অধ্যাত্ম রামায়ণ

Talkes delivered by Swami Samarpanananda on Adhyatmy Ramayan
before the students of Ramakrishna Vivekananda University, Belur Math
(Transcribed and Edited by Amit Ray Chaudhuri)

ভূমিকা

ভারতের প্রধান ধর্ম হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ধর্মের আধার হল বেদ। হিন্দু ধর্মের সব কিছু যদিও বেদেই আছে, তবুও বেদে কিছু কিছু জিনিস ইঙ্গিত-আকারে থেকে গেছে, যেগুলোকে আধার করে পরবর্তি কালে চার ধরণের শাস্ত্র চারটি স্তম্ভ রূপে দাঁড়িয়েছে। যার মধ্যে প্রথম হল বিশুদ্ধ দর্শন, হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন উপনিষদ, পরে গীতাতে এসে এই দর্শনই আরও ঘনীভূত আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয় ইতিহাস-পুরাণ শাস্ত্র, যেখানে রাজা-রানী, দেবী-দেবতাদের কথা কাহিনীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে সামনে রাখা হয়েছে। তৃতীয় পূজা-অর্চনা বিধি, হিন্দু ধর্মের পূজা-অর্চনা বিধি বেশির ভাগই এসেছে তন্ত্র আর পুরাণ থেকে, যেখানে দেখান হয়েছে শুধু পূজা-অর্চনার দ্বারা মানুষ কিভাবে সিদ্ধি লাভ করতে পারবে। আর চতুর্থ আচার-সংহিতা, যেখানে দেখান হয়েছে মানুষ কিভাবে ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন যাপন করে পরমাত্মার উপলব্ধি করতে পারবে। এই চার ধরণের শাস্ত্রের কথা বেদে আগেই এসে গেছে, কিন্তু স্পষ্ট ভাবে দেওয়া নেই। প্রত্যেক ধর্মকেই এই চারটি স্তম্ভকে অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু সুস্পষ্ট ভাবে এই চারটি স্তম্ভ একমাত্র হিন্দু ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই। হিন্দু ধর্মের এই চারটেকেই পরিষ্কার আলাদা আলাদা ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

ইতিহাস-পুরাণকে আমরা অনেক সময় খুব সহজ ভাবে Mythology বলে দিই। Mythology ইংরাজী শব্দ কিন্তু ইংরাজী অভিধানে এবং পাশ্চাত্য জগতে এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। সেইজন্য আমাদের ইতিহাস-পুরাণ বলাটাই শ্রেয়। ইতিহাস-পুরাণে মোটামুটি তিন ধরণের সাহিত্য পাওয়া যায়, প্রথম রামায়ণ সাহিত্য, দ্বিতীয় মহাভারত সাহিত্য আর তৃতীয় পুরাণ সাহিত্য। পুরাণ সাহিত্যে আবার আঠারোটি মূল পুরাণ আর আঠারোটি উপপুরাণ আছে। আঠারোটি মূল পুরাণের প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক আর উপপুরাণেরও প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ শ্লোক মিলিয়ে শুধু পুরাণ সাহিত্যেই প্রায় এগারো লক্ষ শ্লোক আছে। গীতাতে মাত্র সাতশটি শ্লোক আর পুরাণে এগার লক্ষ শ্লোক। এই যে বলা হয় হিন্দু ধর্মকে জানা যায় না, সত্যিই তাই, কি করে জানবে! এগার লক্ষ শ্লোক শুধু পুরাণেই, মহাভারতের এক লক্ষ শ্লোক। সেইজন্য কোন হিন্দুর পক্ষে হিন্দু ধর্মের সব কিছু মাথায় রাখা অসম্ভব। হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক সাত আট হাজার বছর ধরে শুধু এই কাজেই পুরোপুরি নিয়োজিত থেকে গেছে। জ্ঞানের ভাণ্ডারে জ্ঞানরাশি শুধু দিয়েই গেছেন আবার নিজেদের নামটাও কোথাও রাখেননি। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে সব কিছু যেন মূলতঃ একটি লোকের মাধ্যমে এসেছে। তিনি হলেন ব্যাসদেব, একমাত্র ব্যাসদেবের মাধ্যমেই ভারতের সমগ্র ঐতিহ্য এসেছে। কারণ বেদকে তিনি সুসংবদ্ধ ভাবে সঙ্কলন করে দিলেন, মহাভারত তিনি রচনা করলেন আর আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় পুরাণেরেও রচয়িতা ব্যাসদেব। একজনই ঠিক ঠিক ব্যাসদেবের বাইরে ছিলেন, তিনি হলেন বাল্মীকি।

হিন্দু ধর্মে ব্যাসদেবের এই বিশাল অবদানের জন্য তাঁর সম্মান এত উচ্চ ছিল যে, পরের দিকে যাঁরা কবি মনীষীরা এসেছেন, যদিও তাঁরাও খুব বড় প্রতিভাবান ছিলেন, কিন্তু গুরুর সম্মানে নিজের নাম তাঁরা কোথাও দিতেন না, সব কিছুতে ব্যাসদেবের নাম দিয়ে দিতেন। এর ফলে দুটো জিনিস হয়ে গেল, একটা হল তাঁরা নামযশ থেকে দূরে চলে গেলেন আর দ্বিতীয় তাঁদের রচনারও খুব সম্মান হয়ে যেত যেহেতু ব্যাসদেবের রচনা। অনেকের মনে হয়ত সংশয় আসতে পারে, ব্যাসদেব নিজেও তো লিখে থাকতে পারেন, না লিখে থাকার তো কোন কারণ নেই। কিন্তু কেন ব্যাসদেব পুরাণের সব কিছু রচনা করেননি তার কিছু কিছু প্রমাণ পুরাণ সাহিত্যেই পাওয়া যায়। প্রথম কথা হল ব্যাসদেব ছিলেন অত্যন্ত উচ্চমানের ঋষি, উচ্চমানের ঋষি হওয়ার জন্য ব্যাসদেবের ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ। লেখক বা কবি বা সাধক উচ্চমানের কিনা বোঝা যাবে তাঁর লেখার স্টাইল দিয়ে। যদি তাঁর রচনা অত্যন্ত সহজ হয় তাহলে তিনি খুব উচ্চমানের। আমাদের মন কাঁচা বলে মনে করি ক্লাশ ফোরের ছেলেরা যেমন সহজ সহজ লেখে সেই রকম সহজ ভাবে লিখতে নেই। বেশির ভাগ কবি বা সাহিত্যিকরা কামানে যেমন বারুদ ঠাসা হয় সেভাবে রচনার মধ্যে শব্দকে ঠাসতে থাকেন, শেষে কিছুই বোঝা যায় না তিনি কি বলতে চাইছেন। আমাদের দেশের যেকটি আঞ্চলিক ভাষা আছে সবকটি ভাষাই বিশ্লিষ্ট ভাষা, একমাত্র সংস্কৃতই সংশ্লিষ্ট ভাষা। সংশ্লিষ্ট মানে সব কিছুকে জুড়ে দেয়, এটাই সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হিন্দী, বাংলা যত ভাষা আছে সব

বিশ্লিষ্ট, সব কিছুকে ভেঙে ভেঙে রাখা হয়। মহাভারত পড়লেই ব্যাসদেবের একটা প্রধান বিশেষত্বকে খুব সহজেই বোঝা যায়, যারা বাংলা ভাষাটা খুব ভালো জানে তারাও মহাভারতের প্রত্যেকটি শ্লোক পড়লেই বুঝতে পারবে কি বলতে চাইছেন। কিন্তু ভাগবত পড়তে গেলে কিছুই বোঝা যাবে না, সাধারণ মানুষ দূরে থাক, বড় বড় পণ্ডিতরাও এক একটা শ্লোক পড়ে বুঝতে পারেন না কি বলতে চাইছেন। ফলে যার যেমন খুশী ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। আমরা কখনই বেদের পণ্ডিত, উপনিষদের পণ্ডিত হয় শুনিনি কিন্তু ভাগবত পণ্ডিতদের কথা সবাই শুনে থাকবে, ঠাকুরও ভাগবত পণ্ডিতের কথা বলছেন। কারণ ভাগবত হল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য দেখাবার সব থেকে উপযুক্ত জায়গা। ভাগবত যিনিই রচনা করে থাকুন না কেন, ব্যাসদেবের মত উচ্চমানের ঋষি কখনই এই ধরণের কঠিন ভাষা ব্যবহার করবেন না। আচার্য শঙ্কর যত ভাষ্য রচনা করেছেন তার ভাষা এত সহজ সরল কোথাও কোন জটিলতা নেই, সব কিছুর উপর তাঁর দখল আছে। অন্য দিকে রামানুজমের ভাষ্যে এক একটা বাক্য এক একটা পাতা জুড়ে চলতে থাকবে। লম্বা লম্বা শব্দ, দীর্ঘ বাক্য, এমন ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখছেন যে মাথায় ঢুকতেই চায় না, তার মানেই লেখক জিনিসটাকে ঠিক ভাবে ধরতে পারেননি। যিনি পুরো ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করে নিয়েছেন, যাঁর সব কিছু নখদর্পণে তাঁর ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল হয়।

ইংল্যাণ্ডে একজন কম্প্যুটারের একটা নতুন প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলেন। এই নতুন প্রোগ্রামের কাজ হল, শেয়ার মার্কেটে বিভিন্ন রকমের যে কম্প্যুটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয় সেই প্রোগ্রামগুলিকে পরীক্ষা করা। নতুন প্রোগ্রামকে মার্কেটে ছাড়ার আগে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখাবার জন্য অনেক কোম্পানী থেকে লোককে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। যেদিন প্রোগ্রামটা দেখানো হবে সেই দিনই কোন কারণে এদের যে হেড ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তাঁর এ্যসিস্ট্যান্টকে দায়ীত্ব দিলেন তুমি ব্যাপারটা সবাইকে বুঝিয়ে দাও। এ্যসিস্ট্যান্ট অনেকক্ষণ ধরে অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করে যাচ্ছে নতুন প্রোগ্রামটা ঠিক কি কাজ করে। কিছুতেই সে বেচারী ওদের বোঝাতে পারছে না। শেষে ওরা ধরেই নিল যে এই প্রোগ্রাম আমাদের কোন কাজেই লাগবে না। সবাই এবার অফিস থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। তখন তড়িঘড়ি করে তাদের হেডকে খবর দিল, এরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না, আপনি যদি একবার এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে যান। উনিও হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন। এরা সবাই ওনাকে জিজ্ঞেস করছে, এই প্রোগ্রাম আমাদের কি কাজে লাগবে? ভদ্রলোক তখন বলছেন – আপনাকে যদি মই দিয়ে ছাদে উঠতে হয় তাহলে আগে আপনাকে একটা মই লাগাতে হবে, মই লাগানোটা আপনার প্রোগ্রাম। আর মইটা ঠিক ভাবে লাগানো হয়েছে কিনা, ছাদে ওঠার আগে মানুষ মইকে একটু ঝাঁকিয়ে দেখে নেয়। ঝাঁকালে বোঝা যায় মইটা মজবুত আর দৃঢ় আছে কিনা। আপনাদের শেয়ার মার্কেটিংএ যে প্রোগ্রাম চলছে সেটা হল এই মইটা, এই নতুন প্রোগ্রামটা গিয়ে ঝাঁকুনি মারে, ঝাঁকুনি মারলেই আপনি বুঝে যাবেন আপনার প্রোগ্রাম মজবুত কিনা। এটুকু বুঝিয়ে দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে সবাই নতুন প্রোগ্রামটা কিনে নিল। রাতারাতি এই নতুন প্রোগ্রাম বিরাট মার্কেট পেয়ে গেল। প্রোগ্রামটা খুবই প্রয়োজনীয় কিন্তু যারা বোঝাচ্ছে তারা বোঝাতে পারছে না, কারণ ওদের নিজেদের কাছেই ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। কিন্তু যিনি হেড, তাঁরা মাথাটা এত পরিষ্কার যে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় পুরো জিনিসটাকে পরিষ্কার করে দিলেন।

আরও দেখা যায়, কথা বলার সময় আমরা খুব সহজ সরল ভাবে বলি, কিন্তু লিখতে বললেই আমাদের সব পাণ্ডিত্য বেরোতে শুরু করবে, পরে সেই লেখা পড়ে কেউ বুঝতে পারে না কি বলতে চাইছে। ভারতের ছ-সাত হাজার বছর ইতিহাসে অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু সবাই ব্যাসদেবের নামে সব কিছু চালিয়ে দিয়েছেন। যার জন্য পুরাণের ভাষার মধ্যে প্রচণ্ড তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন পুরাণকে খুব কঠিন মনে হবে, বিশেষ করে ভাগবত, কিন্তু অন্য দিকে কিছু পুরাণের ভাষা অত্যন্ত সহজ। আঠারটি যে মূল পুরাণের কথা বলা হল তার মধ্যে একটি হল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। পণ্ডিতরা আবার পুরাণের তিনটি শ্রেণীবিন্যাস করেন, একটা হল ব্রহ্মা কেন্দ্রিক পুরাণ, দ্বিতীয় বিষ্ণু কেন্দ্রিক পুরাণ আর তৃতীয় শিব কেন্দ্রিক পুরাণ। কিভাবে এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে আমাদের জানা নেই, কারণ সব পুরাণেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ তিনজনই সমান ভাবে এসেছেন। ওনারা বলেন যে পুরাণে যাঁকে যেভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেইভাবে এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের নামে বলা হয় এই পুরাণ হল ব্রহ্মার, যদিও সব পুরাণেই ব্রহ্মাকে দিয়ে শুরু হয় কিন্তু ওনাদের বক্তব্য হল ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ব্রহ্মাকে দুজনের থেকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আমরা যে অধ্যাত্ম রামায়ণ আলোচনা করতে যাচ্ছি, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের শেষের দিকে এই অধ্যাত্ম রামায়ণ এসেছে।

অধ্যাত্ম রামায়ণের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য

অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একটা ছোট্ট অংশ। যদিও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অংশ কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের একটা নিজস্ব আস্তিত্ব আছে। যেমন গীতা মহাভারতের খুব ছোট্ট অংশ হলেও গীতার একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। গীতার মত অধ্যাত্ম রামায়ণেরও একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে। বাল্মীকি রামায়ণের পর যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সবই যেন অধ্যাত্ম রামায়ণকে আধার করে লেখা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের প্রতি বাল্মীকির যে দৃষ্টিভঙ্গী, বেশির ভাগ রামকথা রচয়িতারা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নেননি। বিশেষ করে রামকথার কথা বলতে তুলসীদাসের রামচরিতমানসই বেশি জনপ্রিয়। অন্য দিকে তুলসীদাসের রামচরিতমানস বাল্মীকির রামায়ণের ধারে কাছেই আসবে না। রামচরিতমানসের পুরো দৃষ্টিভঙ্গীটাই এসেছে অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে। অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র একজন মহামানব যাঁর মধ্যে অনেক গুণ আছে। সাধারণ ভাষায় আমরা বলতে পারি বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র এমনই এক ব্যক্তিত্ব যারা নাস্তিক, নাস্তিক বলতে যারা ঈশ্বর মানে না কিন্তু অন্যান্য মূল্যবোধকে মানে, যেন তিনি তাদের ভগবান। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রায়ই মর্যাদাপুরুষ বা পুরুষোত্তম শব্দটা ব্যবহার করা হয়, পুরুষোত্তম মানে পুরুষের মধ্যে উত্তম, মর্যাদাপুরুষ মানে যিনি মর্যাদাকে লঙ্ঘন করেন না। কিন্তু আজকের দিনে রামকথা বলতে আমরা যা বুঝি সেখানে বাল্মীকির রামে কাজ হয় না, সেখানে ভক্তির দরকার। অধ্যাত্ম রামায়ণ রামভক্তির শেষ কথা।

গ্রন্থের দিক দিয়ে যদি বিচার করলে আমাদের তিন চারটি গ্রন্থকে সমন্বয় শাস্ত্র রূপে দেখা হয়। ধর্মের বিভিন্ন ভাবকে নিয়ে এসে যে গ্রন্থে একটি সূত্রে গ্রথিত করা হয়েছে তাকেই সমন্বয় শাস্ত্র বলা হয়। হিন্দু ধর্মের সব থেকে বড় সমন্বয় শাস্ত্র হল গীতা। গীতাই প্রথম শাস্ত্র যেখানে হিন্দু ধর্মের যত রকমের দর্শন, মতবাদ ও ভাব আছে সব কিছুকে এক জায়গায় এনে সমন্বয় করা হয়েছে। গীতার পরেই আসে অধ্যাত্ম রামায়ণ। অধ্যাত্ম রামায়ণে দর্শন থেকেও আধ্যাত্মিক জীবনে যত রকমের ভাব আছে তার প্রত্যেকটি ভাবকে নিয়ে এসে একটা সামঞ্জস্য করা হয়েছে। যার জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সত্যিকারের উন্নতি চান তাঁদের জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্র। অধ্যাত্ম রামায়ণের পর শঙ্করাচার্যের দর্শনে আমরা সমন্বয় পাই। শেষ সমন্বয় গ্রন্থ হল ঠাকুরের কথামৃত। কথামৃতে ঠাকুর যেসব উপমা গুলো ব্যবহার করছেন তার বেশির ভাগ উপমা আমরা কিছু ভাগবত থেকে পাই আর অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে পাই। কথামৃতে অনেক জায়গায় বলছেন, অধ্যাত্মে আছে, অধ্যাত্মে আছে মানে অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে।

বাল্মীকি রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র হলেন আমার আপনার মত এক জীবন্ত পুরুষ, কিন্তু তাঁর মধ্যে শক্তি আর চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য গুলি শ্রীরামচন্দ্রকে বাকি সবার থেকে আলাদা করে দেয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই স্থূল জগতের কোন গুরুত্ব নেই, এখানে একমাত্র ভাবরাজ্যকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভাবরাজ্য হল মানুষ তাঁর ইষ্টকে কিভাবে দেখতে চাইছে। ঠাকুর বলছেন, সচ্চিদানন্দ অনেক রকমের লীলা করেন, ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা এই ধরণের নানান রকমের লীলা করেন। বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে সচ্চিদানন্দ নিজেকে ব্যক্ত করছেন। এই যে সচ্চিদানন্দ, বেদে যাঁকে পুরুষ বলছেন, সেই পুরুষ বা সচ্চিদানন্দকে, সেই অনন্তকে যখন কেউ অনুভব করতে চাইছেন, অপরকে যখন কেউ সচ্চিদানন্দের কথা বলতে চাইছেন, বেদ সেটাকে দেবলীলা রূপে সামনে নিয়ে এলেন। সেই অনন্তের মুখোশটা লাগিয়ে দিলেন সচ্চিদানন্দের উপর, অনন্তের একটা মুখ যেন দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু সেই মুখটা হল দেবতার, যেখানে ইন্দ্র, অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারা রয়েছেন। এই দেবতাদের মুখ দিয়ে যেন সেই অনন্তকে দেখছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে এসে তাঁরা আর দেবতার মুখ রাখলেন না, দেবতাদের জায়গায় মানুষের মুখ লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু যখনই মানুষের মুখ সচ্চিদানন্দের উপর লাগানো হবে তখন তিনি আর মানুষ থাকবেন না, তখন তিনি অবতার হয়ে যান। ভাগবতে অবতার তত্ত্বের যে ধারণা আমরা পাই ঠিক সেই একই তত্ত্ব আমরা অধ্যাত্ম রামায়ণেও পাই। এখানে সচ্চিদানন্দকে মানুষের মাধ্যমে দেখছেন। স্থূল জগতের শ্রীরামচন্দ্রের সাথে রামভক্তের যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর কোন মিল নেই। একজন ভক্তের যিনি শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে তিনি এটা কেন করেছিলেন, এগুলো কেন করলেন না, এই জিনিসগুলোর কোন গুরুত্ব থাকে না। এখানে গুরুত্ব হল ভক্ত তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তাকে কিভাবে দেখছেন।

সচ্চিদানন্দের মুখ যখন দেবতাদের উপর লাগানো হয় তখন ব্যাপারটা খুব সহজে উতরে যায়। কিন্তু মানুষের উপর যখন সচ্চিদানন্দের মুখ লাগানো হয় তখন ব্যাপারটা অনেক জটিল হয়ে যায়। ঋষিদের এটাই বাহাদুরী যে সচ্চিদানন্দের যে গুণ সেই গুণকে একটা মানুষের উপর আরোপ করে একটা অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে দাঁড় করিয়ে মানুষের মনে চিরস্থায়ী করে দিলেন। এর বাইরে অধ্যাত্ম রামায়ণের আরেকটি দিক খুব গুরুত্বপূর্ণ, হিন্দু ধর্মের যাবতীয় যা কিছু আছে, যা যা জিনিসের আমরা কল্পনা করতে পারি তার প্রত্যেকটি জিনিসকে অধ্যাত্ম রামায়ণে রেখে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে যেমন জ্ঞানের ভাব পাওয়া যাবে তেমনি যোগের ভাব রয়েছে, ভক্তির ভাব রয়েছে তেমনি ধর্মের ভাব রয়েছে আর সমস্ত দর্শনকে সমন্বয় করা হয়েছে। একই জিনিস গীতাতেও পাওয়া যাবে। গীতা সাতশটি শ্লোকে যা যা বলা হয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণে সেই একই জিনিসকে প্রায় চব্বিশ শ্লোকে রাখা হয়েছে। গীতার বাইরে অধ্যাত্ম রামায়ণের যে বৈশিষ্ট্য তা হল অবতারলীলার কথা। অবতারলীলার কথা গীতাতে নেই। অবতারলীলাই অধ্যাত্ম রামায়ণের মূল। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ আমি আমি করে বলছেন কিন্তু সেখানে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নেই। শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর জন্য আমাদের ভাগবতে যেতে হবে। ভাগবত আবার সম্পূর্ণ গ্রন্থ, একই গ্রন্থে যদি সব কথা জানতে হয় তাহলে ভাগবতে যেতে হবে। ভাগবতে সব কিছুই পাওয়া যাবে, দর্শন রয়েছে, আচার-সংহিতা রয়েছে, পূজা-অর্চনা বিধি রয়েছে আর তার সাথে প্রচুর পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। কিন্তু ভাগবতের কলেবর বিশাল, সেই তুলনায় অধ্যাত্ম রামায়ণে অনেক ছোটর মধ্যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার সব কিছুকে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যেটা গীতাতেও নেই। তবে অধ্যাত্ম রামায়ণে ভক্তির উপাদান এত বেশি যে যুক্তিবাদী মন সব কিছু গ্রহণ নাও করতে পারে। গীতা সেদিক থেকে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে।

বাল্মীকি রামায়ণে কিছু কিছু যে ক্রটি বিচ্যুতি থেকে গেছে সেই ক্রটি বিচ্যুতিকে অধ্যাত্ম রামায়ণে পরিহার করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণ আর অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়তে গেলে অনেক জায়গায় প্রচুর সংশয় উৎপন্ন হয়। যেমন প্রধান একটা সংশয় আসে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে। শ্রীরাম আসলে কে? শ্রীরাম কে হবেন! আপনি তাঁকে যেমনটি দেখতে চাইবেন তিনি তেমনটি। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, একজন ভক্ত মন্দিরে প্রভুর দর্শন করতে গেছেন, প্রভুর বিগ্রহের সবই ঠিক আছে, সব কিছুই জীবন্ত কিন্তু তাঁর কুণ্ডল দুলছে না। প্রভুকে ভক্ত বলছেন, প্রভু! তোমার দুল তো দুলছে না। প্রভু তখন বলছেন, তুমি দোলাচ্ছ না তাই দুলছে না, তুমি দোলালেই দুলবে। এটাই ভাবরাজ্য, ভাবরাজ্যে ভাবের কথাই চলে। আপনি শ্রীরামচন্দ্রকে কেমন দেখতে চাইছেন? বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে একজন মর্যাদাপুরুষ রূপে দেখছেন, বাল্মীকি তাঁর বর্ণনায় কাব্য প্রতিভাকে কাজে লাগিয়েছেন, সেখানে তিনি তাঁর চিন্তন শক্তি প্রয়োগ করে তাঁর নিজস্ব ভাবকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে দিয়েছেন। আর বাল্মীকি যখন রামায়ণ রচনা করেছেন, কিছু না হোক অন্তত তার দেড় হাজার বছর পর অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাই অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাব অনেক উচ্চমানের হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। যে কোন জিনিসের ভিত্তি স্থাপনটাই কঠিন হয়, কিন্তু তারপরে তার উপর কোন জিনিসকে দাঁড় করান অতটা কঠিন হয় না।

বাল্মীকি রামায়ণের অনেক ঘটনা আছে যেমন বালি বধ, একজন শূদ্রকে বধ করা বা সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতাকে বনবাসে পাঠানো এই কাহিনীগুলো ভক্তের হৃদয়ে কোথাও একটা অস্বস্থির ভাব সৃষ্টি করে। অধ্যাত্ম রামায়ণ এর সব দোষকে পরিহার করে দিয়েছে। কোথাও সীতাকে মায়া রূপে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোথাও স্বর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, কোথাও এটা সেটা করে দিচ্ছেন, এইসব করে ভক্তের মনের সব রকম অস্বস্থি ভাবকে দূর করে দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি জ্ঞান ভক্তির দিক দিয়ে দেখতে যাই তাহলে অধ্যাত্ম রামায়ণই শেষ কথা। আর কেউ যদি বলে আমার এসব লাগবে না, আমার মন যুক্তিবাদী, তখন তার কাছে বাল্মীকি রামায়ণ অনেক উচ্চমানের গ্রন্থ। তবে বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি ধর্ম, অর্থ আর কাম এই তিনটেকেই প্রাধ্যান্য দিয়েছেন। মোক্ষের ধারণা বাল্মীকির কাছে ছিল না, তাই বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষের কোন কথা নেই। অধ্যাত্ম রামায়ণ আগাগোড়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটে পুরুষার্থকে নিয়েই এগিয়ে গেছে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখলে অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্র। তবে বাল্মীকি হলেন আদিকবি, আদিকবির সাথে অন্য কারুর তুলনা করা চলে না।

এখানে আমাদের একটা জিনিস খুব ভালো করে বুঝতে হবে, আমাদের কাছে শ্রীরামচন্দ্র গুরুত্ব নন, শ্রীকৃষ্ণও গুরুত্ব নন, ইন্দ্র, মিত্র, বরুন কেউই গুরুত্ব নন, আমাদের কাছে গুরুত্ব একমাত্র সচ্চিদানন্দের। ঠাকুর বলছেন, বৃষ্টি পড়ছে দেখছি বৃষ্টির জল কোথাও বাঘের মুখ দিয়ে পড়ছে, কোথাও আবার হাতির মুখ দিয়ে পড়ছে, আকাশের জল তখন আর মাথায় থাকে না। এই ধরণের গ্রন্থ পড়ার সময় সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে

যে, এখানে সচ্চিদানন্দকে কিভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আমরা সচ্চিদানন্দের কাছে কি উপায়ে পৌঁছাব। এছাড়া আর কোন কিছুরই এখানে গুরুত্ব নেই। ঠাকুর বলছেন নরেনাদি ছোকড়াদের দুটো জিনিস জানলেই হবে – তারা কে আর আমি কে। ধর্ম বলতে এই দুটোর বাইরে তো আর কিছু নেই, তিনি কে আর আমি কে, আমার সাথে তাঁর কি সম্পর্ক। যে কোন ধর্মগ্রন্থই হোক না কেন, সবারই এই দুটি কথা – তিনি কে আর আমি কে, আর তাঁর সাথে আমার কি সম্পর্ক। এর বাইরে বাকি যা কিছু আছে তার কোন দাম নেই। শ্রীরামচন্দ্র যদি অযোধ্যার বদলে বারাণসীতে জন্ম নিতেন তখনও অধ্যাত্ম রামায়ণ তাই থাকত। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে না জন্মে দক্ষিণেশ্বরে জন্ম নিলে কথামৃত পাল্টে যেত না, উপমাগুলো একটু পাল্টাতো। সমস্যা হল সাধারণ মানুষ বাইরের খোলসটা নিয়েই পড়ে থাকে, সাংসারিক জীবনই হোক বা আধ্যাত্মিক জীবনই হোক আর শান্তির জীবনই হোক, কোন জীবনেই বাইরের খোলসের কোন গুরুত্ব নেই। স্বামীজী কোন জাহাজে আমেরিকা গিয়েছিলেন, ৩১শে মে নাকি ৩০শে মে গিয়েছিলেন জানলে আমাদের কি হবে! গুরুত্ব হল স্বামীজী শিকাগোতে বক্তৃতায় যখন Sisters and brothers of America বলছেন। মেরি লুইবার্ক তাঁর নিউ ডিসকভারিজে খুব মজা করে লিখছেন, ভারতবর্ষ স্বামীজীকে এত পূজা করে কিন্তু কোথাও কোন বইতে আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি যে স্বামীজীর উচ্চতা কত ছিল। স্বামীজীর উচ্চতা কত ছিল কেউই জানে না। পরে এই নিয়ে মেরি লুইবার্ক রীতিমত রিসার্চ করতে শুরু করে দিলেন। আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বামীজীর চেহারার যে বর্ণনা আছে সেগুলোকে সংগ্রহ করে, স্বামীজীর পোষাকের মাপ জোগাড় করে অনেক হিসেব করে বললেন স্বামীজী ছ ফুট দুই ইঞ্চির কাছাকাছি ছিলেন। এই মাপ আন্দাজে বলা হয়েছে, কারণ সঠিক মাপ পাওয়ার তো কথা নয়, মানুষটাই তো নেই। লুইবার্ক বলছেন, এই হল ভারতবর্ষ, এখানে ব্যক্তির কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতি ও সিদ্ধান্তের। ব্যক্তির বদলে তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আর যে সিদ্ধান্তের উপর তাঁর সমগ্র জীবন প্রতিষ্ঠিত সেই সিদ্ধান্তকেই ভারতবর্ষ সব সময় গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। যার জন্য স্বামীজী কত লম্বা ছিলেন, ঠাকুরের দুটো কাঁধ ছোট বড় ছিল কিনা এই নিয়ে কারুরই কোন মাথা ব্যাথা নেই।

সব পুরাণের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য মহাভারতেও পাওয়া যাবে, তা হল পুরাণের কাহিনী সব সময় শুরু হয় নৈমিষারণ্যে কোন ঋষি বিরাট বড় এক যজ্ঞ করছেন, সেখান থেকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় শৌনক নামে একজন ঋষি, যিনি ব্যাসদেবরই শিষ্য ছিলেন, তিনি নৈমিষারণ্যে যজ্ঞ করছেন, খবর পেয়ে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক ঋষি মুনিরাও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েছেন। সেখানে একজন সূত এসে উপস্থিত হলেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণদের চার বর্ণের মেয়েকেই বিবাহ করার অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়দের অধিকার ছিল তিনটে বর্ণের মেয়েদের বিবাহ করার, বৈশ্যরা দুটি বর্ণের আর শূদ্ররা শুধু নিজেদের বর্ণের মেয়েদেরই বিবাহ করতে পারত। নিম্ন বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের মেয়েকে বিবাহ করতে পারত না। ব্রাহ্মণ যদি নিম্ন বর্ণের মেয়েকে বিবাহ করতেন আর তাঁর থেকে যে সন্তান হত তাকে সূত বলা হত। সূতদের ব্রাহ্মণের সম্মান দেওয়া হত কিন্তু বেদে তাঁদের কোন অধিকার ছিল না, যজ্ঞ করাতে পারবেন না, বেদ অধ্যয়ন করাতে পারবে না, কিন্তু নিজে বেদ অধ্যয়ন করতে পারতেন। তখনকার দিনে খুব নামকরা সূত হলে লোমহর্ষণ, কোথাও কোথাও রোমহর্ষণও বলা হয়। লোমহর্ষণ পুরাণের কথা বলে বেড়াতেন। পুরাণের একটা কাহিনীতে বলা হয় ব্যাসদেব যখন বেদকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি চারজন শিষ্যকে এক একটি বেদের শিক্ষা দিয়ে সেই বেদের সংরক্ষণের দায়ীত্ব অর্পণ করে দিলেন। ঠিক তেমনি ব্যাসদেব লোমহর্ষণকে পুরাণাদির শিক্ষা দিয়েছিলেন। যদিও পুরাণের মাহাত্ম্য বেদের মত নয় কিন্তু বেদে যে তত্ত্বগুলো আছে সেই তত্ত্বগুলো পুরাণেও পাওয়া যাবে।

লোমহর্ষণও খবর পেয়ে নৈমিষারণ্যে শৌনক ঋষির যজ্ঞে উপস্থিত হয়েছেন। লোমহর্ষণকে দেখে শৌনক ঋষি খুব খুশি হয়ে বলছেন, আমাদের কি সৌভাগ্য আপনি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আপনি আমাদের কিছু পুরাণের কাহিনী বলুন। পুরাণের কাহিনী বলার আগে ওনারা কিছু প্রশ্ন করতেন, যেমন সৃষ্টি কিভাবে হল। অধ্যাত্ম রামায়ণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত তাই এখানে প্রশ্ন করলেন ব্রহ্মা কিভাবে সৃষ্টি করলেন আপনি আমাদের বলুন। বিভিন্ন পুরাণে যত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে সেখানে কারুর সাথে কোন মিল পাওয়া যাবে না। এক বেদেই সৃষ্টির উপর দুটি সূক্তম, নাসদীয়সূক্তম আর পুরুষসূক্তম, দুটোর সাথে কোন মিল নেই। কারণ মূল কথা হল সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে এই রহস্যের কোন দিন ব্যাখ্যা করা যাবে না। সাধারণ মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে জানতে চাইবে, তাদেরকে বোঝাবার জন্য ঋষিরা বিভিন্ন রকমের সৃষ্টির বর্ণনা করে তাদের মনকে শান্ত করে দিতেন।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের কাহিনীও এভাবেই শুরু হয়ে শেষের দিকে একটা জায়গায় এসে শিবের পরিবারের বর্ণনা আসে। শিবের পরিবারের বর্ণনার মধ্যে অনেক প্রশ্নোত্তর পর্ব আছে। পৌরাণিক কাহিনী শুরু করবেন একজন, তিনি বলবেন আমাকে অমুক ঋষি বা রাজা বলেছিলেন, সেই অমুক আবার বলবে আমাকে অমুক বলেছিলেন, সেখান থেকে অমুক বলবেন আমাকে অমুক এই কাহিনী বলেছিলেন, অমুক অমুক করতে করতে পুরোটাই জট পাকিয়ে যাবে, জট ছাড়াতে গিয়ে আসল কাহিনী কোথা থেকে শুরু হয়েছিল কারুরই মনে থাকার কথা নয়। সেইজন্য যে অংশটুকুর মধ্যে থাকবে শুধু ওই অংশটুকুই নিতে হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনী তন্ত্রের ধারায় শিব ও পার্বতীর কথোপকথনের মাধ্যমে শুরু হয়। পার্বতী শিবকে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন করছেন। সেখান থেকেই শুরু হয় রামকথা। পার্বতী শিবকে প্রণাম করে বলছেন –

আদিকাণ্ড

নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস সর্ব্বাত্মকদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।
পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোঽসি।।১/১/৭।।

মহাদেবকে পার্বতীর প্রশ্ন

হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনাকে প্রণাম। আপনি সর্ব্বাত্মদর্শি পরমেশ্বর, আমি আপনার কাছে তাই শ্রীরামচন্দ্র যিনি পুরুষোত্তম, পরমব্রহ্মের তত্ত্ব এবং সনাতন তাঁর সম্বন্ধে জানতে চাইছি। প্রথমেই শুরু করছেন, *পৃচ্ছামি তত্ত্বং*, এখানেই পরিষ্কার হয়ে যায়, আধ্যাত্মিক জগতে কথা, কাহিনী, আচার এগুলোর কোন দাম নেই। এগুলো হল ধর্মের আনুষাঙ্গিক ব্যাপার। স্বামীজী বর্তমান যুগে পুরো ধর্মকে একটা জায়গায় সংগঠিত করে নিয়ে এসে বলে দিলেন Each soul is potentially divine, the goal is to manifest the divinity within, এই যে বলছেন divinity within এটাই তত্ত্ব। অধ্যাত্ম রামায়ণও শুরু হয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা দিয়ে। সেইজন্য কাহিনীতে অমুক হল, তমুক হয়েছিল এসবের কোন মূল্য নেই। কাজের কথা হল তত্ত্ব। তত্ত্বের কথা আপনাকে কেন জিজ্ঞেস করছি, কারণ এই তত্ত্ব সনাতন, সময়ের সাথে এই তত্ত্ব পাল্টায় না। এই তত্ত্বের ব্যাপারে কে বলতে পারবেন? যে দিল্লী গেছে সেই তো দিল্লীর ব্যাপারে বলতে পারবে। যিনি সনাতন তিনিই বলতে পারবেন সনাতনের কথা। কারণ যিনি সনাতনকে জেনেছেন তিনিই সনাতন। মুণ্ডকোপনিষদে বলছেন *ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি*, ব্রহ্মবিদ্ আর ব্রহ্ম দুটো আলাদা কিছু নয়। যিনি তত্ত্বকে জেনে নিয়েছেন, যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তিনি তাই হয়ে যান। কারণ আমরা যেভাবে বস্তুকে জানছি এভাবে কখনই ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে আমাদের বেশির ভাগেরই একটা ধারণা যে আমরা যেভাবে এই কলম দেখছি ঠিক সেই ভাবে আমরা এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে বা শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে পাব। ঈশ্বর দর্শন এভাবে হয় না। নিজেকে জানা আর বস্তুকে জানার মধ্যে বিরাট তফাৎ হয়ে যায়, নিজেকে জানা মানে বোধে বোধ হওয়া। যিনি নিজেকে জেনে গেছেন তিনি নিজেই হয়ে গেছেন। নিজেকে জানা মানে নিজে হয়ে যাওয়া। সেইজন্য ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন, মানে নিজেকে যিনি জেনেছেন, নিজেকে জানা মানে তাই ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া। সনাতনকে যিনি জেনেছেন তিনি সনাতন হয়ে গেছেন। যিনি সনাতন একমাত্র তিনিই সনাতনের কথা বলতে পারবেন, এছাড়া আর কারুর বলার অধিকার নেই। শিব হলেন সনাতন, রামকথা যদি শুনতে হয় তাহলে শিবের কাছেই শুনতে হবে, শিব ছাড়া রামকথা বলার আর কারুর যোগ্যতা নেই। তুলসীদাসও ঠিক এভাবেই বলছেন, উনিও রামকথা শিব ও পার্বতীর কথোপকথনকে আধার করে শুরু করছেন।

একটা নামকরা কথাতে বলা হয়, যে কোন বিষয়ে জানতে হলে বলা হয় read the master। শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি জানতে হয় তাহলে read the master, ঠাকুরের ব্যাপারে মাস্টার কে? ঠাকুর নিজেই, তাই কথামৃতই পড়তে হবে, তবেই ঠাকুরকে জানা যাবে। আর যদি তাতে না হয় তাহলে গ্রেট মাস্টার হলেন শরৎ মহারাজ আর স্বামীজী, স্বামীজীর রচনাবলী পড়ুন আর লীলাপ্রসঙ্গ পড়ুন, শ্রীরামকৃষ্ণকে জেনে নিন। ধর্মতত্ত্ব যদি জানতে হয় তাহলে আমাদের উপনিষদ পড়তে হবে, যদি অর্থ স্পষ্ট না হয় তাহলে আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখে নিতে হবে। তত্ত্বের কথা যদি জানতে হয় তাহলে তত্ত্ববিদের কাছ থেকেই জানতে হবে। তত্ত্ববিদ মানে যিনি তত্ত্বের সঙ্গে এক। পার্বতী জানেন একমাত্র শিবই সনাতন, ঈশ্বরের কথা শুনতে হলে ঈশ্বরের কাছেই যেতে হবে।

প্রফেট বলতে আমরা মনে করি যীশু প্রফেট ছিলেন, মহম্মদ প্রফেট ছিলেন, কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের এখানে যেমন ব্রাহ্মণ ঠিক তেমনি সেই সময় মধ্য এশিয়ায় প্রফেটরা ছিলেন, যাঁদের কাজই ছিল উপদেশ দেওয়া। যীশুকে যে প্রফেট বলা হয় তিনি যে ঈশ্বরের সন্তান বা দূত তার জন্য বলা হয় না, প্রফেট একটা শ্রেনী। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে যীশু যখন উপদেশ দিচ্ছেন তখন সেখানে একজন প্রফেট যিনি এর আগে লোকেদের উপদেশ দিতেন, তিনি বলছেন – He spoke as he had the authority, অন্য কেউ যখন এই কথাগুলো বলত তখন বোঝা যেত তার কোন অথরিটি নেই কিন্তু যীশু যখন বলছেন তখন তাঁর authorization আছে, মানে তোমার এই কথা বলার অধিকার আছে। লোকেরাই বুঝতে পারছে যে এর বলার অধিকার আছে। লোকেরা কারা? অশিক্ষিত গ্রামের মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে, তারাও বুঝতে পারছে এই লোকটার মধ্যে একটা শক্তি আছে, কথাগুলো বলার অধিকার আছে। ঠাকুর বলছেন, ওরে পোদো শাঁখ বাজিয়ে তুই করলি গোল। এখানে সেখানে ঈশ্বরের কথা শুনে বেড়ালে সব গোলমাল হয়ে যায়। ঈশ্বরের কথা যদি শুনতে হয় ঈশ্বরের কাছেই শুনতে হবে। অবতারের কথা যদি শুনতে হয় তাহলে অবতারের কাছেই যেতে হবে। আর ঈশ্বরের কথা একমাত্র ঠিক ঠিক রেকর্ডেড হয়েছে কথামৃতে। কথামৃত ছাড়া কোথাও যে ঈশ্বরের কথা সরাসরি লিপিবদ্ধ হয়েছে পাওয়া যায় না। পার্বতীও এই কথাই বলছেন *সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোহসি*। *পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য সনাতন*, যিনি পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সনাতন, তাঁর তত্ত্বের ব্যাপারে আমার জানার ইচ্ছে হয়েছে, আর সেই ব্যাপারে একমাত্র আপনিই বলতে পারবেন কারণ আপনি নিজেও সনাতন।

গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাচ্যং বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
তদপ্যহোহহং তব দেব ভক্ত্যা প্রিয়োহসি মে ত্বং বদ যৎ তু পৃষ্ঠম্।।
জ্ঞানং সবিজ্ঞানং মথানুভক্তিবৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বৎ।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন।।১/১/৮-৯।।

পার্বতী আরও অনেক কথা বলছেন। সংক্ষেপে তা হল, যেসব কথা অত্যন্ত গোপনীয় সেই সব কথা মানুষ তার নিজের প্রিয়জন বা ভক্তদের বলে, আমি আপনার শুধু স্ত্রীই নই আমিও আপনার প্রতি ভক্তমতী, যদিও তত্ত্ব কথা অতি গূহ্য কথা কিন্তু আপনি আমাকে সেই তত্ত্ব কথা বলুন। পার্বতী বলছেন, যে ভক্তি বৈরাগ্য লাভ করে মানুষ সংসারের পারে যায় সেই ভক্তি বৈরাগ্যের কথা বলুন। এরপরেই পার্বতী খুব মজার কথা বলছেন, *জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং*, আমি স্ত্রী জাতি, তাই আপনি এমন ভাবে বলুন যাতে স্ত্রী জাতি হয়েও আমি আপনার কথা বুঝতে পারি। পার্বতী শিবকে বলছেন মেয়েদের বুদ্ধি কম হয়, তাই এমন ভাবে বলতে বলছেন যাতে মেয়ে হয়েও আমি যেন বুঝতে পারি। মূল বক্তব্য হল শিব সব কিছু যেন সহজ সরল ভাবে বলেন যাতে সবাই এই তত্ত্বকে জানার সুযোগ পায়। আর এটা সত্যিই আশ্চর্যের যে অধ্যাত্ম রামায়ণের সব কথাই অত্যন্ত সহজ সরল। বেদান্তের তত্ত্ব বোঝা অত্যন্ত কঠিন কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ বেদান্তকে যেভাবে ব্যাখ্যা করছে খুব সহজেই বোঝা যায়।

ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যৎ ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্।।১/১/১১।।

পার্বতী শিবকে বলছেন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যে একান্ত ভক্তি এই ভক্তিই সংসারের পারে যাওয়ার জন্য একটা সুদৃঢ় প্রসিদ্ধ নৌকা স্বরূপ। বলছেন *ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায় নান্যৎ ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ*, সংসারের পারে যাওয়ার জন্য ভক্তি সাধনই যথেষ্ট। ঈশ্বরের প্রতি যদি কারুর ভক্তি হয়ে যায় তাতেই সে সংসারের পারে চলে যাবে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান যে বলছেন *তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ*, এই ভাবটাই পার্বতী এখানে বলছেন, আমার ভক্তকে আমি নিজের হাতে মৃত্যু রূপ সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করি। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আমার ভক্তি আছেই, কিন্তু তথাপি *হৃৎসংশয়বন্ধনং মে বিভেত্তুমর্হস্যমলোক্তিভিস্ত্বম্,* কিন্তু আমার মধ্যে যে কিছু কিছু সংশয় ও সন্দেহ এসেছে এগুলো যদি ছিন্ন হয়ে যেত তাহলে খুবই ভালো হত, আর আপনিই বিশুদ্ধ বাক্য দ্বারা আমার এই সংশয় দূর করতে পারেন। আমরা ভাবি ঠাকুরের প্রতি তো আমার ভক্তি আছেই, মঠ থেকে দীক্ষাও নিয়েছি, আমার সব কিছু হয়ে গেছে। না, এভাবে হয় না। কারণ, যে পথেই আমরা চলি না কেন, একটা সময় সবারই মনে সংশয় আসে। সংশয় একবার এসে গেলে সব জপ-ধ্যান উড়ে যাবে, কিছুই আর থাকবে না। কিন্তু শাস্ত্রের কথা বা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের আলাপ-আলোচনাদি করলে সংশয়গুলো কেটে যায়। সংশয় ভাবটা যখন কেটে

যায় তখন ভক্তি ভাব আরও দৃঢ় হয়। সব কথা বলার পর পার্বতী যে প্রশ্ন করছেন এটাই অবতার তত্ত্বের ব্যাপারে মূল প্রশ্ন।

বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং নিরস্তমায়গুণসম্প্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ।।১/১/১২।।
বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমাত্মসংজ্ঞম্।
জানাতি নাত্মানমতঃ পরেণ সম্বোধিতা বেদ পরাত্মতত্ত্বম্।।১/১/১৩।।

শ্রীরামচন্দ্রকে পার্বতী পরমপুরুষ, অদ্বিতীয়, মায়াহীন, আদি, নির্গুণ সব কিছু বলে বলছেন শ্রীরামচন্দ্র যে ভগবান এটা লোকেরা মানছে। কিন্তু অনেকে আবার বলেন তের আর চৌদ্দ নম্বর শ্লোক খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। ঠাকুর কথামৃতে অবতার তত্ত্বকে নিয়ে যখনই কোন কথা বলছেন তখনই এই দুটি শ্লোকের ভাবকেই যেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে আসছেন। শ্রীরামচন্দ্র যদিও তিনি পরমব্রহ্ম কিন্তু মানব দেহ ধারণ করার পর তিনি যেন নিজের মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। ঠাকুরও বলছেন অবতারও শক্তি আণ্ডারে। পার্বতী দেবী বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র শরীর ধারণ করার পর এই মায়ার মধ্যে ফেঁসে গিয়েছিলেন, পরে বশিষ্ঠাদি ঋষিরা ওনাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, পরের দিকে মানে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা জয় করে ফিরে আসার পরই যেন তাঁর নিজের স্বরূপের জ্ঞান হয়েছিল। তার মানে, শ্রীরামচন্দ্র জন্ম নেওয়ার পর তাঁর বাল্যাবস্থা, বিবাহ করা, বনবাস আর লঙ্কায় যুদ্ধাদি করার সময় পর্যন্ত তাঁর স্বরূপ জ্ঞান ছিল না, স্বরূপ মানে, আমি কে আর আমি যে সেই পরমব্রহ্ম এই জ্ঞান ছিল না। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন আসে –

যদি স্ম জানাতি কুতো বিলাপঃ সীতাকৃতেঽনেন কৃতঃ পরেণ।
জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ সমো হি সর্ব্বৈরপি জীবজাতৈঃ।।১/১/১৪।।

যদি শ্রীরামচন্দ্র তাঁর স্বরূপ জেনেই থাকতেন তাহলে তিনি সীতার জন্য বিলাপ কেন করছেন? বাল্মীকি রামায়ণে সীতাকে নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপের এক বিশাল বর্ণনা আছে। রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণের পর শ্রীরামচন্দ্র কেঁদে কেঁদে গাছের ফুল, পাতা, বৃক্ষ সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন তোমরা কি আমার সীতাকে কোথাও দেখেছ? বাল্মীকি সেখানে সীতার শরীরের অসাধারণ বর্ণনা করছেন। বাল্মীকির এই বর্ণনা সত্যিই পড়া যায় না, সবারই চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে। বাল্মীকি একজন বিরাট উচ্চমানের কবি ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের মানসিক যন্ত্রণাকে ভাষায় যেভাবে বর্ণনা করছেন সত্যিই ওই বর্ণনার কোন তুলনা হয় না, আমাদের হৃদয়কে করুণ রসে প্লাবিত করে দেয়। কিন্তু এখানে পার্বতী বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র তো পরমপুরুষ তাঁর যদি স্বরূপ জ্ঞান থাকে তাহলে তিনি স্ত্রীর জন্য কেন এভাবে কাঁদতে যাবেন? নিজের স্ত্রীর জন্য যদি তিনি চোখের জল ফেলেন তাহলে তিনি কিসের পরমপুরুষ! শ্রীরামচন্দ্রের কেন পূজো হবে? বশিষ্ঠ মুনির উপদেশেই যদি শ্রীরামচন্দ্রের জ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তো তিনি সাধারণ জীবের মতই হয়ে গেলেন। আমরা কেন তাঁকে ভগবান বলতে যাব? পার্বতীর এই প্রশ্নের সাথে আমরাও অনেক প্রশ্ন যোগ করে দিতে পারি। তিনি কেন সীতাকে ত্যাগ করে দিলেন? তিনি বালিকে কেন লুকিয়ে বধ করলেন? এই ধরণের আরও কিছু প্রশ্ন যোগ করে দিলে তার একটাই উত্তর হবে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ জ্ঞান ছিল না, সেইজন্যই তিনি এই ধরণের কর্ম করেছেন। হতে পারে তাঁর স্বরূপ জ্ঞান তখন ছিল না, কিন্তু পরে হয়েছে। পরে তো অনেকেরই স্বরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তাঁকে ভগবান বলে কেন পূজা করতে যাব! অধ্যাত্ম রামায়ণ শুরুই হয় এই প্রশ্ন দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র আদৌ ভগবান ছিলেন কি ছিলেন না। যিনি নিজের স্ত্রীর জন্য এত বিলাপ করছেন, কেঁদে কেঁদে কোন মানুষকে স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করছেন না, গাছের পাতা, ফুল, বৃক্ষ, গুল্মলতা এদের জিজ্ঞেস করছেন, এই ধরণের বিলাপ যিনি করেন তিনি আবার কিসের ভগবান! আর এটাও ইতিহাসের নিরিখে সত্য যে তিনি লঙ্কা থেকে ফিরে আসার পর বশিষ্ঠ মুনির অনেক সঙ্গ করেছেন, তাতে তাঁর জ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কোন আশ্চর্যের নয়। যদি পরেই জ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তাঁকে ভগবান বলে কেন মানতে যাব!

এর উত্তরে যদি বলা হয় সবই শ্রীরামচন্দ্রের লীলা, তাহলে এর মত সহজ উত্তর আর হবে না। শ্রীরামচন্দ্র করলে লীলা আর আমরা করলে বিলাপ। এগুলোই আমাদের অনেক পুরনো সমস্যা। সব কিছু লীলা বলে দেওয়ার অর্থ আমার কাছে এর কোন উত্তর জানা নেই। এখানে কয়েকটি জিনিস দেখার আছে, প্রথম দেখার, শ্রীরামচন্দ্র যা যা করেছেন লক্ষ্মণ তাই তাই করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গেছেন, লক্ষ্মণও গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নীব্রত,

লক্ষ্মণও এক পত্নীব্রতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামচন্দ্র যেমন রাবণ বধ করেছেন, লক্ষ্মণও মেঘনাদাদি বধ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের থেকে লক্ষ্মণ কিন্তু কোন অংশেই কম ছিলেন না। শুধু তাই না, বাল্মীকি রামায়ণ পড়লে আরও অবাক হয়ে যেতে হয়, লক্ষ্মণ থেকে থেকে শ্রীরামন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, দাদা! আপনি এভাবে অযথা বিলাপ করবেন না, আর আমার কথাকে আপনি অন্যথা নেবেন না, কারণ আমি আপনার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছি সেটাই আপনাকে ঘুরিয়ে বলছি। লক্ষ্মণের মনের সাম্য ভাব অনেক বেশি। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, সব রাজসুখ ভরতই ভোগ করছে। কিন্তু তিনি এটা দেখছেন না যে শ্রীরামের প্রতি ভালোবাসার জন্য লক্ষ্মণকেও তো অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে। অথচ পূজা হয় শ্রীরামচন্দ্রের, যদিও ছবিতে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তিনজনকেই রাখা হয় কিন্তু পূজো হয় শ্রীরামচন্দ্রেরই। কোথাও লক্ষ্মণের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের একটা বিরাট তফাৎ আছে। শ্রীরামচন্দ্র যা যা করেছেন লক্ষ্মণ সবই করেছেন, পড়াশোনা এক সঙ্গে, তাড়কাদি বধের জন্য এক সঙ্গে, বনবাসে এক সঙ্গে, জঙ্গলে মারামারি এক সঙ্গে, দুজনেরই সমান ক্ষমতা অথচ ভারতবর্ষ পূজো করে শ্রীরামের, দুজনের মধ্যে কোথাও তো একটা বড় তফাৎ থাকতে হবে। এই তফাৎটুকুর জন্যই শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান মানা হয় আর লক্ষ্মণকে এক শক্তিমান পুরুষ রূপে মানা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের এক পত্নীব্রত নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়, শ্রীরামচন্দ্র শুধু সীতাকেই ভালোবেসে ছিলেন আর কাউকে নয়। কিন্তু এই ধরণের অনেক পুরুষই আছেন যাঁরা শুধু নিজের স্ত্রীকেই সারা জীবন ভালোবেসে এসেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরো শাস্ত্রই লীলার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জিনিসটা পুরোপুরি তা নয়।

এখানে আমাদের কথামৃতের সাথে পুরো জিনিসটাকে মেলাতে হবে, কারণ কথামৃতই শাস্ত্রের কথা বিচার করার শেষ মাপকাঠি। বেদ, উপনিষদ থেকে শুরু করে যে কোন শাস্ত্র যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের কথামৃতের সঙ্গে সব কিছুকে বিচার করে দেখতে হবে। কথামৃতের সাথে শাস্ত্রের কোন কথা বা ভাবের যদি বিরোধ থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেই শাস্ত্রে দোষ আছে, কথামৃতে কোন দোষ থাকবে না। কারণ কথামৃত হল সরাসরি ঈশ্বরের কথা। তুলসীদাসের রামচরিতমানস, অধ্যাত্ম রামায়ণ বা যে কোন শাস্ত্র, যদি দেখা যায় কথামৃতের যে ভাব বা দর্শন তার সাথে অন্য শাস্ত্রের বিরোধ হচ্ছে তাহলে সেই শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে কথামৃতের কথাই নিতে হবে। অধ্যাত্ম রামায়ণের ভাবের দিক দিয়ে কথামৃতের কোন বিরোধ নেই, কিন্তু ঠাকুর যে যুক্তি কথামৃতে আনছেন অধ্যাত্ম রামায়ণ সেই যুক্তি কোন দিন আনবে না, কারণ অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তদের গ্রন্থ। ঠাকুর বার বার বলছেন ভগবান যখন মানুষের রূপ ধারণ করে অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর যে দুঃখ আদি হয় এগুলো বাস্তবিকই হয়। কিন্তু সব কিছুতে অনাসক্ত ভাব থাকার জন্য খুব তাড়াতাড়ি এগুলো থেকে নিজের সাম্য অবস্থায় ফেরত চলে আসেন। ঠাকুরের ভ্রাতস্পুত্র অক্ষয়ের শরীর চলে যাবার পর ঠাকুর বলছেন, আমার ভেতরটা ভিজে গামছা নিংড়ানোর মত কষ্ট হচ্ছিল। বলেই আবার বলছেন, বুঝলাম সংসারীদের কি রকম কষ্ট হয়। তার মানে ঠাকুরের স্বজন বিয়োগের ব্যাথাটা সত্যি, লীলা নয়।

তুলসীদাসের কাছে এটাই আবার বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামচিরতমানসে এই ব্যাপারটা নিয়ে তুলসীদাস এমন গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন যে কোন কিছুর যুক্তি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রামচরিতমানসে আবার পার্বতী প্রশ্ন করছেন না, সেখান উমা শিবকে প্রশ্ন করছেন। শিব তখন বললেন, ঠিক আছে তুমি নিজেই গিয়ে দেখে এস শ্রীরামচন্দ্র সত্যিই বিলাপ করছেন কিনা। উমা এবার শ্রীরামচন্দ্রের পরীক্ষা নেবেন। উমা সীতার রূপ ধারণ করে জঙ্গলে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন সীতার জন্য বিলাপ করছেন। হঠাৎ সীতাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, উমা দেবী! আপনি এখানে কি মনে করে এলেন? কৈলাশে দেবাদিদেব মহাদেব ঠিক আছেন তো? উমা দেখছেন কোনটা সীতা আর কোনটা উমা শ্রীরামচন্দ্র সবটাই জানেন। তিনি তখন তাড়াতাড়ি আবার কৈলাশে ফিরে গেলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সীতার রূপ ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রকে পতি ভাবে দেখেছিলেন সেইজন্য তার পাপ হয়ে গেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁকে দেহত্যাগ করতে হবে। সেইজন্য দক্ষের যজ্ঞে উমাকে দেহত্যাগ করতে হল। সেটাকেই তুলসীদাসকে আবার যুক্তি সম্মত করে দিতে হচ্ছে। এই যে কাহিনী, শিব, উমা, শ্রীরামচন্দ্র সীতা এনারা কবে ছিলেন এসব নিয়ে প্রশ্ন করতে নেই। ভাবরাজ্য তৈরী করতে গিয়ে তুলসীদাস যে কোন জিনিস বানিয়ে দিতে পারেন, আর সময়ের কোন হিসাবও থাকছে না। ইতিহাসের ঘটনাগুলো যে একটা যুক্তির উপর চলবে তুলসীদাস তার কোন তোয়াক্কাই করনি। ইদানিং ঠাকুরকে নিয়ে যত নাটক, যাত্রা, সিনেমা হয় সেখানেও ঠিক এই গোলমাল করে ফেলছে। যেখানে নরেনের থাকার কথা নয়,

সেখানেও নরেনকে ঢুকিয়ে দেবে, যেখানে মায়ের থাকার কথা নয় সেখানে মাকে নিয়ে আসছে। তাতে ভাবরাজ্যের কোন ব্যাপার নেই, অজ্ঞতার জন্যই এই ভুল গুলো করছে।

লীলা মানে যে তাঁর কান্নাটা মিথ্যা হবে তা নয়। লীলা বলতে আমরা সব সময় মনে করি চোখের জলটা মিথ্যা, তাহলে তাঁর ঠোঁটের হাসিটাও তো মিথ্যা হবে। আর অবতারের উপদেশ দেওয়াটা? সেটাও তো মিথ্যা হতে হবে। তাঁর আহার নিদ্রা সবটাই মিথ্যা। মানুষের সবটাই সত্য আর ভগবানের সবটাই মিথ্যা! তাহলে ভগবানের থেকে বড় মিথ্যা আর কি হবে? ভারতের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, ভারতের লোকেরা জিনিসটাকে ঠিক ভাবে বোঝে না বা বুঝতে চায় না। ভক্তিশাস্ত্রে লীলা শব্দটা এই জন্যই ব্যবহার করা হয় তা হল, মানুষ যে কর্ম করে তার মধ্যে মায়ার বন্ধন থাকার জন্য, স্বার্থবুদ্ধি থাকার জন্য, আসক্তি থাকার জন্য সেই কর্মের ফল তাকে পেতে হয়। অবতার পুরুষ হলেন নিত্যমুক্ত, সেইজন্য কোন কর্মেরই তিনি ফল পান না। কারণ তিনি নিজের স্বরূপকে জানেন, তাঁর চোখের জলটাও যেমন সত্য তাঁর ঠোঁটের হাসিটাও সত্য, তাঁর শত্রু বধটাও যেমন সত্য তাঁর উপদেশ দেওয়াটাও সত্য, সব কিছুই তাঁর সত্য। কিন্তু কোন কর্মেরই ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না, কারণ উনি সম্পূর্ণ ভাবে স্বার্থবিহীন, আমিত্ব ভাব তাঁর কোথাও নেই। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমার আমি খুঁজে পাই না। যাঁর আমিত্ব নেই তার মানে স্বার্থবোধটাও তাঁর নেই। ফলস্বরূপ তিনি যাই করুন না কেন কোন কর্মের ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বালি বধ করলেও তার ফল লাগবে না, চোখের জল ফেললেও তার ফল লাগবে না। লীলা বলতে এটাই বোঝায় – কর্মের ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। লীলা মানে যে তিনি নাটক করছেন তা নয়। আমরা প্রায়ই মনে করি ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি যা কিছু করেন সবটাই যেন নাটক, সবটাই যেন ম্যাজিক। একেবারেই তা নয়, তাঁর সবটাই সত্য। লীলা বলতে এটাই বোঝায় – *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্*, গীতাতে ভগবান বলছেন আমার যে জন্ম আর আমার যা কিছু কর্ম সবটাই দিব্য। দিব্য মানে কর্মফল প্রেরিত হয়ে কিছু করছেন না। মা ও বাবার সংযোগ হলে একটি শিশুর জন্ম হয়, ভগবানের সেভাবে জন্ম হয় না। তিনি কবে আসবেন যদি ঠিক করেন তখন তার সাথে এটাও ঠিক করে নেন আমি কোন গর্ভে আসব। তিনিই ঠিক করেন আমি কবে আসব, তিনিই ঠিক করেন তিনি কোনটা করবেন আর কোনটা করবেন না। তিনি স্বাধীন, স্বাধীন বলে তাঁর আচরণকে বলা হয় লীলা। লীলা মানে তিনি যে সব নাটক করছেন তা নয়। একবার যখন তিনি শরীর ধারণ করে নিলেন তাঁর সব আচরণই সত্য। ভগবান গদাধর হয়ে পাঠশালায় যাচ্ছেন, সেখানে শিক্ষক গদাধরকে তিরস্কার করছেন, তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন, এগুলো সবই সত্য। শিক্ষক গদাধরের কান মুলে দিচ্ছেন সেটা সত্য হবে আর তাঁর কানে যে ব্যাথা হচ্ছে সেটা মিথ্যা হয়ে যাবে তাতো হবে না, দুটোকেই বাস্তবিক হতে হবে। এই মৌলিক তত্ত্বটা না ধরতে পারলে লীলার ব্যাপারে কিছু বলতে গেলেই সব এলোমেলো হয়ে গিয়ে একটা অন্ধ বিশ্বাস এসে যাবে। অন্ধ বিশ্বাস এসে গেলে জিনিসটা যেমনটি নয় তেমনটি দেখতে শুরু করে। অবতার কর্ম করেন ঠিকই কিন্তু কর্মের সাথে সম্পর্ক না থাকার জন্য কর্মের ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যেটা ভগবান বুদ্ধ খুব সুন্দর বলছেন, তাঁকে যখন ব্রাহ্মণ গালাগাল দিচ্ছে তখন তিনি তাকে বলছেন 'তুমি যদি অতিথিকে কিছু দাও আর অতিথি যদি সেটা না নেয় তখন কি হবে'? 'আমার কাছেই থেকে যাবে'। 'তুমি যে আমাকে গালাগাল দিলে আমি নিলাম না'। এটাই অনাসক্ত, কর্মফল আসছে কিন্তু উনি নিচ্ছেন না, তখন কর্মফল পড়ে থেকে যাচ্ছে। লীলা মানে এটাই, কর্মফলে কোন আসক্তি নেই। এটা আমার চাই, সেই ইচ্ছেও নেই আবার, ওটা থেকে আমি যেন দূরে থাকি, সেটারও ইচ্ছে নেই, লীলা মানে তাই।

মহাদেব কর্তৃক রামতত্ত্বের ব্যাখ্যা

পার্বতীর প্রশ্ন শুনে মহাদেব বলছেন, হে পার্বতী! তুমি ধন্য। কারণ এর আগে কেউ শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে আমাকে এই প্রশ্ন করেনি। শিবের এই বক্তব্যে পাত্রতার ব্যাপারটা আছে। শুধু প্রশ্ন করার জন্য যখন তখন প্রশ্ন করলেই হয় না, প্রশ্ন করার জন্য একটা পাত্রতা দরকার। পার্বতী বলছেন, গুরু বা আচার্যরা বা সিদ্ধ পুরুষরা তাঁর নিজের ভক্তকেই আধ্যাত্মিক গূহ্য কথাগুলো দেন। বলতে চাইছেন যিনি অধিকারী তাঁকেই দেওয়া হয়। আচার্য শঙ্কর যেমন পদ্মপাদ, ত্রোটকাচার্যদের কৃপা করেছিলেন শুধু ভক্ত বলে। পার্বতীকেও তাই শিব বলছেন তুমি ধন্য। অন্য কেউ হয়ত প্রশ্ন করলে শিব উত্তরও দিতেন না। শিব এক কথা বলে দিচ্ছেন –

রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদিরামন্দ একঃ পুরুষোত্তমো হি।
স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ।।১/১/১৭।।

শিব বলছেন, হে পার্বতী! তুমি যে প্রশ্ন করলে, এই প্রশ্নের উত্তর একটাই, শ্রীরামচন্দ্র হলেন প্রকৃতির পারে পরমাত্মা আর তিনি অনাদি। যখনই প্রকৃতির পারে কথা আসে তখনই আমাদের মনে হয় যেন নদীর ওপারের কথা বলতে চাইছে। প্রকৃতির পারে মানে নদীর ওপারে নয়। প্রকৃতি মানে পঞ্চ তন্মাত্রা, প্রকৃতি মানেই বুদ্ধির এলাকা। ঈশ্বর এর কোনটাই নন। তিনি যা, তাকে এই জগতের কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না, সেইজন্য বলা হয় তিনি প্রকৃতির পারে, তিনি আনন্দস্বরূপ। *একঃ পুরুষোত্তমঃ, একঃ* শব্দ শাস্ত্রে বহুবার আসে, ঈশ্বরের নাম *একঃ*। *একঃ* বলতে বোঝায় তাঁর সাথে কারুর তুলনা হয় না। তিনি একা, তিনি এক বললেই বুঝতে হবে তাঁর সাথে কারুর তুলনা হয় না আর তিনি পুরুষোত্তম।

স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা, তিনি নিজের মায়া দ্বারা সংসার সৃষ্টি করেন। *নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ*, তিনি আকাশবৎ বাহিরে ভেতরে ব্যপ্ত হয়ে আছেন। আকাশবৎ অধ্যাত্ম রামায়ণের খুব প্রচলিত ধারণা, অন্যান্য শাস্ত্রেও আকাশবৎ শব্দ এসেছে কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে অনেক বেশি আনা হয়েছে। ঈশ্বরের ধারণা বা আত্মার ধারণা স্পষ্ট করতে হলে প্রথমে আকাশ তত্ত্বটা বোঝা খুব দরকার। তবে আকাশ আর আত্মাতে প্রধান পার্থক্য হল আকাশ ভৌতিক পদার্থ, পঞ্চভূতের একটি ভূত, কিন্তু আত্মা তা নন। কিন্তু আকাশ উপাদান সৃষ্টিতে প্রথম আসার জন্য মুলের সাথে তার অনেক বেশি মিল থেকে গেছে। যেমন কার্বনকপির প্রথম কপি যতটা আসল কপির সাথে স্পষ্ট থাকে পরের গুলো ততটা স্পষ্ট থাকে না, ধীরে ধীরে নীচের কপিগুলো আবছা হতে থাকে। আকাশ আত্মার খুব কাছের, তাই আকাশকে বিভাজিত করা যায় না, আকাশকে দগ্ধ করা যায় না, আর্দ্র করা যায় না ইত্যাদি, আত্মার অনেক গুণ আকাশের মধ্যে চলে এসেছে। কিন্তু আকাশ পঞ্চভূতেরই একটা উপাদান।

বাহিরে আর ভেতরে ব্যপ্ত এই ব্যাপারটাও খুব গভীর একটি বিষয়। এই গ্লাশ এখানে আছে, গ্লাশ এখন কোথায় অবস্থিত? আকাশে অবস্থিত। ভেতরে যদি জল না থাকে তাহলে গ্লাশের ভেতরে কি আছে? সেখানেও আকাশ আছে। এখানে বলছেন *অন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ*, আত্মার স্বরূপ কি, বাইরেও সেই আত্মা, ভেতরেও সেই আত্মা, শুধু যে মানুষের ভেতরেই তা নয়, সব কিছুর ভেতরে। পদার্থ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পদার্থের মধ্যে সব থেকে ক্ষুদ্র এ্যটম, এ্যটমের বাইরেও আত্মা এ্যটমের ভেতরেও সেই আত্মা। যেটারই সৃষ্টি হয়েছে, আকাশতত্ত্ব হল সব থেকে সূক্ষ্মভূত, আকাশতত্ত্বের বাইরেও যেই আত্মা আর আকাশতত্ত্বের ভেতরেও সেই আত্মা। এর খুব ভালো উপমা হল, জলকে জমিয়ে বরফ করা হল, সেই বরফকে একটা বাটির আকার দেওয়া হল। সেই বরফের বাটিতে জল দিয়ে একটা জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। এবার বাটির বাইরেও জল বাটির ভেতরেও জল, আর বরফের বাটিটাও জল, তিনটেই জল। কিন্তু দেখাচ্ছে আলাদা। কিন্তু যিনি জানেন তিনি জানেন তিনটে সেই একই জিনিস। ঠিক তেমনি আমাদের যে অস্তিত্ব, এই অস্তিত্বে দেখছি আমি আলাদা আপনি আলাদা আর ঈশ্বর আলাদা। কিন্তু যিনি জানেন তিনি জানেন, ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, আমার বাইরেও তিনি আছেন আমার ভেতরেও তিনিই আছেন। এটাই অধ্যাত্ম রামায়ণের একটা মৌলিক ভাব। শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণেরই নয় হিন্দু ধর্মের এটিই মৌলিক সিদ্ধান্ত। আসলে অন্যান্য ধর্মেরও এই ভাব। কিন্তু ধর্ম সব সময় দুটো স্তরে চলে, একটা জ্ঞানীদের স্তরে চলে আরেকটা অজ্ঞদের স্তরে চলে। সাধারণ মানুষদের জন্য ধর্ম এক রকম আর বিশিষ্ট লোকেদের জন্য ধর্ম আলাদা হয়। বিশিষ্ট লোকেদের জন্য যে ধর্ম সেটাই আসল ধর্ম। সাধারণ লোকেদের ধর্ম আচার-বিধি, পূজা-উপাচারেই শেষ হয়ে যায়। সব ধর্মে একই কথা বলা হয়, কিন্তু সাধারণ স্তরে এসে ধর্মের অনুশীলনে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। যে ধর্মের প্রবক্তাদের মধ্যে যত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক পুরুষ কম হবে সেই ধর্মের সাধারণ লোকেদের ধর্ম তত নিম্নমানের হবে। হিন্দু ধর্মে ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা চিরদিনই ধর্মের দিকে নিজেদের পুরোপুরি সঁপে দিয়ে এসেছেন। সেইজন্য হিন্দু ধর্মে সাধারণ লোকেদের যে ধর্মাচরণ অন্যান্য ধর্মের সাধারণ লোকেদের ধর্মাচরণের তুলনায় অনেক উচ্চমানের থেকে গেছে।

শিব পার্বতীকে বলছেন, সবারই ভেতরে সেই আত্মা বা চৈতন্য, সেই আত্মাই সমস্ত জগৎ এবং প্রতিটি জীবকে ধারণ করে নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছেন। উপমা দিয়ে বলছেন *জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি যৎসন্নিধৌ চুম্বকলৌহবদ্ধি*, যেমন চুম্বকের সান্নিধ্যে লোহা এলে লোহা নড়তে শুরু করে, চুম্বককে যেমন যেমন নাড়াবে লোহা

তেমন তেমন নড়বে, চুম্বককে লোহার সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নিলে লোহা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। ঠিক তেমনি শরীরের ভেতরে চৈতন্য আছে বলেই শরীর চলছে, শরীরের ভেতর থেকে চৈতন্যকে সরিয়ে দিলে শরীরটা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকবে। সংসারের ভেতর ভগবানই আছেন তাই এই সংসার চলছে। ভগবানের প্রকাশের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের দরকার হয়, বিভিন্ন মাধ্যমের জন্য ভগবানের প্রকাশও ভিন্ন ভিন্ন হয়। জীবাত্মার মাধ্যমে যখন তাঁর প্রকাশ হয় তখন শরীরে তাঁর এক রকম প্রকাশ হয়, বস্তুতে সরাসরি যখন আসছেন তখন তাঁর প্রকাশ ভালো হয় না। যেমন এ্যটম, এ্যটমের মধ্যে তিনি অন্তর্যামী হয়ে বসে আছেন, কিন্তু সেটা দিয়ে এ্যটমের প্রকৃতি পাল্টায় না। কিন্তু যখন জীবাত্মা রূপে বুদ্ধিতে তিনি প্রতিবিম্বিত হন তখন তাঁর প্রকাশ আলাদা হয়ে যায়, পরে এই নিয়ে আরও বলবেন। শিব তখন বলছেন –

এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসা যে।
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে।।১/১/১৯।।

সাধারণ মানুষ অবিদ্যা আর অজ্ঞানে এমন ভাবে আবৃত হয়ে আছে যে, তারা মনে করতে থাকে যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁদেরও এই একই অবস্থা। ঠাকুর যেমন বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠবে। তুমি যদি নিজে অজ্ঞানে পড়ে থাক তোমার সামনের লোককেও তোমার অজ্ঞানী বলে মনে হবে। একজন লোক রাত্রিবেলা রাস্থায় উল্টে পড়ে আছে। একটা চোর সেখান দিয়ে যাচ্ছিল, লোকটিকে দেখে সে ভাবছে সারা রাত চুরির চেষ্টা করে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এরপর একটা মাতাল যাচ্ছিল, সে বলছে, সারা রাত এমন টেনেছে যে এখন আর হুঁশ আসছে না। তারপর একজন সাধু যাচ্ছিলেন, সাধু ভাবছেন, সারা রাত জপধ্যান করে এখন বেচারী ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের ভেতরটা যেমন বাইরের জগতটাও তেমনই হবে। সাধারণ মানুষ অজ্ঞানী, সবাই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, তারা সাধু মহাত্মা বা জ্ঞানী পুরুষকেও তাই ভাবে, ব্যাটা লুকিয়ে লুকিয়ে গুড় খায়। আর যাঁরা সৎ পুরুষ তাঁরা সব কিছু অন্য রকম দেখেন। জগতকে আমি কেমন দেখছি বুঝতে পারলে আমি কেমন বুঝতে পারব। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সবাই যে অজ্ঞান এতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য অবতার পুরুষের মধ্যে সবাই অজ্ঞানই দেখে, যীশুর মধ্যেও অজ্ঞান দেখে, মহম্মদের মধ্যেও অজ্ঞান দেখে, বুদ্ধের মধ্যেও অজ্ঞান দেখে। এরা যদি শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাপারে প্রশ্ন করে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যার যেমন মানসিক গঠন, যেমন যেমন মানসিকতা তেমন তেমন বিচার করতে থাকবে।

এই কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে বলছেন। খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পড়ে আমরা মনে করছি সংসারটা গোল্লায় চলে যাচ্ছে, আগুন লেগে যাচ্ছে, সব রসাতলে চলে যাচ্ছে, কিন্তু চিরদিন এই রকমই চলে আসছে। এই সমস্যা চিরদিনের, অধ্যাত্ম রামায়ণ কিছু না হোক দেড় দু হাজার বছর আগে রচিত হয়েছে, তখনকার দিনেই এই সমস্যা ছিল, অজ্ঞানীরা বলছে – দেখছ! নিজের স্ত্রীর জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে আর তাকে কিনা ভগবান বলা! ঠাকুরের হাত ভেঙে গেছে, তাঁর মানসপুত্র রাখালের তাতে চিন্তা হচ্ছে – ভগবানের হাত ভেঙে গেছে লোকে দেখে কী ভাববে! ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটাকে তাই তিনি একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন যাতে লোকেরা টের না পায় যে ভগবানের হাত ভেঙেছে। ঠাকুর আবার যে আসছে তাকেই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন, ওগো দেখো দেখো আমার হাতের কি অবস্থা হয়েছে। আমরা যখনই ভগবানের বিচার করি, অবতার পুরুষের বিচার করি তখন আমাদের মানসিকতা দিয়েই সেই বিচার করি।

সংসারমেবানুসরন্তি তে বৈ পুত্রাদিসক্তায়ঃ পুরুকর্ম্মযুক্তাঃ।
জানান্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ, চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ।।১/১/২০।।

স্ত্রী-পুত্রাদিতে যারা আসক্ত হয়ে আছে তারা যে ভগবানের উপর অজ্ঞানতা বশতঃ এই জিনিসগুলো আরোপ করবে এতে আশ্চর্যের কি আছে! আপনার আসক্তি কোথায়, মন কোথায় বেশি পড়ে থাকে তাই দিয়ে বোঝা যাবে ঈশ্বরের ব্যাপারে আপনার ভাবনা চিন্তা কেমন। সমাজের কোন লোক যদি কারুর নিন্দা করে, বিশেষ করে কোন মহৎ পুরুষের, এটাই স্পষ্ট করে দেয় যে তার আসক্তিটাও অত্যন্ত নিম্নস্তরের। একদিকে এরা স্ত্রী-পুত্রে একেবারে আসক্ত আবার অন্য দিকে বড় বড় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে থাকে। বলছেন এসব করেই এরা সব সময় এই সংসারের অনুসরণ করতে থাকে, পরমাত্মাকে কখনই জানতে পারে না। এরপর শিব খুব সুন্দর একটা কথা বলছেন, এই ধারণাটা প্রায়ই আসে –

যথাহ প্রকাশো ন তু বিদ্যতে রবৌ জ্যোতিঃ স্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন রঘুত্তমেহবিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি।।১/১/২১।।

সূর্য্যে কখন অন্ধকার হয় না, কারণ সূর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপে কখন অন্ধকার হয় না। ভগবান যিনি তিনি বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন স্বরূপ, তাই তাঁর কখন অজ্ঞান আবার কখন জ্ঞান এই জিনিস হবে না। আচার্য শঙ্কর যিনি এত বড় বেদান্তী, তিনিও গীতার ভাষ্যে অবতার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শুরুই করছেন *স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ*, যিনি ভগবান তিনি জ্ঞানে সদাসম্পন্ন। এই একই কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে যা বলছেন, গীতাতে যা বলছেন, আচার্য শঙ্করও সেটাই বলছেন, ঠাকুরও তাই বলছেন। ঠাকুরের জ্ঞান কি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর সাধনা করার পর হয়েছে? তা নয়, ঠাকুরের জ্ঞান চিরদিনই ছিল। এটা ঠিক যে বিভিন্ন লোক এসে ঠাকুরকে বিভিন্ন কথা শোনাচ্ছেন, অনেক কিছু দেখাচ্ছেন, ঠাকুরও মানব রূপে শুনছেন, দেখছেন। কিন্তু তিনি কখন অজ্ঞানে ছিলেন আবার কখন জ্ঞানে ছিলেন এই জিনিস কখনই হবে না। অজ্ঞানীরাই অবতারের সম্বন্ধে এই ধরণের নানা রকমের বিচার করতে থাকে।

আমরা অতি সৌভাগ্যবান যে এমন এক সময়ে আমরা জন্ম নিয়েছি যখন ঠাকুরের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। আর আমরা ঠাকুরের এত কাছাকাছি সময়ে জন্ম নিয়েছি যে এখনও শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের কাছে ব্যক্তি রূপেই যেন জীবন্ত হয়ে আছেন, এখনও তিনি ভাব রূপে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে যাননি। আজ থেকে পাঁচ ছয়শো বছর পর এই শ্রীরামকৃষ্ণ আর থাকবেন না। আমাদের এতই সৌভাগ্য যে আমরা দুটো জিনিসকেই পাচ্ছি। আজ থেকে আরও বেশ কিছু আগে এলে ঠাকুরের কথা হয়ত শুনতেই পেতাম না, কারণ তখনও ঠাকুরের কথা এত প্রচার প্রসার হয়নি। এখন থেকে আরও কয়েক'শ বছর পর এলে ঠাকুরকে আর ব্যক্তি রূপে পাব না, শুধু ব্যক্তিত্ব বলেই তিনি থাকতেন। খুব কাছ থেকে দেখার জন্য অনেক কিছুর সমাধান যেমন হয়ে যায় আবার অনেক কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। যখনই পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যায় তখনই বোঝা যায় ব্যাপারটা কি। আমরা সবাই অবতারকে যেন একজন ম্যাজিসিয়ানের মত দেখতে চাই। যেমন অনেকেই প্রশ্ন করে যে শ্রীকৃষ্ণ যদি চাইতেন মহাভারতের যুদ্ধ হত না। শ্রীকৃষ্ণ কি কোন ম্যাজিসিয়ান নাকি! কালের গতিকে যিনি থামিয়ে দেবেন! অবতার কখনই কালের গতিকে আটকাবেন না, প্রকৃতির নিয়ম কখনই অবতার উল্লঙ্ঘন করবেন না। ঠাকুর কোন এক অজানা অচেনা গ্রাম কামারপুকুরে গিয়ে জন্ম নিলেন, যেখানে না আছে শিক্ষা, না আছে খাদ্য, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে টাকা-পয়সা। আর সেখানে ঠাকুর জন্ম নিতেই ম্যাজিকের মত আকাশ থেকে খাদ্য, টাকা সব ঝরে পড়তে শুরু করে দেবে! আর জন্মেই ঠাকুরের মুখ থেকে বেদ, বেদান্ত সব বেরোতে শুরু করে দেবে! যদি এই রকম কিছু হয় তার পরের দিনেই সবাই বলবে ভূতে পেয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে সাধনা করছেন আর তাতেই লোকেরা বলতে শুরু করল এর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে একে তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে দাও। আর ছয় মাস বয়সে যদি বেদ, উপনিষদ মুখ থেকে বেরিয়ে আসত তাহলে তাঁকে যে লোকেরা কি করত ভগবান জানেন। ভেবে দেখা দরকার, আমরা একজন অবতার থেকে ঠিক কি চাইছি? কোন এক অচেনা গ্রাম কামারপুকুর, সেখানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান রূপে তিনি এলেন। এরপর তাঁকে ওখানকার সব কিছুকে সম্বল করেই এগোতে হবে, সেই দারিদ্র, অশিক্ষা, ম্যালেরিয়া এসবের মধ্য দিয়েই অবতারকেও বড় হতে হবে। যদি এভাবে না হন তাহলে ম্যাজিসিয়ান হয়ে যাবেন। যে জিনিস শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একই জিনিস শ্রীরামচন্দ্রের উপরেও প্রযোজ্য হবে। মুশকিল হল বেশির ভাগ ভক্তরাই ভাবপ্রবণ হয়, তাদের যাতে কষ্ট না হয় সেইজন্য অনেক কিছু উপকরণ দিয়ে অবতারের কাহিনী সাজানো হয়। যাদের মন খুব যুক্তিপ্রবণ তারা আবার এসব কাহিনী নিতে চাইবে না। সবাইকে তাদের মানসিকতা ও রুচী অনুযায়ী সন্তুষ্ট করতে ধর্মকেই এগিয়ে আসতে হয়, সেখান থেকে এই ধরণের নতুন নতুন শাস্ত্রের জন্ম হয়।

এরপর বলছেন, কেউ যদি একই জায়গায় ঘুরতে থাকে তখন তার মনে হয় ঘরবাড়ি, গাছপালা সব কিছু বন্ বন্ করে ঘুরছে। ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের যা কিছু ক্রিয়া সবটাই আত্মার উপর আরোপ করে দেয়, ফলে তারা মনে করে আত্মাই সব করছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান রূপেও দেখছেন না, একেবারে আত্মা রূপে দেখছেন। যদি শ্রীরামচন্দ্রের উপর কোন ক্রিয়ার আরোপ করা হয় তাহলে আত্মার উপরে ক্রিয়ার আরোপ হয়ে যায়, আত্মাকেই কর্তা বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আত্মা কখনই কর্তা হন না, কারণ আত্মার উপর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের নিষেধ করা হয়েছে, পুরো বেদান্ত এই সিদ্ধান্তের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। যিনি ঈশ্বর তিনিই

সচ্চিদানন্দ, তিনিই আত্মা, তিনিই আবার সবার অন্তর্যামী, এঁর উপর কখনই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আসে না, গীতায় ভগবান বলছেন *ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ*। ভেতরে যিনি আছেন উনি কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, *ন কর্মফলসংযোগং*, তিনি কর্মের সঙ্গে ফলের কোন সংযোগও করবেন না। আত্মা যা করেন ঈশ্বরও ঠিক তাই করেন, সচ্চিদানন্দও তাই করেন আর অবতার পুরুষও ঠিক তাই করেন। অবতার তত্ত্বের উপর একটি খুব সুন্দর শ্লোকে বলছেন –

নাহো ন রাত্রিঃ সবিতৃর্যথা ভবেৎ প্রকাশরূপাব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ
জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং স্বয়ং হরৌ রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধচিদ্‌ঘনে।।১/১/২৩।।

সূর্য জোতিঃস্বরূপ, সূর্যে দিনও নেই রাতও নেই। দিন ও রাতকে বোঝার জন্য আলোর ব্যভিচার দরকার। আমাদের পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে বা প্রতিদিন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হচ্ছে, তাই পৃথিবীতে আলো কখন বাড়ছে কখন কমে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, আলো বাড়া আর কমা দিয়ে আমরা পৃথিবীর দিন ও রাত্রির বিচার করছি। কিন্তু আমরা যদি এ্যটমিক ঘড়িও লাগাই তাহলেও সূর্যে কখনও দিন কখনও রাত বলা যাবে না। টাইমের প্যাসেজ হতে পারে, আইনস্টাইনের বিভিন্ন থিয়োরিতে টাইমও পাল্টে যায়। কিন্তু সূর্য যা কিনা জ্যোতিঃস্বরূপ, তার না আছে দিন না আছে রাত। সমুদ্রের গভীরে কোন গুহায় যদি চলে যাওয়া যায়, সেখানেও দিন হবে না রাতও হবে না। বলছেন যেভাবে সূর্যে দিন ও রাত্রি কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি ঈশ্বরে জ্ঞান ও অজ্ঞানের কোন প্রশ্নই হবে না। আমরা প্রায়শই বলি ঠাকুর সত্যবাদী ছিলেন। ঠাকুর নিঃসন্দেহে সত্যবাদী, কিন্তু ঠাকুর সত্যবাদী নন, গান্ধীজী সত্যবাদী ছিলেন। ঠাকুর হলেন সত্যস্বরূপ। যিনি সত্যবাদী, তাঁর কাছে সত্যের ব্যাপারটাও আছে আর মিথ্যার ব্যাপারটাও আছে, তিনি চাইলে মিথ্যাও বলতে পারেন। কিন্তু সত্যস্বরূপ মানে, যাঁর কাছে মিথ্যা বলেই কিছু নেই। যেমন সূর্যে রাত বলে কিছু হতে পারে না, রাত যদি না হতে পারে তাহলে সেখানে নিশ্চয়ই দিন আছে। না, দিনও নেই। যেখানে রাত নেই সেখানে দিন কি করে হবে! যাঁর মিথ্যা নেই তাঁর কাছে সত্য কোথা থেকে আসবে! এই ধরণের কথা প্রথম প্রথম শুনলে আমাদের মাথাটা গুলিয়ে যাবে। কিন্তু এই জিনিসগুলো ধারণা না হলে ধর্ম ও আধ্যাত্মিক দর্শন তত্ত্ব কোনটাই পরিষ্কার হবে না। ঠাকুর যখন বলছেন, আমি সত্যকে ছাড়তে পারলাম না, তিনি বোঝানর জন্য বলছেন। আমাদের তরফ থেকে এটাকে বুঝতে গেলে মনে হতে পারে তাহলে কি তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত? ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠিত এই কথাও ঠিক ঠিক বলা যাবে না। কারণ যেখানে মিথ্যার কোন প্রশ্নই নেই সেখানে এই কথা বলা যাবে না। যার কাছে মিথ্যা ভাব আছে সেখানেই সত্য আর মিথ্যা হবে, ঠাকুরের সেটা ছিলই না। ঠিক ঠিক যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হয় তিনি সত্য আর মিথ্যার পারে। কিন্তু ঠাকুরের যে অবতারত্ব এই অবতারেত তিনি সত্যকে অবলম্বন করেছিলেন। ঈশ্বর ধর্ম ও অধর্মের পারে, সত্য মিথ্যার পারে। ধর্ম অধর্ম, সত্য মিথ্যা এই জিনিসগুলো অনেক নীচে আসে। তবে শ্রীকৃষ্ণের সাথে যদি তুলনা করা হয় তাহলে বলতে হয় ঠাকুর কোন পরিস্থিতিতেই মিথ্যার আশ্রয় নেননি। কিন্তু স্বভাবেই তিনি সত্যস্বরূপ। সত্যস্বরূপ মানে তিনি সত্যবাদী নন, সত্যবাদী মানে পারলে তিনি মিথ্যা কথাও বলতে পারেন, কিন্তু বলেন না। এই সব কথা বলার পর শিব বলছেন শ্রীরামচন্দ্র হলেন মায়ার অধিষ্ঠান। মায়ার অধিষ্ঠান মানে তিনিই মায়াকে ধরে আছেন, সেইজন্য মায়া তাঁকে মোহিত করতে পারে না। জাদুকর জাদুখেলা দেখিয়ে দর্শকদের মোহিত করে দেন কিন্তু তিনি নিজে কখন মোহিত হন না। ঈশ্বর হলেন মায়ার অধিষ্ঠান, মায়া তাই তাঁকে কিছু করতে পারে না। ঠাকুর যেমন বলছেন সাপের মুখে বিষ আছে কিন্তু সেই বিষ সাপের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ ও লঙ্কা জয় করে অযোধ্যায় ফিরে আসার অনেক দিন পর একদিন শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ পরিবৃত হয়ে রাজদরবারে অধিষ্ঠান করে আছেন, সেখানে মহাবীর হনুমানও আছেন। সেই সময় শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে বলছেন –

রামঃ সীতামুবাচেদং ব্রূহি তত্ত্বং হনুমতে।
নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্য পাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্।।১/১/৩০।।

হনুমান তাঁর সেই বিখ্যাত মুদ্রায় কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে দণ্ডায়মান। তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে হনুমানের চরিত্রকে একটি শব্দে বিশেষিত করে দিচ্ছেন, বলছেন হনুমান হল *নিত্যভক্তিমান্*। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি হনুমানের যে ভক্তি তা হল নিত্য। নিত্য দুটো অর্থেই হয়, কখনও কমেও না বাড়েও না, আরেকটি সনাতন অর্থে,

কোন দিন শেষ হয়ে যাবে না। যখনই দাস্য ভক্তির কথা ওঠে সব সময় হনুমানেরই নাম নেওয়া হয়। সব সময় হাতজোড় করে হনুমান দাঁড়িয়ে আছেন, প্রভু কি আদেশ দেন তার অপেক্ষায়। পরের দিকে হনুমানের এই নিত্যভক্তিমানকে কেন্দ্র করে অনেক সব কাহিনী দাঁড় করান হয়েছে। যার মধ্যে একটা বিখ্যাত কাহিনী হল, সীতা একবার হনুমানকে একটা মুক্তোর মালা উপহার দিয়েছেন। মুক্তোর মালা হাতে নিয়ে হনুমান একটা একটা করে মুক্তো মালা থেকে ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে ভেঙে ভেঙে দেখতে লাগলেন। সীতা তখন শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, দেখছেন কেমন বানরের স্বভাব, এটাকেও ফল মনে করছে। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন, তুমি হনুমানকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না কি ব্যাপার। হনুমান বলছেন, দেখছি ভেতরে রাম নাম আছে কিনা, রাম নাম যদি না থাকে তাহলে আমার কাছে এর কোন মূল্য নেই। হনুমানের কথা শুনে সীতা তখন জিজ্ঞেস করছেন, তোমার ভেতরে কি রাম নাম আছে? হনুমান তখন তাঁর হৃদয়কে চিড়ে দেখাচ্ছেন তাঁর হৃদয়ের ভেতরে রামসীতার মূর্তি। ভক্তি ভাব কোন পর্যায়ের হয় দেখানোর জন্য পরের দিকে এইসব কাহিনী তৈরী হয়েছে। আরেকটি কাহিনী আছে যেখানে হনুমান সীতাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনি সিঁদুর কেন লাগান। সীতা বলছেন শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলের জন্য আর এটাই আমার সৌভাগ্যবতীর চিহ্ন। হনুমান বলছেন, ও তাই! সিঁদুর লাগালে স্বামীর মঙ্গল হয়! তখন হনুমান সমস্ত অঙ্গে সিঁদুর মেখে নিলেন। আপনার মাথায় সিঁদুর লাগালে যদি প্রভুর মঙ্গল হয় তাহলে আমি সারা গায়েই সিঁদুর লাগিয়ে নিচ্ছি। সেই থেকে হনুমানের শরীরের রঙ লাল। এগুলোই দাস্য ভক্তির লক্ষণ, আমার স্বামী বা প্রভুর কিসে মঙ্গল হয়, তার জন্য যা করার দরকার সেটাকে একেবারে চুড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে করে দেবেন।

নৌ নিত্যভক্তিমান, *নৌ* মানে আমাদের প্রতি, সীতাকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আমাদের প্রতি হনুমান নিত্যভক্তিমান। আমাদের দুজনের প্রতি হনুমান যে নিত্যভক্তিমান, আমরা দুজন ছাড়া হনুমানের হৃদয়ে অন্য কোন কিছুর স্থান নেই, এই নিত্যভক্তিমান হওয়ার জন্য *নিষ্কল্মষোহয়ং*, হনুমানের মন কল্মষবিহীন হয়ে গেছে, সাংসারিকতার কোন কিছুই হনুমানের মনের মধ্যে নেই। সাংসারিকতা বলতে শুধু তমোগুণ আর রজোগুণ যার প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভাদি আসে এগুলোতো নেইই তার সাথে সুখ আর জ্ঞান যা সত্ত্বগুণের লক্ষণ সেটাও হনুমানের মধ্যে নেই, সেখানে ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। সত্ত্ব, রজো আর তমো, সত্ত্বগুণের প্রভাবে পাঁচটা জিনিসকে জানব, এই তিনটে গুণের কোনটাই হনুমানের মধ্যে নেই, তাই তিনি নিষ্কল্মষ। কল্মষ বলতে আমরা সব সময় মনে করি পাপযুক্ত, দোষযুক্ত কর্ম, সোজা কথায় নোংরামি, আরও বিস্তার করলে কাম, ক্রোধ, লোভাদি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে যেগুলো ভালো কর্ম, সমাজে যে কাজকে ভালো বলা হয়, সেটাও কল্মষ হয়ে যায়, ভালো কর্মটাও বন্ধন। ধার্মিক জীবনে কাম, ক্রোধ, লোভ এগুলোকে নোংরা বলা হয়। আমরা যখন positive emotion, positive energyর কথা বলি তখন সত্ত্বগুণকে সামনে রেখে এই কথাগুলো বলা হয়। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক পুরুষ, যাঁরা ঈশ্বরের দিকে চলে গেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে আমি ভালো হতে চাই, লোকেরা আমায় ভালো বলুক, এই ভাবটাও চলে যায়। তখন একটাই থাকে ভক্তি বা জ্ঞান, জ্ঞান বলতে ঈশ্বরের জ্ঞান, এই দুটো জিনিস ছাড়া তাঁর আর কিছু থাকে না। শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলছেন, এই যে হনুমানের নিত্যভক্তি, এই নিত্যভক্তির জন্য হনুমান কল্মষবিহীন হয়ে গেছে। যিনি কল্মষবিহীন হয়ে যান তিনিই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই প্রসঙ্গ বেশ কয়েকবার আসবে।

মন যখন একটি মাত্র ভাবকে নিয়ে নেয়, যোগশাস্ত্রে যাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলছে, মন তখন ওই একটি ভাবেতেই এক ভাবে নিবিষ্ট হয়ে যায়। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি, অথবা সগুণ ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি, সেই ভক্তিতে মন সেই সগুণ ঈশ্বরে একেবারে বসে গেছে বা সবিকল্প সমাধির স্তরে চলে গেছে সেখানে অন্য আর কিছু নেই, ওই অবস্থাতেই ঠিক ঠিক তত্ত্বজ্ঞান হয়। কিন্তু যাঁরা ভক্ত তাঁদের তাতে আর কিছু আসে যায় না, তাঁদের কাছে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিও যা, সবিকল্প সমাধিও তাই আর ঈশ্বরে ভক্তিও তাই। তবে কি, তত্ত্বটা জানলে সেটাও জানা গেল আর ঈশ্বরের ভক্তিও জানা গেল। বাড়িটাই আমার দরকার, বাড়িতে আমাকে থাকতে হয়, কিন্তু বাড়ির যে ছাদ সেটাও যদি জেনে যাই, তাতে ভালোই হল। তারপর দেখছি ছাদ যে বস্তু দিয়ে তৈরী বাড়ির দেওয়াল মেঝে সেই বস্তু দিয়েই তৈরী। তত্ত্বজ্ঞান কিছুটা ছাদে ওঠার মত। হনুমান নিষ্কল্মষ হয়ে গেছেন, হনুমান এখন তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী, অধিকারী মানে তাঁর প্রস্তুতি হয়ে গেছে। হনুমানের এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ভক্তিকে আশ্রয় করেই হয়েছে। তবে জ্ঞানমার্গে প্রস্তুতি একভাবে হয়, সেখানে কিছু শর্ত পালন করতে হয়, আবার যোগমার্গে অষ্টাঙ্গ যোগে যম-নিয়মাদির অনুশীলন করে প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু ভক্তিমার্গে একটাই লাগবে, তা হল ভক্তি। ভক্তিমার্গে

সাধনার যে বিধি সেটাও ভক্তি আর সাধনার যে সিদ্ধি সেটাও ভক্তি। শ্রীরামচন্দ্র তাই সীতাকে বলছেন, হে সীতা! তুমি হনুমানকে তত্ত্বজ্ঞান দাও।

তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্।
হনুমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী।।১/১/৩১।।

এখানে সীতাকে লোকবিমোহিনী এই বিশেষণ দিয়ে ভূষিত করছেন, যিনি সম্পূর্ণ লোককে মোহিত করে রেখেছেন। এরপরে কিছু কিছু যে তত্ত্ব বলা হবে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এখানে এভাবে বলছেন। তত্ত্ব মানে সচ্চিদানন্দ, বিভিন্ন দর্শন ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সচ্চিদানন্দের তত্ত্বকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মোটামুটি সব কটি মূল গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ নিষ্ক্রিয়, তিনি কোন কিছুতে নিজেকে জড়ান না, আর তার সাথে সচ্চিদানন্দকে শুদ্ধ চৈতন্য, আনন্দ মাত্র, সত্তা মাত্র বলা হয়। সৃষ্টি কার্যে তিনি থাকবেন না আর সৃষ্টি কার্যে তিনি সহায়কও হন না। তাহলে এই সৃষ্টি কে করছেন, কিভাবে করছেন? নাসদীয়সূক্তে বলেই দিচ্ছে এর উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু দার্শনিকরা বিশেষ করে সাংখ্যবাদীর দার্শনিকরা বলেন প্রকৃতিই সব কিছু করে আর প্রকৃতি নিজে জড়। কিন্তু এই তত্ত্বেও কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। ভক্তরা, বিশেষ করে যাঁরা সগুণ ঈশ্বরের উপাসক, তাঁরা প্রকৃতিকে জড় রূপে গ্রহণ করতে চান না। সেইজন্য প্রকৃতিকে তাঁরা শক্তি রূপে নেন। শাক্ত মতের উপাসকরা প্রকৃতিকে দূর্গা, মা কালী, জগদ্ধাত্রী এই রূপে নেন। আর যাঁরা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত তাঁরা সীতাকেই প্রকৃতি রূপে নেন, ঠাকুরের ভক্তরা যেমন শ্রীমাকে *প্রকৃতিপরমাভয়ং* রূপে দেখে থাকেন।

কিন্তু মূল বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু প্রকৃতি, প্রকৃতি এক স্বাধীন সত্তা কিনা। সাংখ্যবাদীদের মতে প্রকৃতি এক স্বাধীন সত্তা। কিন্তু বেদান্তের বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিতে প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করে আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণও আগাগোড়া এই ভাবকেই আধার করে চলেছে। যোগশাস্ত্রে প্রকৃতিকে যেভাবে স্বাধীন সত্তা দিয়ে দেওয়া হয়, অধ্যাত্ম রামায়ণ প্রকৃতিকে সেইভাবে কখনই স্বাধীন সত্তা দেবে না, এখানে স্বাধীন সত্তা বলতে যা কিছু হবে সব ঈশ্বরের উপর দিয়ে দেওয়া হয়। যখন সৃষ্টি কার্য চলে তখন প্রকৃতি আর ঈশ্বর আলাদা, যখন সৃষ্টিকার্য নেই প্রকৃতি আর ঈশ্বর তখন এক। সেইজন্য একদিকে তাঁর স্বাধীন সত্তা হয়ে যায় আবার অন্য দিকে দুটো মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। সেই এক যেন দুইয়ে বিভাজিত হয়ে যান, দুইয়ে বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পর ওই দুই দিয়ে কার্য চলে। গীতাতে যে পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতির কথা বলছেন সেখানেও এই ভাবেরই প্রাধান্য পেয়েছে। পরা প্রকৃতি উচ্চ প্রকৃতি আর নিম্ন প্রকৃতি হল অপরা প্রকৃতি। নিম্ন প্রকৃতি হল যা দিয়ে পদার্থ তৈরী হয় আর উচ্চ প্রকৃতি হল চৈতন্য রূপে যিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। এই উচ্চ প্রকৃতি ও নিম্ন প্রকৃতি দুটোকে একসাথে শক্তি রূপে বলা হয়, সীতাকে বলছেন *লোকবিমোহিনী*, যিনি সমস্ত লোককে বিমোহিত করে রেখেছেন। এটাকেই বেদান্তে মায়া বলছে, মায়াকে বলছেন আবরণ বিক্ষেপ, অর্থাৎ জিনিসটাকে ঢেকে দিচ্ছে আর ঢেকে দেওয়ার পর অন্য রকম দেখিয়ে দিচ্ছে। জাদুকর যেমন গ্লাশের মধ্যে একটা জিনিস দিয়ে গ্লাশটাকে একটা আবরণ দিয়ে ঢেকে দিল, আবরণ সরিয়ে নেওয়ার পর দেখিয়ে দিচ্ছে জিনিসটা পাল্টে অন্য জিনিস হয়ে গেছে। এই আবরণ বিক্ষেপ হলেই আমাদের মনটা গুলিয়ে যায়। মন কেন গুলিয়ে যায়, জিনিসটা যেমন তেমনটি কেন দেখি না? বলেন যে, এর পেছনে একটা শক্তি আছে, যে শক্তি আমাদের এগুলো জানতে দেয় না। এই শক্তি আমরা কিভাবে দেখতে পারি? যে শক্তি একদিকে আমাদের মোহিত করে রাখছে আবার অন্য দিকে আমাদের মোহ থেকে বার করে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যখন মোহ রূপে দেখছি তখন বলছি লোকবিমোহিনী, আর যখন মুক্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তখন বলছি জ্ঞানদায়িনী, ঠাকুরের ভক্তরা শ্রীমাকে জ্ঞানদায়িনীই বলেন। যাই হোক শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞায় সীতা এবার হনুমানকে রামতত্ত্ব বলতে শুরু করেছেন –

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্
সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং সত্তামাত্রগোচরম্।।১/১/৩২।।

বৎস হনুমান! তুমি যে শ্রীরামকে জান সেই শ্রীরাম হলেন পরমব্রহ্ম। এখানে সীতা অপর ব্রহ্ম বলছেন না, অপর ব্রহ্ম মানে যাঁর দ্বারা সৃষ্টিকার্য হয়, শ্রীরাম পরমব্রহ্ম, সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সচ্চিদানন্দ যে এই তিনটে আলাদা জিনিস তা নন, যিনি সৎ তিনিই চিৎ, যিনিই চিৎ তিনিই আনন্দ, যিনিই আনন্দ তিনিই সৎ। কিন্তু তিনটে ভাবে দেখে বলে সচ্চিদানন্দ বলা হয়। আর বলছেন *সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্তং*, কোন জিনিসকে যদি জানতে হয় তাহলে

তাকে একটা উপাধি দিতে হয়। গাছের পাতাকে বোটানিস্টরা মাইক্রোস্কোপে নিয়ে যদি পরীক্ষা-নিরিক্ষা করতে চান তাহলে সরাসরি আস্ত পাতাকে দিলে স্টাডি করা যাবে না, তার জন্য পাতাকে আড়াআড়ি করে সমান ভাবে কাটতে হবে। কিন্তু পাতা এমনিতে পাতলা বস্তু, এভাবে তো কাটা যাবে না, পাতাকে মোমের মাঝখানে দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর এক ধরণের বিশেষ ব্লেড দিয়ে মোমকে কাটতে কাটতে পাতাকেও মাঝখান থেকে কেটে দেওয়া হয়। এরপর মাইক্রোস্কোপে পাতার সব কিছুকে দেখা যাবে। অতি সূক্ষ্ম জিনিসকে ততক্ষণ জানা যাবে না যতক্ষণ ওকে উপাধি না দেওয়া হবে। এই জগৎ যদি উপাধি রূপে না আসে, শরীর যদি উপাধি রূপে না আসে আমরা এই জগৎ, শরীরের ব্যাপারে কিছুই জানতে পারব না। এখন যিনি সেই সত্তা তাঁর দুটো রূপ, উপাধিবিহীন আর উপাধিযুক্ত। উপাধিবিহীন যেটা তাঁকেই বলে নির্গুণ নিরাকার, আর যখন সোপধিক অর্থাৎ উপাধি যখন এসে গেল তখন এই জগত আদি সব কিছু হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের ঠিক ঠিক সত্তা হল নির্বিকার, নির্বিকল্প। যাঁর কোন বিকল্প নেই তিনিই নির্বিকল্প, তার মানে যাঁর উপাধি নেই। উপাধি হলেই তখন বিকল্প হয়ে যায়। যেমন একজনকে যদি ধনী লোক বলা হয়, ধনী লোক বলে দেওয়া মানেই তার উপাধি এসে গেল। এর উল্টোটাও হয়ে যাবে যার ধন নেই সে নির্ধন, এটাও উপাধি। শ্রীরামচন্দ্রকে যে বর্ণনা করা হবে, বর্ণনা করতে গেলে উপাধি লাগে, গুণ লাগে, শ্রীরামচন্দ্র উপাধিবিহীন, কোন গুণ তাঁর নেই। তাই শ্রীরামচন্দ্রের কোন বর্ণনা করা যায় না।

তাহলে কি তিনি নেই? কারণ কোন জিনিসের যদি কোন গুণ না থাকে, গুণ মানে উপাধি হয়ে গেল, কোন উপাধি যদি না থাকে তাহলে জিনিসটা আদৌ আছে কিনা সেই ব্যাপারে সন্দেহ এসে যাবে। সেইজন্য বলছেন সত্তা মাত্র, তাঁর সত্তা আছে, এই ভুল যেন না করে বসে যে তিনি নেই। ঈশ্বরের ব্যাপারেও আমাদের সন্দেহ হয়, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না তাই তিনি নেই। যারা প্রকৃতির পূজারী তাদের বিশ্বাসের মূল হল প্রকাশ। আমরা জগৎ সামনে দেখছি সেইজন্য জগতকে বিশ্বাস করি। এখানে প্রধান গুরুত্ব হল দেখা, বাকি ইন্দ্রিয়গুলির কোন গুরুত্ব নেই। খুব হলে আমরা বলতে পারি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, যে জগতকে আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরতে পারি সেই জগতের প্রতিই আমাদের বিশ্বাস। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জিনিসকে ধরা যায় না সেই জিনিসে আমাদের বিশ্বাস নেই। একেই তো ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় না, তার উপর আবার বলছেন তাঁর কোন উপাধি নেই, তিনি গুণবিহীন। স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাশে যদি একেবারে পরিশুদ্ধ জল দিয়ে ভরে দেওয়া হয়, জানাই যাবে না গ্লাশে জল আছে কি নেই। আগেকার দিনে রান্নার গ্যাসে কোন গন্ধ ছিল না, গন্ধ না থাকার জন্য প্রচুর দুর্ঘটনা হত। গ্যাস লিক হলে লোকেরা বুঝতেই পারত না। অনেকক্ষণ থেকে গ্যাস লিক হয়ে যাচ্ছে কেউ টের পেত না, তারপর দেশলাই জ্বালতেই পুরো ঘরে আগুন লেগে গেল। পরে সরকার থেকে গ্যাসে গন্ধ মিশিয়ে দেওয়া হয়, গ্যাস লিক হলে গ্যাসের গন্ধে বুঝে যায় গ্যাস লিক হচ্ছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন কিছু যদি না থাকে তাহলে তিনি আছেন কি নেই ধরা যায় না। এই ভুলটা যাতে তোমার না হয়ে যায় সেইজন্য পরিষ্কার করে বার বার করে বলছেন তিনি সত্তা মাত্র, তিনি আছেন। তিনি আছেন এই আভাস একমাত্র সমাধির গভীরেই জানা যায়। সীতাদেবী বলছেন –

আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশমকল্মষম্।।১/১/৩৩।।

ঈশ্বরের যা যা গুণ হতে পারে সব গুণের কথা পর পর বর্ণনা করছেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি নির্মল, কোথাও কোন ধরণের মল তাঁর মধ্যে নেই। *শান্তং*, ঈশ্বরকে শান্তং বলছেন কারণ তিনি কোন ক্রিয়াতে জড়ান না। *নির্ব্বিকারং*, ঈশ্বরের মধ্যে কোন ধরণের বিকার আসে না। বিকার ছয় ধরণের, শাস্ত্রের পরিভাষায় ষড়বিকার বলে, যেমন জন্ম, যার জন্ম হল তার বৃদ্ধি হবে, তারপর তার ক্ষয় হতে থাকবে আর একদিন তার নাশ হয়ে যায়, এই ধরণের কোন বিকার ঈশ্বরের মধ্যে নেই, সেইজন্য বলছেন *নির্ব্বিকারং*। বিকার সব সময় যৌগিক পদার্থেরই হয়, দুটো জিনিসের সংযোগ হলে তখনই তার জন্ম হয়, জন্ম হলেই তার মধ্যে আরও নানা রকমের বিকার আসতে থাকে। ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বে কোন যৌগিকের ব্যাপার নেই, সেইজন্য তাঁর ষড়বিকার হয় না। *নিরঞ্জনম্*, ঈশ্বরের মধ্যে কোন ধরণের অঞ্জন অর্থাৎ কালিমা নেই। *সর্ব্ব্যাপিনম্*, তিনিই আছেন। কোথায় আছেন? সর্বব্যাপী হয়ে ব্যপ্ত হয়ে আছেন, তিনি যে কোন খণ্ডিত হয়ে আছেন তা নয়। আর *স্বপ্রকাশম্*, স্বপ্রকাশ এই ভাব উপনিষদের ভাব। যে কোন জিনিসকে জানার জন্য প্রকাশ লাগে, আলো না থাকলে বস্তুকে দেখা যায় না। আর যেসব জিনিসকে আমরা শ্রবণ করে বা স্পর্শের দ্বারা অনুভব করি সেখানেও আত্মার প্রকাশ ওখানে আছে বলে আমরা জানতে পারি। কিন্তু দৃষ্টিতে আলো না থাকলে জানতে পারবে না। ঈশ্বর হলেন স্বপ্রকাশ, আলোর দ্বারা বা অন্য কিছুর দ্বারা তাঁকে

দেখা যায় না, তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। বরঞ্চ তিনি আছেন বলেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে এবং সমস্ত জগতকে জানতে পারছি। ঈশ্বরের যে স্বরূপ আর যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁরও সেই একই স্বরূপ। এবার নিজের অর্থাৎ প্রকৃতি বা শক্তির বর্ণনা করে বলছেন –

মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সান্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা।।১/১/৩৪।।

সীতার কি স্বরূপ, মা কালী বা মা দূর্গার কি স্বরূপ তারই বর্ণনা করছেন। শাক্ত গ্রন্থে এই ভাবটাই চলতে থাকে। *মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং*, 'কৃ' ধাতু থেকে প্রকৃতি শব্দ এসেছে, কৃ মানে করা, আর 'প্র' যখন লেগে যায় তখন প্রকৃষ্ট রূপে করা হয়ে যায়, প্রকৃতির মূল অর্থও তাই, প্রকৃতি মানে যিনি ক্রিয়া করেন। আমরা ভালো মন্দ যা কিছু করছি সবই আমাদের প্রকৃতিই আমাদের দিয়ে করায়। গীতাতেও ভগবান বলছেন *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, মানুষ যা কিছু করে সব তার স্বভাবের জন্যই করে, ঐটাই তার প্রকৃতি, এই প্রকৃতিকে বাদ দেওয়া যায় না। বলছেন আমাকেই মূল প্রকৃতি রূপে জানবে। মূল প্রকৃতি কেন বলছেন? প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা আলাদা প্রকৃতি বা স্বভাবের সাথে সমষ্টি প্রকৃতির আমরা যাতে গোলমাল না করে ফেলি সেইজন্য বলছেন *মূলপ্রকৃতিং* বা মূলা প্রকৃতি, অর্থাৎ যেটা সব কিছুর মূলে। যখন শক্তির কথা বা সৃষ্টিকারিণীর কথা বলা হয় তখন তাঁকে মূলা প্রকৃতি বলে। শুধু প্রকৃতি বললেও কোন অসুবিধা হবে না।

এই প্রকৃতি কি করেন? *সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্* প্রকৃতি সৃষ্টিকে জন্ম দেন আর সৃষ্টিকে নিজের মধ্যে লয় করেন। ঠাকুরের কথামৃতেও এই ভাবটাই সব সময় থাকছে। মা, যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই সৃষ্টি করেন তিনিই লয় করেন। কিন্তু কিভাবে সব কিছু করেন, সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন *তস্য সান্নিধিমাত্রেণ*, শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে, তিনি যখন কাছে এসে দাঁড়ান, ঐ *সান্নিধ্যি*, কাছে আসাতেই আমার কি হয়, সৃষ্টিকার্যে *অতন্দ্রিতা*, আমার মধ্যে একটুও তন্দ্রা ভাব, আলস্যের ভাব থাকে না। এই যে পাখা চলছে, যতক্ষণ বিদ্যুৎ সরবারহ হতে থাকবে, যতক্ষণ সুইচ অন থাকবে ততক্ষণ পাখা নিরলস ভাবে ঘুরতেই থাকবে। কিন্তু পাখা যদি খারাপ হয়ে যায়, মোটর যদি পুড়ে যায় তখন তো বন্ধ হবেই। এখানে সেটাও হবে না। শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ নিরলস ভাবে সৃষ্টির কার্য চলতেই থাকবে। যখন মনে করবেন আর সৃষ্টির দরকার নেই তখন শ্রীরামচন্দ্রেরই শক্তি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে লয় হয়ে যাবে। তখন আর অবতার আর শক্তি, ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি আলাদা হয়ে থাকবেন না, লয় হয়ে এক হয় যান। সাংখ্য বা যোগ মতে প্রকৃতির একটা স্বাধীন সত্তা আছে, প্রকৃতি নিজের মত সব কিছু করে যাচ্ছে, এই মতকে এখানে আটকে দেওয়া হল। কিন্তু একেবারে যে পুরো উড়িয়ে দিচ্ছেন তাও না, পর পর এখানে দুটোকে মেলাতে থাকবেন, রামও যা সীতাও তাই, আর তিনি আছেন বলে এই জগৎ চলছে। কিন্তু *তস্য সান্নিধিমাত্রেণ*, তাঁর সান্নিধ্য মাত্রেই আমি সব কিছু করছি, এখানে সাংখ্য আর যোগের মতকে নিয়ে চলছেন। কিন্তু পরে পরে দেখাবেন রামও যা সীতাও তাই। তবে রামও যা সীতাও তাই এই ভাবকে বার বার নিয়ে এলে সৃষ্টির ব্যাপারটা কেমন একটা সংশয়ের মধ্যে চলে যায়। কারণ সৃষ্টির ব্যাপারটাই অত্যন্ত জটিল, আর সত্যিকারের আমাদের দার্শনিক বা পণ্ডিতরা কখনই সৃষ্টির ব্যাপারে এক মত হন না। তাই নানান রকমের যত মত আছে সবটাকেই মেলাতে চাইছেন, প্রকৃতিও যা শক্তিও তাই, মায়াও তাই, যেমনি লোকবিমোহিনী বললেন তখনই বেদান্তের মায়াকে নিয়ে এলেন। আবার বলছেন *সান্নিধিমাত্রেণ*, সাংখ্য আর যোগও এই মতকে নিয়েই চলে। আর এর পরে পরে শক্তির মতকেও নিয়ে আসবেন। আসলে দেখাতে চাইছেন সবটাই একই জিনিস, কিন্তু কোথাও কোথাও একটু যে ভাব পাল্টে যাচ্ছে বলে শব্দগুলোও পাল্টে যায়, আর তার ফলে শব্দের প্রকাশটাও পাল্টা যায়।

সীতা বলছেন, শ্রীরামচন্দ্রের সান্নিধ্যে আমিই সব কাজ করছি, তবে কি জানো সাধারণ লোকেরা মনে করে শ্রীরামচন্দ্রই সব কাজ করছেন। চুম্বক পেছনে থাকার জন্য লোহার সব কাজ চলছে। এখন এই কাজটা কে করছে? চুম্বক করছে নাকি লোহা করছে? চুম্বক আছে বলে লোহা কাজ করতে পারছে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়, তিনি আছেন বলেই, তাঁর সান্নিধ্যেই সব কিছু হয়। কিন্তু লোকেরা মনে করে কাজ তিনিই করছেন। পাখা আর বিদ্যুতের তুলনা হবে না, কারণ পাখার ঘোরার মাঝখানে বিদ্যুৎও ক্রমাগত ঘুরছে। যার জন্য মিটারও ঘুরছে। এখানে জিনিসটা ঠিক তা নয়, এখানে হল সন্নিধি, তিনি শুধু কাছে আছেন বলেই সৃষ্টিকার্য চলছে, কিন্তু লোকেরা মনে করছে তিনিই করছেন। এরপর সীতাদেবী আরেক ধাপ এগিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বাল্যাবস্থা থেকে যা যা করেছেন,

যেমন তাড়কাদি বধ, অহল্যার শাপমুক্ত করা, মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ, সীতার বিবাহ, সেখান থেকে বনবাস হয়ে লঙ্কায় রাবণ বধ, যা কিছু শ্রীরামচন্দ্র করেছেন সব কিছুর বর্ণনা করে করে ৪২ নং শ্লোকে এসে বলছেন –

বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ।
অযোধ্যাগমং পশ্চাদ্‌রাজ্যে রামাভিষেচনম্‌।।১/১/৪২।।
এবমাদীনি চান্যানি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তি রামেহস্মিন নির্ব্বিকারেহখিলাত্মনি।।১/১/৪৩।।

এই যে এত কিছু করার পর বিভীষণকে রাজ্য দান করে আমাকে পুষ্পক রথে বসিয়ে অযোধ্যায় আগমন, তারপর তাঁর রাজ্যাভিষেক হওয়া সব কিছু আমার করা, তিনি কিছুই করেননি। এর আগে যেমন বলা হয়েছিল, সূর্যে যেমন অন্ধকারের কল্পনা করা যায় না, ঠিক তেমনি ঈশ্বর যিনি তিনি শুদ্ধ ব্রহ্ম, তাঁতে কখন ক্রিয়ার আরোপ হয় না। কিন্তু অজ্ঞানীরা, জিনিসটা ঠিক ঠিক জানে না, বোঝে না তাই সব কিছু শ্রীরামচন্দ্রের উপর আরোপিত করে মনে করে শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা বধ করলেন, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গেলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন ইত্যাদি। বালির যে বধ হল, কে বধ করেছেন? সীতা করেছেন। সীতার যে বনবাস, শ্রীরামচন্দ্র যে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন, আসলে সীতা নিজেই নিজেকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। যাবতীয় যা কিছু করার সব প্রকৃতিই করে। এই জিনিসটাকেই আমরা যদি নিজের জীবনে বিশেষ করে সাধনার জীবনে নিয়ে আসি তখন হবে কি? এতদিন আমি কাজ করার সময় মনে করছিলাম আমি করছি, কিন্তু এখন যে কোন ক্রিয়াই হবে তখন মনে হবে সব মা করাচ্ছেন বা প্রকৃতি করাচ্ছেন। আর আমি যদি নিজেকে শুদ্ধাত্মা মনে করি তাহলে আমি কখনই কিছু করছি না, মা নিজেই সব করছেন বা করাচ্ছেন। আমি বলতে নিজেকে আমি যেটা বুঝছি সেই আমি কিছুই করে না, করে প্রকৃতি। আসলে তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। চাষীরা চাষ করে ফসল উৎপাদন করে, সেই ফসল বাজারে আমরা সব্জীওয়ালার কাছ থেকে কিনছি, কিন্তু চাষী আর সব্জীওয়ালার মাঝখানে দালালরা ঢুকে চাষীদের কম পয়সা দিয়ে ফসল নিয়ে সব্জীওয়ালাদের কাছে বেচে দেয়। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দ আছেন বলে প্রকৃতি সব করে যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে আমি বোধটা ঢুকে গিয়ে মনে করছে সব আমি করছি। শাস্ত্র কে পড়াচ্ছেন? আচার্য পড়াচ্ছেন। শাস্ত্রের কথা কে শুনছে? শিষ্যরা শুনছে। এটাই দালালী, দালালী ছাড়া এগুলো কিছু না। এইসব বলার পর ৪৪ নং শ্লোক থেকে ৫২ নং শ্লোক পর্যন্ত ঈশ্বর তত্ত্বকে খুব সংক্ষেপে কিন্তু খুব প্রাঞ্জল ভাবে বলছেন –

রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।।১/১/৪৪।।

শ্রীরামচন্দ্র বাস্তবে চলেনও না, দাঁড়ানও না, শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, ত্যাগও করেন না আর কোন ক্রিয়াও করেন না। তাহলে শ্রীরামচন্দ্র কি করেন?

আনন্দমূর্ত্তিরচলঃ পরিণামহীনো
মায়াগুণানুগতো হি তথা বিভাতি।।১/১/৪৫।।

তিনি আনন্দস্বরূপ, অবিচল কূটস্থ, পরিণামবিহীন। যিনি অনন্ত তিনি যাবেনটা কোথায়! যিনি আনন্দস্বরূপ তাঁর শোক হবে কোথা থেকে! আর যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন তাঁর যাওয়ার কোন জায়গাই তো নেই। কোথাও যদি যেতেই না পারেন তাহলে দাঁড়াবেন কোথায়! তাহলে কি হয়? *মায়াগুণানুগতো হি তথা বিভাতি*, মায়ার গুণে তিনি পুরো জড়িয়ে আছেন, জড়িয়ে থাকার জন্য মনে হয় যেন তিনি সব কিছু করছেন। ৪৪ নং শ্লোকটি খুব মজার, কারণ আমাদের জীবনেও এই একই জিনিস প্রযোজ্য হয়। শ্রীরামচন্দ্র বলতে আমরা কি বুঝি? এই প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসবে। প্রথম যেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রতীত হয় তা হল শ্রীরামচন্দ্র একজন মানুষ, রাজা দশরথের সন্তান, তিনি অযোধ্যার রাজা। কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে, তিনি বালি বধ করেছিলেন, তিনি রাবণ বধ করেছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু এখানে বিষয় হল শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন, তুমি হনুমানকে রামতত্ত্ব বল। শ্রীরামচন্দ্রের যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বটা কি? তত্ত্বের কথা যখন আসে তখন বলছেন আসলে শ্রীরামচন্দ্র এই এই। কিন্তু অজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে, জানকীর সাথে বিবাহ হয়েছে, তিনি অনেক অসুর বধ করেছেন, লঙ্কায় রাবণ বধ করেছেন, তিনি অযোধ্যায় রাজত্ব করেছেন। কিন্তু তত্ত্বতঃ শ্রীরামচন্দ্র তা নন। বাল্মীকি যদি শ্রীরামচন্দ্রকে সুপারম্যান রূপে, মহাপুরুষ হিসাবে আর যদি মর্যাদাপুরুষ রামচন্দ্র রূপে দেখেন তাতে দোষের কিছু

নেই। এই কারণেই দোষ নেই অজ্ঞানীরা যেভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে নিচ্ছে বাল্মীকি সেভাবে নিচ্ছেন না। কিন্তু বেদান্তের তত্ত্বের দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে পুরো জিনিসটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ শুধু আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করছেন, এখানে শুধু তত্ত্ব নিয়েই কথা হচ্ছে, সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বটা বলে দিচ্ছেন *রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ*। যমুনা পার হওয়ার সময় ব্যাসদেব গোপীদের ঠিক এই কথাই বলছেন। ব্যাসদেব গোপীদের বলছেন, আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে, তোমাদের কাছে যদি ননী, ক্ষীর থাকে তাহলে আমাকে খেতে দাও। গোপীরা পরিতোষ করে ব্যাসদেবকে খাওয়ালেন, আর খাওয়ার পরেই ব্যাসদেব বলছেন, হে যমুনে! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি তাহলে তুমি বিভাজিত হয়ে যাও। বলতেই যমুনা বিভাজিত হয়ে গেল। গোপীরা অবাক হয়ে ভাবছেন উনি আমাদের সামনে এত ক্ষীর, ননী খেলেন কিন্তু বলছেন আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি। কারণ ব্যাসদেব নিজের আত্মস্বরূপে সদা প্রতিষ্ঠিত।

আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন আমাদের এত উপাধি যে একটি উপাধি থেকেও আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। আমরা আমাদের উপাধিকে সারাদিনই পাল্টাতে থাকি, এই আমি মা হয়ে কাজ করছি, পরক্ষণেই স্ত্রী হয়ে স্বামীর সেবা করছি, এই আমি বাড়ির কর্তা রূপে সংসারের কাজ করছি আবার যখন ভোট দিতে যাচ্ছি তখন দেশের নাগরিক হয়ে ভোট দিতে যাচ্ছি, আবার যখন কোন আন্তর্জাতিক বিষয় আসে তখন আমি নিজেকে মানবজাতির অঙ্গ রূপে দেখছি। আজকে যিনি শিক্ষক কয়েক বছর আগে তিনি ছাত্র ছিলেন, বাড়িতে গিয়ে আবার কারুর স্বামী, কারুর সন্তান, কারুর বাবা হয়ে যান। সেই একই মানুষ কিন্তু কত রূপে নিজেকে সে দেখে যাচ্ছে, বিভিন্ন সময় তার উপাধি পাল্টে যাচ্ছে। আবার আমরা একদিকে বাঙালী অন্য দিকে ভারতীয়, একদিকে হিন্দু অন্য দিকে মানবজাতি, একটি মানুষের কত রকমের ব্যক্তিত্ব যে হতে পারে বলে শেষ করা যাবে না। ব্যক্তিত্ব মানেই একটা মুখোশ, আমরা সবাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের মুখোশ চাপিয়ে ঘুরছি, মুখোশ ছাড়া আমরা থাকতে পারি না, সমাজই মুখোশ ছাড়া আমাদের থাকতে দেবে না। এটা ঠিকই যে, মুখোশ বা উপাধি একটা জিনিসকে সীমিত করে দেয়, সীমিত করে দেওয়ার জন্য জিনিসটাকে আমরা সহজে বুঝতে পারি। কিন্তু সীমিত হওয়া মানেই বন্ধনে চলে যাওয়া, আত্মতত্ত্ব জানতে হলে এই বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু জগৎ উপাধি ছাড়া চলবে না, আর যত উপাধি তত বন্ধন। কারণ মানুষ তার উপাধির সাথে নিজেকে একাত্ম করে নেয়, উপাধির সাথে এক করে নিলে ওখান থেকে আর সে বেরিয়ে আসতে চাইবে না। বলা হয় নাকি, বিজ্ঞানীরা যতদিন নোবেল প্রাইজ না পান ততদিন তাঁরা খুব ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন, তার মানে বিভিন্ন রকম থিয়োরীকে নাড়াচাড়া করতে করতে এগোতে থাকেন। নোবেল প্রাইজ যদি একবার পেয়ে যান, তখন তাঁর মাথায় এক চিন্তা ঢুকে যায়, এখন যদি আমি উল্টোপাল্টা থিয়োরী বলি তাহলে সবাই আমাকে কি ভাববে! সেইজন্য দেখা যায় বেশির ভাগ নোবেলজয়ী বিজ্ঞানীরা পরে আর বিজ্ঞানে বেশি কিছু নতুন অবদান দিতে পারেন না। কারণ নোবেল প্রাইজের উপাধি এসে গেছে, উপাধি এসে যাওয়ার জন্য তাঁদের খুব সংযত হয়ে চলতে হয়। ছোটবেলায় আমরা অনেক কিছুই করি কিন্তু বয়স হতে হতে নানা রকম উপাধি এসে যাওয়ার পর অনেক কিছুই আর করা যায় না।

শাস্ত্র বার বার বলছে তুমি মুখোশ ছাড়া নিজেকে দেখ। আমরা সবাই সব সময় মুখোশ সমেত বিচরণ করে যাচ্ছি, মুখোশ বিহীন আর হতে পারছি না। মুখোশ বিহীন যদি হয়ে যাই তখন আমি কি হয়ে যাব? *রামো ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ*। তখন দেখছি আমার গমনের ক্রিয়া নেই, স্থিতির ক্রিয়া নেই, আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া নেই, ত্যাগের ক্রিয়া নেই কোন ক্রিয়াই নেই। যিনি অনন্ত তিনি ক্রিয়াটা করবেন কোথায়? যাওয়ার জন্য তো একটা জায়গা দরকার, সব জায়গাতেই তিনি ব্যপ্ত, তাঁর বাইরে তো কিছু নেই। শ্রীরামচন্দ্রেরও অনেক রকম ব্যক্তিত্ব, অনেক মুখোশ লাগান আছে, আমরা যখন বলছি অযোধ্যাপতি এটাও একটা মুখোশ। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বটা কি বলছেন? বলছেন, *যো রাম দশরথ কা বেটা, ওহি রাম ঘট ঘট মে লেটা, ওহি রাম জগৎ পসেরা ওহি রাম জগতসে নেয়ারা*। ছোট্ট একটি দোঁহা, এই দোঁহা পুরো আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। দশরথের যে বেটা সেই শ্রীরাম প্রত্যেকটি অণুতে অণুতে ঢুকে বসে আছেন, সেই শ্রীরামই জগতকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি আবার জগতের বাইরে। এখন আমাদের ঠিক করতে হবে আমি আপনি শ্রীরামচন্দ্রের কোন ব্যক্তিত্বকে গ্রহণ করব। হনুমান দাস্য ভাবকে আশ্রয় করে আছেন, তাঁকে এবার শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি এখন মানুষ রূপে দেখছ ভালো, তুমি ঠিকই দেখছ তিনি এই করেছেন সেই করেছেন, কিন্তু তাঁর তত্ত্বটা এই রকম, এই তত্ত্বটা জেনে নাও আর এটাও জেনে নাও তিনি সব কিছুর পারে।

সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে দিলেন, এবার শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের কাছে নিজের তত্ত্ব নিজেই ব্যাখ্যা করছেন। চুয়াল্লিশ নম্বর থেকে বাহান্ন নম্বর শ্লোক এই নয়টি শ্লোককে বলা হয় রামহৃদয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষ একটি করে গ্রন্থের স্তুতি দেওয়া হয়েছে, স্তুতি করে বলে হয় এই অধ্যায় নিত্য পাঠ করলে অমুক লাভ হয়, তমুক লাভ হয় ইত্যাদি। রামহৃদয় হল খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব। গীতাপ্রেস নয়টি শ্লোকের বদলে পুরো অধ্যায়কেই রামহৃদয় রূপে নেয়। কিন্তু স্বামী তপস্যানন্দজী এবং আরও কয়েকজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসীরা চুয়াল্লিশ নম্বর থেকেই রামহৃদয় নিয়েছেন। রামহৃদয় নিয়মিত পাঠ করা খুবই ভালো, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের যে তত্ত্ব সেটাকে জানা যায়।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, হে হনুমান! আমি তোমাকে আত্মা, অনাত্মা আর পরমাত্মা এই তিনটি তত্ত্বের কথা বলছি। এখান থেকে পরের ছয় সাতটি শ্লোকে ঘোর বেদান্তের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রথম বার যাঁরা এই অংশটা শুনবেন তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে, কিন্তু শুনে যেতে হবে, শুনতে শুনতে ভেতরে একটু ছাপ পড়বে, ছাপ পড়তে পড়তে ধীরে ধীরে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। এখানে একেবারে শুদ্ধ বেদান্তের কথা বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র কিন্তু জ্ঞানমিশ্রিত। ঠাকুরও মাঝে মাঝে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তির কথা বলতেন। জ্ঞানমিশ্রিত খুব সাধারণ স্তর থেকে বলা হয়, কারণ শেষ কথায় জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে কোন তফাৎ থাকে না, সেখানে জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। সাধারণ স্তরে বলতে গিয়ে বলা হয়, যিনি ভক্তি করেন তিনি তত্ত্বটাও জানতে চান। কিন্তু শেষ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান আর ভক্তিতে কোন পার্থক্য থাকে না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে To love is to know, ভালোবাসা মানেই জানা, জানা আর ভালোবাসার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একটা জিনিসকে আমরা যত জানছি তত সেই জিনিসকে আমরা ভালোবাসছি। যেটাকে আমরা ভালোবাসি সেটাকেই আমরা জানতে চাই। যত জানছি তত ভালোবাসা বাড়তে থাকে, সেইজন্য জ্ঞান আর ভক্তি দুটো আলাদা জিনিস হতে পারে না, জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। অধ্যাত্ম রামায়ণে পদে পদে এই জিনিসটা আসবে – To love is to know বা To know is to love, দুটো একই জিনিস। এখানে আত্মা, অনাত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্ব বলছেন, এই তত্ত্ব বিষয়ক কথা আমরা যত শুনব তত আমাদের ভালো লাগবে, যত ভালো লাগবে তত ভালোবাসা জন্মাবে, যত ভালোবাসা জন্মাবে তত্ত্বকে তত ধারণা করতে পারব। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আকাশ তিন ধরণের। জলাশয়ের উপমা দিয়ে বলছেন –

আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন এব হি।।১/১/৪৭।।
প্রতিবিম্বাখ্যামপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্।।১/১/৪৮
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ।

প্রথম আকাশ হল মহাকাশ, দ্বিতীয় জলবচ্ছিন্ন আকাশ আর তৃতীয় প্রতিবিম্বাকাশ। বেদান্তের এটি একটি অত্যন্ত নামকরা বর্ণনা। জলাশয়কে আকাশ ঘিরে রেখেছে, এটা একটা আকাশ, দ্বিতীয় সব মিলিয়ে যে সমষ্টি আকাশ সেটা মহাকাশ আর তৃতীয় প্রতিবিম্বাকাশ, জলাশয়ের উপর যে আকাশ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি বুদ্ধিতেও তিন ধরণের চৈতন্য হয়। প্রথম হল বুদ্ধি অবচ্ছিন্ন চেতন, দ্বিতীয় সর্বব্যাপী চৈতন্য আর তৃতীয় আভাস চৈতন্য। আমাদের যে বুদ্ধি আছে সেই বুদ্ধির মধ্যে একটা চৈতন্য কাজ করছে, আর সর্বব্যাপী যে মহাচৈতন্য তাঁর একটা আভাস আছে আর তৃতীয় হল যাকে আমরা শুদ্ধ চৈতন্য বলছি। এনারা আভাস চৈতন্যকে খুব বেশি প্রাধান্য দেন। একটা হল মূল বুদ্ধি, দ্বিতীয় সর্বব্যাপী চৈতন্য আর তৃতীয় সর্বব্যাপীর চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব বা আভাস চৈতন্য যে নিজেকে বুদ্ধির সঙ্গে জুড়ে নেয়। খুব সাধারণ ভাবে বলতে গেলে এভাবে বলা যেতে পারে – একটা হল বুদ্ধির নিজস্ব কার্য, দ্বিতীয় সর্বব্যাপী আত্মা বা ঈশ্বর আর তৃতীয় ওই যে সর্বব্যাপী আত্মা বুদ্ধির কার্যের সাথে নিজেকে একাত্ম মনে করছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই বুদ্ধিই সব কাজ করছে। অজ্ঞানী ভক্তরা মনে করে ঈশ্বর সব কাজ করছেন। কিন্তু সত্য হল যে আভাস চৈতন্য বুদ্ধির মধ্যে থাকে আসলে সব কাজ সেই করে। জলাশয়ের উপমায় যেমন তিন রকম আকাশের কথা বলা হয়েছে, জলাশয়ের নীচে, মহাকাশ আর প্রতিবিম্বিত আকাশ, ঠিক তেমনি চৈতন্যের মাঝখানে থেকে বুদ্ধি যখন কাজ করে তখন তিন রকমের চৈতন্য হয়ে যায়। একটা হল বুদ্ধি নিজস্ব, জীবন আছে বলে যে বুদ্ধি হয়, যে বুদ্ধিতে কাজকর্ম চলে, দ্বিতীয় হল শুদ্ধ চৈতন্য, যে চৈতন্য সর্বব্যাপী আর তৃতীয় হল সর্বব্যাপীর চৈতন্যের যে আভাস, যেখানে আমিত্ব বোধ সৃষ্টি হচ্ছে। এখানে এসে বেদান্ত

অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা বলবে এই বুদ্ধিটুকুই যথেষ্ট, যাঁরা গোড়া ভক্ত তাঁরা বলেন ঈশ্বরই সব করছেন, বেদান্তীরা জানে আভাস চৈতন্যই সব কাজ করে। বেদান্ত এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরে পরে বিভিন্ন রকম উপমার সাহায্য নিয়েছে। ঠাকুরের নামকরা উপমা হল – একটা পাত্রে আলু, পটল রেখে উনুনের উপর সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়েছে। পাত্রের নীচে আগুন জ্বলছে, পাত্রের জল গরম হয়ে যাচ্ছে বলে আলু পটল গুলো লাফাতে শুরু করে। আমরা মনে করতে পারি জল গরম হয়েছে বলে আলু পটল লাফাচ্ছে বা পাত্রটা গরম বলে লাফাচ্ছে কিন্তু আসল হল নীচে আগুন আছে বলে সব কিছু লাফাচ্ছে। ঠিক তেমনি আসল যে ক্রিয়া হয় সেটা হয় এই আভাস চৈতন্যের জন্য। আভাস চৈতন্য না হলে কোন ক্রিয়া হবে না। কিন্তু সাধারণ লোকেরা শুদ্ধ চৈতন্যের উপর সব ক্রিয়াকে আরোপ করে দিয়ে মনে করে তিনিই সব কাজ করছেন। আমরা যে প্রায়শই বলছি ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, তখনও কিন্তু আমরা এই ভুলটাই করছি। যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, যিনি কখনই কোন কিছুতে লিপ্ত হতে পারেন না, তাঁর উপরে সব কার্য আরোপ করে দেওয়া হয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে কার্য তখনই হয় যখন শুদ্ধ আত্মা মন বা বুদ্ধির সাথে নিজেকে একাত্ম করে নেন, তখনই এই বুদ্ধির মধ্যে আমিত্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। এই আমিত্ব ভাবের উদয়ের জন্য মনে করে আমি এটা করছি, কিন্তু ভুলে আমরা ভাবছি ঈশ্বর এই কাজ করছেন।

সাক্ষী আত্মা আর আভাস আত্মা এই দুটো আলাদা। সাক্ষী আত্মাই শুদ্ধ চৈতন্য আর আভাস চৈতন্য যেখানে আমিত্বের বোধ হয়, বুদ্ধির মধ্যে যখন আত্মা প্রতিবিম্বিত হন বা আত্মা যে বুদ্ধিকে চেতন করে দেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই জিনিসটাকে যদি গভীরে ভালো ভাবে দেখা হয়, বিশেষ করে আভাস চৈতন্য যে ক্রিয়া করছে, যেখানে আমিত্ব লেগে আছে তখন দেখা যায় ওই আভাসটাও মিথ্যা। কারণ বুদ্ধি কখন চৈতন্য হতে পারে না। সেইজন্য যাবতীয় যত কার্য হয়ে থাকে সব প্রকৃতিকে দিয়েই হয়। বেদান্তের সাধনাতে যে মহাবাক্য গুলি বলা হয়, যেমন তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, এই মহাবাক্য গুলি যখন বলা হয় তখন দেখে এই আভাস চৈতন্য জিনিসটা কিছুই নয়, কারণ এর নামটাই হল আভাস। শেষ পর্যন্ত থেকে যায় দুটো জিনিস, যিনি পরমব্রহ্ম তিনি থেকে যাচ্ছেন বা প্রকৃতি থেকে যাচ্ছে। প্রকৃতি বা বুদ্ধির মধ্যে যে চৈতন্যের ভাব এই ভাব শুধু আভাস মাত্র, আসলে কিছুই নয়। আভাস মাত্র হওয়ার জন্য মনে হয় এটা আছে কিন্তু আসলে আভাস চৈতন্য বলে কিছু নেই। এই জিনিসটাকে বোঝার সহজ উপমা হল ট্রান্সফর্মার। মাইথন ড্যামে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হল, সেই বিদ্যুৎ ঘুরে ঘুরে আমাদের এলাকায় যে ট্রান্সফর্মার আছে সেখানে আসছে। ট্রান্সফর্মারে দুটো কয়েল থাকে, প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারী কয়েল। মাইথন থেকে যে বিদ্যুৎ আসছে সেটা প্রাইমারি কয়েলে থাকে আর সেকেণ্ডারী কয়েল আমাদের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কিন্তু প্রাইমারি কয়েল আর সেকেণ্ডারী কয়েলের কোন রকম সংযোগ থাকে না। আমরা ঘরে যেই বিদ্যুতের ব্যবহার করছি এই বিদ্যুৎ কিন্তু সরাসরি মাইথন থেকে আসছে না। কারেন্ট দুই রকমের, এসি কারেন্ট আরে ডিসি কারেন্ট, মাইথন থেকে যদি সরাসরি আসত তাহলে সেটা ডিসি কারেন্ট হত। এসি কারেন্টের ক্ষেত্রে কি হয়, মাইথন থেকে যখন বিদ্যুৎ ট্রান্সফর্মারে আসছে তখন সেকেণ্ডে পঞ্চাশ বার আসছে পঞ্চাশ বার চলে যাচ্ছে, ফলে সেখানে একটা ম্যাগনেট তৈরী হচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। বিদ্যুতের যে সিদ্ধান্ত তাতে এভাবে যদি কারেন্ট আসতে যেতে থাকে আর ম্যাগনেট তৈরী হতে থাকে আর চলে যেতে থাকে ফলে এর পাশে যে সেকেণ্ডারী কয়েল আছে, প্রাইমারী কয়েলের খুব কাছে থাকার জন্য সেকেণ্ডারী কয়েলেও ম্যাগানেট হয় আর ম্যাগনেট চলে যায়, অনবরত আসা যাওয়ার জন্য এখানেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে। এই যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হল এই বিদ্যুৎই আমাদের ঘরে ঘরে আসছে। আমরা ঘরে যে বিদ্যুৎ পাচ্ছি সেটা মাইথন থেকে আসছে না, এটা আসছে ট্রান্সফর্মার থেকে। আমাদের ব্যবহৃত বিদ্যুৎ কিন্তু সব সময় লোকাল ট্রান্সফর্মারেই তৈরী হচ্ছে। কিন্তু মাইথন ড্যামে যদি বিদ্যুৎ উৎপন্ন না হয় তাহলে কি ট্রান্সফর্মারে এভাবে বিদ্যুৎ তৈরী হবে? কোন দিনই হবে না, কারণ মাইথনে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে বলেই এই বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে। আবার লোকাল ট্রান্সফর্মার যদি উড়ে যায় তাহলেও মাইথনের বিদ্যুৎ কোন কাজ করতে পারবে না। মাইথন থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ আমরা আনতেই পারব না, বিদ্যুৎ সরাসরি আনা যায় না, ডিসিতে এত দূর বিদ্যুৎ আসবেই না, ব্যাটারিতে আসতে পারে তাও অত দূর থেকে আসবে না। এখানেও অনেকটা তাই হয়, বিদ্যুৎ যখন আসছে তখন এই বিদ্যুৎ মাইথন ড্যাম দিচ্ছে নাকি লোকাল ট্রান্সফর্মার দিচ্ছে, নাকি ইলেক্ট্রিক সুইচ দিচ্ছে, এই সব কিছু মিলিয়ে একটা বিরাট জট পাকিয়ে যায়। এই জটকে এখানে ছাড়ানো হচ্ছে, বলছেন দেখ ভাই আসল জিনিসটা হল মাইথন ড্যাম, কিন্তু তুমি যে বিদ্যুৎ

ভাবছ ওটা কিন্তু লোকাল ট্রান্সফর্মার, এই লোকার ট্রান্সফর্মারের সাথে আসলটাকে মিশিয়ে দিও না। এই ভাবে যখন অনেক বিচার করে করে অনেক গভীরে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় ক্রিয়া কার্য সব আভাস চৈতন্য থেকে বা বুদ্ধি থেকে হয়। কিন্তু যখন জ্ঞান হয়ে যায় তখন দেখেন আভাস চৈতন্যটা কিছুই নয় অর্থাৎ লোকাল ট্রান্সফর্মারটা কিছুই নয় আসল মাইথন ড্যাম। এখানে এই কথাই বলছেন, তখন বোঝা যায় আভাস চৈতন্যের কোন ভূমিকাই নেই, আর আত্মা অক্রিয় বলে তিনি এসবের কোন কিছুতেই জড়ান না, সেইজন্য যা কিছু হচ্ছে সবই প্রকৃতির কার্য। শ্রীরামচন্দ্র এই কথা হনুমানকে বলছেন।

আবার তিনি বলছেন, উপাধি মানেই জিনিসকে সীমিত করে দেওয়া, এই যে নানা রকমের উপাধি, এই উপাধিকে যখন বাধিত করে দেওয়া হয় তখন এই বোধ হয় যে পরমাত্মাই সব কিছু। এইসব বলে আবার বলছেন, অবিদ্যার নাশ কখন হয়? জীবাত্মা আর পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানেই একমাত্র অবিদ্যার নাশ হয়। আসলে এই দুটো কখনই আলাদা ছিল না। ঠাকুর যেমন বলছেন, সচ্চিদানন্দ রূপ জলে একটা লাঠি ফেলে দেওয়া হল, তখন লাঠির ওই দিকের জল আর লাঠির এই দিকের জল হয়ে গেল। এই বিভাজনটা কিন্তু কৃত্রিম আসল বিভাজন নয়। আমরা যে মনে করছি আমি এক আর তিনি আর এক, এই বিভাজনটা আসল নয়। এই বিভাজন কখন বাধিত হয়? যখন বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করা হয়। বেদান্ত বাক্য সবাই শুনতে পায় না, শোনার জন্য একটা প্রস্তুতি দরকার। বেদান্ত বাক্য শ্রবণ করার পর তুমিই সেই পরমব্রহ্ম, এই জিনিসটা যখন জানতে পারে তখন দেখে এই যা কিছু কার্য হয় সব প্রকৃতিরই কার্য। প্রকৃতি কিসের জন্য কাজ করে? তিনি আছেন বলেই প্রকৃতি কাজ করতে পারে। শেষে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – *এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে*, এই ভাব যদি কেউ বুঝে নেয় শ্রীরামচন্দ্র কোন কিছুতে জড়িয়ে নেই, প্রকৃতিই সব কার্য করে যাচ্ছে, আর তুমি যা যা করছ আর মনে করছ তুমি করছ আসলে তুমিও কিছুই করছ না সব প্রকৃতি করে যাচ্ছে। প্রকৃতি কেন করছে? তিনি আছেন বলেই প্রকৃতি করছে। এই ভাবকে বুঝে নিলে কি হয়?

মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি।।১/১/৫৪।।

এই যে আমার তত্ত্বজ্ঞান, এই তত্ত্বকে যদি কেউ ধারণা করতে না পারে, আমার প্রতি ভক্তি যদি না থাকে তাহলে সে যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করে থাকুক তাতে তার জ্ঞানও হবে না ভক্তিও হবে না। এই সব কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যারা ভক্তিহীন, শঠ তারা যদি ইন্দ্রাদির থেকেও বেশি ঐশ্বর্যশালী হয় তাও কখনই এদেরকে এই গূহ্য জ্ঞানের কথা বলবে না। এই কাহিনী মহাদেব পার্বতীকে বলছেন। এরপর মহাদেব বলছেন, শ্রীরাম, সীতা আর হনুমানের মধ্যে যে গূহ্য আলাপ হয়েছিল তার আনুপার্বিক বর্ণনা আমি তোমাকে দিলাম, এটাই রামতত্ত্ব। তখন পার্বতী বলছেন, হে মহাদেব! আপনি সংক্ষেপে যে রামতত্ত্ব আমাকে বললেন এটুকুতে আমার মন পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, আপনি তাই আপনার মুখে সবিস্তারে সব কিছু শোনার জন্য আমার মন উদগ্রীব হয়ে আছে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে রামজন্মকথাদি শুরু হয়।

মহাদেব বলছেন, হে দেবী! আমি তোমাকে এখন পরম গূহ্য অধ্যাত্ম রামচরিত কথা শোনাচ্ছি, যে কথা আমাকে এর আগে শ্রীরামচন্দ্র শুনিয়েছিলেন। এটি একটি আমাদের প্রাচীন ধারণা যে শ্রীরামকথা শ্রীরামচন্দ্র নিজেই মহাদেবকে শুনিয়েছিলেন এবং পরে মহাদেব পার্বতীকে সেই কাহিনী শুনিয়েছিলেন।

পৃথিবীর প্রার্থনায় দেবগণসহ ব্রহ্মার ক্ষীরোদ-সাগরে বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন

একবার এমন অবস্থা হয়েছিল যে রাক্ষসদের অত্যাচার আর অনাচারের মাত্রা এত বৃদ্ধি হয়েছিল যে পৃথিবী সেই পাপের বোঝা আর বহন করতে পারছিল না। পৃথিবী তখন গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বলছেন, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু আমি এখন এই ভার আর নিতে পারছি না। পুরাণের এটি একটি চিরাচরিত কাহিনী যে যখন দেবতাদের সৃষ্টি হয়েছে তখন দৈত্যদেরও সৃষ্টি হয়েছে। দৈত্যদেরই পরে দানব বলা শুরু হল, আরও পরে সেখান থেকে আরও অধঃপতিত হয়ে রাক্ষসাদির সৃষ্টি হল। রাক্ষস ব্যাপারটা সত্যিকারের খারাপ অর্থেই নেওয়া হত। প্রথমে ছিল দেবতা, অসুর আর দৈত্য বা দানব, এরা সবাই সৎভাই। রাক্ষস পিশাচরা পৃথিবীতে প্রাণীদের কাঁচা মাংস খেয়ে বেড়াত। অসুর, দৈত ও দানবদের আরও ভয়ঙ্কর রূপে দেখাবার জন্য পরের দিকে রাক্ষসের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অসুত, দৈত্য এরা কিন্তু রাক্ষসদের থেকে পুরোপুরি ভিন্ন গোষ্টির।

কিন্তু পুরাণে এসে রাক্ষস, দৈত্য, দানব, অসুর সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যার জন্য প্রথমের দিকে প্রহ্লাদাদি দৈত্যদের ভক্তির কথা শোনার পর এগুলো শুনলে মনের মধ্যে একটা বিস্ময় জেগে ওঠে। প্রহ্লাদকে বলছেন দৈত্য বংশে জন্ম কিন্তু একজন ভক্ত। দৈত্য খারাপ কিছু নয়, দৈত্যদের মধ্যেও অনেক শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন, তবে রাক্ষসরা সত্যিকারের খারাপ ছিল। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীতে সব কটাকে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, এমন অবস্থা হয়েছে যে রাক্ষসদের অত্যাচারে পৃথিবীতে পাপের ভার যেন বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। পৃথিবীকে দেবশক্তি ধারণ করে আছে, পাপ বেড়ে যাওয়া মানে দেবশক্তির হ্রাস হয়ে যাওয়া, তখন পৃথিবী আর ভার নিতে পারে না। এখানে পরিবেশ সংক্রান্ত কিছু হচ্ছে না, শুধু বলছেন পাপের ভার। যখনই পৃথিবীতে পাপের ভার বৃদ্ধি পায় তখনই পৃথিবী ব্রহ্মার কাছে যাবে আর সব সময় গরুর রূপ ধারণ করেই যাবে। গরুর রূপ ধারণ করার পেছনে কি যুক্তি আছে আমাদের সঠিক জানা না থাকলেও বলা যেতে পারে যে, তখনকার দিনে গরুই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ, গরু যেভাবে মানুষের ভরণ পোষণ করে, পৃথিবীও তেমনি আমাদের সব দিক দিয়ে ভরণপোষণ করে। মানুষের কাছে তার সারাটা জীবন জুড়ে গরুর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবি। গরুর দুধ, দুধ থেকে বিভিন্ন ধরণের খাদ্যোপকরণ, ঘি, মাখন, দই ইত্যাদি আসছে, সারের জন্য গোবর দরকার, গরু আবার চাষবাশের কাজে লাগছে। মা, পৃথিবী আর গরু মানব জীবনে এই তিনটি জিনিসের সমান স্থান। মানুষের জীবনের গরু এত বেশি ভূমিকা পালন করে যে, গরুকে দেবীর স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, মায়ের থেকেও উপরে নিয়ে গেছে। চার-পাঁচ বছরের শিশুর মা যদি মারা যায় শিশুর জীবন চলতে থাকবে। কিন্তু গরুকে যদি শেষ করে দেওয়া হয় ভারতবর্ষ আর চলতে পারবে না। ঠিক তেমনি পৃথিবী যদি না থাকে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না, সেইজন্য পৃথিবী, গরু আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। পৃথিবীর কিছু হলেই সে ব্রহ্মার কাছেই যাবে কারণ ব্রহ্মা সবারই পিতা।

ব্রহ্মার কাছে যেতেই ব্রহ্মা সব কিছু বুঝে গেলেন পৃথিবীর কি কষ্ট, কি দুঃখ কারণ তিনি সবারই স্রষ্টা। ব্রহ্মা বিচার করে দেখলেন পৃথিবীর যে সমস্যা হয়েছে তিনি নিজে এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাত নম্বর শ্লোকে বলছেন *তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীরমগমদ্, ব্রহ্মাথ দেবৈর্বৃতো,* তখন ব্রহ্মা দেবতাদের সাথে করে ক্ষীরসমুদ্রে গেলেন। এখান থেকেই বৈদিক পরম্পরা আর পৌরাণিক পরম্পরার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আসা শুরু হয়ে গেল। পৌরাণিক পরম্পরায় ভগবান বিষ্ণুকে সব সময় দেখান হয় যে তিনি ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করে আছেন, যাকে বলছেন কারণ সলিল। মানুষের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থা। এই তিনটের বাইরে একটা চতুর্থ অবস্থা থাকে যাকে বলা হয় কারণাবস্থা, সেই কারণাবস্থা হল ঈশ্বরের বা শুদ্ধ আত্মার। আমরা জাগ্রত অবস্থাকে জানি, স্বপ্নাবস্থাকে বুঝি আর সুষুপ্তি মোটামুটি বুঝতে পারি, কিন্তু এই তিনটের পারে যে চতুর্থ একটা অবস্থা আছে এই অবস্থার ব্যাপারে আমরা কিছুই বুঝতে পারব না। কারণ ওই অবস্থাটাই আত্মার শুদ্ধ অবস্থা বা শুদ্ধ আত্মার অবস্থা। এই অবস্থাকে এখন আমাদের মত মানুষকে বোঝাতে হবে, কিভাবে বোঝাবেন? শুদ্ধ আত্মা কোথায় আছেন? কারণ অবস্থায় আছেন। কারণ অবস্থার আবার কোন অর্থ আমাদের ধারণাতে নেই, সেইজন্য কারণ সলিল এই শব্দটা নিয়ে আসছেন। এই কারণ সলিলকে এবার করে দেওয়া হল এক মহা সমুদ্র। মহা সমুদ্রের নোনা জলে ভগবান কখনই শুয়ে থাকবেন না, তাই এই মহাসমুদ্রকে করে দেওয়া হল ক্ষীরসমুদ্র, ক্ষীরের সমুদ্র কি করে হবে তাহলে তো ক্ষীরের পাঁক হয়ে যাবে, তাই দুধের সমুদ্র। এগুলোকেই নিয়ে পরে পরে বিচিত্র রকম ধারণা আমাদের দিয়ে গেলেন, যেমন সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীতে জম্বু দ্বীপ হয়েছে, সেই দ্বীপের চারিদিকে সাতটি সমুদ্র, তার একটি লবণের সমুদ্র, একটি মিষ্টি জলের সমুদ্র, শরবতের সমুদ্র, দুধের সমুদ্র ইত্যাদি।

একজন বৃটিশ ইতিহাসবিদ তাঁর আবার ভারতের প্রতি খুব শ্রদ্ধা, তিনি বলছেন এগুলো খুব বিচিত্র ভাব থেকে এসেছে। পৃথিবীর চারিদিকে লবণের সমুদ্র, এই ব্যাপারে বলছেন, রাজার কাছিপিঠে যারা থাকে তারা হল রাজার শত্রু, সেইজন্য যেন লবণের জল। সেখান থেকে একটু দূরে যারা আছে তার শত্রু হবে মাঝখানে যে আছে, সেইজন্য শত্রুর শত্রু বন্ধু হয়ে গেল তাই ওখানকার জল মিষ্টি জল। তার থেকেও দূরে চলে গেলে তার মিষ্টত্ব আরও বেড়ে গেল, সেইজন্য সেটা হয়ে গেলে শরবতের সমুদ্র। এই ধারণাটা এসেছে, আগেকার দিনে রাজারা মণ্ডল বানাতেন, মণ্ডল বানানো মানে নিজের রাজ্যের একটা ছবি আঁকা হত, ছবি আঁকার পর পাশে যে রাজ্য থাকত সেই রাজ্যকে লবণের সমুদ্র রূপে আঁকত, এরা আমার শত্রু। কাছের প্রতিবেশীরাই সব সময় আমাদের শত্রু হয়। আঘাত যদি কেউ করতে চায় তার পাশের লোককেই আগে করবে। আর আমরা সবাই মনে করি যে

দূরের লোক আমার বন্ধু। আপাত দৃষ্টিতে ভগবান আমাদের থেকে অনেক দূরে মনে হয়, সেইজন্য ভগবানের বাসস্থান ক্ষীরসমুদ্র। যারা কাছের লোক তারা সবাই লবণের সমুদ্রের।

যাই হোক, ব্রহ্মা এখন দেবতাদের নিয়ে ক্ষীরসাগরে গেছেন। সেখানে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তখন তিনি ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করলেন। স্তুতিতে চলে আসা মানে আমরা এই জায়গাতে আবার বৈদিক যুগের ধারণায় চলে এলাম যেখানে অগ্নিকে স্তুতি করা হচ্ছে, ইন্দ্রকে স্তুতি করা হচ্ছে আমার প্রার্থনা তুমি পূরণ কর। প্রথমে পৃথিবী যজমান হয়ে ব্রহ্মার কাছে গেল, ব্রহ্মা পুরোহিত হয়ে গেলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে। স্তুতি করার পর ব্রহ্মা দেখছেন ভগবান বিষ্ণু সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। পুরাণে বিষ্ণুর যে রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় আর বিষ্ণুর যে রূপে আমরা বেশি অভ্যস্ত সেই রূপে তিনি হাজির হয়েছেন। শ্যামবর্ণ, মুখে মিষ্টি হাসি, পদ্মপলাশ লোচন আর কিরীটিসহ তিনি বিভিন্ন অলঙ্কারে ভূষিত, শ্রীবৎস এবং কৌস্তভমণির প্রভায় দীপ্যমান, তাঁর চার হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, সনকাদি চারজন কুমার তাঁর চতুর্দিকে দণ্ডয়মান হয়ে ভগবানের স্তুতি করে যাচ্ছেন। ভগবানের যে সাকার রূপ ব্রহ্মার সেই রূপের দর্শন হল। ব্রহ্ম স্তুতি করে বলছেন –

<u>ব্রহ্মা কৃত ভগবানের স্তুতি</u>

নভোহস্মি তে পদং দেব প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভঃ।
যচ্চিন্ত্যতে কর্মপাশাদ্ধৃদি নিত্যং মুমুক্ষুভিঃ।।১/২/১৫।।

স্তুতিতে সাধারণতঃ যাঁর স্তুতি করা হয় তাতে তাঁর গুণেরই বর্ণনা করা হয়, অনেক সময় একটু অতিরঞ্জিত ভাবেও করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের স্তুতির ক্ষেত্রে অতরঞ্জিত করার কোন সুযোগ নেই। ব্রহ্মা বলছেন হে দেব! আপনার চরণযুগলে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। মুমুক্ষুগণ, যাঁরা মুক্তির ইচ্ছা করেন তাঁরা সব সময় প্রাণ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, মন দিয়ে, ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্থাৎ সব কিছুর দ্বারা একমাত্র আপনারই চিন্তন করেন। কিসের জন্য চিন্তন করেন? মুক্তির জন্য। কিসের থেকে মুক্তি? *কর্মপাশাদ্ধৃদি*, এই যে বিশাল কর্মপাশ মানুষকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে যাচ্ছে, এই কর্মপাশ থেকে মুক্তি। ইংরাজীতে একটা শব্দ আছে যাকে বলে *ভিসাস্ সাইকেল*, কর্ম জিনিসটা তাই। যখন আমরা কোন কর্ম করছি সেই কর্মের একটা ফল হবে, ওই ফল আমাদের কাছে আসবেই। ওই ফলের জন্য আবার আমাদের নতুন কর্ম করতে হচ্ছে, ওই নতুন কর্মেরও আবার ফল হবে, সেই ফল থেকে আবার আরও নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি হবে। কর্ম থেকে ফল, সেই ফল থেকে কর্ম এভাবে ক্রমাগত চলতেই থাকে, কর্ম আর তার ফল আমাদের বেঁধে রেখেছে। এ যেন এক বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষ, চারিদিকে তার শাখা, প্রশাখা, শেকড় ছড়িয়ে আছে, সেখান থেকে আবার ফল, বীজ, নতুন পাতা, ডালপালা বেরিয়ে আসছে, এর আর শেষ বলে কিছু নেই। গীতার পঞ্চোদশ অধ্যায়ে এই জিনিসটাকেই বর্ণনা করে ভগবান বলছেন *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখামশ্বত্থঃ প্রাহুরব্যয়ম্*, এর কোথাও কোন কুল কিনারা নেই। আমি যদি আজকে ঠিক করে নিই এই আমি ধ্যানের গভীরে বসে গেলাম এরপর আর আমি কোন কর্ম করব না, তাও এই কর্মপাশ আমাকে ছাড়বে না। কারণ আগে আগে আমার যত কর্ম জমে আছে সেগুলো তো আমাকে ছাড়বে না। *প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি*, তুমি যাবে কোথায়, প্রকৃতি তোমাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে করাবে।

জেন মাস্টারদের একটা কাহিনী আছে, গ্রামের একটি মেয়ে কোন একটি ছেলের সাথে ফেঁসে গিয়ে তার একটি সন্তান হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা মেয়েটিকে খুব মারধোর করছে, কোন সেই ছেলে বলতে হবে তোকে। গ্রামের কাছে একজন জেন মাস্টার ধ্যান করতে, বলল ওই করেছে। গ্রামের সব লোক সেখানে গিয়ে জেন মাস্টারকে আচ্ছা করে গালাগাল দিয়েছে, তারপর বাচ্চাটা ওর কোলে রেখে সব গ্রামে চলে এসেছে। জেন মাস্টার শুধু বলছে, বেশ! বেশ! তিন চার বছর পর মেয়েটির এবার অনুশোচনা হয়েছে, এ আমি কি করলাম। অনুশোচনা হতেই মেয়েটি গ্রামের লোকদের গিয়ে বলছে, আমি একটা খুব অন্যায় করেছি জেন মাস্টার নির্দোষ, অমুক ছেলে ছিল। গ্রামের লোকেরা সবাই তখন জেন মাস্টারের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছে, আমাদের খুব অন্যায় হয়ে গেছে, আমরা ক্ষমা চাইছি। তারপর বাচ্চাটাকে ফেরত নিয়ে যেতে চাইল। জেন মাস্টার বলছে, বেশ! বেশ! নিয়ে যাও। সাধুর জীবনের সাথে এই ঘটনাকে আমরা কিভাবে মেলাব? এই ধরণের ঘটনা কেন একজন সাধুর জীবনেই ঘটল? এর সহজ সমাধান – কর্মের খেলা। সাধুর আগের আগের জন্মে কিছু অশুভ কর্ম ছিল। কোন কর্ম কোথা থেকে কখন ফলপ্রসু হতে শুরু করবে আমাদের জানার কথা নয়। এটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে যে যত

উঁচুতে চলে গেছে তাঁর শরীর মন তত পরিষ্কার আর তাঁর উপর কর্মের ঝড় তত বেশি আসবে। পাহাড়ের উঁচুতে যত উঠবে বাতাস তত জোরে লাগে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দজী তখন মঠের অধ্যক্ষ। মহারাজরা প্রতিদিন একটা সময় অধ্যক্ষ মহারাজকে প্রণাম করতে যান। সব মহারাজরা দেখছেন, একজন মহারাজের দিকে ব্রহ্মানন্দজী তিনটে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন। ওই মহারাজ ঘাড় নেড়ে কিছু ইশারা করলেন, রাজা মহারাজ আবার ঘাড় নেড়ে তিনটে আঙুল দেখালেন। এই রকম তিনবার হওয়ার পর রাজা মহারাজ মুচকি হেসে সম্মতি সূচক ঘাড় নেড়ে বললেন ঠিক আছে। পরে সবাই মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন কি ব্যাপার। তখন তিনি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিলেন। রাজা মহারাজ যতবার আমাকে তিনটে আঙুল দেখিয়ে বলছেন তোমার আর তিন জন্ম বাকি, তিন জন্মের পর তোমার মুক্তি, ততবার আমি বলছি, না এটাই আমার শেষ জন্ম। শেষে উনি রাজি হয়ে বললেন ঠিক আছে। যেদিন এই ঘটনা হল তারপর দিন থেকে ওই মহারাজের জীবনে যা ঝড় আসা শুরু হল সাধারণ লোকের পক্ষে ওই ঝড় সামলান অসম্ভব। ওই তিন জন্মের কর্মের যে ঝড় আসার ছিল সেটা এই এক জন্মে, তাও তো এই জন্মের অনেক বছর ইতিমধ্যে চলেই গেছে, আর হয়ত কয়েক বছর জীবন, এই কটি বছরের মধ্যে পুরো তিন জন্মের ঝড়ের তোড় বইতে শুরু করে দিল। এই তাঁকে উপরে তুলছে, পর মুহূর্তেই মাটিতে ফেলে আছাড় দিচ্ছেন, সে এক যাচ্ছে তাই অবস্থা। দেখা যায় বড় বড় মহারাজদের এত দুঃখ-কষ্ট আসে যে কল্পনা করা যায় না। দুঃখ-কষ্ট তিন রকমের আসে, শারীরিক মানে শরীরের উপর দিয়ে রোগব্যাধির ঝড় যায়, আর সামাজিক, নানা রকম কলঙ্ক আসবে আর তা নাহলে মনের উপর দিয়ে ভেতরে ভেতরে নানা রকমের দুঃখ-কষ্ট আসবে। এ আসবেই, আর যা আসবে সবই অপ্রত্যাশিত, তার তীব্রতার মাত্রাও অত্যাধিক, এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দেবে না। সেইজন্য যোগীরা কি করেন, যা হওয়ার হয়ে গেছে এবার চল জঙ্গলে গিয়ে থাকি, একটু ফলমূল খাব আর শান্তিতে থাকব। তাও কিন্তু যোগীকে শান্তিতে থাকতে দেবে না, কোন না কোন ঝামেলা এনে ঠিক তাঁকে জড়িয়ে নেবে। কর্মপাশ থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, কোথা দিয়ে কর্মপাশ ঘিরে ফিলবে কেউ টের পাবে না। সেইজন্য মুমুক্ষুরা নিজেদের প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন দিয়ে শুধু আপনার পাদপদ্মের চিন্তন করেন যাতে কর্মপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। আর আপনি হলেন এমনই যে –

মায়য়া গুণময্যা ত্বং সৃজস্যবসি লুম্পসি।
জগৎ তেন ন তে লেপঃ স্বানন্দনুভাবাত্মনা।।১/২/১৬।।

আপনি আপনার মায়াকে আশ্রয় করে সব কিছুর সৃষ্টি করেন কিন্তু আপনি কখন কোন কিছুতেই লিপ্ত হন না, এটাই আপনার বৈশিষ্ট্য। মানুষ যা কিছু করে, দান করছে, অধ্যয়ন করছে, যজ্ঞাদি কর্ম করছে, যাই করুক কক্ষণই শুদ্ধি হবে না। কিন্তু আপনাকে যে ভক্তি করা হয় সেটাই উচ্চতম শুদ্ধি। সত্ত্বশুদ্ধি বা বুদ্ধির যে শুদ্ধি হয়, সেই শুদ্ধি ঈশ্বরে ভক্তি করলে যে রকম হয় দান, ধ্যান, যজ্ঞ, অধ্যয়নাদি করে শুদ্ধির ওই স্তরে যেতে পারবে না। ব্রহ্মা বলছেন, এর আগেও আমরা আমাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতবার আপনার পাদপদ্মের ধ্যান করেছি, আর কেনই বা তা করব না। এই বলে ব্রহ্মা খুব সুন্দর বলছেন, আপনার হৃদয়ে লক্ষ্মীদেবীর বাস আর আপনার শ্রীচরণে তুলসীপত্র দেওয়া হয়। লক্ষ্মীদেবী হলেন ভাগ্যলক্ষ্মী কিন্তু এমনই তাঁর ভাগ্য যে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষে তিনি বাস করেন অথচ তুলসী ভগবানের চরণকমলে বাস করেন। তাতেও কিন্তু লক্ষ্মীর মনে তুলসীর প্রতি হিংসা। ব্রহ্মা বলতে চাইছেন, ভগবানের চরণকমলের স্থান এত উঁচু যে, তুলসী ওই চরণকমলে বাস করার অধিকারী বলে লক্ষ্মী তুলসীকে হিংসা করে, অথচ তিনি ভগবানের হৃদয়ে বাস করেন। আপনার শ্রীচরণের এমনই মাহাত্ম্য যে আপনার শ্রীচরণে যে স্থান পেয়ে যায় তাকে হিংসা করে যারা আপনার হৃদয়ে স্থান পেয়েছে। সেইজন্য ব্রহ্মা বলছেন –

অতস্ত্বৎপাদভক্তেষু তব ভক্তিঃ শ্রিয়োধিকা।
ভক্তিমেবাভিবাঞ্ছন্তি ত্বদ্‌ভক্তাঃ সারবেদিনঃ।।১/২/২১।।
অতস্ত্বৎপাদকমলে ভক্তিরেব সদাস্তু মে।
সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে।।১/২/২২।।

সেইজন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক সারগ্রহণেচ্ছু, যাঁরা আধ্যাত্মিক সার বোঝেন তাঁরা কক্ষণ অন্য কিছুই চায় না, শুধু আপনার পাদপদ্মে ভক্তি আকাঙ্খা করেন। আপনার শ্রীচরণে যাঁরা স্থান নেন তাঁর প্রতি আপনার যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসা লক্ষ্মীর প্রতি আপনার যে ভালোবাসা তার থেকেও বেশি। সেইজন্য বলে লক্ষ্মী তাঁদের খুব হিংসে

করেন যাঁরা ভগবানের চরণকমলের ধ্যান করেন। তাই বলা হয় ভক্তদের কখনই টাকা-পয়সা এগুলো হয় না। বাড়িতে তুলসী বন করলে ভক্তি হবে ঠিকই, কিন্তু টাকা-পয়সা হবে না। সত্যিই তাই, আপনার ভক্ত কখনই ধন সম্পদ চায় না, চায় শুধু আপনার প্রতি ভক্তি, শুধুই আপনাকে ভক্তি করে যেতে চায়। *সংসারাময়তপ্তানাং ভেষজং ভক্তিরেব তে*, সংসারের জ্বালায় যারা জ্বলেপুড়ে দগ্ধ, যারা পীড়িত তাদের জন্য একমাত্র ওষুধ হলে ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এলে সংসারের জ্বালা কমে যাবে। একজনের টাকা পয়সা সব চলে গেল, কিংবা কোন আপদ বিপদ এসে গেল, এবার সে যদি ঠাকুরের নাম করে, ঠাকুরকে ভক্তি করে তাই বলে যে টাকা-পয়সা চলে গেছে সব ফিরে আসবে তা নয়, তার স্ত্রী বা সন্তান যদি মারা গিয়ে থাকে সে যে আবার স্বর্গ থেকে ফিরে আসবে তা নয়, কিন্তু যে জ্বালাতে সে অস্থির হয়ে উঠছিল সেই জ্বালাটা জুড়িয়ে শীতল হয়ে যায়। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, গঙ্গাস্নান করলে সব পাপ চলে যায় কিন্তু চোখের কানাটা যায় না। চোখের কানা আগের জন্মের পাপের জন্য, চোখের কানাত্ব ঘুচবে না কিন্তু ওই পাপটা চলে যায়। ঈশ্বরকে ভক্তি করলে যে টাকা-পয়সা এসে যাবে, মান-সম্মান বেড়ে যাবে তা নয়, সংসারের জ্বালা, টাকা-পয়সার অভাবের যে জ্বালা সেই জ্বালাটা চলে যাবে। আমেরিকার গরীব আর ভারতের গরীবের এটাই তফাৎ। আমেরিকাতে গরীব হয়ে যাওয়া মানে এবার সে একটা বদমাইশ, ক্রিমিনাল কিছু হয়ে গেল, মাতাল হয়ে গেল ইত্যাদি। ভারতের গরীব কি করে? ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শুরু করে। ভক্তিতে চলে যাওয়ার জন্য এই সংসার জ্বালাটা তার বন্ধ হয়ে যায়। ব্রহ্মা এইভাবে স্তুতি করার পর ভগবান তখন বলছেন, বল তোমাদের কি কাজ করতে হবে।

ব্রহ্মা তখন বলছে, পুলস্ত্য নন্দন রাবণ রাক্ষসদের অধীশ্বর। সেই রাবণকে আমি যে বর প্রদান করেছিলাম সেই বরের প্রভাবে সে এখন প্রচণ্ড অহঙ্কারী হয়ে গেছে, তাকে আর সামলানো যাচ্ছে না। রাবণের খুব ইচ্ছে ছিল সে খুব শক্তিশালী হবে। শক্তি পাওয়ার একটাই পথ তপস্যা। ভিক্ষা করলে দুটো টাকা বা এক মুঠো চাল পাবে তার বেশি পাবে না। লাখ টাকা পেতে হলে তপস্যা করতে হবে। ভগবানের সামনে বসে শুধু আমাকে এটা দাও সেটা দাও প্রার্থনা করে গেলে কিছুই পাবে না, কোন দিন কিছু হবেও না। টাইমস অফ ইণ্ডিয়াতে একটা মজার লেখা বেরিয়েছিল, লেখাটির নাম Nine habits of the reach। লেখক ভদ্রলোক অনেক দিন ধরে এর উপর অনেক পড়াশোনা করে একটা পরিসংখ্যান দাঁড় করিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যারা বিশেষ ধনীলোক তারা কি কি করে, তাদের অভ্যাস কি রকম। সেখানে একটা বলছেন, যারা বিশেষ বড়লোক তারা দিনে গড়ে এক ঘণ্টার বেশি টিভি দেখেন না। তাদের প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস, কিন্তু মজা উপভোগ করার জন্য কোন বই পড়ে না, যে বইগুলিতে সার আছে নিয়মিত সেই বইগুলোই পড়বেন। তার মধ্যে মজার একটা হল লটারি, যারা সাধারণ লোক তাদের প্রায় শতকরা সত্তর জন্য লোক লটারিতে টাকা লাগায়, অন্য দিকে ধনীদের মধ্যে শতকরা দুজনও পাওয়া যাবে না যে লটারিতে টাকা লাগাচ্ছে। তার মানে বড়লোকরা কখনই লটারিতে টাকা লাগাবে না, বা যেখানে ভাগ্যের কোন কিছু ব্যাপার আছে সেদিকে তারা যাবেই না। জীবনে কিছু যদি পেতে হয় তাহলে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলে কোন দিন তা আসবে না, কিছু পেতে হল তপস্যা করতে হবে। রাবণ শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য তপস্যা করেছিল, তপস্যার ফলটাও সে পেয়েছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণে যা কিছু আছে সবই বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে এসেছে। আর বাল্মীকি রামায়ণে যা কিছু আছে সবই বেদের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। মহাভারতও বেদের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

বেদের দর্শনের মতে আমার আপনার সবার মূল সত্তা জীবাত্মা, আমরা সবাই জীবাত্মা, ভালো কর্ম করলে জীবাত্মা স্বর্গে যাবে, সেখানে ভোগ করবে, ভালো কর্মের ফল শেষ হয়ে গেলে আবার স্বর্গ থেকে নেমে আসবে। কর্ম যদি ভালো হয় স্বর্গে যাবে, কর্ম যদি একটু কম ভালো হয় পিতৃলোকে যাবে। এই গমনাগমন সব সময় চলতেই থাকবে। সেখান থেকে উপনিষদ এসেছে, উপনিষদ বলল এই গমনাগমনকে বন্ধ করতে হবে। বেদে এই ধারণা থাকার জন্য তখনকার দিনে দুটো জিনিস হত, একটা হল এই জগতকে সত্য মনে করা আর জগতে আমি মরতে চাই না। আমি মরতে চাই না এই ভাবটা চিরদিনের জন্য থেকে গেছে আর বিভিন্ন কাহিনীতে কাউকে যদি মহৎ করতে হত তখন তাকে অমর করে দেওয়া হত। অমর কেউ হতে পারবে না, তাই তুমি এমন কাজ কর যাতে সবাই তোমার কাজের জন্য তোমাকে চিরদিন মনে রাখে, কীর্তিকে অমর করে দেওয়া হত। আর দ্বিতীয় হল স্বর্গ থেকে যেন পতন না হয়। কিন্তু স্বর্গ থেকে পতন হওয়াকে ওনারা কেউ আটকাতে পারলেন না, এমনকি স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রেরও পতন হতে দেখা গেছে। স্বর্গকে কেন্দ্র করে তৃতীয় আরেকটা ব্যাপার এসে গেল, আমি সশরীরে

স্বর্গে যাব। স্বর্গে এই স্থূল শরীরতো যাবে না, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীরটাই স্বর্গে যাবে আর সেখানে গিয়ে আরেকটি শরীর পায়। কিন্তু তাঁদের কাছে এই ব্যাপারটাও এসে গিয়েছিল, আমাকে সশরীরের স্বর্গে যেতে হবে। কিন্তু ইতিহাসে একমাত্র যুধিষ্ঠিরকেই কাহিনীতে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর নহুষকে একবার সশরীরের স্বর্গে পাঠানোর চেষ্টা হয়েছিল, চলেও গিয়েছিল কিন্তু ইন্দ্র এক পদাঘাতে তাঁকে স্বর্গে থেকে ফেলে দিয়েছিলেন।

বেদ মতে জীবনের এই দু-তিনটে উদ্দেশ্য। তুমি শুভ কর্ম কর, শুভ কর্ম করলে স্বর্গে যাবে, স্বর্গে গিয়ে সুখভোগ করবে, আর যেমন তোমার কর্ম হবে সুখভোগের মাত্রা ও স্থায়ীত্বও সেই কর্মানুসারে নির্ধারিত হবে। সেইজন্য দেখা যেত যাঁরা তপস্যাদি করতেন তাঁদের তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল হয় এই পৃথিবীতে নয়তো স্বর্গে এই দুটোর মধ্যে একটাতে বিরাট দীর্ঘস্থায়ী সুখভোগ করা। নচিকেতাকেও যমরাজ বর দেওয়ার সময় এভাবে বর দিচ্ছেন, তুমি পৃথিবীতে যত দিন বাঁচতে চাও ততদিন বাঁচতে পারবে, আর মৃত্যুর পর স্বর্গে যেমন যেমন সুখভোগ করতে চাও সব পাবে। কিন্তু যাঁরা বেদান্ত অধ্যয়ন করতে আসতেন তাঁদের প্রথমেই বলে দেওয়া হত *ইহামুত্রফলভোগবিরাগ*, এখানে এই শরীরে আর মৃত্যুর পরে যে শরীর হবে দুটোর ফলের প্রতি বৈরাগ্য থাকতে হবে। আমাদের দুটি অস্তিত্ব, একটি এই পার্থিব শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আর সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে স্বর্গে। যখনই কোন বর চাওয়ার পরিস্থিতি আসত তখন অবশ্যই এই দুটিকে কেন্দ্র করে বর চাওয়া হত – পৃথিবীতে অমরত্ব কিভাবে পাওয়া যায় আর তা নাহলে শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ কিভাবে পাওয়া যায়।

রাবণের তপস্যার উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করা। রাবণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দিতে চাইলে যথারীতি রাবণ অমরত্ব লাভের বর চাইলেন। ব্রহ্মা বলে দিলেন অমরত্বের বর দেওয়া যাবে না, অমরত্বের বদলে অন্য বর প্রার্থনা করতে বললেন। এই কাহিনীগুলো সবারই জানা। বিভিন্ন কাহিনীতে তপস্যার পর অনেকেই অমরত্বের বর চাইতেন, হিরণ্যকশ্যপুরও অমরত্বের বর চাইলেন, বৃত্রাসুরেরও ইচ্ছে ছিল অমরত্ব লাভ করা। সাধারণত অসুররাই অমরত্ব লাভ করতে চাইত। মানুষ বা দেবতারা এভাবে অমরত্ব চাইত না, যদিও কাহিনীতে কোথাও কোথাও পাওয়া যাবে, কিন্তু এরাই খুব নামকরা যারা অমর হতে চেয়েছে। কিন্তু মর্ত্যলোকে অমরত্ব লাভ করা যাবে না। তখন কিছু কিছু শর্ত সাপেক্ষে এমন বর দেওয়া হত তাতেই তারা মনে করত আমি অমর হয়ে গেলাম। যেমন কোন দেবতা তাকে মারতে পারবে না, যক্ষ, গন্ধর্ব এরা কেউ মারতে পারবে না। এমন কায়দা করা হল যে তারা মানুষ, বানর এদের নাম উল্লেখ করতে যেন ভুলে গেল বা এদেরকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না। এগুলো কাহিনী, কাহিনীতে অনেক কিছুই বানিয়ে দেওয়া যায়। মূল কথা রাবণ এক অতি পরাক্রমশালী, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী রাক্ষস, ফলে প্রচণ্ড দুর্বিনীত আর অহঙ্কারী হয়ে গেছে।

দশরথের পুত্র রূপে চারি অংশে ভগবানের জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার

মানুষেণ মৃতিস্তস্য ময়া কল্যাণ কল্পিতা।
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি দেবরিপুং বিভো।।১/২/২৬।।

ব্রহ্মা বলছেন, আমি বর দিয়েছি ঠিকই কিন্তু রাবণের মৃত্যু মানুষের হাতেই নির্ধারিত করে রেখেছি। হে প্রভু! দেবতাদের শত্রু রাবণের মৃত্যু মানুষের হাতেই হবে। তাই বলে যে কোন মানুষ তো রাবণকে বধ করতে পারবে না, তাকেও সেই রকম পরাক্রমশালী মানুষ হতে হবে। ব্রহ্মার কথা শোনার পর ভগবান বললেন, চিন্তা করার কিছু নেই আমিই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে যাব। অনেক আগে কশ্যপ মুনির তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাঁকে বরদান করতে চাইলে তিনি আমাকে পুত্র রূপে লাভ করার প্রার্থনা করেছিলেন। এখান থেকে বেদ আর পুরাণ আলাদা রূপ নিতে শুরু করে, এমনিতে আলাদা করা খুব মুশকিল। বেদে বিষ্ণু একজন দেবতা, বিষ্ণুর বৈশিষ্ট্য হল তিনি অনেক রকম রূপ ধারণ করতে পারেন, তাঁর নামই ঊরুক্রম। তিনি বিরাট বড় হয়ে যেতে পারেন আবার অনেক ক্ষুদ্র হয়ে যেতে পারেন। কশ্যপ মুনির চৌষট্টি জন স্ত্রী ছিল, চৌষট্টি জন স্ত্রীদের থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন কদ্রু থেকে নাগদের সৃষ্টি, বনিতা থেকে গরুড় জাতীয় পাখির সৃষ্টি হয়েছে, কুকুর জাতীয় পশুরা সরমা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আবার অদিতি থেকে আদিত্য অর্থাৎ দেবতাদের জন্ম, দিতি থেকে দৈত্য এবং দনু থেকে দানবদের জন্ম হয়েছে। চৌষট্টি জন স্ত্রীরা সবাই বোন, একই বাবা-মার সন্তান। বেদে বিষ্ণু একজন যজ্ঞাভিমানী দেবতা কিন্তু পুরাণে এসে বিষ্ণুকে বেদের পুরুষসূক্তমে যে পুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে, যে পুরুষকে ভগবান রূপে দেখানো হয়েছে সেই পুরুষের সাথে এক করে দেওয়া হয়েছে। দৈত্য বংশের বলিরাজা

এক সময় খুব শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। বলিরাজের শক্তি ও প্রতাপকে খর্ব করার জন্য এক বলবান সন্তান ধারণ করার ইচ্ছা করে অদিতি ও কশ্যপ মুনি ঘোর তপস্যা করলেন। তখন বিষ্ণু দেবতা বামন রূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করলেন। বামন দেবতাই বলিরাজার দর্প চূর্ণ করেছিলেন।

স ইদানীং দশরথো ভূত্বা তিষ্ঠতি ভূতলে।
তস্যাহং পুত্রতামেত্য কৌসল্যায়্যং শুভোদয়ে।।১/২/২৮।।
চতুর্ধাত্মানমেবাহং সৃজামীতরয়োঃ পৃথক্।
যোগমায়াপি সীতেতি জনকস্য গৃহে তদা।।১/২/২৯
উৎপৎস্যতে ময়া সার্দ্ধং সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্।
ইত্যুক্তান্তর্দধে বিষ্ণুর্ব্রহ্মা দেবানথাব্রবীৎ।।১/২/৩০।।

কশ্যপ মুনি ও অদিতি পরে আবার তপস্যা করলেন আমাকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন। গর্ভে সন্তান ধারণ করার সময় সব মায়েরাই কামনা করে আমার সন্তান এক বিশেষ সন্তান হবে, রূপে গুণে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ হবে। যাই হোক ভগবান বলছেন কশ্যপ আর অদিতি তপস্যা করে আমাকে সন্তান রূপে প্রার্থনা করলেন। বর্তমানে কশ্যপ আর অদিতি অযোধ্যায় রাজা দশরথ আর তার তিন রানীর শরীর ধারণ করে অবস্থান করছেন, তাদের মধ্যে প্রধান রানী কৌশল্যা। আমি কশ্যপের পুত্রত্ব স্বীকার করে কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার গর্ভে চারটি অংশে পৃথক পৃথক রূপে অবতীর্ণ হব। অন্য দিকে আমার যে যোগমায়া, রাজা জনকের গৃহে সীতা নামে আবির্ভূতা হবেন, আমি তাঁর সাহায্যে সমস্ত কার্য সাধন করব। এখানে যোগমায়া শব্দ পুরাণে প্রবেশ করে গেল। এই জিনিসটাকেই বলা হয় লীলা, লীলা মানে যা কিছু হচ্ছে ভগবান তা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। আমি এভাবে জন্ম নেব, সীতা সেই ভাবে জন্ম নেবে, তারপর এই গোলমাল হবে, সেই গোলমাল হবে। প্রথম নাটক দেখলে আমরা জানি না নাটকের কাহিনী কিভাবে এগোবে, কিন্তু নাটকের যিনি পরিচালক বা লেখক তিনি জানেন কাহিনীর গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কাহিনী, এই কাহিনীর লেখক ভগবান নিজে, সেইজন্য বলছেন লীলা। লীলা বলতে আমরা যেভাবে মিথ্যা মনে করি, জিনিসটা তা নয়। লীলা মানে যা হতে যাচ্ছে সবটাই তাঁর জানা, ভগবানের একটি নাম কবি, কবির অর্থ ত্রিকালদর্শী, সবটাই তিনি জানেন।

ভগবানের কথা শোনার পর ব্রহ্মাও বুঝে গিলেন কি হতে যাচ্ছে। ব্রহ্মা তখন সব দেবতাদের বলে দিলেন, তোমার সবাই গিয়ে বানর বংশে জন্ম গ্রহণ কর যাতে তোমরাও ভগবানের কার্যে সহয়তা করতে পার। দেবতারা তাঁদের দেব শরীরে ভগবানকে সাহায্য করতে পারবেন না, তাই সব দেবতারা গিয়ে বানর, ভল্লুক শরীর নিয়ে জন্ম নিতে শুরু করলেন। এখানেই দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ হয়ে যায়।

শ্রীরাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম

তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানের জন্ম কথা বলা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের বৈশিষ্ট্য হল, কাহিনীকে অতি সংক্ষেপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্যান্য যেসব কাহিনী বাল্মীকি রামায়ণে পাওয়া যায় সেই কাহিনীগুলিকেও ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ শুধু মাত্র রামকথাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন। রাজা দশরথের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু এখনও কোন সন্তান হয়নি। অযোধ্যার রাজপুরোহিত ছিলেন বশিষ্ঠ। ইনি কোন বশিষ্ঠ ছিলেন আমাদের জানা নেই, কারণ বশিষ্ঠ একটি বংশেরও নাম। পৌরাণিক কাহিনীতে একই বংশের বিভিন্ন চরিত্রকে একটি চরিত্রে উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বশিষ্ঠ ছিলেন জ্ঞানী পুরুষ। রাজা দশরথের সন্তান হচ্ছিল না, বশিষ্ট মুনি রাজা দশরথকে বললেন যদি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা যায় তো ভালো হয়। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বেদের খুব নামকরা যজ্ঞ, যে যজ্ঞ করলে সন্তান পাওয়া যায়, শুধু সন্তানই নয় সর্বগুণসম্পন্ন সন্তান পাওয়া যায়। তবে শুধু যজ্ঞ করলেই যজ্ঞের ফল পাওয়া যাবে না, যজ্ঞের যিনি পুরোহিত হন, যজ্ঞে তাঁর চরিত্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিক থাকে। তাঁর চরিত্র যদি শুদ্ধ পবিত্র না থাকে তাহলে যজ্ঞের ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। বশিষ্ঠ মুনি তখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নাম সুপারিশ করে বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে এই যজ্ঞের পুরোহিত করে নিয়ে আসা হোক। ঋষশৃঙ্গ মুনির পিতার নাম ছিল বিভাণ্ডক মুনি। মহাভারত এবং বাল্মীকি রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বিরাট লম্বা কাহিনী আছে। সংক্ষেপে কাহিনী হল, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়েছিল এক হরিণীর গর্ভ থেকে। শৈশবে তাঁর দুটো শিং ছিল বলেই হয়ত তাঁর

ঋষ্যশৃঙ্গ নাম হয়েছে। কিন্তু তিনি ছিলেন বিরাট উচ্চমানের এক ঋষি। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে আসা হয়েছে, উনিও যজ্ঞ শুরু করেছেন। যজ্ঞ যখন শেষ হয়ে গেছে তখন বলছেন –

শ্রদ্ধয়া হূয়মানেহগ্নৌ তপ্তজাম্বুনদপ্রভঃ।
পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যবাট্।।১/৩/৯।।

যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করার পর তপ্তকাঞ্চনবর্ণের হব্যবাহন যজ্ঞের অগ্নি থেকে বেরিয়ে এলেন। অগ্নিদেবতাকে হব্যবাহন বলা হচ্ছে। কারণ অগ্নিদেবতা যজমান আর দেবতাদের মধ্যে সংযোগকারী, যজমান দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে যা আহুতি প্রদান করেন অগ্নিদেবতা সেই আহুতি দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেন, আর দেবতারা খুশী হয়ে যজমানকে যা বর প্রদান করেন সেই বর তাঁরা অগ্নির মাধ্যমে দেন। সেইজন্য তাঁকে বলছেন হব্যবাহন। অগ্নিদেবতা স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছেন, এগুলো কাহিনী, আমরা সংক্ষেপে কাহিনী বলে যাব। সেই পায়েস নিয়ে অগ্নিদেবতা রাজা দশরথকে বললেন তোমার রানীদের এই পায়েস খাইয়ে দাও, এতে তাদের সন্তান হবে। দ্রৌপদীর জন্মের সময় একটু অন্য রকম হয়েছিল। সেখানে যজ্ঞের আহুতি তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেটাও একটা পবিত্র পায়েসের মত জিনিস ছিল। ওই পায়েসকে ধারণ করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, তখন দ্রুপদ রাজার স্ত্রীকে ডাকা হল যাতে সে এসে এই পায়েস খেয়ে নেয়। তখন দ্রুপদ রাজার স্ত্রী বলে পাঠালেন, আমি এখন আসতে পারছি না, আমার মুখে পান দিয়েছি আর অঙ্গরাগে ব্যস্ত আছি। পুরোহিতরা তখন বললেন, আর অপেক্ষা করা যাবে না, এই পবিত্র পায়েসকে ধারণ করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিতরা তখন যজ্ঞের অগ্নিতে সেই পায়েস ঢেলে দিলেন। তারপর সেই যজ্ঞের অগ্নি থেকেই ধৃষ্টদ্যুম্ন আর দ্রৌপদীর জন্ম হল।

কৌশল্যা ছিলেন জ্যেষ্ঠা, তিনি পাটরানী আর ধর্মপত্নী আর কৈকয়ী যদিও কনিষ্ঠা কিন্তু অত্যন্ত রূপসী আর বয়স কম ছিল বলে রাজা দশরথের আসক্তিটা কৈকেয়ীর প্রতিই বেশি ছিল। তিনি সেই পায়েসকে দুটো ভাগে ভাগ করে এক ভাগ কৌশল্যাকে আরেক ভাগ কৈকেয়ীকে দিলেন। মাঝখান থেকে সুমিত্র পায়েস পেলেনই না। বিভিন্ন রামায়ণে বিভিন্ন ভাবে কাহিনী সাজান হয়েছে। তখন কৌশল্য আর কৈকেয়ী তাঁরাও তাঁদের পায়েসের অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন। যার জন্য কৌশল্যা আর কৈকেয়ী একটি করে পুত্র সন্তান আর সুমিত্রা দুটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে কৌশল্যার পুত্রের জন্ম হয়েছিল। পুত্রের জন্ম হওয়ার পর কৌশল্যা দেখছেন –

নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।১/৩/১৮।
জলজারুণনেত্রান্তঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।

বিভিন্ন পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর রূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, এখানেও সেই ভগবান বিষ্ণুর রূপের বর্ণনা করছেন। নীলকমল পাপড়ির যে রঙ তাকে বলা হয় শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণ বলতে আমরা যে কালো মনে করি আসলে তা কালো নয়, শ্যামবর্ণ হল কিছুটা সবুজ আর একটু নীল বর্ণের মাঝামাঝি। দুর্বাঘাসের প্রথম কচি পাতা বেরোবার সময় যে রঙ থাকে ওই রঙটাই ঠিক ঠিক শ্যামবর্ণ। সবুজ, নীল আর কালো এই তিনটে রঙের সাথে মিল থাকে বলে পরিষ্কার করে বলা যায় না শ্যামবর্ণের আসল রঙটা কি রঙের। নীলপদ্মের পাপড়ির রঙ শ্যামবর্ণের হয়। বলছেন তাঁর শরীরের বর্ণ নীলপদ্মের শ্যামবর্ণ। সিনেমা টিভিতে ভগবানকে দেখানোর সময় তাঁর সারা শরীরটা নীল রঙ দিয়ে ছুপিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর রঙ ওই নীল নয়, আমরা যেটা ফর্সা বলি সেই ফর্সাও নয়, আর শ্যামবর্ণ বলতে সচারচর যে রঙকে দেখাই সেই রঙও নয়, একটু যেন কালো মিশে যায়। সেইজন্য সবুজ, না নীল, না কালো কোনটাই আলাদা করে বোঝা যায় না, বলে নাকি খুব সুন্দর রঙ, কিছু কিছু মানুষের এই রঙ থাকে, গৌরবর্ণের কিন্তু সবুজ, নীল আর কালোর মাঝখানের বর্ণ। তারপরে বলছেন তাঁর পরিধানে পীতবসন, চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। সেই পরমাত্মাকে দর্শন করে কৌশল্যা হর্ষ ও আকুল হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবানের স্তুতি করতে শুরু করলেন। ভাগবতেও দেবকী শ্রীকৃষ্ণেকে জন্ম দেওয়ার পর এই একই দৃশ্য দেখে একই ভাবে স্তুতি করলেন আর ভগবানও সেই একই কথা দেবকীকে বলছেন। এখানে কৌশল্যা স্তুতি করে বলছেন –

<u>কৌশল্যা কৃত স্তুতি</u>

দেবদেব নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর।
পরমাত্মাচ্যুতোহনন্তঃ পূর্ণস্তং পুরুষোত্তম।১/৩/২৩

হে শঙ্খচক্রগদাধর দেবাদিদেব আপনাকে নমস্কার করি। বেদে এই ধারণা কখন ছিল না যে ভগবানের চার হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আছে, এটাই পৌরাণিক ধারণা। ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তরা এই চারটে জিনিসকে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করেন। পুরুষোত্তম, আপনি পুরুষের মধ্যে উত্তম। বেদে পুরুষের কথা বলার সময় বা ইন্দ্রের স্তুতি করার সময় যে ধারণাগুলো নিয়ে চলে এসেছে এখানেও সেই একই জিনিস চলছে। আত্মা অনেক রকমের হয়, আত্মার সব থেকে স্থূলতম রূপ মানুষ যখন নিজের সন্তানকে নিজের আত্মা বলে মনে করে। সেখান থেকে আরেকটু কম স্থূল যখন বলে আমার দেহটাই আমার আত্মা। বেশির ভাগ মানুষ নিজের শরীরকেই আত্মা বলে মনে করে। সেখান থেকে আরেকটু গভীরে গিয়ে চিন্তন করে মনকে আত্মা মনে করে, প্রাণকে আত্মা মনে করে। নিজেকে সর্বব্যাপী আত্মা মনে করা খুবই বিরল। কৌশল্যা বলছেন, আপনি পরমাত্মা, আপনিই শেষ। সর্বব্যাপী যে আত্মা আপনি তাই, আর আপনি অচ্যুত, আপনার স্থিতি থেকে কখন আপনি চ্যুত হন না। অচ্যুত, অনন্ত এগুলো পরমাত্মার স্বভাব, অচ্যুত মানে যাঁর কোন ধরণের পরিবর্তন হয় না। যেমন জল কখন নোংরা হবে, কখন পরিষ্কার হবে, কখন বাষ্প হবে, কখন বরফ হবে, কিন্তু আত্মার অবস্থার কোন চ্যুতি হয় না। অনন্ত, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তিনি নেই। পূর্ণঃ, যিনি অনন্ত তিনিই পূর্ণ, যেটা অপূর্ণ সেটাই সীমিত। যিনি পূর্ণ তিনি সব দিক থেকেই পূর্ণ।

বদন্ত্যগোচরং বাচ্যং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্।
ত্বাং বেদবাদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্।১/৩/২৪

বেদবাদীরা, বেদের পণ্ডিতরা, যাঁরা বেদের সার জেনে গেছেন তাঁরা আপনাকে *অগোচরম্* বলেন। গোচর মানে যেখানে গবাদি পশুরা চারণ করে। ইন্দ্রিয়কে বলা হয় গো, ইন্দ্রিয়গুলি এই জগতে চরে বেড়াচ্ছে। কৌশল্যা বলছেন, বেদবাদীরা বলেন আপনি ইন্দ্রিয়ের চর নন। মাঠে যেমন গরুরা চরে বেড়ায়, ঠিক তেমনি এই জগতটা হল গোচরণ, যেখানে ইন্দ্রিয়গুলি চরে বেড়াচ্ছে। তার মানে ইন্দ্রিয় এই জগতের বস্তুকে জানতে পারে। চোখ যত দূর যেতে পারবে, তা মাইক্রোস্কোপ দিয়েই হোক আর টেলিস্কোপ দিয়েই হোক, যেটা দিয়েই যাক না কেন চোখ ইন্দ্রিয় দিয়ে সব কিছুকে জানা যাবে। এইভাবে সব কটি ইন্দ্রিয় দিয়ে জগতের সব কিছুকে জানা যায়। কিন্তু ভগবানকে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই জানা যাবে না। *বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ম্*, বুদ্ধিও একটি ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেও ভগবানকে জানা যাবে না। ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, বুদ্ধি দিয়েও জানা যাবে না। কোন কিছু দিয়েই যদি না জানা যায় তাহলে কি হবে? এই ভাবটাই অধ্যাত রামায়ণের বৈশিষ্ট্য, এই ভাবটাই অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকবে।

সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহম্, ভগবানের একটা নাম সচ্চিদানন্দ বা সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্। সত্তামাত্রম্, তিনি আছেন এই এতটুকুই বোধ করা যায়, তার বেশি আর কিছু বোধ করা যায় না। আর জ্ঞানের তিনি বিগ্রহ। কারণ যেটাই সৎ সেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ। তিনি সত্তামাত্রম্, ভগবানের অস্তিত্ব একেবারে শুদ্ধ অস্তিত্ব, ওই অস্তিত্বের কোন পরিবর্তন হয় না। তাহলে তিনি কি নিশ্চল জড় পদার্থ? না, তিনি *জ্ঞানৈকবিগ্রহম*। পুরাণে প্রচুর বিশেষণ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বেদে শুধু জিনিসটা বলে বেরিয়ে যাবে। পুরাণ হল সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ লোক বিশেষণ ছাড়া চলতে পারবে না। বিশেষণ যত বাড়ানো হবে সাধারণ মানুষ তত সেটাকে গ্রহণ করতে পারে। বাচ্চারা যখন কোন কিছুর বর্ণনা দেবে তখন হাত, পা বাড়িয়ে, চোখ মুখ বড় করে বলতে থাকবে, ও মনে করছে আমি যে বর্ণনা দিচ্ছি সেটা যেন কম পড়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে গেলেও মানুষের একই জিনিস থেকে যায়, অন্যান্য জিনিসের ব্যাপারে যখন কিছু বলতে যাবে তখন তাতে একগাদা বিশেষণ লাগাতে থাকে। শুধু বিশেষণেই হয় না, গুরুত্ব বাড়াবার জন্য ক্রিয়াকেও বিশেষ করে দেওয়া হয়, যেমন ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে, সেটাকে একটু বাড়িয়ে বলবে ঘোড়া দ্রুত ছুটে যাচ্ছে, ঘোড়া অতিদ্রুত ছুটে যাচ্ছে, এভাবে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত বিশেষণ ভাষাকে নষ্ট করে দেয়। যত উচ্চমানের লেখক হবেন তত তিনি বিশেষণ কম ব্যবহার করবেন। আর ভালো লেখকের কাছে ক্রিয়ার বিশেষণ শত্রু। সংস্কৃত সাহিত্য দাঁড়িয়ে আছে বিশেষণের উপর, সেইজন্য ভারতের বাইরে

কেউ আমাদের সাহিত্য পড়ে না। এক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া ভারতের কেউ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেলেন না। আমাদের এত লেখক, এত সাহিত্য থাকতে আর কেউ নোবেল প্রাইজ পাচ্ছেন না। ভারতীয় সাহিত্যের লেখাগুলো ভালো করে দেখুক, সাহিত্য যে একটা ভাবকে বিচারকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে সে ভাব শুধু বিশেষণ আর ক্রিয়া বিশেষণের চাপে পড়ে হাঁফাচ্ছে। কোন সাহিত্য যখন সৃষ্টি হয় তখন তাতে দুটো জিনিস চলতে থাকে, একটা বিচার আর দ্বিতীয় শব্দ। যে কোন কৃতীকে যদি মহৎ হতে হয় তাহলে ওর মধ্যে বিচার থাকতে হয়, ওর মধ্যে যত শব্দের বোঝা চাপান হবে তার মধ্যে বিচার তত ছটফট করতে শুরু করবে। আর ওই শব্দের সাথে যদি বিশেষণ আর ক্রিয়া বিশেষণ দিয়ে দেয় তাহলে বিচার ওর মধ্যেই মুখ থুবড়ে পড়বে, সাহিত্যও ওখানেই শেষ। হিন্দী কবিতায় শুধু বিশেষণই থাকে। নায়িকার বর্ণনা করতে গিয়ে কত শব্দ, শব্দের অলঙ্কার, সেই অলঙ্কারের আবার অলঙ্কার, তাঁরা আবার বলবেন সাহিত্যর রস আস্বাদন করছি। সেক্সপিয়ারাদিরাও নায়িকার বর্ণনা করছেন, কিন্তু একটা কি দুটো শব্দ, আর এমন একটা শব্দ নিয়ে আসছেন, ওই একটা শব্দ দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়ে যাচ্ছে। অতি প্রাকৃত ধরণের লোকেরাই এইসব বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পুরাণ সাহিত্যেরও এই এক সমস্যা। ভগবানকে যখন নিয়ে আসে তখন সেখানে এক গাদা বিশেষণ আর ক্রিয়া বিশেষণ নিয়ে আসে। বেদ, বিশেষ করে উপনিষদ, গীতার যে এত কদর তার একটাই কারণ, এনারা শুধু শুদ্ধ বিচার নিয়ে চলেন। এরপর যত স্তুতি আসবে পুরো অধ্যাত্ম রামায়ণে বিশেষণ আর ক্রিয়া বিশেষণের ব্যাপারটা চলতে থাকবে। সাধারণ লোকদের জন্য ঠিক আছে, কারণ সাধারণ লোক যখন ভগবানের কথা চিন্তা করবে তখন তাকে একটা শব্দ দিয়ে ধারণা করানো যাবে না, তাকে অনেকগুলো শব্দ দিতে হবে। জমিদারের ছেলেকে স্কুলে পড়তে পাঠানো হয়েছে। স্কুলে একদিন ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল। জমিদার মশাইও গেছেন ছেলে ফুটবল খেলবে, দেখতে হবে। একটা ফুটবলকে নিয়ে বাইশটা ছেলে মিলে খেলছে। জমিদার মশাই জানতেনই না ফুটবল খেলাটা কি জিনিস। দেখে তার মনে খুব কষ্ট হয়েছে। আমার ছেলে, আমার মত এত বড় জমিদারের ছেলে হয়ে একটি বলের জন্য একুশটা ছেলের সাথে দৌড়াচ্ছে! এক্ষুণি আরও একুশটা বল কিনে এনে মাঠে সবাইকে দিয়ে দাও। জমিদারের হুকুম, তার টাকার উপর স্কুল দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আরও একুশটা বল কিনে এনে মাঠে ফেলে দেওয়া হল। এনাদেরও এই সমস্যা। একটা শব্দ নিয়ে খেলা চলবে না, বাইশটা শব্দ চাই। যাই হোক কৌশল্যা স্তুতি করে বলছেন –

ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ।
সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ সূর্য্য এবামলঃ সদা।১/৩/২৫

ঈশ্বরের যা যা গুণ হতে পারে সবই দেখাচ্ছেন। তিনিই যখন অবতার রূপে আসেন তখনও এই একই গুণ তাঁর মধ্যে চলতে থাকে। এই ভাব একই থাকবে, কিন্তু বার বার সেই ভাবকে এনে আমাদের মাথায় বসানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বলছেন, আপনি নিজের মায়ার দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি করেন আবার এই বিশ্ব সংহার করেন। *সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ*, এই সংসার সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটি গুণের সংযোগে রচিত হয়, এই তিনটে গুণের পারে যে তুরীয়, আপনি সেই তুরীয় অবস্থায় সদা সর্বদা বিরাজ করে আছেন। তিনটে অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থার পারে যে অবস্থা সেই অবস্থাকেও তুরীয় অবস্থা বলে। হিন্দু ধর্মকে যদি বুঝতে হয়, হিন্দু ধর্মের ভাবকে যদি ধরতে হয়, ভক্তি তত্ত্ব যদি বুঝতে হয়, তাহলে সব থেকে কঠিন হল এই শ্লোকটি। এই শ্লোকের ভাব গীতাতেও কয়েকবার এসেছে, কথামৃতেও ঘুরে ঘুরে আসে আর যে কোন ভক্তিশাস্ত্রে ঘুরে ঘুরে আসবে, আর জ্ঞানমার্গের শাস্ত্রে বিশেষ করে উপনিষদে এই ভাব এক বিরাট বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যিনি সচ্চিদানন্দ, যিনি তুরীয়, তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার পারে, সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণেরও পারে। পারে বলতে ঠিক কি বোঝায় এটাই আমাদের মাথায় ঢুকতে চায় না। যদি ধরেও নিই, আচ্ছা বুঝলাম কিছু একটা আছে যিনি শুদ্ধ চৈতন্য। এখন যিনি সৃষ্টি করছেন, যেটা তাঁর স্বভাবেই নেই, সেই স্বভাবটা এখানে কি করে ঢুকছে, অথচ বলছেন এই স্বভাব তাঁর মধ্যেই রয়েছে। ঠাকুর কত উপমার সাহায্যে এই ভাবকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। যেমন বলছেন সাপের মুখে বিষ আছে সেই বিষে সাপের কিছু হয় না, কিন্তু অপরকে কামড়ালে তার ক্ষতি হয় বা বলছেন মাকড়সা তার ভেতর থেকে জাল বার করে আবার তার ভেতর গুটিয়ে নেয়।

একদিকে তিনি সত্তামাত্রম্, শুধু মাত্র শুদ্ধ অস্তিত্ব বা শুধু জ্ঞানবিগ্রহ, অন্য দিকে যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, সেখান থেকে এত বিভিন্নতা কি করে সম্ভব? এটাই বিরাট সমস্যা রূপে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায়, এই জিনিসটাকে তাই ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। সমাধিবান পুরুষ ছাড়া এই জিনিসকে কেউ বুঝতে পারেন না। শাস্ত্রাদি

অধ্যয়ন করে আমরা মুখে অনেক কথাই বলে দিতে পারি, তিনি অমুক, তিনি তমুক, কিন্তু চৈতন্য থেকে জড়ের সৃষ্টি কিভাবে হয় এটাকে ঠিক ঠিক ধারণা করা খুব কঠিন। ঠাকুর বলছেন, সমুদ্রের ফেনা কিভাবে কঠিন পদার্থ হয়ে যায়। ঠাকুর উপমা দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, প্রত্যেক জিনিসের রূপান্তর হওয়ার একটা পদ্ধতি আছে, এখানেও নিশ্চয় কোন পদ্ধতি আছে। উপমা দিয়ে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যদি কাউকে বলা হয় বাষ্প যা আর বরফ যে এত শক্ত সেটাও তাই। বাষ্প সব সময় দেখাও যায় না, আর বরফ ছুড়লে মাথা ফেটে যাবে। দুটো একই জিনিস, দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎ হল তাপের মাত্রাতে, তাপ মানে শক্তি। বাষ্প আর বরফে যে রূপান্তর হয় এই রূপান্তর বাস্তব। সচ্চিদানন্দের ক্ষেত্রে এই রূপান্তরটা বাস্তব নয়, আপাতদৃষ্টিতে মনে করছি রূপান্তর হচ্ছে। রূপান্তর হচ্ছে আবার হচ্ছেও না। কেন হচ্ছে না? কারণ যিনি অনন্ত তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। অথচ পরিবর্তন আমরা দেখছি। সেইজন্য শব্দ যেটা ব্যবহার করা হয় তা হল মায়া। মায়া শব্দ এই জন্য ব্যবহার করা হয় যে, আছে অথচ নেই। সত্যিই ধারণা করা খুব কঠিন। শুনতে শুনতে নিজের মনের জগতে একটা ভাব তৈরী করে নেওয়া হয়, সেই ভাবরাজ্যে ঢুকে আরও গভীরে চিন্তন মনন করতে করতে একটা ধারণা তৈরী হয়। *সত্ত্বাদিগুণসংযুক্ত সূর্য্য এবামলঃ সদা*, আপনার মধ্যে কোন মল নেই, আপনি অমল, সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটেই মল। আপনি সূর্যের মত সদা নির্মল তাই এই গুণ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেইজন্য কি হয়, আগের ওই একই ভাব আবার ঘুরে বলছেন –

করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি।
ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি।১/৩/২৬

এই ভাবটাই আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্রে আসতে থাকে। *করোষীব ন কর্ত্তা*, মনে হচ্ছে যেন আপনি করছেন, কিন্তু আপনি কর্তা নন, *গচ্ছসীব ন গচ্ছসি*, মনে হচ্ছে আপনি যাচ্ছেন কিন্তু আপনি চলেন না, মনে হচ্ছে আপনি শুনছেন আসলে আপনি শুনছেন না, ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে আপনি দেখছেন আসলে আপনি দেখছেন না। এ তো অদ্ভূত ব্যাপার! কি করে এই জিনিস সম্ভব? গীতায় আচার্য শঙ্কর খুব সুন্দর বলছেন, নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব। কোন জিনিসই নিজের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। যেমন আমার ডান হাত দিয়ে আমি সারা জগতকেই ধরে নিতে পারি কিন্তু আমার ডান হাতকে কোন দিনই ধরতে পারব না। চোখ দিয়ে দুনিয়ার সব কিছু দেখতে পারি কিন্তু নিজের চোখকে দেখতে পারব না। আপনি বলবেন, কেন আয়নাতে আমার চোখকে দেখতে পারি। কিন্তু আয়নাতে চোখকে দেখা হয় না, চোখের প্রতিবিম্বকে দেখা হয়। এটাই নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব। সচ্চিদানন্দ ছাড়া তো আর কিছু নেই, নিজের উপর ক্রিয়ার যদি অভাব হয় তাহলে সচ্চিদানন্দ চলবেন কোথায়! সচ্চিদানন্দকে যদি চলতে হয় তাহলে নিজের উপরেই চলতে হবে। নিজের উপরে কি করে হাটবেন! আপনি নিজের উপর হাটতে পারবেন না। আপনি ছাড়া তো আর কেউ নেই, তাই আপনি কাকে দেখবেন! আপনি ছাড়া কেউ নেই, আপনি কাকে শুনবেন! আমরা ঠাকুরকে মানুষ রূপে দেখছি বলে মনে করছি তিনি শুনছেন। ঠাকুরকে আমরা মানবীকরণ করে সব কিছু করছি, কিন্তু তিনি তো মানুষ নন, তিনি অনন্ত। এখন আপনি শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষ রূপে দেখছেন কি অনন্ত রূপে দেখছেন সেটা আপনার সমস্যা। অনন্ত রূপে দেখলে নিজের উপর ক্রিয়ার অভাব হয়ে যাবে। মানুষ রূপে দেখলে তিনি চলেন, তিনি শোনেন, তিনি দেখেন, সব ক্রিয়াই এসে যাবে। আর বলছেন –

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুদ্ধ ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নাপি ন লক্ষ্যসে।১/৩/২৭
অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত এব সুমেধসাম্।
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ।১/৩/২৮

বেদ, উপনিষদ আপনাকে বলছেন *অপ্রাণো*, অপ্রাণো যাঁর প্রাণ নেই। এখানে নিষ্প্রাণ বলছেন না, বলছেন *অপ্রাণঃ*, অর্থাৎ প্রাণের অভাব। মুণ্ডকোপনিষদেও বলছেন *অপ্রাণো হ্যমনাঃ*, প্রাণন ক্রিয়ার অভাব। ঠিক তেমনি *অমনাঃ*, মনের অভাব, মননক্রিয়ার অভাব। জীবনের দুটো প্রধান ধর্ম ক্রিয়া আর চিন্তন। কারুর মধ্যে যদি প্রাণ আছে বলা হয় তখন তার মধ্যে দুটো জিনিস থাকতে হবে, মস্তিষ্ককে কাজ করতে হবে আর তার হৃদয় কাজ করবে, হৃদয়ের কাজ থেকে হয় ক্রিয়া, সেখান থেকে বাকি সব ক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ আর হৃদয়ের কাজ বন্ধ মানে মৃত। হৃদয়ের ক্রিয়াকে বলছেন প্রাণন আর মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে বলছেন মনন। যাঁর মধ্যে এই দুটো

জিনিসের অভাব, তিনি *অপ্রাণঃ* আর *অমনাঃ*, এরপর আমরা কি করে বলব ভগবান এই করেন, সেই করেন। মনে হয় যেন তিনি করেন। ভগবান হলেন *অক্রিয়ঃ*, কিন্তু ভক্ত মনে করে তিনিই সব করছেন, সেইজন্য এইভাবে বলতে হয়। আপনি সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করছেন, কিন্তু যারা অজ্ঞানী তারা আপনাকে দেখতে পায় না। অজ্ঞানের মধ্যে যারা পড়ে আছে তারাই দেখে যে ভগবান এটা করছেন, সেটা করছেন। আপনার উদরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অণুর মত বিদ্যমান। এই কথা আমরা কি ধারণা করতে পারি! আমরা যদি খুব জোর বলি, হে ভগবান! আপনার যে উদর তাতে কোটি কোটি তারা অণুর মত বিদ্যমান। এখান থেকে আমরা কল্পনা করে নিতে পারি, এই যে বিরাট আকাশ দেখছি এটাই ভগবানের উদর, সেই উদরে আকাশের তারাগুলো অণুর মত ছড়িয়ে আছে। এখানে তা বলছেন না, এই যে ব্রহ্মাণ্ড এই ব্রহ্মাণ্ড একটা অণুর মত। আর এই অণুর মত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনার উদরে বিদ্যমান। আর আশ্চর্যের কি?

ত্বং মমোদরসম্ভূত ইতি লোকান বিড়ম্বসে।
ভক্তেষু পারবশ্যং তে দৃষ্টং মেহদ্য রঘুদ্বহ।১/৩/২৯

সেই ভগবান আমার উদর থেকে জন্ম নিচ্ছেন। এটাই মায়া, এটাই লীলা। মায়া, মোহ বলতে আমরা যা বুঝি, মায়া তা নয়। মায়া মানে, মায়া অসম্ভব জিনিসকে করে দেয়। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রেখে ঠাকুরের উপর চিন্তা করছি। যারা ঠাকুরের ভক্ত, ঠাকুরের মন্ত্রে যারা দীক্ষিত, তারা ঠাকুরের সম্বন্ধে উচ্চতম কি চিন্তা করছেন? ভগবান চিন্তা করছেন। ভগবান মানেই তো দৃশ্য অদৃশ্য সব কিছু তাঁর মধ্যে অণুর মত বিরাজ করছে। আমরা তো আর বৃহৎএর চিন্তা করতে পারব না, আমাদের কল্পনা ছোটই হবে। ঠাকুরই বলছেন অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে। ওই ব্রহ্মাণ্ড কোথায় আছে? ভগবানের শরীরের মধ্যেই আছে। সেইজন্য পুরুষসূক্তমে বলছেন *সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ*, ওই একই কারণে বলছেন। সেই ঠাকুর কামারপুকুরে চন্দ্রামণি দেবীর উদরে গিয়ে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রামণি দেবীর যখন শরীর চলে যাচ্ছে, মাকে প্রণাম করে ঠাকুর বলছেন, হে জননী! তুমি কে ছিলে যে তুমি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলে। এগুলো চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। এই আশ্চর্যের কথাই কৌশল্যা বলছেন, হে ভগবান! যাঁর উদরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অণুর মত বিদ্যমান, সেই তিনি আমার উদরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কৌশল্য তখন স্তুতি করে বলছেন –

সংসারসাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু
ভ্রমামি মায়য়া তেহদ্য পাদমূলমুপাগতা।১/৩/৩০।

কৌশলা বলছেন আমি পতি, পুত্র, টাকা-পয়সার এই মায়ার মধ্যে পড়ে আছি, আমার তাই কী সৌভাগ্য আপনার চরণকমলের দর্শন পেলাম। তখনও কৌশল্যার পুত্র নেই, এটাকে স্তুতি রূপে বলা হচ্ছে বা বলা যায় পুত্র চিন্তা রূপে। কৌশল্যা স্তুতি করার পর ভগবানকে প্রার্থনা করে বলছেন, হে ভগবান! আপনার এই অলৌকিক রূপ সম্বরণ করুন আর সুকোমল বাল রূপে আসুন। তখন ভগবান কৌশল্যাকে বলছেন, তুমি এর আগে অনেক তপস্যাদি করেছিলে তাই আমি তোমার গর্ভে এসেছি। আর আমাদের উভয়ের এই কথোপকথন যে ব্যক্তি পাঠ বা শ্রবণ করবে, মৃত্যুকালে তার মনে আমার স্মৃতি জাগরুক থাকবে আর আমার সারূপ্য লাভ করবে। মৃত্যুর সময় যদি শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি থাকে তাহলে তো সে মুক্তি পাবেই, কারণ মৃত্যুর সময় যে ভাব থাকে সেই ভাব নিয়েই পরের জন্ম নির্ধারিত হয়। এসব বলার পর ভগবান নারায়ণ শ্রীরামের বাল রূপ অবলম্বন করে শিশুর মত রোদন করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে খবর এল আরও তিনটি শিশুর জন্ম হয়েছে। তখন খুব সুন্দর বলছেন –

‘রাম’ নামের ব্যাখ্যা

যস্মিন রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞানবিপ্লবে।
তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাদ্রাম ইত্যপি।১/৩/৪৪।

এখানে রাম নামের ব্যাখ্যা করছেন। যোগিরা তপস্যা করে করে, গভীর ধ্যান করে করে যখন তাঁদের অজ্ঞান নাশ হয়ে গিয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে যায়, তখন যোগিরা যাঁতে রমণ করেন, তিনি সেটাই, সেইজন্য গুরু বশিষ্ঠ তাঁর নাম রাখলেন রাম। আমাদের পরম্পরাতে রাম শব্দের অনেক রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সংস্কৃতের পণ্ডিতরা শব্দকে নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন, এক রাম শব্দকে ভেঙে ভেঙে কত ভাবে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কল্পনাই

করা যাবে না। বলা হয় রাম শব্দের মধ্যে শৌর্যের ভাব আছে, তাই রাম নামটা নাকি খুব কঠোর মনে হয়। দশরথ নাকি বললেন, এটা আবার কি ধরণের নাম হল। বশিষ্ঠ তখন দশরথকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, রাম হল 'নমো নারায়ণায়', 'নমো নারায়ণায়' থেকে যদি 'রা'কে সরিয়ে দেওয়া হয় তখন দাঁড়াবে 'নমো নায়ণায়', যার অর্থ হয়ে যাবে ইন্দ্রিয়কে প্রণাম, নায়ণায় মানে ইন্দ্রিয়, নয়নাদি বলতে সব কটি ইন্দ্রিয়ই হয়ে যায়। তাই নারায়ণকে প্রণাম না হয়ে ইন্দ্রিয়দের প্রণাম হয়ে যাবে। আর 'নমঃ শিবায়' থেকে যদি 'ম' বর্ণকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়ে যাবে 'নঃ শিবায়'। 'নঃ শিবায়' মানে সব নাশ হয়ে যাওয়া। তবে এগুলো সব পণ্ডিতদের বিভিন্ন ভাবে নামের অর্থ করা, তাঁরা যাকে ইচ্ছে হবে বড় করে দেবেন, ছোট করার হলে তাকে ছোট করে দেবেন। কিন্তু রাম শব্দের অর্থ আমাদের শাস্ত্রে যেটা করা হয়েছে সেটাই ঠিক। আর আচার্য শঙ্করের ভাষ্যে কোথাও রাম নাম আসেনি, কিন্তু আচার্যের ব্যাখ্যা করার যে পদ্ধতি সেটাই ঠিক পদ্ধতি।

রাম শব্দ সব সময় আসে রমণ অর্থে। রমণ মানে যে জিনিসটা করে আনন্দ পাওয়া যায়। ঠাকুর তিন রকম আনন্দের কথা বলছেন, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। সাধারণ ভাবে কীট পশু থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সবাই বিষয়ে রমণ করে, বিষয়ে আনন্দ পায়। যারা একটু উন্নত, যাদের বুদ্ধি একটু খুলে গেছে তারা বুদ্ধির স্তরে রমণ করে, আমাদের মত যারা ভক্ত তারা একটু ঈশ্বর চিন্তন করে, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করে আনন্দ পায়, এটাকে বলে ভজনানন্দ, আর হয় ব্রহ্মানন্দ। এখানে ব্যাখ্যা করছেন, *যস্মিন রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞানবিপ্লবে*, অজ্ঞানের যখন নাশ হয়ে যায়, অজ্ঞানের মধ্যে সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটে গুণ রয়েছে, তমোগুণের প্রভাব বেশি থাকলে বিষয় ভোগ হবে, রজোগুণের প্রভাবেও বিষয় ভোগ হবে। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে ভগবান বলছেন *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*, আমি এটাকে জয় করে নিয়েছি, এবার ঐটাকে জয় করে নেব। *অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি*, আমার এই শত্রুকে শেষ করে দিয়েছি এবার একেও শেষ করব। সব সময় প্ল্যানিং, গোল সেটিং করে যাচ্ছে। রজোগুণের লক্ষণ সব সময় সক্রিয়। তমোগুণ আর রজোগুণে যারা আছে তারা সব সময় বিষয়ের মধ্যেই পড়ে থাকে, বিষয়ানন্দ ছাড়া আর কোন আনন্দের খবর জানে না। যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য তারা সুখ আর জ্ঞানের দিকে চলে যায়, তখন আসে ভজনানন্দ। কিন্তু ভজনানন্দও অজ্ঞান।

আমাদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, যিনি সত্ত্বগুণী তিনি হয়ত সত্ত্বগুণে এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাননি কিন্তু তাঁর মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য এসে গেছে, তাঁকেও কেন অজ্ঞানী বলছেন? সত্ত্বগুণীর লক্ষণ হল সে সব সময় সুখে আছে, এই সুখ জাগতিক সুখ নয়, চিন্তার জগতে পড়ে আছে, ভালো বই পড়ছে তাতে সুখ, ঈশ্বরের নাম করছে তার সুখ আর জ্ঞানের প্রতি আসক্তি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন *সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ*, সুখ আর জ্ঞানের প্রতি তার আসক্তি থাকে। রজোগুণী একবার এটা করছে, আরেকবার সেটা করছে আর সব সময় আমাকে এই করতে হবে, ওকে শেষ করতে হবে, এটা পেতে হবে, সব সময় প্ল্যানিং, টার্গেট ফিক্সিং করতেই থাকে। আর তমোগুণী বলে, আমি অতশত কিছু করতে পারব না আর লাগবেও না, ভাত মাংস খাব আর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ব। তাহলে সত্ত্বগুণীকে কেন অজ্ঞানী বলছেন? সত্ত্বগুণী হল কৃত্রিম, যেমন ধরুন, সবাই আমরা এখানে শাস্ত্র কথা শুনছি, শুনতে খুব ভালো লাগছে, আমাদের মনে এখন কোন রাগ, হিংসা কিছু নেই তার মানে আমরা সবাই এখন সত্ত্বগুণে আছি। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড যেতে না যেতেই রাগ, হিংসা, দ্বেষ সব এসে যাচ্ছে। আমাকে এখন বাড়ি পৌঁছাতে হবে, বাড়িতে এই কাজটা করতে হবে, ওর সাথে দেখা করতে হবে, ওকে ফোনে ভালো করে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে, সব এবার রজোগুণে চলে গেল। যাঁরা খুব উচ্চমানের সত্ত্বগুণী তাঁরা এত সহজেই নেমে আসবেন না, কিন্তু তাঁদেরও পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। কোন সত্ত্বগুণী লোক নেই যার পড়ে যাওয়ার ভয় নেই। যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত, আমাদের ঋষি মুনিরা, তাঁদেরও এই ভয়টা থাকে। জোর একটা কোন ধাক্কা, কোন মেয়ে মানুষের প্রলোভনের ধাক্কা যদি আসে, তার থেকেও মারাত্মক পুত্র শোকের ধাক্কা যদি এসে যায় এনারা সবাই উল্টে পড়বেন। বশিষ্ঠ যিনি এত বড় জ্ঞানী তিনিও পুত্রশোকে কাতর হয়ে কাঁদছেন। সেইজন্য সত্ত্বগুণকে অজ্ঞান বলছেন। সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটেই বন্ধন, তমোর লোহার শেকলের বন্ধন সেখানে সত্ত্বগুণের বন্ধন সোনার শেকলের। কিন্তু যাঁর মন তিনটে গুণের পারে চলে গেছে, যিনি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিই অজ্ঞানের পারে চলে যান। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ধরণের আলোচনা বারবার আসতে থাকবে আর খুব বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ ভাবে সব কিছুকে বিশ্লেষণ করিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

তিনটে গুণই অজ্ঞানের এলাকা। যদি আলস্যে পড়ে থাকে তাহলে সে তমোগুণী, আর যারা খুব কাজ দেখাচ্ছে, এই ক্ষমতা অর্জন করেছি এবার আরও কিছু অর্জন করতে হবে, এরা রজোগুণে পড়ে আছে। আর কিছু লোকজন আছে যখন শাস্ত্রীয় কথা শুনছে তখন সত্ত্বগুণে থাকে, অন্য সময় নেমে হয় তমোগুণে নাহলে রজোগুণে থাকে। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণরা খুব সদাচারী ছিলেন, তাঁরা পুরোপুরি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। ঋষি মুনিরা প্রথমে তমোগুণকে নাশ করেন রজোগুণ দিয়ে। তমোগুণকে রজোগুণ দিয়েই কাটাতে হয়, এছাড়া তমোগুণ থেকে বেরিয়ে আসা যাবে না। ব্রাহ্মণরা তমোগুণ কাটাতেন যজ্ঞাদি করে, যজ্ঞে প্রচুর কর্ম জড়িয়ে থাকে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া রজোগুণের লক্ষণ। কিন্তু সেই ক্রিয়াও ঈশ্বর কেন্দ্রিত। ঈশ্বর কেন্দ্রিত হওয়ার জন্য সেখান থেকে তিনি জপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে সরে এসে জপ-ধ্যানে বেশি নিজেকে নিয়োজিত করছেন, তার মানে তিনি এবার সত্ত্বগুণে এসে গেছেন। এরপর যখন তাঁর উপলব্ধি হয়ে গেল, তিনটে গুণকেই কেটে দিলেন। এখানে বলছেন, *অজ্ঞানবিপ্লবে*, অজ্ঞানের যে তোড়, অজ্ঞানের যে সমুদ্র, এই অজ্ঞানকে যখন থামিয়ে দিলেন তার মানে তাঁর মন থেকে বিষয়ানন্দ চলে গেল, তমোগুণ আর রজোগুণ খসে গেল, সত্ত্বগুণের ভজনানন্দটাও চলে গেল। এবার মনকে কোথায় রাখবেন, মনকে তো ফাঁকা রাখা যাবে না, কোথাও মনকে রাখতে হবে। মন তখন কোথায় থাকে? নারদ ভক্তিসূত্রে বলছেন *স আত্মারাম ভবতি*। তিনি আত্মারাম হয়ে যান। তাঁর মন তখন ঈশ্বরে রমণ করে। কোন পরিস্থিতিতেই, যাই হয়ে যাক না কেন, তাঁর মন ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। ঠাকুরের কথামৃত আর লীলাপ্রসঙ্গ নিয়মিত অধ্যয়ন করলে এই ছবি পাওয়া যায়। ঠাকুর বলছেন, গড়ের মাঠে দেখলেন এক সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওই দৃশ্য দেখেই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়ে গেল, তিনি ভাব সমাধিতে চলে গেলেন। মথুরবাবুরা ঠাকুরকে নিয়ে গেছেন বারবণিতাদের কাছে, সেখানে ঠাকুর সব মেয়েদের দেখছেন মা জগন্মাতা। যিনি অবতার পুরুষ তিনি জগতের সব মেয়ের মধ্যে জগন্মাতাকে দেখেন, বাকিরা সেই মেয়েদেরই ভোগ্যা রূপে দেখে।

এই যে তিনি রমণ করছেন, কিসে করেন, বলছেন যে জিনিসটাতে রমণ করেন সেই জিনিসটাই ইনি, সেইজন্য এনার নাম রাম। যদি বিষ্ণুপদে রমণ করেন, যদি আত্মাতে রমণ করেন, যদি ব্রহ্মে রমণ করেন, সবটাই এক, সেই সচ্চিদানন্দেই রমণ করেন। সেই যে অবস্থা, যে শুদ্ধ চৈতন্যকে নিয়ে জ্ঞানীরা থাকেন, অজ্ঞান সমুদ্র যাঁদের স্তব্ধ হয়ে গেছে, যাঁরা এই অজ্ঞানের পারে চলে গেছেন তাঁদের মন শুদ্ধ চৈতন্যে অবস্থিত থাকে, ইনিই সেই শুদ্ধ চৈতন্য। আপনি বলবেন, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন জায়গায় রমণ করছে। ঠিকই বলছেন, রমণ সবাই করছে, একজন সাধারণ মানুষ সেও রমণ করে, একজন ভক্ত সেও রমণ করে আর জ্ঞানীও রমণ করেন। তফাৎ হল, সাধারণ মানুষ বিষয়ানন্দে রমণ করে, ভক্তরা ভজনানন্দে রমণ করে আর জ্ঞানীরা ব্রহ্মানন্দে রমণ করছেন। শ্লোকে এটাকেই আটকে দেওয়া হয়েছে, এটা যেন কেউ ভুল না বোঝে যে রমণ বলতে এখানে বিষয়ানন্দ আর ভজনানন্দকে বলছেন, সেইজন্য বলেই দিচ্ছেন যিনি অজ্ঞান সমুদ্রের পারে চলে গেছেন। কি করে চলে গেছেন? বিদ্যার দ্বারা, বিদ্যা বলতে এখানে আত্মজ্ঞানের কথা বলছেন। শুধু তাই না, তার সাথে বলছেন *তং গুরুঃ প্রাহ রামেতি রমণাৎ*, গুরু বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বলছেন, জ্ঞানীরা যেমন রমণ করেন, ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদেরকে দিয়ে রমণ করান, অর্থাৎ ভক্তদের মনকে তিনি নিজের দিকে চুম্বক যেমন লোহাকে টেনে নেয়, সেইভাবে টেনে নেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ জ্ঞান আর ভক্তির সমন্বয় গ্রন্থ, এই ধরণের উক্তি তাই বারবার আসতে থাকবে। জ্ঞানী আর ভক্তের তফাৎ কিভাবে করছেন? জ্ঞানীরা অজ্ঞান সমুদ্রের পারে চলে গেছেন আর তাঁদের মন যেখানে রমণ করছে তিনিই রাম। আর ভক্তদের তিনি নিজের সৌন্দর্য, তাঁর করুণা দিয়ে তাদের মনকে নিজের দিকে টেনে নেন। আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্যে ভগবানের যখন ব্যাখ্যা করছেন তখনও তিনি এই কথা বলছেন, যিনি ভক্তদের উপর অনুগ্রহ করেন, তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

জ্ঞানী আর ভক্তের পার্থক্য হল, ঠাকুর বলছেন বানরের ছা আর বেড়ালের ছা। বানরের বাচ্চা মাকে নিজে ধরে রাখে, আর বেড়াল তার বাচ্চার ঘাড়টা ধরে এদিক সেদিক নিয়ে যায়। রাম শব্দে জ্ঞানী আর ভক্ত দুটোরই বর্ণনা এক সঙ্গে আছে। যখন নিজের চেষ্টায় ঐখানে পৌঁছে নিজে থেকে রমণ করছেন তখন তাঁকে বলছেন রাম, আর যখন তিনি ভক্তের চিত্তকে নিজের দিকে আকর্ষিত করে দিচ্ছেন তখন তিনি তাকে রমণ করাচ্ছেন, সেইজন্য তাঁর নাম রাম। একটা হল যেখানে চিত্ত রমণ করে সেটাই রাম আরেকটি হল যিনি ভক্তের চিত্তকে নিজেতে রমণ করান, তিনি রাম। রমণ করা মানে অবস্থান করা। যাঁরাই শ্রীরামচন্দ্রের ঠিক ঠিক ভক্ত হন, শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের

মনকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নেন, সেইজন্য তাঁর নাম রাম। ঠাকুর বলছেন, হাসপাতালে একবার নাম লেখালে যতক্ষণ না পুরোপুরি রোগ সারছে ততক্ষণ ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। একবার যদি কেউ মুখের কথায় নয়, সত্যিকারের হৃদয় থেকে জীবনে একবারও যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে থাকে, আহা! আমি যদি ঠাকুরেরেই হতাম, হে ঠাকুর আমি তোমার হতে চাই। ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেবর মত গতানুগতিক প্রার্থনা নয়, এটা যদি সত্যিই তার হৃদয়ের ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সে আর ঠাকুরের কাছ থেকে ছাড়া পাবে না। এরপর সে যতই ভোগ আর সংসারের মধ্যে ঢুকে যাক, ঠাকুর কিন্তু তাকে আর ছাড়বেন না। ঠাকুরের নামে একজন বলছেন, ওরে বাবা! মনে হয় যেন আমাকে বাঘে পেয়েছে। কিছুদিন আগে সুন্দরবনে চারজন নৌকা করে ঘুরতে গিয়েছিল, সেখানে একটা বাঘ ঝাঁপ মেরে একজনকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বাকি তিনজনও জলে নেমে বাঘটাকে মারছে, ধরছে, বাঘ কিন্তু লোকটাকে ছাড়ছে না। নাড়িয়ে নাড়িয়ে ঘাড়টাকে যেমনি পুরো ধরে নিল, ব্যস্ নিমিষের মধ্যে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই হল বাঘে পাওয়া। যদি একবার কেউ বলেছে, হে প্রভু! আমাকে তোমার করে নাও। ব্যস্, এবার তাকে বাঘে পেয়ে গেল। এবার তাকে ভালো করে ঝাঁকানি দেবে, যাতে শক্ত করে তার ঘাড়টাকে মুখের মধ্যে বসাতে পারে। তখন তার জ্বালা আর যন্ত্রণার অন্ত থাকবে না। কত রকমের জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে দেখে নিজেই হতবাক হয়ে যাবে। এমন জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে মারবে যে মা, বাপ, ঠাকুর্দা সবার নাম ভুলে যেতে হবে। কারণ এখন ভালো করে মুখের কাছটায় ঘাড়টাকে নিয়ে আসছেন। ঘাড়টাকে মুখের মধ্যে বসিয়ে নিল, এরপর ভিড়ের মাঝখান থেকে তাকে টেনে নিয়ে সোজা জঙ্গলে। ঠিক সেই রকম যে একবার হৃদয় থেকে বলেছে হে ঠাকুর! আমি তোমার হতে চাই। এরপর যা ঝড়-ঝাপ্টা আসবে সে কল্পনাই করতে পারবে না, এরপর সে যদি বেরিয়েও যেতে চায় আর তাকে ঠাকুর ছাড়বেন না। সেইজন্য তখন সব ছেড়ে দিতে হয়, শরণাগতি নিয়ে নাও। বাঘ যাকে ধরেছে সেই যদি বলে বাঘের মুখে একটা ঘুষি মারব, তোমার ঘুষিতে কি হবে বাঘের! তার চেয়ে বরং নিজেকে বাঘের কাছে ছেড়ে দাও, কারণ তোমার খেলা শেষ, শান্তিতে মরে যাও। ভগবান ঠিক করে নিয়েছেন আপনাকে তিনি নিজের করে নেবেন, এবার যা ঝামেলা আসার আসুক সব তাঁর উপর ছেড়ে দিন। রাম কি করছেন? ভক্তের মনকে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন।

সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে মানুষ সুখে থাকতে চায়। আমাদের কাছে ভালোর সংজ্ঞা মানে সুখ। তমোগুণী মনে করে অলস ভাবে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারলে আমি সুখে থাকব। রজোগুণী মনে করে আমার সব কাজে যদি সাফল্য আসে তাহলে আমার সুখ আসবে। আর সত্ত্বগুণী মনে করে আমি যদি একটু জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারি, ভালো কবিতা যদি পড়তে পারি, ভালো ছবি যদি দেখতে পাই, ভাল গান যদি করতে পারি তাহলেই আমার সুখ। আধ্যাত্মিক জীবনে সব সুখগুলিকে কেটে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে এসে বলেন, ঘরবাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, মা-বাবাকে কাঁদিয়েছেন আপনারা কি শান্তি পেয়েছেন? অবাক হয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, কে বলেছে সাধু জীবন শান্তির জন্য? সাধু জীবন থেকে অশান্ত জীবন আর কারুর আছে? সন্ন্যাসীর জীবন, সাধুর যে জীবন এই জীবনের থেকে অশান্ত জীবন আর কারুরই হয় না। যেখানেই সংঘাত সেখানেই অশান্তি। সংঘাত হলেই আওয়াজ হবে, দুটো তলোয়ার যদি খাপে ঢোকান থাকে সেখানে কিছুই হবে না। দুটো তলোয়ার যখন খাপ থেকে বেরিয়ে এসে দুজনের হাতে চলে গিয়ে সংঘাত হবে তখন ঝন ঝন আওয়াজ হবে, আগুনের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করবে। যিনি বলে দিলেন আমি সন্ন্যাসী হব কিংবা বলে দিলেন আমি ধর্ম পথে যাব, এবার তো আপনার সংঘাত শুরু হয়ে গেল। ঈশ্বরের শক্তি আর মায়ার শক্তির মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে গেল। মায়া একদিকে টানছে, ঈশ্বর অন্য দিকে টানছেন। ত্রিগুণাতীত অবস্থা আপনাকে টানবে ঐদিকে আর প্রকৃতির শক্তি বলবে দেখ দেখ আমার কত সৌন্দর্য। কিসের সৌন্দর্য? রজোগুণের সৌন্দর্য, রজোগুণ এবার আপনাকে টানবে মন্দির বানাও, হাসপাতাল ডিসপেন্সারি কর, লাখ লাখ লোককে খাওয়াও, দীয়তাং ভুজ্যতাং কর। এতটা তো হবে না। ঠিক আছে তাহলে জপ-ধ্যান কর, শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, সত্ত্বগুণকে নিয়ে থাক, ওই নির্গুণ নিরাকারে তুই কী পাবি! আবার নির্গুণ নিরাকার তার দিকে আপনাকে টানছে, তিনি অনন্ত সমুদ্র কিনা, তাই তিনিও টানছেন। তুমি এতদিন প্রকৃতির এলাকার বাসিন্দা ছিলে, এতদিন তুমি প্রকৃতির রূপ রসকে চুষে গেছ, প্রকৃতি কি তাই অত সহজে ছেড়ে দেবে মনে করেছ, সেও তোমার ঠ্যাং ধরে তার দিকে টেনে রেখেছে আর ঐদিকে ঈশ্বর রূপী বাঘ তোমাকে ঘাড় ধরে টানছে। এবার তুমি স্প্রিং এর মত লম্বা হতে থাকবে। তুমি তখন নাজেহাল হয়ে বলবে, কেন এই ঠাকুর-ফাকুরের

চক্করে পড়তে গেলাম, আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু তিনি তাও আর তোমাকে ছাড়বেন না, তুমি একবার বলে দিয়েছ কিনা, আমাকে তোমার করে নাও। তুমি হাসপাতালে নাম লিখিয়ে দিয়েছ, আর তোমাকে ছাড়বেন না।

আমাদের মন এমন ভাবে তৈরী যে, আমরা মনে করি সব কিছুর পেছনে একটা যৌক্তিকতা আছে। আমরা জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে যেটা জানছি সেটাই ঠিক। হাইজেনবার্গ খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী, তিনি বললেন observabilityর একটা লিমিট আছে, যেটাকে বলা হয় Heisenberg's uncertainty principle। একটা সীমার বাইরে আপনি যে কোন জিনিসকে মাপতে পারবেন না। Kurt Friedrich Gödel একজন খুব নামকরা গণিতজ্ঞ ছিলেন, তিনি বললেন reasoningএর একটা limit আছে। ব্রাটার্ণ্ড রাসেল বললেন mathematical reasoning দিয়ে যে mathematical philosophy হবে তাই দিয়ে সব কিছু দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাবে। আর সেই সময় এলেন Gödel। তিনি পুরো mathematically দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে reasoningএর একটা limit আছে, reasoning একটা levelএর beyond যেতে পারে না। যদি কেউ বলে বিজ্ঞান বলছে observationএর limit আছে, আমরা মানতেই চাইব না। বিজ্ঞান বলছে যুক্তি একটা অবস্থার পর এগোতে পারবে না, আমরা মানতেই পারবেন না। ঠিক তেমনি, জীবন নিয়ে সবার একটা ধারণা হয়ে আছে। জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি কি? সুখ। সত্ত্বগুণী মানুষের কাছে সুখ হল শেষ। কিন্তু কোন সন্ন্যাসী বলবেন না, হে ভগবান! আমাকে সুখ দাও। সন্ন্যাসী জ্ঞান ভক্তি ছাড়া কিছু চাইবেন না।

একজন লোকের ইচ্ছে হয়েছিল সে সোমযজ্ঞ করবে, তার জন্য সোম পাতা চাই। সে এবার এক দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, সোমরাজা আছেন? সোম পাতাকে রাজা বলা হত। দোকানদার বলল, আছে। কত দাম? কত দিতে পারবে? পাঁচ টাকা। দোকানদার বলল *সোমরাজা ততোহভূয়াৎ*, সোমরাজার দাম তার থেকেও বেশি। আরেকটা দোকানে গেল, সেখানেও বলে দিল *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*, তুমি যত টাকা সোমারাজার জন্য দিচ্ছ তার থেকে সোমরাজার দাম বেশি। এইভাবে শহরের সব দোকান ঘোরা হয়ে গেল। এরপর যখন শেষ দোকানে গেছে, দোকানদার সোমরাজা বার করেছে আর যতক্ষণে *সোমরাজা ততোভূয়াৎ* বলতে শুরু করতে যাচ্ছে, লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ে দোকানদারের হাত থেকে সোমরাজা কেড়ে নিয়ে বলছে, নিকুচি করেছে তোমার ততোভূয়াৎ, আমার এটা চাইই চাই, আমি নিয়ে চললাম, তোমার যা করার কর। যখনই বলবেন আমার জ্ঞান ভক্তি চাই তখনই বলবে *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*, তুমি এর জন্য যে মূল্য দেবে এর দাম তার থেকে বেশি। আপনি বললেন, ঠিক আছে আমি আরেকটু ছাড়তে রাজী আছি। তখনও বলবে *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*। যখন বলবেন নিকুচি করেছে তোমার *সোমরাজা ততোভূয়াৎ*, আমার এটা চাইই, চাই। আমরা কি কখন একবারও জীবনে বলেছি, হে ঠাকুর! আমি তোমাকে চাই। অথচ জীবনে সবারই কাছ থেকে আমরা কত কষ্ট পাচ্ছি, সংসার জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছে তাও বলতে পারছে না, হে ঠাকুর! আমি তোমাকেই চাই। তার মানে সংসার জ্বলুনির তাপের জ্বালার মধ্যেও আমরা একটু সুখের আশা দেখছি। কিন্তু সংসার জ্বালায় দগ্ধ বিদগ্ধ হয়ে এমন একটা অবস্থা হবে, কোথাও কোন আশার আলো দেখা যাবে না, তখন গিয়ে সে বলবে, হে ঠাকুর! আমি তোমাকেই চাই, আর কাউকে চাই না। তার মানে, সে এবার সব কিছুর মূল্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তখন তিনি বলবেন, এবার তোমার সব সুখ শান্তি চিরদিনের মত গেল। এরপর সে যতই সুখ, শান্তি খুঁজতে যাক আর সে পাবে না, ধোপারা যেমন আছাড় দিয়ে কাপড় কাচে, ঠাকুর এবার তাকে ওই আছাড় মারতে শুরু করবেন, কিছু করার থাকবে না। এর ফল কি হবে? কিছুই ফল হবে না। ঈশ্বরকে চেয়েছিলেন ঈশ্বরকে পাবেন, মানে জ্ঞান ভক্তি পাবেন।

ঠাকুর উপমা দিচ্ছেন, পাণ্ডবদের মত জ্ঞানী আর ভক্ত কোথায়! অথচ তাঁদের দুঃখের শেষ নেই। সত্যিই তাই, পাণ্ডবরা কোন দিন না পেলেন সুখ, না পেলেন শান্তি। তাদের জন্ম জঙ্গলে, একটু বড় হতেই দুর্যোধনা তাদের পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করল, সাম্রাজ্য পেয়েও জুয়াতে সব চলে গেল, বার বছর জঙ্গলে কাটিয়ে এক বছর ভয়ে ভয়ে অজ্ঞাতবাস করতে হল, যুদ্ধে সবাইকে হারাল, রাজা হওয়ার পর চিরদিন এই খেদ করে কাটালেন যে আমরা নিজেদের লোকেদের মেরে রাজা হয়েছি, সারাটা সময় দুঃখ হতাশাতে কাটালেন, শেষে মহাপ্রস্থানে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁদের মত জ্ঞানী আর ভক্ত কোথায় আছে! আপনি নিজে কি চাইছেন? সবারই জীবন হল matter of choice। এই যে বলা হল শ্রেষ্ঠ ধনীরা এক ঘন্টার বেশি টেলিভিশন দেখে না, এটাই matter of choice। আপনি জীবনকে ভোগ করতে চাইছেন কিনা, আপনি পাঁচ ঘন্টা ছ ঘন্টা টেলিভিশনে একই পচা খবর দেখতে চাইছেন কিনা, কিংবা আপনি ঠিক করে নিলেন আমি একটা জিনিসে নিজেকে সমর্পিত করে দিলাম। বাচ্চা বয়স

থেকে আমাদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে যাতে বলছে তোমার জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল সুখ পাওয়া। সুখকে কয়েকটা জিনিস দিয়ে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া সুখ, ভালো চাকরি পাওয়া সুখ, সুন্দরী সতী মেয়েকে স্ত্রী করে আনা সুখ, সন্তান ভালো হওয়া সুখ। কিন্তু এটা আমাদের কেউ বলে দেয় না যে, যখনই সুখ আসে তার সাথে সব সময় দুঃখ লেগে থাকে। সুখের সাথে সব সময় দুঃখ থাকবেই, কেউই এর পারে যেতে পারবে না। আমাদের মনে হচ্ছে সুখে আছি, কিন্তু সংসারে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। আচার্য শঙ্কর বলছেন, সংসারে সুখের গন্ধটুকু পর্যন্ত নেই। কিন্তু আমাদের মাথায় সুখ বোধ ঢুকে আছে। জগতে আমরা যেটা সুখ বলে মনে করছি আসলে এই সুখ হল ড্রাগ, গাঁজা, মদ, আফিংএ মত্ত হয়ে সুখে থাকা। ধর্মকে এরা বলছে সমাজের আফিং, কিন্তু তা নয়, আমাদের জীবনটাই আফিং হয়ে সবাইকে নেশাতে মত্ত করে রেখেছে। যখন কিছু পায় না তখন বলবে আমি কাজ ছাড়া থাকতে পারি না, কাজ যদি না জোটে তখন বলবে অপরের মঙ্গল না করে আমি পারি না, এরপর অপরের সেবা করে বেড়াচ্ছে। এগুলো সবটাই নেশা। নেশাই যদি করতে হয় তাহলে ভালো নেশা করো, দেশী মদের নেশা না করে বিলাতী মদের নেশা করো। ঈশ্বরের নেশা তো ভালো নেশা, দুঃখ সেখানেও আছে। ঈশ্বরের নেশা আর জাগতিক নেশার মধ্যে তফাৎ হল, জাগতিক নেশার চোটে জীবনে যে মার খায় সেটা মানুষ বুঝতে পারে না, মদের ঘোরে থাকলে তাকে দু চারটে লাঠির ঘা বসালে বুঝতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের নেশাতে জাগতিক নেশার ঘোরটা কাটতে থাকে বলে ব্যাথাটা বোধ হয়। সংসারীরা সন্তানের থেকে দুঃখ পেলে স্ত্রীর কাছে যায়, স্ত্রীর কাছে দুঃখ পেলে সন্তানের কাছে যায়, দুজনের থেকে দুঃখ এলে কর্মক্ষেত্রে চলে যায়, কর্মক্ষেত্রে দুঃখ হলে মদের দোকানে চলে যায়। সন্ন্যাসীদের তো কোথাও যাবার জায়গা নেই, সেইজন্য তাদের দুঃখের বোধটা সংসারীদের থেকে অনেক বেশি হয়। কিন্তু সন্ন্যাসী ওই অবস্থায় যাচ্ছেন যেখানে দুঃখ বলে কিছু থাকে না। ওই শান্তিটা জাগতিক শান্তি না, একটা অন্য ধরণের শান্তি। আমাদের মধ্যে একটা ধারণা হয়ে আছে যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে দুঃখ-কষ্ট চলে যায়, প্রার্থনা করলে সুখ আসে, কিন্তু তা একেবারেই নয়। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে একমাত্র দুটো জিনিসই হয় – জ্ঞান আর ভক্তি। ওই জ্ঞান ভক্তি হল মনের একটা অবস্থা। সংসারে যখন থাকছে সেটাও মনের একটা অবস্থা। দুটো ভিন্ন ধরণের মনের অবস্থা। এক একটা মনের অবস্থা যেন এক একটা package deal, এই package dealএ কিছু ধরণের কষ্ট আমাকে নিতে হবে বদলে কিছু ধরণের সুবিধা দেওয়া হবে। জ্ঞান ভক্তিও একটা package deal, এখানেও কিছু সুবিধা আছে, কিছু দুঃখ ও অসুবিধাও আছে। বশিষ্ঠ মুনি বলছেন, জ্ঞানীরা যেটাতে রমণ করেন সেটাই তিনি আর বিষয়ীরা যেটা করে সেটা আরাম।

রমন্তে আর *রমণাৎ* এই দুটি শব্দই এই শ্লোকের প্রাণ। রমন্তে মানে যিনি রমণ করেন বা যেখানে রমণ করেন আর রমণাৎ মানে যাঁকে রমণ করান হয়। জ্ঞানী আর ভক্ত দুজনের বর্ণনাই করা হয়েছে, জ্ঞানী কিভাবে শ্রীরামে রমণ করেন আর ভক্তকে কিভাবে রমণ করান হয়। শ্লোকের আরেকটি মূল বক্তব্য হল – যাঁকে নির্গুণ বলা হয় তিনিই সগুণ, বেদে যাঁকে পুরুষ বলা হয়েছে তিনিই শ্রীরামচন্দ্র। অজ্ঞান সাগরের পারে যাঁর মধ্যে রমণ করে তিনিই রাম, যেখানে অজ্ঞান বলে আর কিছু থাকে না। ঠাকুরের কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ হল একেবারে সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম রামায়ণ, ঠাকুরের জীবনের মিল যদি দেখতে হয়, তাহলে সব থেকে বেশি মিল পাওয়া যাবে অধ্যাত্ম রামায়ণের সাথে। অধ্যাত্ম রামায়ণে পদে পদে ঠাকুরের জীবনের অনেক কিছুর সাথে মিল পাওয়া যায়। ঠাকুরের জীবনে খুব সুন্দর এই রকম একটি ঘটনা আছে, ঠাকুর নরেন, রাখাল এদেরকে খুব ভালোবাসতেন। এই নিয়ে কেউ কেউ ঠাকুরকে কটাক্ষ করে বলতেন, তুমি কায়েতের ছেলেদের এত কেন ভালোবাস। ঠাকুর শুনে বলছেন, ওরে! ওদেরকে আমি সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ দেখি, আর ওদের উপর মনটা নামিয়ে শরীরটা ধারণ করে আছি। এই দ্যাখ্! নরেন, রাখালের থেকে আমার মনকে সরিয়ে নিচ্ছি। যেমনি ঠাকুর নরেন রাখালের থেকে মন সরিয়ে নিলেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন আর তাঁর চুল, দাড়ি, রোম সব শজারুর কাঁটার মত সোজা দাঁড়িয়ে গেছে। ঠাকুরের জীবনে এটা শ্রেষ্ঠ উপমা যেটা অধ্যাত্ম রামায়ণের এই রমন্তে শব্দের ভাবের তাৎপর্যকে সূচিত করে, অজ্ঞান সাগর থেকে মন যখন চলে যায় মন তখন কেমন রমণ করে। এখানে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সংসার থেকে যখন মন সরে যাচ্ছে তখন তাঁর কি অবস্থা হয়। সংসারে ঠাকুর তাঁর মনকে স্বেচ্ছায় নামিয়ে রেখেছেন। যে মুনি ঋষিরা চেষ্টা করে ওই অবস্থায় যান তাঁদেরও কিন্তু ওই একই জিনিস হয়। আমরা যাকে ভালোবাসি, তা যেভাবেই ভালোবাসি না কেন, ওর কথা যখন মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তখন সেই মুহুর্তে সংসারটা খসে পড়ে যায়। ওকে নিয়ে মন তখন রমণ করে।

কয়েকজন থিয়েটারওয়ালারা এসে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ঈশ্বর দর্শন কেমন। থিয়েটারের পর্দা যতক্ষণ না সরান হয় ততক্ষণ এক অপরকে দেখে, এক অপরের সাথে কথা বলে। পর্দা যেমনি সরে গেল তখন সবার দৃষ্টি থিয়েটারের স্টেজে। ঈশ্বর দর্শন এই রকম। ঠাকুরের এই উপমার দুটো পরিণাম, বেদান্তে যাকে উপপত্তি বলে। প্রথম হল, যারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ হন তাঁরা কিভাবে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ্য কঠিন জিনিসকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। থিয়েটারওয়ালা, তারা থিয়েটার করে বেড়ায়, তাদেরও বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঈশ্বর দর্শনটা কি জিনিস। থিয়েটার হলে যতক্ষণ পর্দা নামান থাকে ততক্ষণ এক অপরের সাথে কথা বলতে থাকে। যেমনই পর্দা উঠে মঞ্চে বীণা হস্তে নারদ এসে গান শুরু করলেন সব কথাবার্তা বন্ধ আর সবারই দৃষ্টি নাটকে চলে গেছে। এই যে রমণের ভাব, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দের কথা যে আমরা আগে আলোচনা করছিলাম, এখানে ঠিক তাই হচ্ছে। প্রথমের দিকের আনন্দটা হল বিষয়ানন্দ। বন্ধুদের সাথে থিয়েটারে গেছে, সেখানে হাসি-ঠাট্টা গল্প করছে, তার সাথে এই প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে, দরকার হলে যে নাটকটা দেখতে গেছে সেই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলছে। যেমনি থিয়েটারের আলো নিভে গেল তখন সবারই মন একাগ্র হয়ে গেল, তার আগে কিন্তু মন একাগ্র থাকে না, কারণ তখন সে নিজেকেও দেখছে, তার ডান দিকে বাঁ দিকে, সামনে পেছনে সবাইকেই দেখছে। কিন্তু আলো নিভে যেতেই সবার মন একটা জায়গাতে এসে একাগ্র হয়ে গেল। ঠাকুর যখন নরেন, রাখালের থেকে মনকে তুলে নিলেন তখনও তাঁর পুরো একাগ্রতা সচ্চিদানন্দের উপর চলে গেছে, শরীরটা সোজা হয়ে গেল আর সব চুল, দাড়ি, রোম শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে গেল। রাম নামের এটাই মাহাত্ম্য, মুনি ঋষিদের মন অজ্ঞান সাগর থেকে সরে এসে যেখানে একাগ্র হয়ে যায় সেটাই তিনি। কিন্তু ঠাকুর আবার বলছেন, সুতোর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ফুটো দিয়ে যাবে না।

একই জিনিস হয় যখন তিনি নিজে ভক্তের মনকে তাঁর দিকে টেনে নেন, তোমাকে আর কোন দিকে যেতে দেব না। কোন ছেলে একটি মেয়েকে খুব ভালোবাসে, সত্যিকারের ভালোবাসা। এবার ছেলেটিকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, মেয়েটি যদি তোমাকে ছেড়ে কোন দিন অন্য কারুর দিকে চলে যায় তুমি তখন কি করবে? ছেলেটি বলবে, আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে ওকে আগে আমাকে খুন করতে হবে। এই হল ভালোবাসা। ঈশ্বর যদি কাউকে একবার নিজে ধরে নেন, এবার সে যদি ঈশ্বর থেকে ছাড়া পেতে চায় তাহলে তাকে আগে ঈশ্বরকে খুন করতে হবে। ঈশ্বর তো অনন্ত, অনন্তকে তো খুন করা যাবে না, তাই তিনি যাকে ধরেন আর সে ছাড়া পাবে না। এটাই এখানে বলছেন, রাম মানে, যিনি জ্ঞানী তিনি রমণ করেন, বলছেন রমন্তে আর ভক্ত হলে তাকে টেনে নেন, বলছেন রমণাৎ। ভক্তকে টেনে নেওয়ার তাৎপর্য হল, ভক্ত ঈশ্বরের সামনে সব সময় নিজেকে ছোট মনে করে, জ্ঞানীর নিজের উপর আত্মবিশ্বাসটা বেশি। আর ভক্তের মধ্যে শরণাগতির ভাব থাকে। ভক্তিতে শরণাগতি আবশ্যিক, সে জানে আমি দুর্বল, আমি পারছি না, আমার কত রকমের সমস্যা, তুমি আমাকে কৃপা কর, আমি তোমার শরণাগত। এই হল রাম নামের অর্থ। মূল কথা হল রমণ, রমণ মানে যে জায়গাতে মন রঞ্জন হয়, মন যেখানে আনন্দ পায়। রামের পর গুরু বশিষ্ঠ বাকি তিন ভাইয়ের নামকরণ করে তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করছেন –

ভরণাদ্ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতম্।
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং গুরুরভাষত।১/৩/৪৫।

ভরণাদ্ভরতো নাম, রাজা হবেন তাই প্রজাদের রক্ষা করবেন, প্রজাদের ভরণপোষণ করবেন, সেইজন্য তার নাম ভরত। বাংলায় স্বামীকে অনেক জায়গায় ভাতার বলে, স্বামী ভরণপোষণ করেন বলে তাকে বলছেন *ভর্তারম্*। ঠিক ঠিক ভর্তা একমাত্র ঈশ্বর, ঈশ্বরের পর ভর্তা হন রাজা। ভরত হলেন ভর্তা, তাঁর কাছে যত লোকজন থাকবে তারা কেউ অভাবে থাকবে না, না খেয়ে থাকতে হবে না, সেইজন্য তাঁর নাম ভরত। *লক্ষ্মণং লক্ষণ অন্বিতম্*, তাঁর শরীরের লক্ষণ গুলো সবই শুভ, তাই তাঁর নাম লক্ষ্মণ। *শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং*, এই পুত্র শত্রু হনন করবে, সেইজন্য এনার নাম শত্রুঘ্ন। চারটি নামের চার রকম অর্থ, রাম হল *রমন্তে*, জ্ঞানীরা যেখানে রমণ করেন আর *রমণাৎ* ভক্তদের তিনি রমণ করান, ভরত ভরণপোষণ করেন, শুভ লক্ষণ সম্পন্ন তাই তিনি লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন শত্রুদের নাশ করেন।

কৌশল্যা আর কৈকেয়ী তাঁদের পায়েসের অংশ থেকে সুমিত্রাকে দিয়েছিল। কৌশল্যার পায়েসের অংশে লক্ষ্মণ আর কৈকেয়ীর পায়েসের অংশে শত্রুঘ্নের জন্ম হয়েছে। এরই প্রভাবে শ্রীরামের সাথে লক্ষ্মণের আর ভরতের

সাথে শত্রুঘ্নের বেশি নিবিড় সম্পর্ক হয়। এরপর চব্বিশটি শ্লোকে শ্রীরামের বাল্যলীলার বর্ণনা করা হয়েছে। রামচরিতমানসে তুলসীদাস শ্রীরামের বাল্যলীলার বিশাল বর্ণনা করে গেছেন। কবি সুরদাস ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে নিয়ে কাব্যগীতি রচনা করেছেন, ভারতের কাব্য সাহিত্যে যা এক অমূল্য সম্পদ। ঈশ্বরকে যখন নিজের সন্তান রূপে দেখা হয় তখন যে মাধুর্য্যরসের অবতারণ হয় সেই রসকে সুরদাস যেভাবে তাঁর কাব্যগীতিতে পরিবেশন করেছে, এক কথায় অতুলনীয়। বাল্মীকি রামায়ণে আবার শ্রীরামের বাল্যলীলা একটা দুটো শ্লোকেই শেষ করে সেখান থেকে শ্রীরামকে বড় করে দিয়েছেন। আমরা এই বাল্যলীলার মধ্যে না গিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে চলে যাচ্ছি, যেখান থেকে ধীরে ধীরে রামকথা শুরু হয়ে যাচ্ছে।

রামকথা আর শ্রীকৃষ্ণকথার মধ্যে সব থেকে বড় তফাৎ হল, রামকথাতে কখনই ওনার বালকভাব আসে না, যদিও তুলসীদাস কিছুটা লিখেছেন কিন্তু সেভাবে কখনই জনপ্রিয় হতে পারেনি। কৃষ্ণকথার বেশি অংশটাই হল তাঁর বালক অবস্থার কথা। কৃষ্ণকথা মানেই কংসের কারাগারে জন্ম থেকে শুরু করে রাসলীলা পর্যন্ত। রামকথাতে যখনই রামের শৌর্যের প্রকাশ এসে গেল তখনই শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী শুরু হয়। এটাই দুটো কাহিনীর মধ্যে বিরাট তফাৎ। যার ফলে রামকথাতে বাৎসল্য রস নিয়ে আসা খুব মুশকিল, রামলালা বলছেন ঠিকই, কিন্তু কাহিনী অনুমোদন করতে পারবে না। তুলসীদাস যেটা লিখেছেন সেটা দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের বাললীলা দাঁড়ায় না। ভাগবত পুরো দাঁড়িয়ে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাললীলার উপর, রাসলীলার উপর, রাসলীলার সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স তখন বারো চোদ্দ বছর। আর শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী শুরুই হয়ে বারো বয়সের পর থেকে। এতে যে কোন আধ্যাত্মিকতার হেরফের হচ্ছে তা নয়, কিন্তু এটি একটি মৌলিক তফাৎ।

বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় আগমন

যাই হোক, এখান থেকে ঠিক ঠিক কাহিনী শুরু হয়। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন, একবার বিশ্বামিত্র অযোধ্যায় এসেছেন। বিশ্বামিত্র কেমন বলতে গিয়ে বলছেন *জ্বলনপ্রভঃ*, যেন আগুনের তেজে তেজোদীপ্ত হয়ে রাজা দশরথের রাজদরবারে প্রবেশ করলেন। রাজা দশরথের রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র ঋষির মধ্যে অনেক পুরনো বিবাদ ছিল। জীবনে প্রথম যেদিন দুজনের সাক্ষাত হয়েছে সেদিন থেকেই দুজনের ঝগড়া চলছে। ঝগড়া চলতে চলতে পরে তাঁদের শিষ্যদের নিয়ে ঝগড়া চলতে থাকল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র শিষ্যকে নাশ করবেন আর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শিষ্যদের নাশ করবেন। এখানে বশিষ্ঠের শিষ্য হলেন রাজা দশরথ, এবার দশরথের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি শুরু হবে। বশিষ্ঠকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেবেন না। বিশ্বামিত্রকে আসতে দেখেই রাজা দশরথ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সন্ন্যাসী, সাধু, মহাত্মাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, তাঁদের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করার প্রথা ভারতে প্রথম থেকেই চলে আসছে। রাজা দশরথ খুব সম্মান করে কৃতাঞ্জলী হয়ে বলছেন –

প্রত্যুবাচ মুনিগ রাজা প্রাঞ্জলির্ভিক্তিনম্রধীঃ
কৃতার্থোঽহস্মি মুনীন্দ্রাহং ত্বদাগমনকারণাৎ।১/৪/৩

রাজা দশরথ খুব বিনম্র ভাবে হাতজোড় করে বলছেন আপনার আগমনে আমরা কৃতার্থ হয়ে গেলাম। আপনি বলুন আমি আপনার কি সেবা করতে পারি, আপনি যেটাই বলবেন সেটাই আমার কাছে আপনার আজ্ঞা। তখন বিশ্বামিত্র বলছেন –

অহং পর্ব্বণি সম্প্রাপ্তে ইষ্ট্যা যষ্টুং সুরান্ পিতৃন্।
যদারভ্যতে তদা দৈত্যা বিঘ্নং কুর্বন্তি নিত্যশঃ।১/৪/৬
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ পরে চানুচরাস্তয়ো।

বিশ্বামিত্র বলছেন *যষ্টুং সুরান্ পিতৃন্*, যখনই আমি সুর আর পিতৃদের জন্য যজ্ঞ করি। এই ব্যাপারটা পরের দিকে এসে কমে যায়, এখানে বিশ্বামিত্র পরিষ্কার বলছেন আমি যখন দেবতা আর পিতৃদের জন্য যজ্ঞ করি। বেদ পড়া না থাকলে বোঝা যায় না দেবগণ আর পিতৃগণ কেন বলছেন। পিতৃদের গুরুত্ব এখনও থেকে গেছে, খাওয়ার সময় ব্রাক্ষণরা থালার বাইরে একটু অন্ন রেখে দেন। যেখানে সাধনার ভাব থাকে সেখানে এখন আর পিতৃরা গুরুত্ব পান না, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা দেবতা আর পিতৃদের এখনও গুরুত্ব দেন। কারণ পিতৃগণরা আমাদের বংশ ধারাটা দিয়েছেন, আর দেবতারা আমাদের বর্তমান জীবনকে চালিত করছেন, সেইজন্য দুজনের

প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার প্রথাটা চলে আসছে। বিশ্বামিত্র বলছেন, যখনই আমি দেবতা আর পিতৃদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করতে যাই তখনই কয়েকটি রাক্ষস এসে যজ্ঞে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাল্মীকি রামায়ণে আবার অন্য ভাবে দেখানো হয়েছে। সেখানে বলছেন, বিশ্বামিত্র একটা বড় যজ্ঞ করতে চাইছেন। যখন উনি আচমন ও সঙ্কল্পাদি করে যজ্ঞের জন্য উপবেশন করলেন, এরপর আর কোন হিংসা করা যাবে না। যজ্ঞ করার সময় কিছু ব্রত থাকে, যেমন বিশেষ কোন বড় পূজার সময় পূজারী কোন কথা বলেন না। কোন কারণে যদি কথা বলে ফেলেন, তাহলে তিনি আবার আচমনাদি করে পূজোয় বসবেন। বিশ্বামিত্রও এই রকম সঙ্কল্প করেছেন যজ্ঞ চলাকালীন তিনি কোন হিংসা করবেন না। কিন্তু যখনই যজ্ঞ করতে বসেন তখনই রাক্ষসরা যজ্ঞে বিভিন্ন রকম বিঘ্ন উৎপাদন করে। বিশ্বামিত্র বলছেন, ইচ্ছা করলে ওদের আমি নাশ করে দিতে পারি, কিন্তু যেহেতু আমি সঙ্কল্প করে আছি তাই আমি হিংসা করতে পারি না। সেইজন্য আমার কিছু লোক দরকার যাতে রাক্ষসদের হাত থেকে যজ্ঞকে রক্ষা করে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারি।

অতস্তয়োর্বধার্থায় জ্যেষ্ঠং রামং প্রযচ্ছ মে।১/৪/৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা তব শ্রেয়ো ভবিষ্যতি।

সেইজন্য আমি রাক্ষসদের বধার্থে লক্ষ্মণ সহ তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে চাইছি। এতে তোমার মঙ্গল হবে। আর আমাদেরও সুবিধা হবে কারণ আমরা যে যজ্ঞ করছি এই যজ্ঞ আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্যই করছি আর তোমারও এতে বিশেষ মঙ্গল হবে। বিশ্বামিত্রের কথা শোনার পর রাজা দশরথ খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। চিন্তাগ্রস্ত রাজা দশরথ তখন বশিষ্ঠদেবকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলছেন –

পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ।
কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ।১/৪/৯
বহুবর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সুতাঃ।
চত্বারো মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোহতিবল্লভঃ।১/৫/৯

রাজা খুব চিন্তিত ও ভীত হয়ে বশিষ্ঠদেবকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, হে গুরুদেব! আমি এখন কি করি? রামকে ছেড়ে দিতে আমার মন চাইছে না, বহু সহস্র বছর তপস্যার পর আমি এই দেবতুল্য চারটি পুত্র লাভ করেছি। এটাকে বলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। কবিতায় যদি একটু বড় করে না দেখান হয় তাহলে ঠিক জমবে না। কত দিন রাজা দশরথের সন্তান হয়নি? কয়েক হাজার বছর। বেদেই বলছে মানুষের আয়ু একশ বছর। যারা রামকথা শুনছে তাদের মনে একটা প্রভাব ফেলতে হবে। রাজা দশরথের মনে ভয়ও আছে, রামকে দেওয়া যাবে না বললে বিশ্বামিত্র অভিশাপ দিয়ে দেবেন। অন্যান্য রামায়ণে অন্য ভাবে দেখানো হয়েছে, সেখানে রাজা দশরথ বলছেন, শুনেছি রাবণ নামে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী রাক্ষস আছে, তাকে তো সবাই ভয় পায়, আমি আমার এই সুকোমল শিশুকে কি করে এই কার্যের জন্য দিতে পারি, না হয় বলুন আমি আমার সেনা সহ আপনাকে রক্ষা করতে যাই। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের এই আর্জিকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারেননি। তখন বশিষ্ঠদেব বলছেন, অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য সব কিছুকে লীলাতে নিয়ে চলে যাবে, বাল্মীকি লীলার দিকে যাবেন না –

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামো ন মানুষো জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।১/৪/১৩

রাজন্! আমি তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি, এই কথা আপনি আর কারুর কাছে প্রকাশ করবেন না, শ্রীরামচন্দ্র মানুষ নন, ইনিই *পরমাত্মা সনাতনঃ*। আচার্য শঙ্কর অবতারের ব্যাখ্যা করার সময় কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করছেন, এই কটি শব্দকে যদি মাথায় বসিয়ে রাখা হয় তাহলে অবতার তত্ত্ব বুঝতে আর কোন সমস্যা হবে না, তিনি বলছেন *দেহবানিব জাত ইত চ লোকনুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে*। তাঁকে কেমন দেখা যায়? দেহবানের মত জন্ম নিয়েছেন, মানুষ যেভাবে জন্ম নেয় সেভাবেই জন্ম নিয়েছেন, কিন্তু বলছেন *ইব*, যেন তার মত, আর কাজ যা করছেন সেটাও *ইব*, মানুষের মতই করেন। তার মানে বলতে চাইছেন, পরমাত্মার আবার কিসের জন্ম! যে ভগবানের ১৮৩৬ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারী জন্ম হল আর ১৮৮৬ সালে ১৬ই আগস্ট চলে গেলেন, সেই ভগবান কিসের ভগবান। যিনি ভগবান তিনি রামকৃষ্ণ দেহকে আশ্রয় করে লীলা করেন। যে রামকৃষ্ণ ১৮৮৬ সালে চলে গেলেন সেই রামকৃষ্ণ ভগবান নয়, তাঁর নরদেহটা চলে গেল। কিন্তু তিনি নরদেহ নন, তিনি নরদেব। বশিষ্ঠদেব

বলছেন তিনি *পরমাত্মা সনাতনঃ*। মানুষের যে জন্ম হয় সেখানে মানুষ কর্মে আবদ্ধ, কর্মই মানুষকে টেনে সব কিছু করায়। সেখানে অহং বোধ থাকে, কিন্তু ঈশ্বরের আমি ভাবটাই নেই। আমি ভাব থাকে না বলে তাঁর কর্মফলজনিত কোন কিছুই হয় না। আর বলছেন –

ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।
স এব জাত ভবনে কৌশল্যায়াং তবানঘ।১/৪/১৪

বলছেন এই ভূমির ভার, ভূমির ভার কারা হয়? এটা খুব মজার ব্যাপার, গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ভাষ্য দেওয়ার সময় আচার্য শঙ্কর বলছেন, যারাই হীনবল, দুর্বল তারাই ভারস্বরূপ। এই রকম কারা মনে করে? যারাই আসুরিক গুণসম্পন্ন মানুষ। দেখা যায় ধনীলোকরা সাধারণ গরীব মানুষদের ভারস্বরূপ দেখে। আর নিজের ধর্মের বাইরে সবাইকে ভারস্বরূপ মনে করে। অহিন্দুরা মনে করে হিন্দুরা সব ভারস্বরূপ, এদের বোমা মেরে উড়িয়ে দাও। নিজের ছোট্ট একটা গণ্ডি আছে সেই গণ্ডির বাইরে সবাইকে ভারস্বরূপ মনে করে। তাহলে বড়লোকদের কি কেউ ভারস্বরূপ মনে করে? হ্যাঁ মনে করে। ফরাসী বিপ্লবের পেছনে এটাই ছিল। বিপ্লবীরা ফরাসীতে বলে দিল বড়লোক যারা তারা সবাই ভারস্বরূপ। তারপর সবার গলা কাটা গেল। তার মধ্যে লেবোজিয়ার, এত বড় বিজ্ঞানী, তাঁরও গলা কেটে দিল। সেই সময় নামকরা গণিতজ্ঞ লেভারেজ বললেন, লেবোজিয়ারের মাথা কাটতে এক সেকেণ্ড লাগল, আর এই রকম মাথা জন্মাতে ফরাসীতে একশ বছর লাগবে। চীনের বিপ্লবের সময় মাও সে তুং বলে দিলেন বড়লোকরা সব ভারস্বরূপ। সেখানে গলা কাটা হয়নি, কিন্তু এমনই পরিস্থিতি করে দিত যাতে ওরা নিজেরাই আত্মহত্যা করে নেয়। নিজের মতাবলম্বীরাই ঠিক আর তার বাইরে সবাই ভারস্বরূপ। ধার্মিকরা বলবে পাপীরা ভারস্বরূপ। যারা ধর্ম পালন করছে তারাই এই সুন্দর বাগানের প্রফুল্লিত পুষ্প, বাকি সব আগাছা, ভারস্বরূপ। মানুষ মাত্রই মনে করে এই জগতে বেঁচে থাকার ঠিক ঠিক অধিকার আমার আর আমার নিজের লোকেদের। বিধর্মীরা তাই মনে করে, হিটলারও তাই মনে করত। হিটলার মনে করত বেঁচে থাকার অধিকার শুধু Aryanasদের, সব জহুদির গলা কেটে দাও। এখন জহুদিরা ইজ্রায়লে গিয়ে বসেছে তাই বলছে সব মুসলমানদের গলা কেটে দাও। তাহলে বেঁচে থাকার অধিকার কার? আমার, যে বলছে তার। তার বাইরে কখনই মনে করে না যে অপরের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। গরীবরা মনে করে বড়লোকরা শোষণ করছে এদের গলা কেটে দাও, বড়লোকরা মনে করছে গরীবরা ভারস্বরূপ এদের গলা কেটে দাও। শাস্ত্রেও সেই একই সমস্যা। শাস্ত্রের কাছে পাপীরা ভারস্বরূপ। ভগবান তাদের মারছেন, ভার কমিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো এক একটা দৃষ্টিভঙ্গী এগুলোকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে নেই। যাই হোক, এখানে বলছেন পৃথিবীতে পাপের ভার খুব বৃদ্ধি পেয়ে গিয়েছিল। পুরাণ শুরুই হয় পৃথিবীর সমস্যা নিয়ে, সে গরুর রূপ ধারণ করে ব্রহ্মার কাছে নিজের সমস্যার কথা বলতে গিয়েছিল। সেইজন্য ভগবান পৃথিবীর পাপের ভার লাঘব করার জন্য শ্রীরাম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বশিষ্ঠ মুনি রাজা দশরথকে তাঁর পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন, হে রাজন্! আপনি আগে কশ্যপ মুনি ছিলেন, কৌশল্যা অদিতি ছিলেন। আপনারা ভগবানকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য বর চেয়েছিলেন, সেই কারণে শ্রীরাম রূপে ভগবান জন্ম নিয়েছেন। শ্রীরামের সেবার জন্য শেষনাগ লক্ষ্মণ হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন আর ভগবানের শঙ্খ ভরত আর তাঁর চক্র শত্রুঘ্ন। ভগবানের সাথে তাঁর যোগমায়া থাকেন, তিনি সীতা হয়ে রাজা জনকের গৃহে জন্ম নিয়েছেন। এইসব বলার পর বশিষ্ঠদেব বলছেন –

বিশ্বামিত্রোঽপি রামায়া তাং যোজয়িতুমাগতঃ।৪/২০

রাম আর সীতার মিলন করাবার জন্যই বিশ্বামিত্রের এখানে আগমন। এই যা কিছু ঘটছে সব শ্রীরামচন্দ্রই ঘটিয়েছেন, যাতে রাম আর সীতার সংযোগ হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঠাকুরের লীলাপ্রসঙ্গে আমরা অনেক কিছু পাই। লীলাপ্রসঙ্গ রচনা করার সময় স্বামী সারদানন্দজীকে অনেকই তথ্য সরবরাহ করেছেন, তার মধ্যে একজন নামকরা তথ্য সরবরাহক হলেন হৃদয়রাম। এই ক্ষেত্রে হৃদয়রাম কতটা নির্ভরযোগ্য ছিলেন আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল। তবে শরৎ মহারাজ বলছেন হৃদয়রামের দেওয়া তথ্যকে উনি অনেক ভাবে যাচাই করে নিয়েছেন। ঠাকুরের জীবনে এই রকম একটি ঘটনা হল, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপধ্যায়ের তিন চার বছরের মেয়ে সারদাকে গ্রামের মহিলারা নিয়ে শিহড়ে গেছেন যাত্রা দেখতে। যাত্রাতে গ্রামের অনেকে এসেছে, ঠাকুরও সেদিন ওখানে ছিলেন। গ্রামের এক মহিলা সারদাকে জিজ্ঞেস করছেন, তুই কাকে বিয়ে করবি। ছোট্ট

মেয়ে সারদা নাকি ঠাকুরের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ঘটনা আরও পরের, ঠাকুরের জন্য যখন মেয়ের খোঁজ চলছে তখন ঠাকুর বলছেন, জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপধ্যায়ের বাড়িতে মেয়ে কুটো বাঁধা আছে। গাছের কোন ফলকে খড় দিয়ে বেঁধে রাখা হত, তার মানে এই ফল ঠাকুরের ভোগের জন্য রাখা হল, এই ফলে যেন কেউ হাত না দেয় বা নজর না দেয়। ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বছর আর মায়ের বয়স পাঁচ, আঠারো বছরের তফাৎ। সেই পাঁচ বছরের মেয়ে কুটো বাঁধা। ঠাকুর যেমন বলছেন জয়রামবাটীতে মেয়ে কুটো বাঁধা, ঠিক তেমনি এখানেও বলছেন সীতা মিথিলায় কুটো বাঁধা। তুমি যে এত তোড়জোর দেখছ, শুধু ওই মিলনটুকুর জন্য এত কিছু। স্বামীজী ভারত পরিক্রমা করছেন, সেই সময় খবর পেলেন চিকাগোতে বিশ্বধর্ম সম্মেলন হতে যাচ্ছে। স্বামীজী তখন নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বলছেন, এই যা কিছু আয়োজন হতে যাচ্ছে সব এর জন্য। অথচ স্বামীজী যেতে চাইছিলেন না। একবার অর্থ সংগ্রহ করা হল, কিন্তু উনি সব ফেরত দিয়ে দিলেন, এদিকে বলছেন ওখানে যা আয়োজন চলছে সব এর জন্য। এনারা কোথাও জিনিসটা জানতে পারেন এই রকম হতে যাচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের রামকথা ভাবপ্রবণ কাহিনী, সেইজন্য এই জিনিসগুলো এখানে বেশি জায়গা পেয়েছে, এখানে অপরিকল্পিত কোন ঘটনা নেই। সবটাই ভগবানের আগে থেকে ঠিক করা আছে। বিশ্বামিত্র এখানে আসবেন এটাও ঠিক করা ছিল।

লীলাধর্মী কাহিনীতে এই সমস্যা থাকবে। উচ্চ আধারের পাঠক যদি না হয় লীলাধর্মী কাহিনীতে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হবে, এদের তমোগুণটা বেড়ে যাবে। নিম্ন আধারের ভক্তরা মনে করবে, ঠাকুর তো আমার জন্য সব ঠিক করে রেখেছেন, ফলে ইষ্টের প্রতি পূর্ণ সমর্পণের ভাব থাকে না। কোথাও গিয়ে এদের তমোগুণটা বেড়ে যায়। এইসব শাস্ত্রের জন্যই আজ আমাদের দেশের নানা রকম সমস্যা হয়ে গেছে। তিনি তো ঠিক করে রেখেছেন, হলে হবে, না হলে হবে না। তমোগুণ বেড়ে যাওয়া মানে কর্মবিমুখতা গ্রাস করে নেয়, ভেতরের পৌরুষত্বটা ঘুমিয়ে পড়ে, তেজটা তাই কমে যায়। উচ্চ আধারের ভক্তদের এই সমস্যা হয় না। একজন সাধারণ গৃহস্থ নিজের জাগতিক সুখের জন্য চেষ্টা করে আর ঈশ্বরের নাম নেওয়ার সময় তাঁর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়, তিনি টানছেন না তাই বেলুড় মঠে আসা হয় না। সন্ন্যাসী কি করেন? জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর উপর ছেড়ে দেন আর সাধন-ভজন নিজের পুরুষকার দিয়ে চালিয়ে যান। লীলা কাহিনী আমাদের দেশে প্রচুর, নিম্ন আধারের ভক্তরা লীলা কাহিনী পড়ে পড়ে এমন মানসিকতা তৈরী করে ফেলে যে এরা সব কিছুই তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে অকর্মণ্য হয়ে যায়। সাধন-ভজনটাও তাঁর উপর ছেড়ে দেয় আর জাগতিক চেষ্টাটাও করতে চায় না। অথচ এদের ভেতরে কামনা-বাসনা, দুর্বলতা সবই আছে। যদি কিছু পেয়ে যায় তো ভালো, নাও যদি পায় পাওয়ার চেষ্টা নেই, একেবারে আলস্যের মধ্যে ডুবে থাকে। ঠাকুর এদেরকে বলছেন কুমড়ো কাটা বটঠাকুর। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নেই, বটঠাকুর সারাদিন বসে ভুড়ুর ভুড়ুর তামাক টানতে থাকে, কুমড়ো কাটার সময় কাউকে দিয়ে খবর পাঠায় তাকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য।

তাড়কার যোনিমুক্তি

সব বলার পর বশিষ্ঠদেব বললেন, আমি অতি গুহ্য কথা তোমাকে বললাম আর তুমি বিশ্বামিত্রকে পূজা করে খুশীমনে রাম ও লক্ষ্মণকে তাঁর হাতে তুলে দাও যাতে ওরা বিশ্বামিত্রের সাহায্য করতে পারে। রাজা দশরথও রাম আর লক্ষ্মণকে আশীর্বাদ ও আদর করে খুব প্রীতমনে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করলেন। বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চলেছেন। যেতে যেতে তিনি রাম আর লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা দুটো বিদ্যা শিখিয়ে দিলেন। বলা হয় যে, এই দুটো বিদ্যা যার থাকবে তার শরীর মনে কখন কোন ক্লান্তি আসবে না। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের বাস্তবিকই কখন ক্লান্তি হত না। এই বিদ্যা যার থাকবে তার শরীরে কোন ব্যাধিও হবে না। আরও হল, ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। বাল্মীকি বলা ও অতিবলা বিদ্যাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার বলছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় সে কাতর হয়ে পড়বে না, খিদে আছে কিন্তু খাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না, জল পিপাসা লেগেছে কিন্তু কোথাও জল পাওয়া যাচ্ছে না, এই বিদ্যা থাকলে সে ছটফট করবে না। বলা ও অতিবলা বিদ্যা থাকলে সৌভাগ্য সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তার সাথে যে কোন কাজে কর্ম কুশলতা ও দক্ষতা থাকে, জ্ঞান বুদ্ধি প্রখর হয়। তার থেকেও বড় ব্যাপার হল প্রতিবক্তব্য, প্রতিবক্তব্য হল কথাবার্তাতে খুব চটুলতা থাকা, কেউ একটা কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সেই কথার খুব বুদ্ধিদীপ্ত একটা জবাব দিয়ে দেবে। প্রতিবক্তব্য খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লক্ষণ। বিশ্বামিত্র রাম

ও লক্ষ্মণকে এই বলা ও অতিবলা বিদ্যা দিলেন। এবার ওনারা অযোধ্যা থেকে এগোতে এগোতে বিশ্বামিত্র মুনির আশ্রমের কাছাকাছি একটা জায়গায় চলে এসেছেন যেখানে তাড়কা রাক্ষসীর বধ হবে।

এক জায়গায় এসে বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণকে নিয়ে গঙ্গা পার করলেন। ওখান থেকেই রাক্ষসদের উপদ্রব শুরু। বিশ্বামিত্র বলছেন, এখানে ভয়ঙ্করী তাড়কা রাক্ষসীর বাস, সে কি করে –

অত্রাস্তি তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
বাধ্যতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন।১/৪/২৯

তাড়কা রাক্ষসীকে কামরূপিণী বলছেন। ইচ্ছা মত সে রূপ ধারণ করে নিতে পারে। পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতাদের এই ক্ষমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ইন্দ্র অনেক রকম রূপ ধারণ করে নিতে পারতেন। তাছাড়া যাদের অশুভ শক্তি ছিল তাদেরও এই ক্ষমতা ছিল। মানুষের মনের খুব গভীরে কোথাও একটা সুপ্ত বাসনা রয়েছে যে সে যেন অনেক রকম রূপ ধারণ করতে পারে। বাচ্চারা একটা গোঁফ লাগিয়ে মাকে ভয় দেখাতে যাবে, বা মুখোশ লাগিয়ে অন্য রকম একটা রূপ ধারণ করার ইচ্ছা করে। তাদের মনে এই ভাবটা কাজ করে, আমি যেন সবার কাছে অজানা থাকি বিশেষ করে দুষ্টুমি করার সময়। যারা ছিনতাই বা ডাকাতি করে তারাও একটা মুখোশ লাগিয়ে নেয়।

অসুররা যেমন অনেক রূপ ধারণ করতে পারত তেমনি রাক্ষসীরাও বিভিন্ন রকম রূপ ধারণ করে নিতে পারত, তার সাথে তাদের কামরূপিণীও বলা হত। এগুলোকে নিয়ে অনেক রকম ব্যাখ্যাও করা হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন কামনা রূপিণী যে রাক্ষসী তাকে বধ না করা পর্যন্ত জীবনে এগোনো যায় না। তাড়কা যে শুধু দেহধারী রাক্ষসী ছিল তা নয়, তার থেকেও বেশি হল আমাদের ভেতরে যে কামনা রূপিণী রাক্ষসী এই সেই আসল তাড়কা রাক্ষসী। *বাধতে লোকমখিলং*, তাড়কা রাক্ষসী এই অঞ্চল আর তার আশপাশের সব লোককেই পীড়ন করছে, তুমি তাই একে বধ করে দাও। বিশ্বামিত্র যদিও বধ করার কথা বলছেন, কিন্তু তার আগে বলছেন *তামবিচারয়ন*, এই রাক্ষসীকে বধ করার জন্য তোমার কোন কিছু বিচার করার দরকার নেই। বাল্মীকি রামায়ণের হিসাবে শ্রীরামচন্দ্রের বয়স তখন ষোল বছর, তাঁর মধ্যে সবে স্ত্রী পুরুষের ভেদ এসেছে। নারী বলতেই নারীর কতগুলি বিশেষণ আমাদের মাথায় ঘুরতে থাকে, অবলা, কোমলাঙ্গী, মধুরভাষিণী ইত্যাদি। কিন্তু বিশ্বামিত্র বলে দিচ্ছেন তুমি এই রাক্ষসীকে বধ করার সময় নারী পুরুষের বিচার করতে যেও না, নারী হলেও এ অত্যন্ত ক্রুঢ়া, নৃশংসী একে সরাসরি বধ করে দাও।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের মাতাহারি নামে একজন মেয়ে গুপ্তচর ছিল, মেয়েটি অত্যন্ত রূপসী ছিল। এই একটি মেয়ের জন্য হাজার হাজার বৃটিশ সৈন্য মারা গেছে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী কিছুতেই ওকে ধরতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত যখন ধরেছে, তখনও সরাসরি ধরতে পারেনি, অনেক কায়দা করে ধরতে হয়েছিল। এ্যলবার্ট স্পাল্ডিং একজন বিখ্যাত বেহালা বাদক ছিলেন। ওনাকে আমেরিকার বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বেহালা বাদক বলা হয়। স্বামীজী একবার এ্যলবার্ট স্পাল্ডিংএর বাড়িতে গিয়েছিলেন। স্পাল্ডিংএর মা আমেরিকার একজন উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। এ্যলবার্ট স্পাল্ডিংএর দিদিমা মোটাসোটা ছিলেন আর সারাটা দিন একটা ইজিচেয়ারে বসে থাকতেন, ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে খুব ভালোবাসতেন, ভদ্রমহিলা খুব মজার ছিলেন। এ্যলবার্ট স্পাল্ডিং বাচ্চা বয়সে স্বামীজীকে দেখেছিলেন। স্বামীজীর উপর তাঁর কয়েকটি স্মৃতিচারণ আছে। এ্যলবার্ট স্পাল্ডিংএর এক দুর্ধর্ষ জীবন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উনি একবার ইউরোপের কোন এক রাজপরিবারের অতিথি হয়েছিলেন। একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেখানে রাজার কানে এসে কেউ একটা কিছু বলতেই রাজা উঠে বেরিয়ে গেলেন। অনুষ্ঠান থেকে রাজার উঠে বেরিয়ে যাওয়াটা তখনকার দিনে চিন্তাই করা যেত না। সবাই খুব উদ্বিগ্ন, কি হয়েছে? তখন রাজা এসে বলছেন Matahari has been shot dead। রাজা মনে মনে বলছে আহা! মেয়েটি এত রূপসী ছিল, কেন যে ওকে মারল! এ্যলবার্ট স্পাল্ডিংএর লেখাগুলো খুবই হিউমারাস। ওনার স্ত্রীও অত্যন্ত উচ্চমানের বিদুষী মহিলা ছিলেন। উনি বলছেন, অসাধারণ এক রূপসী মেয়েকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারাটা অন্যায়। উনি নিজেও একজন আমেরিকান, ওনাকেও বাধ্যতামূলক ভাবে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়েছিল। যে কোন পুরুষের মনে একটা মেয়েকে মেরে ফেলাটা কোথাও একটা বাধো বাধো লাগে। মানুষের এটাই স্বভাব সৌন্দর্য দেখলেই সেখানে বিশ্বাসটা স্থির হয়ে যায়। বিশ্বামিত্র বলছেন *তামবিচারয়ণ*। বাল্মীকি বলছেন পাপ কখন লিঙ্গের উপর নির্ভর করে না।

বিশ্বামিত্রের কথা শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র প্রস্তুত হয়ে গেলেন। প্রথম বাণ মারার সাথে সাথে তাড়কা আরও ভয়ঙ্করী হয়ে তেড়ে আসছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র ধনুকের ছিলা টেনে এক ভীষণ টঙ্কার দিয়ে তাড়কার বক্ষ লক্ষ্য করে বাণ চালালেন। বাণ মারতেই তাড়কা রক্ত বমন করতে শুরু করেছে। এরপরেই তাড়কা মারা গেল। মারা যাওয়ার পরেই –

ততোহতিসুন্দরী যক্ষী সর্বাভরণভূষিতা।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ।১/৪/৩৩

এক আশ্চর্যের দৃশ্যের অবতারণ হল। তাড়কা মারা যেতেই ওর ভেতর থেকে এক অতি সুন্দরী নারী বেরিয়ে এসেছে। শুধু তাই না, তার সমস্ত অঙ্গ দামী দামী অলঙ্কার দ্বারা আভূষিত। ওই নারী একজন যক্ষী। যক্ষ হল যারা দেবতাদের ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। যক্ষরা দেখতে খুব সুন্দর হয় তার সাথে টাকা-পয়সা আছে সেইজন্য তাদের অহঙ্কারটাও বেশি। এগুলো কতটা সত্য কতটা কবির কল্পনা আমাদের জানা নেই। বাল্মীকি রামায়ণেও আছে তাড়কা রাক্ষসী প্রেতযোনী থেকে মুক্তি পেয়ে গেল। এর আগে সে একজন যক্ষী ছিল, কোন মুনির অভিশাপে সে প্রেতযোনীতে পতিত হয়ে গিয়েছিল আর শ্রীরামচন্দ্রের বাণ দ্বারা বিদ্ধ হতেই তার যোনিমুক্তি হয়ে গেল।

যোনিমুক্তির ব্যাপারটা আমাদের শাস্ত্রে অনেক জায়গায় আসে। বলা হয় যে, অবতার যখন আসেন তখন জগতে ক্রমবিবর্তনতায় একটা ধাক্কা (evolutionary push) লাগে। পৃথিবী, চন্দ্রমা, গ্রহ নক্ষত্রাদি যেমন নিজের নিজের বৃত্তে ঘুরছে ঠিক তেমনি মানুষের মন আর সভ্যতা একটা বৃত্তে ঘুরতে থাকে। আমি আপনি একটা কর্ম করছি, ওই কর্মের মধ্যেই আমরা সবাই ঘুরছি। এই বৃত্তটা বিরাট, তার মধ্যে আবার স্পেসও আছে। মনে করুন একটা বিরাট কুয়া আছে, ওর মধ্যে একটা গোলাকার জিনিস আছে যার মধ্যে কয়েকটা বল ঘুরছে, ঐটুকুর মধ্যেই উপর নীচে আসা যাওয়া করছে। কিন্তু সেখান থেকে আরও যে উপরে চলে যাবে সেই ক্ষমতাটা তার থাকে না। কোয়ন্টাম ফিজিক্সে কোয়ান্টাম জাম্প সম্ভব হয় না। যতক্ষণ না একটা বিশেষ শক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ তার trajectoryটা কখনই পাল্টাবে না। পৃথিবীতে আমি যত গতিতেই যাই না কেন পৃথিবীর আকর্ষণকে আমি ছাড়তে পারব না। পৃথিবীর আকর্ষণকে ছাড়াবার জন্য escape velocity দরকার। কিন্তু তখন আবার আরেকটা trajectoryতে গিয়ে চলতে থাকব। তারপর কি হয় আমরা জানি না। যদি আমরা মঙ্গল গ্রহে বা শনি গ্রহে চলে যাই, সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অন্য ধরণের escape velocity লাগবে। মানব সভ্যতা একটা বৃত্তের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ভক্তিশাস্ত্রে বলে মানুষে পক্ষে কখনই সম্ভব নয় যে সে মুক্তির দিকে যাবে। যুক্তির দিক দিয়েও যদি ভাবা হয় তাও সম্ভব নয়। অবতার যখন আসেন তখন তিনি একটা ধাক্কা দেন। এই ধাক্কার জন্য কয়েকজন ওই বৃত্ত থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। যেমন ঠাকুর এসেছেন, ঠাকুরের কাছে নরেন, রাখাল, তারক এনারা এলেন। এনাদের যদি আমরা মানব রূপে দেখি, যদিও ঠাকুর এনাদের ঈশ্বরকোটি বলছেন, ঈশ্বরকোটি মানলেও কোন অসুবিধা নেই। ঠাকুরের প্রভাবে এনারা মুক্ত পুরুষ হয়ে গেলেন। তার মানে, একটা রকেট প্রস্তুত ছিল escape velocity পাওয়ার জন্য, এবার সে escape velocity পেয়ে বেরিয়ে চলে গেল। নরেন, রাখালের থেকে যারা নীচে আছে তারা আরেকটু higher trajectoryতে চলে গেল। ঠাকুর যখন নরেন রাখালদের টেনে উপরে করে দিলেন, তাদের নীচে যারা ছিল তাদেরকে নরেন রাখালরা টেনে উপরে নিয়ে এলেন। ঠাকুর বলছেন কলমীর দল, এক অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যেমন আমি আপনাদের সাথে জড়িয়ে আছি, এবার আমি যদি উপরে যাই তখন এটা কখনই হবে না যে আমি আপনাদের টানব না। আপনার সাথে যারা জড়িয়ে আছে তাদের কি হবে? তারাও কিন্তু ওই টানটা টের পাবে। এই ক্ষমতা একমাত্র অবতারের থাকে। অবতার এসে যখন টানটা মারেন তখন ওই টানে অনেকেই উপরে চলে আসেন, যার ফলে সভ্যতাও একটা ধাক্কা পায়। ঠাকুর যখন এসেছেন, তখন অনেক কিছুতেই পরিবর্তন হতে শুরু হয়ে গিয়েছিল, বিজ্ঞানে, চিন্তা-ভাবনায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের সময়েও অনেক কিছুর পরিবর্তন এসেছিল, জানতে পারছি না তার কারণ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি তখন ছিল না। কিন্তু আমরা মানি এবং আজকে জানাও যাচ্ছে সমাজে ও সভ্যাতায় যে পরিবর্তন আসবে এটা অবতার ছাড়া হয় না। অবতার একটা evolutionary push দেন, ওই evolutionary pushএ কি হয় – স্বামীজী ছিলেন তাই রামকৃষ্ণ মিশন হল, রামকৃষ্ণ হল তাই ভালো কিছু

লোক ছিল তারা সাধু হয়ে গেলেন, তাঁরা আবার কিছু লোকদের টানলেন। যাদেরই মধ্যে একটু সৎগুণ আছে তারাই একটু ধাক্কাতেই উপরের দিকে চলে গেলেন। এটা হল একটা সিরিজ। দ্বিতীয় আরেকটা সিরিজও হয়।

অবতার যাদের যাদের উপর কৃপাদৃষ্টি দিলেন। কৃপাদৃষ্টি কৃপা কটাক্ষেও হয় আবার যাকে বকাবকি করছেন সেখানেও কৃপা হয়। অবতারদের কখনই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি থাকে না। রামকথাতে এই জিনিসটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। অবতারের ক্রোধ বলে কোন জিনিস হয় না। আমি আপনি যদি কাউকে বকাঝকা করি তার পেছনে আমাদের ক্রোধ থাকে। ঠাকুর বলছেন ফোঁস করবি বিষ ঢালবি না। শ্রীরামচন্দ্র যে কাউকে মারছেন বা ফোঁস করছেন তাতে কোন বিষ থাকছে না। বিষ না থাকার জন্য সে ভালোবাসলেও যা হবে রাগ করলেও একই জিনিস হবে। রাগ করার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত নতুন ধরণের একটা সাধনার কথা বলা হয় বৈরী ভাবে সাধনা। যদিও এই সাধনায় পরের দিকে বেশি উৎসাহিত করা হয়নি, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এসেছে। যদি কেউ শত্রুভাব নিয়ে ভগবানের সাধনা করে তখনও কিন্তু তার প্রতি ভগবানের একই ভাব থাকবে, যে ভাব তাঁর ভক্তের প্রতি আছে। গীতায় ভগবান বলছেন *ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ*, ভগবানের কারুর প্রতি দ্বেষও থাকে না আর প্রেমও থাকে না। ভগবানের আদরও যা কাউকে চড় মারাও তাই। আদর করা হয় শুভ শক্তিকে, আদর করলে তার মুক্তি হয়ে যায়। অশুভ শক্তিকে তিনি মারেন, ভগবানের ওই মারাতে তার যোনিমুক্তি হয়ে যায়।

ঠাকুর গোপালের মায়ের বাড়িতে গেছেন। সেখানে দুটো ভূত ছিল। ঠাকুর আসাতে ভূত দুটো বলছে, তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমার গায়ের বাতাস আমরা সহ্য করতে পারছি না। ঠাকুর শুনে হাসলেন। রাত্রে ওখানে ঠাকুরের থাকার কথা ছিল, কিন্তু ঠাকুর থাকলেন না। রাখালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছেন। রাতে গিয়ে নহবতের বাইরে থেকে হাঁকডাক করছেন। মা আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেছেন, এত রাতে কি খেতে দেব! ওখানে এসে রাখালকে ঠাকুর বললেন ওখানে দুটো ভূত ছিল, ভূতগুলো এই কথা বলাতে চলে এলাম। রাখাল শুনে বলছে, ভাগ্যিস তখন আমাকে বলেননি, শুনলে ভয়ে আমার দাঁতকপাটি লেগে যেত। অনেক পরে মায়ের কাছে বসে গল্প করার সময় এই ঘটনার প্রসঙ্গ উঠেছে। ঘটনা শোনার পর একজন মহিলা ভক্ত বলছেন, আহা! ভূতগুলো কেমন বোকা, ঠাকুরকে দর্শন করল, তাঁর কাছে মুক্তি চেয়ে নিলেই পারত। শুনে মা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, সেকি বলার অপেক্ষা থাকে, ঠাকুরকে দর্শন করেছে তাতেই সে মুক্ত হয়ে যাবে। তখন অনেকেই বলতে শুরু করলেন, ঠাকুরকে তো অনেকেই দেখেছেন, ঘোড়াগাড়ির মালিক আর তার ঘোড়াগুলোও তো ঠাকুরকে দেখেছে। শুনে মা আরও অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, অবশ্যই তাদের মুক্তি হবে। প্রথমের দিকে অনেকে সন্ন্যাসীরাও মায়ের এই কথাকে মেনে নিতে চাইতেন না, শাস্ত্রের সাথে মায়ের এই কথা মেলে না। কারণ শাস্ত্র বলে জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। তাঁরা তখন মঠের বয়স্ক বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা তখন বলছেন, মুক্তি তো অনেক রকমের হয়, যোনিমুক্তি, কর্মমুক্তি। শ্রীমা এখানে যোনিমুক্তির কথা বলছেন। তখন তাঁদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়। সেইজন্য বলা হয় গুরুর পেছনে ঘুর ঘুর করতে হয়। গুরু অনেক বকাঝকা করবেন, অনেক সময় তাড়িয়ে দেবেন, অনেক কিছুই করবেন। কিন্তু গুরু একটা কথা বলে দেবেন, তাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র কারুর উপর যখন কৃপা করছেন, যেমন পরে শবরীর কাহিনী আসবে, তিনি শবরীকে কৃপা করলেন, শবরীর মুক্তি হয়ে গেল, জন্ম-মৃত্যুর যে চক্র সেই চক্র থেকে মুক্তি হয়ে গেল। আর তাড়কাকে যখন তিনি বাণ দিয়ে বধ করলেন তখন তাড়কার যোনিমুক্তি হয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্র যার প্রতিই দৃষ্টিপাত করবেন তা তিনি কৃপাদৃষ্টিই করুন আর ক্রোধ দৃষ্টি করুন, মুক্তি দুজনরই হবে। একটাতে সংসার নিবৃত্তি অন্যটাতে যোনিমুক্তি। তিনি যতটুকু সময়ের জন্যই কারুর প্রতি মন দিয়েছেন, ভালোবেসেই দিন আর রেগেই দিন, ওতেই তার মুক্তি গ্যারান্টি। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই ভাবটাই আগাগোড়া চলতে থাকবে। যখনই শ্রীরামচন্দ্র কাউকে বধ করে দিচ্ছেন তার একটা মুক্তি হয়ে যাচ্ছে, হয় যোনিমুক্তি, তা নাহলে এই মুক্তি কি সেই মুক্তি বা কোথাও সে আটকে আছে সেটাও খুলে গেল। অবতার ছাড়া এই জিনিস সম্ভব নয়, একমাত্র অবতাররাই এভাবে মুক্তি দিতে পারেন।

তাড়কার এখন যোনিমুক্তি হয়ে গেছে। সে ছিল যক্ষী, কোন মুনির অভিশাপে সে রাক্ষসী হয়ে গিয়েছিল, রাক্ষসী হয়ে যাওয়াতে তার ব্যবহারটাও রাক্ষসীর মত হয়ে যাবে। কিন্তু তার এই বোধটা থাকবে আমি তো আসলে এই রকম নই, আমি তো অন্য কিছু। এই বোধ যদি নাও থাকে কিন্তু যেমনি শরীর পতন হবে তখন তার মনে হবে, আরে আমি এসব কি করছিলাম! তাড়কার এই বোধ এসে গেছে। তখন সে শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা করল।

যখন কাউকে খুব উচ্চ সম্মান জ্ঞাপন করা হয় তখন তাঁকে পরিক্রমা করে প্রণাম করে। তাড়কাও পরিক্রমা করে শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে নিজের জায়গায় চলে গেল।

শ্রীরামের এই অদ্ভূত কাণ্ড দেখে বিশ্বামিত্র একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। বিশ্বামিত্র এক সময় ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনিও তীর-ধনুক চালাতে জানতেন। শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য ও পরাক্রম দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেছেন। তাড়কাকে একটা বাণ মেরেছেন, দুটো বাণও চালাতে হল না, তাতেই তাড়কা যে ছিটকে পড়ল আর দাঁড়াতে পারল না, ওখানেই সে শেষ। তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর বিশ্বামিত্র যত রকম দৈবী অস্ত্রবিদ্যা জানতেন সব অস্ত্র শ্রীরাচন্দ্রকে সমর্পণ করে দিলেন। বাল্মীকি এই দৃশ্যকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি সেখানে বর্ণনা করছেন, শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে আচমন করে সব দিব্যাস্ত্র গুলিকে গ্রহণ করেছেন। যে কোন অস্ত্রকে কিভাবে আবাহন করা হয়, সন্ধান করা হয় তারপর বিক্ষেপ করা হয় আর তাকে আবার ফেরত আনা হয়, বাল্মীকি অস্ত্র চালনার এই জিনিসগুলিকে খুব প্রাঞ্জল ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। অশ্বত্থামার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র ছিল, তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের আবাহন করতে পারতেন, সন্ধান করতে পারতেন, নিক্ষেপও করতে পারতেন কিন্তু ফেরত আনার কৌশলটা জানা ছিল না। চালিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু চালাবার পর আর তিনি কোন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। বিশ্বামিত্র প্রদত্ত এই দৈবী অস্ত্রগুলি, যে অস্ত্রগুলিকে শ্রীরামচন্দ্র পরে আগাগোড়া ব্যবহার করতে থাকলেন, প্রত্যেকটি অস্ত্রের উপর শ্রীরামচন্দ্র তখনই ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি দিব্যাস্ত্র তাদের দিব্য রূপ ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলছে, আমরা সবাই এখন আপনার অধীন, আপনি আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু বললেন, আপনারা এখন নিজ নিজ ধামে ফিরে যান, যখন যেমন যেমন দরকার হবে আমি আপনাদের স্মরণ করব। এবার শ্রীরামচন্দ্র হয়ে গেলেন ঋণী, কারণ আগেই তাঁর অস্ত্র-শস্ত্রের শিক্ষা-দীক্ষা ছিল, তার সাথে বলা অতিবলা বিদ্যা পেয়ে গেলেন। ঠাকুর তাঁর সব কিছু নরেনকে দিয়ে ফকির হয়ে গেলেন বলছেন। ঠাকুরের তো আরও অনেক শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তাঁদেরকে তো দিলেন না। কিছু পাওয়ার জন্য তোমাকে কিছু দেখাতে হবে। আমরা যে ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছি, হে ঠাকুর তুমি কৃপা কর। ঠাকুর আমাদের কী কৃপা করবেন, আমাদের কি কিছু আছে যে তিনি কৃপা করবেন। সরু তার দিয়ে ৪৪০ ভল্ট বিদ্যুৎ আনতে গেলে ওই তারের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ! ট্রান্সফর্মার পুড়ে যাবে। তার আগে ইলেক্ট্রিক তারকেও শক্তি দেখাতে হবে। শক্তি থাকলে তখন তাকে তিনি তাঁর কাজে লাগাবার জন্য কৃপা করেন। অসুরদের উপদ্রব খুব বেড়ে গেছে, তখন বলছেন, শিব যদি সন্তান উৎপাদন করেন তখন সেই সন্তানই অসুরদের বদমাইশি বন্ধ করতে পারবে, এছাড়া সম্ভব হবে না। কিন্তু শিবের ওই শক্তিকে কে ধারণ করবে? বলছেন, পার্বতীকে তৈরী করাতে হবে, পার্বতী ছাড়া আর কেউ শিবের শক্তি ধারণ করতে পারবে না। অন্যদের ক্ষেত্রে শিবের ভালোবাসার প্রভাবে তাদের শরীরে আগুন লেগে গিয়ে সব ভস্ম হয়ে ছিটকে যাবে। আবার গঙ্গ যখন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামবেন, তখন সোজা নেমে এলে পৃথিবী তার বেগ সহ্য করতে পারবে না। তাহলে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামার সময় গঙ্গাকে কে ধারণ করবেন? গঙ্গাকে ধারণ করারও ক্ষমতা থাকা চাই। শিব ছাড়া গঙ্গার অবতরণের ওই বেগকে কেউ সামলাতেই পারবে না। শিব তখন তাঁর জটা ছড়িয়ে দিয়েছেন। গঙ্গা শিবের জটাতে নেমেছেন। গঙ্গাই এবার নিজে ফেঁসে গেছেন, জটার জালে আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। আবার যখন নামছেন তখন এক বিরাট পাথরে গঙ্গা আটকে গেছে। এখন এই পাথরকে কে সরাবে? বলছেন, ঐরাবতই পারবে। ঐরাবত বলছে, আমি না হয় পাথর সরিয়ে দেব কিন্তু তার জন্য গঙ্গাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে। কিন্তু ভগীরথ মা গঙ্গাকে কি করে বলতে পারে এই কথা! গঙ্গা হলেন মা, বলা অসম্ভব। ভগীরথেরও আর কোন দ্বিতীয় পথ নেই, তাঁর এতদিনের তপস্যা আবার এখানে আটকে আছে। ভগীরথকে বাধ্য হয়ে বলতে হল। শুনে গঙ্গা মা বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো রাজি যদি হাতি আমাকে সামলে নিতে পারে আমি অবশ্যই রাজী হব। ঐরাবত এসে দাঁত দিয়ে পাথর সরিয়ে দিল। পাথর সরিয়ে দিতেই গঙ্গা ঐরাবতকে শুদ্ধু একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। এই যে শক্তি, যে কোন শক্তিকে পাওয়ার জন্য তাকেও সেই রকম শক্তিশালী হতে হবে। এই যে শিবের শক্তি, শিবের যে ভালোবাসা একে কেউ নিতে গেলে তার মাথাটাই বিগড়ে যাবে।

যাযাবর বা বাঞ্জারা জাতীয় লোকেদের নামে বদনাম আছে যে ওরা এদিক সেদিক চুরি করে বেড়ায়। একবার এক রাজা এদের একটি মেয়েকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেছে। রাজা বলে কথা, বিয়ে করে ওকে রাজমহলে নিয়ে এসেছে। সবই ঠিক আছে, কিন্তু মেয়েটি খেতে পারছে না। দিনে দিনে রোগা হয়ে যাচ্ছে। রাজার

প্রচুর দুশ্চিন্তা। অনেক বৈদ্যকে দেখান হল, অনেক চিকিৎসা হল কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। কিছুই যখন হল না তখন ভাবল এক কাজ করা যেতে পারে। রাজাকে সবাই বলে দিল, ওর খাওয়া কখন টেবিলে দেবে না, খাওয়া লুকিয়ে রেখে দেবে, কখন পর্দার পেছনে, কখন পালঙ্কের তলায়, কখন দরজার ফাঁকে। ওদের স্বভাবেই আছে চুরি করে বেড়ান। খাওয়ার সময় খুঁজে বেড়ায় কোথায় খাবার আছে। এতদিন কোথাও খাবার চুরি করে পেত না। কিন্তু এখন চুরি করে খেতে পারছে। কদিনের মধ্যেই তার শরীর আগের মত হয়ে গেল। এমনি সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু চুরি না করলে খেতেই পারবে না। আধ্যাত্মিক জীবনেও ঠিক তাই হয়, কোন গুরু তাঁর শিষ্যকে কিছু দেবে না, তাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নেবে, সব কিছু করিয়ে নেবে কিন্তু দেবে না কিছু। হৃদয়রামকে দিয়ে ঠাকুর সারা জীবন সেবা করিয়ে নিলেন কিন্তু তাকে কিছুই দিলেন না। ঠাকুর বলছেন, তুই সেবা করে যা এতেই তোর হবে। কিন্তু দেওয়ার সময় দিলেন নরেনকে, কারণ নরেনের সেই শক্তিটা ছিল। দেওয়ার পর বলছেন, তোকে সব কিছু দিয়ে আজ আমি ফকির হয়ে গেলাম। ঠিক একই জিনিস এখানে বিশ্বামিত্র করলেন, শ্রীরামের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে এই দিব্যাস্ত্রকে ধারণ করার। গুরু এমনিই বলবেন, আমি তো তোমাকে দিতে রাজী আছি কিন্তু তুমি নিতে পারবে কি, তুমি নিজেই ছিটকে যাবে। হৃদয়রামও মাঝে মাঝে আবদার করে বলত, মামা! কিছু একটা অনুভূতি অন্তত দাও। ঠাকুর বিরক্ত হয়ে হৃদয়রামকে একটু ছুঁয়ে দিয়েছেন। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়রাম দেখছে তার শরীরটা আলোর শরীর হয়ে গেছে। মথুরবাবুও চাইছিলেন আমারও কিছু একটা হোক। ঠাকুরও তাকে ছুঁয়ে দিলেন, মথুরবাবুরও মাথাটা ঘুরে গেল। তিন দিন সে আর কোন কাজকর্ম কিছুই করতে পারছে না। শেষে ঠাকুরকে গিয়ে বলছেন বাবা! তোমার শক্তি ফেরত নিয়ে নাও। আমাদের কাছে সবটাই মেকি, যতই ভালোবাসার কথা বলি সব মুখের কথা, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির কথা বলি সেটাও মুখের কথা। কিছুই তো ভেতরে নেই, পুরোটাই ফাঁপা, মারলে শুধু আওয়াজ বেরোয়। যে যত বড় তার তত আওয়াজ, যত বড় বাঁশ তার তত বড় ফোঁপর। ঢোল যত বড় তার আওয়াজও তত বেশি। কিন্তু বিশ্বামিত্র বুঝে গেছেন। কি করে বুঝলেন? তাড়কাকে যখন মেরেছেন তখন ওই তীরের সন্ধান দেখেই বুঝতে পারলেন এর ভেতরে শক্তি আছে। শেষে সব বিদ্যাটাই শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়ে দিলেন।

মারীচ ও সুবাহুর পরাজয়

তাড়কা রাক্ষসীর বধ হয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ দুজন বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করতে করতে কামাশ্রমে, যেখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল, সেই সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ করলেন। আশ্রমে বিশ্বামিত্রের শিষ্য ও অন্যান্য মুনিরা সবাই শ্রীরামচন্দ্রের খুব সম্মান করে পূজা করলেন। শ্রীরামচন্দ্রও বিশ্বামিত্রকে বললেন আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যজ্ঞের দীক্ষা নিন। যজ্ঞের একবার সঙ্কল্প নিয়ে নিলে বিশ্বামিত্র আর হিংসা করতে পারবেন না। সেইজন্য রাক্ষসরা ওই সময়টাকে বেছে নিয়ে উপদ্রব শুরু করে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মজা করে একটা গল্প বলতেন। কয়েকটি মাতাল ঠিক করল মদ খেয়ে নিজেরাই অভিনয় করবে। কিসের অভিনয় করবে, একজনকে মরা সাজতে হবে আর তাকে চারজন কাঁধে করে নিয়ে যাবে। যেতে যেতে চারজন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। সবাই তো মদ খেয়ে আছে, এখন কেওড়াতলা যাবে না নিমতলার দিকে যাবে কিছুই ঠাহর করতে পারছে না। তখন যে মরা সেজেছে সেও মাতাল কিন্তু বলছে, কেওড়াতলাও জানি আর নিমতলাও জানি, মরা সেজেছি কিনা তাই আর বলব না। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার পর চাইলেও অনেক ব্যাপারে সে মুখ খুলতে পারবে না, অনেক কিছু বলা যাবে না। বিশ্বামিত্র তিনিও অস্ত্র-শস্ত্রের বিদ্যা জানেন, তিনি চাইলে দু চারটে অসুরকে এমনিই উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু দীক্ষা নিয়ে নিয়েছেন কিনা, এখন আর হিংসা করতে পারবেন না। সেইজন্য আরেকজনের সাহায্য দরকার, যিনি তাঁর হয়ে উপদ্রবগুলো সামলে নেবেন।

বিশ্বামিত্র যজ্ঞে বসেছেন। যেমনি যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে ধুম্র উদ্‌গীরণ হতে শুরু হয়েছে তখনই দেখা গেলে দুজন রাক্ষস এসে গেছে। এদের একজনের নাম সুবাহু অন্য জনের নাম মারীচ। বলছেন *রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ*, কামরূপী দুই রাক্ষস। দুজনের মধ্যে কামনার রূপটা বিশাল, রাক্ষস মানেই তাই, ভেতরে প্রচুর কামনা। অসুর রাক্ষসদের রজোগুণটা বেশি থাকে। পিশাচাদিদের মধ্যে তমোগুণের প্রাধান্য। দুজনকে দেখেই শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে তীর বসিয়ে কান পর্যন্ত লম্বা করে টেনে নিয়ে এসেছেন, কান পর্যন্ত টানা মানে তীরের শক্তিকে বাড়িয়ে দেওয়া। তীর ছাড়তেই দুটো পৃথক দৃশ্য দেখা গেল, সুবাহু রক্ত বমন করতে করতে সেখানেই মারা গেল আর মারীচ একশ যোজন দূরে সমুদ্রের ধারে গিয়ে ছিটকে পড়ল। রামায়ণ মহাভারতে এই সমস্যাটা আছে, সমুদ্রের ব্যাপারে ওনারা সব সময় সংশায়ত্মক ছিলেন। দ্বিতীয় সমস্যা হল যোজনের হিসাব। বলা হয় যে আজ

পর্যন্ত ওনারা যোজন বলতে কতটা দূরত্বের হতে পারে বলতে পারেননি। এক জায়গায় হয়ত বলছেন যোজন মানে পাঁচ কিলোমিটার কি ছয় কিলোমিটার, অন্য জায়গায় অন্য রকম হিসাব, দুটোর বর্ণনায় হিসাবের মিল পাওয়া যাবে না। আর যোজনের যে কত রকমের সংজ্ঞা আছে আমাদের জানাও নেই। একটা সংজ্ঞাতে যোজন মানে একটা গরুর গাড়ি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত যত দূর যায়, সেটা হল এক যোজন। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত গরমের সময় যাচ্ছে নাকি শীতের সময় যাচ্ছে সেই ব্যাপারে কিছু বলছেন না, গরমে আর শীতে হিসাবটা তো পাল্টে যাবে। মাপজোপের ব্যাপারটা ভারতে এক বিচিত্র জিনিস ছিল। অনেক কিছুকে নিয়ে আমরা গর্ব করি ঠিকই। শুধু সময়কে নিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে দেখা যাব সময়ের কত রকমের বিভাজন করা হয়েছে। ভাগবতে সময়ের বিভাজন করে সব থেকে ক্ষুদ্র যে সময়ের ইউনিট বার করা হয়েছে তাকে বলছেন নিমি। নিমি থেকে শুরু করে সময়ের ইউনিটের সব থেকে বড় ইউনিট নিয়ে গেছে ব্রহ্মার আয়ুকালে। কত রকমের ডিভিশান, কিন্তু এই ডিভিশানকে যে বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগানো যাবে তারও উপায় নেই।

সময়ের পর আসে দূরত্বের পরিমাপ, সেখানেও একই দুরবস্থা। এনারা সব কিছুকে কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করতেন, কবিতাতে করার জন্য শব্দগুলি খুব শ্রুতি মধুর হত। পৌরাণিক শাস্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবেই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু পুরাণের দেওয়া তথ্যকে আধার করে কেউ যদি বিজ্ঞান, ভূগোলের উত্তর খুঁজতে যায় তখন অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। এখানে একশ যোজন বলে দেওয়া হল, তার মানে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে, এরপর আর বেশি ঘাঁটাঘাটি করতে যেও না। উদ্দেশ্য হল শ্রীরামচন্দ্রের তীরের শক্তি দেখান। শ্রীরামচন্দ্রের তীরের শক্তির বর্ণনা পুরো রামায়ণে পর পর আসতেই থাকে, কোথাও যে একটু কম দেখাবেন তা হবে না, সব ক্ষেত্রে সমান ভাবে দেখান হয়েছে। মারীচকে শ্রীরামচন্দ্র একটা ভোঁতা বাণ মেরেছিলেন। বাণ অনেক রকমের হয়। যেমন কোন বাণের ডগায় পাতলা আঠা দিয়ে ছুঁচ লাগানো থাকে। বাণ যেখানে বিদ্ধ হবে, সেখান থেকে বাণ বার করার সময় ছুঁচটা ভেতরে থেকে যাবে আর বাণ আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই রকম ছুঁচলো বাণ, ভোঁতা বাণ, ভারী বাণ নানান রকমের বাণ হয়। তীর দিয়ে সে যা করতে যাচ্ছে সেই অনুসারে বাণ বেছে নিত। মারীচকে একটা ভোঁতা বাণ মেরেছেন। ভোঁতা বাণ মারাতে মারীচ ছিটকে একশ যোজন দূরে সমুদ্রের কাছে গিয়ে পড়েছে। পরে রাবণকে মারীচ বলবে, তখন তো রাম নেহাতই বাচ্চা ছিল তখনই এমন বাণ মেরেছিল যে আমার এই অবস্থা হয়েছিল, তাই এখন আমি আর তাঁর ধারে কাছে যাচ্ছি না। সুবাহুকে যেভাবে মেরে দিয়েছিল সেভাবে মারীচকেও মেরে দিলে সেখানেই সব ঝামেলা চুকে যেত, পরে হরিণ হয়ে এত কাণ্ড করতে পারত না। এগুলোকেই বলে লীলা। কেন এমন করলেন এই নিয়ে বেশি প্রশ্ন করতে নেই।

কথাকাররা ব্যাখ্যা করবেন শ্রীরামচন্দ্র আগে থেকেই জানতেন পরে এই মারীচ স্বর্ণমৃগ হয়ে আসবে, একে যদি মেরে দিই পরে তাহলে লীলা চলবে না। কাহিনীকাররা এগুলোর বিভিন্ন অর্থ বার করতে থাকেন। এগুলোকে দুদিক থেকে দেখা যায়। একটা হল যেমনটি আছে তেমনটিই আছে, এর বেশি অর্থ বার করতে নেই। অধ্যাত্ম রামায়ণ মূলতঃ লীলাগ্রন্থ, লীলাগ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র যদি চোখটা একটু তুলে তাকান তারও একটা অর্থ হয়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণে আবার এগুলোকে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। তিনি ভোঁতা বাণ বেছে নিলেন, নিয়েছেন তো নিয়েছেন, কেন বেছে নিলেন এরপর এর অর্থ বার করার কোন মূল্য থাকে না। টলস্টয় খুব বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পর সাংবাদিকরা সারাদিন তাঁর বাড়ির সামনে বসে থাকত। টলস্টয় যা বলতেন সেটাকেই তারা নোট করে যেত। উনি হয়ত বললেন, আমি এবার স্নান করতে যাব, সেটাও নোট করে যেত। কারণ এই কথার পেছনেও একটা অর্থ আছে। কথামৃতেও মাস্টারমশাই বলছেন, ঠাকুর বললেন জল খাব। ঠাকুরের এই কথার পেছনেও একটা অর্থ আছে। কি আর অর্থ থাকবে, জলতেষ্টা পেয়েছে তিনি জল খাবেন। এর বেশি অর্থ বার করেতে নেই, যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে দিতে হয়।

একদিকে সুবাহু মারা গেছে অন্য দিকে মারীচ ছিটকে সমুদ্রের কাছে গিয়ে পড়েছে। অন্য দিকে লক্ষ্মণও বাণ চালাচ্ছেন। বাকি যারা ছিল সবাই তখন প্রাণ ছেড়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। এসব দেখে বিশ্বামিত্র খুব খুশী হয়েছেন, তিনি দু ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ যতদিন বিশ্বামিত্রের আশ্রমে ছিলেন তিনি দুজনকে অবসর সময়ে ইতিহাস পুরাণের কাহিনী শোনাতেন। তখনকার দিনে বেদ শিক্ষা একটা বিশেষ পদ্ধতিতে দেওয়া হত। যজ্ঞাদি চলাকালীন বেদের শিক্ষা দেওয়া যাবে না। কিন্তু সন্ধ্যার সময় বা দুপুরবেলা বা রাত্রিবেলা যখন কোন কাজ থাকত না তখন তাঁরা ইতিহাস পুরাণের কাহিনী শোনাতেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর

বিশ্বামিত্র বলছেন, কাছেই মিথিলার রাজা এক বিরাট যজ্ঞ করছেন, চল আমরা সবাই সেই যজ্ঞে যাই। যজ্ঞ হওয়া মানেই ব্রাহ্মণরা দক্ষিণাদি পাবেন। বিশ্বামিত্রের দক্ষিণা পাওয়ার প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না, কিন্তু সেখানে অনেক জ্ঞানী-গুণী লোকের সমাগম হবে। তার থেকেও বড় হল রাজা জনকের কাছে একটা বিরাট ধনুক আছে, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্র সেই ধনুক দেখাতে চাইছেন। যেতে যেতে একটা জায়গায় যাওয়ার পর বলছেন –

অহল্যার শাপোদ্ধার

গৌতমস্যাশ্রমং পূণ্যং যত্রাহল্যা শিলাময়ী।১/৫/১৪
দিব্যপুষ্পফলোপেত-পাদপৈঃ পরিবেষ্টিতম্।

বিশ্বামিত্র সবাইকে নিয়ে গঙ্গা নদীর কাছে গৌতম মুনির আশ্রমে গেলেন। লোকমুখে প্রবাদ যে ছাপড়ার ধারে কাছে গৌতম মুনির আশ্রম ছিল। গৌতম মুনির আশ্রমে অহল্যা তপস্যা করছিলেন। আশ্রমের ফুল, ফল সবটাই দিব্য, আশ্রমের গাছপালা যা কিছু আছে সব কিছুরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ছে। শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন আশ্রমে দিব্য ফল, দিব্য পুষ্প কিন্তু –

মৃগপক্ষিগণৈহীনং নানাজন্তুবিবর্জিতম্।১/৫/১৫
দৃষ্ট্বোবাচ মুনিং শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ।
কস্যৈতদাশ্রমপদং তপতাং সুখদং মহত।১/৫/১৬
পত্রপুষ্পফলৈর্যুক্তং জন্তুভিঃ পরিবর্জিতম্।
আহ্লাদয়তি মে চেতো ভগবন্ ব্রূহি তত্ত্বতঃ।১/৫/১৭

শ্রীরামচন্দ্রের আরেকটি নাম রাজীবলোচন, তাঁর চোখ দুটো পদ্মফুলের মত ছিল, তাই তাঁকে রাজীবলোচন বলে সম্বোধন করতেন। শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করছেন, আশ্রমটি এত সুন্দর দিব্য ফুল, ফলে শোভিত, সবই আছে, আর সবই রমণীয় কিন্তু কেমন যেন প্রাণহীন লাগছে। গাছপালা আছে, ফল ফুলও আছে কিন্তু একটিও পাখি নেই, একটিও পশু নেই। এখানে শব্দটা বলছেন মৃগপক্ষি, পোকামাকড়ও থাকার কথা নয়। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পুরো ব্যাপারটা আশ্চর্যের লাগছে। বিশ্বামিত্রকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এই আশ্রম কার, আর ব্যাপারটা কি? যে আশ্রমের গাছাপালা, যার পত্র, ফুল, ফল এত রমণীয় অথচ *জন্তুভিঃ পরিবর্জিতম্*, এটা কি করে হয়? অথচ স্থানটি এত মনোরম যে আমার মনপ্রাণ আহ্লাদিত হচ্ছে। এটাই কাব্য, একদিকে জীবনের প্রাচুর্য অন্য দিকে মৃত্যুর ছায়া, একদিকে মৃত্যু অন্য দিকে ভরপুর জীবন। একটা বিপরীত ভাবকে যখন নিয়ে আসা হয় তখন সেটাই খুব উচ্চমানের চিন্তন আর অত্যন্ত উন্নতমানের কবিতা হয়ে দাঁড়ায়। এখানে সব কিছুই আছে গাছপালা, পত্র, পুষ্প, ফল সবই আছে কিন্তু অন্য দিকে কোন প্রাণী নেই, যা দিয়ে প্রাণের অস্তিত্ব বোঝা যায়। পুরোটাই যেন একটা ছবির মত স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ওই ছবিতে কোন পশু পাখিরা আসবে না। অথচ একেবারেই যে প্রাণহীন নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে তাও নয়, জায়গাটা দেখার পর ভেতর থেকে আনন্দ হচ্ছে। ভেতর থেকে আনন্দ হওয়ার কারণ কি? এখানেই তন্মাত্রার ব্যাপার এসে যাচ্ছে। যাঁর মধ্যে শুভ শক্তি, পবিত্রতার ভাব বিরাজ করে, তাঁকে দেখে বা তাঁর কাছে গেলেই একটা ভালো লাগার ভাব জেগে ওঠে। আমরা যখনই খাণ্ডাহারের কথা ভাবি তখনই জায়গাটাকে কেমন ফাঁকা ফাঁকা ভুতুড়ে মনে হয়। এখানে ভুতুড়ে মনে হচ্ছে না, অথচ ভুতুড়ে হওয়ার যে লক্ষণ সেটাও আছে, কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মন আহ্লাদিত হয়ে উঠছে। তার মানে এমন কোন শক্তি এখানে কাজ করছে, যে শক্তির প্রভাবে ভেতর থেকে একটা আনন্দ অনুভব হচ্ছে। তখন বিশ্বামিত্র এর পেছনের কাহিনীটা বলছেন। ওখানে কিছু সূক্ষ্ম শুভ শক্তি কাজ করছে, যে সূক্ষ্ম শুভ শক্তির প্রভাবে এই বিপরীত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বামিত্র বলছেন, গৌতম মুনি সপ্তর্ষি মণ্ডলের একজন বিরাট ঋষি, এই আশ্রম তাঁরই। এক সময় তিনি এখানে থাকতেন। ঋষি মুনিরা একা থাকলে অনেক সমস্যা হত, একা থাকলে কোথায় খাবে, কে খাওয়া দেবে, তাঁর সেবা কে করবে, এই সমস্যাগুলো থাকত। সেইজন্য আগেকার দিনে কোন বড় ঋষিকে রাজা তার মেয়েকে নিয়ে বলতেন, আমার এই মেয়েকে গ্রহণ করুন, আপনার সেবায় আমার মেয়ে এখানে থাকবে। মহাভারতে এর ধরণের প্রচুর কাহিনী আছে। সন্ন্যাসীরা কখন নিতেন না। সন্ন্যাসীরা ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, ঋষি মুনিরা আশ্রম করে থাকতেন। আশ্রম করে থাকতে গেলে অনেক সমস্যা হয়। গৌতম মুনিও আশ্রম করে এমন ধ্যান ধারণাতে ডুবে

থাকতেন যার জন্য ব্রহ্মা লোকসুন্দরী অহল্যাকে গৌতম মুনির সেবার জন্য দিলেন। যদিও শব্দটা সেবা কিন্তু ঋষি মুনিরা স্বামী স্ত্রী রূপেই থাকতেন। বেদে যদিও ইন্দ্রকে অনন্তের মুখ রূপে দেখান হয়েছে, ঠিক তেমনি পরে তাঁকে আবার ক্ষমতাবান মানুষ রূপেও দেখান হয়েছে। মানুষের মধ্যে রাজার যেমন শক্তি থাকে, তার সাথে অনেক রকম দুর্বলতাও থাকে, ইন্দ্র যেন সেই রকম রাজা। ক্ষমতাবান লোকের যেমন দশটা গুণ আর দু-চারটে দোষও থাকে, ঠিক তেমনি ইন্দ্রেরও কয়েকটা বড় রকমের দোষ ছিল। ইন্দ্রের মধ্যে শক্তিও আছে, যেহেতু ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের একজন তাই তাঁর শক্তিটা আত্মশক্তি থেকে আসত। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে দেখলে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারতেন না। অহল্যাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রের ঘটনা খুব নামকরা। আর সোমরস পান করে ইন্দ্রের মাথা ঘুরে যাওয়ার অনেক বর্ণনা আছে। এইভাবে ইন্দ্রের দুটো ব্যক্তিত্ব পাশাপাশি চলত, একটা উপর দিকের ব্যাক্তিত্ব আরেকটা নীচের দিকের ব্যক্তিত্ব। উপর থেকে যখন ব্যক্তিত্ব চলত তখন তিনি যেন সেই অনন্তেরই মুখ। আবার যখন নীচের দিকে যাচ্ছে তখন মানুষের শক্তিরই একটা বৃহৎ রূপ। অহল্যাকে দেখার পর থেকে ইন্দ্রের মাথায় শুধু ঘুরছে কিভাবে অহল্যাকে পাওয়া যায়।

অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনী হল, গৌতম মুনি ভোরবেলা উঠে গঙ্গা স্নানে চলে যেতেন। ইন্দ্র সব সময় সুযোগ খুঁজে যাচ্ছে কিভাবে অহল্যাকে কাছে পাওয়া যায়। এমনিতেও বলা হয় কামী পুরুষ কখনই শান্ত থাকতে পারে না, মনের মধ্যে সব সময় চাঞ্চল্য থাকবে। একদিন ইন্দ্রের নজরে পড়ল গৌতম মুনি ভোরবেলা গঙ্গা স্নানে যাচ্ছেন। রোজ সকালেই যেতেন কিনা এখানে পরিষ্কার বলা নেই। বাল্মিকী রামায়ণের কাহিনী পরিষ্কার, সেখানে দেখাচ্ছেন গৌতম মুনির অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র কায়দা করে অহল্যাকে গিয়ে বলছেন, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। এদিকে অহল্যাও ইন্দ্রের কথা শোনার পর ভালো লেগেছে। ভালো লাগার পেছনে অহল্যার অহঙ্কারের ব্যাপারটা বেশি কাজ করছে। দেবতাদের যিনি রাজা, আমাকে দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেছে, এটাই অহল্যার কাছে বিরাট গর্বের ব্যাপার। মেয়েদের আসল শক্তি তাদের সৌন্দর্যে আর লাবণ্যে। এই শক্তি দিয়েই তারা পুরুষদের আকর্ষিত করে। রূপ আছে, লাবণ্যও আছে অথচ কোন দিকে নজর নেই, আমাকে কে দেখছে না দেখছে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, বুঝতে হবে সেই মেয়ে কোন পুরুষকে প্রচণ্ড ভালোবেসেছে। এদের বাইরে সবাই সচেতন আমাকে আড় চোখে কজন দেখছে। অহল্যার এই সমস্যাই হয়েছে। আমার স্বামী এখন আমার কাছে নেই, দেবতাদের রাজা আমাকে আকাঙ্খা করেছেন। ইন্দ্রকে তিনি স্বাগত জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের মত লীলা প্রধাণ ভক্তিশাস্ত্রে এই জিনিসকে অনুমতি দেয় না। সেইজন্য এখানে দোষ পুরোপুরি ইন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখান এসেই কাহিনীগুলি পৌরাণিক সাহিত্যের রূপ ধারণ করে নিয়েছে। পৌরাণিক সাহিত্য মানেই, যেখানেই সুযোগ পাবে সেখানেই ইন্দ্রকে গালাগাল দিয়ে দেবে। বৈদিক সাহিত্যে এই জিনিস কখনই করা হবে না। এখানে বলছেন ইন্দ্র খুব কায়দা করে গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে আশ্রমে ঢুকে অহল্যাকে জড়িয়ে ধরেছেন। এরপর যদি বলা হয় অহল্যাকে বোকা বানিয়েছে, কে বিশ্বাস করবে! একজন ঋষি ভোরবেলায়, যখন তাঁর সন্ধ্যাবন্দনাদির সময়, তখন তাঁর স্ত্রীকে জড়াতে যাবেন? আর তাঁর স্ত্রীও বুঝতে পারবেন না যে, এই পুরুষ আমার স্বামী নন, অন্য একজন। এগুলো কিছুই নয়, অহল্যার মনেও দুর্বলতা ছিল। অহল্যা তখন কোন বাচ্চা মেয়েও নন, ততদিনে তাঁর পুত্র সন্তান হয়ে সেও আবার ঋষি হয়ে গেছে।

গৌতম মুনিও স্নানাদি শেষ করে ফিরে এসেছেন। ইন্দ্রও টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অহল্যাকে ছেড়ে আশ্রম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। গৌতম মুনি তখন ইন্দ্রকে ধরে জিজ্ঞেস করেছেন, আমার বেশ ধারণ করে তুমি কে? বাল্মীকি রামায়ণে তা নয়, ইন্দ্র কায়দা করে পালিয়ে গেছে। গৌতম মুনি ঘরে এসে দেখছেন তাঁর স্ত্রী মুখ মলিন করে বসে আছেন। গৌতম মুনি সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝে গেছেন। আমাদের সব কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না, যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা এক দৃষ্টিতেই পুরো জিনিসটাকে বুঝে নেন। সমারসেট মৈগমের একটা বিখ্যাত কাহিনী আছে, কাহিনীর নাম Mr. Know All। সমারসেট তার সব কাহিনীতে নিজেকেই কেন্দ্রিয় চরিত্র করে নিতেন, সব সময় আমি আমি করে লিখতেন। একবার তিনি জাহাজে করে কোথাও যাবেন। জাহাজে উঠে দেখছে ওর এক রুমমেট সেখানে আগে থেকেই হাজির। রুমমেটটি সবজান্তা, হেন জিনিস নেই যেটার ব্যাপারে সে জানে না। দেখা মাত্রই রুমমেট তাকে ওয়েলকাম করছে, মনে হচ্ছে ও যেন আগে থেকেই জানত এ আসবে। তারপর এক নাগাড়ে সব বিষয়ের উপর বলে যাচ্ছে। পরের দিন জাহাজে একটা পার্টির মত হয়েছে। সেখানে এক আর্মি অফিসার জিজ্ঞেস করছে আমার স্ত্রীর গলায় যে নেকলেস দেখছেন এর কত দাম হতে পারে? রুমমেট সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল

দু হাজার পাউণ্ড, এর নীচে হবেই না। আর্মি অফিসার শুনে খুব হাসছেন আর বলছেন, আমার স্ত্রী লণ্ডনের ইমিটিশানের দোকান থেকে পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে কিনেছে। সবজান্তা শুনে বলছে আমি এর জন্য দশ পাউণ্ড বেটিং করতে রাজী আছি, এর দাম দু হাজার পাউণ্ডের নীচ কখনই হবে না। লোকটি হঠাৎ মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ব্যাপারট একটু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর মহিলার কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা হাতের কাছে দেখতে চাইলেন। হাতে নিলেন, তার মধ্যেই হঠাৎ পকেট থেকে একটা মানিব্যাগ বার করে বলছে, সরি স্যার! এটা সত্যিই নকল নেকলেস, আমার ভুল হয়ে গেছে। এই নিন আপনার দশ পাউণ্ড। সবাই খুশি হয়ে হাততালি দিচ্ছে। এই লোকটি এতদিনে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতেন যে আমি সবজান্তা। যিনি কাহিনী লিখছেন তিনি এবার বলছেন, আমার দেখে তো আনন্দে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে, এই ভেবে যে লোকটিকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল আর মাঝখান থেকে দশ পাউণ্ড গেল। লোকটি হেরে গেলেও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, নিজের মনের আনন্দে শিস দিয়ে গান করে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই ওর ঘরের দরজায় কেউ টোকা দিয়েছে, টোকা দিতেই দরজা খুলেছে, বেয়ারা তাকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। খামটা ছিড়ে দেখছে খামের ভেতরে একটা দশ পাউণ্ডের নোট। লোকটি দশ পাউণ্ড সমেত খামটা লেখকের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। লেখক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার? লোকটি তাকে বলছে, এই সাধারণ মাইনের চাকরী তাও সাত বছর ধরে বছরে ছ-সাত মাস যে স্ত্রীকে স্বামীর কাছ দূরে দূরে পড়ে থাকতে হয়, সেই স্ত্রী অপরের সাথে জড়াবে না আর তার থেকে দামী উপহার পাবে না এটা কি কখন হতে পারে! স্বামীর যাতে সন্দেহ না হয় তাই ইমিটেশান বলতে হয়। আসল ঘটনা হল ওই নেকলেসের দাম দু হাজার পাউণ্ডই ছিল। এই নেকলেস আবার তার কোন প্রেমিক তাকে উপহার দিয়েছে। কর্ণেল সাহবে যখন জিজ্ঞেস করেছে, স্ত্রী বুঝিয়ে দিল এই সুন্দর ইমিটেশানটা আমি সস্তায় লণ্ডনের এক দোকানে পেয়েছি। লোকটি সত্যিই ওস্তাদ, দেখেই বলে দিয়েছে নেকলেসের এই দাম। দাম বলে দেওয়ার পর মেয়েটি তখন ভয়ে রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছে, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে কর্নেল যে কি করে বসবে কোন কিছু ঠিক নেই, জীবনটাই হয়ত শেষ হয়ে যাবে। ভদ্রমহিলার চোখের চাহনি দেখেই লোকটি পুরো ব্যাপারটা বুঝে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কায়দা করে কাছ থেকে একবার ভালো করে যাচাই করে দেখতে চাইল। নেকলেসটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে নিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি বেটিংএ দশ পাউণ্ড হেরে গেছি। দশ পাউণ্ড হেরে গেছে, ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতাবশতঃ ওই দশ পাউণ্ড নোটটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। লেখক তখন লিখছেন, এই প্রথম এই লোকটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা হু হু করে বেড়ে গেল।

যাই হোক, গৌতম মুনি সব বুঝে গেছেন। তিনি অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে দিলেন। লীলাশাস্ত্রে এখানেই বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। ইন্দ্র যদি গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে আসে সেখানে অহল্যার দোষ কোথায়! আমরা সবাই ছোটবেলা থেকে কাহিনী শুনে আসছি। ভারতবর্ষে অধ্যাত্ম রামায়ণকে আধার করেই পরবর্তি কালে রামায়ণের কাহিনী তৈরী হয়েছে, আর সেই কাহিনী এখনও চলছে। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী অন্যান্য রামায়ণে ঠিক ভাবে আসেনি। ছোটবেলা থেকেই আমরা শুনে আসছি ইন্দ্র গৌতম মুনির রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। তখন আমাদেরও মনে হত এখানে অহল্যা কি দোষ করলেন যে তাঁকে গৌতম মুনি অভিশাপ দিয়ে দিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনী পড়লে বোঝা যায় অহল্যার মধ্যেও রীতিমত গোলমাল ছিল। বাল্মীকি এই ব্যাপারে খুব পরিষ্কার, ওখানে কোন সন্দেহের কিছু নেই। গৌতম মুনি অভিশাপ দিলেন, তুমি এই মুহুর্তে পাথর হয়ে যাবে। পাথর হয়ে এখানে পড়ে থেকে নিরাহার হয়ে শীত গ্রীষ্ম সব সহ্য করতে থাক। গৌতম মুনি বলছেন –

দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।১/৫/২৬
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা।১/৫/২৭
আতপানিলবর্ষাদি-সহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরম্।

আমার এই আশ্রমে এবার তুমি পাথরের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বাস কর। আমাদের প্রচলিত কাহিনীগুলিতে বলে অহল্য তখন পাথরের মুর্তি হয়ে গেলেন। কিন্তু মূল রামায়ণের বর্ণনা তা নয়। আসলে অহল্যার শরীর থেকে জীবাত্মা যেন বেরিয়ে গেলেন। ওই জীবাত্মা এখন পাথরকে আশ্রয় করে থাকছে। পাথর হয়ে থাকা মানে এবার তাঁকে নিরাহার থাকতে হবে তার সাথে শীত, বর্ষা, রোদ সব সহ্য করতে হবে। পাথর হয়ে থাকাটা সব থেকে জঘন্য শাস্তি। গৌতম মুনি তখন বলছেন –

তদৈব ধুতপাপা ত্বং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপাদ্বিমোক্ষ্যসে।৩১

তোমার শরীর বোধ না রেখে তুমি নিরন্তর ঈশ্বর চিন্তন করবে। ঈশ্বর চিন্তন করলে তোমার পাপ চলে যাবে। অনেক বছর পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সহ এই আশ্রমে এসে তোমাকে যখন স্পর্শ করবেন তখনই তুমি শাপমুক্ত হবে। এখানে গৌতম মুনি অনেকগুলি শর্ত রাখছেন। কেউ কোন পাপ কাজ করেছে বা কারুর উপর কোন অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে, এর থেকে এবার মুক্তি পাওয়ার কয়েকটি উপায় নির্দিষ্ট করা আছে। প্রথম হল প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়ঃ মানে তপস্যা আর চিত্ত মানে নিশ্চিত, প্রায়ঃ আর চিত্ত এই দুটি শব্দ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত শব্দ তৈরী হয়। একটা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যখন নিশ্চিত তপস্যা করা হয় সেটাকে বলে প্রায়শ্চিত্ত। আমি কোন ভুল কাজ করে ফেলেছি, কোন পাপ কাজ করেছি, এবার এই ভুল কাজ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমি তপস্যা করছি। গৌতম মুনি অহল্যাকে এই তপস্যা করার কথা বলছেন। এইভাবে অনেক বছর তপস্যা করার পর শ্রীরামচন্দ্র এই আশ্রমে আসবেন, তিনি তোমার শিলাকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করবেন তখন তুমি শাপমুক্ত হয়ে যাবে। শাপমুক্ত হয়ে যাওয়ার পর *ত্বং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ*, তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে ভক্তিপূর্বক পূজন করবে। তারপর *পরিক্রম্য*, শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করবে। এখানেই বেদের সময় থেকে পুরাণের সময়ে বিরাট এক পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে। পুরাণে অর্চনা, বন্দনা, পরিক্রমা এগুলোর মাহাত্ম্য বেড়ে গেছে। যার জন্য পরবর্তিকালে ভারতে যত মন্দির নির্মিত হয়েছে সেখানে বিগ্রহকে প্রণাম করার পর যাতে বিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করতে পারে সেইজন্য চারিদিকে চাতাল রাখা হয়। ভগবানকে আমি চারিদিক থেকে প্রণাম করছি। তারপর বলছেন *নমস্কৃত্য*, ঘুরে ঘুরে প্রণাম করবে এবং *স্তুত্বা* শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করবে। ভালোবাসায় যা হয় ভক্তিতেও ঠিক তাই হয়। আমার পুরো মন, প্রাণ, হৃদয় তোমার প্রতি সমর্পিত, এই ভাবকে নিয়ে আসার ধাপগুলো দেখাচ্ছেন।

এসব করার পর কি হবে? তুমি শাপমুক্ত হয়ে গিয়ে পুনরায় তোমার পূর্ব দেহ ফিরে পাবে। দেহ ফিরে পাওয়ার পর তুমি আবার আমার কাছে চলে আসবে। এখন আমি হিমালয়ে চললাম, শাপমুক্ত হয়ে তুমি ওখানে এসে আবার আমার সেবা-শুশ্রুষা করতে থাকবে। অভিশাপ দিয়ে এসব কথা বলার পর অহল্যা ওখানেই পাথর হয়ে হাজার হাজার বছর পড়ে থাকলেন। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, হে রঘুনন্দন! তুমি তোমার চরণ দিয়ে স্পর্শ করে ব্রহ্মার কন্যা মুনিপত্নী অহল্যাকে শাপমুক্ত করে পবিত্র করে দাও। অহল্যার বাকি সব কিছু করা হয়ে গেছে। এখন এই কাহিনীকে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেন যে, অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের চরণ স্পর্শে মুক্তি পেলেন নাকি গৌতম মুনি বলেছিলেন বলে মুক্তি পেলেন। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান নন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় মুক্ত হলেন, নাকি গৌতম মুনি ঐ রকম বলে রেখেছিলেন বলেই মুক্ত হলেন। গৌতম মুনি কি কি করতে হবে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছিলেন, এত বছর তপস্যা করবে, এই এই করবে, তারপর শ্রীরামচন্দ্র আসবেন, চরণ দ্বারা স্পর্শ করবেন। এখন বিশ্বামিত্র থাকতে শ্রীরামচন্দ্রের নাম কেন গৌতম মুনি নিলেন? শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষ শক্তি আছে বলে তাঁর নাম নিয়েছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে গেলেন, দেখছেন এক বিরাট শিলা। শিলা স্পর্শ করলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্পষ্ট দেখছেন অহল্যা ওই শিলার মধ্যে অবস্থান করে আছেন। বাল্মীকি রামায়ণে অহল্যা পাথরের বদলে বায়ু রূপে অবস্থান করছিলেন। শরীর ত্যাগ করে কোন পাথরকে আশ্রয় করে নেই, ব্যাপারটা লোকেদের মনে সংশয় হতে পারে, পরে তাই বলে দিলেন শিলাকে আশ্রয় করে ছিলেন। কিন্তু শিলাকে আশ্রয় করা আর বায়ু রূপে থাকা একই জিনিস। কিন্তু যেমনি চরণ দিয়ে স্পর্শ করলেন শ্রীরামচন্দ্র অহল্যার সূক্ষ্ম শরীরকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। অহল্যা প্রথম ধাপটা পেরিয়ে সূক্ষ্ম রূপ পেয়ে গেলেন। বাকিটা এবার অহল্যকে নিজেকে করতে হবে। অহল্যা পাথর থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, এবার তিনি পরিক্রমা করবেন, পূজন করবেন, স্তুতি করবেন। শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে দেখতে পেলেন, দেখছেন তপস্যা করে করে একেবারে শুদ্ধ পবিত্র হয়ে গেছেন, সেই তপস্বিনীকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

ননাম রাঘবোহহল্যাং রামোহহমিতি চাব্রবীৎ।১/৫/৩৭

এই জায়গার বর্ণনা খুবই স্পর্শকাতর। শ্রীরামচন্দ্র শুধু অহল্যার কাহিনী শুনেছেন, অহল্যা কিছু ভুল করেছিলেন, স্বামী তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। কিন্তু এতদিন তিনি শুধু তপস্যা করে গেছেন, তাঁকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাতজোড় করে প্রণাম করছেন আর বলছেন, আমি রাম। এই কাহিনী অধ্যাত্ম রামায়ণেই আসে, অন্য রামায়ণে

আমাদের চোখে পড়ে না। শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে প্রণাম করছেন, তপস্যার প্রতি, যে কোন তপস্যা, শ্রীরামচন্দ্রের এতই শ্রদ্ধা যে, একজনের যা কিছু গোলমাল হওয়ার হয়েছিল, কিন্তু মন পুরোপুরি ঈশ্বরে নিবিষ্ট এতদিন ধরে শুধু তপস্যা করে গেছেন, তার যে কি সাংঘাতিক মূল্য, মরে গিয়ে নতুন শরীর পাচ্ছেন না, ওই শরীরেই থেকে শুদ্ধিকরণ করে আবার ওই শরীরেই থাকছেন। শ্রীরামচন্দ্র জানতেন এর মুক্তি আমার পাদস্পর্শে, তার মানে অহল্যা এতই সাধারণ, কিন্তু অহল্যাকে তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করছেন, কত বড় তপস্বিনী যে স্বয়ং ভগবান নরদেহে তাঁকে প্রণাম করছেন। ঠাকুরের জীবনীতেও আমরা এই ধরণের ঘটনা পাই, গোস্বামী বংশের একজন এসেছেন, ঠাকুর তাঁকে প্রণাম করছেন। শ্রীমাও ব্রাহ্মণদের কাছে গেলে তাঁদের প্রণাম করতেন, তাঁরাই আবার পরের দিকে সঙ্কোচ বোধ করতেন। এই ধরণের মহাপুরুষরা যেখানে দেখতেন এর মধ্যে একটা বিশেষ শক্তি তাঁদের তাঁরা নতমস্তকে সম্মান করতেন। ঠাকুরও যদি শুনতেন এর মধ্যে বিশেষ গুণ আছে, তিনি তাঁর কাছে যেতেন, ঝুঁকে প্রণাম করতেন।

অহল্যার মন এখন ধীরে ধীরে ঈশ্বর চিন্তন থেকে নেমে আসছে। অহর্নিশ ঈশ্বর চিন্তন থেকে হঠাৎ নেমে এলে মস্তিষ্কে অনেক গোলমাল হয়ে যেতে পারে। মন যখন উপর থেকে নামে তখন ঈশ্বরীয় রূপ বা ঈশ্বরীয় ভাবের উপর মন না রাখতে পারলে অনেক সমস্যা হয়ে যায়। তখন অহল্যা দেখছেন –

চতুর্ভুজম্ শঙ্খচক্রগদাপঙ্কজ ধারিণম্।
ধনুর্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।১/৫/৩৮
স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্।১/৫/৩৯

অহল্যা দেখছেন লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র রূপে নয় অহল্য বিষ্ণুর রূপে দেখছেন। তিনি চতুর্ভুজ আর শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম ধারণ করে আছেন। মুখে মিষ্টি হাসি, পদ্মফুলের মত চোখ আর শ্রীবৎস অঙ্কিত বক্ষ। শ্রীরামচন্দ্রকে ওই রূপে দেখে –

দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্ফুরিতেক্ষণা।১/৫/৪০

শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে আনন্দের আবেগে অহল্যার ভেতর থেকে মুখে হাসির ফোয়ারা বেরিয়ে এসেছে। আমি মুক্তি পেয়ে যাচ্ছি এই ভেবে অহল্যার আনন্দ হচ্ছে না। একবার যে ঈশ্বরের ভালোবাসা আস্বাদ করে নিয়েছে এরপর তার কাছে মুক্তি বন্ধন এগুলোর কোন গুরুত্বই থাকে না। খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে। জীবনে একা থাকা যায় কিনা এই নিয়ে বিদেশে দুজন বন্ধু তর্কাতর্কি করছে। এক বন্ধু সামাজিক জীবন অতিবাহিত করত, প্রচুর আনন্দ-ফুর্তিতে থাকত, সে বলছে জীবন চালানোর মত কিছু ব্যবস্থা হয়ে গেলে কেন একা থাকা যাবে না। দুজনের মধ্যে বেটিং হল, তুমি দশ বছর একা থাকবে, কোন লোকের সাথে কথা তো হবেই না, কোন লোকের মুখও তুমি দেখবে না, শুধু চিঠির মাধ্যমে তুমি যা কিছু করার করতে পারবে। দশ বছর যদি তুমি এভাবে থেকে যেতে পার তাহলে আমি তোমাকে আমার সব সম্পত্তি লিখে দেব, আর যদি না পার তাহলে তোমাকে তোমার সব সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিতে হবে। লোকটিও রাজী হয়ে গেছে। সারা শহরেও জানাজানি হয়ে গেছে। এক নির্জন জায়গায় বেশ বড় একটা বাগান বাড়িতে একা থাকছে আর ডাইরী লেখাটা শুরু করল। আস্তে আস্তে তার মনে হতে লাগল আমি বুঝি পাগল হয়ে যাব, মাথা ঠিক থাকছেন না। তারপর একদিন, দুদিন করে দিন কেটে যাচ্ছে। কিছু দিন পর নিজেই ঠিক করে নিল পড়াশোনাটা করা যাক। চিঠিতে জানিয়ে দিল লাইব্রেরী থেকে আমাকে এই এই বই পাঠিয়ে দেওয়া হোক। বইও এরপর আসতে থাকল। এরপর লেখাপড়া, চিন্তন করে করে দিন কেটে যাচ্ছিল। ছয় মাস, এক বছর খুব কষ্টে কোন রকমে কেটে গেল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে ওর মন মেনে নিতে শুরু করল। অন্য দিকে ওর বন্ধুটি ভাবছে, কবে আমাকে চিঠি লিখে জানাবে আমাকে এখান থেকে শিগগিরি বার করে নিয়ে যাও। এই ভাবে যেতে যেতে দশ বছর শেষ হতে মাত্র তিন চার দিন বাকি আছে, তখন সে বন্ধুকে চিঠি লিখছে, আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। দশ বছর শেষ হতে আর মাত্র কটা দিন বাকি, এতগুলি বছর কাটিয়ে দিয়ে আর এই কটা দিন সে থাকতে পারছে না! আর শেষ মুহুর্তে এসে সে এখান থেকে চলে যেতে চাইছে কেন! লোকটি শেষ পর্যন্ত ওখান থেকে পালিয়ে গেছে। যাওয়ার আগে একটা চিঠি শুধু রেখে গেছে, তাতে সে লিখছে এই দশ বছর একাকী জীবন কাটিয়ে দেখলাম একাকী জীবনের কী আনন্দ! তিন-চারদিন যদি আমি থেকে যাই তাহলে আমি বেটিং জিতে যাব, তোমার সম্পত্তি আমার কাছে এসে যাবে, আবার আমাকে

কত রকম ঝুটঝামেলা এই জগতে পোয়াতে হবে, আমি সব সম্পত্তি তোমার নামে লিখে দিয়ে আমি এবার চললাম পুরো জীবনটাই একাকী থাকার জন্য, মানুষের সাথে তাদের মত জীবন-যাপন করা আমার পক্ষে আর কোন দিনই সম্ভব নয়। ভেতরে খুব গভীর উচ্চ ভাব, উচ্চ বোধ এসে গেলে মানুষ অন্য রকম হয়ে যায়, মানুষের সঙ্গ সে আর নিতে পারে না। একজন জন্ম থেকে কালা ছিল। অনেক বয়সে কোন ডাক্তার তার কান দেখে অবাক হয়ে গেছে, আরে! কী আশ্চর্য! এর কানটা তো সারিয়ে দেওয়া যাবে। যাই হোক অপারেশন করে সারিয়ে দিয়েছে। সারিয়ে দেওয়ার দুদিন পর থেকে লোকটি চিৎকার বলছে, চারিদিকে এত আওয়াজে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতদিন কান বন্ধ ছিল, ভেতরটাও শান্ত ছিল। এখন কান সারিয়ে দিতেই পাখার আওয়াজটা তার কাছে বোমা ফাটার আওয়াজ মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে বলছেন, অপরেশন করে কি করেছেন আপনি! আমার যা ছিল আগের মত করে দিন। আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল বিয়ে করব, কিন্তু এখন আমার কোন কিছুরই ইচ্ছেফিচ্ছে নেই, আমার কান কেটে আবার আগের অবস্থা করে দিন। ডাক্তারও বাধ্য হয়ে আবার অপারেশন করে কান থেকে সব এ্যাপারেটোসগুলো বার করে দিলেন। যিনি একমাত্র ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে খুব গভীরে ডুবে থাকেন জগতের ব্যাপারে তাঁদের কোন আগ্রহই থাকে না, জগতের কি হল কি না হল তাতে তাঁর ভারি বয়ে গেছে। ঠাকুর বলছেন মিছরির শরবৎ খাওয়ার পর তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগবে না। একবার যিনি ধ্যান করে পরমাত্মার চিন্তনে চলে গেছেন এরপর কোন কিছুতেই তাঁর আসে যায় না।

আমাদের সবারই মনে একটা কল্পনার জগৎ বা নিজস্ব একটা জগৎ থাকে। ঐ জগতে সব কিছুর ব্যাপারে একটা ধারণা তৈরী হয়ে আছে। বাইরের সবাই কেমন হবে তার একটা ধারণা হয়ে আছে, আমার শরীর কেমন হবে তার একটা ধারণা তৈরী হয়ে আছে, যাকে ভালোবাসি তার ব্যাপারেও একটা ধারণা থাকবে, সব কিছুই ধারণা করা আছে। আমাদের দেশে মেয়েদের বাচ্চা বয়স থেকেই মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত, একদিন তোমার একজন স্বামী হবে, স্বামী তুমি যাকেই পাও তার সাথে তুমি এভাবে এভাবে চলবে। সেইজন্য কিছু কিছু জিনিসের ভাবকে মেয়েদের মনে আসতেই দেওয়া হত না। তাও কোথাও কোথাও কোন ভাবে ঢুকে যেত। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনছে, শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী শুনছে, নানা রকম কাহিনী শুনতে শুনতে মনের কোথাও অন্য ধরণের কিছু কিছু ভাব আকার নিয়ে নেয়। এরপর জীবনে কাউকে যদি সেই ভাবরূপী পাওয়া যায়, যেখানে তার মনের কল্পনা আর বাস্তব মিলে গেল, তখন ঠিক অতটুকু নিয়েই তার সারাটা জীবনে চলে যাবে। এখানে অহল্যার আদর্শ কখনই গৌতম মুনি হতে পারেন না, তা তিনি যত বড়ই মুনি হন না কেন। হাজার হাজার বছর তপস্যার কথা বলছেন বটে, কিন্তু দুটি বছরও যদি তিনি শুধু ঈশ্বরের ধ্যান করে কাটিয়ে দেন যেখানে মনের জগতে তিনি ঈশ্বরের একটা কল্পনা করে নিচ্ছেন। সেখানে হঠাৎ অহল্যা দেখছেন শ্রীরামচন্দ্রকে। এই প্রথম দিব্য দর্শন শুরু হল। দর্শন বলতে বোঝায়, অনন্ত যিনি তাঁকে যখন মনের মাধ্যমে দেখছেন। দেখছেন শ্রীরামচন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন, শ্রীরামচন্দ্র একটি রূপ। কিন্তু প্রথম থেকে দেখান হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর যে অনন্ত রূপ তারই একটা মুখোশ হলেন শ্রীরামচন্দ্র। এই রাম রূপী মুখোশকে সরিয়ে দেওয়ার পর মন দিয়ে যখন দেখা হবে তখন এসে যাবেন ভগবান বিষ্ণু রূপী মুখোশ। অহল্যা যিনি অনন্ত সচ্চিদানন্দ তাঁকে দেখছেন বিষ্ণু রূপী মুখোশ দিয়ে। রাম রূপী মুখোশটা তিনি দেখছেন না। অহল্যা তখন বলছেন, আমি ধন্য হয়ে গেলাম, এতদিন যাঁর ধ্যান করছিলাম এখন তাঁকে স্পর্শ করতে পারছি। এরপর অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের খুব সুন্দর একটা লম্বা স্তুতি করছেন। এই স্তুতি দিয়েই ঈশ্বর তত্ত্ব আসা শুরু হয়। বেদে আধ্যাত্মিক সত্য, অনন্তকে আলোচনা করছেন কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্বের আলোচনা বেদ করবে না। ধ্যান করে করে, তপস্যা করে করে মন শুদ্ধির এমন অবস্থায় চলে গেছে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের শরীর থাকলেও অহল্য আর ওই শরীরকে দেখছেন না। শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর আছে, যেটা মুখোশ, সেই মুখোশকে দেখছেন, ওটাই ভগবান বিষ্ণু। চলতি ভাষায় আমরা ঈশ্বর দর্শন বলতে সব সময় মনে করি সাকার রূপে দর্শন। কিন্তু জিনিসটাতো সাকার নয়, হতে পারে, যাঁরা বৈষ্ণব তাঁরা ওই ভাবেই ধ্যান করেন আর দর্শনও ওই ভাবেই হবে ভাবেন। কিন্তু আচার্য শঙ্করের যা মত বা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যা মত তাতে তিনি অমূর্তই আছেন কিন্তু তিনি যেন কোথাও কোথাও সাকার রূপ ধারণ করেন, যখন নরলীলা, ঈশ্বরলীলা করেন তখন বিষ্ণু যেন তাঁরই একটা রূপ। শিব, ব্রহ্মা আবার তাঁরই অন্য রূপ, আল্লাও ঈশ্বরলীলা। অহল্যা ধ্যান করে করে ঈশ্বরলীলার এমন অবস্থায় চলে গেছেন যে, শ্রীরামচন্দ্র একজন অবতার তাঁকেও তিনি ঐ রূপেই দেখছেন। অহল্য তখন স্তুতি করে বলছেন –

অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতৎ
মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন জগৎ।
চপস্যজস্রং চরণাদিবর্জিতঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োহতিমায়িকঃ।১/৫/৪৪।

হে রামচন্দ্র! আপনার লীলা কী বিচিত্র, মানুষ রূপে আপনি সমস্ত জগৎ সংসারকে বিমোহিত করে রেখেছেন অথচ আপনি তা নন। যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই ঈশ্বরলীলায় বিষ্ণুরূপ, তিনিই নরলীলায় রাম রূপ। এই রাম রূপ আর বিষ্ণু রূপ, এখান থেকে ঈশ্বর তত্ত্ব পুরোদমে আসতে শুরু করে। হিন্দু ধর্মে যত তত্ত্ব আছে তার মধ্যে অবতার তত্ত্ব বা সগুণ ঈশ্বরের তত্ত্ব সব থেকে কঠিন। বেদের সচ্চিদানন্দকে, যোগের জ্ঞানকে সহজেই অন্যদের ব্যাখ্যা করে দেওয়া যায় আর বুঝে নেওয়াও খুব সহজ। কথামৃতে পাতায় পাতায় ঠাকুর বলছেন, সেই অনন্ত, সেই ঈশ্বর যে মানুষ রূপে আসতে পারেন এটাকে ধারণা করা যায় না। ঠাকুর যে ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান আমাদের কখনই সন্দেহ হয় না, কত সহজে আমরা বলে দিচ্ছি ঠাকুর তো ঈশ্বরই ছিলেন। আসলে মুর্খরাই অবতার তত্ত্ব বুঝে নিতে পারে, বিদ্বজ্জনরা কোন দিন বুঝতে পারবেন না। যে যত জোর গলায় বলে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান সে তত বড় মুর্খ। কারণ সচ্চিদানন্দ যিনি তিনি মানুষ রূপে আসতে পারেন এই জিনিস ধারণা করা সত্যিই অসম্ভব। তাহলে আমরা কি করে বলছি ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এনারা অবতার? ঠাকুর যদি অবতার না হন, তাহলে যে এত এত সন্ন্যাসীরা জগতের সব সুখভোগ ছেড়ে এখানে পড়ে আছেন এটা কি করে সম্ভব হচ্ছে! মুর্খ কিন্তু সবাই, সন্ন্যাসী যিনি মনে করছেন ঠাকুর ঈশ্বর তিনিও মুর্খ, গৃহীভক্ত যিনি মনে করছেন ঠাকুর ঈশ্বর তিনিও মুর্খ। কিন্তু একটা জায়গায় দুজনেরই জ্ঞান আছে। আমরা মনে করি আমরা সব সময় নিজেদের কথাতে চলি, কিন্তু আসলে তা নয়, আমরা সব সময় চলি অপরের কথায়। যেমন, ইদানিং গুগুল সার্চ করে আমরা অনেক কিছুর ব্যাপারে জেনে যাচ্ছি। গুগুল সার্চের নিজস্ব কতকগুলি পদ্ধতি আছে, সব থেকে উপরে যে উত্তরটা ওরা দিয়ে রাখবে সেটাই যে সব সময় সঠিক উত্তর হবে তা নয়। আসলে গুগুল আমাদের যেটা জানাতে চাইছে সেটাই সবার উপরে থাকবে। দু নম্বরেও তা থাকবে না, তিন নম্বরেও থাকবে না, কোথাও একটা থাকবে কারণ ইন্টারনেটে দিয়ে রেখেছে। খবর কাগজের লোকেরা, টেলিভিশনের লোকেরা যা আমাদের জানাতে চায় আমরা সেটাই জানি। কিন্তু এগুলোর থেকে আরও খারাপ হল, আমরা সবাই দু-চারজনকে ভালোবাসি, তারা আমাদের যেমনটি বলে আমরাও তেমনটিই চলি। আরেকটু বড় হলে চারটে ব্যাপারে চার রকমের জিনিস হয়ে যায়। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা দুজন দুজনের উপর নির্ভর করি। এরপর বিজ্ঞানের ব্যাপারে, জীবনের ব্যাপারে যত এগিয়ে যায় তত আরও চার-পাঁচ জনের উপর নির্ভর করতে হয়। বাচ্চা যত ছোট থাকে সে তত বেশি একজনের উপর বেশি নির্ভর করে। আমাদের যারা গাইড, যারা আমাদের মস্তিষ্ককে চালাচ্ছে এদের মধ্যে প্রথম হল টেলিভিশন, দ্বিতীয় খবরের কাগজ, তৃতীয় হল আমার যারা খুব ঘনিষ্ঠ। ঠাকুরকে একজন এসে বলছেন, মহাশয়! গীতা বইটা দেখলাম, গীতা খুব ভালো বই। ঠাকুর বলছেন, বুঝি খবরকাগজে বেরিয়েছে? একজন এসে খবর দিল ওখানে একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। যে বেচারীকে বলল সে এখন বলছে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, আগে দেখি খবরের কাগজে আছে কিনা। আমাদের গুরু খবরের কাগজ, তখন তো টেলিভিশন ছিল না, এখন টিভিও গুরু। সবাই মনে করে আমি সব ব্যাপারে খুব ওস্তাদ, সব কিছু আমার জানা আছে। কিন্তু সবাই প্রতি মুহুর্তে অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়। কারুর যদি অনেক সৌভাগ্য থাকে, জন্ম-জন্মান্তরের অনেক পূণ্য সঞ্চিত থাকে তখন কোন সাধু পুরুষের সাথে তার যোগাযোগ হবে, শুধু যোগাযোগই নয় যাকে সে বলতে পারবে, আপনি আমার সব, যদি আমাকে ডোবাতে হয় আপনিই ডোবাবেন, যদি উদ্ধার করতে হয় আপনিই আমাকে উদ্ধার করবেন। ঠাকুর বলছেন, ভালো লোককে অছি করলে সে কখন ক্ষতি হতে দেবে না। দু-তিন বছরের শিশু যেমন মায়ের উপর নির্ভর করে থাকে, মা একবার বলে দিয়েছে ও ঘরে জুজু আছে, মানে ভয়ের ব্যাপার আছে, শিশু আর ওই ঘরে যাবে না। একটা ছুতোরের ছেলেকে বলে দিল ও তোর দাদা, মা যা বলছে সেটাকেই সে ধ্রুব সত্য বলে জানে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের জীবন একমাত্র তার কথা মতই চলে যাকে আমরা ভালোবাসি। সেইজন্য আমি কাকে ভালোবাসছি, কার কথা গ্রহণ করছি এর উপর আমাদের জীবন খুব নির্ভর করে। ইংরাজীতে খুব নামকরা প্রবাদই আছে, A man is known by company he keeps, আপনি

মানুষটি কেমন বোঝা যাবে আপনি কি ধরণের লোকের সাথে মেলামেশা করছেন। যে সাধুর উপর নির্ভর করছে, সাধু তাকে যা বলছে সেটাই তার কাছে সত্য বলে মনে করতে হবে।

তাহলে খবরের কাগজ, টেলিভিশন এদের কি হবে? এরাও থাকবে, কিন্তু আস্তে আস্তে তার মস্তিষ্ক জেনে যায় ধর্মীয় ব্যাপারে, জীবনের সূক্ষ্ম তত্ত্বের ব্যাপারে একজন সাধু যা বলবেন সেটাই আমাকে গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে কোন কথা যদি হয় তখন এদের কথা নিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সদ্‌গুরু বা সাধুর কথার সাথে টেলিভিশনের কোন বক্তব্যের মধ্যে যদি বিরোধ হয় তখন সব সময় সদ্‌গুরুর কথাই নিতে হবে। এখন যাঁর উপর আমি নির্ভর করছি, তিনি আমাকে বলছেন ঠাকুর ঈশ্বর, সেইজন্য ঠাকুর ঈশ্বর। ওনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় মশাই! আপনি কি করে বলছেন ঠাকুর ঈশ্বর? তিনি তখন বলছেন, আমি যাঁকে শ্রদ্ধা করতাম তিনি বলতেন ঠাকুর ঈশ্বর। এবার তাঁকেও যদি জিজ্ঞেস করা হত, মশাই আপনি কি করে বলছেন? তিনি বলতেন, আমি যাঁকে বিশ্বাস করতাম তিনি বলতেন ঠাকুর ঈশ্বর। এইভাবে আরও কয়েক সিঁড়ি ভেঙে একেবারে উপরের সিঁড়ির কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তখন তিনি বলবেন, ভাই! আমি স্বামীজীর সঙ্গ করেছি, তাঁর রচনাবলী পড়েছি, স্বামীজী ঠাকুরকে ঈশ্বর বলতেন। এরপর আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। এই যে লম্বা একটা পরম্পরা, এর একটা সিঁড়ি যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সবটাই ভুল হয়ে যাবে। এই কথাই আরও শক্তপোক্ত হয়ে যায় যখন আরও দশজন লোক ঠাকুরকে ঈশ্বর বলছেন। এনারাও কেউ সাধারণ লোক নন। সেইজন্য দেখতে হয় সমাজে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা কি বলছেন, আর তাঁদের এই বলার পেছনে কোন স্বার্থ আছে কিনা। ভালো করে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এনাদের কোন স্বার্থ নেই। তাই না, তাঁদের অনেকেই ঠাকুরের জন্য তাঁদের জীবন, তাঁদের সম্পদ সব দিয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য কাউকে যদি বলে দেওয়া হয় ইনি ঈশ্বর, এরপর দেখতে হবে এনার জন্য কজন নিজের জীবন চিরদিনের দিয়ে দিয়েছেন, কজন বলছেন এনার জন্য আমার সব সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন, কামিনী-কাঞ্চন সব ত্যাগ করে আমার জীবনটা দিয়ে দিলাম। তার সাথে গুরু-শিষ্য পরম্পরা কত দিন ধরে চলছে।

বৃক্ষকে জানতে হলে তার ফল দেখতে হবে। ঠাকুরকে যদি জানতে হয় তাহলে তাঁর শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য, সেই শিষ্যর শিষ্য পর্যন্ত দেখতে হবে, তখন গিয়ে বোঝা যাবে ঠাকুর কি ছিলেন। যাঁর পরম্পরা যতদিন শক্তিশালী হয়ে চলবে বুঝতে হবে তিনি তত শক্তিশালী। এই ধরণের শাস্ত্র নিজে থেকে পড়তে গেলে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু যখন সাধনা করতে থাকবে, এখানে যেমন সগুণ সাকারের কথা বলছেন, সগুণ সাকারের সাধনা করতে থাকলে তখন নিজের বুদ্ধিই গুরু হয়ে যায়। এতদিন অপরের কথা শুনে, শাস্ত্র পড়ে নিজেকে একদিকে নিয়ে গেছে, সাধনা করতে করতে তার মধ্যে একটা রূপান্তর আসে, রূপান্তর আসার পর নিজের যে সদ্বুদ্ধি সেই তখন তার গুরু হয়ে যায়। ওই জায়গাতে এসে আবার অন্য সমস্যা শুরু হয়, কারণ সবাই মনে করে আমার বুদ্ধি সৎ আমি ঠিক পথেই যাচ্ছি। বুদ্ধি সৎ হয়েছে কিনা তারও লক্ষণ আছে। অনেক ভক্ত এসে বলে ঠাকুর আমাকে এই এই আদেশ দিয়েছেন। এগুলো বোঝা যায় ফলেন পরিচিয়তে। বুদ্ধি সৎ হয়েছে কিনা, জীবনে এর প্রতিফলন কিভাবে দেখা যাবে? তাকে দেখলেই কি লোকের মনে আনন্দ হয়, তাকে দেখলেই কি লোকের মনে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা জাগে, তাকে দেখলে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য লাভ করার প্রেরণা আসছে কি, তখন বুঝতে হবে হ্যাঁ! তাঁর বুদ্ধি সৎ, তাঁর ভেতরে জ্ঞান এসেছে। যার ভেতরে যা জ্ঞান আছে সেই জ্ঞানের প্রতিফলন দেখা যাবে তার জীবনে। যাঁর ভেতরে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, অপর কেউ তাঁকে দেখলেই তার ভেতরে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা আর জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যের প্রতি আকর্ষণ আসবে।

অবতার তত্ত্ব ধারণা করা অসম্ভব। যোগে যে পুরুষকে কেন্দ্র করে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে সেটাও ধারণা করা যায়, বেদে যে সচ্চিদানন্দের কথা বলছে তাও ধারণা করা যায় কিন্তু অবতার তত্ত্বকে কিছুতেই ধারণা করা যায় না। মুর্খদের পক্ষে ঠিক উল্টো, অবতার তত্ত্ব বুঝে নেওয়া তাদের পক্ষে সব থেকে সহজ কিন্তু যোগ বা বেদের তত্ত্ব তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। অহল্যা যে বলছেন *অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতৎ*, এসব কথা ঠাকুরও দক্ষিণেশ্বরে এক সময় শুনেছিলেন। অহল্যা বলছেন আপনার এই মানবলীলা কি বিচিত্র। এদিকে আপনি পূর্ণ আনন্দময় তার সাথে অতি মায়াবী, পুরো বিপরীত ভাব। কি রকম সম্পূর্ণ বিপরীত? সচ্চিদানন্দ যিনি, যাঁকে আচার্য শঙ্কর বারবার আত্মা নিয়ে বলছেন, আত্মতত্ত্বের কথা বলছেন, সেখানে তিনি বলছেন জ্ঞানে কখনই অজ্ঞান থাকতে পারে না, আলোতে কখন অন্ধকার থাকতে পারে না। অবতারে এসে এই বিপরীত জিনিসগুলি সরাসরি

এসে দাঁড়িয়ে যায়। বেদান্তে যা কিছু বলছে অবতারে এসে তার বিপরীত হয়ে যায়। এসব কারণেই অবতার তত্ত্ব ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন।

চপস্যজস্রং চরণাদিবর্জিতঃ, আপনি সর্বত্র বিচরণ করছেন অথচ আপনার চরণ নেই। এটা নতুন কিছু নয়, বেদেই এই বর্ণনা এসে গেছে, ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন *অনেজদেকং মনসো জবীয়ো*, *এজৎ* মানে কম্পন, *অনেজৎ* মানে কম্পনহীন, আত্মার কোন কম্পন নেই, অথচ *মনসো জবীয়ো*, মনের থেকেও আগে আগে চলেন। একদিকে কোন কম্পন নেই, অন্য দিকে মনের থেকেও বেশি গতিতে চলেন, আলোর গতির সাথে তুলনা করা হচ্ছে না, বলছেন মন থেকে দ্রুত। এই বিপরীত ভাবে কেন বলা হচ্ছে? একটা হল, আমাদের বোঝাতে চাইছেন আত্মতত্ত্ব কত দুর্বোধ্য। অথচ *অনেজদেকং মনসো জবীয়ো* যে কোন সাধু সন্ন্যাসীদের পক্ষে ধারণা করা সহজ কিন্তু *চপস্যজস্রং চরণাদিবর্জিতঃ* বুঝতে তাঁদের অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ রাম মানেই তাঁর চরণ আছে, চরণ থাকলে তিনি তো চলেছনই, বিরোধ লেগে যায়। কিন্তু এখানে রাম কোন পুরুষকে বলছেন না, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁরই কথা বলছেন। কেন এরকম হয়? যদি আমি মনে মনে চিন্তা করি আমি চাঁদে চলে গেছি তখন আমি বলব আমি চাঁদে চলে এসেছি, এখানে সব সময় আমি ভাবটা আগে আসে, পৌঁছানর ভাবটা পরে আসে। তাহলে আগে কে গেল? আত্মতত্ত্ব আগে পৌঁছে গেছে, মন তার পেছনে আসছে, যখন বোধ আসছে আমি এখানে পৌঁছে গেলাম। আমি তোমার চিন্তা করছিলাম, আগে আমি এসে যাচ্ছে। কারণ আত্মতত্ত্ব সর্বব্যাপী, যেখানকার কথা ভাবছে সেখানেই আত্মতত্ত্ব আগে পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা মনে করি মন সবার থেকে দ্রুত চলে, কিন্তু তা নয়, I consciousness সব থেকে দ্রুত। মন থেকে আত্মবোধ অনেক দ্রুত যায়, কারণ আত্মা সর্বব্যাপী। আত্মতত্ত্বের এই মৌলিক জিনিসটাকেই এখানে অবতার তত্ত্বে প্রয়োগ করছেন। হে রাম! আপনি চরণবিবর্জিত অথচ আপনি সব সময় চলছেন।

তারপরে সহজ বলছেন, আপনার চরণ থেকে গঙ্গা বেরিয়েছে। পুরাণের বর্ণনানুযায়ী গঙ্গা ভগবানের চরণ থেকে বেরিয়েছে। গঙ্গা সমস্ত জগতকে পবিত্র করে, এমনকি ব্রহ্মা, শিব এনাদেরকেও পবিত্র করে। শ্রীমাকে আমরা বলি মা হলেন পবিত্রতাস্বরূপিণী। ভগবানকে সরাসরি পবিত্রস্বরূপ না বলে বলছেন ভগবানের চরণ থেকে যে গঙ্গার উৎপন্ন সেই গঙ্গা সমস্ত জগতকে পবিত্র করে। অহল্যা বলছেন আমার কী সৌভাগ্য সেই ভগবানকে আমি সাক্ষাৎ দেখছি। মানে অহল্যা পবিত্রতমা হয়ে গেলেন। উপনিষদ বলছেন *ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি*, যাঁর জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যায় তিনি সেই জ্ঞানের সাথে এক হয়ে যান। আর বলছেন –

মর্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্।
ধনুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান ভজিষ্যে।১/৫/৪৬

শ্রীরামচন্দ্রের দেহে যিনি ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন আমি নিরন্তর তাঁরই ভজনা করছি, আমি আর কারুর ভজনা করতে চাই না। এখানে আবার বিরোধ এসে যায়। অহল্যা এতক্ষণ ধ্যানে ছিলেন, তাঁর জানার কথা নয় যে ভগবান শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু এখানে স্তুতি করা হচ্ছে, স্তুতি হওয়ার জন্য আরেকটা জায়গায় পরে আসবে, রামকথা অনেক হয়ে গেছে ইত্যাদি। যাই হোক মূল কথা হল আমরা যদি অবতার তত্ত্ব হিসাবে দেখি তাহলে অহল্যা যে বলছেন একমাত্র ভগবানের চিন্তন ছাড়া আমি আর কারুরই চিন্তা করতে চাইছি না, তাতে তিনি ঠিকই বলছেন। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের যিনি অবতার তাঁকে বলছেন, যিনি মানুষের মুর্তি ধারণ করে এই মর্ত্যলোকে অবতরণ করেছেন। হরি হলেন ঈশ্বরলীলা আর শ্রীরাম হলেন অবতারলীলা, সবই লীলা, ঈশ্বরটাও লীলা অবতারটাও লীলা –

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নাম্নসাররসিকো ভগবান পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি।১/৫/৪৭

বলছেন, যাঁর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম, যেখান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি, কিন্তু তার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল চরণকমলের রজ, রজ অর্থাৎ ধুলি, রজ আমরা ধুলো অর্থে বলি ঠিকই কিন্তু রজ মানে কণা। ভগবানের পায়ে তো ধুলো আসবে না, বলছেন যেমন পদ্মফুলে রেনুর কণা থাকে, শ্রুতি ভগবানের পাদপদ্মে সেই রেণু খুঁজে বেড়ান, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি আমার হৃদয়ে অহর্নিশি ধ্যান করি। এগুলো স্তুতি, আমরা যাতে আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য স্তুতি করতে পারি সেইভাবে রচিত হয়েছে। শ্রুতি অর্থাৎ বেদ যাঁর পাদপদ্মের রজ খুঁজে বেড়ায় এগুলোকেই কাব্যিক বর্ণনা বলা হয়। যেমন কবি হিমালয়ের বর্ণনা করে কবিতা লিখছেন, হিমালয়ের বর্ণনা করে কোন লেখক রম্য রচনা বা ভ্রমণ কাহিনী লিখছেন বা কেউ হিমালয়ের ছবি আঁকছে বা কোন ফটোগ্রাফার লম্বা লম্বা ক্যামেরা দিয়ে ফটোগ্রাফি করছে, এর সবটাতেই হিমালয় থাকছে কিন্তু এগুলো দিয়ে হিমালয়কে আমি কখনই সম্পূর্ণ রূপে জানতে পারব না। আমি হিমালয়ে গিয়ে যদি দেখেও থাকি তাতেও আমি হিমালয়কে জানতে পারব না। হিমালয়কে যদি জানতে হয় তাকে হিমালয়ে গিয়ে থাকতে হবে, তাতেও কেউ পুরো হিমালয়কে জানতে পারবে না, কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রান্ত পর্যন্ত হিমালয় বিস্তির্ণ হয়ে আছে। তাহলে কবিতা বা লেখা পড়ে বা কোন ছবি দেখে হিমালয়ের যে ধারণা আমার হবে সেটা সব সময় হিমালয়ের ব্যাপারে অসম্পূর্ণ জ্ঞানই হবে। এক হিমালয়কেই বর্ণনা করতে গিয়ে যদি একটা কবিতা বা বই অসম্পূর্ণ হয় তাহলে যিনি ঈশ্বর, যিনি অনন্ত, তাঁকে শাস্ত্র কিভাবে বর্ণনা করতে পারবে। যেমন হিমালয়কে ছবি দিয়ে, কবিতা দিয়ে, আমরা বর্ণনা করতে চাইছি, অনন্তকেও শাস্ত্র সেই ভাবে বর্ণনা করতে চাইছে। শাস্ত্র মানে কটি বই? কয়েকটা বেদ, আর রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে শাস্ত্র শেষ। অনন্তকে কি এটুকুর মধ্যে বর্ণনা করা যায় কখন! কখনই সম্ভব নয়। ভগবানের ব্যাপারে, অনন্তের ব্যাপারে সব বর্ণনাই তাই অসম্পূর্ণ। এই ভাবকেই কাব্যিক শৈলীতে বলছেন শ্রুতি আপনার চরণের রজ অর্থাৎ কণা খুঁজে বেড়াচ্ছে। খুঁজে বেড়ান মানে, নাগাল পাচ্ছে না। *যতো বাচো নিবর্তন্তে মনসা অপ্রাপ্য সহ*, খুব বিখ্যাত মন্ত্র, বলছেন মন আর বাণী তাঁকে না পেয়ে ফেরত চলে আসে। এখানেও একই কথা বলা হচ্ছে। যেখানে হিমালয়কে বর্ণনা করা যাচ্ছে না, সেখানে ভগবান যিনি অনন্ত তাঁকে কিভাবে বর্ণনা করবে!

আমাদের অবস্থা হল কুয়োর ব্যাঙের মত। সমুদ্রের ব্যাঙ কি করে কুয়োর মধ্যে এসে পড়েছে। কুয়োর ব্যাঙ তার কাছে জানতে চাইছে সমুদ্র কত বড়, কুয়োর এক পাশ থেকে আরেক পাশে লম্ফ দিয়ে জিজ্ঞেস করছে সমুদ্র কি এত বড়? কুয়োটাই তার কাছে বিশাল। সমুদ্র আর হিমালয় পৃথিবীতে এই দুটোই বিশাল বস্তু। ভগবানকে ভাবতে গেলে এই দুটোর সাথে তুলনা করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, এত শাস্ত্র পড়ারও আর দরকার নেই। কারণ আমরা যার ব্যাপারে কিছু জানি না তাকে সব সময় ছোট বলেই মনে করি। মনে মনে হিমালয়কে কল্পনা করুন, একটা পিঁপড়েকে হিমালয়ে ছেড়ে দিয়ে বলে দেওয়া হল হিমালয়ের খবর নিয়ে এস। দুদিন পরে খবর এল পিঁপড়েটা মারা গেছে, কিছুই জানতে পারল না। ঠিক আছে এবার একশ খানা পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর ওদের বলে দেওয়া হল, তোমরা হিমালয়ে পাঁচ বছর সাত বছর ঘুরে ঘুরে হিমালয়ের সব খবর নিয়ে এস। দশ বছর পর মেনে নিচ্ছি একশটা পিঁপড়েই ফিরে এসেছে, কিন্তু একশটা পিঁপড়ে হিমালয়ের কতটুকু খবর নিয়ে আসতে পারবে! আসলে এটাই ঠিক, শ্রুতিরা সব পিঁপড়ের মত। এক একটা শাস্ত্র মানে এক একটা পিঁপড়ে। ঠাকুর এটাই বলছেন, একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে মনে করছে এর পরের বার যখন আসব তখন পুরো পাহাড়টা তুলে বাড়ি নিয়ে যাব। তারপর ঠাকুর বলছেন, শুকদেবাদি যেন ডেঁও পিপড়ে, হদ্দ একটা কি দুটি দানা মুখে করে নিতে আসতে পারবেন। অহল্যা এটাই বলছেন *যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং*, শ্রুতি তোমার পায়ের রজ খুঁজে বেড়ায়। এর মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি অলঙ্কার করা হচ্ছে না। এটাই আক্ষরিক সত্য কিন্তু কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে, এছাড়া আর কিছু না। ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বরকে কি জানা যায় গা! এটাকে ঠাকুর গ্রাম্য ভাষায় বলছেন আবার এটাকেই যখন কাব্যিক ঢঙে বলছেন তখন বলছেন শ্রুতি যেন তোমার চরণের রজ হাতড়াচ্ছে। এখানে শ্রুতি পরম সত্তার যা যা কথা বলেছে, কোন কথাকেই ভুল বলা হচ্ছে না, কিন্তু সবটাই অসম্পূর্ণ। অহল্যা বলছেন যিনি এই রকম তাঁকে আমি সাক্ষাৎ দেখছি। এরপর শবরীর কাহিনীতেও এই ভাব আসবে, যাঁকে সারাটা জীবন ধ্যান করে এসেছেন, হঠাৎ তাঁকে সামনে দেখছেন, তাঁকে ফল খাওয়াচ্ছেন।

হিন্দুদের সব শাস্ত্র, অন্যান্য ধর্মে যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রকে এক করে দিয়েও যদি ঈশ্বরের বর্ণনা করা হয়, তা ঈশ্বরের রূপের বর্ণনাই হোক, লীলার বর্ণনাই হোক আর ঈশ্বরের গুণের বর্ণনা করা হোক, কোন বর্ণনাই সম্পূর্ণ হবে না, সবটাই খণ্ডিত বর্ণনা হবে, কোন কিছু দিয়েই সেই অনন্ত ভগবানের বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অথচ

তিনি দেখছেন সেই ভগবান তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলছেন ‘তুমি এই চোখে আমার বিশ্বরূপ দেখতে পারবে না, সেইজন্য তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিচ্ছি’। এই দিব্য চক্ষু সাধনা ছাড়া হয় না। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন – সাধনা করতে করতে শরীর মন সবটাই নতুন হয়ে যায়, এমনকি লিঙ্গ পর্যন্ত। এই শরীরের মধ্যেই একটা আধ্যাত্মিক শরীর বাস করছে কিন্তু পুরোটাই অন্য রকম। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণা করা খুব কঠিন। আধ্যাত্মিক শরীর এই স্থূল শরীরেই আছে কিন্তু সাধনা করে করে সেই শরীরটা একটা আলাদা রূপ নিয়ে নেয়। ওই যে একটা নতুন মন তৈরী হয়, ওই নতুন মন দিয়ে তাঁকে জানা যায়। তপস্যা আর ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া এই জিনিস হবে না। তপস্যা করে অনেকের হয়েও যায় কিন্তু তাও যে তিনি তাঁর দর্শন পাবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ঠাকুর যে নরেনকে বলছেন, হ্যাঁ আমি ঈশ্বর দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি। তার কারণ, ঠাকুর দেখছেন যে আধ্যাত্মিক শরীর ও মন দিয়ে ঈশ্বর দর্শন হয় সেটা নরেনের ভেতরে তৈরী হয়ে আছে। একমাত্র নরেনকেই ঠাকুর বলছেন, আমি ঈশ্বর দেখেছি তোকেও দেখাতে পারি, যদিও পরিবর্তিকালে ঠাকুরের কৃপায় অনেকেরই অনেক কিছুর দর্শন হয়েছে। তফাৎ হল, নরেন তৈরী হয়েই আছেন, বাকীরা যখন এসেছেন তখন তাঁরা নরেনের মত তৈরী নন। ঠাকুরের কাছে এসে ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে তৈরী হচ্ছেন। স্বামীজীকে দিয়েও ঠাকুর অনেক সাধনা, জপ-ধ্যানাদি করিয়েছেন, সাধনার অনেক নতুন নতুন পদ্ধতি শিখিয়েছেন। নরেনের শরীরের লক্ষণ দেখে ঠাকুর বুঝতে পারছেন এর সেই সূক্ষ্ম শরীরটা তৈরী হয়ে গেছে, যে সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে ঈশ্বরকে জানা যায়। যে কেউ এসে যদি বলে আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে, বোঝা যায় এদের কোথাও ভ্রান্ত দর্শন হচ্ছে, কারণ ঈশ্বর দর্শন হওয়ার আগে তার শরীর মন পুরোটাই পাল্টে যাবে। আমরা হয়ত দেখে বুঝতে পারব না, কিন্তু যিনি জানেন তিনি দেখেই বুঝতে পারবেন যে এর ভেতরে ওই জিনিসটা তৈরী হয়ে আছে।

অহল্যা যে এতদিন ধরে তপস্যা করেছেন, তপস্যার ফলে তাঁর ওই সূক্ষ্ম শরীর মন তৈরী হয়ে গেছে, সেইজন্য তিনি দেখতে পারছেন। পাশেই লক্ষ্মণ বা বিশ্বামিত্র আছেন, তাঁরা কিন্তু কিছুই দেখতে পারছেন না, একমাত্র অহল্যাই দেখছেন। এরমধ্যে তপস্যার ব্যাপারটা তো আছেই তার সাথে ঈশ্বরের কৃপাও লাভ করেছেন, এই দুটোকে মিলেই সম্ভব হচ্ছে। অহল্যা বলছেন, *যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ*, যে ভগবানের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম, ভগবান শঙ্কর সদা যাঁর নাম-রসপানের রসিক পুরুষ আমি সেই ভগবানকে নিত্য হৃদয়ে ধ্যান করি। শিবের ইষ্ট শ্রীরাম, শিবকে রামনামের রসিক বলা হয়। নিজেদের মতকে বড় করে দেখানর ব্যাপারটা কিছুটা এখানে এসে যায়। তবে আমরা যে রামমন্ত্র বলি, রামমন্ত্র মানে সেই সচ্চিদানন্দ মন্ত্র। যাঁরাই ঈশ্বর চিন্তন করেন তাঁরা ওই মন্ত্রেরই ধ্যান করে, তা যিনিই তাঁর ইষ্ট হন না কেন। সেটাই এখানে অহল্যা বলছেন *রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি*, আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রেরই ধ্যান করি, শ্রীরামচন্দ্র সেই সচ্চিদানন্দ। স্তুতি করে অহল্যা বলছেন –

যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে।৪৮

পুরাণে বিভিন্ন অবতারাদির বর্ণনা করা হয়েছে। অহল্যা বলছেন, নারদ প্রমুখ ঋষিরা, বা শিব ব্রহ্মাদি দেবতারা যখন সেই অবতারের চরিতামৃতবলী গান করেন বা বলেন তখন তাঁদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে। ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান, ভক্তি লাভ হয়েছে, ঈশ্বর দর্শন হয়েছে তার একটা লক্ষণ কুণ্ডলিনী জাগরণ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে যখন হৃদয়ে আসে তখন সে অনাহত ধ্বণি শুনতে পায়। সেখান থেকে কণ্ঠ দেশে কুণ্ডলিনী আসার পর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা বলে না, এখানে দ্বিতীয় যেটা বলছেন তা হল, ঈশ্বরীয় কথা শুনলে বা বললে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল বেরিয়ে আসে। সাধারণ অবস্থায় আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলো ধারণা করা খুব কঠিন। চার-পাঁচ বছরের শিশুর মা যদি দূরে চলে যায়, মায়ের কথা বললে শিশুর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। যাকেই ভালোবেসে থাকুক, মাকে, সন্তানকে, প্রেমিকাকে, তার যে বিরহ বা তার কথা বলতে গিয়ে যে আনন্দ হবে তাতে তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু বেরিয়ে আসবে। নারদ মুনি তো ভগবানের গান করে বেড়ান আর ব্রহ্মা, শিব যাঁরা এই জগতকে চালাচ্ছেন তাঁরাও ঈশ্বরীয় ধ্যান চিন্তন ছাড়া আর কিছু করেন না, কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা বলেতে গেলে তাঁদের বাণী গদগদ হয়ে যায়। ভক্তদের এই জিনিসটা খুবই স্বাভাবিক, ঈশ্বরীয় কথা কণ্ঠ দিয়ে পরিষ্কার বেরোয় না, বলতে গেলেই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল বেরিয়ে আসে, ভক্তদের এটা একটা লক্ষণ। সাধক

অবস্থায় এক রকম লক্ষণ থাকে, সিদ্ধ অবস্থায় চলে যাওয়ার আরেক রকম লক্ষণ দেখা যায়। বলছেন *বাগীশ্বরী চ*, সরস্বতী তিনি নিজেই ঈশ্বরীয় কথা বলতে থাকেন। এনারা যাঁর কথা বলতে গিয়ে অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে বিগলিত হয়ে যান আমি সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণ নিলাম। যিনি সেই সচ্চিদানন্দ তাঁর স্বরূপ কি? সেই স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে এখানে সেই নির্গুণ নিরাকার থেকে সাকার, সেই সাকার থেকে অবতার এই তিনটে জিনিসকে একসাথে নিয়ে বলছেন –

সোঽহং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
একম্ স্বশংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ।১/৫/৪৯

সোঽহং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ, এগুলো ভগবানের গুণ। আমরা গুণ বলতে মনে করি বস্তু আলাদা গুণ আলাদা। বলছি লাল গোলাপ, গোলাপ আলাদা আর লাল রঙ আলাদা। যখনই বলছি লাল গোলাপ তখন অন্য গোলাপও থাকতে পারে। যখন বলছি ভালো ছেলে, তার মানে ভালো ছেলে খারাপও হয়ে যেতে পারে। বিশেষ্য আর বিশেষণ এই দুটো আমাদের কাছে আলাদা। দুটো আলাদা হওয়ার জন্য বস্তুর যদি পরিবর্তন হয়, বস্তুর ধর্মের যদি পরিবর্তন হয় তখন পুরো জিনিসটাই পাল্টে যাবে। ঈশ্বরের কাছে এগুলো গুণ নয়, এটাই তাঁর স্বভাব। স্বভাব হওয়ার জন্য কোন পরিস্থিতিতেই আর পাল্টাবে না। আমরা যাকে বিশেষণ বলি, গুণ বলি, যখন ঈশ্বরীয় কথা আসে সেখানে সেটা তার স্বভাব, তার মানে তিনি সেটাই। যেমন জল, জল যে পরিস্থিতিতেই থাকুক সে ভিজিয়ে দেবে। জলের ধর্মই হল আর্দ্রতা, এটাই জলের স্বভাব। কিন্তু অন্য দিকে জল কখন ঠাণ্ডা হয় কখন গরম হয়, গরম বা ঠাণ্ডা জলে বাইরে থেকে এসেছে। গরম জল মানেই জলটা গরম, ঠাণ্ডা জল নয় আর গরম জলের ক্ষেত্রে জল ভেজায়, জল শুকোয় এই জিনিসও হবে না। ভালো, ভালোবাসা, প্রেম এই শব্দগুলি ব্যবহার করার সময় আমরা বিশেষণ রূপেই ব্যবহার করি। বিশেষণ আর ধর্ম দুটো সব সময় আলাদা জিনিস। যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন সাধারণ লোকদের বিশেষণ আর ধর্মের এই তফাৎটা বোঝান যাবে না। বিশেষণ মানেই যেটা আজ আছে কাল সেটা নাও থাকতে পারে। যখন ভগবানকে আমরা বলছি তিনি অনুগ্রহ করেন, তখন অনুগ্রহণ করাটা কি একটা বিশেষণ নাকি ধর্ম? আমাদের মন এমন ভাবে তৈরী যে আমরা অনুগ্রহ করাকে বিশেষণ ছাড়া কল্পনাই করতে পারি না। বিশেষণ হলে ভগবান এক সময় আমাদের অনুগ্রহ করেন, অন্য সময় তিনি আমাদের অনুগ্রহ নাও করতে পারেন। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর! তুমি আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার কর। তার মানে আমি ধরেই নিয়েছি যে ঠাকুর আমাকে অনুগ্রহ করবেন, আর প্রার্থনা না করলে তিনি অনুগ্রহ করবেন না। তার মানে ঠকুর কখন অনুগ্রহ করবেন আবার কখন অনুগ্রহ করবেন না, অনুগ্রহ করাটা তাই বিশেষণ হয়ে গেল। ভগবানের কখনই বিশেষণ হয় না। বারবার বলা হয় তিনি হলেন নির্বিশেষণ। নির্বিশেষণ মানে তাঁর যা কিছু আছে সেটাই তাঁর ধর্ম, ওটাই তিনি। যেমন জল, জল সব কিছুকে ভেজাবেই, ঠাণ্ডা জলও ভেজাবে, গরম জলও ভেজাবে। ঠাণ্ডা গরমটা জলের বিশেষণ। যে কোন জিনিসের যেটা বিশেষণ সেটাই মিথ্যা আর যেটা তার ধর্ম সেটাই সত্য। সৎ ও অসৎ, সত্য ও মায়া বা সত্য মিথ্যা এই শব্দগুলো যখন আসছে তখনও এদের একই তফাৎ। আমরা মায়া বলতে মনে করি মিথ্যা, মায়া মানে যেটা নেই। কিন্তু তা নয়, মায়া মানে changing, মায়া সব সময় change করবে। যদি বলি শ্যাম একটি ভালো ছেলে। এর মধ্যে সৎ আর অসৎ কোনটা? ছেলেটা সৎ আর ভালোটা অসৎ। অসৎ মিথ্যা কারণ আজকে ভালো আছে কাল মন্দ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ছেলে ছেলেই থাকবে, ছেলে কখনই পাল্টে মেয়ে হয়ে যাবে না, সেইজন্য সৎ। কিন্তু ছেলেটি আজকে বেঁচে আছে কাল সে মরে যাবে, তাহলে জীবনটা অসৎ হয়ে গেল। মলিক্যুলস অবস্থায় যখন চলে গেল তখন সেটা সৎ আর জীবনটা অসৎ হয়ে গেল। কিন্তু মলিক্যুলস অবস্থাতেও আইনস্টাইনের থিয়োরী অনুযায়ী এণার্জিই আছে, তাহলে তখন মলিক্যুলসটাও অসৎ হয়ে গেল।

ধর্ম জিনিসটা যদি বুঝতে হয়, ঈশ্বর তত্ত্বকে যদি বুঝতে হয় তাহলে প্রথমে বিশেষণ ও ধর্ম এই দুটোর তফাতটা ধরতে হবে। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমাদের মানসিক গঠণ এমন ভাবে তৈরী যে আমরা নিজেদের সুবিধা, নিজের লাভের বাইরে চিন্তা করতে পারি না। কেউ যখন মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলতে আসে সেখানেও পরিষ্কার বোঝা যায় কিছু স্বার্থসিদ্ধি করতে চাইছে। ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝতে গেলে প্রথমেই ভালো করে বুঝে নিতে হবে

যে, ঈশ্বরের ব্যাপারে যা কিছু বলা হয় কখনই সেটা কোন অবস্থাতেই বিশেষণ হয় না। ঈশ্বরের ব্যাপারে যা কিছু বিশেষণ ব্যবহার করা হয় আমরা ভুলে সেটাকে বিশেষণ ভাবি, শাস্ত্র কখনই ওগুলোকে বিশেষণ অর্থে নেয় না, শাস্ত্র সব সময় ঈশ্বরের ধর্ম রূপে নেয়। লাল গোলাপ যে অর্থে চলে ভগবানের সেই অর্থে লাল হয় না। তবে আচার্য শঙ্কর বলছেন, স্ফটিকের সামনে যদি একটা লাল গোলাপ রেখে দেওয়া হয় তখন স্ফটিক লাল দেখাবে। অবতারের যত রকম ক্রিয়া আমরা দেখছি, সেই ক্রিয়াগুলো ঠিক সেই লাল গোলাপ রেখে দেওয়ার মত, সেখান থেকে লাল রঙ প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু স্ফটিক স্ফটিকই আছে।

কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে বলার সময় তখন এটাই বলেন *সোঽহং পরাত্মা*, যিনি ঈশ্বর তিনিই পরমাত্মা। ওই জায়গায়র সত্তায় কোন ধরণের আপোস হবে না। আমরা যেমন বললাম ভালো ছেলে, যেমন যেমন এর পেছনের দিকে যাব তেমন তেমন আগে যেটা বলা হল সেটা মায়া বা মিথ্যা বা অস্থায়ী, যেমন যেমন পেছনের দিকে যাব তেমন তেমন সেটা আরও বেশি স্থায়ী হবে। ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার আগে শেষ যায় প্রকৃতির কাছে, প্রকৃতিও মায়া। কারণ প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন মানেই প্রকৃতি, সৃষ্টি মানেই পরিবর্তন, পরিবর্তন মানেই প্রকৃতি। তার পেছনে যিনি আছেন তিনি পরাত্মা, সব কিছুর উপরে। ওখানে কোন পরিবর্তন নেই, যদি পরিবর্তন হয় তাহলে মেনে নিতে হবে তারও পেছনে কিছু একটা আছে। এটাকে দর্শন শাস্ত্রে বলে অনবস্থাদোষ। একটা কোথাও গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। যেখানে গিয়ে দাঁড়াব সেটাই হলেন পরমাত্মা বা আমাদের শাস্ত্রে বলছেন পরাত্মা। পরা মানে শ্রেষ্ঠ, সব কিছুর পারে, পরম মানে সর্বোচ্চ, একই অর্থ।

পুরুষঃ পুরাণ, তিনি সেই আদিপুরুষ। সেখান থেকেই সৃষ্টি, সেখানেই স্থিতি আর সেখানেই লয়। আর *একম্*, তিনিই আছেন। *একম্* মানে এক নয়, *একম্* মানে যার সাথে কারুর তুলনা করা যায় না। যখন বলা হয় ঈশ্বর এক, এই এক এক, দুইয়ের এক নয়, এই এক মানে কারুর সাথে তুলনা হবে না, অতুলনীয়। আমরা ছোটবেলা থেকে যে পদ্ধতিতে জগতের সব কিছু শিখছি জানছি এই পদ্ধতিকে বলে উপমান। উপমান মানে তুলনা করা। নবজাতক শিশু প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে না, নিজের খাওয়া, নিঃশ্বাস ছাড়া কিছুই বুঝতে পারে না। কিন্তু দিনরাত যাকে বারবার দেখতে থাকে তার ছবিটা গিয়ে তার ভেতরে বসতে থাকে। নবজাতক শিশু প্রথম দিন থেকে নিজের মাকেই সব সময় দেখছে। সেখান থেকে দেখে আরেকজন আসছে, তখন ওর মধ্যে মা আর বাবার ব্যাপারে একটা সংশয় হতে থাকে। বাড়িতে যদি আরও পাঁচজন থাকে তখন আরও সংশয় হবে। ছোট্ট বাচ্চাকে যদি লক্ষ্য করা হয় দেখা যাবে সবাইকে উল্টোপাল্টা বলতে থাকে। কোন রকমে একটা দুটো শব্দকে ধরে নিচ্ছে। এরপর তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়, এ তোমার মা আর এ তোমার বাবা। এখন ওর মাথায় ঘুরতে শুরু করে, এ কেন মা আর এ কেন বাবা। তখন সে বুঝে নেয় লম্বা চুল মানে মা। ইদানিং কালে মেয়েদের ছোট চুল বাচ্চাদের আরও সংশয় বেড়ে যাচ্ছে। মা বাচ্চাকে খাওয়ায় আর খাদ্যটা ভেতরের অনুভূতি, সেইজন্য সে বুঝতে পারে এই মহিলা আমার খাওয়ার উৎস আর বাকিরা অন্য অন্য জগৎ। এইভাবে বাচ্চা ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করে। স্কুলে যাওয়া শুরু হওয়ার পর ওকে বোঝান শুরু হয়, এটা কি? এটা নাক। এটা কটা? এটা একটা। সেখানেও তার সংশয় লেগে যায়, এটা এক এটা দুই। এরপর বারবার বলে বলে যখন মাথায় যেতে শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে তফাৎটা ধরতে পারে যে, এটা যখন হবে তখন এক হবে, আর এটা যখন আসবে তখন দুই হবে। এরপর কিছু কিছু জিনিস তাকে মুখস্ত করিয়ে দেওয়া হয়। মুখস্ত করিয়ে দেওয়ার পর বাকি যে জিনিসগুলো আসবে সেগুলোকে তুলনা করে করে মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়।

জিনিয়াস মানে হয়, তার মাথায় এত বেশি জিনিস আছে যে, যখনই কোন নতুন জিনিস আসে ফট ফট করে সেটাকে সব জিনিসের সাথে তুলনা করে link করে নেয়, link করার জন্য data base দরকার। তার কাছে প্রচুর data base আছে আর readingএর যে process সেটাও খুব fast। জিনিয়াস মানেই তাই, ওর comparing processটা খুব fast আর data baseটাও বিরাট। শিক্ষা একটা পদ্ধতিতেই হয় সেটা হল উপমান। জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে তুলনা করা যায়, জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেটাকে আরেকটা অন্য জিনিসকে দিয়ে তুলনা করা যাবে না। কিন্তু একমাত্র ভগবানকে কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। সেইজন্য যে অর্থে আমরা জানা বলি সেই অর্থে ভগবানকে কখনই জানা যায় না। আমরা সব সময় ঈশ্বর জ্ঞান শব্দটা ব্যবহার করে যাচ্ছি, কিন্তু ঈশ্বর জ্ঞান কখনই ওই অর্থে হয় না যে অর্থে আমরা জ্ঞানকে বুঝি। জ্ঞান মানেই তুলনাত্মক, উপমান। উপমান মানেই উপমা, একটা জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিসকে তুলনা করে জানার চেষ্টা।

বেদান্তের খুব প্রচলিত উপমা হল, একজন সিংহ কি জিনিস জানে না, তাকে বোঝান হল কুকুরের মত কিন্তু বিরাট লম্বা, গায়ের রঙ ধুসর আর ঘাড়ের কাছে লম্বা লম্বা চুল আছে, মুখটা হাড়ির মত আর হালুম করে ডাক ছাড়ে। এই বর্ণনাগুলো শোনার পরে মনের মধ্যে একটা সিংহের আকার তৈরী হয়ে যাবে। মন যে ইমেজ তৈরী করছে সে কিছুটা কুকুর থেকে নিচ্ছে, কিছুটা বেড়াল থেকে নিচ্ছে, কিছুটা নিচ্ছে কোন রঙ থেকে। চিড়িয়াখানায় গিয়ে প্রথমে বাঘ দেখল, বাঘ দেখে সন্দেহ হচ্ছে এটাই সিংহ কিনা। এরপর সিংহকে দেখবে তখন তাকে বলে দিতে হবে না যে এর নাম সিংহ, নিজেই বুঝে নেবে। আগে যা কিছু দেখেছিল, যা শুনেছিল, সব নিয়ে মনের মধ্যে যে একটা কল্পনা তৈরী করেছিল সেটাই যখন বাস্তবে দেখে নিল তখন তার কাল্পনিক মুর্তিটা বেরিয়ে গেল আর তার জায়গায় আসল জিনিসটা এসে গেল। আমরা প্রায়ই বলে থাকি, আপনার কথা শুনে আমি আগে এই রকম ভাবতুম, পরে দেখলুম এই রকম। যখনই আমরা কোন কথা শুনি আমরা সঙ্গে সঙ্গে একটা কাল্পনিক ছবি দাঁড় করিয়ে দিই। তারপর দেখা যাচ্ছে বাস্তবে ঠিক সেই রকম নয়, এইভাবে সব সময় আমাদের ভেতর উপমান চলছে।

ভগবানকে নিয়েও আমরা একটা কাল্পনিক ছবি তৈরী করে রেখেছি। কিন্তু ভগবানকে ওই কাল্পনিক ছবিতে ফেলা যায় না। যখন সাক্ষাৎ দর্শন হয় তখনও ফেলা যায় না। ঠাকুর বারবার বলছেন ঈশ্বরের ব্যাপারে পড়লে এক রকম, শুনলে এক রকম, চিন্তন করলে আরেক রকম কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন হলে একেবারে অন্য রকম। সেইজন্য শব্দ দিয়ে ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেটা দিয়ে ভগবানের উপমান করা যাবে। সেইজন্য তাঁর নাম একম্। এই জিনিসগুলো শুনে রাখলে কাজে লাগে, এরপর ধীরে ধীরে ধারণা হয়। আর আমরা যতই শুনে যাই, যতই আমরা পাঠ করেতে থাকি না কেন আমরা সব সময় ভাবছি শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে একজন পরম পুরুষ যিনি আকাশের উপর কোথাও বসে আছেন, সেখান থেকে তিনি আমাদের উপর কৃপা করছেন, অন্যায় করলে তিনি আমাদের সাজা দেন। ঈশ্বর তা নন। মা ভালোবাসে, মা শাসন করে, ঈশ্বরও কি তাই? একেবারেই না। যদি তাই হয় তাহলে তো ভগবানের সাথে মায়ের তুলনা হয়ে গেল, তাহলে তিনি আর কিসের ঈশ্বর থাকলেন! তাহলে ঠাকুর কেন মা বলে ডাকতেন? ঠিকই, কারণ এই জগতে যত শব্দ ব্যবহার করতে হয় তখন মা শব্দটা খুব কাছাকাছি হবে বা যীশু যখন ফাদার বলে ডাকছেন তাঁর কাছে ওটাই সব থেকে কাছের শব্দ বলে মনে হচ্ছে। আমাদের ভেতরে যে শব্দের ভাণ্ডার আছে তাতে এর থেকে অন্য কাছাকাছি শব্দ আর কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে এর সাথে যে কোন সম্পর্ক আছে তা নয়।

আর বলছেন স্বয়ংজ্যোতি, তিনি স্বয়ং প্রকাশ। যেটাই স্বয়ং প্রকাশ তাকে কেউ কখন আলোকিত করতে পারে না। জগতের যে কোন বস্তুকে জানার জন্য আলো দরকার, আর যে কোন চিন্তাকে জানার জন্য বুদ্ধির আলোর দরকার। কিন্তু আত্মাকে কোন আলোই আলোকিত করতে পারে না। জাগতিক যে কোন আলো তা সূর্যই হোক, চন্দ্র হোক, টিউব লাইট হোক কোন কিছুই তাঁকে আলোকিত করতে পারে না। আর বুদ্ধিও যে তাঁকে আলোকিত করবে তাও না, তিনি স্বয়ংজ্যোতি। *অনন্ত আদ্যঃ*, প্রথম থেকে তিনিই আছেন। যখন বলা হল প্রথম থেকে তিনিই আছেন, তখন বৌদ্ধদের শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানের যে মত সৃষ্টির বাইরে কিছু নেই অর্থাৎ পদার্থ জগতের বাইরে কিছু নেই, এই মতকে নাকচ করে দেওয়া হল। আমরা দেখছি জগতের সব কিছুই দুদিন পরে শেষ হয়ে যাচ্ছে, যেটাই আছে সেটারই নাশ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ভগবানেরও শেষ আছে? না, ভগবানের শেষ হয় না, কারণ তিনি *অনন্তঃ*। অনন্তের আরেকটা অর্থ হয়, আমরা চেষ্টা করলে প্রশান্ত মহাসাগরকেও মেপে নিতে পারব, হিমালয়ের উচ্চতাকেও মেপে নেওয়া যায়, জগতের সব কিছুকেই মেপে নেওয়া যায়, ঈশ্বরকে কোন দিন মাপা যাবে না, কারণ তিনি অনন্ত।

মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো, সেই ভগবান মায়াকে আশ্রয় করে নানা রকমের শরীর ধারণ করেন, তিনিই ব্রহ্মা হন, তিনিই বিষ্ণু হন তিনিই শিব হন। *ধত্তে পরানুগ্রহঃ এষ রামঃ*, তিনিই জগতের মঙ্গল করার জন্য রাম হয়েছেন। ভগবান যিনি পরাত্মা, সেই আদিপুরুষ, স্বয়ংপ্রকাশ তিনিই লোকেদের অনুগ্রহ করার জন্য এই রাম রূপ ধারণ করেছেন। ভগবান যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর একটাই কাজ হয়, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্মকে আচার্য ব্যাখ্যা করে বলছেন – দুটি ধর্ম, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। গৃহস্থ ধর্ম আর সন্ন্যাসীদের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আসেন। এরপর আচার্য বলছেন, ভগবান যখন আসেন তখন তাঁর একটাই

উদ্দেশ্য থাকে, লোকের উপর অনুগ্রহ করা। তাহলে শ্রীরাম এসে রাবণের বধ করলেন এতে অনুগ্রহ কোথায় হল? বালিকে লুকিয়ে বধ করে দিলেন, কোথায় অনুগ্রহ হল? আসলে ধর্ম মানে একটাই, সনাতন ধর্ম, বৈদিক ধর্ম। বৈদিক ধর্ম পরিষ্কার, গৃহস্থ ধর্ম এভাবে চলবে আর সন্ন্যাসীর ধর্ম এভাবে চলবে। এখন বলছেন, বেদের যে ধর্ম সেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা, এতে পাঁচজন যদি মরার থাকে মরবে, পাঁচজন যদি বাঁচার থাকে বেঁচে যাবে, এতে যদি ঋষির মরার থাকে ঋষিও মরবে, সন্ন্যাসীর যদি মরার থাকে সন্ন্যাসীও মরবে তাতে কিছু আসে যায় না। অবতারের একটাই কাজ, বেদের যে দুটি ধর্ম, কর্মকাণ্ড গৃহস্থদের জন্য, জ্ঞানকাণ্ড সন্ন্যাসীদের জন্য, এটাকে স্থাপনা করা। এখন সেখানে যদি সুবাহু মারা যাওয়ার থাকে মরবে। কৌশল্যা যদি কান্নাকাটি করার থাকে করবে, সীতার যদি কষ্ট পাওয়ার থাকে পাবে।

আমার আপনার সবার কষ্ট কোথায়? এই একটা সহজ জায়গায় সব কষ্ট। আমাদের জীবনে কি কোন উদ্দেশ্য আছে? কোন আদর্শ আছে? আমরা কেন বেঁচে আছি সেটাই জানি না। আমার স্বামী/স্ত্রী আর একটা ছেলে আছে আমি এদের জন্য বেঁচে থাকতে চাই? স্বামী/স্ত্রী সন্তান কি কখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে? পুরো জগতের সবার সমস্যা ওই একটি জায়গায়। জীবনে কোন তোমার আদর্শ নেই। কিসের জন্য তুমি বেঁচে আছ তুমি জান না। তুমি বলবে, আমি তো রোজ বেলুড় মঠে এসে চরণামৃত খাই। আরে ভাই! ওটা তো ক্রিয়া, আদর্শ কোথায় হল! আগেকার দিন আদর্শ ছিল ধর্ম, অর্থ ও কাম। সেটাই বর্তমান কালে তিনটে আদর্শে এসে দাঁড়িয়েছে, বিদ্যা, যে কোন বিদ্যা অর্জন করুন, দ্বিতীয় সম্পদ, নিজের জন্য নয় দেশের জন্য সম্পদ তৈরী করুন আর তৃতীয় সেবা, আমার জীবন অপরের সেবায় সমর্পিত করে দিলাম। আর যাঁরা খুব উচ্চমানের তাঁদের জন্য ত্যাগ, ঈশ্বরের জন্য আমি সব ত্যাগ করে দিলাম, আমি জ্ঞানমার্গেই যাই বা ভক্তিমার্গেই যাই ঈশ্বরের জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করে দিলাম। যারা অতটা পারবে না তাদের জন্য এই তিনটে আদর্শ, বিদ্যা, সম্পদ আর সেবা। আদর্শ যদি জীবনে থাকে কোন দিন তার ভেতরে কোন ধরণের অবসাদ আসবে না। ঠাকুর জীবনে একদিন মাত্র চোখের জল ফেলছেন, অক্ষয় মারা গেছে তিনি বলছেন ভেতরটা গামছা নিংড়ানোর মত মোচড় দিচ্ছে। তিনি বলছেন, সংসারীরা শোকে কিভাবে বিষাদগ্রস্ত হয় সেটা মা দেখিয়ে দিলেন। এর বাইরে ঠাকুরের জীবনে কোন ধরণের অবসাদ বলে কিছু নেই, সব সময় আনন্দের ঘনীভূত রূপে ভাসছেন। তখন কে এল কে বাঁচল তাতে তাঁর কিছুই আসছে যাচ্ছে না। উদ্দেশ্য সেই একটি, ধর্ম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু নরেন যদি একটু অন্য রকম কথা বলে বা অন্য ভাব নিয়ে চলতে চাইছে তখন তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়ছেন। কারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার কাজ যাকে দিয়ে করাবেন সে যাতে বিগড়ে গিয়ে ছিটকে না যায়। যে মুহূর্তে কেউ জীবনে একটা আদর্শকে ঠিক করে নেবে, আর ওই আদর্শে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে ঢেলে দেবে, এরপর কোন কিছুই তার কাছে আর আসে যায় না। যে কোন অবতারের একটাই কাজ, ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা। কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা? বেদে যে ধর্ম বর্ণিত হয়েছে। যে কোন অবতারের জীবনকে এভাবে দেখতে যদি আমরা সক্ষম হই, তখন সবটাই আমাদের আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এরপর শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে জঙ্গলে পাঠালেন, বালিকে লুকিয়ে তীর মারলেন তাতে কোন কিছু আসে যায় না।

শ্রীরামচন্দ্রের একটাই লক্ষ্য, সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অনেকে বলবে আজকালকার ছেলেরা তো তাই করছে। নিজেদের ক্যারিয়ারের জন্য বাবা-মা সবাইকে ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের কাছে কিসের আদর্শ? ওরা যেটার পেছনে ছুটে যাচ্ছে, ওটা তো আসুরিক বৃত্তি। আগে যে চারটে আদর্শের কথা বলা হল, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা আর ত্যাগ, এর মধ্যে কোন আদর্শকে এরা নিয়েছে? বিদ্যা তো একেবারেই না। সম্পদ? ম্যানেজমেন্ট মানেই তোমার পকেটের টাকা যেন আমার পকেটে চলে আসে, তাহলে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে এরা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করার বদলে লুট করে নেবে। সেবা! সুযোগ পেলে অপরকে পিষে ফেলবে আর এরপর ত্যাগের ব্যাপারটা ছেড়েই দিন। কোন আদর্শই থাকল না। শুধু নিজের জন্য টাকা উপার্জন করাটা কখনই কারুর জীবনের আদর্শ হতে পারে না। চারটে আদর্শের কোথাও এর একটা আদর্শ নেই। সেইজন্য তিরিশ বছর পেরিয়ে যেতে সবাই আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের মনে অবসাদ আসছে, এরাতো অবসাদের থেকে আরও বড় ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আদর্শ না থাকার জন্যই যত সমস্যা। একবার কেউ যদি কোন একটা আদর্শকে ধরে নেয়, এরপর কার কি হচ্ছে কোন দিকেই হুঁশ থাকবে না। ঠাকুর যে বারো বছর ধরে সাধনা করলেন, শুধু একটা ভাবকে ধরে সাধনা করে গেলেন। নিজের শরীর যে এত প্রিয় সেই শরীরেরই কোন হুঁশ নেই, জগতের ব্যাপারে তার আর কি হুঁশ থাকবে! ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর একটাই উদ্দেশ্য থাকে, ধর্মের

প্রতিষ্ঠা। ধর্ম কি তার আবার পরিষ্কার সংজ্ঞা করে দেওয়া হয়েছে – প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম। অবতারের এই একটাই উদ্দেশ্য এই দুটো ধর্মকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া, এটাকেই বলে লোকানুগ্রহ। লোকানুগ্রহ শব্দের অর্থই হয় ধর্ম সংস্থাপন, এর অন্য কোন অর্থ হয় না। জগতের যে অভ্যুদয়ের কথা বলা হয়, অভ্যুদয় মানে বৈষয়িক কল্যান, এই অভ্যুদয় সব সময় হয় ধর্মকে অবলম্বন করে। যীশু বলছেন, লবণ যদি নিজের লবণত্বকে হারিয়ে ফেলে তখন তার ধর্মটাই চলে গেল, তখন আর লবণ কোন কাজে লাগবে না, পাথর রূপে তাকে অন্য কাজে লাগাতে হবে। ঠিক তেমনি মানবজাতি যদি তার ধর্মকে ছেড়ে দেয়, মানবজাতির আর কোন বৈশিষ্ট্যই থাকবে না, তখন সে পশু হয়ে গেল। এই ধর্মকে বাঁচাবার জন্যই ভগবান অবতার হয়ে আসেন, তাতে চারটে লোক মরল আর চারটে লোক বাঁচল তার জন্য তাঁর কিছু আসে যায় না। শ্রীরামচন্দ্রকে ঠিক এই কথাই অহল্যা স্তুতি করে বলছেন, *পরানুগ্রহ*, অপরের উপর কৃপা করার জন্য ভগবান রাম রূপে এসেছেন। অহল্যা বলছেন ইনি একাই সব কিছু করেন, সৃষ্টি করেন, পালন করছেন আবার সংহারও করেন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব রূপে তিন ধরণের কাজ করে যাচ্ছেন। পরের শ্লোকে বলছেন –

নমোঽস্তু তে রাম তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াৎ।
আক্রান্তমেকেন জগত্রয়ং পুরা
ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জিতৈঃ।১/৫/৫১

স্বয়ং লক্ষ্মী যিনি সমস্ত জগতের আরাধ্যা, তিনি আপনার চরণ যুগল বক্ষে ধারণ করে লালন করেন। যিনি তাঁর এক পা দিয়েই তিনটে লোককে মেপে নিয়েছিলেন, আর ঋষি মুনিরা যাঁর চরণের ধ্যান করেন, *মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জৈতৈঃ*। মুনি মানে যাঁরা মনন করেন, ঋষি আর মুনি একই, দুজনেই আশ্রম করে থাকেন, বিবাহাদিও করেন কিন্তু ঋষিরা ক্রিয়া বেশি করেন, ক্রিয়া মানে যজ্ঞাদি করেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শিষ্যদের শাস্ত্র অধ্যয়ন করান আর মুনিরা ধ্যান বেশি করেন। সন্ন্যাসী দুজনের থেকেই আলাদা তৃতীয় শ্রেণীর, সন্ন্যাসী ক্রিয়া কোন মতেই করবেন না, আর মুনিদের মত আশ্রম করেও থাকবেন না। অহল্যা বলছেন, যে মুনিরা অভিমান বর্জিত, মন সম্পূর্ণ ভাবে অহঙ্কার শূন্য হয়ে গেছে। অহঙ্কার যাঁর চলে গেছে তাঁর মন এখন কি নিয়ে থাকবে? অহঙ্কার এখানে গর্ব হওয়া নয়, অহং মানে আমিত্ব বোধ, এই আমিত্ব যার চলে গেছে। আমাদের আমিত্ব চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পুরুষের স্ত্রীকে নিয়ে আমিত্ব, স্ত্রীর স্বামীকে নিয়ে আমিত্ব। তাদের সন্তান হল, আমিত্ব আরেকটু ছড়িয়ে পড়ল, সন্তানেও যখন হয় না তখন নাতি-নাতনী পর্যন্ত এই আমিত্ব বিস্তার হয়ে যায়। এর বাইরে জিনিস-পত্র আছে, বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সে আমিত্ব ছড়িয়ে রয়েছে। ঋষি মুনিরা বাইরের ছড়ানো আমিটাকে কেটে ছোট করে নেন, ওই ছোটটাকেও যেখানে আমিত্বটা আটকে আছে সেটাকেও বাদ দিয়ে দেন। মন এখন হয়ে গেল মুক্ত, মুক্ত মন এখন কোথায় গিয়ে থাকবে। মন এমনই একটি জিনিস যে সব সময় গতিশীল, মন কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না, মনের সব সময় একটা বিষয় চাই যেটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে। যার মন যত শক্তিশালী তার মন তত বেশি বেশি জিনিসকে আঁকড়াতে চায়। পাগলরা কাউকে আঁকড়াতে চায় না, কারণ পাগলদের মন খুব দুর্বল। মন যত শক্তিশালী তত সে ছড়াতে থাকে। যখন আরও শক্তিশালী হয় তখন সব কিছু থেকে নিজেকে গোটাতে শুরু করে। গোটাতে গোটাতে মন ফাঁকা হয়ে আসে, কিন্তু মন একেবারে ফাঁকা থাকতে পারবে না, তখন মনকে ভগবানের চরণে দিয়ে দেয়। অহল্যা এটাই এখানে বলছেন। প্রথমে লক্ষ্মীকে নিয়ে বললেন, যিনি সবারই আরাধ্যা তিনি সেই ভগবানের চরণ যুগলকে বক্ষে ধারণ করে লালন করেন, দ্বিতীয় ভগবানের চরণের বিশালত্বকে নিয়ে বলছেন, বলির যজ্ঞে ভগবান যে চরণ দিয়ে সমস্ত লোককে মেপে নিয়েছিলেন, তৃতীয় ভগবানের চরণের আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে বলছেন, মুনিরা যাঁরা পবিত্রতম, নিরহঙ্কারী, নিরাভিমান তাঁরা ভগবানের চরণের ধ্যান করেন। ভগবানের শ্রীচরণে আমি প্রণাম করছি, যে শ্রীচরণের এই এই বৈশিষ্ট্য।

জগতামাদিভূতস্ত্বং জগৎ ত্বং জগদাশ্রয়ঃ
সর্বভূতেষ্বসংযুক্ত একো আদি ভবান্ পরঃ।১/৫/৫২

আপনি এই জগতের আদি কারণ, আপনিই এই জগদ্রূপ আর আপনি এই জগতের আশ্রয়। পড়ার সময় মনে হয় কবিতার মত, কি সুন্দর বর্ণনা, কিন্তু তা নয়, এটাই বাস্তব। যিনি ঈশ্বর তিনি এই সংসারের কারণ, তাঁর

থেকেই এই সংসার বেরিয়েছে, পৃথিবী যেমন সূর্য থেকে বেরিয়েছে। জগতের এই রূপ আপনারই রূপ, আপনিই এই জগৎ রূপে হয়েছেন। আর এর আশ্রয়ও আপনি। এই বিষয়টা এর আগেও এসেছিল, আমরা সেখানে বরফ আর বরফের বাটির উপমা সহ আলোচনা করেছিলাম, এই বিষয় পরেও আবার আসবে। বরফ দিয়ে একটা বাটি তৈরী করা হয়েছে, ওই বরফের বাটির মধ্যে জল ভরে দেওয়া হল, জলে সমেত ওই বরফের বাটিকে এবার জলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। এবার একটা একটা করে বিচার করতে থাকুন, বরফের জন্ম কোথা থেকে? জল থেকে। বরফের বাটিটা নিজে কি? জল। বাটির ভেতরে কি আছে? জল। বাটির বাইরে কি আছে? জল। এই উপমা বোঝানর জন্য যে, এই রকম হয়। ঈশ্বর ঠিক তাই। এই যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টি ঈশ্বর থেকে এসেছে, সৃষ্টিতে যা কিছু আছে সেটাও ঈশ্বর, যেটা এই সৃষ্টিকে ধরে আছে সেটাও ঈশ্বর আর ভেতরে যা আছে সেটাও ঈশ্বর।

তারপরেই বলছেন *সর্বভূতেষ্বসংযুক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ*, জগতে যা কিছু আছে সবার সাথে আপনি জুড়ে আছেন, অথচ আপনি *একঃ*। আবার এখানে *একঃ* শব্দ এসে গেল, *একঃ* মানে সব কিছুর পারে। আপনার সাথে কোন কিছুকে সংযুক্ত বা জড়ান যাবে না, কারণ সব কিছুর পারে আপনি, আপনি সব কিছুর থেকে আলাদা। *আদি ভবান পরঃ*, আপনি অদ্বিতীয়। ভগবানের জগৎ যেমন একটা সত্তা, জগতের পারেও ভগবানের আরেকটা সত্তা। জগৎ রূপে তিনি ভাসমান কিন্তু জগতের পারে যে ভগবানের সত্তা সেই সত্তাকে মন, বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না। প্রাথিমক অবস্থায় ঈশ্বরকে জানতে হলে জগৎ রূপেই তাঁকে জানতে হয়। স্বামীজী বারবার বলছেন মানুষকেই শিব জ্ঞানে পূজো করো। কারণ এর বিলক্ষণ বলে ঈশ্বর কিছু নেই। আমরা ভুলে কল্পনা করি যে তিনি জগতের বাইরে ওই আকাশের কোথাও অবস্থান করে আছেন। কিন্তু তা নয়, এই জগৎ তাঁর সেই রূপ যে রূপকে পরিষ্কার বোঝা যায়, দেখা যায়। এর বাইরে তাঁর আরেকটা রূপও আছে, যে রূপকে ধ্যানের গভীরে ছাড়া জানা যায় না। কিন্তু যদি কেউ এই রূপেও দেখে তারও সেই একই জ্ঞান হবে, সেখানে কোন তফাৎ হবে না। যাদের দ্বারা ধ্যান করা সম্ভব নয়, তাদের জন্য এটাই ঠিক, সে সবাইকে ঈশ্বর রূপে দেখতে থাকুক আর তার আচরণও সেই রকম করে নিক, তাহলে আর কোন তফাৎ থাকবে না।

ওঙ্কারবাচ্যস্ত্বং রাম বাচামবিষয়ঃ পুমান্।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়।১/৫/৫৩
কার্যাকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া।১/৫/৫৪

তিপ্পান্ন আর চুয়ান্ন নম্বর শ্লোক খুব কঠিন। বাচ্যবাচক, শব্দ আর বস্তু, যেমন গ্লাশ, গ্লাশ হল শব্দ আর এর বস্তু হল এখানে যে গ্লাশ রাখা আছে। গ্লাশ হল বাচক আর বাচ্য হল এই গ্লাশ বস্তু, যেটাকে দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বর কোন শব্দ নয়। কিন্তু শব্দ হয়, ঈশন্ শাসন করার অর্থে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে বা ভগবানকে বুঝতে হলে, ভগবানের ঠিক ঠিক যে গুণ, বুঝতে হলে একমাত্র ওঁ দিয়েই বোঝান যায়। সেইজন্য ওঁ হল বাচক, *তস্যবাচক প্রণবঃ*। অহল্যা বলছেন, আপনি হলেন ওঙ্কারের বাচ্য। যে কোন ব্যাপারে যখন ওঁ বলা হয় তখন সেই ঈশ্বরকেই ইঙ্গিত করা হয়, যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করেন; যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার পারে। অথচ বলছেন, একদিকে তিনি বাচ্য আবার অন্য দিকে তিনি বাণীর অগোচর, বাণী দিয়ে তাঁকে বলা যায় না। কারণ, যেমন এই পেন, আমি বলছি পেন, কিন্তু পেন বলার আগে আমাকে পেন জিনিসটাকে আমার মাথার মধ্যে আনতে হচ্ছে, আর আগে আগে পেনের মত যা কিছু দেখেছি সেগুলোর সাথে উপমান পদ্ধতি দিয়ে আমাকে জানতে হচ্ছে যে এটা পেন। আমার মস্তিষ্কে পেনের একটা ইমেজ আগে থেকেই আছে। এখন পেনের যে ইমেজ এল, এই ইমেজকে মস্তিষ্কের ইমেজের সাথে উপমান দিয়ে জানলাম এটা পেন। ভগবানের ইমেজ যখন বাইরে থেকে ভেতরে আমরা আনছি তখন তাঁর কোন মিল পাওয়া যাচ্ছে না। কোন মিল নেই বলে মস্তিষ্ক ভগবানের কোন ইমেজ নেয় না, মস্তিষ্ক যদি কোন ইমেজই না নেয় তখন সে শব্দ দিয়ে কি করে বলবে! মুখ থেকে সেই শব্দই বেরোবে যে শব্দের ইমেজ মস্তিষ্কে আছে। মস্তিষ্কের নিউরোন যেমন ইমেজ তৈরী করে তেমনি সে শব্দও তৈরী করে। যার ইমেজই নেই তার শব্দ কোথা থেকে আসবে! সেইজন্য ভগবানকে বলা হয় তিনি মন বাণীর পারে।

বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়, আপনি বাচ্য বাচকের পারে। কারণ শব্দ যেখানে হয় তখন শব্দ একটা বস্তুকে দেখায়, কিন্তু আপনি বস্তুও নন সেইজন্য শব্দও নন। অথচ আপনি জগৎ রূপে আছেন এটাই মায়া।

একদিকে আপনি জগৎ রূপে আছেন অথচ আপনি বস্তু নন। আর আপনি বস্তু নন সেইজন্য শব্দ রূপেও আপনাকে ধরা যাবে না। অন্য দিকে ওঙ্কার আপনার বাচক। সবটাই ঠিক, এটাও ঠিক ওটাও ঠিক। এর আগে আমরা উপমা নিয়েছি, এই উপমাকে মনে রাখলে সবটাই বুঝতে পরিষ্কার হয়ে যাবে। হিমালয় পাহাড়ে দশটা পিঁপড়েকে ছেড়ে দিয়ে বলে দেওয়া হল তোমার হিমালয়ের খবর নিয়ে এস। দশটা পিঁপড়ে এসে কিছু কথা আমাদের জানাল। কিন্তু হিমালয়ের কতটুকু তারা জানবে, যেটুকু বলছে ঠিকই বলছে, কিন্তু এটা হিমালয়ের পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। পূর্ণাঙ্গ ছবি যদি না দিতে পারে তাহলে আমরা জানছি কিভাবে! ঈশ্বরের ব্যাপারে যে এই যা কিছু বলা হচ্ছে, এগুলো সবই ছবি, ঠিকই বলছে কিন্তু কোনটাই পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। এই পূর্ণাঙ্গ ছবি না হওয়ার জন্য একবার বলছেন আপনি জগৎ রূপে আছেন অথচ আপনি বস্তু নন। ওঙ্কারের আপনি বাচ্য অথচ আপনি বাণীর পারে। এগুলো ঠিকই বলছে, কিন্তু সীমিত জিনিসকে বলছে।

তার সাথে, আপনার মায়া, যা আপনার বিশেষ এক শক্তি সেটা দিয়ে *কার্যাকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ*, কারকের যত রকমের বিভক্তি আছে সেটা আপনি, ক্রিয়া সেটাও আপনি, করণটাও আপনি আর তার যে কারণ সেটাও আপনি আর সব কিছুর যে ফল সেটাও আপনি। গীতায় যেমন বলছেন *ব্রহ্মার্পণং*, সবটাই আপনি অথচ আপনি সব কিছুর পারে। আপনি সেই এক, রামও আপনি রাবণও আপনি, রাবণকে যে তীর দিয়ে বধ করা হচ্ছে সেই তীরটাও আপনি, যে ধনুষ দিয়ে ছাড়া হচ্ছে সেই ধনুষটাও আপনি। রাবণ বধের ফলে জগতে যে শান্তি আসছে সেটাও আপনি। অথচ আপনি সেই এক, আর আপনার মায়ার এমনই শক্তি সেই এককে বহু রূপে দেখাচ্ছে। এর মধ্যে নেতি নেতি লাগান আছে। নেতি নেতি লাগানর জন্য, আমাদের ভেতরে যে ধারণাগুলো আছে সেগুলোকে কেটে দিচ্ছে। ফলে আমাদের মনে ভুল ইমেজিংটা হতে দেয় না। বাচ্চা বয়স থেকে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি দেখে ধরে রেখেছি ইনিই ভগবান, একটা ইমেজ তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু এটা ভুল ইমেজ। এনারা ওই ভুল ইমেজটাকে কেটে দিচ্ছেন। ওটাকে সরিয়ে দিয়ে যে ইমেজ দিচ্ছেন সেটাও যে ঠিক দিচ্ছেন তা নয়, সেইজন্য তারপরেই বলছেন ওটা নয় এটা। আবার আরেকটা ইমেজ দেখিয়ে বলছেন এটাই, আবার এর বাইরেও আছে। এই যে ক্রমাগত ইতি নেতি ইতি নেতি করে বলে যাচ্ছেন এইভাবে আমাদের ভেতরে ঈশ্বরের ব্যাপারে যে ইমেজ হয়ে আছে সেটার আকারকে আরও বড় করে দিচ্ছেন। এরপর অহল্যা বলছেন –

ত্বন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ।
মানুষং ত্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্।১/৫/৫৫

মায়া শব্দকে প্রায়ই দুটো অর্থে ব্যবহার করা হয়, একটা হল শক্তি আর দ্বিতীয় মোহ। সাধারণ ভাবে আমরা মায়াকে মোহ অর্থেই বেশি ব্যবহার করি। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যাপারে যখন মায়া বলা হয় তখন মায়ার ঠিক ঠিক অর্থ হয় শক্তি, মায়া ঈশ্বরেরই একটা বিশেষ শক্তি। মায়া বিশেষ শক্তি বুঝলাম কিন্তু তার ফল কি? এর ফল সব সময় অস্থায়ী, কাল ছিল না, আজ আছে আবার কাল থাকবে না, এটাই মায়া। আর যেটা আজকে আছে কাল থাকবে না, সেটাতে মোহিত হয়ে যাওয়াটাও মায়া। প্রথমের দিকে বলছিলেন, আপনার যে শক্তি সেই শক্তিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি দেবতাদের মাধ্যমে আপনি সব কিছু করছেন। আপনিই আপনার শক্তিতে কার্যকারণাদি হয়ে দেখাচ্ছেন। অন্য দিকে আপনার এই শক্তিতে মানুষ মুগ্ধ হয়ে গিয়ে পুরোপুরি মোহিত হয়ে আছে। মোহিত হওয়ার দরুণ জিনিসটা যেমন তেমন না দেখে সব কিছু ভুল দেখে। জাদুকর আর তার খেলা, যে জাদু বিদ্যা জানে সে ছাড়া বাকি সবাই জাদুকরের খেলায় মুগ্ধ হয়ে যায়, জাদুকরকে আর কেউ বুঝতে পারে না। ভগবান হলেন জাদুকর, তিনি তাঁর শক্তির যে খেলা দেখাচ্ছেন তাতে বাকি সবাই মুগ্ধ হয়ে খেলাতে মোহিত হয়ে যাচ্ছে। মুগ্ধ হয়ে যাওয়া মানে, বুদ্ধি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধির কাজ হল বিচার করা, জিনিসটা যেমনটি তেমনটি দেখা। ধী শব্দ বুদ্ধি থেকে এসেছে, ধী মানেও তাই, যেমনটি আছে তেমনটি দেখা। যখন যেমনটি দেখার তেমনটি দেখা হয় না তখন আমরা বলি মোহিত। এই মোহিত হওয়ার নামই মায়া।

মায়ার সব থেকে বড় প্রভাব হল ঈশ্বরে মানুষ জ্ঞান করা। *ন জানন্তি তত্ত্বতঃ*, ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানা যায় না। ঠাকুরকে কয়েকজন প্রশ্ন করতেন, ঈশ্বর কি কাউকে কম শক্তি আর কাউকে বেশি শক্তি দেন? ঠাকুর বলছেন, তা নাহলে একজন দশজনকে হারিয়ে দেয় কি করে! শক্তির তো তারতম্য আছে। শক্তি আর তত্ত্ব এই দুটো জিনিস। আমরা শক্তির খেলাতেই হারিয়ে যাই আর তত্ত্ব জিনিসটাকে আমরা দেখি না। এখন যিনি ঈশ্বর তিনি

যখন শরীরকে আশ্রয় করে খেলা করেন তখন আমার আপনার মত মানুষ কি করবে? যে জিনিসকে নিয়ে দিনরাত আমরা কাজকর্ম করছি সেই জিনিসকে আমরা তেমনই দেখব। একবার নিউইয়র্কে খুব গরম পড়েছিল। ওখানে সাধারণত গরম পড়ে না। সেবার এত গরম পড়েছিল যে স্টেট থেকে রেডিও, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করা হয়েছিল যে সরকারের তরফ থেকে যারা কাজকর্ম করে তাদের প্রতি আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। কারণ আপনাদের সুবিধার জন্যই তারা এই গরমে কাজ করছে। গারবেজ কালেকশনের জন্য রোজ গাড়ি আসে। এক ভদ্রমহিলা তার নিজের আবর্জনার বোচকাটা গাড়িতে ফেলেছেন। ফেলার পর ভাবছেন ট্রাকের লোকটিকে একটু সেবা করা যাক। ফ্রিজ থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা জল এনে ড্রাইভারকে দিতে গেছে। ড্রাইভার ইশারা করে মহিলাকে বলছে পেছনে দিয়ে দিতে। ড্রাইভার ভাবছে এটাও গারবেজ। বড় ট্রাকের ইঞ্জিন আওয়াজ করে যাচ্ছে, তার মধ্যেই মহিলাটি চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে it is for you। ড্রাইভার কিছুই বুঝতে পারছে না। যাই হোক হাত বাড়িয়ে কোন রকমে বোতলটা নিয়েছে, নিয়ে ড্রাইভারের পেছনে যে জানলা আছে সেই জানলা দিয়ে পেছনে গারবেজের মধ্যে ফেলে দিয়ে ট্রাকটা নিয়ে চলে গেল। ট্রাক ড্রাইভার ভাবছে, মহিলাটা বলতে চাইছেন বোতলটা ছুঁড়তে পারছে না আপনি নিয়ে ছুঁড়ে দিন। যে লোকটি গারবেজ নিয়ে কাজকর্ম করে, তাকে গরমে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হচ্ছে সে মনে করছে এটাও গারবেজ। আমরাও যখন সারাটা জীবন সাধারণ মানুষের সাথে ওঠাবসা করছি আমরাও তখন এই ট্রাক ড্রাইভারের মত আচরণ করে যাচ্ছি। আমি আমার মত আপনাকে নিয়ে চলছি, আপনি আপনার মত আমাকে নিয়ে চলছেন। কোন মানুষ আমার কাছে আসলে তাকে আমার মতই দেখব। এর মাঝখানে ঢুকে গেলেন একজন অবতার পুরুষ। এরপর কোথা থেকে আমরা তাকে অবতার বলে চিনতে পারব! যদি মানুষের আকৃতি না নিয়ে বিরাট কোন আকৃতি নিয়ে এলে আমরা মনে করব কোন রাক্ষস বা অসুর এসে গেছে, তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। এমনিতেই কিছু অন্য রকম কথা বলাতে যীশুর এই দুরবস্থা হয়ে গেল, মহম্মদকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হল, এর উপর যদি আকৃতিটাও অন্য রকম নিয়ে আসতেন তাহলে এনাদের তো আরও দুরবস্থা হয়ে যেত। অবতার মানুষ রূপ ধারণ করে যখন আসছেন তখন তাঁকে আমাদের মতই মনে হবে। অবতারকে এভাবে দেখাতে মানুষের কোন দোষ নেই। কারণ মানুষের বুদ্ধি হল সহজী বুদ্ধি, এই স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়েই আমরা সব কিছু দেখে যাচ্ছি। এখন না হয় আমরা দুম্‌দাম্‌ বলে যাচ্ছি ঠাকুর অবতার, কিন্তু যে ঠাকুরকে অবতার বলছে, ঠাকুরকে ভগবান বলছে এর মধ্যে যে যত বড় মুর্খ সে তত জোর গলায় বলে। যাঁরা অনেক দিন ধরে সাধনা করছেন, সন্ন্যাস জীবন-যাপন করছেন, আগে তাঁরা যেভাবে ঠাকুরকে অবতার বলতেন এখন তত জোর গলায় বলতে ভরসা পান না। কারণ অবতার তত্ত্ব বোঝা যে কত কঠিন এটা বুঝতেই একটা মানুষের সারা জীবন কেন, কত জন্ম যে লেগে যাবে। সেইজন্য বলে একমাত্র মুর্খরাই অবতার তত্ত্বকে বুঝতে পারে। কারণ না বুঝে যে কোন বিষয়ের উপর বলা খুব সোজা। যারা বোঝে তারা মুখ খোলে না, আর যাঁরা জানেন তাঁরাও আবার লোক দেখে মুখ খোলেন। যারা জানে না তারা যেখানে সেখানে মুখ খুলে দেবে। একটা বাচ্চা ছেলে প্রস্বাব পেলে যেখানে সেখানে প্রস্বাব করতে শুরু করে দেবে, ওর কাছে কোন বাছবিচার নেই। যাদের বুদ্ধিটা একটু খুলেছে তারা অনেক ভেবে চিন্তে মুখ খুলতে যাবে।

আমরা সারা জীবন মানুষই দেখে এসেছি, ঈশ্বরকে দেখেনি আর ঈশ্বরের অবতারকে কোথাও দেখিনি। তবে অনেকের মুখে অবতার শব্দটা আমরা শুনেছি, ঠাকুর অবতার এই শব্দটাও শুনেছি। কিন্তু ঈশ্বর তত্ত্ব আর অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই। কারণ আমাদের বুদ্ধি মোহিত। যেমন ঠাকুরকে আমরা তত্ত্বতঃ জানতে পারছি না, ঠিক তেমনি ঠাকুর অবতার এই শব্দটা শুনে নিয়ে মোহিত বুদ্ধি ওই শব্দকে নিয়েই এখন চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের কোন দোষ নেই। আমি আপনি এত চালাক, আমাদের এত বুদ্ধি আর ঠাকুরের সময় যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই মুর্খ ছিলেন নাকি! ঠাকুরের সময় ঠাকুরকে কজন অবতার বলে জানলেন, যীশুকে কজন অবতার বলে জানলেন! জানা সম্ভব নয়। এই জগতে যে যে জিনিসগুলিকে আমরা ভুল বলে জানি তার মধ্যে সব থেকে বেশি ভুল জানি অবতার তত্ত্ব।

মানুষং ত্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্‌, মানুষ পরমেশ্বরকে কখন বুঝতে পারে না। গীতায় ভগবানও ঠিক এই কথা বলছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতাম্‌*। সাধনা ছাড়া কেউই বুঝতে পারবে না যে, ঈশ্বর কিভাবে মানুষের দেহ ধারণ করেন। ঠাকুর বলছেন অবতারকে জানাও যা ঈশ্বরকে জানাও তাই। ঠাকুর আবার বলছেন ঈশ্বরকে জানার জন্য অন্য শরীর অন্য মন লাগে। তপস্যাদি করলে নতুন শরীর মন সৃষ্টি হয়, যেটা

অহল্যা করেছেন। গীতায় এটাকেই বলছেন দিব্যচক্ষু। তাহলে ঠাকুরকে অবতার বলে কে জানতে পারবে? এক নরেন ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভবই নয়। যিনি ঈশ্বরকে তত্ত্বতঃ জানতে পারবেন একমাত্র তিনি ছাড়া অবতারকে ভগবান রূপে আর কেউই জানতে পারবে না। তারপরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলবে। ঠাকুরের সাথে বসবাস করতে করতে সেই সময় যাঁরা সাধনা করেছিলেন, যেমন ঠাকুরের সন্তানরা, এনারাও সাধনা করে করে নতুন আধ্যাত্মিক শরীর পেয়েছেন, সেই শরীর দিয়ে তাঁরাও জানতে পারলেন ঠাকুর ভগবান। সচারচর অবতারের এত সঙ্গী হতে দেখা যায় না, যেভাবে আমরা ঠাকুরের ক্ষেত্রে দেখছি। আর অবতারের শিষ্যও যে অবতারের সাথে একই সাথে পূজিত হবেন, স্বামীজী ছাড়া এই ঘটনা ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। অর্জুনের মত পুরুষও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে মানতে পারছেন না, সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ বিশ্বরূপের মাধ্যমে অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন। কাহিনীতে কোথাও কোথাও আসে যে দুর্যোধনকেও শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছিলেন। দুর্যোধন দেখে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ একজন মায়াবী, মায়ার খেলা দেখাচ্ছে, দুর্যোধন তার লোকেদের আদেশ দিচ্ছে একে বেঁধে নিতে। সামনে সাক্ষাৎ ভগবানের রূপ দেখেও দুর্যোধন বুঝতে পারছে না যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান। দুর্যোধনের তো বুঝতে না পারারই কথা, কারণ তার সেই শরীর মনটাই নেই। এটাই আমাদের চূড়ান্ত মায়া, যে মায়ার জন্য এই জগতকে আমরা ভুল দেখছি, আমরা আমাদের ভুল দেখছি, কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষাৎ যখন আমাদের সামনে আসেন তখনও আমরা বুঝতে পারি না। অহল্যা আবার বলছেন –

আকাশবৎ ত্বং সর্বত্র বহিরন্তর্গতোহমলঃ।
অসঙ্গো হ্যচলো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ।।১/৫/৫৬

ভগবানকে যদি উপমা দিয়ে বুঝতে হয় তাহলে আকাশতত্ত্ব সব থেকে কাছের উপমা হবে। আমরা যে উপরে আকাশ দেখছি এখানে এই আকাশের কথা বলছেন না। আকাশ পরমাণু থেকেও অণু, space particle বলা যেতে পারে। যেখানে যেখানে space particle থাকে সেখানে সেখানে space generate হয়। সেই space particles গুলো যখন মেশে তখন সেখান থেকে বায়ুর পরমাণু তৈরী হয়, সেখান থেকে তৈরী হয় অগ্নি তত্ত্ব, এই করে করে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। যেখানেই সৃষ্টি সেখানেই আকাশ। এই গ্লাশ, গ্লাশের বাইরে আকাশ, গ্লাশের ভেতরেও আকাশ আর গ্লাশ জিনিস যেটা সেটাও আকাশ, গ্লাশের জলে যেটা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সেটাও আকাশ। ভগবানের যদি তুলনা করতে হয়ে এই আকাশের সাথেই তুলনা করা যায়। আকাশকে কখন কালিমালিপ্ত করা যায় না, কোন কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তেমনি বলছেন ভগবান *অমলঃ অসঙ্গঃ* কোন জিনিসের সাথে তার সঙ্গ হয় না। দুটো জিনিসকে যদি সঙ্গ করাতে হয় তখন তাকে বাঁধার জন্য বা যোগ করার জন্য কোন জিনিসের দরকার হয়, কিন্তু এমন কোন বাঁধন নেই যেটা দিয়ে ঈশ্বরকে বাঁধা যেতে পারে। যেমন এই বোতল আর গ্লাশের সঙ্গ করাতে হলে দুটোকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে হবে, চারটে পেন্সিলকে একসাথে রাখতে হলে একটা রাবার ব্যাণ্ড দিয়ে বাঁধতে হবে, তার মানে আরেকটা কোন কিছু দিয়ে এদেরকে ঘিরে দিতে হবে, তখন সঙ্গ হয়ে যাবে। তার মানে একটা জিনিসকে আরেকটা জিনিস দিয়ে বেঁধে নেওয়া যাবে। কিন্তু ভগবান এতই বৃহৎ যে তাঁকে কোন কিছুর সাথেই জুড়ে দেওয়া যাবে না, সেইজন্য তিনি অসঙ্গ। তিনি অচল, যিনি সর্বব্যাপী তিনি কোথায় চলা ফেরা করবেন, তাই তিনি অচল। আর বলছেন *নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সদব্যয়ঃ*, তিনি নিত্য, সব সময় আছেন, শুদ্ধ, একেবারে অমল, বুদ্ধঃ, তিনি চৈতন্য, সৎ, তিনি আছেন নাকচ কখন করা যাবে না। আর *অব্যয়ঃ*, কোন ধরণের তাঁর কোন পরিবর্তন হয় না, তার মধ্যে কোন বিকার হয় না। এগুলোই ঈশ্বরের পরিভাষা, ঈশ্বরকে বুঝতে হলে এই পরিভাষাগুলিকে ধারণা করতে হবে। অহল্যা বলছেন, আমি এত কথা বললাম ঠিকই কিন্তু আপনার তত্ত্ব আমি কি আর বুঝব! কারণ –

যোষিন্মূঢ়াহমজ্ঞা তে তত্ত্বং জানে কথং বিভো।
তস্মাৎ তে শতশো রাম নমস্কুর্য্যামনন্যধীঃ।১/৫/৫৭

আমি স্ত্রীজাতি, মূঢ় স্বভাবের। পুরাণ বা আগেকার দিনে সবাই মেয়েদের মুর্খ বলতেন। কারণ তখনকার দিনে মেয়েদের বেদ উপনিষদ পড়তেই দেওয়া হত না। বেদের সময় মেয়েদের অধিকার ছিল কিন্তু পরের দিকে এসে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে দেওয়া হল। মেয়েদের লেখাপড়া করতে দেওয়া হত না, কিন্তু তাদের বুদ্ধি যেটা থাকার সেখানে তো কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের এখানে পুরুষ নারীর ব্যাপারটা চিরস্থায়ী কোন

বন্দোবস্থ নয়। এই জন্মে যে পুরুষ আছে আগামী জন্মে সে নারী হয়েও জন্ম নিতে পারে, যে নারী সে পুরুষ হয়েও জন্ম নিতে পারে। সেইজন্য বুদ্ধির ব্যাপারে কোন কিছ হেরফের হবে না, বুদ্ধি চলতে থাকবে। পুরুষ রূপে যে বুদ্ধি ছিল মেয়ে হয়ে জন্মালে সেই বুদ্ধিই তার থাকবে, কিন্তু exposureএ গিয়ে তফাৎ হয়ে যাবে। পড়াশোনা করে যে functional memory তৈরী হয়েছে সেটা পরে গিয়ে দুর্বল হয়ে যায়। যেমন যেমন অনুশীলনে থাকবে তার exposureটাও সেই রকম তৈরী হবে। আপনারা মেয়েদের শাস্ত্র পড়তেই দেবেন না, লেখাপড়া করতে দেবেন না, কোথা থেকে তাদের বুদ্ধি বিকশিত হবে! অহল্যা এখানে সেটাই বলছেন। সাধারণ একটা ধারণা যে মেয়েরা মূঢ়, মূঢ় মানে মুর্খের কথা বলছেন না, মূঢ় মানে জ্ঞানের অভাব। যেমন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমরা সবাই মূঢ়, আমরা আধ্যাত্মিকতার কিছুই জানি না। আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের exposureটাই নেই, exposure থাকলে তবেই তো জ্ঞানের বিকাশ হবে। এর আগে অহল্যা এত উচ্চ ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কথা, অবতার তত্ত্বের কথা বললেন, আর এখন বলছেন আমি স্ত্রী জাতি, স্ত্রী জাতি স্বভাবেই মূঢ়। এর অন্য অর্থও হতে পারে, অহল্যা যখন গৌতম মুনির সাথে ছিলেন তখন তিনি তাঁর স্বামীর মুখ থেকে যে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের কথা শুনেছিলেন সেই কথাগুলিই এখন বলছেন, এই কথাগুলো যেন তার কাছে শব্দ মাত্র, উপলব্ধি নেই। অথবা তাঁর জ্ঞান আছে কিন্তু মানুষ বিনয়ের ভাব নিয়ে নিজেকে যেমন বলে অহল্যা যেন সেইভাবে বলছেন। কিন্তু এরপরেই বলছেন আমার পক্ষে এসব জিনিস ধারণা করা সম্ভব নয়, কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, আর আমি তো একেই স্ত্রী জাতির যারা স্বভাবেই মূঢ়। সেইজন্য –

তস্মাৎ তে শতশো রাম নমস্কুর্য্যামনন্যধীঃ, হে রাম! আমি যা বললাম এগুলো আমার পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয়, সেইজন্য যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব তা হল, আমি আপনাকে শতবার প্রণাম করছি। জ্ঞান আর ভক্তি, এই দুটো ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বর তত্ত্ব যদি আমাদের না জানা থাকে তাহলে আমাদের পক্ষে কি করা যেতে পারে? একমাত্র ভক্তিই করা যেতে পারে। ভক্তিতে আবার পরা ভক্তি ছাড়া ভক্তি হয় না, পরা ভক্তি মানে ঈশ্বরের সাথে অনন্য ভাব। যদি সেই ভাবও না থাকে তাহলে কি করব? প্রণাম করবে। বৈধী ভক্তি করতে করতে পরা ভক্তির উদয় হবে। পরা ভক্তিই আবার জ্ঞানে পরিপক্কতা লাভ করে। অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তদের জন্য রচিত, এটা ইতিহাস নয়। অহল্যা বলছেন আমার ভেতরে সেই জ্ঞান নেই, আমি বুদ্ধিহীন, আমি অজ্ঞ, আমি ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সমূহ ধারণা করতে পারব না, আপনাকে তত্ত্বত জানতে পারব না। তাহলে এর পরিবর্তে আমি কি করতে পারি? শত শত বার আপনাকে আমি প্রণাম করছি। অর্জুনও গীতায় ঠিক তাই বলছেন *নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব*, হে ভগবান! আপনাকে সামনে নমস্কার করছি, আপনাকে পেছন থেকে নমস্কার করছি, আপনাকে সব দিক থেকে নমস্কার করছি। যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করে, যাঁর ক্ষমতা আমরা বুঝতে পারি না, যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা কিভাবে আমাদের ভালোবাসা শ্রদ্ধা ব্যক্ত করতে পারি! মায়ের সন্তান বিরাট পণ্ডিত হয়ে গেছে বা বিরাট কিছু হয়ে গেল, মা কিছুই বুঝতে পারে না। মা বলে, বাবা! আমি এত কিছু বুঝতে পারব না, তুমি কি করছ আমি তো অত কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু আমার আশীর্বাদ তোমার সাথে সাথে সব সময় যেন থাকে, তুমি আরও বড় হও। ভক্তও ঠিক সেই রকম বলে, প্রভু! আমি তো তোমার তত্ত্ব জানি না, বুঝতেও পারব না, তবে আমার শ্রদ্ধা ভক্তি তুমি গ্রহণ কর। এটা বুঝতে পারছি তুমি আমার থেকে অনেক অনেক বড়, আমার ধারণা যত দূর যেতে পারে আপনি তার থেকেও বড়, সেইজন্য আপনাকে শত শত প্রণাম করি। *যোষিন্মূঢ়াহমজ্ঞা*, আমি এক অজ্ঞ স্ত্রী, অহল্যাও ঠিক একই ভাবে ভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তি নিবেদন করছেন। স্ত্রী পুরুষ সবাই অজ্ঞ, সবাই মূঢ়। কোন অর্থে মূঢ়? *তে তত্ত্বম্*, ভগবানের তত্ত্ব জানার ব্যাপারে পুরুষ নারী সবাই মূঢ়। কিন্তু অহল্যা বলছেন *নমস্কুর্য্যামনন্যধী*, *অনন্য ধী*, আমার মন আর অন্য দিকে যাবে না, ওই একটি জায়গায় মন পড়ে থাকবে, ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি ওই ভক্তির বাইরে কোথাও তাঁর মন বুদ্ধি যাবে না। আর বলছেন –

দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্বদা।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে।১/৫/৫৮
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে।১/৫/৫৯

হে দেব! আমি যেখানে যে অবস্থাতেই থাকি না কেন আপনার পাদপদ্মে যেন আমার সর্বদা প্রগাঢ় ভক্তি থাকে, আপনার পাদপদ্মেই আমার মন যে সর্বদা স্থিত থাকে। *নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল*, এটি ভগবান

শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম মন্ত্র। যদিও অহল্যা এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম নিবেদন করছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শিব যে কোন ভগবানকেই এই প্রণাম মন্ত্র দিয়ে প্রণাম করা যায়। *নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ*, সমস্ত পুরুষের যিনি অধ্যক্ষ। এই পুরুষ ব্যাটাছেলে পুরুষ নয়, পুরুষ মানে চৈতন্য। পুরুষাধ্যক্ষ মানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যিনি পুরুষ, যিনি জীব তাঁর যিনি অধ্যক্ষ। সৃষ্টি থাকলেই জীব থাকবে, জীব আছে মানে চৈতন্য আছে, সমস্ত চৈতন্যের যিনি অধ্যক্ষ তিনি *পুরুষাধ্যক্ষ*।

নমস্তে ভক্তবৎসল, মানুষ নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না, নিজের উপরই কৃপা করে, এই বিচিত্র সংসারে কেউ নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসে না। আজ পর্যন্ত কোন মা নিজের সন্তানকে আদর করেনি আর করবেও না, মা সন্তানকে যে আদর করে আসলে নিজেকেই আদর করে। মা জানে আমার পুত্র আমিই হয়েছি, মাও মনে করে বাবাও মনে করে। স্বামী স্ত্রীকে স্ত্রী স্বামীকে যখন ভালোবাসে তখন জানে আমি আর তুমি এক, বন্ধুকে যখন ভালোবাসে তখন জানে আমি তুমি এক। ভগবানও কক্ষণ নিজেকে ছাড়া ভালোবাসেন না। সেইজন্য অপরকে ভালোবাসা কখন হতেই পারে না, সেইজন্য ভগবানও নিজেকেই ভালোবাসেন। নিজে মানে? আমাদের সবার ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন ভগবান তাঁকেই ভালোবাসেন। যেখানেই সেই চৈতন্যের বোধ জেগেছে তিনিই ভক্ত, সেইজন্য ভক্ত মনে করে ঈশ্বর আমাকে কৃপা করেন। ঈশ্বর কখনই কাউকে বেশি কাউকে কম ভালোবাসেন না। দশ দিনের বাচ্চা মায়ের ভালোবাসা কী আর বুঝবে! মা আমাকে ভালোবাসে এই বোধ বাচ্চার হওয়া চাই। দু-তিন বছর হলে তার বোধ হয়ে মা আমাকে ভালোবাসে। ঠিক তেমনি ভগবান আমাদের ভেতরে যে শুদ্ধ আত্মা তাঁকেই ভালোবাসেন, কিন্তু আমরা দশ দিনের বাচ্চার মত, আমরা বুঝতে পারি না যে ভগবান ভালোবাসছেন। চৈতন্য যখন হয় তখন বোঝে ভগবান আমাকে ভালোবাসেন। তার আগে পর্যন্ত আমরা বলি তিনি ভক্তবৎসল, ভগবান ভক্তকে ভালোবাসেন আমাকে ভালোবাসেন না ইত্যাদি। ঠাকুর বলছেন তাঁর কৃপা সমান ভাবে চলছে। অহল্যা বলছেন ভগবান ভক্তবৎসল, কেন বলছেন, বোঝা যায়। আমার আপনার ভালোবাসা কি বোঝা যায় না? আমাদের ভালোবাসা সীমিত, তার কারণ আমরা কখনই আমাদের আত্মার সাথে জুড়ে নেই, আমরা নিজেকে আমাদের শরীর, মন, অহঙ্কারের সাথে জুড়ে রেখেছি। যখন আত্মার সাথে কাউকে এক মনে করছি সে যেই হোক, মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, বন্ধু তখন মনে করি সে আর আমি এক। এই শরীর, মন এগুলো জড়, জড় কখন এক হতে পারে না। কিন্তু আত্মা চৈতন্য, আত্মার সাথে এক হলে কোন দিন অশান্তি লাগবে না। সেইজন্য ভগবান কোন দিন ভক্তের উপর থেকে কৃপা তুলে নিতে পারবেন না, সম্ভবই নয়। গীতাতেও ভগবান যখন বলছেন জ্ঞানী আমার অতীব প্রিয় সেখানে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই কথাই বলছেন, নিজের আত্মা সবারই প্রিয়, জ্ঞানী ভগবানের আত্মা, ভগবান তাঁকে ভালোবাসবেন এতে আশ্চর্যের কী আছে! তা নাহলে ভগবানের বৈষম্য দোষ এসে যাবে, ভগবানের কোন দোষ আসতে পারে না। ঠাকুর একে বেশি ভালোবাসেন, তাকে কম, কখনই তা হয় না। যার চেতনা জাগ্রত হয়েছে তিনি বুঝতে পারেন, যার চেতনা জাগ্রত হয়নি সে এই জিনিসটা বুঝতে পারে না।

হে রাম! আপনি কোটি সূর্যের মত, এইভাবে স্তুতি করার পর অহল্যা বলছেন আপনি জগতের ভয় হরণ করেন। আমি সেই রঘুনন্দনকে লক্ষ্মণ সহ স্তুতি করি আপনি আমার ভয় নাশ করুন। এরপর অহল্যার প্রতি যে আদেশ ছিল তিনি সেই আদেশানুসারে শ্রীরামচন্দ্রকে পরিক্রমা করলেন এবং আকাশমার্গে নিজের স্বামী গৌতম মুনির কাছে ফিরে চলে গেলেন। সব শেষে বলছেন, যে শ্রদ্ধা সহকারে অহল্যাকৃত এই স্তুতি পাঠ করবে অহল্যা যেভাবে শাপমুক্ত হয়ে গেলেন ঠিক সেই ভাবে সেও সমস্ত রকমের পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এটাকে বলে গ্রন্থস্তুতি। এরপর এখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র চললেন রাজা জনকের যজ্ঞ দেখতে, সেখানে ধনুর্ভঙ্গ হবে, আর ধনুর্ভঙ্গ হওয়ার জন্য সীতার সাথে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হবে।

শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ এবং বিবাহ প্রসঙ্গ

বিশ্বামিত্র বলছেন, রাজা জনকের ওখানে এক বিরাট যজ্ঞ হচ্ছে, আমরা সবাই এখন সেই যজ্ঞ দেখতে যাব। ওখান থেকে আমরা অযোধ্যায় ফিরে যাব। অধ্যাত্ম রামায়ণে একটা নতুন ভাব নিয়ে আসা হয়েছে, যে ভাবকে পরে তুলসীদাস মুর্ত করে দিলেন, সেটাকে বলে কেভট প্রসঙ্গ, কেভট মানে মাঝী। এই প্রসঙ্গ প্রথম অধ্যাত্ম রামায়ণে এই জায়গাতেই এসেছে। এই জায়গাতে নিয়ে আসার জন্য প্রসঙ্গটা কেমন একটা খাপছাড়া মনে

হয়। এখানে সঙ্গে বিশ্বামিত্র রয়েছেন। যেখানে বিশ্বামিত্র রয়েছেন সেখানে এই প্রসঙ্গটা যুক্তিতে ঠিক জমে না। তুলসীদাস সেইজন্য এই প্রসঙ্গ অনেক পরে নিয়ে গেছেন। কেভট প্রসঙ্গ রামকথাতে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কাহিনী হল, শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় উঠতে যাচ্ছেন, তখন মাঝী শ্রীরামচন্দ্রকে আটকে দিয়েছেন। আটকে দিয়ে মাঝি বলছে –

ক্ষালয়ামি তব পদপঙ্কজং নাথ দারুদৃষদোঃ কিমন্তরম্।
মানুষীকরণচুর্ণমস্তি তে পাদয়োরিতি কথা প্রথীয়সী।১/৬/৪

এটা এখন লোক প্রসিদ্ধ যে আপনার চরণকমলে এমন বিশেষ চূর্ণ লাগানো আছে যে চূর্ণ যদি পাথরে বা কাঠে লেগে যায় সেই পাথর বা কাঠ মানুষ হয়ে যাবে। কিছু আগে শ্রীরামচন্দ্র অহল্যাকে মুক্তি দিয়েছেন, সেই ঘটনার পরিণতির কথা শুনে মাঝি এই কথা বলছে।

পাদাম্বুজং তে বিমলং হি কৃত্বা পশ্চাৎ পরং তীরমহং নয়ামি।
নো চেৎ তরঃ সদ্যুবতী মলেন স্যাচ্চেদ্বিভো বিদ্ধি কুটুম্ভাহানিঃ।১/৬/৫

আমি শুনেছি যে আপনি চরণরজ দিয়ে পাথরকে স্পর্শ করে দিলেন আর তাতেই সে মানুষ হয়ে গেল। আর এই নৌকাতো কাঠ, পাথরের থেকেও নরম। পাথরই যদি মানুষ হয়ে যায় তাহলে এই কাঠের কি দুরবস্থা হবে। আমি এক গরীব মাঝি এই নৌকাই আমার জীবিকার একমাত্র সম্বল। এই নৌকা যদি যুবতী মেয়ে হয়ে যায় আমার খাওয়া-দাওয়া কি করে চলবে! আমি তাই এই নৌকায় আপনার চরণ এমনি এমনি স্পর্শ করতে দেব না। আগে আপনার চরণ ধুইয়ে দিচ্ছি, চরণ ধোওয়া হয়ে যাওয়ার পর আপনি নৌকাতে গিয়ে উঠুন। এই জায়গাতে এসে অধ্যাত্ম রামায়ণে একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে, বিশ্বামিত্র মুনির সামনে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধুইয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা কেমন একটা খাপছাড়া মনে হয়। তুলসীদাস সেইজন্য এই ঘটনাকে আরেকটু পরে নিয়ে গেছেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা আর লক্ষ্মণকে নিয়ে বনবাসে যাওয়ার সময় যখন তিনি নদী পার হচ্ছিলেন তখন মাঝি শ্রীরামচন্দ্রকে নৌকাতে উঠতে দেবে না। যাই হোক, এই বলার পর মাঝি একটা জলপূর্ণ পাত্র এনে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, আপনার চরণ এই পাত্রে রাখুন যাতে আপনার চরণরজ ধুয়ে যায়।

তুলসীদাস অবধী ভাষায় রামচরিতমানস রচনা করেছেন, এখানে তিনি বর্ণনা করছেন *মাগী নাব ন কেবটু আনা। কহই তুম্হার মরমু মৈঁ জানা।। চরন কমল রজ কহুঁ সবু কহঈ। মানুষ করনি মূরি কছু অহঈ।।* মাঝি নৌকা নিয়ে এসে বলছে, আমি আপনার মর্ম জানি, আপনার চরণে কোন জড়িবুটি আছে যেটা পাথরে লাগলে পাথর মানুষ হয়ে যায়। এইসব জায়গায় এসে কবিদের কল্পনা অনেক উঁচুতে চলে যায়। আমরা প্রায়ই বলে থাকি গুরুর চরণে আশ্রয় নিলে বা ঠাকুরের চরণধূলা পেলে আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যায়। গুরুর চরণধুলি নিলে আমরা বলছি আমি মানুষ হয়ে গেলাম। এটাকেই এখানে একেবারে ভৌতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারপর বলছেন, *ছুঅত সিলা ভই নাআরি সুহাঈ*। আপনি যখন পাথরকে চরণ দিয়ে স্পর্শ করলেন তখন সেই পাথর এক সুন্দরী নারী হয়ে গেল, *পাহন তেঁ ন কাঠ কঠিনাঈ*, পাথর থেকে কাঠ সে তো আরও নরম তাই আরও সহজে আমার এই নৌকা নারী হয়ে যাবে। *তরনিউ মুনি ঘরিনী হোই জাঈ*, আমার এই তরণী যদি কোন গুণীর স্ত্রী হয়ে যায়, *বাট পরই মোরি নাব উড়াঈ*, এই নৌকাই আমার একমাত্র সম্বল, নৌকা যদি মানুষ হয়ে যায় মাঝখান থেকে আমার জীবিকাটাই চলে যাবে। এখানে একটা পরিহাসের মধ্য দিয়ে ভক্তিভাবকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নিজের ইষ্টকে নিয়ে ভক্ত আমোদ করছে। ওই চরণ ধোওয়া জল নিয়ে মাঝি সোজা বাড়ির দিকে দৌড়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে সবার মাথায় শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ধোওয়া জল সিঞ্চন করে দিচ্ছে, কেউ পান করছে, আমরা সবাই এবার উদ্ধার হয়ে যাব। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এই ভক্তিভাবটাই পরের দিকে গিয়ে খুব জনপ্রিয় হয়ে গেল। হাতি রাস্তায় যেতে যেতে শুড় দিয়ে রাস্তার ধুলো মাথায় ছুড়তে থাকে। হাতি এই ধরণের আচরণ কেন করে? হাতি কোথাও শুনেছে যে অহল্যা পাথর থেকে মানুষ হয়ে গিয়েছিল। হাতিও ভাবছে আমি আর কতদিন এই কষ্ট করব, সেই থেকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের চরণধূলা কোথায় আছে, যদি একবার আমার মাথায় তাঁর চরণধূলা লেগে যায় আর তাতে যদি আমার এই যোনিমুক্তি হয়ে যায়। যখন মানুষ ঠিক ঠিক বিনম্র হয় তখনই সে প্রভুকে পায়। নিজেকে বড় মনে করলে সে কিছুই পায় না, যেমন পিঁপড়ে শুঁড়ে করে চিনি নিয়ে যায় আর হাতি মাথায় ধুলো ছেটাতে ছেটাতে যায়। এটাকেই বলছেন, হাতি অত বোকা নয়, হাতি সেই ধুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, যে ধুলোর স্পর্শে

পাথর অহল্যা হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, নাবিক তখন শ্রীরামচন্দ্রের পা ধুইয়ে দেওয়ার পর তাঁদের তিনজনকে নদী পার করে দিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে এখানে ভক্তির একটু ঝলক দিয়ে দেওয়া হল। এই ভক্তিকে তুলসীদাস অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন।

বিশ্বামিত্র রাম আর লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় পৌঁছে গেছেন। রাজা জনক খবর পেলেন তাঁর রাজ্যে বিশ্বামিত্র পদার্পণ করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি করে পাদ অর্ঘ্যাদি নিয়ে এগিয়ে এসে বিশ্বামিত্রের পূজা করে প্রণাম করলেন। রাজা জনক দেখছেন ঋষির সাথে দুজন দেবতুল্য বালক সূর্যের আলোকের ন্যায় চারিদিক আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছে। এটা দেখা যায় যে অবতার পুরুষদের যখনই কোথাও কোন বর্ণনা আসে সেখানে অবতার পুরুষের চেহারার খুব প্রশংসা করা হয়। আমাদের পরম্পরাতে বলা হয় শরীরে কিছু কিছু লক্ষণ দেখে বলা যায় সে কোথা থেকে এসেছে, সে আগে কি ছিল। সেখানে বলছেন, দেখতে যদি সুন্দর হয় অর্থাৎ শুভ লক্ষণযুক্ত যদি হয়, মোটামুটি বোঝা যায় দেবলোক থেকে এসেছে। কারণ দেবলোকে থাকলেও পূণ্যের কোটা শেষ হয়ে গেলে তাকে সেখান থেকে নেমে আসতে হয়। অনেকে বলবেন বংশগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে চেহারা অনেকের সুন্দর হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, একটা বংশে জন্ম নিলেও পরিষ্কার বোঝা যায় বংশের সবার থেকে সে আলাদা, ভালো হতে পারে অথবা ভালো নাও হতে পারে। তাতেই বোঝা যায় পুরোটা বংশগত নয়। সাধারণ যে জন্ম হয় তাতে বেশির ভাগ পিতৃলোক থেকে আসে বা শুধু জন্মাচ্ছে আর মরছে। কারণ সাধারণ লোকেদের তো সেই রকম শুভ কর্ম করা নেই, সেইজন্য জন্মাচ্ছে মরছে। কঠোপনিষদে নচিকেতা এই কথাই বলছেন *সস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে সস্যমিবাজায়তে পুনঃ*, সব ধান-গমের মত জন্মাচ্ছে মরছে, এদের কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না। এদের থেকে যারা একটু উপরে, যার পিতৃলোকে গেছে তাদের চেহারাটা একটু ভালো হবে, কারণ তারা যজ্ঞাদি করেছে। দেবলোক থেকে যারা আসে তারা অবশ্যই দেখতে সুন্দর হবে। এখন তো একটা শরীর পেয়ে গেল, এই শরীরকে এবার সুন্দর করার উপায় কি? বলা হয়, জপ-ধ্যান-তপস্যাদি করলে চোখ মুখের চেহারাটাই পাল্টে যায়, এমনকি হাতের রেখাও পাল্টে যায়। এটা বাস্তবিকই হয়, জন্ম তার যেমনই হয়ে থাকুক, জপ-ধ্যান করলেই চেহারার আভা পাল্টে যাবে। রাজা জনক এটাই বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞেস করছেন এই দুজনকে দেবতাদের মত দেখতে লাগছে, এরা কারা? বিশ্বামিত্র তখন বললেন এরা রাজা দশরথের পুত্র। এইসব বলে পরিচয় পর্বাদি শেষ হল।

বিশ্বামিত্র বলছেন, আমি এদের এখানে নিয়ে এলাম আপনার যজ্ঞ দেখার জন্য, আর আপনার কাছে শিবের যে ধনুষ আছে ওই ধনুষ শ্রীরামকে একবার দেখিয়ে দিন। রাজা জনক বিশ্বামিত্রের কথা শোনার পর মন্ত্রীদের বললেন, শিবধনু এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হোক। মন্ত্রীরা ধনুষ আনতে চলে গেল। ইত্যবসরে রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে বলছেন, হে মুনিবর! শ্রীরাম যদি এই ধনুষ ধারণ করে তাতে গুণ আরোপ করে দিতে পারে তাহলে আমার কন্যা সীতাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করে দেব। এবার শিবের ধনুষ নিয়ে আসা হচ্ছে। এখানে বর্ণনা করছেন পাঁচ হাজার লোক কোন রকমে শিবধনুকে তুলে নিয়ে এসেছে। এটাই কাব্যিক বর্ণনা। যে ধনুষের কথা বলা হচ্ছে সেই ধনুষ তো আর সাধারণ কোন তীর-ধনুক নয়, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের ধনুষ। পাঁচ হাজার লোক যে জিনিসকে বহন করে নিয়ে আসতে হিমশিম হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিস কত ভারী হবে! কবিতাতে কবিকে কল্পনার ব্যাপারে একটু ছাড় দিতে হয়। সাধারণ ভাবে মানুষের কল্পনা শক্তি খুব দুর্বল। যার জন্য সবার দ্বারা বিজ্ঞান পড়া সম্ভব নয়, ফিজিক্সের যে উচ্চ থিয়োরীগুলো মাথাতেই আসবে না, ওই বিমুর্ত জিনিসগুলিকে ধারণাই করতে পারবে না। এই জগত থেকেই যদি আমাদের কোন আইডিয়া দেওয়া হয়, যতটুকু আমরা জানি ততটুকুই আমরা ধারণা করব। কোন কবি কিছু বলতে চাইছেন, তিনি তখন কল্পনা করে নিচ্ছেন আমরা কতটুকু জানি। যাই হোক ধনুষ দেখেই শ্রীরামচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্ত দিয়ে তুলে নিলেন। ধনুকে গুণ লাগাবার জন্য যেমনি একটু বাঁকিয়েছেন ধনুকটা গেল ভেঙে। এর অনেক অর্থ হয়। শিবের ধনুক যদি ভেঙে যায় তাহলে শ্রীরামচন্দ্র যে ধনুক ব্যবহার করতেন সেই ধনুকগুলো কি রকম ছিল? আসলে বলতে চাইছেন শ্রীরামচন্দ্র শক্তিমান। তিনি কত শক্তিমান? এই ধারণাটা দেওয়ার জন্য বলছেন, যে ধনুককে বহন করে নিয়ে আসার জন্য পাঁচ হাজার লোকের দরকার, শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুককে এক হাতে তুলে নিলেন।

রাজা জনকের শর্ত ছিল যে শিবের ধনুকে গুণ লাগিয়ে দেবে তার সাথেই আমি সীতার বিবাহ দেব। আর এখানে দড়ি লাগান দূরে থাক ধনুকই ভেঙে দিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের এই কাণ্ড দেখে রাজা জনক বললেন, এক্ষুণি রাজা দশরথকে খবর পাঠান হোক, আমার কন্যাকে শ্রীরামের সাথে বিবাহ দেব। রাজা জনক একবারও ভাবলেন

না রাজা দশরথ যদি না করে দিতেন তাহলে কি হত। আপনি তো পণ করেছেন সীতা তারই গলায় মালা দেবে যে এই ধনুকের গুণ লাগাতে পারবে। যে লাগিয়ে দিল সে যদি বলে আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, তখন কি হবে! এদিকে আবার সীতাকে অপরূপা সুন্দরী, সর্বগুণসম্পন্না বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। অথচ বাল্মীকির মতে সীতার বয়স তখন মাত্র বারো বছর। বারো বছরের মধ্যে নারীর সব গুণ খুলে যাওয়াতেও একটু সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সেইজন্য তুলসীদাসের কাছে এগুলো বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। তিনি তাই সীতার বয়সটা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। রামায়ণের অনেক জায়গাতেই বলা হয়েছে যে শ্রীরাম আর সীতার ছয় বছরের তফাৎ। বাল্মীকিও তাই বলছেন। সীতাকে ষোল বছর দেখালে শ্রীরামচন্দ্রের বাইশ বছর হয়ে যায়। বাইশ বছর হয়ে গেলে এখানকার বর্ণনার সাথে আবার মিলবে না। কারণ এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে সুকুমার বালক রূপে বর্ণনা করা হচ্ছে। সুবাহু আর মারীচকে যখন তীর চালাচ্ছেন তখন পরিষ্কার বলছেন তিনি তখন এক অপরিপক্ক বালক, এখনও গোফ-দাঁড়ি ঠিকমত বেরোয়নি।

খবর পেয়ে রাজা দশরথ সবাইকে নিয়ে এসেছেন, শুনে তিনি খুব খুশী, রাজা জনকের সাথে আমাদের সম্পর্ক হতে যাচ্ছে। সীতার সাথে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হয়ে গেল। রাজা জনকেরই ঊর্মিলা নামে আরেকটি কন্যা ছিল, তার সাথে লক্ষ্মণের বিবাহ হল। রাজা জনকের ভাইয়ের আবার দুটি কন্যা ছিল, তাদের নাম ছিল মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি, এই দুজনের সাথে যথাক্রমে ভরত আর শত্রুঘ্নর বিবাহ হল। একই পরিবারে চার ভাইয়ের বিবাহ হয়ে গেল। রাজা জনক সীতার পূর্বকথা রাজা দশরথকে বলছেন। একবার রাজা জনক যজ্ঞভূমিতে লাঙল চালাতে গিয়েছিলেন। লাঙল চালাতে গিয়ে তিনি দেখছেন লাঙলের যে অগ্রভাগ যাকে সীত বলা হয়, সেই সীতের কাছে একটা নবজাত শিশুকন্যা পড়ে আছে। সীতাকে তাই ভূমিপুত্রী বা পৃথিবীকন্যাও বলা হয়। বাল্মীকি রামায়ণের সব কটি প্রধান চরিত্রের জন্ম অস্বাভাবিক। কাহিনীর শুরুতেই বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম অস্বাভাবিক। তিনি আবার যজ্ঞ করাতে দশরথের চারটি পুত্রের যে জন্ম হল সেই জন্মও অস্বাভাবিক, এখানে সীতারও অস্বাভাবিক জন্ম। তারপর প্রধান চরিত্র হবে হনুমান, তাঁরও জন্ম স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। রামায়ণের প্রধান চরিত্র যত আছে কারুরই জন্ম স্বাভাবিক নয়। কেউ যজ্ঞ থেকে জন্ম নিচ্ছে, কেউ মাটি থেকে জন্মাচ্ছে আর মহাবীর হনুমানের জন্মের ব্যাপারটা আবার পুরো অন্য রকম। সব কিছুই যদি স্বাভাবিক থাকে তাহলে আর সেটা কাহিনী হবে না। বেশির ভাগ সাহিত্যিকই জীবনে যা কিছু দেখেছেন, যে দেখার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, সেই জিনিসগুলোর মধ্যে একটু তেল, নুন, মশলা দিয়ে কাহিনী দাঁড় করিয়ে দেন। এভাবে না হলে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, সাহিত্য দাঁড় করাতে হলে কাহিনী এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেটা সাধারণ অবস্থায় হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আর এটা যে কল্পনা করে নেবেন সেটাও সাধারণ অবস্থায় হওয়ার কথা নয়। বাল্মীকির এটাই বৈশিষ্ট্য, তিনি জন্ম ব্যাপারটাকেই একটা অস্বাভাবিকতায় নিয়ে গেছে। আর প্রত্যেকটি জন্মকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছেন তো বটেই কিন্তু প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন ভাবে দেখাচ্ছেন। যখন শিবের সন্তান হচ্ছে তখন অন্য ভাবে নিয়ে আসছেন, সাহিত্য এভাবেই সৃষ্টি হয়। মহাভারতেও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম অস্বাভাবিক, পাণ্ডবদের জন্ম, কৌরবদের জন্মও অস্বাভাবিক ভাবে হচ্ছে।

তখন জনক রাজা বলছেন, সীতাকে নিয়ে এসে আমি পালন করছি। একদিন নারদ মুনি এসে আমাকে বললেন, এই কন্যা সাক্ষাৎ মায়া আর পরমাত্মা হৃষীকেশ ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ দান ও দেবকার্য সিদ্ধির জন্য রাজা দশরথের গৃহে চার অংশে তাঁর পুত্র রূপে জন্ম নিয়েছেন। এদিকে সীতা ভগবানের সাক্ষাৎ মায়া তোমার গৃহে জন্ম নিয়েছেন। নারদ বলছেন –

যোগমায়াপি সীতেতি জাতা বৈ তব বেশ্মনি।
অতস্ত্বং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ।১/৬/৬৫

যিনি যোগমায়া তিনিই সীতা, অতএব তুমি রামের হস্তেই সীতাকে অর্পণ করবে। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি কিভাবে পূর্ণ থেকে অংশ হয়ে যান এটাই গূঢ় রহস্য। কিভাবে হন আমরা জানি না। কিন্তু এটা বোঝা যায় সেই শুদ্ধ চৈতন্যে কিছু একটা হয় যার দরুণ যিনি অখণ্ড তিনি খণ্ডিত রূপে দেখান। এটাকেই বেদান্তে মায়া বলছে। আমি অখণ্ড থেকে খণ্ডিত হব এই ইচ্ছা ভগবানের কী করে হতে পারে! তাই বলছেন মায়া। আবার কেউ বলে অজ্ঞান। কিন্তু অজ্ঞান সব সময় ব্যষ্টি স্তরে হয়। উচ্চস্তরে দুটোকে তফাৎ করার জন্য মায়া বলে। তন্ত্র এটাকেই শক্তি বলছে, যারা বিষ্ণুর ভক্ত তারা একে লক্ষ্মীর সাথে মিলিয়ে দেন। বিভিন্ন আধ্যাত্মিক দর্শনে

সচ্চিদানন্দকে নিয়ে কোন সমস্যা হয় না, কারণ বেদে সচ্চিদানন্দকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওর বাইরে কেউ যেতে পারবে না। কিন্তু মায়ার ক্ষেত্রে এসে বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুর যোগমায়া এভাবে জিনিসটাকে বর্ণনা করার চেষ্টা করছেন। নারদ বলছেন, সীতা সেই যোগমায়া। তাহলে যোগমায়া কি কোন ব্যক্তি? আসলে অধ্যাত্ম রামায়ণের মত গ্রন্থ সাধারণ লোকেদের জন্য। বেদ হল খুব উচ্চমানের ব্রাহ্মণদের জন্য। সাধারণ লোকেদের জন্য বেদ নয়। কিন্তু তাদের জন্যও তো ধর্মগ্রন্থ চাই। বাল্মীকি রামায়ণকে আমরা semi-spiritual work বলতে পারি। শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি যুগপুরুষ রূপে তুলে ধরেছেন ঠিকই কিন্তু তার সাথে যজ্ঞের বর্ণনা, ধর্মের বর্ণনা, কর্তব্যাকর্তব্যের বর্ণনা এই জিনিসগুলোও রয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্র, সব রকম মত ও চিন্তাধারাকে সমন্বয় করা হয়েছে। সমন্বয় করার ফলে আস্তে আস্তে সবটাই কঠিন হয়ে গেছে। যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তাঁকে এই জগৎ রূপে কি করে দেখাবেন? আমরা তাঁকে কিভাবে দেখব?

সেইজন্য সচ্চিদানন্দ যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তাঁর যে স্ত্রী হবেন তাঁকেও বিশেষ হতে হবে। শ্রীরামচন্দ্রও যদি বিবাহ করেন তিনিও যাকে তাকে বিবাহ করতে যাবেন না। শ্রীকৃষ্ণও যে কাউকে বিবাহ করবেন না। সেইজন্য অবতারের সঙ্গীকে সব সময় যোগমায়া রূপে দেখা হয়। যোগমায়া যদি না দেখা হয় তাহলে কাহিনী কখনই পূর্ণাঙ্গ হবে না। নারদ তাই রাজা জনককে সাবধান করে দিচ্ছেন, সীতা যেন কোন মতেই অন্য কারুর কাছে না চলে যায়, তুমি এটা লক্ষ্য রাখবে। যদি সীতা যোগমায়াই হন, ঈশ্বরের কার্যের জন্যই যদি তাঁর আগমন হয় তাহলে অন্যের কাছে যাওয়ার তো কোন কথাই হয় না। আসলে যখনই আমরা অবতার, যোগমায়া, শক্তি এই জিনিসগুলি ভাবি তখন আমাদের মনে হয় সবটাই যেন একটা magical creature, শ্রীরামচন্দ্র ম্যাজিকের মত এসে গেছেন, সীতা ম্যাজিকের মত এসেছেন, তিনিও অন্য কারুর কাছে যাবেন না, কেউ এই সেই করতে গেলে ভস্ম হয়ে যাবে, আগে থেকেই যেন স্ক্রিপ্ট লেখা হয়ে আছে। কিন্তু এভাবে হয় না, ওর মধ্যেও জাগতিক বৈশিষ্ট্য গুলো থাকে।

আমরা যদি অবতার রূপে না দেখে যোগশাস্ত্রের নিরিখে দেখি তাহলে জিনিসগুলো সহজ ভাবে বোঝা যায়। তিনিও মানুষ কিন্তু তাঁর মধ্যে শক্তির বিশেষ প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। ওই শক্তির দরুণ তাঁর আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যেও শক্তির প্রকাশ এসে যাচ্ছে। আমরা দেখছি ঠাকুর অবতার, তিনিও শ্রীমার সম্বন্ধে বলছেন কুটো বাঁধা আছে, অর্থাৎ শ্রীমার সাথেই তাঁর বিবাহ ঠিক হয়ে আছে। নরেনকে বলছেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি। এই যে তিন চারটে প্রধান চরিত্র বা পরে আরও অনেককে দেখে বলছেন, ওকে অমুকের দলে দেখছি, তাকে অমুকের দলে দেখছি। কিন্তু সেই ঠাকুরই নরেনের বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুনেই পাগলের মত ছটফট করছেন। তিনি মা কালীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছেন, মা যে করেই হোক এই বিয়ে তুমি আটকাও। নরেনের মা দেখছেন যদি বড় বাড়িতে বিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। নরেনও বলতে শুরু করে দিয়েছে যদি ভালো টাকা পাওয়া যায় কেন বিয়ে করব না! সেই কথা আবার ঠাকুরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, ঠাকুরের তো মাথায় হাত। আমরা ভাবি, নরেনের যদি বিয়ে হয়ে যেত তাহলে কী সর্বনাশই না হয়ে যেত। সত্যিই কি নরেনের বিবাহ হওয়ার সম্ভবনা ছিল? আসলে মায়ার রাজ্যে কোন কিছুই বলা যায় না। কথামৃতেও ঠাকুর বলছেন, মায়ার রাজ্যে কিছু বলা যায় না। কোথাও মায়ার একটা কিছু এসে যায় আমরা যতই লীলা বলি আর যাই বলি না কেন, ছিটকে যাওয়ার সম্ভবনা সব সময়ই থাকে। সিনেমায় চিত্রনাট্য করা থাকে কিন্তু অনেক সময় বড় বড় অভিনেতারা চিত্রনাট্য থেকে সরে গিয়ে তারা on the spot সংলাপ বানিয়ে নেয়।

এবার আমরা মাস্টারমশাইর জীবনের দিকে তাকাচ্ছি। কথামৃতে প্রথমের দিকে বর্ণনা আছে, ঠাকুর মাস্টারমশাইর দিকে তাকিয়ে দেখছেন। তারপর জিজ্ঞেস করছেন, তোমার বিবাহ হয়েছে? বলছেন, হ্যাঁ। ঠাকুর শুনেই বলছেন, এইরে গেল! তারপর জিজ্ঞেস করছেন, সন্তান? হয়েছে। তাহলে তো পুরোটাই গেল। মাস্টারমশাই অত্যন্ত বিস্মিত আর কুণ্ঠিত বোধ করছেন। তারপর ঠাকুর বলছেন, আমি লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি। তোমার চোখ, কপাল দেখে বুঝতে পারছি তুমি অন্য রকম। লক্ষণ যদি অন্য রকমই থাকে তাহলে মাস্টারমশাইর স্ক্রিপ্ট অন্য রকম হল কেন? আজকে আমরা পেছনের দিকে তাকিয়ে বলে দিচ্ছি, ঠিকই তো আছে, তিনি ঠাকুরের কাজ করলেন, কথামৃতে ঠাকুরের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ওই পয়েন্ট থেকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, মাস্টারমশাইর এটা হওয়ার ছিল না। স্ক্রিপ্টটাই পাল্টে গেল। মাস্টারমশাই পুরো সাংসারিক জীবনটাই অত্যন্ত দুর্বিষহ। সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি আত্মহত্যা করতেও গিয়েছিলেন। ইংলিশে একটা কথা আছে

made for each other, এর অর্থ স্বামী স্ত্রী দুজনেই এক অপরের জন্য নির্মিত। যদি এক অপরের জন্য তৈরী না হয়, তাহলে ছিটকে যাবে, কিছু একটা গোলমাল লাগবে, হয় স্ত্রী মরে যাবে, স্বামী হয়ত পাগল হয়ে যাবে, তিতিবিরক্ত হয়ে যাবে, অনুশোচনা হবে কেন আমি ফাঁসলাম। সাধু সন্ন্যাসীরাও কোন মেয়ের খপ্পড়ে পড়ে যেতে পারেন। কিন্তু সেটা কিছু নয়, কিন্তু পড়ার পরে কেমন আছে সেটা দেখতে হবে। যদি সে আনন্দে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে সন্ন্যাসের জন্য আসেনি। যদি সেখানে অশান্তিতে ভুগতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে পিছলে গেছে। বিশ্বামিত্রের যেমন, স্বর্গের অপ্সরা তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে, সেখান থেকে কন্যা হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে। এই যে পয়েন্টটা, যদি দিব্যগুণের সমাবেশ থাকে বা স্ক্রিপ্ট যেটা আছে সেটা দিব্য, এবার মায়ার জগতে যদি ওই স্ক্রিপ্ট পাল্টে যায়, তার জীবনে নানা রকম অঘটন হতে শুরু হয়ে যাবে। যদি ভুল বাড়িতে জন্ম হয়ে যায়, বা ভুল জন্ম হয় তাহলে তার একটা দুর্ঘটনা হয়ে যাবে বা আত্মহত্যাও করে নিতে পারে। জন্ম যদি accidental হয় মারাও যাবে accidentএ। তবে এটা একটা থিয়োরী, এটাকে তো আর প্রমাণিত করা যাবে না। যে কোন সংখ্যাকে যদি শূন্য দিয়ে গুণ করে দেওয়া হয় সেটা শূন্যই হবে। One equal to two। কারণ One into zero is zero, two into zero is zero, zero zero সমান, সেইজন্য zero zero কেটে দিলে one equal to two। এটাকে বলে ট্রিবিয়ান, এই যুক্তিগুলো হল ট্রিবিয়ন, আপনি যেদিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকেই নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠাকুরের সমসাময়িক যাঁরা ছিলেন, যাঁরা নিয়মিত ঠাকুরের কাছে আসতেন, তাঁদের জীবনী খুব খুঁটিয়ে যদি পড়া হয় যে ঠাকুর তাঁদের জন্য কি করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি কি বলেছিলেন, তারপর দেখতে হবে তাঁদের জীবনটা স্ক্রিপ্ট অনুসারে গেল কিনা, ঠাকুর যেমনটি বলে গেছেন সেইভাবে গেছে কিনা, তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন, শোওয়ার সময় তোর নিঃশ্বাস অনিয়মিত চলে, যোগীদের এভাবে অনিয়মিত নিঃশ্বাস চললে বেশি দিন বাঁচে না। ঠিক তাই হল, স্বামীজী বেশি দিন বাঁচলেন না। আমরা এখন অনেক কথাই বলতে পারি, স্বামীজী কাজ করে করে শরীরপাত করে দিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুর অনেক আগেই বলে দিয়েছিলেন এই ধরণের মানুষ বেশি দিন বাঁচে না। যাকে যাকে ঠাকুর যা যা বলেছেন সেগুলো যখন স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী চলল তখন এক রকম চলেছে। ঠাকুর বললেন নরেন শিক্ষে দেবে, তাই হল। কিন্তু যাদেরকে ঠাকুর সাংসারিক জীবন থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, তারা যে সংসারে ঢোকেনি তা নয়, ঢুকেছে, কিন্তু অনেক অশান্তি এসেছে। আমরা এখানে backward argument ব্যবহার করছি, retrospective argument কখনই ভালো argument হয় না। এখানে ফল দেখে কারণে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা মানতে পারি যদি কোন কারণে এই রকম হয়ে যায় তখন ঘোর অশান্তি দেখা যাবে। যদি কেউ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে ওই পরিস্থিতিই তাকে ছুড়ে বার করে দেবে। ওই পরিস্থিতির জন্য সে উপযুক্ত নয়, তাকে বার করবেই। তার মানে তাঁর জন্য যে divine script তৈরী হয়ে আছে ওই scriptএর বাইরে তিনি যদি যান, ওখান থেকে তাঁকে নীচে ফেলে দেবে, তাঁকে থাকতেই দেবে না। আমরা যা কিছু খাচ্ছি শরীর সেটাকে নিজের ভেতরে আত্মসাৎ করে নেয়, কিন্তু এমন কিছু যদি চলে যায় যেটা শরীরের জন্য নয়, শরীরই বমি করে বার করে দেবে। পরিবারে একটা ছেলে জন্ম নেওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে মারা গেল, তার বাবা-মা সারা জীবনই কাঁদছে, আমাদের ছেলে কত গুণের ছিল। কিন্তু উল্টোটাও তো হতে পারে, ছেলেটি হয়ত সেই বংশেরই ছেলে নয়, ভুলে এই বংশে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। সেইজন্য জীবনকে যতক্ষণ একটা higher perspective থেকে না দেখা হয়, ততক্ষণ জীবনে শান্তি আসবে না।

ভারতের জন্য ভগবান যে স্ক্রিপ্ট দিয়েছেন তাতে ত্যাগের আদর্শই প্রধান। সন্ন্যাসীরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ঋষিরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, ব্রাহ্মণরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষা যাঁরা দিতেন তাঁরা ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত। সমাজের যাঁরা উচ্চ স্থানীয় তাঁরাই ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বামীজী বারবার বলছেন, ভারতে শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগী পুরুষদের হাতে দিতে হবে। স্বামীজী মৌলিক যে জিনিসটাকে বলছেন আমরা সেটা পালন করছি না, কিন্তু দিনরাত man making character building, manifestation of the perfection এই ধরণের বড় বড় বুলি আওড়ে যাচ্ছি। শিক্ষা তো পরে শুরু হবে, তার আগে শিক্ষকদের দেখুন, স্বামীজী বলছেন শিক্ষার দায়ীত্ব ত্যাগী পুরুষদের কাঁধে দিতে হবে, দ্বিতীয় বলছেন, আমার আইডিয়া হবে গুরুগৃহবাস। পাঁচ হাজার বছর ধরে গুরুগৃহবাস আর ত্যাগী পুরুষরা শিক্ষার দায়ীত্ব নিয়ে এসেছেন বলে আজকে আমরা এই আধ্যাত্মিক সম্পদ নাড়াচাড়া করতে

পারছি। আর আজ ভারতের শিক্ষা জগতের দিকে তাকিয়ে দেখুন, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে। ভারতে শিক্ষা দানকে কোটি কোটি টাকার ইণ্ডাস্ট্রি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিস্ট্যুটে এক বছরের কোর্সের ফি ষোল লক্ষ টাকা। এই ছেলেরা পাশ করে বেরিয়ে এসে তো সমাজ থেকে লুট করতে শুরু করে দেবে। দক্ষিণ ভারতে মেডিকেল কলেজগুলিতে একটা সিটের জন্য এক কোটি করে টাকা নিচ্ছে। ভারতের জন্য ভগবান যে স্ক্রিপ্ট করে রাখা হয়েছে তা হল এই দেশ ত্যাগের শিক্ষা দেবে। আজ সেই স্ক্রিপ্টকে ছিঁড়ে পুরো টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের যে সর্বনাশ আসছে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ভারত ভগবানের তৈরী করা স্ক্রিপ্টের বাইরে চলে গেছে।

রাজা জনককে নারদ এটাই সাবধান করে দিচ্ছেন, সীতার স্ক্রিপ্ট যেন পাল্টে না যায়। আরও বলে দিলেন এই কথা আর পাঁচ কান করবেন না। নারদের কথা শুনে রাজা জনক খুব সাবধান হয়ে গেলেন, আর মনে মনে ঠিক করে নিলেন আমার কাছে শিবের ধনুক রাখা আছে, এই ধনুক দিয়ে ভগবান শিব ত্রিপুর রাক্ষসকে বধ করেছিলেন, এই ধনুকে যে গুণ লাগাতে পারবে তাতেই আমি বুঝে যাব সে কার মত শক্তিশালী। তখন তিনি এটাকেই সীতার বিবাহের পণ রূপে রাখলেন। পণ মানে শুল্ক। পণ তারই লাগে যার দাম আছে। ইদানিং বিহার, ইউপি, রাজস্থানে বিবাহে কন্যাপক্ষ থেকে বরপক্ষকে প্রচুর পণ দিতে হয়। রীতিমত আদায় করে নেওয়া হয়। কিন্তু এখানে উল্টো, কন্যা যদি অত্যন্ত গুণবতী হয় তখন সেই কন্যার জন্য পণ রাখা হত।

যাই হোক বিবাহ কার্য সম্পন্ন হয়ে গেছে। এবার বিদায় নেওয়ার পালা। রাজা দশরথ সবাইকে নিয়ে অযোধ্যায় রওনা হবেন। সেই সময় সীতার মা সীতাকে বলে দিচ্ছেন –

শ্বশ্রূশুশ্রূষণরতা নিত্যং রামমনুব্রতা।
পাতিব্রত্যমুপালম্ব্য তিষ্ঠ বৎসে যথাসুখম্।১/৬/৮১

এখানে স্ত্রীধর্ম নিয়ে বলছেন। *শ্বশ্রূশুশ্রূষণরতা*, তোমার শাশুড়ী মাতার সেবা করবে, *রামমনুব্রতা*, পতিব্রতা ধর্মানুসারে তুমি রামকে সব সময় অনুগমন করবে। এই কথাকেই পরে সীতা বনবাসে যাওয়ার সময় ব্যবহার করেছেন, আমাকে মা বলে দিয়েছিলেন *রামমনুব্রতা*, রামের প্রতি সব সময় অনুব্রত থাকবে, আমি তাই আপনাকে ছাড়তে পারব না। আগেকার দিনে অল্প বয়সেই মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হত, স্বামীর সেবা কিভাবে হবে, স্বামীর বাড়ির লোকেদের কিভাবে সেবা করবে। তার মধ্যে দুটো নির্দিষ্ট করে বলে দিলেন, শাশুড়ীমাতাদের সেবা করবে আর স্বামীর অনুগামিনী হবে, স্বামী যেখানেই যাবে সেখানেই তুমি থাকবে। সমাজে যে আজকাল অনেক রকম সমস্যা তার অন্যতম একটি মূল কারণ পতিধর্মা থেকে মানুষ সরে এসেছে। হলিউডের একজন নামকরা চিত্রাভিনেত্রী তাঁর একটা লেখাতে বলছেন, হলিউড ডিভোর্সের জন্য খুব বিখ্যাত। তিনি বলছেন, আমি অনেক বিচার করে দেখলাম সন্ধ্যের পর স্বামী আর স্ত্রী যদি এক সঙ্গে থাকে তাহলে কিন্তু কখনই তাদের ডিভোর্স হবে না। একটা দুটো যে ব্যতিক্রম হবে না তা নয়, সেটাকে হিসাবের মধ্যে নেওয়া যায় না। ভারতেও একটা শিল্প পরিবার আছে যাদের মধ্যে এটাই প্রথা যে সন্ধ্যের পর কোন পুরুষ নিজের স্ত্রীকে ছাড়া বাড়ির বাইরে যেতে পারবে না। আর স্ত্রীর তো একা বাড়ির বাইরে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। এখানে ঠিক তাই বলছেন *রামমনুব্রতা*। এখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। সীতার বোন ঊর্মিলা, তাকেও মা একই শিক্ষা দিয়েছেন। ঊর্মিলাও তো লক্ষ্মণের সাথে যেতে পারত। Retrospective কাহিনী লেখা হয়েছে বলে ঊর্মিলাকে নিয়ে আসা হয়নি। এটাও হতে পারে যে ঊর্মিলার বয়স কম ছিল, সে বেচারী নিজের অধিকার আদায়ের জন্য লক্ষ্মণের উপর জোর খাটাতে পারেনি।

হিন্দীর একজন নামকরা কবি ঊর্মিলাকে নিয়ে একটা বই লিখেছেন। সেখানে তিনি বলছেন, সীতার কথা সবাই লিখে যাচ্ছেন, কিন্তু উর্মিলার যে করুণ অবস্থা, বিয়ে করে আসার কদিন পর থেকে চৌদ্দ বচ্ছর তাকে স্বামীর থেকে আলাদা থাকতে হয়েছে, ঊর্মিলার জন্য কোন ঋষি মুনি বা সাহিত্যিক বা কবি কলমের এক ফোঁটা কালি খরচ করেননি। আসলে কাহিনী সব সময় অবতার পুরুষেরই হয়, মহাপুরুষের হয় না। উর্মিলা বা ভরত এরা মহাপুরুষ কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কাহিনী সব সময় অবতার পুরুষেরই হয়। শ্রীরামচন্দ্রের যা যা গুণ ছিল লক্ষ্মণের মধ্যেও তার সব কটি গুণ ছিল, শ্রীরামও যোদ্ধা, লক্ষ্মণও যোদ্ধা, শ্রীরাম এক পত্নীব্রত লক্ষ্মণও এক পত্নীব্রত, লক্ষ্মণের একটি অতিরিক্ত গুণ তিনি দাদার ভক্ত, কিন্তু লক্ষ্মণকে নিয়ে কোন গ্রন্থ হবে না, গ্রন্থ সব সময় অবতার পুরুষকে নিয়েই হয়।

মিথিলার পথে রাজা দশরথের অশুভ লক্ষণ দর্শন

সীতাকে অশ্রুজলে বিদায় দেওয়া হয়েছে। বলছেন রাজা দশরথ সবাইকে নিয়ে মিথিলা থেকে তিন যোজন পথ অতিক্রম করে এসেছেন। এরপর সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলছেন –

নত্বা বসিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব।
নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে বিষমাণি সমন্ততঃ।১/৭/২

তখনকার দিনে প্রথা ছিল, রাজা যখন কোথাও যেতেন তখন রাজার সামনে সামনে রাজপুরোহিত চলতেন। এই প্রথা শুধু ভারতেই নয়, গ্রীক সভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথা পাওয়া যায়, পুরোহিত রাজার আগে আগে যেতেন। রাজা দশরথ বশিষ্ঠ মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন *নিমিত্তানীহ দৃশ্যন্তে বিষমাণি সমন্ততঃ*, হে মুনিবর আমি কেন চারিদিকে অশুভ লক্ষণ দেখছি? বাংলা ও হিন্দীতে নিমিত্ত শব্দের ব্যবহার এখন পাল্টে গেছে। গীতায় অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব*, আমরা এখানে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছি কিন্তু এখানকার নিমিত্ত গুলোকে সব বিপরীত দেখছি। বিপরীত কেন? আমরা সুখ চেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যুদ্ধ করে সুখ পাব সেইজন্য আমরা সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। কিন্তু যা কিছু দেখছি তাতে মনে হচ্ছে এই যুদ্ধ করে আমরা কোন সুখই পাব না। একাদশ অধ্যায়ে গিয়ে এবার ভগবান অর্জুনকে বলছেন *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্*, হে অর্জুন! এই যুদ্ধে তুমি নিমিত্ত হও। ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, যা কিছু করার ভগবানই করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন কৌরবদের আর তোমাদের পক্ষে যত মহারথীরা আছে সবাইকে আমি আগেই মেরে রেখেছি, সবাই এখন কালের গ্রাসে পতিত। কিন্তু যারাই মর্ত্যলোকে এসেছে তারা সবাই এই কালের গ্রাসে পড়ে গেছে। কেউ কাল মারা যাবে, কেউ দুদিন পরে মরবে, এখানে বাঁচাবাঁচির কোন প্রশ্নই নেই। তফাৎ হল ইচ্ছা, কেউ মরতে চায় না, কেউ মরতে চায়। কিন্তু ভগবান নিজে কাল রূপে সবাইকেই মেরে রেখেছেন। কবে থেকে? আমাদের জন্মের আগে থেকেই মেরে রেখেছেন, যেদিন মায়ের গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে সেদিনই তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আর আমরা সবাই এদিকে ওদিক দৌড়াদৌড়ি করে মৃত্যুকে পিছিয়ে দিতে চাইছি, কখন সম্ভব নাকি! শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন *নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচী*, এদের মৃত্যু আমি আগেই করে রেখেছি, তুমি এবার এদের উপর শুধু অস্ত্র চালাবে, মাঝখান থেকে তোমার যশ হয়ে যাবে।

নিমিত্ত তাই দুটো অর্থে হয়। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন *নিমিত্ত চ পশ্যামি বলছেন*, এখানে নিমিত্ত মানে লক্ষণ, কিছু চিহ্ন বা লক্ষণ দেখে বোঝা যাচ্ছে আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি সেই কাজটা খারাপ হবে নাকি ভালো হবে। যেমন ঘর থেকে বেরোচ্ছে সেই সময় কেউ হাঁচি দিল, রাস্থা দিয়ে যাওয়ার সময় বেড়াল রাস্থা কেটে দিল, এগুলো হল লক্ষণ, ইঙ্গিত করছে সামনে খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। এই জিনিসগুলিকে আমরা মোটামুটি সবাই মানি। যারা বলে মানি না তাদেরও মনটা খুঁত খুঁত করে, মুখে হয়ত কিছু বলবে না। ঠাকুরও এই ধরণের অনেক লক্ষণ মানতেন, তিনি বলছেন, অমুক লোকের মুখ দেখে উঠেছি বলে রাখালের জ্বর হয়েছে। হাঁচি, টিকটিকি ঠাকুর খুব মানতেন। আর একাদশ অধ্যায়ে ভগবান *নিমিত্তমাত্রং* বলছেন, এখানে নিমিত্ত মানে সব কিছু ঠিক করা হয়ে আছে কিন্তু তোমার মাধ্যমে কাজটা সম্পন্ন করা হবে, তুমি নিমিত্ত মাত্র। অর্জুনকে এখানে যন্ত্র মাত্র হতে বলছেন, মারছেন ভগবানই। অর্জুন ভগবানের অস্ত্র, অর্জুন যদি না মারতে চায় ভগবান অন্য যন্ত্র ব্যবহার করবেন। আমরা বলছি মাস্টারমশাই কথামৃত রচনা করেছেন। মাস্টারমশাই এক সময় এই কাজ করতে চাইছিলেন না। ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন, তিনি মাস্টারমশাইকে বলছেন, কারিগরের কাছে অনেক কল আছে, একটা কল কাজ না করলে আরেকটা কল লাগিয়ে নেয়। বলতে চাইছেন, তুমি যদি এই কাজ না কর আমি অন্য কাউকে দিয়ে করিয়ে নেব। তাহলে মাস্টারমশাই কি করছেন? কিছুই করছেন না, মাঝখান থেকে আজ মাস্টারমশাইর নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল, ঠাকুর, শ্রীমা, স্বামীজীর সাথে সবাই মাস্টারমশাইর নামও জেনে যাচ্ছেন। আজকে অর্জুনের এত সুখ্যাতি কেন, কারণ ভগবান অর্জুনকে মাধ্যম করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দজী যখন লীলাপ্রসঙ্গ লিখছিলেন সেই সময় লেখার সরঞ্জামে অনেকগুলো পেন্সিল রাখা থাকত। উনি বলতেন, কোন পেন্সিলকে আমি তুলব সেটা আমার ইচ্ছা। একটা বিশেষ কলম দিয়ে তিনি যদি লিখতেন, পরে সেই কলমটাই বিখ্যাত হয়ে যেত, মহারাজ এই কলম দিয়ে লীলাপ্রসঙ্গ লিখেছিলেন। দেখা গেলে লেখকের থেকে কলমের সুখ্যাতি বেশি হয়ে গেছে। লেখার মধ্যে

কৃতিত্বটা কার, ওই বিশেষ কলমের না লেখকের? কলমের কিসের কৃতিত্ব, ওই কলম না থাকলে যে কোন কলম দিয়েই কাজ চলে যাবে।

আমরা কিছু করে দিতে পারলে খুব লাফালাফি শুরু করে দিই, দেখ আমি কি করে দিলাম! তুমি কি করেছ! ভগবান তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। ভগবান কাকে দিয়ে কি করাবেন তিনি আগে থেকেই সব ঠিক করে রেখেছেন। এগুলো একটু বিচার করলেই আমরা বুঝতে পারি, কাকে কি দেবেন কি দেবেন না ভগবানের সব ঠিক করা আছে। কোন কারণে যে ভাবে হওয়ার কথা, যদি সেভাবে কাজ না করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্য চ্যানেল খুলে দেন। জল তার প্রবাহমান ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কিন্তু কোন কারণে যদি জলকে আটকে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করে দেবে। আর সব দিক থেকে যদি বেঁধে দেওয়া হয়, জল তখন নিজের শক্তি সঞ্চয় করে বাঁধের উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। আমাদের কর্মও এই জলের প্রবাহের মত চলছে। কর্মে যদি কারুর টাকা-পয়সা থাকে, তার যদি চাকরিও চলে যায়, হঠাৎ দেখা যাবে কি করে একটা ব্যবসা করতে শুরু করল আর ব্যবসাটা রাতারাতি দাঁড়িয়ে গেল, কেউ আটকাতে পারবে না। এগুলোকে বলে higher laws of nature, প্রকৃতির এগুলো খুব শক্তিশালী নিয়ম। আমরা এগুলোকে বুঝতে পারি না, বুঝতে পারি না বলে আমরা মানতেও চাই না। আমরা কার্য কারণ সম্পর্ককে নিয়েই চলছি, আমি এতটা দিলাম আমার এতটা প্রাপ্য, জীবনে এভাবে সব কিছু চলে না।

ঝড় আসার আগে মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইতে শুরু করে। এখন মিষ্টি মিষ্টি বাতাস চলছে বলেই কি ঝড় আসছে, নাকি ঝড় আসবে বলে মিষ্টি বাতাস চলছে? ঝড় আসবে বলেই মিষ্টি বাতাস দিতে শুরু করেছে। সেইজন্য নিমিত্ত যখন বলছেন, এই নিমিত্ত যন্ত্র অর্থে বা একটা লক্ষণ হিসাবে দুটো একই জিনিস। যার জীবনে যখন শুভ বা ভালো আসা শুরু হয় দেখা যায় এর আগে তার সব কিছু পাল্টাতে শুরু হয়ে গেছে। ঠাকুর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, সাধারণ প্রজার বাড়িতে জমিদার আসবেন। সাধারণ প্রজার বাড়িতে জমিদার এলে সে তাকে কোথায় বসতে দেবে, জমিদারকে কি ভাঙা কাপে চা খেতে দেবে, সেইজন্য জমিদার নিজের লোকজনদের দিয়ে আগেই সব কিছু সেই প্রজার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। বেলুড় মঠে যখন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী কেউ আসবেন ঠিক হয়ে যায় তখন তার সাত দিন আগে থাকতে পুলিশের কর্তারা বেলুড় মঠে ঘুরঘুর করতে শুরু করে দেবে। আসার দুদিন আগে থাকতে ফায়ার ব্রিগেড, এ্যম্বুলেন্স আসতে শুরু করে। তার মানে রাজা আসছেন। রাজার নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাজা নিজেই করে নেন। ফায়ার ব্রিগেড এসেছে বলে প্রধানমন্ত্রী আসছেন তা নয়, প্রধানমন্ত্রী আসবেন সেইজন্য ফ্রায়ার ব্রিগেড এসেছে। আমরা জিনিসটাকে কোথা থেকে, কিভাবে নিচ্ছি সেটা আমাদের উপর নির্ভর করে। যদি পুরোটাই নিয়ে থাকি তাহলে নিমিত্ত মানে লক্ষণ, যদি সামনে থেকে নেওয়া হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে কর্মের তৃতীয়া। একাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলছেন তুমি নিমিত্ত মাত্র হও অর্থাৎ কর্মের তৃতীয়া, যাকে করণ বলছে, তুমি যন্ত্র স্বরূপ হও আর যখন বলছেন *নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরিতানী কেশব*, দুটো একই জিনিস কোন তফাৎ নেই। বেড়াল রাস্তা কাটলে অশুভ হয় বলছেন, তাহলে বেড়াল কাটার জন্য আমার অশুভ হচ্ছে? না, আমার অশুভ হওয়ার ছিল বলে বেড়াল রাস্তা কেটেছে। এই নিমিত্ত আর ওই নিমিত্ত দুটোই এক।

সমস্যা হল এটাকে আমরা কি করে কার্যকরী করব। কার জন্য কোনটা নিমিত্ত হবে আমরা জানি না, অনেকের অনেক রকম ব্যাপার স্যাপার থাকে, এগুলো খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিছু লোকের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খারাপ হতে পারে, সেটাই আবার অন্যের জন্য ভালো হয়। সেইজন্য এগুলো বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে কোন লক্ষণ দেখা গেলে শুভ হবে কোন লক্ষণ দেখা গেলে অশুভ হবে এর প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যাবে। ঠাকুর হাঁচি টিকটিকি মানছেন, শ্রীমা এই নিয়ে বলছেন ঠাকুর তো ভাঙতে আসেননি, তিনি গড়তে এসেছেন।

কিন্তু এখানে রাজা দশরথ যত নিমিত্ত দেখছেন সব নিমিত্তই গোলমাল দেখছেন। শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ হয়েছে, সীতাকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরছেন, সাথে আবার চতুরঙ্গী সেনা আছে, কিন্তু চারিদিকে তিনি সব অশুভ জিনিস দেখছেন। বশিষ্টদেবকে রাজা দশরথ জিজ্ঞেস করেছেন। তখন বশিষ্ঠ দেবও বলছেন, চারিদিকে যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে শিঘ্রই কিছু ভয়ের কারণ ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরেই তিনি আবার বলছেন, হে রাজন্! আপনে দেখুন আপনার ডান দিক দিয়ে হরিণগুলো ছুটে যাচ্ছে। তার মানে ভয় আছে কিন্তু কেটে যাবে। প্রথমে খারাপ কিছু হবে পরে আবার শুভ হয়ে যাবে।

শ্রীরাম কর্তৃক পরশুরামের দর্পচূর্ণ

বশিষ্ঠ দেব এই কথা বলতে না বলতেই প্রচণ্ড ধুলি ঝড়ে চারিদিক যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই ঝড়ের মধ্যে পরশুরাম কালান্তক রূপ ধারণ করে সেখানে হাজির হয়ে গেলেন। পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরশুরামের কাহিনী আবার একটা আলাদা কাহিনী আর খুব লম্বা কাহিনী। তিনি সতেরবার আবার কোথাও বলে একুশবার ক্ষত্রিয়দের নিধন করে পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় শূন্য করেছিলেন। কার্ত্যবীর্য নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পরশুরামের বাবাকে প্রাণে মেরে দিয়েছিল। তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমি সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতকেই নাশ করে দেব। পরশুরামের উপর একটা বর ছিল, ওনার হাতে যতক্ষণ কুঠার থাকবে ততক্ষণ তাঁকে কেউ পরাস্ত করতে পারবেন না। উনি পরশু নিয়েই লড়াই করতেন, যদিও তিনি সব অস্ত্রবিদ্যাই জানতেন। শ্রীরামচন্দ্র শিবের ধনুক ভাঙতেই সমস্ত পৃথিবী আদি কেঁপে উঠেছে দেখে তিনি এখানে পৌঁছে গেছেন। পরশুরামের এই বরও ছিল যে, তিনি ইচ্ছা মাত্র যেখানে খুশি চলে যেতে পারতেন। রাজা দশরথ দেখছেন পরশুরাম পরশু হাতে নিয়ে তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেছেন। পরশুরামকে দেখে রাজা দশরথ ভয়ে খুব বিহ্বল হয়ে গেছেন, এমনই বিহ্বল হয়ে গেছেন যে অর্ঘ্যাদি দিয়ে পূজা নিবেদন করা ভুলে গিয়ে তিনি হাতজোড় করে বলতে শুরু করেছেন আমার পুত্রের প্রাণ দান করুন। রাজা দশরথের তো প্রশ্নই নেই যে পরশুরামের হাত থেকে কেউ বেঁচে ফিরতে পারবেন। পরশুরামকে আবার অবতার রূপেও গ্রহণ করা হয়। রাজা দশরথ হাতজোড় করে যে পরশুরামকে প্রার্থনা করছেন তাতে পরশুরাম কোন ভ্রুক্ষেপই করছেন না, তিনি তাঁর ক্রোধে অবিচল। পরশুরাম তখন ক্রোধে বশীভূত হয়ে খুব কঠোর বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন –

উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।১/৭/৯
ত্বং রাম ইতি নাম্না মে চরসি ক্ষত্রিয়াধম।

শ্রীরামচন্দ্রকে পরশুরাম বলছেন, তুমি ক্ষত্রিয়েদের মধ্যে অধম। তার মানে তিনি বলতে চাইছেন, এই যে একুশবার আমি ক্ষত্রিয়েদের শেষ করেছি তারা উত্তম ছিল, আর তোমাকে মারতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে, তুমি তো একটা অধম ক্ষত্রিয়। খুব কঠোর বাণী প্রয়োগ করছেন, *ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ*, ক্রোধে পরশুরামের ইন্দ্রিয়গুলো চঞ্চল হয়ে গেছে। ক্রোধ বৃত্তির এটাই ধর্ম, ক্রোধ বৃত্তি মানুষের ইন্দ্রিয়ে ক্ষোভণ উৎপন্ন করে। পরশুরাম বলছেন, *ত্বং রাম ইতি নাম্না মে*, পরশুরামেরও নাম রাম, কিন্তু যেহেতু তিনি পরশু হাতে নিয়ে ঘুরতেন তাঁর নাম পরশুরাম হয়ে গেল। পরশুরাম বলছেন, আমার নাম রাম, তুমি আমার নামকে নকল করে জগতে প্রসিদ্ধ হতে চাইছ? ক্ষত্রিয়দের মধ্যে অধম যে সে কিনা আমার নাম ব্যবহার করে জগতে নাম কিনতে চাইছে, আমাকে এতে অপমান করা হয়েছে। রামের যে নাম রাখা হয়েছে তাতে শ্রীরামচন্দ্রের কি করার আছে! মানুষ যেমনটি আশা পোষণ করে তার নাম সেই রকমই রাখা হয়। আমরা এর আগে বর্ণনা পেয়েছি যেখানে বলছেন মুনিরা, ভক্তরা যেখানে রমণ করেন তাঁর নাম রাম। এখানে পরশুরাম বলছেন আমি হলাম রাম, আর এক অধম ক্ষত্রিয় হয়ে এই নাম নেওয়ার দুঃসাহস তোমার কি করে হল! গরীব লোক তার নাম ধনীরাম, এই রকম হামেশাই হয়, কিছু করার নেই। পরশুরাম আরও বলছেন –

ইদন্তু বৈষ্ণবে চাপে আরোপয়সি চেদ্‌গুণম্।১/৭/১১

তুমি শিবধনু ভেঙেছ তো, এই নাও এবার তোমাকে এই বৈষ্ণবীধনু দিলাম, এই ধনুতে যদি তুমি জ্যারোপণ করে দিতে পার তাহলে তোমার সাথে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব। আর তা নাহলে এক্ষুণি আমি তোমাদের সবাইকে বধ করে দিচ্ছি। একটা পুরনো ধনুক ভেঙে তুমি এখন তার কৃতিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ। যদি তোমার সত্যিই ক্ষমতা থাকে তাহলে এই ধনুকে জ্যারোপণ করে দেখিয়ে দাও। রামচরিতমানসে এই অংশটা তুলসীদাস অনেক বিস্তৃত ভাবে টেনে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি আবার এই অংশকে লক্ষ্মণ-পরশুরাম সংবাদ নাম দিয়েছেন। তুলসীদাস শ্রীরামকে না এনে এখানে লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছেন আর প্রচুর হাস্যরসাত্মক উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন। শ্রীরামের বদলে লক্ষ্মণই পরশুরামকে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, যেমন বলছেন আমাদের যখন বাচ্চা বয়স ছিল তখন খেলতে খেলতে কত ধনুকই তো ভেঙে দিয়েছিলাম, তাতে এত রেগে যাওয়ার কি আছে। তাতে পরশুরাম আরও রেগে গিয়েছেন। এই ধরণের দৃশ্যগুলিকে কবিরা খুব বিস্তৃত করে বলেন। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এত বর্ণনা নেই, এখানে একটা দুটো কথা বলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। শুধু বলে দিলেন, তোমার যদি সত্যিই দম থাকে

তাহলে এই বৈষ্ণবীধনুতে দড়ি লাগাও আর তা নাহলে এক্ষুণি সবাইকে বধ করে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, ক্ষত্রিয়দের নিধন করাই আমার কাজ।

শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামের কাছ থেকে বৈষ্ণবীধনুতে অনায়াসে দড়ি লাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে কোন পরিশ্রমই করতে হল না। ধনুকে দড়ি লাগিয়ে শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেন না, তখনই তাতে বাণ সন্ধান করলেন। বাণ সন্ধান করে শ্রীরামচন্দ্র পরশুরামকে বলছেন, হে পরশুরাম! আপনি জানেন এই বৈষ্ণবীধনুতে তীর সন্ধান করলে সেই তীরকে ছাড়তেই হয়। আর এই তীরকে তো এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যাবে না, আমাকে একটা কিছুকে লক্ষ্য করেই ছাড়তে হবে। আপনি বললেন দড়ি লাগাতে, আমি দড়িই শুধু লাগাইনি তাতে তীর বসিয়ে আমি টেনে নিয়েছি, এবার আপনি বলুন এই বাণকে আমি কোথায় ছাড়ব। এই বাণ যে লক্ষ্যে গিয়ে বিদ্ধ হবে তার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু অকারণে তো আমি কোন কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারি না, তাতে আমার দোষ হবে। তাহলে এখন এর দুটো পথ আছে, একটা হল আপনার যাবাতীয় যত পূণ্য আছে আমি সব পূণ্যকে নাশ করে দিচ্ছি। আর দ্বিতীয় আরেকটা পথ আছে, আপনার পূণ্যের ফলে আপনি যে সর্ব লোকে নিজের ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা পেয়েছেন, আমি আপনার এই ক্ষমতাকে নাশ করে দিচ্ছি। শ্রীরামচন্দ্র দুটো লক্ষ্য বলে দিলেন, হয় আপনার সঞ্চিত পূণ্য আর তা নাহলে পূণ্যের যে ফল পাচ্ছেন। আমরা যা কিছু পাই, এই শরীর, এই চেহারা, টাকা-পয়সা, বুদ্ধি, সৃজনশীলতা, সম্মান, যাবতীয় যা কিছু পাচ্ছি বা পেয়েছি, গত গত জন্মে যা কিছু পূণ্য করেছি সব তার ফল। আর এখন যদি ভালো কর্ম না করা হয় ভবিষ্যতটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে। এটা কোন মতবাদ নয় এটাই বাস্তব। কারুর প্রচুর টাকা-পয়সা, দেখতে সুন্দর তার সাথে প্রচুর নাম-যশ, শরীরটা নিরোগ, এগুলো কোথা থেকে এসেছে? আমরা এ ব্যাপারে খুব দৃঢ় আমার কর্মের জন্যই আমার যা কিছু আসার আসে। এর মধ্যে কোথাও ঈশ্বরের কৃপা জড়িয়ে নেই। এখন আমার যা কিছু ভালো হচ্ছে এটা আমার ফল ভোগ, তপস্যাটা আগে হয়ে গেছে। আর এখন যদি তপস্যা না করতে থাকি, তাহলে আস্তে আস্তে আগের তপস্যার ফল যখন শেষ হয়ে যাবে, *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশ্যন্তি*, পূণ্যের ফল যখন ক্ষয় হয়ে যাবে তখন স্বর্গ থেকে পতন হয়ে যাবে, ঠিক তেমনি আমারও যখন পূণ্যের কোটা শেষ হয়ে যাবে, তখন দেখব আমার কিছুই নেই। আমার কত টাকা-পয়সা ছিল, কত নাম-যশ ছিল সব চলে গেছে। আমাদের শাস্ত্রে একটা পরিভাষা আছে যোগক্ষেম, যোগ মানে অর্জন করা আর ক্ষেম মানে সেটাকে রক্ষণ করা। অর্জন করে পেয়ে গেলেই হয় না, রক্ষণ করার ক্ষমতাও থাকা চাই। একটা বলা হয় যে, নিজের তেজ দিয়ে সেটাকে ধরে রাখতে হয়। মা গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে যখন অবতরণ করান হচ্ছে তখন যেখানে খুশি নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মা গঙ্গার ওই বেগকে ধারণ করে রাখার ক্ষমতা তো থাকতে হবে। পূণ্য না থাকলে এই ধারণ করা ক্ষমতা হয় না। পূণ্য আর পূণ্যের যে ফল এই দুটো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র এটাই পরশুরামকে বলছেন, আপনি বলুন, আপনার পূণ্যটা শেষ করে দেব নাকি পূণ্যের ফলটা নাশ করে দেব। পূণ্যের ফল হল, পরশুরামের নিবাস ছিল মহেন্দ্রপর্বতে, মহেন্দ্রপর্বত থেকে যেখানে খুশী তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের মত চলে যেতে পারতেন।

পরশুরামের উপর আবার একটা অভিশাপ ছিল। যাঁরাই খুব শক্তিমান হন তাঁদের অনেক কিছু গোলমাল থাকে। পরশুরামেরও কিছু একটা গোলমাল ছিল, যার জন্য তাঁর উপর অভিশাপ ছিল যে, মহেন্দ্রপর্বতের বাইরে কোথাও রাত্রিবাস করলেই তিনি মারা যাবেন। সেইজন্য যে করেই হোক সন্ধ্যের আগেই তাঁকে মহেন্দ্রপর্বতে পৌঁছে যেতে হত। পরশুরাম তাই বলছেন, হে রামচন্দ্র, তুমি যদি আমার পূণ্যের ফলটা নিয়ে নাও তাহলে তো আমি শেষ হয়ে যাব, কেননা আমাকে যেভাবেই হোক মহেন্দ্রপর্বতে পৌঁছাতে হবে। সেইজন্য তুমি আমার পূণ্যটাই নাশ করে দিন। পরশুরাম এই কথা বলার পরই শ্রীরামচন্দ্র ওই সঙ্কল্প করে ধনু থেকে তীরটা ছেড়ে দিলেন। ওতেই পরশুরামের সব পূণ্য নাশ হয়ে গেল। পরশুরামের তো সব পূণ্য নাশ হয়ে গেল, এবার তিনি কি করবেন? কিন্তু ঐ পূণ্য কর্মটুকু একটু থেকে গেল, পূণ্যটা নাশ হয়ে যাওয়ার পর ওই কর্মটুকুও কদিন পরে শেষ হয়ে যাবে, যদি না আবার তপস্যা করে পূণ্যের সঞ্চয় করতে শুরু করেন। পরশুরাম তাই মহেন্দ্রপর্বতে ফিরে গেলেন তপস্যা করার জন্য। ফিরে যাওয়ার আগে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, অনেকদিন আগে আমি একবার তপস্যা করছিলাম তখন আপনি আমাকে দর্শন দিয়ে কৃপা করেছিলেন। বিষ্ণুর যখন আমার দর্শন হয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম, এই বলে পরশুরাম স্তুতি করছেন। এখানে এসে অধ্যাত্ম রামায়ণ আবার বেদান্তে ঢুকে যাচ্ছে।

পরশুরাম বলছেন, হে রাম! আমি বুঝেছি আপনিই সেই বিষ্ণু, আপনি আমাকে এই শক্তি দিয়েছিলেন, আজ আপনিই সেই শক্তি ফেরত নিয়ে নিলেন কারণ আপনার কাজ হয়ে গেছে। পরশুরাম তখন স্তুতি করে বলছেন –

রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বং পরমেশ্বরম্।
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্।১/৭/১৮
বাল্যেহহং তপস্যা বিষ্ণুমারাধয়িতুমঞ্জস্য।

হে মহাবাহো শ্রীরাম! আমি জেনেছি আপনি সেই পরমেশ্বর। অবতারবাদ হিন্দু শাস্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য ধর্মেও অবতারবাদ আছে কিন্তু হিন্দু ধর্মে যেভাবে অবতারবাদকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্যান্য ধর্মে সেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়নি। খ্রীশ্চান ধর্মে যীশুকে Son of God বলছে, কিন্তু খ্রীশ্চান ধর্মেরই বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে যাঁরা যীশুকে ভগবানেরই সমান মর্যাদা দেন, তাঁরা বলেন ঈশ্বর আর ঈশ্বরের পুত্র এক। কথামৃতে ঠাকুর বলছেন, ভগবান যিনি অনন্ত তিনি নরদেহ ধারণ করে লীলা করবেন মন এই জিনিসটা মানতে চায় না। হিন্দু ধর্মের পরিবারে জন্ম নিয়ে ছোটবেলা থেকেই মুখে বলে যাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আর ইদানিং কালে ঠাকুরের ভক্ত পরিবার আর তাদের পরিবারের লোকেরা মুখে বলছে ঠাকুর ভগবান। কিন্তু ঠাকুরকে নিয়ে বা যে কোন অবতারকে নিয়ে পুরোদমে সাধনায় নেমে যাওয়ার পর আমাদের মনে অনেক ধরণের প্রশ্ন জেগে ওঠে। দুজনের মধ্যে প্রশ্ন জাগবে না, অজ্ঞানীরা কিছুই বুঝতে পারে না বলে কোন প্রশ্নও করে না। জ্ঞানী যাঁরা তাঁর সব কিছু জানেন বলে কোন প্রশ্ন করবেন না।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। বিভিন্ন কারণে ফাইনম্যানকে কয়েকবার ব্রাজিলে যেতে হয়েছিল। ব্রাজিলের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল এখানে কিছু দিন অধ্যয়ন করানোর জন্য। উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, পরীক্ষার সময় ছিলেন, পরীক্ষার খাতা দেখেছেন, ইন্টারভিউ নিয়েছেন। কাজ করতে করতে ওনার বারবার মনে হচ্ছিল এখানকার শিক্ষা পদ্ধতিতে কিছু একটা গোলমাল আছে। মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফিরে যাওয়ার সময় ওখানকার সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষরা ওনাকে অনুরোধ করলেন এখানকার শিক্ষা পদ্ধতির উপর একটা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য, শিক্ষা পদ্ধতিতে কোথায় ত্রুটি, কোন কোন জিনিসের ঘাটতি, এসবের উপর একটা রিপোর্ট দিতে বললেন। রিচার্ড ফাইনম্যান নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, কিন্তু উনি একটু খামখেয়ালী ধরণের মানুষ ছিলেন, লোকেরা একটু খ্যাপাটে ধরণের মনে করত। উনি প্রথমেই বললেন, আমি যা যা বলতে চাই সব বলতে পারি তো? অবশ্যই বলবেন, আপনার সাজেশান আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব। যেখানে তিনি তাঁর মতামত দেবেন সেখানে ব্রাজিলের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী এসেছেন এবং শিক্ষা জগতের অনেক গণ্যমান্যরাও এসেছেন। বলতে উঠে প্রথম কথাই বলছেন, ব্রাজিলে কোথাও বিজ্ঞান পড়ান হয় না। শুনে সবারই মাথায় হাত, সরকার এত এত টাকা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য খরচ করছে, এখান থেকে এত এত বিজ্ঞানের স্নাতক তৈরী হচ্ছে অথচ উনি বলছেন ব্রাজিলে বিজ্ঞান পড়ান হয় না। ফাইনম্যান বলছেন, বিজ্ঞানের মাধ্যমে এখানে ইংরাজী ভাষা পড়ান হয়। ব্রাজিলের ভাষা পর্তুগীজ কিন্তু বিজ্ঞান ইংরাজীতে পড়ান হয়। তারপর উনি অনেক দৃষ্টান্ত দিতে শুরু করলেন। দৃষ্টান্ত দিতে দিতে উনি একটা খুব সুন্দর ঘটনা বলছেন। একবার উনি এক দেশে গেছেন সেখানে সবাই গ্রীক পড়ে অর্থাৎ সক্রেটিস, প্লেটো এদের পড়ে। সেটা দেখে তিনি খুব অবাক হয়ে গেছেন, আমাদের এখানে কেউ গ্রীক পড়ে না, কিন্তু এখানে সবাই গ্রীক পড়ছে। উনি ওদের জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা তোমরা বল তো সক্রেটিস সত্যম্ (Truth) আর সুন্দরম্ (Beauty) এই দুটোর মধ্যে কি সম্পর্কের কথা বলেছেন? আচার্য শঙ্কর সচ্চিদানন্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন যেটাই সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ, যেটাই আনন্দ সেটাই সৎ। সক্রেটিসেরও ঠিক একই ভাব ছিল, এর উপর সক্রেটিসের বিরাট আলোচনা আছে। পাশ্চাত্য দর্শনও এই জিনিসগুলোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করার পর কেউই কোন উত্তর দিতে পারছে না। তখন ওনার হঠাৎ মনে হওয়াতে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা তোমরা বলতো Third Symposiumএ কি আছে? ছেলেরা সব গড়গড় করে শুনিয়ে দিল। Third Symposiym হল Truth আর Beautyর উপর আলোচনা। যখন Truth আর Beautyর relation সম্বন্ধে বলতে বলা হল তখন কোন উত্তর দিতে পারছে না। কিন্তু যখন Third Symposium সম্বন্ধে বলতে বলা হল তখন পুরোটা শুনিয়ে দিচ্ছে। যেমন আমাদের যদি বলতে বলা হয় আদর্শ ভক্তের কি কি লক্ষণ হবে আমরা তখন আর কোন উত্তর দিতে পারব না। কিন্তু গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে কি বলছেন বলতে বললে গড়গড় করে শুনিয়ে দেব। তার মানে বিষয়টা মুখস্ত

করে নিয়েছে কিন্তু কিছুই বোঝেনি। উনি একটা একটা করে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলে দিচ্ছেন শিক্ষা পদ্ধতিতে কোথায় কোথায় গলদ। বলছেন ছাত্রদের দেখলাম ওরা কখনই ক্লাশে কোন প্রশ্ন করে না। পরে ওদেরকে বলাতে ওরা বলছে, আমরা এখানে শিখতে এসেছি, শিক্ষক যা বলছেন সেটা শোনার জন্য এসেছি, প্রশ্ন করে আমরা সময় নষ্ট করতে চাই না। ফাইনম্যান বলছেন প্রশ্ন যদি না করে কি করে তারা একটা জিনিসকে বুঝবে। প্রশ্ন করাতে এদের প্রথম আতঙ্ক সবাই বলবে তুমি সময় নষ্ট করছ, আরও বাজে, বাকিরা জেনে যাবে যে আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমি ছেলেদের বলেছি পরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে, তাও তারা কক্ষণ করবে না। কেন করবে না? আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে যাব? আমি কি আমার বন্ধু থেকে অজ্ঞ? যে জাতি প্রচুর নির্যাতিত হয়েছে তাদের এই রকম স্বভাবই হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে নিজেকে বিরাট মনে করে।

আমাদের বুদ্ধির ব্যাপারে খুব বিচিত্র অহঙ্কার। কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কাছে কিছু টাকা আছে? তার কাছে যদি টাকা না থাকে সে বলবে না নেই। যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি সবার থেকে সুন্দর দেখতে? যদি সে জানে সে সুন্দর নয় বলবে আমি সবার থেকে সুন্দর নই। যা যা জিজ্ঞেস করা হবে সবটাই বলবে, না। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমার বুদ্ধি আছে? এখানে এসে সবাই মনে করে আমার চাইতে বুদ্ধিমান এই জগতে আর কেউ নেই। আমরা অনেকেই হয়ত মানতে চাইব না, কিন্তু এটাই বাস্তব। জগতে প্রত্যেকটি মানুষ মনে করে আমার মত বুদ্ধিমান এই জগতে কেউ নেই। একটা অল্প বয়সী ছেলেও নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে, সেইজন্য কখন কোন প্রশ্ন করতে চায় না, কোন আলোচনা করতে চায় না। একজন নিজের একটা ঘটনা বলছিলেন, উনি খুব পণ্ডিত এবং অনেক বইও লিখেছেন। উনি যেখানে থাকতেন সেখানে ওনার ঘরে তিনি কখন তালা লাগাতেন না। উনি হয়ত ঘরের বাইরে চা খেতে গেছেন সেই সময় অল্প বয়সী তাঁর এক ছাত্র লুকিয়ে ওনার ঘরে ঢুকে দেখতেন উনি কি কি ধরণের বই পড়েন। বইয়ের নামগুলো তাড়াতাড়ি লিখে পরে লাইব্রেরী থেকে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করত। কিন্তু ছাত্রটি সরাসরি সামনে এসে যে বলবে আপনি কি বই পড়েন আমার খুব জানার ইচ্ছে, সেই আগ্রহটাই নেই। আমার মত বুদ্ধিমান আর কেউ নেই, এই জিনিসটা আমাদের ভেতরেই ঢোকান আছে। প্রশ্ন করার আগ্রহ না এলে বিষয়ের জ্ঞান ভেতরে বসবে না।

অবতারবাদ নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, আমরা কিন্তু সবাই জেনে বসে আছি অবতারবাদ কি, আমি জানি ভগবান মানুষ হয়ে আসতে পারেন। কোন বিষয়কে নিয়ে আমরা যখন পড়াশোনা করতে যাই, যেমন বিজ্ঞান নিয়ে কেউ পড়ছে, তখন দেখা যাবে একটা পাতাও আমরা বুঝতে পারছি না। ঠিক তেমনি আমরা যখন সাধন-ভজন, জপ-ধ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে যত এগোতে থাকব তত আমাদের সন্দেহ বাড়বে। এই জিনিসটা সত্যিই আশ্চর্যের, আর অনেকেই এই কথা বলে গেছেন, the more I learn the more I know that I know nothing। সক্রেটিসকে খোঁজ নিতে বলা হল এথেন্সে সব থেকে জ্ঞানী ব্যক্তি কে। তখনকার দিনে কিছু দেবী মন্দিরে থাকতেন যাঁরা দৈববাণী করতেন। সক্রেটিস বহু কষ্টে পাহাড়ে উঠে সেই মন্দিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এথেন্সে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত কে? দৈববাণী হল সক্রেটিস। সক্রেটিসের মাথায় চিন্তা এসে গেল, আমাকেই কেন বড় পণ্ডিত বলছে! ওখান থেকে তিনি নেমে আসছেন, পাহাড় থেকে নামতে নামতে হঠাৎ তাঁর মনে হল দৈবাবাণী কখনই ভুল হবে না। কিন্তু আমাকেই কেন বলতে গেল! তখন উনি অনেক চিন্তা করতে করতে বুঝতে পারলেন, এথেন্সের বাকিরা সবাই মনে করে তারা সব জানে, কিন্তু আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না, সেইজন্য আমি সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। কেনোপনিষদেও ঠিক এই ভাবটাই আছে, যে মনে করে ঈশ্বরকে জানে সে জানে না, যে জানে যে জানে না সেই জানে। প্রথম প্রথম কেনোপনিষদের এই মন্ত্র পড়তে গেলে মন্ত্রে কি বলতে চাইছে কিছুই বুঝতে পারা যায় না। কারণ ঈশ্বর অনন্ত, যিনি অনন্ত তাঁকে কখনই জানা যায় না। অবতার তত্ত্ব আরও বেশি জটিল। রাজযোগে বা উপনিষদে যে আত্মতত্ত্বের কথা বলা হয়, বহু কষ্টে তাও ধারণা করা যায়। কিন্তু ভক্তি তত্ত্বকে বোঝা অসম্ভব। অথচ আমরা মনে করি ভক্তি তত্ত্ব, ভক্তির ব্যাপারটা খুব সহজে বোঝা যায়। নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা করা খুব সহজ। কিন্তু সেই নির্গুণ নিরাকার আবার একটা শরীর ধারণ করে অবতার হয়ে মানবলীলা করেন এ ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। ঠাকুর অবতার, শ্রীরামচন্দ্র অবতার কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে দেওয়া অত্যন্ত সহজ। এই কারণেই সহজ, অবতারতত্ত্ব কিছুই বোঝা যায় না। নামকরা ইংরাজী কথা fools rush in where angels fear to tread, দেবতারা যেখানে ঢুকতে ভয় পান মুর্খরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অবতার তত্ত্ব বোঝা খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব। পরশুরামই প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিন্তু পরে বলছেন *রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বং পরমেশ্বরম্*, হে রাম! আমি জেনেছি আপনি সেই পরমেশ্বর। যাঁকে এক সেকেণ্ড আগে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বাণ জানাচ্ছে আর তার পরের সেকেণ্ডেই তাঁকে বলছেন, আমি বুঝেছি আপনিই সেই পরমেশ্বর। এ কি করে সম্ভব হতে পারে? আসলে সাধনা করতে করতে মন একটা পরিপূর্ণ অবস্থায় চলে যায়, যেমন কোন solution super saturated অবস্থায় চলে যায়, তার বাকি সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেছে শুধু বাইরে থেকে একটা ফিটকারি দিয়ে দিলেই crystal form করে যাবে, ঠিক তেমনি সাধন ভজন করতে করতে মন এমন super saturated solutionএর মত হয়ে গেছে যে সেখানে জ্ঞানের একটি বাক্য শুধু বাকি থাকে, সেটা যে শুধু বাক্য দিয়ে আসবে তা নয়, যে কোন ভাবেই আসতে পারে। পরশুরাম যেমনি শ্রীরামচন্দ্রের ওই শক্তি দেখলেন, ওই শক্তি তো সেখানে অনেকেই দেখলেন, রাজা দশরথ দেখলেন, লক্ষ্মণও দেখলেন কিন্তু কই আর তো কেউ বললেন না আপনি ভগবান, তাহলে পরশুরাম কেন বললেন? কারণ তাঁর প্রস্তুতি হয়ে গিয়েছিল, তপস্যা করে করে তিনি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, ওই একটা জিনিস দেখেই তিনি বুঝে গেলেন আপনি ভগবান। স্বামীজী যখন বলছেন ঠাকুর ভগবান, তিনি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। বাকিরা যাঁরা বলছেন সবারই মুখের কথা। আমি আপনি যে বলছি ঠাকুর ভগবান এগুলো সব আমাদের মুখের কথা, এই কথার কোন দাম নেই। কিন্তু যিনি তপস্যা করেছেন, প্রচুর সাধন ভজন করা হয়ে গেছে তাঁর মনও প্রস্তুত হয়ে আছে, এরপর তাঁর শুধু দরকার একটি বাক্য, একটি ইঙ্গিত বা একটা চোখের চাহনি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান হয়ে যাবে। পরশুরামের ঠিক one strokeএ সেই জ্ঞানটা হয়ে গেল। উপনিষদেও অনেকবার বলছেন উত্তম শিষ্যকে একবার শুধু বলে দিলেন তত্ত্বমসি, তুমিই সেই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। এখানে তত্ত্বমসি বলেননি, এখানে স্বরূপ প্রাকট্য করে দিলেন। স্বরূপ প্রাকট্য মানে, ধনুষ তুললেন, তীর সন্ধান করলেন, এতেই পরশুরামের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। বাকিরা যাঁরা ওখানে ছিলেন তাঁরা কিন্তু জ্ঞান পেলেন না। রঘুবংশের সবাই আছেন, কৌশল্যাও আছেন, ভরত, শত্রুঘ্ন সবাই আছেন, কিন্তু জ্ঞান একমাত্র পরশুরামই পেলেন। শ্রীরামের প্রতি তাঁদের পারিবারিক ভালোবাসাটুকুই আছে। তারও আগে অহল্যা এই জ্ঞান পেয়েছিলেন, কারণ তিনিও সাধনা করে সেই অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

এসব শাস্ত্রকে আমরা যত সহজ মনে করি ততটা সহজ নয়। রামকথা ছোটবেলায় আমরা বাবা-মা-ঠাকুরমার কোলে বসে শুনেছি, বড় হয়ে অমর চিত্রকথায় পড়েছি, আর এখন টিভি সিরিয়ালে দেখছি সবই তো দেখা হয়ে গেল। রামকথা তো সুপারম্যান, এ্যস্ট্রিক্সের বা টিনটিনের মত কথা কাহিনী নয়, রামকথার মধ্য দিয়ে তত্ত্বকথা চলে। বিশেষ করে এখানে যে অবতার তত্ত্ব চলছে এই তত্ত্বকে ধারণা করা সত্যিই খুবই কঠিন। আমি আপনি সারা জীবন শ্রীরামচন্দ্রের কি নিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছি? তিনি একা এত এত অসুর নিধন করলেন। তত্ত্বের দিক দিয়ে এগুলো কিছুই নয়, রামকথা অনেক গভীরে চলে। পরশুরাম শ্রীরামকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, দম থাকে তো এই ধনুকে জ্যারোপণ করে দেখাও। শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে লাগিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তাতে পরশুরামের জীবনটাই শেষ হয়ে গেল, তাঁর সব পূণ্যের নাশ হয়ে গেল। কিন্তু তাও বলছেন *রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বং পরমেশ্বরম্*, হে রাম! আমি বুঝতে পেরেছি আপনিই সেই পরমেশ্বর। যিনি তার সব শক্তি কেড়ে নিলেন, তার সব কিছুকে নাশ করে দিলেন, সেকি তাঁর কখন প্রার্থনা করতে যাবে! আমরা হলে বলতাম, তুমি আমার জীবন শেষ করে দিলে, ঠিক আছে একদিন আমারও সময় আসবে সেদিন আমিও তোমাকে ছাড়ব না, আমিও তোমাকে দেখে নেব। পরশুরামের সব ক্ষমতা নাশ করে দেওয়ার পর তিনি তো বলতে পারতেন, ঠিক আছে আমার সব পূণ্যকে নাশ করে দিয়েছ তো, এই আমি তপস্যায় চললাম, তুমি অপেক্ষা কর এরপর আমি তোমাকে দেখে নেব। পরশুরাম তা বলছেন না, তিনি বলছেন *রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বং পরমেশ্বরম্*।

আর তাই না, বলছেন *পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্*, আপনাকে আমি সেই পুরাণ পুরুষ রূপে দেখছি। *পুরাণপুরুষ* মানে সেই আদি পুরুষ। পুরুষ মানে, এই দেহটা যেন একট নগরী, পুর মানে নগরী, এই নগরীতে বা পুরে যিনি শয়ন করেন তিনি পুরুষ বা অন্তর্যামী, আপনি সেই আদি পুরুষ। পুরাণ আবার হয় আমাদের যে পুরাণাদি শাস্ত্র আছে, পুরাণ বলা মানে অনেক পুরনো কিন্তু এখনও নতুনের মত। যিনি সেই আদি পুরুষ যিনি সবারই হৃদয়ে দেহ রূপ পুরে বাস করছেন। ভগবান বিষ্ণু তিনিই আদি পুরুষ। আর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কি রকম? *জগৎসর্গলয়োদ্ভবম্*, এই জগতের সৃষ্টি, পালন আর তার সংহার এই তিনটিই আপনি করেন। এই কথা বলার পর পরশুরাম বলছেন, আমার যখন অল্প বয়স ছিল তখন আমি চক্রতীর্থে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর

আরাধনা করেছিলাম। চক্রতীর্থ বলতে ঠিক কোন জায়গার কথা বলছেন আমাদের জানা নেই। অনেকে বলেন পুরীতে জগন্নাথ তীর্থে চক্রতীর্থ নামে একটা জায়গা আছে সেখানকার কথা বলছেন। কিন্তু এই নামগুলো খুব সাধারণ নাম, সারা দেশে অনেক জায়গাতেই এই নাম পাওয়া যায়। পরশুরাম বলছেন, তখন এমন তপস্যা করছিলাম যে সেই সময় আদিপুরুষ ভগবান বিষ্ণু আমাকে কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন। কি রূপে দর্শন দিয়েছিলেন? *শঙ্খচক্রগদাধরঃ*, যিনি দেবেশ যাঁর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম, তিনি এসে আমায় দর্শন দিয়েছিলেন। সাধনা করে করে যাঁরা অনেক গভীরে চলে যান, যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণ নির্মল হয়ে যায় তখন তাঁদের সেই নির্মল হৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান যখন হয় তখন ওনাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল হয় যে এই জ্ঞান মনের ভেতরে হচ্ছে না বাইরে হচ্ছে। এটাই ঠিক ঠিক জ্ঞান। তপস্যা যদি ঠিক ঠিক করা না থাকে, তপস্যা না করে যদি এই ধরণের কোন সিদ্ধি লাভ হয় তাহলে বুঝতে হবে ওই জ্ঞানে কিছু গোলমাল আছে। এরপর পরশুরামের লম্বা কাহিনী, এতে আমাদের গিয়ে কাজ নেই।

কার্তবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি বিরাট শক্তির অধিকারী ছিলেন। কার্তবীর্য্য কিভাবে কিভাবে পরশুরামের বাবাকে বধ করে দিয়েছিল। সেখানেও শ্রীরামচন্দ্রের সাথে এখানে যে রকম হয়েছিল কার্তবীর্যের সাথেও একই জিনিস হয়েছিল। কার্তবীর্যকে বধ করতে হবে, কিন্তু পরশুরাম তাঁকে বধ করতে পারবেন না। পরশুরাম তখন তপস্যা করেছেন। আমরা মনে করি জীবনে সাফল্য লাভ করা খুব কঠিন, কিন্তু আমরা জানি না যে জীবনে সফল হওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। আমাদের দেশে ভিক্ষা চাওয়ার প্রথা কখনই ছিল না, এখানকার প্রথা হল তপস্যা। তুমি কোন কিছু পেতে চাইছ, তপস্যা কর। ভিক্ষা করে, কারুর দাসত্ব করে কিছু পাওয়ার মানসিকতা আমাদের মধ্যে আগে কখনই ছিল না। আমি নিজেকে এই জিনিসটা পাওয়ার যোগ্য মনে করি, আমি এটা পাব। বেদে যত মন্ত্র আছে, যত সূক্ত আছে সেখানে ব্রাহ্মণ বলছেন আমি সকাল বিকাল তোমার আরাধনা করেছি, এটা পাওয়ার অধিকার আমার আছে। তপস্যা করে পেয়েছেন, ভিক্ষা করে নয়। আমাদের টাকা-পয়সা চাই, পদোন্নতি চাই, মর্যাদা চাই, তপস্যা করে এগুলো পাওয়ার জন্য আমি নিজেকে যোগ্য করেছি। নববধু শ্বশুড় বাড়িতে এলে প্রথমেই তাকে সব অধিকার দিয়ে দেওয়া হয় না, তাকেও স্বামীর বাড়িতে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্বশুড় বাড়ির জন্য তপস্যা করতে হয়।

প্রবাহিত জলের ধারাকে বাধা দিলে জল ডান দিক বা বাম দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। ডান দিক আর বাম দিককেও যদি আটকে দেওয়া হয় তখন জল নিজের শক্তি সঞ্চয় করে। জলের জীবনকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে দেওয়া হল। জল যদি কম হয় তাহলে কিছু দিন পরে শুকিয়ে যাবে। জল যদি ক্রমাগত জমতে থাকে তখন সে শক্তি সঞ্চয় করে। শক্তি সঞ্চয় করতে করতে একদিন বাঁধের উপর দিয়ে উপচে বেরিয়ে যায়। জীবনে যখনই কোন বাধা আসে তখন নিয়মই হল শক্তি সঞ্চয় করা। বাড়িতে অসুখ বিসুখ লেগে আছে, অশান্তি চলছে, দারিদ্রতা কিছুতেই যাচ্ছে না, তপস্যা করুক, কিছু দিনের মধ্যে সব সমস্যা চলে যাবে। রোগভোগ, অশান্তি মানে তার ভেতরের আধ্যাত্মিক শক্তি এখন কমে গেছে। তপস্যা করে এবার আধ্যাত্মিক শক্তিকে বাড়িয়ে দিক, সমাজ এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে যাবে। গান্ধীজী ঠিক তাই করলেন। তিনি পুরো দেশকে সঞ্চালিত করতে চাইলেন। তিনি তপস্যা করলেন, আর এমন তপস্যা করলেন যে সারা দেশ তাঁকে জাতির জনকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। জওহরলাল নেহরু বলছেন, দেশের লোককে যদি মানাতে হয় তাহলে আমাকে একটি লোককে শুধু মানাতে হবে, তিনি হলেন গান্ধীজী। গান্ধীজী যদি হ্যাঁ বলে দেন সারা দেশ হ্যাঁ বলে দেবে। আমাদের ঋষিরা যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই শিক্ষাতে লক্ষ্য বলে কিছু নেই, আছে শুধু আদর্শ। সেই শিক্ষাতে বলছে তুমি লক্ষ্যের দিকে তাকিও না, তাকাবে আদর্শের দিকে।

বর্তমান কালের এটাই সমস্যা। অসুরদের সব সময় ছিল goal setting করা, গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে বলছেন, *অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি*, একে মেরেছি, এবার ওকে মারব, একে জয় করেছি, এটা পেয়েছি, এবার ওটা পেতে হবে, এগুলো হল goal setting। আদর্শ মানে হয় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আমার আদর্শ হল বিদ্যা বা আমার আদর্শ হল সেবা। কেউ হয়ত অফিসে কাজ করছে, তার আদর্শ হল সেবা। আট ঘন্টা একটা বিশেষ কাজ করছে বলে তাকে একটা মাইনে দিচ্ছে। এই মাইনে নিয়ে সে কি করবে? নিজের আর পরিবারের পেট চালাবে, এর বেশি তার কোন দাম নেই। লক্ষ্য হল অফিসে কাজ করা, এটা কখন কারুর আদর্শ হতে পারে না, সংসার চালাতে হবে তাই। তাহলে এখানে job satisfaction বলে কিছু হতে পারে কখন? এসব

সংস্কৃতি পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসে আমাদের সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমাদের এখানে job satisfaction বলে কিছু ছিল না, আমাদের কাছে ছিল ধর্ম, আমাকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। যখন সে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তখন সে বলছে আমার যে কটি টাকা এসেছে তাতে আমার খাওয়া-পড়া চলে যাবে। এবার আমি পুরোপুরি জপ-ধ্যান করব। জপ-ধ্যান করে তপস্যার যে ফল আসবে সেটা কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, তার অন্তর্জগতের উন্নতিতে যাবে। ওই তপস্যার ফল তাকে আরও ঠেলে উপরে উঠিয়ে দেবে। সেটাও তো তপস্যা, তার ফল কি হবে? আরও ঠেলবে। ঠেলতে ঠেলতে তাকে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাবে। আত্মজ্ঞান হলে কি হবে? এটাই তো আমার আদর্শ ছিল, আমি তো নিজেকেই জানতে চাইছিলাম।

বলে সূর্যে নাকি সব সময় এ্যটম বোমা ফাটছে। এ্যটম বোমা কখন ফাটে? যখন fusion হয়, যখন জিনিসটা ভাঙে। এ্যটম বোমা ফাটছে বলে হাইড্রোজেন বোমা ফাটছে। ওই তাপে আবার কিছু কিছু এ্যটম আছে যেগুলো নিজেদের মধ্যে মিশে গিয়ে আবার fusion হয়। এগুলোকে বলে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ হওয়া। অনবরত সূর্যে এ্যটম বোমা আর হাইড্রোজেন বোমা ফাটছে। হাইড্রোজেন বোমাগুলো ফাটছে বলে আবার এ্যটম বোমাগুলো ফাটছে। সব সময় একটা chain লেগে আছে। আমাদের জীবনেও ঠিক তাই হয়। কেউ যখন সাধনা করছে, তপস্যা করছে তার শক্তি বাড়ছে। ওই শক্তি সে যদি নাম-যশ বা অর্থোপার্জনে লাগিয়ে দেয় তাতে তার অর্থ আসবে, কিন্তু ওখানেই তপস্যার ফল শেষ। আরেকজন বলল আমি আমার তপস্যার ফল কোথাও লাগাব না। তাহলে কোথায় রাখবে? নিজের ভেতরেই রাখব। নিজের ভেতরে রাখলে কি হবে? তপস্যা করার ক্ষমতাটা বেড়ে যাবে। তপস্যার ক্ষমতা বেড়ে গেলে কি করবে? আরও জোর তপস্যার শক্তি আসবে, এভাবে হতে হতে আত্মজ্ঞান এসে যাবে। ঠাকুরের জীবনকে যদি আমরা দেখি, তিনি প্রথম যেদিন থেকে তপস্যা শুরু করলেন, তাঁর মধ্যেও নানান রকমের শক্তি বাড়ছে। তাঁকে রাণী রাসমণী মানছেন, মথুর বাবু মানছেন। ওখানেই যদি ঠাকুরের তপস্যা থেমে যেতে তাহলে কি হত? একজন ভালো সাধু হয়েই থাকতেন, বেশ টাকা-পয়সা হত। ঠাকুর বলছেন, জগৎ যদি সত্য হত তাহলে কামারপুকুরকে আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতুম। পুরো কামারপুকুর না হোক নিজের খড়ের চালা ঘরকেই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে নিতেন, ইদানিং বাবাজীরা যেমন করে যাচ্ছেন। ঠাকুর তা না করে ওই শক্তিকে আবার তপস্যার মধ্যে ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। হতে হতে একটা সময় এমন হত তিনি কলকাতার সবচেয়ে বড় সাধু হয়ে যেতেন। কিন্তু তিনি তাও করলেন না। ওটাকেও তপস্যার মধ্যে লাগিয়ে দিলেন। তপস্যার যা ফল আসছে সব ওতেই ঢেলে দিচ্ছেন। করতে করতে আজ তিনি বিশ্ববন্দিত অবতার হয়ে গেলেন। ঠাকুরকে মানুষ রূপে দেখে তাঁর সাধনাকে যদি বিশ্লেষণ করা হয় তখন এই চিত্রটাই পাওয়া যাবে।

ইদানিং একটা নতুন শব্দ এসেছে Corporate Social Responsibility, সংক্ষেপে CSR। দেশে নিয়ম করা হয়েছে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে সবাইকে সমাজের সেবার কাজে একটা percentage ছাড়তে হবে, বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। তখন সবাই বড় বড় ট্রাস্ট তৈরী করে সব টাকা ওই ট্রাস্টে দিয়ে দেয়, ওই ট্রাস্ট থেকে টাকাটা আবার নিজেরা ঘুরিয়ে নিয়ে নেয়। সবাই এখানে CSRএর নিয়মকে কায়দা করে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে। টাটা কোম্পানি কিন্তু তা করছে না, তারা Social Responsibilityর ব্যাপারে খুবই সজাগ। আজকে অনেকেই বলছেন সমাজের কাজ ঠিক ঠিক একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন করছে আর করছে টাটা, ওখানে কোন দু নম্বরী নেই। রতন টাটা এক সাক্ষাৎকারে বলছেন আমরা Corporate Social Responsibility সততার সাথে করছি বলে আমাদের সুনাম হচ্ছে। সুনাম হওয়ার জন্য আমাদের ব্যবসা বাড়ছে, ব্যবসা বাড়ার জন্য CSRএ আরও টাকা যাচ্ছে, তাতে আমরা আরও বেশি লোকের ভালো করছি, তাতে আমাদের ব্যবসা আরও বাড়ছে, সমাজের কল্যাণ আরও বেশি হচ্ছে, সমাজের কল্যাণ যত বেশি হচ্ছে আমাদের মুনাফাও তত বাড়ছে, উনি বলছেন it has become a virtuous cycle। তপস্যাতে ঠিক একই জিনিস হয়। তপস্যার ফলকে যদি কামিনী-কাঞ্চন, নাম-যশে লাগিয়ে দেয়, পাওয়া যাবে, তপস্যার ফল কিনা। ব্যাঙ্কে সবারই টাকা থাকে, ব্যাঙ্কে টাকা রেখে যে সুদ পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়ে ইচ্ছে করলে কেউ জামা-কাপড় কিনতেই পারে। আরেকজন মনে করল সুদ যা পাওয়া গেছে এই টাকাটা আমি আবার ব্যাঙ্কেই রেখে দেব, তখন কম্পাউণ্ড সুদ হয়ে গেল। পাঁচ বছর পরে ওই টাকাটাই অনেক বেড়ে যাবে। তখন সুদটাও বেশি আসতে থাকবে। সেটাকেও ব্যাঙ্কেই ঢেলে দিচ্ছে। এইভাবে চলতে চলতে এক সময় সে দেশের বিরাট ধনীলোক হয়ে যাবে। তপস্যাতেও ঠিক তাই হয়। এটা কোন থিয়োরী নয়, বাস্তবিক তাই হয়। তপস্যা হল একটা জিনিসকেই নিষ্ঠার সাথে অনেক দিন করে যাওয়া।

তপস্যা আসছে *তপঃ* থেকে, তপস্যাতে নিজের ভেতরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। মায়েরা তার শিশুকে যে বড় করছে এটাই তাদের তপস্যা। তপস্যার কোন ভালো মন্দ হয় না। তপস্যার শক্তি তড়িৎ শক্তির মত নিরপেক্ষ। তড়িৎ শক্তিতে পাখাও চলছে, আলোও দিচ্ছে, হীটারে হীট তৈরী করে দিচ্ছে আবার ফ্রীজে সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে আবার ইলেক্ট্রিক চুল্লিতে মানুষকে ভস্মও করে দিচ্ছে। তপস্যার শক্তিও একেবারেই নিরপেক্ষ, তপস্যা একটা তাপ, ওই তাপে রান্নাও করতে পারবে, আবার কারুর বাড়িতে আগুনও লাগিয়ে দিতে পারে। পরশুরামও তপস্যায় নেমে পড়লেন। তপস্যায় নামার পর বলছেন –

উত্তিষ্ঠ তপসো ব্রহ্মন্ ফলিতং তে তপো মহৎ।
মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জাহ হৈহয়পুঙ্গবম্।
কার্তবীর্য্যং পিতৃহণং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ।১/৭/২১

হে ব্রাহ্মণ্! তুমি ওঠো, তোমার তপস্যা সফল হয়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, যাঁকে সামনে রেখে তপস্যা করছেন তিনি এসে বলছেন তোমার তপস্যা সফল হল, তোমার সাধনা সফল হয়েছে ইত্যাদি। এমনকি রাবণের মত দুষ্ট লোক শিবের আরাধনায় নেমে গেল। আর এমন তপস্যা করল যে শিব এসে বলছেন, বল তোমার কি বর চাই। তপস্যায় নিজের শক্তিটাই বেড়ে যায়। তপস্যায় যে শক্তি অর্জিত হল, সেই শক্তি দিয়ে সে যা চাইবে সেটাই পেয়ে যাবে। *হৈহয়পুঙ্গবম্,* হৈহয় একটা বংশের নাম, সেই বংশের যিনি পুঙ্গব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ তাকে তুমি বধ কর। কিভাবে বধ করবে? তোমার শক্তি দিয়ে তাকে বধ করা যাবে না। *মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জাহ,* আমার চিদাংশ নিয়ে তুমি তাকে বধ করতে পারবে। চিদাংশ শব্দটা আবার খুব জটিল একটি শব্দ। চিদাংশের ধারণা প্রথম আসে ভাগবতে। কথামৃতে ঠাকুর থেকে থেকে বলতেন, অংশ না কলা। অংশ আর কলা ভক্তিশাস্ত্রেরই একটি ধারণা, কিন্তু কিভাবে এসেছে আমাদের জানা নেই। তবে ভাগবতে আছে, অধ্যাত্ম রামায়ণেও আছে আর ঠাকুর প্রচুর অংশ আর কলাকে ব্যবহার করেছেন। যারাই কলা আর অংশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারা সবাই নিজের বুদ্ধি দিয়েই দিয়েছেন। শাস্ত্রে যে এর ব্যাখ্যা আছে তাও নয়।

বেদান্তের দৃষ্টিতে আমরা যাকেই দেখব সে পূর্ণব্রহ্ম, কিন্তু শক্তির তফাৎ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন, মশাই! ঈশ্বর কি কাউকে বেশি শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন? বিদ্যাসাগরের কথা শুনে ঠাকুর প্রচুর কষ্ট পেলেন। পরে তিনি অন্যদের বলছেন, বিদ্যাসাগর অত বড় পণ্ডিত কিন্তু কেমন একটা কাঁচা কথা বলে ফেললেন। বিদ্যাসাগরকে ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, অবশ্যই তিনি কারুকে বেশি শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। তা নাহলে আমরা তোমাকে কেন দেখতে এলাম, তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে? তোমার মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে, বিশেষ শক্তি যদি না থাকে তাহলে তোমার কাছে লোকেরা কেন আসবে! গীতাতে ভগবান বলছেন, যেখানে যেখানে যা বিভূতি দেখবে বুঝবে সেখানে আমার শক্তির প্রকাশ বেশি। এটাই ঠাকুর খুব সহজ করে বলছেন, যাঁকে অনেকে গণে মানে বুঝবে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের বেশি প্রকাশ। ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ কতটা হয়? শক্তির প্রকাশ বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন রকম। কলা বলতে আমরা জানি ষোল ভাগের এক ভাগ, কলার হিসাবে দেখলে higher percentageএ হয়ে যাবে। Lower percentage হলে অংশ হবে, অংশ হলে যে কোন percent হতে পারে। কলার দিক থেকে হিসাব করলে ষোল ভাগের এক ভাগ মানে এক কলা, এইভাবে দুই কলা, তিন কলা, অষ্ট কলা, অষ্ট কলা মানে ঈশ্বরের শক্তির পঞ্চাশ শতাংশ। কিন্তু কারুর শক্তিকে যদি ঈশ্বরের এক শতাংশ হিসাবে করা হয় তখন এক কলার থেকে অনেক কম হয়ে যাবে। Lower percentageএ হিসাব করলে সেটাই অংশ হয়ে যাবে, তখন আর কলা বলা যাবে না। যদি কারুর শক্তি পয়েন্ট ফাইভ শতাংশ বলা হয় তার মানে শক্তির হিসাব আরও কমতে কমতে চলেছে। সবার ভেতরে যে চৈতন্য রয়েছে সেটা পূর্ণ, কিন্তু তাঁর প্রকাশে তারতম্য হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, each soul is potentially divine, potentially divineকে বাংলায় অনুবাদ করছেন অব্যক্ত ব্রহ্ম। প্রত্যেক মানুষ অব্যক্ত ব্রহ্ম, ব্যক্ত ব্রহ্ম নয়। অব্যক্ত ব্রহ্ম যে ব্যক্ত হন তখন কতটা ব্যক্ত হন? বলছেন, যখন ব্যক্ত হতে শুরু হয় তখন তা শক্তি রূপে প্রকাশ পায়। সাধু-সন্ন্যাসীদের দশ জন মানে, তাঁদের মধ্যে প্রকাশ বেশি, সেইজন্য সাধারণ মানুষ সাধু সন্ন্যাসীদের দেখলেই সম্মান করে। দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনিও একজন সন্ন্যাসীর সাথে দেখা করতে তাঁর আশ্রমে যান। নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন একবার আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেখানে একটা অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন। অনুষ্ঠানটি আবার আমেরিকাতে লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী মহারাজও এসেছেন,

স্টেজেই নরসীমা রাও স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। বিদেশীদের কাছে এটা বিচিত্র জিনিস, প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেশের রাজা তিনি একজন সন্ন্যাসীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবেন তারা ভাবতেই পারে না। সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেই শক্তির প্রকাশটা বেশী, যেখানে সবাই এসে মাথা নত করে, কারণ তিনি সব সময় ভগবানের চিন্তন মনন করে যাচ্ছেন। তাছাড়া বড় খেলোয়াড়, ফিল্মস্টার, বড় নেতা, সুবক্তা এদের মধ্যেও শক্তির প্রকাশ বেশী। সন্ন্যাসী আবার দুই প্রকার, একটা হল যেখানে প্রকাশ আছে আরেকটা হল তিনি একটা পরম্পরায় আছেন। আচার্য শঙ্কর বলছেন অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করে নিয়েছিলেন সেইজন্য সব ব্রাহ্মণদের মানুষ সম্মান করে, কারণ তাঁরা সেই অগস্ত্য মুনির বংশের লোক। সন্ন্যাসীরা একটা হলেন, যেখানে শঙ্করাচার্যের মত সন্ন্যাসী ছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের মত সন্ন্যাসী ছিলেন, সন্ন্যাসীরা সেই পরম্পরায় আছেন বলে তাঁকে সম্মান করছে। কিন্তু এই সম্মানকে যদি চিরস্থায়ী করতে হয় উপলব্ধি তাঁকে নিজেকে করতে হবে। সন্ন্যাসীরা এমনিই সম্মান পাবেন কারণ তাঁরা ওই পরম্পরায় আছেন। কিন্তু একজন সন্ন্যাসীকে যদি নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে ব্যক্তিগত সম্মান পেতে হয় তাহলে তাঁর চিদাংশকে প্রকাশ করতে হবে। চিদাংশকে প্রকাশ করা মানেই তপস্যা চাই।

এখানে শুধু অংশ বলছেন না, বলছেন *মচ্চিদংশেন* অর্থাৎ আমার চিতি অংশ। *মদাংশেন* বললে কোথাও কোথাও সংশয় হওয়ার সম্ভবনা এসে যায়, তার মানে ভগবান আছেন আর ভগবানের অংশ আছে, তাহলে ভগবান কখন এক রকম থাকবেন আবার কখন কয়েকটা অংশ বিহীন হয়ে যাবেন, এই গোলমাল হয়ে যাবে। ভগবানের যে চিতি, তাঁর যে চৈতন্য সেই চৈতন্যের অংশ। কিন্তু চিতি অংশ শব্দটাও পরস্পর বিরোধী শব্দ হয়ে যাবে, কারণ চৈতন্যের কখন অংশ হয় না। যে কোন পার্থিব বস্তুরই অংশ হতে পারে, চৈতন্যের অংশ হয় না। আনন্দের অংশও কখন হয় না। কিন্তু যদি কেউ বলে আনন্দের অংশ বা চিতির অংশ তার মানে বলতে চাইছে চৈতন্যের শক্তির প্রকাশ পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হচ্ছে না। ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন আর নরেনের খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, কেশবের যদি এক কলা থাকে সেখানে নরেনের ষোল কলা। তার মানে কেশব সেনের মধ্যেও চিতি রয়েছে কিন্তু তার প্রকাশ কেশব সেনের থেকে নরেনের মধ্যে অনেক বেশি। তাহলে ঠাকুরের মধ্যে কত প্রকাশ? ঠাকুরের মধ্যে অংশ কলা কোনটাই নয় সেখানে পূর্ণ। ওখানে কম বেশির কোন প্রশ্নই নেই কারণ ঠাকুরই সেই।

যদি ভক্তি তত্ত্ব দিয়ে বিচার করা হয় তাহলে ঈশ্বর কাউকে এক রকম শক্তি দেন আবার কাউকে আরেক রকম শক্তি দেন। ঠাকুর মা কালীর সামনে গিয়ে বলছেন, মা! ওকে এত কম শক্তি কেন দিলি? বলার পরেই বলছেন, ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে। আমরা ঠাকুরের এই জিনিসটাকে এভাবে দেখতে পারি। একজন সত্যিকারের ঠাকুরের কাজ করছেন, তিনি সমাজের সেবা ছাড়া কিছু বোঝেন না। আর এই জগতকে তিনি তাঁরই বিস্তার রূপে দেখছেন। এখন তাঁর মনে হচ্ছে তিনি অনেক কিছুই করতে পারছেন না, একটা বিরাট সেবাকেন্দ্র খুলতে চাইছেন, কিন্তু টাকা-পয়সা, লোকবলের অভাবে খুলতে পারছেন না। তখন তিনি খুব দুঃখ করে প্রার্থনা করে বলছেন, হে ঠাকুর! তোমারই তো কাজ করছি, আরেকটু শক্তি তো দিতে পারতে। যদি ঠাকুর এসে উত্তর দিতে চান, তিনি এসে বলতেন, তুমি আমারই কাজ করছ কিনা, তুমি যা করছ এতেই আমার হবে, বাকি কাজের জন্য অন্যরা আছে। একই প্রার্থনা ঠাকুর যখন মায়ের কাছে করছেন তখন তিনিই মাকে বলছেন, ও বুঝেছি এতেই তোর কাজ হবে। স্বামীজী যে কাজ করছিলেন সেই কাজের জন্য তাঁর বেশি শক্তির দরকার ছিল। এবার এটাকেই যদি বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে সব পূর্ণ ব্রহ্ম, কিন্তু অজ্ঞানের আবরণে চাপা আছে। যার মধ্যে ওই অজ্ঞানের আবরণ যত পাতলা হবে শক্তির প্রকাশ তার মধ্যে তত বেশি। আর যতক্ষণ পূর্ণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ ওই প্রকাশ কমতে বাড়তে থাকবে। একজন সাধুবাবার চারিদিকে খুব নামযশ হচ্ছে, কদিন পর দেখা গেল সব অন্য রকম হয়ে গেল। নামযশ হচ্ছে মানে তাঁর আবরণ গুলো সরে যাচ্ছে। নামযশ হতেই তিনি এবার কামিনী-কাঞ্চন ভোগে নেমে গেলেন, তখনই আবার আবরণ এসে গেল। যতক্ষণ পূর্ণ না হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ এই আবরণ কমতে বাড়তে থাকবে।

মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জাহ হৈহয়পুঙ্গবম্, আমার যে চিতি অংশ তোমাকে দিলাম এতেই তোমার কাজ হয়ে যাবে। যে কার্যোদ্ধারের জন্য তুমি তপস্যা করছিলে আমার এই চিতি অংশ দিয়েই তোমার সেই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে। এবার তুমি তপস্যা থেকে ওঠ, যাও, গিয়ে কার্তবীর্য্যকে বধ কর। আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে ঈশ্বরের চৈতন্যের প্রকাশ যার মধ্যে, সেই প্রকাশ দিয়ে কাউকে কি করে বধ করতে পারবে! আসলে এই জগতে যা কিছু সাফল্য আসে সবটাই আসে এই চিদাংশ দিয়ে। বিজ্ঞানের যা কিছু উন্নতি, সব চৈতন্য শক্তির জন্য,

টেকনলজিতে যা যা হচ্ছে সব চিদাংশের জন্য, যুদ্ধে যে জয়ী হচ্ছে চিদাংশের জন্য, সাহিত্য, শিল্প যা কিছু হয় সব চিদাংশের জন্য, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে অভ্যুদয় আসে চিদাংশের জন্য। সবারই মধ্যে চিদাংশ আছে, কিন্তু অংশ কিনা তাই কত কম শতাংশে পড়ে আছে, হিসাবে আসে না। যেমনি দেখা যাবে কারুর সামান্যতম একটু সাফল্য আসতে শুরু হয়েছে তখন বুঝতে হবে ওই অংশের মাত্রা এবার উপরের দিকে খুলতে শুরু করেছে। কিন্তু খুলে কত দূর আর যাবে, তখনও শতাংশের হিসাবে অনেক কম থাকে। কিন্তু একটু যদি তার ভূমিটা পাল্টে যায় তাতে তার সাফল্যে হেউটেউ হয়ে যাবে। ঠাকুর বলছেন, মা সরস্বতীর কিরণের একটু সামান্য কণা যার মধ্যে এসে যায় সে মহা পণ্ডিত হয়ে যায়। চিদাংশ যদি কারুর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে তার সব শক্তি এসে যাবে, শুধু মেধাই নয়, যদি এই শক্তিকে শারীরিক ক্ষমতা অর্জনের দিকে লাগায় সেখানেও সে জয়ী হবে। চিদাংশকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও এটা এভাবেই চলে। ঠাকুর হনুমান সিং পালোয়ানের উপমা দিচ্ছেন। সবার মধ্যে এমনকি এই জগতেও দু ধরণের শক্তি চলে, একটা আসুরিক শক্তি আরেকটি দৈবীশক্তি। দৈবীশক্তি যেখানে সামনে আসে তখন সেখানে চিদাংশের প্রকাশ বেড়ে গেছে বুঝতে হবে। দেবতারা যখনই দেখতেন আসুরিক শক্তির মোকাবিলা করা যাচ্ছে না, তখনই তাঁরা তপস্যায় নেমে যেতেন। আমরাও যখন আর কোন কিছুই করতে পারিনা তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে নানান ধরণের মানত করতে শুরু করি, কিন্তু মানতের প্রভাব এতই নগণ্য যে কোন ফল পাওয়া যায় না। আগেকার দিনের মায়েরা সন্তানের জন্য আর স্ত্রীরা স্বামীর জন্য তপস্যা করতেই থাকত। ওদের তপস্যা হল আজ এই উপোস, কাল সেই উপোস আর নানা রকমের ব্রত করে যেত আর যারা দীক্ষা নিয়েছে তারা প্রচুর জপ করে। বর্তমান কালের মায়েরা জানেই না তপস্যা কি জিনিস, তাদের সন্তানরাও সেই রকমই তৈরী হচ্ছে। মায়ের তপস্যাই সন্তানকে সব দিক থেকে সুরক্ষা দেয়।

এসব বলার পর ভগবান বিষ্ণু পরশুরামকে বলছেন, এরপর আমি যখন আবার শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হব তখন তুমি আমার একটা অন্য রূপ দেখতে পাবে, আর সীতাকেও তুমি জগজ্জননীর রূপে দেখতে পাবে। আগে থেকেই পরশুরামকে সব বলে দিচ্ছেন। আর বলছেন, তখন আমি তোমার এই চিদাংশ ফেরত নিয়ে নেব। চিদাংশ ফেরত নিয়ে নেওয়ার পর তুমি আবার তপস্যায় রত হয়ে যাবে। কারুর চিদাংশ ফেরত নেওয়া যায় কিনা ব্যাপারটা একটু বিভ্রান্তকর মনে হতে পারে। প্রথম প্রথম পৌরাণিক এই কাহিনীগুলো যারা পড়বে তাদের অনেক রকম বিভ্রান্তি হবে। পুরাণ পরশুরামকে অবতার বলছে, শ্রীরামচন্দ্রকেও অবতার বলছে। রামকথাতে রাম আর পরশুরামের লড়াই হল, অবতার আর অবতারের মধ্যে লড়াইতে একজন অবতার জিতে গেলেন আরেকজন অবতার হেরে গেলেন, এটা কি করে হতে পারে। রাম আর পরশুরাম ছাড়া আর কোথাও আমরা দুই অবতারের লড়াই দেখি না। এমনিতেই অবতার তত্ত্ব এত কঠিন তার উপর এই জিনিসগুলো আরও বেশি আমাদের বিভ্রান্ত করে দেয়।

প্রথমেই আমাদের অবতারের সংজ্ঞা নিরুপণ করতে হবে। আচার্য শঙ্কর বলছেন বেদের দুটো ধর্ম, একটা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম আর আরেকটি নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম, এই দুটো ধর্মকে স্থাপনা করবার জন্য ভগবানকে নিজে আসতে হয়। এই দুটো বৈদিক ধর্মের মধ্যে যখন অনেক রকম গোলমাল এসে যায় তখন যিনি এসে এই বৈদিক ধর্মকে স্থাপন করে দেন তিনিই অবতার। কিন্তু সব ধর্মে তো বেদকে মানা হয় না, বৌদ্ধ ধর্ম তো বেদের বিরোধিতা করেই দাঁড়িয়েছে, তাহলে বুদ্ধকে আমরা অবতার কি করে বলছি? একেই রাম আর পরশুরামের বিরোধ আর তার সাথে ভগবান বুদ্ধকে অবতার বলা এগুলো সত্যিই আমাদের চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেয়। এগুলোকে আমাদের একটা একটা করে আলোচনা করা দরকার। ভগবান বুদ্ধকে অবতার বলছেন, আমাদের সেই আগের প্রশ্নে ফিরে যেতে হয়, অবতার কে? অবতারের সব থেকে ভালো সংজ্ঞা দিয়েছে ভাগবত। কিছু কিছু বিশেষ অধিকার সম্পন্ন আধার আসেন, তাঁরা এমন কিছু কাজ করেন যে কাজ দেখে মনে হয়, ওই কাজ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, আমরা তখন তাঁকে বলি অবতার, কারণ মানুষের দ্বারা ওই কাজ কখনই সম্ভব নয়। এর বাইরে অবতারের সঠিক সংজ্ঞা আছে কিনা আমাদের জানা নেই। ভাগবতে অবতারকে যেভাবে পরিভাষিত করা হয়েছে, এটাই অবতারের সব থেকে ভালো সংজ্ঞা বলে মনে হয়। যখন একজন আধার, সেখানে শ্রীরামচন্দ্র আধার, শ্রীকৃষ্ণ আধার, পরশুরামও আধার, শ্রীরামকৃষ্ণও আধার, এই আধারগুলোর এমন কিছু উপলব্ধি থাকে যার ধারে কাছে মানুষ কোন দিন পৌঁছাতে পারবে না। পুকুরের জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, পুকুরের মাছেরা মনে করে এটাও আমাদের মতই কোন মাছ। সারা রাত তারা সেই চাঁদের সাথে খেলা করল, ভোরের আলোতে ফর্সা হতেই মাছ উধাও।

পরশুরাম একুশবার ধরিত্রীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করে দিলেন। এটা নিছক পৌরাণিক গাথা হতে পারে, কিন্তু তাও আমরা মনে করছি এই কাজ সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য পরশুরামকে অবতার বলা হচ্ছে। এখন রাম আর পরশুরামের মধ্যে যদি বিবাদ থেকে থাকে আর একজন অবতার আরেকজন অবতারকে শেষই করে দেন, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে অবতারেরও তারতম্য আছে। এই তারতম্যের জন্যই ভাগবতে অংশ, কলা এই ধারণাকে নিয়ে আসা হয়েছে। অংশ, কলা আর পূর্ণ এই ধারণাকে যদি আমরা মেনে নিই তাহলে পূর্ণের কাছে অংশ চাপা পড়বেই। আবার অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে একই যুগে দুজন অবতার হতে পারেন কিনা। হতেই পারে, আমরা শ্রীচৈতন্যকে অবতার জানি আবার শ্রীরামকৃষ্ণকেও অবতার রূপে জানি, একই যুগের অবতার। আরও যদি স্পষ্ট ভাবে বিচার করে দেখা হয় তাহলে পরশুরাম অনেক আগেকার, শ্রীরামচন্দ্র তাঁরও অনেক পরে এসেছেন। এগুলোর আবার নানান রকমের ব্যাখ্যা আছে। তবে অবতার মানে যিনি বিশেষ কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, এমন বিশেষ কিছু, যেটা মানুষের ক্ষমতার বাইরে।

রিচার্ড ফাইনম্যান ক্যালিফোর্ণিয়ার ইনস্টিটুট অফ টেকনলজিতে অধ্যাপনা করতেন। সেখানে আরেকজন নামকরা পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন, তিনিও নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, ওনার নাম ছিল গেইলম্যান। দুজনেরই অফিস পাশাপাশি আর দুজনেরই সেক্রেটারি একজন মহিলা। ফাইনম্যান মারা যাওয়ার পর একজন ছাত্র খুব সুন্দর একটা স্মৃতিকথায় লিখেছে, দুজনই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। গেইলম্যানের হাত দিয়ে কুড়ি পঁচিশ জন পিএইচডি পেয়েছে আর সারা জীবনে ফাইনম্যানের মেরেকেটে একজন মাত্র ছাত্র পিএইচডি পেয়েছিল। ফাইনম্যানের সমস্যা হল, ওনার কাছে কেউ সমস্যায় গাইড নেওয়ার জন্য এলে, উনি দেখে নিতেন কি problem solve করতে হবে। দেখার পর নিজেই solve করে দিতেন। ছাত্রদের গাইড করার জায়গায় উনি নিজেই সব কিছু problemএর solution দিয়ে দিতেন। সেই ছাত্রের আর রিসার্চ কি করে হবে! ফলে কোন দিন ওনার কাছে কেউ পিএইচডি করতে যেত না। ছাত্রটি লিখছে, যখন দুজনের দিকে তাকাতাম তখন গেইলম্যান আর ফাইনম্যানের মধ্যে একটা বিরাট তফাৎ মনে হত। গেইলম্যানের দিকে যখন তাকাতাম তখন মনে হত, আমি যদি খাটি তাহলে আমিও গেইলম্যানের মত হয়ে যেতে পারব, অন্য দিকে ফাইনম্যানের দিকে তাকালে মনে হত চেষ্টা করলেও কোন দিন ফাইনম্যানের মত আমি হতে পারব না। গেইলম্যান আর ফাইনম্যানের এই হল তফাৎ। আমরা চেষ্টা করলে আলেকজাণ্ডারের মত হতে পারব কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মত কোন দিন হতে পারব না।

এখানে পরশুরাম, শ্রীরাম ও ভগবান বুদ্ধের যে কথা আসছে, ভগবান বুদ্ধের যে উপলব্ধি এবং পরে তিনি যেভাবে সারা দেশে একটা বিরাট ধাক্কা দিলেন, এই জিনিস মানুষের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তেমনি পরশুরামের যে উপলব্ধি, শ্রীরামের যে উপলব্ধি মানুষের দ্বারা হয় না। সুতরাং তিনজনই অবতার রূপে পূজিত। কিন্তু ভগবান বুদ্ধকে ভারত অবতার বলে মানতে চাইবে না, কারণ তিনি বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেননি। কিন্তু তাও ভগবান বুদ্ধকে অবতার বলে মানা হয় এর পেছনে আবার একটা মজার কাহিনী আছে। বলা হয় এক সময় মানব বেশে ভারতবর্ষে অনেক অসুর জন্ম নিয়েছিল। অসুরগুলো বৈদিক ধর্মের সর্বনাশ করে দিচ্ছিল। এদেরকে মেরে তাড়ানোর দরকার ছিল। ভগবান বিষ্ণু তখন ভগবান বুদ্ধ হয়ে এলেন, এসে তিনি একটা বিচিত্র ধর্ম দাঁড় করিয়ে দিলেন। সব অসুরগুলো সেই ধর্ম পালন করে নষ্টের দিকে চলে গেল আর আসল বৈদিক ধর্মটা রক্ষিত হয়ে গেল। এটা যে কোন মজার কাহিনী তা নয়, আজ থেকে দু হাজার বছর আগে এই মতটাই ছিল। কারণ একদিকে ভগবান বুদ্ধের যা জনপ্রিয়তা তাতে তাঁকে অবতার বলতে হবে। অন্য দিকে আবার তিনি বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন। আচার্যের অবতারের সংজ্ঞার সাথে তো মিলছে না। কিন্তু একদিকে ভগবান বুদ্ধ বেদকে রক্ষা করেছেন। কিভাবে রক্ষা করেছেন? যারা বেদের বিরোধী ছিল, অসুর যারা মানুষ রূপে জন্ম নিয়েছে সব কটাকে ভগবান বুদ্ধ টেনে তাঁর দিকে নিয়ে গেছেন। দশাবতার চরিতে ভগবান বুদ্ধের যে নাম আছে সেখানেও এই ধরণের কথা আছে, তিনি বিধর্মীদের টেনে নিয়ে চলে গেলেন। সবাইকে তিনি বৌদ্ধ বানিয়ে দিলেন, বৈদিক ধর্ম তাতে রক্ষা পেয়ে গেল। ভগবান বিষ্ণুই ভগবান বুদ্ধ হয়ে এসেছেন। বৈদিক ধর্মের সব আবর্জনাগুলিকে সরিয়ে তিনি বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করলেন। আচার্য শঙ্করের মতে এবার যদি আমরা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে দেখি, ভগবান বুদ্ধ বেদের নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্যা হয় বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যবাদকে নিয়ে। আবার ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ এগুলোর সাথে অদ্বৈত বেদান্তের এত বেশি মিল যে আচার্যের যারা বিরোধী ছিল তারাও আচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলতে শুরু করলেন। তারা বলছে, বৌদ্ধ ধর্ম যে অসুরদের ধর্ম তা নয়, অদ্বৈত বেদান্ত বৌদ্ধ ধর্মেরই ভাই। আচার্য

শঙ্করকে তারা হিন্দু ধর্মের বড় শত্রু মনে করত, কারণ আচার্য প্রকারন্তরে একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। এদের কাছে ভগবান বুদ্ধ অবতার, কারণ তিনি বৈদিক ধর্মের আবর্জনাগুলোকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম অসুরদের ধর্ম আর তাদেরই ভাই আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদিরা।

শক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে পরশুরাম এমন একটা শক্তির প্রকাশ দেখিয়ে দিলেন তাতে তাঁকে অবতার বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল, কিন্তু শ্রীরামের আবার শক্তির প্রকাশ পরশুরামের থেকে অনেক বেশি। এই কম বেশীকে মেলাতে গিয়ে সমস্যা হয়ে যায়। এই সমস্যাকে মেটাবার জন্য নিয়ে এলেন চিদাংশ, কলা আর পূর্ণাবতার। যদি অবতার কোন কারণে পরশুরামের মত ছিটকে যায় তখন পূর্ণাবতারের সামনে সেই অবতার চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু সাধারণত দুজন অবতার কখনই মুখোমুখি হন না। এই মত যদি হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত পরশুরামকে অবতার বলা যাবে কিনা? এই প্রশ্ন সেইজন্যই আসছে যেহেতু ভাগবতে অবতারের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে সেই তালিকায় পরশুরামেরও নাম আছে আবার শ্রীরামচন্দ্রের নামও আছে। তাহলে একজন অবতার আরেকজন অবতারের কাছে কি করে পরাস্ত হবেন? তখন একটাই পথ খোলা থাকে, একজনকে চিদাংশ করে দিন আরেকজনকে পূর্ণ করে দিন। তাহলে অবতারের ব্যাপারে মূল থিয়োরী কি হবে? তখন এই একটা জিনিসকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। ঠাকুরকে আমরা অবতার কেন বলছি? জ্ঞান, ভক্তির ঐশ্বর্যের যে প্রকাশ ঠাকুরের মধ্যে দেখা গিয়েছিল আর তাঁর অনুভূতির যে ব্যপ্তি কারুর সাথে তুলনা করা যাবে না, সেইজন্য তিনি অবতার। তাছাড়া আমরা অবতারের ব্যাপারে আর কি বুঝতে পারব! কারণ যিনি অবতার তিনিই জানেন তাঁর মধ্যে অবতারত্ব আছে কি নেই। আর তিনিই জানতে পারবেন যিনি সাধনা করে করে আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা উচ্চ অবস্থায় চলে গেছেন, যে অবস্থা থেকে তিনি বলতে পারবেন তিনি অবতার, সেখান থেকে তিনি নিজেকে দেখিয়ে দিলেন। যেমন স্বামীজীকে দেখিয়েছেন বা এখানে শ্রীরামচন্দ্র যেমন পরশুরামকে দেখালেন। আগামীকাল যদি কোন নতুন পুরাণ লেখা হয় আর সেখানে যদি বলে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার আর স্বামী বিবেকানন্দ তিনিও অবতার। তখন আবার এই সমস্যা আসবে, দুজন অবতার কি করে হলেন। তখন বলবেন শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণাবতার আর স্বামী বিবেকানন্দ কলাবতার। ঠাকুর অনেককে বলছেন নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি মানেই অবতার। পরবর্তিকালে পুরাণ লেখা হলে তাঁরা এভাবেই লিখবেন। খুব সাধারণ স্তর থেকে চিন্তা করলে অনেক রকম দ্বন্দ্ব আসবে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব এমন কিছু নয় যে মেটানো যাবে না, যদি ভাগবতের এই মতকে অংশ, কলা ও পূর্ণকে মেনে চলা যায়, আর যদি আচার্য শঙ্করের অবতারবাদের মতকে নেওয়া হয়, যিনি বৈদিক ধর্ম সংস্থাপন করেন, সেদিক দিয়ে দেখলে পরশুরামও বৈদিক ধর্ম স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর ওই অতটুকু কাজ করার ছিল সেটুকু হয়ে গেছে, ঠাকুর যেমন মাকে বলছেন, ওকে অতটুকু শক্তি কেন দিলি, ও! বুঝেছি ওতেই তোর কাজ হয়ে যাবে। যিনি ঈশ্বর তিনি দেখলেন পরশুরাম থেকে আমার যতটুকু কাজ করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল হয়ে গেছে, পরশুরামকে আমার আর দরকার নেই। ভগবান বিষ্ণু পরশুরামকে আরও বলছেন –

ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা রামোহহমব্যয়ঃ।
উৎপৎস্যে পরয়া শক্ত্যা তদা দ্রক্ষ্যসি মাং পুনঃ।১/৭/২৩
মত্তেজঃ পুনরাদাস্যে ত্বয়ি দত্তং ময়া পুরা।
তদা তপশ্চরন লোকে তিষ্ঠত্বং ব্রহ্মণো দিনম্।১/৭/২৪

আমি অব্যয় হলেও ত্রেতাযুগে পূর্ণ শক্তিতে আমি দশরথের পুত্র রাম নামে ভূতলে অবতীর্ণ হব, তখন তুমি আমাকে আবার দেখতে পাবে। তখন তোমার যে শক্তিতে আমার কাজ চলছিল সেই শক্তিটা আমার কাছে ফেরত চলে আসবে। এই শক্তি নিয়ে নেওয়ার বদলে তুমি জ্ঞান পেয়ে যাবে। জ্ঞান আর ভক্তি একটা দিক আর অন্য দিকে শক্তি, দুটো জিনিস আলাদা। পরশুরামকে শ্রীরামচন্দ্র শক্তিতে দাবিয়ে দিলেন। বদলে তিনি ঈশ্বর জ্ঞান পেয়ে গেলেন। এই ব্যাপারটা একেবারে আক্ষরিক ভাবে সত্য। ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দের প্রচুর দেবী দেবতার দিব্য দর্শন হত। ঠাকুর তাঁকে বলছেন, এই যা হওয়ার হয়ে গেল এরপর আর দর্শন হবে না। এরপর একদিন তিনি দেখছেন সব দেবী দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে লয় হয়ে গেল। তারপর থেকে তাঁর আর কোন দিব্য দর্শন হয়নি। দিব্য দর্শনকে যদি শক্তি রূপে দেখা হয় তাহলে সব মিলে যাচ্ছে। নানা রকম দেবী দেবতার দিব্য দর্শন হচ্ছিল, কিন্তু যখন দেখলেন সবটাই শ্রীরামকৃষ্ণ তখন থেকে দিব্য দর্শনও বন্ধ হয়ে গেল। তাই বলে কি ওনার শক্তি কমে গেল? কোন শক্তিই কমছে না, একটা প্যাটার্নে যে শক্তিটা কাজ করছিল এরপর সেই শক্তির আর

কোন প্রয়োজন নেই তাই অন্য একটা প্যাটার্নে শক্তি কাজ করতে শুরু করল। ঠাকুর যেমন নিজের শরীরকে নিয়ে বলছেন, এটা দিয়ে আর চলছে না, তখন তিনি আরেকটা শরীরে শক্তি সঞ্চার করে দিচ্ছেন। সেখানে অবশ্য অবতার সঞ্চার করেছেন। এই ধরণের জিনিস প্রচুর হয়। কিন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান আর ভক্তি পুরোপুরি আলাদা, জ্ঞান আর ভক্তি কখনই কমে না। তিনি সিদ্ধ পুরুষই হন, সাধকই হন ঈশ্বরীয় জ্ঞান আর ভক্তি কখনই কমবে না। কমে যেটা সেটা হল শক্তি। শক্তি কমতে পারে, যেমন পরশুরামের শক্তি কমে গেল। কি করে কমল? ভগবান বিষ্ণু বললেন, যে শক্তিটা তোমাকে আমি দিয়েছিলাম সেই শক্তিটা আমার কাছে ফেরত চলে আসবে। শিশুপালেরও প্রচুর শক্তি ছিল। শিশুপালকে বধ করার পর সবাই দেখলেন শিশুপালের শরীর থেকে একটা তেজ বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে প্রবেশ করে গেল। এখানে অবশ্য পরশুরামের তেজ ভগবানের কাছে ফেরত যাওয়াটা দেখা যায়নি। এই দ্বন্দ্বগুলি নিজের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে, অপরের কাছে গিয়ে পরিষ্কার করতে গেলে অনেক বেশী আপনাকে আলোচনা করতে হবে।

যাই হোক এরপর ভগবান পরশুরামকে বললেন, এরপর যত দিন এই কল্প থাকবে তত দিন তুমি তপশ্চরণ করে পৃথিবীতে অতিবাহিত করবে। সেইজন্য বলা হয় পরশুরাম এখনও তপস্যা করে যাচ্ছেন। কিন্তু তপস্যা নিয়েই পরশুরাম থেমে থাকেননি। আবার একটা সময় তিনি নেমে পরেছিলেন, পরশুরাম শান্তিতে থাকতে পারতেন না। মহাভারতে যখন অম্বাকে নিয়ে ঝামেলা হল, ভীষ্ম বললেন আমি বিয়ে করব না, তখন আবার পরশুরাম ভীষ্মের সঙ্গে লড়াই করতে নেমে পড়লেন। সেখানেও তিনি আবার মার খেয়ে গেলেন। ভীষ্মকে উনি কিছুই করতে পারলেন না। পরশুরাম থেকে থেকে লড়াই করতে নেমে পড়তেন, সেইজন্য অবতারদের মধ্যে পরশুরাম হলেন রাগী অবতার, ঋষিদের মধ্যে যেমন দুর্বাসা রাগী ঋষি। এগুলো হল তরকারীতে যেমন মশলা দেওয়া হয়, এও তেমনি, এই জিনিসগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। মূল কথা পরশুরামকে এনারা অবতার মনে করতেন, পরে শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বকে মহান করার জন্য পরশুরামকে নিয়ে আসা হল। রামকথাতে পরশুরামের এই অংশের কোন দরকারই ছিল না, পরশুরামের এই কাহিনীকে রামকথা থেকে সরিয়ে দিলে রামকথাতে কোন হেরফের হয়ে যাবে না। অনেকে বলেন ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যকে সামনে নিয়ে আসার জন্য পরশুরামের কাহিনীকে নিয়ে আসা হয়েছে, কারণ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ধরণের অনেক থিয়োরী আছে, এগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু শ্রীরামের যারা ভক্ত তাদের মধ্যে শ্রীরামের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া হল। যে পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় সংহার করেছেন, তাঁকেই শ্রীরামচন্দ্র পর্যুদস্ত করে দিলেন। এরপর পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করছেন।

<u>পরশুরাম কৃত শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি</u>

স এব বিষ্ণুস্ত্বং রামো জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ।
ময়ি স্থিতন্তু ত্বত্তেজস্ত্বয়ৈব পুনরাহৃতম্।১/৭/২৫-২৬

তেজ চলে যাওয়ার পর পরশুরাম স্তুতি করে বলছেন, হে রাম! আপনি সেই বিষ্ণু, ব্রহ্মার প্রার্থনাতে আপনি ভূতলে অবতরণ করেছেন। আমার মধ্যে যে তেজ ছিল সেই তেজ আপনি ফেরত নিয়ে নিলেন। তেজ ফেরত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র ভগবানরই থাকে।

অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোঽসি মমপ্রভো।
ব্রহ্মাদিভিরলভ্য স্ত্বং প্রকৃতেঃ পারগো মতঃ।১/৭/২৬-২৭।

হে রাম! আজ আমার জন্ম সার্থক। কেন জন্ম ধন্য হয়ে গেল? *ব্রহ্মাদিভিরলভ্য স্ত্বং প্রকৃতেঃ পারগো মতঃ*, আপনাকে ব্রহ্মাও জানতে পারেন না, কারণ আপনি প্রকৃতির পারে। পুরুষ অখণ্ড আর প্রকৃতি তাঁর একটা ছোট্ট অংশ। পুরুষ থেকেই প্রকৃতির জন্ম। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে সমন্বয় করে বলছেন পরা প্রকৃতি আর অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি অখণ্ড আর অপরা প্রকৃতি হল এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। প্রকৃতির পারে মানে তিনি প্রকৃতির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ব্রহ্মা এই প্রকৃতির এলাকার তাই আপনি ব্রহ্মারও অলভ্য। যিনি ব্রহ্মারও অলভ্য সেই আপনাকে আমি এখন জেনেছি, আমার সত্যিই কী সৌভাগ্য! যিনি প্রকৃতির পারে, ব্রহ্মার কাছে যিনি অলভ্য, তাঁকে পরশুরাম কি করে জেনে গেলেন? আমাদের জেনে রাখা দরকার যে অধ্যাত্ম রামায়ণ, উপনিষদ, গীতা, কথামৃতের মত শাস্ত্রে কোন আবেগীয় কথা থাকে না। ভক্তিগীতিতে আবেগে অনেক কিছু বলে দেওয়া যায়, যেখানে অনেক রকম

অযৌক্তিক কথা, অপসিদ্ধান্ত চলে আসে। ঠাকুর মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়ার কথা বলছেন, এটা অপসিদ্ধান্ত। এখানে পরশুরাম বলছেন, আপনি প্রকৃতির পারে তাই ব্রহ্মার জন্য অলভ্য কিন্তু তাও আমি আপনাকে জেনেছি।

কথামৃতে ঠাকুর বলছেন ঈশ্বর জ্ঞান কিভাবে হয়। এখানে একটাই বক্তব্য, এই বক্তব্যকে যদি মাথায় রাখা যায় তখন এগুলো বুঝতে কখন ভুল হবে না। ঠাকুর বলছেন শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। মন আর বুদ্ধি একেবারে শুদ্ধ হয়ে শুদ্ধ আত্মার সঙ্গে এক না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আত্মজ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান হবে না। শুদ্ধ আত্মা বাইরের কোন কিছুকে জানে না, বাইরের কিছুকে জানার নাম বৃত্তি জ্ঞান। এই পেনকে আমি জানছি, এই জানাটা বৃত্তি জ্ঞান, এই জ্ঞান বুদ্ধি বৃত্তি দিয়ে হয়। আত্মজ্ঞানে কোন বুদ্ধি বৃত্তি থাকে না। যোগশাস্ত্রে বলছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে জানতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রকে জানা মানে নিজেকে জানা, নিজেকে জানা তখনই যাবে যখন বুদ্ধি বৃত্তি থেমে যাবে। তাহলে এটা কি করে সম্ভব হল পরশুরামের বুদ্ধি বৃত্তি থেমে গেল আর অন্যদের থামল না? এখানে এসেই পাত্রতার ভেদ স্পষ্ট হয়। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু দিলাম। আমরা এগুলোকে শাব্দিক অর্থে নিই ঠিকই যে ভগবান তাঁকে একটা শক্তি দিলেন। কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা হয় না। ঠাকুর একটু অন্য ভাবে বলছেন, হঠাৎ সিদ্ধও আছে। হঠাৎ সিদ্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন, মন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সেখান থেকে কোন কারণে হঠাৎ কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেল। যেমন রাস্থা দিয়ে আপন মনে যাচ্ছি, মন চারিদিকে ছড়ান আছে, হঠাৎ সামনে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তখন সব দিক থেকে মন সরে এসে একটা জায়গাতে স্থির হয়ে গেল। ঠাকুর হঠাৎ সিদ্ধের কথা অতি সাধারণ স্তরে বলছেন। কিন্তু এনাদের ক্ষেত্রে ঠিক একই জিনিস হয়, বুদ্ধি এতক্ষণ অনেক কিছুর জ্ঞান নিচ্ছিল কিন্তু কোন একটা কারণে সব কিছু থেকে সরে এসে মন একটি জায়গায় স্থির হয়ে গেছে। এই কোন একটা কারণ কেন হয় বোঝা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। সহজ করার জন্য এনারা তাই বলেন ঈশ্বরের কৃপা বা ঈশ্বরীয় কৃপা, বা যে কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। হঠাৎ ছড়ান মনটা কুড়িয়ে আসে, তখন বৃত্তি জ্ঞান না হয়ে সেটা চলে যায় আত্মজ্ঞানে। পরশুরাম দেখছেন ইনি সেই নারায়ণ, আর তখন নারায়ণ রূপে স্তুতি করছেন। স্তুতি করতে গিয়ে তিনি আরও বলছেন –

যথা জলে ফেনজালং ধুমো বহ্নৌ তথা ত্বয়ি।
ত্বদাধারা ত্বদ্বিষযা মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো।১/৭/২৯

জলে যেমন ফেনা হয় আর আগুনে যেমন ধুয়ো হয়, আপনিও ঠিক তেমনই। আপনি আছেন বলেই এই জগদ্রূপী ধুয়ো, আপনি অগ্নি। আপনি আছেন বলে জলের ফেনা রূপী জগৎ, আপনি তার আধার, আপনিই তার কারণ, আপনাতেই সব কিছু আশ্রয় করে আছে, অথচ আপনি সব কিছুর থেকে আলাদা। অগ্নি আর ধুয়ো দুটো আলাদা জিনিস। যতক্ষণ মানুষ অবিদ্যার দ্বারা আবৃত থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে জানতে পারে না। অবিদ্যা মানে, আমাদের যে বুদ্ধি বৃত্তি, যে বৃত্তির দ্বারা আমরা সব কিছুকে জানছি, এই বুদ্ধি বৃত্তি যখন জগতের দিকে থাকে তখন সেটাই অবিদ্যা। আচার্য শঙ্কর খুব সহজ ভাষায় বলছেন *যুস্মদ্ অস্মদ্ প্রত্যয়ঃ*। প্রত্যয় মানে বোধ হওয়া, যুস্মদ্ বলতে জগতকে বলছেন আর অস্মদ্ বলতে নিজেকে বলছেন, মূল কথা আমি তুমি বোধ। মানুষের মধ্যে আমি বোধ আর তুমি বোধ এই দুটি বোধ সব সময় চলতে থাকে, তুমি বলতে পুরো জগৎ। বুদ্ধি যখন তুমি বোধ নিয়ে থাকে তখন এটাই অবিদ্যা। যখন পুরোপুরি আমি বোধে নেমে যায় তখনই আত্মজ্ঞানের দিকে চলে যায়। আমি বলতে অস্মদ্ প্রত্যয়, আমিই আছি এই বোধ, অর্থাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে একটা জায়গায় চলে যাওয়া। তখন কোন বৃত্তি থাকছে না, বৃত্তি থাকছে না মানে কোন ধরণের চাঞ্চল্য থাকছে না। যেমন একটা পাত্রে জল আছে আর জলের তলায় কিছু একটা রাখা আছে। জল যদি অনবরত নড়তে থাকে তখন বোঝা যাবে না জলের তলায় কি রাখা আছে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে জল শান্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে জলের তলদেশে কি আছে।

জলের তলায় কি আছে ওটাকে কে দেখছে? আমরা উপমাগুলো দিচ্ছি আমি আছি আর আমি ঐ জিনিসটাকে দেখছি। তার মানে আমি আছি আর আমি ভগবানকে দেখছি। ব্যাপারটা একেবারেই তা নয়। জলের তলায় একটা এক টাকার কয়েন রাখা আছে, মনে করা যাক কয়েনের মধ্যে চেতনা আছে। তার চেতনাটা ওখান থেকে উঠে বাইরে চলে আসছে। এবার ওখান থেকে ঘুরে নিজের দিকে তাকাচ্ছে, নিজের দিকে তাকাতে গিয়ে বুদ্ধি বৃত্তি মানে জলের মধ্যে চাঞ্চল্যতা আছে বলে নিজেকে দেখতে পারছে না। জলের নড়াচড়াটাই সে দেখতে পায়। জলের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেলে সে তখন কাকে দেখছে? নিজেকেই দেখছে। কি দিয়ে দেখছে? নিজের মন

দিয়েই দেখছে। আসলে প্রতিবিম্বকে দেখছে না, নিজেকেই দেখছে। এই জিনিসটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া একটু কঠিন। যেমন ভেতরে একটা আলো জ্বলছে, আলো সবাইকে প্রকাশিত করছে। আলোটা নিজেই আলোকিত, ওই আলোকে দেখার জন্য অন্য কোন আলোর দরকার পড়ে না। ঠিক তেমনি যিনি চৈতন্য স্বরূপ তিনি নিজেকে যখন বোধ করবেন তখন তার জন্য তাঁর অন্য কোন কিছুর অবলম্বন দরকার হয় না। সেইজন্য ঈশ্বরকে জানার জন্য, ব্রহ্মকে জানার জন্য, আত্মাকে জানার জন্য কিছুই লাগে না, মন লাগে না, বুদ্ধিও লাগে না। চৈতন্য সব সময় নিজেকে জানছে। কিন্তু নিজেকে জানছে যুস্মদ্ প্রত্যয় দিয়ে, অর্থাৎ জগৎ দিয়ে নিজেকে জানে। শরীরটা যেমন তাঁর কাছে জগৎ মনটাও তাঁর কাছে জগৎ। সেইজন্য আমি শরীর, আমি মন এই বোধ সব সময়ই তাঁর হয়ে আছে। কিন্তু আরও ভেতরের যে বোধ সেই বোধকে তিনি হারিয়ে রেখেছেন। এই যে বোধটাকে হারিয়ে রেখেছেন এটাই অবিদ্যা। খুব সংক্ষেপে চৈতন্য সত্তা যখন নিজেকে সরাসরি বোধ করে, এটাকে বলে অবিদ্যার নাশ, আর যখন বুদ্ধি দিয়ে কোন কিছুকে জানছে সেটাই অবিদ্যা। তার মানে বুদ্ধি বৃত্তি দিয়ে যেখানেই কাজ হয়, বুদ্ধি দিয়ে কোন জিনিসকে যে জানা হচ্ছে সেটাই অবিদ্যা। আমাদের মনে হতে পারে বুদ্ধি ছাড়া মানুষ কি করে জানবে, আমাদের পুরো সাধনা, সমস্ত শাস্ত্র এটাকে নিয়েই চলে। বুদ্ধির মাধ্যমে জগতকে যতক্ষণ জানছে ততক্ষণ এটাই অবিদ্যা, এটাই ততক্ষণ সংসার। কিন্তু যখন বুদ্ধি ছাড়া জানছে তখন সেটা কে জানছে? এতক্ষণ যিনি বুদ্ধির মাধ্যমে জানছিলেন তিনিই তখন জানছেন। এটাকেই পরশুরাম বলছেন –

অবিদ্যাকৃতদেহাদি-সঙ্ঘাতে প্রতিবিম্বিতা।
চিচ্ছক্তির্জীবলোকেঽস্মিন্ জীবইত্যভিধীয়তে।১/৭/৩০

জীব আর ব্রহ্মের তফাৎ কি এখানে বলছেন। ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ চৈতন্য। আয়না বা জলে যেমন সূর্য প্রতিবিম্বিত হয় আর আয়নার প্রতিবিম্ব দিয়েও সূর্যকে দেখা যায়, আয়নার আলো ঘরের মধ্যে ফেললে সূর্যও ঘরের মধ্যে এদিকে ওদিক করতে থাকবে। অনেক রকমের আয়না লাগিয়ে দিলে ঘরের মধ্যে অনেক রকম আলো আসতে থাকবে। ঠিক সেই রকম শুদ্ধ চৈতন্য বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হন। আয়নাতে আমার যে প্রতিবিম্ব, ওই প্রতিবিম্বটা তো আমি নই। কিন্তু আমি হাত নাড়লে প্রতিবিম্বও হাত নাড়ে। আয়নাতে কে হাত নাড়ছে? এখানে আমি বলতে পারব আমি হাত নাড়ছি। আবার এও বলতে পারি প্রতিবিম্ব হাত নাড়ছে। এবার ঘরে আমি হাজারটা আয়না লাগিয়ে দিলাম, আর প্রত্যেকটি বিভিন্ন আকৃতির, কোনটা গোলাকার, কোনটা লম্বা, কোনটা ডিম্বাকৃতি। এবার আমি যদি হাত নাড়ি তাহলে হাজারটা হাত নড়বে। হাজারটা হাত এক রকম হবে না, হাজার রকমের হাত হবে, কারণ আয়নার আকৃতি গুলি সব আলাদা আলাদা। এই মজার ব্যাপার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, এটাই জগতকে দেখে শুদ্ধ আত্মার মুগ্ধ হয়ে যাওয়া। এখানে সবাই কথা শুনছেন, কেউ ঘাড় নাড়ছেন, কেউ অবাক হয় শুনছেন, কেউ লিখছেন, কেউ ঝিমোচ্ছেন। এগুলোই নানান যে আয়না আছে তার প্রতিবিম্ব ছাড়া কিছুই না। কার প্রতিবিম্ব? সেই যে শুদ্ধ চৈতন্য তাঁরই প্রতিবিম্ব। এখানে আয়না বলতে বুদ্ধিকে বোঝাচ্ছে। ওখানে যেমন স্থূল আয়না এখানে স্থূল বুদ্ধি, তাছাড়া আর কিছু না। বুদ্ধির বিভিন্ন রকম গঠন হওয়ার জন্য প্রতিবিম্বও বিভিন্ন রকমের। এটাই অবিদ্যা।

চিৎশক্তি যে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এখানে তাকে বলছেন জীব। আমার মধ্যে চিৎশক্তি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সেইজন্য আমিও একটা জীব, আপনার মধ্যেও হচ্ছে সেইজন্য আপনিও একটা জীব। আমি যদি মারা যাই বা আমার যদি আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে কি হবে? তার মানে বুদ্ধি বৃত্তি কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে বাকিদেরও কি জ্ঞান হয়ে যাবে? কোন দিনই হবে না। এর অর্থ হল একটা আয়না ভেঙে দেওয়া হল। বাকি আয়না যেমন আছে তেমনই থাকবে। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে আয়নার অভাব কোন দিনই হবে না। তিনি চাইলে সব আয়নাকে বন্ধ করে দিতে পারেন, তার মানে সৃষ্টি শেষ হয়ে গেল। আবার যদি তাঁর ইচ্ছে হয় ওই আয়না গুলোকেই দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, তখন আবার সৃষ্টি হয়ে যাবে। আমরা উপমার সাহায্যে ধারণা করার চেষ্টা করছি, ভগবান ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন। হাজারটা আয়নাতে যে বিভিন্ন রকমের নড়াচড়া হচ্ছে, আসল নড়াটা ওই একটা জায়গাতেই হয়। এগুলো প্রথম প্রথম শুনলে খুব অবাক লাগে, শুনতে খুব মজাও লাগে, মজা লাগার পর ওখানেই সব শেষ। দ্বিতীয় হল, শুনে একটু ধারণা করতে পারলে পুরো ব্যাপারটাই আমাদের কাছে অবাক লাগে। তৃতীয় আরেকটা হয়, শুনে মনে হবে সব আজগুবি। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য। এমনকি ইসলামের পরম্পরাতেও এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে যেখানে তাঁরা সৃষ্টিকে বোঝানর জন্য আয়নার

উপমা নিচ্ছেন। শুধু যে বেদান্তেই আছে তা নয়, অনেকেই এসব উপমা ব্যবহার করেন। কারণ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু থাকার সম্ভবনা নেই। তাহলে এত কিছু কিভাবে হয়? সব এভাবেই হয়। যদি কেউ সাধনা করে নিজেকে সেই ঈশ্বরের সাথে এক করে নেয়, তার মানে বুদ্ধিকে এত শুদ্ধ করে নিয়েছে যে জগৎ আর সেখানে প্রতিবিম্বিত হয় না। শুদ্ধ চৈতন্যের যে আলো, ওই আলোই শুধু থাকে, ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাওয়া মানে তখন সে ওই আলোর সাথে এক হয়ে যায়।

পরশুরাম এই কথাই বলছেন, জীব হয়ে যাওয়ার পর সে বাকি সৃষ্ট জিনিসগুলো, হাত, পা, চোখ, কান, নাক এগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করে নেয়। আত্মা কখনই একাত্ম করবেন না, কারণ আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। আত্মার যে প্রতিবিম্ব ওর মধ্যেও চেতনা আছে। আমরা একই উপমা অনেকবার নিয়েছি, এই টিউবলাইট দেখছি, টিউবলাইট তো একটা কাঁচ। কাঁচের মধ্যে পাউডার দেওয়া আছে, সেই পাউডারের মধ্যে তড়িৎ শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে। তাহলে আলোটা কার মধ্যে আছে? তড়িৎ শক্তির মধ্যেই আলো আছে। কিন্তু টিউবের মধ্যে যে গ্যাস দেওয়া আছে, তড়িৎ শক্তি প্রবাহিত হওয়ার জন্য ঐ গ্যাসটা চার্জড হয়ে যাচ্ছে আর কাঁচের মধ্যে যে পাউডার লাগানো আছে সেটা আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা আলো পাচ্ছি এই কাঁচ থেকে, কিন্তু আসল আলো তড়িৎ শক্তিতে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, আমাদের যাবতীয় যা কিছু সব বুদ্ধি দিয়ে চলে। সেইজন্য বুদ্ধির পেছনে কি আছে তাকে নিয়ে আমাদের কোন মাথা ব্যাথা হয় না। প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে দিয়েই আমাদের জগতের কাজ চলে যায়। প্রতিবিম্বিত চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য নয়, সেইজন্য সে নিজেকে কি করে –

যাবদ্দেহমনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিষ্বভিমানবান্।
তাবৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখাদিভাগভবে।১/৭/৩১

আমি নিজেকে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জুড়ে রেখেছি। মানুষ যার সাথে নিজেকে জুড়ে রাখে তার সুখে তারও সুখ অনুভব হয়, তার দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করে। ঐদিকে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের বোধ শক্তি আছে বলে তার হাসিও আছে কান্নাও আছে। আমাদের সবারই জীবনে দুঃখ আসে, দুঃখ যদি না আসে তাহলে দুঃখ পাওয়ার একটা বাহানা খুঁজে বার করে নিই। আমার নিজেরই এত দুঃখ এরপর আমি আরও চারজনকে জড়িয়ে নিচ্ছি, তাদের দুঃখকেও নিজের মনে হয়। নার্সারি স্কুলের একটা বাচ্চা যদি কাঁদতে শুরু করে আরও পঞ্চাশটা বাচ্চাও কাঁদতে শুরু করে দেবে। ওরা মনে করে একজন যদি কাঁদে তাহলে বাকিদেরও কাঁদতে হবে। আমাদের জীবনেও একই জিনিস হয়, শরীরের একটা অঙ্গে যদি কিছু হয় সব অঙ্গগুলিই কাঁদতে শুরু করে। লেগেছে হয়ত হাতে কিন্তু চোখ জল বার করতে শুরু করে দেবে, এটাই আশ্চর্যের। বাচ্চাদের মত সব এক অপরের সাথে যোগ আছে। হাতে চোট লেগেছে আমি বসে পড়লাম। কুকুরের পায়ে যদি লেগে যায় সে প্রাণ ছেড়ে দৌড়ে পালায়। আমরা দৌড় মারি না, আমরা বসে পড়ি। হাতটা অবশ পাও অবশ আর চোখ দিয়ে জল। কেউ যদি আমার দুঃখের কথা শুনতে আসে তাহলে তো আরও কান্না বেড়ে যাবে। কেউ না থাকলে দুঃখ কম হয়। কারণ এরা sympathetic crime পুরো একটা দল, একটা পরিবার, একজনের দুঃখে সবাই দুখী। ইন্দ্রিয়গুলিরও ঠিক তাই হয়। জীব যাকে বলছি, সেতো আসল চৈতন্য নয়, আসল চৈতন্য না হওয়ার জন্য জীব ইন্দ্রিয়ের কিছু ধর্ম নিজের মধ্যে নিয়ে নেয়।

প্রথমটা হল ইন্দ্রিয়ের দুঃখকে নিয়ে নেয়, সেখান থেকে আরেক ধাপে গিয়ে আসে জন্ম-মৃত্যু। জন্ম-মৃত্যুটাই সংসার, সংসার মানে যে জিনিসটা চলছে, সৃপ্ ধাতু থেকে সংসার, সৃপ্ মানে সরে সরে যাওয়া। এটা কি করে হয়? সেটাই আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

জড়স্য চিৎসমাযোগাচ্চিত্ত্বং ভূয়াচ্চিতেস্তথা।
জড়সঙ্গাজ্জড়ত্বং হি জলাগ্নোর্মেলনং যথা।১/৭/৩৩

জড় আর চেতনের যদি মিলন হয়, তখন একজনের ধর্ম আরেকজনের উপর চলে আসে। যেমন ঠাণ্ডা জলে একটা তপ্ত লৌহদণ্ডকে রেখে দিলে লৌহদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যায় আর জল গরম হয়ে যায়। ঠিক তেমনি জড় আর চেতন মিলে গেলে চেতনের উপর জড়ের স্বভাব আরোপিত হয়ে যায় আর জড়ের উপর চৈতন্য আরোপিত হয়ে যায়, এটাকে বলছেন চিজ্জড়গ্রন্থি। আমরা আবার ইলেক্ট্রিসিটির উপমা নিচ্ছি, টিউব লাইটে ইলেক্ট্রসিটি যাচ্ছে, সেখানে ইলেক্ট্রিসিটি জড়তা পেয়ে যায়, জড়তা পেয়ে যায় মানে তার নাশ হয়ে যাচ্ছে, এনার্জি ডাউন হয়ে যায়।

আর কাঁচ যার মধ্যে আলোকিত হওয়ার ক্ষমতা নেই সে আলোকিত হয়ে যায়। টিউবের ভেতরে যে গ্যাস আছে তার সাথে ইলেক্ট্রিসিটির সংযোগ হয়ে গেলে গ্যাস আলোকিত হয়ে যায় আর ইলেক্ট্রিসিটির ক্ষমতাটা হারিয়ে যেতে থাকে। চৈতন্য ও জড়ের সংযোগ হয়ে গেলে চৈতন্য জড়ের মত আচরণ করতে শুরু করে। জড়ের মত ব্যবহার করা মানে, আমি সুখি আমি দুখী মনে করা। আর জড় অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন এরা লাফাতে থাকে। হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলে আমি তোমাকে দেখ নেব। কিন্তু হাতের তো কোন ক্ষমতাই নেই, একটা কাঠের টুকরো যেমন জড় হাতটাও তেমনই জড়। সারা জগতের একই দুরবস্থা। সবচেয়ে পেছনে রয়েছেন শুদ্ধ চৈতন্য, তাঁর প্রতিবিম্ব এসে পড়ছে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে তখন প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে, দেখে মনে হবে তারই যেন চৈতন্য আছে। সেই চৈতন্য চলে আসে মনের উপর, মন আবার জুড়ে আছে দশটি ইন্দ্রিয়ের সাথে, মন কিন্তু নিজেও একটি ইন্দ্রিয়। মন কখন ইন্দ্রিয়ের মত ব্যবহার করে আবার কখন বুদ্ধির মত ব্যবহার করে। তখনই বুদ্ধির মত আচরণ করে যখন তার থেকে এনার্জিটা নেয়। এর বাইরে অন্য সময়ে মন ইন্দ্রিয়ের মত আচরণ করতে থাকে, তখন সে টানা জগতের জ্ঞান নিতে থাকে।

সব কটি ইন্দ্রিয়, মন আর দশটি ইন্দ্রিয়, মোট একাদশটি ইন্দ্রিয় সবাই এক অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একটা ইন্দ্রিয়ের যদি কিছু হতে শুরু করে বাকি ইন্দ্রিয়গুলিরও একই জিনিস শুরু হয়ে যাবে। এই কথা শুধু শাস্ত্রই বলছে না, বাস্তবিকই তাই হয় এবং নিউরো বিজ্ঞানীরাও হাতেনাতে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ভি এস রামচন্দ্রন, একজন নামকরা নিউরোলজিস্ট, এই বিষয়ের উপর ওনার একটা বই আছে Phantoms in the Brain, কারুর যদি হাত কাটা যায়, মস্তিষ্কে হাতের যে নিউরোনস গুলো আছে সেগুলো আর কোন কাজে লাগছে না, তখন তার আশেপাশের ইন্দ্রিয়গুলো হাতের নিউরোন গুলিকে টেনে নেয়। আগেকার দিনে এগুলো লোকেরা ধরতে পারত না, এখন এর টেকনলজি উন্নত হওয়ার দরুণ মস্তিষ্কে অর্গানের নিউরোনের পুরো ম্যাপিং করে দেওয়া হয়েছে। হাত যে জায়গাটায় আছে তার ঠিক পাশেই আছে গাল, হাত কাটা গেছে এখন গাল হাতের নিউরোন গুলিকে টেনে নেয়। অন্য দিকে ব্রেনের মেমোরিতে আছে এই নিউরোন আমার হাতের। ফলে খুব মজার ব্যাপার হয়, কোন কারণে গালে যদি মাছি বসে মনে হবে তার হাতটা চুলকাচ্ছে। কিন্তু তার তো হাতই নেই। তখন বিরাট সমস্যা হয়ে যায়। ব্রেনের মেমোরি জানে ওটা হাত, অন্য দিকে কাজের সময় ওটা হয়ে গেছে গাল, গাল যদি চুলকায় তাহলে মনে করবে আমার হাত চুলকাচ্ছে। লোকটির তো প্রায় পাগলের মত অবস্থা হয়ে গেছে। এবার তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। বেশির ভাগ ডাক্তাররাই তাকে পাগল বলে ভাগিয়ে দিয়েছে। ডাঃ রামচন্দ্রনের কিন্তু সন্দেহ হয়েছে, উনি তখন এটা নিয়ে রীতিমত রিসার্চ করতে শুরু করলেন। রিসার্চ করে তিনি দেখে অবাক এতো phntom limb, এখন তো পুরোপুরি প্রমাণিত হয়ে গেছে। কারুর হয়ত চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। ব্রেনের আশি ভাগ প্রসেসিং এরিয়া চোখের, অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য ইন্দ্রিয়গুলি চোখের নিউরোন গুলিকে টেনে নেয়। ফলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা বেড়ে যায়। এও দেখা গেছে যারা অন্ধ তাদের শ্রবণ শক্তি খুব প্রখর। যাঁরা চিন্তা ভাবনা বেশি করেন তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলোর শক্তি কমে যায়। ঋষিদের এই জিনিসগুলো জানা ছিল না, কিন্তু তাঁরা জানতেন প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় এক অপরের সাথে জড়িয়ে আছে আর পাঁচটা কুকুরের বাচ্চার মত নিজেদের মত লড়তে থাকবে অথচ এক অপরকে ছেড়ে থাকতে চাইবে না।

চৈতন্যের সাথে এদের কোন সম্পর্কই নেই, অথচ মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর এদের নিয়ে সব সময় জড়িয়ে লেজেগোবরে হয়ে চৈতন্য নিজের স্বভাবকেই ভুলে গেছে। এর একটা খুব ভালো উপমা দেওয়া যেতে পারে। একজন বয়স্কা মহিলা আছেন, তাঁর অনেক কিছুতে প্রতিভা আছে, ভালো গান গাইতে পারেন, কবিতা লিখতে পারেন, খুব সুন্দর ছবি আঁকা ও বিভিন্ন ধরণের শিল্প কর্মেও দক্ষ। তাঁর পাঁচটি নাতি আছে। পাঁচটি নাতির প্রতি স্নেহ ভালোবাসাতে তিনি একেবারে মজে আছেন। পাঁচটা নাতিও তাঁকে সব সময় নাচিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে, দিদিমা চল আমার সাথে ব্যাটবল খেলবে, কেউ বলছে দিদিমা আমার সাথে বল খেল, কেউ দিদিমাকে টেনে নিয়ে বলছে তুমি আমার সাথে ক্যারাম খেল। দিদিমার অত্যন্ত আদরের নাতি, নাতিদের খুশি রাখার জন্য সারা দিন ওদের সাথে দৌড়াদৌড়িই করে যাচ্ছেন। কখন খেলছেন, কখন আদর করছেন, কখন বকাবকি করছেন। সন্ধ্যে হয়ে যখন রাত এল তখন বাচ্চাগুলো ঘুমোতে চলে গেল। এবার দিদিমা কি করবেন? দিদিমা কি ছবি আঁকতে বসবেন নাকি গান গাইতে বসবেন, নাকি কবিতা লিখতে বসে যাবেন? কিছুই করতে যাবেন না, তিনিও ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। আবার সকাল হবে, আবার নাতিদের নিয়ে হুটোপাটি করতে হবে, আবার সন্ধ্যে হয়ে রাত

আসবে, আবার সকাল হবে। এইভাবে বছরের পর বছর দিদিমার আর কিছুই করা হচ্ছে না। দিদিমার যে বিভিন্ন দিকে নিজস্ব একটা সৃজনশীলতার সত্তা ছিল সেটাও শেষ হয়ে গেছে। কোন বিজ্ঞ পুরুষ যদি দেখেন তিনি দিদিমাকে দেখে অবাক হয়ে যাবেন, এর মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে, এর প্রতিভাকে কাজে লাগানো দরকার। কিন্তু দিদিমার প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁকে কি করতে হবে? সবার আগে নাতিদের কাছ থেকে দিদিমাকে সরাতে হবে।

আমাদের অবস্থাও দিদিমার মত, সারাদিন ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের নাচিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন নাচানাচির পর রাত্রিতে ইন্দ্রিয়গুলো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তখন আমাদেরও আর কোন শক্তি থাকে না। প্রথমেই পুরোপুরি ইন্দ্রিয় থেকে সরে আসা যাবে না। দিদিমাকেও একদিনেই নাতিদের থেকে আলাদা করে দেওয়া যাবে না। প্রথম প্রথম এক ঘন্টা করে সরাতে হবে, তোমাদের দিদিমা এত বড় পেইন্টার, এত বড় ম্যাজিশিয়ান, তাঁকে তোমাদের কিছুটা সময় দিতে হবে এগুলো করার জন্য। তখন দিদিমার প্রতিভা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। এটাকেই পরের শ্লোকে খুব সুন্দর বলছেন –

যাবৎ ত্বৎপাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং ন বিন্দতি।
তাবৎ সংসারদুঃখৌঘান্ন নিবর্ত্তেন্নরঃ সদা।১/৭/৩৪

যদি কোন মানুষ এই দুঃখ সংসারের নিবৃত্তি চায়, তার জন্য একটাই পথ, তা হল আপনার চরণে ভক্তি। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি নিজে থেকে কারুরই হয় না, গুরুকৃপা না হলে ভক্তি হবে না। ঈশ্বরের চরণে ভক্তি হওয়া মানে, দিদিমাকে তার নাতিদের কাছ থেকে সরিয়া আনা হল। এবার আস্তে আস্তে তার ভেতরের শক্তির উন্মোচন হতে শুরু হবে। ভগবানের প্রতি ভক্তি আসা মানে, ধীরে ধীরে এবার মায়ার আবরণটা আলগা হতে শুরু হবে। তখন কি হয়?

ততস্ত্বজ্‌জ্ঞানসম্পন্নঃ সদ্‌গুরুস্তেন লভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাদ্বিমুচ্যতে।১/৭/৩৬

মুক্তি কিভাবে হবে, আমাদের ভেতরে যে অনন্ত শক্তি সেই শক্তি কিভাবে বেরোবে? আমরা সবাই সেই দিদিমা যিনি পাঁচ খানা নাতিকে নিয়ে সারাটা দিন নেচে বেড়াচ্ছেন। যদি কোন কারণে ভগবানের পায়ে ভক্তি হয়, মুখের কথাও যদি হয়, মুখের কথা মানে কিছুই করছে না, শুধু সকাল বিকেল ঠাকুরের দর্শন করে যাচ্ছে, করতে করতে হঠাৎ একদিন সত্যিকারে ভক্তিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই যে ভগবানের প্রতি ভক্তি হল, তার জন্য এবার তিনি একজন সদ্‌গুরু পেয়ে যাবেন। এটা একটা পদ্ধতিতে চলে, একটা যেমন vicious circleএ চলে তেমনি অন্যটাও virtuous circleএ চলে। সংসারের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছিল, দগ্ধ হওয়ার জন্য কোন কারণে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হল। ঈশ্বরের প্রতি এমনি এমনি ভক্তি হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এত মসজিদ আছে, এত মন্দির আছে, কোন কারণে কেউ টেনে নিয়ে চলে গেল। আগেকার দিনে মা-দিদিমারা মন্দিরে যাওয়ার সময় বাড়ির বাচ্চাদেরও টেনে নিয়ে যেত, বাচ্চারা পেছন পেছন যেত কারণ মন্দিরে গেলে প্রসাদ পাবে। কিন্তু প্রসাদের লোভেও যদি সে ঘুর ঘুর করতে থাকে তাতেই কোনদিন যে তার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উদয় হবে সে নিজেই টের পাবে না। ভক্তি এসে গেলে তখন সে সদ্‌গুরু পেয়ে যাবে। সংসারে যে আগুনে আমরা দগ্ধ হয়ে মরছি, এই আগুন আমাদের ভেতরে ভেতরে তৈরী করতে থাকে। এরপর এর ওর সাথে বা নিজে থেকেই মন্দিরে যাতায়াত করতে শুরু করে দিল, আসতে যেতে দু-চারটে ভগবানের কথাও শুনছে, এবার জিনিসটা ঘন হতে শুরু করেছে, এরপরে সদ্‌গুরু যখন মহাবাক্য বলে দেবেন, আমাদের উপনিষদে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, প্রজ্ঞানাং ব্রহ্ম* এই ধরণের কিছু মহাবাক্য আছে, আবার ঠাকুর বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু, এটিও একটি মহাবাক্য। সদ্‌গুরু বলে দিলেন তত্ত্বমসি, তুমিই সেই, তখন জ্ঞান হয়ে যায়। মহাবাক্য দুভাবে কাজ করে, একটাতে আমি প্রস্তুত, আমাকে মহাবাক্য বলে দেওয়া হল আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞান হয়ে গেল। আর দ্বিতীয়, এখনও আমি প্রস্তুত হইনি কিন্তু মহাবাক্য শুনে নিয়েছি, এরপর সাধনা করতে করতে হঠাৎ মহাবাক্যের জ্ঞানটা জেগে গেল। ঠাকুরও বলছেন সময় না হলে কিছু হয় না। সময় হয়ে গেলে সদ্‌গুরু লাভ করবে আর মহাবাক্যও পাবে, কিন্তু আবার বলছেন, তবে শুনে রাখা ভালো।

ইন্দ্রিয়ের ভোগেরও একটা সীমা আছে, ভোগ করতে করতে তারাও এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটি ছেলে একটি মেয়েকে ভালোবাসে। মেয়েটির কথা তার কাছে কত মধুর লাগে। মেয়েটি এসে যখন বলে আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখন সেই কথা শুনতে ছেলেটির কত মিষ্টি লাগছে। একবার, দুবার, তিনবার, চারবার বলছে তখনও ভালো লাগছে, কিন্তু দিনরাত যদি কানের কাছে অনবরত বলতে থাকে আমি তোমাকে ভালোবাসি, ছেলেটে একটা সময় সন্দেহ করবে মেয়েটির মাথায় নির্ঘাৎ গণ্ডগোল আছে বা বিরক্ত হয়ে বলবে, তুমি এবার থাম। কিন্তু মেয়েটির মুখ থেকে এতদিন এই কথা শোনার জন্যই হা পিত্যেস করে যাচ্ছিল। ইন্দ্রিয়রও একটা সীমা আছে। শরীর যেমন থোকে যায় ইন্দ্রিয়গুলিও থোকে যায়। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে সেখানে মন ক্লান্ত হয়ে যায় না। টাকা-পয়সা, সম্পদে মন বিরক্ত হয়ে যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি ক্লান্ত হয় ঠিকই কিন্তু একটু বিশ্রাম পাওয়ার পর আবার তরতাজা হয়ে ভোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ভোগেরও শেষ হয় না। কিন্তু সংসার থেকে যখন প্রচুর মার খায়, খেতে খেতে যখন সে আর কোথাও যেতে পারে না, তখন একটা সময়ে জগতকে অসার বলে মনে হতে শুরু হয়। জগৎ অসার মনে হলে সবাই তখন মুক্তি চাইতে শুরু করবে, সেইজন্য ভগবান মাঝে মাঝে মুখের মধ্যে একটু মধু ঢেলে ওই বেদনার উপর সামান্য প্রলেপ দিয়ে দেন। মিষ্টির আস্বাদ পেতেই ভাবতে শুরু করে জগতকে যত অসার ভেবেছিলাম ততটা অসার নয়, আবার সে চলতে শুরু করে। আবার আগের মত মার খেতে শুরু করে, ওই একটু আশা জেগে থাকে, ওই আশা নিয়ে আবার বেদনার বালুচরে খেলাঘর বাঁধে। এটাই সংসার, সংসার অসার মনে হয় ঠিকই কিন্তু ওই যে একটু আশা দিয়ে রেখেছে, ওই আশা তাকে নাচাচ্ছে। আঘাত, যন্ত্রণা পেতে পেতে সে যখন সম্পূর্ণ বিরক্ত হয়ে যায় আর বহু জন্মের তিল তিল করে যে পূণ্য সঞ্চিত হয়ে আছে সেই পূণ্যের প্রভাবে তার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আসে। তা সে বৈধী ভক্তিই হোক আর রাগাত্মিকা ভক্তিই হোক তাতে কিছু আসে যায় না, ভক্তি হলেই হবে। মুখেও যদি কেউ বলতে শুরু করে, হে ঠাকুর! আমার সুখে দুখে তুমিই একমাত্র ভরসা, তাতেও সে আস্তে আস্তে ভক্তির দিকে চলে যাবে। যেখানে একেবারেই কিছু করছিল না, এবার সে একটু একটু ঈশ্বর চিন্তন করতে থাকে। ভক্তির খুব নামকরা কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

তস্মাদ্ ত্বদ্ ভক্তিহীনানাং কল্পকোটিশতৈরপি।
ন মুক্তিশঙ্কা বিজ্ঞানশঙ্কা নৈব সুখং তথা।১/৭/৩৭

সুখ পাওয়ার দুটি উপায়, হয় জ্ঞান আর তা নাহলে ভক্তি। বিজ্ঞান আর ভক্তি আসাই মুক্তি। মুক্তি মানে সংসারের প্রতি আসক্তির নাশ। কিন্তু *তস্মাদ্ ত্বদ্ ভক্তিহীনানাং*, হে রাম! যার আপনার প্রতি ভক্তি নেই তার আর সংসারের আসক্তি যাবে না। মুক্তি আর বিজ্ঞান দুটি শব্দের ব্যবহার করছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য। আগেই বলা হয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্র। সমন্বয় শাস্ত্র মানে ধর্মের বিভিন্ন পথকে এক জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে। বেদান্ত মতের সাধনা নেতি নেতি, নেতি নেতি করে সেই অবস্থায় চলে যান যেখানে তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে যায়। নেতি নেতি পথের সাধক জানেই না ভক্তি জিনিসটা কি। ভক্তি পথের সাধক বলেন ভগবান বিষ্ণুকে ভক্তি করলে ভক্ত সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য এই ধরণের মুক্তি পান। ভক্ত সাযুজ্য চায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিন্তু পদে পদে বলবেন জ্ঞানও যা ভক্তিও তাই। ঠাকুরেরও এই ভাব। ঠাকুরের ভক্তদের তাই অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়া দরকার। বলছেন যাঁরা ঈশ্বরকে ভক্তি করেন তাঁদের ভক্তি লাভও হয়, মুক্তি লাভও হয় আর জ্ঞান লাভও হয়। যাদের এগুলো নেই তাদের কখনই সুখের আশা করতে নেই।

বলছেন ভগবদ্ভক্তিতেই সুখ আসে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে সুখ বলছেন না, কতগুলি ধাপ বলছেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দিয়ে ভক্তি লাভ হয়, মুক্তি লাভ হয় আর জ্ঞান লাভ হয়, এটাই চিরস্থায়ী সুখ। গীতায় সুখের আবার কয়েকটা ক্রমবিন্যাস করে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলছেন *নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, অযুক্ত যদি হয়, অধ্যাত্ম চিন্তন বা ঈশ্বর চিন্তন থেকে বিমুখ থাকাটাই অযুক্ত। *ন চাযুক্তস্য ভাবনা*, যতক্ষণ যুক্ত না হবে ততক্ষণ চিন্তন হবে না, *ন চাভাবয়তঃ শান্তিঃ*, যতক্ষণ চিন্তন একাগ্র না হয় ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ বৃত্তি জ্ঞান থাকে। বৃত্তি জ্ঞান মানেই চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্য মানেই অশান্তি। *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, সুখী কে হয়? যে শান্ত। শান্ত কে হয়? যার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আছে, যার মুক্তি হয়েছে বা যার জ্ঞান লাভ হয়েছে। শান্তির ক্রমবিন্যাসে প্রথমে যুক্ত হতে হবে, একটা জিনিসের প্রতি মনকে একাগ্র করতে হবে। বলবে, আজকালকার ছেলেরা তো তাই করছে, তার তো দিনরাত একটাই চিন্তা করে যাচ্ছে কিভাবে টাকা আয় করতে হবে আর কি করে একজন ভালো পার্টনার পাওয়া যেতে পারে। ঠিকই বলছে, কিন্তু এদের সবটাই ইন্দ্রিয় সুখের

দিকে নেমে গেছে। ইন্দ্রিয় সুখ আদপেই সুখ নয়। ইন্দ্রিয় সুখকে বলা হয় pleasurable sensation। ইন্দ্রিয় সুখ আর শান্তির সুখ দুটো পুরোপুরি আলাদা। সুখ মানেই হয় born of stimulates, born of peace, যেখানে silence সেখানেই শান্তি, এটা তখনই হয় মন যখন যুক্ত হয়। কিসে যুক্ত? আদর্শে। জীবনে কখন লক্ষ্য রাখতে নেই, জীবনে রাখতে হয় একটা আদর্শ। লক্ষ্য আর আদর্শ দুটো আলাদা। লক্ষ্য যখন প্রাপ্ত হয় তখন একটা চাঞ্চল্য আসে, আমি একটা কিছু হয়ে গেছি। লক্ষ্য প্রাপ্তি না হলে আসবে ঈর্ষা। কিন্তু জীবনে আদর্শ থাকলে, আদর্শ চ্যুতি যদি কোন কারণে হয়েও যায়, সে বলবে এবারের মত পড়ে গেছি কিন্তু আর না। ছোট ছোট বাচ্চারা বর্ষাকালে মাঠে ঘাটে ইচ্ছে করে স্লিপ খেয়ে কাদার মধ্যে পড়ে আর বৃষ্টির সময় ওর মধ্যেই পড়ে থাকবে, এটাই ওদের খেলা। কিন্তু ভদ্রলোক যদি হাঁটতে গিয়ে স্লিপ করে কাদার মধ্যে পড়ে যায়, তাড়াতাড়ি করে উঠে দেখবে কেউ দেখে ফেলেনি তো, তারপর নিজের গন্তব্যে হাঁটতে শুরু করে। লক্ষ্য সেটিং হল বাচ্চাদের মত জেনেবুঝে স্লিপ খেয়ে কাদার মধ্যে পড়তে থাকে। আদর্শ হল ভদ্রলোকের মত, আদর্শ চ্যুতি যদি হয়েও যায়, আবার সে উঠে দাঁড়িয়ে আরও সতর্ক হয়ে আদর্শের দিকে এগিয়ে যায়। যারা goal setting করে তারাই দুঃখ পায়, দুঃখ পেয়ে কাঁদে। আদর্শে যারা থাকে তাদের কখনই দুঃখ হবে না। সেইজন্য সব সময় ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। ধর্মে প্রতিষ্ঠিতদের কখন চাঞ্চল্য হবে না। যুক্ত সব সময় একটা আদর্শের সাথে হয়, লক্ষ্যের সাথে কখন যুক্ত হয় না। সেইজন্য পরশুরাম বলছেন –

অতস্ত্বৎপাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি।
স্যাৎত্বদ্ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যা যাভ্যাংবিনশ্যতি।১/৭/৩৮

হে রাম! যত জন্মই হোক না কেন তোমার পাদপদ্মে আমার যেন ভক্তি থাকে। আমার সুখই আসুক আর দুঃখই আসুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না, হে প্রভু! তোমার চরণকমলে শুধু যেন আমার ভক্তিটুকু থাকে। ভক্তির কাছে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। আর যদি আমাকে সঙ্গ করতে হয় তাহলে তোমার ভক্তদের সঙ্গই যেন আমি করতে পারি, তোমার প্রতি এই ভক্তিতেই আমার অবিদ্যা মায়া নাশ হয়ে যাবে। আর বলছেন –

নমোঽস্তু জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন।
নমঃ কারুণিকানন্ত রামচন্দ্র নমোঽস্তু তে।১/৭/৪০
দেব যদ্যৎ কৃতং পূণ্য ময়া লোকজিগীষয়া।
ভৎসর্বং তব বাণায় ভূয়াদ্রাম নমোঽস্তু তে।১/৭/৪১

এই দুটি শ্লোক প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র। যারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, এই দুটি শ্লোক কয়েকবার পাঠ করলে পাপ কেটে যাবে। হে জগতের নাথ! আপনাকে নমস্কার। হে ভক্তিভাবন! আপনাকে নমস্কার। হে করুণাময় রামচন্দ্র! আপনাকে বার বার নমস্কার করি। এতদিন আমি যত পূণ্য অর্জন করেছি আপনার এই বাণের দ্বারা সেই পূণ্য সমূহ বিনষ্ট হোক। শেষে গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন, হে রাম! কোন ভক্তিহীন পুরুষও যদি এই স্তোত্র নিয়মিত পাঠ করে (২৫ থেকে ৪১ শ্লোক পর্যন্ত) তার যেন ভক্তি লাভ হয়ে যায় আর অন্তিমে যেন আপনাকে পায় এই আশীর্বাদ করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র তথাস্তু বলে সম্মতি প্রদান করলেন। এখানে এসে আদিকাণ্ড শেষ হয়ে যায়। এরপর থেকে শুরু হয় অযোধ্যাকাণ্ড।

অযোধ্যাকাণ্ড

কৃষ্ণকথা আর রামকথাতে একটা বড় পার্থক্য হল, কৃষ্ণকথায় শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে যতদিন বাল্যলীলা ও শৈশবলীলা করেছেন ঠিক ঐ কালটুকুই হল ভক্তদের জন্য। কিন্তু রামকথা ঠিক ঠিক শুরু হয় বালকাণ্ডের পর থেকে, যখন তিনি রাজ্য ছেড়ে বনবাসে চলে গেলেন। এমন কি বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামের বালকাণ্ডের কিছু নেই, বাল্মীকি সেখানে শুধু কথা দিয়ে ভরিয়েছেন। এরও ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি রামের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। বলা হয় ব্রহ্মার কৃপায় বাল্মীকির সব জ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান হওয়ার ফলে তিনি যেখানে কিছু ছিল না সেগুলোও জেনে গেলেন আর কাহিনীর পর কাহিনী রচনা করে গেলেন। আমাদের সামনে ঠাকুর, স্বামীজীর আদর্শ আছে, আমরা জানি অলৌকিক জিনিসগুলোকে বাদ দিয়েও অনেক কিছু করা যায়। অলৌকিক জিনিসগুলো যদি বাদ দিয়ে দেওয়া যায় তখন সবটাই সহজ হয়ে যায়। বাল্মীকি রামকথা লিখবেন ভেবেছেন, আর এদিকে সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, সীতা এখন বাল্মীকির আশ্রমে আছেন। সীতার কাছে বাল্মীকি শ্রীরামের গল্প শুনছেন। সীতা শ্রীরামের ব্যাপারে জানেন তাঁদের বিবাহের পর থেকে। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণে সীতার বিবাহের পর থেকেই কাহিনী খুব জমাট হয়ে যায়। সীতার বিবাহের আগে পর্যন্ত কাহিনী সেভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামের বালকাণ্ডের বিশদ বর্ণনা না থাকার এটা একটা সম্ভবনা থাকতে পারে। আরও মজার ব্যাপার হল বাল্মীকি রামায়ণ সীতার বনবাস হওয়ার পরেই শেষ হয়ে যায়। উত্তরকাণ্ডকে অনেকেই বাল্মীকি রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। প্রচুর তপস্যা করে করে বাল্মীকির কবিত্বের প্রতিভা স্ফুরিত হয়ে গিয়েছিল। সীতার মুখ থেকে যা যা তিনি শুনেছেন সেটাকে আধার করে তিনি একটি মহাকাব্য রচনা করে দিলেন। কিন্তু বালকাণ্ড যেমনটি হওয়ার কথা ছিল তেমনটি না হয়ে ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলে বাল্মীকি সেখানে নানান রকমের পরম্পরার কাহিনীগুলিকে দিয়ে সামলে নিয়েছেন। কিন্তু তারপর থেকে রামকথা স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে গেছে। শুধু বাল্মীকি রামায়ণেই নয়, প্রত্যেক রামায়ণেই অযোধাকাণ্ডের পর থেকেই কাহিনী খুব জোরাল হয়ে গেছে।

নারদ ও শ্রীরামের কথোপকথন

অযোধ্যাকাণ্ড শুরু হয় শ্রীরামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তুতি দিয়ে। অধ্যাত্ম রামায়ণে আবার অযোধ্যাকাণ্ডের শুরুটা খুবই সুন্দর এবং স্পর্শকাতর, যেটা অন্যান্য রামায়ণে পাওয়া যাবে না। শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা অযোধ্যাতে আছেন। একদিন সেখানে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হয়েছেন। নারদ মুনিকে অকস্মাৎ উপস্থিত দেখে শ্রীরাম খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সীতা সহ অত্যন্ত প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ভূতলে মস্তক লুণ্ঠিত করে নারদ মুনিকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্।২/১/৬
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে।
অবাপ্তং মে পূর্বজন্মকৃতপূণ্যমহোদয়ৈ।২/১/৭
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ
অতস্তদ্দর্শনাদেব কৃতার্থোহস্মি মুনীশ্বরঃ।২/১/৮

এখানে এক অতি উচ্চমানের ভাব আর এমন এক দৃষ্টান্তকে তুলে ধরা হয়েছে যা আমাদের মনে খুব গভীর রেখাপাত করে যায়। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা একসাথে প্রণাম করে নারদ মুনিকে খুব কোমল কণ্ঠে ও বিনয় সহকারে বলছেন, *সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্*, হে মুনিবর! আমাদের মত সংসারীদের পক্ষে ঋষি মুনিদের দর্শন লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। সংসারীরা পুরোহিত, ব্রাহ্মণ এনাদেরই দর্শন পায়, আর এখানে রঘুবংশের সদস্যরা বশিষ্ঠ মুনির দর্শন পান, যেহেতু তিনি রাজা দশরথের রাজপুরোহিত। বশিষ্ঠকে যদিও রাজপুরোহিত বলছেন, আর তাঁকেই বশিষ্ঠ মুনি রূপে জানতেন, কিন্তু বশিষ্ঠ মুনি আর রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ দুজন এক হওয়ার কথা নয়। ঋষি-মুনিরা হলেন, যাঁরা একান্তে জঙ্গলে পর্বতের গুহায় বা নদীর তীরে কোথাও ধ্যানে মগ্ন। ধ্যান করে করে, ঈশ্বর চিন্তন করে তাঁরা এমন পবিত্র হয়ে যান যে তাঁরা আর সংসারী লোকদের সংস্রবে আসতে চান না, তাদের দেখলে নিজেদের আড়াল করে নেন। ঠাকুরও এর অনেক বর্ণনা দিচ্ছেন, ভক্ত যারা তার বড়লোকদের থেকে দূরে থাকে। মোঘল আমলে দিল্লীর আশপাশে অনেক সুফী সন্তরা মাজাহারে থাকতেন। তাঁরা যদি শুনতেন

অমুক বাদশা কিংবা কোন রাজা তাঁর সাথে দেখা করতে আসছে, প্রাচীর ডিঙিয়ে পালিয়ে যেতেন। দেখাই করতে চাইতেন না। এসব নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। আর ইদানিং সাধুরা তো রাজা আসছে শুনলে ওয়েলকাম করার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। যাঁরা রাজা বাদশার সাথে দেখা করতে চাইতেন না, সেখানে তাঁদের বক্তব্য হল, তুমি এই জগতের একটা ছোট্ট ভূমিখণ্ডের রাজা, আর আমি হলাম আল্লা বা ভগবানের যে সাম্রাজ্য সেখানকার রাজা। কিন্তু সাধারণ ভাবে দেখা যায় সত্যিকারের সন্ত মহাত্মা, ঋষিরা কখনই সংসারীদের সামনে আসবেন না। কথামৃতেও এই ধরণের অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়, সংসারীরা এলে ঠাকুর বলতেন তোমরা এখানে ঘুরে ঘুরে বিল্ডিং, মন্দির দেখগে যাও। তাতেও যদি কেউ না যেত উনি নিজেই উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন। যদি কেউ খুব আগ্রহ নিয়ে দেখা করতেও যায়, এক মিনিট দু মিনিট কথা বলে বিদায় করে দেবেন। সেখানে রাজদরবারে ঋষি যাবেন! কোন প্রশ্নই নেই। এই নিয়েও অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে। একবার এক সন্ন্যাসী রাজদরবারে গিয়ে দেখেন রাজকুমারীর বিবাহ হচ্ছে, তিনি অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন বিবাহ জিনিসটা কি। রাজকুমারী আবার সেই সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁকেই বিবাহ করতে চাইছেন। সন্ন্যাসী তো রেগেমেগে সেখান থেকে বেরিয়েই গেলেন।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, সংসারীরা ঋষি মুনির দেখাই পায় না আর সেখানে এত বড় একজন ঋষি আমার বাসগৃহে উপস্থিত হয়ে গেছেন, এতো কল্পনাই করা যায় না। ঋষি মুনি কারুর বাড়িতে যাওয়া মানে ভগবান আসার মত, বাস্তবিকই তাই হয়। আশ্রম চালাবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করতে সন্ন্যাসীদের গৃহীদের দুয়ারে দুয়ারে যান, সেখানে ব্যাপারটা অন্য রকম। আবার অনেক সন্ন্যাসী আছেন জীবনে কোন দিন কারুর কাছে চাঁদা চাইতেও যান না। টাকা এলে আশ্রম চলবে, না এলে চলবে না, এই তাঁদের ভাব। ঠাকুরের সন্তানরা যখন সঙ্ঘের কাজ শুরু করেছিলেন তখন কোন কিছুই ছিল না, কিন্তু তখনও সঙ্ঘ চলেছে। আজকে দুটো পয়সা হয়েছে এখনও চলছে। আশ্রম চালাবার জন্য সন্ন্যাসীকে কেন বড়লোকদের তোয়াজ করতে যেতে হবে! ঠাকুর বারশো ন্যাড়া আর তেরশ নেড়ীর গল্প বলছেন। নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের তেরশ ন্যাড়া শিষ্য ছিল। তপস্যা করে এরা যখন সিদ্ধ হয়ে গেল তখন বীরভদ্রের ভয় হয়ে গেল, এরা যেদিক দিয়ে যাবে সেদিকেই ভয়, কেননা লোকেরা না জেনে যদি অপরাধ করে ফেলে তাদের অনিষ্ট হয়ে যাবে। তখন একটাই উপায় এদের তেজকে নাশ করে দেওয়া। জয়পুরের গোবন্দজীর পূজারীও খুব তেজী ছিল। রাজা পূজারীকে ডেকে পাঠিয়েছে, সে বলছে, আমি গোবন্দীজীর পূজারী আমি কেন যাব, রাজাকে আসতে বল। রাজা এরপর একটা মেয়ে এনে পূজারীর বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ে দিয়ে দেওয়া মানে সন্তান হবে, সন্তান হলে তার আজ অন্নপ্রাশন, কাল হাতেখড়ি, পরশু উপনয়ন। পূজারী এখন নিয়মিত রাজদরবারে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে, রাজা তোমার জন্য গোবন্দজীর চরণামৃত নিয়ে এসেছি, রাজা তোমার জন্য গোবন্দজীর নির্মাল্য নিয়ে এসেছি। বাড়ি বয়ে রাজার জন্য চরণামৃত নিয়ে আসা মানে বলতে চাইছে আমার কটি টাকা চাই। যার টাকা লাগবে না তার কি হবে? কাউকেই তোয়াক্কা করতে যাবে না। তেজী সাধুরা গৃহীদের কাছে খুব বিপজ্জনক, কোথাও কোন চাহিদা নেই, তাঁদের যদি সেবা অপরাধ হয়ে যায় খুব সমস্যা হয়ে যাবে।

শ্রীরামচন্দ্র তাই বলছেন *সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্লভং তব দর্শনম্*, আমাদের মত সংসারীদের এই ধরণের শ্রেষ্ঠ মুনিদের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ। আর *অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে*, শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আমরা হলাম বিষয়াসক্ত, ভোগে আসক্ত। শ্রীরামচন্দ্র যে কত নিরহঙ্কার এটাই এখানে দেখাচ্ছেন। আগেকার দিনে নবাবরা কখনই বলতেন না যে এটা আমার বাড়ি, ওনার সব সময় বলবেন হামারা গরীবখানা। আপনাকে খাওয়ার জন্য কখন ডাকবেন না, অতি বিনয় করে বলবেন একটু মুখ এঁঠো করে নিন। এই ভাব যে, আমার আর কি সামর্থ যে আপনাকে খাওয়াব! কিন্তু খাওয়ার সময় ছাপান্ন রকমের পদ দিয়ে টেবিল সাজিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র সেই রকম খুব নিরহঙ্কারের ভাব নিয়ে বলছেন, আমরা হলাম বিষয়াসক্ত মানুষ, আমাদের কাছে মুনি ঋষিরা আসবেন কল্পনাতেও ভাবতে পারি না। তাহলে নারদ মুনি কিসের জোরে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন?

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *অবাপ্তং মে পূর্বজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ*, এর আগের আগের জন্মে আমার হয়ত কিছু পূণ্য জমা ছিল, সেই পূণ্য হয়ত এখন হঠাৎ ফলীভূত হতে শুরু হয়েছে। দোপাটি ফুল বর্ষাকালে হয়। দোপাটি ফুলের বীজ নিজে থেকেই ফেটে মাটিতে পড়ে থাকে। তারপর শীত এল, বসন্ত এল, গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা আসতেই সেই বীজগুলো থেকে গাছ বেরিয়ে এল। সারাটা বছর বীজ পড়ে থাকে, কিন্তু যেই বর্ষার জল পড়ল হুড় হুড় করে গাছ বেরিয়ে এল। মন্দিরে যাচ্ছে, ঠাকুর দর্শন করছে, প্রার্থনা করছে, এতেই কি ঠাকুর কৃপা করতে শুরু করে দেবেন? না, এগুলো হল আকাশ থেকে যেন বৃষ্টি পড়তে শুরু হল, অর্থাৎ কর্মের ধারাটা এবার পাল্টাতে শুরু

করল। এর আগে আগে যে পূণ্য সঞ্চিত ছিল সেই পূণ্যের বীজ এবার অঙ্কুরিত হতে শুরু করবে। কোন কিছু দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাদের সেই বস্তুকে সম্পূর্ণ রূপে দেখতে হবে। সম্পূর্ণতা যদি না নেওয়া হয় তাহলে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, সঠিক সিদ্ধান্ত যদি না থাকে তাহলে জীবন চলবে না। জিনিসটাকে সম্পূর্ণ রূপে দেখা, দেখার পর বলতে পারব, এটাই সঠিক। কর্মবাদ, ঈশ্বরের কৃপা এগুলো জীবনের সম্পূর্ণ ছবি দিতে পারে না। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা শুধু টাকা উপার্জন আর ভোগের জন্য দৌড়াচ্ছে, এরাও জীবনের একটা ছোট্ট অংশকে নিচ্ছে বলে এদের এত দুঃখ-যন্ত্রণা। আমাদের পূণ্য কর্মও আছে পাপ কর্মও আছে, পাপ কর্মের জন্যই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট। আমার হয়ত একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এসে গেছে, যে কাজটা না করলে আমার খুব ঝামেলা হয়ে যাবে। সেই সময় আমার জ্বর হয়ে গেল। তখন ভাবছি কাজটা কোন রকমে শেষ হয়ে যাক তারপর না হয় শরীর খারাপ করুক। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম আর দেখা গেল অলৌকিক ভাবে জ্বরটা সাময়িক ভাবে চলে গেল। এখানে আমার হয়ত কোন সঞ্চিত পূণ্য আছে বা একটা অদম্য ইচ্ছাশক্তি জাগার ফলে সব বিঘ্নগুলি সরে গেল। অতটুকু পার করিয়ে দেওয়া হল, এরপর আবার আমার স্বাভাবিক কর্মের ধারা এসে যাবে। সেইজন্য এই ধরণের পরিস্থিতিকে বেশি কাজে লাগাতে নেই। জীবনকে আমাদের ভালোভাবে চালিয়ে যেতে হবে, আর যখন বিশেষ কোন পরিস্থিতি আসে, বাড়িতে হয়ত কোন বিবাহ বা উপনয়নের অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে তখন ঠাকুরের কাছে যেমন প্রার্থনা করতে হয় তার সাথে গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতে হয়। আমি চাইছি আমার যত পূণ্য জমা আছে সব পূণ্যের ফল যেন এই উৎসবটাকে ভালোয় ভালোয় পার করে দেয়।

শ্রীরামচন্দ্র এখানে সব কিছুকে মিলিয়ে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গিয়ে বলছেন, আমার অনেক জন্মের সঞ্চিত পূণ্য হঠাৎ উদয় হয়েছে, সেইজন্য আপনি এসেছেন। ব্যাপারটাকে তিনি উল্টো বলছেন, আপনি এসেছেন বলে আমার পূণ্যোদয় হয়েছে তা নয়। আমরা যেমন বলি আমার ছেলের পূণ্যোদয় হয়েছে, ও এখন নিয়মিত ঠাকুরের কাছে পাঁচ মিনিট করে বসছে। কিন্তু এটাকে অন্য ভাবে বলা হয়, সঞ্চিত পূণ্য যখন ফলীয়মান হতে চায়, তখন ঠাকুরের প্রতি প্রীতি হয়, সাধু দর্শন হয়। সাধু দর্শনে আমার সঞ্চিত পূণ্য যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে সাধু দর্শন না করলেই ভাল। শ্রীরামচন্দ্রই এখানে বলছেন, আমার যাবতীয় যত পূণ্য ছিল সব উদয় হল বলেই আপনার দর্শন লাভ করতে পারলাম। সাধুর দর্শন হওয়া মানে আমার পূণ্যটা শেষ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু সাধুসঙ্গ যখন হচ্ছে তখন বিপরীত দিক থেকে আমার প্রচুর পূণ্যের সৃষ্টি করে দিচ্ছে। সেইজন্য আমাদের সব শাস্ত্র থেকে শুরু করে ঠাকুর পর্যন্ত সবাই সৎসঙ্গের কথা বলে যাচ্ছেন। পূণ্য উদয় হয়েছে বলেই সাধুর দর্শন হচ্ছে ঠিকই আর ওই পূণ্যটাও নাশ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু সৎসঙ্গে তার বিনিময়ে বিশাল এক পূণ্যরাশি সঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। সৎসঙ্গের পূণ্যেই মানুষের মন ঠিক ঠিক ঈশ্বরের দিকে যেতে শুরু করে, যেটা একটু আগেই বললেন। ওই সঞ্চিত পূণ্যে ঈশ্বরের দিকে মন যায়, তখন সৎগুরু লাভ হয়, সৎগুরু লাভ হলে মহাবাক্য শুনতে পায়। তাই সঞ্চিত পূণ্য নাশ হয় ঠিকই, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু in turn নতুন ধরণের পূণ্য আসতে শুরু করে।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ*, যখন পূণ্যের উদয় হয় তখন সংসারীদের সৎসঙ্গ হয়। সৎসঙ্গের ফলস্বরূপ তখন জমাট বাঁধা গাঢ় পূণ্য সঞ্চয় হতে শুরু হয়, শাস্ত্রের কথা শোনার সুযোগ আসে। শাস্ত্রের কথা শুনতে শুনতে হয়ত কিছুই ধারণা হচ্ছে না। কিন্তু গুরু বা সাধুর অনেক দিন সেবা করতে করতে শাস্ত্রের কথা ধারণা হতে শুরু হয়। শাস্ত্রের কথা ধারণা করা শুরু হওয়া মানে বিশাল পূণ্যের সঞ্চয় হতে আরম্ভ করেছে। এইসব কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমি তো কৃতার্থ হয়ে গেলাম। তবে কি, মুনি যখন এত দূর এসেছেন নিশ্চয় কোন কাজে এসেছেন, আপনার কোন কার্য করতে হবে আদেশ করুন, আপনার সেবা করে আমি ধন্য হই।

সাধু সন্ন্যাসীরা কখনই সামাজিকতা রক্ষার জন্য কোন গৃহস্থ বা সংসারীর বাড়ি যাবেন না। যদি কোন সন্ন্যাসীর নিয়মিত গৃহী ভক্তদের বাড়িতে যাতায়াত থাকে তাহলে নিশ্চয় সেই সন্ন্যাসীর কোন গোলমাল আছে বুঝতে হবে। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ একবার গুজরাতে গাড়ি নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, আমরা এখন কোথায় আছি? বলা হল অমুক জায়গা দিয়ে যাচ্ছি। মহারাজ আবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা এখানে অমুক লোক থাকে না? মহারাজ একজন ভক্তের কথা জিজ্ঞেস করছেন। ওখানে তাদের বিশাল সম্পত্তি ছিল, কিন্তু কালের দুর্যোগে তারা এখন অতি সাধারণ হয়ে গেছে। মহারাজ ওদের জানতেন। মহারাজ বললেন, গাড়ি নিয়ে ওদের বাড়ি চল তো। ওরা কিছুই জানে না, হঠাৎ দেখছে বাড়িতে প্রেসিডেন্ট

মহারাজ এসে উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দে ওদের যে হার্টফেল হয়ে যায়নি রক্ষে। এটা হল অনুগ্রহ করা। এগুলো খুব কদাচিৎ ঘটনা। যাই হোক তখন নারদ ঋষি খুব সুন্দর কথা বলছেন –

কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈলোকানুসারিভিঃ।
জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব।২/১/১০

আমাদের যত শাস্ত্র আছে তাতে এত সুন্দর, এত আকর্ষণীয়, আর এত মাধুর্য্যপূর্ণ শ্লোক পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য, অত্যন্ত মধুর। দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রের কথার খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন। এই যে আপনি বললেন, আমরা সংসারী, আপনি একেবারেই ঠিক কথা বলেছেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতার, অবতার কি করে বলতে পারেন আমি সংসারী, শ্রীরামকৃষ্ণ কি কখন বলবেন আমি সংসারী! কখনই বলবেন না। তাহলে শ্রীরামচন্দ্র কি করে বলছেন আমি সংসারী? আর দেবর্ষি নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, আপনি একেবারে ঠিক কথাই বলছেন, হে বিভু! আপনি তো সত্যিই সংসারী। আবার তাঁকে বিভুও বলছেন। একদিকে বলছেন, হে বিভু, হে সর্বব্যাপী আপনি হলেন সংসারী। কেন সংসারী? *জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব*, জগতের যিনি আদিভূতা মায়াশক্তি সেই সীতা তো আপনার গৃহিণী, আপনি তো সংসারী বটেই। এটাই অত্যন্ত গুহ্য মানের চিন্তন। যিনি সংসার রচনা করেছেন, সংসার রচনা করছেন মায়াশক্তি, সেই মায়াশক্তিই সীতা, তিনি আপনার গৃহিণী, তাই আপনি সংসারী না হলে আর কে সংসারী হবেন! কোন অর্থে সংসারী? তিনি বিবাহ করে সংসার করছেন এই অর্থে নয়। যিনি পুরো জগতের সৃষ্টি করেছেন তিনিই আপনার স্ত্রী। এখন যদি কোন সাধারণ গৃহস্থ বলে আমি সংসারী আর নারদও তাকে বলে দিলেন হ্যাঁ আপনি সংসারী, তখন নারদ এক অর্থে বলছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি বলা হয় আপনি সংসারী তখন এর অর্থটাই অন্য রকম হয়ে যাবে। যিনি জগতপ্রসবিনী, সংসারের যিনি রচনা করেছেন, তিনি আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনী। সংসারী তো বটেই, আপনিই সংসার হয়েছেন। এখানে সংসার মানে ঘর সংসার করেছেন তা নয়, সৃষ্টির সংসার করেছেন, তাই আপনি ঠিকই কথা বলছেন যে আপনি সংসারী।

বিভিন্ন প্রবন্ধ, কাহিনী ও টিভির সিরিয়ালের দৌলতে আমাদের একটা ধারণা হয়ে গেছে নারদের যেন একটাই কাজ, সবার মধ্যে ঝগড়া লাগানো। কিন্তু পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রে নারদ একজন দেবর্ষি, সাধকের উচ্চতম যে অবস্থা হতে পারে নারদ সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঈশ্বর চিন্তন ছাড়া নারদের অন্য আর কোন দিকে মন নেই। অনেক সময় বলা হয় যে নারদ কলহপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তা নয়, নারদ যদি দেখেন কারুর আধ্যাত্মিক উত্থানের উজ্জ্বল সম্ভবনা আছে, কিন্তু একটা জায়গাতে আটকে আছে। নারদ তখন তাকে সাহায্য করার জন্য এমন একটা গোলমাল সৃষ্টি করে দেন যার পরিণতিতে তার ওই বন্ধনটা খুলে যায়। দেবতারাও তাঁদের কোন সমস্যা এলে বা কোন কঠিন কাজে নামার আগে নারদের শরণাপন্ন হন। অন্য দিকে নারদ সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে, কারণ তিনি শরীর ব্যাতিরেকে নিজের ইচ্ছা মত যেখানে খুশী যখন তখন চলে যেতে পারেন। সেই নারদ ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করতে করতে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এসে হাজির হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রও খুব খুশী, আমাদের কি সৌভাগ্য, আমরা সংসারী, অনেক জন্মের সঞ্চিত পূণ্যের ফলে সংসারীদের সাধু দর্শন হয়। নারদও খুব সুন্দর বললেন, এই সংসারের উৎপত্তির যিনি কারণ, আপনি তাঁর পতি, সেই আদিকারণভূতা মায়াশক্তি আপনার গৃহিণী, আপনি তো সংসারী বটেই। গীতায় ভগবান বলছেন *পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ*, আমি এই জগতের পিতা, এই জগতের মা, পিতামহ ইত্যাদি। সেখানে একটা অন্য ভাব। কিন্তু মূল জিনিসটা এক, জগতের যিনি আদিশক্তি, তাঁকে আমরা যে নামেই সম্বোধন করি না তাতে কিছু আসে যায় না, তিনিই এখন অবতারপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের গৃহিণী।

স্বামীজী বলছেন জগতে কয়েকটি মৌলিক চিন্তা আছে, ওই কটি জিনিসকে বুঝে নিলে বাকি জিনিস গুলো বুঝতে কঠিন হবে না। বিশ্বের প্রত্যেকটি দর্শনকে জীব, জগৎ, ঈশ্বর আর মায়া এই চারটে জিনিসকে ব্যাখ্যা করতে হয়। মার্ক্সবাদী দর্শন ঈশ্বরের ব্যাপারে বলবে ঈশ্বর বলতে কিছু নেই। সেইজন্য মায়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠবে না। থেকে গেল জীব আর জগৎ, মার্ক্সবাদীরা জীব আর জগতকে ব্যাখ্যা করবে। বস্তুবাদীরা অবশ্য জগতকেও ব্যাখ্যা করতে যাবে না, জীবকে ব্যাখ্যা করবে বাবা-মায়ের সম্পর্ক থেকে জীবের উৎপত্তি। যে কোন বস্তুবাদী দর্শন এখানেই শেষ। বিজ্ঞান এদের থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে জগতকেও ব্যাখ্যা করে। জীবের ব্যাখ্যা একই থাকে কিন্তু তার সাথে জগতেরও ব্যাখ্যা দেবে। আর আধ্যাত্মিক দর্শন ঈশ্বরকেও নিয়ে আসে। হিন্দু,

খ্রীশ্চান, মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা করলেও জীব, জগৎ আর ঈশ্বর এই তিনটেকে তারা ব্যাখ্যা করবেই। বেদান্ত বা আমাদের দেশের যত উচ্চমার্গের দর্শন রয়েছে, বেদান্তের আবার দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত রয়েছে, এরা সবাই মায়াকেও ব্যাখ্যা করে। এই চারটেকে ব্যাখ্যা করে দিলে সব দর্শনই এসে যাবে। অদ্বৈত বেদান্তের বৈশিষ্ট্য হল ব্রহ্ম, ব্রহ্ম না বললেও চলে, কারণ যখন ঈশ্বর আর মায়াকে ব্যাখ্যা করা হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই ব্রহ্ম তার মধ্যে এসে যাবে। এই চারটের বাইরে পঞ্চম কিছু নেই যে দর্শন ব্যাখ্যা করতে যাবে। ঘুরে ফিরে সব দর্শন এই চারটে জিনিসকেই ব্যাখ্যা করে। বিশ্বে যত উপন্যাস আছে সব উপন্যাসেই প্রেমিক আর প্রেমিকা থাকবে, তার সাথে হয় তাদের মিলন নয়তো বিচ্ছেদের কথা বলবে। এই কটি জিনিসকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ উপন্যাস তৈরী হয়েছে। একবার এর সারটুকু বুঝে নিতে হবে আর বাকিটা তারই বিস্তার। সার যদি একবার জানা হয়ে যায় বিস্তারের আর কোন দাম থাকে না। সেইজন্য সারটাই জানতে হয়, বিস্তারের দিকে যেতে নেই। সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে বলতে গিয়ে দেবর্ষি নারদ বলছেন –

ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্যাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ।
ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা।২/১/১১

ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে, আপনি শুধু কাছে যান তাতেই সৃষ্টি হয়ে যায়। এনারা লোহা আর চুম্বকের উপমা নেন। লোহার ছোট ছোট টুকরোর কাছে চুম্বক নিয়ে এলেই লোহার টুকরোগুলো নড়তে শুরু করে। পদার্থ বিজ্ঞান বলছে, তারের মধ্যে যদি একটা চুম্বককে নাড়ান হয় তখন সেখান থেকে তড়িৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। চুম্বক না থাকলে তড়িৎ শক্তি তৈরী হবে না। তড়িৎ শক্তিতে এত কিছু হচ্ছে, পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এসি চলছে, টিভি চলছে, ফ্রীজ চলছে, মেশিন চলছে অথচ অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি জিনিস, কটি তার জড়ান আর তার মধ্যে চুম্বক রাখা, আর কিছু নেই। ঋষিদের সময় ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, কিন্তু এই ভাবটা এসেছে সাংখ্য দর্শন থেকে। সাংখ্য দর্শনে দুটি সত্তা, পুরুষ আর প্রকৃত। প্রকৃতি হল জড়, জগতে যাবতীয় যা কিছু আছে তার সার হল প্রকৃতি। পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে আসে প্রকৃতি তখন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই চঞ্চল হওয়াটাই সৃষ্টি। প্রকৃতির কাছ থেকে পুরুষ সরে এলে সমস্ত সৃষ্টি বিলীন হয়ে যাবে।

আর বলছেন *ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা*, ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সব সময় আপনাকেই আশ্রয় করে আছে। আপনাকে আশ্রয় করে থাকার জন্য প্রকৃতিকে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণে দেখাচ্ছে। তিনটে গুণ এক অপরের সাথে যখন মিশতে থাকে তখনই সৃষ্টি কার্য শুরু হয়। বেদান্তে সৃষ্টি তত্ত্বকে বারবার নিয়ে আসবে। গীতায় এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে সৃষ্টি তত্ত্বকে অনেক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে সৃষ্টি তত্ত্বকে বিস্তারিত করে বলেছেন আবার সপ্তদশ অধ্যায়েও নিয়ে এসেছেন, কিন্তু চতুর্দশ অধ্যায় পুরোটা সৃষ্টি তত্ত্বের জন্যই রাখা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে থেকে থেকে সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে আসা হয়েছে। সৃষ্টি তত্ত্বটাই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ মানে আমি কে আর তুমি কে, এনারা দেখাচ্ছেন সৃষ্টি কি আর স্রষ্টা কে। সত্ত্ব, রজো আর তমো আসা মানেই সৃষ্টির এলাকায় এসে গেল। আমাদের সবার মধ্যেও দুটো জিনিস আছে, স্রষ্টা আছেন আর সৃষ্টি আছে। কার্যটা সৃষ্টি আর কারণ হলেন স্রষ্টা। আমার আপনার বাস্তবিক স্বরূপ সৃষ্টি নয়, আমাদের বাস্তবিক স্বরূপ হলেন স্রষ্টা। এই জিনিসটাকে বোঝানর জন্য বারবার সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে আসা হয়। সত্ত্ব, রজো আর তমো তিনটে গুণকে নিয়ে এত কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য, আমাদের দেখাতে চাইছেন যে, যেখানে অত্যন্ত ভালো কিছুও দেখ সেটাও সৃষ্টির এলাকা, জঘন্য বাজে জিনিস যদি দেখ জানবে সেটাও সৃষ্টির এলাকা। সৃষ্টির এলাকার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমার অন্তর্যামীকে আশ্রয় করে তোমার এই শরীর খেলা করছে, তোমার মুখ থেকে মিষ্টি মিষ্টি ভালো ভালো কথা বেরচ্ছে এটাও সৃষ্টি, তোমাকে কেউ গালাগালি দিচ্ছে সেটাও সৃষ্টি। দুটোর পেছনে সেই এক অন্তর্যামী। আধ্যাত্মিক জীবন যদি গ্রহণ করতে চাও তাহলে জেনে রাখো, মিষ্টি কথারও কোন দাম নেই, মন্দ কথারও কোন দাম নেই। এই একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য বারবার সৃষ্টি তত্ত্বকে নিয়ে আলোচনা করছেন, এটাই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ মানে বিচার। কিসের বিচার? ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। বাকি সবটা কি? বাকি সব হল সৃষ্টি। সৃষ্টি মানেই সত্ত্ব, রজো আর তমো। যে জিনিসটাকে তুমি ভালোবাসছ, যে জিনিসটা থেকে তুমি পালাতে চাইছ, বিচার করে দেখ সেই জিনিসটা কি। এটাই সৃষ্টি। সৃষ্টির সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, যার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই কেন তোমাকে পালাতে হবে! কেন একে তাকে ভালোবাসতে যাবে! এই কারণেই সৃষ্টি তত্ত্বকে বারবার নিয়ে আসা হয়।

সুতেহজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্বদা প্রজাঃ।
লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্তুমুদাহৃতঃ।২/১/১২

ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনাকে আশ্রয় করে শুক্ল, কৃষ্ণ ও লোহিত অর্থাৎ সত্ত্ব, রজো আর তমোগুণ সমন্বিত প্রজা উৎপন্ন করেন। ঠাকুরও সত্ত্ব, রজো আর তমোকে নিয়ে প্রচুর কথা বলছেন। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময় অনেকের মনে হয় ঠাকুর কেন এত সত্ত্ব, রজো আর তমোকে নিয়ে বলছেন। এগুলো বোঝার জন্য একটু উন্নত আধ্যাত্মিক মানসিকতার দরকার। পরে বেদান্ত অধ্যয়ন করতে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যায়, বেদান্তে এই তিনটে গুণকে নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়। পাশ্চাত্যের লোকেরা তিনটে গুণকে ধারণা করতে পারবে না বলে স্বামীজী ওদের সামনে সত্ত্ব, রজো আর তমো নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেননি। স্বামীজী অবশ্য সেই সব ক্ষেত্রে অন্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। ঠাকুর কিন্তু সব কিছুতেই সত্ত্ব, রজো আর তমোকে নিয়ে এসেছেন, এমনকি ভক্তিকেও সত্ত্ব, রজো আর তমো দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন, ভক্তির সত্ত্ব হলে কি হয়, ভক্তির রজো হলে কি হয়, ভক্তির তমো হলে কি হয় পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। এই তিনটে গুণ, মন্দ, মধ্যম আর ভালো, গতির দিক দিয়ে দেখলে পুরো স্থবির, চলন্ত আর সাম্য অর্থাৎ চলতেও পারে আবার থামতেও পারে, পুরোটা নিজের নিয়ন্ত্রণে, এই তিনটে গুণকে নিয়ে পুরো জগতকে দেখাচ্ছে। সত্ত্ব, রজো আর তমো থাকা মানেই সৃষ্টি। তিনটে গুণ যেখানে যেখানে আছে তার সবটাই সৃষ্টির এলাকা। শাস্ত্র আমাদের বোঝাতে চাইছেন, যে জিনিসের সাথে সত্ত্ব, রজো আর তমো জড়িয়ে আছে সেই জিনিসের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। অধ্যাত্ম রামায়ণ অতি উচ্চমানের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, ঘুরে ঘুরে এই বিষয়কে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবেন। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কলকাতার লোকেদের ত্যাগের কথা বেশি বললে ওরা আর এদিকে পা বাড়াবে না, সেইজন্য ওদের বলি তোমরা এও কর ওও কর। সংসারীদের সব কিছুকে নিয়েই চলতে হয়, কিন্তু তার জন্য আদর্শকে জেনে বিসর্জন না দিয়ে দেয়। এরপর তের থেকে আঠার নম্বর শ্লোক পর্যন্ত সৃষ্টিতে বিখ্যাত বিখ্যাত দম্পতিদের নাম উল্লেখ করে শ্রীরামচন্দ্র আর সীতার সাথে তুলনা করে বলছেন।

ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মী শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা।২/১/১৩

হে রাম! আপনি সেই বিষ্ণু আর জানকী লক্ষ্মী, আপনি শিব আর সীতা শিবা অর্থাৎ পার্বতী। আপনি ব্রহ্মা আর জানকী বাণী। পুরাণে বাণী শব্দ আবার খুব জটিল, বাণীর একটা অর্থ সরস্বতী, বলা হয় যে সরস্বতীকে দেখে ব্রহ্মা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখলে বাণীর অর্থ অন্য রকম হয়ে যাবে। এখানে বাণী বলতে বোঝাবে বেদ, আবার ব্রহ্মার যে এত প্রসিদ্ধি তার প্রধান কারণ হল ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ বেরিয়েছে। বেদকে যেমন সৃষ্টির মূল বলা হয় তেমনি ব্রহ্মাও হলেন এই সৃষ্টির মূল। ভারতের লোকেরা আবার অমূর্ত কোন জিনিসকে নিতে পারে না, সবেতেই তাদের একটা শরীর চাই। তাই বাণীরও একটা শরীরের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন মেটাতে বাণীকে সরস্বতীর শরীর রূপে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী দিয়ে যদিও বাণীকে সরস্বতী রূপে দাঁড় করান হয়েছে, কিন্তু যুক্তিতে জিনিসটা দাঁড়ায় না। আবার বলছেন, হে রাম! আপনি সূর্য আর জানকি প্রভা। অন্য দিকে সূর্যেরও স্ত্রী আছে। বিশ্বকর্মার এক মেয়ে সন্ধ্যার সাথে সূর্যের বিবাহ হয়েছিল। বলে নাকি যে সূর্যের এত তেজ যে সন্ধ্যা তাঁর কাছে যেতে পারতেন না। তাই বিশ্বকর্মা মেয়ের দুরবস্থা দেখে র‍্যাঁদা দিয়ে সূর্যের দাড়ি কামিয়ে দিলেন। তাতে সূর্যের রশ্মি অনেকটা কমে গেল। এগুলো সব আখ্যায়িকা, বসে বসে সব কাহিনী বানিয়ে যেতেন। শিষ্যরা এগুলোকেই আবার সত্য বলে মনে করত, সেখান থেকে আবার কল্পনা তৈরী হতে থাকল, সেই কল্পনা থেকে আবার কাহিনী বেরোতে থাকল, এগুলোকে তাই খুব আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। এরমধ্যে যে তত্ত্ব আছে তাতেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে, সেটা নিয়েই চলতে হবে। আর বলছেন –

ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতা তু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌসোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্।২/১/১৪

চন্দ্রমার স্ত্রী রোহিণী, পুরাণে এর লম্বা কাহিনী আছে। চন্দ্রমা যখন রোহিণী নক্ষত্রের কাছাকাছি থাকে তখন নাকি চন্দ্রমাকে খুব সুন্দর লাগে, চন্দ্রমা খুব জ্বল জ্বল করে। সেই চন্দ্রমা হলেন আপনি আর সীতা সেই রোহিণী। হে রাম! আপনি হলেন দেবরাজ ইন্দ্র আর সীতা হলেন পুলহ ঋষির কন্যা শচী। আপনি অগ্নি আর সীতা হলেন

স্বাহা। অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার সময় বলা হয় স্বাহা, কিন্তু তাতেও শান্তি নেই, স্বাহাকে একজন নারী বানিয়ে অগ্নির সাথে বিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে বলছেন, আপনি হলেন যম সীতা সংযমনী। আপনি নিঋতি সীতা তামসী। নিঋতি হল negative power, রাক্ষসের মত, যেখানেই চলে যাবে সেখানেই সংহার শুরু হয়ে যাবে। আপনি যদি নিঋতি হন সীতা তাহলে তামসী। আপনি বরুণ, জানকী বারুণী। বারুণী ভৃগু ঋষির কন্যা ছিলেন। আপনি হলেন বায়ু আর সীতা হলেন সদাগতি। আপনি হলেন কুবের আর জানকী সম্পত্তি। আপনি হলেন রুদ্র সীতা রুদ্রাণী। এত কিছু বলার পর আঠারো নম্বর শ্লোকে উপসংহার করছেন। শুরু হয়েছিল বিষ্ণু থেকে যিনি ভগবান, সেখান থেকে নিয়ে গেছে দেবতাদের মধ্যে, দেবতাদের থেকে নিয়ে গিলেন যক্ষাদিতে এমনকি যেখানে নেতিবাচক শক্তি আছে সেখানেও নিয়ে গেছেন, আর শেষ করছেন –

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং জানকী শুভ।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্বং ত্বং হি রাঘব।২/১/১৮

পৃথিবীতে পুং বাচক যা কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি বা জানি সব হলেন আপনি শ্রীরামচন্দ্র। আর স্ত্রীবাচক যাবতীয় কিছু আছে, স্ত্রী লিঙ্গ বলতে যেটাই বোঝায়, তা সে শব্দই হোক, বস্তু হোক আর জীবন্তই হোক সব হলেন জানকী। এই মূল কথাটি বলার জন্য আগে এত কিছু বলা হল। হিন্দী ভাষাতে সব শব্দই হয় স্ত্রীলিঙ্গ হবে নয়তো পুংলিঙ্গ হবে, সংস্কৃতেও অনেক শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ করা হয়। ইংরাজী ভাষায় এই জিনিসটা উঠেই গেছে কিন্তু লাটিন ভাষাতে এখনও স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের সমস্যা আছে। এখানে কিন্তু সেই দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে না, একটাই আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বকে নিয়ে আসা হয়েছে। সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হল, তুলসিদাস বলছেন সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, পুরো যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমি তাকে জানি সীতা আর রামময়, সীতা আর রামের বাইরে জগতে কিছু নেই। শ্রীমা বলছেন, আমি বৈকুণ্ঠে তাঁর পদসেবা করতাম। তার মানে আমরা মনে করছি শ্রীমা লক্ষ্মী আর ঠাকুর নারায়ণ, সেই বিষ্ণু। কিন্তু এটা মতুয়ার বুদ্ধি, জিনিসটা তা নয়। যা কিছু আছে, পোকা-মাকড়, রাক্ষস-রাক্ষসী, অসুর-অসুরী যত আছে সবই শ্রীরামকৃষ্ণ আর শ্রীমা। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সব কিছুকে সেই এক সত্তা এই সত্যকে নিতে পারি না। আমরা বলি বটে *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, কিন্তু ব্যবহার কালে আমরা এই সত্যকে ধরে রাখতে পারি না। আমরা জানি আমি পুরুষ সে নারী, পুরুষ আর নারীতে অনেক ভেদ দেখছি। আমরা যাই করে থাকি না কেন, যেখানেই যত উচ্চ অবস্থাতে যাই না কেন, পুরুষ নারীর এই ভেদ দৃষ্টি আমাদের যেতে চায় না।

মানুষের মনের গঠন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বৈত ভাব দিয়ে গঠিত। সেইজন্য দ্বৈতবাদ কোন দর্শন হতে পারে না, যে জিনিসটা স্পষ্টত প্রতীয়মান সেই জিনিস দর্শন কি করে হবে! আমি ভাত খাই, এই কথা দিয়ে কোন সাহিত্য হয় না। সাহিত্য হতে গেলে জিনিসটা অন্য ভাবে যাবে, ক্ষুধা জিনিসটার উপর চলে যাবে। একটা মানুষ তিন চার দিন অভুক্ত, এরপর সেই মানুষের মনের যে অবস্থা, ওই অবস্থাকে শব্দ, অলঙ্কার দিয়ে যে বর্ণনা করা হবে তখন সেই বর্ণনা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে। যে জিনিসটা স্বাভাবিক নয়, সেই জিনিসের বর্ণনা দিয়েই সাহিত্য হয়। ঠিক তেমনি যে জিনিসটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, দর্শন সেখান থেকে শুরু হয়। দ্বৈত পুরোপুরি স্বাভাবিক, আপনি আলাদা আমি আলাদা এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য অন্য কিছুর সাহায্য লাগে না, কারণ মানুষের মন স্বাভাবিক ভাবেই দ্বৈত। সেইজন্য অধ্যাত্ম রামায়ণাদি বা যে কোন ধর্ম সব সময় চেষ্টা করে আমাদের যেটা স্বাভাবিক সেটাকে অবলম্বন করে আমাদের মধ্যে ধর্ম ঢোকান। *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*, এই চরম সত্যকে ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বলছেন যত পুরুষ সব বিষ্ণু, যত নারী সব লক্ষ্মী। এখন এই লক্ষ্মী আর বিষ্ণু মানে সত্ত্বগুণে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সৃষ্টিতে রজোগুণও আছে আর তমোগুণও আছে। সেইজন্য ধাপে ধাপে নামাচ্ছেন। নামাতে নামাতে মনটা একটু যেই প্রস্তুত হয়ে গেল তখন বলে দিলেন যাবতীয় যা কিছু পুং বাচক আছে সব শ্রীরাম আর স্ত্রী বাচক যা কিছু সব সীতা। সেখান থেকে তারপর নিয়ে যাবেন *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মে*। কথামৃতেও ঠাকুরের কথায় এই শ্লোকের ভাব পাওয়া যায়।

আধ্যাত্মিক জীবনের উত্থান যাদের কাম্য তাদের জন্য তিনটে পথ, প্রথমটা শ্রেষ্ঠ পথ, বেদান্ত যেটা বলছে, আত্মা ছাড়া কিছু নেই বা ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই। দ্বিতীয় পথ, যদি ওই উচ্চাবস্থায় না যেতে পারে তাহলে তাদের জন্য হল সিয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু, পুং বাচক যা কিছু সব শ্রীরাম আর স্ত্রী বাচক যা কিছু সীতা। এবারে রাস্তা ঘাটে, সমাজে, পরিবারে যত নারী আছে সবাইকে আমি মা সীতা রূপ দেখছি, কারুর প্রতি যে আমি কুদৃষ্টি দেব

সেটা আর সম্ভবই হবে না। আর আমি সব পুরুষকে শ্রীরামচন্দ্র দেখছি, এরপর কাউকে ছোট করা, কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মানসিকতাই থাকবে না। এটাও যে পারবে না তার জন্য তৃতীয় পথ, যেখানে ধর্ম, মূল্যবোধ, নীতিবোধ এগুলোকে নিয়ে চলতে হয়। অপরের জিনিস চুরি করতে নেই, অপর নারীর প্রতি দৃষ্টি দিতে নেই, কাউকে হিংসা করতে নেই, ভালো কর্ম করলে পূণ্য হবে, খারাপ কর্ম করলে পাপ হবে। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে আরও ভালো তৈরী করার চেষ্টা করা, আধ্যাত্মিক পথে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা। উচ্চস্তরে অদ্বৈত চলে, দ্বিতীয় স্তরে দ্বৈত চলে আর তৃতীয় স্তরে মূল্যবোধ, নীতিবোধ চলে। মনুস্মৃতি আদি যত স্মৃতি শাস্ত্র আছে সব মূল্যবোধ, নীতিবোধের উপর চলে। তোমার বুদ্ধি এখন স্থূল অবস্থায় আছে, তুমি এত উচ্চ তত্ত্বের কথা বুঝতে পারবে না, তাই সমাজে, পরিবারে চলার জন্য তোমাকে এই এই আচরণ, এই এই ধর্ম পালন করতে বলে দেওয়া হল, এই ভাবে চলে তুমি আগে নিজেকে শুদ্ধ করে উন্নত হও, তারপর তুমি উচ্চ কথাগুলো ধারণা করতে পারবে। কিন্তু ইদানিং মানুষ মূল্যবোধ, নীতিবোধকেও মানছে না, তাই ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড দিয়েই সব কিছুকে চালাতে হচ্ছে। এখন যদি জেনে যায় সবাই ব্রহ্ম তখন কেউ আর কোন নারীর উপর অত্যাচার করতে যাবে না। যদি জানে সীতা তাও অত্যাচার করবে না আর নীতিবোধ থেকে যদি জানে কোন মেয়েকে অত্যাচার করা ঠিক নয়, তাহলেও সমাজে কোন গোলমাল হবে না। কিন্তু এখন হয়ে গেছে আইন, আইন মানে তুমি যদি ধরা না পড় তাহলে তুমি বেরিয়ে গেলে। তাই যে যেখানে সেখানে যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। সারা দেশ উচ্ছন্নে চলে যাচ্ছে আর নেতারা আরও আইন বানিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাতেও কিছু হচ্ছে না। মানুষকে শুভ পথে আরও উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই তিনটে স্তরেই সম্ভব। চতুর্থ হল পেনাল কোড, যে কোন দেশের পক্ষে পেনাল কোডকে নিয়েই চলা মানে সব থেকে খারাপ অবস্থা। অধ্যাত্ম রামায়ণে দ্বিতীয় স্তরটাকে নিয়ে চলছেন, সাধারণ মানুষ যেভাবে আধ্যাত্মিকতাকে বুঝতে পারবে সেইভাবে বলছেন। সাধারণ মানুষের উপযোগী করে তাই বলছেন পুরুষ বাচক যা কিছু আছে সবই আপনি আর স্ত্রী বাচক জগতে যা কিছু আছে সব সীতা হয়েছেন। পরের শ্লোকে বলছেন –

তস্মালোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন।২/১/১৯

ত্রিজগতে যা কিছু আছে আপনাদের দুজন ব্যাতিরেকে আর কিছু নেই। একই কথা তুলসীদাসও বলছেন, সীয়ারাম ম্যায় সব জগ জানু। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সীতা আর রাম ছাড়া আর কিছু নেই। আমরা অনেকেই এগুলোকে কবিতা মনে করি, অনেক সময় ভাবছি ভক্তির উচ্ছাস। কিন্তু তা নয়, এটাই সত্য।

কুড়ি, একুশ আর বাইশ নম্বর শ্লোকে বলছেন সৃষ্টি কিভাবে হয়। যখন ঈশ্বর বা শ্রীরামচন্দ্র প্রকৃতি কিংবা মায়ার কাছে চলে যান তখন প্রকৃতি ঝলমলিয়ে হয়ে ওঠে, প্রকৃতি যেন তখন জেগে ওঠে। সিনেমার পর্দায় প্রজেক্টরের আলো পড়লে পর্দা যেমন ঝলমল করে ওঠে, ঠিক তেমনি চৈতন্য যেমনি প্রকৃতির কাছে চলে যায় তখনই প্রকৃতি চৈতন্যের আলোতে চনমনে হয়ে ওঠে। প্রকৃতির তখন দুটি রূপ হয়, একটা ব্যষ্টি রূপ আরেকটি সমষ্টি রূপ। জেগে ওঠার পর প্রকৃতি থেকে প্রথম যে জিনিসটা বেরিয়ে আসে তাকে বলা হয় মহৎ। মহৎ হল সমষ্টি বুদ্ধি। মহৎ থেকে আরেক ধাপ নামার পর আসে অহঙ্কার, অহঙ্কারে ওই যে সমষ্টি বুদ্ধি সে এবার নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে, আমি আছি। বেদান্ত সাধকের সাধনার শেষ কথা হল *অহং ব্রহ্মাস্মি*। তাহলে সৃষ্টির প্রথম কথা কি? সেই ঈশ্বর প্রকৃতির মাধ্যমে যখন সৃষ্টি করতে শুরু করেন তখন প্রথম কথা হয় *অহম্ অস্মিন্*, আমি আছি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বলছেন সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বরের প্রথম বোধ হয় *অহম্ অস্মিন্*, আমি আছি। সাধারণ জীবের মধ্যে যখন *অহম্ অস্মিন্* থাকে তখন সেটাই অজ্ঞান, আমি আছি এই বোধ আমাদের সবারই আছে। কিন্তু কোন কোন দুর্লভ পুরুষের যখন অজ্ঞান চলে গিয়ে জ্ঞান হয়ে যায় তখন বলে *অহং ব্রহ্মাস্মি*। আমি আছি এটাই অজ্ঞান আর আমিই সেই ব্রহ্ম, এটাই জ্ঞান। ভগবানেরও ঠিক তাই হয়, যখন তাঁর বোধ হয় *অহং ব্রহ্মাস্মি* তখন সৃষ্টি কার্য বন্ধ। কিন্তু *অহম্ অস্মিন্* বোধ এসে গেলে সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। কিভাবে সৃষ্টি হয়? তখন মায়ার আবরণ দিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলেন, যে ঈশ্বর শুদ্ধসত্ত্ব তিনিই তখন দেখান সমষ্টি বুদ্ধি রূপে, যার নাম মহৎ। মহতে তিনি একেবারে শুদ্ধ বুদ্ধি হয়ে আছেন। ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ।

সমষ্টি বুদ্ধি তখন কি করে? তখন সে নিজেকে ধ্যান করে, নিজেকেই সে ভাবে। কি ভাবে? ওর বোধ হয় *অহম্ অস্মিন্*। শ্রীমা নিজের ধ্যানের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইতেন না। একদিন কোন এক প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, একদিন শ্রীমা ধ্যানের খুব গভীরে চলে গেছেন। সেখান থেকে যখন নামছেন তখন তিনি বলছেন, গোলাপ! আমার

হাত কোথায়? আমার পা কোথায়? শ্রীমা তখন ওই বোধকে নিয়ে আসছেন, *অহম্ অস্মিন্* আমি আছি। অহঙ্কার মানে ওই *অহম্ অস্মিন্*। *অহম্ অস্মিন্* বোধ চলে আসার পর থেকে সৃষ্টি শুরু হয়, সেখান থেকে এক এক করে পঞ্চ তন্মাত্রা সৃষ্টি হতে থাকে। পঞ্চ তন্মাত্রা হল একেবারে শুদ্ধ গুণ। ওই পঞ্চ তন্মাত্রার পর পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু ও তেজ এই পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ যখন হতে থাকে তখন সেখান থেকে ইন্দ্রিয়ের আর তার সাথে ইন্দ্রিয়ের বিষয় বস্তু সমূহের সৃষ্টি হয়। এরপর ইন্দ্রিয় আর বস্তুর খেলা শুরু হয়ে যায়। এটাই সৃষ্টি। ওই সমষ্টি বুদ্ধি যখন কোন একটা স্বতন্ত্র জিনিসকে ভাবতে শুরু করে, এটা আমি, তখনই আমরা তাকে বলি লিঙ্গ দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে মন এর নাম মহৎ। এই মহৎ নিজেকে যতক্ষণ আমি আছি দেখছে ততক্ষণ কিন্তু সৃষ্টি এগোবে না। সৃষ্টি যখন বহু রূপে এগোতে শুরু করে তখন অনেক কিছুই এসে যাচ্ছে। অনেক কিছু যে হয়ে যাচ্ছে, এরও সবটাই সমষ্টি, মহৎ যখন এই সমষ্টিকে আমি রূপে নিজেকে দেখে তখন সৃষ্টি বলে কিছু থাকে না। কিন্তু মহৎ যখন অনেক কিছুর থেকে একটা কিছুর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে নেয়, তখন একজন ভদ্রলোক হয়ে গেল। আরেকটা বিশেষ কিছুর সঙ্গে জুড়ে নিলে আরেকজন ভদ্রলোক হয়ে গেল, সেখান থেকে আরেকটা বিশেষ কিছুর সঙ্গে জুড়ে নিয়ে আরেকজন মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। এই করেই একজন বাবা, একজন তার ছেলে আরেকজন তার বৌমা হয়ে গেল। মাঝখান থেকে দুই নম্বর মরে গেলে বাকি দুজন কাঁদতে শুরু করবে। কে কার জন্য কাঁদছে, এক নম্বর দু নম্বর বলতে তো কিছু নেই, আছে তো শুধু মহৎ, মহৎ ছাড়া তো কিছু নেই। তাহলে যখন কাঁদছে তখন কে কাঁদছে? মহৎই কাঁদছে। কার জন্য কাঁদছে? দু নম্বরের জন্য কাঁদছে। দু নম্বর তো কোথাও যায়নি। দু নম্বর যদি শরীর পাল্টে কোথাও জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়ায় সে এগারো নম্বর হয়ে কোথাও দাঁড়িয়ে গেছে। যদি না জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে মহতেরই কোথাও ভাসছে। মহতই কাঁদছে, মহতের জন্যই মহৎ কাঁদছে। কোন রূপে কাঁদছে? এক আর তিন নম্বর রূপে কাঁদছে। মহতই এক হয়ে দুইয়ের জন্য কাঁদে, যে দুই এখন এগার নম্বর হয়ে সমষ্টির কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। এটাই সৃষ্টি, এছাড়া আর কিছু নেই।

এই যে এক নম্বর, দু নম্বর, তিন নম্বর হয়ে আছে, এটাকেই আমরা বলি দেহ। দেহের ভেতরে যেটা থাকে তাকে বলছি লিঙ্গ দেহ, বাইরের দেহকে স্থূল শরীর বলছি। অন্ন ভক্ষণ করলে স্থূল শরীরের বৃদ্ধি হয়, অন্ন ভক্ষণ না করলে স্থূল শরীরটা নাশ হয়ে যাবে। নাশ হয়ে কোথায় যাবে? কিছুই নয়, দু নম্বর হয়ে গেল, দু নম্বর হয়ে স্বর্গের কোথাও থাকবে। তারপর আবার একটা শরীর নিয়ে এগারো নম্বর হয়ে দশ নম্বরের সাথে জড়িয়ে যাবে। যখন এক নম্বর দু নম্বরের জন্য কাঁদছে, তখন দেখবে দু নম্বর এগারো নম্বরের হয়ে দশ নম্বরের সাথে জড়িয়ে আছে। আমরা যে কার জন্য কাঁদছি জানিই না। এক নম্বর কখনই কাঁদে না, এক নম্বর বলে তো কিছু নেই, আছে মহৎ, মহৎই এক নম্বর হয়ে কাঁদছে। যখন এক নম্বর বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে আমার আর কিছু লাগবে না, তখন সে ওই যে বিশেষ স্বতন্ত্র কিছুর সঙ্গে মহৎ নিজেকে জুড়ে রেখেছিল সেটা কেটে যায়। কেটে যাওয়ার ফলে তখন সে সমষ্টির সাথে আবার মিশে গেল। তাহলে দু নম্বর কোথায় যাবে? কোথাও যাবে না, দশ হয়ে এগারোর সাথে যা করছিল তাই করতে থাকবে, এভাবেই জগতের খেলা চলতে থাকবে।

সৃষ্টি যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মহতের যে বিস্তার ছিল সেটা ভেঙে গিয়ে শুধু সার রূপে থেকে যাবে। মহৎও কিন্তু মায়া, এটাও অবিদ্যা। মহৎ যে এতক্ষণ নিজেকে *অহম্ অস্মিন্* ভাবছিল, *অহম্ অস্মিন্* ভাবাটা চলে গিয়ে প্রকৃতি মধ্যে লয় হয়ে যাবে। প্রকৃতি হল মায়া, ওই মায়ার আবরণও যখন চলে যাবে, তখন যিনি ছিলেন তিনিই থাকবেন। এই জিনিসটাকেই দুটো শ্লোকে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। আমি বলতে কে? খুব হলে আমার ভেতরে যে সূক্ষ্ম শরীর তার কথা ভাবছি। ইদানিং কেউ মারা গেলে ইংরাজী শোকাবার্তা পাঠানোর একটা রেওয়াজ হয়েছে, সেখানে শেষে বলে May his soul rest in peace। এর থেকে বড় মুর্খ কথা কি কিছু হতে পারে! খ্রীশ্চানদের জন্য এই ধরণের কথা ঠিক আছে। তাদের কাছে জীব একবারই জন্ম নেবে, মানুষের জীবন মানেই one time affair, মরে যাওয়ার কোথায় পড়ে থাকবে কেউ জানে না, ওরা বলে ওর সোল তড়্পাতে থাকে। আমাদের এখানে জীবাত্মা তড়্পায় না, মৃত্যুর পর কদিন এদিক ওদিক ঘুরবে তারপর একটা শরীর নিয়ে আবার চলে আসবে।

মহতের ক্ষেত্রে যে এক নম্বর, দশ নম্বর বলা হল, মনে করলাম আমি হলাম এক নম্বর। এবার আমি যদি জগতের দিকে মুখ না দিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে যাই তখন ধীরে ধীরে আমি মহতের সাথে এক হয়ে যাব। মহতের সাথে এক হয়ে যাওয়া মানে সমষ্টি মনের সাথে এক হয়ে যাওয়া। তখন দু নম্বরের মনে কি হচ্ছে, দশ নম্বর

এগারো নম্বরের মনে কি হচ্ছে আমি জানতে পারব। মহাসমুদ্রের জল ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে। ওই বরফে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। আমি সেই একটি ছিদ্র, আপনিও একটা ছিদ্র। ওর মধ্যে একটি মাছ ওই ছিদ্রতে আছে, আরেকটি মাছ আরেকটি ছিদ্রতে আছে। এবার ওই মাছটা ভাবল দেখিতো ওই ছিদ্রের মাছটা কি করছে। কিন্তু জানার কোন পথ নেই। জানতে হলে কি করতে হবে? ছিদ্রে তলাতেও বরফ, ওই বরফকে ছেঁদা করে নীচে চলে যেতে হবে। তার মানে সে এবার সমুদ্রে ঢুকে গেল। এবার সে যে ছিদ্রতেই যেতে চাইবে সেই ছিদ্রতেই যেতে পারবে। কারণ ওপর দিয়ে তো সে যেতে পারবে না। কখন কখন কোন অজ্ঞাত কারণে এর তার ছিদ্রগুলো মিলে যায়। যেমন মা আর ছেলে সব সময় মিলে থাকে। অবশ্য আজকাল আর মিলে থাকে না। কারণ মাতৃত্বের ভাবটাই এখন হারিয়ে যাচ্ছে, এই মাতৃত্বের ভাব জাগাবার জন্যই ঠাকুর এসেছেন। কিছু দিন আগে একজন গৃহশিক্ষিকা তিন বছর বাচ্চাকে এমন মেরেছেন যে বাচ্চাটির জীবন সংশয় হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে খবর কাগজ, টিভিতে খুব হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। ফেসবুকে একজন মহিলা খুব কড়া ভাষায় লিখছেন, যখন ওই শিক্ষিকা বাচ্চা মেয়েটিকে মারছিল তখন তার মা কি করছিল? মা কি বসে বসে সিসিটিভি মনিটরিং করছিল নাকি! আর মায়ের instinctটা গেল কোথায়? যে কোন বাচ্চার কষ্ট হলে মা তো বুঝতে পারে। বাচ্চাকে এভাবে মারছে আর মা বুঝতে পারেনি সে কিসের মা! আগেকার দিনের পঁচিশ বছরের মহিলাকে দেখে মনে হত মা, এখন পঞ্চাশ বছরের মহিলাকে দেখলে মনে হবে বিয়ে করতে যাচ্ছে। জগৎ থেকে মাতৃত্ব ভাব উঠেই গেছে। তিন বছরের বাচ্চাকে মারছে, মা পাশের ঘরে আর তার মধ্যে mother instinct কাজ করছে না! অবশ্যই করছিল না, সন্তানের সাথে মায়ের মাতৃত্ব disconnect হয়ে গেছে। তার থেকেও বড়, তিন বছরের বাচ্চাকে গৃহ শিক্ষকের কাছে কেন পড়তে হবে! আমাদের সময়ে বেশির ভাগ মায়েরা মুর্খ ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও পাঁচ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের পড়াতেন। আর তিন বছরের বাচ্চাকে দরজা বন্ধ করে পড়াতে হচ্ছে, মা কি পাশের ঘরে টিভি দেখছিল নাকি! এরাই আবার বলে জীবনে শান্তি নেই, আমি শান্তি খুঁজছি।

ঠাকুর বলছেন, আমার কাছে কেউ এলেই কাঁচের আলমারিতে যেমন সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়, আমিও তার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাই। কারণ ঠাকুর সমষ্টি মনের সাথে, ওই মহতের সাথে এক হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে যে কোন ছিদ্র দিয়ে উনি ঢুকে যেতে পারেন। এটা কঠিন কিছু নয়, অত্যন্ত সহজ, দিনে এক ঘন্টা করে মন শান্ত করে একাগ্র হয়ে জপ করলে একদিন সবারই মন আপনি পড়তে পারবেন। আমাদের মন চঞ্চল হয়ে আছে বলে connect করতে পারছি না। মহতের স্তরে অবিদ্যা যখনই ভালো করে জড়িয়ে ধরে তখনই আমরা তাকে জীব বলছি। এক নম্বর, দু নম্বর যা কিছু আছে সবই জীব। আসলে জীব বলে কিছু হয় না, শরীরের দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে এই শরীরটা মহাজাগতিক ভৌতিক পদার্থ, মনের দিক থেকে দেখলে মন সেই সমষ্টি মনের সাথে জুড়ে আছে, আত্মার দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে সবটাই সেই বিশ্বাত্মা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রটাই মায়া, আলাদা আলাদা যা দেখছি এটাই মিথ্যা। এটা যেমন বেদান্তের একটা পথ, দ্বিতীয়ত আরেকটা পথের কথা এনারা বলেন, সেটাই দেবর্ষি নারদ পরের শ্লোকে বলছেন –

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা সৎসৃভির্যা প্রবর্ততে।
তথা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘুত্তম।২/১/২৪

বেদান্তের এটি একটি খুব বিখ্যাত আলোচনা, বিশেষ করে মাণ্ডুক্যোপনিষদের এটাই মূল আলোচ্য বিষয়, সেখানে বলছেন সৃষ্টির সময় তিনটে অবস্থার সৃষ্টি হয় – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। এই তিন অবস্থার বিচারও জ্ঞানযোগের অন্তর্গত, যাকে বলা হয় অবস্থাত্রয় বিচার। আগেরটা যেমন গুণত্রয় বিচার তেমনি এটা অবস্থাত্রয় বিচার। জেগে থাকলে আমাদের একটা অবস্থা হয়, ঘুমিয়ে আছি তখন একটা অবস্থা হয় আর গভীর নিদ্রায় চলে গেলে তখন আরেকটি অবস্থা হয়। জাগ্রত অবস্থায় আমরা সব কিছুই বুঝতে পারি, স্বপ্নের অবস্থাতেও পুরোটাই জানি আর গভীর নিদ্রায় চলে যাওয়ার পর সেই অবস্থাকেও জানতে পারি। গভীর নিদ্রার দুটি লক্ষণ, প্রথম লক্ষণ আমরা বলি আমার কিছু মনে নেই আর দ্বিতীয় বলে আনন্দে ছিলাম। গভীর নিদ্রার এই দুটো অনুভূতি ছাড়া আর কোন তৃতীয় অনুভূতি থাকে না। গভীর নিদ্রাকে সুষুপ্তিও বলা হয়। অল্প কিছু সময়ও যদি মানুষ সুষুপ্তিতে চলে যায় তাতেই সে তরতাজা হয়ে যায়, কারণ ওই অবস্থায় আত্মা তার আলম্বনগুলো ছেড়ে দেয়। আলম্বনগুলিকে ছেড়ে দিলেই আত্মার শান্তি হয়।

জীবের এই তিনটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। জীবের জাগ্রত অবস্থায় বহির্জগতের নির্মাণ হয়, স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নে যে বস্তুগুলি আসে তার নির্মাণ হয় আর সুষুপ্তি অবস্থায় সে অজ্ঞানের সাথে থাকে, কিন্তু আত্মার কাছাকাছি থাকে বলে আনন্দের অনুভূতি থাকে। কিন্তু আত্মা, অন্তর্যামী যিনি তিনি এই তিনটে অবস্থার পারে। ঠিক তেমনি ভগবানও এই তিনটে অবস্থার পারে। ভগবান যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁরও ওই তিনটি অবস্থা হয়, স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ আর কারণ জগৎ। কথামৃতে ঠাকুর অনেকবার বলছেন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, বলেই আবার বলছেন মহাকারণ। স্থূল জগৎ হল ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগতকে দেখছি, সূক্ষ্ম জগৎ হল যেখানে দেবতাদিরা চলাফেরা করছেন, কারণ জগৎ হল এই প্রকৃতির অবস্থা যেখানে আর অন্য কিছু নেই, শুধু এই আভাসটুকু থাকে, আমি আছি, *অহম্ অস্মিন্*। কিন্তু এই আভাসটুকুও যখন চলে যায় তখন সেই শুদ্ধ অবস্থায় থাকে যেখানে বলছেন *অহং ব্রহ্মাস্মি*, তখন *অহং ব্রহ্মাস্মি* চিন্তাও করতে হয় না, আমাদের অবস্থা থেকে বলা হচ্ছে বলে *অহং ব্রহ্মাস্মি* বলছি। দেবর্ষি নারদ খুব সুন্দর বলছেন, *তথা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘুত্তম*, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এই যে অবস্থাত্রয়ের কথা বলা হয়ে থাকে, জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এবং এই তিনটিকেই ব্যষ্টি রূপে এবং সমষ্টি রূপে যেটা বলা হচ্ছে, আপনি দুটোরই পারে।

ত্বত্ত এব জগজ্জাতং ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বয্যেব লীয়তে কৃৎস্নং তস্মাৎ ত্বং সর্বকারণম্।২/১/২৫

হে শ্রীরামচন্দ্র! স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ ও কারণ জগৎ আপনাতেই সৃষ্টি আবার আপনাতেই স্থিত আর আপনাতেই লয় হয়। আর সব কিছু আপনার জন্যই হওয়ার কারণে আপনি হলে *সর্বকারণম্*, আপনিই সব কিছুর কারণ। শুরু হয়েছিল প্রকৃতিই সব কিছুর কারণ দিয়ে, সেখান থেকে ধাপে ধাপে নিয়ে এসে বলছেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনিই সব কিছুর কারণ। এটাই সমন্বয়, শুরু করলেন প্রকৃতি থেকে, শেষ করলেন পুরুষে গিয়ে। প্রথমে সাংখ্য যোগকে ধরে এগিয়েছেন, যেখানে বলছেন পুরুষ আর প্রকৃতি আলাদা। সেখান থেকে ধাপে ধাপে টেনে বিশুদ্ধ বেদান্তে এনে মিশিয়ে দিলেন। এই শ্লোকে এসে বিশুদ্ধ বেদান্তের শেষ কথাই বলছেন, শুদ্ধ আত্মাই আছেন। শুদ্ধ আত্মাতেই এই তিনটে অবস্থার আভাস, এই যে তিনটি অবস্থার আভাস তিনিই সৃষ্টি, এতেই স্থিতি আর এতেই লয়। সেইজন্য এই যা কিছু হয় সব তাঁর জন্যই হয়। পরের শ্লোকে আরও খুব সুন্দর বলছেন –

রজ্জোবহিমিব্যত্মানং জীবং জ্ঞাত্বাভয়ং ভবেৎ।
পরাত্মহমিতি জ্ঞাত্বা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে।২/১/২৬

রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, ঠিক তেমনি *অহম্ ইব আত্মানাং জীবং জ্ঞাত্বা*, মানুষ যখন নিজেকে জীব রূপে ভাবে তখনই সব দুঃখ এসে যায়। আত্মা নিজেকে যখন জীব রূপে ভাবে তখন তাঁর সংসার প্রাপ্তি, সংসারের সব দুঃখ তার হয়ে যায়, আবার নিজেকে যখন পরমাত্মা ভাবে তখন সব রকম ভয়ের নাশ হয়ে যায়। *ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে*, জীবনে যাদের খুব ভয় আর দুঃখ আছে তাদের জন্য দুটো কথা বলে দিচ্ছেন। ভয় আর দুঃখ সবার জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে। ভয় আর দুঃখকেই আবার শোক আর মোহ বলা হয়। মোহ যেটা সেটাই ভয়, কোন জিনিস আমি পেতে চাইছি, পাবো কিনা জানি না, ভয় সৃষ্টি হল বা যেটা আছে সেটা চলে যেতে পারে এটাও মোহ, হারিয়ে যেতে পারে এই ভয়। যেটা আছে সেটাকে আঁকড়ে রাখতে চাইছি এটাই মোহ। যেটা নেই সেটাকে পেতে চাইছি, এটাই মোহ। আর শোক মানে, যেটা ছিল সেটা বাস্তবিকই চলে গেছে, তখন আসে দুঃখ। শেষ পর্যন্ত এই দুটো দুঃখ আর ভয় বা শোক আর মোহ। শোক আর মোহের নাশ বা দুঃখ আর ভয়ের নাশ কিভাবে হবে? আগে দেখতে হবে দুঃখ আর ভয়ের জন্ম কিভাবে হয়। যখন মানুষ নিজেকে জীব ভাবে তখন ভয় আর দুঃখ জন্ম নেয়, মানুষ যখন নিজেকে পরমাত্মা মনে করে তখন দুঃখ আর ভয়ের নাশ হয়ে যায়। আমরা যদি পাঁচ মিনিট সময় নিজেকে একাকী করে চুপচাপ বসে শুধু ভাবতে থাকি আমি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-আত্মা, দেখা যাবে একটা অজানা শক্তি বেগে আমার মধ্যে ঢুকছে। তখন যদি ভাবি আমার কি কি দুঃখ আছে, আমার কিসে কিসে ভয়, এরপর আমি যদি ভাবি, আচ্ছা আমি যদি পরমাত্মা হই, আমি যদি সত্যিকারের শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে এক হই, আমি যদি পূর্ণব্রহ্মের সাথে এক হই, তাহলে এই দুঃখ আর এই ভয়গুলোর কি দাম আছে! আমি যদি পূর্ণব্রহ্মের সাথে নিজেকে এক ভাবি তাহলে পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই আমার, তখন আমার সন্তান বিদেশে থাকলেও যা ভারতে আমার কাছে থাকলেও তাই। আর যদি নিজেকে জীব রূপে ভাবি তাহলে সন্তান দূরে চলে গেলে আমার কষ্ট হবে, দুশ্চিন্তা আসবে। তবে মাথার মধ্যে প্রচুর সমস্যা, মনে অনেক দুঃখ কষ্ট থাকলে

এভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। তাই যখন আমাদের সব কিছু ভালো চলছে, সুখে আছি তখন একবার এভাবে এই দিকটাকে নিয়ে ভাবতে হয়। সেই সময় কাল্পনিক দুঃখ, কাল্পনিক ভয়গুলোকে নিয়ে চিন্তা করতে হয়। ওই ভাব আমি সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, একবার এসে গেলে তখন ওই ভাবকে দুঃখের সময় যদি লাগানো যায়, তখন দুঃখটা চলে যাবে না, কিন্তু অনেক লাঘব হবে। দু মিনিটের জন্য আবার এসে যাবে তাতে কোন দোষ নেই। চলে যাওয়ার জন্য আরও অনুশীলন করা দরকার। সবারই জীবনে এমন অনেক আনন্দ মুহূর্ত আসে যে আনন্দকে মানুষ সারা জীবন মনে রাখে। বিয়ের সময় যে আনন্দ হয়েছিল, কত বাজনা, রোশনাই, কত শাড়ি গয়না, লোকজন, ওই আনন্দে রেশ তার সারা জীবনকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি এই পাঁচ মিনিটের চিন্তন, আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম, তাতে যে শক্তি প্রবাহিত হতে থাকবে, পরে যখনই দুঃখ কষ্ট আসবে তখন ওই স্মৃতিটাই তাকে টেনে তুলে নিয়ে আসবে। যাদের মধ্যে অবসাদ থাকে তারা যদি ডাইরি লেখার অভ্যাস করে, আমার জীবনে কি কি ভালো হয়েছে, দু চারটে ভালো সবারই জীবনে হয়ে থাকে, সেগুলোকে ডাইরিতে নোট করে রাখতে হবে। যখনই অবসাদ গ্রাস করে নেবে তখন ঐ ডাইরিটা খুললে একটু পরেই অবসাদ কেটে গিয়ে হাসি পেতে থাকবে। এইভাবে আস্তে আস্তে অবসাদ আসাটা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মূল যে অবসাদ, যেখান থেকে দুঃখ আর ভয় সব আছে, এই দুঃখ ভয়কে কাটানোর এটাই পথ, জীব রূপে ভয় আর দুঃখ আর পরমাত্মা রূপে ভয় আর দুঃখের নাশ, এটাই শেষ কথা।

অধ্যাত্ম রামায়ণকে কেন সমন্বয় শাস্ত্র বলা হয় এখানেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ভক্তিমার্গের সার তত্ত্ব কয়েকটা শ্লোকে বলে দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে বেদান্তের যা সার সেটাকেও কয়েকটি শ্লোকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছেন, রাজযোগের যা সার তাও কয়েকটা শ্লোকে বলে দিচ্ছেন। আধ্যাত্মিকতার মুল যে কটি পথ আছে তার বেশির ভাগেরই সার অধ্যাত্ম রামায়ণে রাখা আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ আমাদের সবারই পাঠ্য গ্রন্থ হওয়া উচিৎ। অধ্যাত্ম রামায়ণের সব থেকে বড় সুবিধা হল, গীতা, উপনিষদ যেমন নিজে থেকে পড়ে অর্থ করা যায় না, ভাষ্যের দরকার হয়, অধ্যাত্ম রামায়ণে কোন ভাষ্যের দরকার হয় না, পড়লে নিজে থেকেই এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণ অত্যন্ত উচ্চমানের গ্রন্থ। একটি গ্রন্থের মধ্যে হিন্দু ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে যদি জানতে হয় তাহলে সেই একটি মাত্র গ্রন্থ অধ্যাত্ম রামায়ণ। ভাগবতও খুব উচ্চমানের কিন্তু ভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন, কলেবরও বৃহৎ। হিন্দী বলয়ে তুলসীদাসের রামচরিতমানসেই সব কাজ মিটে যায়, ঠিক তেমনি সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাত্ম রামায়ণ একই ভূমিকা পালন করে।

বেদান্তে আমি মনে করছি আর পরে আমি জেনে গেলাম এই দুটো পুরো আলাদা। প্রথমে আমি নিজেকে জীব মনে করছি, নিজেকে জীব মনে করা মানে সব দুঃখ-কষ্ট আমার নিজের হয়ে গেল আর যখন আমি জেনে গেলাম আমি সেই পূর্ণব্রহ্ম তখন আমার কোন শোক মোহ নেই। দুটোর মধ্যে এইটুকু তফাৎ। প্রথমটা হল অধ্যারোপ, অধ্যারোপ মানেই কল্পনা আর দ্বিতীয়টা হল সত্য। অনেকেই বলে থাকে যে ধর্ম ব্যাপারটা auto hypnosis। Auto hypnosis হল নিজেকে সে চিন্তা করে করে সম্মোহিতের মত করে নিয়েছে। বেদান্তের দৃষ্টিতে জিনিসটা ঠিক উল্টো। জগতটাই auto hypnosis, জগতকে চিন্তা করে করে জগতের সাথে আমরা নিজেদের একাত্ম করে নিয়েছি, জগৎ আর আমি এক। স্বামীজী প্রবুদ্ধ ভারতের উপর একটা কবিতা রচনা করেছিলেন, কবিতাতে তিনি বলছেন, স্বপ্নই যদি দেখতে হয় তাহলে উচ্চতম স্বপ্ন দেখ। তাহলে এই জগতটাই যদি স্বপ্ন হয় তাহলে আমি যদি স্বপ্নে ভাবি আমি শুদ্ধ, আমি মুক্ত, তাহলে এটাই উচ্চতম স্বপ্ন। দুই বন্ধু কি করে জঙ্গলে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়া কিছুই জুটছে না। এক বন্ধু বলছে, ইস্! এই জঙ্গলে যদি কেউ একটু ভাত, ডাল, তরকারী রান্না করে নিয়ে আসত কত ভালোই না হত। তখন অন্য বন্ধু বলছে, যদি ভাবতেই হয় তাহলে লুচি মাংসের কথাই ভাব না কেন। আমাদের যা কিছু চিন্তা ভাবনা সব আমাদের মস্তিষ্কেই হয়। যদি ভাবতেই হয় তাহলে তুমি যে আমার আমি যে তোমার, এগুলো না ভেবে আরও বড় করে ভাবো। চিন্তার জগতে আমি আর তুমি এক যদি ভাবতে হয় তাহলে সেই চিন্তার জগতে আমি আর ঈশ্বর এক ভাবাটা তো আরও অনেক ভালো। স্বামীজী এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন, ঈশ্বর যদি কল্পনার হন তাহলে জগতটাও তো কল্পনার।

একজন নামকরা নিউরো বিজ্ঞানী এক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তর বলছিলেন, ঈশ্বরের ব্যাপারে মানুষ যখন চিন্তন করে তখন ব্রেনের ফ্রন্টাল কর্ডের মধ্যে যে নিউরোনস গুলি থাকে সেগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে। তখন

সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞেস করছে, তাহলে ঈশ্বরের ব্যাপারটা কি পুরোপুরি কল্পনার? আজ পর্যন্ত যত বিজ্ঞানী উত্তর দিয়েছেন তার মধ্যে এনার উত্তরটা সব থেকে সুন্দর। উনি বলছেন, যে instrument দিয়ে ঈশ্বর কল্পনা মনে হয়, সেই instrument দিয়ে পুরো জগতকেও তুমি কল্পনা রূপে দেখছ। ব্রেনের নিউরোনস গুলো চঞ্চল হয়ে সামনের দিকে যাচ্ছে তখন আপনার ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, পেছনের দিকে যখন চঞ্চল হয়ে থাকে তখন জগতের অনুভূতি হয়। ঈশ্বর যদি কল্পনা হয় তাহলে জগতও কল্পনা হয়ে যাবে। তুমি জগতকে সত্য বলবে আর ঈশ্বরকে কল্পনা বলবে, এটা কি করে হবে! হয় দুটোকেই কল্পনা বল আর নয়তো দুটোকেই সত্য বল। যাঁরা ধ্যান-ধারণা করেন তাঁদের অন্য সেটস্ অফ নিউরোনগুলো জেগে ওঠে, তাঁদের কাছে ওটাই সত্য মনে হয়। সত্য মনে হয় বলছেন, তার মানে এটাই তো কল্পনা হয়ে গেল। তাহলে জগতটাকেও তোমার কাছে সত্য মনে হচ্ছে, সেখানেও তো একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে। জগতকে যখন তুমি সত্য মনে করছ তখন তোমার কি কি সমস্যা হচ্ছে ভেবে দেখ, তোমার দুঃখ হবে, কষ্ট হবে, ভয় হবে, নানা রকমের অশান্তি হবে। অন্য দিকে ঈশ্বরকে যদি তুমি সত্য মনে কর তাহলে এই যে এর আগে যত নেতিবাচক জিনিসগুলোর কথা বলা হল, এগুলো থেকে বেরিয়ে আসবে। এখন তোমার ইচ্ছা তুমি কোনটাকে সত্য রূপে মনে করবে। কিন্তু এমনই বিচিত্র যে মানুষ এই সংসারকে ছাড়তে পারে না, মনে করছে এর মধ্যেই সব সুখ। যতক্ষণ মানুষ সংসার থেকে প্রচুর জ্বালা যন্ত্রণা না পায়, বেদম মার যতক্ষণ না খায় ততক্ষণ এদিকে সে আসবেই না। জ্বলেপুড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর যখন এদিকে আসে তখন তাকে বলে, বাপু এতদিন জগতকে সত্য মনে করে জগতের মধ্যেই ডুবে ছিলে, তার পরিণতিটা ভালো করে দেখলে তো, এবার তুমি একটু অন্য দিকে মন দাও। সেকি পারা যায়, কি করে পারবে! আমাদের যে মন, এই মনের উপর যে শক্তিগুলো কাজ করে, তার মধ্যে পেছনের দিকে আত্মার আলোটা টিমটিম কর জ্বলছে আর সামনের দিকে দুর্দান্ত শক্তি পাঁচ খানা তেজী ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। মন এর সাথেও জুড়ে আছে তাঁর সাথেও জুড়ে আছে। একদিকে পাঁচখানা দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ইন্দ্রিয়, তারা সর্বক্ষণ আমার এটা চাই আমার সেটা চাই করে দাবী করে যাচ্ছে। আর পেছনে আত্মা টিমটিম করে আলো দিচ্ছে আর পিনপিনে গলায় কিছু বলতে চাইছে কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলোর ঢাকঢোল পেটানোর আওয়াজে আত্মার পিনপিনে কণ্ঠস্বরটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। পরের শ্লোকে বলছেন –

চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্বাঃ সর্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ।
ত্বয়া যস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্বস্য ত্বা ততো ভবান্।২/১/২৭

কতকগুলো ছোট ছোট জিনিসকে নিয়ে আমরা যদি একান্তে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করি তাহলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন এই কলম, কলমটা জড় বস্তু আমার কাছে স্পষ্ট, কলমের প্রাণ নেই এটাকে প্রমাণিত করার দরকার হয় না। কলমকে জীবন্ত কার কাছে মনে হবে? অবোধ শিশুর কাছে মনে হতে পারে। কলম দিয়ে কত কিছু লেখা বেরোচ্ছে দেখে শিশুর মনে হতে পারে কলমটা জীবন্ত। পরে ধীরে ধীরে সে আপনা থেকেই জেনে যায় যে কলম একটা জড় বস্তু। ঠিক তেমনি আমরা যদি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ে, হাত, পা এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করি, সবই তো জড় কিন্তু কি করে এগুলো চলছে? চলছে এই জন্যই যে, ভেতরে কিছু একটা আছে যার জন্য ওর মধ্যে চৈতন্যের আভাস দিচ্ছে। আমরা তাকে মন বলি, বুদ্ধি বলি তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু কিছু একটা আছে যা কিনা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চৈতন্যের আভাস এনে দিচ্ছে। অনেকের কাছে বুদ্ধিই এই চৈতন্যের আভাস নিয়ে আসছে। যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁরা বলছেন, না, বুদ্ধির পেছনে আরেকটা শক্তি আছে। তাতে বিশেষ কিছু তফাৎ হয় না, আমাদের শরীরটা যে জড় বস্তু এতে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। পা কেটে শরীর থেকে আলাদা করে দিলে কাটা পা কিছুই করতে পারছে না, জড় হয়ে গেছে। তার মানে কোন একটা জিনিস আছে যার জন্য আমাদের বোধ হচ্ছে পা জীবন্ত। যে এই বোধ দিচ্ছে সে যেই হোক, মন হোক, বুদ্ধি হোক, আত্মা হোক তাতে কোন কিছু আসে যায় না। এখানে কি বলছেন? *চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্বাঃ*, যেখান থেকে ওই চৈতন্যের বোধ আসছে সেটাই আপনি। তুমি যদি তাকে বুদ্ধি মনে কর তাহলে তাই, তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সেটা আপনি। তবে হ্যাঁ, বেদান্তের যুক্তি অবলম্বন করে আরও গভীরে এগোতে শুরু করলে দেখা যাবে বুদ্ধি নয়, বুদ্ধির পেছনে স্বয়ংজ্যোতি আত্মা আছেন। কিন্তু আমাদের কাজের জন্য অত গভীরে যাওয়ার আপাততঃ কোন দরকার নেই, যদি বলেন বুদ্ধিই চৈতন্য, তাতেও কোন সমস্যা নেই। শুধু একটা তফাৎ এসে যাবে। যে কোন পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক বলবে চোখ একটা ক্যামেরার মত যন্ত্র। কিন্তু এই যন্ত্র দিয়ে যখন কিছু দেখছি তখন যন্ত্রকে জীবন্ত মনে হচ্ছে, দেখা ক্রিয়ার মধ্যে একটা living experience আসছে। কলমটা জড়, গ্লাশটা জড়,

আলো জড়, চোখটা জড় অথচ আমার কাছে যখন বোধ হচ্ছে তখন একটা চৈতন্যের বোধ হচ্ছে। তাহলে কিছু একটা জিনিস আছে যা এর মধ্যে চৈতন্যের বোধ এনে দিচ্ছে। চৈতন্যের বোধ যেটা আসে সেটাই ঈশ্বর। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বলছে, আমার মধ্যে যে বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধিই চৈতন্যের বোধ দিচ্ছে। তাতে কোন অসুবিধা নেই, চৈতন্যের বোধ যিনি দিচ্ছেন তিনিই ঈশ্বর। *চিন্মাত্রজ্যোতিষা*, চৈতন্য মাত্র, শুদ্ধ চৈতন্য যেখানে কোন ধরণের জড়তা নেই, সেটাই আপনি। বুদ্ধির সমস্যা হল, আমি যদি খোশ মেজাজে থাকি আপনাকে দেখেই বলব, খুব ভালো লাগছে, কত দিন পর এলেন। আমার যদি মেজাজ খারাপ থাকে তখন বলব, এইরে আবার জ্বালাতে এসেছে। তার মানে বুদ্ধির ওঠা পড়া আছে, তাই বুদ্ধি শাশ্বত হতে পারে না। যেটা চৈতন্য হবে তাতে চৈতন্য ছাড়া আর কোন কিছুই থাকবে না। বুদ্ধি এই স্থবির, এই তীক্ষ্ণ হয়ে যাচ্ছে, এই আনন্দ অনুভব করছে, এই অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি যে চৈতন্য নয় এটাই তার সব থেকে বড় যুক্তি। যাই হোক আমরা ওই যুক্তিতে যাচ্ছি না। এখানে বলছেন যেখান থেকে চৈতন্যের আভাস আসছে সেটাই আপনি।

অজ্ঞানকে নাশ করা যায় নিরন্তর অভ্যাসের দ্বার। কি অভ্যাস? এই যে বোধ হয়ে আছে জগৎ আমার, আমি এই জগৎ, আমি আর এই জগৎ এক এই ভ্রমকে জ্ঞান বিচার দিয়ে নিরন্তর ধাক্কা দিয়ে যেতে হবে। এটাই জ্ঞানযোগ, জ্ঞানযোগ মানেই বিচার করা বা যারা ভক্তিমার্গের, ভক্তি দিয়েও হয়। কিন্তু ভক্তিতে আবার গোঁড়ামি আসার ভয় থাকে, জ্ঞানে আবার শুষ্ক হওয়ার ভয় থাকে। খুব বিচার করে যেতে হবে, কোনটা নিত্য কোনটা অনিত্য বিচার করা। সংসারীরা জীবনকে প্রচণ্ড ভালোবাসে আর সংসারীদের মধ্যে যারা রোগগ্রস্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছে তারা মৃত্যুকে ভালোবাসে, মরে যেতে চায়। সন্ন্যাসী জীবনকেও ভালোবাসে না, মৃত্যুকেও ভালোবাসে না। সন্ন্যাসী সব সময় বিচার করে যাচ্ছেন, সব কিছুই করে যাচ্ছেন, সঙ্ঘের সব কাজ করছেন, কিন্তু ভেতরে বিচার চলতে থাকে। নিরন্তর বিচার করতে করতে এই ভ্রমটা চলে যায়। খুব জোর হলে মরে যাবেন, এটাই তো প্রথম মৃত্যু নয়, এর আগে আগে আরও কত বার আপনার মৃত্যু এসেছিল গণনাই করা যাবে না। পরের শ্লোকে আবার ভক্তি আর মুক্তিকে সমন্বয় করছেন –

ত্বৎ পাদভক্তিযুক্ত নাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ।
তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজস্ত এব হি।২/১/২৯
অহং ত্বদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ।

নারদ মুনি বলছেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনার শ্রীপাদপদ্মে যাঁরা ভক্তিযুক্ত চিত্তে মন প্রাণ সমর্পণ করেন তাঁরা ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভের দিকে এগিয়ে যান। একটা কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি, to love is to know, to know is to love, যত আমরা তাঁকে ভালোবাসব তত তাঁকে আমরা জানব, যত তাঁকে জানব তত তাঁকে ভালোবাসব। ঈশ্বরের পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে তত সে বিজ্ঞানের দিকে এগোবে। বিজ্ঞানের দিকে এগনো মানে জ্ঞান হওয়া, জ্ঞান হল ঈশ্বর বস্তু বাকি অবস্তু। ঠাকুর বলছেন, নরেনের কত গুণ, দুটি পাশ, গান-বাজনা জানে আবার বলে বিয়ে করবে না, মানে কাম জয়ী। এবার একটি ছেলের কথা ভাবুন যার এই গুণ গুলো আছে, বিএ পাশ করে এমবিএ করেছে, দেখতে সুন্দর, গান জানে আর চল্লিশটা মেয়ে তার পেছনে ঘুরছে। দোষের কিছু নয়। এবার যখন সে একটা মেয়ের দিকে এগিয়ে যাবে তখন ঝড়তি-পড়তি গুলো খসে পড়তে শুরু করবে। যেদিন মেয়েটিকে বিয়ে করে নিল বাকি সব কটি খসে পড়ে গেল। সেখান থেকে ঘর সংসার যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন ঐ নিয়েই আনন্দে ডুবে থাকে। ঠাকুর অন্তঃসত্ত্বা বধুকে নিয়ে অন্য উপমা দিচ্ছেন, কিন্তু একই জিনিসকে নিয়ে বলছেন। আমরা এখন পঞ্চাশ রকমের জিনিস নিয়ে আছি। কেউ যদি এবার ঈশ্বরের দিকে এগোতে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি তার যত ভক্তি আসবে তত নানা রকমের আবর্জনাগুলো খসে পড়ে যেতে শুরু করে। যত খসে পড়ছে তত তার অনেক সময়ও পেয়ে যাচ্ছে, সেই সময়টাও ঈশ্বরের দিকে লাগিয়ে দিয়ে আরও এগিয়ে যায়। হতে হতে একটা জায়গায় এসে তার একত্ব বোধ এসে যায়। একত্ব বোধ এসে গেলে পুরো জগতটাই খসে পড়ে যায়। এটাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মানেই তাই, সংসার পড়ে থেকে গেল। কোন মেয়ের প্রেমে পড়লে ছেলেরা বাপ-মা, কুল, বংশ, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি সব ছেড়ে দেয় শুধু ওই মেয়েটিকে পাওয়ার জন্য। ইংল্যাণ্ডের রাজ পরিবারের কিং জর্জ বলে দিল আমার রাজ্য লাগবে না, সে ডিভোর্স করে আরেকজনকে বিয়ে করে নিল। একটি মেয়ের জন্য সে সাম্রাজ্য ছেড়ে দিল। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীকে একজন বলছিলেন, লোকটা কি লম্পট! শুনে বিজ্ঞান মহারাজ বলছেন, যে লোক একটা মেয়ের জন্য পুরো বৃটিশ সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত হয় না, সেই সাম্রাজ্যকে ত্যাগ

করে দিতে পারে, এই বৈরাগ্যে একদিন ঈশ্বরের জন্য ওই মেয়েটাকেও ছেড়ে দেবে। একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্য মানুষ বাপ-মা, ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ভালোবাসার সময় মনে করি সবটাই থাকা চাই, কামিনীও চাই, কাঞ্চনও চাই আবার ঈশ্বরে ভক্তিও চাই।

বলছেন, *তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজস্ত এব হি,* তাঁরাই একমাত্র সত্যিকারের ভক্তির পাত্র যাঁরা আপনার শ্রীপাদপদ্মের ভজনা করেন। নারদ মুনি বলছেন, হে প্রভু! আমার উপর আপনি কৃপা করুন, আপনার মায়া দিয়ে আমাকে কখন মোহিত করবেন না। *অহং ত্বদ্ভক্তভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিঙ্করঃ,* আপনার যিনি ভক্ত, তার যে ভক্ত, তারও যে ভক্ত আমি তার দাস। ঈশ্বরের সাথে কোন ভাবে সংযোগ থাকা চাই। আমি আপনার প্রৌত্র, কারণ আমি ব্রহ্মার মানসপুত্র, ব্রহ্মা আবার আপনার পুত্র, সেইজন্য আমাকে আপনি বিশেষ কৃপা করুন। যাঁরা বর্তমান অধ্যক্ষ মহারাজের কাছ দীক্ষা নিয়েছেন, বর্তমান অধ্যক্ষ আবার স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী আবার ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান। তাঁরা তাই ঠাকুরের প্রপৌত্র। তিনিও ঠাকুরের কাছে এভাবে প্রার্থনা করতে পারেন, হে ঠাকুর! আমি তোমার নাতির সন্তান, তুমি আমাকে বিশেষ কৃপা কর।

এতক্ষণ দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করা হল, একটা হল জীব কিভাবে ব্রহ্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। জগতের বস্তুর সাথে, বিশেষ করে নিজের স্থূল শরীরের সাথে যখন সে নিজেকে একাত্ম করে নেয় তখনই সে ব্রহ্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর ছিল অবস্থাত্রয় বিচার। বেদান্তে দুটো শব্দকে প্রায়ই নিয়ে আসা হয়, ব্যষ্টি আর সমষ্টি। বলা হয় ব্যষ্টিতে যা আছে সমষ্টিতে তাই আছে। ব্যক্তি স্তরে আমাদের সবারই যেমন জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই তিনটে অবস্থা আছে ঠিক তেমনি সমষ্টিতে স্থূল, সূক্ষ্ম আর কারণ আছে। বিচার যদি করতে হয় তাহলে আমরা যে কোন একটাকে নিয়ে বিচার করতে পারি। মূল হল আমি যে সেই শুদ্ধ চৈতন্য এই ভাবটাকে সব সময় ধরে রাখা। সিংহ ভেড়ার দলে মিশে নিজেকে ভেড়া মনে করছে। তাকে বহু চেষ্টা করে মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে তুমি আসলে সিংহ। কিন্তু সে নিজেকে সিংহ বলে মানতে চাইছে না। আমাদেরও একই অবস্থা, দেহের সাথে অনেক দিন থেকে থেকে দেহের ধর্মকে নিজের ধর্ম মনে করে ভাবছি আমি এই দেহ। শাস্ত্র এই দেহ থেকে আমাদের টেনে সরাতে চাইছে, কিন্তু আমরা মানতে পারছি না বলে আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট।

বায়োলজিতে বলে শরীরের কোষিকা গুলি প্রতি নিয়ত পাল্টাতে থাকে। কোষিকা গুলো একদিকে ক্ষয় হচ্ছে আর আমরা যে খাওয়া-দাওয়া করছি সেখান থেকে নতুন নতুন কোষিকা তৈরী হয়ে চলেছে। তার মানে আমরা রোজ পাল্টে যাচ্ছি, চব্বিশ ঘন্টা আগে আমি যা ছিলাম এখন আমি তা নই। তিল তিল করে প্রতি মুহূর্তেই আমরা মারা যাচ্ছি, তাহলে মৃত্যুকে নিয়ে আমাদের এত চিন্তা করার কি আছে! স্বামীজীও কয়েক জায়গায় এই জিনিসটাকে নিয়ে বলছেন। সমস্যা নিজের মৃত্যুকে নিয়ে হয় না। নিজের মৃত্যুকে নিয়ে সমস্যা দুটো পরিস্থিতিতে হয়, যারা অত্যন্ত বিষয়ী লোক তারা সুখভোগ ছেড়ে যেতে চায় না, যদি জেনে যায় আমি আর বাঁচব না, তাদের চোখে জল চলে আসে। আর দ্বিতীয় যাদের মাথায় অনেক দায়ীত্ব। মরণাপন্ন মা তার ছোট্ট শিশুর কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এই ছোট্ট শিশুকে আমি মারা গেলে কে দেখবে। এর বাইরে নিজের মৃত্যুকে নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবে না। সৈন্যরা মৃত্যুর জন্যই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাদের ভেতরেও ভয় থাকে, সুযোগ পেলে সেও পালিয়ে যাবে। মৃত্যু জনিত যে আসল কষ্ট সেটা হয় নিজের প্রিয়জনের মৃত্যুতে। অনেক স্ত্রী প্রার্থনা করে বা আশীর্বাদ করতে বলে আমি যেন আমার স্বামীর আগে চলে যেতে পারি। অন্য দিকে বিয়ের সময় আশীর্বাদ করা হয় তুমি চির সৌভাগ্যবতী হও, বলতে চাইছে তোমার স্বামী যেন তোমার পরে গত হয়। আমি মারা যাব এই নিয়ে বেশি কেউ ভাবে না, আমার প্রিয়জন যদি চলে যায় এই ভাবনা আমাদের বেশি ভাবায়। ভারতবর্ষে মৃত্যুকে নিয়ে বিশেষ কেউ বিচলিত হয় না, কিন্তু আমার প্রিয়জন মারা গেলে আমি কি নিয়ে, কাকে নিয়ে থাকব, এতেই সবাই বিচলিত। আমাদের প্রত্যেককে জীবনে তাই এমন একটা কিছুকে কেন্দ্র করতে হয়, বাকি সব কিছু চলে গেলেও সেটা যেন ঠিক থাকে। কোন মহিলার নাড়ুগোপাল আছে, তাকে রোজ খাওয়াচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, ঘুম পাড়াচ্ছে, ওই নাড়ুগোপালকে নিয়েই সব সময়ই ব্যস্ত। মহিলার জীবনের কেন্দ্র নাড়ুগোপালকে নিয়ে। বাড়িতে কার কি হচ্ছে না হচ্ছে তাতে তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কে মরল কে বাঁচল তাতেও তার কিছু আসে যায় না। অনেক সময় মনে হয় এও এক ধরণের স্বার্থপরতা। সন্ন্যাসীদেরও অনেকে স্বার্থপর বলে। কিন্তু, মোটেই তা নয়। অনেক হিসেব ও বিচার করে দেখলে দেখতে পাব যে এই জগতে স্বার্থপর না হলে আর বাঁচা যাবে না। জগতে সবাই স্বার্থপর। তফাৎ হল আমি আপনাকে চুষছি আর আপনি আমাকে চুষছেন। আর আমরা চেষ্টা করছি কে বেশি চুষতে পারে। সবাই

সবাইকে চুষে যাচ্ছে। বাচ্চা যখন মায়ের বুক থেকে দুধ চুষছে মা তখন হিসেব কষছে, আমি যখন বৃদ্ধা হয়ে যাব তখন সন্তান আমাকে দেখবে। জগতে আমরা সবাই parasite। সেইজন্য প্রিয়জন যখন চলে যায় তখন মনে হয় আমার পরাশ্রয়টাই চলে গেল, আমি এখন কাকে চুষব। একজন বয়স্ক লোকের স্ত্রী যদি মারা যায়, তার বৌমা তাকে চা যে দেবে সেটাও ঠিক ভাবে দিতে পারবে না, তার স্ত্রী জানত ওকে কিভাবে চা দিতে হয়, ওর কখন কি দরকার স্ত্রীই জানে, বৌমা সেই জায়গাটা পূরণ করতে পারবে না। তার মানে স্বামী স্ত্রীকে চুষে যাচ্ছিল। মৃত্যু ভয় সবারই আছে, মৃত্যু ভয়কেই রাজযোগে বলছে অভিনিবেশ, যেখানে মানুষ নিজেকে নিজের সাথে জড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু তাহলেও স্বাভাবিক মৃত্যু হলে বা কঠিন ব্যাধিতে মারা গেলে অতটা কষ্ট পায় না।

এগুলোকে যদি বিচার করা হয়, যেমন অবস্থাত্রয়ের কথা বা গুণত্রয়ের কথা বলা হল, বিচার করলে জোঁকের মত জগতকে যে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এই ধরে রাখাটা একটু আলগা হবে। এই ভাবটাই আধ্যাত্মিক শাস্ত্রগুলিতে বার বার আলোচনাতে আসে। সেইজন্য শাস্ত্রের কথা শুনে যেতে হয় আর সাথে সাথে এই বিচার চালিয়ে যেতে হবে।

স্তুতি করার পর নারদ ঋষি বলছেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনার যে এই আগমন, এই আগমন রাবণ বধের জন্য। কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে, আপনি যদি রাজ্য পরিচালনায় আসক্ত হয়ে পড়েন, তাহলে রাবণ বধ কি করে সম্ভব হবে! যে কার্যের জন্য আপনার এই আগমন সে কার্য থেকে আপনি তো সরে যাচ্ছেন। আপনি বিবাহ আদি করলেন, এবার রাজ্য পরিচালনার ভার আপনার উপর অর্পিত হতে যাচ্ছে, এরপর তো রাবণ বধের চিন্তাটা আপনার মাথা থেকে সরে যাবে মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনি পণ করেছিলেন, সেই ব্যাপারে কিছু করুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর বলছেন –

শৃণু নারদ মে কিনিদ্বিদ্যতেঽবিদিতং ক্বচিৎ।
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎ পূর্বং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ।২/১/৩৬

হে দেবর্ষি নারদ! আপনি শুনুন, এই জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমি জানি না, জানার মত জিনিস অথচ জানি না এমন কিছু নেই, সবটাই আমি জানি। আমি এই দেহ ধারণ করে আছি বলে কিছু জানি না তা নয়। এখানে এসে আমাদের অনেক যুক্তি এসে যায়। যেমন ঠাকুরও অবতার ছিলেন, তিনি কি সব কিছু জানতেন? দেখে তো মনে হয় না তিনি সব জানতেন। অনেক কিছুর ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞেস করতেন, আবার অনেক কিছু জানতেও পারতেন। ভক্তিশাস্ত্রের এটাই বৈশিষ্ট্য, ভক্তিশাস্ত্রে যিনি অবতার হবেন তাঁকে সব কিছুই জানতে হয়। স্বামীজীর এক শিষ্য ছিলেন ইটি স্টার্ডি। ইটি স্টার্ডির ভারতীয় ধর্মের প্রতি খুব শ্রদ্ধা ছিল। স্বামীজী ইটি স্টার্ডির সঙ্গে থাকতেন। ইটি স্টার্ডির স্ত্রী আবার স্বামীজীকে খুব একটা পছন্দ করতে না। যার জন্য স্টার্ডি পরিবারে থাকার সময় স্বামীজীকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল। পরে আমেরিকাতেই তাঁর শরীরও খারাপ হয়। শরীর খারাপ হওয়াতে স্বামীজীর প্রতি ইটি স্টার্ডির পুরো শ্রদ্ধাটাই চলে গেল। তাঁর বক্তব্য হল, আপনি যদি যোগী হন তাহলে আপনার শরীর এত খারাপ হচ্ছে কেন। যোগীর শরীর খারাপ হবে না। এই ধরণের কিছু কিছু উদ্ভটা ধারণা আমাদের সবারই মধ্যে আছে। আমরা মনে করছি যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি চৈতন্য, তিনি সবই জানেন। তার মানে, তিনি দেহ ধারণ করলে সব জানবেন। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি পূর্ণ, যিনি পূর্ণ তাঁর কখন শরীর খারাপ হবে না। এই ধরণের কিছু উদ্ভট ধারণা নিয়ে আমরা চলছি। ভক্তিশাস্ত্র ভাবরাজ্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এগুলোর উপর জোর দিতে হয়। দেবর্ষিকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, জগতে এমন কিছু নেই যেটা আমি জানি না, আমি জানি আমি কিসের জন্য এসেছি, আমি জানি আমার কি কর্তব্য, সবই আমার জানা আছে। এটাকেই গীতাতে ভগবান অন্য ভাবে বলছেন, *নানবাপ্তমবাপ্তব্যং*, এই জগতে কোন কিছু নেই যেটা আমি চাইলে পেতে পারি না, অথচ জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটাকে আমি পেতে চাই। পূর্ণতার এটাই শেষ কথা। যিনি বলছেন আমি পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, আমরা কি করে বুঝব তিনি ঠিক বলছেন কিনা, বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই। কিন্তু তার একটাই পরীক্ষা, তিনি জগতের যা কিছু পেতে চাইবেন তিনি তা পেয়ে যাবেন। যদি তিনি ইচ্ছা করেন প্রধানমন্ত্রী এসে আমাকে এক কোটি টাকা দিয়ে যাবে, বাস্তবিক তাই হবে। ঠাকুরের জীবনে, স্বামীজীর জীবনে এই ধরণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। তাঁর ইচ্ছাশক্তি এত বলীয়ান হয়ে যে তিনি যেটা চাইবেন সেটাই হবে, জগতে কোন কিছু নেই যেটাকে তিনি পেতে পারবেন না, কোন বিদ্যা নেই যেটাকে তিনি জানতে পারবেন না। যদি তিনি চান জগতের যে

কোন বিদ্যাকে তিনি আয়ত্ত করে নিতে পারবেন। তার সাথে দ্বিতীয় পরীক্ষা হল, অথচ তিনি নিজে কিছু পেতে ইচ্ছা করেন না। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই জিনিসটাকে অন্য ভাবে বলছেন, জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটা আমি জানি না। তারপর বলছেন –

কিন্তু কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধ সংক্ষয়াৎ।
হরিষ্যে সর্বভূভারং ক্রমেণাসুরমণ্ডলম্।২/১/৩৭

অসুরমণ্ডলম্, এই যে অসুরদের দল এদের সবাইকে আমি এক এক করে শেষ করব। কিভাবে শেষ করবেন? *কালানুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধ সংক্ষয়াৎ*, যেমন যেমন তাদের প্রারব্ধ ক্ষয় হতে থাকবে তেমন তেমন আমি ওদের শেষ করব। খুব মজার শ্লোক। এই জন্যই মজার যে, ভগবান বলছেন আমি শেষ করব, আমি ভূভার হরণ করব, কিন্তু তার একটা পদ্ধতি আছে। যাদের প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেছে তাদেরকেই আগে শেষ করব। গীতায় ভগবান বলছেন, হে অর্জুন! এদের আগেই আমি মেরে রেখেছি, কালই এদের শেষ করে দিয়েছে, এদেরকে মারা তোমার পক্ষে কিছুই না। প্রশ্ন আসে এখানে ভগবানের তাহলে কি অবদান? ভগবান বলছেন, আমি তাদের মারব। কিভাবে মারবেন? যেমন যেমন তাদের প্রারব্ধ শেষ হবে তেমন তেমন ভাবে মারব। তাহলে এখানে ভগবানের কি ভূমিকা? ঠাকুর এক জায়গায় উল্লেখ করছেন, যদিও বাল্মীকি রামায়ণে এই কাহিনী নেই, অন্য রামায়ণে থাকতে পারে, ঠাকুর বলছেন, যখন শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া বেরিয়েছে লব-কুশ সেই ঘোড়াকে বেঁধে রেখেছে। হনুমান এসে বলছেন, তোমরা জান শ্রীরামচন্দ্রের কি মহিমা! হনুমান বলতে শুরু করতেই লব-কুশ হাসছে, শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা এখানে কোথায়? মুনি বলে দিয়েছিলেন অহল্যাকে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর চরণ দিয়ে স্পর্শ করবেন তখন অহল্যা আবার নারী হয়ে যাবেন। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কোথায়? মুনি বলে রেখেছিলেন বলেই অহল্যা পাথর থেকে নারী হয়েছেন। এইভাবে লব-কুশ দেখিয়ে দিচ্ছে, ওতে অমুক ছিল বলে তাই হয়েছে, তাতে তমুক ছিল বলে হয়েছে এতে শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা কোথায়? শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে আপনার এত আস্ফালনের কি আছে! লব-কুশরা তো জানে না যে শ্রীরামচন্দ্র তাদের পিতা। শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞের ঘোড়ার সাথে এবার হনুমানকেও বেঁধে রেখে দিয়েছে, ভাল খেলা হবে এর লেজ ধরে নাড়ানো যাবে। এগুলো কাহিনী, আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই।

এগুলোই খুবই জটিল বিষয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা আর কর্মবাদ এই দুটোকে নিয়ে একসাথে চলতে গেলে অনেক জটিলতা এসে যায়। যদি কর্মবাদকেই নিয়েই চলতে হয় তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছার কোন মূল্য থাকে না। আর যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিয়েই চলা হয় তাহলে কর্মবাদের কোন দাম থাকে না। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুটোকে এক সঙ্গে নিয়ে চলে। কর্মবাদ মানে যেমনটি কর্ম হবে তেমনটি ফল আসবে। কথামৃতেও অনেকবার এই ধরণের প্রসঙ্গ এসেছে। একটা জায়গায় গিয়ে আমাদের বিচার যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে এগুলোকে মেলান যাবে না। প্রথম প্রথম কথামৃত পড়ার সময় সবারই মনে এই জিনিসগুলোকে নিয়ে সংশয় হবে। ঠাকুর এখানে এক রকম বলছেন, ওখানে আরেক রকম বলছেন, ব্যাপারগুলো স্পষ্ট হতে চায় না। যেমন ঠাকুর বলছেন লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবেই, তাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছার কি দাম! আবার বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না। একদিকে বলছেন ঈশ্বরের ইচ্ছাই সর্বোপরি আবার অন্য দিকে বলছেন কর্মবাদই শেষ কথা। তাহলে কোনটা সঠিক? আসলে কোনটাই ঠিক নয়। জিনিসগুলো এভাবেই ঘটে। যারা কর্মবাদী তারা সব কিছুতে কর্মকেই দেখেন, সব কিছুতে প্রারব্ধকেই দেখেন। যারা খুব একটা ভক্তিকে মানে না তারা বলবে প্রারব্ধ, যারা ভক্তি নিয়ে চলে তারা বলবে তাঁর ইচ্ছা হয়েছে তাই তিনি তাকে শেষ করেছেন। যতক্ষণ সাধক সাক্ষাৎ না দেখছে ঈশ্বরই সব কিছু করছেন বা চৈতন্যের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু এই বিশ্বাস হবে না যে, ভগবানই সব কিছু করেন। তার আগে পর্যন্ত সব কিছু প্রারব্ধেই চলতে থাকবে। এর পরের ধাপ হয়, তাহলে কি ঈশ্বর প্রারব্ধের খণ্ডন করতে পারেন? ভক্ত বলবে হ্যাঁ তিনি পারেন। তখন প্রশ্ন আসবে, তাহলে তিনি নিজে যে আইন করেছেন সেই আইনকে তিনি নিজে লঙ্ঘন করতে পারেন? কেন পারবেন না, যিনি আইন তৈরী করেছেন তিনিই পারেন লঙ্ঘন করতে। এগুলো অহেতুক তর্ক মাত্র। এসব যুক্তি তর্কের খেলা, আধ্যাত্মিকতায় যার কোন দাম নেই। সব সময় নিজের ভাবের উপর চলতে হয়। আগে দেখুন আপনার কি ভাব। আপনি দুপুরে যে ভালো মন্দ খেয়েছেন, আপনি কি ঈশ্বরের ইচ্ছা খেয়েছেন, নাকি নিজে রান্না করেছেন বলে খেতে পেরেছেন? যদি মনে করেন আপনি নিজের রান্নার জোরে খেয়েছেন তাহলে আপনি বলবেন প্রারব্ধ ক্ষয় হয়ে গেছে, এবার তাদের মরতে হবে। কার হাতে মরবে? শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মরবে। আর যদি বলেন, আমার তো এগুলো পাওয়ার কথা নয়, তাঁর কৃপাতেই পাচ্ছি, তাহলে

আপনি বলবেন শ্রীরামচন্দ্রই মারছেন। কিন্তু তারপরে যে জিনিসগুলো নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তিনি কি প্রারব্ধ খণ্ডন করে দিতে পারেন, তিনি কি কপালমোচন, এসব কথা যার যার নিজের ভাবের কথা।

মানুষ ঠিক ঠিক ভগবানকে কখন ডাকে? যখন দেখে আর আমার কোন পথ নেই। বৃন্দাবনে বিধবারা যাঁরা থাকেন, বিভিন্ন মন্দির ঠিক করা আছে যেখানে তাঁরা প্রতিদিন চার ঘন্টা করে হরিনাম করে। হরিনাম করার জন্য তাঁদেরকে প্রতিদিন এক মুঠো চাল আর দুটো করে টাকা দেওয়া হয়। এই নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হয়েছে, অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু কে এর দায়ীত্ব নেবে? বাড়ির লোকেরা বিধবা মা, পিসি, খুড়ী, জ্যেঠীদের বৃন্দাবনে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে, আবার অনেক বিধবা দুঃখ-কষ্টে পড়ে নিজেরাই চলে যান। কিন্তু এদের দায়ীত্ব কে নেবে? সবাই দোষ দিচ্ছে মন্দির কর্তৃপক্ষদের। কিন্তু এদের দোষ কোথায়! তারা তো তাও দুটো খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এদেরকে নিয়ে একজন সাংবাদিক খুব সুন্দর একটা আর্টিকেল লিখেছেন। লেখার জন্য সাংবাদিক অনেকের সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। সেখানে একজন মহিলার সাক্ষাৎকার আছে, তাঁর বয়স হয়েছে, প্রায় সত্তর পঁচাত্তর বয়স, তাঁর মাও বেঁচে আছেন, তাঁরও বয়স পঁচানব্বুই। মহিলা সাংবাদিককে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন, ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, সেখানে গোপালের মুর্তিকে সাজিয়ে রাখা আছে, গোপালকে রোজ স্নান করায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায় আর সব সময় বলছে গোপাল আমাকে দেখছে। সাংবাদিক মহিলাকে বলছেন, আপনার খাওয়া জোটে না, আপনার তিন মাসের ভাড়া বাকি, গোপাল চাইলে তো আপনার কষ্ট অনেক আগেই ঘুচিয়ে দিতেন, তাও আপনি গোপাল গোপাল করে যাচ্ছেন। মহিলা বলছেন, আমার সতের বছর বয়সে আমার স্বামী গত হন। আমাদের অনেক জমি-জায়গা ছিল, পাড়ার মস্তানরা কায়দা করে সব কেড়ে নেয়। কলকাতায় গিয়ে আমি লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে শুরু করলাম, যে কাজ আমি কোন দিন করিনি আর আমরা ওই বংশেরও লোক নই। কোথায় আর যাব, খাওয়া পড়া পাচ্ছি না, তাই মাকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে এলাম। তিরিশ চল্লিশ বছর এখানেই আছি। আমাদের তো অনেক আগেই মরে যাওয়ার কথা, গোপালই তো আমাদের দেখছেন। বলতে চাইছেন, আমাদের আর কোন সম্বলই নেই। বাড়ির লোকেরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে, আত্মহত্যা করার দম নেই বা কেনই বা করতে যাব? তাহলে এতদিন আমাদের কে দেখেছেন? বলছেন, সত্যিকারের যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট আমাদের হয় তখনই দেখি অযাচিত ভাবে কিছু সাহায্য এসে যায়, আর আমরা বিশ্বাস করি গোপালই করছেন। এখানে সব থেকে মারাত্মক হল, আমাদের তো কিছু নেই, কোন সম্বল নেই, গীতায় বলছেন যারা যারা ভগবানের দিকে যায় তাদের মধ্যে একজন হলেন যিনি আর্ত। যার একটু কোন সম্বল আছে সেতো ভগবানের দিকে যাবে না। যে মহিলার কথা বলছেন, সতের বছরে বিধবা হয়েছেন, তার মাও অসহায়, দুই বিধবা মিলে বৃন্দাবনে পড়ে আছে, তার তো কিছুই নেই, সেতো কাঙালিনী, ভিখারিণী। চার ঘন্টা করে হরিনাম করছে, বদলে একটু চাল আর দুটি টাকা পায়।

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় প্রারব্ধ আর ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঠাকুর বাঁদরের ছা আর বেড়ালের ছায়ের কথা বলছেন। বাঁদরের সন্তান মাকে জো সো করে ধরে রাখে, এটাই প্রারব্ধ। বেড়ালের ছা সে অতশত ভাবে না। এই নিয়ে দুজন মহারাজের একটা খুব সুন্দর আলাপ আছে, এর কোনটা ঠিক। বলছেন কোনটাই ঠিক নয়। সাধক কখন এটাতে থাকেন আবার কখন ওটাতে থাকেন। একটা অবস্থায় যখন চলে যান তখন বলেন সব তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছায় যদি হয় তাহলে স্বামীজী এত দৌড়ঝাপ কেন করলেন, তাঁর ইচ্ছা হলে তো সব হয়েই যেত। তখন স্বামীজী দেখছেন এটা ঈশ্বরীয় আদেশ, তুমি এটা কর। প্রারব্ধ আর ঈশ্বরের ইচ্ছা, যার যেমন ভাব সেভাবেই নিতে হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণ দুটোকে মিলিয়ে দিয়েছেন। অসুরদের বধ আমিই করব, অন্যরা পারবে না। আর অসুরদের প্রারব্ধ যেমন যেমন ক্ষয় হতে থাকবে তেমন তেমন আমি এদের বধ করতে থাকব। কিন্তু যাঁরা জ্ঞান পথের আর যাঁরা ভক্তি পথের তাঁরা দুটো ভাবকে একটা শ্লোকে ঢোকাবেন না। কিন্তু এখানে দুটো ভাবকেই একটা শ্লোকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেইজন্যই অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্র।

এই কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, রাবণের বিনাশের জন্য আমি আগামীকালই দণ্ডকারণ্যে চলে যাচ্ছি আর চোদ্দ বছর পর আমি রাবণকে বধ করব। ইতিমধ্যে এই চোদ্দ বছরে যেসব অসুরদের যেমন যেমন প্রারব্ধ শেষ হবে আমি তাদের তেমন তেমন মারতে থাকব। সেইজন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে এনারা সব কিছু নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, যেমন হিরণ্যকশ্যপুকে বধ করবেন যখন দিন থাকবে না, রাত থাকবে না, ঘরেও থাকবে না বাইরেও থাকবে না। এখন সন্ধিক্ষণের জন্য ভগবানকেও অপেক্ষা করে থাকতে হবে। কারণ যে বর তাকে দেওয়া আছে সেটাকে তো অসত্য করে দেওয়া যাবে না। আসলে দেখাচ্ছেন প্রারব্ধ কিভাবে ক্ষয় হচ্ছে, যখন সময়

আসবে তখনই হবে। দিনও থাকবে না রাতও থাকবে না, বুঝতে হবে সন্ধ্যাবেলার কথা বলছেন। আর সন্ধ্যাবেলা যদি সে ঘরের ভেতর বসে থাকে তাও হবে না, ওকে যে করেই হোক টেনে দরজায় নিয়ে আসতে হবে। তখন ঘরেও নেই বাইরেও নেই। আর আকাশেও নেই জমিতেও নেই, তাই ওকে ভগবানের কোলে শোওয়াতে হল। আসলে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। হিন্দুদের সংস্কৃতি অনেক প্রাচীন, তাঁরা অনেক কিছুকে দেখেছেন, সেইজন্য দুমদাম কোন কিছুকে মেনে নেন না। সময় না হলে কিছু হয় না, এই জিনিসটাকে হিন্দুরা আগাগোড়া মেনে আসছে। আবার ভক্তরা অবতার তত্ত্বে এগুলোকে উড়িয়ে দিতে পারে না, তাই সব কিছুকে মিলিয়ে মিশিয়ে বলেন। যাই হোক শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আজ আপনি এখানে এত কিছু হচ্ছে দেখছেন কিন্তু কালই আমি চোদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাচ্ছি। এরপর নারদ ঋষি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। এই যে শ্রীরামচন্দ্র বলে দিলেন, এবার যেন বিশ্বমন নড়তে শুরু হয়ে গেল।

আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, বাল্মীকি রামায়ণ পুরো অন্য ভাবে চলে, বাল্মীকি রামায়ণে ঘটনাগুলো একটার পর একটা নিজে থেকেই যেন ঘটে যাচ্ছে। আর ভক্তিশাস্ত্রে সব ঘটনা শ্রীরামচন্দ্র নিজের ইচ্ছে মত ঘটিয়ে যাচ্ছেন। যার জন্য তিনি কখন ওর মনকে কখন তার মনকে পাল্টে দিচ্ছেন। এরপর যার যেমন ভাব সে সেভাবেই গ্রহণ করবে, সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনীও সত্য আবার অধ্যাত্ম রামায়নের কাহিনীও সত্য।

রাজা দশরথের শ্রীরামকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার ইচ্ছা

রাজা দশরথের মনে হল আমার বয়স হয়ে গেছে শ্রীরামচন্দ্রকে এবার সব দায়ীত্ব বুঝিয়ে দেব। বাল্মীকি রামায়ণে অন্য ভাবে আছে, রাজা দশরথ বলছেন, আমার জন্ম নক্ষত্রে এখন সূর্য, মঙ্গল আর রাহু অবস্থান করছে। বাল্মীকি জ্যোতিষ বিদ্যাটা জানতেন, কারণ কথায় কথায় বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থানকে তিনি রামায়ণে উল্লেখ করে গেছেন। এখানেও বলছেন রাজা দশরথের জন্ম নক্ষত্রে সূর্য, মঙ্গল আর রাহু একসাথে অবস্থান করছে। জন্ম নক্ষত্রে সূর্য, মঙ্গল আর রাহু যদি একসাথে এসে যায় বলা হয় যে তার মৃত্যু আসন্ন। রাজা দশরথ বলছেন, আমার কাল সন্নিকটে। আমার অবর্তমানে যাতে কোন অশান্তি না হয় তাই আমি শ্রীরামচন্দ্রকে আমার চোখের সামনে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করে দিতে চাইছি। যুবরাজ মানেই তাই, রাজার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই সে রাজসিংহাসনে বসে যাবে। রাজা দশরথের মনে কোথাও একটি শঙ্কা ছিল, উনি ভালো ভাবেই জানতেন কৈকেয়ী খুব ধুরন্ধর মহিলা, রাজমহলের ভেতরে ভেতরে একটা কূটনীতির খেলা সে চালিয়ে যেত। বাল্মীকি রামায়ণ পড়া না থাকলে ঘটনা গুলো বোঝা যায় না, কেন এই রকম হচ্ছিল। রাজা দশরথ হঠাৎ মনে হওয়াতে তিনি বলতে শুরু করলেন, আগামীকাল সকালবেলা রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে। মন্ত্রী সুমন্ত্রকে বলে দিলেন গুরুদেব বশিষ্ঠ যা যা আদেশ করবেন তার সব যেন ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বশিষ্ঠ দেব যুবরাজ পদে অভিষেকের জন্য কি কি আদেশ দিচ্ছেন তার খুব সুন্দর বর্ণনা আছে।

বশিষ্ঠ দেব বলছেন – কাল সকালবেলা রাজমহলের মধ্যকক্ষে ষোলজন কুমারী স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা হয়ে অবস্থান করবে। কুমারী মেয়েদের ভারতবর্ষে চিরদিনই খুব শুভ মনে করা হত। এখনও যখন কোন শুভ অনুষ্ঠান হয় সেখানে কুমারী কন্যাকে খাওয়ানো হয়, আর কুমারীপূজার প্রচলন তো এখনও চলে আসছে। আবার অনেকে মানত করে, আমার যদি এই কাজটা হয়ে যায় আমি পাঁচজন কুমারীকে খাওয়াবো। এইভাবে কুমারী পূজা সারা দেশেই আছে। যুবরাজের অভিষেক হতে যাচ্ছে, সেখানে কুমারী মেয়েরা যদি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেটা খুব শুভ। ঠিক তেমনি সধবা নারীদের উপস্থিতিকেও শুভ মনে করা হয়। যখন কোন শুভ কাজ হয় বা কোন সম্মানীয় ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা করার সময় মা বোনেরা শঙ্খ, প্রদীপ, ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কুমারী মেয়েদের উপস্থিতি বিশেষ করে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিরাট শুভ মনে করা হয়। আর বলছেন, ঐরাবত বংশের চতুর্দন্ত বিশিষ্ট হাতী যেন থাকে। বিভিন্ন তীর্থের জল স্বর্ণ কুম্ভে রাখতে হবে। নয়টি বা তিনটি ব্যাঘ্রচর্ম আনতে হবে আর অভিষেক স্থলে মণি-মুক্তা দিয়ে সজ্জিত শ্বেতছত্র, দিব্যমালা, দিব্যবস্ত্র এবং দিব্য আভরণ সব রাখতে হবে। মুনিদের সম্মান করে কুশহস্তে সেখানে বসতে দেওয়া হবে। আর নর্তকী, গায়ক, বেণুবাদক এবং নানা রকমের বাদ্যবিশারদরা সেখানে নৃত্যগীত করবে, বাজনা বাজাবে। রাজমহলের বাইরে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক বাহিনীর সৈন্যরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অবস্থান করবে, অযোধ্যায় যত দেব-মন্দির আছে সেখানে নানা উপাচারে এখনই পূজা কার্য আরম্ভ করে দেওয়া হোক।

<u>বশিষ্ঠদেব ও শ্রীরামচন্দ্রের সংলাপ</u>

এইসব বলার পর বলা হল শ্রীরামচন্দ্রকে এবার খবর দেওয়া হোক যে, তাঁকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হবে। খবর দেওয়ার জন্য বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রের কক্ষে অবারিত ভাবে প্রবেশ করলেন। গুরুদেব এসেছেন দেখেই শ্রীরামচন্দ্র তাড়াতাড়ি করে উঠে ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে রত্নাসনে বশিষ্ঠ দেবকে বসিয়ে তাঁর পদযুগল প্রক্ষালন করলেন আর সেই পাদোদক তিনি নিজের মাথায় স্পর্শ করলেন এবং জানকীর মাথাতেও স্পর্শ করালেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আপনার পাদোদক ধারণ করে আমি ধন্য হলাম। আচার্য বা গুরুর পাদপ্রক্ষালন করা আর তাঁর পাদোদক পান করা এগুলো আমাদের খুব প্রাচীন প্রথা। শ্রীরামচন্দ্র এই কথা বলার পর বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে খুব সুন্দর কথা বলছেন –

ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূদ্‌গিরিজাপতিঃ।
ব্রহ্মাপি মৎপিতা তে হি পাদতীর্থহতাশুভঃ।২/২/২২

হে রাম! তোমার চরণ-জল ধারণ করে পার্বতীপতি শিব ধন্য হয়ে গেলেন আর আমার পিতা ব্রহ্মাও আপনার চরণ-জল ধারণ করে নিষ্পাপ হয়ে গেলেন। বলা হয় গঙ্গা ভগবান বিষ্ণুর চরণ থেকে বেরিয়েছে। সেই গঙ্গাকে শিব নিজের মস্তকে ধারণ করলেন তাতেই তিনি ধন্য হয়ে গেলেন। এটাই আশ্চর্যের, আপনার চরণ-জল শিব যখন ধারণ করলেন তখন তিনি ধন্য হয়ে গেলেন, আপনার চরণ-জল আমার পিতা ব্রহ্মা ধারণ করলেন তাতেই তাঁর সমস্ত অশুভরাশি বিনষ্ট হয়ে গেল। আর সেখানে আপনি বলছেন, আমার চরণ-জল স্পর্শ করে নাকি আপনি ধন্য হয়ে গেলেন, সত্যিই কি আশ্চর্য। তুলসীদাস এই দৃশ্যকে খুব পরিহাস করে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন বশিষ্ঠ মুনির কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে গেলেন তখন তিনি বলছেন, যাঁর নিঃশ্বাসের সাথে বেদ বেরিয়েছে তিনিই আবার গুরুর কাছে বেদ বিদ্যা অর্জন করতে এসেছেন, এর থেকে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে! ঠাকুরের যাঁরা ভক্ত তাঁরাও এভাবে চিন্তন করতে পারেন – শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান, তাঁর নিঃশ্বাসে নাকি বেদ বেরিয়েছে, তিনিই আবার কামারপুকুরে লাহাদের পাঠশালায় শুভঙ্করী শিখতে গেছেন। তুলসীদাস এগুলোকে খুব সুন্দর চিত্রণ করেছেন। এখানে বশিষ্ঠ মুনি ঠিক এটাই বলছেন, আপনার চরণধৌত জলে আমারই বাবা শুদ্ধ হয়েছেন আর আমার যিনি ইষ্ট শিব তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। আর সেখানে আপনি বলছেন আমার চরণ-জল স্পর্শ করে আপনি নাকি ধন্য হয়েছেন। আপনি কেন এই রকম আচরণ করছেন? বশিষ্ঠদেব বলছেন –

ইদানিং ভাষসে যৎ ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্ম্যা সঞ্জাতমীশ্বরম্‌।২/২/২৩

আসলে এখন আপনি জগতকে শিক্ষা দিতে চাইছেন গুরুর সাথে শিষ্যের কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। দেওঘর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে একবার স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ এসেছিলেন। তিনি তখন সঙ্ঘাধ্যক্ষ। বিদ্যাপীঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা মহারাজকে তাঁর ঘরে প্রণাম করলেন। ওখানকার ছাত্ররাও প্রণাম করতে এসেছেন। প্রথম ছাত্র যে প্রণাম করবে তার আগে বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ মহারাজ হাঁটু গেড়ে স্বামী ভূতেশানন্দজীকে প্রণাম করলেন। অধ্যক্ষ মহারাজ প্রণাম করার পর এবার ছাত্ররা প্রণাম করতে শুরু করল। একজন সন্ন্যাসী অধ্যক্ষ মহারাজকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, এই তো মহারাজকে প্রণাম করলেন, আবার কেন প্রণাম করলেন। অধ্যক্ষ মহারাজ তখন সেই সন্ন্যাসীকে বললেন, ছেলেগুলো তো জানে না কিভাবে সঙ্ঘাধ্যক্ষকে প্রণাম করতে হবে, বেশির ভাগই তো হাতজোড় করে প্রণাম করে বেরিয়ে যাবে, ওই ভুলটা যেন ওরা না করে। ছেলেদের সমস্যা হল একজন যেটা করবে বাকিরা সবাই তাই করবে। ছাত্ররা দেখ নিল আমাদের যিনি প্রধান তিনি যখন সঙ্ঘাধ্যক্ষকে এভাবে প্রণাম করছেন তাহলে আমাকেও এভাবে প্রণাম করতে হবে। মুখে যতই বলে দেওয়া হোক সবাই শুনবে না। আমাদের প্রধান তিনি হাঁটু গেড়ে প্রণাম করছেন এরপর প্রত্যেকটি ছাত্রই ওই ভাবেই প্রণাম করতে থাকবে। ভগবান গীতায় বলছেন, *যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ*, শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যেভাবে আচরণ করেন ইতরজন যারা তারাও ঠিক সেভাবেই আচরণ করবে। বশিষ্ঠ মুনিও ঠিক এই কথাই বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র জগতকে দেখাচ্ছেন গুরুর সাথে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। নিজের যেটা শ্রেষ্ঠ আসন সেখানে বসাবে, তাঁর পাদপ্রক্ষালন করতে হবে, সেই পাদোদককে মাথায় স্পর্শ করতে হবে।

তখন বশিষ্ঠ মুনি বলছেন, তবে আমি এটা জানি, আপনি এই যে জানকীর সাথে কথা বলছেন এখানে সাক্ষাৎ বিষ্ণু লক্ষ্মীর সাথেই সম্ভাষণ করছেন। আমি এটাও জানি, দেবতাদের কার্যসিদ্ধি এবং ভক্তদের ভক্তি লাভ ও সিদ্ধির জন্য রাবণবধের উদ্দেশ্যেই এই শরীর ধারণ করেছেন। আপনার এই গুহ্য রহস্য আমার জানা আছে, তবে এই রহস্য আমি কোথাও প্রকাশ করব না। আপনিও চিরদিন শিষ্যের মতই আচরণ করবেন আর আমিও চিরদিন গুরুর মতই ব্যবহার করব। ভারত হল ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবের দেশ, ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থে, লোকমুখে এই ধরণের শত শত কাহিনী ছড়িয়ে আছে।

এখানে বশিষ্ঠদেব যেটা বলছেন আমি তোমার সাথে গুরুর মত ব্যবহার করব আর তুমি শিষ্যের ব্যবহার করবে, মিথিলাতে ঠিক এই ধরণের একটা বহুল প্রচলিত কাহিনী আছে। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি আবার একজন শিব ভক্ত ছিলেন। সব ব্রাহ্মণদের মত বিদ্যাপতিও খুব গরীব ব্রাহ্মণ। তাঁর স্ত্রী খুব খিটখিটে মেজাজের ছিল। বিদ্যাপতি শিবের আরাধনা করতেন আর অন্য দিকে দোঁহা রচনা করতেন। বিদ্যাপতির গান খুব জনপ্রিয় ছিল, কথামৃতেও বিদ্যাপতির গান আছে। একদিন কোথা থেকে বিদ্যাপতির এক চাকর এসে জুটল, ওর নাম দিল উগনা, উগনা মানে হঠাৎ উদয় হওয়া। বিদ্যাপতির সংসারে অর্থাভাব আর অশান্তি নিত্য সঙ্গী ছিল। একদিন বিদ্যাপতি আর তার চাকর উগনা এক গ্রামে যাচ্ছিল। যেতে যেতে বিদ্যাপতির হঠাৎ খুব জল পিপাসা পেয়েছে। উগনাকে বললেন, দেখো কোথাও একটু জল পাও কিনা, আমি আর জলতৃষ্ণা সহ্য করতে পারছি না। গ্রামের পথ, চারিদিকে শুধু জঙ্গল, কোথাও জল নেই। উগনা নাকি সাক্ষাৎ শিব ছিলেন। তখন তিনি নিজের জটা খুলে এক ঘটি জল এনে বিদ্যাপতিকে দিলেন। ওই জল খেয়েই বিদ্যাপতি অবাক। কারণ ওই জল ছিল গঙ্গাজল, গঙ্গাজলের স্বাদ আলাদা। জল পান করেই বিদ্যাপতি বুঝলেন এতো গঙ্গাজল, গঙ্গাজল কি করে পেল! তখন বিদ্যাপতি বুঝে গেলেন ইনি সাক্ষাৎ শিব। শিব তখন বললেন এটা যেন প্রকাশ না হয়। বিদ্যাপতি মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন, তাঁর যিনি সেবক তিনি তাঁর ইষ্ট সাক্ষাৎ শিব। কিন্তু উগনা সেবা করে যাচ্ছে, সেবকের আচরণ করে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যাপতি আর তাঁর থেকে কোন সেবাই নেবেন না। স্ত্রী এসব কিছুই জানে না। একদিন বৃষ্টি পড়ছিল, বিদ্যাপতির স্ত্রী উগনাকে বলল যাও কাঠ নিয়ে এস। কাঠ এনেছে কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাঠগুলো ভেজা। জ্বালাতে গিয়ে ধুয়ো বেরচ্ছে। স্ত্রী খুব রেগে গেছে, ওই চ্যালা কাঠ দিয়েই উগনাকে মেরেছে, উগনার পিঠে দাগ হয়ে গেছে। চেঁচামেচি শুনে বিদ্যাপতি এগিয়ে এসেছেন। ওই দৃশ্য দেখেই বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষায় খুব জোর চিৎকার করে উঠলেন – তুমি এ কী করলে! সাক্ষাৎ শিবকে এভাবে চ্যালা কাঠ দিয়ে মারলে! ভগবানকে মারা সেটা একটা অন্য রকম ব্যাপার। স্ত্রী খুব ঘাবড়ে গেছে। উগনার রহস্য প্রকাশ্যে এসে গেল। ভগবান শিব তখন বলছেন, আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, আমার কথা কখন প্রকাশ করবে না, আমি এবার চললাম। বলে, বিদ্যাপতি এরপর আর কোন দিন গান লিখতে পারলেন না। তারপর থেকে তিনি ঘরে বসে শুধু কাঁদতেন আর চোখের জল ফেলত ফেলতে ঘুরে বেড়াতেন, উগনা! তুমি কোথায় চলে গেলে। মধুর সম্পর্ক আর অত্যন্ত উচ্চ ধরণের সম্পর্ককে কখন প্রকাশ্যে আনতে নেই, প্রকাশ্যে আনলেই এর গাম্ভীর্যতা আর তাৎপর্যটাই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের অনেক sacred relation থাকে, ভুলে গিয়ে ওটাকে secret relation বানিয়ে দিই। জিনিসটা কখনই secret নয় জিনিসটা হল sacred। যেখানে যেখানে আমাদের পবিত্র সম্পর্ক, ওই সম্পর্ককে কখন প্রকাশ্যে আনতে নেই।

বশিষ্ঠ মুনি এটাই শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন। আপনার এই উপস্থিতি এটা অত্যন্ত পবিত্র, এটাকে প্রকাশ্যে আনা যাবে না। সেইজন্য আমাকে সব সময় গুরুর ভূমিকা পালন করে যেতে হবে আর আপনাকেও শিষ্যের ভূমিকা নিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আমার সাথে আপনার সম্পর্ক হল প্রপৌত্র আর পিতামহের সম্পর্কের। আজকের দিনে নাতি ঠাকুর্দার সম্পর্ক জাগতিক ভাবের উপর চলে, কিন্তু বশিষ্ঠ মুনির কাছে এই সম্পর্ক জাগতিক সম্পর্ক হতে পারে না। বশিষ্ঠ মুনির কাছে ব্রহ্মা তাঁর পিতা, আর ব্রহ্মার আদিকর্তা হলেন সেই ভগবান নারায়ণ, সেই নারায়ণ এখন রাম রূপে এসেছেন। এই যে অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক, এই সম্পর্ককে কখন প্রকাশ্যে আনা যাবে না। তাই আপনি আমার সাথে যে ব্যবহার করছেন ঠিকই করছেন, কিন্তু এই পবিত্র ভাব আমি কখনই প্রকাশ করব না, আর আপনিও যে প্রকাশ করবেন না জানা কথা। যদিও এর আগে বশিষ্ঠদেব রাজা দশরথকে শ্রীরামের ব্যাপারে কিছু বলেছেন আর শ্রীরামচন্দ্র জন্মের সময় নিজের স্বরূপ কৌশল্যাকে দেখিয়েছেন কিন্তু মায়ার দরুণ তাঁদের দুজনের স্মৃতিটা ঢাকা পড়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণও জন্মের সময় দেবকীকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন, আবার

বাললীলাতে যশোদাকেও অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কারুরই কিছু মনে থাকছে না। কারণ তিনি মায়া দিয়ে ওই জ্ঞানকে ঢেকে দিয়েছেন। ঠাকুরের কাছে আসার পর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ঠাকুরের প্রতি একটা বাৎসল্য ভাব ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণী তাঁর এই বাৎসল্য ভাবকে চেপে রাখতেন। একটা বর্ণনা আছে, একবার মথুরবাবুর সামনে তাঁর ওই বাৎসলটা এসে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওই ভাব প্রশমিত করে দেন। সাধক, শুধু সাধকই নয়, এমনিতেও অনেকের অনেক কিছুই হয়, কিন্তু সেগুলোকে সবার সামনে নিয়ে আসতে নেই। সামনে নিয়ে এলে সাধারণ লোক বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাস না করার জন্য জিনিসটা খেলো হয়ে যায়। দীক্ষার সময় বলে দেওয়া হয় মন্ত্র কাউকে বলবে না, ইষ্ট কে বলবে না, এর পেছনেও একই কারণ। এগুলো অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্ক, অন্যরা এগুলোকে বুঝবে না, হয়ত এই নিয়ে ঠাট্টা মজা করবে ইত্যাদি। এই কথাই বশিষ্ঠদেব বলতে চাইছেন, যদিও আমি গুরুর মতই ব্যবহার করব, আর আপনিও শিষ্যের মত ব্যবহার করবেন কিন্তু আমি প্রত্যেক মুহূর্তে জানি –

তথৈবানুবিধাস্যেহহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহম্।
গুরুর্গুরুণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ।২/২/২৬

আপনি গুরুরও গুরু। গুরুর গুরু শব্দ যোগশাস্ত্রের, যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলা হয় *স পূর্বেষামপি গুরুঃ*। ঈশ্বর গুরুরও গুরু, মানে আমার যিনি গুরু, তাঁর গুরু, তাঁরও গুরু এই করে করে শেষে যেখানে যাচ্ছে তাঁরও গুরু তিনি, কারণ সব বিদ্যা তাঁর কাছ থেকে এসেছে। *কালেনানবচ্ছেদাৎ*, উনি কালে বাধিত নন। তিনি ছাড়া সবাই কালে বাধিত সেইজন্য তিনি *পূর্বেষামপি গুরুঃ*। ঈশ্বরের এই পরিভাষা যোগশাস্ত্র থেকে এনেছেন। আমি জানি আমি গুরুর ব্যবহার করছি কিন্তু আপনি *গুরোহপি গুরুঃ, পূর্বেষামপি গুরুঃ*, আপনি সেই নারায়ণ আর *পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ*, বেদে দেবতা আর পিতৃদের কথা বলা হয়। প্রাচীন শাস্ত্র বলে এখানে পিতৃদের সম্মান আছে। ইদানিং কালে পিতৃদের সম্মান অনেক কমে গেছে আর পিতৃদের সম্মানটা এখন শ্রাদ্ধে চলে গেছে। কিন্তু পিতৃপূজার খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়, বাড়িতে যখন কোন বড় পূজা হয় তখন সেখানে পিতৃপূজার খুব বড় একটা ভূমিকা থাকে। পঞ্চ মহাযজ্ঞে পিতৃযজ্ঞ খুব গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ। বশিষ্ঠদেব বলছেন, পিতৃরা খুব পবিত্র কারণ আপনি সেই বংশের কিনা। *পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ*, পিতৃরা হলেন শ্রেষ্ঠ আপনি তাঁদেরও পিতামহ। কারণ পিতৃদের পিতা হলেন ব্রহ্মা, তাঁরও পিতা আপনি। গুরুর দিকে দিয়ে আপনি হলেন *গুরোহপি গুরুঃ* আর পিতৃদের দিক থেকে সমস্ত পিতৃদেরও আপনি পিতামহ। শুধু তাই না, আপনি হলেন –

অন্তর্যামী জগদ্‌যাত্রাবাহকস্ত্বমগোচরঃ।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসম্ভবম্।২/২/২৭

আপনি সবারই অন্তর্যামী আবার জগতের প্রবর্তক। একদিকে আপনি সবারই অন্তরে অবস্থিত আবার আপনি এই সংসারের প্রবর্তক। তার সঙ্গে আপনি মন ও বাণীর পারে, অর্থাৎ মন ও বাণীর আপনি বিষয় হতে পারেন না। মন ও বাণী একটা জিনিসকে সীমিত করে দেয়, যেমন এই গ্লাশ আছে, গ্লাশকে মন যখন বিষয় করে নিল তখনই মন ওই গ্লাশকে জানতে পারে। ক্যামেরায় একটা বড় পাহাড়ের ছবি নিতে গেলে সম্পূর্ণ পাহাড়ের ছবিটা নেওয়া যাবে না, পাহাড়ের একটা অংশের ছবি নিতে পারব। পুরো ছবি নিতে হলে অনেক বড় লেন্সের ক্যামেরা আনতে হবে। মনের লেন্সটা খুব ছোট, মন জগতকে ধরে নেয় কিন্তু ঈশ্বরকে ধরতে পারে না। আর মন যদি ধরতে নাই পারে তাহলে বাণী দিয়ে তাকে কিভাবে ব্যক্ত করবে! করার কোন প্রশ্নই নেই। আপনি তাই মন বাণীর পারে।

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীনসম্ভবম্, এই যে আপনি শুদ্ধসত্ত্ব দেহ ধারণ করেছেন অথচ আপনি স্বাধীন। তার মানে, দেহ আপনি ধারণ করেছেন ঠিকই কিন্তু আপনি প্রকৃতির নিয়মে চলেন না। বাকি জগৎ যেমন প্রকৃতির নিয়মে চলছে, প্রকৃতি সবাইকে টেনে এনে নিজের নিয়মে চালাচ্ছে, প্রকৃতি আপনাকে সেভাবে চালাতে পারে না। গীতাতেও এই ভাবটা অনেকবার এসেছে, ঈশ্বর সব সময় স্বাধীন। স্বাধীন শব্দ যখনই শাস্ত্রে আসবে তখন এর একটাই অর্থ হয় কর্ম প্রবাহ তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি যেই কর্মই করুন না কেন, সেই কর্মের ফল তাঁকে কখন স্পর্শ করতে পারবে না। যেমন শ্রীরামচন্দ্র বালিকে বধ করলেন, এই কর্মের ফল তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না, রাবণকে বধ করলেন এই কর্মের ফলও তাঁকে স্পর্শ করবে না। কারণ তিনি স্বাধীন। স্বাধীন শব্দের একটাই অর্থ, কর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কর্ম স্পর্শ করলে কি হয়? সেই কর্মের জন্য আরেকটা কর্ম সৃষ্টি হবে, সেই কর্মের জন্য আরেকটা কর্ম তৈরী হবে, এভাবে চলতেই থাকবে। বশিষ্ঠ মুনি শেষে প্রার্থনা করে বলছেন –

মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘুদ্বহ।
গুরুনিষ্কৃতিকামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেব মে।২/২/৩২।

গুরু বা আচার্যের কাছে সবারই ঋণ থাকে। আচার্য সবাইকে শিক্ষা দেন, গুরুর এই ঋণ সব সময় শোধ করতে হয়। বশিষ্ঠ মুনি বলছেন, হে রামচন্দ্র! আমরা এখানে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নিয়ে চলছি, সেইজন্য শিষ্য রূপে আমাকে আপনার কিছু দক্ষিণা দেওয়ার আছে, তবেই আপনি গুরুঋণ থেকে মুক্ত হবেন। তা আপনি আমাকে কি দেবেন? আপনি আমাকে এই দিন, আপনার এই যে লোকবিমোহিনী মায়া, এই মায়াতে যেন আমি মোহিত না হই। গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দেন যাতে শিষ্য মায়াতে মুগ্ধ না হয়ে যায়, কিন্তু এখানে উল্টো গুরুই শিষ্যের কাছে প্রার্থনা করছেন আপনার মহামায়া আমাকে যেন বিমোহিত করতে না পারে। বড়লোককে সব সময় হাতজোড় করে বলতে হয় আপনার যে এই বিপুল সম্পদ ঐশ্বর্য, এই দিয়ে আমাকে ভোলাবেন না। ঠাকুর তাই বলছেন, মেয়ে দেখলেই ভাবতে হয় এটা সাপ, কাছে এলেই বলতে হয়, মা তোমার লেজ দেখাও। সাপের মুখ দেখতে নেই, লেজ দেখানো মানে, তুমি এখান থেকে এসো। কারণ ওই মায়ার জালে পড়ে গেলে আর বাঁচার পথ নেই। ঐশ্বর্যবান লোকের সঙ্গ করলেই তাদের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, আপনার এই ঐশ্বর্যে আমি যেন মুগ্ধ না হই। বশিষ্ঠদেব এই প্রার্থনাই করছেন, যদিও তিনি শ্রীরামচন্দ্রের গুরু, শিষ্যের কাছে তিনি প্রার্থনা করছেন। তখন বলছেন, আমি এত কথা আপনাকে বললাম কিন্তু যে কথা বলতে রাজা দশরথ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন এখন সেই কথাই বলছি, আগামীকাল আপনাকে যুবরাজ পদে অভিষেক করা হবে, সেইজন্য আপনাকে কয়েকটা জিনিস পালন করতে হবে। কি কি পালন করতে হবে সেটাই পর পর বশিষ্ঠদেব এখন বলে যাচ্ছেন।

আজকের দিনটা আপনি সীতার সাথে উপবাস করবেন, তার সাথে সীতার সাথে পবিত্র ভাবে, শুদ্ধভাবে জিতেন্দ্রিয় হয়ে থাকবেন আর ভূমিতে শয়ন করবেন। ভারতে যা কিছুই করা হত সবটাই যজ্ঞ রূপে করা হত। বিবাহ করা যেমন যজ্ঞ তেমনি রাজ্যাভিষেক হচ্ছে সেটাও যজ্ঞ। আজ প্রথমে নারদ এসে চলে গেলেন, রাজা দশরথের মনে একটা ভাবনার উদয় হল, বশিষ্ঠ এলেন, কথা বললেন আর শেষে বলে দিলেন কাল সকালে রাজ্যাভিষেক হবে আপনাকে আজকের দিনটা এভাবে থাকতে হবে। কিন্তু বশিষ্ঠদেব এটা জানেন না, আগামীকাল কত কি হতে যাচ্ছে। আগামীকাল কত কি হবে একমাত্র শ্রীরামচন্দ্রই জানেন। এরপরেই দেখাচ্ছেন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে আছেন আর লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

নিমিত্তমাত্রমেবাহং কর্তা ভোক্তা ত্বমেব হি।২/২/৩৭
মম ত্বং হি বহিঃপ্রাণো নাত্র কার্য্যা বিচরণা।

লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আগামীকাল যা কিছু হবে আমি তার নিমিত্তমাত্র হব আর তার যা কিছু কর্তা ভোক্তা তুমি হবে। তার কারণ, তুমি হলে আমার বাহ্যপ্রাণ। ইংলিশে একটা শব্দ ব্যবহার করে, alter ego, যার মানে হয় আমি আলাদা আমার শরীর আলাদা। বেদান্তে এই ভাব থেকে থেকে চলবে, আমার যিনি অন্তর্যামী তিনি আলাদ আর আমার শরীর আলাদা। লক্ষ্মণ হলেন বাহ্যপ্রাণ, লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের যেন শরীর আর শ্রীরামচন্দ্র তার নিমিত্তমাত্র। যেমন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুনের সম্পর্ক, শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, তিনি মুখ্যপ্রাণ বা অন্তঃপ্রাণ। শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপ্রাণ আর অর্জুন তাঁর বাহ্যপ্রাণ মানে শরীর। এখানে শ্রীরামচন্দ্র হলেন অন্তঃপ্রাণ আর লক্ষ্মণ হলেন তাঁর বাহ্য শরীর, কিন্তু এখানে শব্দটা ব্যবহার করছেন *বহিঃপ্রাণঃ*। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্রকে যখনই দেখা হয় তখন লক্ষ্মণের সাথেই দেখা হয়। কারণ অবতারের উপর কর্তা ভোক্তা এই ভাব আসে না। কর্মবাদ নিয়ে যখন কোন আলোচনা হয় তখন এই প্রসঙ্গটা প্রায়ই উত্থাপন করা হয়, জীবনমুক্ত পুরুষ, যেমন ঠাকুর কিছু কর্ম করলেন এই কর্মের ফল এখন কোথায় যাবে? যতই আমরা নিষ্কাম কর্মের কথা বলি না কেন, নিষ্কাম কর্মকে বোঝান খুব কঠিন। সাধারণ ভক্তদের বুদ্ধির স্তর সেই রকম উন্নত হয়নি সেইজন্য তাদেরকে এটা বোঝান যায় না। সাধারণ ভক্ত জানতে চায়, উনি যে কর্ম করলেন তার ফলটা কোথায় যাবে। যেমন ঠাকুরই বলছেন, আমার শরীরে এত ব্যাধি কেন। তখন তিনিই বলছেন, ওনার সাথে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যা পাপকর্ম করেছে, সেই পাপকর্ম গুলি তাঁর উপর চলে এসেছে। তাহলে ঠাকুর যে কর্মগুলো করছেন তার ফল কোথায় যাবে? বেদান্তের দৃষ্টিতে কোথাও যাবে না, কিছুই হবে না। কিন্তু লোকেদের এটা বোঝান যায় না যে, তাঁর ফল কোথাও যাবে না, ওখানেই পড়ে যাবে। কিন্তু তাদের তো বোঝাতে হবে, তাই তখন বলে, যাঁরা তাদের সেবা করে তাঁরা তাঁর পূণ্যটা পায়, আর যারা তাকে গালাগাল করে

নিন্দা করে তাঁর বাজে কর্মের ফলগুলো তাদের কাছে যায়। ব্রহ্মসূত্রে এর উপর একটা আলোচনা আছে, শুভকর্মের ফল যাঁরা তাঁর সেবা করেন তাঁদের কাছে যায়, আর বাজে জিনিসগুলো যারা তাঁর নিন্দা করে, তাঁর যারা শত্রু তাদের কাছে যায়। এখানে শ্রীরামচন্দ্র যাবতীয় যা কিছু করবেন তার ফল কোথায় যাবে? লক্ষ্মণকে তাই বলে দিচ্ছেন, তুমি হলে আমার বাহ্যপ্রাণ। তুমি কর্তা ভোক্তা হয়ে যাবে আর আমি নিমিত্তমাত্র। আত্মা আর ঈশ্বর এক, গীতায় পদে পদে বলছেন আত্মা কিছু করেন না, ঈশ্বর কিছু করেন না। আর তার সাথে নিয়ে আসছেন কর্তা-ভোক্তা এই দুটো পৃথক সত্তাকে।

এইসব বলে গুরু বশিষ্ঠদেব যা বলে গেলেন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সব বললেন, চারিদিকে সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। এদিকে কৌশল্যাও খুব খুশী, তাঁর সন্তান এবার যুবরাজ হবেন। কিন্তু অযোধ্যার রাজমহলের অন্তঃপুরের রাজনীতি অন্য রকম চলছিল। চার কুমারের একই সাথে জন্ম হওয়ার জন্য আর রাজা দশরথের কৈকেয়ীর প্রতি অতিরিক্ত দুর্বলতা, সব মিলিয়ে এদেরও একটা শঙ্কা ছিল। কৌশল্যা যদিও পাটরানী, জ্যেষ্ঠা কিন্তু কৈকেয়ীর বয়স কম, পরে বিবাহ হয়েছে, আরও কিছু কিছু ব্যাপার মিলিয়ে কৈকেয়ীকে রাজা দশরথ বেশি ভালোবাসেন। কৈকেয়ী যদি বলে দেয় ভরতকে যুবরাজ করতে হবে তখন রাজা দশরথকে সেটাই করতে হবে। সব কিছু শোনার পর কৌশল্যা বলছেন, আমি জানি রাজা দশরথ একজন সত্যবাদী কিন্তু –

কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি।
ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়।২/২/৪৩

রাজা দশরথ সত্যবাদী, সবই ঠিক আছে কিন্তু তিনি কামুক আর কৈকেয়ীর বশীভূত, কৈকেয়ী যা করতে বলবে রাজা দশরথ ভালোমন্দ বিচার না করে সেটাই করবেন। তাই সন্দেহ হয় রাজা তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবেন কিনা। কোন বিঘ্ন যাতে না হয়ে যায় সেইজন্য কৌশল্যা ব্যাকুলচিত্তা, সন্তানের জন্য মায়ের ব্যাকুলতা, দুশ্চিন্তা কি জানি কি হবে, সেইজন্য তিনি দুর্গাদেবীর পূজা করলেন। এই যে বলছেন কৌশল্যা দুর্গাদেবীর পূজা করলেন, এই জিনিসটাকে অধ্যাত্ম রামায়ণে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাই বলে দিচ্ছে যে অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক পরের দিকে রচিত। বাল্মীকি রামায়ণে কৌশল্যা বিষ্ণুর পূজা করলেন, যজ্ঞাদি করলেন কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে দুর্গা পূজার কথা বলছেন। এটাই নিয়ম, যে কালে গ্রন্থগুলি রচিত হয় সেই কালের প্রচলিত দেবী দেবতাদেরকেই নিয়ে আসা হয়। তাতেই বোঝা যায় কোন গ্রন্থ কোন সময়কার রচিত। এরপরে পুরাণের একটা খুব প্রচলিত বিষয়কে নিয়ে আসা হয়েছে –

দেবতাদের প্রেরণায় কৈকেয়ীকে মন্থরার কুমন্ত্রণা

এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণীমচোদয়ন্।
গচ্ছ দেবী ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ।৪৪

এখানে এসেই বেদে দেবতাদের সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল পুরাণে এসে সেই ধারণা পাল্টে যায়। বেদে দেবতারাই প্রধান, আর যিনি অনন্ত তাঁর সাথেই দেবতাদের এক করে দেখা হয়। এখানে কিন্তু আলাদা হয়ে গেল। ভগবান বিষ্ণু এক রকম, তিনি যখন অবতার হয়ে আসছেন তখন অন্য রকম চলছেন কিন্তু দেবতারা যেন মানুষের থেকে একটু উচ্চশ্রেণীর তার বেশি কিছু নয়। দেবতাদের নিজস্ব স্বার্থ, চিন্তা, দুশ্চিন্তা সবই আছে। দেবতারা এখন দেখছেন শ্রীরাম যদি অযোধ্যার রাজা হয়ে রাজত্ব শুরু করে দেন তাহলে তো তাঁদের স্বার্থসিদ্ধি হবে না। সেইজন্য দেবতারা একজোট হয়ে বাণীদেবীর কাছে গেলেন। বাণীদেবী বলতে আমরা সাধারণত সরস্বতী দেবীকেই জানি, কিন্তু অন্য ভাবে বেদে যে বাক্ দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় সেই দেবীও হতে পারেন, তাঁকে গিয়ে দেবতারা বলছেন, হে দেবী! আপনি অযোধ্যায় গমন করতে প্রযত্ন হন, আর সেখানে গিয়ে –

রামাভিষেকবিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ।
মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্।৪৫

শ্রীরামের যে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন চলছে তাতে বিঘ্ন উৎপাদন করুন। এটাই পুরাণের খুব প্রচলিত পন্থা। ভগবান বিষ্ণু অনন্ত নাগের উপর যখন শয়ন করেছিলেন আর এদিকে মধু আর কৈটভ যখন খুব অত্যাচার করতে শুরু করেছে তখন বিষ্ণু হাই তুলতে মায়া শক্তি বেরিয়ে এসেছে। মধু কৈটভ দুজনে যখন খুব লড়াই করছে

তখন সেই মায়া শক্তি তাদের ভেতরে প্রবেশ করে গেছেন, প্রবেশ করে তাদের মনকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন, মন ঘুরে যাওয়াতে ওদের ভেতরে খুব গর্ব হয়েছে, গর্ব হওয়াতে বলছে, বিষ্ণু! তোমার যুদ্ধ কৌশল দেখে আমরা খুব খুশি, বল! কি বর চাই তোমার। ভগবান বিষ্ণু কি আর বর নেবেন! তোমরা বল কিভাবে তোমাদের বধ করা যাবে। মধু আর কৈটভ গর্বে স্ফীত হয়ে গেছে। কাউকে যদি নাশ করতে হয় তাহলে হয় তার মন, মনের থেকে আরও বেশি যদি বাণীকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ইন্দ্রকে বধ করার জন্য অসুররা একটা যজ্ঞ করছিল। দেবতারা খুব ঘাবড়ে গেছেন। তখন বাণীদেবী গিয়ে পুরোহিত যে মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছিল সেই মন্ত্রের উচ্চারণে গোলমাল করে দিলেন। যেখানে বলার কথা ইন্দ্রের যে শত্রু তার যেন বর্ধন হয়, কিন্তু উচ্চারণটা অন্য রকম হয়ে গিয়ে অর্থ হল ইন্দ্রের যে শত্রু তার যেন বধ হয়। এইভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করার পথ বেরিয়ে এল। দেবতারা যখনই দেখেন এই জায়গাতে আমাদের ক্ষতি হতে যাচ্ছে তখন কোন একটা শক্তিকে দিয়ে একটা গোলমাল তৈরী করে দেন। এখানে দেবতারা সরস্বতীর সাহায্য নিয়েছেন। সরস্বতী দেবীকে বললেন, আপনি এই কাজটা করে আবার স্বর্গলোকে ফেরত চলে আসুন। তখন বলছেন –

সাপি কুব্জা ত্রিবক্রা তু প্রাসাদাগ্রমথারুহৎ।
নগরং পরিতো দৃষ্টা সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।২/২/৪৭।

তখনকার দিনে বিয়ের সময় মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে সেবার জন্য দাসদাসী দেওয়ার প্রথা ছিল। কৈকেয়ীর সাথে তার পিতৃগৃহ থেকে এক কুব্জা দাসী এসেছিল যার নাম মন্থরা। মন্থরা দেখছে অযোধ্যার চারিদিকে বিরাট সাজগোজের তোড়জোর চলছে, অযোধ্যা নগরীকে পতাকা, তোড়ন দিয়ে সাজান হচ্ছে, ব্রাহ্মণদের বস্ত্রাদি দান করা হচ্ছে। মন্থরা জিজ্ঞেস করছে কি ব্যাপার।

তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ।
পর্য্যঙ্কস্থাং বিশালাক্ষীমেকান্তে পর্য্যবস্থিতাম্।২/২৫২।
কিং শেষে দুর্ভগে মূঢ়ে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।
ন জানীষেহতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী।২/২/৫৩

সব খবর গোচর হতেই মন্থরা গিয়ে কৈকেয়ীকে বলছে, ওহে মুর্খ! এত বড় ভয় উপস্থিত আর তুমি নিশ্চিন্তে বিছানায় শয়ন করে আছ! আসলে তুমি নিজে বেশি সুন্দরী কিনা তাই নিজের সৌন্দর্যের অভিমানেই মত্ত হয়ে আছ। তুমি মনে করছ তোমার সৌন্দর্য দিয়েই সারা জগৎ জয় করে নেবে। অথচ তোমার মাথার উপর তোমার বিনাশের খড়্গ উদ্যত সেটা তোমার চোখে পড়ছে না। পুরুষের বুদ্ধির অহঙ্কার আর নারীর রূপের অহঙ্কার এই দুটো দুজনকে বিনাশের দিকে নিয়ে যায়, মন্থরা কৈকেয়ীকে এই কথা বলতে চাইছে।

তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী।
তস্যৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনূপুরং রত্নভূষিতম্।
হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্।২/২/৫৫

মন্থরার মুখে রামচন্দ্রের অভিষেক হতে যাচ্ছে শুনেই কৈকেয়ীর মন আনন্দে ভরে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে শয্যা থেকে উঠে বসেছেন। এতই খুশি যে রামচন্দ্রের অভিষেকের খবর মন্থরার মুখে শুনেই কৈকেয়ী একটা রত্নখচিত সুবর্ণময় দিব্য নূপুর মন্থরাকে দান করে দিল। এত আনন্দের সময় আর তুমি বলছ মহাভয়!

ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃন্মে প্রিয়ংবদঃ।
কৌসল্যাং মাং স্মং পশ্যনসদাশুশ্রুষতে হি মাম্।২/২/৫৬
রামাদ্ভয়ং কিমাপন্নং ত মূঢ়ে বদস্ব মে।
তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদাথ কুব্জা অকারণবৈরিণী।২/২/৫৭

রাম আমার ভরতের থেকেও বেশি প্রিয়, সে আমার কখন প্রিয় কার্য ছাড়া কিছুই করে না আর নিজের মা কৌশল্যার থেকেও সে আমাকে বেশি বই কম ভালোবাসে না। আর সেই রামের থেকে আমার ভয় উপস্থিত হয়েছে, মুর্খ ছাড়া এই কথা কে আর বলতে পারে! আসলে ভালোবাসা এমনই এক জিনিস না বলে দিলেও বোঝা যায় সে আমাকে ভালবাসে কি বাসে না। সেইজন্য কৈকেয়ী বলছে, রে মূঢ়! রাম থেকে আমার ভয় কিভাবে

আসবে বলো। যেখানে এত আনন্দের ব্যাপার সেখানে ভয়ের কথা কিভাবে আসছে আমাকে বল। তখন মন্থরা বলতে শুরু করেছে। এখানে *অকারণবৈরিণী* শব্দটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। *অকারণবৈরিণী* মানে বিনা কারণে বৈরী কার্য সাধন করা। কিছু লোকের পক্ষে অকারণবৈর সাধন শব্দটা প্রযোজ্য হয়। মানুষ যখন শত্রুতা করে তখন কোন কারণেই করে, হয় তার সম্মান হানি করেছে বা তার স্বার্থে কোথাও ব্যাঘাত হয়েছে, এমন কিছু একটা হয়ে যার জন্য মানুষের মধ্যে বৈরী ভাব আসে। কিন্তু মন্থরা বিচিত্র, অকারণ, কোন কারণ নেই, শুধু অপরের ভালো দেখে তার শত্রুতার ভাব এসে গেছে।

এরপর মন্থরা অনেক কথা বলছে। এখানে এর একটা বিরাট বর্ণনা আছে, যেমন যেমন কবি হন তাঁরা এগুলোকে তেমন তেমন বর্ণনা করেন। এই ধরণের নাটকীয়তায় একটা ষড়যন্ত্রের ভাব থাকে। যাই হোক এখন মন্থরা কৈকেয়ীর মগজ ধোলাই করছে। কৈকেয়ীকে বলছে, এই যে রাজা দশরথ, তোমার স্বামী, অত্যন্ত বাজে লোক, সে তোমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তোমার রূপের প্রশংসা করে আর রামচন্দ্রকে রাজা করবে ঠিক করেছে বলে ভরত আর শত্রুঘ্নকে তাদের মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণ সব সময় রামের অনুগামী, যেমনি রাম রাজা হবে তখন ভরতকে হয় রামের দাস হয়ে থাকতে হবে নয়ত অযোধ্যা থেকে কোথাও চলে যেতে হবে, এই দুটো ছাড়া তৃতীয় কোন সম্ভবনা নেই। আর অন্য দিকে তুমি কৌশল্যার সতীন, এবার তোমাকে কৌশল্যার দাসী হয়ে থাকতে হবে।

বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনানুযায়ী দেখা যায়, কে বেশি রাজার প্রিয় হতে পারে এই নিয়ে কৌশল্যা আর কৈকেয়ীর মধ্যে প্রথম দিন থেকেই ভেতরে ভেতরে একটা সুপ্ত অশান্তি ছিল। যাই হোক মন্থরা বলছে, তোমার ছেলে ভরতকে অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আর তোমাকেও কৌশল্যার দাসী হয়ে থাকতে হবে। তার থেকে ভাল হবে যদি তুমি এক কাজ করতে পার –

পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্।
ইন্দ্রেণ যাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ।২/২/৬৬

অনেককাল আগে একবার যখন দেবাসুরের সংগ্রাম চলছিল সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র রাজা দশরথকে আহ্বাণ করেছিলেন যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য। দেবতা আর মানুষ কোথাও যেন মিলেমিশে যায়, মহাভারতেও এই ভাব প্রচুর পাওয়া যাবে, যক্ষরা রীতিমত মানুষের মধ্যে এসে মেলামেশা করছে। কখন এদের উপরের দিকে নিয়ে যায় আবার কখন নীচের দিকে নিয়ে আসে। মন্থরা কৈকেয়ী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, ওই যুদ্ধের সময় রাজা দশরথের রথের চাকার সাথে যে কীল লাগানো থাকে সেটা খুলে যায়। কীল খুলে গেলে আস্তে আস্তে চাকাটা রথ থেকে আলগা হয়ে বেরিয়ে যাবে। ওই দেখে তুমি ওই কীলের ছিদ্রে তোমার আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছিলে যাতে রথের চাকা স্বাভাবিক ভাবে ঘুরতে থাকে। তারপর সমস্ত অসুরদের সংহার করার পর তোমাকে রথে ঐ অবস্থায় দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। অত কষ্ট সহ্য করে থাকতে হল, কৈকেয়ী একবারের জন্য একটা কথাও বলল না, চুপ করে সহ্য করে গেল। কিন্তু আমাদের কাছে একটু খটকা লাগে যুদ্ধে কৈকেয়ীকে কেন সঙ্গে রেখেছিলেন বোঝা যায় না। রাজা তখন খুশি হয়ে তোমাকে দুটি বর দিতে চাইলেন। কৈকেয়ী খুব বুদ্ধিমতী, রাজার এখন এত ভালোবাসা যা চাইবো এমনিতেই দিয়ে দেবেন, তাই বর দুটো ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা যাক। দেখা যায় আজ কাউকে একটা কথা দিল যে তোমার অনুকূলে কিছু একটা করে দেব। পরে হয় ভুলে যায় নয়তো অন্য রকম সম্পর্ক হয়ে যাওয়াতে কিছু ভালো করতে ইচ্ছেও করবে না। আমরা কাউকে যা কিছু দিই আমরা কিন্তু কেউই কৃতজ্ঞতার জোরে দিই না। এটাকে বলে in anticipation, তার মানে আমি আপনার কিছু ভালো করেছি, এবার আমি আশা করছি বা আপনি কথা দিলেন আমি আপনার কাছে ঋণী থাকলাম, একদিন আমি এই ঋণ শোধ করব। পরে দরকার পড়াতে আমি যখন আবার আপনার কাছে গেলাম তখন আপনি যে আমার জন্য কিছু করবেন তা নয়, এভাবে তা হয় না। করবেন, যদি দেখেন আমি আবার প্রতিদানে কিছু দিতে পারব। কৃতজ্ঞ অকৃতজ্ঞ শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করি ঠিকই, কিন্তু কোনটাই কিছু নয়। মানুষ তখনই কারুর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, যদি জানে যে এই লোকটি আমার আবার প্রয়োজনে লাগবে। সেইজন্য আপনি পাঁচজনের যতই ভালো করে থাকুন, তারপর আগামীকাল আপনি দুর্বল হয়ে গেলেন, শেষ অবস্থায় চলে গেছেন এরপর আপনি আশা করছেন যাদের আমি মঙ্গল করেছিলাম তারা আমাকে সাহায্য করবে, এই আশা করাটা একেবারেই বৃথা। লোকেরা আপনাকে

তখনই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে যদি দেখে তার প্রয়োজনে সে আপনার কাছ থেকে কোন সাহায্য পেতে পারে। যদি আপনি শেষ হয়ে থাকেন, তাহলে ধরে নিন আপনি শেষ। এসব ব্যাপারে কোন সংশয় থাকা উচিৎ নয়। কৈকেয়ী কেন বর দুটো ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিল? কৈকেয়ী জানে আমার এখন যৌবন আছে, রাজা দশরথ এখনও কামুক, এখনও আমাকে ভালোবাসে, এগুলো চিরদিন থাকবে না, যখন এগুলো নড়বড়ে হয়ে যাবে তখন চেয়ে নেব। কিন্তু কৈকেয়ী যদি একেবারেই অযোগ্যা হয়ে যায় তখন দশরথ তাকে পাত্তা দিতেন কিনা সন্দেহ, তখন বর দিতে চেয়েছিলাম তখন ছিল, এখন ভুলে যাও। যাঁরা খুব উচ্চমানের মানুষ হন একমাত্র তাঁরাই করবেন আর অন্য কেউ যদি করেও দেয় কিন্তু এমন তাচ্ছিল্য ভাবে করবে যে এর থেকে না নেওয়াই ভালো ছিল। যাই হোক, রাজা দশরথ বললেন, ঠিক আছে। সব কথা বলে মন্থরা বলছে, এসব কথা আমি তোমার কাছেই শুনেছি সেই কথাই আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। এখন তুমি তোমার যত আভরণ আছে সব খুলে রেগে মেগে ছুড়ে ফেলতে থাক, আর মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাক, রাজা যতক্ষণ না তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করছেন ততক্ষণ মৌনতা অবলম্বন করে ক্রোধে মাটিতে পড়েই থাকবে। তখন কৈকেয়ী সেই বিখ্যাত উক্তি করছে –

এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রসুন্দরি।
ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সুতঃ প্রিয়ঃ।২/২/৭৭

যাকে এতক্ষণ কুব্জা বলছিল তাকেই এখন বলছে *বক্রসুন্দরী*। কৈকেয়ী বলছে তোমার এত বুদ্ধি কোথা থেকে এল, সব বুদ্ধি কি তোমার ওই কুব্জের মধ্যে জমা ছিল! আমার ছেলে ভরত যদি রাজা হয় আমি তোমাকে একশটি গ্রাম দান করব। তুমি আমাকে যা বুদ্ধি দিলে, এমন এক সময়ে তোমার বুদ্ধি আমার কাজে দিল যে আজ তুমি আমার প্রাণেরও প্রিয়। এই কথা বলার পরেই কৈকেয়ী রোষানলে জ্বলতে জ্বলতে ক্রোধাগারে প্রবেশ করল আর সব আভূষণ খুলে চারিদিকে ছুড়ে ফেলে দিল, মলিনবস্ত্র পরিধান করে ভূমিতে শয়ন করে থাকল; বলছে, যতক্ষণ না আমার পণ পুরণ না হয় ততক্ষণ আমি এভাবে এখানেই পরে থাকব। এরপর একটা নীতিবাচক শ্লোকে খুব সুন্দর কথা বলা হচ্ছে –

ধীরোঽত্যন্তদয়ান্বিতোঽপি সুগুণাচারান্বিতো বাথবা,
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যাবিবে কাঽথবা।

কোন মানুষের মধ্যে যদি সব রকম গুণ থাকে, কি কি গুণ, অত্যন্ত ধৈর্যবান, অত্যন্ত দয়ালু, সদ্‌গুণসম্পন্ন, সদাচারী, নীতিপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ এবং বিদ্যা-বিবেকসম্পন্ন সবই আছে কিন্তু –

দুষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ভজেৎ,
তদুবুদ্ধ্যা পরিভাবিতো রজতি তৎস ম্যংক্রমেণা স্ফুটম্‌।২/২/৮২।

যদি দুষ্ট লোকের সঙ্গ ক্রমাগত করতে থাকে তাহলে এই ধরণের মানুষের বুদ্ধি বিচারও প্রভাবিত হয়ে দুষ্ট লোকের মত হয়ে পড়ে। অন্য এক প্রসঙ্গে এর আগে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল কিভাবে মন মনকে প্রভাবিত করে। যদি আমরা দুর্বল লোকের সঙ্গ করি কিছু দিন পরে দেখা যাবে আমরাও ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছি। স্বামীজী এক জায়গায় আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা বলছেন। সেই সময় ইংল্যাণ্ডের হাতেই আয়ার্ল্যাণ্ডের খুব দুরবস্থা চলছিল। স্বামীজী বলছেন এই আইরিশরা যখন নিজের দেশে থাকে তারা কুজো হয়ে হাঁটে, তাদের সব সময় বলা হয় তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না। এরাই যখন আমেরিকায় আসে আর তাদের যখন বলা হয় তুমি স্বাধীন, তোমার উপর কারুর কোন অধিকার নেই তখন কদিন পরেই তাদের হাঁটাচলা সব পাল্টে যায়। আপনি যেমনটি সঙ্গ করবেন আপনার ব্যক্তিত্ব কদিন পর ধীরে ধীরে তেমনটি হয়ে যাবে। যতই আপনার ভেতরে তেজ থাকুক, যতই শক্তি থাকুক, দুর্বলদের সঙ্গ করতে থাকুন, দেখবেন কদিন পরে আপনার সব তেজ, শক্তি উধাও হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি দুষ্ট লোকের সঙ্গ করতে থাকলে কিছু দিন পরে বুদ্ধিটাও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। কৈকেয়ীর মধ্যে হয়ত অনেক গুণ ছিল, কিন্তু মন্থরার সঙ্গ করে করে ওর বুদ্ধি নাশ হয়ে গেছে। সেইজন্য শেষ শ্লোকে বলছেন –

অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গী চ্যবতে স্বার্থাদ্‌যথেয়ং রাজকন্যকা।২/২/৮৩

এই যে রাজকন্যা পুরুষার্থচ্যুত হয়ে গেল, পুরুষার্থচ্যুত মানে, আদর্শ আর লক্ষ্য এই দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলে। লক্ষ্য অনেক সময় আদর্শকে নীচে নামিয়ে দেয়, আমাদের এখানে আদর্শ সব সময় ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ। অথবা আমরা এখন যেমন বলছি বিদ্যার আদর্শ বা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করার আদর্শ, এটাকে বলছেন পুরুষার্থ। মানুষ কখন পুরুষার্থচ্যুত হয়ে যায়? যখন দুষ্ট লোকের সঙ্গ করে বা আমার সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে। ভুল সিদ্ধান্ত মানে আমি ঠিক জিনিসটা বুঝতে পারলাম না। সেইজন্য কারুর সাথে কথা বলতে গেলে, মেলামেশা করতে গেলে দেখতে হয় মানুষটির মধ্যে কি কি বিশেষত্ব আছে, এর কি কি বৈশিষ্ট্য, এর শক্তিটা কোথায়। যদি দেখি এর মধ্যে শক্তি নেই বা যে ধরণের শক্তি আমার ভেতরে আছে বা যে শক্তিটা আমি চাইছি সেই শক্তিটা নেই, তাহলে কিন্তু এই ধরণের মানুষের থেকে দূরেই থাকতে হয়। আমরা অনেক সময় ভাবি, আমি যাকে ভালোবাসি তার মধ্যে দুর্বলতা আছে ঠিকই কিন্তু আমি সঙ্গ করে করে তাকে তুলে নেব। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে নেগেটিভ শক্তির জোর অনেক বেশি। স্বামীজীর মত বা গান্ধীজীর মত মহাপুরুষদের শক্তি বিরাট, তাঁরা নেগেটিভ শক্তিকে সরিয়ে অন্য দিকে ঠেলে দিতে পারবেন। আমার আপনার পক্ষে এই জিনিস সম্ভব নয়। আমাদের অবস্থা দুধের মত, জল মেশালে দুধটা নষ্ট হয়ে যাবে অন্য দিকে ঠাকুর, স্বামীজী এনারা হলেন মাখন তোলা, ওনাদের কোন কিছুতেই আর কিছু আসে যায় না। এখানে এটাই বলতে চাইছেন যে, যদি আপনি বেশি দুষ্ট লোকের বা দুর্বল লোকের সঙ্গ করেন ধীরে ধীরে আপনার সব কিছুই এদের মত হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন দুর্বল বা দুষ্ট লোকের বেশি সঙ্গ করতে নেই। কৈকেয়ী হল এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কৈকেয়ী এখন যা করতে যাচ্ছে এতে ধর্ম, অর্থ, কাম কোনটারই সিদ্ধি লাভ হবে না।

এরপর আবার কাহিনীতে ফিরে যাচ্ছেন। রাজা দশরথ রাজমহলে ঢুকে দেখছেন সেখানে কৈকেয়ী নেই। কৈকেয়ীর দাসীদের কাছে জানতে পারলেন কৈকেয়ী কোপভবনে পড়ে আছেন। দশরথ কোপভবনে গিয়ে দেখছেন কৈকয়ী মলিন বেশে পড়ে আছে। সব কিছু দেখে তিনি তৃতীয় সর্গে বলছেন –

কৈকেয়ীকে দশরথের বরদান

ব্রূহি কং ধনিনং কুর্য্যাং দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করম্।
ধনিনং ক্ষণমাত্রেণ নির্ধনঞ্চ তবাহিতম্।২/৩/১২

হে প্রিয়তমা! বল, তোমার প্রিয় কোন দরিদ্রকে ধনী করে দিতে হবে বা তোমার অপকারী কোন ধনীকে নির্ধন করে দিতে হবে। তুমি বল কাকে বধ করতে হবে, আমি তাকে বধ করিয়ে দিচ্ছি, আর যদি কোন বধ্যকে মুক্ত করে দিতে চাও বল, আমি তাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। এমনকি তোমাকে খুশী করার জন্য আমি আমার প্রাণকেও বিসর্জন দিয়ে দিতে পারি। আর কমলনয়ন রাম, যাকে আমি আমার প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি, সেই রামের নামে শপথ নিয়ে বলছি তোমার কোন হিতকার্য্য করে দিতে হবে বল, তাও তুমি এভাবে আমার থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। রামের নামে শপথ করাতে কৈকেয়ী তখন চোখের জল মুছতে মুছতে তার সেই দুটি বরের কথা বললেন। সেই দুটি বর কি?

তদ্দ্বয়ং ন্যাসভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুব্রত।
তত্রৈকেন বরেণ শু ভরতং মে প্রিয়ংসুতম্।২/৩/১৮
এভিঃ সম্ভৃতসম্ভারৈর্যে বিরাজ্যেহভিষেচয়।
অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্।২/৩/১৯
মুনিবেশধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলভূষণঃ।
চতুর্দশ সমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ।
পুনরায়াতু তস্যান্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ম্।২/৩/২০
প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামো রাজীবলোচনঃ।২/৩/২১

হে সুব্রত! এর আগে তুমি আমাকে দুটি বর দিয়েছিলে, সেই দুটি বরই আমি তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন আমি সেই বর দুটি চাইছি, তার একটি বরে আমার পুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর আর অপরে বরে রাম অবিলম্বে চৌদ্দ বছরের জন্য মুনিবেশ ধারণ করে, জটা-বল্কলে ভূষিত হয়ে দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।

আমরা অনেক জায়গায় শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ আর সীতার জঙ্গলে যাওয়ার ছবি দেখতে পাই আর পরে টিভি সিরিয়ালের দৌলতে আরও ভালো করেই দেখেছি। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের জঙ্গলে যাওয়ার যে ছবি আমরা দেখি তাতে শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ গেরুয়া বস্ত্র পরিধান করে আছেন। বেলুড় মঠে একজন মহারাজ ছিলেন, অল্প কিছু দিন আগে তিনি গত হয়েছেন। মহারাজের অনেক দিকে প্রতিভা ছিল, শাস্ত্র খুব ভালো জানতেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালো জানতেন আর ছবি আঁকাতে বিরাট প্রতিভা ছিল। ফাইন আর্টস যাদের মধ্যে থাকে তাদের একটা দিকে প্রতিভা থাকলে আরও অনেক দিকে প্রতিভা থাকে। কিছু দিনের জন্য মহারাজ দেওঘর বিদ্যাপীঠে ছিলেন। সারাদিন বসে বসে তিনি শুধু পেইন্টিং করতেন। বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে ঢুকতে শ্রীমায়ের একটা বৃহৎ ছবি লাগানো আছে, ছবিটি মহারাজের আঁকা। একদিন কথায় কথায় দেওঘরের অধ্যক্ষকে মহারাজ বলছেন, আমি মাঝে মাঝে ভাবি শ্রীরামচন্দ্র যখন জঙ্গলে গিয়েছিলেন তখন উনি মুনিবেশে ছিলেন, কিন্তু যেখানেই শ্রীরামচন্দ্রের জঙ্গলে যাওয়ার ছবি দেখি সেখানেই তাকে ধুতি পড়া দেখি, এটা কিন্তু ভুল। এরপর তিনি শ্রীরামচন্দ্রের একটা ছবি আঁকলেন। এই ছবিটি ওখানকার অধ্যক্ষের অফিস ঘরে টাঙানো আছে। এখনও আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে এটাই শ্রীরামচন্দ্রের জঙ্গলে যাওয়ার সঠিক চিত্র। কারণ বাল্মীকি রামায়ণে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণেও ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

কৈকেয়ী যে বর চাইছে তাতে প্রথম শর্ত হল ভরতকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করতে হবে আর দ্বিতীয় বরে বলছে, *মুনিবেশধরঃ*, রাম যেন মুনিবেশে থাকে তার সাথে আরও একেবারে সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছে, *জটাবল্কলভূষণঃ*, মাথায় যেন জটা থাকে আর পরনে যেন বল্কল থাকে। বল্কল এক ধরণের বিশেষ গাছের ছাল, গেরুয়া কাপড় পড়া চলবে না। সিরিয়ালে গেরুয়া ধুতি যদি সরিয়ে দেয় তাহলে সিরিয়ালের টিআরপি রেট কমে যাবে, তখন রাম আর রাম থাকবেন না, গ্ল্যামারটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু জিনিসটা তা নয়। এমনকি বাল্মীকি রামায়ণে এই জিনিসটাকে আরও দীর্ঘায়িত করেছেন, একটু পরে সীতাও যখন যেতে চাইছেন তখন কৈকেয়ী তারও শাড়ি গয়না খুলে দিচ্ছিল। তখন বশিষ্ঠ, সুমন্ত্র প্রচণ্ড আপত্তি করেছেন, সীতাকে এভাবে পাঠান যাবে না, কারণ তোমার শর্ত রামকে নিয়ে। সেইজন্য রাম আর সীতার খুব মজার combination। শ্রীরামচন্দ্র শিব রূপ ধারণ করে আছেন, জটা বল্কল আর সীতার অন্নপূর্ণার বেশ, গয়না, শাড়ি সবই আছে। সীতা মা অন্নপূর্ণা কিনা। ঠাকুরের শরীর চলে যাওয়ার পর, ঠাকুর মাকে সোনার বালা খুলতে দিলেন না, কারণ তখন জগৎ যেন অনীশ্বর হয়ে যাবে, জগতে অলক্ষ্মী এসে যাবে, মা অন্নপূর্ণা কিনা। কৈলাসে যিনি মা অন্নপূর্ণা তিনিই অযোধ্যাতে সীতা, তিনিই কলকাতায় শ্রীমা। বৈধব্য মানেই কাঙালিনীর বেশ বা ভদ্র ভাষায় বলা যায় ব্রহ্মচারিণীর বেশ। ব্রহ্মচারিণীর দুটি কাপড়, একটা পরিধানে আরেকটা শুকোচ্ছে, মাটিতে শয়ন। এভাবে জগন্মাতাকে ব্রহ্মচারিণী করে দিলে জগতের যা দিয়ে পোষণ হয়, সেই পীনপোয়ধর, সেটাই শুকিয়ে যাবে, সেটা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে সমগ্র জগতটাই অসমৃদ্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য মেয়েদের উপোস করা, মলিন বেশে থাকা ঠাকুর একেবারেই পছন্দ করতেন না। শোকের সময় আলাদা ব্যাপার, সাধারণ অবস্থায় মেয়েদের এভাবে থাকতে নেই। মনুস্মৃতিতেও বলছেন নারী গৃহলক্ষ্মী। একজন হলেন গৃহলক্ষ্মী আরেকজন হলেন জগতলক্ষ্মী। গৃহলক্ষ্মী বা জগতলক্ষ্মীর সমৃদ্ধিসূচক জিনিস গুলো যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে বিরাট শোক এসে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র শিব, ঠাকুরও তাই ছিলেন, পরিধানে কোন কিছুই আড়ম্বর নেই অথচ তাঁদের সঙ্গিনীর সবটাই আছে। এটাই আদর্শ জুড়ি।

কি কি শর্ত কৈকেয়ী বলছে? *মুনিবেশধরঃ*, মাথায় জটা, পরনে বল্কল, জটা মানে মাথায় যেন চিরুনির ব্যবহার করতে না পারে। বলা হয় যে গঙ্গার জলে এমনিতেই জটা হয়ে যায়, গঙ্গায় রোজ স্নান করে চুল না আঁচড়ালে কিছু দিনের মধ্যে মাথায় জটা হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্রকে মাথায় জটা তৈরী হতে সময় দিতে হবে, মাথার চুলও অত বড় নয়। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা আছে যে, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণের মাথায় বটবৃক্ষের দুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, দুধের আঠাতে চুল জট পাকিয়ে গেল। তার সাথে *চতুর্দশ সমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ*, চৌদ্দ বছর জঙ্গলে ফল-মূল খেয়ে থাকবে। আবার মজা করে বলছে, চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর রাম যদি ইচ্ছে করে জঙ্গলেই থেকে যেতে পারে, এদিকেই যে আসতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। চৌদ্দ বছর পর রামের দিক থেকেও আশঙ্কা থাকতে পারে, কারণ চৌদ্দ বছর ভরত রাজত্ব করলে প্রজারা তাকেই মেনে নেবে। সেইজন্য চৌদ্দ বছর পর শ্রীরামচন্দ্র যদি ফিরেও আসেন খুব একটা সমস্যা হবে না। মানুষের মন এমনই বিচিত্র যে একটা পরিবেশে থাকতে থাকতে ওই পরিবেশেই সে অভ্যস্ত হয়ে যায়, এর বাইরে অন্য ধরণের পরিবেশকে ওই মন চট

করে মেনে নিতে পারে না। একজন লোকের কুড়ি বছর জেলে থাকার সাজা হয়েছিল। কুড়ি বছরের মেয়াদ শেষে তাকে ছাড়া হয়েছে, ওই অন্ধ কূপের বাইরে আলোর মধ্যে এসে সে চেঁচাতে শুরু করেছে, আমি এই আলোতে থাকতে পারব না। আবার তাকে জেলে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেল একটা লেখাতে উনি বলছেন, আমাকে যদি কুড়ি বছরের জন্য কোন দেশের শিক্ষা মন্ত্রী করে দেওয়া হয় সেই দেশের সমাজকে আমি চিরদিনের জন্য আমার গোলাম বানিয়ে নেব। কুড়িটি বছর ধরে কোন জাতিকে যদি indoctrinate করা হয় সেই জাতি চিরদিনের মত গোলাম হয়ে যাবে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু জিনিসটা পুরো ভুল বলেছিলেন। এটাই সমস্যা হয়ে যায়, একটা চিন্তনের পেছনে যদি পরম্পরা না থাকে সেই চিন্তনে অনেক গোলমাল হয়ে যায়। ওনার চিন্তনে কোন পরম্পরা ছিল না। উনি সেই সময়ে স্টালিনের রাশিয়ার আন্দোলনের পেছনে কম্যুনিস্টদের ভূমিকা দেখে এই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল কম্যুনিজম মতবাদ রাশিয়াতে চলতে পারল না। আসলে মানুষের আত্মার শক্তি বুদ্ধির শক্তি থেকে অনেক বেশি। মানুষের বুদ্ধিকে যতই প্রভাবিত করে দেওয়া হোক না কেন, একশ লোকের মধ্যে নিরানব্বুই জনকে করে দেওয়া যাবে, কিন্তু একজন থেকে যাবে যার মধ্যে আত্মার শক্তিটা থেকে যায়, আমি স্বাধীন হতে চাই, এই ইচ্ছাটা তার থেকে যাবে। সেখান থেকে আমি স্বাধীন হব এই চিন্তাটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। কুড়ি বছর তো দূরের কথা, হাজার বছরও যদি রেখে দেওয়া হয়, তারপরেও যদি একজন এসে যায়, মুক্তি জিনিসটা এমন একটা জিনিস, ভেতরে মুক্তির এমন একটা চাহিদা থাকে যে তাকে একটা সময়ের পর আর গোলাম করে রাখা যাবে না। কৈকেয়ী ভাবছে চৌদ্দ বছর যদি রামকে রাজ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, পরে তার রাজ্য পাওয়ার ইচ্ছাই হবে না। কৈকেয়ীর এই চিন্তাটা ভুল ছিল, সেটা অন্য ব্যাপার, কিন্তু এই চিন্তা করাটাই ভুল। যাই হোক, কৈকেয়ী সব বলে দেওয়ার পর বলছে আপনি যদি আমার এই বর অস্বীকার করেন বা বিলম্ব করেন তাহলে আমি এক্ষুণি *প্রাণাংস্ত্যেক্ষ্যে তবাগ্রতঃ*, আপনার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করব।

কৈকেয়ীর রোমকূপ সোজা হয়ে যাওয়ার মত নিদারুণ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করতেই একটা পাহাড়ে বজ্রপাত হলে পাহাড় যেমন নিপতিত হয়, ঠিক সেই রকম অত শক্তিমান পুরুষ রাজা দশরথ পড়ে গেলেন। দশরথ নিজের কর্ণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাসই করতে পারছেন না, আমি কি ঠিক শুনেছি কৈকেয়ী কি বলতে চাইছে, আমি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি, তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না। মনের শক্তি কিভাবে শরীরকে চালায় ভাবলেই অবাক লাগে। রাজা দশরথ ক্ষমতাবান, শক্তিশালী সবই ঠিক আছে কিন্তু একটি মাত্র বাক্য, রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, শোনার সাথে সাথে তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। আমরা নিজেদের নিয়ে কত অহঙ্কার করি অথচ আমাদের জীবন যেন একটি কথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। একটি কথা শুনে নিল তাতেই মস্তিষ্কের যে রসায়ন মুড ঠিক রাখে তার লেভেল এত নীচে নেমে গেলে যে পা টলমল করতে করতে উল্টে পড়ে গেল। অন্য দিক দিয়ে যদি দেখা হয়, তাঁর প্রাণ অন্য একজনের উপর এত বেশি রাখা আছে যে, তার কিছু হওয়ার খবর শুনেই নিজে উল্টে পড়ে যাচ্ছে। রাজা দশরথ বলছেন –

শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমুজ্য পরয়া ভিয়া।
দুঃস্বপ্নো বা ময়া দৃষ্টো হ্যথবা চিত্তবিভ্রমঃ।২/৩/২৪।

রাজা দশরথের একটু পরে যখন চেতনা সামান্য ফিরেছে, তখন তিনি অবাক হয়ে ভাবছেন, এটা কি হলো! আমি কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছি, নাকি আমার চিত্তে কোন বিভ্রান্তি এসে গেছে। রাজযোগে পতঞ্জলি বলছেন আমাদের চিত্তে সব সময় যে বৃত্তি জ্ঞান হয়, এই বৃত্তি জ্ঞান পাঁচ ভাবে আসে – প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণ মানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কৈকেয়ী এখানে শব্দ দিয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিয়েছে, তার সাথে বিপর্যয়, বিকল্প আর নিদ্রা এই চারটে বৃত্তির কথা দশরথ বলে দিলেন। এখানে স্মৃতি থেকে তাঁর কোন জ্ঞান হচ্ছে না। নিদ্রা মানে স্বপ্ন, রাজা বলছেন আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম, আর বিভ্রম, আমার কি কোন ভ্রান্তি হয়ে গেল। বিভিন্ন ভাবে আমাদের যে জ্ঞান আসে সেটাকেই এখানে কায়দা করে বলে দেওয়া হল। শব্দ কিন্তু সত্যিই আসছে, কিন্তু রাজা ভাবছেন এটা কি স্বপ্ন, নাকি আমার চিত্তে ভ্রান্তি এসেছে। চতুর্থ বিকল্প, যেখানে কোন কিছুই নেই, বস্তু অভাবঃ। তখন বলছেন –

ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃস্থিতম্।
কিমিদং ভাষসে ভদ্রে মম প্রাণহরং বচঃ।২/৩/২৫

বাল্মীকি ছিলেন একজন সত্যিকারের কবি, অন্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কবি নন, তাঁরা সাধক। কবি আর সাধক লেখকের মধ্যে তফাৎ হল, কবিদের যে কোন রসের বর্ণনা সাধক লেখকদের থেকে অনেক উচ্চমানের হয়। সাধকরা সার তত্ত্বের উপর বেশি জোর দেন। বাল্মীকিও একজন উচ্চমানের ঋষি কিন্তু তার সাথে ওনার মধ্যে কবিত্ব ছিল। সব সাধকের মধ্যে কবিত্ব থাকে না। ব্যাসদেব যেমন, তিনি উচ্চমানের ঋষি কিন্তু কবিত্ব ভাব বাল্মীকির তুলনায় অতটা গভীর ভাবে ছিল না, ব্যাসদেবের রচনার মধ্যে তত্ত্বের প্রাধান্য বেশি। দশরথের চিত্তে বিভ্রম হয়েছে, সেখান থেকে তাঁর চেতনা যখন একটু জাগ্রত হয়েছে। জাগ্রত হয়ে দেখছেন, তিনি যাকে এত ভালোবাসেন সেই কৈকেয়ী তাঁর সামনে বসে আছে। কিন্তু অত্যন্ত আদরের প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখে রাজা দশরথের কি মনে হচ্ছে? *ব্যাঘ্রীমিব*, কৈকেয়ী যেন একটা বাঘিনীর মত শিকারের সামনে বসে আছে। নারীর মুখে যতই সৌন্দর্য্য থাকুক, যতই তার মিষ্টি মুখ হোক কিন্তু কখন যে সেই চন্দ্রমুখী জ্বালামুখী হয়ে যাবে কোন ঠিক নেই। বলছেন বাঘিনীর মত শিকার লব্ধ বস্তুর সামনে বসে আছে।

রাজা দশরথ বলছেন, 'রাম তোমার কি অপরাধ করেছে? তুমি আগে আমাকে সব সময় রামের গুণের প্রশংসা করতে, তুমিই বলতে রাম কৌশল্যা আর তোমাকে সমান চোখে দেখে, তুমিও রামকে কত ভালোবাসতে কিন্তু এখন এসব কী বলছ'! শ্রীরামচন্দ্র সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত তাই সবারই প্রিয়। সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকলে সবাই তাকে ভালোবাসে। শ্রীকৃষ্ণেরও আমরা তাই দেখি, ঠকুরেরও তাই দেখি। রাজা দশরথ ঠক ঠক করে কাঁপছেন আর বলছেন –

রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে।
অনুগৃহ্নীষ্ব মাং বামে রামান্নাস্তি ভয়ং তব।২/৩/২৮

হে কৈকেয়ী! তোমার পুত্র ভরতই রাজ্য গ্রহণ করুক, কিন্তু আমার রাম যেন গৃহেই থাকতে পারে, তুমি আমাকে অনুগ্রহ কর, রামের কাছ থেকে তোমার কোন আশঙ্কা নেই। এখানে রামের তো কোন দোষ নেই, তুমি এই রকমটি করতে যেও না। কৈকেয়ী এবার মুখ খুলেছে –

কৈকেয়ী প্রত্যুবাচেদং সাপি রক্তান্তলোচনা।২/৩/২৯
রাজেন্দ্র কিং ত্বংভ্রান্তোহসি উক্তংতদ্ভাষসেহন্যথা।
মিথ্যা করোষি চেৎস্বীয়ং ভাষিতং নরকো ভবেৎ।২/৩/৩০

কৈকেয়ীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। সর্পিণীর লেজে পা পড়ে গেছে, এবার সে ফোঁস করবেই। *রক্তান্তলোচনা*, ক্রোধে কৈকেয়ীর চোখ আরক্তিম হয়ে গেছে। সংসারে কিভাবে আগুন জ্বলে এখানে এসে বোঝা যায়। সংসারীদের এগুলো খুব ভালো করে জানা দরকার। জীবনে যে নানা রকম সমস্যা আসে তার একটা প্রধান কারণ হল জীবন চালাতে গেলে যে মূল কয়েকটি জিনিস দরকার আমরা সেসব ব্যাপারে অনেকেই ওয়াকিবহাল নই। মানুষ কিভাবে ব্যবহার করে, যুক্তি-তর্ক কিভাবে নিয়ে আসে এই ব্যাপার গুলো যদি জানা থাকে আগে থেকেই সাবধান হয়ে যাওয়া যায়, আর জানার পরেও যদি ভুল করে ফাঁদে পড়ে যায় তাহলেও কিন্তু বুঝতে পারে যে আমি ফাঁদে পড়ে গেছি। কৈকেয়ী বলছে, হে রাজা! আপনার কি মাথার গণ্ডগোল হয়ে গেছে যে, এখন অন্য রকম কথা বলছেন! কথা দিয়ে কথা না রাখলে যে নরকে যেতে হয় আপনি কি সেটা জানেন না!

বাল্মীকি রামায়ণে একটা খুব সুন্দর কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে, যে কাহিনী পরে অন্যান্য সাহিত্যেও জায়গা করে নিয়েছে। যদিও এখানে এখনও সুমন্ত্রের কোন ভূমিকা আসছে না, একটু পরেই আসবে। বাল্মীকি রামায়ণে কৈকেয়ীকে সুমন্ত্র বলছেন, তুমি কৈকয় প্রদেশের মেয়ে, ওখানকার মেয়েদের খুব বদনাম আছে, আর তোমাদের দেশেরই খুব প্রচলিত গল্প আছে। এই বলে সুমন্ত্র কৈকয় দেশের খুব প্রচলিত কাহিনী বলছেন, যে কাহিনী আমরা অনেক সাহিত্যেও পড়ে থাকি। কৈকয় দেশের একজন গৃহস্বামী পশুপাখিদের ভাষা বুঝতে পারত। একদিন তার একটা বলদের পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল। গৃহস্বামী বুঝতে পেরে বলদের খুব সেবা শুশ্রুষা করেছে। সেদিন বলদকে কাজেও পাঠায়নি। বিকালবেলা অন্য বলদ কাজ থেকে ফিরে এসে তাকে বলছে, কি ভাই! তুমি আজ কাজে গেলে না? বলদটা বলছে, আমার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেইজন্য স্বামী আমাকে ছুটি দিয়েছে, তাই বাড়িতেই ছিলাম। পরের দিন অন্য বলদটা পেটের যন্ত্রণার নকল করেছে। কিন্তু গৃহস্বামী ওদের কথাবার্তা শুনে নিয়েছিল, পশুপাখির কথা বুঝতে পারত কিনা। বলদটা পেটে যন্ত্রণার অছিলা করাতে গৃহস্বামী ওর খাওয়াটাই সেদিন বন্ধ

করে দিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা সে বলদকে বলছে, আরে ভাই! স্বামী তো আজ আমার খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছে। বলদের কথা শুনে গৃহস্বামী খুব জোর হেসে উঠেছে। গৃহস্বামীর স্ত্রী হাসি শুনে বলছে, তুমি হাসলে কেন? গৃহস্বামীর এই যে বিদ্যার ব্যাপারে কেউ যদি জেনে যায় তাহলে গৃহস্বামী মারা যাবে। গৃহস্বামী বলছেন, আমি এমনি হেসেছি, ও কিছু না। কিন্তু স্ত্রী এমনই অপদার্থ আর হিংসুটে যে স্বামীকে মানছেই না, তোমাকে বলতেই হবে তুমি হাসলে কেন। গৃহস্বামী এখন খাটে গিয়ে শুয়ে পড়েছে, জানে আমাকে বলে দিতেই হবে আর আমাকে মারাও যেতে হবে। সকালবেলা উঠে দেখে একটা মুরগী কি একটা বদমাইসি করেছে, মোরগটা এসে মুরগীকে এক চাটি মেরেছে। মোরগরা পা দিয়ে মারে। মোরগটা মুরগীকে বলছে, তুমি আমাকে কী মনে করেছ! আমি কি এই গৃহস্বামীর মত নাকি যে, বউয়ের কথা মত ওঠ-বোস করব! গৃহাস্বামী আবার মোরগ-মুরগীর কথাবার্তাও শুনতে পেরেছে। সেই মুহুর্তেই, তবে রে খ্যাপী, বলে গৃহস্বামী লাফিয়ে উঠে পড়েছে। আমি মরি কি বাঁচি তোর তাতে কিছু আসে যায় না তাই না! বলেই স্ত্রীকে মারতে শুরু করেছে। সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে বলছেন, তোমার এটাই দরকার। সুমন্ত্র মন্ত্রী হয়েও অনেক কিছু বলে দিয়েছে, এর বেশি বলতে পারে না। কৈকেয়ী কি বলছে?

বনং ন গচ্ছেদ্ যদি রামচন্দ্রঃ প্রভাতকালেঽজিনচীরযুক্তঃ।
উদ্বন্ধনং বা বিষভক্ষণং বা কৃত্বা মরিষ্যে পুরতস্তবাহম্।২/৩/৩১
সত্যপ্রতিজ্ঞোঽহমিতীহ লোকে বিড়ম্বসে সর্বসভাস্তরেষু।
রামোপরি ত্বং শপথঞ্চ কৃত্বা মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো নরকং প্রয়াহি।২/৩/৩২

যদি রামচন্দ্র সকালেই চীরাজিন পরিধান করে বনে না যায় তাহলে গলায় দড়ি দিয়ে নাহলে বিষপান করে তোমার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করব। রাজা! তোমার সব ভণ্ডামি ফাঁস হয়ে যাবে, তুমি চারিদিকে সভায় বলে বেড়াও তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞঃ, সবাই জেনে যাবে তুমি আসলে একটা ভণ্ড। তুমি আমাকে বর দিয়ে আবার পিছিয়ে যাচ্ছ। তোমার যে শুধু দুর্নামই হবে তাই নয়, রামের নামে শপথ নিয়ে তুমি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছ এতে নরকপ্রাপ্তি তোমার অবশ্যাম্ভাবি।

একটু বিচার করে দেখা যাক, কৈকেয়ী যা করেছিল সেটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল? জীবনে যদি বাঁচতে হয় আমাদের সবাইকেই এই রকম করেই বাঁচতে হয়। সাংসারিকতার দৃষ্টিতে ভালো করে দেখলে বলা যেতে পারে কৈকেয়ী ভুল কিছু করেনি। আমাকে এই জগতে টিকে থাকতে হবে, এখানে সবাই সবাইকে পিষে যাচ্ছে, আমাকেও টিকে থাকতে হলে কাউকে না কাউকে পিষতে হবে। সেদিক দিয়ে কৈকেয়ী ভুল কিছু করছে না। রাবণ বলছে আমার রাজ্যের মধ্যে যে নারীর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়বে সে আমার, শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আমি ক্ষত্রিয়, আমার স্ত্রীকে যদি কেউ বলপূর্বক নিয়ে যায় তাকে আমি বধ করবই। আমাদের একটা জিনিস ভালো করে বুঝতে হবে, শাস্ত্রাদি পড়ে আমরা খুব সহজ ভাবে বলে দিই অধর্মের উপর ধর্মের জয়। কিন্তু অতি সহজিকরণ দিয়ে শাস্ত্র চলে না। অতি সহজিকরণ দিয়ে কি চলে? যেমন একটা গল্প লেখা হবে, ভালো ছেলে আর খারাপ ছেলে, একটা সুবোধ বালক ছিল। তার খুব খিদে পেয়েছিল, মাকে তাকে কেক দিয়েছিল। খেতে খেতে যাচ্ছিল। একটা ভিখারিণী এসে তাকে বলল, বাবা! আমি তিন দিন কিছু খাইনি। সুবোধ বালক তাকে সেই কেকটা দিয়ে দিল। একটা খারাপ ছেলে ছিল, তার পকেটে অনেক পয়সা থাকত। একটা ভিখারী তার কাছে ভিক্ষা চাইল, সে তাকে দিল না। তারপর একদিন ভালো ছিল যাচ্ছিল তাকে একজন গাড়ি করে নিয়ে গেল, খারাপ ছেলেকে নিল না, সে পরে একটা গর্তে পড়ে গেল। এই হল ভালো ছেলে আর খারাপ ছেলের গল্প। শাস্ত্র এভাবে হয় না। শাস্ত্রে কখনই ধর্ম আর অধর্মের লড়াই চলে না। তাহলে শাস্ত্রে কি চলে? ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই চলে। বালসাহিত্যে ধর্ম অধর্মের লড়াই হয়, শাস্ত্রে ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই হয়। কৈকেয়ীর এটাই ধর্ম, কৈকেয়ী কিছু ভুল করছে না। কৈকেয়ী একজন মা, মা নিজের সন্তানের ভালোর জন্যই সব করছে, কোন ভুল করছে না। তাহলে রামায়ণে কেন কৈকেয়ীকে বদমাইস বলছে? আমরা আজ শ্রীরামচন্দ্রকে ভালোবাসে তাই কৈকেয়ীকে খারাপ মনে করছি।

সমগ্র মহাভারতে ধর্ম আর অধর্মের লড়াই কোথাও নেই। মহাভারত *যতো ধর্মঃ ততো জয়ঃ*, এটাকেই ব্যাখ্যা করছেন। পাণ্ডবরা সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে গেল, তাহলে কোথায় গেল ধর্মের জয়! তখন বলছেন, না, ধর্ম মানে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ যেখানে জয় সেখানে। যদি ভালো করে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে কৌরবরা পাণ্ডবদের থেকে অনেক বেশি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কি যুদ্ধের সময়েও। আমরা বিষপান, জতুগৃহ

বলছি, এগুলোও আছে, কেউ অস্বীকার করবে না, এগুলোর মধ্যে যে গোলমাল ছিল না তা নয়। কিন্তু পাণ্ডবদেরও অনেক রকমের গোলমাল ছিল। কিন্তু আসল লড়াই সব সময় ধর্মের সাথে ধর্মের। দ্রৌপদীর চীরহরণের সময় অনেক আলোচনা আছে কিন্তু মহাভারতে কোথাও ধর্মের অধর্মের সাথে লড়াই নেই, লড়াই সব সময় ধর্মের সাথে ধর্মের, একটা ধর্মের সাথে আরেকটা ধর্মের লড়াই।

চুরি করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, বড়দের সম্মান করবে এগুলো আমরা ক্লাশ ফোরেই শিখে নিয়েছি। তাহলে সারা জীবনে আমাদের এত সমস্যা কেন? আমাদের সমস্যা কি নিয়ে হয়? ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াইকে নিয়েই সমস্যা বা আমাদের যে টিকে থাকার লড়াই সেখানে পরস্পর বিরোধী পরিস্থিতিতে আমাদের সমস্যা হয়ে যায়, এটাও ঠিক মনে হচ্ছে আবার ওটাও ঠিক মনে হচ্ছে। আমি জানি এটা করা ঠিক নয়, কিন্তু না করলে আমি বাঁচব না। কৈকেয়ী এখানে যা করছেন এটাই টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা। ধর্ম আবার আরোপিত, আরোপিত মানে কিছু বিধি বা আইন যদি তৈরী করে না রাখা হয় সমাজে অরাজকতা এসে যাবে। সেইজন্য শক্তিমান বা ক্ষমতাশালীরা বলে আমরা আমাদের আইন নিজেরাই বানিয়ে নিই। যারা দুর্বল, নিয়মটা তাদের জন্যই বানানো হয়। আমরা যে ধর্মের কথা বলি, এই ধর্ম ভগবান পর্যন্ত নয়। ভগবানের ভারি বয়ে গেছে তোমাদের দুনিয়াতে কি হচ্ছে! নিয়ম তৈরী করে বলে দেওয়া হয় ভগবান এই নিয়ম বলে দিয়েছেন, তা নাহলে কেউ মানবে না। সমাজ যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে তার জন্যই নিয়ম তৈরী করা হয়। মনু সমাজের জন্য কিছু নিয়ম বানিয়ে দিলেন, যাতে সমাজ ঠিকমত চলে। নিয়মের অতিক্রম সব কালেই হবে। যার ক্ষমতা আছে সে অতিক্রম করবে, যাদের অতিক্রম করার ক্ষমতা নেই তারা সব সময় করব কি করব না এই দ্বন্দ্বে ভুগছে। বাচ্চাদের খুব ভালো একটা টিভি সিরিয়াল চলছে তার মধ্যে বেচারীকে পড়তে হচ্ছে, তার মধ্যেই একটা পরস্পর বিরোধী অবস্থা এসে যাচ্ছে। আপনি বলবেন, এতে তো পরিষ্কার ভালো আর মন্দ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তা নয়, বাচ্চার মন যদি অস্থির হয়েই থাকে তার থেকে বরং ওকে সিরিয়ালটা দেখিয়ে দাও তাহলে শান্তিতে পড়তে পারবে। সেইজন্য শাস্ত্র রচনা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তার তুলনায় সাহিত্য রচনা করা অত্যন্ত সহজ কাজ। ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই যখন হয় তখন সেই লড়াইটাই এত বাঞ্ছনীয় হয়ে যায় যে সেটা দিয়ে আর কাহিনী তৈরী করা যায় না। ধর্মকে যখন অধর্ম রূপে সামনে নিয়ে আসা হয় তখনই শাস্ত্র তৈরী হয়, সেইজন্য শাস্ত্র রচনা করা অত্যন্ত কঠিন। কৈকেয়ী এখানে কোন ভুল করেনি। যোগশাস্ত্রে অভিনিবেশের কথা বলা হয়, আমাকে বাঁচতে হবে আর বাঁচার জন্য আমাকে এটাই করতে হবে। নামী দামী স্কুলে ছেলেকে ভর্তি করার সময় আমরাও এর ওর প্রভাব কাজে লাগাই। জীবনে আপনি কি কখন নিজের কাজ আদায় করার জন্য ঘুষ দেননি! নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্য আমরা সবাই একই জিনিস করছি, কৈকেয়ীও তাই করেছে।

ধর্ম দুটো স্তরে চলে, একটা স্তরে ধর্ম সাধারণ লোকেদের জন্য চলে আরেকটা স্তরে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের জন্য চলে। ধর্মের এই দুটো গতি, স্থূল গতি আর সূক্ষ্ম গতি, স্থূল গতি সাধারণ লোকেদের জন্য আর সূক্ষ্ম গতি উচ্চ আধারের মানুষের জন্য। আমরা বাচ্চা বয়স থেকে যত ধর্মের কথা শুনে এসেছি সবই ধর্মের স্থূল গতি, ধর্মের যে সূক্ষ্ম গতি তার ধারে কাছে আমরা যাই না। এই কারণেই জীবনে আমাদের এত দুঃখ কষ্ট। একজন সন্ন্যাসী সারা জীবন প্রচুর সেবামূলক কাজ করেছেন, অনেক তপস্যা করেছেন, খুব উচ্চ আধারের সন্ন্যাসী। কিন্তু একটা সময় তাঁর শরীরটা এমনই খারাপ হয়ে গেল যে যার জন্য তিনি মানসিক ভাবে খুব চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। এবার অনেকে বলছেন, এইতো উনি এত জপ-ধ্যান করলেন, সেবা করলেন কিন্তু তাঁকে কেন এই পরিস্থিতিতে পড়তে হল। এর খুব সহজ উত্তর আছে, বিশেষ করে যদি যোগশাস্ত্রকে মাথায় রেখে দেখা হয় তাহলে এর খুব সহজ সমাধান হয়ে যাবে। জীবন প্রত্যেক স্তরে আমাদের একটা সুযোগ দেয়, যেমন একজন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, জীবন তাঁকে একটা সুযোগ দিয়েছে। তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করাচ্ছেন, জীবন তাঁকে একটা সুযোগ দিয়েছে। এই সুযোগ দুটো জিনিসকে খুলে দিচ্ছে, একটা হল external result আরেকটা হয় inner transformation। Extern result হল খুব ভালো শাস্ত্র পড়ান, নিষ্ঠা নিয়ে কাজকর্ম করছেন, অন্য দিকে inner transformation হল কি হল না সেটা তাঁর নিজের উপর নির্ভর করে। বাইরের কেউ টেরও পাবে না তাঁর inner transformation হচ্ছে কিনা। প্রত্যেক মুহুর্তে জীবন আমাদের এই সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। আপনি বিবাহ করে সংসার করছেন, বিবাহ করার একটা বাহ্যিক দিক আছে। বাহ্যিক দিক হল, ভালো স্ত্রী পেয়েছেন, আপনার সংসারকে সামলে দিচ্ছে, সেবা শুশ্রূষা করছে। কিন্তু এর একটা অন্য দিক আছে সেটি আপনার inner

transformation। আপনার মনে যে একটা ছটফটানি, আমারও জীবনে কেউ আসুক। এসে গেল তো, এক বছর, দু বছর, দশ বছর হয়ে গেল। এবার কিন্তু আপনি ওখান থেকে বেরিয়ে আসুন যাতে স্ত্রী যদি কাল মারাও যায় তাতেও আপনার কিছু হবে না। বিবাহ করা, বিবাহ করে ভালো লাগার যা আছে সেটাও হয়ে গেছে এবার আপনার জীবনকে একটা আদর্শের দিকে নিয়ে যান। যদি নিয়ে যান আপনি মহৎ হয়ে যাবেন, না করলে সারা জীবন কাঁদতেই থাকবেন। এইভাবে জীবন আমাদের প্রত্যেক পদে একটা করে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছে। জীবনে যা কিছু করছি সবটাই একটা সুযোগ। কিসের সুযোগ, জীবনের inner transformationএর জন্য। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, আমি তার এত সেবা করলাম, সে আমাকে দেখল না। না দেখাটাই স্বাভাবিক। আপনার যদি inner transformation হয়ে থাকে তাহলে এগুলোতে আপনার কিছু আসবে যাবে না। এটা হল সূক্ষ্ম জিনিস।

স্থূল ভাব হল, আমি ঠাকুরের সেবা করছি তারপর মনে করছি আমার কি হবে। তারপর দেখা গেল গোলমাল হলে ঠাকুর আর রক্ষা করতে আসছেন না। ঠাকুর কেন রক্ষা করতে আসবেন, ঠাকুরের তো আমাদের রক্ষা করার কথা নয়। আমাদের নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করার কথা। কিভাবে রক্ষা করার কথা? Inner transformation দিয়ে। এই কারণেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভবিষ্যত বলে দেওয়া, জন্মকুণ্ডলী দেখে সব কিছু বলে দেওয়া এগুলোর কোন মূল্য নেই। বেদান্তের দৃষ্টিতে যদি বিচার করা হয় তাহলে হরস্কোপ কখন সত্য হতে পারে না। বেদান্তের একটি মৌলিক সিদ্ধান্তই হল মুক্তি কখন কর্মের অপেক্ষা রাখে না, কর্ম দিয়ে কখনই মুক্তি হয় না। গীতা, উপনিষদের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বারবার এই কথাই বলছেন, মুক্তি কখন ক্রিয়ার ফল রূপে আসতে পারে না। ভগবান বুদ্ধ বা শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য সাধক রূপে দেখি, তাহলে ভগবান বুদ্ধের যেদিন জ্ঞান হয়ে গেল জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে সেদিন তাঁর গ্রহের অবস্থান কি সেই রকম ছিল? যদি থাকে তাহলে মুক্তি তো কর্মের পরিণতি হয়ে গেল। এখানেই পুরো বেদান্ত ধসে পড়ে যাবে, পুরো উপনিষদ, গীতা, শঙ্করাচার্য সব মিথ্যা হয়ে যাবে। মুক্তি কেন হল? গ্রহের অবস্থান ওই রকম ছিল। তাহলে মুক্তি কর্মের পরিণতি হয়ে গেল। মুক্তির ধারণাটাই অন্য রকম হয়ে গেল। আগামীকাল গ্রহের অবস্থান পাল্টে গেলে মুক্তিটা আবার বন্ধনে চলে আসবে। তাহলে আমরা বেদান্তকে মানব, নাকি জ্যোতিষ বিদ্যাকে মানব? আমরা কখনই জ্যোতিষ বিদ্যাকে এখানে মানতে যাব না। অন্য দিকে যদি বলা হয় ওটা মুক্তির ফল হয় না। তার মানেই হল ওটা predict করা যায় না। দু দিক থেকেই contradiction এসে যায়, এই contradiction জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। বেদান্তে কখনই contradiction আসবে না, কারণ বেদান্ত পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে দেখাচ্ছেন কেন মুক্তি কর্মের পরিণতি হবে না। অন্য দিকে জ্যোতিষ শাস্ত্র কখনই দেখাতে পারে না, কেন মুক্তিটা গ্রহের অবস্থানের জন্য হবে। তার থেকে আরও বড় ব্যাপার হল, মুক্তি মানেই গ্রহের প্রভাবের বাইরে যাওয়া। তাহলে গ্রহ কি করে বলে দেবে তুমি কিভাবে আমার প্রভাবের বাইরে যেতে পারবে, সম্ভবই নয়। গ্রহ বলছে আমার প্রভাবের জন্য এই এই হবে। তোমার প্রভাব তোমার এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন ভারত সরকারের কথা ভারতের সীমানার মধ্যেই চলে, বাংলাদেশে গিয়ে চলবে না। গ্রহের প্রভাবের বাইরে কি হচ্ছে সেটা বলা সম্ভবই না। তবে যারা অতি সাধারণ মানুষ তাদের উপর জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব চলে। যেমন নিউটনের নিয়মগুলো যত বড় শরীর রয়েছে তার উপর চলে, আইনস্টাইনের নিয়মগুলো যখন long distance, high velocityতে চলে যায় তখন চলে। আর যখন body গুলো খুব strong হয়ে যায়, distance খুব strong হয়ে যায় তখন এদের কারুরই নিয়ম চলে না, তখন কোয়ান্টাম থিয়োরী এসে যায়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম নিয়ম চলে। সেই রকম জ্যোতিষী বিদ্যা, কর্মের বিধান এগুলো একটা এলাকায় চলে। সেই এলাকার বাইরে এগুলো আর চলে না। যদি একবার এটাকে কেউ বুঝে নেয় তখন তার এগুলোকে নিয়ে কোন মাথাব্যাথা হবে না। এগুলোই ধর্মের একটা স্থূল রূপ আরেকটা সূক্ষ্ম রূপ। ধর্মের সূক্ষ্ম রূপকে যদি একবার ধরে নেওয়া যায় জীবনের অনেক দুঃখ-কষ্ট খসে পড়ে যাবে। জীবন আমাদের এভাবেই চলে।

কৈকেয়ী যে এখানে রাজা দশরথকে বলছেন, তোমার এই ভণ্ডামী তুমি যে চারিদিকে বলে বেড়াও তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ সেই মুখোশটা এবার খুলে পড়ে যাবে। আর তুমি রামের নামে দিব্যি দিয়ে শপথ করেছ তুমি তোমার কথা রাখবে, এখন তুমি সেই শপথ যদি পালন না কর তাহলে তোমাকে নরকে যেতে হবে।

প্রমাণিত হল যে কৈকেয়ী ঠিক ছিল, তাহলে এই পরিস্থিতিতে রাজা দশরথের কি করা উচিৎ ছিল? খুব জটিল পরিস্থিতি, এখানেই শাস্ত্র তৈরী হয়। অথচ মজার ব্যাপার হল একটা জায়গায় কৈকেয়ীর কিন্তু ভুল ছিল।

কৈকেয়ী কোথায় ভুল ছিল বুঝতে হলে আমাদের এবার পুরো জিনিসটাকে অন্য দিক থেকে দেখতে হবে। আমরা যদি বৃহত্তর দৃষ্টিতে যদি পুরো কাহিনীটাকে দেখি তাহলে প্রথমে আমাদের এই জায়গা থেকে সরে দু-তিন মাস পরের বা দু বছর পরের ঘটনাগুলো দেখতে হবে। ভরতকে রাজা করা আর শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠানোর কৈকেয়ীর এই পরিকল্পনার শেষ পরিণতি কি হল? ভরত রাজা হল না, শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলেন ঠিকই কিন্তু ফিরে এসে তিনিই রাজা হলেন, সেই কৌশল্যাই রাজমাতা হয়ে থাকলেন। সাধারণ অবস্থায় যা যা হত শেষ পর্যন্ত তাই হল। মাঝখান থেকে কৈকেয়ীর স্বামী মারা গেল, ছেলের কাছে গালাগাল শুনতে হল, অশান্তি হল, হাজারটা জিনিস হল। তাহলে নিশ্চয়ই কৈকেয়ী কোথাও গোলমাল করেছে। কোথায় গোলমাল করেছে? কর্মের একটা গতি আছে। আমি আপনি কিন্তু জানি না কর্মের গতি কোন দিকে আমাদের নিয়ে যাবে। যেদিন এই ঘটনা গুলো ঘটছে তার আগে কেউ জানত না যে কৈকেয়ী এই রকম করবে। আর কৈকেয়ীও জানত না দুদিন পরে ভরত ফিরে এসে মাকে গালাগাল দেবে আর রাজা দশরথ মারা যাবেন। কেউই কিছু জানত না। সেইজন্য কেউ যদি কর্মকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে কর্মকে পাল্টাতে চেষ্টা করে থাকে, তাই বলে কর্ম যে পাল্টে যাবে তা হয় না। হিন্দীতে বলে ছেড়খানি, কর্মের সঙ্গে ছেড়খানি করতে নেই। তাতে কর্মের ফল খারাপ হয়। সেইজন্য আমাদের জীবনের এই দুটি জিনিস আদর্শ আর লক্ষ্য, আদর্শকে ধরলে জীবন এক রকম হবে আর লক্ষ্যকে নিয়ে চললে জীবন আরেক রকম চলবে। কৈকেয়ী আদর্শকে ছেড়ে লক্ষ্যের দিকে চলে গেল। কৈকেয়ীর লক্ষ্য হল নিজের সন্তানকে উপলক্ষ্য করে রাজ ক্ষমতা ভোগ করা। লক্ষ্যের দিকে গিয়েও কৈকেয়ীর জীবনে সাফল্য এসে যেতে পারত যদি ভরত রাজা হতে রাজী হয়ে যেত, ভরত যদি বলত, মা তুমি আমার জন্য কি দারুণ কাজ করে দিলে, তুমি এবার রাজমাতা হবে, ইত্যাদি। শ্রীরামচন্দ্র যদি রাবণের কাছে মার খেয়ে আসত, সীতাকেও যদি উদ্ধার করতে না পারত তাহলে কোন দিন আর কাহিনী হত না। কৈকেয়ীর একটা খুব সফল কাহিনী হয়ে যেত, কৈকেয়ী কোন এক সময় প্রচুর তপস্যা করেছিল তাই সে আজ এক আদর্শ মাতা হয়ে নিজের সন্তানের জন্য স্বামীকেও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করল না, এসব বলে কাহিনী শেষ হয়ে যেত। কিন্তু কৈকেয়ী মার খেয়ে যেতে কাহিনীটা অন্য রকম হয়ে গেল। কিন্তু তখনও ওই পরিস্থিতিতে লোকে বলত কৈকেয়ী ঠিক কাজ করেনি, কারণ কৈকেয়ী আদর্শ থেকে সরে গেছে।

কর্মের একটা গতি আছে, কর্মের ওই গতি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কর্ম কিন্তু পাল্টাবে না, কর্ম আরও হাজার গুণ জোরে ধাক্কা দেবে। যেমন শ্রীরামচন্দ্রের কোন দোষ নেই, তাঁর একটা আদর্শ আছে। আদর্শ সব সময় চারটে পুরুষার্থকে নিয়েই হয়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ঠাকুর যেমন বলছেন পরমার্থ। ঠাকুর বলছেন, কোন মেয়ে যদি এগিয়ে আসে তাকে বলতে হয়, খেপী তোর মুণ্ড কেটে দেব, আমার পরমার্থ হানি করতে এসেছিস! পরমার্থ আর পুরুষার্থ একই জিনিস। আমার আপনার যে পরমার্থ, যেটা আমাদের আদর্শ, সেই আদর্শ থেকে কখন চ্যুত হতে নেই। এবার কেউ যদি বলে, চারটে পুরুষার্থের মধ্যে তো কাম আছে, অর্থও আছে, তাহলে কৈকেয়ী কি দোষ করছে? অর্থ আর কামের জন্যই তো এত কাণ্ড হল। ঠিকই, অর্থ আর কাম যখন পুরুষার্থ হয় তখন এই সমস্যা হওয়ার সম্ভবনা থাকে। ঠাকুর যে বারবার কাম আর কাঞ্চন থেকে সরে আসতে বলছেন এই কারণেই বলছেন, ধর্ম আর মোক্ষই ঠিক ঠিক পুরুষার্থ হয়। এই যে আমরা অনেকবার বিদ্যা, সেবা, সম্পদ আর মোক্ষ এই চারটে আদর্শের কথা বলেছি, এই চারটে আদর্শের দৃষ্টিতে দেখলে কৈকয়ী পুরোটাই ভুল করেছে। কৈকেয়ী যে কাজ করল, সেখানে বিদ্যার আদর্শ দাঁড়াচ্ছে না, সেবার আদর্শ দাঁড়াচ্ছে না, সম্পদ আদর্শও দাঁড়াচ্ছে না, ত্যাগ তো নয়ই। যদি আদর্শ থেকে না সরে আসতে হয় তাহলে কর্মকে ছেড়ে দিতে হয়। যদি কেউ দেখে কোথাও তার আদর্শের চ্যুতি হচ্ছে তখন সে বলবে এই চ্যুতিকে আমি হতে দেব না, কর্ম যেদিক দিয়ে যাচ্ছে আমি তাকে আটকাচ্ছি। যদি আদর্শের চ্যুতি না হয় তাহলে কিন্তু কর্মের সাথে সংঘাতে যেতে নেই, কর্মকে নিজের গতিতে যেতে দিতে হয়। এই জিনিসটাকে অবশ্য রামায়ণে কোথাও আলোচনা করা হয়নি। তবে আদর্শ আর লক্ষ্য এই দুটোকে বৃহত্তর জীবনের দৃষ্টিতে দেখতে হয়, যেখানে একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে নিয়ে চলতে হয়, অন্য কিছু লক্ষ্য না থাকুক অন্তত লোকশিক্ষার ব্যাপারটা এসে যায়। তবে কৈকেয়ী যে সবটাই ভুল করেছিল তাও নয়, ঠিকও ছিল, কৈকেয়ীর যে পুরোপুরি দোষ ছিল তা নয়। তখন উচ্চতম লক্ষ্য আর নিম্নতম লক্ষের মধ্যে যে সংঘাত, সেখানে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায় যে কৈকেয়ী কর্মকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল। কর্মের সঙ্গে নাড়াচাড়া করতে নেই। যেমন একটা পাথর, পাথরের কর্ম হল মাটিতে থাকা, পাখি যেমন উড়ে যায় পাথরও তেমনি উড়ে যাবে ভেবে আপনি যদি পাথরকে আকাশে ছুঁড়ে দেন, তখন পাথর যত উপরে যাবে তত জোরে মাটিতে পড়বে, বেশি

জোর পড়লে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আপনি পাথরের কর্মকে পাল্টে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার আদর্শে যদি কোন ব্যাঘাত করে তখন কর্মকে নিয়ে নাড়াচাড়া করুন ঠিক আছে। এরপর এর যা পরিণতি হবে আমি তার মোকাবিলা করব। কিন্তু আপনার ধর্মের উপর যদি কোন বাধা সৃষ্টি না করে তাহলে কর্মকে নিজের মত চলতে দিতে হয়। এখানে কর্মের প্রবাহ আসছিল। রাজা দশরথ কর্মের একটা প্রবাহ নিয়ে এসেছিলেন, তাতে কৈকেয়ীর স্বার্থ হানি হচ্ছিল ঠিকই কিন্তু কোথাও ধর্মের হানি হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর্ম ঐটাই করল যেটা রাজা দশরথ চেয়েছিলেন। ঠাকুরের কাছে একজন আসা যাওয়া করতেন, তার স্ত্রীর সাথে কি হওয়াতে তাকে আলাদা করে আরেকজনকে বিয়ে করলেন, পরে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেল, আবার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। শ্রীমা তখন বলছেন, যার থাকার কথা ছিল সেই শেষমেশ এল, মাঝখান দিয়ে এত কাণ্ড ঘটে গেল। আপনার কর্মে যেটা আছে সেটা ঘুরে ঠিক আপনার কাছেই আসবে। মাঝখানে সেটাকে আটকাতে গিয়ে কত কাণ্ড ঘটিয়ে শেষে সেই কর্মটাই আবার এসে হাজির হয়ে যাচ্ছে। কৈকেয়ীর গোলমালটা ঐ জায়গাতেই হয়েছিল। কৈকেয়ী আদর্শকে ছেড়ে দিল আর কর্মের সঙ্গে ছেড়াফেরি করতে শুরু করে দিল। কিন্তু ঠিক সেটাই হল যেটা রাজা দশরথ চেয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতার ছিলেন, তিনি ভগবান ছিলেন এই ভাবনাকে সরিয়ে রেখে যদি খুব বিচার করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ঠিক ঐটাই হল যেটা কর্মে ছিল। সেই রামই রাজা হলেন, সেই কৌশল্যাই রাজমাতা হলেন, মাঝখান থেকে কত কাণ্ড হয়ে গেল, কৈকেয়ীর দুর্নামও হয়ে গেল। সেইজন্য নিজের জীবনের যে আদর্শ সেই আদর্শকে কখন লক্ষ্যের সাথে সমঝোতা করতে নেই। মানুষ অসহায় তাই সমঝোতা করে, আঘাতও পায়, সেটা দিয়েই কাহিনী সৃষ্টি হয়। আমরা তারই একটা দিককে আলোচনা করলাম।

কৈকেয়ীর এসব কথা শোনার পর রাজা দশরথ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। সবার অগচোরে এত সব কাণ্ড রাত্রিতে হয়ে চলেছে। এদিকে সকাল হতে শুরু হয়েছে। অযোধ্যা বাসীদের রাত্রিতে উৎকণ্ঠায় ঘুম হচ্ছে না, কখন ভোর হবে কখন তারা সবাই রাজপুরীতে গিয়ে দেখবে শ্রীরামচন্দ্র যুবরাজ হচ্ছেন। ভোর হতেই মন্ত্রী সুমন্ত্র দেখছেন এখনও রাজা শয্যা ত্যাগ করেননি, তিনিও চিন্তিত মনে রাজা দশরথ যেখানে ছিলেন সেখানে হাজির হয়েছেন। গিয়ে দেখছেন রাজা দশরথ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। বেহুঁশ ঠিক নয়, একেই সারারাত রাজার ঘুম হয়নি, তার উপর কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্যবাণ, সব মিলিয়ে রাজাকে বেহুঁশের মত লাগছিল। তাঁর ওঠার ইচ্ছে থাকলেও আর উঠতে চাইছেন না। সুমন্ত্র তখন রাজার মঙ্গলসূচক জয়ধ্বণি করে বলছেন –

বর্দ্ধয়ন্ জয়শব্দেন প্রণমন্ শিরসা নৃপম্।
অতিখিন্নং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত।২/৩/৪৩
দেবী কৈকয়ী বর্দ্ধস্ব কিং রাজা দৃশ্যতেহন্যথা।
তমাহ কৈকয়ী রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্।২/৩/৪৪

আজ এত আনন্দের দিন কিন্তু রাজা এখনও শয্যা ত্যাগ করেননি, তিনিও রাজার জয়ধ্বণি করেছেন কিন্তু তখনও রাজাকে অত্যন্ত কাতর দেখে সুমন্ত্র কৈকেয়ীকেই জিজ্ঞেস করলেন – দেবী! কৈকেয়ী! আপনার জয় হোক, রাজাকে অসুস্থ দেখছি মনে হচ্ছে, রাজার কি কিছু হয়েছে? তখন কৈকেয়ী যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাব করে সুমন্ত্রকে বলছে – রাজার সারা রাত ঘুম হয়নি। কেন ঘুম হয়নি?

রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্।
প্রজাগরেণ বৈ রাজা হ্যস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে।
রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেগচ্ছতি।২/৩/৪৫

সারা রাত তিনি "রাম রাম রাম" বলতে বলতে রামেরই চিন্তা করে গেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই বাক্যটা ঠিক খাপ খায় না। কারণ এর মধ্যে একটা dirty humour আছে। বাল্মীকি রামায়ণে এর খাপ খায়। অধ্যাত্ম রামায়ণ এই অংশটা বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই নিয়েছে। এখানে কৈকেয়ীর চরিত্রকে ব্যঙ্গ করে তার স্বভাব কেমন দেখাচ্ছেন। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এভাবে humour করাটা বেমানান, সাহিত্যে ঠিক আছে। রাজা দশরথ সারা রাত শুধু রাম রাম রাম করে গেছেন, রামকে ভুলতে পারছেন না। রামের চিন্তায় তাঁর ঘুম হয়নি, রাত্রি জাগরণের জন্যই রাজাকে অসুস্থবৎ মনে হচ্ছে, তুমি এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে রামকে এখানে ডেকে নিয়ে এস। কৈকেয়ী দু রকম অর্থে বলছে, রাজা দশরথ সারা রাত রাম রাম করেছেন ঠিকই কিন্তু শোক বশতঃ করেছেন, আর সেটাকে

এমন ভাবে বলছে আর সুমন্ত্রও তাই ভাববেন যে রাম যুবরাজ হবে ভেবে আনন্দে সারারাত রাম রাম করে গেছেন। কিন্তু সুমন্ত্র বুঝতে পারছেন কিছু একটা গোলমাল আছে। সুমন্ত্রকে কৈকেয়ী আদেশ দিল রামকে ডেকে আনার জন্য, সুমন্ত্র কিন্তু কৈকেয়ীকে না করে দিয়ে বলছেন –

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ।২/৩/৪৬

হে ভামিণি! তুমি রানী হতে পার কিন্তু তোমার কথায় আমি চলব না, আমি রাজার মন্ত্রী রাজা অনুমতি না দিলে আমি যেতে পারি না। আমাদের ভাষায় কৈকেয়ীর এই ধরণের আচরণকে বলা হয় Extra Constitutional Authority, অনেক সময় দেখা যায় প্রশাসনের উচ্চপদে যারা থাকে তাদের স্ত্রীরা স্বামীর পদমর্যাদার ক্ষমতাকে গায়ের জোরে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সরাসরি তারা কর্মচারীদের কমাণ্ড দিতে শুরু করে। সুমন্ত্র কিন্তু বুদ্ধিমান, তিনি কৈকেয়ীকে সরাসরি না করে দিয়েছেন। রাজা দশরথ কি আর করবেন, তিনি সুমন্ত্রকে বললেন তুমি রামকে ডেকে নিয়ে এস, আমি ওকে দেখতে চাইছি। শ্রীরামচন্দ্রকে ডেকে নিয়ে এসেছেন। রাজা দশরথ রামকে বুকের মধ্যে জড়াতে গেছেন কিন্তু আবার উনি মাটিতে উল্টে পড়ে গেলেন। রাজা মুর্ছিত হয়ে পড়েছেন দেখে শ্রীরামচন্দ্র হায় হায় করে তাড়াতাড়ি রাজাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিজের কোলে শয়ন করিয়ে দিয়েছেন। রাজাকে মুর্চ্ছিত দেখে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে। কৈকেয়ীকে শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞেস করছেন, রাজার কি হয়েছে, রাজার এত দুঃখের কারণ কি? তখন কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন –

ত্বমেব কারণং হ্যত্র রাজ্ঞো দুঃখোপশান্তয়ে।
কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম কর্তব্যাং নৃপতোর্হিতম্।২/৩/৫৫

কৈকেয়ী বলছে হে রাম! তুমিই রাজার এই দুঃখের হেতু আর রাজার এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তোমাকে রাজার কিছু প্রিয় কার্য করতে হবে। এগুলোকেই বলে চরিত্র চিত্রণ, একটা চরিত্র কি রকম হয় তাকে সাহিত্যের ভাষায় অঙ্কন করে দিচ্ছেন। এখানে যেমন আছে বাল্মীকি রামায়ণেও ঠিক এভাবেই এই দৃশ্যের বর্ণনা আছে। কেমন ঠাণ্ডা মাথায় কৈকেয়ী সব কিছুকে manipulate করে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় কৈকেয়ী বলছে, হে রাম! রাজার দুঃখের কারণ তুমি, দুঃখ নিবৃত্তির জন্য তোমাকে রাজার কিছু প্রিয় কার্য করে দিতে হবে। যে কোন কঠিন কাজে যখন আমাদের কোন decision নিতে হয়, সেই decision নেওয়া যখন হয়ে যায় তখন আর কাউকে ওটা disturb করবে না। কৈকেয়ী কিন্তু disturb ছিল, রাজা দশরথ যতক্ষণ আসেননি, যতক্ষণ কথা দেননি ততক্ষণ খুব disturb ছিল। ক্রোধভবনে পড়ে ছিল, গয়না ছুড়ে ফেলেছে, মলিন বস্ত্র পরিধান করে ছিল, সবই করেছে। কিন্তু সব কিছু বলা হয়ে গেল, রাজা মুর্ছিত হয়ে গেলেন, এবার কৈকেয়ী আর disturb হচ্ছে না। কৈকেয়ী তখন বলছে –

কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞস্ত্বং রাজানং সত্যবাদিনম্।
রাজ্ঞা বরদ্বয়ং দত্তং মম সন্তুষ্টচেতসা।২/৩/৫৬

হে রাম! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ, পিতার কথা পালন করে ওনার সত্যবাদিতাকে তুমি রক্ষা কর। কৈকেয়ী বলতে চাইছে, তোমার বাবার সত্যবাদিতা তোমার উপরই নির্ভর করছে। তুমি যদি রাজার কথা মেনে নাও তাহলে রাজার কথা রক্ষা হয়ে যাবে। এই ধরণের পরিস্থিতি সংসারে প্রচুর দেখা যায়, যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে অনেক সময় বলি তোমার উপর ভরসা করে আমি এই রকম করেছি বা তুমি আমাকে দুর্নাম থেকে রক্ষা কর। একজন গোলমাল করবে, করে আসার পর তাকে যে ভালোবাসে সেই ভালোবাসার লোককে গিয়ে বলবে তোমাকে আমায় বাঁচাতে হবে, তার মানে এবার তোমাকে গোলমাল করতে হবে বা তোমার ঘাড়েই এর দায় এসে পড়বে। সমাজে সবাইকে অপরের জন্য কিছু করার সময় দিনরাত এই ধরণের পরিস্থিতিকে face করতে হয়। কৈকেয়ী বলছে, রাজা খুশী হয়ে আমাকে দুটি বর দিয়েছেন কিন্তু –

ত্বদধীনন্তু তৎ সর্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ।
সত্যপাশেন সম্বদ্ধং পিতরং ত্রাতুমর্হসি।২/৩/৫৭

সেই বরের কার্যকারিতা তোমার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে, রাজা তোমার কাছে বলতে লজ্জা পাচ্ছেন। আমরাও অন্যের কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে গেলে নিজে না বলে অপরকে দিয়ে বলাই, কারণ আমরা ছোট হতে চাই না। বলতে বা করতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি বলে অনেক কিছু আমরা আরেকজনকে এগিয়ে দিই। এই কথা বলতে গিয়ে কৈকেয়ী আবার বলছে, সত্যের পাশে তোমার বাবা আবদ্ধ, এই পাশ থেকে তাঁকে একমাত্র তুমিই পরিত্রাণ করতে পার। কঠোপনিষদে যমরাজ নচিকেতাকে ঠিক এই কথাই বলছেন *মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্*, যদি কারুর ধার দেনা থাকে তাকে যেমন গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যায়, নচিকেতা তুমি আমার সাথে সে রকম কিছু করতে যেও না। নচিকেতাকে যমরাজ বর দিয়েছেন। নচিকেতা বলছেন, আমাকে আপনি আত্মার জ্ঞান দিন। যমরাজ বলছেন, নচিকেতা এই বর তুমি নিও না, তার বদলে অন্য কোন বর নাও। নচিকেতাও ছাড়বে না, তখন যমরাজ ঠিক এই কথা বলছেন, যার ধার দেনা থাকে তাকে যেমন গলায় গামছা দিয়ে টেনে নিয়ে ধার শোধ করায়, তুমি আমাকে ওই রকমটি করো না। রাজা দশরথেরও ঠিক ওই অবস্থা, সত্যের পাশে বাঁধা হয়ে আছেন। কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, এই পাশ থেকে রাজাকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পার।

পুত্রশব্দেন চৈতদ্ধি নরকাৎ ত্রায়তে পিতা।
রামস্তোয়দিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা।২/৩/৫৮

খুব প্রাচীন প্রচলিত একটা ধারণার কথা এখানে কৈকেয়ী বলছে। পুতি মানে পচে যাওয়া, পুত্র শব্দ আর পুতি একই ধাতু থেকে এসেছে। তাহলে পুতির সাথে মিলিয়ে কেন পুত্র বলা হয়? কারণ পুত্র বাবাকে পচা জায়গা থেকে উদ্ধার করে। নরক হল পচা জায়গা, নরকে পতন হওয়া থেকে পুত্র বাবাকে রক্ষা করে। পুতি, পতন, পুত্র সব একই ধাতু। কিন্তু পুত্রের অর্থ নরকে যাওয়া থেকে যে বাঁচায়। পুত্র নানা রকমের ক্রিয়াকর্মাদি করে, নিজের অনেক সুকর্ম করে বাবাকে নরকে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। কৈকেয়ী তাই বলছে পিতাকে নরক থেকে পরিত্রাণ করে এটাই পুত্র শব্দের অর্থ। তাই সব কিছু এখন তোমার হাতে, তোমার বৃদ্ধ পিতা এখন সত্যের পাশে আবদ্ধ হয়ে আছেন, তুমি তাঁকে রক্ষা কর। কৈকেয়ীর কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র যেন শূলে বিদ্ধ হয়ে গেছেন, ব্যথিত হৃদয়ে বলছেন –

ব্যথিতঃ কৈকয়ীং প্রাহ কিং মামেবৎ প্রভাষসে।
পিত্রার্থ জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বণম্।২/৩/৫৯
সীতাং ত্যক্ষেহত কৌসল্যাংরাজ্যঞ্চপিত্যজাম্যহম্।
অনাজ্ঞপ্তোহপি কুরুতে পিতুঃ কার্যাং স উত্তমঃ।২/৩/৬০

মা! আপনি এত কথা কেন বলছে? পিতার জন্য আমি আমার প্রাণত্যাগ করে দিতে পারি, ভয়ঙ্কর বিষপান করে নিতে পারি। এখানে মজার হল, প্রথমে বলছেন, পিতার জন্য আমি প্রাণ দিয়ে দিতে পারি, দ্বিতীয় ভয়ঙ্কর বিষপান করতে পারি, তারপরের ধাপে বলছেন সীতা মানে স্ত্রী, কৌশল্যা অর্থাৎ মা, রাজ্য সব আমি ছেড়ে দিতে পারি। প্রথমে প্রাণ ত্যাগ করে দেওয়ার কথা বলছেন, আসলে মরে যাওয়া অনেক সহজ, বেঁচে থেকে কষ্ট সহ্য করা তার থেকে অনেক কঠিন। বলছেন প্রাণত্যাগ করাটা যেমন, সীতাকে ত্যাগ করাও তাই আর রাজ্য ত্যাগ করাও তাই। রাজকুমার সাম্রাজ্য ছেড়ে থাকতে পারে না। জর্জ বার্ণাড'শ একটা জায়গায় খুব সুন্দর লিখছেন – সাফল্যের কাহিনী সবাই লেখে, অসাফল্যের কাহিনী কেউ লেখে না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এক সময় কুঁড়ে ঘরে থাকতেন, কুঁড়ে ঘরে থেকে তিনি কিভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন সেই কাহিনী সবাই লিখছে। কিন্তু বিনা দোষে কাউকে যদি রাজমহল থেকে রাস্তার ভিখারী হয়ে যেতে হয়, সেই দুঃখ কি কেউ কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করে! সেইজন্য বলে, ওপরে ওঠা খুব সোজা কিন্তু নীচে নেমে আসা খুব কঠিন। জীবনে বড় হওয়া কিছুই না, সাফল্য পাওয়া কঠিন নয়, কঠিন হল উপর থেকে নীচে নেমে আসা। ইংল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ডের দিকে আগে নিয়ম ছিল, ওখানকারা রাজা বা জমিদাররা বড় ছেলেকে সব সাম্রাজ্য দিয়ে যেত, অন্য ছেলেদের কপালে কিছুই জুটত না। পরে ভাইদের একমাত্র দাদার করুণার উপর নির্ভর করে থাকতে হত। বার্ণাড'শর ঠিক তাই হয়েছিল। তিনি বড় হয়েছেন রাজমহলে রাজকুমারের মত, বাবার বয়স হতে যেমনি মারা গেল দাদা হয়ে গেল ব্যারন। দাদার পরে যারা থাকবে তারা simply out। এখন দাদা যদি চায় সে ভাইদের বাড়িতে থাকতে দিতে পারে, মাসে কিছু মাসোহারাও দিতে পারে। ইতিমধ্যে দাদা যদি মারা যায় রাতারাতি তার পরের ভাই সব কিছুর মালিক হয়ে

যাবে। সেইজন্য মরে যাওয়া অনেক সহজ, কিন্তু ওই দুরবস্থায় বেঁচে থাকা, সীতাকে ছেড়ে বেঁচে থাকা, সাম্রাজ্য ছেড়ে বেঁচে থাকা খুব কঠিন। যে মরে যায় সে বেঁচে গেল আর যে থেকে যায় সেই মরে। শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলছেন। প্রথমে মৃত্যুর কথা বললেন, পরে বলছেন সাম্রাজ্য, স্ত্রী, মা এদেরকেও আমি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। আর পিতার আজ্ঞার অপেক্ষা না রেখে যে পুত্র পিতার কার্য সমাধান করে দেয় সে হল উত্তম পুত্র। বলছেন –

উক্তো করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ।
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে।২/৩/৬১

যে পুত্র পিতার আদেশ পাওয়ার পর কার্য করে সে মধ্যম পুত্র, আর পিতা আদেশ করলেও যে পুত্র আদেশ পালন করে না সেই পুত্র পিতার বিষ্টার মত। ঠাকুর উত্তম শিষ্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, গুরুর আদেশ দেওয়ার আগে শিষ্য বুঝে নেয় কি করতে হবে বা গুরুর কি লাগবে, সেই শিষ্য উত্তম শিষ্য। মধ্যম শিষ্যকে আদেশ দিয়ে করাতে হয় আর অধম শিষ্য আদেশ দিলেও করে না। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ককে নিয়ে অনেক মজার মজার কাহিনী আছে। এক শিষ্যকে গুরুকে তামাক সাজতে বলছেন, শিষ্যের তামাক সাজতে চাইছে না, তাই বলছে, গুরুদেব আপনার তামাক সাজার যোগ্যতা কি আমার আছে।

অতঃ করোমি তৎসর্বং যন্মামাহ পিতা মম।
সত্যং সত্যং করোম্যেব রামো দ্বির্নাভিভাষতে।২/৩/৬২

অতএব পিতা আমাকে যে আদেশই দিয়ে থাকুন আমি অবশ্যই সেই আদেশ পালন করব। *সত্যং সত্যং করোম্যেব*, সত্যি বলছি, অবশ্যই সত্যি বলছি আমি সেটাই করব, সর্বথা করব। *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম এক মুখে দুই রকম কথা বলে না, তার মানে তিনি যেটা বলেছেন সেটা তিনি করবেনই। এই যে *সত্যং সত্যং করোম্যেব* বলছেন, এই সত্য ব্যাপারটাই খুব জটিল একটি বিষয়। ঠিক এই জায়গাতে এসেই moral dilemma শুরু হয়ে যায়। রামায়ণ অত জটিল নয়, রামায়ণের তুলনায় মহাভারত এই ব্যাপারে অনেক বেশি জটিল। মহাভারত অনেক ভাবে চেষ্টা করছে ধর্মের সংজ্ঞা কি হতে পারে, ধর্মকে কিভাবে সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোথাও পরিষ্কার ভাবে বলতে পারছেন বলে আমাদের সন্দেহ আছে। আমরা আগে বললাম ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই, কিন্তু ধর্ম বুঝতেই আমাদের জীবন চলে যাচ্ছে এরপর ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াইকে কি করে বুঝব! ঠিকই, যুধিষ্ঠিরও বলছেন *গহনা ধর্মণো গতিঃ*, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, বোঝা যায় না কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম। শ্রীরামচন্দ্র যখন বলছেন *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম দুই রকমের কথা বলে না, খুব জটিল। ঠাকুরও বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। সত্য খুব জটিল হয়ে যায় বিশেষ করে সত্যের সাথে যখন অহিংসা এসে জুটে যায় বা সত্যের সাথে অন্য কোন কিছুর সংঘাত হয় তখন খুব সমস্যার হয়ে যায়। ঠাকুর সত্যে প্রতিষ্ঠ আমরা বলি না, আমরা বলি তিনি সত্যস্বরূপ। তাই ঠাকুর যখন বলছেন সত্যে প্রতিষ্ঠ হতে, কলিতে সত্যই তপস্যা, এটা তিনি afford করতে পারেন কারণ তিনি ভগবান। কিন্তু মহাভারতে এর অনুমতি দেয় না। মহাভারত পড়লে বারবার মনে হবে মহাভারতের ধর্ম হল অহিংসার ধর্ম, সবারই যাতে মঙ্গল হয়। কিসে মঙ্গল হবে বললে তখন আবার অনেক কিছু এসে যায়। একটা খুব নামকরা ঘটনা আছে।

এক জায়গায় হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হচ্ছিল। একটা উন্মত্ত দল এসেছে একটা বাড়ির মেয়েকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সময় তিন-চার বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। মেয়েটিকে ওরা জিজ্ঞেস করেছে তোর দিদি কোথায়। মেয়েটি ভয়ে বলেছে, দিদি নেই, বাইরে গেছে। মেয়েটি মিথ্যা কথা বলেছে, দিদি বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল। ওরা মেয়েটিকে একটা চড় মেরে চলে গেছে। বাচ্চা মেয়েটি মিথ্যা কথা বলে ঠিক করেছে নাকি ভুল করেছে? এটাকেই বলে ধর্মের সংঘাত। এরপর এটাকে নিয়েই একটা hypothetical situation বানিয়ে দেয়। একজন আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশ তাকে খুঁজছে, আমাকে পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করেছে, আমি সত্যি কথাই বলে দিলাম, হ্যাঁ এখানেই আছে। ইতিমধ্যে লোকটি পেছনের একটা দরজা দিয়ে কখন পালিয়ে গেছে আমি জানিও না। এগুলো hypothetical, এগুলোকে আলোচনাই করতে নেই। কিন্তু মনুস্মৃতি বা মহাভারতে আপৎধর্মের পরিষ্কার নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, এই এই হলে আপৎধর্ম, আর তার সাথে বলছেন পাঁচটা পরিস্থিতিতে মিথ্যা কথা বলাটাই ধর্ম। যেমন নিজের প্রাণ যখন সংশয় হবে, অপরের যদি প্রাণ সংশয় হওয়ার অবস্থা হয় তখন অবশ্যই মিথ্যা কথা বলতে হবে। আবার নিজের সর্বস্ব হরণ হয়ে যাওয়ার পরিস্থিতি হলে মিথ্যা

কথা বলে যদি রক্ষা করা যায় তাহলে অবশ্যই মিথ্যা কথা বলবে। এখানে এসেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে হিন্দু ধর্ম জীবনকে অনেক বেশি মূল্য দেয়। আমরা যেটা ধারণা করে আছি তার থেকে অনেক বেশি মূল্য দেয়। ঠিক তেমনি বিবাহ কালে মিথ্যা কথা বলা যায়। আমার ছেলের বিরাট ডিগ্রী, পরে দেখা গেল ম্যাট্রিক ফেল। আর বলে রতিকালেও মিথ্যা কথা বলা যায়, স্বামী স্ত্রীকে ভালোবেসে বলছে, তোমাকে ছাড়া আমি আর কারুর দিকে তাকাতেই পারি না। কিন্তু ইতিমধ্যে মাথায় আরেকটি মেয়ে হয়ত ঘুরছে কিন্তু বলে যাচ্ছে তোমাকে ছাড়া আমি কারুর দিকে তাকাই না। বলছেন এটাকে মিথ্যার মধ্যে ধরা যাবে না, এটাই শাস্ত্রের বিধান। এখানেই সত্যের উপর কত রকমের শর্ত আরোপ করে দেওয়া হল। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম দুই রকমের কথা বলে না।

আমাদের মনে হতে পারে এখানে শ্রীরামচন্দ্র বলতে চাইছেন, আমি যেটা কথা দিয়ে দেব সেখান থেকে আর পিছিয়ে আসব না। কিন্তু এটুকু দিয়ে *রামো দ্বির্নাভিভাষতে* এই জিনিসটাকে মাপা যাবে না। এই কথার বিরাট ওজন। শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয়ই হল *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম দুই রকম কথা বলবে না। শ্রীরামচন্দ্র আগে যেটা বলবেন সেটাই বহাল থাকবে। তার মানে সবার আগে রাজা দশরথকে বলে দিলেন আপনার আদেশই পালন করব। এরপর সীতার কথা চলবে না, কৌশল্যার কথাও শুনবেন না। সুগ্রীব আর বালির লড়াইয়ে আগে সুগ্রীবকে বলে দিয়েছেন, সেইজন্য বালির কথা আর শুনবেন না। *দ্বির্নাভিভাষতে* এর অর্থ এটাই। লোকজন পাঠিয়েছে খবর নিতে রাজ্যের লোকেরা কি বলছে, খবর নিয়ে এসে বলল সীতার জন্য কলঙ্ক, ঠিক আছে সীতাকে সরিয়ে দেওয়া হবে। শ্রীরামচন্দ্রের এই কাজগুলোকে সমালোচকরা প্রচুর নিন্দা করছেন, রাম লুকিয়ে বালিকে কেন বধ করলেন, রাম সীতাকে কেন বনবাসে পাঠালেন। কিন্তু সমালোচকরা শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মূল কেন্দ্রবিন্দুটাকেই ধরতে পারছেন না, শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের মূল স্তম্ভ, যার উপর তাঁর ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে তা হল, *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*। *রামো দ্বির্নাভিভাষতে* এর গভীর তাৎপর্যকে যদি না বোঝা হয় তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র কোন দিন সম্পূর্ণ হবে না। শ্রীরামচন্দ্রের পুরো চরিত্র, তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ৬২ নম্বর শ্লোকের চতুর্থাংশে দাঁড়িয়ে আছে। এই কারণে বাল্মীকি রামায়ণ বা অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্লোকটির একটা বিশেষ গুরুত্ব হয়ে গেছে। এমনকি তুলসীদাসও *রামো দ্বির্নাভিভাষতে* এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে সত্য বচন শব্দে বলা হচ্ছে না, এখানে বলছেন *দ্বির্নাভিভাষতে*, কথা যেটা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে সেখান থেকে আর ফেরত আসবেন না। কথাটা যাকে আগে দিয়েছেন তার কথা থেকেই তিনি আর ফেরত আসবেন না। সেইজন্য আগে বড়দের কাছে গিয়ে কথা দিয়ে দিতে হয়। কারণ জীবনে সব সময় একটার সাথে আরেকটার সংঘাত চলে। বাচ্চারা কিছু অন্যায় করে থাকলে আগে মাকে গিয়ে বলবে, মা জান তো এই রকম একটা হয়ে গেছে। মা বলবেন, ঠিক আছে আমি দেখে নেব, তোকে ভাবতে হবে না। আমরা শ্রীকৃষ্ণের নামে এত কিছু শুনি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরও তাই ছিল, শ্রীকৃষ্ণও দু রকমের কথা বলতেন না। পাণ্ডবদের বলছেন তোমাদের জয় এনে দেব, তিনি জয় এনে দিলেন।

সত্য বচন আর বচন দুটো আলাদা জিনিস। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলে দিলেন তুমি মনে করে নাও বালি শেষ, বালি সত্যিই শেষ। এরপর আর কোন ডান দিক বাম দিক কিছু থাকবে না, কোথায় রাজধর্মের হানি হচ্ছে, কোথায় ক্ষত্রিয় ধর্মের হানি হচ্ছে এগুলো তাঁর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমাদের জীবনেও তাই হয়, ধর্মের পঁচিশ খানা দড়ি দিয়ে আমরা বাঁধা। শ্রীরামচন্দ্রের কত রকমের দায়ীত্ব, বাবার প্রতি দায়ীত্ব, মায়ের প্রতি দায়ীত্ব, সৎমায়ের প্রতি দায়ীত্ব, বিবাহ করে যাঁকে নিয়ে এসেছেন তাঁর প্রতি দায়ীত্ব। আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে যদি অবতার রূপে না দেখি, তিনি দশরথের সন্তান, দশরথের সন্তান হওয়ার জন্য ওনার কোন হাত নেই কিন্তু জানকীর হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এসেছেন, তোমার রক্ষণাবেক্ষণের দায়ীত্ব আজ থেকে আমার। সীতার প্রতি দায়ীত্ব শ্রীরামচন্দ্রের অনেক বেশি। যে কোন স্বামীর মায়ের থেকে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য অনেক বেশি, কারণ মায়ের ব্যাপারে তার কোন হাত ছিল না কিন্তু স্ত্রীকে সে গ্রহণ করেছে, তার হাত ধরে নিয়ে এসেছে। শ্রীরামচন্দ্রেরও সীতার প্রতি কর্তব্য অনেক বেশি, সীতাকে ছাড়াও তিনি আরও কত কর্তব্যের বন্ধনে বাঁধা হয়ে আছেন। তাহলে তাঁর কোনটা করা ঠিক? আমরা এক কথায় এর কোন মীমাংসা করতে পারব না। কিন্তু এখানে একটাই মীমাংসা হয় – যাকে আগে কথা দিয়ে দিলেন তারটাই আগে করে দিলেন। তাঁর দশরথের প্রতি কর্তব্য, কৌশল্যার প্রতি কর্তব্য, সীতার প্রতি কর্তব্য, রাজ্যের প্রতি কর্তব্য, লক্ষ্মণের প্রতি কর্তব্য, নিজের প্রতি কর্তব্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষ সেটাই করে যেটা তার আদর্শ। শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ হল তাঁর কাছে সবটাই কর্তব্য, তিনি জানেন আমি যেটাই করব অন্য কর্তব্যটা

অবহেলিত হবে। মায়ের কথা মত চললে বাবার কথাকে অমান্য করা হয়ে যাবে, যদি স্ত্রীর কথাতে চলি তাহলে মা-বাবার কথাকে অবহেলা করতে হবে। আমরা যেটাই করব ধর্মের লঙ্ঘন হবেই। এবার আমাকে একটা আদর্শ ঠিক করে নিতে হবে। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের যে আদর্শ, যেটা তাঁর জীবনের আগাগোড়া সমান ভাবে রক্ষিত হয়েছে, তা হল *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, রাম দুই রকম কথা বলে না। যখন যাকে যেটা কথা দিয়েছি আমি কঠোর ভাবে সেটাকেই পালন করব।

আমরা যে সত্য কথা বলি, সাধারণত এই সত্য কথা reportingএর অর্থে হয়। যদি জিজ্ঞেস করি আপনার আসতে দেরী কেন হল? আপনি বললেন বাস তুলে নিয়েছে, আপনি হয়ত সত্যি কথাই বলছেন, কিন্তু এই সত্যটা reportingএর অর্থে। কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে সত্য কথা বললে অনেক অস্বস্থির মধ্যে পড়তে হয়। তখন অনেক কিছু বানিয়ে বলে দিতে হয়। সত্য একটা হল reportingএর অর্থে আর দ্বিতীয় আরেকটি অর্থে হয় ভবিষ্যতের কথা, বচন, ভবিষ্যতে আমি এই কাজ করব। এখানে *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, এটা ভবিষ্যতের অর্থে। ঠাকুর যে সত্যের আঁট বলছেন, তার অর্থ যেটা বলে দিয়েছেন সেটা করবেন। আর প্রথমটা যেটা হয়েছে সেটাকে যেমনটি হয়েছে তেমনটি বলা। দুটো আলাদা জিনিস। ঠাকুর বলছেন সত্য হল কলির তপস্যা, ঠাকুর দুটোকে নিয়েই বলছেন, reporting করা হচ্ছে সেটাও আর যেটা করবেন বলছেন সেটাও।

ঠাকুর বলছেন সত্য হল কলির তপস্যা আর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*। তাহলে ঠাকুর কেন বললেন সত্য কলির তপস্যা? আসলে তপস্যা মানেই তাপ সৃষ্টি হওয়া, তাপ সৃষ্টি হওয়াটাই তপস্যা। আমি হয়ত অফিসে কোন গোলমাল করে ফেলেছি। অফিসের কর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি গোলমাল করেছ? আমি সেই মুহূর্তে কিন্তু সত্য কথা বলতে পারব না, সত্য বলে দিলে এমন তাপ সৃষ্টি করবে যে মনে হবে আমাকে দগ্ধ করে দেবে। আসলে দগ্ধ করে না, আরও পরিশুদ্ধ করে পবিত্র করে দেয়। সত্য কথা সব সময় মানুষকে পবিত্র করে। ঠিক তেমনি আমি যদি কাউকে কথা দিই, আর কথা রাখার সময় হয়ত আমি কথাটা রাখতে পারছি না, তখনও শরীরে একটা তাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি কথা দিয়েছি, যাই হয়ে যাক আমি এটাই করব, ওই যে তাপ সৃষ্টি হচ্ছে ওটাই তপস্যা। দুটোতেই তাপ সৃষ্টি হয়, পেছনের কথা যখন reporting করা হয় তখনও তাপ সৃষ্টি হয়। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী খুব সুন্দর কথা বলতেন। একবার তিনি কথায় কথায় একজনকে বলছেন, সন্ন্যাসীকে যদি তুমি জিজ্ঞেস কর কোথায় যাচ্ছেন মহারাজ? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন হাওড়া স্টেশন। ঠিক আছে, তিনি হাওড়া স্টেশনেই যাচ্ছেন। সন্ন্যাসীর মধ্যে যদি কিছু গলদ থেকে থাকে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোথায় যাচ্ছেন, বলবেন একটু বাইরে যাচ্ছি। তিনি কিন্তু সত্যকে এড়িয়ে গেলেন। তিনি মনে করছেন আমি সত্য রক্ষা করেছি, বাইরেই তো যাচ্ছি। কিন্তু হয়ত কোন ভক্ত বাড়ি যাচ্ছেন। এখানে সত্যের তপস্যা মানে কোন সত্য রক্ষা নয়, সত্য সত্যই। আচার্য শঙ্কর বলছেন সত্য মানে যেমনটি তেমনটি বলা। যেমনি সত্য কথা বলতে যাবে শরীরের প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করবে। একদিকে তার ভেতরে তাপ অন্য দিকে যাকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, ক্ষমতায় আছে সত্য কথা বলে দেওয়াতে এবার তার সাথে গোলমাল লাগবে। কারণ সে একটা গোলমাল করেছে কিনা। কিন্তু তাকে যেই একটা সাজা দিয়ে দিল তখনই ওই গোলমেলে কাজের প্রায়শ্চিত্তটা ওখানেই হয়ে যাচ্ছে। তা নাহলে ভেতরে একটা পাপ বোধ থেকে যায়। কোন ব্যাপারে মন যদি একটুও খুঁত খুঁত করে ওই সময় যাই পরিস্থিতি থাকুক সত্য কথা বলে দিতে হয়। নাহলে পরে খুব জ্বালিয়ে মারবে।

ঠাকুর যে বলছেন কলিযুগে সত্যই তপস্যা, তার কারণ কলিযুগে আমাদের আর কিছুই করতে হবে না। কারণ কলিযুগে এখন চারিদিকে যা সব চলছে, এর মধ্যে সত্য কথা বলতে গেলে বা কথা দিয়ে কথা রক্ষা করতে গেলেই আমাদের প্রচুর সমস্যায় পড়তে হবে। ওই সমস্যার মধ্যেও সত্য কথা বলা আর কথা দিয়ে কথা রাখাটাই বিরাট তপস্যা হয়ে যাবে।

সেইজন্য *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, এটাই তপস্যা। আগেও বলা হয়েছে, এখনও আবার বলা হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে বা শ্রীরামকথা যদি বুঝতে হয় বা কৃষ্ণকথাও যদি বুঝতে হয় তাহলে *দ্বির্নাভিভাষতে* ভালো করে বুঝতে হবে, তা নাহলে কোনটাই বোঝা যাবে না। যখন বালিকে বধ করছেন তখন এই একই জিনিস, সুগ্রীবকে বলে দেওয়া হল বালি মরবে, তার মানে বালি মারা গেছে। রাবণকে বধ করলেন, বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলছেন, তোমার জন্য আমি যুদ্ধ করিনি, আমি ক্ষত্রিয় আমার স্ত্রীকে অপহরণ করেছে আমি

আমার ধর্ম পালন করলাম। কারণ শ্রীরামচন্দ্র বলেই দিয়েছিলেন রাবণকে বধ করবেন। প্রজাদের দায়ীত্ব নিয়েছেন সেইজন্য সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের পুরো ব্যক্তিত্বটা এই একটিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে – *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*। এর আগেও আমরা বলেছি শাস্ত্রে কখন ধর্ম অধর্মের লড়াই হয় না, শাস্ত্রে সব সময় ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই চলে। বাবা আর ছেলের মধ্যে বিবাদ, মা কাকে সামলাবে? নিজের স্বামীকে না ছেলেকে? কিন্তু দুজনের প্রতিই তার কর্তব্য, একদিকে স্ত্রীধর্ম অন্য দিকে মাতৃধর্ম। স্বামী সব সময় স্ত্রীকে বলে যাচ্ছে তোমার জন্য ছেলে গোল্লায় যাচ্ছে। আর ছেলেকে বাঁচাবার জন্য মায়েরা দিনরাত মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছে। কোন মাকে যদি নিজের ছেলের জন্য কোন দিন মিথ্যা কথা বলতে না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ছেলে জন্ম থেকেই সন্ন্যাসী। ব্রুস লী সব সময় বাইরে গিয়ে মারামারি করে বাড়ি ফিরত। বাবার কাছ থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য মা লুকিয়ে চিকিৎসা করতে থাকত। সেই ব্রুস লী পরে কোথায় চলে গেল। অথচ তার মা ছেলেকে বাঁচাবার জন্য বাবার কাছে অনবরত মিথ্যা কথা বলে গেছে। তাহলে সব মা কি মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে? একেবারেই না, এটাই ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াই, একদিকে স্বামীর প্রতি ধর্ম আরেক দিকে পুত্রের প্রতি মায়ের ধর্ম, মা এখন কোন দিকে যাবে!

আমাদের জীবনে ধর্ম অধর্মের লড়াই কখন হয় না। ছোটবেলা থেকেই আমরা জানি কোনটা অধর্ম, আর এটাও জানি মিথ্যে কথা বলতে নেই, চুরি করতে নেই। আমাদের জীবনেও লড়াই সব সময় ধর্মের আর ধর্মের হয়, এটাও ঠিক মনে হচ্ছে ওটাও ঠিক মনে হচ্ছে। আর যখন emotionকে নিয়ে অধর্ম আসে সেখানেও survivalকে নিয়ে সমস্যা থাকে, এই গোলমালটা না করলে আমি মরেই যাব। যার জন্য অনেক সময় আমরা বলি যে, একবারটি আমাকে করে নিতে দাও। অধর্ম জিনিসটা ঠিক কি? পাপ কি? কোন এক মহাপুরুষ একটা পথ বেছে নিয়ে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছালেন। যেমন গান্ধীজী একটা পথ নিয়েছিলেন, নেতাজী আরেকটা পথ নিয়েছিলেন, ঠাকুর আরেকটা পথ নিয়েছেন, স্বামীজী, যীশু, বুদ্ধি সবাই একটা পথ নিয়েছিলেন। তাঁদের শিষ্যরা মনে করে উনি যে পথে গেছেন সেই পথকে আমিও যদি অবলম্বন করে তাঁর মত পালন করি তাহলে আমিও ওনার মত হয়ে যাব। গান্ধীজীর অনুগামীদের দুটো জিনিস খুব ছিল, একটা হল খাদি পড়া আর দ্বিতীয় নেচারোপ্যাথি করা কিন্তু বাকি জিনিসগুলো সত্য, অহিংসা এগুলোর দিকে জোর দিল না, খুব কঠিন কিনা। কিন্তু ধর্মের পথে যখন কোন মহাপুরুষকে আদর্শ করে নেওয়া হল তখন তিনি যেটা বলেছেন, যেটা করেছেন সেটাই ধর্ম আর তিনি যেটা করেননি, বলেননি সেটাই অধর্ম। এই ব্যাপারটা সব থেকে পরিষ্কার করে বোঝা যায় ইসলামে। মহম্মদকে আল্লা যা যা বলেছেন সেটাই ধর্ম, মহম্মদ যা যা করেছেন সেটাই ধর্ম বা কেউ বলছেন যে তিনি এই রকম বলে গেছেন সেটাও তখন ধর্ম। তার মানে ধর্ম একজন একক ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। একজন যেটা করেছেন সেটা তো তাঁর খামখেয়ালীও হতে পারে। যাঁরাই মহৎ হন তাঁরাই কিন্তু ধর্মকে নিজের মত পরিভাষিত করেন। তবে বিশ্ব জুড়ে মানবজাতি ছড়িয়ে আছে তারা অতি সাধারণ, তাদের দ্বারা এসব সম্ভব নয়। ফলে তারা যাঁকে তাদের আদর্শ করে নিয়েছে তারা তাঁর মতই চলে। ফলে আমরা যে এই ধর্ম অধর্ম যা বলছি এগুলো ঠিক কি ভুল এক তরফা বলে দেওয়া যায় না।

দুটো আচরণ, এক দিকে শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য, যাঁকে তিনি নিয়ে এসেছেন আর অন্য দিকে প্রজাদের প্রতি কর্তব্য, যাদের তিনি রাজা, রক্ষক। এই দুটো আচরণের মধ্যে কোন আচরণটা তিনি পালন করবেন? ওনার কাছে যে প্রথম এসেছে তারটাই থাকবে। তিনি আগেই কথা দিয়ে রেখেছেন আমার কাজ হল প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা, প্রজারা এসে সীতাকে নিয়ে আপত্তি জানাল। তখন সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। যদি না পাঠাতেন তখন আবার আমরাই বলতাম যে এই রকম স্ত্রৈণ সে আবার কিসের অবতার, কিসের ভগবান! নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত বলে প্রজাদের গোল্লায় পাঠিয়ে দিল। যাঁরাই মহৎ হয়ে যান তাঁদেরই সবাই বেশি নিন্দা করে। আর মহাপুরুষদের নিন্দা করে চারিদিকে একটা হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিতে পারলে মনে করবে আমি বিরাট কিছু হয়ে গেছি। বালিকে যদি না মারত তখন বলত, দেখলে কেমন বিশ্বাসঘাতক, বন্ধুকে কথা দিয়ে কথা রাখল না। শ্রীরামচন্দ্র কোন দিকে যাবেন? এসব পরিস্থিতিতে তিনি যেটাই করবেন সেটারই নিন্দা হবে। কিন্তু তার মধ্যেই একটাকে বেছে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্রও এই কথাই বলে, তুমি যেটাই করবে সেটাতেই নিন্দা হবে। আজ কত লোক সন্ন্যাসীদের দেখলে কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে প্রণাম করে, আবার অন্য দিকে সন্ন্যাসীদের কত লোকের কাছে গালাগাল শুনতে হয়, মা-বাবার প্রতি কর্তব্য পালন না করে সব জগৎ উদ্ধারে নেমেছে! কিছু একটা তো করতে হবে, হয় ঘরে থাকবে নয়তো ঘর ছাড়বে। ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হলে লোকে

বলবে, স্বার্থপর, মা-বাবাকে দেখল না। কিন্তু একবার যখন ঠিক করে নিয়ে বলে দিল আমি এটাকে নিয়েই থাকব, এরপর সেটাকে নিয়েই যদি সে চলতে থাকে এবার শরীরে তার তাপ সৃষ্টি হবে। ওই যে তাপ সৃষ্টি হয় এটাই তপস্যা, এই তাপ তাকে শুদ্ধি করতে থাকে। তখন সে নিজেই একটা ছাঁচ হয়ে গেল। উনিই তখন অনেকের আদর্শ হয়ে যাবেন। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য এটাই, শাস্ত্র দেখিয়ে দিচ্ছে এনাদের এই এই বিষম পরিস্থিতি এসেছিল এনারা তখন এই এই করেছিলেন। মূল কথা যেটাকে আপনি ধরে নিয়েছেন সেটাকে আর কোন মতেই পাল্টানো যাবে না। যেটা বলে দিয়েছেন সেটা থেকে আর সরে আসা যাবে না, দু রকম কথা বলা যাবে না।

যাই হোক, এরপর কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, তোমার অভিষেকের জন্য যা কিছু সামগ্রী একত্রিত করা হয়েছে এই সামগ্রী দিয়ে ভরতের অভিষেক হবে। আর দ্বিতীয় কথা, তুমি এখনই বল্কল আর জটা ধারণ করে চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে চলে যাবে। কিন্তু তার সাথে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, ওখানে তুমি মুনির মত বাস করবে। তুমি জঙ্গলে গিয়ে নিজের মত একটা আলাদা সাম্রাজ্য দাঁড় করিয়ে দেবে, তা করতে পারবে না। মুনি ঋষিদের যে দিনলিপি তোমাকেও সেই দিনলিপি পালন করে চলতে হবে। কৈকেয়ীর মনে আবার ভয়ও আছে, রাম বনে গিয়ে যদি একটা সাম্রাজ্য তৈরী করে নিয়ে একটা বিশাল সৈন্যবাহিনী একত্রিত করে নেয় তখন ভরতের দিকে থেকে বিপদের আশঙ্কা হয়ে যেতে পারে। তোমার পিতা এটাই চাইছেন কিন্তু নিজের মুখে তোমাকে বলতে তিনি লজ্জা বোধ করছেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র শান্ত ভাবে খুব সুন্দর করে বলছেন –

ভরতস্যৈব রাজ্যং স্যাদহং গচ্ছামি দণ্ডকান্।
কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেহত্র কারণম্।২/৩৬৭

হে মা! রাজ্য ভরতেরই হবে আর আমি দণ্ডকারণ্যেই যাব এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, বাবা নিজে কেন আমাকে বলছেন না। শ্রীরামচন্দ্র একটা দ্বিধায় পড়ে গেছেন, সতিই খুব সন্দেহজনক। সুমন্ত্র যেমন বলছেন, রাজার আদেশ ছাড়া আমি যেতে পারি না। এখানে তা নয়, শ্রীরামচন্দ্রের মনে সংশয় হচ্ছে উনি কি কোন কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যাঁরা সৎ পুরুষ হন তাঁরা সব সময় দোষ নিজের উপর নিয়ে নেন। অসৎ যারা হয় তারা সব সময় দোষটা অপরের উপর চাপিয়ে দেয়। বাচ্চারাও সব সময় অপরের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। অসৎ আর বাচ্চা একই রকম। অসৎ কাজ করে অপরের ঘাড়ে ফেলে দেওয়াটা তারাই করে যাদের বালবুদ্ধি। অসৎ লোকেদের সব সময় বালবুদ্ধিই হয়। যাঁরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নত তাঁরা কখনই অসৎ কাজ করবে না। অসৎ কাজ করা মানেই বালবুদ্ধি। যাদের মধ্যে অপূর্ণতা, অপূর্ণতা মানেই বালবুদ্ধি। যারা আরও বালবুদ্ধি সম্পন্ন তারা দোষ করে অপরের উপরে চাপিয়ে দেয়। শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে রাজা দশরথের মনে খুব দুঃখ হয়েছে। রাজা দশরথও বালবুদ্ধি সম্পন্ন। আমরা বালবুদ্ধি শব্দটা অনেকবার ব্যবহার করছি। রাজা দশরথের বালবুদ্ধি না হলে এত কাণ্ড করতেন না, কৈকেয়ীর প্রতি তাঁর এত দুর্বলতা থাকত না। কৈকেয়ীর প্রতি দুর্বলতা মানেই রাজা দশরথের বালবুদ্ধি। বালবুদ্ধির দ্বিতীয় ধাপ হল দোষ অপরের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া, দায়ীত্ব অপরের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া। জগতটাই গোলমেলে, জগতই দোষী, আমার কাজ অপরে করে দেবে, এগুলো সবই বালবুদ্ধির পরিচায়ক। রাজা দশরথ খুব সুন্দর বলছেন –

স্ত্রীজিতং ভ্রান্তহৃদয়মুন্মার্গপরিবর্তিনম্।
নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং রাজ্যং পাপং ন তদ্ভবেৎ।২/৩/৬৯

রাজা দশরথ খুব দুঃখে আফশোষ করে নিজের চরিত্রের কথা বলছেন, আমি হলাম *স্ত্রীজিতং*, কামীপুরুষ, স্ত্রীর বশে। *ভ্রান্তহৃদয়ম্*, এখানে হৃদয় মানে মন বা বুদ্ধি, আমার ভ্রান্তবুদ্ধি, নারীর প্রতি যে আসক্ত তার বুদ্ধি কি কখন ঠিক থাকে! আমার মন ভ্রান্ত। আর *উন্মার্গপরিবর্তিনম্*, আমি এখন বিপথগামী হয়ে গেছি। নারীর পাল্লায় যারাই পড়ে তারাই ভুল পথের পথিক হয়ে যায়। যত নাটক, উপন্যাস, গল্প আছে সব কাহিনীর পেছনে একজন নারী আছে। যে কোন কাহিনী থেকে নারীকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় কাহিনীটা ধপাস করে পড়ে যাবে। অথচ যাঁরা শাস্ত্রের কথা, ধর্মের কথা শুনতে আসছে তাদের বাড়ির লোকেরা, পাড়া প্রতিবেশীরা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবর বলবে, ওই একই ধর্মের কথা কত শুনবে, ঈশ্বর সত্য বাকি সব মিথ্যা এছাড়া ধর্মে কি আর কিছু আছে নাকি। তাহলে নারীতে কি আছে, ওই এক নারীকে নিয়ে লক্ষ লক্ষ উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে, আরও লেখা হয়ে চলেছে। এখানে নারী আর মাকে এক করে দেওয়া যাবে না। নারী কিন্ত মা নয়, মা সম্পূর্ণ আলাদা একটা

প্রজাতি। মায়ের সাথে নারীর কোন সম্পর্ক নেই, আমার যিনি গুরু তিনিও আমার মা হতে পারেন, আমার যিনি বাবা তিনিও আমার মা হতে পারেন। ভগবান এক নারীর সৃষ্টি করে দিয়েছেন আর ওই সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে লক্ষ লক্ষ সৃষ্টি বেরিয়ে আসছে। বিশ্বে যত উপন্যাস, নাটক সবের মধ্যমণি একজন নারী। রাজা দশরথ বলছেন আমি *স্ত্রীজিতং*, শুধু রাজা দশরথ একা নয়, ঠাকুর বলছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু সবাই ওখানে খাবি খাচ্ছে।

সেইজন্য হে রাম! তুমি এক কাজ কর, *নিগৃহ্য মাং গৃহাণেদং*, আমাকে তুমি বেঁধে কারাগারে পুরে বলপূর্বক এই রাজ্য ভার গ্রহণ করে নাও, এতে তোমার কোন পাপ লাগবে না। অনেক সময় দেখা যায়, যারা রামায়ণাদি সাহিত্যকে নিয়ে সমালোচনা করে তারা বলে, রামের তখন উচিৎ ছিল বাবাকে জেলে পুরে দেওয়া। বাবা নিজেই ছেলেকে বলছেন তুমি তাই কর। বাবা তো নিজেই করতে পারত, তুমি তো রাজা, কৈকেয়ীকে জেলে পুরে দিলে কারুর ক্ষমতা ছিল না যে একটু ট্যাঁ ফু করবে। রাজা দশরথ তা করবেন না, বালবুদ্ধি কিনা, দুর্বল চিত্তের। দুর্বল চিত্তের না হলে কি *স্ত্রীজিতং* হয়! সেইজন্য নিজে না করে অন্যের ঘাড়ে দায়ীত্বটা দিয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক রাজা দশরথ বলছেন তোমার কোন পাপ লাগবে না, আর শুধু তাই না –

এবং চেদনৃতং নৈব মাং স্পৃশেদ্রঘুনন্দন।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখসন্তপ্তো বিললাপনুস্তদা।২/৩/৭০

দেখো রামচন্দ্র! তুমি যদি এই রকম কর তাতে তোমার মিথ্যার পাপ লাগবে না। দশরথ কি রকম দুর্বল চিত্তের যে অপরের ঘাড়ে দায়ীত্ব ফেলে দিচ্ছেন। নিজে করছেন তখন সেটাতে তাঁর মনে হচ্ছে যেন মিথ্যা হয়ে যাবে, আর রাম যদি বলে আমি করতে রাজী আছি সেইজন্য তাকে বলছেন তুমি যদি আমাকে বেঁধে দাও, অর্থাৎ মিলিটারি ক্যু যেমন হয় সেই রকম জোর করে রাজ্যভার গ্রহণ করে নাও তাতে তোমার কোন পাপ লাগবে না। এই বলে তিনি দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে বলছেন –

হা রাম হা জগন্নাথ হা মম প্রাণবল্লভ।
মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনংগন্তুমর্হসি।২/৩/৭১

হে রাম! হে জগতের নাথ! হে আমার প্রাণবল্লভ! তুমি আমাকে ছেড়ে ঘোর অরণ্যে চলে যেও না। এখন আবার মায়াতে আচ্ছন্ন, একদিকে বলছেন তুমি আমাকে দড়ি বেঁধে কারাগারে বন্দী করে দাও তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তুমি যেন আমার কাছেই থাক। কী আশ্চর্য! এই যে মোহ মায়ার কথা বলা হয়, এই মোহ মায়া এমনই জিনিস যে বলছেন তুমি আমাকে বেঁধে কারাগারে পুরে দাও তাতে তোমাকে কোন পাপ স্পর্শ করবে না, তুমি আমার থেকে দূরে চলে যেও না।

বেলুড় মঠে এক বয়স্ক দম্পত্তি ঘোরাঘুরি করছিল। সামনে একজন সন্ন্যাসীকে দেখে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে চাইলেন। বিরাট বড়লোক বাড়ির লোক, ভদ্রলোক সত্তর একাত্তর বয়সের। সন্ন্যাসীকে দেখে দুজনই বলছেন, আমরা মরে যেতে চাই। সন্ন্যাসী খুব রেগে গিয়ে বলছেন, মঠে এত সন্ন্যাসী থাকতে আমাকেই কেন মরে যাওয়ার কথা বলতে এলেন। ভদ্রলোক বললেন, না আপনাকে দেখে মনে হল আপনাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। সন্ন্যাসী তখন জানতে চাইলেন আপনাদের কি এমন সমস্যা হল যে দুজনেই একসাথে আত্মহত্যা করতে চাইছেন? ওনারা যা বললেন শুনে সন্ন্যাসী মহারাজ খুব অবাক হয়ে গেলেন। উনি একজন বড় শিল্পপতি, ছেলেও বড় ডাক্তার, বৌমাও বড় বাড়ির মেয়ে। ওনাদের এক নাতি আছে, নাতির মায়ায় ভদ্রমহিলা নিজেদের আলাদা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ছেলের বাড়িতে থাকবেন। স্ত্রী ওখানে থাকেন বলে ভদ্রলোকও ওখানে পড়ে থাকেন, আর বৌমা একেবারেই চায় না যে শ্বশুড়-শাশুড়ি এখানে থাকে। সন্ন্যাসী একটু মজা করে বললেন, বৌমা আপনাদের মারধর করে নাকি। ভদ্রলোক স্ত্রীকে দেখিয়ে বলছেন, হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওকে মারে। যে শুনবে তারই কষ্ট লাগবে। সন্ন্যাসী বোঝাচ্ছেন, নাতির মায়া কি এতটুকুও ছাড়তে পারছেন না! ভদ্রলোক বলছেন, স্ত্রীকে আমি সব সময় তাই বলি, কি করতে নাতির প্রতি এত মায়া করছ, নাতির মায়া ছাড়লে তো কোন সমস্যাই থাকত না, কিন্তু ছাড়তেই পারছে না। বৌমা দিনরাত শাশুড়িকে মারধোর করছে কিন্তু নাতির মায়া ছাড়তে পারছে না। আর বৃদ্ধা ওখানে আছে বলে বৃদ্ধও ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। কষ্টের শেষ নেই, ভাবছে যদি মরে যাই তাহলে এই কষ্ট থেকে বেঁচে যাব। সন্ন্যাসী খুব সুন্দর করে বোঝালেন, মরে এই সংসারটাকেই তো ছাড়তে চাইছেন, তার থেকে ওই বাড়িটা ছেড়ে দিলেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়। ভদ্রমহিলা এরপরও বলছে, নাতিকে ছেড়ে আমি দূরে থাকতে

পারব না। তাহলে মার খেতে থাকুন, এটাই আপনার প্যাকেজ ডীল। মায়া মোহকে কাটানো খুব মুশকিল। দশরথেরও একই অবস্থা, আমি মরে যাই ঠিক আছে, তুমি যা করার কর। কিন্তু বাপু, আমি যত দিন বেঁচে আছি আমার এই চোখ দুটোকে তোমার দর্শন থেকে বঞ্চিত করে কোথাও চলে যেও না। এটাই মমতা। ঠাকুর বলছেন বিচার কর, নারীদেহে কি আছে, হাড়, মাংস, মল, মুত্র, রক্ত, পুঁজ, এছাড়া আর কি আছে! তাহলে মানুষ কি হাড় মাংসকে ভালোবাসে? একজন পুরুষ যখন কোন নারীকে ভালোবাসছে তখন সেকি জানে না নারীর শরীরে এগুলোই আছে, জেনেও তো সে নারীর দিকে উন্মত্তের মত ছুটে যাচ্ছে। রাজা দশরথের এত দুঃখ, কই সেও তো এই দুঃখ থেকে বেরোতে পারছে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলছেন আত্মার যে বিস্তার, যারা দুর্বল লোক বা সাধারণ লোক তারা নিজেকে বাইরের আয়নাতে দেখে যাঁরা উচ্চস্তরের লোক তাঁরা নিজেকে নিজের ভেতরের আয়নায় দেখেন। যখন সামনের আয়নাতে নিজেকে দেখে তখন এটাই সংসার আর যখন ভেতরের আয়নাতে দেখছে তখন এটাই মুক্তি, এছাড়া আর কিছু না। বহির্জগতে আমি যখন নিজেকে দেখছি, যখন স্ত্রীকে ভালোবাসছে তখন সেখানে সে নিজেকেই দেখছে। সবাই জানে মৃত্যুর পর এই টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি কিছুই সঙ্গে যাবে না, সব এখানেই পড়ে থাকবে। তাও তো মানুষ টাকা-পয়সা, বাড়ি, গাড়িকে ভালোবাসে। তাহলে মানুষ কি এতই মুর্খ? একেবারেই মুর্খ নয়, এই কারণেই আমাদের উপনিষদ পড়া খুব দরকার, জিনিসগুলিকে একেবারে সঠিক দৃষ্টিতে রেখে দেয়। মানুষ এজন্যই ভালোবাসে কারণ এগুলোকে মানুষ নিজের ছবি রূপে নিয়ে নিয়েছে। যে আয়নাতে নিজের ছবি খুব ভালো দেখে মানুষ সেই আয়নাকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসে। জীবনে আমরা যাদের ভালোবাসি তার মধ্যে আশ্চর্যজনক হল, নাতির প্রতি যে ভালোবাসা সেটা সব থেকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় কিছু কামনা থাকে, সন্তানের প্রতি ভালোবাসায় কিছু প্রত্যাশা থাকে কিন্তু নাতির ক্ষেত্রে সে জানে নাতি যতদিনে বড় হবে ততদিনে আমি মরে যাব, নাতির প্রতি ভালোবাসায় কোথাও যেন আধ্যাত্মিক জিনিসটা জড়িয়ে থাকে। প্রেমের ঠিক ঠিক আনন্দ সেখানেই পাওয়া যায় যেখানে নিঃস্বার্থপরতা থাকে। আত্মার প্রতিবিম্ব যখন বাইরে দেখছে তখন যেখানে নিঃস্বার্থপরতা বেশি থাকে সেখানে আত্মার প্রতিবিম্ব ভালো দেখে। বাইরের জগতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ হয়ে গিয়ে নিজের ভেতরেই যখন নিজের ছবিকে দেখে এটাই তখন আধ্যাত্মিক হয়ে যায়, এটাই ঈশ্বর জ্ঞান, এটাই আত্মজ্ঞান। যখন বহিঃ প্রকৃতিতে নিজের ছবি দেখছে তখন এটাই সংসার। রাজা দশরথ যে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছেন এতে দোষের কিছু নেই। এখন যদি এটাকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হবে? মানুষ উদভ্রান্ত হয়ে যাবে, পাগল হয়ে যাবে, আত্মহত্যার প্রবণতা এসে যাবে। সেইজন্য আয়নার বিন্যস্ত করাটাই জীবন। সহজ আয়না হল বাইরের আয়না। একজন লোক বিয়ে করে এক নারীকে স্ত্রী করে নিয়ে এল মানে একটা আয়না নিয়ে এল, দুটো সন্তান হয়ে গেল, আরও দুটো আয়না হয়ে গেল, একটো বাড়ি বানাল, আরও একটা সুন্দর আয়না এসে গেল। ভদ্রলোক খুব খুশী, পরিষ্কার নিজের ছবি দেখছে। কিন্তু এর কোন একটা আয়না যদি ভেঙে যায়? ভূমিকম্পে বাড়িটা ভেঙে গেল, কিংবা স্ত্রী মারা গেল কিংবা আরেকজনের সাথে চলে গেল, ছেলের কিছু হয়ে গেল। তখন কি হবে? পাগল হয়ে যাবে বা আত্মহত্যা করে নেবে। সেইজন্য এনারা বলছেন, তুমি যা করছ ঠিকই করছ এতে কোন দোষ নেই, তবে ঈশ্বরের ছবিকে তুমি যদি জগতে দেখতে যাও সেখানে সব সময় বিপদ থাকবে, কিন্তু ঈশ্বরের ছবিকে নিজের ভেতরে দেখতে পারলে তখন আর বিপদের কোন কিছু থাকবে না। কারণ আপনি আর আপনার অন্তরাত্মা সব সময় সাথে সাথে আছেন। সেইজন্য দশরথের জীবনে এত বিলাপ। আমার যে দিব্যত্ব, যেটা আমার প্রকৃত আমিত্ব, এই আমিত্বকে আমি কোথায় দেখছি তার উপর নির্ভর করে আমাদের সবার জীবনের সুখ-দুঃখের খতিয়ান।

স্বামীজী কায়রোর বন্দরে সেই বেশ্যাদের যখন দেখছনে তখন তিনি বলছেন এরা নিজের দেহের মধ্যে নিজের দিব্যত্বকে দেখছে। দশরথ তাঁর দিব্যত্বকে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তান শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে দেখছেন। আমরা আমাদের দিব্যত্ব যাকে ভালোবাসি তার মধ্যে দেখছি। তারপর যেমনি ওই চেহারাটা সামনে থেকে সরে যাবে তখনই আমরা হতাশ হয়ে পড়ব। কারণ নিজের দিব্যত্ব দেখা ছাড়া মানুষ এক মুহুর্ত থাকতে পারবে না। যত বড় ক্রিমিনালই হোক সেও নিজের দিব্যত্ব দেখে। কোথায় দেখে? তারা প্রতিহিংসাতে গিয়ে তাদের দিব্যত্বকে দেখে। এই যে honour killing হয়, সেখানে তারা নিজের দিব্যত্বকে নিজের প্রতিষ্ঠায়, নিজের নামযশে দেখছে। প্রতিষ্ঠাতে যদি কিছু হয়ে যায় সে তার দিব্যত্বকে হারিয়ে ফেলে। দশরথেরও ঠিক সেই সমস্যা। হা রাম হা

জগন্নাথ, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, *মাং বিসৃজ্য কথং ঘোরং বিপিনংগন্তুমর্হসি*, আমাকে পরিত্যাগ করে তুমি কি করে এই গহন অরণ্যে গিয়ে থাকবে, বনে যাওয়াটা তুমি কখনই ঠিক মনে করো না। অথচ কিছুক্ষণ আগেই রামের নামে শপথ নিয়ে কৈকেয়ীর ইচ্ছা পূরণ করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হচ্ছেন। জীবন যে কত বিচিত্র, কিছু করার থাকে না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীটা যদি খুব স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন স্বামীজী বারবণিতার দেখে করুণায় আপ্লুত হয় বলছেন আহা! ওরা নিজেদের দেহের মধ্যে ওদের দিব্যত্বকে দেখছে। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, সাধনার পথ দিয়ে দেখলে এটাকেই দিব্যত্ব মনে না হয়ে মোহগ্রস্ত মনে হবে। মোহগ্রস্ত লোকেরা ঠিক এই রকমই করে, এক রকম কথা বলেই কিছুক্ষণ পরে সেটাকে অন্য রকম বলবে। বাল্মীকি দশরথের চরিত্রকে এভাবেই চিত্রণ করেছে। কিন্তু বাল্মীকি কি আর চিত্রণ করবেন, প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই একই কাহিনী।

এইভাবে রাজা দশরথ বিলাপ করে যাচ্ছেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, আপনি এত দুঃখ করছেন কেন? আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত রাজ্য শাসন করবে, চৌদ্দ বছর পর আবার তো আমি ফিরে আসব। আর আমি যে সত্য রক্ষা করতে পেরেছি তার জন্য রাজ্য সুখের থেকে কোটি গুণ আনন্দ আমার হবে আর তাতে আপনারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন বনবাস অনেক গুণদায়কও বটে, যে কোন একান্ত বাসে ভালো তো হয়ই। যে কোন মানুষ যদি একান্ত বাস করতে পারে তাহলে তার অনেক মঙ্গল হয়, একান্ত বাসে মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়। তারপর বলছেন, আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না, আমি মা আর সীতাকেও বুঝিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে নিচ্ছি। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের এই কথাটিই অত্যন্ত মূল্যবান –

রাজ্যাৎ কোটিগুণং সৌখ্যং মম রাজন্ বনে সতঃ।২/৩/৭৪

রাজ্য পাওয়া থেকেও আমার কোটি গুণ আনন্দ হবে যদি আমি সত্য রক্ষার্থে জঙ্গলে যেতে পারি। এর আগে আমরা আলোচনা করছিলাম, ঠাকুর বলছেন সত্যই কলির তপস্যা। শ্রীরামচন্দ্র যে বলছেন জঙ্গলে আমার কোটি গুণ সুখ হবে, জঙ্গলে গিয়ে কি কারুর কোটি গুণ সুখ আদৌ হয়? কখনই হতে পারে না। বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর বলছেন, বনবাসে থাকার সময় শ্রীরামচন্দ্র থেকে থেকে বিলাপ করছেন, ভরতই সব সুখ পেল, আমার কপালে সুখ নেই। কারণ বাল্মীকি রামায়ণ অনেক বেশি বাস্তবানুগ, অধ্যাত্ম রামায়ণ একটু অন্য ধরণের। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যদি কথা না রেখে রাজ্যভার নিয়ে নিতেন তাহলে কি হত? অনুতাপেই শেষ হয়ে যেতেন। ওই অনুতাপে দগ্ধ হওয়ার থেকে জঙ্গলে গিয়ে কষ্ট পাওয়া অনেক ভাল। এই যে বলছেন সত্য পালনের জন্য যদি আমি জঙ্গলে চলে যাই তাহলে আমার কোটি গুণ সুখ হবে, এটাকেই যদি ঘুরিয়ে বলা হয় তাহলে হবে, সত্য রক্ষা না করে আমি যদি রাজ্য নিয়ে নিই তাহলে আমার কোটি গুণ অনুতাপ হবে। সৎ পুরুষ যদি অসত্য ভাষণ দিয়ে কিছু নিয়ে নেন তিনি তখন সেই অনুতাপেই মরে যাবেন। অনুতাপ যেন না হয়, সেইজন্য সত্যকে অবলম্বন করে থাকেন। সত্যকে অবলম্বন করাতে যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপ মনকে শুদ্ধ করে দেয়। মনের শুদ্ধির জন্য মনে একটা অনাবিল আনন্দের স্রোত সব সময় প্রবাহিত হতে থাকে। এইসব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র পিতাকে পরিক্রমা করে প্রণাম করলেন এবং বিদায় নিয়ে মায়ের কক্ষে দেখা করতে এসেছেন।

কৌশল্যা, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের কথোপকথন

কৌশল্যা তখন শ্রীরামের মঙ্গলার্থে বিষ্ণু পূজা ও হোম করে ব্রাহ্মণদের দান কার্য শেষ করে মৌনব্রত অবলম্বন করে একাগ্র চিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করছেন। ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করছেন তখনই বজ্রপাত। কৌশল্যা এক সতীসাধ্বী স্ত্রী, শ্রীরামের মত তাঁর সন্তান, ঘোষণা হয়ে গেছে তোমার সন্তান রাজা হবে, কৌশল্যা সেই থেকে বিষ্ণুর পূজা, ব্রাহ্মণদের দান করে যাচ্ছেন আর বসে একাগ্র চিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করে যাচ্ছেন আর তখনই বজ্রপাত। সব ধরণের শুভ মুহূর্ত একত্রিত হয়ে গেছে, এক নম্বর শুভ নিজের সন্তান শ্রীরামচন্দ্র রাজা হতে যাচ্ছেন, দু নম্বর শুভ বিষ্ণুর পূজা ও হোম করছেন, তিন নম্বর শুভ ব্রাহ্মণদের দান করছেন, চার নম্বর শুভ হৃদকমলে বিষ্ণুর ধ্যান করছেন আর তার মধ্যেই বজ্রপাত। বাল্মীকি রামায়ণেও একই দৃশ্যকে নিয়ে আসা হয়েছে।

আমরা কিছুই করছি না তাতেও যদি কিছু গোলমাল হয় ঠাকুরকে বলি হায় ঠাকুর তুমি একি করলে। এই কারণেই শাস্ত্রের এত দাম। তোমার একটু গোলমালে তুমি ঠাকুরকে দোষারোপ করছ, তুমি এখানে এসে দেখ সব রকম শুভ জিনিস এক জায়গায় জুটেছে তার মধ্যেই বিধাতা এসে বজ্র নিক্ষেপ করে দিলেন। এতেই কি কৌশল্যা বেঁচে গেলেন? একেবারেই নয়, সেকেণ্ডের মধ্যে ছেলে জঙ্গলে চলে গেল, বৌমাও গেল আর নিজে বিধবা হয়ে

গেলেন। এই শাস্ত্রগুলো যদি ঠিক ঠিক অধ্যয়ন না করা হয়, তখন সামান্য একটু গোলমাল হলেই আমরা ছিটকে পড়ে যাব। কৌশল্যার এই কয়েক মিনিট হল এই জগতের সব থেকে কঠিন মুহূর্ত, রামচন্দ্রের মত সন্তান রাজা হতে যাচ্ছে মনের মধ্যে কত খুশীর ঢেউ, ভগবানের পূজা করার আনন্দ, দান করে পূণ্যার্জনের একটা আনন্দ, আর ভগবানের ধ্যান করে যে আনন্দ সেই আনন্দে কৌশল্যা পরিপূর্ণ আর মুহূর্তের মধ্যে বজ্রপাত, ছেলে জঙ্গলে, বৌমা জঙ্গলে আর নিজে বিধবা হয়ে গেলেন। কৌশল্যার পুরো জগতটা একটা তুফানে সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গেল। এই জিনিসগুলিকেই আমাদের গভীর ভাবে বিচার করতে হয়। সেইজন্য নিজের যে একটা পথ ঠিক করা হয়ে গেছে, সেই পথের বাইরে কখনই যেতে নেই। কর্ম তার নিজের গতিতে চলবে, সেখানে আমাদের কিছু করার নেই। যদি শুভকে ধরে রাখতে যাই ছিটকে বেরিয়ে যাবে, অশুভকে যদি ঠেলে দূরে সরিয়ে দিতে চাই, সে যাবে না। সব নিজের মত চলে।

ডেনিসের একটা সুন্দর কার্টুন আছে। ডেনিস একটা বাচ্চা ছেলে, তার একটা বিরাট বড় কুকুর আছে। কুকুরের নাম Ruff। ডেনিস তার বন্ধুদের বলছে, আমার কুকুরকে এমন ট্রেনিং দিয়েছি, ওকে আমি যেমনটি বলি ও তেমনটিই করে। কুকুরটা তখন বসে ছিল। ডেনিস বলছে, রাফ! সিট ডাউন। রাফ বসে আছে। তারপর কুকুরটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেনিস সঙ্গে সঙ্গে বলছে, রাফ! গেট আপ। কুকুর হাটতে শুরু করেছে, ডেনিস বলছে, রাফ! ওয়াক। হাটতে হাটতে আবার বসে পড়ল, ডেনিস বলল রাফ! সিট ডাউন। ডেনিসের বন্ধুরা বলছে, ওতো যা করছে তুমি বলার আগেই করছে। ডেনিস বলছে, ওকে এমন ট্রেনিং দিয়েছি যতক্ষণে আমার চিন্তা আসে ততক্ষণে রাফ ধরে নেয় আমি কি বলতে যাচ্ছি। জগতও এই রকমই। জগতটা ডেনিসের কুকুর রাফের মত নিজের খেয়ালে চলছে আর আমরা ভাবছি আমার ইচ্ছাতে সব কিছু আসছে যাচ্ছে। কিন্তু আমার আপনার ইচ্ছাতে কিছুই হয় না, জগত নিজের মত চলছে। দুঃখ যখন আসে তখন নিজের মত আসে, সুখ যখন আসে তখনও নিজের মত আসে। আমরা জগতের লেজ ধরে মনে করছি আমাদের ইচ্ছা মত জগৎ চলছে, কখন সখন আমাদের ইচ্ছার সাথে মিলিয়েও যায়। জ্যোতিষ বিদ্যা, কর্মের বিধান, ঈশ্বরের ইচ্ছা যেটাই আমরা বলি না কেন কোনটাই কিছু না, সবই কতকগুলি শব্দ মাত্র হয়ে পড়ে থাকে, প্রকৃতি নিজের মত চলেছে। গীতায় ভগবান বলছেন *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, স্বভাব মানে প্রকৃতি। আর এটাই স্বাভাবিক, আমাদের তো এতটুকু বুদ্ধি আর এখানে একটা মহাজাগতিক বুদ্ধি আছে, আমাদের এই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস এই মহাজাগতিক বিশাল জিনিসকে কী কন্ট্রোল করবে!

রামায়ণের এই অংশটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। কৌশল্যা এখন top of the world, জগতে এর থেকে ভালো অবস্থা আর কার হতে পারে! আর কয়েক মিনিটের ব্যাপার, কৌশল্যা রাজমাতা হতে যাচ্ছেন তার সাথে প্রত্যেকটি কর্ম তাঁর শুভ, পূজা, হোম, দান, ধ্যান, এর থেকে শুভ আর কী হতে পারে! কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কৌশল্যার সব শেষ। শেষ মানে কিছুক্ষণের জন্য নয়, পরবর্তি দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের জন্য। চৌদ্দ বছরে পুরো একটা যুগ হয়ে যায় আর এই জন্মে চিরদিনের মত পতিহারা হয়ে গেলেন।

রামকে দেখে কৌশল্যা খুব আনন্দিত। খুশীতে প্রাণ ভরে আছে, বলছেন এসো বাছা! কিছু খেয়ে নাও। তখন শ্রীরামচন্দ্র খুব শান্ত ভাবে বলছেন, মা! এখন আমার খাওয়ার সময় নেই কারণ আমার জন্য এখনই দণ্ডকারণ্যে চলে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে গেছে। আমার পিতা সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি কৈকেয়ীকে দুটি বর দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে ভরতকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করা হবে আর আমাকে চৌদ্দ বছরের জন্য জঙ্গলে পাঠানো হচ্ছে, আর এক্ষুণিই আমাকে জঙ্গলে চলে যেতে হবে। চৌদ্দ বছর বনবাস করে পুনরায় শীঘ্রই ফিরে আসব, আপনি চিন্তা করবেন না। রামের মুখে কথাগুলো শোনামাত্র দুঃখে উদ্বেগে কৌশল্যা মুর্ছিত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে একটু স্বাভাবিক হয়ে কৌশল্যা বলছেন –

যদি রাম বনং সত্যং যাসি চেন্নয় মামপি।
ত্বদ্বিহীনা ক্ষণার্দ্ধং বা জীবিতং ধারয়ে কথম্।২/৪/৮
যথা গৌর্বালকং বৎসং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠেন্ন কুত্রাচিৎ।
তথৈব ত্বাং ন শাক্নমি ত্যক্তুং প্রাণাৎ প্রিয়ং সুতম্।২/৪/৯

হে রাম! তোমাকে ছাড়া তো আমি ক্ষণার্দ্ধও বেঁচে থাকত পারব না। আমাকেও তাহলে তোমার সাথে জঙ্গলে যেতে হবে। গাভী নিজের বৎসকে ছাড়া থাকতে পারে না। মা আর সন্তানের উপমা দেওয়ার সময় গাভী

আর বৎসের উপমাই সব সময় দেওয়া হয়। রাজা যদি ভরতের প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাকে রাজ্য দিতে চান দিন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু তোমাকে তার জন্য কেন বনবাসের আদেশ দিচ্ছেন? রাজা কৈকেয়ীকে বর দিতে চাইলে তিনি তাকে সর্বস্বই দান করুন না কেন? কিন্তু তুমি কৈকেয়ী বা রাজার কাছে তো কোন অপরাধ করোনি যে তোমাকে তারা বনবাসে পাঠাতে চাইছেন! কৌশল্যা খুব সুন্দর বলছেন –

পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতম্।২/৪/১২
যদি গচ্ছসি মদ্বাবক্যমুল্লঙ্ঘ্য নৃপবাক্যতঃ।
তদা প্রণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনম্।২/৪/১৩

হে রাম! পিতা যেমন তোমার গুরু, আমিও তো তদপেক্ষা তোমার অধিক গুরু। মনুস্মৃতিও তাই বলছেন, পিতা গুরু ঠিকই কিন্তু পিতার থেকে মায়ের গৌরব অনেক বেশি। এখানে গুরু মানে যাঁর আদেশ পালন করতে হয়। বাবা যেমন তোমার গুরু আমিও তোমার গুরু বরঞ্চ তার থেকেও বেশি। আর তোমাকে আদেশ করছি তুমি বনে যাবে না। কিন্তু আমার আদেশ উল্লঙ্ঘন করে রাজার আদেশ মত বনে চলে যাও, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে যমসদনে গমন করব। একদিকে পিতা প্রাণত্যাগ করবেন বলছেন, অন্য দিকে কৈকেয়ীর কথা না শুনলে কৈকেয়ী প্রাণ দেবে এদিকে আবার কৌশল্যাও প্রাণত্যাগের হুমকি দিচ্ছেন। চারিদিকে প্রাণত্যাগের হিড়িক পড়ে গেছে। আমরা যে বারবার ধর্মের সাথে ধর্মের লড়াইয়ের কথা বলে যাচ্ছি, এখানে ঠিক সেই ধর্ম আর ধর্মের মধ্যে সংঘাত লেগে গেছে। মা একেবারে স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন, তোমার গুরু রূপে আমার স্থান তোমার বাবার থেকে বেশি, এরপরেও তুমি যদি আমার আদেশ না মানো তাহলে এই আমি প্রাণত্যাগ করলাম। এবার শ্রীরামচন্দ্র কি করবেন? এটাই ধর্মের সঙ্কট। এই ধরণের সঙ্কট আমাদের জীবনে যখন আসে তখন ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমি সেটাই করব যেটা আমি নিজে করতে চাইছি। যেমন একজন একটা বাড়ি কিনতে চাইছে, সে তখন পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করবে বাড়িটা কেনা যাবে কিনা, কিনলে কোন ঝামেলা-টামেলা হবে নাতো ইত্যাদি। কিন্তু সে যদি মনে মনে ঠিক করে থাকে আমি কিনব তখন কিন্তু পাঁচজন নিষেধ করলেও তাদের কথা শুনতে যাবে না। এটা শুধু খোঁজখবর নেওয়া। মানুষ সেটাই করে যেটা সে করতে চাইছে, অপরের কথাতে কেউ কিছু করে না। আমরা প্রায়ই বলি, তোমার কথা মত করে আজ আমার এই দুরবস্থা। কিন্তু বাস্তবে এই জিনিস কখনই হয় না। রাজা দশরথ আর কৌশল্যার মধ্যে যে সংঘাত, এখানে শ্রীরামচন্দ্র কোনটা করলেন, যেটা তিনি করতে চাইছিলেন। যদি শ্রীরামচন্দ্রের জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকত, রাজ্যভার নেওয়ার বাসনা থাকত তাহলে কি বলতেন? আমি তো পিতার আজ্ঞা মত যেতে চাইছিলাম কিন্তু মা আটকে দিলেন, মায়ের আদেশ কি করে উল্লঙ্ঘন করি, ইত্যাদি। যখনই কেউ এসে বলে, বাবার কথায় করলাম, মায়ের কথায় করলাম, স্ত্রীর কথাতে করতে হল, বুঝে নিন সবাই মিথ্যা কথাই বলছে। সবাই যা করে নিজের ইচ্ছাতেই করে। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এখন ধর্মের সংঘাত এসে গেছে, কোনটা করবেন আর কোনটা করবেন না তাঁর কাছে কিছুই নয়। শ্রীরামচন্দ্রের একটিই ব্যক্তিত্ব, যে ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে এই একটি জিনিসের উপর, তা হল *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*। তিনি পিতাকে আগে কথা দিয়ে দিয়েছেন, এরপর মা যতই কান্নাকাটি করুন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে কোন ব্যাপারই নয়, তিনি এখন কাউকেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনবেন না। কৌশল্যা সত্যিই যদি প্রাণ দিয়ে দিতেন আজকে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের কত নিন্দাই না করতাম। কারণ মহাপুরুষদের নিন্দা করাটা আমাদের স্বভাবেই আছে। যাই হোক, লক্ষ্মণ সেখানে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিলেন। কৌশল্যার কথা শুনে লক্ষ্মণ প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলছেন –

উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্তিনম্।
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধুন মাতুলানপি।২/৪/১৫

লক্ষ্মণ প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হয়ে গেছে, চোখমুখ দিয়ে যেন আগুন বেরিয়ে আসছিল। লক্ষ্মণ বলছেন আমাদের বাবা উন্মত্ত হয়ে গেছেন, *ভ্রান্তমনসং*, তাঁর চিত্তের বিক্ষেপ হয়ে গেছে, তিনি নিজে ঠিক করতে পারছেন না কি করবেন আর কি করবেন না। আর বলছেন *কৈকেয়ীবশবর্তিনম্*, বাবা কৈকেয়ীর বশে এসে গেছে, আসলে বলতে চাইছেন কৈকেয়ীর কামে মোহিত। লক্ষ্মণ কৈকেয়ীকে আর মা বলেও সম্বোধন করতে পারছেন না। *বদ্ধা নিহন্মি*

ভরতং তদ্বন্ধুন মাতুলানপি, আমি এক্ষুণি রাজাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে কারাগারে বন্দী করে ভরতকে বধ করে দিচ্ছি আর ভরতকে তার মামারা বা কোন বন্ধুবান্ধব যদি রক্ষা করতে এগিয়ে আসে তাদেরকেও বধ করে দেব।

অদ্য পশ্যন্তু মে শৌর্য্যং লোকান পদহতঃপুরা।
রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমন্দিরম্.।২/৪/১৬

হে রাম! আপনি এবার আমার শৌর্য দেখতে থাকুন। আমি পুরো সংসারকে দগ্ধ করে দিতে পারি। এর আগেই বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থে লক্ষ্মণ তাঁর শৌর্য দেখিয়েছেন। আপনি অভিষেকের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন। আমার কার্যে যারাই বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আসবে তারা আমার অস্ত্রের আঘাতে শেষ হয়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণকে এই একবারই রাগতে দেখা যায় আর কোথাও এভাবে তাঁকে রাগতে দেখা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণে রাগের দিক থেকে লক্ষ্মণের নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি শ্রীরামচন্দ্রের থেকে অনেক বেশি। এমনকি শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে থাকার সময় থেকে থেকে কাতর হয়ে প্রচণ্ড দুঃখ করে হা-হুতাশ করতেন তখন লক্ষ্মণ তাঁকে বোঝাতেন, দাদা! আপনাকে আমি যা বলতে যাচ্ছি এগুলো আপনার কাছে উপদেশ মনে হবে কিন্তু আপনার কাছে যা শুনেছি সেগুলোই আপনাকে বলছি। আপনি এভাবে ভেঙে পড়বেন না, বা এভাবে রেগে যাবেন না। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রে যা হয়ে থাকে, ইষ্টকে বড় করার জন্য অন্যদের নামিয়ে দিতে হবে। পরের দিকে যত রামায়ণ লেখা হয়েছে, বিশেষ করে তুলসীদাসের রামচরিতমানস, এমনকি টিভি সিরিয়ালেও লক্ষ্মণকে দেখান হচ্ছে সব সময় যেন উগ্র মেজাজের, সব সময় যেন চটে আছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে লক্ষ্মণ এই একবারই খুব রেগে গেছেন। পরে আরেকবার সুগ্রীব রাজ্য পেয়ে কিছুই করছিল না, শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে পাঠিয়েছেন, সেখানে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে আদেশই দিয়েছেন সুগ্রীবকে একটু ধমক দিয়ে এস। লক্ষ্মণ এখানে একেবারে স্থির নিশ্চিত, এটাই রাজাকে বন্দি করে দেওয়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি, রাজবিদ্রোহ করার সময় হয়ে গেছে। লক্ষ্মণকে তখন শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর কয়েকটি কথা বলছেন।

এই জায়গাতে বাল্মীকি রামায়ণের বর্ণনা সত্যিই খুব চিত্তাকর্ষক। শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু এখানে পুরোপুরি স্থির অবিচল, শান্ত। দুঃখ সবারই হয় কিন্তু মহাপুরুষরা দুঃখকে সহজে শুষে নিতে পারেন, শ্রীরামচন্দ্ররেও দুঃখ যা হয়েছিল সেকেণ্ডের মধ্যে নিজেকে সোজা করে নিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন মাকে জিজ্ঞেস করছেন, লক্ষ্মণ যে কথাগুলো বলছে শুনে তোমার কি মনে হচ্ছে? কৌশল্যা তখন বলছেন, বাবা! লক্ষ্মণের কথাগুলো তুমি একটু ভেবে দেখ, ওর কথাগুলো যদি ঠিক মনে হয় তাহলে তাই কর। খুব দুঃখ করে কৌশল্যা বলছেন, সারাটা জীবন আমি কৈকেয়ীর গঞ্জনা, লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছি। কৈকেয়ী দেখতে রূপসী, রাজার প্রিয়তমা পত্নী, তার কথায় ওঠবোস করবেন নাতো আর কার কথায় করবেন। এখন ভাবলাম, তুমি বড় হয়ে গেছ, এবার রাজা হবে, আমার সুখের দিন খুব কাছে এসে গেছে মনে করে খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম। কিন্তু সেই আশাও অস্তমিত, তাই লক্ষ্মণ যা বলছে তুমি একটু ভেবে দেখ, তাই নাহয় করে দাও।

মানুষ নিজের টুকু ছাড়া জীবনে কোন কিছুকেই ভালোবাসে না। আজকে বলছি বটে কৌশল্যা একজন আদর্শ পত্নী, আদর্শ মা, আদর্শ নারী। মূল বাল্মীকি রামায়ণের সাহিত্যই ঠিক ঠিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিকতার দলিল, মানুষ এই মানসিকতা নিয়েই চলে। পরে ভক্তিশাস্ত্রে দেখাচ্ছে কেমন চলা উচিৎ। যেটা মানুষের স্বাভাবিকতা, যে ভাবে তার সব কিছু হচ্ছে, চলছে সেটাকেই বাল্মীকি চিত্রণ করেছেন, মানুষ মাত্রেই এই রকম। অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে অঙ্কন করেছেন, অবতার পুরুষরা এরকম হন না। অবতার পুরুষ কেমন হন জানার জন্য লীলাপ্রসঙ্গে, কথামৃতে যেতে হবে। ঠাকুর হৃদয়রামকে বলছেন, আমি রাগলে তুই চুপ করে থাকবি আর তুই রাগলে আমি চুপ করে থাকব, তা নাহলে খাজাঞ্চিকে ডাকতে হবে। ঠাকুরের প্রচণ্ড রাগ ছিল, আর রেগে গেলে যা ভাষা ব্যবহার করতেন আমরা তা উচ্চারণও করতে পারব না। ঠাকুরেরও মন খারাপ হত, ঠাকুরও হাসি-ঠাট্টা করতেন, সবই করতেন। অবতার পুরুষরা ঠিক এভাবেই চলেন। বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এটাই ঠিক ঠিক অবতার চরিত্রের প্রতিমূর্তি। পরের দিকে ভক্তিশাস্ত্রে বেশি সাদা রঙ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের চরিত্র পড়লে আমাদের মনে হয় আমরাও চেষ্টা করলে শ্রীরামের মত হতে পারব। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র পড়ার পর সবারই মনে হবে আমার দ্বারা কোন দিন শ্রীরামচন্দ্রের ধারে কাছে যাওয়া হবে না। এটা ঠিকই অবতারের মত আমরা কোন দিনই হতে পারব না। ঠাকুরের যে এত রাগ, এত মন

খারাপ হওয়া, এত কিছু এগুলো আমরা জানি কিন্তু ওই মুণ্ডুকাটা তপস্যা আমাদের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। আবার ঠাকুরের অনেক বিশেষ পছন্দের জিনিসও ছিল। এক জায়গায় ভোজ হচ্ছিল, খাওয়া-দাওয়া হতেই ঠাকুর উঠে পড়েছেন। একজন বলল আরও অনেক পদ আছে। ঠাকুর বলছেন আমার গলা পর্যন্ত হয়ে গেছে আর নামবে না। হঠাৎ একজন বলে উঠল জিলিপি আসছে। ঠাকুর তাড়াতাড়ি করে আবার বসে পড়লেন। তখন সবাই বলছে, এই যে বললেন গলা পর্যন্ত ভরে গেছে! ঠাকুর তাদের বলছেন, জিলিপি হল লাটসাহেবের গাড়ি, গ্রামের মেলায় লোকজন ভর্তি একটা পিঁপড়েও আর ঢুকতে পারবে না, কিন্তু যেই শুনল লাট সাহেবের গাড়ি আসছে সঙ্গে সঙ্গে সবাই সরে গিয়ে জায়গা করে দিল।

লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্রের আত্মতত্ত্বের উপদেশ

বাল্মীকি যেভাবে কৌশল্যাকে চিত্রণ করেছেন এভাবে এখানে করা যাবে না, ভক্তিশাস্ত্রে তিনি একজন আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী। সেইজন্য এখানে কৌশল্যাকে দিয়ে কিছুই বলানো হয়নি। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এখানে লক্ষ্মণকে যে কথাগুলো বলছেন, বাল্মীকিও ঠিক এই ধরণের কথাই শ্রীরামচন্দ্রের সংলাপে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এটা অধ্যাত্ম শাস্ত্র, এখানে যে ভাবকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ভাব আমাদের একেবারে তুঙ্গে নিয়ে চলে যায়। যাদেরই খুব দুঃখ-কষ্ট হবে তাদের এই কটি শ্লোক আঠারো থেকে তেত্রিশ পনেরটি শ্লোক নিয়মিত পাঠ করা উচিৎ। এই কটি শ্লোকের ভাবার্থকে গভীর ভাবে চিন্তন করতে পারলে দুঃখ-কষ্ট চলে যাবে। এই পনের ষোলটি শ্লোকে মানুষের পুরো মনস্তত্ত্বকে আর বিশ্বের সমস্ত বিষয়কে ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের অন্তর্জগতের বিকাশ কিভাবে হবে সেটাকে দেখতে হবে, অবতার যত বড়ই হোন তাতে আমার কি, বিল গেটস্ পৃথিবীর সব থেকে ধনী হতে পারেন তাতে আমার কি আসে যায়, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন তাতে আমার কি হল! আমার সদার্থক রূপান্তর চাই, আমার বিকাশ চাই। শ্রীরামচন্দ্র সতের নম্বর শ্লোকে শুরু করে আঠারো নম্বর শ্লোকে বলছেন –

শূরহোসি রঘুশার্দূল মমাত্যন্তং হিতে রতঃ।
জানামি সর্বা তে সত্যং কিন্তু তে সময়ো ন হি।২/৪/১৮

হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণ! আমি জানি তুমি একজন শূরবীর আর তুমি যে আমার পরম হিতকারী এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু যা করতে চাইছ এগুলো করার এখন সময় নয়। তুমি যে বলছ বাবাকে বধ করে দেব, ভাইকে কেটে দেব, ভরতকে যারা রক্ষা করতে আসবে তাদেরকেও উড়িয়ে দেব, এসব করার এটা সময় নয়। কেন সময় নয়?

যদিদং দৃশ্যতে সর্বং রাজ্যং দেহাদিকঞ্চ যৎ। যদি সত্যং ভবেৎ তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে।২/৪/১৯

ভাই লক্ষ্মণ! এই যা কিছু তুমি দেখছ, এই রাজ্য এই দেহ, এই সবই যদি সত্য হত, এখানে শব্দটা হল যদি *সত্যং*, যদি সত্যিকারের হত, তাহলে তোমার এই প্রয়াস, তোমার এই পরিশ্রম সার্থক হত। কত পরিশ্রম করতে হবে, দশরথের দেহরক্ষী আছে, চাইলেই তো দশরথকে টেনে কারাগারে বন্দী করে দেওয়া যাবে না। ভরতেরও দেহরক্ষীরা আছে, তাকেও সহজে মারা যাবে না, অনেক পরিশ্রম করতে হবে। ভরতের বন্ধুবান্ধবরাও কম না, তাদের মারতেও পরিশ্রম হবে। সেইজন্য বলছেন, এই যে দেহ, শ্রীরামচন্দ্রের এই দেহ আর এই অযোধ্যার সাম্রাজ্য যদি সত্য হত। এই সত্য মানে দেশতঃ, কালতঃ আর বস্তুতঃ এর দ্বারা যা কিছু সীমিত সেটাই অসৎ বাকি সব সৎ। অযোধ্যা রাজ্য দেশের দিকে থেকে সীমিত, অযোধ্যার বাইরে অযোধ্যা নেই। কালেও সীমিত, অযোধ্যা রাজ্যা আগে ছিল না, এখন আছে আগামী দিনে থাকবে না আর বস্তুত অবশ্যই, কারণ অযোধ্যা একটা রাজ্য। সেইজন্য অযোধ্যা সাম্রাজ্য অসৎ। সৎ বস্তুকে পরিভাষিত করা যায় না, কিন্তু অসতকে পরিভাষিত করা যায়। যা কিছুই *দেশতোকালতোবস্তুতঃ* পরিচ্ছিন্ন সেটাই সীমিত। সৎ আর অসতের এটাই শাস্ত্রীয় পরিভাষা। অযোধ্যা সাম্রাজ্য আর আমার শরীর যদি দেশ, কাল আর বস্তুতে পরিচ্ছিন্ন না হত তাহলে লক্ষ্মণের পরিশ্রম করাটা সার্থক হত। তাহলে পরিশ্রম সব সময় কিসের জন্য করতে হবে?

সত্যের জন্যই পরিশ্রম করতে হবে। সত্য মানে সত্য কথা বা সত্যবাদির সত্য নয়, সত্য মানে যেটা নিত্য, সনাতন, যে জিনিস বস্তুর দ্বারা, কালের দ্বারা আর দেশের দ্বারা বাধিত নয় সেটাই সত্য। ভগবান ছাড়া সত্য আর কিছুই হয় না। উনিশ নম্বর শ্লোকের বক্তব্য হল পরিশ্রম যদি করতে হয় ভগবানের জন্যই পরিশ্রম করতে

হবে। ঠাকুর খুব আফশোষ করে বলছেন, মানুষ টাকার জন্য মাগের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে ঈশ্বরের জন্য কেউ কাঁদে না। ঠিক তেমনি সব কিছুর জন্যই আমরা পরিশ্রম করি ঈশ্বরের জন্য কেউ পরিশ্রম করবে না। এই শ্লোকের একবারে সরাসরি প্রতিচ্ছবি ঠাকুরের কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যেখানে ঠাকুর বলছেন, যদি জানতাম জগৎ সত্য তাহলে কামারপুকুরকে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিতাম। ঈশ্বরের জন্য পরিশ্রম করার কথা যখনই বলা হয় তখন তা অবশ্যই আত্মজ্ঞানের জন্য পরিশ্রম করার কথা বলা হয়। শ্রীরামচন্দ্র যদি রাজ্য পেয়ে যান তাহলে লক্ষ্মণের কি আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে? যদি দশরথকে মেরে দিত, ভরতকে মেরে দিত তাহলে কি লক্ষ্মণের আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে? লক্ষ্মণের আত্মজ্ঞান কখনই হত না। ঈশ্বরের জন্য পরিশ্রম করা মানে ঈশ্বরের সেবা-পূজা করার কথাই বলা হচ্ছে না। ঈশ্বরের সেবা-পূজা করেও আত্মজ্ঞান হবে না। একজন পূজারী বছরের পর বছর ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের পূজা করে যাচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেমন বিষয়ী আর লোভী ছিল পঁচিশ বছর পরেও সেই বিষয়ী আর লোভী থেকে গেছে। আর কিছুক্ষণ আগেই কৌশল্য বিষ্ণুর পূজা, হোম করছিলেন, ব্রাহ্মণদের দান করলেন, ভগবানের ধ্যান করলেন কিন্তু তাঁর জীবনটা সম্পূর্ণ তছনছ হয়ে গেল। বক্তব্য এখানে একটাই, জীবনের উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা। এই আত্মজ্ঞানকে আমরা ঈশ্বর জ্ঞান বলতে পারি, ঈশ্বর দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞানও বলতে পারি। এবার আমরা যে কোন জিনিসের জন্য যখন পরিশ্রম করছি, কাজ করছি তার উদ্দেশ্য সব সময় থাকবে আত্মজ্ঞানের দিকে। ঈশ্বরের পূজা করছি তখনও উদ্দেশ্য হল আত্মজ্ঞান লাভ করা, জুতো সেলাই করছি, শিষ্য যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে আর আচার্য যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাচ্ছেন সেখানেও উদ্দেশ্য হবে আত্মজ্ঞান। সমস্ত কর্মের পেছনে এই উদ্দেশ্য যদি না থাকে তাহলে সব পরিশ্রমই বেগার খাটা। লক্ষ্মণ যদি ঈশ্বর জ্ঞানেও শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করতে চান তাহলে অযোধ্য নগরী নিয়ে তাঁর কি লাভ হবে। দক্ষিণেশ্বরে রাধাকান্তের গয়না চুরি হয়ে গেছে, ঠাকুর মথুরবাবুকে বলছেন, লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করেন তোমার কটা গয়না তাঁর কাছে মাটির ঢেলা। শ্রীরামচন্দ্র যদি ভগবান হন তাহলে লক্ষ্মণ তাঁকে কি রাজ্য দেবেন! প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরকে বলছেন কেশব সেনের নামটা যাতে থাকে তাই আমি এসব করছি। ঠাকুর বলছেন, তুমি সেটা করার কে, সেটা তিনিই করবেন।

আমরা কথামৃতই পড়ি, রামায়ণই পড়ি আর ভাগবতই পড়ি সবেতেই ঘুরে ঘুরে এই একটা কথাই আসে এই জগতে কোন কিছুই কিছু নয়। এমনকি ভগবানের পূজা, সেবাও কিছু নয়, কিছু হল একমাত্র আত্মজ্ঞান। যে কাজই করি না কেন, যদি দেখা যায় এই কাজ আমাকে আত্মজ্ঞানের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে ঠিক আছে, যদি না নিয়ে গিয়ে থাকে এবার তাহলে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে আমাকে কি করতে হবে। হৃদয়রাম ঠাকুরের কত সেবা করেছ কিন্তু শেষমেশ কি হল তার! অন্য দিকে লাটুও ঠাকুরের সেবা করলেন, কিন্তু তিনি মহাপুরুষ হয়ে গেলেন। অনেকে বলবেন মৃত্যুর সময় হৃদয়রামের জ্ঞান হয়েছিল। হিন্দু ধর্ম কখন মৃত্যুর ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্ম সব সময় জীবিতদের ধর্ম। খ্রীশ্চান, মুসলমানরা মৃত্যুর পরে স্বর্গে যেতে পারে, কাশীতে মৃত্যুর পরে স্বর্গে যায় কিন্তু একমাত্র হিন্দুদের দর্শনই হল জীবনমুক্তির দর্শন। জীবিত অবস্থায়, এই শরীরেই যদি মুক্তি না পেতে চায়, আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করতে যদি ইচ্ছা না থাকে তাহলে তার হিন্দু হওয়ার দরকার নেই। স্বামীজী বলছেন যদি কোন হিন্দু spiritual না হয় আমি তাকে হিন্দু বলে মনে করি না। Spiritual মানেই তাকে জীবনমুক্ত হতে হবে। গীতায় ভগবানও এই কথা জোরের সাথে বলছেন, *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*। স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী বারবার বলতেন এটাই আমাদের হিন্দু ধর্মের মর্ম, আর এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। কি উদ্দেশ্য? *ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো*, এখানে এই অবস্থায় তিনটে লোককে জয় করে নিতে হবে। কিভাবে? *যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ*, মনের মধ্যে সাম্য অবস্থা এনে। বেদান্তে মৃত্যুর পর কোন কিছুকে একেবারেই মূল্য দেয় না।

ঠাকুরের কাছে তিনজন 'হ' ছিলেন, হৃদয়রাম, হলধারী আর হাজরা, তিনজনই ঠাকুরের আত্মীয়, আর তিনজনেরই তিন রকম বিশেষত্ব, হৃদয়রাম সেবায় অর্থাৎ কর্মযোগ, হলধারী জ্ঞানযোগীদের মত সারাদিন শাস্ত্র পড়তেন আর হাজরা সব সময় জপ করে যেতেন মানে ভক্তিযোগের লোক। আবার তিনজনই ব্রাহ্মণ, তিনজনই দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, তিনজনই ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন, তিনজনের সাথেই ঠাকুরের রক্তের সম্পর্ক আর তিনজনই তিন মার্গের পথিক। শেষ পর্যন্ত তিনজনই গোলমেলে বেরোলেন। হলধারীও ঠাকুরকে গালাগাল দিচ্ছেন, হৃদয়রামও গালাগাল দিচ্ছেন আর হাজরাও ঠাকুরকে অপদার্থ বলে গালাগাল দিয়ে যাচ্ছেন। এবার এনাদের পাশাপাশি অন্য তিনজনকে দেখা যাক, লাটু সেবা করলেন, স্বামীজীর পাণ্ডিত্য আর রাজা মহারাজের ভক্তি। তিনজনই অব্রাহ্মণ, তিনজনই বাইরে থেকে এসেছেন, তিনজনই ঠাকুরের কেউ ছিলেন না, অথচ তিন জনই

কোথায় চলে গেলেন, অমর হয়ে গেলেন। অথচ ঠাকুরের নিজের লোক, আর ঠাকুরের দিনে সঙ্গ করেছেন, রাতে সঙ্গ করেছেন। আর একদিন দুদিনের জন্য নয়, দিনের পর দিন এভাবে ঠাকুরের সঙ্গ করেছেন। কি হল তাতে? কিছুই পরিবর্তন হল না, হলধারীর অহঙ্কার শেষ দিন পর্যন্ত থেকে গেল, হৃদয়রামকেও সরে যেতে হল আর হাজরাকেও সরে যেতে হল। এর আগে আমরা বলছিলাম, প্রত্যেকটি অবস্থায় জীবন আমাদের একটা সুযোগ দেয়, ওই সুযোগকে যে কাজে লাগাবে জীবন তাকে আরেকটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাবে। যদি কাজে না লাগায় তাহলে হয় ওখানেই ফেলে রাখবে তা নাহলে আরও নীচে পাঠিয়ে দেবে। শ্রীরামচন্দ্রের যিনি পূজা করছেন, সেবা করছেন তখনও তিনি ভাববেন এটাও আমাকে জীবন একটা সুযোগ দিয়েছে, এই পূজা সেবা করে আমাকে আরও উপরে যেতে হবে। কিন্তু রুটিন মাফিক যদি করে যায় তাতে কিছুই হবে না। আমাদের বেলুড় মঠে গর্ভ মন্দিরের যিনি পূজারী তাঁরও ওই ভাব, সেখানে তিনি দেখছেন আমি ঠাকুরের সাক্ষাৎ সেবক, তিনিই আমাকে এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছেন। তার মানে, তিনি ঠাকুরের নৈকট্যের একটা সুযোগ পেয়েছেন, ঈশ্বরের কাছে থাকার এই সুযোগকে তিনি যদি কাজে লাগান তিনি একটা অন্য অবস্থায় চলে যাবেন। অন্য দিকে কোন সন্ন্যাসী নেই যে যিনি বলেন না যে গর্ভ মন্দিরে গেলে গা শিউড়ে ওঠে। সবারই গা শিউড়ে ওঠে। যে কোন কাজের উদ্দেশ্য একটাই, আত্মজ্ঞান। লক্ষ্মণ যে বলছেন, বাবাকে বেঁধে জেলে বন্দী করে দেব, ভরতকে মেরে উড়িয়ে দেব এই কাজের সাথে আত্মজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, যদি তোমার এই কাজ শুদ্ধ কাজ হত, অর্থাৎ তোমাকে যদি ঈশ্বর জ্ঞানের দিকে নিয়ে যেত তাহলে এই পরিশ্রম সার্থক হত। কিন্তু এই জগতটা কি রকম?

ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্ত-লোহস্থজলবিন্দুবৎ।২/৪/২০

জগতের সমস্ত রকম ভোগ মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের চমকের মত ক্ষণস্থায়ী। ঠাকুর এই জিনিসটাকে অনেকবার অনেক ভাবে বলেছেন। সন্দেশ গলার নীচে চলে গেলে আর কিছুই বোঝা যায় না। ঘন কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যখন কড়কায় তখন অন্ধকারের মধ্যে একটা আলোর ঝলকানি নিয়ে আসে, কিন্তু ওই আলোর ঝলকানি ক্ষণিকের জন্য। জগতের সব ধরণের ভোগ বিদ্যুতের চমকের মত নশ্বর। তাহলে ভোগের পেছনে দৌড়ে আমাদের কি হবে! ভাগবতে বলছেন, মানুষ কত চেষ্টা করে যাতে দুঃখের মুখ যেন দেখতে না হয়, কিন্তু তাও তো দুঃখ আসে, ঠিক তেমনি সুখের চেষ্টা না করলেও সুখ আসবেই। তাই সুখ পাওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা আর দুঃখকে আটকানোর চেষ্টাটাও বেকার। পালা করে আমাদের জীবন সুখ আর দুঃখ আসছে আর যাচ্ছে, আমাদের কিছুই করার থাকে না। শুভকে ধরে রাখার চেষ্টা করলে ধরে রাখা যায় না, অশুভকে সরাতে চাইলে সরাতে পারি না। বিদ্যুতের মত সব ভোগ চঞ্চল, এই আছে এই নেই।

আয়ুরপ্যগ্নিসন্তপ্ত-লোহস্থজলবিন্দুবৎ, তপ্ত লোহার পাত্রে একটু জলের ছিটে দিলে ছ্যাঁৎ করে সেই জল মুহূর্তে কোথায় বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আমরা টেরও পাই না। আমাদের সবার আয়ুও তপ্ত লৌহ পাত্রে জলের ছিটে দেওয়ার মত। এই সৃষ্টি বিগ ব্যাঙ থেকে যে ব্ল্যাকহোলে যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা বলে এর আয়ু কত শত কোটি বছর, সেই হিসাবে আমাদের আয়ু আর কতটুকু। সাদা খাতায় একটা যদি লাইন টানা হয়, এই লাইনটা পৃথিবীর আয়ু, এই লাইনের মধ্যে আমাদের আয়ু কোথায় আছে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওরই মধ্যে কত অহঙ্কার, কত দাপট, আরও কত কি! এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথায় একটা সাধারণ ছায়াপথ, সেই ছায়াপথে কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অতি সাধারণ একটি নক্ষত্র হল সূর্য, সেই সূর্যের অত্যন্ত সাধারণ একটি গ্রহ পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে সাধারণ শহর কলকাতা, ওই কলকাতার কোন ঘুপচি গলির এক বাসিন্দা, তাতেই তার কত অহঙ্কার। অহঙ্কারের কারণ আছে, আমি শুদ্ধ আত্মা কিনা। সেইজন্য সব সময় মনে হয় আমার মত কে আছে! এতে কোন ভুল নেই। সমস্যা হল, আমি যে বিরাট কিছু, এই বিরাট কিছুর কারণ যেটা মনে করছি সেটাই ভুল। নীচু ক্লাশে যারা অঙ্ক ভালো পারে না, তাদের অঙ্কের উত্তরগুলো মুখস্থ করা থাকে। পরীক্ষার সময় ভুলে গেলে জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা কত বল দেনা। বলে দিল উত্তর দশ। এবার সে কোন রকমে মিলিয়ে দেবে। মাস্টারও চালাক, তাঁরাও ধরে ফেলেন উত্তরটা মেলান হয়েছে। উত্তরটা ঠিক মিলছে কিন্তু প্রসেসটা পুরো ভুল। আপনি যে গ্রেট, আপনি যে মহৎ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যেটার জন্য আপনি নিজেকে মহৎ মনে করছেন সেটার জন্য নন, আপনি মহৎ পুরো অন্য কারণে। এটাই এখানে বলছেন, তোমার আয়ু তপ্ত লোহার জলের ছিটে দেওয়ার মত, তোমার আবার কিসের গর্ব! তোমার ভোগ বিদ্যুতের আলোর ক্ষণিকে রেশের মত, তোমার কিসের গর্ব! কিন্তু আমি যদি সেই অনন্ত আত্মা হই

তাহলে সেই অনন্তের মধ্যে এই সৃষ্টি কিছুই না। একজন বদ্ধ জীব রূপে আপনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে একটা কণা মাত্র কিন্তু শুদ্ধ আত্মার দৃষ্টিতে আপনি হলেন অনন্ত আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার কাছে একটা কণা। আত্মার দৃষ্টিতে আপনার অহঙ্কার যথার্থ, এতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমরা অহঙ্কারকে জুড়ে রেখেছি ভুল জিনিসের সাথে।

অধ্যাত্ম রামায়ণের এই অংশটা খুবই সুন্দর। এখানে শ্রীরামচন্দ্র জগৎ ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্য দিয়ে শুরু করেছেন। যে কোন ধর্মের মূলে কিন্তু বৈরাগ্য থাকতে হবে। বৈরাগ্য না হলে ধর্মগ্রন্থও হবে না। আমার এটাও থাকবে, ওটাও থাকবে আর তার মাঝখানে ধর্মও আছে, এভাবে ধর্ম হয় না। আমেরিকায় প্রথমের দিকে স্বামীজীর মনে অনেক আশা ছিল। লোকেরা তাঁর কথা খুব মনযোগ দিয়ে শুনছে দেখে স্বামীজীর খুব ভালো লাগত। কিন্তু যা হয়, মানুষকে যখন একটা নাড়া দিতে শুরু করবেন তখন তার আসল রূপটা বেরিয়ে আসে। ঠাকুর বলছেন, একটু নাড়া দিলেই ভেতরের চুনোপুটি গুলো বেরিয়ে আসতে শুরু করে। প্রথমের দিকে ক্লাশে তারা খুব আগ্রহ নিয়ে স্বামীজীর লেকচার শুনতে আসতেন, তারপরে তাদের সাথে কথা বলতেই ভেতরের সব চুনোপুটি বেরোতে শুরু করল। কিছু দিন পর থেকেই স্বামীজী বিরক্তি অনুভব করতে শুরু করলেন। আমেরিকার সমাজের সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য বলে পরিচিতদের বাড়িতে ভালো ভালো অনেক কিছুই আছে তার মধ্যে ধর্মটাও আছে। শুধু বড়লোক বলেই নয়, যে কোন জিনিষে যদি কারুর বিশেষ কৃতিত্ব থাকে, নামকরা ফিল্মস্টার, খুব জনপ্রিয় গায়ক, বড় শিল্পী, বড় লেখক, যে কোন জিনিষে যদি বিশেষত্ব যার আছে তার দ্বারা ধর্ম আর হবে না। প্রথমে থেকে সাধনা করে যাঁরা এটাকে অন্য ভাবে নিয়ে এসেছেন, তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়। কারণ ধর্ম আর বৈরাগ্য দুটো হাত ধরাধরি করে চলে। বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম কখনই কল্পনা করা যায় না।

অধ্যাত্ম রামায়ণে যেখানে ঠিক ঠিক রামকথা শুরু হয় সেখানে বৈরাগ্য দিয়েই শুরু হয়। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই বৈরাগ্যের কথাই বলছেন, যদি জগতটা চিরস্থায়ী হত, যদি সত্য হত তাহলে তোমার এই পরিশ্রম সার্থক হত। আমাদের পেছনে এক অনন্তকালের ইতিহাস পড়ে আছে সামনে অনন্তকাল পড়ে আছে, মাঝখানে কয়েকদিনের জন্য এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে, সেই কয়েকদিনের জগতে আমরা কয়েকটি মুহূর্তের জন্য এসেছি আর এইটুকু সময়ের মধ্যে কত জ্বালা যন্ত্রণা, কত কষ্ট, কত মারামারি, কত মান-অভিমান। তাহলে কোনটা ঠিক? এটুকু সময়ের মধ্যে থেকে মারামারি করে বেঁচে থাকাটা ঠিক নাকি মারামারি না করাটা ঠিক? কিছু দিন আগে মহারাষ্ট্রের একজন চার কিলো সোনা দিয়ে একটা জামা বানিয়েছে, গিনেস বুকে তার নাম তোলার জন্য সে কয়েক কোটি টাকা দিয়ে একটা জামা বানিয়েছে। সবাই এক কোটি, দেড় কোটি দিয়ে গাড়ি কেনে, তাতে আর কি আছে, কিন্তু আমি চার কিলো সোনা দিয়ে একটা জামা বানিয়েছি। আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন জগতটা যদি সত্য হত তাহলে কামারপুকুরকে আমি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিতাম। আর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, জগতটা যদি সত্য হত তাহলে এই লড়াই করাটা সার্থক হত। এত শাস্ত্র পড়ার পরেও তো আমরা কত কিছুই করছি। দর্শনের দৃষ্টিতে তাহলে কোনটা ঠিক?

গীতায় ভগবান বলছেন *অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।।* তোমার জন্মের আগে তুমি অব্যক্ত ছিলে, মৃত্যুর পর আবার অব্যক্তে চলে যাবে, মাঝখানে এই কটি দিনের জন্য তোমার এত ভাবনা কিসের! আমরা সবাই আগে ছিলাম কি ছিলাম না জানি না, মরে গেলে কোথায় যাব তাও জানি না, কিন্তু এই কটি দিনের জন্য জগতে এসে কত খাটাখাটনি, কত দৌড়ঝাঁপ করছি কিন্তু তাও তো সুখ শান্তি পাচ্ছি না। এগুলো কি আমরা একটুও বিচার করে দেখি কখন? জিনিসটা এত সহজ নয়। আমরা সবাই সেই সচ্চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দের অংশ। আমি যদি সচ্চিদানন্দকে আমার প্রকৃত সত্তা বলে মেনে নিই তাহলে আমি হয়ে যাব অজর অমর। খুব নিম্নস্তরেও আমি যে সৎ, সৎ মানে চিরস্থায়ী, সনাতন, এই ভাবটা থাকছে। আত্মা রূপে আমরা চিরন্তন, চিরস্থায়ী এতে কোন সন্দেহ নেই, এই ভাবেরই ছিটেফোঁটা প্রতিচ্ছবি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে। কোথাও যেন আমাদের বোধ করাচ্ছে আমি চিরদিন থাকব, আমার মৃত্যু নেই। এখানে কোন ভুল নেই, কারণ মৃত্যু দেহেরই হয় আত্মা রূপে আমার মৃত্যু হয় না। ভগবান বলছেন *অব্যক্তাদীনি ভূতানি*, বলছেন না যে তুমি ছিলে না, তুমি থাকবে না। কারণ এটা গীতার দর্শন নয়, ভগবান বলতে চাইছেন যদি তোমার দর্শন এই রকম হয়। আবার যখন ভগবান বলছেন *জাতস্য হি ধ্রুবোর্মৃত্যো*, যে জন্মেছে সে মরবে, যে মরবে সে আবার জন্মাবে, এটাও গীতার দর্শন নয়। অর্জুনকে ভগবান বলছেন, অনেকগুলো দর্শন আছে, জড়বাদীদের মত হল কিছুই ছিল না, আমি জন্মেছি আমি মরে যাব, খেলা শেষ। তোমার যদি তাই মত হয় তাহলে তোমার এত মাথা

খারাপ করার কিছু নেই! পূর্বমীমাংসকদের মত যদি নাও, তুমি সেই আত্মা যে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে, মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে, স্বর্গে গিয়ে সুখ ভোগ করবে, ভোগ শেষ হয়ে গেলে আবার কোথাও গিয়ে জন্ম নেবে, তাহলে তোমার এত শোক মোহ করার কিছু নেই। কিন্তু গীতার মত হল শুদ্ধ অদ্বৈত, তুমিই সেই সনাতন আত্মা, যাঁর জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। যদি তুমি এটাকে মেনে নাও তাহলে তোমার এত শোক করার কোন কারণ থাকতে পারে না। মানুষের মনের গভীরে এই বোধটা কিন্তু আছে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি ঈশ্বরের অংশ। সেইজন্য এই বোধ তার সব সময় হয়, আমি মরব না। ঠিকই বলছে, আত্মা রূপে, সচ্চিদানন্দ রূপে তার কোন জন্ম নেই মৃত্যু নেই। এই ভাবটাই ছিটকে আমাদের দেহের উপর চলে আসে বলে এই গোলমালটা হয়। যার সঙ্গ করা হবে তার ভাব এসে যাবে। দেহ আত্মার সঙ্গ করছে বলে দেহরও আমি আত্মা এই বোধটা চলে আসে। যার জন্য দেহ মনে করছে আমি কখনই মরব না। সেখান থেকে এসে যায় কর্মবাদ বা পুনর্জন্মবাদ। আমি আজকে যা অর্জন করেছি, পরে আমি তা ভোগ করব, আজকে যা কর্ম করলাম এই কর্মের ফল আমি পরে ভোগ করব। হিন্দু ধর্ম এই মতকে পুরোপুরি মেনে চলছে।

সমস্যা হয় খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মে এসে। এদের কাছে জন্ম একবারের জন্য, ভৌতিকবাদীরা যেমন মনে করে কোথাও ছিলাম না, হঠাৎ জন্ম হয়ে গেছে। খ্রীশ্চানরাও তাই বলে, তাঁর ইচ্ছাতে আমি এই একটি জীবনই পেয়েছি। ইসলাম ধর্মও বলছে একবারের জন্যই আল্লার ইচ্ছায় আমি জন্ম নিয়েছি আর আল্লার কাজ করছি। তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এদের এত মারামারি, কাটাকাটি করাটা মানায় না। কিন্তু হিন্দুদের জন্য ঠিক আছে, কারণ তারা জানে আজ আমি যা করছি আগামী জন্মে আমি এটাই পাব। ঠাকুরও বলছেন, তবে কি জান, আগের জন্মে দান পূণ্য করা থাকলে এই জন্মে ঐশ্বর্য হয়। তাহলে কি আমরা সব কিছু এখন থেকে সঞ্চয় করে যেতে থাকব যাতে আগামী জন্মে ভোগ করতে পারি? টাটা বংশের একজন প্রচুর কাজ করে টাটা কোম্পানীকে দাঁড় করিয়েছে, আর ধরা যাক মৃত্যুর পর টাটা বংশেই আবার জন্ম নিয়েছে, তাহলে কি তার মনে থাকবে টাটা কোম্পানি আমি দাঁড় করিয়েছি? এখানে এসে হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য অন্যান্য ধর্মের তুলনায় স্পষ্ট বোঝা যায়। স্বামীজীও এই বৈশিষ্ট্যের উপর খুব জোর দিয়েছেন। ধর্মকে যে ঠিক ঠিক বুঝতে চায় তাহলে তাকে এই দু-তিনটে কথা মাথায় রেখে দিলে ধর্মও পরিষ্কার হয়ে যাবে আর জীবনটাও খুব সহজ হয়ে যাবে।

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ, সনাতন যখন ভাবছেন শরীর রূপেও আমি অনন্ত তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে যখন যায় তখন ঐটা কাটাকাটি হয়ে যায়। সেখানেও কোন সমস্যা নেই, কিন্তু যখন অন্য শরীরে যাচ্ছে তখন তার মনকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। মনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটা বেদান্তও পুরোপুরি মানছে, স্বামীজীও এর উপর বারবার জোর দিচ্ছেন। আমরা যে কাজই করছি সেই কাজের একটা ছাপ মনের উপর এসে পড়ে, ওই ছাপ মন থেকে কোন দিন মিটে যাবে না। রাজযোগ ও বেদান্ত শাস্ত্র এই দর্শনকে নিয়েই চলে। কিন্তু সাধারণ যে হিন্দু ধর্ম তাতে ভুলবশতঃ মনে করে আমি যদি কাউকে চড় মারি তাহলে পরের জন্মে সেও আমাকে চড় মারবে। হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন এই কথা বলে না। তাঁরা বলেন কাউকে চড় মারার প্রবৃত্তি যদি তোমার থাকে তাহলে বুঝতে হবে তোমার ভেতরে ক্রোধ বৃত্তির মাত্রাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরের জন্মে এই ক্রোধ বৃত্তি আরও বাড়তে থাকবে, হতে হতে একদিন তুমি ফেঁসে যাবে। ক্রোধ বৃত্তি প্রথমে মনের স্তরে থাকে কিন্তু বাড়তে বাড়তে এই বৃত্তি দৈহিক স্তরে নেমে আসে। দৈহিক স্তরে এসে গেলে এবার সেটা কার্যেও নেমে যেতে শুরু করবে।

মহাভারতে খুব সুন্দর বলছেন, যখন কেউ কোন পাপ কাজ করতে যায় তার আগে সে মনে মনে ভাববে। যেমন চুরি করার আগে তার মনের মধ্যে চুরির ইচ্ছা জেগেছিল, আমাকে চুরি করতে হবে। কিছু দিন পর মনের ভাবাটাই মুখ দিয়ে বেরোতে শুরু করে, আমার চারিদিকে অনেক দেনা হয়ে গেছে, এবার আমাকে চুরিই করতে হবে। লোকে কিছু বলবে না। তারপর সে চুরি করতে নেমে গেল। প্রথমবার চুরি করার সময় খুব ভয়, যদি ধরা পড়ে যাই কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার ভয়টা একটু কম হব, তৃতীয়বার আরও কমে যাবে, চতুর্থবার সাহস এসে গেল। কিন্তু একদিন সে ধরা পড়বে। আর যেদিন ধরা পড়বে সেদিন এতদিনের পুরো কর্মের বদলাটা নিয়ে নেবে। কর্মের বিধান অনুসারেই তার শাস্তি হবে। কর্ম কিভাবে চলে বুঝে নিতে পারলে পুরো শাস্ত্র বুঝতে আর কোন অসুবিধা হবে না। কারুর মনে কোন একটা দুর্বলতা আছে, যে জিনিসটা তার করা ঠিক নয় সেই জিনিসটাই করার ইচ্ছা ভেতরে জাগছে। যেমন সে মনে মনে চাইছে আমার একটা বড় বাড়ি হোক। তার বাড়ির লোক, বন্ধুরা সবাই বোঝাল এখন আর এত বড় বাড়ি করতে যেও না। কিন্তু বৃত্তিটা তার আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃত্তিটা এত

জোরাল ভাবে এসে গেছে যে এবার সে বলতে শুরু করল, যে করেই হোক, ঘুষ নিয়েই হোক, চুরি করেই হোক, ডাকাতি করেই হোক আমাকে এই বাড়ি বানাতেই হবে। এবার সে ধর্ম পথ ছেড়ে অধর্ম পথে নেমে পড়ল। বাড়ি তৈরী করতে যদি ঘুষ নিতে হয় তাহলে আমি ঘুষ নেবে। এবার ঘুষ নিতে শুরু করল। প্রথমবার ঘুষ নিতে গিয়ে হাত কাঁপবে, কেউ দেখে ফেলল কিনা এই ভয় করবে। মানুষ প্রথম কোন পাপ কাজ করতে গেলে তার পক্ষে কাজটা খুব কঠিন হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার গোলমাল করার সময় অনেকটাই সে সহজ হয়ে যায়, তৃতীয়বার ঘুষ নেওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায় আর চতুর্থবারে সে মনে করে এটা তার অধিকার। এই কর্মের জন্য তাকে এখানে আরও বেশি করে ফেঁসে থাকতে হবে। তার খারাপ কিছু হলে আমরা বলতে থাকি এত ঘুষ নিয়েছে যাবে কোথায়, এবার তার ফলভোগ তো করতে হবে। সারদা কেলেঙ্কারীতে মন্ত্রী, এমপি, আমলারা জেলে, আমরা মনে করছি এত লোকের চোখের জল। সাধারণ ভাবে কর্মবাদ বলতে এটাই বুঝি। কিন্তু পুনর্জন্মকে নিয়ে চলার সময় এই ব্যাখ্যা ঠিক হবে না। এখানে ব্যাখ্যা হল, যেদিন সে প্রথম ভুল কাজ করে দিল, এরপর তার দ্বিতীয়বার করাটা আরও সহজ হয়ে গেল। তৃতীয় ভুলটা আরও সহজ হয়ে যাবে আর চতুর্থ ভুলে গিয়ে সেটা তার অধিকারের মধ্যে চলে আসবে। এরপর তার মনটা নোংরা কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কাজে ফাঁকি মারতে ইচ্ছে হল, প্রথমবার ফাঁকি দিতে উশখুস করবে। দ্বিতীয়বার ফাঁকি দেতে সহজ হয়ে যাবে, তৃতীয়বার সবার সামনেই কাজে ফাঁকি দেওয়া শুরু করবে এইভাবে ধীরে ধীরে আলস্য তাকে গ্রাস করে তমোগুণের দিকে পুরোপুরি ঠেলে দেবে। এবার সে মারা গেল, মারা যাওয়ার পর সে যে শরীর পাবে তাতে তার ওই তমোগুণের মনটাই যাবে। যদি সে কিছু পূণ্য করে থাকে তাহলে মনুষ্য জন্ম পাবে, কিন্তু তমোগুণটা থাকবে। সে হয়ত একজন বড় রাজনৈতীক নেতার বাড়িতে জন্মাল, তখন কি হবে? পার্টির জন্য শুধু টাকা সংগ্রহ করে বেড়াবে। ঠাকুর বলছেন, একজন ধোপা মরে রাজকুমার হয়ে জন্ম নিয়েছে। বন্ধুদের সাথে খেলা করছে, রাজকুমার বলছে, তোরা কি খেলা খেলছিস, আমি একটা ভালো খেলা জানি, আমি উপুড় হয়ে শুই আর তোরা আমার পিঠে হুশ হুশ করে কাপড় কাচ। ঠাকুরের গল্পে এটাই দেখান হচ্ছে যে আমাদের সংস্কারগুলো একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে চলতে থাকে।

এবার আমরা যেখানে আলোচনা শুরু করেছিলাম সেখানেই ফিরে আসছি। যিনি শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ তিনি কিভাবে কিভাবে এই জগতের মধ্যে ঢুকে গেছেন। তাহলে জগতকে ভোগ করাই কি আমাদের উদ্দেশ্য হবে? কেউ নিষেধ করছে না, যত পারুন জগতকে ভোগ করতে থাকুন। কিন্তু চোখের জল যখন বেরোতে শুরু হবে তখন ঠেলা বোঝা যাবে। যদি মনে করেন, অনেক হয়েছে আর চোখের জল ফেলা নয়, আমার চোখের জলও চাই না, ঠোঁটের হাসিও চাই না। তাহলে আপনাকে এবার জগত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা মানে, যতটুকু নিজে থেকে আসছে ততটুকুর বাইরে আর হাত-পা ছুড়তে নেই। শ্রীরামচন্দ্র কেন বলছেন লক্ষ্মণকে যদি আমার শরীর আর অযোধ্যার সাম্রাজ্য সত্য হত তাহলে তোমার এই পরিশ্রম সার্থক হত? যদি এতটাই বৈরাগ্য হত তাহলে তো তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে রাজমহল ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি যুবরাজ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। রাজা দশরথের দেহাবসানের পর তিনি রাজা হবেন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন তিনি আপত্তি করছেন না। যেটা নিজে থেকে আসছে সেটাকে না করতে নেই। কিন্তু নিজে থেকে যখন পা বাড়িয়ে জড়াবেন তখন আপনি ফাঁসছেন। কোন দিকে ফাঁসছেন? মনের অধীনে। এবার মন দ্বারা শাসিত হচ্ছেন। দুজনের অধীনে শাসিত হতে হয়, আত্মার অধীনে শাসিত হওয়া আর মনের অধীনে শাসিত হওয়া। সব সময় চেষ্টা থাকবে যাতে আত্মার অধীনে থাক যায়। আত্মার শাসন সব সময় আসে শাস্ত্র থেকে। শাস্ত্র মানেই ত্যাগ, যত ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে তত আত্মার অধীনে চলে আসবে, ত্যাগ মানেই আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। মনের শাসন সব সময় হয় জড়ান থেকে, যত জগতের সাথে জড়াবে তত মন তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কায়েম করবে। আত্মার প্রশাসন সব সময় ত্যাগের উপর চলে আর মনের প্রশাসন জড়ানর উপর চলে। তাহলে শ্রীরামচন্দ্র যে যুবরাজ হতে চাইছেন সেখানেও কি জড়ান হচ্ছে? কখনই তা হচ্ছে না, ওনার মুক্তি উদ্দেশ্য নয়, তিনি ধর্ম, অর্থ আর কামের মধ্যে আছেন, তাই নিয়মানুসারে যা আসছে তাকে স্বাগত জানাতে কোন অসুবিধা নেই।

এখন নিয়মানুসারে কি কি আসছে? ধর্ম মতে পিতা আদেশ করছেন জঙ্গলে যেতে। অন্য দিকে লক্ষ্মণ বলছেন, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে দাও। এখানে বিষয় হল, জগতটা যদি সত্য হত তাহলে এগুলো করা যেত। কিন্তু আত্মা যেভাবে সত্য জগৎ সেভাবে সত্য নয়। মানুষ এখন যেভাবে জড়াতে চাইছে, তাতে সে মনের হাতে তার

প্রশাসনটা তুলে দিচ্ছে, এবার কিন্তু তাকে সমস্যায় পড়তে হবে। কারণ মনের উপর যে সংস্কারগুলো কাজ করবে সেই সংস্কারগুলো হল ভোগের সংস্কার, সংহারের সংস্কার, এই সংস্কার তাকে এবার বিপদের দিকে ঠেলে দেবে। ত্যাগের প্রশাসন যখন চলে তখন তা ধর্ম মতে চলে। খুব উচ্চমানের পরমহংস পরিব্রাজক সব কিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে যান। সাধারণ লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, তাদের ধর্ম মতে চলতে হয়। ধর্ম মতে যখন চলবে তখন এই কথাই এনারা বলবেন, যেটা আসছে ঠিক আছে, এর বাইরে বেশি দৌড়ঝাপ করতে যেও না। শ্রীরামচন্দ্র যে বলছেন এই জীবন যদি সত্য হত, জগৎ যদি সত্য হত তাহলে লক্ষ্মণ যা করতে চাইছে কোন আপত্তি থাকত না। তা সত্ত্বেও লক্ষ্মণ তাহলে কেন এই ধরণের কাজ করতে চাইছেন? কারণ লক্ষ্মণের মনে কোথাও এই বোধ হয়ে আছে, আমি অবিনাশী। কঠোপনিষদে বলছেন, *নিত্যোঽনিত্যানাং*, নিত্যের মধ্যে অনিত্য খেলা করে যাচ্ছে। আমরা স্বরূপতঃ নিত্য কিন্তু উপরে অনিত্যের খেলা চলছে। নিত্য আর অনিত্য অনেক দিন একসাথে থাকার জন্য অনিত্যের মধ্যেও নিত্যের বোধটা এসে যায়। এই বোধটা ভ্রান্ত, কিন্তু এই ভ্রান্তির জন্য আরও পাঁচ জনের ক্ষতি হয়ে যায় তাই তাকে আটকাতেই হবে। শ্রীরামচন্দ্র তাই লক্ষ্মণকে আটকাচ্ছেন। সবই অনিত্য নয়, অনিত্যের আধারটাই নিত্য, যে নিত্য আধার সেটাই আমি আপনি। আমরা নিত্য বলেই অনিত্যটাও নিত্য বলে বোধ হয়। তবে বিচার করতে করতে অনিত্য জিনিসটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকবে। যেমন যেমন চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাবে, অনিত্য ততই অনিত্য হতে শুরু হবে আর নিত্য তত নিত্য বোধ হতে থাকে। নিত্যকে নিত্য বোধ করলে শান্তি আর অনিত্যকে নিত্য বোধ করলে অশান্তি।

বাল্মীকি রামায়ণ এই ব্যাপারে অনেক বেশি সম্পূর্ণ। কারণ সেখানে মানুষের মনস্তাত্ত্বিকতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অবতারেরও যে দুঃখ হওয়ার কথা বাল্মীকি রামায়ণই সঠিক ভাবে দেখিয়ে দিয়েছে। পরে শ্রীরামচন্দ্রও অনেক দুঃখ অনুভব করছেন, লক্ষ্মণকে দুঃখ করে বলছেন, ভাই লক্ষ্মণ! সব সুখ ভরতই ভোগ করছে, যত দুঃখভোগ আমারই কপালে জুটল। শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তখন যদি লড়াই করে রাজ্য নিয়ে নিতেন তাহলে অশান্তিতেই মরে যেতেন। জীবন আমাদের প্রত্যকে পদে দুটো পথ খুলে দেয়। জীবন নিজে থেকে যে পথ দিচ্ছে সেই পথ যদি না নেওয়া হয় তখন সেটাই হয় পলায়নবৃত্তি। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে চৌদ্দ বছরের বনবাসের জন্য। এবার যদি তিনি মারামারিতে নেমে পড়তেন তখন সেটা পলায়নবৃত্তি হয়ে যেত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে শক্তির খেলা, কাপুরুষতার ঊর্ধ্বে তিনি। কিন্তু না, এটাই পলায়নবৃত্তি। কারণ জীবন শ্রীরামচন্দ্রকে যা দিতে চাইছে সেটাকে তিনি গ্রহণ করছেন না। সেটাকে কাটাচ্ছেন তাঁর শক্তি দিয়ে, তিনি সেটাকে শক্তি দিয়েই আটকান আর কাপুরুষতা দিয়েই আটকান জিনিসটা পলায়নবৃত্তি।

নিন্দুকরা, যাদের বুদ্ধি প্রাকৃতিক, যারা বুদ্ধিজীবি তারা শ্রীরামচন্দ্রের জঙ্গলে চলে যাওয়াকে পলায়নবৃত্তি বলবে। এরা কেউই ধর্মের গতি বোঝে না। ধর্মের গতি সব সময় বলে তোমার কাছে যেটা আসছে মাথা পেতে সেটা নিয়ে নাও। শেষ পর্যন্ত তাই হল, শ্রীরামচন্দ্রই রাজা হলেন, সেই ভরত তাঁর সেবক হয়ে থাকলেন। কিন্তু মহাভারতে কি হল! শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনদের বললেন, পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চাইছে দিয়ে দাও, তাই দিয়েই ওরা জীবন চালিয়ে নেবে। কিন্তু দুর্যোধন মানল না, বলল যুদ্ধ চাই। দুর্যোধনের এই সিদ্ধান্তই জীবন যেভাবে আসছে সেভাবে তাকে গ্রহণ করে নিতে পারল না, তাই জীবনও তাদের সবাইকে জগৎ থেকেই সরিয়ে দিল। ঠিক এই জায়গাতেই শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধ থেকে সরে গিয়ে যেটা আসছিল সেটাকে গ্রহণ করে নিলেন। জীবন শেষ পর্যন্ত সেটাই করে। ঠাকুর গল্প বলছেন, শাশুড়ী বৌমাদের মাটির সরাতে চাল মেপে দিত। তাতে বৌমাদের পেট ভরত না, আধপেটা খেয়েই থাকতে হত। একদিন কিভাবে সরাটা ভেঙে যায়। সরা ভেঙে যেতেই বৌমাদের খুব আনন্দ। শাশুড়ী বৌমাদের আনন্দ দেখে বলছে, যতই নাচ কোঁদ আমার হাতের আটকেল আছে। ভগবান যখন বিধাতা রূপে কাজ করেন, বিধাতার হাতের আন্দাজ আছে, তিনি যাকে যেটা যতটুকু দেবার ঠিক করে রেখেছেন, এবার সে যতই যা কিছু করে নিক না কেন ওর বেশি কেউ পাবে না। কোন কারণে তুমি যদি নিজের শক্তি বা মন্ত্রশক্তি বা অপরের শক্তি দিয়ে বিধাতার ওই আটকেল পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা কর তাতে পাল্টে হয়ত যাবে কিন্তু যতটা পাল্টাবে তার দ্বিগুণ তুমি হোঁচট খাবে। টলস্টয়ের একটা খুব সুন্দর গল্প আছে, একটা গাছে বিরাট একটা মধুর চাক আর তার উপরে একটা বড় কাঠ ঝুলছে। সেখানে একটা ভাল্লুক গেছে মধু খেতে। ভাল্লুক কাঠটাকে সরিয়ে মধু খেতে শুরু করেছে আর কাঠটা এসে আবার মধুর চাককে আড়াল করে দিয়েছে। যতবারই মধু খাওয়ার জন্য কাঠটা সরিয়ে চাকে মুখ দিতে যায় ততবার ঝুলন্ত কাঠটা এসে মুখের সামনে এসে আড়াল করে দেয়। ভাল্লুক তখন বিরক্ত হয়ে কাঠটাকে

টেনে অনেক দূর সরিয়ে দিয়ে আরামসে মধু খেতে শুরু করেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মোটা কাঠটা এমন জোরে ওর মাথায় এসে আঘাত করল তাতেই ভাল্লুকটা মরে গেল। টলস্টয়ের একটা বিরাট বড় কাহিনীর এটা ছোট্ট একটা অংশ। জীবনেও তাই হয়, ঝঞ্ঝাট, বিঘ্ন যখন আসে আমরা ঠেলে সরিয়ে দিতে যাই, যত হাল্কা ঠেলব তত কম দূরে যাবে, যত জোরে ঠেলব তত বেশি দূরে যাবে, কিন্তু ঘুরে যখন মারবে তখন এমনিতে যত জোরে মারার ছিল তার হাজার গুণ জোরে ঘুরিয়ে মারবে। উপমা দিয়ে কখন সত্যকে স্থাপিত করা যায় না, গল্পের গরু গাছে ওঠে। টলস্টয়ও ওভাবেই বানিয়েছেন, এটা একটা উপমা, কিন্তু জীবনে বাস্তবিক যা হওয়ার এভাবেই হয়। যখন আমরা ঝামেলাকে সরাতে যাব, যত জোর সরাব তত দূরে চলে যাবে আর কিছুক্ষণ পরে সে তত জোরে আমাদের মারবে। শ্রীরামচন্দ্র দেখছেন একটা ঝামেলা এসে গেছে, তিনি বুঝতে পারছেন ধাক্কা মেরে কোন লাভ নেই। ঝড় এসে গেলে মুখ বুজে পড়ে থাকতে হয়, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

অধ্যাত্ম রামায়ণের এই শ্লোকটি অত্যন্ত উচ্চমানের জীবন দর্শনকে নিয়ে বলছেন। কর্মবাদের কার্য কারণ সম্পর্ক দিয়ে যদি খুব ভালো করে বিচার করা হয় তাহলে কোথাও আমরা কোন কারণ পাই না যার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে এই ঝামেলা আসার কথা, কোথাও কোন কারণ নেই। জীবনে তিনি কোন পাপ করেননি, কাউকে ঠকিয়ে কিছু আদায় করেননি, সবার প্রতি তাঁর সমান ভালোবাসা, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাও কেন এই বিপত্তি? কিছুই না, সব এলেমেলো ব্যাপার, কোন কিছু দিয়েই কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। বিধাতার মনে কি আছে, কেন করছেন আমরা জানি না। আমরা ততটুকুই জানি যতটুকু আমাদের সামনে আসছে, ভেতরে কি আছে আমাদের জানার কথা নয়। যতটুকু এসেছে ওর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া হবে ঠিক মেপে ততটাই। যদি তার বেশি করতে যাওয়া হয় আরও ঝামেলা আসবে।

শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণকে যে এত কথা বলছেন অন্য কোন লোক হলে তিনি এত কিছু এভাবে বলতেন না। সুগ্রীব যখন বলছেন দাদা বালি আমার স্ত্রীকে কেড়ে নিয়েছে, আমাকে মেরে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, ঠিক আছে বন্ধু আমি আছি তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, আমি কথা দিচ্ছি বালিকে আমি বধ করে দেব। তখন শ্রীরামচন্দ্র এর আগে লক্ষ্মণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই উপদেশ সুগ্রীবকে দিচ্ছেন না। সুগ্রীবকে তো বলছেন না যে, তোমার স্ত্রী অনিত্য, তোমার রাজ্য অনিত্য। শ্রীরামচন্দ্র বালিকে শেষ পর্যন্ত বধ করে দিলেন। সুগ্রীব এই কথা নিতেই পারবে না, সে মরেই যেত যদি এই কথা তাকে বলা হত। সব কথা সবাইকে বলা যায় না, আধার বুঝে বলতে হয়। কিন্তু জীবন সব সময় আমাদের ত্যাগের পথ অবলম্বন করার শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। যে ত্যাগের শিক্ষা পায় না, তাকে মৃত্যু শেষ দিন ঠ্যাং ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়, পেছনে তার সব কিছু পড়ে থেকে যায়। আর তার যে অত্যন্ত প্রিয় শরীর সেটাও পড়ে থেকে যায়। এভাবেই একটার পর একটা জন্ম আর মৃত্যুকে সে অতিক্রান্ত করে চলে, কিন্তু তাও ত্যাগের শিক্ষা নেবে না। কারণ কোথাও তার মধ্যে সেই নিত্যের ভাব থেকে গেছে কিনা। *ভোগা মেঘবিতানস্থবিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ,* জীবনে দুঃখ-কষ্ট ছাড়া কিছু নেই কিন্তু ওই দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ঘন কালো মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকানোর মত একটা আনন্দের ঝিলিক দিয়ে ওঠে। জীবনে ওই অতটুকু আনন্দের জন্য আমরা কত কি করছি। শুধু তাই না –

যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনাগ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান।২/৪/২১

একটা সাপ ব্যাঙ ধরেছে, সাপের মুখে ব্যাঙ কিছুক্ষণের মধ্যেই সাপের পেটে চলে যাবে, ব্যাঙটা একটা ফড়িং দেখেছে, ফড়িং দেখে তখনও সে আশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এটাকে যদি আমি খেতে পারতাম। বাস্তবিক তাই হয়, ব্যাঙ বুঝতে পারছে তাকে সাপে ধরেছে, সে আর চলতে পারছে না। অন্য দিকে ব্যাঙের যে শরীরের ধর্ম, ইন্দ্রিয় তাকে একটা সূচনা দিয়েছে, ফড়িং বসে আছে, নার্ভাস সিস্টেম সঙ্গে সঙ্গে বলছে এটা আমার খাদ্য। আগে হলে সে তিড়িং করে লাফিয়ে ফড়িংটা ধরে নিত। কিন্তু এখন সে লাফাতে পারছে না, সাপের মুখে আটকে আছে। সে এখন আরেকজনের খাদ্য হয়ে গেছে, কিন্তু তখনও সে লোভের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমাদের সবারই ব্যাঙের মত অবস্থা, মৃত্যু আমাদের ধরে রেখেছে, বন্ধন ছাড়া আমাদের কিছু নেই। ছোটবেলায় মেলায় যাওয়ার কথা হলে মনে হত যেন উড়ে চলে যাই, কিন্তু শরীর একটা বন্ধন, ব্যাধি একটা বন্ধন, ক্ষুধা তৃষ্ণা একটা বন্ধন, কত রকম কর্তব্যের বন্ধন, শুধু বন্ধন আর বন্ধন। এত বন্ধনের মধ্যেও মানুষ ভোগের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে, ইস্ এটা যদি আমার হত! *লোকো ভোগানশাশ্বতান্*, অশাশ্বত ভোগের দিকে মানুষ ঠিক সেভাবে তাকিয়ে আছে যেভাবে ব্যাঙ ফড়িংএর দিকে তাকিয়ে আছে অথচ সে নিজে সর্পের মুখে বন্দী হয় আছে। আমরা যখন অপরের দিকে তাকাই তখন তার ব্যাপারে আমাদের নশ্বরতা বোধ হয়, যখন নিজের দিকে তাকাই তখন আমাদের ব্যাপারে অনশ্বরতা বোধ হয়, এটাই মজার। যখন সাপের মুখে ব্যাঙের কথা ভাবছি তখন মনে করছি ব্যাঙটা কি বোকা, মরতে যাচ্ছে তখনও ফড়িংএর দিকে তার লোভের দৃষ্টি। ভোগবাদীরা বলবে, মরে যাবে তো কি আছে, ভালো খেয়েদেয়েই তো মরল। প্রবাদেই আছে বোষ্টম মরে নেয়ে আর সাধু মরে খেয়ে। বৈষ্ণবরা শুচি-অশুচি বিচার করতে করতে সারাদিন স্নানই করে যায়, আর বেদান্তী সন্ন্যাসীরা খেতেই থাকে আর খেয়েই মরে। বিষয় হল মৃত্যুকে ভয় পাওয়ার কি আছে। ভোগবাদীরা মৃত্যুকে যে দৃষ্টিতে দেখে বেদান্ত কিন্তু সেই দৃষ্টিতে নেয় না। স্বামীজী বলছেন, এই জগতটা একটা জিমনাসিয়াম, এই জিমনাসিয়ামে আমরা মনটা তৈরী করতে এসেছি। ভোগ যেমন আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে ত্যাগও আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, যখন লড়াই করতে হচ্ছে তখন সেই লড়াইও আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে, ভালো-মন্দ যা কিছু আসছে সবই আমাদের কিছু না কিছু শিক্ষা দিচ্ছে। প্রত্যেক দিন যদি আমরা একজন ভালো মানুষ না হতে থাকি, ভালো মানুষ বেদান্তের দৃষ্টিতে, তাহলে সেই বিদ্যা বিফলে যাবে। এই পুরো প্রক্রিয়া যেটা চলছে, এই প্রক্রিয়াতে আমাদের আরও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বান হতে হবে। আমাদের বিচার করতে হবে, সারাদিন আমি যা করছি এতে আমার ব্যক্তিসত্তাকে কতটা শক্তিশালী করছে, এই কাজ করে আমি কি আরও ভালও একজন নাগরিক হতে পেরেছি, যিনি শিক্ষক তিনি কি একজন আরও ভালো শিক্ষক হতে পেরেছেম, যিনি অফিসে কাজ করছেন তিনি ভাববেন এই কাজ করে কি আমি কি আরও ভালো একজন নিষ্ঠাবান কর্মচারী বা অফিসার হতে পেরেছি। তা যে ধরণের শক্তিই হোক না কেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যদি শক্তিশালী হয় সেটাও ভালো, জাগতিক দৃষ্টিতে যদি শক্তিশালী হয় সেটাও ভালো, কারণ কিছু দিন পর এসব করতে করতে বৈরাগ্য এসে যাবে। পড়াশোনা করে যদি জ্ঞান অর্জন করে থাকে সেটাও ভালো। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যে কাজই করি না কেন, দেখতে হবে সেই কাজটা যেন আমার শক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

করোতি দুঃখেন হি কর্মতন্ত্রং শরীরভোগার্থমহর্নিশং নরঃ।
দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষতে কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে।২/৪/২২

মানুষ দিবারাত্র কত কষ্ট করে খেটে যাচ্ছে শুধু যাতে তার ভোগের পুর্তি হয়। কিন্তু মানুষ যদি একবার বুঝে নেয় তার এই শরীর আত্মা থেকে ভিন্ন, তখন ভোগের দিকে তার দৃষ্টিই থাকবে না। ভোগ না থাকলে সব অশান্তিও মিটে যাবে। আমরা চাইছি আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ব্যক্তিত্বের বিকাশ কি করে হবে! আমাদের সবারই আমিত্বটা ছড়ানো। একজন গৃহিণীর আমিত্ব তার স্বামীতে, তার সন্তানে ছড়িয়ে আছে, নিজের যে ঘরবাড়ি আছে সেখানে ছড়িয়ে আছে, তার নিজস্ব কিছু হবি আছে তাতে ছড়িয়ে আছে, তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনে ছড়িয়ে আছে। তাহলে একজন গৃহিণীর আমিত্ব ঠিক কোনটা? আমার সব কিছুই আমার আমিত্বের ভাব। পুকুরের জলে সবুজ শ্যাওলা যেমন ছড়িয়ে পুকুরকে ঢেকে রাখে, ঠিক তেমন আমাদের আমিত্ব শ্যাওলার মত সারা জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। পুকুরের শ্যাওলাকে কখনই এমনিতে পরিষ্কার করা যাবে না। পরিষ্কার করতে হলে কাপড় দিয়ে পুরো শ্যাওলাকে একটা জায়গায় টেনে নিয়ে আসতে হবে। আমিত্বকে যখন সব কিছু থেকে টেনে সরিয়ে এনে একটা জায়গায় জড়ো হয়ে যাচ্ছে তখন তার শক্তি বাড়ছে। এবার সে যদি আধ্যাত্মিক পুরুষ হতে যায়, তাহলে ঐ আমিত্বকে উপড়ে ফেলে দিলে সে আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবে। আর যদি উপড়ে না ফেলে জগতের বন্ধনেই পড়ে থাকবে, খুব জোর একজন শচীন তেণ্ডুলকারের মত নামকরা কিছু হয়ে চিরদিনের জন্য থেকে যাবে। অমিতাভ বচ্চন তাঁর আমিত্বকে সরিয়ে শুধু অভিনয়ের জগতে জড়ো করেছেন, কিন্তু ওই আমিত্বকে এবার যদি তিনি উপড়ে ফেলেন তাহলে তিনি একজন বিরাট আধ্যাত্মিক পুরুষ হয়ে যাবেন। কিন্তু পারবেন না, একজন নাম্বার ওয়ান অভিনেতা হয়েই থেকে যাবেন। আপনি নিজের একটা শক্তিশালী আমিত্বকে সৃষ্টি করুন, আমিত্ব সবারই মধ্যে আছে কিন্তু ছড়িয়ে আছে। এই ছড়ানো আমিত্বকে যদি গুটিয়ে এনে উপড়ে ফেলে দিয়ে ঠাকুরের পথে চলে যায়, সে তখন একজন মহাত্মা হয়ে যাবে। আর উপড়ে যদি না ফেলতে পারে বা না ফেলতে চায় জগতে একজন সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে থেকে যাবে। বিল গেটস, গুগুলসের যিনি প্রতিষ্ঠাতা এরা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে গেছেন, অন্য দিকে স্বামীজীর মত মহাপুরুষরা ওই আমিত্বটাকে উপড়ে ফেলে দিলেন, ওনারা তাই ঘরে ঘরে

পূজিত হচ্ছেন। বাকিরা তাহলে কি? এদের আমিত্ব বলে কিছু নেই, একটা কথা আছে যেখানে বলছে Patriotism is the last refuge of scoundrels। যারা বদমাইশ লোক তারা সবাই patriot হয়ে যায়, রাজনৈতিক লোক হয়ে যায়। বৃটিশ পার্লামেন্টিয়ারদের নামে ব্যঙ্গ করে এই কথা বলা হয়েছিল। বৃটিশ এমপিরা বদমাইশি করে বলত আমি এটা দেশের হিতের জন্য করেছি। এই যে নানা ধরণের মানুষ নানান রকম কথা বলছে, নেতারা বদমাইশি করে বলছে আমি দেশের জন্য কাজ করছি, সাধুরা বলছে আমি সঙ্ঘের জন্য কাজ করছি, আমি আমার পরিবারের জন্য কাজ করছি বা পাড়ার লোকেদের জন্য কাজ করছি। খোঁজ নিলে দেখা যাবে সবাই গোলমেলে, ভেতরে কোন দম নেই। তুমি নিজে আগে ভেতরে কিছু শক্তি অর্জন কর, তোমার ছড়ানো আমিত্বকে গুটিয়ে একটা জায়গায় আগে নিয়ে এসে কিছু ক্ষমতা অর্জন কর। তোমার মধ্যে যদি ওই শক্তি হয় জগৎ তোমাকে গুরুত্ব দেবে, আর ওই শক্তিকে যদি উপড়ে ফেলে দাও জগৎ চিরকাল তোমার পূজা করবে।

মানুষ শুধু সুখের পেছনে ছুটে চলেছে, একবারও ভাবছে না আমি কোন সুখের পেছনে দৌড়াচ্ছি, দু পয়সার সুখ আর দু দিনের সুখ। কলকাতার ছেলেরা আজকাল একটা শব্দ ব্যবহার করে। কোথায় যাচ্ছিস জিজ্ঞেস করলে বলবে, এই একটু মস্তি মারতে যাচ্ছি। মস্তি মারতে যাওয়ার অর্থ হল, এখান থেকে বাসে করে বা বাইকে একটু দূরে যাবে, সেখানে গিয়ে ফুচকা খাবে, ঝালমুড়ি খাবে এটাই মস্তি মারা। বেলুড়ের ছেলেরা হয়ত দক্ষিণেশ্বর গেল আর দক্ষিণেশ্বরের ছেলেগুলো বেলুড়ে যাচ্ছে। বড় হয়ে যাওয়ার পর এই মস্তিটাই থাকে কিন্তু আকারটা একটু পাল্টে যায়। কিন্তু তার জন্য কি খাটান খাটতে হচ্ছে। কারণ আমরা শরীরটাকেই সত্য মনে করছি। একবার যদি আত্মাকে সত্য বলে মনে করে নেয় মস্তি মারার ইচ্ছেটাই চলে যাবে। তাহলে কি দেহের কোন দাম নেই? সাংঘাতিক দাম আছে, এই দেহ ঠিক আছে বলে মনটা সুস্থ আছে। দেহের কিছু হলে মনটাও খারাপ হয়ে যায়। মন যদি প্রচণ্ড শক্তিশালী না হয়, ও কোন দিন আমাদের ছাড়বে না, আঁকড়ে ধরে রাখবে। সবল মন কখনই আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখবে না। যে দুর্বল সেই আঁকড়ে ধরে রাখে। মন যেই সবল হয়ে যায়, যখন সে বুঝে যায় আমি সব কিছু পেতে পারি তখন সে আমাকে ছেড়ে দেবে। কেউ যদি আত্মজ্ঞান পেতে চায় তার মনকে আগে প্রচণ্ড শক্তিশালী হতে হবে। ছেলে আর মেয়ের মধ্যে ঝামেলা হলে যে শক্তিমান সে একজনকে ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যে দুর্বল সে কাঁদতে থাকে, তুমি আমাকে ছেড়ে দিলে! তার যদি শক্তি থাকত সে বলত, ছেড়ে গেছে তো গেছে, আমার নিকুচি করেছে। মন শক্তিশালী হওয়ার জন্য সুস্থ শরীর দরকার। লিকলিকে পেট রোগা শরীর আবার ভোঁদকা ভেদভেদে শরীর এদের মনও ঐ রকমের হয়, এদের দ্বারা কিছু হয়ও না। এরাই আবার ভোগের পেছনে দৌড়াবে, নিজে পাবে না, যারা পাচ্ছে তাদের দেখে গা জ্বালা করবে, তাদের নামে আবার সারা জগতে নিন্দা করে বেড়াবে। এগুলো বুঝে নেওয়া তো দূরের কথা, তুমি এখনই বোঝার চেষ্টা শুরু করে দাও যে, আমার যে আসল আমি সেটাই শুদ্ধ চৈতন্য, তখনই তোমার অনেক কিছুই পাল্টাতে শুরু করে দেবে। আমাদের আমিত্বকে দেহ মন থেকে সরিয়ে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য। যাঁরা এখানে দিনের পর দিন শাস্ত্রের আলোচনা শুনছেন তাঁদের কোথাও একটা আনন্দের অনুভূতি হচ্ছে বলেই শুনতে আসছেন। এখানে শ্রোতাদের আমিত্ব দেহ থেকে আলাদা হয়ে কোথাও আত্মাতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। সমাধিতে যে ধরণের আনন্দ হয়, শাস্ত্রে ডুব মারলে ওই আনন্দেরই কাছাকাছি আনন্দ হয়। পরের শ্লোকে অত্যন্ত কঠোর কথা বলছেন কিন্তু একেবারে সত্য –

পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃ-দারবন্ধ্বাদিসঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তুনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ।২/৪/২৩

আগেকার দিনে, আর এখনও অনেক জায়গায় দেখা যায় জঙ্গলে বড় বড় কাঠকে নদীরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সাইজের কাঠ এখন নদীর জলে নিজের মত ভাসতে ভাসতে চলতে থাকে। দেখা যায় কয়েকটা কাঠ জলের প্রবাহে কাছাকাছি এসে যায়, কিছু দূর একভাবে চলার পর জলের প্রবাহেই আবার তারা পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে ভেসে যায়। আলাদা হয়ে এই কাঠ আবার আরেকটা কাঠের সাথে মিশছে, অন্য কাঠও অন্য আরেকটা কাঠের সাথে মিশছে। কিছু দূর যাওয়ার পর এরাও আবার এক অপর থেকে আলাদা হয়ে যায়। আমরা যাকে বাবা বলছি, যাকে মা বলছি, ভাই বলছি, বোন বলছি, স্ত্রী বলছি, যাকে পুত্রাদি বলছি, যাদের বন্ধু বলছি, যাই বলি না কেন, সবাই এই নদীর প্রবাহে কাঠের মত ভেসে চলেছে, এই কাছে এল আবার এই আলাদা হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

আমরা যদি কিছুক্ষণের জন্য পুনর্জন্মবাদকে মেনে নিই আর সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত আমার আপনার যত জন্ম হয়েছে, সব কটা জন্মকে যদি আমরা ফরাক্কা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত গঙ্গার যে দূরত্ব এই দূরত্বের মধ্যে ধরে নিই, তাহলে আমাদের এক একটা জন্ম দু-তিন মিনিট করে থাকছে, তার থেকে কম বই বেশি হবে না। কয়েক কোটি বছরকে যদি কয়েক ঘন্টার মধ্যে নামাতে চাই তখন ওই টাইম স্কেলে এক একটা জন্ম কয়েক মিনিট করেই হবে। এবার আজকের এই মুহূর্তে আপনি নিজেকে ভাবুন, আপনার বয়স এখন পঞ্চাশ, আপনার বিবাহ হয়েছে সাতাশ বছর বয়সে। স্ত্রীর সাথে আপনি তেইশ বছর আছেন, আর আপনি যদি আশি বছর জীবিত থাকেন তাহলে তেইশ বছরটা বেড়ে তিপান্ন বছর হবে, তার আগে স্ত্রী যদি মারা যায় সেটা আলাদা ব্যাপার হয়ে যাবে। ধরে নিলাম তিপান্ন বছর আপনাদের বিবাহিত জীবনের স্থায়ীত্ব। এবার একবার ভাবুন আপনার কোটি কোটি বছর জীবনের স্কেলে এই তিপান্ন বছর কতক্ষণের জন্য দাঁড়াবে? কয়েকটা সেকেণ্ডের জন্য দাঁড় করান যাবে। নদীর বেগে দুটো কাঠের টুকরো ভেসে চলে যাচ্ছে, যতক্ষণের জন্য কাছাকাছি এল ততক্ষণের মধ্যেই আবার জলের প্রবাহে আলাদা হয়ে গেল। যে বাবা-মার সঙ্গে আছি ওটা কয়েকটা দিনে গিয়ে দাঁড়াবে। এর আগের জন্মে যাদের সাথে ছিলাম সেটাও কয়েক দিনের জন্য, তার আগের জন্মে যাদের সাথে থাকতে হয়েছিল সেটাও কয়েকটা দিন। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এটাই বলছেন, জীবনের দিকে যদি তাকাও তখন এটাই তুমি দেখবে, পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নী, বন্ধুর মধ্যে যে সম্বন্ধ হচ্ছে এই সম্বন্ধ যেন নদীর জলে ভাসমান কাষ্ঠরাশির মিলনের মত ক্ষণস্থায়ী। যে কাছে এল তাকে নিয়ে বেশি আনন্দ করারও যেমন কিছু নেই আর যার সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে তাকে নিয়ে দুঃখ করারও কিছু নেই। এরপর আবার শ্রীরামচন্দ্র জীবনের অনশ্বরতাকে নিয়ে বলছেন –

ছায়েব লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা তারুণ্যমম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ।
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ।২/৪/২৪

লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন সম্পদ ছায়ার মত চঞ্চল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ছিল রাজা, আমেরিকার তখন কিছুই ছিল না। সেখান থেকে কয়েক দিনের মধ্যে আমেরিকা কোথায় চলে গেল আর ইংল্যাণ্ডকে আমেরিকার দালালি করা শুরু করতে হল। যৌবন জলের তরঙ্গের মত অস্থির, স্ত্রীর সাথে পুরুষ যে সুখের কল্পনা করে সেই সুখ স্বপ্নের মত মিথ্যা। টাকা-পয়সা তাও কয়েক বছর থাকে, কিন্তু সেই তুলনায় নারীর যৌবন কদিন আর স্থায়ী হয়! আর বলছেন আয়ু আমাদের অত্যন্ত অল্প। অথচ মানুষের মধ্যে কত অহঙ্কার, নিজেকে কত শক্তিমান ভাবছে। অনিত্যকে ধরেই মানুষের যদি এত অহঙ্কার হয়, নিজেকে এত শক্তিমান ভাবে তাহলে নিত্যকে ধরলে কোথায় চলে যাবে ভাবা যায়! শ্রীরামচন্দ্র পর পর কয়েকটি শ্লোকে দেহ, জীবন, জগতের নশ্বরতা, অনিত্যতার কথা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। এরপর ২৯ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে।২/৪/২৯

জরা একটা বাঘিনীর মত সবাইকে সামনে থেকে ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে। মানুষ তার বৃদ্ধাবস্থাকে খুব ভয় করে। হিন্দু সমাজ বৃদ্ধাবস্থাকে সম্মান দেয়, কিন্তু অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় বৃদ্ধাবস্থাকে খুব অবহেলার চোখে দেখা হয়। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থা, জরা মানুষের কাছে সব সময় ভয়ের, কারণ সারা জীবন যেগুলোকে আঁকড়ে ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে হাতের মুঠো থেকে আলগা হয়ে যায়। যেমন এই দেহ, দেহকে মানুষ সব থেকে বেশি আঁকড়ে থাকে, বৃদ্ধাবস্থায় দেহের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। নিজের বল বুদ্ধিকে এত দিন আঁকড়ে ছিল, এখন দেখছে শরীরে বল নেই, স্মৃতিতে কিছু থাকছে না, এত দিন একটা সম্মান নিয়ে জীবন চালিয়ে এসেছে, বয়স হয়ে যাওয়ার পর কেউ তার কথা শুনতে চায় না, সবাই তাকে অবজ্ঞা করতে থাকে। সব দিক দিয়েই একটা হতাশার ছবি, সব কিছুই হাতছাড়া হয়ে যায়। এক এক করে সবাই তাকে ছাড়তে থাকে, যার ফলে একটা আতঙ্ক এসে তাকে গ্রাস করে নেয়। দেখছে মৃত্যু যেন তার কাছে কাছেই ঘুরঘুর করছে, শুধু একটা ক্ষণের প্রতীক্ষা। আর শেষে যখন মৃত্যু এসে তাকে নিয়ে যায় তখন যে দেহ কৃমি, বিষ্টাতে ভর্তি, তারই পরিণতি হবে কৃমি, বিষ্টা আর ভস্মে, সেই দেহকেই লোকে আমি মনে করে। আর তাই না, সে নিজেকে মনে করে এক রাজা। লক্ষ্মণ রাজ্য নিয়ে বলছেন কিনা। পরের শ্লোকে সেটাই শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

দেহেহহম্ভাবমাপন্নো রাজ্যহং লোকবিশ্রুতঃ।
ইত্যস্মিন্ মনুতে জন্তুঃ কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞিতে।২/৪/৩০

যে দেহকে নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার, যেটাকে নিয়ে মনে করে আমি রাজা, মৃত্যু হয়ে গেলে সেই দেহকে কবর দিয়ে দিলে কৃমি শরীরটাকে খেয়ে নেবে, পুড়িয়ে দিলে শরীরটা ভস্ম হয়ে কয়েক মুঠো ছাই হয়ে যাবে। অথচ এই শরীরকে নিয়ে সে নিজেকে রাজা মনে করছে। এর আগে আমরা যে আলোচনা করলাম আমাদের মধ্যে কোথাও সেই নিত্যের ভাব, আমি সেই সচ্চিদানন্দ, এই ভাব কাজ করে। এটাই যখন শরীরের উপর প্রতিভাসিত হয় তখন অহঙ্কার আসে, পুরোপুরি অজ্ঞতার জন্য বলছে তা নয়। হে লক্ষ্মণ! তুমি একটু ভেবে বল দেখি, তুমি যেটাকে আমি মনে করছ সেটা তুমি কি করে হবে? এই শরীরে কী আছে, মাংস, মজ্জা, হাড়, নাড়িভুড়ি ছাড়া আর কি আছে এতে! এই যে নানান রকমের বিকার আর পরিণামী, পরিণামী মানে যে জিনিসটার পরিবর্তন হয় সেটাই পরিণামী আর যার রূপ পাল্টে যায় সেটাকে বলে বিকার। যে জিনিসের জন্ম আছে, বৃত্তি আছে, ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে এগুলোকেই সেই জিনিসের বিকার বলে। আর যখন একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে পরিবর্তন হয়ে যায় তাকে পরিণামী বলে। যেমন দুধ দইয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এটাকে বলে পরিণাম। একটা বীজ জমিতে দিয়ে দিলে, সেখান থেকে বৃক্ষের জন্ম হচ্ছে, বৃদ্ধি হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে শেষে একদিন বিনাশ হয়ে যাচ্ছে। এই শরীরটা পুরোপুরি বিকারী আর পরিণামী, দেহ কী করে আত্মা হবে! এখানে আত্মা কি করেন একটা বাক্যে বলে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। এর মধ্যে দুটো ব্যাপার আছে। একটা হয় যে, শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ দুজনেই বশিষ্ঠ মুনির কাছে অধ্যয়ন করেছেন। বশিষ্ঠ মুনির কাছে পড়াশোনা করার জন্য আত্মতত্ত্বের ব্যাপারটা দুজনের কাছেই এসেছে। ফলে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলতে পারছেন তুমিই সেই আত্মা। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন, এই শরীরকে তুমি কি করে মনে করছ এটাই আসল তুমি? তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র যা বলছেন এটাই সংসার ধর্ম আর অধ্যাত্ম ধর্ম, দুটোকে একটি শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন –

দেহোহহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্ব্বিদ্যেতি ভণ্যতে।২/৪/৩৩

শ্লোকে এখানে যদিও অনেক কিছু বলা হয়েছে কিন্তু এর বক্তব্য অত্যন্ত সহজ। আমি দেহ – এটাই অবিদ্যা আর আমি শুদ্ধ আত্মা – এটাই বিদ্যা। এটাই মূল বক্তব্য। কিন্তু শ্লোকে বলছেন, আমি দেহ নই বরং আত্মা, আমরা এখানে সহজ করে বলে দিচ্ছি আমি আত্মা এটাই বিদ্যা। সমগ্র বিশ্বসাহিত্য, বিশ্বের যত চিন্তন রয়েছে সবের মধ্যে এই দুটি জিনিসই আছে। আমি দেহ, এই বোধকে কেন্দ্র করে তৈরী হয় সাহিত্য, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছু। আমি আত্মা – এই বোধকে কেন্দ্র করে তৈরী হয় উপনিষদ। আমি দেহ এই বোধ নিয়ে জীবন যখন চলে তখন জীবন এক রকম চলে, আমি আত্মা – এই বোধকে কেন্দ্র করে জীবন যখন চলে তখন জীবন আরেক রকম চলে। যে কোন কাজ যখন আমরা করছি, আমি দেহ এই বোধ নিয়ে যদি করা হয় তখন অবিদ্যার দিকে আরও এগিয়ে যাচ্ছি, আমি আত্মা এই বোধ নিয়ে যদি সব কাজ করি তাহলে আমি মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দেহ বোধে যে কাজ করা হয় সেই কাজই অবিদ্যা, অবিদ্যাই বন্ধনের কারণ, আর আমি দেহ নই আমি শুদ্ধ আত্মা এই বোধটাই বিদ্যা, আত্মার বোধ নিয়ে যা কাজ করা হবে সেই কাজই মুক্তির কারণ হয়ে যাবে। সেইজন্য বন্ধন মন থেকেই হয় আর মুক্তিও মন থেকেই হয়, মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত, মনের বাইরে কিছু নেই। মানুষ কখন নিজেকে আবদ্ধ মনে করে, কখন নিজেকে মুক্ত মনে করে, এরই ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন শাস্ত্রে ঘুরে ঘুরে করা হয়েছে। আমাদের সমস্যা হল, আমাদের নিজেদের কিছু দুঃখ-কষ্ট এলে সেখানে আমরা নিজেদেরকে দেহ বোধ দিয়ে চালাই, আর ওই একই জিনিস যখন অপরের উপরে আসে তখন তাকে আমরা আত্মা রূপে উপদেশ দিতে যাই। অপরের যখন কষ্ট হয় তখন আমরা বলি, এগুলো কিছু নয়, সব অনিত্য, এ রকম হয়েই থাকে। ভারতের লোকেদের এটা একটা বড় সমস্যা, শাস্ত্রের উপদেশ সব সময় অপরের জন্য, নিজের উপর উপদেশ কখন লাগাবে না।

অবিদ্যা সংসৃতে হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবা শত্রুসূদন।২/৪/৩৪

অবিদ্যাই সংসারের হেতু, অবিদ্যাই সবাইকে সংসারের মধ্যে টেনে আনে। আমি দেহ, তুমি দেহ এই বোধ এসে গেলেই ভোগের ইচ্ছা, পাওয়ার ইচ্ছা, মারামারি করার ইচ্ছা, সব এসে যাবে। বলছেন, *তস্মাদ্‌যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ*, যাঁরা মুমুক্ষু, যাঁরা মুক্তি পথের পথিক তাঁরা জানেন চেষ্টা করে, লড়াই করে সব সময় এই বিদ্যার অভ্যাস করে যেতে হয়। আমি দেহ এটাই অবিদ্যা, আমি শুদ্ধ আত্মা এটাই বিদ্যা, এই বিদ্যার অভ্যাসের কথা বলছেন। যাঁরা মোক্ষ পথের পথিক তাঁদেরকে টানা এই বিদ্যার অভ্যাস করতে হয়। কি রকম অভ্যাস? খুব ছোট্ট একটা উদাহরণ, আমার সাথে কোন রিক্সাওয়ালা খারাপ ব্যবহার করছে তখন আমার অভ্যাস হবে, সেও ঈশ্বরেরই একটা রূপ, আমারই সম্প্রসারিত রূপ, আমি কেন উল্টে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতে যাব। খুব জোর তার ন্যায্য ভাড়ার উপর একটু বেশি কিছু দিয়ে তাকে বিদায় করে দেব। স্বামীজী যখন ভারতের প্রতি ভালোবাসাকে নিয়ে বারবার বলছেন, ঈশ্বরই যদি সব কিছু হয়ে থাকেন ভারতবাসীও তিনিই হয়েছেন। যে রিক্সাওয়ালা খারাপ ব্যবহার করছে সেও তিনিই হয়েছেন। এই ভাব সব সময় ধরে রাখার জন্য অনুশীলন চালিয়ে যেতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র এই কথাই বলছেন, *তস্মাদ্‌যত্নঃ সদা কার্য্যো*, তোমাকে সব কাজে সব সময় প্রযত্নশীল হতে হবে। এত দিন ধরে আমরা শাস্ত্র কথা শুনে যাচ্ছি, বয়স হয়ে গেছে, কবে থেকে সেই একই কথা শুনে আসছি কিন্তু আমাদের জীবনে কোন পরিবর্তন আসছে না, কারণ আমাদের একটুও চেষ্টা নেই। লক্ষ লক্ষ জপ করেও কিছু হবে না, যতক্ষণ না নিজে এই বিচার করবে যে তিনিই সব কিছু হয়েছেন, সব আমারই রূপ। আপনি রেগে গেছেন বা কোন জিনিসের প্রতি মনটা আঁকড়ে থাকছে। একবার ভাবুন আমি দেহ এটাই অবিদ্যা, আমি দেহ নই আমি আত্মা এটাই বিদ্যা। আমি শুদ্ধ আত্মা, শুদ্ধ আত্মা মানে যা কিছু আছে সব আমারই রূপ। তাহলে কার উপর আমি রাগ করব, কার কাছ থেকে আমি কেড়ে নিতে চাইব, কাকে আমি কষ্ট দিতে চাইছি, মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ভাবুন। সঙ্গে সঙ্গে রাগ ক্রোধ সব শান্ত হয়ে যাবে। একটা ঘটিকে উল্টো করে রেখে কল খুলে রেখে দেওয়া হয়েছে, হাজার বছর ধরে কল দিয়ে জল পড়তে থাকুক ঘটিতে এক ফোঁটা জলও ঢুকবে না। আমাদের জীবনটাও তাই, আমাদের মনকে উল্টো করে রেখেছি। সোজা করে রাখা মানে, আমি দেহ নই আমি শুদ্ধ আত্মা এই ভাবকে নিরন্তর অনুশীলন করে যাওয়া।

মোক্ষ কখনই আমাদের লক্ষ্য নয়, এটাই আমাদের way of life, এটাই আমাদের জীবনের ধারা। আমাদের কাছে ঈশ্বর দর্শন যেন একটা লক্ষ্য, ভালো মানুষ হওয়া জীবনের লক্ষ্য। হিন্দুদের এগুলো লক্ষ্য নয়, এগুলোই হিন্দুদের আদর্শ, আদর্শ মানেই হয় way of life, আদর্শই আমাদের জীবনের ধারা, আমাদের জীবন এই রকমই। আমরা যেমন দু পায়ে হাঁটি, ছয় মাসের শিশু যে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে সে জানে বাবা-মা যেমন দু পায়ে চলে আমাকেও দু পায়ে চলতে হবে। দু পায়ে চলাটাই way of life, হামাগুড়ি দিয়ে চলাটা way of life নয়। ঠিক তেমনি মোক্ষমার্গে চলা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এটাই way of life। হিন্দু ধর্মে যা কিছু হয় সব way of life, তোমরা ভালো মানুষ হও, তোমরা সৎ হও, তোমরা ধার্মিক হও, এগুলো আমাদের লক্ষ্য নয়, এটাই হিন্দুদের way of life। অকরণে প্রত্যবায়, এগুলো না করলে পাপ, করার জন্য বাহাবার কিছু নেই। শ্রীরামচন্দ্র এসব কথা লক্ষ্মণকে বলছেন, কারণ লক্ষ্মণ মোক্ষমার্গি, সুগ্রীবকে এই কথা বলছেন না, সুগ্রীব মোক্ষমার্গী ছিলেন না। সুগ্রীব যখন দুঃখ করে বলছেন দাদা আমার সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে এই উপদেশ দিচ্ছেন না। একটা বাচ্চা ছেলে চকলেট খেতে চাইছে, আপনি তাকে নিশ্চয় উপদেশ দিতে শুরু করবেন না এই বলে যে, চকলেটে কিছু নেই, এই জগতটা মায়া, সব মিথ্যা, তাই তুমি লোভ করতে যেও না। আপনি হয়ত তাকে একটা চকলেট দিয়ে দিলেন, দিয়ে বললেন, চকলেট ভালো জিনিস নয়, পেটে ক্রিমি হয়ে যাবে, দাঁত খারাপ হয়ে যাবে ইত্যাদি।

ঠাকুরের তিথি পূজাতে কামারপুকুরে বড় মেলা হয়। গ্রামের একজন তার ছেলেকে নিয়ে মেলায় যাচ্ছে। হাটতে হবে বলে বাচ্চা মেলায় যেতে চাইছে না। বাবা তাকে বলছে, তুই চল, মেলাতে তোকে একটা বাবা কিনে দেব, তোকে মা কিনে দেব। বাচ্চা কাঁদছে, অতটা হাটার ইচ্ছে নেই বলে যেতে চাইছে না। যাই হোক বাবা ছেলেকে নিয়ে মেলায় গেছে। বাচ্চাকে ঠাকুর আর মায়ের প্লাস্টার অফ প্যারিসের মুর্তি কিনে দিয়েছে। বাড়িতে এসে বাচ্চা তার মাকে বলছে, এই নাও তোমার বাবা, এই নাও তোমার মা, বলে ধড়াম করে ফেলে দিয়েছে। বেচারা হাটতে চাইছিল না, জোর করে মেলাতে নিয়ে গিয়ে ঠাকুর আর মায়ের মুর্তি হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। নশ্বর অনশ্বর সবার জন্য নয়, যাঁরা মোক্ষমার্গের তাঁদের জন্য। শ্রীরামচন্দ্রও আধার বুঝে এই উপদেশ দিচ্ছেন।

ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ।২/৪/৩৬

ক্রোধের মত শত্রু নেই, সংসার বন্ধনের মূল হল ক্রোধ। মোক্ষমার্গীর কোন শত্রুর দরকার পড়ে না, শুধু ক্রোধেই জীবনের সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিদ্যার সাধনায়, বিদ্যা বলতে আমি দেহ নই আমি আত্মা, এই সাধনের সবচেয়ে বড় শত্রু হল ক্রোধ। এরপর শ্রীরামচন্দ্র ষড় রিপুর কথা বলছেন, কিন্তু ক্রোধ সাধককে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। কাম আর ক্রোধের কথা গীতাতেও অনেকবার বলছেন। যদিও আমরা বলি কাম থেকেই ক্রোধ আসে, কিন্তু আমরা কামকে কাম রূপেই জানি আর ক্রোধকে ক্রোধ রূপেই জানি, সেইজন্য দুটোকে আলাদা করেই বলা হয়। যেমন ছেলে যখন ছোট থাকে তখন তাকে অমুকের সন্তান রূপে বলা হয়। কিন্তু যখন বড় হয়ে গেল, তারও নিজের একটু নামডাক হয়ে গেলে তাকে আর বাবার নামে তার পরিচিতি করাতে হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এগুলো সব কটাই রিপু, কিন্তু ক্রোধ একাই মানুষকে শেষ করে দিতে পারে। মনের সন্তাপের মূলে ক্রোধ, তার সাথে ক্রোধ সংসারে বন্ধন সৃষ্টি করে আর ধর্মের ক্ষয় করে দেয়। ক্রোধের বহিঃপ্রকাশই হোক আর মনের মধ্যে জমেই থাকুক, সব কিছুর মূলে ক্রোধ।

বিবাহ, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, শত্রুতা, লড়াই সব সময় সমানে সমানে হয়ে থাকে। যদি মনে হয় ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, সব্জিওয়ালা আমাকে ঠকাচ্ছে, আমার মধ্যে তখন একটা ক্রোধের সঞ্চার হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া করতে নেমে যাই, তার মানে আমি আমার মর্যাদাকে ভুলে যাচ্ছি, মর্যাদা ভুলে আমি নিজেকে এদের সম পর্যায়ে নামিয়ে আনছি। শ্রীরামচন্দ্র তাই বলছেন –

ক্রোধ এষ মহান শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
সন্তোষ্যে নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্।২/৪/৩৭

ক্রোধ আমাদের জীবনের মহান শত্রু। তৃষ্ণা বৈতরণী নদী, তৃষ্ণা মানে যে কোন জিনিসের ভোগ করার বা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা, এটাই তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা হল বৈতরণী নদী। মৃত্যুর পর মানুষকে পারে যাওয়ার জন্য বৈতরণী নদী পার করে যেতে হয়। বলা হয় বৈতরণী নদীর মাঝখানে নানান রকমের হিংস্র জলজ জন্তুরা বাস করে, পার হওয়ার সময় তারা গিলে ফেলে। সেইজন্য মানুষ আর ওপারে যেতে পারে না। বৈতরণী নদী পার হওয়ার জন্য গোদানের মত অনেক কিছু দান করতে হয়। আবার বলা হয় মা দূর্গা এই বৈতরণী নদী পার করিয়ে দেন। অমৃতত্ব লাভ করতে হলে সবাইকেই এই বৈতরণী নদী পার করতে হবে। বলছেন তৃষ্ণা হল এই বৈতরণী নদী, এই নদীকে যে পার করতে যাবে তাকেই হাবুডুবু খেতে হবে। শুধু যে হাবুডুবু খাবে তা নয়, নদীতে যে নানান রকমের হিংস্র জীব রয়েছে তারা গিলে ফেলে। আর তার সাথে বলছেন *সন্তোষ্যে নন্দনবনং*, স্বর্গের যে নন্দনকানন, যেখানে প্রচুর বৃক্ষ-লতাদি আছে যাতে প্রচুর ফুল ফল পাওয়া যায়, সন্তোষ হল এই নন্দনকানন। *শান্তিরেব হি কামধুক্*, শান্তি মানে যখন মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই, এই শান্তিই কামধেনু। কামধেনু মানে যে সব ইচ্ছা পূর্ণ করে।

প্রথমে ক্রোধ আর তৃষ্ণার কথা বললেন, এই দুটো বিপজ্জনক আর তার বিপরীত হল সন্তোষ ও শান্তি। সন্তোষ মানে যা আছে, যা আসছে তাতেই সুখী আর শান্তি হল মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্য না থাকা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সব কিছুর মূলে কাম আর সমষ্টির স্তরে বিশ্লেষণ করলে সব কিছুর মূলে অবিদ্যা। তবে এগুলোর একটা distinctive features আছে, যার জন্য এগুলোর এক একটা আলাদা নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। লক্ষ্মণকে বলছেন, ভাই! সেইজন্য তুমি এই ক্রোধের ভাব ত্যাগ কর। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, মানুষ তার আমিত্বকে যতক্ষণ আত্মার সাথে যুক্ত না করে ততক্ষণ সে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এদের সাথে নিজেকে জুড়ে রাখে। এদের সাথে জুড়ে রাখার জন্য জন্ম-মৃত্যুর পাপ এদের সাথে ঘুরতে থাকে। পুনর্জন্মাদির কথা, সুখ-দুঃখের যে কথা বলা হয়, নানান রকমের যে দ্বন্দ্বের কথা বলা হয় এগুলোর মধ্যে যে মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছে তার একটাই কারণ, নিজেকে আত্মা না মনে করে দেহ মনে করছে। জীবনে আমরা যে দুঃখই পাই না কেন দেখা যাবে সব দুঃখের মূলে নিজেকে দেহ রূপে নয়তো ইন্দ্রিয় রূপে, তা নাহলে মন রূপে ভাবা। কিন্তু ওই মুহুর্তে নিজেকে আত্মা রূপে ভাবলে জিনিসটা পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। আত্মা রূপে ভাবা মানে, আমিই সব কিছু হয়েছি, আত্মা মানেই আনন্দঘন, আত্মা আনন্দস্বরূপ, তাহলে আমার আবার কিসের দুঃখ। যার সাথে আমি

ঝগড়া করছি সেও আমারই একটা রূপ, আমার যে ক্রোধের রূপ সেটাই personify হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাকে ভালোবাসছি সেও আমারই রূপ, আমার ভেতরে যে ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসাই মুর্ত রূপ ধারণ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে পাওয়ার কি আছে, সেতো আমারই জিনিস। তাকে দুটো লজেন্স দেওয়ার জন্য আমি প্যান্টের পকেটে নিয়েছি। তাকে ভালোবাসি বলে লজেন্স দুটো প্যান্টের পকেট থেকে বুক পকেটে রাখলাম, ভালোবাসাটা অনুভব করার জন্য। এই ভাবকে খুব গভীরে গিয়ে যদি চিন্তা ভাবনা করা যায়, তখন সত্যিই বোধ হয় আমাদের যা কিছু দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ সব কিছুর মূলে এই দেহবোধ, আমি দেহ। এই কথাই শ্রীরামচন্দ্র বলতে চাইছেন, দুঃখ, যন্ত্রণার মূলে এটাই, এটাই সংসারের কারণ। পুনর্জন্মাদি এই কারণেই হয়। সেইজন্য তুমি এগুলো থেকে বেরিয়ে এসো। বেরিয়ে আসা মানে, জীবন আমাকে যা কিছু দিচ্ছে তার সব কিছুকেই প্রারব্ধ রূপে মেনে নেওয়া। প্রারব্ধ রূপে মেনে নিয়ে তোমার যতটুকু কর্ম করার কথা সেটুকু করে দিলে, করে দিয়ে তুমি বেরিয়ে গেলে।

এর আগেও আমরা কয়েকবার এই কথা বলেছি, জীবনে যদি কোন আদর্শ পালন করা হয়, জীবনে কষ্টের মাত্রা অনেক কমে যাবে, সাফল্যও অনেক উপরে চলে যাবে। আর লক্ষ্য ঠিক করে জীবন যদি চালান হয় তাহলে অনেক বিপদে পড়তে হবে। মহাভারতের সমগ্র যুদ্ধকে অর্জুন লক্ষ্য রূপে নিয়েছিলেন। বর্তমান সমাজও এখন কত রকম লক্ষ্য নিয়ে এসেছে short-term goal, long-term goal, very long-term goal, life long goal, কত রকম শব্দ এসে গেছে। আজকের সমাজেও তাই চারিদিকে শুধু অশান্তি, অশান্তি ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু এটাই যখন আদর্শের দিকে চলে যাবে তখন আবার জিনিসটা পুরো অন্য রকম হয়ে যাবে। আদর্শ মানে বিদ্যা, সম্পদ, সেবা আর ত্যাগ, এই চারটে ছাড়া পঞ্চম আদর্শ হয় না।

একজন লোক গ্রাম থেকে কলকাতা শহরে এসেছে। লোকটি ফটোগ্রাফি করে, ফটোগ্রাফি শুধু মরা মানুষের করে। মরে যাওয়ার পর শুয়ে আছে সেই ছবি সে তোলে। লোকটি ফটোগ্রাফির এটাই শুধু জানে। দীর্ঘ দিন ধরে শুধু মরা লোকের ছবি তুলে গেছে। এরপর ওর এক বন্ধুর ছবি তুলতে হবে, বিয়ের জন্য সেই ছবি পাঠাতে হবে। লোকটি বন্ধুকে বলল 'ভাই! তোমাকে তো খাটে শোওয়াতে হবে তা নাহলে ছবি হবে না। সে বন্ধুকে খাটে শুইয়ে মরার মত সাজিয়ে ছবি তুলে সেই ছবি পাঠিয়েছে। বিয়ের জন্য ছবি পাঠাতেই ওখানে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। ঐভাবেই ছবি তোলা শিখে নিয়েছে, ওকে যে দাঁড় করিয়েও ছবি তোলা যায় সেটা আর তার মাথায় আসছে না। আমাদের অবস্থাও তাই, যেটা স্বাভাবিক সেটাকে ভুলে গেছি, অস্বাভাবিক যেটা সেটাকেই নিয়েছি। এখন অস্বাভাবিকটাই আমাদের স্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

যে কোন কথা, তা শাস্ত্রের কথাই হোক বা অন্য কোন ভালো কথাই হোক, যদি সেই কথা শোনার পর জীবন পরিবর্তন না হয়ে থাকে তাহলে সেই কথা অপরকে উপদেশ দিতে কাজে লাগে। মানুষ সেই উপদেশই দেয় যেটা সে জীবনে আত্মসাৎ করতে পারেনি। আমরা অপরকে বলি তুমি মানুষ হও, কারণ নিজে মানুষ হতে পারিনি, নিজে মানুষ হতে পারলে তাকে আর বলতে হত না তুমি মানুষ হও।

ক্যারাটে যারা করে তাদের হাত, পা সব শিথিল থাকে। শরীরের অঙ্গগুলি যত শিথিল থাকবে তত তার ক্ষিপ্রতা আসে। ঠিক তেমনি মনকে যদি শিথিল করে দেওয়া হয়, তখন আইডিয়া গুলো ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। আমাদের মন এখন সলিড পাথর হয়ে আছে। আইডিয়া গুলো ভেতরে আসছে আর বুলেট প্রুফের মত ধাক্কা খেয়ে ফেরত চলে আসছে। জীবনকে যদি সদার্থক রূপে পরিবর্তন করতে হয় তাহলে মন, প্রাণ, বুদ্ধি সব খুলে দিতে হয়। খুলে দেওয়া থাকলে কি হয়, কর্মগুলো আসবে, ভেতরে ঢুকবে, তাকে নাচাবে, নাচিয়ে নিজের মত আবার বেরিয়ে চলে যাবে। কর্মগুলো না আসার জন্য আমরা আগল দিয়ে রাখি বলে আরও বেশি জোরে কর্মগুলি ধাক্কা মারতে থাকে। তবে এই জিনিসগুলো খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক পুরুষ ছাড়া করতে পারবে না। গীতাতে ভগবান অর্জুনকে এই কথাই বলছেন। অর্জুন একটা লক্ষ্য ঠিক করে রেখেছে। কিসের লক্ষ্য? আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ভগবান বললেন, যুদ্ধটা লক্ষ্য নয় যুদ্ধটা আদর্শ। তুমি ক্ষত্রিয়, এটাই তোমার আদর্শ, যুদ্ধ করাটাই তোমার কাজ, তুমি এই যুদ্ধ করবে। ওই আদর্শকে বোঝাবার জন্য ভগবান সতের খানা অধ্যায় নিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন কয়েকটি শ্লোকে তাঁর কথা বলে দিলেন, ভগবান সতেরটি অধ্যায় নিলেন অর্জুনকে লক্ষ্য থেকে সরিয়ে আদর্শের দিকে নিয়ে যেতে। সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার পর বলে দিলেন এবার তোমার যা ইচ্ছা হয় কর। মূলতঃ

তিনি বোঝাতে চাইলেন এটা অর্জুনের কর্তব্য কেন। এই জিনিসটাকে বোঝাতে গিয়ে তিনি নানান ভাবে বুঝিয়ে দেখাচ্ছেন যেদিক দিয়েই তুমি যাওনা কেন যুদ্ধ করাটাই তোমার একমাত্র কর্তব্য। অর্জুনের মন লক্ষ্যের উপর তৈরী হয়ে আছিল, যুদ্ধটা যেন অর্জুনের কাছে একটা প্রজেক্ট ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেখান থেকে অর্জুনের মনকে তুলে আদর্শের উপর স্থাপিত করলেন। যুদ্ধকে তুমি প্রজেক্ট রূপে নেবে না, আদর্শ রূপে নাও, যুদ্ধকে জীবন শৈলীর মত নাও। এরপর তুমি হেরে গেলেও তোমার জয়জয়কার হবে, মারা গেলে স্বর্গে যাবে। দুর্যোধনও তাই বলছে, আমি ধর্মযুদ্ধ করে মারা গেছি এর জন্য আমার কোন দুঃখ নেই। যুধিষ্ঠির জয়ী হয়েও কোন শোক উচ্ছাস নেই। অন্য দিকে এটা যদি তুমি লক্ষ্য রূপে নাও তাহলে সব দিক থেকে তোমার দুঃখ হবে। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকে জীবনাদর্শ নিয়েছেন, আমার আদর্শ হল যুদ্ধ করা, আমি তাই যুদ্ধ করতে এসেছি, *হতো বা প্রাপ্স্যসি জিত্বা বা মোক্ষ্যসে মহিম*। আদর্শে যে প্রতিষ্ঠিত জীবনে তার কখন খেদ হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইতালীতে যে যুদ্ধ হচ্ছিল তার বর্ণনাতে পাওয়া যায়, হিটলারের সৈন্যরা সব দিক দিয়ে গুলিগোলা চালিয়ে যাচ্ছে আর আমেরিকার সৈন্যরা প্রাণ ছেড়ে পালাচ্ছে। সেখানে ভারতীয় কয়েকজন সৈন্য গিয়েছিল। তাদের কাজ ছিল মৃত সৈন্য আর আহত সৈন্যদের নিয়ে আসা। ওই গুলিগোলার মধ্যে ওরা নির্বিকার, ওরই মধ্যে স্ট্রেচার নিয়ে যাচ্ছে কেউ মৃতদেহ তুলছে কেউ আহত সৈন্যদের স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে আসছে। একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনাতে এই চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। এরা নির্বিকার, আমি যুদ্ধ করতে এসেছি, আমার কাজ হল এদের নিয়ে যাওয়া, আমিই যদি পালিয়ে যাই তাহলে এদের কে বাঁচাবে! আদর্শে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন জীবন-মৃত্যু কোনটারই কোন মূল্য থাকে না। যার কাছে জীবন-মৃত্যুর কোন মূল্য নেই সেখানে সাফল্য-অসাফল্যের কি দাম থাকবে! বিয়াল্লিল নম্বর শ্লোকে বলছেন –

প্রবাহপতিতঃ কার্যাং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব।২/৪/৪২

জীবনে যাদের প্রচুর সংঘাত, অশান্তি লেগে আছে তাদের জন্য এই শ্লোক খুব কাজে লাগবে। এই ভাব আমরা গীতাতেও পাই। খুব পরিষ্কার করে এখানে বলছেন, হে লক্ষ্মণ! তোমার ইন্দ্রিয়, মন আর তোমার দেহ দিয়ে সব সময় কর্তৃত্ব প্রকাশ করবে। যখনই কোন কাজ করবে তখন মনে করবে এই কাজের আমি কর্তা, কিন্তু ভেতর থেকে জানবে আমি কর্তা নই। আর প্রারব্ধবশতঃ যতটুকু কাজ এসে যাবে ততটুকুই কাজ করবে, তার বেশি নয়। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর বলছেন *অহং কর্তা ঈশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোতি*। আদর্শ সব সময় হবে আমিই কর্তা, আমি যদি কর্তা হই তার মানে পুরো নিষ্ঠা নিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। কাজে কোন ফাঁকিবাজি চলবে না। কি কাজ করবে? প্রারব্ধবশতঃ যে কাজগুলো এসে গেছে। নিজে থেকে কোন কাজে জড়াতে যাবে না। যখন বিয়েথা করেছে তখন হয়ত তার বুদ্ধি ছিল না, বিয়ে করতে হয়েছে। প্রারব্ধবশতঃ সংসার হয়ে গেছে। এবার তাকে পুরোদমে দেখতে হবে সংসারটা যেন ঠিকঠাক ভাবে চলে। কিন্তু তার সাথে ভেতরে ভেতরে তাকে জানতে হবে আমি কিন্তু এই সংসারের কর্তা নই। তাহলে কর্তা কে? যদি সে ভক্ত হয়ে তাহলে বলবে, সব ঠাকুর করাচ্ছেন, যদি সে বেদান্তী হয় তাহলে বলবে প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করছে। এই যে আমি, এই শুদ্ধ আমি কিন্তু কিছু করছে না, কিন্তু মনে মনে সে বলবে, আমি নির্লিপ্ত, নির্বিকার। মহাভারতের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কিভাবে জয়ী করিয়ে দিলেন, তার মানে শ্রীকৃষ্ণ ওখানে একজন কর্তা, শুধু কর্তাই নয় একজন সফলতম কর্তা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, কোনমতেই আমি কর্তা নই। আমি ভাব, আমি কর্তা, কর্তৃত্বের ভাব কোন পরিস্থিতিতেই আসে না। তাহলে কর্তৃত্বের ভাব কার মধ্যে আসে? কর্তৃত্ব প্রথম হয় ঈশ্বরের আর নাহলে প্রকৃতির। আমি দেহ নই আমি আত্মা, এই ভাব যদি নেওয়া হয় তাহলে আত্মাকে দু ভাবে আমি দেখব, এক অন্তর্যামী রূপে আর তা নাহলে সর্বব্যাপী রূপে। অন্তর্যামী রূপে যদি দেখি তাহলে কর্তা হয়ে যাবেন ঈশ্বর, কর্মের সাফল্যেও আমার কৃতিত্ব থাকছে না, কর্ম বিফল হলেও আমার কোন অকৃতকার্যতা থাকছে না। যদি সে সর্বব্যাপী আত্মা দেখে তাহলে কর্তা প্রকৃতি হয়ে যাবে। প্রকৃতিই কর্তা হোক আর ঈশ্বরই কর্তা হন, উভয় ক্ষেত্রেই তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এইভাব তো একদিনে আসবে না, অনেকদিন সাধনা করতে করতে আসবে। আধ্যাত্মিকতাকে নিয়ে যখন চলা হবে, সেখানে যে দর্শনই থাকুক না কেন, সে খ্রীশ্চান হতে পারে, মুসলমান হতে পারে, বেদান্তী হন, ভক্ত হন যাই হোক না কেন, কর্তা কোন মতেই তুমি হতে পার না। হয় ঈশ্বর কর্তা আর তা নাহলে প্রকৃতি প্রকৃতির উপর কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলছেন *প্রবাহপতিতঃ কার্যাং*। ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশন থেকে দিল্লী যাচ্ছি, কত স্টেশন আসছে, নদী আসছে, গ্রাম, শহর, দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত, পাহাড় কত কি আসছে, নিজের মত আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এত কিছু দৃশ্যের আসা আর যাওয়া আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। ট্রেন ছুটে চলেছে, ট্রেনের একটা সীটে আমি নির্বিকার চিত্তে বসে আছি আর আমার চোখের সামনে দৃশ্যের পর দৃশ্যও পাল্টে পাল্টে পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। আমি যদি বাচ্চা ছেলের মত কান্নাকাটি করতে থাকি, ওই পাহাড়টা কোথায় গেল, এক্ষুণি আমি পাহাড় চাই। পাশের লোকেরা আমাকে নির্ঘাৎ পাগল মনে করবে। সংসারে আমি আপনি সবাই এই পাগলামোই করে চলেছি। এই শরীরটা যেন একটা ট্রেন ভেতরে আমি দ্রষ্টা রূপে বসে আছি। সময় রূপী রেলপথে এই শরীর রূপী ট্রেন দৌড়াচ্ছে, আর আমার আশেপাশে নানান দৃশ্যও দৌড়ে দৌড়ে আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাচ্ছে। কোন দৃশ্যই এই জগতে স্থির নয়, আরও গতি নিয়ে যেন দৌড়াচ্ছে। একটা ভালো দৃশ্য আসছে আমি মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছি, কিন্তু যতক্ষণে দূরের ওই পাহাড়ের দিকে তাকাতে গেলাম ততক্ষণে ওই দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল। আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম, ওই দৃশ্য কোথায় গেলে, আমাকে এক্ষুণি ওই দৃশ্যটাই এনে দাও। কোথা থেকে এনে দেবে, দৃশ্য চলে গেছে। এবার অন্য দৃশ্য, এই দৃশ্যকে এখন দেখ। এটাই সবার বাস্তব জগৎ। একবার যদি এই ভাবকে ভেতরে নিয়ে আসা যায় জীবনের দুঃখ-কষ্ট অনেক কমে যাবে, দুঃখ-কষ্ট যে আসবে না তা নয়, আসবে সবই কিন্তু মাটিতে ফেলে দিতে পারবে না। এগুলো উপমা ঠিকই, কিন্তু এটাই সত্য। আমি, আমি মানে শুদ্ধ চৈতন্য, যার মধ্যে চেতনা আছে। শুদ্ধ চৈতন্যই অন্তর্যামী রূপে সব কিছু বোধ করছেন আর এই শরীরটা একটা ট্রেনের মত, যেটা নিজের মত চলছে, এর উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার কিছু নেই। আগেকার দিনে ট্রেনের থার্ড ক্লাশে মানুষগুলোকে গরু ছাগলের মত ঢুকিয়ে গার্ড কামরার দরজায় তালা মেরে দিত। কারণ, ট্রেন যে গতিতে চলবে সেই গতিটা এদের কারুরই জানা নেই, ছিটকে বাইরে পড়ে যাবে। ঠাকুরও বলছেন, জীবনটা রেলগাড়ির চাবি দেওয়া কামরার মত। অনেকে বুঝতে পারে না, ঠাকুর চাবি দেওয়া কেন বলছেন। কিন্তু সারা বিশ্বে রেলগাড়ি চালু হওয়ার পর প্রথমের দিকে এভাবেই ট্রেনের কামরায় চাবি দেওয়া হত।

আমরা যদি মেনে নিই আমার কর্মে অশুভ কিছু ছিল বলে এই বাজে জিনিসগুলো আসছে বা কর্মে কিছু ভালো ছিল বলে আজকে এই শুভ জিনিসগুলো এসেছে, তখন আমাদের দুঃখ বোধ অনেক কম হবে। আবার কিছু অশুভ জিনিস যেতে চায় না, হয়ত আগে আগে কোন খুব গর্হিত কর্ম ছিল যার জন্য এই অশুভ জিনিসগুলো যেতে চাইছে না। না গেল কী আর করা যাবে! আর একেবারেই যে কাঙালী ভিখারী হয়ে যাচ্ছে তাতো নয়। হাওড়া স্টেশনের যে ভিখারী পঙ্গু হয়ে প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে সেও কোন দিন এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা পেয়ে যায়। একেবারেই যে মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাবে তা কখন হয় না। ওই দুঃখের মধ্যেও কিছু না কিছু সুখ থাকবে আবার সুখের মধ্যেও কিছু না কিছু দুঃখ থাকবে। সংসারে খাঁটি সুখ বলে কিছু হয় না, আবার পুরোটাই দুঃখ বলে কিছু হয় না। পিওর দুঃখের মধ্যেও সুখের বীজ নিহিত হয়ে আছে। পুরোটাই কখন নষ্ট হয়ে যায় না। কারণ আত্মা, যিনি সব কিছুর মালিক তিনি ওই ট্রেনের কামরার মধ্যে বসে আছেন। ওই কামরার মধ্যে যেই থাকুক, দেশের প্রধানমন্ত্রীই বসে থাকুক আর ভিখারীই বসে থাকুক, উপায় নেই যে কারুরই দৃশ্যগুলো পাল্টে দেবে, যখন পাহাড় আসার আসবে, যখন নদী আসার আসবে। সবাই আলাদা আলাদা ট্রেনে আছে, কোন ট্রেন ধীর গতিতে চলছে, দুঃখ যখন চলে তখন অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। একবার যদি কেউ বুঝে নেয় সুখ দুঃখের দৃশ্যগুলো এভাবেই আসে তখন জীবন অনেক সহজ হয়ে যায়। সেটাই শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *প্রবাহপতিতঃ কার্যাং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে*, যে দৃশ্য গুলো আসছে এতে তুমি লিপ্ত হয়ে যেও না। যদি লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে হাসিও যেমন আসবে, কান্নাও ততটাই আসবে। কারণ ওই দৃশ্য একদিন পাল্টাবেই, এখানে আমাদের কিছু করার নেই। কৌশল্যার কথাই ভাবুন, কিছুক্ষণ আগেও জানতেন তাঁর ছেলে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন, তিনি বিষ্ণুর পূজো করছিলেন, ব্রাহ্মণদের দান দিলেন, হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করলেন, সব কিছুই শুভ আর উচ্চ অবস্থায়। কিন্তু একটা খবর এসে সেখান থেকে তাঁকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিল, ভরত রাজা আর শ্রীরামচন্দ্রের চৌদ্দ বছরের বনবাস আর দুদিনের মধ্যে বৈধব্য। পূণ্যের যে উচ্চতম শিখর হতে পারে কৌশল্যা সেখানে অবস্থান করছিলেন, সেই উচ্চ শিখর থেকে তিনি একেবারে সানুদেশে এসে আছড়ে পড়লেন। কোন হেতু নেই, প্রকৃতি প্রকৃতির মত চলছে। সব দুঃখের মূলে আমরা নিজেরা, দুঃখকে ডেকে আনছি বলে নয়, আমরা প্রকৃতির মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি বলে দুঃখ। আমরা সুখকেও ডেকে আনতে পারি না, দুঃখকেও ডেকে আনতে পারি না। সুখ আর দুঃখ

নিজের মত আসছে আর যাচ্ছে, আমরা লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি বলে সুখ দুঃখের বোধ আসছে। চোখের জল সবারই বেরোয়, ঠাকুরেরও বেরোয়, স্বামীজীরও বেরোয়। তাঁদের সেকেণ্ডের জন্য বেরোয় আমাদের মাস বা বছরের জন্য বেরোয়। লিপ্ত হলে চোখের জল অনেক দিন ধরে বেরোবে। সেইজন্য কি করতে হয়?

অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্মভিঃ।
এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদি ভাবয়া সর্বদা।২/৪/৪৩

যদি তুমি অন্তর থেকে রাগ-দ্বেষ রহিত হয়ে যাও, তোমার অন্তঃকরণ যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, তখন কোন দুঃখই তোমাকে বিচলিত করতে পারবে না। হে লক্ষ্মণ! আমার এই কথাগুলোকে সর্বদা তুমি বিচার করবে। আমরা যে এত দুঃখ দুঃখ করছি এর মূলে হল রাগ আর দ্বেষ। আমি যাকে ভালোবাসি তার থেকে যদি আমাকে আলাদা হয়ে যেতে হয় আমার দুঃখ হবে আর যাদের আমি অপছন্দ করি বা যে জিনিসকে পছন্দ করি না সেই মানুষ বা সেই জিনিস যখন কাছে এসে যায় তখন কষ্ট হবে। এই রাগ আর দ্বেষের জন্যই দুঃখ। মনের মত হলে আনন্দ, মনের মত না হলে দুঃখ। সব গোলমাল আমাদের ভেতরেই বাইরে কিছু নেই। এটাই বলছেন, অন্তঃকরণ যদি শুদ্ধ হয়ে যায়, রাগ-দ্বেষ যদি না থাকে তখন সে আর কোন কিছুতেই লিপ্ত হবে না, লিপ্ত না হওয়ার জন্য দুঃখ-কষ্টের বোধও আসবে না। রাগ-দ্বেষ না হলে আমাদের শরীরই চলবে না। শরীর চলবে না ঠিকই কিন্তু রাগ-দ্বেষের মাত্রাতো কমানো যেতে পারে। বাচ্চারা যেমন সব কিছুর জন্য বায়না করে, সব কিছুকে যেমন আঁকড়ে ধরে, আমরাও যদি ঐরকম বায়না না করি, আঁকড়ে না ধরি তখন দেখা যাবে আস্তে আস্তে আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমরা সব কিছুকে জোঁকের মত জাপটে ধরে আছি, কিছুই ছাড়তে চাই না। কিন্তু একবার যদি ভাবি, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আলো যেমন ক্ষণিক, জীবনে সুখটাও চোখের পলকের মত। অন্তঃকরণটা পরিষ্কার নয় সেইজন্য এত দুঃখ কষ্টের ঢেউ জীবনে আছড়ে পড়ছে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, কর্ম বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়ে আছে, তারা কোন দিন এক সঙ্গে থাকতে পারে না। আমরা সবাই কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে আছি, সেইজন্য স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পুত্র, ভাই-বোন এরা কেউই এক সঙ্গে থাকতে পারবে না। যার মধ্যে বন্ধন যত বেশি তার বিচ্ছেদও তত তাড়াতাড়ি হয়। যে যত জগতকে আঁকড়ে ধরে তার হাত থেকে তত সেটা বেরিয়ে যায়। এত কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তুমি মন খারাপ করো না, চৌদ্দ বছর নিমেষের মধ্যে অতিবাহিত হয়ে যাবে।

শ্রীরামচন্দ্র এবার কৌশল্যাকে প্রণামে করে বলছেন, মা তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। তুমি মন খারাপ করো না, নদীর প্রবাহে ডিঙি নৌকা গুলো ভেসে যায়, কখন তারা পরস্পর কাছে আসে আবার কিছুক্ষণ পরে আলাদা হয়ে যায়, এভাবেই কর্মের পথানুসারে আমরা চলছি, দেখবে কিছু দিন পর আবার আমরা কাছে এসে যাব, সেইজন্য মন খারাপ করার কিছু নেই। দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে চৌদ্দ বছর চলে যাবে টেরও পাওয়া যাবে না। কৌশল্যার আর কিছু করার নেই। তখন তিনি বলছেন –

সর্বে দেবাঃ সগন্ধর্বা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতম্।২/৪/৪৯

যদি কাউকে আশীর্বাদ করতে হয় তখন তার মাথায় হাত রেখে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আশীর্বাদ করতে হয়। কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে বলছেন, তুমি যখন চলছ, তুমি যখন শয়ন করে আছ, তুমি যখন নিদ্রা যাচ্ছ সেই সময় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতারা এবং গন্ধর্বরা তোমাকে যেন রক্ষা করেন। কেউ যদি অন্তর দিয়ে শুদ্ধ ভাবে কাউকে মাথায় হাত রেখে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে আশীর্বাদ করে সে সব দিক দিয়েই রক্ষিত থাকবে। লক্ষ্মণও সব শোনার পর বলছেন –

আহ রাম মমান্তঃস্থঃ সংশয়োহয়ং ত্বয়া হৃতঃ।
যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম সেবাং কর্তুং তদাদিশ।২/৪/৫১

লক্ষ্মণ বলছেন, হে দাদা! আপনি যে কথাগুলো বললেন তাতে আমার মনে যত সন্দেহ ছিল সব দূরীভূত হয়ে গেল। সত্যিই খুব অবাক হওয়ার ব্যাপার, চৌদ্দ বছরে লক্ষ্মণ কিন্তু একবারও কোন ব্যাপারে কোন রকম অভিযোগ করেননি। লক্ষ্মণ বলছেন, আমার সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল তার সাথে আমার কি কর্তব্য সেই বোধও হয়ে গেছে। আমি তাই আপনার সেবা করার জন্য আপনাকে অনুসরণ করে বনে গমন করছি। যদি আপনি

আমাকে অনুমতি না দেন তাহলে কিন্তু আমি প্রাণত্যাগ করব। আমি পরিষ্কার হয়ে গেছি, এটাই আমার এখন কর্তব্য। আমার এই কর্তব্য পালন করতে অসমর্থ হওয়ার থেকে আমার মরে যাওয়া অনেক ভালো।

কৌশল্যার মহল থেকে বেরিয়ে এবার শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্যে নিজের কক্ষে গেলেন। মাথার উপর শ্বেতছত্র নেই, কোন বাদ্যধ্বণি, শ্রীরামকে এই ভাবে আসতে দেখে সীতা চমকে উঠেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সুবর্ণ পাত্রে জল এনে শ্রীরামচন্দ্রের পদযুগল প্রক্ষালন করে দিলেন। সীতা জিজ্ঞেস করছেন, আপনার সাথে কোন রক্ষী নেই কেন? রাজকুমাররা দেহরক্ষী ছাড়া চলে না। কিন্তু এখন সব কিছুই চলে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন স্মিত হাসি দিয়ে মজা করে বলছেন 'হে শুভে! রাজা আমাকে দণ্ডকারণের সমগ্র রাজ্য প্রদান করেছেন'। শ্রীরামচন্দ্র বলতে চাইছেন অযোধ্যা রাজ্যের যেন একটা বিভাজন হতে যাচ্ছে। তারপর বলছেন 'আমি তো আজই বনে চলে যাচ্ছি, তুমি আমার মাতার কাছে থেকে তোমার শ্বশ্রুমাতার সেবা করবে'। সীতা জানতে চাইছেন রাজা কেন আপনাকে জঙ্গলে রাজত্ব করতে বললেন? তখন পুরো ব্যাপারটাই শ্রীরামচন্দ্র পরিষ্কার করে বলছেন, পিতা ভরতকে রাজ্য দিয়েছেন আর আমাকে চতুর্দশ বৎসর বনবাস দেওয়া হয়েছে। তখন সীতা শুনে বলছেন 'খুব ভালই হয়েছে, আগে আগে আমি চলব আর পশ্চাতে আপনি আসবেন'। সীতার তখন বয়স পনের ষোল হবে, সীতার কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে খুব আহ্লাদিত হয়েছেন, ভাবছেন আমার স্ত্রী এভাবে বলছে! কিন্তু তিনি সীতার সামনে জঙ্গলের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রস্তুত করছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদির মত হিংস্র পশু আছে, ভয়ঙ্কর ধরণের রাক্ষসরা আছে, আর খাওয়ার জন্য খুব সাধারণ ফলমূল, তাও আবার কটু ও অম্ল যুক্ত ফল। রাজমহলের মত খাওয়া-দাওয়ার সুখ সেখানে পাবে না। তাছাড়া জঙ্গলে কোন রাস্থা নেই, যেটুকু সঙ্কীর্ণ চলাচলের পথ সেটুকুও নানা রকমের খানাখন্দে ভর্তি, তদুপরি কাঁটা, কাঁকড় ছড়িয়ে আছে, সেখানে কি করে চলাফেরা করবে! শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব সময় সহ্য করে পদব্রজে ঘোরাঘুরি করতে হবে। আর এমন এমন ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস আছে যাদের দেখেই ভয়ে তোমার প্রাণ বেরিয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সীতা খুব রেগে গেছেন, দুঃখও পেয়েছেন, রাগে আর দুঃখে সীতার ঠোঁট কাপতে থাকল। সীতা বলছেন –

কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্মপত্নীংপতিব্রতাম্।
ত্বদনন্যামদোষাং মাং ধর্মজ্ঞোহসি দয়াপরঃ।।২/৪/৭১

আমি আপনার ধর্মপত্নী, ধর্মপত্নী মানে অগ্নিসাক্ষী করে আমাকে নিয়ে এসেছেন। শুধু ধর্মপত্নী নই, আমি পতিব্রতা, আমি আপনার অনুসারিণী, আপনার পেছনে পেছনেই আমাকে যেতে হয়, আমার মধ্যে কোথাও কোন দোষ নেই। একজন পতিব্রতা স্ত্রীর যা যা কর্তব্য তার সবটাই আমি পালন করি। দুদিক থেকে সীতা বলছেন, আপনি অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আমাকে বরণ করেছেন আর আমিও আপনার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে নিবেদিত। সেইজন্য আপনি আমাকে এভাবে ত্যাগ করে বনে চলে যেতে পারেন না। আমার তরফে কোন দোষ যদি হয়ে থাকত তাহলে আপনি বলতে পারতেন। অনেক সময় যেমন দাসী রূপে কাউকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে, সীতা তো তা নয়, অগ্নিসাক্ষী করে সীতাকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর অসৎ স্ত্রী যদি হয় তাকে ত্যাগ করে দেওয়া যায়। সীতাকে অসৎ কেউ বলতে পারবে না, সীতা বলছেন আমি পতিব্রতা।

সীতা বলছেন হে রাম! আপনি ধর্মজ্ঞ আবার দয়ালু, আমি *অনন্যামদোষাং* আমি কোন দিক থেকে দোষী নই, আমি আপনার অনন্যা ভক্ত, আপনি কেন আমাকে ছেড়ে যাবেন বলছেন? এভাবে আপনি আমাকে ছেড়ে যেতে পারেন না। আপনি যখন আমার সাথে থাকবেন জঙ্গলে তখন কেউই আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আপনি যেভাবে থাকবেন আমিও সেভাবেই থাকব। আপনার খাওয়ার পর যা ভুক্তাবশিষ্ট ফল মূলাদি থাকবে সেটাই আমার অমৃততুল্য হবে, তাতেই আমি তুষ্ট হয়ে আনন্দে থাকব। এইসব বলার পর সীতা বলছেন, আমার বাল্যকালে কোন এক জ্যোতিষি আমাকে দেখে বলেছিলেন তোমার স্বামীর সাথ তোমাকে জঙ্গলে যেতে হবে। পরের দুটো শ্লোকে সীতা খুব অদ্ভূত কথা বলছেন –

অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননম্।
রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ।২/৪/৭৭
সীতাইং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ।
অতস্ত্বয়া গমিস্যামি সর্বথা ত্বৎসহায়িনী।২/৪/৭৮

এর আগে আমি ও আপনি অনেকবার অনেক ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণ কথা শুনেছি, আপনি কি কোথাও কোন রামায়ণে শুনেছেন সীতা ছাড়া রামচন্দ্র বনবাসে গেছেন? অধ্যাত্ম রামায়ণের এই শ্লোকটা খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একমাত্র অধ্যাত্ম রামায়ণেই এই উক্তি পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণে আছে যেখানে সীতা বলছেন, আমাকে একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন স্বামীর সাথে তোমাকে বনে বাস করতে হবে। কিন্তু এখানে বলছেন, হে রাম! আপনিও শৈশবকাল থেকে অনেক রামকথা শুনেছেন, *রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি*। অনেক রামায়ণ আমরা শুনে এসেছি, কোথাও কি কোন কাহিনীতে দেখেছেন শ্রীরাম সীতা ছাড়া জঙ্গলে গেছেন, প্রত্যেক রামায়ণেই সীতার রামের সাথে বনে গেছেন। তাহলে আপনি কি করে বলছেন, এখানে থেকে শ্বশ্রুমাতার সেবা করে যেতে! আমাদের অনেক প্রাচীন একটা ধারণা চলে আসছে যাতে বলা হয় রাম জন্মবার আগেই রামকথা রচিত হয়ে গিয়েছিল। বাল্মীকি রামায়ণে এই সব উদ্ভট ধারণা স্থান পায়নি। এর একটা ব্যাখ্যা হতে পারে যে, এর আগের আগের কল্পে যা হয়েছে এই কল্পেও ঠিক সেই সেই জিনিস হবে। এর আগের আগের কল্পে ঠিক এভাবেই বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, ঠিকে এভাবেই সবাই শাস্ত্র কথা শুনতে আসতেন, ঠিক এভাবেই আচার্যরা ক্লাশ নিতেন। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, how many times I have spoken before you, how many times you have heard me। কল্পের ব্যাপারে এটা একটা খুব প্রচলিত মত। কিন্তু কল্পের এই ব্যাপারটাকে মনে হয় ওনারা একটু বেশি টেনে নিয়ে গেছেন। যখন বলছেন আগের কল্পে যেমনটি ছিল এই কল্পেও তেমনটি হবে, আসলে এখানে বলতে চাইছেন patternটা একই রকম হবে। যেমন আখের রস মিষ্টি হবে, এটাই pattern হয়ে আছে, পরের কল্পেও আখের রস এই রকমই মিষ্টি হবে। কিন্তু সব কিছু যে একেবারে specific হবে তা কিন্তু নয়, সব কিছু specific হলে মুক্তির ধারণাতেই গণ্ডোগল লেগে যাবে। ধরুন একজন সাধন-ভজন করে মুক্ত হয়ে গেলেন, কল্পের সব কিছু যদি একই ভাবে চলে তাহলে পরের কল্পে আবার তাঁকে নেমে এসে প্রথম থেকে সাধন-ভজন করে মুক্তির চেষ্টা করতে হবে। সেইজন্য কল্পের এই ধারণাটা যুক্তিতে একটা জায়গায় গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে এটা ঠিকই যে সীতা যেটা বলছেন তার ব্যাখ্যা করতে গেলে কল্পের এই ধারণা দিয়েও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

আসলে এগুলোর ব্যাখ্যা দেওয়া খুব মুশকিল। ইদানিং সাহিত্যে একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে, যার নাম Post Modernism, ওরহান্ পামুর এই Post Modernismএর লেখক, উনি ওর মধ্যে অনেক বিচিত্র জিনিস নিয়ে এসেছেন, বলছেন এর মধ্যে কোন তালমিল, কোন রকম reasoning চলে না। ওরহান্ পামুরের একটা বইতে দেখাচ্ছেন একজন কবি এক শহরে এসেছেন। সকালের খবরের কাগজে আছে, কবি এই শহরে এসেছেন, একটা জায়গায় বিকালবেলা তিনি কবিতা পাঠ করলেন, সেখানে অনেক হাততালি পড়ল ইত্যাদি। অনেক আগেই কবির কাছে রিপোর্ট এসে গেছে। কবি খুব আপত্তি করে বলছেন, আমি তো নিমন্ত্রণই গ্রহণ করিনি, আপনি কি করে এর রিপোর্ট দিয়ে দিলেন। রিপোর্টার বলছেন, আমি যখন লিখে ফেলেছি তখন এটাই হবে। আমাদের মনের নিয়মানুসারে ঘটনা আগে হয় আর তার বর্ণনা পরে হয়। কিন্তু এমন কোন জগৎ হতে পারে কিনা যেখানে বর্ণনাটা আগে হয় আর পরে ঘটনাটা হয়, এটাই post modernismএর একটা অঙ্গ যেখানে ব্যাপারটা এলেমেলো হয়ে যায়। যে লেখক যত এলেমেলো হয় তার লেখার তত নাম হয়। সাহিত্য রচনা মানেই কল্পনা, কল্পনা মানেই কোথাও সে যেন reasoningকে ছেড়ে দেয়। লেখা যদি reasoningএর মধ্যে বাঁধা থাকে তাহলে কিন্তু তিনি লেখক হবেন না, সাহিত্য না হয়ে সেটাই একটা ইতিহাসমূলক রচনা হয়ে যাবে। যে কোন লেখকের সাহিত্য যদি একটা reasonable limitএর মধ্যে থেকে খুব উপরে চলে যায় সেই সাহিত্য তত মহৎ হয়ে যায়। এই যেমন বাঁটুল দা গ্রেট বা সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল পুরোটাই এলেমেলো। যে reasoningকে নিয়ে জাগতিক সব ঘটনাবলী চলে, সেই ঘটনাকে নিয়ে সাহিত্য তৈরী হয় না। এই যে সীতা এখানে বলছেন, এর আগে আমরা যত রামায়ণ শুনেছি সেখানে কোথাও সীতাকে ছাড়া শ্রীরামচন্দ্র বনে যাননি, এটাই যেন Post Modernismএর বীজ, ঘটনা পরে আসছে বর্ণনার আগেই এসে গেছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ যিনি রচনা করেছেন তিনি এখানে কাব্যিকতার একটা চমক দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, বর্ণনা আগে এসে গেছে আর ঘটনা পরে ঘটছে। সাধারণ ভাবে আরেকটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, ঈশ্বরের মনে আগেই সব কিছু হয়ে যায় তারপরেই সব কিছু ঘটে। আমাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রেও একই জিনিস দেখা যায়, যে কোন জিনিস আগে আমাদের মনে চিন্তা রূপে ঘটে যায় তারপরেই সেটাকে আমরা কার্যে পরিণত করি। ঠিক তেমনি সমষ্টি মনে যখন জিনিসগুলি ঘটে যায়

তখন বাকি জিনিসগুলো এখানে ঘটতে থাকে। যেমন আপনি ঠিক করলেন আমি রান্না করব, তারপর আপনি রান্নার সরঞ্জাম সব জোগাড় করতে থাকলেন, তারপর রান্না হল। সমষ্টির স্তরে ঈশ্বর যখন এই রকম ভেবে নেন যে, জিনিসটা ঠিক এভাবেই হবে, এটারই একটা কাব্যিক বর্ণনা এখানে লেখক দিচ্ছেন। এই বর্ণনাকে যদি আক্ষরিক অর্থে নিতে যাওয়া হয় তখন আর এই ঘটনা reasoningএ দাঁড়াবে না, কারণ তখনও রামায়ণ লেখা হয়নি। তাহলে ওটা অন্য কারুর কাহিনী হতে হবে, সেই কাহিনীর মূল চরিত্রের নামও নাকি রাম আর সীতা, তাহলে আবার কাহিনীটাও পাল্টে যাবে। পুরোপুরি আক্ষরিক অর্থে নিলে এই জিনিসটা কখনই সত্য বলে মনে হবে না। কারণ আমরা জানি বাল্মীকি অনেক পরে রামকথা লিখেছেন। আর বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে পরে পরে অনেক রামকথা রচনা করা হয়েছে। Figuratively বা Metaphorically যদি নিতে চান তখন তার অনেকগুলো ব্যাখ্যা এসে যায়, তার মধ্যে সব থেকে জোরাল ব্যাখ্যা হল, ঈশ্বরীয় কথা ঈশ্বরের মনে যা আছে তা আগেই ঘটে গেছে, এরই একটা কাব্যিক বর্ণনা হল সীতা যেটা বলছেন।

মূল কথা বল, সীতা বলতে চাইছেন, আপনি যেদিক দিয়েই দেখুন, আমার কর্তব্যের দিক দিয়ে দেখলে আমাকে আপনার সাথেই যেতে হবে, আমার পতিব্রতা ধর্ম পালনের দিক দিয়ে দেখলে আমাকে যেতেই হবে, জ্যোতিষী বিদ্যা দিয়ে বিচার করলে আমাকে তো অবশ্যই যেতে হবে আর রামকথার যত বর্ণনা আগে আগে হয়ে গেছে সেই বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হলে আমাকে আপনার সাথে বনে যাওয়া ভিন্ন আর কোন কিছু হতে পারে না। আমরা যখন কোন কাজ করব বলে ঠিক করে নিই বা কাউকে দিয়ে কাজ করাতে চাই তখন যত রকমের যুক্তি হতে পারে সব রকমের যুক্তিকেই নিয়ে আসি। বাঘ একটা ছাগলকে খাবে, কিন্তু ছাগলকে মারার জন্য তাকে একটা যুক্তি দেখাতে হবে। ছাগলকে বলছে তুমি আমার জল উচ্চিষ্ট করে দিয়েছ, ছাগল বলছে জল তো আপনার দিকে থেকে আসছে আমি এঁঠো কি করে করতে পারি। বাঘ তখন আবার একটা যুক্তি নিয়ে আসছে, অমুক দিন তুমি আমাকে গালাগাল দিয়েছিলে। ছাগল বলছে তখন তো আমার জন্মই হয়নি আমি কি করে আপনাকে গালাগাল দিতে পারি! বাঘ বলছে, তাহলে তখন তোমার মা ছিল। বাঘ এখন ছাগলটাকে খাবে। সরাসরি মেরে ফেলতে বাঘের মনে কোথাও একটা অপরাধ বোধ এসে গেছে, সেইজন্য বাঘ এখন reasoning দিয়ে যাচ্ছে। ঝগড়া করার সময় ভেতরে আমাদের রাগ জমা হয়ে আছে, সেই রাগ এখন reaoningকে অবলম্বন করে বেরিয়ে আসছে। হলাহল পান করে শিবের কণ্ঠে গরল, শিব ঠাকুর কত দিন আর গলায় গরল ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে থাকবেন, তাই এই সৃষ্টির মধ্যে কিছু কিছু জীবের মাধ্যমে দিয়ে রাখলেন। সেই থেকে আমাদের মাথায় সব বিষ জমে আছে। বিষটাকে এবার বার করতে হবে, এমনি বার করতে গেলে লোকে তাকে পাগল বলবে, সেইজন্য একটা reasoning বার করে নেয়।

যাই হোক, সীতার সব কথা বলা হয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ঠিক আছে, তুমি এক কাজ কর তোমার যত আভূষাণাদি আছে সব গুরুমা অর্থাৎ বশিষ্ঠদেবের স্ত্রী অরুন্ধতীর কাছে রেখে যাও। আর আমাদের যা ধন সম্পদাদি আছে এগুলো আর আমাদের এখন কোন কাজে লাগবে না, সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে দান করে দেওয়া হোক। অন্য দিকে লক্ষ্মণ নিজের ঘর সামলে নিয়ে আর মা সুমিত্রাকে কৌশল্যার কাছে সমর্পণ করে শ্রীরামের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণ তিনজন এবার একসাথে রাজভবনে চললেন আজ্ঞা নিতে। কৌশল্যার ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় আসতেই অযোধ্যাবাসী সব পুরগণ অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। সেই জানকী যিনি আর কিছুক্ষণ পর রাণী হতে যাচ্ছেন তিনি এভাবে রাস্তায় নেমে এসেছেন, যাঁকে কেউ কোন দিন দেখতে পায় না, সবারই খুব কৌতুহল জেগেছে। ইতিমধ্যে চারদিকে সব খবরও ছড়িয়ে গেছে। সবাই কৈকেয়ীর নিন্দা করতে শুরু করে দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, যখনই আমাদের মনের মত কিছু হয় না, তখন একজনকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে তার উপর সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা খুব উচ্চমানের লোক তাঁরা এগুলোকে সব কর্মের উপর ছেড়ে দেন। সব পরিস্থিতি দেখে বামদেব, যিনি একজন নামকরা মুনি, তিনি সাধুসমাজে এসে বলছেন, দেখুন আপনারা রাম, সীতা আর লক্ষ্মণের জন্য যে দুঃখ করছেন এটা ভুল করছেন –

এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা।২/৫/১১
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতম্।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তত্তদাকারবত্নানিব।২/৫/১২

বামদেব মুনি কর্তৃক সাধু ও ব্রাহ্মণদের শ্রীরামের স্বরূপের পরিচয় প্রদান

যিনি আদি নারায়ণ ভগবান বিষ্ণু তিনিই রাম রূপে এসেছেন আর যিনি যোগমায়া নামে লক্ষ্মী তিনিই সীতা হয়েছেন। ভক্তিশাস্ত্রে এই ধারণা অত্যন্ত দৃঢ় ভাবে দাঁড় করান হয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণেরও এই ভাব, কিন্তু সেখানে বলছেন বিষ্ণুর অংশ থেকে শ্রীরামের জন্ম। তবে বাল্মীকি রামায়ণে বিষ্ণুর ধারণা অধ্যাত্ম রামায়ণে এসে অনেক তফাৎ হয়ে যায়। বাল্মীকি রামায়ণে বিষ্ণু একজন দেবতা কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে বিষ্ণুই ভগবান। বলছেন এই যে লক্ষ্মণ ইনিই অনন্ত, যে অনন্ত শয্যার উপর ভগবান শয়ন করে থাকেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মায়ার গুণে নানান রূপ ধারণ করেন। একই চৈতন্য নিজেরই মায়াকে আশ্রয় করে যে নানান রূপে দেখান এটাকে এনারা জাদুকরের উপমা দিয়ে দেখান। জাদুকর তাঁর জাদুর শক্তিতে নিজেকে অনেক রূপে দেখান। আর বলছেন –

এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাভুদ্বিশ্বভাবনঃ।
সত্ত্বাবিষ্টস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎপ্রতিপালকঃ।২/৫/১৩

যখন রজোগুণকে আশ্রয় করেন তখন তিনি ব্রহ্মা রূপে দেখান, আর সত্ত্বগুণের যখন আশ্রয় করেন তখন তিনি বিষ্ণু রূপে দেখান। যখন তিনি সংহার করেন তখন তিনি তমোগুণকে আশ্রয় করে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। এখানে মনে রাখার জিনিস হল, ভগবান বিষ্ণুকে এখানে কিন্তু সাকার রূপে বা ব্যক্তি রূপে না দেখে চৈতন্য রূপে দেখছেন। যিনি ভগবান নারায়ণ তিনিই বিষ্ণু রূপে দেখান, এর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব খুব জটিল। এগুলোকে নিয়ে বেশি নাড়াচড়া করতে থাকলে একটা জায়গায় বুদ্ধি দিয়ে আর কাজ হবে না। অনুভূতির দ্বারাই এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বোঝা যায়। ঠাকুর বলছেন যাঁরই নিরাকার তাঁরই সাকার। আমরা এটাকে করে দিই – যিনি নিরাকার তিনিই সাকার। কিন্তু তা নয়, যিনি না হয়ে হবে যাঁর। যাঁর নিরাকার তাঁরই সাকার। আসলে যখনই বলা হয় ঈশ্বর নিরাকার, তখন কিন্তু তাঁকে পরিভাষিত করে দেওয়া হচ্ছে। যখনই ঈশ্বরকে পরিভাষিত করে দেওয়া হবে তখন তিনি আর ঈশ্বর থাকবেন না। তাই তিনি নিরাকার সেটাও বলা যাবে না, আর তিনি সাকার সেটাও বলা যাবে না। তিনি নিরাকার আবার সাকার এটাও বলা যাবে না। তিনি অনন্ত সেটাও বলা যাবে না। কারণ অনন্ত যখন বলা হয় তখন তাঁকে অনন্ত শব্দ দিয়ে পরিভাষিত করার জন্য বলা হয় না, ওটাকে নাকচ করার জন্য বলা হয় যে, তিনি সীমিত নন। তাহলে যিনি সীমিত নন তিনি তো অনন্ত, কিন্তু তাও বলা যাবে না, কারণ অনন্ত বলতে আমরা যা ভাবি জিনিসটা তাও নয়। জিনিসটা যে কী, সেটাকে মন বাণী দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু তাঁকে জানা যায়, তাঁর কার্য দিয়ে, কার্যের প্রভাব দিয়ে জানা যায়। সেইজন্য ঠাকুর বলছেন, ঈশ্বর অনেক রকমের লীলা করেন, কখন ব্রহ্মা রূপে লীলা করছেন, আবার কখন বিষ্ণু রূপেও লীলা করেন আবার শিব রূপেও লীলা করছেন। আবার এর বাইরে দেবতার রূপে লীলা করছেন, মানব রূপে লীলা করছেন, তাঁরই নানান রকমের লীলা চলছে। সত্ত্ব, রজো আর তমো রূপে যে তাঁর শক্তি, তাঁর এই তিনটে গুণকে আশ্রয় করে তিনি অনেক কিছু হচ্ছেন, তিনি অনেক কিছু রূপে দেখাচ্ছেন। এই কথা বামদেব এখানে বলছেন। আর যিনি এটা করেন তিনি এখন শ্রীরামচন্দ্র রূপে আমাদের মধ্যে বিরাজ করে আছেন। আর যে শক্তি দিয়ে তিনি সব কিছু করেন সেই শক্তি হলেন সীতা। আর এই প্রকাশের আগে তিনি যাঁকে আশ্রয় করে থাকেন, তিনি হলেন অশেষ, এই লক্ষ্মণই সেই অশেষ। ভগবান যাঁকে আশ্রয় করে থাকেন, সেটাও সেখানে, যে শক্তি দিয়ে ঐ আশ্রয়টা হয় সেই শক্তিটাও সেখানে আর যিনি আশ্রয় নিয়েছেন তিনিও সেখানে। এইসব বলার পর বামদেব বিভিন্ন অবতারের কথা বলছেন।

মৎস্যরূপ, কুর্মরূপ, বরাহরূপ, নৃসংহ রূপ, প্রত্যেক অবতারের নাম করে বলছেন, জগতকে রক্ষা করার জন্য যিনি ওই সব রূপ ধারণ করেছিলেন তিনিই এখন এখানে রাম রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাবণাদি কোটি কোটি অসুরদের যে প্রাদুর্ভাব হয়েছে এদের নিহত করার জন্যই তাঁর এই আগমন। সাধুরা দেখছেন অযোধ্যার যিনি যুবরাজ হতে যাচ্ছেন হঠাৎ তাঁকে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ কেন রাস্তা দিয়ে যেতে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না, তখন বামদেব সাধুদের এসব কথা বলে বোঝাচ্ছেন। বলছেন, বিষ্ণুকে পুত্র রূপে কামনা করে রাজা দশরথও এর আগের আগের জন্মে ভগবানের অনেক তপস্যা করেছিলেন, তাই ভগবান হরি রাজা দশরথের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অনেক রকম কারণ জমে জমে আজ শ্রীরাম রূপে ভগবানের আবির্ভাব কার্য সাধিত হয়েছে। বলছেন –

রাজা বা কৈকেয়ী বাপি নাত্র কারণমন্বপি।
পূর্বেদ্যুর্নারদঃ প্রাহ ভূভাহরণায় চ।২/৫/২৪

এই যে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বনে যাচ্ছেন এতে রাজা দশরথের কোন হাত নেই, কৈকেয়ীরও কোন হাত নেই। কারণ গতকাল নারদ মুনি এসে শ্রীরামচন্দ্রকে ভূভারহরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে শ্রীরামচন্দ্র বলেছিলেন, কাল সকালেই আমি বনে গমন করব। আমরা যখন সিংহাবলোকন, অর্থাৎ সিংহ যেমন চলতে চলতে পেছনের দিকে তাকায়, আমরাও যদি একবার পেছনের দিকে তাকাই তখন দেখি অনেক কিছু জিনিস আগে এক রকম দেখাচ্ছিল এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে। যে মেয়েকে আগে আমি খুব ভালোবাসতাম তাকে এখন নাগীনির মত দেখাচ্ছে, বা ছেলেটাকে জাত সাপের মত দেখাচ্ছে। যেটাকে অভিশাপ মনে হচ্ছিল সেটাকেই এখন আশীর্বাদ বলে মনে হচ্ছে। যেখানে মনে হচ্ছিল আমার সব কিছুর সংহার হতে যাচ্ছিল, এখন দেখছি সেখান থেকেই একটা নতুন সৃষ্টির বীজ বেরিয়ে এসেছে। পরিস্থিতিতে জিনিসটাকে এক রকম দেখায়, কিছু দিন পর পেছনের দিকে তাকালে জিনিসটাকে পুরো অন্য রকম দেখায়। আমাদের যদি কেউ সাবধান করে বলে দেয়, একটু শান্ত হয়ে ধৈর্য ধরে দেখ জিনিসটা অন্য রকম হতে যাচ্ছে, তখন মনটা শান্ত হয়ে যায়। অনেকের আবার অত সহজে শান্ত হতে চায় না, পরে তার মনে হয়, তাইতো উনি তো আগেই বলেছিলেন। বামদেব একজন জ্ঞানী সাধু, শ্রীরামচন্দ্রের ঘটনা দেখে সাধুদের আকুল হয়ে যেতে দেখছেন, সাধুদের শান্ত করার জন্য তিনি এত কথা বলছেন –

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন।২/৫/২৬
কা পুনস্তস্য রামস্য দুঃখশঙ্কা মহাত্মনঃ।
রামনাম্নৈব মুক্তি স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ।২/৫/২৭

এই দুটো শ্লোকই ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্লোক, যে শ্লোক ঠিক ঠিক রামকথার সাথে মেলে না। বলছেন জগতে যারা নিত্য রাম রাম এই নাম জপ করে তাদের মৃত্যু ভয়ও চলে যায়, তাদের সব কষ্টাদি চলে যায়, সেখানে যিনি সাক্ষাৎ রাম তাঁর আবার কিসের দুঃখ কিসের কষ্ট। এর আগে সীতা বলছিলেন, ছোটবেলা থেকে আমরা যত রামায়ণ শুনে এসেছি তাতে কি কোথাও আছে যে সীতাকে ছাড়া রাম বনবাসে গেছেন, তার মানে রামের জন্মের আগে রামকথা রচিত হয়ে গেছে, এখানেও একই সমস্যা আসছে। শ্রীরামচন্দ্র এখনও যুবরাজ হননি, তাঁর পরিচিতি এখনও সেভাবে হয়নি অথচ ভূতলে রামনামের মাহাত্ম্য আগে থেকেই প্রচার হয়ে আছে। এখানে পরিষ্কার বোঝা যায় অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক পরে রচিত হয়েছে, যখন রাম নামের মাহাত্ম্য অনেক প্রচলিত হয়ে গেছে। আর অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হওয়ার সময় রাম নামের মাহাত্ম্য যেন থেকে থেকে ঢুকে পড়ছে। দ্বিতীয়তঃ, এর মধ্যে একটা দর্শনও আছে, যেমন পরে পরে অনেক কাহিনীতে বলছেন রাম থেকে রামের নাম বড়, যার জন্য পাথরের উপর রাম নাম লিখে দেওয়াতে পাথর ভেসে যাচ্ছে। এগুলো সবই কাহিনী, যথার্থ ভাবে নিতে নেই। তবে কাহিনীগুলো মেনে নিলে নিজের মনে একটা শান্তি আসে। মূল কথা হল, যা কিছু হচ্ছে এই নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মনে কোন শোক বা দুঃখ নেই, সব কিছু থেকে নিস্পৃহ, নিজে থেকেই তিনি অনাসক্ত। বাকি যা কিছু আছে সবটাই অধ্যাত্ম রামায়ণের নিজস্বতা, ভক্তিশাস্ত্র রূপে অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব সুন্দর শাস্ত্র। এখানে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, যুগ যুগ ধরে রামের কথা চলে আসছে, রামের আবির্ভাবের আগেই লোকেরা রাম নাম জপ করে ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভক্তিশাস্ত্র এভাবেই চলে। অধ্যাত্ম রামায়ণে থেকে প্রভাবিত হয়ে তুলসীদাস যখন রামচরিতমানস রচনা করছেন, সেখানে এই ধরণের কিছু কিছু কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে উপনিষদেও আমরা একই জিনিস পাই, কিন্তু সেখানে বিপরীত ধর্মে নিয়ে আসা হয়, যেমন বলছেন *তদেজতি তন্নৈজতি*, তাঁর মধ্যে কম্পন আছে আবার তাঁর মধ্যে কোন কম্পন নেই। কথার মধ্যে বিরোধ নিয়ে আসা হয় একটা জিনিসকে বোঝানর জন্য। এভাবে না নিয়ে এলে একটা জিনিসকে পরিভাষিত করা যায় না। আজকে আমরা যখন দেখছি তখন আমরা এটাই দেখছি, যিনি শ্রীরামচন্দ্র, তাঁর নাম করে আমাদের দুঃখ শোক চলে যাচ্ছে। যাঁর নাম নিলে দুঃখ শোক চলে যায়, তাঁর নিজের কি কখন দুঃখ শোক থাকতে পারে!

আমাদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা যে, বেশি বিচার করলে ভক্তির হানি হয়। আসলে কিন্তু তা নয়, বিচার করে যখন একটা perspectiveএ নিয়ে যাওয়া হবে ভক্তি তখন দৃঢ় হয়। হাভাতে ভক্তি দিয়ে কোন কাজ হয় না। জিনিসটাকে বিচার করে যখন ধারণা পরিষ্কার হয় তখনই ভক্তি দৃঢ় হয়। বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া যত রামকথা আছে সব অনেক পরে লেখা হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের হিসাবে বাল্মীকি রামায়ণ প্রায় চার হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে। এবার সেখান থেকে যত আমরা এগিয়ে আসব, তত আমরা দেখতে পাব যে, বাল্মীকি

রামায়ণের পরে যত রামকথা লেখা হয়েছে বেশির ভাগই বুদ্ধের পরে লেখা হয়েছে। বৌদ্ধরা অনেক কিছু করার সাথে সাথে তাঁরাও বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক কিছু রচনা করতে শুরু করলেন। দু হাজার খ্রীষ্টপূর্ব যদি নাও নেওয়া হয় তাহলেও খুব কম করে হলেও সাতশ থেকে হাজার বছরের তফাৎ এসে যাচ্ছে। শুধু যে বাল্মীকি রামায়ণের জন্য এক হাজার বছরে রামকথা ছড়িয়ে গেছে আর সবাই রাম নাম জপ করছে তাও না। কিছু তো একটা ছিল যার জন্য সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাই রাম নাম করে আসছে। শুধু যদি অযোধ্যার লোকেরাই রাম নাম জপ করে থাকে তাহলে একটা সন্দেহ আসে। আরও কিছু একটা এমন আছে যার জন্য সারা দেশে রামকথা ছড়িয়ে গেছে।

আলোচনায় একটা কথা বারবার বলা হয়, রামকৃষ্ণ ব্যক্তি রূপে আমাদের কোন কাজে লাগবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর জন্ম নিলেন আর কাশীপুরে দেহ রাখলেন, এই দিয়ে আমার আপনার কিছুই হবে না! বিল গেটসের যত টাকাই থাকুক, তাতে আমার আপনার কি আসে যায়। আমাদের কাছে দরকার শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব বা শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব। অবতারকে কখন ব্যক্তি রূপে দেখা হয় না, সব সময় ব্যক্তিত্ব রূপে, ভাব রূপে দেখা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাব রূপে দেখার সেই বুদ্ধি আমাদের কোথায়! স্বামীজীর মত আধার ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে কেউ বুঝতে পারবে না। তাহলে আমাদের বুদ্ধি দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কি বুঝব? তাঁর নাম, এছাড়া কিছু বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই। মাহাত্ম্য সব সময় নামের। কারণ শ্রীরামচন্দ্র ব্যক্তি রূপে আমাদের কোন কাজে আসবে না। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হল, যুবরাজ হলেন, তাতে আমাদের কি লাভ! ঠাকুর খুব সুন্দর বলছেন, লঙ্কায় রাবণ মল, বেহুলা কেঁদে আকুল হল। কোথায় সেই লঙ্কা সেখানে কোন রাবণ মারা গেল আর কোথায় বেহুলা, দেশ ও কালে দুজনেই আলাদা, কিন্তু বেহুলা কেঁদে যাচ্ছে। কোথায় গদাধর চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরে জন্ম নিলেন তাতে আমার আপনার কি হল! কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যে সংগ্রাম করেছেন, যে আদর্শের জন্য সারা জীবন লড়াই করে গেছেন, এটাই তাঁর ব্যক্তিত্ব, এটাই তাঁর ভাব, আমার এটাই লাগবে। তাঁর ভেতরে যে শক্তির প্রকাশ, যে শক্তি তাঁকে বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে দিয়ে একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে গেছে, সেদিকে আমার দৃষ্টি। সেখানে তাঁর ব্যক্তির সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকছে না।

গুগুলের প্রতিষ্ঠাতা বলছেন, আমরা ঠিকই করে রেখেছিলাম যে গুগুল will be the third part of the brain। মানুষের মস্তিষ্কের দুটো পার্টস, লেফট এণ্ড রাইট, কিন্তু বলছেন google will be the third part। এই হচ্ছে আদর্শ, মানুষ তার মস্তিষ্কের দুটো পার্ট দিয়ে কাজ করে, উনি ইন্টারনেট দিয়ে গুগুলকে থার্ড পার্ট করতে যাচ্ছেন। জ্ঞান ভাণ্ডারকে এমন ভাবে খুলে দিতে চাইছেন যে, মানুষের মধ্যে যে জ্ঞানের আকাঙ্খা সেটা যেন কোথাও বন্ধ না হয়ে যায়। গুগুল কোম্পানীর অনেক টাকা পয়সা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তার কোন দাম নেই, কিন্তু তাদের যে এই সংগ্রাম, একটা আদর্শ, মানুষের জ্ঞানের স্পৃহাকে জাগিয়ে রাখার জন্য তারা যে পরিশ্রম করে গেছে এর মূল্য অপরিসীম। জ্ঞানের ভাণ্ডার আমি এমন ভাবে খুলে দেব যে, কক্ষণ কোন মানুষ যেন বলতে না পারে এই ব্যাপারে জানার কোন পথ নেই। জ্ঞানের ভাণ্ডারকে খুলে দেওয়াকেই বলছেন থার্ড পার্ট, থার্ড পার্ট বলে আদৌ মস্তিষ্কের কিছু হয় না। কিন্তু বিশ্বের যা কিছু জানতে চাও তার জ্ঞান এখানে রাখা আছে। ব্যক্তির কোন দাম নেই, দাম ব্যক্তিত্বের, যেটা দিয়ে তিনি সাধারণ জগৎ থেকে উপরের দিকে উঠে গেছেন।

ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রে কিংবা, শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে তখন তিনটে জিনিস এসে যায়, ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব আর তৃতীয় হল শুধু নাম। ব্যক্তি কোন কাজে লাগবে না, শুধু এনাদের ক্ষেত্রেই নয় কারুরই ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু এনাদের ব্যক্তিত্বকে যে কাজে লাগাতে হবে, তাঁদের ভাবকে ধরে নিয়ে জীবনে অবলম্বন করতে হবে, এই কাজ ঋষিরা ছাড়া পারেন না। আমি যদি বলি আমি ঠাকুরের ভক্ত, কিন্তু আমার আপনার মত দু পয়সার মানুষ কি কখন ঠাকুরের ভক্ত হতে পারি! ঠাকুরের ভক্ত বিশ্বামিত্র হতে পারেন, ব্যাসদেব, বশিষ্ঠ এনারা হতে পারেন আর স্বামীজীর মত পুরুষরা হতে পারেন। তাহলে আমাদের উপায় কি? একমাত্র উপায় তাঁর নাম। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে বারবার ঈশ্বরের নামের মাহাত্ম্য প্রচার করছে, তার কারণ এটাই একমাত্র উপায়। ঈশ্বরের নাম করা ছাড়া আমাদের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই।

ধর্মগ্রন্থ মানেই ঈশ্বরের নাম আর ঈশ্বরের ভাব বা অবতারের ব্যক্তিত্বকে আধার করে রচিত। নাম আর ভাব এই দুটোর মধ্যেই ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা চলে। নাম আর ভাবের মধ্যে যদি কেউ প্রবেশ করে যেতে পারে সে

তখন অনন্তের ভাবকে আয়ত্ত করার সুযোগ পেয়ে গেল, তখন সে যা খুশি করে চলে যেতে পারে। তার ভেতর থেকে নাম আর ভাব কোন দিন আর হারিয়ে যাবে না। এবার কিছু দিন পর সে যখন অধ্যাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে বা শুনবে তখন সে বুঝতেই পারবে না কোথায় ঐতিহাসিক রূপী রাম, কোথায় ভাব রূপী রাম আর কোথায় নাম রূপী রাম, সবটাই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। অন্য দিকে এর একটা সমস্যাও হয়, সব কিছু মিলেমিশে যাওয়াটা আবার ধর্মের সহজীকরণ হওয়ার পথটা সুগম করে দেয়। সেখান থেকে আবার ধর্মের নাশ হতে শুরু হয়ে যায়। কারণ নামের মহিমাকে এত বেশি উপরে নিয়ে গেছে যার ফলে অবতার বা ভগবানের যে ভাবের গভীরতা রয়েছে সেটাকে অনেক লঘু করে দেওয়া হয়েছে, মানুষ আর ওই গভীর ভাবের দিকে যেতেই চাইবে না। ঈশ্বরীয় তত্ত্বের মহিমা বা ভাবের গভীরতাকে বাদ দিয়ে যদি শুধু নামের মহিমার উপর দিয়ে চলে তাহলে কিছু দিন বাদে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি এগুলো চেপে বসে যাবে।

ভাব রূপী শ্রীরামচন্দ্র বা ভাব রূপী শ্রীরামকৃষ্ণ সীমিত কয়েকজন অধিকারির জন্য, এগুলো সবার জন্য নয়। কিন্তু অন্য দিকে ঐতিহাসিক রামও আছেন, যার বর্ণনা অধ্যাত্ম রামায়ণে পাই, বাল্মীকি রামায়ণেও পাই। ঐতিহাসিক রামকে নিয়ে চললে ভাব রূপী রামে আবার গোলমাল হয়ে যাবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে ভাব রূপী রামের দুর্ধর্ষ বর্ণনা করছেন। পরে আসবে যেখানে বলবেন, রাবণ একটা বদমাইশ লোক যদি ভগবানের হাতে মারা যায় তাহলে তো তার মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ অন্য দিকে নিয়ে চলে গেল, বলছেন রাবণও একজন সাধক, কিন্তু সে বৈরীভাবে সাধনা করে গেছে। বৈরীভাবে সাধনায় রাবণ প্রতিটি মুহুর্তের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তন করে যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রের বৃত্তি ছাড়া আর কোন বৃত্তি রাবণের মধ্যে নেই। হনুমানও রাবণকে সাবধান করে বলছেন, রাবণ! তুমি বৈরীভাবে ভগবানের সাধনা করতে যেও না, এই পথ ভালো পথ নয়। কারণ শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাব, সেই ভাবের মধ্যে যে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব সেটাকে বৈরীভাবে সাধনায় পাওয়া যাবে না। কিন্তু আবার বলা হয় ভাবরূপী রামকে আপনি যেভাবেই মনে করুন, আর যদি বলেন রাম নাম তাহলে রাম হলেন সেই সচ্চিদানন্দের একটা মুখোশ। রাম নামের মুখোশের পেছনে সেই অনন্ত। দীক্ষা দেওয়ার সময় সব জায়গাতে গুরু কখনই ব্যক্তি রামকৃষ্ণ বা ব্যক্তি কৃষ্ণকে আলাদা বলবেন না, তাঁর পেছনে যে অনন্ত সত্তা আছে সেই সত্তাকে চিন্তন করতে বলে দেওয়া হয়। বলা হয় হরি অনন্ত আর হরি কথা অনন্ত, খুব নামকরা কথা। রাম অনন্ত আর রাম নামও অনন্ত। শ্রীরামচন্দ্রকে যদি দেখা হয় তিনি অযোধ্যায় জন্ম নিলেন তারপর তাঁর রাম নাম হল, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কারণ তখন আর এটা অধ্যাত্ম শাস্ত্র হবে না হয়ে একটা ইতিহাসের বই হয়ে যাবে। রাম একটা ভাব, সেই ভাবের যদি একটা শব্দ দেওয়া হয়, ঐ শব্দকে আমরা বলছি নাম। সেই দিক থেকে রামের ভাব যেমন চিরন্তন রামের নামও চিরন্তন। শুধু একজন ব্যক্তি রূপে যদি নাম হয় তাহলে সেই নাম দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যাবে। সেইজন্য দুটোই দেখতে হয়, যেমন ঠাকুরের যে ভাব, তাঁর যে নাম দুটোই চিরন্তন। কিন্তু ব্যক্তি রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ একজন ছিলেন, যাঁর অনেক রকম পছন্দ অপছন্দ ছিল, যিনি সাধনাদি করেছিলেন, এই ব্যক্তি রামকৃষ্ণকেও দরকার, ব্যক্তি রামকৃষ্ণকে না ধরে রাখলে গোঁড়া ভক্ত হয়ে যাবে, ধর্মান্ধতা এসে যাবে। ঐতিহাসিক দিককে যদি একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া হয় তখন এই ধরণের অনেক সমস্যা এসে যাবে। আর ধর্মকে যদি ঐতিহাসিকের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখা হয় তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে, ওই ধর্ম দিয়ে আর সাধন-ভজন হবে না।

এই যে নামের মাহাত্ম্য যা বলা হল বা আগে রামকথা যা বলা হল এর দাম সেখানেই, তিনি অনন্ত, তিনি চিরন্তন। সাধারণ লোককে যদি এই কথাগুলো বলা হয় সে বেচারী এর কিছুই বুঝতে পারবে না। সেইজন্য খুব সহজ করে বলে দেওয়া হয়, রাম নাম আগে থেকেই ছিল, দশরথ সেই রাম নাম জপ করে রামকে সন্তান রূপে পেলেন। রত্নাকরও রাম নাম জপ করে শ্রীরামের জন্মের আগেই রামকথা লিখে দিলেন। এভাবে বলে দিলে সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি অনেক বেড়ে যাবে। সাধারণ মানুষকে বোঝানর জন্য এই জিনিসগুলিকে এভাবে বলছেন, এগুলোকে তাই আক্ষরিক ভাবে নিতে নেই। Rationally জিনিসগুলিকে দেখতে হয়, rationally দেখলে কখন কোন গোলমাল হয় না বরং ভাব আরও দৃঢ় হয়। ঠাকুরও বলছেন ভক্তিকে জ্ঞানাগ্নিতে একটু ঝালিয়ে নিতে হয়, ঝালিয়ে নিলে ভক্তি আরও পাকা হয়। বামদেব আবার বলছেন –

য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রামসীতয়োঃ।
তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্বিজ্ঞানপূর্বিকা।২/৫/৩১

এই কথাটাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। বামদেব সাধু ও ব্রাহ্মণদের বলছেন, যে ব্যক্তি রাম-সীতার এই রহস্যকে জানবে, জেনে চিন্তা করবে তার তত্ত্বজ্ঞানমূলক দৃঢ় ভক্তি হয়ে যাবে। দুটো, ঐতিহাসিক রামকেও জানা আর ভাব রূপী রামকেও জানা, তখনই তার ভক্তি দৃঢ় হবে। শুধু ঐতিহাসিক রামকে খুঁজলে ভক্তি হবে না, শুধু ভাব রূপী রামকে নিলে গোঁড়ামি এসে যাবে।

রহস্যং গোপোনীয়ং বো যুয়ং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রস্তেহপি রামং পরং বিদুঃ।২/৫/৩২।

<u>শ্রীরামের বনগমন ও গঙ্গাতীরে বাস</u>

বামদেব বলছেন, তোমরা সবাই শ্রীরামের প্রিয়, এসব কথা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ, সাধারণ মানুষের কাছে কখনও প্রকাশ করতে যেও না। এমনিতেও ধর্মের কথা নিজের ভাবের লোকের বাইরে কারুর সাথে আলোচনা করতে নেই। যে বলছে তার ভাবটা খেলো হয়ে যায়, অন্যরা বুঝতে না পেরে এই ভাবকে সম্মান দিতে পারবে না। আমি যাঁকে ভক্তি করছি, যে ভক্তির উপর আমার জীবন দাঁড়িয়ে আছে সেই ভক্তিকে নিয়ে কেউ যদি বিদ্রুপ তাচ্ছিল্য করে, আমার ভাবের হানির হয়ে যাবে, ভাবের হানি হয়ে গেলে আমার আধ্যাত্মিক জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয় ভাবের লোক ছাড়া এসব কথা কাউকে বলতে নেই। যাই হোক, এখন তিনজনই কৌশল্যার মহল থেকে বেরিয়ে রাজমহলে যেতেই কৈকেয়ী নিজেই এগিয়ে এসে তিনজনকেই বল্কল দিলেন। সীতা বেচারী বল্কল কিভাবে পড়তে হয় জানেন না, তখন শ্রীরামচন্দ্র বল্কল সীতার গায়েই জড়িয়ে দিয়েছেন। সীতা, যিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাঁকে এভাবে বল্কল পরিধান করতে দেখে সমস্ত রাজপত্নীরা চারিদিক থেকে রোদন করে উঠলেন। বশিষ্ঠ সেই রোদন ধ্বণি শুনতেই কৈকেয়ীকে খুব রেগে গিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। ওহে দুর্বৃত্তে, তুই তো রামের বনবাসই চেয়েছিলি। দুষ্টে! সীতাকে কেন বল্কল দিতে গেলি। সীতা পতিব্রতা, তিনি ভক্তিবশতঃ স্বইচ্ছায় শ্রীরামের অনুগমন করছেন, তাঁর উপর কেউ কোন রকম নিয়ম আরোপ করতে পারে না। সীতার যত আভূষণ, যত দিব্য বস্ত্র আছে সব সীতার সাথে যাবে আর এখান থেকেই সীতা দিব্যালঙ্কারে ভূষিতা হয়ে বনে যাবে। বলা হয় যে, অরুন্ধুতী সীতাকে কিছু দিব্য বস্ত্র দিয়েছিলেন, দিব্য বস্ত্র মানে যে বস্ত্র কখন মলিন ও জীর্ণ হবে না।

এদিকে দশরথ মাটিতে পতিত হয়ে চোখের জল ফেলে কাঁদছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বাবাকে পরিক্রমা করে প্রণাম করলেন। প্রণামাদি করার পর রথে আরোহণ করে বেরিয়ে গেলেন। সবাই কান্নাকাটি করছেন। রাজা দশরথ অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করার পর পরিচারকদের বললেন আমাকে রামজননী কৌশল্যার ঘরে নিয়ে চল, দুঃখসাগরে নিমজ্জিত আমি সেখানে গেলে কিছুক্ষণ হয়ত বাঁচতে পারব। এই হল মানুষের বিচিত্রতা, একটা মেয়েকে এত ভালোবাসত, যে ভালোবাসার জন্য সে এত কিছু করল, কিন্তু একটু অন্য রকম হতেই সব কিছু চলে গেল। কৈকেয়ী এখনও আশায় আছে তার ছেলে ভরত রাজা হবে। যাই হোক মূল কথা হল, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে চলে গেলেন। অযোধ্যার সব পুরবাসিরাও শ্রীরামচন্দ্রের পেছনে পেছনে চলে এসেছে। তাই দেখে শ্রীরামচন্দ্রের আবার মাথা গেছে ঘুরে, জঙ্গলে এত লোকের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কি করে করা হবে! তখন তিনি কায়দা করে রাত্রিবেলা সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে তখন সুমন্ত্রকে বলে রথকে অযোধ্যার দিকে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে আবার নিজেদের গন্তব্যের দিকে চলে গেলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে শ্রীরামচন্দ্রকে কোথাও দেখতে না পেয়ে অযোধ্যার লোকেরা রথের চাকার দাগ অনুসরণ করতে করতে একটা জায়গায় এসে আর খুঁজে না পেয়ে সবাই আবার অযোধ্যায় ফিরে গেল।

সেখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গার তীরে উপস্থিত হয়ে গঙ্গা দর্শন ও প্রণাম করলেন। সেটা ছিল নিষাদরাজের এলাকা। নিষাদরাজ গুহকের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। আগে কখন সখন শ্রীরামচন্দ্র হয়ত এখানে শিকারে আসতেন সেই থেকে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। গুহক শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, এই রাজ্য তো আপনারই অধীনে আপনি আমার গৃহে অবস্থান করুন, আপনাকে আদর আপ্যায়ন করে আমি নিজের জীবনকে কৃতার্থ করি। তখন শ্রীরামচন্দ্র বললেন, আমি তা পারি না, বাবা আমাকে চৌদ্দ বছরের জঙ্গলে বাস করার আদেশ দিয়েছেন, আমি কোন শহর, কোন গ্রাম, কারুর গৃহে বাস করতে পারি না, এমনকি কারুর দেওয়া কোন কিছু আমি নিতেও পারব না। তুমি যে আমাকে ফল, মূল দিচ্ছ এগুলো আমি নিতে পারব না। কিন্তু আমি চৌদ্দ বছর পর ফিরে আসার পথে তোমার সাথে দেখা করব। পরের কাহিনী হল, নিষাদরাজ পরের দিন থেকে শ্রীরামচন্দ্রের মতই থাকতে শুরু করলেন।

এরপর তমসা নদীর তীরে সকালবেলায় বটবৃক্ষের দুধ আনিয়ে রাম আর লক্ষ্মণ জটা তৈরী করলেন। লক্ষ্মণ কুশপত্রাদি দিয়ে ভূমিতে শয্যা প্রস্তুত করে দিলেন। এতদিন রাজপ্রাসাদে রাজপালঙ্কে কোমল শয্যায় শয়ন করে এসেছেন, সেই আনন্দেই শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের দ্বারা নির্মিত শয্যায় শয়ন করলেন আর লক্ষ্মণ সারা রাত সেখানে পাহারা দিতে থাকলেন। এর আগে বিশ্বামিত্র এদের বলা অতিবলা বিদ্যা দিয়েছিলেন। বলা অতিবলা বিদ্যাতে যত রকম ক্ষমতা হয় তার মধ্যে দুটো হল খিদে পাবে না যতক্ষণ না সে খেতে চাইবে আর ঘুম আসবে না যতক্ষণ না সে ঘুমোত ইচ্ছে করবে। এছাড়া পেছন থেকে তাকে কেউ আক্রমণ করতে পারবে না, ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ আক্রমণ করতে পারবে না। রাম আর লক্ষ্মণ দুজনেরই এই শক্তি ছিল। সেইজন্য লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর ঘুমোয়নি।

লক্ষ্মণ ও গুহকের কথোপকথন

এরপর ষষ্ঠ অধ্যায় শুরু। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যাবাসীদের নজর এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে বনে চলে এসেছেন। এই জঙ্গল নিষাদরাজ গুহকের রাজত্ব। লক্ষ্মণ শয্যা তৈরী করে দিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা নিদ্রা যাচ্ছেন। লক্ষ্মণ সারা রাত পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন, সাথে গুহকও জেগে আছেন। গুহক চোখের জল ফেলতে ফেলতে খুব বিনয়ের সাথে লক্ষ্মণকে বলছেন, যিনি গতকাল রাত্রেও রাজাপ্রাসাদে সুবর্ণ পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শয়ন করে এসেছেন আর আজ এই রাতে তিনি কুশপত্র নির্মিত শয্যায় সীতার সাথে নিদ্রা যাচ্ছেন। বিধাতাই কৈকেয়ীকে রামের দুঃখের কারণ করিয়েছেন, মন্থরার বুদ্ধিতে কৈকেয়ী তাই এমন পাপকার্য করেছে। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান, তাঁরই এত দুঃখ, একে আমরা কিভাবে ব্যাখা করতে পারি? ভগবান মানেই তাঁর কোন কর্ম নেই, সঙ্গে সীতা আর লক্ষ্মণেরও কত দুঃখ। জাগতিক দৃষ্টিতে দেখলে এনাদের এত দুঃখ কেন? অধ্যাত্ম রামায়ণে এগুলোর উপর অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের জীবনের দিকে তাকালে এর কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যায় না।

মোটামুটি তিনটে থিয়োরী দাঁড়ায়। একটা হল এলোপাতাড়ি, এলোপাতাড়ি মানে কেন দুঃখ-কষ্ট হয় এর কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয় খুব প্রচলিত থিয়োরী, ঠাকুরের ইচ্ছা। জীবন ভগবান দিয়েছেন, জীবনে দুঃখটাও ভগবান দেন, কষ্টটাও ভগবান দেন আর সুখটাও ভগবান দেন। তৃতীয় খুব জোরাল থিয়োরী হল কর্মবাদ। আমারই কোন এমন কর্ম আছে যে কর্মের জন্য আমি আজ এই দুঃখ বা সুখ পাচ্ছি। এই তিনটের বাইরে চতুর্থ আর কোন থিয়োরী নেই। বাকি থিয়োরীগুলো এই তিনটের মধ্যেই ঘুরপাক খায়। এই তিনটে থিয়োরীর মধ্যে কোনটা ঠিক আমাদের জানার কোন পথ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আমার ভাব পাল্টাচ্ছে। এই ভাব পাল্টানো জিনিসটা কি হতে পারে? ভক্তের অবস্থা আর জ্ঞানের অবস্থা বললে অনেকটা কাছাকাছি বলা হবে ঠিকই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় না। ভাব মানে আমি বোধটা কি অবস্থায় আছে। আমাদের সবারই আমিত্ব বোধ আছে, আমি জানি আমি অমুক, অমুকের সন্তান, অমুকের বাবা, অমুকের মা ইত্যাদি। এই আমিত্বটা পাল্টাতে থাকে, আর এই আমিত্বের সাথে জগতের প্রতি দৃষ্টিটাও পাল্টাতে থাকে। জগতে দুটো জিনিসই আছে, একটা আমি আছি আর জগৎ আছে, এটাকেই আচার্য শঙ্কর যুস্মদ্ প্রত্যয় আর অস্মদ্ প্রত্যয় বলছেন। আমি নিজেকে কি দেখছি আর জগতকে কিভাবে দেখছি। একটা বাচ্চা নিজেকে ঘরের অন্যান্য জিনিসের মতই মনে করে, ঘরে ঘড়ি আছে, খাট আছে, আয়না আছে, টিভি আছে, যা কিছু আছে নিজেকে সে ওই রকমই একটা কিছু মনে করে বা এর উল্টো নিজেকে জীবন্ত মনে করে ঘরের গ্লাশ বাটিকেও জীবন্ত মনে করে। লেখকরাও কোথাও যেন বাচ্চাদের মত হন, বাচ্চারা জগতকে যেমন অন্য ভাবে দেখে, লেখকরাও ঠিক তেমনি একটু অন্য ভাবে দেখেন। এখান থেকে আরেকটু উপরে গেলে আমরা নিজেকে মন রূপে দেখি। মনকে তখনও পদার্থ রূপেই দেখছে। ফলে আমি একটা সলিড মন আপনিও একটা সলিড মন। দুটো সলিড মনের সাথে যখন সংঘাত হয় তখন দুম্ দাম্ আওয়াজ হয়। অন্য দিকে আরেকটা অবস্থা হল নিজেকে চৈতন্য রূপে দেখা। মানুষ যখন নিজেকে চৈতন্য রূপে দেখে, কল্পনা করে নয়, সত্যিকারের দেখে তখন সে দেখে তিনিই সব কিছু করাচ্ছেন। কারণ চৈতন্য রূপে দেখা মানে এটাই দেখা যে ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন, যেখানে যাবতীয় যা কিছু হচ্ছে সব ঈশ্বরই করাচ্ছেন। ঈশ্বরের ভাবে যদি মানুষ না থাকে তখন সে প্রকৃতির ভাবে বা মনের ভাবে এসে যাবে, সচরাচর আমরা যে ভাবে সব সময় থাকি। প্রকৃতির ভাবে থাকলে তখন হবে সব কিছু কর্ম করাচ্ছে। আর দর্শনের দিক থেকে কিছুই যদি না নেয়, তখন মনে হবে সব এলোপাতাড়ি চলছে, কোন কিছুর মাথামুণ্ডু নেই। এই তিনটে ভাব চলে। এই তিনটে ভাবের মধ্যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বলা অসম্ভব। কারণ যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ তিনি সব সময় দেখবেন সব ঈশ্বরই করছেন। ঈশ্বর যদি সব কিছু করেন তিনি কি এলোপাতাড়ি সব কিছু করেন? ঠাকুর

বলছেন, তাঁর কার্য কি বুঝা যায় গা। ঈশ্বরের কার্য বোঝার ক্ষমতা কারুরই নেই। অথচ মানুষের মনের বৈশিষ্ট্যই হল সব জিনিসে pattern দেখা। আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, সেই মেঘে আমি একটা মুখ দেখব বা কোন একটা পাখি বা পশুর স্বরূপ দেখব। স্বামীজী ভারত মহাসাগরের উপর কবিতা লিখছেন সেখানেও তিনি এই ভাব নিয়ে আসছেন, এই যে মেঘ ভেসে যাচ্ছে কখন তাকে সিংহের মত দেখাচ্ছে, কখন প্রেমিক যুগলের মত দেখাচ্ছে। মানুষের মনের এটাই স্বভাব, মনের গঠনটাই এমন ভাবে তৈরী যে আমরা সব সময় pattern দেখব। তাহলে গাছ থেকে একটা আপেল পড়ল, তারও একটা pattern থাকবে। পদার্থ বিজ্ঞানের এত অগ্রগতির ফলে আরও বেশি patternএর নাম দিয়ে দিয়েছে। যাঁরা সব কিছুতে pattern দেখেন, তাঁরাই সব কিছুতে কর্মবাদকে নিয়ে আসেন। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরের উপর পুরোপুরি নির্ভর করে চলেন তাঁরা কখন ব্যাখ্যা দেবেন না, তাঁর ইচ্ছাতেই হয়েছে। এটা কেন হল? কি করে আমি বলব কেন হল, তিনি অনন্ত তিনি কেন করলেন আমি কি করে জানব! কথামৃত খুব বিচার করে পড়লে একটা জিনিস দেখা যাবে, কোথাও ঠাকুর কিন্তু pattern দেখছেন না। যখনই কেউ pattern নিয়ে কথা বলছে, যেমন ইলেক্ট্রিসিটি নিয়ে কেউ বোঝাতে গিয়ে বলছেন উঁচু জায়গাতে বাজ পড়ে। ঠাকুর তাকে বলছেন, তা কেন হবে, আমি তো দেখলাম বড় বাড়ি ছেড়ে তার পাশে নীচু বাড়িতে বাজ পড়েছিল। ঠাকুর কখনই pattern দেখতেন না। আধ্যাত্মিক পুরুষ কখনই pattern দেখতে চান না। কিন্তু সাধারণ মন pattern ছাড়া চলতে পারে না। যেখানে কোন pattern নেই সেখানেও pattern দেখবে। কর্মবাদ থিয়োরী হল, মানুষের মনের যে উচ্চতম অবস্থা, যেখানে unrelated জিনিস সেখানেও pattern দেখে। এটাই মনের উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু আমাদের মত সাধারণ মানুষের সব কিছুই এলোপাতাড়ি। একজন নামকরা লেখক তাঁর সব কটি বইতে দেখাচ্ছেন সবটাই random, pattern বলে কিছু নেই। যদি ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় আমাদের মাথাটা পুরো খারাপ হয়ে যাবে। আমাদের সবটাই random, by chance জন্মেছি, by chance মরে যাব। সাধারণ লোক যদি সবটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে বিরাট ধাপ্পাবাজ লোক হয়ে যাবে, কারণ সবটাই passivity। যাঁরা কর্মবাদ মানেন তাঁরা খুব সক্রিয় হন। জীবন চালানোর জন্য দরকার রজোগুণ, রজোগুণের জন্য কর্মবাদকে মানতে হয়। কর্মবাদ না মানলে সাধারণ মানুষ কোন দিন নিজেকে উন্নত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে না।

এখানে কোনটা সত্য আমাদের পক্ষ বলা অসম্ভব। যিনি সমাধিবান পুরুষ তিনি দেখছেন ঈশ্বর ছাড়া কিছু নেই, যা কিছু হয় সব তিনিই করেন। সাধারণ লোক এটা বুঝতেও পারবে না। অতি সাধারণ লোক বলবে সবটাই এলোপাতাড়ি। এর মাঝারি মানুষের জন্য কর্মবাদ। আজ আমার ভালো কিছু আসছে, কারণ এই জন্মে বা আগের আগের জন্মে আমি শুভ কর্ম করেছি, আমি পরিশ্রম করেছি। আমার এত দুর্গতি কেন? আমারই কোন অশুভ কর্ম করা ছিল তাই আজ দুর্গতি চলছে। ভালো হোক মন্দ হোক কর্মবাদ সবটাই নিজের উপর ফেলে দেয়। এভাবে লড়াই করে যেতে যেতে শেষ অবস্থায় গিয়ে দেখে, সব কিছু তিনিই করাচ্ছেন। আপনি বলবেন, ঈশ্বর সব কিছু করাচ্ছেন এই ভাবটা প্রথমে নিয়ে নিলেই তো হয়। নেওয়া যাবে না কেন, নিলেই হল। কিন্তু অঙ্ক পরীক্ষায় অঙ্কের উত্তরটা আপনার জানা নেই, কারুর কাছ থেকে শুনে লিখে দিলেন। তাতে অঙ্ক পরীক্ষায় হয়ত পাশ করে যাবেন কিন্তু জীবনে অঙ্ক আর শেখা হবে না। অঙ্কের উত্তরটা জানার জন্য আপনাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। কাঠখড় পোড়ালে অঙ্কটা শেখা হয়। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অবস্থায় যাওয়ার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সবটাই তিনি করাচ্ছেন, এটাকে জানার জন্য আগে প্রচুর কর্ম করতে হবে, কর্ম দিয়ে ওই উচ্চ অবস্থায় না গেলে তমোগুণী হয়ে জন্মের পর জন্ম ওখানেই পড়ে থাকতে হবে। হিন্দু ধর্মের দর্শনানুসারে ঈশ্বর নিরাকার, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য পাপ-পূণ্য ঈশ্বরের উপর কখনই যেতে পারে না। ধর্মশাস্ত্র নিয়ে আলোচনার সময় এগুলোকে নিয়ে প্রচুর আলোচনা চলে। ঈশ্বরই যদি সব কিছু করান, তাহলে কর্মের দরুণ যে পাপ-পূণ্যও হবে তার সব কিছু ভগবানের উপরেই চলে আসার কথা। সেইজন্য বলে ঈশ্বর নির্বিকার, তিনি দ্রষ্টা মাত্র, তিনি আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। হিন্দু ধর্মের এটি একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত। খ্রীশ্চান আর ইসলাম ধর্মে এটাই একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এই দুটি ধর্মে ভগবানই কর্তা, তিনিই সব কিছু করান। তাহলে পাপ-পূণ্যের দায়ও ভগবানের উপর গিয়ে পড়বে। আচার্য শঙ্করও একাধিকবার এইসব প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু ওদের কাছে এর কোন উত্তর নেই। আমি যদি পূণ্য কর্ম করি, এই পূণ্যের কর্মের জোরে আমি কেন স্বর্গে যাব, ভগবানই তো স্বর্গে যাবেন। কারণ তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়, তিনিই সব করাচ্ছেন। তাহলে আমার আর পাপ-পূণ্য বলে কিছু থাকবে না। হিন্দু ধর্মে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা আসে বা কর্মবাদ আসে অথবা দুটো মিলিয়ে আসে, দুটো মিলিয়ে বলা মানে,

তিনি যখন কিছু করেন বা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যেটা আসে সেটাও কর্মের মাধ্যমেই আসে। সেইজন্য ঈশ্বর সরাসরি দায়ী হন না। তিনি যাঁদের জন্য দায়ী হন তাঁরা পাপ-পূণ্যের পারে চলে গেছেন। গীতায় ভগবান বলছেন *যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌*, যিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বরে সমর্পিত তাঁর সব দায়দায়ীত্ব ঈশ্বর নিজে নিয়ে নেন। সুতরাং তাঁর ভালোমন্দ যা হবে সেটাও ঈশ্বরের, কিন্তু তাঁর ভালোমন্দ বলে কিছু থাকে না, ভালোমন্দের ঊর্ধ্বে চলে যান। তাহলে বাকিদের কে দেন? বাকিদের ঈশ্বরই দেন, কিন্তু তাদের কর্মের মাধ্যমে দেন। এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন। তখন লক্ষ্মণ গুহকের কথার উত্তর দিতে গিয়ে এই বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করছেন –

তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহসখে শৃণু বচো মম।
কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা।২/৬/৪

গুহক লক্ষ্মণকে বলছিলেন, বিধাতা কৈকেয়ীকে শ্রীরামচন্দ্রের দুঃখের কারণ করেছেন। মন্থরার বুদ্ধিকে আশ্রয় করে কৈকেয়ী এমন পাপকার্য করল। গুহকের কথা শুনে লক্ষ্মণ বলছেন, *কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা*, হে সখে! এই জগতে কে কার সুখের কারণ হয় আর কেই বা কার দুঃখের কারণ হয়। মানে, কেউই কারুর সুখ-দুঃখের কারণ হয় না। স্বামীজী এক জায়গায় খুব সুন্দর বলছেন, আমাদের চারিপাশে নানা রকমের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াতে ভর্তি। কিন্তু সবাইকে সংক্রামক রোগ আক্রমণ করে না। যার শারীরিক গঠন দুর্বল তাকেই ভাইরাস আক্রমণ করে। শরীর মন যদি দুর্বল না হত তাহলে কখনই তার এই সংক্রামক ব্যাধি হত না। সুখ-দুঃখের ব্যাপারেও ঠিক তাই হয়। যা কিছু চারিদিকে হচ্ছে বেছে বেছে আমারই কেন লাগছে, কারণ আমি নিজেকে দুর্বল করে রেখেছি।

আমেরিকার এক মহিলার খুব ইচ্ছে যে তার মেয়ে বিশ্ব সুন্দরীর প্রতিযোগিতায় যাবে। মেয়েটি চৌদ্দ-পনের বছরের কিন্তু মোটাসোটা। মহিলাটি মেয়েকে জানিয়ে প্রচুর টেপ ওয়ার্মের ডিম খাইয়ে দিয়েছে। মেয়েটির পেটে এখন প্রচুর টেপ ওয়ার্ম হয়ে গেছে। মেয়েটির খাবারগুলো টেপ ওয়ার্ম খেয়ে নিলে মেয়েটি স্লিম হয়ে যাবে, স্লিম হয়ে গেলে মেয়ে বিশ্ব সুন্দরী হতে পারবে। ইতিমধ্যে পেটে প্রচুর টেপ ওয়ার্ম হয়ে যেতে মেয়েটির পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। মেয়েটিকে টয়লেটে নিয়ে যেতে দেখছে বড় বড় টেপ ওয়ার্ম বেরোচ্ছে, আর এমনই শক্তিশালী যে ওই প্যান থেকেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ডাক্তাররা অবাক হয়ে ভাবছেন এত টেপ ওয়ার্ম হল কি করে! তখন ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেলেছে। মা এখানে নিজের মেয়েকে টেপ ওয়ার্মের ডিম খাওয়াচ্ছে, আমার মেয়েকে বিশ্ব সুন্দরীর করতে হবে। সরাসরি দেখতে গেলে মাকেই দায়ী মনে হবে, কিন্তু কোথাও মেয়েও দায়ী। তারও ইচ্ছে যে আমি র‍্যাম ওয়াকিং করব, লোকে আমাকে দেখবে, আমি বিশ্ব সুন্দরী হব, তারও কোথাও এই ব্যাপারে একটা দুর্বলতা আছে। আমরা নিজেরা যদি দুর্বল না হই বাইরের লোক আমাকে কখনই দুঃখ দিতে পারবে না। আমরা যদি না চাই কেউই আমাদের সুখ দিতে পারবে না। দুর্বল ব্যক্তি নিজেই নিজের দুঃখের কারণ, সে নিজেই দুঃখ পায়, তাকে অপর কেউ দুঃখ দেয় না। আমরা অনেক সময়ই বলি, ওর জন্য আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। কেউই কারুর জীবন শেষ করে দিতে পারবে না। কারণ প্রত্যেকটি মানুষ সেই শুদ্ধ আত্মা, আত্মার শক্তি সবারই ভেতরে পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, সেইজন্য কেউ কারুকে নাশ করে দিতে পারে না। মানুষের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, পদ্মপাতার জলের মত একবার একটা নাড়া দিলে সব দুর্বলতা ঝরে যাবে। কিন্তু মানুষের মধ্যে আত্মার যে শক্তি বিদ্যমান, এই শক্তিকে কখনই ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায় না। এটা কোন তত্ত্ব কথা নয়, এটাই বাস্তব।

আসলে মানুষ নিজেই দুঃখের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। তা নাহলে আমরা পয়সা দিয়ে চোখের জল ফেলার জন্য দিলীপকুমার, উত্তমকুমারের ট্রাজেডি সিনেমা দেখতে যেতাম না। মানুষ ওটাই ভালোবাসে যেটা তার নেই। দুঃখ নেই বলে দুঃখ পাওয়ার জন্য ট্রাজেডি সিনেমা দেখতে যায়। বানরের অনেক রকমের সমস্যা হয়, কিন্তু মানিয়ে নেয়। কিন্তু যদি কোন ভাবে বানরের ফোড়া হয়ে যায় তখন তার সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যায়। সারাক্ষণ বানর তার ফোড়াকে আদর করতে থাকে। এত আদর করে যে ফোড়াটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। সব কিছু ছেড়ে বানরের সব মন এখন ঐ ফোড়াতেই। আশেপাশের বানরগুলোও এসে ওর ফোড়াকে আদর করতে থাকে। মানুষের দুঃখটা এই রকমই। মানুষ হাসি নিয়ে বাঁচতে পারে না, দুঃখ আর চোখের জল নিয়েই মানুষ বাঁচে। বাচ্চা বয়সে মানুষ আহার নিদ্রাকে নিয়ে কান্নাকাটি করে। বাচ্চারা জানে না চিন্তা, দুর্ভাবনা কি জিনিস, বাচ্চা বয়স থেকে

ওদের এর জন্য ট্রেনিং দিতে হয়। কিসের ট্রেনিং? দুঃখ বোধ করার ট্রেনিং। সারাটা জীবন আমরা ট্রেনিং নিয়ে এসেছি কিভাবে চোখের জল ফেলতে হবে। আমরা সবাই সুযোগের অপেক্ষায় আছি কখন একটু কাঁদব। সেখানে এই বলা, অপর কেউ আমাকে দুঃখ দিচ্ছে এর কোন অর্থই হয় না। আমরা সবাই জানি জগতে মৃত্যু আছে, নিকট কেউ যদি মরা যায় তাতে আমাদের দুঃখ করার কি আছে! কারণ মৃত্যু স্বাভাবিক। লক্ষ্মণ গুহককে এই কথাই বলছেন *কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা*, আমাকে সুখও কেউ দেয় না, দুঃখও কেউ দেয় না। দুঃখ বোধ করতে চাইছি তাই আমাদের দুঃখ বোধ হয়। সুখ আর আলাদা ভাবে বোধ হবে কি করে, আমি তো আনন্দস্বরূপ, সুখেই আমি সর্বদা অবস্থিত। মানুষ স্বধর্মে অবস্থিত থাকলে তখন তার সুখও হয় না, দুঃখও হয় না। Goal setting নিয়ে যখন চলে তখনই তার দুঃখ আসে। অর্জুনের এত বিষাদ কেন? অর্জুনও goal setting করে রেখেছে। অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ নির্বিকার, কারণ তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত। অর্জুনের goal setting হল এই যুদ্ধে আমাকে জয়লাভ করতে হবে। কিন্তু এর পরিণতি আমার সম্বন্ধীরা সবাই মারা যাবে। অর্জুনের দুঃখ শুরু হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ দেখছেন এটাই আমার স্বধর্ম, এখানে কাঁদারও কিছু নেই হাসিরও কিছু নেই। যখনই স্বধর্ম পালনে মানুষে নেমে যাবে তখন আর সুখ দুঃখ বলে কিছু থাকবে না। শ্রীরামচন্দ্র বলে দিলেন আমি বাবার আদেশ পালন করব, এখানেই সব কিছুর মীমাংসা হয়ে গেল। কিন্তু যখনই কোন উদ্দেশ্য থাকে, আমার উদ্দেশ্য সুখ পাওয়া, নাম-যশ পাওয়া, তখনই সে স্বধর্ম থেকে সরে এল, কারণ এগুলো স্বধর্ম নয়। লক্ষ্মণ আবার বলছেন –

স্বপূর্বার্জিতকর্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ।২/৬/৫

যদি আপাতঃ জাগতিক দৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলে সুখ-দুঃখের কারণ হল, আমাদের নিজের নিজের আগের যা কর্ম করা হয়েছে তারই ফল এই সুখ-দুঃখ। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, অবতার পুরুষদের সুখ-দুঃখ নিয়ে কখনই আলোচনা করতে নেই। শ্রীরামচন্দ্রের যে দুঃখ বা শ্রীকৃষ্ণের যে কদাচিৎ দুঃখ, যদিও কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে চোখের জল ফেলতে দেখান হয়নি বা শ্রীরামকৃষ্ণেরও যে কিছু কিছু দুঃখ, যেমন হালদার মশাই বুটের গোজা মারছেন আবার হৃদয়রাম এত ভাবে গঞ্জনা দিচ্ছে, এগুলোকে কখনই জাগতিক দৃষ্টিতে নিতে নেই। কারণ অবতারের প্রথম শর্তই হল তিনি শুভ-অশুভের পারে অবস্থিত, তিনি কর্ম-অকর্মের পারে থাকেন সেইজন্য এই প্রশ্নগুলোই হয় না। তবে অবতারের মাধ্যমে সাধারণ লোকেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ধরণের শাস্ত্র সব সময় হয় সাধারণ লোকেদের জন্য। এটাই এখানে বলছেন, আমাদের সুখ-দুঃখের হেতু কেউই নয়, হেতু আমি আপনি নিজে। এই ভাবটাই পরের শ্লোকেও টেনে নিয়ে বলছেন –

সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ।২/৬/৬

অন্য কেউ আমাকে সুখ বা দুঃখ দিয়েছে বা দিচ্ছে এটাই কুবুদ্ধির পরিচয়। *অহং করোমীতি বৃথাভিমানঃ*, আমি কর্তা অর্থাৎ নিজেকে কর্তা মনে করাটা মিথ্যা অভিমান। কারণ সবাই নিজের নিজের কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে আছে। পরের দিকে যত রামায়ণ রচিত হয়েছে সব রচনাই অধ্যাত্ম রামায়ণের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছে। আর কিছু বিচিত্র ধারণা, যেমন রাম জন্মের আগেই রামকথা লেখা হয়ে গিয়েছিল, এই ধারণা গুলো অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেই এসেছে। পুরাণের একটা অসুবিধা হল, পুরাণে দর্শনের আলোচনা গুলি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, শুদ্ধ বেদান্তে গিয়ে শেষ করতে পারে না। শুদ্ধ বেদান্তে না থাকার জন্য দর্শনের আলোচনাগুলো কোথাও কোথাও অযৌক্তিক হয়ে যায়। এখানে একটা খুব প্রচলিত ধারণাকে নিয়ে আসা হয়েছে, তা হল মানুষ নিজের কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা। এটাকে ঠিক ভাবে বুঝতে না পারলে মনে হবে আমরা যেন স্বাধীন নই। কিন্তু মানুষ সব সময়ই স্বাধীন। প্রথম হল ভারতে কর্মবাদের প্রভাব প্রচণ্ড, আর কোন বাদ এত প্রভাব ফেলতে পারেনি। ইসলামকে যদি define করা হয়, তাহলে আল্লা আসবে। খ্রীশ্চান ধর্মকে define করে God। কিন্তু হিন্দু ধর্মের distinctive feature হল কর্মবাদ। পুনর্জন্মবাদ কর্মবাদেরই পরিণতি, মুক্তি জিনিসটাও কর্মবাদের পরিণাম, আমাদের শাস্ত্রাদিতে যা কিছু আলোচনা আছে সবই কোন না কোন ভাবে কর্মবাদে চলে আসে। ফলে কর্মকে নিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন আসতে শুরু হয়ে যায়।

এখানে বলছেন, *স্বকর্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ*, মানুষ কর্মের দড়ি দিয়ে বাঁধা। শুনে মনে হবে যেন আমাদের কোন স্বাধীন সত্তা নেই। কিন্তু তা নয়, আমরা পুরো স্বাধীন। যতক্ষণ আমরা আমাদের স্বাধীন সত্তার

জোর না দেখাই ততক্ষণ কিন্তু ওটা নিয়মমত চলে। যেদিন বলবে আমি নিয়মকে ভাঙলাম, তৎক্ষণাৎ ওই নিয়ম ভেঙে পড়ে যায়। কারণ আমার আপনার অতীতের কর্ম আমাদের বর্তমানে নিয়ে এসেছে। বর্তমান কর্মগুলি আবার ভবিষ্যত কর্মের জন্ম দিচ্ছে। তার মানে স্থায়ী ভাবে আমি কর্মের শেকলে বাঁধা হয়েই থেকে যাচ্ছি, মুক্তি তাহলে তো কোন দিনই হবে না। বেদান্ত বলবে, তোমার সবটাই কর্মের উপরই চলে, কিন্তু যেদিন তুমি বলে দেবে আমি কর্মের বাইরে সেদিন তুমি এর বাইরে। সেইজন্য বেদান্ত কখনই ভক্তি, মুক্তি এগুলোকে কর্মের পরিণতি বলবে না, তাঁরা বলবেন জ্ঞানের পরিণতি। যতক্ষণ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ সত্যিই সবাই কর্মে বাঁধা। কিন্তু এটাও চিরন্তন নিয়ম নয়, মানে মৌলিক নিয়ম নয়। মৌলিক নিয়ম হল মানুষ স্বাধীন, মৌলিক নিয়ম হল মানুষ স্বভাবেই মুক্তির অধিকারী। কিন্তু এর দ্বিতীয় স্তরের নিয়ম হল মানুষ কর্মে বাঁধা। আপনি যদি নিজেকে কর্মে বাঁধা মনে করতে চান তাহলে কোন দিন কর্ম আপনাকে ছুটি দেবে না, প্রকৃতি কোন দিন আপনাকে ছাড়বে না। যেদিন আপনি বলবেন, আমি এর থেকে বেরোতে চাই সেদিনই আপনি বেরিয়ে যেতে পারবেন। আমি বেরোতে চাই, এই যে ভাব, এই ভাবকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই ভাব কেন আসে? কারণ উনি তো কর্মের মধ্যেই পড়বেন না। এই বিচার আসে সাধুসঙ্গ থেকে বা জীবনে এত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে যে হঠাৎ তার আত্মা যিনি পুর্ণজ্ঞানে, পূর্ণ স্বাধীনতাতে প্রতিষ্ঠিত তিনি চেঁচিয়ে উঠে বলেন, আর নয়। সাধুসঙ্গে ওই চেতনাটা কোন ভাবে এসে যায়। সেই চেতনাকে যখন একবার ধরে নিল তখন সে বলে দেয়, অনেক হয়েছে এবার আমাকে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন আর তার উপর কর্মের বিধান চলবে না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কর্মবাদই ঠিক ঠিক, তখন সে কর্মে বাঁধা।

এর আগে যেমন বলা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন মানুষকে passive বানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি কর্ম জিনিসটাও মানুষকে passive বানিয়ে দেয়। তখন থেকে থেকে এই বিলাপই করতে থাকবে, আমি তো কর্মে বাঁধা, আমি আর কি ভালো করতে পারি, আমার পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মের ফলে আজ আমার এই দুরবস্থা, আমার কি আর কখন ভালো হতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু বেদান্ত মানেই ক্রমাগত লড়াই, এই লড়াই যখনই বন্ধ হয়ে যাবে বুঝবেন আপনি আর বেদান্তী থাকলেন না। বেদান্তের মূল কথাই হল *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*, বৃহতেই সুখ। আমি বৃহতের দিকে যাব, বৃহতের দিকে যাওয়ার যে লড়াই এটাই বেদান্তের মূল কথা। জীবন সব সময় আমাদের সামনে দুটো সুযোগ এনে দেয়, একটাতে ছোট দেবে আরেকটাতে বৃহৎ দেবে। বেদান্ত সব সময় বলছেন, তুমি বৃহতকে নাও। কর্মবাদও আমাদের দুটো দিচ্ছে, হেয় আর শ্রেয়। হেয় মানে তুমি কর্মে বাঁধা, এর থেকে ভালো কিছু তুমি করতে পারবে না। শ্রেয় বলছে, আমার পূর্ব পূর্ব কর্ম আমার এই দুরবস্থা করেছে, এবার ভালো কর্ম করে আমি আমার কর্মকে পাল্টাব। বেদান্ত বলছে তুমি শ্রেয়কে নাও, হেয়কে নিতে যেও না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেও দুটো আসছে, হেয় আর শ্রেয়ো। তখন হেয় মানে, আমার আর কিছু করার দরকার নেই, তিনিই যা করার করবেন, তিনিই রক্ষা করবেন। আর শ্রেয় মানে, তিনি তো সব কিছু ঠিক করেই রেখেছেন, আমার তো আর চিন্তা করার কিছু নেই, তাই এবার আমি পুরো দমে সুপারম্যান হওয়ার চেষ্টা করে যাব, মৃত্যু তো আমার অবধারিত, তাহলে মৃত্যুকে নিয়ে আমার চিন্তা করার কি আছে! দ্রোণচার্যকে সবাই বলছে, ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম হয়েছে আপনাকে বধ করার জন্য, একে আপনি অস্ত্র শিক্ষা দেবেন না। দ্রোণাচার্য তখন বলছেন, এটাই যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার ধর্ম ছাড়তে যাব কেন! ঈশ্বর যদি ঠিকই করে থাকেন ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতেই আমার মৃত্যু, ঈশ্বরের বিধানকে তো খণ্ডন করা যাবে না, তাই বলে আমার ধর্মকে কেন আমি ছেড়ে দেব! ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিনি অস্ত্র শিক্ষা দিলেন আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিষ্যই পরে গুরুকে বধ করল। তাতে কি দ্রোণাচার্য ছোট হয়ে গেলেন! আর ধৃষ্টদ্যুম্ন যদি তাঁকে না মারতেন তাহলে কি তিনি চিরদিন বেঁচে থাকতেন! মানব জীবনের সব থেকে হেয় হল নিজের স্বধর্মকে ত্যাগ করা। গীতাতে ভগবান বলছেন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ*। কেন বলছেন? স্বধর্মই মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যায়, এই যে বলছেন *যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্*, স্বধর্ম ভূমা মানে শ্রেয়োর দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বধর্মে না থাকলে নীচের দিকে নিয়ে যাবে। যদি কখন কোন আপোষ করতেই হয়, তাহলে তাকে সব সময় মনে করতে হবে, আমাকে তো আপোষ করতে হচ্ছে কিন্তু জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না। যেটুকু আপোষ না করলেই নয় ততটুকু করার করে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। তাই কর্মই বলুন, ঈশ্বরের ইচ্ছাই বলুন, যাই বলুন, সবেতেই এটাই দেখার শেষ পর্যন্ত আমি উপরের দিকে কিভাবে যেতে পারি, আমি আরও ভালো মানুষ কিভাবে হতে পারি। কিন্তু মানুষ কি করে?

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-দ্বেষ্যমধ্যস্থবান্ধবাঃ।
স্বয়মেবাচরন কর্ম তথা তত্র বিভাব্যতে।২/৬/৭

জীবনে চলতে গিয়ে মানুষ কাউকে সুহৃদ মনে করে, কাউকে শত্রু মনে করে, কাউকে আমরা দ্বেষ করি, কাউকে উদাসীন মনে করি, কাউকে মধ্যস্থ মনে করি। কিন্তু এরা কি তাই? কখনই নয়, আমি আমার মত চিন্তা করে করে অপরের প্রতি আমার এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করে নিয়েছি। আমি একজনকে অনেক দিন ধরে পছন্দ করি না, কিন্তু কেউ না কেউ তাকে ভালোবাসে। তার ছেলে, তার স্ত্রী, তার বাবা-মা, তার বন্ধুরা, কেউ না কেউ তাকে ভালোবাসছে। তার মানেই হল, inherently সে খারাপ নয়। তাহলে আমার কাছে সে খারাপ কেন? খারাপটা আমার মনের ভেতরে। এটাই লক্ষ্মণ বলছেন, কৈকেয়ীকে যে আমরা দোষ দিচ্ছি, এটা আমাদের মনের কল্পনা। আর বলছেন –

সুখং না যদি বা দুঃখং স্বকর্মবশগো নরঃ।
যদ্‌যদ্‌যথাগতং তত্তদ্‌ভূক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ।২/৬/৮

সুখ দুঃখ এই দুটো প্রারব্ধ থেকে আসতে থাকে, সেইজন্য যেমন যেমন যা আসছে সেটাকে মেনে নিতে হয়। ঝড় যখন আসে তখন মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়। ঠিক তেমনি যখন সুখ আসে তখন তার জন্য বেশি লাফালাফি করতে নেই। বাচ্চারা আবেগজনিত ব্যাপারে খুব নড়বড়ে হয়। খেলনা দিলে আনন্দ, খেলনা কেড়ে নিলেই কান্না। আমাদেরও বাচ্চাদের মত অবস্থা, ভালো কিছু হলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠছি, খারাপ কিছু হলেই ভেঙে পড়ি। হিন্দু শাস্ত্র এই জিনিসটার উপর বারে বারে আলোকপাত করে গেছে, ভাগবতেও ঘুরে ঘুরে আসে, গীতাতেও ঘুরে ঘুরে আসে, রামায়ণেও অনেকবার আসে। সুখ আর দুঃখ নিজের মত আসে আবার নিজের মত চলে যায়। ভাগবতে খুব সুন্দর বলছেন, জীবনে কেউই দুঃখ চায় না, মানুষ মাত্রই চেষ্টা করে যাতে দুঃখ না আসে, তাও তার দুঃখ-কষ্ট আসে, প্রিয়জনের বিয়োগ হবেই, অপ্রিয়ের সংযোগ হবেই। সুখের ক্ষেত্রেও তাই হয়, চেষ্টা না করলেও সুখ আসবে। তাহলে সুখের জন্য এত চেষ্টা করার দরকারটা কি? সুখের জন্য যদি চেষ্টা না করি তাহলে আমরা করবটা কি? স্বধর্ম পালন ছাড়া অন্য কিছু করার নেই। আপনি নিজে ঠিক করে নিন আপনার স্বধর্ম কি। মহাভারত, মনুস্মৃতিতে স্বধর্মের সংজ্ঞা বলে দেওয়া হয়েছে, ঐটাকে শুধু করে যাওয়া। বর্তমান কালে নতুন আদর্শ, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা আর ত্যাগ। নিজেকে বিদ্যার প্রতি বা দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য, বা মানবজাতির সেবার প্রতি বা ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দেওয়া, এই চারটে ছাড়া পঞ্চম কোন আদর্শ হয় না। এর যে কোন একটা বা একাধিক কোন আদর্শে পুরোপুরি নিজেকে দিয়ে দেওয়া। এরপর যা সুখ বা দুঃখ আসার নিজে থেকে আসবে, নিজে থেকেই চলে যাবে, ওদিকে আর তাকাতে নেই।

ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জ্জনে।
আগচ্ছত্বথ মাগচ্ছত্বভোগবশগো ভবে।২/৬/৯

এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শ্লোক। এই কথাগুলো লক্ষ্মণ বলে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণ একজন জীবনমুক্ত পুরুষ, ঋষিদের মত কথা বলছেন। লক্ষ্মণ বলছেন, আমরা ভোগের কামনা করি না, আর ভোগ ত্যাগ করার কামনাও আমরা করি না। ভোগ আসুক আর নাই আসুক, আমরা ভোগের অধীন নয়। একটা খুব প্রচলিত কাহিনী আছে, এই কাহিনীটা বলে দিলে লক্ষ্মণের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে। একবার দুজন ফাদার এক জায়গা থেকে তাঁদের আশ্রমে ফিরছিলেন। একটা জায়গায় এসে দেখেন একজন যুবতী বসে বসে কাঁদছে। মেয়েটির পায়ে লেগেছে, আর ওর প্রেমিক নদীর ওপারে থাকে। মেয়েটি তার প্রেমিকের কাছে যেতে পারবে না বলে কাঁদছে। একজন ফাদার বলল, ঠিক আছে তুমি আমার কাঁধে বস, আমি তোমাকে নদী পার করিয়ে দিচ্ছি। ফাদার মেয়েটিকে কাঁধে নিয়ে নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়েছে। এরপর ফাদার দুজন আশ্রমে চলে গেছেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রথম ফাদার দ্বিতীয় ফাদারকে, যিনি মেয়েটিকে কাঁধে নিয়েছিলেন তাঁকে বলছেন, দেখুন আমরা হলাম সন্ন্যাসী, আপনি আজ কত বড় অন্যায় কাজ করলেন, সন্ন্যাসী হয়ে একটা যুবতী মেয়েকে স্পর্শ করলেন, তাকে কাঁধে বসালেন। ব্রহ্মচর্য, পবিত্রতা আমাদের ধর্ম, আর সেখানে আপনি একটা নারীর সঙ্গ করলেন। দ্বিতীয় ফাদার তখন হেসে বলছেন, আমি তো মেয়েটিকে কাঁধে করে নদীর পারেই ছেড়ে দিয়ে এসেছি, তুমি এখনও মেয়েটিকে বয়ে বেড়াচ্ছ!

সারা জগৎ নারীকে নিজের কাছে আনতে চাইছে। তার মানে এই যে মেয়েটিকে নিয়ে ভোগ হবে, সেই ভোগ দুজনেরই নিয়ন্ত্রণে আছে। প্রথম জন তাঁরও নিয়ন্ত্রণে আছে কারণ তিনি তাকে সরাতে চাইছেন। কিন্তু যিনি পার করে দিয়েছেন, তিনি এটারও পারে ওটারও পারে। ঠাকুর স্বামীজীর জীবনকে যদি আমরা তাকাই, ওনারা সব কিছুতে নির্বিকার। কে কাছে এসেছে, কে দূরে চলে গেছে কোনটাতেই তাঁদের কিছু আসে যায় না। অথচ ঠাকুর তাঁর শিষ্যদের, যাঁদের মন তখনও কাঁচা, তাঁদের তিনি কত অনুশাসনের বেড়াজালে আটকে রেখেছেন, তাঁদের কথা পর্যন্ত বলতে দিতেন না। কারণ যিনি নারীর চিন্তা করে আনন্দ পান, তিনিও কিন্তু ভোগের মধ্যেই আছেন। আর যিনি নারীর চিন্তাকে মন থেকে মেরে তাড়াতে চাইছে তিনিও কিন্তু নারীর ভোগের মধ্যে আছেন। যিনি নির্বিকার হয়ে গেছেন, তিনিই পাকা খেলোয়াড়, তিনিই ঠিক ঠিক। লক্ষ্মণ ঠিক এই কথাই এখানে বলতে চাইছেন। লক্ষ্মণ শুধু নারীর কথা বলছেন না, সমস্ত রকম ভোগের ব্যাপারে বলছেন। ভোগ আসুক এটাও চাই না, ভোগ এসে গেলে তাকে তাড়াতে হবে সেটাও চাই না। আমরা কোন পরিস্থিতিতেই ভোগের বশে নয়। সন্ন্যাসী আর সাধারণ মানুষের এটাই তফাৎ, জীবনের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরাট আকর্ষণ, আর যারা হতাশাগ্রস্ত তাদের মৃত্যুর প্রতি বিরাট আকর্ষণ। সন্ন্যাসীর জীবনের প্রতিও আসক্তি নেই, মৃত্যুর প্রতিও আসক্তি নেই, জীবন আর মৃত্যু দুটোরই পারে চলে যান। ঠিক তেমনি, সন্ন্যাসীর ভোগের প্রতি কোন আকাঙ্খা থাকে না আর ত্যাগের প্রতি, জিনিসটা তাড়াতে হবে, সেটার প্রতিও কোন আকাঙ্খা থাকে না, দুটোতেই তিন নির্বিকার। স্বামী প্রেমেশানন্দজীকে একজন ভক্ত খুব দামী একটা সিল্কের আসন দিয়েছিল। মহারাজ বসার পর আসনটাকে উল্টে রাখতেন। সেবক দেখে একদিন বলছেন, আসনটাকে যদি উল্টো করেই রাখতে হয় আপনি নিলেন কেন? মহারাজ সেবককে বলছেন, দিল তাই নিলাম, কিন্তু আমি যদি সোজা করে রাখি তাহলে এই দামী আসন দেখে গ্রামের গরীব লোকেদের মনে একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। সেইজন্য মহারাজ ব্যবহার করে উল্টে দিচ্ছেন। তার মানে মহারাজের ভোগেরও কোন ইচ্ছা নেই, ত্যাগেরও কোন ইচ্ছা নেই। তুমি দিয়েছ খুব ভালো, কিন্তু ব্যবহার কিভাবে করছেন, যাতে অন্যদের মনে কোন প্রভাব না পড়ে। এই শ্লোকে ঠিক এই জিনিসটাই লক্ষ্মণ বলছেন, আমাদের ভোগেরও ইচ্ছা নেই, ত্যাগেরও ইচ্ছা নেই। কারণ আমরা ভোগের বশে নই। যারা ভোগের বশে তারাই ভোগের দিকে দৌড়ায় বা ভোগের বিপরীত দিকে দৌড়ায়। ভোগের বিপরীত দিকে যারা দৌড়াচ্ছে তারা যে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত তা নয়, তারাও ভোগেই প্রতিষ্ঠিত। বলছেন, আমরা দুটোতেই নির্বিকার। তাহলে কোন সন্ন্যাসীকে এসে যদি কোন মেয়ে বলে আপনাকে আমি ভালোবেসেছি আপনি আমাকে ভোগ করুন, তখন সন্ন্যাসী কি করবেন? ঠাকুরকে যখন মথুরবাবু কলকাতায় বারঙ্গনাদের কাছে নিয়ে গেছেন, ঠাকুরও গেছেন। ঠাকুর তাদের মা ভগবতী দেখে সেখানেই সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। ওই মেয়েদের কাছে ঠাকুরের যাওয়ারও কোন ইচ্ছা নেই, ওদের কাছ থেকে পালিয়ে আসারও কোন তাগিদ নেই। কর্মের কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মণ আবার বলছেন –

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাদ্বা যেন কেন বা।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম ভোজ্যং তৎ তত্র নান্যথা।২/৬/১০

যখন কোন দেশে বা কালে কোন কর্ম করা হয়, তা শুভই হোক আর অশুভই হোক, তার ফল কিন্তু তাকে ভুগতেই হবে। এগুলোই কর্মের খুব প্রচলিত সিদ্ধান্ত। এর উপর কত আলোচনা, কত রচনা হয়ে চলেছে তার শেষ নেই। যেখানে তলোয়ারের কোপ পড়ার কথা সেখানে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে ওই তলোয়ারের কোপটাই একটা ছুঁচ হয়ে ফুটবে। একটা বয়সে এই কথাগুলো দারুণ মনে হয়, কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ার পর মনে হয় এগুলো কিছুই নয়, এসবের কোন দাম নেই। তবে সাধারণ লোকেদের জন্য এগুলো খুব দরকার। ঠাকুরও বলছেন, স্বাধীন বোধ যদি না থাকে তাহলে পাপ বাড়বে। সাধারণ মানুষের মনে এই চেতনা না দিয়ে রাখলে সমাজ উৎসন্নে চলে যাবে। সমাধিবান পুরুষ দেখেন উৎসন্নে যেটা যাচ্ছে এটাও তাঁর ইচ্ছাতেই যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তো সমাধির অবস্থায় সব সময় থাকছেন না, উচ্চ অবস্থা থেকে মন যখন নেমে আসে, আমি বোধটা যখন একটু আসে তখন মনে হবে এই কাজটা ভুল, এই কাজ করতে নেই। সেইজন্য বলা হয় সাধারণ লোকেদের কর্মবাদে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, কর্মবাদের সিদ্ধান্ত বলছে, যে দেশে যে কালে যা যা শুভ বা অশুভ কাজ করেছ তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। আর বলছেন –

অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে।
বিধাত্রা বিহিতং যদ্ তৎ তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ।২/৬/১১

বিধাতার বিধানকে দেবতা, অসুর কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। সেইজন্য শুভ অশুভ যাই আসুক সব কিছুকে চুপচাপ মেনে নিতে হয়। ঠাকুর বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ। বর্ণাশ্রম ধর্ম দ্বারা যে স্বধর্মকে পরিভাষিত করা হয় বা আমরা যে চারটি আদর্শের কথা বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগের কথা বললাম, যদি এর যে কোন একটিকে জীবনের অঙ্গ করে নিই, এটাই আমার জীবনের আদর্শ, তখনও শুভ অশুভ আসতে থাকবে, কিন্তু ওই আদর্শের দিকে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। এর ফলে শুভ অশুভ যা আসার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে, আমাকে কোন কিছুই বিচলিত করতে পারবে না। তারাই ঠিক ঠিক সুখ-দুঃখ পায় যাদের কোন আদর্শ নেই। আদর্শের বদলে যারাই কোন লক্ষ্য নিয়ে জীবন চালায় তারাই দুঃখ পায়। যাদের জীবনে আদর্শ থাকে তারা কখনই সুখ-দুঃখ পায় না। তারা জানে কর্মের গতিতে যা আসার তা স্বাভাবিক ভাবে এসেছে, ওর দিকে তারা বেশি তাকায় না। তারা জানে শুভ অশুভ এগুলো নিজের মত আসতেই থাকে। আদর্শকে নিয়ে যে চলে তার কাছে পরিষ্কার হয়ে আছে যে এটাই আমাকে পেতে হবে। স্বামীজী অনেক জায়গায় goal শব্দটা নিয়ে এসেছেন, স্বামীজী যখন goal শব্দটা ব্যবহার করছেন সেখানে তিনি ideal অর্থেই বলছেন। আমরা এখন যে goalএর কথা বলছি এটা অন্য অর্থে হয়। আমরা goalকে projectঅর্থে নিই। জীবনটাকে যদি একটা package of projects নেওয়া হয়, যেমন আমাকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে, আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবে, আমাকে আইটি সেক্টরে একটা চাকরি জোগার করতে হবে, আমাকে এখন বিয়ে করতে হবে, আমাকে এই কাজ শেষ করতে হবে, এগুলো সব moving from project to project, এটাতেই সুখ-দুঃখ আসে। কিন্তু যাঁরা আদর্শকে নিয়ে চলেন, যেমন কারুর আদর্শ হল পূর্ণ রূপে ঈশ্বরে সমর্পিত করে দেওয়া, তাঁদের আর সুখ-দুঃখ হবে না। আমার আদর্শ হল বিদ্যা, বিদ্যা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না, তাঁর আর সুখ-দুঃখ হবে না। আমার আদর্শ হল মানব জাতির সেবা করা বা দেশের সেবা করা, তাঁর কখনই সুখ-দুঃখ হবে না। কারণ আদর্শ তাঁর ভেতরের ব্যাপার, ওই জিনিসটাকে আর কেউ নিয়ে নিতে পারবে না। একজন কাউকে ভালোবাসে, তাকে আপনি তার জীবন থেকে সরিয়ে দিতে পারবেন কিন্তু তার ছবিকে মন থেকে কখনই সরিয়ে দেওয়া যাবে না। ঠিক তেমনি তার বাকি সব কিছুকে নষ্ট করে দেওয়া যায়, কিন্তু তার ভেতরে যে আদর্শ, যেটার প্রতি তার ভালোবাসা, সেটাকে কোন ভাবেই সরিয়ে নেওয়া যাবে না। আদর্শ যতক্ষণ আছে বাকি কোন কিছুই তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। একটা মেয়ের বিবাহ হল, স্বামী তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, কিন্তু বাড়িতে শাশুড়ি, ননদ সব সময় তাকে গঞ্জনা দিতে থাকে, তাতে কি মেয়েটির কষ্ট হবে, কিছুই কষ্ট হবে না। তার দুটি সন্তান হয়ে গেছে, তারাও মাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, স্বামীও তাকে ভালোবাসে এরপর তার আশেপাশে যারা আছে তারা দিনরাত তার সাথে খিচখিচ করে যাচ্ছে, সে জানে ওরা এই রকমই করবে, করুক তাতে আমার কি আসে যায়। প্রাণদায়িনী, শক্তিদায়িনী স্রোতের প্রবাহ যদি ঠিক থাকে বাকি কোন কিছুই তাকে আর কিছু করতে পারবে না। আমাদের জীবনের সমস্যা হল জীবনের যে মূল স্রোত সেটা ঠিক থাকে না, শুধু আমাদের নয়, পুরো মানব জাতির এই সমস্যা। হিন্দু সমাজ যে এক সময় দাঁড়িয়েছিল তার পেছনে তাদের এই প্রচেষ্টাটা ছিল, যার জন্য ক্ষত্রিয়েদের বলে দেওয়া হল তুমি যদি যুদ্ধে মরেও যাও এটা খুব আনন্দের। ক্ষত্রিয় স্ত্রীদের সেভাবেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, তোমার স্বামী যদি মরে যায় তুমি জহরব্রত করে নাও। সেইজন্য কোন সুখ-দুঃখই তাদের গায়ে লাগত না। এখন সবটাই ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেছে, আদর্শ বলে কোথাও কিছু নেই। আমাদের জীবন এখন project to project চলছে, সেইজন্য আমাদের সুখ-দুঃখের শেষ নেই। শিক্ষা, কলা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি সবটাই এখন project to project রূপে চলছে, কোথাও কোন আদর্শ বলে কিছু নেই, কে কাকে দাবিয়ে মাথায় বসবে লড়াই করে যাচ্ছে, কোন কিছুকেই আর সামলানো যাচ্ছে না। কিন্তু যার মধ্যে সঞ্জিবনী শক্তি, জীবনদায়িনী শক্তি থাকে তাকে আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। এখানে বারবার এই কথাটাই বলতে চাইছেন, সুখ-দুঃখ সাধারণ মানুষকেই প্রভাবিত করে। সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে শেষে বলছেন –

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তুনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ।২/৬/১৩

বলছেন, সুখ আর দুঃখ জীবনে মিলে মিশে থাকে। কি রকম মিশে থাকে? যেটা পরের শ্লোকে বলছেন, পাঁকে যেমন মাটি আর জল মিশে একাকার হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সুখ আর দুঃখ মিলে মিশে আছে। সেইজন্য কোন জীবই এই সুখ আর দুঃখকে লঙ্ঘন করতে পারে না। সুখ আর দুঃখ যেন দিন আর রাত, দিন আর রাত

সমস্ত প্রাণীর পক্ষেই অনতক্রমণীয়। শ্রীমা বলছেন, ঘুড়ির লাটাইয়ে যেমন যেমন সুতো গোটান হয়েছে, সুতো ছাড়ার সময় সেভাবেই কখন লাল সুতো, কখন সাদা সুতো, কখন কালো সুতো বেরোতে থাকে। কর্মও ঠিক এভাবেই চলে, সব মিলে মিশে চলে, পাঁকে যেমন মাটি আর জল মিলে মিশে এক হয়ে আছে। সুখ আর দুঃখ মিশে আছে, এই সুখ পাচ্ছে সেই সুখের মধ্যেই আসে দুঃখ। ঠাকুর বলছেন, কোন মেয়ের যখন প্রসব বেদনা হয় তখন বলে আর স্বামীর কাছে যাব না। স্বামীর কাছে যখন যায় তখন সেটা একটা সুখ, সেখান থেকে আসে প্রসব বেদনা, কত কষ্ট। বলে আর স্বামীর কাছে যাচ্ছি না। সেখান থেকে আসে সন্তান, সেটা আবার সুখ। একই জিনিস, সুখই দুঃখকে জন্ম দেয়, দুঃখই আবার সুখের জন্ম দেয়। সেইজন্য সুখ দুঃখকে নিয়ে চিন্তা করে কোন লাভ নেই। তবে এটা ঠিক যে, বৃদ্ধ বয়সে দুঃখ আসার পর সুখ আসার সম্ভবনা থাকে না। কারণ তখন সেই শক্তিটা আর থাকে না, যে শক্তি মানুষকে জীবনমুখী করে সেই শক্তিটাই চলে গেছে। স্বামীজী তাই বলছেন, old age is a bundle of frustration, দুঃখ হতাশার একটা পোটলা। এই যে বলছে সুখ-দুঃখ মিলে মিশে আছে, এখানে তো মিলছে না। কিন্তু এখানেও সেটাই হয়। আগে থাকতেই যদি পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হতে হতে স্বধর্ম করে একটা জীবনধারা যদি তৈরী করে নিতে পারে, জীবনে তার আর কোন দুঃখ হবে না। বেশির ভাগ বৃদ্ধদের যে দুঃখ তার কারণ আগে থেকে তারা জীবনকে তৈরী করে প্রস্তুতি নেইনি। একটা সময়ে গোটা দিনকে যদি সাজিয়ে নেওয়া হয়, আমি এতক্ষণ পূজা করব, এতক্ষণ জপ-ধ্যান, এতক্ষণ পাঠ করব তখন বৃদ্ধ বয়সেও জীবনীশক্তির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে না। দুঃখ যে হবে না তা নয়, দুঃখ হবে, কিন্তু সকালে উঠেই মনে পড়বে আমাকে ফুল তুলতে হবে, ঠাকুরকে সাজাতে হবে, জপ-ধ্যান করতে হবে, এবার শাস্ত্র পাঠ করতে হবে, তারপর ঠাকুরের ভোগ দিতে হবে, দুঃখের কথা ভাববার সময়ই পাবে না। সবের মধ্যে ক্রিয়া জড়িয়ে আছে, এই ক্রিয়াই যখন সঞ্জিবনী শক্তিকে নিয়ে আসে তখন একদিকে দুঃখ এলেও দুঃখকে ভাববার সময় পায় না, আবার নিজে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি কোন বৃদ্ধ অবসাদগ্রস্থ, দুঃখে অবসন্ন হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার ক্রিয়াশক্তি, প্রাণশক্তি বন্ধ হয়ে গেছে। যদি কোন বৃদ্ধকে বলা হয়, বসে বসে একটু ঠাকুরের বই পড়ুন বা একটু ঠাকুরের নাম করতে বলা হয়, তারা শুনবে না, উপরন্তু রেগে যাবে। কারণ পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে ঐ জীবনধারাটা তৈরী করে নেওয়া দরকার ছিল। এখন চেষ্টা করলেও আর পারবে না। এখন শুধু খবর কাগজ পড়া, টিভি দেখা আর পাড়ার কে কি করল তাই নিয়ে খোশগল্প করা আর উপদেশ দেওয়া, এছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। আর নানান রকমের দুঃখ-কষ্ট চলতে থাকে। কষ্ট তো ঠিকই হয়, কিন্তু তার থেকেও যেটা হয় এত মূল্যবান সময় পুরোটাই হাত থেকে বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এটাই লক্ষ্মণ বলছেন, যাঁরা বিদ্বান তাঁরা বলেন সবটাই মায়া। মায়া মানে মিথ্যা, মিথ্যাকে কখন দাম দিতে নেই। এই সুখ এসেছে কাল আবার দুঃখ আসবে, এই দুঃখ এল আবার সুখ আসবে। তাই সুখে উৎফুল্ল হওয়ারও কিছু নেই আর দুঃখে ভেঙে পড়ারও কিছু নেই। লক্ষ্মণ গুহককে এত কথা বলছেন। আর এইভাবে কথা বলতে বলতে সারা রাত কেটে গেল। এবার সকাল হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রও শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃকৃত সম্পন্ন করে গুহকের কাছে এসেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র এখন যে স্থানে আছেন এই স্থানের নাম শৃঙ্গবীরপুর। শ্রীরামচন্দ্র গুহককে বলছে, হে সখে! আমাদের জন্য একটা ভালো নৌকা নিয়ে এস। ভাল নৌকা মানে নৌকাটা যেন সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। এখান থেকে সবাই গঙ্গা পার করবেন। এলাহাবাদ আর কানপুরের মাঝখানে এই জায়গাটি অবস্থিত। ওই রাস্থা ধরে এগিয়ে গেলে চিত্রকূট যাওয়া যায়। মাঝ গঙ্গায় গিয়ে সীতা গঙ্গাকে প্রণাম করছেন, প্রণাম করে প্রার্থনা করছেন, হে মা গঙ্গা! চৌদ্দ বছর অতিক্রান্ত করে আমরা যখন ফিরে আসব তখন আমি শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সহ তোমার পূজা করব। অথচ বাল্মীকি রামায়ণে আছে যে, সীতা বলছেন, তোমাকে ছাগ বলি দেব, মাংস ও মদিরা দিয়ে তোমার পূজা করব। তখন ক্ষত্রিয়রা এসব খেতেন। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক পরে লেখা হয়েছে, হিন্দুরা এখন আর এই ভাষা ব্যবহার করবে না বলে ভাষাটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে পরিষ্কার মাংস আর মদিরা দিয়ে পূজা করার কথা বলছেন। তবে অনেক জায়গায় গঙ্গাকে ছাগ উৎসর্গ করা হয়, তবে সেখানে মেয়ে ছাগলকে অর্পণ করা হয়। মেয়ে ছাগলকে গঙ্গার জলে স্নান করিয়ে তারপর তাকে বলি দেওয়া হয়। আসলে আমাদের সমাজে কোন মেয়ে পশুকে কাটা হয় না।

গুহক সবাইকে নিয়ে গঙ্গার ওপারে পৌঁছেছেন। গুহকও বলছে আমি আপনার সাথে বনে যাব। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি চৌদ্দ বছর পর আমি এই পথ দিয়েই ফিরব আর তখন তোমার

সাথে দেখা করব। গুহক সেই থেকে শ্রীরামচন্দ্র জঙ্গলে যেভাবে থেকেছেন এরপর চৌদ্দ বছর তিনিও সেইভাবে ব্রহ্মচারী হয়ে থেকেছেন। পুষ্পকযানে করে শ্রীরামচন্দ্র যেদিন লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় ফিরছিলেন, তখন তিনি বলছেন, দেখ আজ শেষ দিন, আজ যদি গুহকের সাথে আমি দেখা না করি তাহলে ও প্রাণত্যাগ করে দেবে।

শ্রীরামের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন

ওখান থেকে সবাই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গেছেন। সেখানে এক ব্রহ্মচারীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র তাকে বলছেন, ভরদ্বাজ মুনিকে গিয়ে খবর দাও রাজা দশরথের সন্তান রাম পত্নী ও অনুজ সহ এখানে এসেছেন। খবর পেয়ে ভরদ্বাজ অর্ঘ্য ও পাদ্যসহ শ্রীরামের কাছে দৌড়ে এসে তাঁদের যথাবিধি স্বাগত আপ্যায়ন করে বলছেন, আমার পর্ণকুটির আপনার পদধুলিতে ধন্য হয়ে গেল। ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে তখন বলছেন –

ভক্ত্যা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্।
অধ্যাহং তপসঃ পারং গতোহস্মি তব সঙ্গমাৎ।২/৬/৩৬

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে ঘরে আনয়নপূর্বক আবার ভক্তিসহকারে পূজা করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলতে লাগলেন, এতদিন যে আমি তপস্যা করেছি, আপনার দর্শন লাভ করে সেই তপস্যা আজ আমার পূর্ণ হল। ভরদ্বাজ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ ভগবান দেখছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রে বেশি যুক্তিতর্ক দিয়ে খুঁজতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কারণ যদি ওই রকমই ঠিক হয়ে থাকে তাহলে ভরদ্বাজ মুনি গঙ্গা পার হয়ে অযোধ্যায় গিয়ে দেখে এলেই তো হয়ে যেত। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এখানে এসেছেন, ভরদ্বাজ মুনির তপস্যা পূর্ণ হয়ে গেছে, তাঁর জীবন ধন্য হয়ে গেল। আর বলছেন –

জ্ঞাতং রাম তবোদন্তং ভূতঞ্চাগামিকঞ্চ যৎ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়য়া কার্য্যমানুষম্।৩৭

হে রাম! আমি আপনার ভূত ভবিষ্যত সবই অবগত আছি, আপনি সেই পরব্রহ্ম কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য আপনার মায়াকে আশ্রয় করে মানুষের মত ব্যবহার করছেন। বেদান্তের আত্মতত্ত্ব খুব সোজা পথে চলে, সেইজন্য আত্মতত্ত্ব বোঝা যায়, এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু অবতার তত্ত্ব অত্যন্ত জটিল, সেইহেতু অবতার তত্ত্ব অপরকে বোঝান বা নিজে বোঝার জন্য অত্যন্ত কঠিন। যদিও অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীরা প্রচুর বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু অবতার তত্ত্ব এমনই এক তত্ত্ব যার ব্যাপারে একটা দুটো বাক্য বলে দেওয়ার পর আর বেশি বলতে নেই। অবতার তত্ত্বের কয়েকটা খুব মজার ব্যাপার আছে। স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ঠাকুর নরেনকে তাঁর ঘরে বসিয়ে নরেনের সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে বলছেন – আমি জানি আপনি সেই নরঋষি। নরেন মনে মনে ভাবছে লোকটির মাথায় গণ্ডগোল আছে। এই বর্ণনা ভুল হওয়ার কোন সম্ভবনা নেই, কারণ এই ঘটনার অনেক পরে কথামৃত লেখা হয়েছে। আর ঠাকুরও এই কথা বলছেন, স্বামীজীও এই কথা বলছেন, শরৎ মহারাজও এই কথা শুনেছেন। ঠাকুর জানেন নরেন নর ঋষি, আর আগাগোড়া সব শিষ্যদের থেকে নরেনের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কত কথা কাটাকাটি কত কিছু। আবার শ্রীমার সম্বন্ধে হৃদয়কে বলছেন, ওরে! ও হল সারদা, জ্ঞান দিতে এসেছে। তার মানে তিনি শ্রীমাকে জগন্মাতা রূপেই দেখছেন, অথচ ঠাকুর শ্রীমাকে কত হুকুম দিচ্ছেন, আদেশ করছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন, আবার তাঁর ধর্মপত্নী রূপেও দেখছেন। এই দুটো ঘটনা এইজন্যই বলা হল, অন্যদের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, মানে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেভাবে দেখছেন সেখানে না হয় মানা যায় ভক্ত তাঁর ইষ্টকে দেখছেন আর মাঝে মাঝে ভক্তের অজ্ঞান আবরণ এসে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরের তো অজ্ঞান আবরণ আসার কথা নয়, তাহলে ঠাকুর একবার যাঁকে নর ঋষি দেখছেন আবার অন্য সময় বকা ঝকা করা এটা কি করে হয়? আমরা বলব এটাই ঠাকুরের লীলা, তাঁকে শিক্ষা দিয়ে দাঁড় করাতে হবে। তাই হবে। কিন্তু আমরা আর একবারও দেখছি না যে, ঠাকুর নরেনকে হাতজোড় করে সম্মান দিয়ে কথা বলছেন। কথামৃত বা লীলাপ্রসঙ্গে এর দ্বিতীয় বর্ণনা আর আসে না। নরেন শিক্ষা দেবে, ঘরে বাইরে হাঁক দেবে এসব বলছেন ঠিকই, কিন্তু ওই দৃশ্য আর একবারও দেখা যায় না। তাহলে অবতার তত্ত্ব জিনিসটা কি? প্রচণ্ড জটিল বিষয়।

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছে, দেবকীকে নিজের নারায়ণের রূপ দেখিয়ে বলছেন এই তোমার উপর মায়ার আবরণ দিয়ে দেওয়া হল, তুমি আমার এই রূপ আর দেখতে পাবে না। আবার বসুদেবকে বলছেন, আমার রূপ দেখিয়ে দিলাম, এবার আপনি ঈশ্বর জ্ঞানটাও রাখবেন আবার সন্তান জ্ঞানও রাখবেন। এই কথাগুলোই শাস্ত্রে আমরা অনেকবার পাই। কিন্তু দেবকী, বসুদেব, কৌশল্যা এনারা না হয় সাধারণ লোক, এনারা ভুল করে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের সাথে জাগতিক ভাব নিয়ে ব্যবহার করে ফেলছেন, কিন্তু অবতারের তো ভুল হওয়ার কথা নয়। ঠাকুর নরেনকে নর ঋষি বলছেন, অথচ কত ঝগড়া, কত গালাগালও করছেন। অথচ তিনি নরেনকে প্রধান শিষ্য রূপে ঠিক করে দিয়েছেন। শ্রীমায়ের সাথেও একই ব্যাপার। অবতার তত্ত্ব জিনিসটাই খুব জটিল। একটা জিনিস না বুঝে বলে দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা শুরু করতে গেলে হাত থেকে স্লিপ করে যাবে। উপনিষদের আত্মতত্ত্বকে বোঝা খুব কঠিন নয়। কটি জিনিস, যেমন অনন্তের ব্যাপারটা যদি ধারণা করে নেওয়া যায় আত্মতত্ত্ব বুঝতে বেশি কঠিন হবে না। কিন্তু অবতার তত্ত্ব ঠিক ঠিক বুঝতে গেলে হিমশিম খাইয়ে দেবে। অথচ কত সহজে সবাই অবতার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভরদ্বাজ মুনি কখন যে শ্রীরামচন্দ্রকে রাজকুমার রূপে দেখছেন আবার কখন যে অবতার রূপে দেখছেন, বোঝা যায় না। ঠাকুরের অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় স্বামীজীর নিষ্ঠা অনেক আগে থেকেই খুব জোরাল ছিল। ঠাকুরকে যখন অবতার রূপে দেখছেন তখন তাঁর মধ্যে কোন ইমোশান থাকত না, হ্যাঁ তিনি অবতার, ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট।

জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ।
ইতঃপরং ত্বাং কি বক্ষ্যে কৃতার্থোঽহং রঘুত্তম।২/৬/৩৯

ভরদ্বাজ মুনি বলছেন, আমি জানি আপনি সেই পরমাত্মা, আপনি ভগবান নারায়ণ, আমি আপনারই উপাসনা করে আসছি। আমরা উপাসনা যে অর্থে মনে করি সেই অর্থে নয়, সাধনা করে করে আমার যে জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে তাতে আপনি অবতার রূপে যা যা করবেন সবটাই আমার জ্ঞানদৃষ্টিতে আমি অবগত আছি। তাহলে এখানেও সেই একই জিনিস এসে যাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র কি কি করবেন সব আগে থেকেই ঠিক করা আছে। সীতা যে বললেন, আপনি এর আগে অনেক রামকথা শুনেছেন কোথাও কি শুনেছেন শ্রীরামচন্দ্র সীতা ছাড়া জঙ্গলে গেছেন। তার মানে, রাম জন্মের আগেই রামকথা লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যা যা করবেন সবটাই ভরদ্বাজ মুনি জানেন, এটা কি কখন সম্ভব? শ্রীরামচন্দ্র বালি বধ করবেন, রাবণ বধ করবেন এগুলো ভরদ্বাজ মুনি আগে থেকেই জানেন। তাহলে ভগবানও তো কর্মেই হোক বা pre-destinationএ আবদ্ধ হয়ে গেলেন, সবটাই যেন আগে থেকে ঠিক করা আছে। ঋষিরা ভূত ভবিষ্যৎ জানতে পারেন, এই ব্যাপারে কারও আপত্তি নেই। কিন্তু ভগবানের ব্যাপারে যদি সব কিছু ঠিক করা থাকে তাহলে ভগবান নিজেই বন্ধনে পড়ে গেলেন।

দ্বৈতবাদেই এই সমস্যাগুলো আসে। সেদিক দিয়ে বেদান্ত খুবই যৌক্তিক। ভক্তিশাস্ত্রে দ্বৈতবাদ প্রচণ্ড খটমট, কিছুতেই মাথা আর মুণ্ডু মেলান যাবে না। গীতায় ভগবান বলছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* ভগবান বলছেন, জগতে যা কিছু হচ্ছে আমার জানা আছে, যা কিছু আগে হয়ে গেছে সেটাও জানা আছে আর যা কিছু হতে যাচ্ছে সেটাও আমার জানা আছে। কারণ তিনি সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ মানে তিনি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ মানে তাঁকে ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সবটাই জানতে হবে। ঠিক তেমনি ঋষি হলেন ক্রান্তদর্শি, তিনি ত্রিকালজ্ঞ, সেইজন্য তিনিও সব জানবেন। এই পর্যন্ত কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সবটাই যদি আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে সেদিক থেকে তো ভগবান বন্ধনে পড়ে যাচ্ছেন, ভগবানের তো আর করার কিছু থাকছে না, যেটা নির্ধারিত হয়ে আছে তার বাইরে তিনি আর যেতেই পারবেন না, তাহলে ভগবানের স্বাধীনতা বলে কিছু থাকল না। যে ভগবানের স্বাধীনতা নেই তিনি কিসের ভগবান। গীতাতেই ভগবান বলছেন, *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং*, কর্মের বন্ধন দিয়ে আমার জন্ম হয় না। সেইজন্য ঈশ্বরের কার্যকে কর্মের বাইরে থেকে যতক্ষণ না দেখা হবে ততক্ষণ এই সমস্যাগুলো থেকে যাবে। এর উপর ভিত্তি করেই ইসলাম আর খ্রীশ্চান ধর্মের এমন প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয় যে ওরা আর সেই সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে পারে না। যার ফলে ইউরোপে যেদিন যুক্তিবাদীদের যুগ এল সেদিন থেকে খ্রীশ্চানরা আর তাদের সামনে দাঁড়াতে পারল না। হিন্দু ধর্মে এই সমস্যা হয় না।

ইসলাম আর খ্রীশ্চানদের বিরুদ্ধে একটা খুব নামকরা ধাঁধা আছে। তুমি বলছ তোমার গড, তোমার আল্লা সর্বশক্তিমান। ঠিকই তিনি সর্বশক্তিমান। আচ্ছা উনি কি এমন কোন পাথর সৃষ্টি করতে পারবেন যে পাথর তিনি তুলতে পারবেন না? প্রশ্নের মধ্যে দুটো অর্থ। যদি বলে ভগবান এই রকম পাথর তৈরী করতে পারবেন, তাহলে তার অর্থ হয়ে গেল ভগবান সেই পাথর তুলতে পারবেন না, তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আর যদি বলে ওই রকম পাথর তৈরী করতে পারবেন না, তাহলেও তিনি আর সর্বশক্তিমান থাকলেন না। এগুলো হলো তর্কোলজি, এগুলো কোন যুক্তিই নয়। এরা তখন লজিককে একটা নতুন ধারায় নিয়ে গেলেন। বললেন, এই রকম অর্থহীন কাজ ভগবান করেন না। বেদান্তে এই ধরণের প্রশ্ন কখনই আসবে না, কারণ বেদান্তের ভগবান সব সময় নির্বিকার। বেদান্ত বলবে, হ্যাঁ তিনি তুলে দেবেন, কিন্তু জায়গাটা তোমাকে বার করে দিতে হবে। কারণ তিনি অনন্ত কিনা, তিনি তুলে নিয়ে যাবেনটা কোথায়! ভগবানের বাইরে একটা জায়গা তো থাকতে হবে তবেই তিনি তুলবেন। সেইজন্য বেদান্তের মায়ার সিদ্ধান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মায়ার সিদ্ধান্ত না থাকলে এই জিনিসগুলোকে বোঝাই যায় না। প্রথমেই বলে দিলেন, শ্রীরামচন্দ্র চলেনও না, তিনি বসেনও না। তিনি কিছু করেনও না, কারুকে তিনি বধও করেন না, তিনি নির্বিকার। অথচ দেখাচ্ছে যেন তিনি কত কিছু করছেন। যেমনি মনে হচ্ছে যেন সব দেখাচ্ছে তখনই মায়া হয়ে গেল। ঈশ্বর সব কিছুর বাইরে, ঈশ্বরকে কিছু স্পর্শ করতে পারে না। যতক্ষণ এই সিদ্ধান্তকে না নেওয়া হবে ততক্ষণ সব কিছু এলেমেলো হয়ে যাবে। তখন ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব আর ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব এই দুটোর মধ্যে এমন ঝামেলা লেগে যাবে যে সমাধান কোন কিছু দিয়েই মেটানো যাবে না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তিনি সব কিছু জানেন আর সর্বকর্তৃত্ব তিনি সব কিছু পারেন। তাহলে যদি বলা হয় তিনি এমন কাজ করতে পারবেন যেটা উনি আগে থেকে জানেন না। যদি বলে দেওয়া হয় হ্যাঁ পারবেন, তাহলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব থাকবে না, আর যদি বলেন পারবেন না, তাহলে তাঁর সর্বকর্তৃত্ব চলে যাবে। এরপর মানুষ কোথায় যাবে! কিন্তু মায়ার সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে আসা হয় তখন এগুলোকে বুঝতে আর সমস্যা হয় না। কারণ মায়ার সিদ্ধান্তে তিনি কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্বের বাইরে। আমরা কর্তৃত্ব জ্ঞাতৃত্ব যে অর্থে নিই তখন সেই অর্থে হয় না। ভরদ্বাজ মুনি যে বলছেন, আমি সব জানি, কারণ এগুলো সব মায়ার কার্য। এগুলো তিনি করছেন না, মায়ার কার্যে এগুলো হবে। মায়াতে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তৃত্ব বা সর্বঈশিত্ব অর্থাৎ সব কিছুকে যিনি শাসন করেন এগুলোর দ্বারা ঈশ্বর প্রভাবিত হন না, কারণ এই জিনিসগুলো সব মায়ার রাজ্যে চলে। বিচার অনুশীলন যখন একটা স্তরে চলে আসে তখন এই জিনিসগুলো পরিষ্কার হতে শুরু হয়, তার আগে পর্যন্ত মহা খটমট মনে হয়। যেমনি দ্বৈতবাদে নেমে আসবে ওখান থেকে আর বেরিয়ে আসা যায় না, দ্বৈতবাদ এক মহা গর্ত। ভক্তিশাস্ত্রে এটার সাথে ওটা, ওটার সাথে এটা মেলান যায় না।

বাল্মীকি ও শ্রীরামের কথোপকথন

ভরদ্বাজ মুনি বলছেন, আমার কী আনন্দ! যিনি প্রকৃতির পারে আমি তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছি। যিনি প্রকৃতির পারে, তিনি কিছুই করেন না, তিনি কাজও করেন না, তিনি কাউকে বধও করেন না, তিনি সব কিছুর পারে। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আপনি তো এখানে অনেক দিন ধরে আছেন, আপনি যদি আমাদের বসবাসের উপযুক্ত কোন জায়গার কথা বলে দেন তাহলে আমরা সেখানে গিয়ে থাকতে পারি। অনন্তর শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ মুনিপ্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চিত্রকূট পর্বতে বাল্মীকির আশ্রমে গেলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই অংশটা আবার খুব মজার। বাল্মীকি রামায়ণে এই ধরণের কোন উল্লেখ নেই, সেখানে বাল্মীকির সাথে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎই হয়নি। বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের কথা জানতেনও না, তিনি নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করছেন এই ধরণের কোন ব্যক্তিত্ব আছেন কিনা যাঁকে আধার করে একটা কাহিনী রচনা করা যেতে পারে। নারদ মুনি তখন বললেন, হ্যাঁ রাজা রামচন্দ্র আছেন। বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রকে জানতেনই না। কিন্তু এটা ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রে এসে সবাইকে মাথা নত করতে হবে। তাই এখানে বাল্মীকিকে নিয়ে আসা হয়েছে।

দৃষ্টৈব সহসোত্তস্থৌ বিস্ময়ানিমিষেক্ষণঃ।
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ।২/৬/৪৭

বাল্মীকি দেখছেন ত্রিলোক-সুন্দর শ্রীরাম, তাঁর দুই পাশে জানকী ও লক্ষ্মণ, মস্তক জটারূপ মুকুট দ্বারা শোভিত। এতদিন যাঁর ধ্যান করে এসেছেন তাঁকে সম্মুখে দেখে বাল্মীকি আসন থেকে গাত্রোত্থান করলেন, তাঁর দু চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হল, তিনি আনন্দে শ্রীরামচন্দ্রকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সারাটা জীবন যাঁকে ধ্যান

করে এসেছেন, যাঁর চিন্তন করে এসেছেন হঠাৎ সেই শ্রীরামচন্দ্রকেই তিনি তাঁর সামনে দেখছেন। তারপর ভক্তিপূর্বক সাদরে বসিয়ে অর্ঘ্যাদি দিয়ে পূজা করে মিষ্ট মধুর ফল দিয়ে ভোজন করালেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বাল্মীকিকে বলছেন, পিতার আজ্ঞায় আমরা দণ্ডকারণ্যে এসেছি। শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন –

ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোঽত্র কারণম্।
যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ।
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিৎ তত্র নয়াম্যহম্।২/৬/৫০

আপনি তো সবই জানেন, আপনাকে আর আমি কি নতুন করে বলব। তবে আমরা কোথায় সুখপূর্বক নিরুপদ্রবে চৌদ্দ বৎসর বনবাস করতে পারি, সেই স্থান আমাদের বলে দিন যেখানে আমি সীতার সাথে সুখে শান্তিতে নির্বিঘ্নে এই চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করতে পারব।

বেদান্তে মতে বন্ধন মায়ার এলাকার, মুক্তিও মায়ার এলাকার। মুক্তি যদি মায়ার এলাকার না হয় তাহলে বেদান্ত দর্শন আর দাঁড়াতে পারবে না। মুক্তিও মায়ার মধ্যে, মুক্তি মায়ার বাইরে নিয়ে যায় না। এর পেছনে যে দর্শন সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ দর্শন, সেটা হল যখন বন্ধন জিনিসটাকে আমরা নিয়ে এসেছি। বন্ধনকে মায়াই বলি, প্রকৃতিই বলি আর মনের এলাকাই বলি, যেভাবেই নিই না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মূল হল, এই বন্ধন কি বাস্তবিক নাকি কাল্পনিক। বেদান্ত, বেদান্ত বলতে আমরা আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের কথাই বলছি, এই অদ্বৈত বেদান্তের সাথে বিশ্বের যত ধর্ম আছে, দর্শন আছে তা সে ইসলামই হোক, খ্রীশ্চানই হোক, জহুদিই হোক আর বৈষ্ণব ধর্মই হোক এদের সাথে একমাত্র বিরাট তফাৎ হয়ে যায় এই জায়গাতে এসে। এই জগৎ, জগতের যে বন্ধন, এই যে আমিত্ব, যে আমিতে আমি নিজেকে শরীর মন, ইন্দ্রিয় মনে করছি, এটা কি বাস্তবিক নাকি কাল্পনিক? বেদান্তে এটা পুরোপুরিই কাল্পনিক। কাল্পনিক যদি না হয় তাহলে বন্ধন বলতে যাই বোঝাক সেই বন্ধনও তাহলে আর কাল্পনিক হবে না, বন্ধনটাও বাস্তবিক হয়ে যাবে। বন্ধন যদি বাস্তবিক হয়, তাহলে শুদ্ধ আত্মা যিনি তিনি বাস্তবিক বন্ধনে পড়ে গেছেন। যদি তিনি বাস্তবিক বন্ধনে পড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁর মুক্তিটাও বাস্তবিক। বন্ধন যদি বাস্তবিক হয় আর মুক্তিটাও যদি বাস্তবিক হয় তাহলে মুক্তি হয়ে যাওয়ার পর আবার তাঁকে বন্ধনে পড়তে হবে। একেবারে পরিষ্কার সহজ যুক্তি। আমরা বলতে পারি একবার লোককে বোকা বাননো যায় দ্বিতীয়বার তাকে আর বোকা বানানো যাবে না। কিন্তু এটাও যুক্তিতে দাঁড়াবে না, যে আপনাকে বোকা বানিয়েছে সে আবারও আপনাকে বোকা বানাবে। পুরোপুরি যুক্তি দিয়ে গেলে যদি বন্ধন বাস্তবিক হয় তাহলে কিন্তু বন্ধন বারবার আসবে। তাহলে মুক্তি ব্যাপারটাও শর্তসাপেক্ষ হয়ে গেল, যে আজ মুক্ত হয়ে গেল সে কাল আবার বন্ধনে পড়ে যাবে। শাস্ত্রে যে এত চিরমুক্তি, চিরন্তন কালের জন্য মুক্তির কথা বলা হয়, বন্ধন যদি বাস্তবিক হয় তাহলে শাস্ত্রে চিরন্তন মুক্তি বলে কিছু হতে পারবে না। আবার যদি বন্ধনেই পড়তে হয় তাহলে মুক্তি পেয়ে আমাদের লাভ কি হল! জেল থেকে কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া হল, জেলের গেটের কাছে আসতেই পুলিশ আবার ধরে তাকে জেলে পুরে দিল। তাহলে এত ঝামেলা করার কি দরকার ছিল, জেলেই তো সে শান্তিতে ছিল। অনেক সময়ে খবরে দেখা যায়, আদালত বেল দিয়ে দিল কিন্তু আদালতের বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, যেই বেরিয়ে এসেছে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা নতুন ধারায় তাকে গ্রেফতার করে জেলে পুরে দিল। যদি আবার গ্রেফতার হয়েই যেতে হয় তাহলে বেল পেয়ে তার লাভটা কি হল! বেদান্তের সিদ্ধান্ত হল এই বন্ধনটা কাল্পনিক।

বন্ধন যদি কাল্পনিক তাহলে মুক্তি কি কাল্পনিক হবে নাকি বাস্তবিক হবে? স্বাভাবিক ভাবেই মুক্তিটাও কাল্পনিক। বন্ধনটা যদি মায়া হয় মুক্তিটাও মায়া। এটাই বেদান্তের ভিত্তি। একদিন গিরিশ ঘোষ স্বামীজীকে বলছেন, সবই তো মায়া, এই যে এত সেবাকার্য করছেন এটাও তো মায়া। স্বামীজী বলছেন, দাদা! তোমার মুক্তিটাও তো মায়া। মুক্তি যদি মায়ার না হয় তাহলে বেদান্ত ধসে পড়ে যাবে। বেদান্ত আত্মার যে বর্ণনা দিচ্ছেন, আত্মার এই ধারণটাই ভেঙে যাবে যদি মুক্তি মায়ার না হয়। আত্মাকে বলছেন চিরমুক্ত, তাহলে যিনি চিরমুক্ত তাঁর বন্ধনটাও কাল্পনিক হবে। বন্ধনটা যদি কাল্পনিক হয় তাহলে মুক্তিটা বাস্তবিক কি করে হবে। মুক্তিটাও তাই মায়ার ব্যাপার। বন্ধনটা মায়া মুক্তিটাও মায়া।

কিন্তু তাতে আবার বিরাট একটা বিপজ্জনক ধারণা এসে যাবে। এটাকেই আশ্রয় করে দ্বৈতবাদীর আচার্যরা শঙ্করকে আক্রমণ করছেন। মুক্তিটা যদি মায়াই হয় তাহলে এত সাধনা করা কেন? আর এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাই

বা কেন? বেদান্ত সাধারণদের জন্য নয়, বেদান্ত বুঝতে গেলে প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলছেন, সবটাই যদি মিথ্যা হয় তাহলে তোমার গ্রন্থটাও তো মিথ্যা, তোমার জপ-ধ্যান সাধনাটাও তো মিথ্যা। মুক্তিটাই যদি মিথ্যা হয় তাহলে মুক্তির সাধন কি করে সত্য হবে, সাধনাটাও মিথ্যা হতে হবে। এবার আচার্য শঙ্কর এর উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, পারমার্থিক দৃষ্টিতে এগুলো মিথ্যা কিন্তু যারা করছে তাদের কাছে এর সবটাই সত্য। যাদের কাছে দেহবোধটা সত্য বলে মনে হয় তাদের কাছে শাস্ত্রটাও সত্য, তাদের কাছে বন্ধনটাও সত্য, তাদের জন্য সাধনা করাটাও সত্য। তাদের তাই সবটাই করতে হবে। এগুলো যতক্ষণ না করা হয় ততক্ষণ পুরো জিনিসটা যে মিথ্যা এটা কোন দিন বোঝা যাবে না। এনারা তখন কাঁটার উপমা নিয়ে আসেন। একটা কাঁটা বার করতে হলে আরেকটা কাঁটার দরকার, পরে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। শাস্ত্রও মিথ্যা, সাধনাও মিথ্যা, এই মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা বন্ধন, মিথ্যা মুক্তিকে কাটিয়ে দেওয়ার পর দেখে বন্ধন আদপে কখনই ছিল না। বন্ধন যদি কখন ছিলই না তাহলে মুক্তির কথা কোথা থেকে আসবে! স্বপ্নে দেখছে বাঘ তাড়া করেছে, স্বপ্নে একটা বন্দুক নিয়ে এলো, স্বপ্নেই গুলি চালালো, স্বপ্নেই বাঘটা মরে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখছে কোথাও কিছু নেই। বাঘটাও মিথ্যা, বন্দুকটাও মিথ্যা, গুলি চালনাটাও মিথ্যা, সবটাই মিথ্যা। ঠিক তেমনি বন্ধনটাও মিথ্যা, শাস্ত্রও মিথ্যা, সাধনাও মিথ্যা আর মুক্তিটাও মিথ্যা। কিন্তু সত্য যেটা সেটাকে জানার জন্য আমাদের সবাইকে এই পুরো পদ্ধতির মধ্য দিয়েই যেতে হবে। রাত্রে যদি না ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যে উল্টোপাল্টা যদি না দেখে তাহলে তার শরীরটা তরতাজা কোন দিন হবে না। ঘুমোলেই আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে। যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি এগুলোকে কল্পনা করে নিয়েছেন। এই কল্পনা কিন্তু স্বপ্নের কল্পনা নয়, বাস্তবিক কল্পনা। ওই কল্পনার মধ্যে এই জগৎ সংসারের সব কিছু চলছে, সবটাই মায়া, সবটাই মিথ্যা, কিন্তু আমাদের সব কিছুই করতে হয়। দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের কাছে মুক্তিটা সত্য, শাস্ত্র সত্য, সাধনা সত্য। বেদান্তবাদীরা জানে সবটাই মিথ্যা, কিন্তু এটাও জানে যে এগুলো করা ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। সাপের বিষ নামাতে সাপের বিষকেই ব্যবহার করতে হবে। প্রবুদ্ধ ভারতের উপর স্বামীজী একটা কবিতা লিখেছেন, কবিতায় বলছেন, জগতটা যেখানে স্বপ্ন, স্বপ্নই যদি মিথ্যা হয় তাহলে মানুষ কি স্বপ্ন দেখবে? চিরন্তন মুক্তির স্বপ্নই দেখবে। যে স্বপ্ন আমাকে শক্তি দেয়, শান্তি দেয় সেই স্বপ্ন দেখাই ভালো।

দুজন ক্ষুধার্ত লোক জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। একজন বলছে, ভাই একটু ভাত, ডাল, সব্জী যদি পাওয়া যেত, তখন অন্যজন বলছে তার সাথে লুচি আর মাংসটাও ভেবে নেনা। কল্পনাই তো করছে, জঙ্গলে কোনটাই তার জুটবে না, ভাতও জুটবে না, ডালও জুটবে না, তা যদি ভাবতেই হয় ভালো জিনিসই ভাবব, লুচি মাংস ভেবে নে। স্বপ্নই যদি দেখতে হয়, কল্পনাই যদি করতে হয় তাহলে আমি চিরমুক্ত, আমি সর্বশক্তিমান রূপেই কল্পনা করব। মিথ্যার মধ্যেই যদি থাকতে হয় তাহলে শোক, মোহ, দুঃখের স্বপ্ন কেন দেখতে চাইব। এটাই বেদান্তের মৌলিক সিদ্ধান্ত। আমরা ভাবছি, আমরা মায়ার মধ্যে পড়ে আছি, জপ-ধ্যান করলে আমাদের মুক্তি হয়ে যাবে, মুক্তিই আমাদের আদর্শ। মনে করছি, মুক্তি মানে একটা বদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আলোর মধ্যে এসে পড়ব। যখন বদ্ধ ঘর থেকে দরজা দিয়ে বাইরে আলোর মধ্যে আসছি, তখন পুরো জিনিসটাই যেন বাস্তবিক। কিন্তু বন্ধ দরজাটাও কল্পনা বাইরে চলে আসাটাও কল্পনা। বলতে পারেন, এটা জেনে আমার কি লাভ হবে। কোন লাভ হবে না ঠিকই, কিন্তু বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলো জেনে রাখা খুব দরকার তা নাহলে শাস্ত্র বোঝা যাবে না। সেইজন্য যখন দেখছি শ্রীরামচন্দ্র বালি বধ করছেন সেটাও মিথ্যা, রাবণ বধ করছেন সেটাও মিথ্যা আর সীতাকে যখন জঙ্গলে পাঠাচ্ছেন সেটাও মিথ্যা। কিন্তু বাকিদের জন্য সবটাই সত্য। শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধের সময় কত মিথ্যা কথা বলছেন, কত ছলচাতুরি করছেন, কিন্তু তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি চিরমুক্ত। শ্রীরামচন্দ্র এত কিছু করলেন, কিছুই তাঁর আসে যায় না, তিনি চিরমুক্ত, এনাদের বন্ধনটাই নেই। তাই ভালোমন্দ যা কিছু হয় সবই মায়ার মধ্যেই হয়। মায়ার বাইরে কোন কার্যই নেই, কারণ সেখানে শুদ্ধ আত্মা, অনন্ত আত্মাই আছেন, তিনি কার উপর, কি দিয়ে, কোথায় কার্য করবেন! এগুলো একবার শুনলে কিছুই বোঝা যায় না, অনেক দিন ধরে শুনতে শুনতে ধারণা হতে থাকে। যাই হোক শ্রীরামচন্দ্রের কথায় বাল্মীকি খুব সুন্দর উত্তর দিচ্ছেন –

ত্বমেব সর্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্।
তথাপি সর্বভূতানি নিবাসসদনানি হি।২/৬/৫২

হে রামচন্দ্র! সমস্ত প্রাণীর হৃদয় তোমার উত্তম বাসস্থান। এটা তোমার সাধারণ বাসস্থান আর তোমার বিশেষ বাসস্থান হল উত্তম চরিত্র, পবিত্র হৃদয় যাঁদের, যাঁরা শান্ত, সমদর্শী, কোন প্রাণীর প্রতি যাঁদের কোন দ্বেষ নেই এবং তোমাকে যাঁরা ভক্তি করে তাঁদের হৃদয়েই তোমার বিশেষ বাসস্থান, সেখানেই তোমার নিত্য বাস। তোমাকে আমি আর বিশেষ বাসস্থান কি বলে দেব! আমাদের অনেক নিবাসস্থান হয়, কিন্তু ভগবানের নিবাসস্থান আমাদের কাছে উত্তম নিবাসস্থান, মানে মানুষ মরে যদি ভগবানের কাছে যায় তখন সেটাই তার উত্তম স্থান। তাহলে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেললেই তো হয়, ভগবানের উত্তম নিবাসস্থানে চলে যেতে পারবে। কেউ মারা গেলে আমরা বলি উনি ভগবানের কাছে চলে গেছেন। বাল্মীকি বলছেন ভগবানের নিবাস স্থান উত্তম। আমরা কোথায় বাস করি? যাকে আমরা ভালোবাসি তার ভেতরেই আমরা বাস করি। কিন্তু আমাদের ভালোবাসা অনবরত পাল্টাতে থাকে। স্ত্রী এখন স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর মধ্যে এখন বাস করছে, দু চারটে সন্তান হয়ে গেলে তখন সন্তানদের মধ্যে বাস করবে। কিন্তু তার মধ্যে প্রধান বাসস্থান হবে নিজের শরীরের মধ্যে বা মনের মধ্যে। কিন্তু সব থেকে উত্তম নিবাস স্থান সেটাই হয় যখন মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে বাস করে। ঈশ্বর চিন্তনে মানুষ যখন নিমগ্ন হয়ে যায়, তার বাসস্থানের ঠিকানা যখন ঈশ্বর হয়ে যান, ঐ বাসস্থানই সব থেকে উত্তম নিবাসস্থান। সব থেকে অধম বাস হয় যখন আমাদের বাসস্থানের ঠিকানা জগতের অপর কেউ হয়। বাবা-মা, স্ত্রী, সন্তান, প্রেমিক, প্রেমিকা এরা যখন আমাদের ঠিকানা হয় তখন সেটা হয় নিকৃষ্ট নিবাসস্থান। তার থেকে একটু ভালো নিবাস হয় যখন নিজের শরীরকে আমার ঠিকানা করছি। ব্যক্তিত্ব যেটা ছড়িয়ে ছিল সেখান থেকে গুটিয়ে এবার নিজের ভেতরে নিয়ে এসেছে। এর থেকেও উত্তম বাস হবে যখন নিজের মনকে ঠিকানা করে নিল। সব থেকে শ্রেষ্ঠ নিবাস হয় যখন মানুষ পুরোপুরি ঈশ্বরকে নিবাস করে নেয়।

এটা যেমন একদিকে আছে, আবার অন্য দিকে সমস্ত জীবের নিবাসস্থান তুমি। একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠতম, তেমনি আবার সবার নিবাসই আমি। কারণ ঈশ্বরের বাইরে কেউ থাকতে পারে না, সেইজন্য সবার নিবাসস্থান তুমি। অন্য দিকে –

এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন।
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব।২/৬/৫৩
তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ যৎ তে নিয়তমন্দিরম্।
শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টিণাঞ্চ জন্তুষু।
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেহধিমন্দিরম্।২/৬/৫৪

এটা হল সাধারণ ভাবে বলা। সবাই যখন তোমার মধ্যে আছে সেইজন্য তুমিও সবার হৃদয়ে বাস কর। কিন্তু তুমি সীতার সহিত থাকার বিশেষ বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করছ। সেইজন্য বলছি, মানুষের হৃদয়টা তখনই মন্দির হয়ে যায় যখন তাঁর হৃদয়ে ভগবান বাস করেন। ভগবান তো সবারই ভেতরে বাস করছেন। আমাদের বাড়িতে কত ঘরই আছে, রান্নাঘর আছে, বাথরুম আছে, শোওয়ার ঘর আছে, বৈঠকখানা আছে। আর যারা খুব সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের আবার একটা আলাদা পূজার ঘর থাকে। আগেকার দিনে যাঁরা খুব ধর্মপ্রাণ ছিলেন তাঁদের পূজোর ঘরটা বিশেষ ঘর থাকত। মানুষ যখন কাউকে খুব ভালোবাসে তখন তাকে বলে, আমার হৃদয় মন্দিরে তোমাকে বিগ্রহ করে বসিয়ে রাখব। মানুষ মানুষকেই তার হৃদয়ে বসাতে পারে, ভগবানকে বসাতে হলে তার আগে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। ঠাকুর খুব সুন্দর ছড়া বলছেন, ওরে পোদো তুই শাঁক বাজিয়ে করলি গোল। গ্রামে একটা পোড়ো মন্দির ছিল, পদ্মলোচন নামে একজনের খুব ইচ্ছে হল এই পোড়ো মন্দিরকেই আমি বিখ্যাত করে দেব। একদিন সে শাঁক নিয়ে ভোঁ ভোঁ বাজাতে শুরু করল। গ্রামের লোকেরা ভাবল মন্দিরে বিগ্রহ বসানো হয়েছে। দৌড়ে এসে দেখে কিছুই নেই, যেমন পোড়ো ছিল তেমনই পোড়ো, চারিদিকে জংলা আগাছা, মন্দিরের ভেতর চামচিকের বাসা। তখন গ্রামবাসীরা বলছে, ওরে পোদো শাঁক বাজিয়ে তুই করলি গোল। আমাদের ভেতরটাও আবর্জনাতে ভর্তি, মাকড়সার জাল, চামচিকের বাস, পায়রার বিষ্ঠা, এই মন্দিরে কি মাধব প্রতিষ্ঠা করা যায়!

মানুষের হৃদয়কেও মন্দির করা যায়। কখন মন্দির হয়? *শান্তানাং*, মন শান্ত আর ইন্দ্রিয়গুলোও শান্ত, মনের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য ভাব নেই, *সমদৃষ্টিনাম্*, যার শত্রু মিত্র বলে কিছু নেই, সবার প্রতি সমান ভাব। কারণ তিনি

কাকে শত্রু করবেন আর কাকেই বা মিত্র করবেন, দেখছেন সবাই সেই তিনিই হয়ে আছেন, সবাই ঈশ্বরেরই সন্তান। *অদ্বেষ্টিনাম্*, কারুর প্রতি তাঁর কোন দ্বেষ ভাব নেই, সবার প্রতিই তার সমান ভালোবাসা। আর *ত্বামেব ভজতাং নিত্যং*, সব সময় আপনারই ভজনা করছেন, আপনার ছাড়া তিনি আর কারুর দিকে তাকান না, এনাদের হৃদয়টাই মন্দির। বাকিদের হৃদয় হল বাথরুম বা বাসন ধোওয়ার জায়গা, মন্দির আর হয় না। বাল্মীকির কাছে শ্রীরামচন্দ্র জানতে চাইছিলেন কোথায় শান্তিতে বাস করা যাবে। বাল্মীকি তার উত্তর বলছেন, সব জীব তোমাতেই বাস করে, আর এটাই সাধারণ কথা। আর যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি বিশেষ ভাবে কোথায় বাস করেন? হৃদয় মন্দিরে বাস করেন। এমনিতে সাধারণ ভাবে আপনি সবার হৃদয়েই বাস করেন, কিন্তু আপনার বিশেষ বাসস্থান হল হৃদয় মন্দির। ঠাকুর এটাকেই খুব সহজ করে বলছেন, বাবুকে সব জায়গাতেই পাওয়া যায় তবে অমুক বৈঠকখানাতে তিনি বিশেষ ভাবে থাকেন, ওখানে তাঁকে পাওয়া যাবে। ভক্তের হৃদয় হল ভগবানের বৈঠকখানা। সবারই হৃদয়ে তিনি বাস করছেন, কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে তিনি বিশেষ ভাবে থাকেন। সব কিছুতেই অগ্নি আছে কিন্তু কাঠে অগ্নির বিশেষ প্রকাশ।

বিশেষ প্রকাশ আর সাধারণ প্রকাশটা কি? যেমন আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করছি মায়া, ঠিক তেমনি আরেকটা শব্দ হল শক্তি। শুদ্ধ চৈতন্যের উপর অনেক আবরণ পড়ে আছে, সেই আবরণের পর আবরণকে ভেদ করে আমরা সেই শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশকে দেখছি। ওই আবরণ যত সরানো হবে শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ তত ভালো দেখাবে। সব থেকে মোটা আবরণ হল কাম আর ক্রোধ, লোহা বা কাঠের আবরণ। যখন কেউ পাগলের মত কিছু পেতে চাইছে, না পেলে তখন রেগে যাচ্ছে, ক্রোধ হচ্ছে, ওর মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ পুরোপুরি আবৃত হয়ে আছে। অনেকে ক্রোধ করা, রেগে যাওয়াকে শক্তির প্রকাশ বলে মনে করে, কিন্তু ক্রোধ কখনই শক্তির প্রকাশ নয়, ক্রোধ মাত্রই দুর্বলতার চিহ্ন। শ্রীরামচন্দ্রের কারুর প্রতি কোন দ্বেষ নেই, যাকে বধ করার তাকে বধ করে দেবেন, তার প্রতি কোন ক্রোধ বা রাগ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে এক আধবার দেখাচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্র রেগে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। রাগ মানুষের মধ্যে আসবে, কিন্তু সামলে নিতে হয়। বাল্মীকি আবার বলছেন –

ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোহনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্।২/৬/৫৫

সুখমন্দিরম্, সুখের মন্দির, যেখানে মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করে। সেই সুখমন্দির কি? যেখানে শ্রীরামচন্দ্র সীতা সহ বাস করেন। সেই সুখমন্দির কিভাবে নির্মিত হয়? *ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য*, এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণ গীতার বিখ্যাত শ্লোককে আনছেন। গীতাতে ভগবান বলছেন *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য*, যত রকমের ধর্ম ও অধর্ম হতে পারে, মানে করণীয় আর অকরণীয়, যতক্ষণ আমাদের মনে এই ভাব থাকবে আমাকে এটা করতে হবে ততক্ষণ বুঝতে হবে আমাদের ঈশ্বর ভক্তি উদয় হয়নি। কোন কর্তব্য বোধ যদি থাকে, এমনকি ঈশ্বরের প্রতিও যদি কর্তব্য বোধ থাকে, বুঝতে হবে সেখানে এখন ভক্তির ভাব আসেনি। যেখানে ঈশ্বরের প্রতি শুধু ভালোবাসা আছে তখনই সে সুখমন্দিরে বাস করে। যীশুর দুই শিষ্যা, মেরি আর মার্থা যীশুকে খুব ভক্তি করত। যীশু তাদের বাড়ি গেছেন, মার্থা যীশু আর তার সাঙ্গপাঙ্গোদের সেবার জন্য ছুটোছুটি করে কাজ করে যাচ্ছে আর মেরি যীশুর কাছে বসে তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শ্রবণ করে যাচ্ছে। মার্থা এসে যীশুকে বলছেন, মেরিকে বলুন এখানে বসে না থেকে আমাকে কাজে একটু সাহায্য করতে। যীশু বলছেন, মেরি যা করছে এটাই ঠিক। আবার ঠাকুর বলছেন, একজন গুরুর কাছে বসে গুরুর কথা শুনে যাচ্ছে। গুরু শিষ্যকে বলছেন, যাও তামাক সেজে নিয়ে এসো। শিষ্য বলছে আমি কী আপনার সেবা করার যোগ্য? সে উঠে গিয়ে আর তামাকও সাজতে গেল না। যীশু বলছেন, মেরি যেটা করছে এটাই ঠিক। আর ঠাকুর এটাকে নিন্দা করছেন, শিষ্য বলছে আমি কি আপনার সেবা করার যোগ্য! তাহলে কোনটা ঠিক? ঠাকুর যেটা বলছেন, সেখানে তমোগুণীর কথা বলছেন, ওর মধ্যে ফাঁকিবাজীর প্রচেষ্টা লেগে আছে। আর মেরি যে বসে যীশুর কথা শুনছে সেখানে তার এখন কর্তব্য বোধটা চলে গেছে। কর্তব্য বোধ চলে গেছে মানে, যে যীশুকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসছে তাঁর প্রতিও তার এখন কোন কর্তব্য বোধ নেই। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তার প্রতি কোন কর্তব্য বোধ থাকছে না, এটা শুনলে আমাদের কেমন অদ্ভুত মনে হয়।

যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত তাঁদের জন্য এটা সত্যিই একটা মারাত্মক সমস্যা, খুব উচ্চমানের ভক্তের দ্বারা কোন বৈধী ভক্তি করাই আর সম্ভব হয় না। বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর শিষ্য রূপ গোস্বামী থাকতেন, রোজ ভিক্ষা করে

দুটো শুকনো রুটি নিয়ে আসতেন আর তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতেন। একদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে রূপ গোস্বামীকে বলছেন, শুকনো রুটি আর খেতে ইচ্ছে করে না, একটু লবণ যদি জোগাড় করতে পার। পরের দিন রূপ গোস্বামী আরও তিনটে বাড়িতে ভিক্ষায় যেতে শুরু করলেন লবণ নিয়ে আসার জন্য। কিছু দিন পর শ্রীকৃষ্ণ আবার স্বপ্নে তাঁকে বলছেন, আর কত রুটি আর লবণ খেয়ে থাকব, একটু ঘি যদি হত। রূপ গোস্বামী নিজের ইষ্টকে বলছেন, এর বেশি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি ঘি লাগানো রুটি খেতে হয় তাহলে একজন বড়লোক ভক্তকে ধরুন, আমার দ্বারা হবে না। শ্রীকৃষ্ণ তখন দক্ষিণ দেশের এক রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন। তিনি বৃন্দাবনে রঙ্গনাথের মন্দির তৈরী করলেন, সারা দিন সেখানে শুধু ভোগই চলতে থাকে। রামানুজ সম্প্রদায়েও এই সমস্যা হয়েছিল। মন্দিরে সব শিষ্যরা বসে কেউ মালা গাথছে, কেউ চন্দন ঘষছে, কেউ বিগ্রহের কাপড় ঠিক করছে। সেই সময় খবর এল রাস্তায় ভগবানের রথ বেরিয়েছে। খবর পেয়ে কয়েকজন শিষ্য রথ দেখতে বেরিয়ে গেল, বাকী শিষ্যরা মন্দিরেই কাজ করতে থাকল। ততক্ষণে রথও চলে গেছে। রামানুজ জিজ্ঞেস করছেন তোমরা দেরী করলে কেন? শিষ্যরা তখন বলছে, আপনিই তো আমাদের বলে দিয়েছেন ঈশ্বরের সেবা পূজা করতে, আমরা এতক্ষণ তিলক কাটছিলাম, সেটাকে বন্ধ করা যাবে না, তাই দেরী হয়ে গেছে। রামানুজ তখন বলছেন তোমরাই ঠিক করেছ। আর যারা মন্দিরের সেবা কাজ ছেড়ে ভগবানে রথ দেখতে চলে গেছে তারাও ঠিক, সেখান থেকে ওদের দুটো সম্প্রদায় তৈরী হয়ে গেল। একটা সম্প্রদায় ভগবানের সেবা ও বাহ্যিক ধর্মীয় আচারগুলোকে প্রাধান্য দিল, অন্য সম্প্রদায় ভক্তিকে প্রাধান্য দিল।

যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত এখানে তাঁদের কথা আলোচনা চলছে। কর্ম জিনিসটাই খুব জটিল। কিন্তু সাধারণ স্তরের ভক্তদের জন্য কর্ম অত্যন্ত জরুরী, সেবা-পূজা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু যেখানে সাংঘাতিক ভালোবাসা সেখানে কিন্তু কর্ম আর থাকবে না। গভীর ভালোবাসা যেখানে সেখানে তার একাত্ম বোধের দিকে নজর থাকে, সেবার দিকে নজর দিতে চাইলেও আর পারে না। ভালোবাসায় হয় একাত্মবোধ, একাত্ম বোধের দিকে চলে গেলে ধর্ম অধর্ম বলে আর কিছু থাকবে না। সেই কথাই বাল্মীকি বলছেন, *ধর্মাধর্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্*, ধর্ম ও অধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য অকর্তব্য বোধ, শুচি অশুচি বোধ কিছুই আর তখন থাকে না। তাহলে কি থাকে? *ভজতোঽনিশম্*, একমাত্র প্রভুর ভজনা, তাঁর চিন্তন ছাড়া আর কিছু থাকে না। হে রাম! তুমি জানতে চাইছিলে তুমি কোথায় বাস করবে, এবার তুমি কোথায় কোথায় বাস কর আমি এক এক করে বলছি। যাঁরা ধর্ম অধর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধু তোমার চিন্তন করে যায় তুমি সেখানে বাস করেন। আর কোথায় থাকেন?

ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিঃস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্।/২/৬/৫৬

ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্তু, যিনি তোমার মন্ত্র সব সময় জপ করছেন, তুমি সেখানেই বাস কর। *ত্বামেব শরণং গতঃ*, তোমাতে যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত হয়ে আছেন তুমি সেখানে বাস কর। শরণাগত হয়ে যাওয়া মানেই শিশু হয়ে যাওয়া, বাচ্চা যেমন মা ছাড়া আর কিছু জানে না, মা ছাড়া সে নিজেকে অসহায় মনে করে, ঠিক তেমনি যিনি ঈশ্বরে পুরোপুরি শরণাগত তিনি ঈশ্বর বৈ আর কিছুই জানেন না। আফগানিস্থানের ইতিহাসের উপর একটা বই আছে তাতে ১৮১১ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কার আফগানিস্থানের এক রাজার বর্ণনা আছে। রাজা খুব ভালো লোক আর আল্লার প্রতি তাঁর সাংঘাতিক ভক্তি। নিজের লোকেদের ভালোর জন্য তিনি অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু যা হয়, আফগানিস্থানে সবাই নিজের মনের রাজা, কেউ কারুর কথা শোনে না। যার জন্য একটা কেন্দ্রিয় রাজ্য আফগানিস্থানে কোন দিন হতে পারল না। আফগানিস্থানে কখনই শান্তির পরিবেশ ছিল না, আর হবেও না। সেই রাজার এমন এক পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে তাঁকে কাঙালীর মত আফগানিস্থান থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। কিন্তু সব সময় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে আল্লার মর্জি ছাড়া কিছু হতে পারে না। কিন্তু নিজের লোকেদের সংঘটিত করে যতবার হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে গেছেন ততবার মার খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে, লড়াই করে করে একেবার নিঃস্ব প্রায় হয়ে গেছেন। তাঁকে কখন ভারতের রঞ্জিৎ সিং সাহায্য করেছিলেন, কখন ইংরেজরা সাহায্য করেছিল, কিন্তু প্রত্যেকবার লোকটি মার খেয়ে গেছে। যখন মার খাচ্ছে তখনও বলে যাচ্ছেন, আল্লা চান না আমি এখন রাজা হই। আক্রমণ যখন করতে যাচ্ছেন তখন বলছে আল্লা চাইছেন আমি এখন আক্রমণ করি। এটা কোন কাহিনী বলা হচ্ছে না। হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। রাজার কাছে কোহিনুর ছিল, যুদ্ধের জন্য রনজিৎ সিংকে কোহিনুরটাও দিয়ে দিতে হল। কাশ্মীরের কাছে রাজা একবার ধরা পড়ে গিয়েছিল। রনজিৎ সিংকে বলেছিল

ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে, রনজিৎ সিং তাঁকে বললেন, আমি ছাড়ানোর ব্যবস্থা করছি কিন্তু তার বদলে তোমার কোহিনুরটা আমাকে দিতে হবে। আল্লার প্রতি পূর্ণ শরণাগতি, যেখানে তাঁর নিজের প্রাণেরও চিন্তা নেই আর তাঁর সাথে যারা লড়াই করছে তাদের প্রাণেরও চিন্তা নেই। খুব উচ্চমানের ভক্তি না হলে এই শরণাগতি হয় না। এটা খুবই আশ্চর্যের যে মুসলমানদের মধ্যে এই শরণাগতি অনেক বেশি দেখা যায়। সারা বিশ্বে যে এত অশান্তি তাতেও এদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, তারা একটাই জানে আমি আল্লার কাজ করছি, আমার যা হচ্ছে সব আল্লার মর্জি, আমি স্বর্গে যাব, ওখানে আমার জন্য হুরীরা অপেক্ষা করে আছে। হিন্দুদের যদি শরণাগতির এই বিশ্বাস থাকত, হিন্দু জাতি তাহলে আজ কোথায় চলে যেত। তার কারণ হিন্দুদের এত উচ্চ দর্শন, এত উচ্চ আদর্শ সেখানে যদি এই শরণাগতি হত তাহলে হিন্দু জাতির চেহারাটাই আজ পাল্টে যেত। বাল্মীকি বলছেন –

নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জিতঃ।
সমালোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্।২/৬/৫৭

যিনি নিরহঙ্কার, আমি ভাব যাঁর মধ্যে নেই, *রাগদ্বেষবর্জিতঃ*, মনের মধ্যে কোন ধরণের রাগ দ্বেষ নেই আর *সমালোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং*, মাটির ডেলা আর সুবর্ণে যাঁর সমান দৃষ্টি, কোন কিছুকে সে পেতেও চায় না, কোন কিছুকে সে ছাড়তেও চায় না, এই রকম হৃদয়মন্দিরে তুমি বাস কর। টাকা মাটি, মাটি টাকা এই বোধ, দুটোই সমান, দুটোরই কোন দাম নেই এই বোধ কখন হওয়া সম্ভব? আসলে আমাদের জীবন দুটো ধারায় চলে, একটা চলে আদর্শের ধারাতে, আরেকটা চলে লক্ষ্যের ধারাতে। আদর্শের ধারাতে হয়, এটাই আমার জীবন শৈলী এছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আর লক্ষ্যতে হয়, project to project move করে আর দিনগত পাপক্ষয় করে। আমরা সবাই কিন্তু লক্ষ্যের ধারাতে চলছি। লক্ষ্য ধারাতে জীবন যাদের চলছে তাদের কাছে টাকা মাটি মাটি টাকা কোন দিন হবে না। আফগানিস্থানের ইতিহাসের বইতে আরেকটা বর্ণনা আছে, একজন রাজা ছিলেন যাকে দশটা উপজাতির দল সমর্থন করে যাচ্ছে। সেই রাজাকে আরেকজন রাজা আক্রমণ করেছে যার সমর্থনে মাত্র দুটো উপজাতি রয়েছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেলে আগের রাজার ছজন উপজাতি দল অন্য দিকে চলে গেছে, এরা আগেই টাকা খেয়ে দল বদল করে নিয়েছে। শুধুমাত্র একে ডোবানর জন্য তার সঙ্গে আছে। যার দুজন উপজাতি ছিল তার আট হয়ে গেল আর এরা দশ থেকে চারটি উপজাতি থাকল, ওখানেই সব ফয়সালা হয়ে গেল। আফগানিস্থানে এখনও কে কার দিকে আছে বোঝাই যায় না। কারণ ওদের কাছে যুদ্ধটা আদর্শ নয়, ওদের কাছে যুদ্ধ জয় করাটা লক্ষ্য। এই উপজাতিরা যুদ্ধ জয় করলে বেশি টাকা পাবে আর যুদ্ধ না করেই যদি বেশি টাকা দিয়ে দেয় তাহলে তারা মিছিমিছি মরতে যাবে কেন! দায়বদ্ধতা বলে এদের কিছু নেই। কোন লেখককে যদি কেউ এসে বলে আপনাকে এক কোটি টাকা দিচ্ছি আপনি লেখা বন্ধ করে দিন। যদি লেখক রাজী হয়ে যান তাহলে বুঝতে হবে বই লেখাটা তাঁর জীবনের ধারা ছিল না। বই লেখাটা তাঁর লক্ষ্য ছিল, ওই লক্ষ্যটা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল আরেকটা লক্ষ্য পুর্তির দিকে, সেই পুর্তিটা হল টাকা। সেই টাকা পেয়ে গেলেন লেখাটাও বন্ধ করে দিলেন। জীবনের যা উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ, এই চারটের যে কোন একটি যদি কারুর জীবনের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ওই উদ্দেশ্য থেকে তাকে চ্যুত করার জন্য যত টাকাই দেওয়া হোক না কেন, তাকে কেউ চ্যুত করতে পারবে না। নিজের ধর্মকে কখন ছাড়তে নেই, ধর্মকে ছাড়া মানে নিজের জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। গীতায় যে বলছেন *সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ*, এটাই আমাদের মৌলিক মূল্যবোধ। সেইজন্য আমাদের আদর্শই হল যেটা আমাদের জীবনধারা সেই জীবনধারাকে আমরা কক্ষণই পাল্টাতে যাব না। যদি কোন জীবনধারা না হয়ে লক্ষ্য হয়ে থাকে তখন জীবন অন্য রকম হয়ে যাবে।

এর খুব সুন্দর উপমা আছে, ব্রাহ্মণ পুত্রের অভিশাপে সাত দিনের মধ্যে তক্ষকের দংশনে পরীক্ষিৎ মারা যাবে। তক্ষক প্রস্তুত দংশন করার জন্য। ওখানে একটা কাহিনী আছে, একজন ব্রাহ্মণ তক্ষকের বিষ নামানোর মন্ত্র জানত। সেই ব্রাহ্মণ এখন চলেছে তক্ষক রাজাকে দংশন করলে আমি রাজাকে বাঁচিয়ে দেব। খবর পেয়ে তক্ষক পরীক্ষা নিতে এসেছে। তক্ষক রাস্থায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করছে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? রাজা পরীক্ষিৎকে বাঁচাতে। তক্ষক এক বিষাক্ত নাগ, তার বিষ থেকে রাজাকে আপনি বাঁচিয়ে দেবেন? ব্রাহ্মণ বলছে, আমার কাছে যে সঞ্জীবনি মন্ত্র আছে তাতে আমি বাঁচিয়ে দেব। আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন? কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব! তখন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার আসল রূপ দেখিয়ে বলছে আমিই তক্ষক। বলেই একটা গাছে ছোবল দিয়েছে, গাছটা সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে গেছে। এবার আপনি গাছটাকে বাঁচান তো। ব্রাহ্মণ মন্ত্র মারতেই গাছটা

সবুজ হয়ে গেছে। তখন তক্ষক বলছে আপনি যে পরীক্ষিতের কাছে যাচ্ছেন সেখানে আপনি কটা টাকাই তো পাবেন, আমি আপনাকে এখনই টাকা দিয়ে দিচ্ছি। কালচক্রে যেটা নির্ধারিত হয়ে আছে এটাতে আপনি বিঘ্ন করতে যাবেন না। ব্রাহ্মণ বলল, আমি তো টাকার জন্যই যাচ্ছিলাম, আমাকে টাকা দিয়ে দিলেই আমি বাড়ি ফিরে যাব। তখন তক্ষক কিছু স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে দিয়ে সেখান থেকে বিদায় করে দিয়েছে। পরে জন্মেজয় যে রেগে গিয়েছিল এটাও তার একটা কারণ ছিল। বাবাকে ব্রাহ্মণ বাঁচাতে আসছিল তক্ষক তাকে ছল করে ফেরত পাঠিয়ে দিল। ব্রাহ্মণের কাছে অপরের জীবন রক্ষা করাটা জীবনধারা ছিল না, ব্রাহ্মণের লক্ষ্য ছিল আমার এই বিদ্যাকে আমি আমার সম্পদে রূপান্তরিত করতে চাই। ব্রাহ্মণের লক্ষ্য ছিল অর্থোপার্জন। ব্রাহ্মণের বিদ্যাই যদি উদ্দেশ্য থাকত তাহলে বলত, যে সাপেই দংশন করুক আমি সবাইকে বাঁচিয়ে তুলব। সম্পদ উদ্দেশ্য তখনই হবে যখন সম্পদ নিজের জন্য না হয়ে দেশের জন্য হবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজের জন্য সম্পদের চেষ্টা করছে। ব্রাহ্মণের জীবনের কোন আদর্শই আর থাকল না। ইতিহাসে তাই ব্রাহ্মণের কোন নাম নেই, একটা কাহিনীর ফুটনোটে থেকে গেল। আমাদের মৌলিক মূল্যবোধ হল *সমলোষ্টশ্মাকাঞ্চনঃ*, এটাকে যে কেউ তার জীবনে আদর্শ করে নিতে পারে। আমরা মনে করছি যিনি আত্মজ্ঞানী হবেন, যিনি শরণাগতির পথে যাচ্ছেন তাঁদের জন্য এগুলো, তা কখনই নয়, সবার জন্য এই মূল্যবোধ।

রিচার্ড ফাইনম্যান খুব বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী, নোবেল প্রাইজও পেয়েছেন, ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনা করতেন। ফাইনম্যানের একবার মনে হল আমার আরও কিছু টাকার দরকার। তিনি তখন আরেকটা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন, তখনও তিনি নোবেল প্রাইজ পাননি। এখানে তিনি মাসে হাজার ডলারের মত পেতেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলা হল আমরা আপনাকে বারশো ডলার দেব, আপনি চলে আসুন। উনি তখন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে জানালেন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বলে দিল, আমাদের এখান থেকে আপনাকে ছাড়াছাড়ির ব্যাপার নেই। এখানে একবার ঢুকে গেছেন মানে আমাদের সাথে বিয়ে হয়ে গেছে, ছাড়াছাড়ি নেই, এই নিন আমরা এই মাস থেকে আপনাকে পনেরশ ডলার করে দিচ্ছি। তখন ফাইনম্যান আবার ওদেরকে জানিয়ে দিল। ওরা ওখান থেকে বলে দিল আমরা ষোলশ ডলার দেব। আবার এদের বলাতে এরাও বলে দিল আমরা আঠারশো ডলার দিচ্ছি। ওদেরকে জানাতে ওরা বলে দিল দু হাজার ডলার। ফাইনম্যান নিজের স্মৃতিকথায় একটা খুব নামকরা কাহিনীকে নিয়ে লিখছেন, রাস্থার দু ধারে দুটো বড় খড়ের গাদা রাখা ছিল। একটা গাধা রাস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। যখন গাধাটা এদিকে তাকাচ্ছে তখন মনে করছে এই খড়ের গাদাটা উঁচু, ওখানে গেলে আরও বেশি খেতে পারব, গাধাটা ঐদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই খড়ের গাদার কাছে চলে আসার পর অন্য দিকে তাকিয়ে মনে করছে ওই গাদাটা উঁচু, তখন সে আবার অন্য গাদার কাছে এগিয়ে গেল। ওখানে পৌঁছে গিয়ে দেখছে এইদিকের গাদাটা উঁচু, সে এটাকে ছেড়ে আবার ঐদিকের গাদার দিকে এগিয়ে গেছে। যদি কোন গাধাকে মেরে ফেলতে হয় তাহলে দুদিকে সমান সমান খড়ের গাদা করে গাধাকে মাঝখানে ছেড়ে দিলে কোন গাদার খড়ই সে খেতে পারবে না। কাহিনীতে এটাই বলছে, সত্যি কি মিথ্যে আমাদের জানা নেই। একটা খড়ের গাদার কাছে দাঁড়িয়ে মনে করে ঐ গাদাটা আরও বেশি উঁচু ওদিকে গেলে আরও বেশি খেতে পারব। ফাইনম্যান এটাই লিখছেন এই গাধার মত আমার কাছে দূরেরটা বেশি ভালো দেখাচ্ছে তা নয়, এটা তো সত্যিকারের হাজার থেকে দু হাজার ডলারে চলে গেছে। তিনি তখন বলছেন, তখন আমি ভাবলাম আমি এই যে হাজার ডলার অতিরিক্ত পাচ্ছি, আমি এই ডলার নিয়ে কি করব! আরেকটা বাড়ি কিনব, সেখানে একজন মিস্ট্রেস রাখব, গার্ল ফ্রেণ্ড রাখব আর সারাদিন আমার দুশ্চিন্তা হবে আমি তো গার্ল ফ্রেণ্ডের কাছে এখন নেই, সে আরেকটি পরপুরুষকে কাছে রেখে দিয়েছে কিনা কে জানে। তখন আর আমাকে ফিজিক্স পড়তে হবে না, সারাটা দিন ঐ মেয়েটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে থাকব। সোজা তিনি নিজের ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বলে দিলেন আমার একটি ডলারও বাড়াতে হবে না, হাজার ডলার যেমন ছিল তেমনই থাকবে। পুরোটাই তিনি ছেড়ে দিলেন। রিচার্ড ফাইনম্যানের স্মৃতিকথায় তিনি এই কাহিনী বলছেন। যেমনি টাকা এল আপনি জানবেন আপনার জীবনধারা পাল্টে গেল। যারা নিজের জীবনধারার ব্যাপারে সজাগ, তাদের আপনি যাই টাকা দিন, যাই প্রলোভন দেখান, কামিনী-কাঞ্চন, যশ, ক্ষমতা যাই দিয়ে দিন, তারা কিন্তু নিজের পথ থেকে আর সরবে না।

আমরা যে চারটে আদর্শের কথা বলছি, বিদ্যা, সম্পদ, সেবা ও ত্যাগ। এখানে ত্যাগের কথা বলছেন, ঈশ্বরের জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। তাঁর মন পুরোপুরি ঈশ্বরের উপর, এখন আর তাঁর কামিনী-

কাঞ্চনের দিকে মন যাবে না। মন কাদের কামিনী-কাঞ্চনের দিকে যায়? যারা দিনগত পাপক্ষয় করছে। সকালে উঠে ভাবছে দিনটা কি করে কাটবে আর রাত্রে ভাবছে ঘুমটা কি করে আসবে। উদ্দেশ্য সেইজন্য সব সময় হওয়া উচিত জীবনকে একটা আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়া, জীবনকে একটা জীবনধারায় প্রতিষ্ঠিত করা। আবার ওই একই ভাব নিয়ে বলছেন –

ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ত্যক্তকর্মা যস্তন্মনাস্তে শুভং গৃহম্।২/৬/৫৮
যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষতি।
সর্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্।২/৬/৫৯

মন, বুদ্ধি সব কিছুই আপনাতে সমর্পিত করে যিনি সব সময় সন্তুষ্টি ভাব নিয়ে থাকেন আর সমস্ত কর্মের ফল আপনাতেই অর্পণ করছেন, তাঁর যে হৃদয় সেটাই আপনার শুভ নিকেতন। আর বলছেন, যিনি সব কিছুই মায়া এই ভাবকে নিশ্চয় করে অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ করেন না আর প্রিয় বস্তুতে উৎফুল্ল হন না এবং শুধু আপনারই নিরন্তর ভজনা করেন, এদের মনই আপনার উত্তম গৃহ।

ষড়্‌ভাবাদিবিকারান যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুর্ত্তৃষ্ট সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে।২/৬/৬০

যে কোন জিনিসের ছয়টি বিকার হয়। প্রথমে হয় অস্তি, জিনিসটা আছে, তারপর জায়তে, জন্ম হল, বর্ধতে, একটু একটু করে বাড়তে থাকে, বিপরীণমতে, একটা থেকে আরেকটাতে পাল্টে যায়, অপক্ষীয়তে, তার ক্ষয় হতে থাকে আর বিনশ্যতে, শেষে নাশ হয়ে যায়। আমাদের সবার শরীরের এই ছয়টি বিকার সব সময় দেখা যায়। যিনি দেখেন এই শরীরের মধ্যে এভাবেই বিকার চলছে কিন্তু আত্মার মধ্যে কোন বিকার নেই। তিনি যেখানে বিকারহীন দেখছেন সেখানে তাঁর মনকে নিবদ্ধ করেন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, ভয়, দুঃখ এগুলোকে যিনি প্রাণ আর বুদ্ধির ধর্ম রূপে দেখেন এবং সাংসারিক ভালো মন্দের থেকে দূরে থাকেন, এই ধরণের মানুষের যে মন, সেই মনই আপনার ঠিক ঠিক নিজের আবাসস্থান। এইভাবে বলছেন, যিনি সব সময় আত্মার চিন্তন করেন, সবারই অন্তঃকরণে আপনাকে দর্শন করেন, হে রাম! ওই ধরণের মানুষের হৃদয়েই আপনার বাস আর আপনি সেখানেই বাস করতে থাকেন। নিরন্তন আপনার চিন্তন করে করে যাঁদের চিত্ত স্থির হয়ে গেছে, আপনার চরণ সেবাতে যাঁরা সব সময় তৎপর হয়ে থাকেন, এনাদের সব পাপ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এদেরই হৃদয় আপনার ঠিক ঠিক বাসগৃহ।

এইসব বলার পর বাল্মীকি নিজের কাহিনী বলছেন। কাহিনী আমাদের সবারই জানা। বলছেন আমার ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়েছিল কিন্তু শূদ্রদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার আচরণ শূদ্রদের মত হয়ে গিয়েছিল। বাল্মীকি এক শূদ্রা মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন, সেখান থেকে তাঁর অনেকগুলি পুত্র সন্তান হয়েছিল। তখন তাঁর নাম ছিল রত্নাকর। একবার সপ্তর্ষির ঋষিরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের সব কিছু লুট করতে গেছে। ঋষিরা রত্নাকরকে বলছেন, তুমি যে এই পাপকর্ম করে বেড়াচ্ছ তোমার পাপকর্মের ভাগ তোমার বাড়ির লোকেরা কি নেবে? বাড়িতে গিয়ে এক এক করে সবাইকে জিজ্ঞেস করছেন। শুনে সবাই অবাক হয়ে গেছে, তুমি এই ঘৃণ্য কাজ করছ আমরা জানতাম না। বাড়ির লোকেরা কেউই তাঁর পাপের ভাগ নিতে রাজী হল না। বাল্মীকি বলছেন, তখন আমার মনে বৈরাগ্য এসে গেল, যাদের জন্য আমি এই পাপকর্ম করছি তারাই আমার পাপকর্ম নিতে রাজী নয়। তখন তিনি ঋষিদের পায়ের উপর পড়ে বলছেন, হে ঋষিবর! আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

এখানে আমরা যদি বাল্মীকিকে না নিয়ে এই কাহিনীকে একটা প্রচলিত ধারণা রূপে নিই, তাহলে দেখতে পাব যে, ভারতবর্ষে কখন বায়োগ্রাফি লেখা হয় না, এখানে একটা আদর্শকে কোন একটা চরিত্রের মাধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়। সেইজন্য ঐতিহাসিক চরিত্র আর আদর্শের চরিত্র কখনই মিলবে না। শ্রীকৃষ্ণ যিনি বাস্তবিক ছিলেন সেই কৃষ্ণ কোন দিন ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের সাথে মিলবে না। শ্রীরামচন্দ্র যিনি বাস্তবিক ছিলেন সেই শ্রীরামচন্দ্রকে কোন দিনই রামায়ণের রামের সাথে মেলানো যাবে না। ঠিক তেমনি বাল্মীকি যিনি বাস্তবিক ছিলেন তাঁকে কোন দিনই রামায়ণের বাল্মীকির সাথে মেলানো যাবে না। কারণ লেখকদের আদর্শ হল, ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষ এই চারটে যে আদর্শ, বিভিন্ন চরিত্র ও বিভিন্ন ঘটনাকে অবলম্বন করে ওই চারটে আদর্শের শিক্ষা দেওয়া। এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন মানুষ যখন কঠোর ক্রূর কর্ম করতে শুরু করে, গর্হিত কর্ম, শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম করতে শুরু করে,

এইসব কর্ম করতে করতে একটা খুব নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে যায়। রত্নাকরের থেকে নীচু আর হতে পারে না। ব্রাহ্মণ বংশের কিন্তু শূদ্রের আচরণ করছে, ব্রাহ্মণ বংশের কিন্তু শূদ্র মেয়েদের ধরে রেখেছে, এর উপর আবার ডাকাতি করছে, মানুষ খুন করছে। এর থেকে আর কত নীচে যাবে, এর নীচে তো আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু ঐ অবস্থার মধ্যেও ঋষিদের সাথে দেখা হতেই বটবৃক্ষের একটা বীজ যেন পোড়ো বাড়িতে গিয়ে পড়ল। এরপর যখন জল পাবে, সূর্যের কিরণ পাবে, বাতাস পাবে তখন সেই বীজ আস্তে আস্তে অঙ্কুরিত হয়ে এক মহীরুহে পরিণত হয়ে যাবে, আর ওই পোড়ো বাড়িটাকে শেষ করে দেবে, অর্থাৎ তার যে একটা বিধ্বস্ত ব্যক্তিত্ব ছিল সেই ব্যক্তিত্বের নাশ হয়ে যাবে। এই যে একটু বিবেক জাগ্রত হয়ে গেল, যেখান থেকে রত্নাকর বলল আমাকে রক্ষা করুন, তখন ঋষি তাকে বললেন তুমি রাম নাম জপ কর। রাম হল সনাতন মন্ত্র। কিন্তু রত্নাকর এমনই পাপী যে সে রাম নামও করতে পারছে না। তাই তাকে বলে দেওয়া হল তুমি মরা মরা মরা বলতে থাক। সে এখন মরা মরা জপ করতে থাকল। ওই বটবৃক্ষের বীজ এবার অঙ্কুরিত হল। ধীরে ধীরে পল্লবিত হতে থাকল, সেখান থেকে বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হতে থাকল, এই যে বটবৃক্ষের বিস্তার হচ্ছে এতে রত্নাকরের ব্যক্তিত্বটা নাশ হয়ে গেল, থেকে গেল বিশাল এক মহিরুহ। বলছেন, এভাবে শত সহস্র যুগ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেল। এটাই বলার উদ্দেশ্য একদিনেই মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তর হয় না। দিনের পর দিন একভাবে পড়ে থেকে শুধু রাম নাম জপ করে যাচ্ছেন, ধীরে ধীরে রত্নাকরের শরীর উই পোকার ঢিপিতে চাপা পড়ে গেল। উই পোকার ঢিপিকে সংস্কৃতে বলে বল্মীক। অনেক দিন পর ঋষিরা আবার সেই পথ দিয়ে একদিন যেতে যেতে ভাবছেন এখানে সেই রত্নাকর তপস্যা করছিল, সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত তার তো মৃত্যু হওয়ার কথা নয়। ঋষিরা তখন তার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। ঋষিদের ডাকে তখন তার সমাধিটা ভাঙল। ভাঙার পর রত্নাকার সেই উইয়ের ঢিপি ভেঙে বেরিয়ে এলেন। ঋষিরা তখন বললেন তুমি বল্মীক থেকে বেরিয়ে এসেছ তাই তোমার নাম আজ থেকে বাল্মীকি হল।

উপনিষদেও এই ধরণের একটি কাহিনী আছে। আরুণি নামে এক শিষ্য ছিলেন। একদিন রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল, গুরু আরুণিকে বললেন এত বৃষ্টিতে ক্ষেতের আল ভেঙে চাষের জমি না ডুবে যায়, তুমি একবার দেখে এসো। আরুণি গিয়ে দেখছে আল ভেঙে এত জল বেরিয়ে আসছে যে আলের মাঝখানে নিজেই শুয়ে পড়ে জল আটকে দিয়েছে। রাত্রিবেলা শিষ্যকে বলে দিয়ে গুরু শুয়ে পড়েছেন। শিষ্য ফিরল কিনা জানতেও পারলেন না। সকালে উঠে আরুণিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছেন না। কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে তিনি ক্ষেতের কাছে খুঁজতে গেছেন। গিয়ে দেখছেন আরুণি আলের উপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে। গুরু আরুণির নাম ধরে ডাক দিতে আরুণি উঠে পড়ল। তখন গুরু বলছেন, এই যে তুমি মাটি ফুঁড়ে উঠে এলে তাই আজ থেকে তোমার নাম উদ্দালক। ঋষিরাও ওই রকম রত্নাকরের নাম দিলেন বাল্মীকি।

নিজের কাহিনী বলার পর বাল্মীকি বলছেন, আপনার নামের কৃপাতেই আজ আমি এই বাল্মীকি ঋষি হতে পেরেছি। আপনি জানতে চেয়েছিলেন আপনি কোথায় থাকবেন, আমি আপনাকে তো সব বললাম আপনি কোথায় ঠিক ঠিক বাস করেন। তবে আপনি যদি সাধারণ ভাবে এই জঙ্গলে কোথাও থাকতে চান তাহলে চলুন আপনাকে বাসোপযুক্ত একটা ভালো মনোরম জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। বাল্মীকি তখন নিজের কয়েকজন শিষ্যকে দিয়ে চিত্রকূট জঙ্গলে দুটো ছোট খুব সুন্দর পর্ণ কুটির নির্মাণ করালেন। এই পর্ণ কুটিরে এবার শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণ বাস করবেন। এবার ওনারা চিত্রকুটে প্রবেশ করে গেলেন।

দশরথের জীবনাবসান

অন্য দিকে সুমন্ত্র শ্রীরামন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণকে ছেড়ে অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন। রাজা দশরথ খুব দুঃখ করে জিজ্ঞেস করছেন, হে সুমন্ত্র! তুমি রামকে কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলে। যা যা হয়েছে সুমন্ত্র সব দশরথকে বলেছেন। তখন কৌশল্যা খুব কেঁদে কেঁদে রাজা দশরথকে বলছেন, আপনি সত্যিই যদি কৈকেয়ীকে এত ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভরতকেই সাম্রাজ্য দিতেন কিন্তু আমার ছেলেকে কেন জঙ্গলে পাঠালেন। এসব কথা শুনে দশরথও আবার কান্নাকাটি করতে শুরু করে দিয়েছেন। কৌশল্যা দুঃখ রাগ সব মিলিয়ে রাজা দশরথকে বলছেন, আজ যা কিছু হয়েছে সব আপনিই তো করেছেন এখন এই কুম্ভিরাশ্রু ফেলার কি প্রয়োজন। কৌশল্যার কথা শুনে খুব মর্ম বেদনা নিয়ে দশরথ বলছেন, একেই তো আমি রামের বিরহে আকুল হয়ে দুঃখে মরতে বসেছি, এর উপর তুমি এভাবে আমাকে কেন দুঃখ দিতে চাইছ! আরও কিছু কথা বলার পর রাজা দশরথ বলছেন, আমার

প্রাণ আর বেশিক্ষণ থাকবে না। রাজা দশরথ তখন কৌশল্যাকে শ্রবণ কুমারের কাহিনী বলছেন। এর আগে আমরা বলছিলাম হিন্দু ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে কর্মবাদের উপর। হিন্দু ধর্ম থেকে কর্মবাদ সরিয়ে দিলে হিন্দু ধর্ম আর দাঁড়াতে পারবে না। বিদেশীরা আগেকার দিনে কিছুতেই কর্মবাদের ব্যাপারটা ধরতে পারত না। কিন্তু সব ধর্মই কোন না কোন ভাবে কর্মবাদকে মানছে। Law of Karmaকে যদি না মানা হয় তাহলে ধর্ম দাঁড়াতে পারবে না। দর্শনের দিক দিয়ে যদি ধর্মকে পার্থক্য করা হয় তাহলে দুটো ধর্ম দাঁড়াবে, এক যারা কর্মের বিধান মানবে আর দুই যারা কর্মের বিধান মানবে না। কিন্তু খ্রীশ্চান, মুসলমান সবাই কর্মের বিধান মানছে। তারাও বলছে আমি যদি ভালো কর্ম করি তাহলে মৃত্যুর পর আমি স্বর্গে যাব। হিন্দুরা কর্মের বিধানকে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মজা করে লোকে বলে, আপনি রাস্থা দিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে একটা বাড়ির ইট খসে আপনার মাথায় পড়ল। আমেরিকায় হলে লোকটি প্রথমে যাবে কেস করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে। ভারতের লোকটি ভাববে আমি কি কর্ম করেছি যার জন্য আমার মাথায় এই ইট এসে পড়ল, নিশ্চয়ই আমার কোন কর্ম ক্ষয় হল।

আমাদের মধ্যে নানান রকম প্রশ্ন উঠবে, রাজা দশরথের এই দুরবস্থা কেন হল, এই সংশয়কে মেটাবার জন্য তাই একটা কোন কর্মকে নিয়ে আসতে হবে। তখন এই শ্রবণ কুমারের কাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক আগে রাজা দশরথের বয়স কম ছিল, তখন তাঁর বিরাট শক্তি, খুব প্রতাপ আর তিনি সেই সময় শব্দভেদী বাণ অর্থাৎ শব্দ শুনে বাণ চালানোর অনুশীলন করতেন। একদিন রাত্রিবেলা শিকার গিয়ে শিবিরে বসে আছেন, হঠাৎ তিনি একটা আওয়াজ পেলেন। আওয়াজ শুনে মনে করলেন যে হাতি জল পান করছে। ওই শব্দকে লক্ষ্য করে রাজা দশরথ বাণ চালালেন। বাণ চালাবার পরই একটা মানুষের আর্তনাদ তাঁর কানে ভেসে এল। উনি বুঝে গেলেন এক সর্বনাশ হয়ে গেছে। দৌড়ে গিয়ে দেখেন এক মুনি কুমার জল নিতে এসেছিলেন, জল ভর্তি করতে গিয়ে যে আওয়াজ হচ্ছিল তাতে রাজা দশরথ মনে করলেন কোন হাতি জল খাচ্ছে। রাজা দশরথ তো ভয়ে কাঁপছেন, আর বলছেন একজন নিরীহ ব্রাহ্মণ মুনিকে আমি বধ করে দিলাম, এ আমি কি করে বসলাম! শ্রবণ কুমার তখন রাজা দশরথকে বলছেন দেখুন প্রথমটা আপনার কোন চিন্তা নেই কারণ আমি ব্রাহ্মণ কুমার নই, আমি বৈশ্য। ব্রহ্মহত্যার পাপ আপনার লাগবে না। তবে অন্য দিকে হল আমার বাবা-মার খুব ইচ্ছে হয়েছিল তীর্থ করবেন, আমি তাই বাঁকে করে ওনাদের নিয়ে তীর্থ করছিলাম, আমার তরফ থেকে আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার বাবা-মা আমার প্রতীক্ষা করে আছেন, আপনি যদি বাঁচতে চান এই জলটুকু তাঁদের জন্য নিয়ে যান আর ওনাদের কাছেই আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবেন। আপনি যদি ক্ষমা না চান ওনারা হয়ত রেগে আপনাকে অভিশাপ দেবেন তাতেই আপনি হয়ত ভস্ম হয়ে যাবেন। যাই হোক, দশরথ এখন ভয়ে ভয়ে শ্রবণ কুমারের বাবা মার কাছে গেছেন। যা হয়ে থাকে মানুষের মনের মধ্যে অপরাধ বোধ যখন চেপে যায় আর তার যাই ক্ষমতা থাকুক না কেন, ওই অপরাধ বোধের জন্য তখন সে আর দাঁড়াতে পারে না। সেই অপরাধ তার জেনে বুঝেই হোক আর অজান্তেই হয়ে থাকুক, এই অপরাধ বোধই তাকে শেষ করে দেয়। রাজা দশরথ এসেছেন, পায়ের শব্দ শুনে ভাবছেন তাঁদের পুত্র জল নিয়ে এসেছে। উনি বললেন, আমি দশরথ। ওনারা জানতে চাইলেন আমাদের পুত্র কোথায়। তখন রাজা দশরথ পুরো ঘটনাটা বললেন। পুত্রের দুঃসংবাদ শুনে তো বাবা-মা খুবই মর্মাহত হয়েছেন আর দশরথের উপর প্রচণ্ড রেগে গেছেন। প্রথমে বললেন, আমাদের সেখানেই নিয়ে চল যেখানে আমাদের পুত্রের পার্থিব শরীরটা পড়ে আছে। ওখানে নিয়ে আসর পর বলছেন, এই পুত্রশোকে আমরা আর বাঁচব না, সেইজন্য একটা চিতা বানিয়ে সেই চিতায় আমাদের সন্তানকে তুলে দাও আর আমাদেরও সেই চিতায় তুলে দাও। আর আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমিও যখন বৃদ্ধ হবে তখন তুমিও পুত্রশোকেই মারা যাবে।

এই কাহিনী বলার পর রাজা দশরথ কৌশল্যাকে বলছেন, আমার উপর অভিশাপ আছে, আমাকেও পুত্রশোকে দেহত্যাগ করতে হবে, আমি আর বাঁচব না, আমার আর কিছু করার নেই। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, রাজা দশরথ অজান্তায় একটা পাপ করে ফেলেছেন, তিনি জল নিয়ে গেলেন, ক্ষমা চাইলেন, তাও তাঁরা রাজা দশরথকে ক্ষমা করলেন না, অথচ তাঁরা তীর্থ করছিলেন। একটা হতে পারে যে, পুত্রশোক এমনই এক শোক যে তখন বিচার বুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায়, একজন লোক তখন ক্ষমা চাইলেও যে ক্ষমা করে দিতে হয় সেটাও তাঁদের চেতনাতে আসছে না। অথচ আমরা আগেই জানলাম যে রাজা দশরথ এর আগের আগের জন্মে কশ্যপ মুনি ছিলেন, তিনি ভগবানকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করেছিলেন। আর তাঁকেই কিনা অভিশাপে মারা যেতে হল। বেদ যেমন শাস্ত্র, মহাভারত যেমন শাস্ত্র ঠিক তেমনি অধ্যাত্ম রামায়ণও শাস্ত্র, শাস্ত্র যখন পড়া হয় তখন

তার কোন জিনিসকেই ঐতিহাসিক রূপে দেখতে নেই। শাস্ত্রের সব সময় একটাই কাজ, কিছু বিচার, কিছু ভাব, কোন আদর্শকে আমাদের সামনে রেখে দেওয়া, তার জন্য এনারা নানা রকম কাহিনী তৈরী করেন, এই কাহিনীকে আক্ষরিক অর্থে নিতে গেলে অনেক সমস্যা এসে যাবে। এখানে একটা বাস্তবিক পরিস্থিতির বর্ণনা করছেন। মানুষ যখন তার একমাত্র অবলম্বনকে চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলে তখন তার মধ্যে আর কোন কিছুই কাজ করবে না। মানুষ পুত্রশোকে এমন অধীর হয়ে পড়ে যে তার মধ্যে আর কোন কিছুই কাজ করতে চায় না। সেইজন্য বাবা-মার সামনে তাঁদের সন্তানের উপর কখনই হাত দিতে নেই।

এই কাহিনী বলতে বলতেই রাজা দশরথের প্রাণ 'হা রাম' 'হা রাম' করতে করতে বেরিয়ে গেল। চারিদিকে কান্নাকাটির রোল উঠে গেছে। বশিষ্ঠ মুনি এসে আদেশ করলেন রাজার শরীরকে তেলের মধ্যে চুবিয়ে রাখতে। রাজার শরীরকে এখন কিছু দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। কারণ ভরত আর শত্রুঘ্ন মামা বাড়িতে রয়েছে, তাদেরকে নিয়ে আসতে কিছু দিন লাগবে। সন্তান থাকতে সন্তানের অবর্তমানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা যাবে না। তাই শরীরটা তেলের মধ্যে চুবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভরত আর শত্রুঘ্নকে নিয়ে আসার জন্য ভরতের মামার বাড়িতে লোক পাঠানো হয়েছে, কিন্তু অযোধ্যার কোন খবরই দেওয়া হয়নি। ভরত কিন্তু শত্রুঘ্নকে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্রের উপর বা বাবা দশরথের উপর নিশ্চয়ই কোন বড় অঘটন ঘটে গেছে। নানা রকম দুশ্চিন্তার কথা ভাবতে ভাবতে ভরত আর শত্রুঘ্ন অযোধ্যা নগরীতে প্রবেশ করে দেখছেন –

ইতি চিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ।
নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসম্বাধবর্জিতম্।১/৭/৫৬
উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্টা চিন্তাপরোঽভবৎ।
প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জিতম্।১/৭/৫৭

অযোধ্যা নগরীর রাস্তাঘাট কেমন যেন জনশূন্য, শ্রীহীন লাগছে। যে নগরী সব সময় উৎসব মুখর থাকে সেই নগর যেন উৎসবহীন। সব দেখে ভরতের আরও দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া বলছেন তার মানে, কোথাও কোন আমোদ আহ্লাদ নেই, কোথাও আলো জ্বলছে না। হিন্দুদের এই প্রথাগুলো খুব বেশি প্রচলিত, সন্ধ্যে হলে আলো জ্বালাতে হয়, ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। গৃহস্থ ছেঁড়া ফাটা জামা কাপড় পড়লে ঠাকুর খুব অসন্তুষ্ট হতেন। পয়সা নেই এক্ষুণি কিনতে পারছেন না ঠিক আছে, ছিঁড়ে গেছে সেলাই করে নাও। এগুলোই লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ, গৃহস্থদের কখনই লক্ষ্মীছাড়া থাকতে নেই, ভ্রষ্টলক্ষ্মী হতে নেই। বিধবাদের চিহ্নই হল ভ্রষ্টলক্ষ্মী, স্বামী মারা যেতেই তার কপাল থেকে সিঁদুর মুছে দেওয়া হল, শরীর থেকে স্বর্ণালঙ্কার খুলে ফেলা হল, রঙিন কাপড় সরিয়ে সাদা কাপড় ধরিয়ে দেওয়া হল, এগুলোই প্রতীক, তার এখন লক্ষ্মী চলে গেছেন। কিন্তু সে যদি পরে ঠিক ঠিক তপস্যা করতে শুরু করে দেয় তখন তার মধ্যে অন্য ধরণের একটা শ্রী আসে। দেশ বা সমাজের বা কোন সংগঠনের প্রধানের যদি মৃত্যু হয়ে যায় বা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে তখন সেই জায়গাতে একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। দেশের বড় কোন নেতা মারা গেলে তিন দিন বা এক সপ্তাহের জাতীয় শোক পালন করা হয়, জাতীয় শোক মানে পতাকা অর্ধনমিত থাকবে, আমোদ-আহ্লাদ সব বন্ধ। গ্রামেও বড় কেউ মারা গেলে সারা গ্রামেই একটা শোকের ছায়া নেমে আসে। একমাত্র সন্ন্যাসীরাই কোন সন্ন্যাসী মারা গেলে আনন্দ করেন। বেলুড় মঠে কোন সন্ন্যাসীর দেহ চলে গেলেও বেলুড় মঠের দৈনন্দীন রুটিনের একচুলও হেরফের হয় না, সেই ঠিক সময়ে খাওয়ার ঘন্টা পড়বে, আরতি হবে, শাস্ত্র পাঠ হবে সব কিছুই প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী চলতে থাকবে, বাইরের কেউ টেরও পান না যে সন্ন্যাসীদের একজন কেউ মারা গেছেন। তবে সঙ্ঘাধ্যক্ষরা দেহ রাখলে একটু শোকের ভাব টের পাওয়া যায়। কারণ ভক্তরা তো সন্ন্যাসীদের জীবনধারা বুঝতে পারে না আর সঙ্ঘাধ্যাক্ষদের অনেক শিষ্য শিষ্যারা থাকেন, তাদের মধ্যে সন্ন্যাসীও আছেন, তাদের চোখে একটু জল বেরিয়ে আসে। কিন্তু অন্যান্য সময় সন্ন্যাসীদের কোন ভাই দেহ রাখলে গল্প করতে করতেই দাহ করে এসে আবার রোজকার কাজকর্ম, সাধন-ভজনে ডুবে যান, শোকের কোন চিহ্নই থাকে না। সাধুরাই এই জিনিস পারেন, অন্যরা পারবে না। অন্য জায়গায় মৃত্যুর জনিত শোকের চিহ্ন এসে যায়। এটাই এখানে বলছেন ভ্রষ্টলক্ষ্মী।

জনপদশূন্য, রাস্তাঘাট সব ফাঁকা, এটাই শোকের চিহ্ন। এবার ভরত রাজশ্রীহীন রাজভবনে প্রবেশ করেছেন। ভরতকে আসতে দেখে কৈকেয়ী তাড়াতাড়ি এসে সন্তানকে আলিঙ্গন করছে, খুব আনন্দ করছে। কৈকেয়ী

ভরতকে নিজের পিতৃকুলের সবার কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমার বাবা, মা, ভাইরা সব কুশলে আছেন তো? ভরত এসব কথার কোন উত্তর না দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করছেন আমার পিতা কোথায়? তোমাকে একাকিনী এখানে কেন দেখছি? তোমাকে ছাড়া বাবাকে আমি কখন নির্জনে দেখিনি, কিন্তু আজ তাঁকে তোমার সাথে দেখছি না কেন? তিনি কোথায় আমাকে বল। কৈকেয়ী তখন ভরতকে বলছেন, তোমার পিতার ওটাই হয়েছে –

যা গতির্ধর্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাম্।
তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল।২/৭/৬৫

যাঁরা ধর্মশীল, যাঁরা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সম্পন্ন করেছেন তাঁদের জন্য যে গতি নির্দিষ্ট করা আছে, তোমার পিতা সেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত করেছেন। বলতে চাইছেন তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন। রাজা দশরাথ একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, অশ্বমেধাদির মত উচ্চ যজ্ঞ করেছেন তাই তিনি স্বর্গে গেছেন। সেইজন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। শোনা মাত্র ভরত শোকবিহ্বল হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন আর বলতে লাগলেন, বাবা আমাদের ফেলে এভাবে চলে গেলেন, তিনি তো রাজা রামের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে গেলেন না। এর মধ্যে আরও কিছু কথাবার্তা হওয়ার পর কৈকেয়ী বলছেন, তুমি চিন্তা কর না তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। ভরত আবার জানতে চাইলেন, দেহত্যাগের সময় কি বলে গেছেন? কৈকেয়ী তখন বলছেন –

হা রাম রাম সীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ।
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিব্যং যযৌ।২/৭/৬৯

প্রাণ যাওয়ার সময় তোমার পিতা শুধু বিলাপের সুরে বলে যাচ্ছিলেন হে রাম, হে সীতা, হে লক্ষ্মণ। এই কথা শুনে ভরত চমকে উঠেছেন। সেকি! পিতার দেহত্যাগের সময় রাম, সীতা বা লক্ষ্মণ কেউ তাঁর কাছে ছিলেন না? ওনারা তাহলে কোথায় গেছেন? তখন কৈকেয়ী সংক্ষেপে বলছেন, তোমার জন্য রাজ্য নেওয়া হয়েছে আর রামকে বনবাসে পাঠানো হয়েছে, পতিব্রতা সীতা রামের অনুগমন করেছেন আর লক্ষ্মণও ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ রামের অনুগমন করেছ। কৈকেয়ীর মুখে এই কথা শোনা মাত্র শোকাকুল হয়ে বজ্রাহত বনস্পতির মত মাটিতে ভরত উল্টে পড়ল। কৈকেয়ী ভরতকে এই রকম শোকাকুল দেখে বলছে, সেকি! তুমি এত শোক করছ কেন, তুমি এখন বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েছ, তোমাকে রাজা করার জন্য সব পরিষ্কার করা হল আর তুমি মিছিমিছি শোক করছ কেন? আর –

রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ।২/৭/৭৮

তুমি এত বড় সাম্রাজ্য পেয়েছ, এই সাম্রাজ্যকে তোমাকে এখন সামলাতে হবে, এখন দুঃখ করার সময় কোথায়! এখন তো আনন্দের সময়, এটা দুঃখ করার সময় নয়। তখন ভরত মাতা কৈকেয়ীর দিকে এমন ভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন যেন কৈকেয়ীকে দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবেন। ভরত তখন বলছেন –

অসম্ভাষ্যাসি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনী।
পাপে ত্বদ্গর্ভজাত্যেহং পাপবানস্মি সাম্প্রতম্।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহম্।২/৭/৮০
খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্ব যামি যমক্ষয়ম্।
ভর্তৃঘাতিনি দুষ্টে ত্বং কুম্ভীপাকং গমিষ্যাসি।২/৭/৮১

অসম্ভাষ্যাসি, তুমি কথা বলার যোগ্য মহিলা নও, তোমার সাথে কথা বলাও পাপ। *পাপে মে ঘোরে*, তুমি হলে অত্যন্ত পাপাচারিণি আর *ত্বং ভর্তৃঘাতিনী*, তুমি নিজের স্বামীকে হত্যা করেছ। হে পাপীয়সি! তোমার গর্ভ থেকে যে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি সেইজন্য আমিও পাপিষ্ঠ। আমার এই পাপের একটাই প্রায়শ্চিত্ত, হয় আমাকে অগ্নিতে প্রবেশ করে যেতে হবে না হলে বিষ ভক্ষণ করে আমাকে মরে যেতে হবে, কিংবা খড়্গপ্রহারে আত্মহত্যা করে যমালয়ে যেতে হবে। স্বর্গেলোকেও নয় এই প্রায়শ্চিত্ত করে ভরতকে যমলোকেই যেতে হবে। ঠাকুর বলছেন, অপঘাতে মৃত্যু হলে প্রেতনী হয়। ভরতকে এখন আত্মহত্যা করতে হবে কিনা, তাই বলছেন আমি তো স্বর্গেলোকে যাব না, যমলোকেই আমাকে যেতে হবে, কী আর করা যাবে তাই যাব। তোমার মত পাপীয়সি নারীর গর্ভ থেকে আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে বলে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই। শুধু তাই না, তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি রে

পতিঘাতিনি! রে দুষ্টে! তুমিও কুম্ভীপাক নরকে গমন করবে। নরকের এই সব ধারণা পুরাণে খুব জোরালো ভাবে এসে গিয়েছিল, পুরাণের আগে নরকের কোন ধারণা ছিল না।

যে মা সন্তানের জন্য এত কিছু করল, সেই মাকেই কি এই ধরণের ভাষা প্রয়োগ করে সন্তানের ভর্ৎসনা করা উচিৎ কাজ হয়েছে? এই প্রশ্নের যে উত্তরই দেওয়া হোক না কেন কোন উত্তরই সঠিক হবে না, এই জিনিসগুলো খুব জটিল। রামায়ণকে যদি আমরা সাহিত্য রূপে নিই, তাহলে বলতে হয় সাহিত্য সব সময় দু রকমের হয়, একটাকে বলে child literature আরেকটাকে বলে matured literature, শিশু সাহিত্য আর বয়স্কদের সাহিত্য। শিশু সাহিত্যে সাদা সাদাই হয় কালো কালোই হয়। বয়স্ক সাহিত্যে সাদা কালো বলে কিছু থাকে না, সবটাই মিলেমিশে থাকে। সাদার মধ্যে কালোকেও পাওয়া যায় আবার কালোর মধ্যে সাদাকেও পাওয়া যায়। ভরতের মধ্যে যে সবটাই সাদা হবে, তিনি অবতারের অংশ বলে তার মধ্যে কালো কিছু থাকবে না, এই জিনিস বয়স্ক সাহিত্যে চলবে না। চরিত্রকে যখন দাঁড় করানো হয় তখন পুরোটাই সাদা বা পুরোটাই কালো matured literatureএ চলে না। Matured literatureএ একটার মধ্যে সব রকম মিলে মিশে চলতে থাকে। কৈকেয়ীর ক্ষেত্রে কৈকেয়ী যেমন একদিকে সন্তানের জন্য করেছে, ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে সন্তান তাকে আবার সংশোধন করছে, মিলে মিশে চলছে। ভরতের ভালোবাসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বেশি নাকি কৈকেয়ীর প্রতি বেশি ছিল, আমরা তার বিচার করতে যাচ্ছি না। তবে ভরতকে যখন আদর্শ ভ্রাতা বলা হয় এটাই তার একটা প্রধান কারণ রূপে নেওয়া হয়। শ্রীরামচন্দ্রকে ভরত এমনই ভালোবাসে যে সে তার মাকেও তাচ্ছিল্য করছে। আরেকটু গভীরে গেলে দেখা যাবে কৈকেয়ী যা কিছু করেছে সেগুলো কখনই স্বধর্ম প্রেরিত ছিল না, সবটাই লোভ প্রেরিত ছিল, আমি রানী হব, আমি রাজমাতা হব, আমার পদমর্যাদা হবে ইত্যাদি। এখানে স্বধর্মের কোন ব্যাপার ছিল না। লোভ মানেই goal setting, সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভরত দুদিক থেকে মার খাচ্ছে। একদিকে তার মা ঘৃণ্য কাজ করল আর তার ফলটাও তাকেই নিতে হচ্ছে। ভরত যদি রাজা হত তাকে সারা জীবন অনেক রকম কথা শুনতে হত। সবাই বলত পাপের ফল ভরত ভোগ করল, ভরতও নিশ্চয়ই এর মধ্যে জড়িত ছিল, ইত্যাদি। এই ছবিটাই সবার মধ্যে থেকে যাবে যে, কৈকেয়ী যদি বিষবৃক্ষ হয় ভরত সেই বৃক্ষের ফল। যার জন্য ভরতের নিজের অস্তিত্বেই প্রশ্ন চিহ্ন পড়ত। এইসব কারণে ভরতের প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। তোমার জন্য আমারও অধোগতি হয়ে গেল। এই সব কারণে মায়ের প্রতি ভরতের এই প্রতিক্রিয়াকে প্রশ্ন করা যায় না, সত্যিই তো কৈকেয়ীর এই কাজের জন্য ভরতের সব কিছুই নষ্ট হয়ে গেল। যে ভরত দাদা শ্রীরামচন্দ্রকে এতো ভালোবাসত সে চোখের আড়ালে চলে গেল, বাবাকে এত ভালোবাসত সেও মারা গেল। কিন্তু সব থেকে মারাত্মক হল, আগামী চৌদ্দ বছর ভরতের যে জীবনধারা হবে তাতে সে যদি রাজাও হয় তখন সবাই বলবে মাকে দিয়ে ষড়যন্ত্র করিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে যাচ্ছে। প্রজারা ভরতকে মানতে চাইত না, শুধু মানতে চাওয়াই নয় এটা কত বড় একটা পাপকর্ম হয়ে যাচ্ছে। কৈকেয়ী নিজে যা ডোবার ডুবেছে সাথে ভরতকেও ডুবিয়ে দিয়েছে। সেইজন্য ভরতের এই প্রতিক্রিয়াকে ভুল বলার আগে ভরতের এই দিক গুলিকে একটু বিচার করা উচিৎ।

এরপর ভরত কৌশল্যার কাছে গেছেন। ভরতকে দেখে কৌশল্যা কাঁদতে শুরু করেছেন। কৌশল্য ভরতকে বলছেন, দেখ তুমি যাতে সাম্রাজ্য পাও তাই আমার ছেলে বনবাসে চলে গেল। আর দেখ আমার রাম হল সাক্ষাৎ পরাৎপর পরমাত্মা, তিনি আমার গর্ভে এসেছেন কিন্তু তাতেও দুঃখ আমাকে পরিত্যাগ করছে না, *বিধির্বলীয়ানিতি*, বিধাতাই সব থেকে বলবান। বিধাতা শব্দ এসেছে বিধি থেকে, বিধি মানে ভাগ্য, আমার ভাগ্যে যা আছে এটাকে কেউ আটকাতে পারবে না। এটাই কৌশল্যা বলছেন স্বয়ং ভগবান আমার গর্ভে এসেছেন তাতেও আমার ভাগ্যে দুঃখ জিনিসটা থেকে গেছে। দেবকীরও গর্ভে ভগবান এলেন, চতুর্ভুজ দর্শন হল তাও তাঁর কারাগারত্ব ঘুচলা না।

ভরত কৌশল্যাকে বলছেন, মা! আপনি আমার কথা শুনুন, শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাপারে কৈকেয়ী যা করেছে তার বিন্দুবিসর্গ যদি আমার জ্ঞাতসারে হয়ে থাকে বা এই ব্যাপারে আমি যদি ঘুণাক্ষরেও জড়িত থাকি তাহলে আমার যেন শত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় আর গুরুপত্নী অরুন্ধতী ও গুরু বশিষ্ঠদেবকে খড়্গ দ্বারা আঘাত করলে যে পাপ লাগবে আমার যেন সেই পাপ লাগে। এইসব কথা বলতে বলতে ভরত বলছে, মা আপনি বিশ্বাস করুন আমি এসব কিছুই জানতাম না, আমার উপর আপনি রাগ করবেন না। কৌশল্যা ভরতকে তখন আদর করে জড়িয়ে ধরে বলছেন, পুত্র! আমি সব জানি, তুমি আর শোক করো না। এদিকে ভরতের মাতুলালয় থেকে ফিরে আসার খবর পেয়ে বশিষ্ঠ এসে দেখছেন ভরত ক্রন্দন করছেন। বশিষ্ঠ তখন ভরতকে কিছু কথা বলছেন –

<u>শোকাহত ভরতকে বশিষ্টদেবের উপদেশ</u>

বৃদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ।
ভুক্ত্বা মর্ত্যসুখং সর্বমিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।২/৭/৯৩
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্লব্ধ্বা রামং সুতং হরিম্।
অন্তে জগাম ত্রিদিবং দেবেন্দ্রার্দ্ধাসনং প্রভুঃ।২/৭/৯৪

রাজা দশরথ অমোঘ বিক্রমী ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন, জগতের সুখ ভোগ করেছেন, অশ্বমেধ প্রভৃতি অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন আর সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীরামকে পুত্র রূপে লাভ করেছেন, এবার তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই রাজা দশরথ হলেন অশোচনীয়, তুমি তাঁর জন্য বৃথা শোক করছ। বৃদ্ধ শব্দ জ্ঞানীর অর্থেও হয়। সংস্কৃতে পরাক্রমের সাথে প্রায়শই সত্য শব্দটা লাগানো হয়, শুধু পরাক্রম ব্যবহার করা হয় না। এরও অনেক তাৎপর্য আছে। এর তাৎপর্য হল, পরাক্রম যে কোন লোকই দেখাতে পারে। যারা আত্মঘাতী সন্ত্রাসী তারাও পরাক্রম দেখাতে পারে, যারা লুটপাট করে তারাও পরাক্রম দেখাতে পারে, এরা সত্যপরাক্রম নয়। যিনি সত্যপরাক্রম ধর্মের বাইরে তিনি কখনই যাবেন না। অনেক সময় দেখা যায় যাঁরা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত বা সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের শৌর্য, তেজ এগুলো যেন কমে যায়, লড়াই করার ক্ষমতাটা দমে যায়। সেইজন্য সত্যপরাক্রম শব্দটা এনাদের খুব প্রিয় শব্দ ছিল। কোন রাজাকে যদি সম্মান করতে হয় তখন বলবেন তিনি সত্যপরাক্রমী। তার মানে তিনি সত্যে অবস্থিত, ধর্মে অবস্থিত কিন্তু পরাক্রমী। এই দুটো শব্দে কোথাও যেন একটা অমিল হয়ে যায়, সত্যে বা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত আর পরাক্রমী এই দুটো একসাথে সাধারণত দেখা যায় না। যাঁরাই সত্য বা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের পরাক্রমের অভাব হয়ে যায়। আর যারা পরাক্রমী হয়ে যায় দেখা যায় তারা সত্যে আর ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। দশরথ ছিলেন সত্যপরাক্রমী।

আর *ভুক্ত্বা মর্ত্যসুখং সর্বমিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ*, এই জগতে অর্থ আর কাম তিনি প্রচুর ভোগ করেছেন। অর্থ আর কাম, এই দুটোই জগতে ভোগ করার মত। তৃতীয় হল ধর্ম, ধর্মেও রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিভাবে ছিলেন? বশিষ্ঠদেব বলছেন, *বিপুলদক্ষিণৈঃ*, যখন যজ্ঞাদি করতেন তখন তিনি প্রচুর দক্ষিণা দিতেন। দক্ষিণা যজ্ঞেরই একটি অঙ্গ। এখনও বাড়িতে পূজা, উৎসব হলে সব কিছুর সাথে পুরোহিতকে দক্ষিণা দেওয়া হয়। বলা হয় যে ঠিকমত দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দক্ষিণা ব্যাপারটা উদারতারই একটা চিহ্ন। যাঁরা সত্ত্বগুণী হন তাঁদের মধ্যেও উদারতা থাকে, এছাড়া আধ্যাত্মিকতা ভেতরে না এলে উদার ভাব আসবে না। উদার ভাব আর আধ্যাত্মিক ভাব এই দুটো কোথাও যেন জড়িয়ে থাকে। উল্টো দিকে সঙ্কীর্ণতা খুব সাধারণ মানসিকতার চিহ্ন। যে কোন ক্ষেত্রে, টাকা-পয়সার ব্যাপারেই হোক, চিন্ত-ভাবনার ক্ষেত্রেই হোক বা ধর্মের ব্যাপারেই হোক কেউ যদি সঙ্কীর্ণ হয় বুঝতে হবে তার মানসিকতায় কোন সমস্যা আছে। উদার ভাব ধর্মপ্রাণ মানুষের লক্ষণ। আধ্যাত্মিকতা ভেতরে জাগ্রত না হলে এই ভাব আসবে না। ধর্মান্ধতায় কোন ধর্মই হয় না, এই যে ধর্মান্ধতার জন্য চারিদিকে এত সাম্প্রদায়িকতা, কত মারামারি এগুলোই মানুষের সঙ্কীর্ণতার পরিচয়। যেখানেই সঙ্কীর্ণতা সেখানেই আধ্যাত্মিকতার অভাব আছে বুঝে নিতে হবে। আমি বড়, সব কিছু আমারই থাকবে, সবাই আমার সামনে ভিখারীর মত এসে দাঁড়াবে এই ভাবগুলোই সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয়। রাজা দশরথ একদিকে সত্যপরাক্রমী আবার অন্য দিকে *বিপুলদক্ষিণৈঃ*, প্রচুর দক্ষিণা দিতেন। আর তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেছেন, যার ফলস্বরূপ তিনি দেবলোকের অর্দ্ধাসন লাভ করেছেন, বলতে চাইছেন তিনি যেন ইন্দ্রের পাশে গিয়ে বসার যোগ্যতা পেয়েছেন। এটা একটা সম্মানসূচক কথা, সত্যিকারের বসবে কিনা জানা নেই।

সেইজন্য দশরথ কোন কারণেই শোক করার যোগ্য নন। গীতাতেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতে ভগবান বলছেন, ভীষ্ম, দ্রোণ এনারা শোক করার যোগ্য নন। এই জায়গাতে শোক ব্যাপারটা খুব তাৎপর্যতা পেয়ে যায়। গীতায় ভগবান বলছেন ভীষ্ম, দ্রোণ শোক করার যোগ্য নন আর বশিষ্ঠদেবও বলছেন রাজা দশরথ শোক করার যোগ্য নন। এই দুটো ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। শোক দুটো কারণে হয়, আমি তোমার অভাব বোধ করছি, এটা একটা শোকের কারণ হয়। আর একটা শোকের কারণ হল, তার জীবনে কিছুই হল না, ছোট শিশু বা অল্প বয়সে কেউ যদি মারা যায় সেটাও একটা শোকের কারণ হয়। সে একটা মানব শরীর পেয়েছিল কিন্তু জীবনকেই সে অনুভব করতে পারল না। এই দুটো শোকের কারণ হয়। সন্ন্যাসী মারা গেলে অন্য সন্ন্যাসীরা

নির্বিকার থাকেন। আর কোন সন্ন্যাসীর সাথে যদি অন্য কোন সন্ন্যাসীর বিশেষ সম্পর্ক থাকে সেখানে একজন মারা গেলে তাঁর হয়ত দু ফোঁটা জল বেরোবে, এর বেশি কিছু হবে না। এখানে বশিষ্ঠদেব বলছেন, দশরথ শোক করার যোগ্য নন, গীতায় অর্জুন বলছেন এদেরকে আমায় মারতে হবে কিন্তু এনারা আমার আপনজন, কি করে আমি বধ করব! তার মানে ধরে নিয়েছে এরা মরবে। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলছেন ভীষ্ম, দ্রোণ শোক করার যোগ্য নন। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে আদর্শ করে অর্জুনকে বলছেন, আত্মার জন্ম নেই মৃত্যুও নেই, তুমি এগিয়ে যাও। বশিষ্ঠদেব এখানে ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে বলছেন, ইনি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এখানেও ভোগ করেছেন পরে স্বর্গেও ভোগ করবেন, তাহলে তুমি কি নিয়ে শোক করছ! দুটোর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ আলাদা। গীতায় যেখানে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তুমি ভীষ্ম দ্রোণের ব্যাপারে কেন শোক করছ, সেখানে যুক্তিটা পুরো আলাদা। আমরা কথায় কথায় বলে দিই, তোমার চিন্তা কিসের! আত্মার সুখ নেই, দুঃখ নেই, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীটা ঠিক নয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলতে পারেন, আমি আপনি একে তাকে এভাবে বলতে পারি না। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী হল বশিষ্ঠদেব যেটা ভরতকে বলছেন। দশরথ একটা জীবন পেয়েছিলেন। সেই জীবনের পেছনে কামনা-বাসনা ছিল, কামনা-বাসনা না থাকলে জীবন হবেই না। অজ্ঞান আছে বলেই জীবন এসেছে, জ্ঞান থাকলে জীবন হবেই না। অজ্ঞানের ভোগ তো এই তিনটে, ধর্ম, অর্থ আর কাম। এই তিনটে রাজা দশরথ প্রাণভরে ভোগ করেছেন, ভোগ করে যে সুখ পাওয়া যায় সব রকম সুখই তিনি পেয়েছেন। আর অদৃশ্য সুখ হল স্বর্গের সুখ। স্বর্গের সুখ পাওয়ার জন্য বেদে যা যা করতে বলা হয় রাজা দশরথ সবই করেছেন, যজ্ঞ করেছেন, দক্ষিণা দিয়েছেন, অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করেছেন, তাতে তাঁর ইন্দ্রের সমকক্ষ হওয়ারই কথা। এরপর কি নিয়ে মানুষ শোক করবে! মৃত্যু তো অবধারিত, আজ নয়তো কাল সবারই মৃত্যু হবে, এখানে কারুরই কিছু করার নেই।

আরেকটা ব্যাপার মনে রাখার মত। অর্জুন বলছেন, এনারা আমার গুরুজন, তাঁদের পায়ে আমি পূজা করেছি তাঁদের প্রতি আমি বাণ চালাব কি করে। এখানে অর্জুনের শোক নিজের, ভরতের শোকও নিজের। কিন্তু দুটো শোকের সমাধান যে লোকটি চলে যাবে তাকে কেন্দ্র করেই করা হচ্ছে। আমাদের জীবনেও নিজের কেউ আপনজন মারা গেলে সব সময় এই দৃষ্টি নিয়েই দেখতে হবে। কেউ মারা গেলে পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রায়ই ইংরাজীতে লেখেন he lived a full life, একটা জীবনকে তিনি পূর্ণ ভাবে ভোগ করে গেছেন। পূর্ণ ভাবে জীবন ভোগ করা মানে, জীবনে যত রকমের সুখ হতে পারে সেই সুখকে তিনি ভোগ করেছেন। সুখ ভোগ করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, সেই অর্থও তার ছিল। আর থাকল লোকৈষণা, স্বর্গপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় যজ্ঞযাগ আর দক্ষিণা, এগুলোও তিনি প্রচুর করেছেন। সেইজন্য দশরথ শোক করার মত নন। বশিষ্ঠদেব তাই ভরতকে বলছেন, তুমি মিছি মিছি শোক করছ কেন, রাজা দশরথ তো শোক করার যোগ্য নন। নিজের লোক মারা গেলে সেটা তার ব্যক্তিগত ক্ষতি ঠিকই, ভীষ্ম, দ্রোণ মারা গেলে অর্জুনের নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে, এই ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করা কখনই যাবে না, আর এটাকে নিয়ে এনারা কখন উত্তরও দেন না। বৃদ্ধ পিতা মারা গেলে তার যে ক্ষতি হবে সেটাকে কখনই পূরণ করা যাবে না, আর এটাকে নিয়ে কখনই আলোচনা করা যাবে না। আলোচনা সব সময় হয় সামনের লোককে নিয়ে। আমাদের বালবুদ্ধি, বুদ্ধি আমাদের সীমিত, সীমিত বুদ্ধি দিয়ে আমরা যখন জগতকে দেখি, তখন আমাদের সিদ্ধান্তগুলোও ঠিক হয় না। যেমন, একটা স্কুলে পড়ছে, স্কুল থেকে পাশ করে এবার কলেজে যাবে, তার জন্য বাড়ির লোকের দুঃখ হওয়ার কিছু নেই, ভালোই তো হল। ঠিক তেমনি যাদের জীবনটা সার্থক জীবন, তাঁরা মারা গেলে কখনই শোক করতে নেই। কারণ আপনি শুধু নিজের টুকু নিয়েই ভাববেন, তার সামনের দিকটাকেও দেখতে হবে। সামনের দিকে দেখলে তখন দেখবেন ভালোই তো হল তিনি আরও এগিয়ে গেলেন। তাঁর সুখভোগ পুরো হয়েছে, কোথাও কোন ক্ষোভ থেকে যায়নি, আর পরে যেটা হবে সেটারও পুরো প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আমরা কেউই কিন্তু মৃত্যুর প্রস্তুতি নিই না। মৃত্যুর পরে যে ভালো কিছু হবে তার জন্য জপ-ধ্যান করা, তপস্যা করা, দান-দক্ষিণা দেওয়া আমরা করি না। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর হতাশা এসে পুরো আচ্ছন্ন করে ফেলছে, বুঝতে পারছে না কি করবে, কোন প্রস্তুতিই নেয় না। এখানে সেটাই বলছেন, দশরথের এই প্রস্তুতিটা নেওয়া আছে। তাই এতে শোক করার কি আছে! শুধু তোমার দিকটা দেখলেই তো হবে না, তাঁর দিকটাও তো দেখতে হবে। গীতাতে এটাকেই উচ্চ আদর্শের দিক থেকে দেখান হয়েছে। একজন ভাষ্যকার বলছেন, ভীষ্ম দ্রোণ এনারা ধর্মপ্রাণ লোক, পুরো জীবনটাই ধর্ম কেন্দ্রিক ছিল, সেইজন্য এনাদের মৃত্যুতে শোক করার কিছু নেই। যদি এনারা ধর্ম থেকে পতিত হয়ে যেতেন তখন শোক করার ছিল। যদি কখন কারুকে নিয়ে

শোক করতে হয় তখন কাকে নিয়ে শোক করা যেতে পারে? হিন্দু ধর্মের দিক থেকে দেখলে তাঁর জন্যই শোক করা উচিৎ যিনি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে গেছেন। মৃত্যুকে নিয়ে কখন শোক করার কথা নয়। দ্বিতীয় আরেকটি অবস্থায় শোক করা যেতে পারে, যদি দেখা যায় যে সে জীবনটাকে দেখতে পারল না, অল্প বয়সে মারা গেল। একটা জীবন পেয়েছিল, জীবনের কিছুই সে দেখল না, আবার কোথায় জন্ম নেবে, কবে নেবে কিছুই ঠিক নেই, তখন শোক করা চলে। এখানেও মানুষকে আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে, তুমি তোমার জন্য ভেবো না, তার জন্য ভাব। তার জন্য যদি ভাবতে যাও তাহলে শোক করার কিছু নেই। বশিষ্ঠদেব এটাই ভরতকে বলতে চাইছেন। গীতা আর রামায়ণে শোকের ব্যাপারটায় দুটো দৃষ্টিভঙ্গীকে নেওয়া হয়েছে। তার সাথে বলছেন –

তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনম্।
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জিতঃ।২/৭/৯৫
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরম্।
বিচার্য্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন।২/৭/৯৬

গীতাতে ঠিক এই ভাবটাই নিয়ে আসা হয়েছে। যিনি অশোচ্য, যাঁকে নিয়ে শোক করা চলে না, তাঁকে নিয়ে বৃথা কেন শোক করছ? এটাকে মেনে নেওয়া বা গ্রহণ করা খুব কঠিন। মৃত্যুশোক হলে এভাবে বিচার করতে হয়, তিনি কি শোক করার যোগ্য! আগেকার দিনে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে গেলে মেয়ের মা কান্নাকাটি করে বলত, আহা! আমার মেয়ে জীবনের কোন সখই পূরণ করতে পারল না, মেয়ে মাছ ছাড়া খেতে পারে না, সাজগোজ করতে ভালোবাসে, সবটাই চলে গেল। এখানে তাও শোক করা যায়, কিন্তু দশরথের মত লোক শোক করার যোগ্য নন। *মোক্ষভাজনম্*, রাজা দশরথ মুক্তি পাওয়ার যোগ্য। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই মোক্ষের ব্যাপারটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিচার করে দেখলে দশরথের জীবন কখনই মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণের দ্বারা প্রচণ্ড ভাবে প্রভাবতি হওয়ার জন্য অনেক জায়গায় এনারা অনেক কিছুকে মেলাতে পারেন না। বাল্মীকি রামায়ণে মোক্ষ শব্দটাই আনবে না, ওখানে ঠিক আগের জিনিসটাকেই বলবে যেটা আগের শ্লোকে বলা হয়েছে। অর্থ, কাম আর ধর্ম তিনি পূরণ করেছেন, এটাই জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত।

এরপরেই গীতার ভাব বলছেন। হে ভরত! রাজা দশরথের দুটো দিক, একটা তাঁর শরীর আরেকটা তাঁর আত্মা। তারপর আত্মার বৈশিষ্ট্য বলছেন, আত্মা নিত্য, অব্যয় যাঁর কোন ক্ষয় হয় না, আর আত্মা শুদ্ধ, আত্মার জন্মও নেই মৃত্যু নেই। এটাই বেদান্তের আত্মার ধারণা। আত্মার তুলনায় এই শরীর জড়, অপবিত্র এবং নশ্বর। তুমি এবার বিচার কর, তুমি কোনটাকে নিয়ে শোক করতে চাইছ, দশরথের শরীরকে নিয়ে শোক করতে চাইছ নাকি তাঁর আত্মাকে নিয়ে শোক করতে চাইছ। হিন্দু ধর্মের পরম্পরাতে এই ভাবটা ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে। যখনই আমরা কাউকে ভালোবাসছি, আমরা কাকে ভালোবাসছি? শরীরকে নাকি তার আত্মাকে? যখন শোক করছি তখন তার শরীরকে নিয়ে না আত্মাকে নিয়ে? বিচার করতে গেলে দেখছি শরীর অপবিত্র, জড়, নশ্বর আর অনিত্য। তাহলে মা যে সন্তানকে বুকে লাগিয়ে এত ভালোবাসে বা স্ত্রী স্বামীকে কত ভালোবাসছে, কোন মা বা স্ত্রীকে যদি বলা হয় তুমি যে সন্তানকে এত ভালোবাসছ তার শরীরকেই না তুমি ভালোবাসছ, তুমি বিচার করে দেখ এই শরীর অপবিত্র, অনিত্য। এভাবে বিচার করলে তো জগৎ থেকে ভালোবাসাটাই বিলীন হয়ে যাবে, ভালোবাসা বলে কিছুই থাকবে না। এমনকি সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ সেটাও চলে যাবে। সবাইকে যদি বেদান্তের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে তে সবাই একটা মেশিন হয়ে যাবে। আসলে তা কখনই হয় না। আমি অমুক ব্যক্তি, এই যে একক ভাব, আমি বলতে কি বোঝাচ্ছে এই ব্যাপারে আমার যে ধারণা আর অপরের প্রতি আমার যে ধারণা এই ধারণাটা ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে। আমি যদি নিজেকে জড় বলে জানি তাহলে অপরকেও আমি জড় বলেই জানব, জড় জড়কেই ভালোবাসতে জানে। ঠিক তেমনি চেতনার যত উন্মেষ হতে থাকবে, জড় বোধ থেকে চৈতন্যের দিকে যত এগোতে থাকবে ততই অপরের প্রতি অনুভূতি পাল্টাবে। সমস্যা হল যখন জড় রূপে দেখছি, তখন সে যেমন ভালোবাসা দেয় বেদনাও তেমন দেয়। ঐ ভালোবাসা ভোগ করতে চাই ইচ্ছে করলে আমি তা করতি পারি, আনন্দও আসবে, কিন্তু ঐ ভালোবাসা থেকেই যখন প্রচুর বেদনার জন্ম হবে তখন বেদনা থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হবে উচ্চ দর্শনকে নিয়ে আসা। যখনই কেউ কোন সমস্যার আবর্তে পড়ে যায় তখন দেখা যায় ওই আবর্ত থেকে বাঁচার কোন পথ থাকে না। বাঁচার তখন একটাই পথ থাকে, কোন উচ্চস্তর থেকে এসে ঐ সমস্যার সমাধান

করা। যেমন একটা কেল্লার মধ্যে শত্রুরা ঢুকে আছে ওদেরকে ধরা যাচ্ছে না। এখন কি পথ আছে? আকাশ থেকে ওদের উপর আক্রমণ করতে হবে, না হলে সুড়ঙ্গ তৈরী করে নীচ দিয়ে এসে ওদের বোমা মারতে হবে। জীবনে যদি কখন খুব বাজে ভাবে ফেঁসে যাই, ওখান থেকে বেরিয়ে আসার আর কোন পথ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তার সমাধান সব সময় উচ্চস্তর থেকে আনতে হয়। এখানে ভরত তার পিতাকে শরীর রূপেই দেখছে, সারা জীবন শরীর রূপেই দেখে এসেছে। এই যে দুঃখের আবর্তে ফেঁসে গেছে, ওখান থেকে ভরতের আর বেরিয়া আসার পথ নেই। সেইজন্য ভরতকে একটা উচ্চ দর্শন দিয়ে সেখান থেকে বার করে নিয়ে আসতে হবে। বশিষ্ঠ তাই করছেন, তিনি এক উচ্চ দর্শন নিয়ে আসছেন। এখানে তুমি আত্মার যে ঠিক ঠিক ভাব ঐ ভাবের দৃষ্টিতে সব কিছু দেখ তাহলে তোমার আর শোক হবে না। দেহাত্মাও আত্মা আর শুদ্ধ আত্মাও আত্মা। সারাটা জীবন তো তুমি বাবাকে দেহাত্মা রূপে দেখলে এবার একটু আত্মা রূপে দেখ। যে কোন সমস্যার সমাধান সব সময় উচ্চস্তর থেকে আনতে হয়। ক্লাশ ফাইভে যে জিনিসটা আগে ক্লাশ ফাইভে বুঝতে পারছিল না, ক্লাশ সেভেনে এসে নিজে থেকেই ওই জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। একটু উপরে উঠে গেলে নিজে থেকেই সমস্যা গুলো পরিষ্কার হয়ে যায়। এটা বাস্তব যে ঘোর বেদান্তীদের মধ্যে ভালোবাসা বলে কিছু থাকে না। ঠাকুর তাই বলছেন মা আমাকে শুষ্ক জ্ঞানী করিস না। বেদান্তীরা এমনিতে শুষ্ক জ্ঞানী হন না, কিন্তু বিচার করতে করতে শুষ্ক জ্ঞানী হয়ে যান। ভালোবাসা থাকুক আর নাই থাকুক বেদান্তীরা কখনই কোন কিছুকে জড় রূপে দেখবেন না। যাঁকে স্নেহ করছেন তাঁকে আত্মা রূপেই স্নেহ করেন। সেইজন্য বেদান্তীরা কারুকে দ্বেষ করেন না। এই কারণেই বেদান্তীদের সমদৃষ্টি বলা হয়। আবার বলছেন, যদি এভাবে বিচার করা হয় –

পিতা বা তনয়ো বাপি যদি মৃত্যুবশং গতঃ।
মূঢ়াস্তমনুশোচন্তি স্বাত্মতাড়নপূর্বকম্।২/৭/৯৭

বশিষ্ঠদেব বলছেন যারা মূঢ়, বাবা-মা বা সন্তান মারা গেলে তারা বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে থাকে। কিন্তু জ্ঞানীরা এভাবে কাঁদবেন না। তাহলে মৃত্যু জিনিসটা কাদের উপর প্রতিক্রিয়া তৈরী করে? যারা অতি সাধারণ মানুষ, যারা মূঢ়। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী, একটু কষ্ট পান, এরপর আমি কার সাথে আর কথা বলব, কিন্তু ঐটুকুই, এর বেশি আর নয়। ঠাকুর যেমন কেশব সেনের নাম করে বলছেন, মা! ওর যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে কলকাতায় গেলে কার সাথে কথা বলব? এই জিনিস সবারই হয়, কিন্তু তার বেশি না। কিন্তু মূঢ় যারা তারা দেহবুদ্ধিতে এমন জড়িয়ে থাকে যে বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে থাকে। বলছেন –

নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা।
ভবেদ্বৈরাগ্যহেতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ।২/৭/৯৮

এই দুটি শ্লোক জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর তফাৎ করে দিচ্ছে। আগের শ্লোকে বললেন, প্রিয়জনের বিয়োগে অজ্ঞানীরা কেঁদে কুঁকিয়ে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে শোককে মিটিয়ে দেয়। এই শ্লোকে জ্ঞানীদের কথা বলছেন। *নিঃসারে খলু সংসারে*, এই সংসারটা অসার, *বিয়োগ জ্ঞানিনাং যদা*, এই অসার সংসারে জ্ঞানীরা যখন বিয়োগের মুখোমুখী হন, *ভবেদ্বৈরাগ্যহেতুঃ*, তখন সংসার থেকে তাঁদের বৈরাগ্য হয়ে যায়। আর তার জন্য জ্ঞানীদের জীবনে *শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ*, শান্তি আর সুখের বিস্তার হয়। তার মানে, প্রিয়জনের বিয়োগে জ্ঞানীরও দুঃখ হয়, কিন্তু খুবই সামান্য। কিন্তু এই বিয়োগই তাঁর বৈরাগ্যের কারণ হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, একদিকে সন্তান মারা যাচ্ছে আরেক দিকে বছরের পর বছর সন্তান হয়ে যাচ্ছে। মেয়ের বিয়েতে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল তারপরেও আবার সন্তান হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলে বলে অদৃষ্টে ছিল। অজ্ঞানীদের কিছু চলে গেলে তারা আরও বেশি করে ঐ জিনিসকে বেশি করে পাওয়ার জন্যে তেড়েফুড়ে লেগে পড়ে। স্ত্রী মারা গেলে আবার উঠে পড়ে লেগে যাবে আবার কি করে আরেকটা স্ত্রী নিয়ে আসা যায়, ক্ষমতা থাকলে হয়ত তিনটে স্ত্রী নিয়েই চলে আসবে। জ্ঞানীরা বলেন, অনেক হয়েছে, আর ঐদিকে না। আশ্রমের এক স্কুলে একজন সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। তিনি খুব গুণী আর একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ ছিলেন। দেখেশুনে একটা ভালো জায়গায় তাঁর বিবাহ দেওয়া হল। তার স্ত্রীর মাথা খারাপ ছিল কিনা জানা নেই, কিন্তু স্বামীকে সে কাছেই আসতে দিত না। কাছে গেলেই লাথি মারত আর খুব গালাগাল দিত, তোর এই দুঃসাহস! আমার কাছে আসতে চাইছিস! কোন দিন সে পণ্ডিতকে কাছেই আসতে দিল না। পরে তিনি আশ্রমের সন্ন্যাসীদের বলতেন, মহারাজ! বিয়ে করেছি ঠিকই কিন্তু ঠাকুর ঐ ভোগ থেকে আমাকে

বার করে দিলেন। অজ্ঞানীর ক্ষেত্রে যদি এই একই জিনিস হত তখন সে কি করত? স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করে নিত। কিন্তু জ্ঞানী পুরুষ বলছেন – যাঃ! ঝামেলা চুকে গেল।

দিল্লীতে এক বড় মহিলা জার্নালিস্টের সাথে এক সন্ন্যাসীর পরিচয় হয়েছিল। মহিলা নিজেও ঠাকুরের ভক্ত। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বিয়ে হয়েছে? হ্যাঁ মহারাজ। সন্তান হয়েছে? প্রশ্ন করতেই মহিলা খুব আনন্দে দু হাত তুলে বলছেন, মহারাজ! ঠাকুর আমাদের ঐ থেকে রক্ষা করেছেন, আমরাও ওতে নেই। অন্য এক সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের বোন, বিদেশে থাকেন, উচ্চ শিক্ষিতা, ভালো চাকরি করেন। তাঁকে কোন এক সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করছেন, আপনার কটি সন্তান? মহিলা বলছেন, কোন প্রশ্নই নেই, এই যা ঝামেলা এটাই অনেক, এরপর আর নয়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এক সঙ্গে বলছেন, আর এই ঝামেলার মধ্যে আমরা নেই। আমরা অনেক সময় ভাবি, সন্তান না থাকলে বৃদ্ধ বয়সে কে দেখবে। যাদের আছে তারাও তো দেখে না। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর এই যে দু রকম মনোভাব এই নিয়ে একজন সন্ন্যাসী খুব সুন্দর বলতেন, খাবার সময় যদি এমন কোন কিছু পেটে চলে যায় যেটা আমাদের শরীর হজম করতে পারবে না তখন সঙ্গে সঙ্গে হয় বমি হয়ে নয়তো পেটের কোন গণ্ডগোল হয়ে ওটাকে বার করে দেবে। একটা জিনিসকে যখন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল তার মানে আপনার কাছে ঐ জিনিসটার মৃত্যু হয়ে গেল। স্ত্রীর মৃত্যু হয়ে গেল, কিংবা সন্তানের মৃত্যু হয়ে গেল তখন ওটার খেসারত দেওয়ার জন্য আপনি আরেকটা নতুন ব্যবস্থা নেবেন, এটাই অজ্ঞানীর মনোভাব। জ্ঞানী বলবেন, বাবাঃ সংসার দেখা হয়ে গেল, আর না। এটাই জ্ঞানীর বৈরাগ্যের কারণ হয়ে যায়। বৈরাগ্য নিয়ে কি হবে? শান্তি আর সুখের বিস্তার হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান বলছেন *অশান্তস্য কুতঃ সুখম্*, তার মানে যার মন শান্ত তারই সুখ। সুখ কে পায়? যে শান্ত। শান্তি কার হয়? যে বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুযোগ সবারই কাছে আছে, যে জ্ঞানী সেও সুযোগ পায় আর যে অজ্ঞানী সেও সুযোগ পায়। কিসের সুযোগ? বৈরাগ্যের সুযোগ। যখন বৈরাগ্যের সুযোগ আসে অজ্ঞানী তখন আরও পাঁচটা জিনিসকে আঁকড়ে ধরে নেয়। আর জ্ঞানী বলে, বাঁচা গেল। সেখান থেকে তার শান্তি আর সুখের বিস্তার হয়ে যায়।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে বোঝাচ্ছেন, দেখ ভরত! তুমি যদি জ্ঞানী হয়ে থাক তাহলে বুঝে নাও এটাই কিন্তু বৈরাগ্যের কারণ হয়ে যেতে পারে, সেইজন্য তুমি দুঃখ করতে যেও না। এগুলো আমাদের খুব ভালো করে চিন্তা করা উচিৎ, চিরদিনের মত বিচ্ছেদ হওয়াটাই জীবনের ধর্ম, ও হবেই। অনবরত এই বিচ্ছেদ হয়ে চলেছে। আমরা যখন হাতে একটা কাজ নিয়ে থাকি তখন আগের কাজটা ছেড়ে দেওয়া হয়। একবার জিজ্ঞেস করল, তোর মা কি করছে দেখতো। ছেলে এসে বলল, মা কাপড় কাচছে। আরেকটু পরে আবার বলল, এবার দেখতো কি করছে? মা এখন রান্না করছে। তার মানে মা কাপড় কাচাটা ছেড়ে দিয়েছে। কাপড় কাচা ছেড়ে দিয়েছে বলেই আরেকটা কাজে হাত দিতে পারল। ত্যাগ বৈরাগ্য ছাড়া জীবন চলে না। পাহাড়ে আমরা যখন উঁচুতে উঠতে থাকি তখন পেছনে নীচের দিকটা ছাড়তেই হয়। ওই নিয়ে আপনি কতটা কান্নাকাটি করছেন, ওটা দিয়ে বোঝা যাবে আপনি কত জ্ঞানী বা অজ্ঞানী। দুঃখ হবে, কিন্তু দেখতে হবে ঐ দুঃখটা বৈরাগ্যে পরিণত হচ্ছে কিনা। আর দেখতে হবে ঐ বৈরাগ্য থেকে পরে আপনার শান্তি আর সুখ হয় কিনা। তাই বলছেন *নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা*। গীতায় ভগবান বলছেন *অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*। সংসার অনিত্য, অ-সুখ, এই মর্ত্যলোক অনিত্য, সুখহীন, এটা যখন বুঝে যায় তখন মানুষ কি করে? বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বলে আমি এবার ভগবানের দিকেই যাব, আমার আর কিছু লাগবে না। তখনই সে শান্তি পায়, সুখ পায়। আর বলছেন –

জন্মবান্ যদি লোকেঽস্মিন্ তর্হি তং মৃত্যুরন্বগাৎ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা।২/৭/৯৯
স্বকর্মবশতঃ সর্বজন্তুনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
বিজানন্নপ্যবিদ্বান্ যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্।২/৭/১০০

যে জন্ম নিয়েছে তাকে মরতে হবে, সেইজন্য এই মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। এই জগতে সব কিছুই কর্মবন্ধনে পড়ে আছে, কর্মানুসারেই তার জন্ম, কর্মের জন্যই তার মৃত্যু আর এগুলোকে জানার পরেও সাধারণ মানুষ, যারা অজ্ঞ সবাই প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধবদের মৃত্যুতে কিভাবে শোক করতে থাকে! একজন যখন জন্ম নিল তার কর্মই তাকে জন্ম দিল। বাবা-মা মনে করছে আমরা তাকে জন্ম দিয়েছি। সেই বাচ্চা নিজের কর্মে মারা গেল, বাবা-মা তখন শোক করতে থাকে। একটা জিনিস ঘটছে নিজের মত, তার অঘটন ঘটছে নিজের মত অথচ

তার জন্য শোক করছে অন্য আরেকজন। গাছ নিজের মত বড় হচ্ছে, গাছ নিজের মত ফল দেয়, গাছ নিজের মত মরে যায়, মাঝখান থেকে আমি আপনি শোক করছি। এগুলো ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন লঙ্কায় রাবণ মলো বেহুলা কেঁদে আকুল হল। এই না হলে আবার জীবন চলবে না, জীবন চালাবার জন্য এই মায়াকেই দরকার। তারপরে বলছেন –

ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যান্তি সাগরাঃ সর্বে কৈবাশা ক্ষণজীবিতে।২/৭/১০১

কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে গেছে, কত সৃষ্টি বিলীন হয়ে গেছে, কত সমুদ্র শুকিয়ে গেছে আবার কত সমুদ্র শুকিয়ে যাবে, সেখানে এই একটা জীবনের কী মূল্য! আমরা এর সব কিছু জানি, কিন্তু যতই চিন্তন করি, যতই ভাবি না কেন ঘুরেফিরে সেই নিজের এই ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকি। ঠাকুর বলছেন, টিয়া পাখি মুখে যতই রাম নাম করুক বেড়ালে ধরলে ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। তবে শুনতে শুনতে ভেতরে একটা সংস্কার তৈরী হয়। আগে যেখানে একশটা ক্ষেত্রে একশবার পতন হয়ে যেত পরে দেখা যাবে কোন একটা জায়গায় গিয়ে সাফল্য পেয়ে গেল। নিরানব্বুই বার পতনের পর ঐ একটা সাফল্য আসা মানে বিরাট কিছু হয়ে গেল। ধীরে ধীরে একদিন দেখবে একশটার মধ্যে নিরানব্বুইটাতে সাফল্য এসে গেছে।

চলপত্রান্তলগ্নাম্বু-বিন্দুবৎ ক্ষণভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব।২/৭/১০২

বটবৃক্ষের উপর সারা রাত হিম পড়েছে, সেই হিমকণা বটবৃক্ষের পাতার সরু ডগায় এসে জলবিন্দু হয়ে জমেছে, সেই পাতা আবার বাতাসে নড়ছে, এই জলবিন্দু কতক্ষণ স্থায়ী থাকবে, যে কোন মুহুর্তে ঝরে পড়বে, আমাদের জীবনের আয়ু হল ওই ক্ষণস্থায়ী জলবিন্দুর মত। আয়ু কখন চলে যাবে টেরই পাওয়া যাবে না, আর সেই আয়ুর উপর তুমি ভরসা করছ!

পরের কয়েকটি শ্লোকে গীতা বা বেদান্তের খুব নামকরা কথাগুলিই বলছেন। শরীরের উপমা দিয়ে আত্মার বর্ণনা করছেন, শরীর যেমন পুরনো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে নেয় ঠিক তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীরকে ত্যাগ করে আরেকটা শরীর ধারণ করে। আর বলছেন, আত্মা সব কিছু থেকে নির্বিকার, তাই তোমার এই শোকের কোন অর্থ হয় না। আমি আমার সামনের লোককে কিভাবে দেখতে চাইছি, শরীর রূপে দেখতে চাইছি, নাকি আত্মা রূপে দেখতে চাইছি? দেহ রূপে যদি ভাবি এই এই তার দোষ, আত্মা রূপে যদি দেখি তাহলে এই এই সুবিধা। তাহলে কোনটা নেওয়া উচিৎ? তার আগে এই জিনিসটা আমাদের জেনে নিতে হবে যে, যেখানেই সুখ সেখানেই দুঃখ, যেখানেই দুঃখ সেখানেই সুখ। ঘরবাড়ি ছেড়ে যে সদ্য সন্ন্যাসী হতে এসেছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কিসের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়েছ? সে হয়ত বলল সুখপ্রাপ্তির জন্য। বেদান্ত যে বলছে যেখানেই সুখ সেখানেই দুঃখ, সাধু হয়ে তুমি যদি বিরাট সুখ পাও তাহলে বিরাট দুঃখও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথম প্রথম বেদান্তের এসব কথা শুনলে এর যুক্তিকে খুব উদ্ভট লাগে, যেখানেই সুখ সেখানে দুঃখ কি করে হবে! দুটো তো বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে বেদান্তের কথা ধারণা হয় না। সংসার মানেই তাই, যতটা সুখ ততটা দুঃখ। হয়ত দুঃখ নাও পেতে পারে, কিন্তু সম্ভবনা সব সময় থাকবে। যখন আত্মভাবে মানুষ চলে যায় তখন তার আর দুঃখ থাকবে না, কিন্তু সুখও থাকবে না। এবার আপনি ঠিক করুন আপনি কোনটা চান, তখন আবার দেখা যায় একটু যখন সুখ আসে তখন দুঃখটা তার থেকে বেশি আসে। সেইজন্য নিজেকেই বিচার করতে হবে আমি কোনটা নেব। শান্তি মানেই সেখানে সুখও নেই দুঃখও নেই। এখানে সুখ যেটা বলছেন সেটা পরম সুখের কথাই বলছেন। পরম সুখ মানে নিজের ভাবে অবস্থান করা। নিজের ভাবে অবস্থানের যে সুখ সেই সুখ জাগতিক সুখের অর্থে বা ইন্দ্রিয় সুখের অর্থে নয়। ইন্দ্রিয় সুখ মানেই তার পেছনে ততটা দুঃখ আছে।

ভরতকে এত কথা বলার পর বশিষ্ঠদেব বলছেন, আমরা তোমার জন্য দশরথের শরীর রেখে দিয়েছিলাম এবার দাহ করে দেওয়া হোক। এরপর ভরত আর শত্রুঘ্ন দশরথের পার্থিব শরীর দাহ করে দিলেন। এখানে বর্ণনা করছেন কত ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেন, কত কি দান করলেন ইত্যাদি। ভরত শ্রাদ্ধাদি কর্ম করে যাচ্ছেন কিন্তু মনে মনে ভাবছেন কাজকর্ম মিটে গেলে আমি বনে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে যাব। আর বলছেন, মা কৈকেয়ীকে দেখলেই আমার সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে যাচ্ছে। এরপর কাহিনীই বেশি, আমরা কাহিনীকে সংক্ষেপে বলে চলে যাব।

<u>শ্রীরামকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের বনে গমন</u>

সব কিছু মিটে যাওয়ার পর বশিষ্ঠদেব বলছেন, রাজ্য তো রাজা ছাড়া চলতে পারে না। হে ভরত! তোমার পিতা তোমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেইজন্য তোমাকেই এখন রাজ্য পরিচালনার দায়ীত্ব নিতে হবে। তোমার মা কৈকেয়ী তোমার বাবার থেকে এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন, আর তোমার বাবা সত্যপরায়ণ, সেইজন্য এই দায়ীত্ব তোমাকেই নিতে হবে। ভরত তখন বলছেন –

তচ্ছ্রুত্বা ভরতোহপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে।২/৮/৫
রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিঙ্করায়ঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা।২/৮/৬
অহং যুয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম্।২/৮/৭

হে মুনিবর! রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি এই রাজ্য চাই না, শ্রীরামচন্দ্রই রাজাধিরাজ, আমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, আমরা তাঁর কিঙ্করমাত্র। আর শুনুন আমি কাল সকালেই শ্রীরামচন্দ্রের সাথে দেখা করতে চললাম, আমার সাথে আপনি এবং রাক্ষসী কৈকেয়ী ছাড়া আর যাঁরা মাতৃগণ আছেন তাঁরাও সঙ্গে যাবেন। মায়ের উপর ভরতের খুব রাগ, খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা ভাবি ছেলেরা মায়েদের খুব ভালোবাসে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরা মাকে পছন্দ করতে পারে না। ভরত বলছেন, আমি তো এখনই লোভ-পরায়ণা কৈকেয়ী আমার মা হলেও তাকে বধ করে দিতে পারি। কারণ কৈকেয়ী মা নয়, *মাতৃগন্ধিনীম্*, ওর মধ্যে মায়ের গন্ধটুকু আছে। এই ভাবটা আমাদের এখানে একটা খুব প্রচলিত ভাব, কোন একটা খাদ্যদ্রব আসল নয় কিন্তু ওর মধ্যে আসল খাদ্যের একটু গন্ধ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৈকেয়ীকে বলছেন *মাতৃগন্ধিনীম্*, যে কোন নারীর প্রতি এটি অত্যন্ত একটি অপমান সূচক মন্তব্য। এর মধ্যে মায়ের গন্ধটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু ভরত কেন কৈকেয়ীর গলা কাটবেন না?

কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে।
তচ্ছোভূতে গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্।২/৮/৮

আমি তো এক্ষুণি মা কৈকেয়ীর মুণ্ডুটা কেটে দিতে পারি কিন্তু আমি নারীহন্তা বলে দাদা শ্রীরামচন্দ্র আমাকে কোন দিন আর ক্ষমা করবেন না। এইসব বলার পর ভরত সেই একই কথা বলছেন, আপনারা যদি আমার সাথে না আসতে চান না আসুন আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আমি চললাম, শ্রীরামচন্দ্র যেভাবে জটাজুট ধারণ করে ফলমূল খেয়ে জঙ্গলে আছেন আমি ও শত্রুঘ্ন সেইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে থাকব। তখন সকলেই আনন্দে ভরতকে সাধু সাধু বলে প্রশংসা করতে লাগল। একটা মানুষ রাজ্য ছেড়ে দিতে পারে, রাজ্য পাওয়াতে যে ক্ষমতা আর স্বাধীনতার আস্বাদ পাওয়া যায়, এই জিনিসকে কেউ ছেড়ে দিতে চায় না, সেখানে ভরত সব কিছু ছেড়ে শ্রীরামচন্দ্রের মত জঙ্গলে গিয়ে থাকতে চাইছেন, সত্যিই ভরত প্রশংসার যোগ্য।

পরের দিন সকাল হতেই ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য যাত্রা করলেন। যদিও এখানে উল্লেখ নেই কিন্তু অন্যান্য রামায়ণে এবং টিভি সিরিয়ালেও দেখান হয়েছে যে কৈকেয়ীও সঙ্গে গিয়েছিলেন। সবাইকে নিয়ে ভরত প্রথমে শৃঙ্গবেরপুরে শিবির স্থাপন করলেন, সুবিশাল সেনাবাহিনীরা চারিদিকে শিবির স্থাপন করেছে। গুহক খবর পেলেন ভরত সেনা নিয়ে আসছেন। গুহকের মনে আশঙ্কা হল, ভরত সেনা নিয়ে কোথায় যেতে চাইছেন, এমন তো নয় যে ভরত শ্রীরামচন্দ্রকে শেষ করে দেবে যাতে নিষ্কন্টক রাজ্য ভোগ করতে পারে! এই জিনিসগুলো যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে, অন্যায় ভাবে যখনই কেউ রাজা হয়, রাজা হয়ে প্রথমেই সে তার যত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে তাদের সবাইকে শেষ করে দেয়। মোঘলরা কাউকে বাদ দিত না, নিজের ভাই, ভাইপো, বাবা সবারই গলা কেটে রাখত। মোঘলরা সবাই অন্যায় ভাবেই ক্ষমতা দখল করত, দখল করেই নিজের দাদা, ভাই সবাইকে খুন করিয়ে দেবে। যাদের মনে হত বধ করতে পারবে না, খুন করিয়ে দিলে হয়ত কোথাও বিদ্রোহ হয়ে যেতে পারে, তখন খুব কায়দা করে ওদেরকে রাজমহলেই বিভিন্ন ভাবে বন্দী করে রাখত। বন্দী করে জলে আফিং মিশিয়ে খেতে দিত, শুদ্ধ জল আর দেবে না, এটাই তোমাকে পান করতে হবে, এই নির্দেশই দেওয়া থাকত। কতদিন

আর বেচারী জল না খেয়ে থাকতে পারবে। কয়েদীও জানে জলে আফিং মেশানো আছে, সে জানে আমি যত জল খাচ্ছি তত আফিং ভেতরে যাচ্ছে। কোন উপায় থাকে না, দু বছর, তিনি বছর যেতে না যেতে মস্তিষ্কটা পুরো বিকৃত হয়ে যেতে। যাদেরকে মারতে পারত না তাদের এভাবে শেষ করে দেওয়া হত। রাজা, বাদশারা নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই ধরণের কাজ করে। যেখানেই সত্তার লড়াই সেখানেই এই সমস্যা আসবে। সেইজন্য প্রথম থেকেই আমাদের দেশে জ্যেষ্ঠ সন্তানকেই রাজা করার নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনও আমার বড়জন ক্ষমতা পাবে! ঠিক আছে আমার নিজের লোকজন দিয়ে ওকেই মেরে দেওয়া যাক। এই সমস্যাগুলো সব সময়ই থেকে গিয়েছিল।

গুহকের মনেও এই আশঙ্কা হয়েছে। গুহক তাঁর লোকজনদের নির্দেশ দিলেন তোমরা সবাই গঙ্গার মাঝখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাক, আর আমি যাচ্ছি ভরতের কাছে, ভরতের সাথে কথা বলে দেখি তাঁর কি মনোভাব। যদি বুঝতে পারি ভরতের মনের ভাব অশুদ্ধ তাহলে তোমাদের কাউকে আর গঙ্গা পার হতে দিচ্ছি না। গুহক ভরতের কাছে গিয়ে দেখছে ভরত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে আছেন আর মুখে সব সময় রাম রাম জপ করে যাচ্ছেন। তখন গুহক মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলছে, আমি গুহক। গুহক পরিচয় দিতেই ভরত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, তোমারই জীবন ধন্য, তুমি এভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করার সুযোগ পেয়েছ। হে গুহকরাজ! আমাকে সেখানে নিয়ে চল যেখানে তুমি প্রথম রামকে দেখেছিলে, আমাকে দেখাও রাম আর সীতা যেখানে শয়ন করে রাত কাটিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে ভরত দেখছেন, তৃণের উপর সীতার অঙ্গে যে আভূষণ ছিল সেই স্বর্ণালঙ্কারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণ খণ্ড পড়ে আছে। শাড়ীতে যে স্বর্ণরাগ থাকে সেখান থেকেও কিছু স্বর্ণরেণু ঝরে পড়ে থাকতে পারে, কিন্তু এখানে বর্ণনা করছেন অলঙ্কার থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ড পড়ে আছে। ঐ দেখেই ভরত সুঃখে সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে বলছেন, যিনি অতি কোমলাঙ্গী আর যিনি রাজাপ্রাসাদে অতি কোমল শয্যায় শ্রীরামচন্দ্রের সাথে শয়ন করতেন, সেই জনকতনয়া কি করে প্রথম রাত এই কষ্টদায়ক কুশশয্যায় শয়ন করেছিলেন! আর বলছেন, আমি কেমন অভাগা, আমি এমন এক মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছি, যে মায়ের গর্ভ হল মুর্তিমান পাপরাশি। তেত্রিশ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ।
যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ।২/৮/৩৩

ভরত বলছেন, শ্রীরামের যিনি দাস, সেই দাসেরও যিনি দাস আমি সেই দাসের চাকর যদি হই তাতেই আমার এই জন্ম সফল হয়ে যাবে, এতে আমার কোন সংশয় নেই। যেখানে অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা হয় সেখানে এই ভাব আসে বিশেষ করে যেখানে প্রচুর ভক্তি আছে কিন্তু মিলন হয় না, সেখানেই এই ভাবের প্রকাশ বেশি দেখা যায়। যারা মন্দিরাদিতে কাজকর্ম করেন বা অধ্যক্ষ মহারাজের কাছে যারা সেবার কাজ করছেন, তাদের সাথেও কথা বলতে পারলে আমরা নিজেদের কত কৃতার্থ মনে করি। ভরতেরও এই ভাব, আমি শ্রীরামের দাস নই, তাঁর যিনি দাস, সেই দাসেরও যিনি দাস, আমি তাঁর সেবক। গুহককে তাই বলছেন, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র আছেন আমাকে সেখানে নিয়ে চল। গুহক ভরতকে তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন –

গুহস্তং শুদ্ধহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সস্নেহমব্রবীৎ।
দেব ত্বমেব ধন্যোহসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী।২/৮/৩৫

হে দেব! আপনিই ধন্য, যেহেতু আপনার হৃদয়ে কমললোচন শ্রীরাম, সীতা আর লক্ষ্মণের প্রতি আপনার এই রকম ভক্তি। এরপর গুহক বলছেন শ্রীরামচন্দ্র কিভাবে চিত্রকূট পর্বতে সীতা সহ বাস করছেন। সবাই তখন নৌকা করে গঙ্গার অপর পারে গেলেন। সেখান থেকে সবাই ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে পৌঁছালেন। ভরদ্বাজ মুনিকে খবর পাঠানো হল। ভরদ্বাজ মুনি এসে মজা করে ভরতকে জিজ্ঞেস করছেন, ভরত! তুমি তো এখন রাজা, রাজা হয়ে আজ তোমার এই বল্কলাদির সাজ কেন? আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোন রামকথা, তা সে অধ্যাত্ম রামায়ণই হোক আর যে কোন রামায়ণই হোক, বাল্মীকি রামায়ণের উপর আধারিত। বাল্মীকি রামায়ণ পুরোটাই যুক্তির উপর দিয়ে চলেছে, অযৌক্তিক কিছু নেই বললেই চলে, যেখানে শ্রীরামচন্দ্র হলেন একজন মর্যাদা পুরুষোত্তম। অন্যান্য যে চরিত্র তাঁরা সবাই মানুষ, মানুষের মধ্যে যা যা গুণ থাকতে পারে সবটাই তাঁদের মধ্যে আছে। ভরদ্বাজ একজন বিরাট বড় ঋষি, একটু পরেই তাঁর ক্ষমতা আমরা দেখতে পাব, কিন্তু ওনার মধ্যে মানবীয়

গুণ, কাউকে একটু বিদ্রুপ করা, হাসিমজা করা এগুলো সবই আছে। ভরদ্বাজ ঋষি ভরতকে বিদ্রুপ করছেন, তোমার মায়ের জন্যই আজ এই রকম হল। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে ভরদ্বাজের মুখে এই সংলাপ মানানসই হয়নি। কারণ ভরদ্বাজ মুনি এত বড় ঋষি, যেখানে ঋষিদের এত প্রশংসা করা হয়েছে, সেখানে তিনি এই ধরণের বিদ্রুপাত্মক কথা কেন বলতে যাবেন! কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিতে দেখলে এই সংশয় আসবে না। যাই হোক, ভরদ্বাজ এইভাবে বলাতে ভরতের চোখে জল চলে এসেছে। ভরত তখন বলছেন –

সর্বং জানাসি ভগবন্ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিত্তদনুগ্রহ এব মে।২/৮/৪৫

হে ভগবন্! আপনি ঈশ্বরের সাথে এক, আপনি তাই সমস্ত ভূতের অন্তর্যামী, অতএব আপনার সব কিছুই জানা আছে। হে ভরদ্বাজ মুনি! আপনি এও জানেন আমি দোষী কিনা, আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন এর সাথে আমি কোন ভাবেই জড়িত নই। হে মুনিবর্! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস! আমি শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণের কাছে যেতে চাই, সেখানে গিয়ে আমার সব কিছু শ্রীরামচন্দ্রের চরণযুগলে অর্পণ করে দেব। ভরতের চোখে জল। ভরত রামচন্দ্রকে সত্যিই প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভরতের এই ভালোবাসা বাল্মীকি রামায়ণের সব জায়গাতেই দেখান হয়েছে। চার ভাইয়ের মধ্যে যে ভালোবাসা, এই ভালোবাসাকে বাল্মীকি খুব নিপুণ ভাবে চিত্রণ করেছেন, ভাইয়ে ভাইয়ে যে ভালোবাসা এই ভালোবাসাকে একটা উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পুরো কৃতিত্ব বাল্মীকির। ভরত বা অন্যান্য ভাইদের মধ্যে অন্য ভাইকে নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য যে কোন রকম অভিযোগ এসেছে দেখা যাবে না। তখন ভরদ্বাজ ঋষি বলছেন, আমার জ্ঞানদৃষ্টিতে সব কিছুই আগে থেকেই আমার জানা আছে। তোমার এখন আর শোক করার কিছু নেই। আজ দিবস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আজকের রাতটা এই আশ্রমেই অতিবাহিত কর। তোমার সৈন্যদের এখানে আপ্যায়নের ব্যবস্থাদি করে দিচ্ছি। আগামীকাল সকালে তোমরা চলে যেও।

ভরতের এই বিশাল সৈন্যবাহিনী ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে রাত কাটাবে। এই বিশাল সংখ্যক সৈন্যের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা এই ছোট্ট আশ্রমের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়। ভরদ্বাজ মুনি তখন আচমন করে মৌনভাব অবলম্বন করে কামধেনুকে স্মরণ করলেন। বশিষ্ঠ মুনির জীবনের সাথে কামধেনু অনেক ভাবে জড়িয়ে আছে। কামধেনুকে স্মরণ করাতে কামধেনু এসে সঙ্গে সঙ্গে সবারই জন্য এক রাত্রির মত সব রকম খাবার পানীয় প্রস্তুত করে দিল। বাল্মীকি রামায়ণে এই জায়গায় কামধেনু বলে কিছু নেই। বাল্মীকি এখানে বেদ মন্ত্রের শক্তিকে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন। বেদ মন্ত্র দিয়ে সব ইচ্ছাই পুর্ণ করা যায়। বাল্মীকি বর্ণনা করছেন, ভরদ্বাজ মুনি তখন সঙ্গে সঙ্গে বেদমন্ত্রের উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। যেমন যেমন বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন সঙ্গে সঙ্গে তেমন তেমন স্বর্গের দিব্য খাবার-দাবার, স্বর্গের পেয় সামগ্রী এসে গেল, আর প্রত্যেক সৈনিকের পরিচর্যা ও মনোরঞ্জনের জন্য দুজন করে অপ্সরা হাজির হয়ে গেল। অযোধ্যার সৈনিক, সবই তো এখনকার সিপাহীদের মত, তাদের সামনে এখন স্বর্গের খাবার আবার দুই এক রকমের পদ নয়, নানান রকমের পদের খাবার, আর কত রকমের দিব্য পেয়, আর প্রত্যেকের সেবার জন্য দুজন করে অপ্সরা হাজির হয়ে যেতেই সব সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে 'দেখো ভাই! অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রই হন আর ভরতই হন তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না। এই সুখ আমরা আর কোথায় পাবো বল, যা মাইনে পাই সেই মাইনে দিয়ে এই সুখ জীবনে কোথাও পাওয়া যাবে না। আমরা এখান ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি না, যে রাজ্য করার করুক গে'। সবাই খুব খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রিবেলা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়েছে। ভোর হতেই সবাই দেখছে কোথাও কিছু নেই, যেমন জঙ্গলে পড়ে ছিল তেমন জঙ্গলেই পড়ে আছে। অপ্সরা-টপ্সরা কোথাও কিছু নেই, সব কিছুই উধাও। সবাই সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে আবার ভরতের পেছন পেছন চলতে শুরু করল। বাল্মীকির রামায়ণে এই ধরণের হাস্যরস প্রচুর আছে। ভরতকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রীরামচন্দ্র কোথায় আছেন। এরপর সকাল হতেই সবাইকে নিয়ে ভরত ধীরে ধীরে চিত্রকূট পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন।

শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূটের যেখানে ছিলেন সেখানে তাঁরা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতেন। এই জায়গাতে বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা করছেন। লক্ষ্মণ একটা উঁচু পাথরের টিলা থেকে হঠাৎ দূরে দেখছেন প্রচুর ধুলো উড়ছে, লক্ষ্মণের মনে হল ভরত বুঝি আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। লক্ষ্মণ গিয়ে বলছেন, দাদা! ভরত তো আমাদের

আক্রমণ করতে আসছে। ভরতকে আসতে দিন, আমি একাই ওদের সবাইকে শেষ করে দেব। শ্রীরামচন্দ্র তখন খুব মিষ্টি করে বলছেন, লক্ষ্মণ! তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হয় তোমার মনে রাজ্য পাওয়ার লোভটা থেকে গেছে। তোমার মনে যখন লোভ আছে, ভরত যখন আসবে তখন ওকে বলে দেব তোমাকেই যেন রাজ্যটা দিয়ে দেয়। তুমি ভেবো না, ভরত কখনই আক্রমণ করতে আসবে না। পরে লক্ষ্মণ দেখছেন ভরত একা শ্রীরামচন্দ্রের দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন উঁচু পাথরের টিলা থেকে নেমে এলেন।

ঐ এলাকার মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণ ঘোরাফেরা করেন, বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্র প্রায়শই শিকার করতে চলে যান। অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক পরের দিকের রচনা। সেই সময় বৌদ্ধদের প্রভাবে আর তারও পরে জৈনদের প্রভাবে ভারতে নিরামিষ খাওয়ার প্রচলনটা খুব প্রাধান্য পেয়ে গিয়েছিল। সেইজন্য পরবর্তিকালের ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এনাদের নিরামিশাষী দেখান হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে হরিণের মাংসকে অন্য কিছু না বলে হরিণের মাংসই বলছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে কিন্তু সবটাই নিরামিষের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র ঘোরাঘুরি করতেন, হরিণের পেছনে তাড়া করে শিকার করছেন। তাতে জঙ্গলের পথে ওনাদের পদচিহ্ন হয়ে গেছে। হিন্দুদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে হস্তরেখার বিচার বলে কিছু ছিল না, পরের দিকে বিদেশ থেকে এই জিনিসটা এসেছে। ভারতে সব সময় চিহ্ন দেখে বিচার করা হত। হাতে কি কি চিহ্ন আছে, আঙুলে কটি চক্র আছে, শঙ্খ কটি আছে। ঠিক তেমনি পায়েও অনেক চিহ্ন থাকে। পায়ের খুব নামকরা চিহ্ন হল, বজ্র, অঙ্কুশ, কমল আর ধ্বজা। ভরতও যেতে যেতে পথে দেখলেন –

স তত্র বজ্রাঙ্কুশবারিজাঞ্চিত ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সর্বত্র।
দদর্শ রামস্য ভুবোহতিমঙ্গলান্যচেষ্টয়ৎ পাদরজঃসু সানুজঃ।২/৯/২

পায়ে যদি এই ধরণের চিহ্ন থাকে তাহলে বলে যে সে পরাক্রমী হয়, রাজা হয় ইত্যাদি। ভাগবতেও চিহ্নের খুব সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ধারে ধারে ঘুরছেন সেখানে এই চিহ্নগুলো ছড়িয়ে আছে। ঐ চিহ্ন দেখে গোপীরা বুঝতেন শ্রীকৃষ্ণ কোন দিকে গেছেন। জিম করবেট যখন শিকার করতে যেতেন আর যাকে শিকার করতে হবে, সে চিতাই হোক বা কোন বাঘিনী হোক, ওর পায়ের ছাপ দেখে তিনি বুঝে যেতেন আমি যাকে শিকার করতে যাচ্ছি এটা তারই পায়ের ছাপ। শ্রীরামচন্দ্রের চরণতলে বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, পতাকা এই শুভ চিহ্নগুলি ছিল। যেমন যেমন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের কুটিরের দিকে এগোচ্ছেন তেমন তেমন শ্রীরামচন্দ্রের পায়ের এই শুভ চিহ্নগুলি দেখে তাঁর হৃদয় আগেই আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠছে। যেখানেই ভরত ঐ পদচিহ্ন দেখছেন সেখানেই ভরত আর শত্রুঘ্ন আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। আর বলছেন –

অহো সুধন্যোঽহমমূনি রামপাদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি।
পশ্যামি যৎপাদরজো বিমৃগ্যং ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যম্।২/৯/৩

আমি আজ ধন্য হয়ে গেলাম, কারণ শ্রীরামচন্দ্র সেই ভগবান যাঁর চরণরজ ব্রহ্মাদি দেবতারা আর শ্রুতিগণ অর্থাৎ বেদ সব সময় অন্বেষণ করে যাচ্ছেন। তার মানে এনারা কেউ ভগবানের চরণরজ খুঁজে পান না, কারণ বেদে যে কথাগুলো আছে সেগুলো কথা মাত্র, শুধু তথ্য, এই দিয়ে কখন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। আমাদের যত শাস্ত্রে যখন ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন, এটাকে অনেক সময় কাব্যিক ভাবে বলা হয় তারা যেন ভগবানের চরণরজের অন্বেষণ করছেন। ভরত বলছেন, সেই চরণধুলিতে আজ আমি গড়াগড়ি দিচ্ছি। এখানে সাকার আর নিরাকার এবং অবতার আর ঈশ্বরের যে বাস্তবিক স্বরূপ তারই বর্ণনা করছেন। ঋষিরা বা ব্রহ্ম ও দেবতারা তাঁরা ভগবানের ধ্যান করছেন, ধ্যান করা মানে ঈশ্বরের যে পদধুলি তারই সন্ধান করছেন। আর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রূপে যখন দেহধারণ করছেন তখন তাঁকে পাওয়া অনেক সহজ। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের বলছেন, এই তিনটি জিনিস দুর্লভ, মানবজীবন, মুক্তির ইচ্ছা আর মহাপুরুষের আশ্রয়। ভাইরে! এরপর আমরা মানব জন্ম অবশ্যই পাব, মুক্তির ইচ্ছাও থাকবে কিন্তু ঠাকুরের আশ্রয়টা আর পাওয়া যাবে না। সেইজন্য যা করার এখনই করে নিতে হবে। বেদান্তে যখন যুক্তি দিয়ে দাঁড় করান হয় সেখানে তখন দেখান সমাধির জ্ঞান ছাড়া কোন গতি নেই, সমাধির জ্ঞান দিয়েই জিনিসটাকে দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু মানবজীবন অত্যন্ত দুর্লভ ও মূল্যবান জিনিস। বেদান্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, যদিও আচার্য শঙ্কর ব্যবহারিক সত্তাকে নিয়ে এসে সবটাকেই মূল্য দিচ্ছেন, কিন্তু ওনার শেষ সিদ্ধান্তের দিক থেকে যদি দেখা হয়, যেমন মৃত্যুকে নিয়ে যেভাবে বলছেন, মৃত্যু যেন কোন ব্যাপরই নয়, অন্য দিকে হিন্দু ধর্মে

জীবনকে অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের যে অন্য ধর্মে জীবনকে অত মূল্য দেয় না। কিন্তু এটাই দুর্ভাগ্য যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা বলে হিন্দু ধর্ম হল নৈরাশ্যবাদী ধর্ম, কিন্তু সত্যিকারের জীবনমুখী ধর্ম বলতে একমাত্র হিন্দু ধর্মকেই বলা যায়। কারণ অন্যান ধর্মে যা কিছু হওয়ার সব মৃত্যুর পরেই হয়। স্বর্গপ্রাপ্তি মৃত্যু না হলে হবে না। ইসলাম বা জহুদি ধর্মে যা কিছু হবে সব মৃত্যুর পরেই হবে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে যত যোনি আছে সব ফলভূমি আর মানবযোনি হল কর্মভূমি। মানব দেহেই কর্ম সৃষ্টি হয়। দেবতাদের শরীরে শুধু ফলের ভোগই হয়। এগুলো দর্শনের দিক দিয়ে বলা হচ্ছে। ঋষিরা যেভাবে বলে গেছেন তার সাথে যোগ করারও কিছু নেই, তার থেকে বিয়োগ করারও কিছু নেই। হিন্দু ধর্মের দিক থেকে মানবজীবন অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি ক্ষণ হিন্দুদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এটাই আশ্চর্যের যে এই জিনিস ইসলাম বা খ্রীশ্চান ধর্মে দাঁড়ায় না। যত দিন তুমি আছ তত দিন আল্লার মর্জি মত চল বা God's will follow কর। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এসব হয় না। হিন্দু ধর্ম যেখানে বহু জন্মে শুদ্ধি করে চলে যাওয়ার কথা বলে সেখানে অন্যান্য ধর্ম এক জন্মেই নিয়ে নেয়। সেই কারণে তখন যুক্তির উপর অনেক প্রশ্ন উঠে আসে। একটা বাচ্চা জন্ম নেওয়ার দু ঘন্টার মধ্যে মরে গেলে সেই বাচ্চা কোথায় যাবে? বলছে যেদিন বিচার হবে সেদিন সে চিরদিনের জন্য নরক পাবে, তাহলে যে প্রথম নিঃশ্বাস নিয়েই মরে গেল সেই বাচ্চা মৃত্যুর পর কোথায় যাবে? এই ধরণের অনেক প্রশ্ন উঠলে এরা আর দাঁড়াতে পারে না। সেইজন্য হিন্দু ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বলা হয়।

মুসলিমরা আরব দেশ থেকে ভারতে আসার জন্য ওরা হিন্দু ধর্মকে বুঝতেই পারল না, হিন্দু ধর্মকে মূর্তি পূজার উপাসক মনে করল, মহম্মদ যার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা যিনি নিরাকার তাঁকেই যে সাকার রূপে দেখেন এই জিনিসটা মুসলমানরা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না। খ্রীশ্চানদের সমস্যা পুরো অন্য রকম। খ্রীশ্চান ধর্মের লোকেরা লেখাপড়া জানা ছিল, এরা দেখল হিন্দুদের গ্রন্থগুলিকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে খ্রীশ্চান ধর্ম দাঁড়াতেই পারবে না। ওরা তখন নিজেদের ধর্মগ্রন্থ গুলিকে তুলনা করতে শুরু করে দিল হিন্দুদের সামাজিক অনুশীলনের সাথে। এটা খুবই নিন্দনীয় কৌশল। যখন দুটো ধর্মকে তুলনা করতে হবে তখন দুটো ধর্মের শাস্ত্রকে নিয়েই সেই তুলনা করা উচিৎ। হিন্দুদের সামাজিক অনুশীলনের সাথে যদি তুলনা করতে হয় তাহলে খ্রীশ্চানদের যে সামাজিক অনুশীলন আছে তার সাথে তুলনা করতে হবে। এটা খ্রীশ্চানদের খুব পুরনো কৌশল, ওরা বাইবেলের সাথে সব সময় তুলনা করবে সামাজিক অনুশীলনের সাথে। তুমি সামাজিক কি অনুশীলন কর সেটাকে নিয়ে এসে দেখাও আমরা কি সামাজিক অনুশীলন করছি। আর যদি ধর্মের সাথে তুলনা করতে হয় তাহলে তোমার বাইবেল নিয়ে এসে আমাদের উপনিষদের সঙ্গে তুলনা করে দেখ। তোমাদের বাইবেল উপনিষদ তো অনেক দূরের, ভাগবতের দশটা পাতা নিয়ে নিলে তার মধ্যেই বাইবেল শেষ হয়ে যাবে। সমগ্র হিন্দু ধর্মে ভাগবত অতি সাধারণ একটা গ্রন্থ, সেখানে ভাগবতের কাছেই বাইবেল দাঁড়াতে পারবে না। বাইবেলে যা কিছু তত্ত্ব আছে তার হাজার গুণ বেশি তত্ত্ব ভাগবতে দেওয়া আছে। তাই হিন্দু ধর্মের সাথে খ্রীশ্চান ধর্মের কখনই তুলনা হয় না। একমাত্র খুব মুর্খ আর গোঁড়া ছাড়া এর তুলনা কেউ কোন দিন করতে যাবে না। সমগ্র কোরান বা বাইবেলের যা সাইজ তার থেকে ভাগবত অনেক বৃহৎ আকারের, অথচ ভাগবতই বলছে আমরা বেদ উপনিষদের কাছে মাথা নত করি। খ্রীশ্চানরা সব সময় যে গোলমাল করে তা হল আমাদের সামাজিক অনুশীলনকে নিয়ে গিয়ে বাইবেলের সাথে তুলনা করতে থাকে। যার জন্য দেখা যায় হিন্দুদের যাঁরা লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোক তাঁরা সহজে ধর্মান্তরিত হন না, হয় না যে তা নয়, খুব কম। কোন কারণে আমাদের সামাজিক অনুশীলন গুলিকে ঠিক মনে হয় না। কিন্তু তার আগে খ্রীশ্চানদের সামাজিক অনুশীলনের অবস্থাটা দেখুন। কিছু দিন আগে আলিগড়ে কয়েকজন তপশীলি খ্রীশ্চান হয়ে গিয়েছিল। নিজেরাই রাতারাতি সেখান চার্চ তৈরী করে ফেলল। আর কিছু দিন পরে হঠাৎ তারা নিজেরাই আবার চার্চের ক্রুশ ভেঙে পতাকা লাগিয়ে চার্চকে হনুমানের মন্দিরে পাল্টে দিল। স্বাভাবিক ভাবেই চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেছে। হিন্দু থেকে খ্রীশ্চান বা মুসলমান হয়ে গেলে কোথাও কোন টুঁ শব্দ করার কেউ সাহস পায় না, আর খ্রীশ্চান থেকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতেই প্রচুর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। খোঁজ খবর চলতে লাগল। পচাত্তর কি আশিজনের মত লোক ধর্মান্তরিতে হয়েছিল। তার বলল, হিন্দুরা আমাদের সব সময় নীচ জাতি বলে ধীক্ করত, আমরা তাই খ্রীশ্চান হয়ে গেলাম। খ্রীশ্চান হয়ে যেতেই ফাদাররা এসে এই বিরাট চার্চ বানিয়ে দিল। তারপর দেখছি এরাও আমাদের না দিচ্ছে কোন শিক্ষা, না কোন সামাজিক সমমর্যাদা, কিছুই দিচ্ছে না। শুধু বিবাহ হওয়ার সময় একজন ফাদার এসে বাইবেল থেকে কিছু বলে দিয়ে যান, আর কিছুই নেই। আমাদের তো

দুকুলই চলে গেছে। তার থেকে আমরা হনুমানজীর পূজা করতাম সেটাই অনেক ভালো। তারপর আরএসএস লোকের এসে শুদ্ধিকরণ করে তাদের আবার হিন্দু বানিয়ে দিয়েছে। যে কোন ধর্মের যাঁরা সাধক হন তাঁরা কিন্তু কোন ধর্মের মধ্যেই পার্থক্য দেখেন না, কিন্তু ধর্মের অনুশীলনকারীদের মধ্যে অনেক পার্থক্য এসে যায়। সমস্যা হল যে কোন সমাজেই আধ্যাত্মিক পুরুষের সংখ্যা কম, সেই কারণে সমাজের লোকেদের মধ্যে যদি লোভ, হিংসা এগুলো বেশি মাত্রায় এসে যায় তখন অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়।

খ্রীশ্চান, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ সহজেই সবাই জেনে যেতে পারে, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ এত বিশাল আর এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও দর্শনে সমৃদ্ধ যে পণ্ডিতরা ছাড়া কারুরই জানার ক্ষমতা হবে না। পণ্ডিতদেরও সারা জীবন চলে যেত শুধু বেদ উপনিষদ মুখস্থ করতেই, যার জন্য ঠিক ঠিক যে ধারণা করবেন সেটাও হয়ে উঠত না। যারা আক্রমণ করতে আসে তারা সেভাবে প্রস্তুতি নিয়েই আসে। ঠাকুর বলছেন অপরকে মারতে ঢাল তলোয়ার দরকার আর নিজেকে মারার জন্য একটা নড়ুন হলেই হয়ে যায়। ওরা যখন আক্রমণ করে তখন ওদের কথার অনেক ঢাল তলোয়ার আছে আর আমাদের পণ্ডিতদের ঐ নড়ুনটুকুই সম্বল। এই ধরনের অনেক mismatch হয়ে যায়। যার জন্য স্বামীজী যখন প্রকাশ্যে এলেন তখন স্বামীজীর সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারল না। কারণ হিন্দু ধর্ম তত্ত্ব আর দর্শনে এত সমৃদ্ধ যে এর কাছে কোন ধর্মই দাঁড়াতে পারবে না। এখন দেশে-বিদেশে বড় বড় পণ্ডিত যাঁরা আছেন তাঁরা এই ব্যাপারটা ভালো জানেন ও বোঝেন।

আমাদের আলোচনা চলছিল জীবনকে নিয়ে। বিশ্বে যত ধর্ম আছে তার মধ্যে জীবনকে সব থেকে বেশি মূল্য দেয় হিন্দু ধর্ম। আত্মহত্যা ইসলাম ও খ্রীশ্চান ধর্মেও অনুমতি দেয় না, আল্লা তোমাকে একটা জীবন দিয়েছেন, জীবন নেওয়ার হলে তিনিই নেবেন, আত্মহত্যা করে তুমি জীবনকে শেষ করে দিতে পার না। হিন্দু ধর্মে জোর দেওয়া হয় অন্য জায়গায়, বহু কষ্টে তুমি এই সুযোগ পেয়েছ, এই সুযোগকে যদি কাজে না লাগাতে পার, যদি এই সুযোগকে অবহেলা কর বা নষ্ট করে দাও, কবে আবার এই সুযোগ পাবে কোন ঠিক নেই। এখানে সব কিছুকে নিজের উপর নিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু জীবনের প্রচণ্ড মূল্য।

সব থেকে বড় কথা হল, অবতার রূপে যখন আসেন তখন সহজেই ভগবানের সাক্ষাৎ করতে পারা যায়। শ্রীরামচন্দ্রকে অবতার রূপে সরাসরি সামনে দেখা যাচ্ছে। নিরাকারে যারা ধ্যান করে তারা ঐ নিরাকারের ধ্যানই করতে থাকবে, নিরাকারে কোন দিন ঈশ্বর বা ভগবানকে সে জানতে পারবে না। এই জিনিসটাই এখানে বলছেন, ব্রহ্মা, দেবতারা আর শ্রুতি সবাই ভগবানকে খুঁজে যাচ্ছেন কিন্তু ভগবানের দেখা পান না, কিন্তু সেই ভগবানের চরণচিহ্ন আমি সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। এই আনন্দের ভাব নিয়ে ভরত আর শত্রুঘ্ন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। কিছু দূর চলার পর দেখছেন শ্রীরামচন্দ্র বসে আছেন, দুর্বাদলের মত যাঁর শরীরের রঙ। সঙ্গে কৌশল্যাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র উঠে এসে প্রণামাদি করলেন, বশিষ্ঠ মুনিকে দেখতে পেয়ে তাঁকেও প্রণাম করলেন। এখানে অবাক হওয়ার মত ব্যাপার হল, যেটা বাল্মীকি রামায়ণেও নেই এখানেও নেই। বশিষ্ঠ মুনি যিনি এত বড় ঋষি আর অন্য দিকে ভরদ্বাজ মুনিও বিরাট ঋষি, দুজন বড় ঋষির সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া মানেই কিছু না কিছু আলোচনা চলবে, এখানেও তার কোন বর্ণনা নেই আর বাল্মীকি রামায়ণেও নেই।

সবাইকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই বাবার কথা জিজ্ঞেস করছেন, আপনার বলুন আমার পিতৃদেব ভালো আছেন তো। আমার বিরহে নিশ্চয়ই তিনি খুব কাতর হয়ে আছেন। আমার জন্য কি তিনি আর কোন বিশেষ আদেশ দিয়েছেন? এখানে একটা খুব সুন্দর এক নাটকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। বশিষ্ঠদেব, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা সবাই আছেন, সবাইকেই প্রণাম করছেন। বাবার কথা জিজ্ঞেস করার পর জানতে চাইছেন বাবা আমার জন্য আর কোন আদেশ করেছেন কিনা। এই দৃশ্যের মধ্যে কৌতুহল জাগানোর মত একটা জিনিস লক্ষ্য করার আছে। তখনকার দিনে স্ত্রীরা স্বামীর মৃত্যুর পর কোন বৈধব্যের চিহ্ন ধারণ করত না। মা কৌশল্যাকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র ধরতেই পারছেন না যে বাবা গত হয়েছেন। তাই জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে বাবা কেমন আছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ যে সময়ে রচিত হয়েছে সেই অনুসারে বৈধব্যের চিহ্ন থাকার কথা, কিন্তু যেহেতু বাল্মীকি রামায়ণের উপর আধারিত এবং বাল্মীকি রামায়ণের সময়ে বৈধব্যের চিহ্ন থাকত না, সেইহেতু এখানেও কোন বৈধব্যের চিহ্ন দেখানো হয়নি। এই ফাঁকটা এখানে থেকে গেছে। যাঁরা তুলনাত্মমূলক সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন তাঁরা চট করে এই ফাঁকগুলিকে ধরে ফেলবেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ অনেক পরে রচিত হয়েছে, ভক্তিকে অনেক প্রাধান্য দেওয়া

হয়েছে কিন্তু এই ফাঁকটা থেকে যাচ্ছে। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা যদি বৈধব্যের চিহ্ন ধারণ করে থাকত শ্রীরামচন্দ্র দূর থেকেই বুঝে যেতেন, বাবা কেমন আছেন এই প্রশ্নই তখন আসত না। বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে সব খবর দিলেন, তোমার বাবা তোমার বিরহে হা রাম হা রাম করতে করতে ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। পিতা মারা গেছেন শুনেই শ্রীরামচন্দ্র একেবারে মাটিতে লুটিয়ে পরে কান্নাকাটি শুরু করেছেন। সে কী! পিতা আমাকে এভাবে ছেড়ে চলে গেলেন, আমাকে আর কে আদর করবে, ইত্যাদি।

সবাই মিলে মন্দাকিনী নদীর তীরে রাজা দশরথের নামে জলাঞ্জলী দিলেন আর স্থানীয় জংলী ফল দিয়ে পিণ্ড তৈরী করে পিতার উদ্দেশ্য পিণ্ডদান করলেন। যদিও শ্রাদ্ধাদি কর্ম আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ নিজেদের তরফে পিতৃদেবতার উদ্দেশ্যে তর্পণাদি করলেন। তর্পণাদি করার পর সবাই ফিরে এসেছেন। ফিরে আসার পর ভরত বলতে শুরু করলেন, দাদা! যা হওয়ার হয়ে গেছে এবার আপনি রাজ্য অভিষেক গ্রহণ করে অযোধ্যা রাজ্যের দায়ীত্ব পালন করুন। তাছাড়া এই পৈত্রিক রাজ্যের উত্তরাধিকারী আপনি, আপনি এই রাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। সাথে সাথে বংশ বৃদ্ধির জন্য আপনি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও করুন, আপনার যে সন্তানাদির জন্ম হবে তারাই পরবর্তিকালে অযোধ্যার সিংহাসনে বসবে। তারপর আপনি যদি ইচ্ছে করেন তখন আপনি বনে আসতে পারেন, কিন্তু এখন আপনার জঙ্গলে থাকা চলবে না। ইদানিং যেমন সবাই বলে ধর্মকর্ম বুড়ো বয়সে করা যাবে, ঠাকুর এর খুব নিন্দা করতেন। ভরত যেন তাই বলতে চাইছেন, এই কম বয়সে ধর্ম কেন।

তখন শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলছেন, হে ভরত! তুমি শোন, বাবা আমাকে বলেছিলেন, চৌদ্দ বছর দণ্ডকারণ্যে বাস করার পর তুমি অযোধ্যায় আসবে। ওটা deferred punishment হতে পারে না। অনেক সময় বলা হয়, তোমাকে ছয় মাসের জন্য ওখানে যেতে হবে, তা তুমি আজকেও যেতে পার আর তিন মাস পরেও যেতে পার। এখানে এসব কিছু নেই, তুমি দণ্ডকারণ্যে যাবে সেখানে চৌদ্দ বছর থাকবে, তারপরে তুমি অযোধ্যায় আসবে। এই চৌদ্দ বছর তুমি কোন গ্রাম, কোন শহরে প্রবেশ করতে পারবে না, কোন ধরণের ভোগে লিপ্ত হতে পারবে না। সেইজন্য এই প্রশ্নই আসে না যে, আমি এখন অযোধ্যা যাব আর পরে এসে জঙ্গলে বাস করব। তার সাথে বাবা এটাও পরিষ্কার করে বলে গেছেন এই রাজ্য আমি ভরতকে দিচ্ছি।

অতঃ পিতুর্বচঃ কার্য্যমাবাভ্যামতিযত্নতঃ।
পিতুর্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে।
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ।২/৯/৩১

পিতার আদেশকে যে উল্লঙ্ঘন করে সে জীবিত থেকেও মৃত এবং দেহান্তে নরকে গমন করে। অতএব তুমি রাজ্য শাসন কর, আমি দণ্ডকারণ্য পালন করছি। ভরত তখন –

ভরতস্ত্বব্রবীদ্রামং কামুকো মূঢ়ধীঃ পিতা।২/৯/৩২
স্ত্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি।

নিজের পিতার নামে নিন্দাবাদ করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, হে রামচন্দ্র! পিতা অত্যন্ত কামী পুরুষ, *মূঢ়ধীঃ*, তাঁর বুদ্ধি চলে গেছে, *স্ত্রীজিতো*, তিনি নারীর বশে ছিলেন। আর তিনি *ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো*, আগে যে কথাগুলো লক্ষ্মণ বলেছিলেন, ভরতও তাই বলছেন। বৃদ্ধ বয়সে যুবতী স্ত্রী জুটে গেলে যে কিভাবে মাথাটা পুরোপুরি বিগড়ে যায় ঠাকুর কথামৃতে তার খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। দশরথেরও একই সমস্যা হয়েছিল। যার মাথাটা খারাপ তার কথাকে গুরুত্ব দিতে যাবেন না। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, তুমি এভাবে পুরো ব্যাপারটাকে সহজীকরণ করে দিও না। আগে লক্ষ্মণও এই ধরণের কথা বলেছিলেন, এখন ভরতও একই কথা বলছেন, আগে লক্ষ্মণের কথার শ্রীরামচন্দ্র কোন উত্তর দেননি, কিন্তু এখন দিচ্ছেন –

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রুয়ান্ন কামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ।২/৯/৩৪

হে ভরত! তুমি কেন এই ভুল করছ? পিতা স্ত্রীবশ হয়ে বা কামী বা মূঢ় বুদ্ধি হয়ে এই আদেশ দেননি। *পূর্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ*, তিনি সত্যবাদী, আগে যে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই ভয়ে তিনি কৈকেয়ীকে পূর্ব প্রতিজ্ঞাত বর দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি যদি বর না দিই তাহলে সত্য রক্ষা হবে না,

সেইজন্য তিনি এই কাজ করেছেন। তুমি বারবার পিতাকে কামী, স্ত্রীজিতঃ, মূঢ় এই কথাগুলো বলবে না। আমরাও রামায়ণের কাহিনী শুনে বা পড়ে মনে করি বৃদ্ধ বয়সে দশরথের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, তিনি কৈকেয়ীর বশে থাকতেন, সেইজন্য তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। ইদানিং কালে অনেক প্রবন্ধাদিতেও দশরথের চরিত্রের এই দিকগুলিকে তুলে ধরা হয়। এটা একেবারেই ঠিক নয়। তিনি এক সময় দুটো বর দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, কৈকেয়ী এখন সেই বর চাইছে। এর মধ্যে দশরথেরও কোন দোষ নেই, কৈকেয়ীরও কোন দোষ নেই।

ভারতের লেখক লেখিকারা বিশেষ করে মার্ক্সিস্টরা বিভিন্ন জার্নালে, পত্রপত্রিকায় ভারতের সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে অনেক কিছু লেখেন, তাতে এরা ঠিক কি বলতে চাইছে বোঝা যায় না। ভারত সরকারের মানব সম্পদ বিভাগ থেকে বলা হল ৫ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে সরকারী স্কুল কলেজে এই বছর গুরু উৎসব পালন করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এরা গেল গেল বলে চিৎকার শুরু করে উঠল, সব কিছুকে ধর্মীয়করণ করা হচ্ছে। শিক্ষক দিবসকে অনুবাদ করে যদি গুরু উৎসব বলা হয় তাতেই ধর্মীয়করণ হয়ে গেল? এদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা আসলে কি চাইছ, এদের কাছে কোন পরিষ্কার উত্তর নেই। আমরা freedom চাই। কিসের freedom চাইছে? আমরা রাস্থায় ঘুরে বেড়াব। ঘুরে বেড়াও না, কেউ নিষেধ করতে যাবে না। চ্যাংড়ারা তোমার শ্লীলতাহানী করলে কি হবে? সেটা সরকারের দায়ীত্ব। মেয়েরা নিজের খুশীমত ঘুরে বেড়াবে তার দায়ীত্ব সরকারের, মা-বাবার কোন দায়ীত্ব নেই। স্কুলে ডিসিপ্লিন ঠিক করতে গেলে শিক্ষক আর হেডমাস্টারের উপর কেস হয়ে যাবে। মাস্টার যদি ছাত্রকে শাস্তি দেয় তাতেও কেস হয়ে যাবে। বাবা-মা যদি সন্তানকে শাসন করে, ভারতে এখনও শুরু হয়নি, বিদেশে কেস হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের বাড়িতে শাসন করা যাবে না, স্কুলে শাসন করা যাবে না। এরপর ছেলেমেয়েরা যদি অসভ্যতা করে তখন কি হবে? এরা কি চাইছে কিছুই বোঝা যায় না। এরাও একটা ধর্মকে ব্যাখ্যা করছেন, আমার কাছে ধর্ম হল জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ করা। কিন্তু এরা বুঝতে পারছে না, এদের পরবর্তি প্রজন্মই বলবে আমার বাবা-মার জীবনধারা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। কিন্তু আমাদের ভাষা দিয়ে যদি দেখা হয় তাহলে বলা হবে, তিনি ধর্মকে সংজ্ঞা দিচ্ছেন। সেই ধর্মের সংজ্ঞা কি রকম? বাবার সাথে মেয়ে যাচ্ছে, সেই মেয়ে একটা সেমি-নেকেড ড্রেসে যেতে পারে, এটাই তার কাছে ধর্ম। কিন্তু আজ থেকে চার-পাঁচ হাজার বছর আগে এদেরই পূর্বজদের ধর্ম অন্য রকম ছিল। আজকে সে তার পূর্বজদের ধর্মের নিন্দা করছে কিন্তু বুঝছে না যে তোমার ধর্মটাও ভুল হতে পারে। এই সমস্যা চিরদিন এভাবেই চলে আসছে, একটা প্রজন্ম একভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেবে, আরেকটা প্রজন্ম ধর্মকে আরেক ভাবে ব্যাখ্যা করবে। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ধর্ম হল, বাবা আমাকে আদেশ করেছেন আমি সেই আদেশ পালন করব। সেই আদেশকে যদি ভুল ভাবে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি বলছেন, সেরকম কিছু নয়, পিতা যে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি কোন গাঁজা-ভাং খেয়ে নেননি, কৈকেয়ীর বশে নেননি, তিনি কথা দিয়েছিলেন। যখন সেই কথা রক্ষা করার সময় এসেছে তখন তিনি সেটা রক্ষা করলেন, এছাড়া আর কিছু নয়। এসব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলে দিলেন –

অসত্যাদ্ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি।
করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং কস্যৈ প্রতিশ্রুতম্।৩৫

মহৎ ব্যক্তি যদি কাউকে কথা দিয়ে দেন তিনি তখন মনে করেন, *করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং কস্যৈ প্রতিশ্রুতম্*, কাউকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতি থেকে যদি আমি পিছিয়ে যাই তাহলে তা নরকের যাওয়ার থেকেও অধোগামী হয়ে যাব।

শ্রীরামচন্দ্রের এই কথা শোনার পর ভরত বলছেন, দাদা! তবে তাই হোক, আমিই আপনার প্রতিনিধি হয়ে আপনার মত জটাবল্ক ধারণ করে চৌদ্দ বছর বনবাস করছি, আপনি অযোধ্যা রাজ্য শাসন করতে থাকুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই জিনিস করা যায় না, কারণ পিতা তোমাকেই রাজ্য দিয়েছেন এবং আমাকে বনবাস দিয়েছেন, যদি আমি এর বিপরীত করি তাতে পিতার আদেশই লঙ্ঘন হয়ে যাবে। এর আগে বলেছিলেন পুত্র যদি পিতার প্রতিশ্রুতিকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করে সেই পুত্র জীবিত থেকেও মৃত আর মৃত্যুর পর সে নরকে গমন করে। ঠাকুরের কাছে একজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রশংসা করে বলছেন, তিনি পিতার ঋণ শোধ করেছিলেন। ঠাকুর খুব বিরক্ত হয়ে বলছেন, আর জ্বালাসনি বাপু, নিজের বাপের যদি দেনা না শোধ করে লোকে বলবে ধিক্। এক একটা সমাজে এক এক রকম ধারা চলে। যে সমাজে যে ধারা চলে সেটাই তাদের কাছে ঠিক,

অন্য সমাজের কাছে সেটা ঠিক নাও হতে পারে। সেইজন্য universal morality বলে কিছু হয় না। কিছু দিনে আগেও ভারতে ক্ষমাকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হত, কেউ কিছু অপরাধ করলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হত। আফগানিস্থানে এখনও ক্ষমার কোন প্রশ্নই নেই, ওদের কাছে খুনের বদলা খুন। আফগানিস্থানের মানুষরা খুবই ভালো, তাদের ব্যবহারও ভালো, সব কিছু ভালো। কিন্তু কোন কারণে তাদের পরিবারের কেউ যদি অপরের হাতে মারা যায়, সে তার বদলা নেবেই। এটাই তাদের সংস্কৃতি। যদি বদলা না নিতে পারে তার সম্মান চলে যাবে, সম্মান চলে গেলে সে আর সমাজে বাঁচতেই পারবে না। ভারতীয় সমাজেও কিছু কিছু সংস্কৃতি চলে আসছে, তার মধ্যে একটা সংস্কৃতি হল, যেটা আমরা রামকথাতে পাই, ঠাকুরও একই ভাবকে নিয়ে বলছেন, বাবা একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাবে। ঠিক এই জিনিসটাকেই আগেকার দিনের জমিদাররা কাজে লাগাত। জমিদার হয়ত কোন গরীবকে কটি টাকা ধার দিল, আর তার সুদের হিসাব এমন ভাবে করে দিত যে তারা জীবনে আসল টাকাটা শোধ করতে পারবে না। তখন তারাই জমিদারের বেগার খাটত। বংশের পর বংশ বেগার মজুর হয়ে কাজ করে যেত। কারণ তোমার ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাবা ঋণ নিয়েছিল, হয়ত একশ টাকা ঋণ নিয়েছিল, মাঝখান থেকে চার পুরুষ ধরে জমিদারের বেগার খেটে যাচ্ছে। এই মূল্যবোধ ছিল, কিন্তু মূল্যবোধের পেছনে এটাই ছিল, বাবাই আমার সব কিছু, তিনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কাউকে কথা দিয়েছেন, সেই সত্য রক্ষা আমাকেই করতে হবে।

শ্রীরামচন্দ্র যদি রাজ্য নেন তাতেও দশরথের প্রতিশ্রুতির উল্টো হয়ে যাবে। এমন কি ভরতও যদি বনবাসে চলে যায় তাহলেও সত্য রক্ষা হবে না। ভরত তখন বললেন, এই সমস্যাই যদি হয় ঠিক আছে আমিও বনেই থাকব, লক্ষ্মণের মত আমিও আপনার সেবা করব, আর তা নাহলে প্রায়োপবেশন করে এই দেহত্যাগ করব। এই বলে ভরত রৌদ্রের মধ্যে কুশদল বিছিয়ে পূর্বমুখ হয়ে তার উপর উপবেশন করলেন। আমি অন্নজল ত্যাগ করে প্রাণত্যাগ করে দিচ্ছি, তাহলে তো পিতার প্রতিশ্রুতির কোন কিছুই অসত্য হবে না, আমি তো রাজা আছিই। এরপর আমার শরীর চলে গেলে তখন তো আর কোন দোষ হবে না। খুব জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র ইশারা করতেই বশিষ্ঠ মুনি ভরতকে আলাদা ডেকে নিয়ে গেলেন। এনাদের এটা খুব প্রচলিত পদ্ধতি, যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হত তখন তাকে আলাদা করে ডেকে শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে বলতে থাকবেন। এখানেও বশিষ্ঠদেব ভরতকে নির্জনে ডেকে নিয়ে বলছেন, তোমাকে খুব গোপন একটা কথা বলছি, শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের অবতার, ব্রহ্মার প্রার্থনাতে রাবণবধের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। সীতা হলেন সাক্ষাৎ যোগমায়া আর অনন্তদেব লক্ষ্মণ রূপে আবির্ভূত হয়ে সর্বদা শ্রীরামের অনুগামী হয়ে আছেন। রাবণ বধের জন্যই তিনি বনবাসী হয়েছেন। কৈকেয়ী যা কিছু করেছে দেবতাদের প্রেরণাতেই করেছে। অতএব তুমি সব কিছু মেনে নাও আর শ্রীরামকে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা পরিত্যাগ করে সবাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে চল।

জীবনের কোন কিছুই বোঝা যায় না, জীবন চালানো সত্যিই খুব কঠিন, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সঠিক ভাবে নিরুপণ করা খুবই মুশকিল। স্বামীজী আলমোড়ার পথে যেতে যেতে এক বটবৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসে গেলেন। ধ্যান থেকে ব্যুত্থিত হয়ে তিনি স্বামী তুরিয়ানন্দজীকে জড়িয়ে ধরে বলছেন, আজ আমার কাছে এক বিরাট তত্ত্ব খুলে গেল। কি সেই তত্ত্ব? ব্রহ্মাণ্ড যে সিদ্ধান্তে তৈরী একটা অণুও সেই সিদ্ধান্তেই তৈরী, সংস্কৃতে খুব নামকরা কথা, *যৎ ব্রহ্মাণ্ডে তৎ পিণ্ডাণ্ডে*। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আছে একটা ছোট্ট অণুতেও তাই আছে। স্বামীজী এই তত্ত্ব আগেই জানতেন, এই তত্ত্ব বেদান্তের খুব নামকরা। স্বামীজী তাঁর লেকচারে এই তত্ত্বকে অনেকবার এনেছেন, স্বামীজীর রচনাবলীর এটা একটা সিদ্ধান্ত। যেমন একটা সিদ্ধান্ত হল চিত্তবৃত্তি নিরোধ, তেমনি ব্রহ্মাণ্ড আর পিণ্ডাণ্ড যে একই সিদ্ধান্তে তৈরী, এই সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন ভাবে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানীদের মধ্যেও কোথাও এই অনুভূতি ছিল। নিউটন যেমন বলছেন যে সিদ্ধান্তে আপেল গাছ থেকে নীচে পতিত হচ্ছে সেই একই সিদ্ধান্তে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করছে। গ্যালিলিও বলছেন, আমাকে একটা লম্বা পোল আর লিভার দাও আমি পৃথিবীকে নাড়িয়ে দিতে পারি। কারণ যে সিদ্ধান্তে লিভার কাজ করে একই সিদ্ধান্তে সব কিছুই চলছে।

বর্তমানে দুটো খুব নামকরা সিদ্ধান্ত এই জিনিসটাকে নিয়ে চলে, একটা সিদ্ধান্ত হল যেটা টেকনলজিতে চলে যার নাম হোলোগ্রাম। একটা ছবি আছে, তার একটা কোণ যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে ছবিটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু হোলোগ্রামে পুরো ছবিকে যেন সমান্তরাল ভাবে কেটে হাজারটা টুকরো করে দেওয়া হয়েছে। হোলোগ্রামে কি হয়, প্রত্যেকটি কোণা ঐ ছবিটাকে ধরে রাখে। কেউ যদি কোণা কেটে দেয় ছবিটা নষ্ট হবে না

কিন্তু একটু বিবর্ণ হয়ে যাবে, শুধু ছবির গাঢ়তা পাল্টাতে থাকে। কিন্তু একেবারে মাইক্রোস্কোপিক ছোট্ট একটা কণা তার মধ্যেও পুরো ছবিটা পাওয়া যাবে। হোলোগ্রাম এই সিদ্ধান্তের উপরই চলে। এমনি কোন ছবির মাঝখান দিয়ে কেটে দিলে ছবি পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবে, কোন দিন জানাই যাবে না বাকি অর্দ্ধেকে অংশে কি ছিল। কিন্তু যে কোন হোলোগ্রামকে মাঝখান থেকে অর্দ্ধেক যদি কেটে দেওয়া হয়, তখন ছবির গাড়তাও পুরো অর্দ্ধেক হয়ে যাবে, ছবির ঔজ্জ্বলতা পুরো পঞ্চাশ শতাংশে চলে যাবে, সেটাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না ঠিকই কিন্তু ছবিটা নষ্ট হবে না। গণিতেও এর উপর একটা খুব মজার থিয়োরী আছে, থিয়োরীর নাম fractal theory। আমাদের অনেক সময় কোন কিছুকে random, chaos মনে হয়, কোন অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানেও একটা pattern থাকে। Patternএ একটা জিনিসকে যদি ধরা যায় তখন ঐ জিনিসটাকে দিয়ে পুরোটাই ধরা যাবে। গণিতের জগতে যেদিন fractal theory এল গণিতজ্ঞরা এই থিয়োরীকে এত দূর নিয়ে চলে গেল যে টিভিতে সিরিয়ালে দেখাচ্ছে কেউ ব্যাঙ্ক ডাকাতি করছে, কেউ খুন করছে, সেখানে তারা গাণিতিক সিদ্ধান্ত লাগিয়ে আগে থেকেই বলে দিচ্ছে অমুক লোক খুন করেছে বা অমুক জায়গায় ডাকাতি হতে যাচ্ছে। কিন্তু পুরো জিনিসটাই কাল্পনিক, কাল্পনিক মানেই ধাপ্পা। Fractal Theory এর খুব নামকরা effect হল জুরাসিক পার্ক বই আর সিনেমা। জুরাসিক পার্ক সিনেমা পুরোটাই fractalএর সিদ্ধান্তে দাঁড় করান হয়েছে। যার জন্য সেখানে একজন আছেন যে আগে থেকেই সব কিছু বলে যাচ্ছে, এবার বন্যা হবে, এবার অমুক হবে ইত্যাদি। কিন্তু যারা করছে তাদের কাছে পরিষ্কার নয় কি করে করছে। তাদের এটাই সিদ্ধান্ত যে, একটা ছোট্ট জিনিস আছে তার মধ্যে পুরোটারই ছবি রয়েছে। ঐ ছোট্ট ছবিকে বড় করতে করতে পুরো ছবিটাই পেয়ে যাবে। মনে করুন আপনার একটা ছবি নেওয়া হল, আপনার ছবিকে ছোট করতে করতে একেবার এ্যাটমিক স্টেজে ছবিটাকে নিয়ে আসা হল। এবার ঐ ছবিকে লাগিয়ে লাগিয়ে আপনার একটা পুরো ছবি তৈরী করা হল। এই ছবিকে এবার যেখান থেকেই কাটা হোক না কেন, সেই টুকরো এনলার্জ করলে শুধু আপনারই পুরো ছবি বেরিয়ে আসবে। এখন ভক্তিশাস্ত্রের যে মূল সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্তে বলছেন সবই কৃষ্ণ, এখানেও তো একই কথা বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ তিনি নিজে তো আছেনই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা সেটাও কৃষ্ণ, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একট অণুর ভেতরে গেলে সেখানেও কৃষ্ণ। গণিতের যে fractalএর সিদ্ধান্ত ঐ একই সিদ্ধান্ত, ওরা জানে না যে আমাদের ঋষিরা এগুলো অনেক আগে থেকেই জানতেন।

আমরা এই জায়গাতে যার জন্য এই আলোচনাকে নিয়ে এলাম, তা হল যদি fractalএর সিদ্ধান্ত ঠিক হয় বা স্বামীজী যে সিদ্ধান্তের কথা বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড আর পিণ্ডাণ্ড যদি একই সিদ্ধান্তে তৈরী হয়ে থাকে তাহলে এর একটা খুব বিপজ্জনক পরিণতি হয়। এ্যাটম হল সব থেকে ছোট, এর ছোট আমরা জানি না। কিন্তু এ্যাটমের ভেতরেও যদি চলে যাওয়া যায় তখন সেখানে বলে কোয়ান্টাম ফিজিক্স। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল probabilistic laws, যেখানে বলা হয় যে কোন জিনিসকেই একেবারে ঠিক ঠিক বলা যাবে না। আজকে ফিজিক্সের এটাই একেবারে মূল সিদ্ধান্ত, যাকে বলছে uncertainity principle। একটা ইলেক্ট্রন কোথায় আছে, ওর কত ওজন আর কত বেগে যাচ্ছে এগুলো সঠিক ভাবে কখনই বলা যাবে না। এবার পিণ্ডের সত্যকে যদি আমরা জীবনে লাগাই আর সেটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে যদি ঈশ্বরে লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন এটাই হবে যে জীবনে কোন কিছুকেই সুনিশ্চিত করে বলা যাবে না। আপনার আমার ভাগ্যে কি হবে কোন দিন ঠিক ঠিক বলা যাবে না। কারণ এই পিণ্ডাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড আর fractals, uncertainity principle ওখানেও প্রযোজ্য হবে। ঈশ্বরকে কখনই ইতি করা যাবে না। পিণ্ডাণ্ড আর ব্রহ্মাণ্ড একই সিদ্ধান্তে চলছে এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহলে একেবারে সূক্ষ্মতম যে পিণ্ড, তার মূল সিদ্ধান্তই হল uncertainity principle, কোন কিছুই ঠিক বলা যাবে না, এই নিয়ম ব্রহ্মাণ্ডেও প্রযোজ্য হবে, মানুষের জীবনেও প্রযোজ্য হবে। একটু যেই ঘনত্ব এসে গেলে এ্যাটম হয়ে যায়, এ্যাটম হয়ে গেলে সব কিছু ঠিক ঠিক বলা যাচ্ছে। কোয়াণ্টাম ফিজিক্স আসার আগে পর্যন্ত নিউটনের মত বিজ্ঞানীরা বলতেন আমরা সব কিছু ঠিক ঠিক predict করে দেব। খ্রীশ্চানরা যে বলছে সব আগে থেকে ঠিক করা আছে, তারা তাহলে ঠিকই বলছে। কারণ তখন পর্যন্ত সিদ্ধান্ত ছিল এ্যাটমকে আর ভাঙা যাবে না, এ্যাটমের আচরণ আমাদের জানা আছে, যার জন্য মানুষের ভাগ্য জানা যাবে। এখন আমরা এ্যাটমের ভেতরে ঢুকে গেছি, আমরা এখন জানি যে একটা সীমার বাইরে আর বলা যায় না। ঠিক তেমনি মানুষের জীবনেও একটা সীমার বাইরে আর বলা যাবে না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একটা সীমার বাইরে আর বলা যাবে না। যদিও ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে সেখানে এখানকার কোন নিয়মই চলবে না। একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য এতগুলো কথা বলা হল।

শ্রীরামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ এদের মধ্যে একই জিনিস চলছে, এত রকমের শক্তির খেলা চলছে যে, একেবারে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে এটা ঠিক ছিল বা এটা ভুল ছিল। জীবনের ক্ষেত্রে আমরা খুব বিবেচকের মত বলে দিই যে এটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু একটা যে element of uncertainity আছে সেটাকে সব সময় ছেড়ে দিতে হয়। Uncertainity principleকে যেমন ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডাণ্ডের সিদ্ধান্তে বলা যাবে না, ঠিক তেমনি জীবনের ব্যাপারে, ভাগ্যের ব্যাপারে বলা যাবে না, আবার moralityর ব্যাপারেও বলা যাবে না। গ্রীক দর্শনে সংশয়বাদীরা ছিল, তারাও ঠিক এই কথাই বলত, কি করে জানবে এটা করলে তোমার ভালো হবে কি খারাপ হবে? সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র যখন বলছেন এই রকমই করতে হবে ভরত তখন বলছেন আমি তাহলে প্রায়োপবেশন করব। ভরত ঠিক ছিল কি ভুল ছিল বলা খুব মুশকিল, আমরা সার্বিক ভাবে এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে পারি না।

গুরু বশিষ্ঠদেবের মুখ থেকে সব কিছু শোনার পর ভরত তখন শ্রীরামচন্দ্রকে গিয়ে বললেন, হে রাজেন্দ্র! তাহলে এক কাজ করা যায়, আপনার চরণ পাদুকা দিন, যত দিন আপনি ফিরে না আসছেন ততদিন এই পাদুকাকেই সিংহাসনে রেখে আপনার প্রতীক রূপে এর সেবা করে যাব। ভরত তখন এক জোড়া দিব্য খড়ম শ্রীরামের পদদ্বয়ে পরিয়ে দিলেন। বাল্মীকি রামায়ণে ভরত শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহৃত খড়মটাই নিয়ে এসেছিল, সেখানে ভরত খড়ম নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা তার কোন উল্লেখ নেই। যদি না নিয়ে যান তখন শ্রীরামচন্দ্রের ব্যবহৃত খড়মই ভরতকে নিয়ে আসতে হয়েছিল। এগুলো কিছুই না, এই ধরণের রামায়ণে তিনটে layerকে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে। প্রথম layerহল বাস্তব, সত্যিকারের ঘটনাগুলোকে সাজান হয়েছে, দ্বিতীয় layerটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হল কাব্য। শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বাড়াতে গিয়ে আমরা বাল্মীকির মহিমাকে কেড়ে নিতে পারি না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, খাটব আমি আর সব কৃতিত্ব ভগবান পাবেন এটা কোথাকার ন্যায়! সবাই বলছে ঠাকুর তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। কিন্তু করলাম আমি আর বলছেন সব ঠাকুর করিয়েছেন, সব কৃতিত্ব ঠাকুর কেড়ে নেবেন, এটা কি ধরণের বিচার! বাল্মীকি বা ব্যাসদেব এনারা কেউ কাহিনীকার নন, যেমন যেমন ঘটনা ঘটছে তেমন তেমন লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন না, এনার হলেন অত্যন্ত উচ্চমানের কবি। কবি মানেই তিনি কোন জিনিসের সারটাকে টেনে বার করে এনে তার উপর একটা নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে একটা পূর্ণ ব্যাক্তিত্বকে দাঁড় করি দেন। এখানে সার হল ভরত রাজ্য নেবেন না, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের একটা স্মৃতিকে নিয়ে যেতে চাইছেন। শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরীয় নিলেও তো স্মৃতিই হবে। কিন্তু কাব্যিক মাধুর্যটা থাকবে না। এটাই বাল্মীকির মাহাত্ম্য, তিনি এমন একটা জিনিসকে নিয়ে এলেন যেটা অত্যন্ত মনোহর আর কমনীয়। কিন্তু যদি বলা হয় ভরত আগে থেকেই নিয়ে এসেছিলেন, যেমন এখানে বলছেন, সত্যিই নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানার কথা নয়। কিন্তু বাল্মীকি ছিলেন সত্যিকারের প্রতিভাবান কবি, উচ্চমানের কবি সব সময় বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে বাচ খেলেন। কোন জায়গাটা বাস্তব আর কোন জায়গাতে কল্পনার রাজ্যে ঢুকে গেছেন ধরা খুব মুশকিল হয়ে যায়। এটাই হল কাব্য সাহিত্যের দ্বিতীয় layer, যেখানে বাল্মীকির কৃতিত্বকে সরিয়ে রেখে শুধু শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাকেই বড় করা যাবে না। এখান থেকে তৃতীয় layerএ এসে যায় ভাব জগৎ। ভাব জগৎ মানে ভক্তির রাজ্য। ভক্তির রাজ্যে ভরত সত্যিকারের খড়ম নিয়ে গেছেন, ভক্তের কাছেই এটাই সত্য। কিন্তু বেশি প্রশ্ন করলে অনেক রকম অমিল এসে যাবে। এই তিনটে layerকে মাথায় রেখে এই ধরণের সাহিত্য পড়লে কোন রকম অসুবিধাই হবে না।

রামজন্মভূমি নিয়ে যে সময় খুব ঝামেলা চলছিল সেই সময় সংবাদপত্রে একটা মজার ঘটনা বেরিয়েছিল। আর্কোলজিক্যাল বিভাগ থেকে ওখানে খোঁড়াখুড়ি চলছিল। একদিন রামাইত সাধুরা সব দল বেঁধে আর্কোলজিক্যাল বিভাগের কর্মচারীদের গিয়ে ধমক দিতে শুরু করল। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করছে শ্রীরামের খড়ম যেটা ভরতকে দেওয়া হয়েছিল ওটা কি পাওয়া গেছে? এরা বেশির ভাগই অশিক্ষিত। না হয় মানছি শ্রীরামচন্দ্রের খড়ম ছিল। আপনারা সাধুবাবারাই বলছেন শ্রীরামচন্দ্র গত একুশ হাজার বছর আগে ছিলেন, আমাদের হিসাবে অবশ্য তিন হাজার বছর আগের ঘটনা। আপনাদের হিসাবে একুশ হাজার বছর ধরে কাঠের খড়ম যেটা মাটি চাপা পড়ে আছে সেটা কি আজও ঠিক থাকবে মনে করছেন? আপনারা কিসের খড়ম খুঁজে বার করতে চাইছেন, তারপর এই নিয়ে একটা মারামারি লাগিয়ে দেবেন। বাল্মীকি রামায়ণ একটা শাস্ত্র, একটা মহাকাব্য, কবিদের অর্থে যদিও মহাকাব্য নয় কিন্তু মানুষের জীবনকে বাল্মীকি রামায়ণ একটা ধারা দেয়, সেটাকে ঐভাবে নিতে হয়। একদিকে যুক্তিবাদীরা বাচ্চাদের মত প্রশ্ন করে মাথা খারাপ করে দেয় অন্য দিকে এই অশিক্ষিত সাধুরাও মাথা খারাপ করে দেয়, রামচন্দ্রের খড়ম খুঁজে বেড়াচ্ছে। কদিন পর শুনব, রামচন্দ্র ছোটবেলায় যে তীরধনুক নিয়ে খেলতেন সেগুলোও

খুঁজে পাওয়া গেছে। ইতালীতে টিউরিন বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে যীশুর একটা কাপড় রাখা আছে, যে কাপড় দিয়ে যীশুকে ক্রুসিফাই করার পর ঢাকা দেওয়া হয়েছিল। তাতে এখনও রক্ত লেগে আছে, আর তাতেই যীশুর আকৃতি হয়ে গেছে। এখানেই সন্দেহ হয়, রক্ত দিয়ে যীশুর আকৃতি কোথা থেকে তৈরী হবে! আর প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ লোক ঐ কাপড় দর্শন করতে যাচ্ছে। প্রচুর প্রণামী পড়ে। বিজ্ঞানীরা বললেন আমরা দেখতে চাই এই বস্ত্র যীশুর সময়ের কিনা। একটা ছোট্ট টুকরো দেওয়া হল। কার্বন ডেটিং করে দেখা গেল ওই বস্ত্রের সুতো তের শতকের সময়কার কার্পাসের সুতো। কার্পাসের জন্ম হয়েছে তের শতকে, কার্পাসের তুলো দিয়ে যে সুতো তৈরী হবে তার জন্য অনেক সময় দিতে হবে, সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরী হতেও সময় দিতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই অনেক পরে হতে হবে। তাতে টিউরিনের উপর কিছুই প্রভাব পরেনি। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছিল, তেমনই লক্ষ লক্ষ লোক যাচ্ছে। এরা আবার হিন্দুদের বলে পৌত্তলিক, নিজেরাই যে কত বড় ধরণের পৌত্তলিক সেটাই বুঝতে পারছে না। যীশুর ক্রুসিফাইয়ের তেরশ বছর পর কোন কাপড়ে ছাগলের রক্ত মাখা আছে, আর সেটাকে খ্রীশ্চান ফাদাররা যীশুর রক্ত বলে চালিয়ে যাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা বলে দিলেন পুরোটাই নকল। কত দিনের নকল? তেরশ বছরের নকল। তাও লোকেরা যেমন যাচ্ছিল তেমনই যাচ্ছে, কারণ এরা কাপড় দেখতে যাচ্ছে না, যীশুকে যে ক্রুসিফাই করা হয়েছিল সেই স্মৃতিকে সামনে রেখে যাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের খড়মের কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব হল ভরতের শ্রীরামের প্রতি ভক্তি। খড়ম না হয়ে রামের হাতের কোন ছড়ি হত বা কোন কাপড়ের টুকরো হত তাতেও কিছু হত না, একই জিনিস হত। খড়ম হল যাঁকে ভক্তি করছি তাঁর চরণের প্রতিনিধি, এটাই কাব্যিক মাধুর্য। আর যদি কোন কিছু না হয়ে ভরত যদি বলতেন আমি শুধু আপনার নামেই রাজ্য চালাবে তাতেও একই জিনিস হত। ভরতের ভক্তির কোথাও এতটুকু হেরফের হচ্ছে না। শিক্ষিত লোকেরা ভরতের ভক্তিকে বেশি সম্মান দেবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আরও স্থূল কিছুকে আশ্রয় করতে চায়, বাল্মীকি তাই খড়ম নিয়ে চলে এলেন। এগুলোকে তাই বেশি যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করতে নেই। দ্বিতীয় হল, যখন ভাবরাজ্যের খড়মে চলে যাচ্ছে তাতে কোন দোষ নেই, শ্রীরামচন্দ্রের খড়ম মাথায় নিয়ে ভরত ফিরে আসছেন এই ছবি যদি কেউ আঁকেন অবশ্যই তিনি আঁকবেন। কিন্তু অযোধ্যা গিয়ে যদি আপনি শ্রীরামচন্দ্রের খড়ম খোঁজা শুরু করে দেন আর এটা নিয়ে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগার মত পরিস্থিতি তৈরী হয় তখন এই জিনিসটাকে আটকাতে হবে। এগুলো ভাবজগতের, বাস্তবিক জগতের নয়। রামকথা আলোচনার সময় আমাদের এই জিনিসগুলিকে মাথায় রেখে চলতে হবে। ঠাকুরের যেমন এখনও কোন কিছু ভাব জগতে ঢোকেনি, এখনও আমরা ঐতিহাসিক রামকৃষ্ণকে নিয়েই চলেছি। ঠাকুরের যে ভাব জগতের রচনাগুলো হবে, এই রচনা আরও অনেক পরে শুরু হবে। মানুষ কখনই বস্তুর পূজো করে না, সব সময়ই সে ভাবের পূজো করে।

যাই হোক, ভরত সেই দিব্য পাদুকাযুগল অতি ভক্তিভাবে গ্রহণ করে আবার শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন। ভরত গদগদ স্বরে বলছেন, যেদিন চৌদ্দ বছর শেষ হয়ে পনের বছরের প্রথম সূর্যোদয় হবে সেদিন যদি আপনি অযোধ্যায় আগমন না করেন তাহলে অগ্নিতে প্রবেশ করে আমি দেহত্যাগ করব। এখানে আবার অযৌক্তিক কথা এসে গেল। একটা মানুষ চৌদ্দ বছর জঙ্গলে থাকবেন, জঙ্গল থেকে যে তিনি অযোধ্যায় আসবেন তাকে তো দুদিন সময় দিতে হবে। সেটাও ভরত দিতে চাইছেন না, যেদিন চৌদ্দ বছর শেষ হয়ে যাবে, পরের দিনই আপনাকে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে হবে। তাহলে শ্রীরামচন্দ্রকে কিভাবে প্রবেশ করাতে হবে? এদিকে ভরতের শ্রীরামের প্রতি ভালোবাসা ভক্তিকেও সামনে রাখতে হবে। এবার চৌদ্দ বছরের শেষ দিনে শ্রীরামচন্দ্র কোথায় থাকবেন আমাদের জানা নেই। তাহলে অযোধ্যার সীমানার বাইরে আগের দিন তাঁকে ক্যাম্প করে থাকতে হবে। আর যদি তিনি লঙ্কায় থাকেন, তাহলে এক দিনে সেখান থেকে অযোধ্যায় নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তখন পুষ্পকযানের কল্পনা নিয়ে আসা হল। বাল্মীকি আবার বর্ণনা করছেন যে পুষ্পকযানকে দুটো খচ্চর টেনে আকাশমার্গ দিয়ে চলে যেত।

অনেকে বলবেন, স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের রথকে যদি ঐরাবত হাতি আকাশ মার্গে চালাতে পারে তাহলে রাবণের খচ্চরগুলো, যারা হাতির থেকেও হাল্কা, তারা কেন পুষ্পকযানকে আকাশ দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। ঠিকই বলছে, কিন্তু এগুলোকে নিয়ে বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করলে অনেক সমস্যা এসে যাবে। স্বর্গ মানেই সূক্ষ্ম জগৎ, সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য স্বর্গের সব কিছুই সূক্ষ্ম হতে হবে, সেইজন্য দেবতাদের আমরা স্থূল শরীরের দেখতে পাই না। সব কিছু যদি সূক্ষ্ম হয় তাহলে হাতিও সূক্ষ্ম হবে। রাবণ ছিল স্থূল জগতের বাসিন্দা, সে নিজেও

স্থূল আর তার খচ্চরগুলিও স্থূল। ঐরাবতের সাথে পুষ্পকযানের খচ্চরদের তুলনা কখনই করা যায় না। ঐরাবত সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম প্রাণী। দেবতা আর অসুরদের লড়াইয়ের সময় আরও সমস্যা এসে যায়। অসুররা স্থূল জগতের প্রাণী আর দেবতারা সূক্ষ্ম জগতের সূক্ষ্ম প্রাণী। কিন্তু অসুরদের দেখা যায় না, অসুরদেরও এনারা সূক্ষ্ম জগতে নিয়ে চলে গেছেন। বেদের কিছু কিছু জিনিস, তার সাথে পৌরাণিক সাহিত্যের কিছু কিছু কাল্পনিক জিনিস তার সাথে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, সব কিছুকে মিলিয়ে পৌরাণিক কাহিনী গুলিকে রূপ দেওয়া হয়েছে, একটু যুক্তি দিয়ে ভাবতে গেলে আমাদের মাথা ঝিমঝিম করতে শুরু করবে। সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে বেশি প্রশ্ন করতে নেই। যদি পুষ্পকযানের ধারণা মেনে নেওয়া হয়, পুষ্পকযানকে খচ্চর দিয়ে চালান হয়ে থাকলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় সেই সময় এ্যারোপ্লেনের টেকনোলজি ছিল না। কবিরা কিছু জিনিসকে বাস্তবিক দেখেছেন, কিছু জিনিসকে দেখে ওর উপর একটা কাব্যিক পোষাক চাপিয়ে দিয়েছেন। ঐ কাব্যিক পোষাকটাই ধীরে ধীরে ধর্মীয় ভাবে পরিবর্তিত হয়ে শাস্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শাস্ত্র হয়ে যাওয়ার জন্য এগুলো মানুষের মনের মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে গেছে যে, এই নিয়ে আর প্রশ্ন করা যায় না। তোমাকে প্রশ্ন করা হবে না ঠিকই তার সাথে তুমিও একই কারণে অপরকে আপত্তি করতে পার না। সব মিটে যাওয়ার পর সবাই ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। সেই সময় কৈকেয়ী নির্জনে গিয়ে একাকী শ্রীরামচন্দ্রের সাথে কথা বলছেন। হাতজোড় করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন –

কৈকেয়ী ও শ্রীরামের কথোপকথন

কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিতচেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ।২/৯/৫৬
ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধুসাধু বা।২/৯/৫৭

শ্লোকটি খুব সুন্দর। হে রাম! তোমার প্রেরিত বুদ্ধি দিয়েই আমি এই কাজ করেছি। ক্ষমাই সাধুগণের স্বভাব। তুমি সাধু, যা কিছু হয়েছে আমার জন্যই হয়েছে, তুমি আমার এই দৌরাত্ম মার্জনা কর। এখানে কৈকেয়ী শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন অব্যক্ত বিষ্ণুর মায়ামনুষ্য রূপে দেখছেন। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, ভগবানই সবাইকে বুদ্ধি দিয়ে প্রেরিত করেন। কৈকেয়ীকে বুদ্ধি দিয়ে যেমন তিনি নিয়ে গেছেন সেই মত এই অঘটন ঘটে গেছে। কৈকেয়ী যেন বলতে চাইছে, এই অঘটনে আমার কোন দোষ নেই, আর আমার দোষ তুমি যদি দেখেও থাক তাহলে সাধুদের স্বভাব হল ক্ষমা করা, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ভক্তি পথের সাধনাতে শরণাগতির ভাব থাকে, ঠাকুর বেড়াল ছানার সঙ্গে এর তুলনা করছেন। বেদান্ত মতের সাধনাকে বানর ছানার স্বভাবের সাথে তুলনা করা হয়। বানরের ছা মাকে ধরে রাখে, আমি নিজের চেষ্টায় করব। ভক্তিশাস্ত্রে দেখানো হয় ভক্তের সব দায়ীত্ব তিনিই নিয়ে থাকেন, ভক্তের ভালো মন্দ সবটাই তাঁর। কৈকেয়ী বলছেন, হে রাম! তুমি সেই সাক্ষাৎ পরমাত্মা, তুমি আমাকে প্রেরিত করেছ বলেই আমি এই কাজ করলাম। এই ভাব যদি কারুর মধ্যে এসে যায় সে কিন্তু মহাপুরুষ। ঠাকুর বলছেন, যার এই বোধ হয়ে গেছে যে তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয় সে তো মুক্ত পুরুষ। আমি ভালো যা করছি তাঁর ইচ্ছাতে করছি আর মন্দ যা করছি সেটাও তাঁর ইচ্ছাতেই করছি। নিজের ইচ্ছাটা চলে গেছে, অর্থাৎ সে ভালো-মন্দের পারে চলে গেল, তার আমিটাই চলে গেল। আমি চলে যাওয়া, ভালো-মন্দের পারে চলে যাওয়াটাই তো মুক্তি। তখন দেখে, ঈশ্বরের প্রেরণাতে সে হয়ত একটা ভুল কাজ করে ফেলেছে, ঐ ভুল কাজের জন্য সে যখন দণ্ড পায় ঐ দণ্ডকেও সে ঐভাবেই গ্রহণ করে, তিনিই আমাকে এই দণ্ড দিচ্ছেন। আমি মন্দ কাজ করেছি আর বললাম ঈশ্বরের ইচ্ছাতে করেছি তাই আমি দণ্ড পাব না, তা কখনই হয় না, দুটোকেই তাঁর বলে মেনে নিতে হবে।

কথামৃতে ঠাকুরের 'রামের ইচ্ছা' খুব বিখ্যাত গল্প। এক ভক্ত রাতে শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম করছিল, ডাকাতরা এসে তাকে ধরে তার মাথায় চুরির মাল চাপিয়ে মুটেগিরি করতে নিয়ে চলল। ভক্ত এখন চুরির মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ তাড়া করতে ডাকাতরা পালিয়ে গেছে, মাঝখান থেকে চোরাই মাল সমেত ভক্ত ধরা পড়ে গেছে। তাকে সোজা গারদে ভরে দিয়েছে। পরের দিন বিচারকের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। সে বিচারককে বলতে শুরু করল, রামের ইচ্ছায় আমি শুয়ে ছিলাম। রামের ইচ্ছায় ডাকাতরা এসে

আমাকে ধরল, রামের ইচ্ছায় তারা আমাকে মুটে বয়ালো, রামের ইচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা পড়লাম, রামের ইচ্ছায় আমাকে গারদে নিয়ে গেল, রামের ইচ্ছায় এখন হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। এখন যদি বিচারক তাকে দু বছর জেলে থাকার সাজা দেন, সে কি করবে! বলবে রামের ইচ্ছায় আমার দু বছরের জেল হল। আপাতদৃষ্টিতে এটা হল নৈরাশ্যবাদী দর্শন আর অক্রিয় দর্শন। কিন্তু তা হয় না, এই 'রামের ইচ্ছা' কেউ যদি অনুশীলন করতে যায়, একদিনেই সে ভেঙে পড়বে। রামের ইচ্ছা বা ঠাকুরের ইচ্ছা যখনই বলে দেওয়া হল এরপর তার আর কোন কিছুতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া বলে কিছু থাকবে না। গিরিশ ঘোষ ঠাকুরকে বকলমা দিলেন, তারপরেই গিরিশ ঘোষ কি একটা কথায় বললেন আমি এই রকম করব। ঠাকুর তখন সাবধান করে দিচ্ছেন, তুমি এই কথা আর বলতে পারো না, বকলমা আমার। এগুলো আমাদের পক্ষে ধারণ করা খুব কঠিন। আমাদের আমি ভাব সবারই আছে, যাদের এই আমি ভাব আছে তাদের আমি জপ করছি, আমি ঠকুরকে ভক্তি করছি, আমি ধ্যান করছি, তাদের এই ভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ। এই সহজ পথ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর একটা জায়গায় গিয়ে দেখে আমার দ্বারা আর এগনো সম্ভব নয়, তখনই আসে শরণাগতি। প্রথম থেকেই শরণাগতির অনুশীলন করতে গেলে তার অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে যাবে, কোন কিছুই করতে পারবে না, চোখের যে জল ফেলবে সেটাও ফেলতে পারবে না। শরণাগতীর অনুশীলন যে করছে সে নিজেই জানে আমি সত্যিই শরণাগত নাকি চালাকি করছি। যারাই খুব বেশি শরণাগতীর কথা বলে, হাবভাব দেখায় তারা নিজেকেও ঠকাচ্ছে, অপরকেও ঠকাচ্ছে। কৈকেয়ী যে এখানে যেভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এখানে কোন ঢঙঢাঙ নেই, একেবারে সত্যিকারের শরণাগতীর ভাব নিয়ে বলছেন। কৈকেয়ী ভেতর থেকে বুঝে গেছেন আমি যা করেছি ঠিক করিনি। দ্বিতীয় হল, কৈকেয়ী যখন শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের খবর পেলেন তখন তাঁর মধ্য উৎফুল্লতার ভাব দেখা গিয়েছিল। তিনিও প্রথমেই শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে ভরতকে রাজা করতে চাননি। কিন্তু মন্থরার মাধ্যমে তাঁর মনে এমন একটা ধাক্কা এসে লাগল, কৈকেয়ীরও সব কিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। এমন uncertainity একটা থেকে যায়, কি থেকে কি হয়ে যায় আমরা কেউ বলতে পারি না। সেইজন্য জীবনে চলার জন্য নিজের একটা পথ ঠিক করে নিয়ে বাকি জিনিসগুলিকে ছেড়ে দিতে হয়। আমি একটা পথ ঠিক করে নিলাম, এটাই আমার জীবনধারা, এই জীবনধারার বাইরে আমি আর যাচ্ছি না। এর মধ্যেই ভালোও আসবে মন্দও আসবে, এরই ভেতর কুবুদ্ধি আসবে সুবুদ্ধিও আসবে, এর মধ্যে ঠাকুরের নাম হবে, এর মধ্যেই বাকবিতণ্ডা হবে, সবই হবে।

কৈকেয়ী বলছেন, তুমি সনাতন পরমাত্মা সাক্ষাৎ বিষ্ণু। তুমি নিজের মায়াশক্তিতে এই মানুষ রূপ ধারণ করেছ। তোমার এই মায়া দিয়ে সমস্ত জগতকে মোহিত করে রেখেছ। তোমারেই প্রেরণায় মানুষের মধ্যে কেউ সাধু হয় কেউ অসাধু হয়। দেবীসূক্তমেও এই একই কথা বলছেন, আমিই কাউকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি, কাউকে ব্রহ্মা বানাই, কাউকে ঋষি করে দিই আবার কাউকে প্রজ্ঞাশালী করি। মহাপুরুষরা দেখেন পরমাত্মা ছাড়া কিছু নেই, তাঁরা দেখেন মানুষ যা কিছু করছে ভেতরে অন্তর্যামী আছেন বলেই করছে। ভালো মন্দ যা কিছুই সে করছে সব অন্তর্যামীর প্রেরণাতেই করছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আমরা আমাদের বুদ্ধির জোরেই সব করছি, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সেইজন্য এটাই বলা ঠিক হবে যে, তিনিই প্রেরণা দেন। মুস্কিল হল এগুলো potentially passive theory হওয়ার জন্য মানুষ প্রতারক হয়ে যায়। এখন সিরিয়া ইরাকে আইএসআই যা করছে এগুলোই ধর্মের নামে প্রতারণা। কেরলের এক মৌলবী ফোতয়া দিয়ে বলছেন, তোমরা জেহাদের নাম করে নিজেদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করছ। বেশির ভাগ জেহাদের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। আমরাও যখন বলছি আমি ঈশ্বরের প্রেরণায় করেছি, দেখা যাবে এর পেছনে নিজেদের চালবাজি আছে, নিজেদের কাম, ক্রোধ, লোভ এই রিপুগুলো রয়েছে। কৈকেয়ী আবার বলছেন –

ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিম্।
যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া।২/৯/৫৮

বাজিকর যেভাবে নিজের ইচ্ছায় পেছনের গোপন সুতো দিয়ে পুতুলের নৃত্য দেখায়, ঠিক তেমনি তোমার অধীনে এই বিচিত্র রূপধারিণী মায়া সবাইকে নৃত্য করাচ্ছে। কারণ বুদ্ধি হল জড়, জড়ের কিছু করার ক্ষমতাই নেই। অন্তর্যামী বা আত্মা আছেন বলেই সব কিছু হচ্ছে। আত্মাও যা পরমেশ্বরও তাই। ভগবানই অন্তর্যামী রূপে সবারই ভিতরে বিরাজ করছেন। তিনি আছেন বলেই জগৎ চলছে। আমি ভাবকে কৈকেয়ী যেন কোথাও বুঝতে পারছেন, তাই বলছেন হে প্রভু! তোমার জন্যই সব হচ্ছে। তবে এই ভাব হল potentially passive আর

potentially dangerous theory, ভুল লোকের হাতে চলে গেল এই থিয়োরী মারাত্মক বিপজ্জনক হয়ে যায়। কিন্তু যোগশাস্ত্রে এই সমস্যা কখনই আসবে না, এমন কি বেদান্তেও এই সমস্যা থাকে, সব কিছুকেই মায়াকে জড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিছু হলেই বলে দিতে পারে যে মায়ার দরুণ সব হচ্ছে। যোগশাস্ত্রে চালাকি করার কোন সুযোগ নেই। তবে বলে দিতে পারে আমার ইন্দ্রিয় মন সব নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। কিন্তু ধরা পড়ে যাবে ধ্যানে বসিয়ে দিলে, তুমি কতক্ষণ একাসনে বসে থাকতে পার দেখি, ছয় ঘন্টা টানা একাসনে বসতে পারছ কিনা দেখিয়ে দাও, তাহলে বোঝা যাবে তোমার সব কিছু নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হঠযোগীরা আবার এমনিতেই কিছু এমন ক্ষমতা অর্জন করে নেয় যাতে ওদের কাছে ছয় ঘন্টা টানা বসে থাকাটা কিছুই না। এটাই আবার পয়সা উপার্জনের একটা ফন্দি হয়ে যায়। জ্ঞান, ভক্তি এগুলো সব সময় স্বসংবেদ্য, জ্ঞান ভক্তি তার হয়েছে কিনা সে নিজেই জানবে, সে ছাড়া কেউ জানতে পারবে না।

শেষে বলছেন, তুমি দেবকার্য করার উদ্দেশ্যে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছিলে এই কাজ করার জন্য, আমিও পাপ মনে এই পাপ কর্ম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে পরিত্রাণ কর। তোমাকে নমস্কার। আর তোমার যে স্বরূপের জ্ঞান, এই জ্ঞানাগ্নি দিয়ে আমার *ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরম্*, সন্তানের প্রতি যে মায়া, সম্পদের প্রতি যে মায়ার পাশ, এই বন্ধনকে নাশ করে দাও। এখানে পুত্র বলতে কিন্তু ভরতকে বলা হচ্ছে না, মানুষের মনের পুত্রৈষণা, লোকৈষণাদি ভাবগুলোকে নিয়ে বলছেন। সবই তাঁর ইচ্ছাতে হচ্ছে এই ভাব যদি কেউ অনুশীলন করে প্রথমে তার যত রকমের মোহ আছে সব মোহ দূর হয়ে যাবে, জগতের কোন কিছুর প্রতিই তার আর কোন আকর্ষণ থাকবে না। আমার যে সন্তান তিনিই দিয়েছেন, সন্তান মারা গেল, তিনিই তাঁর জিনিস নিয়ে নিলেন। টাকা এসেছে তিনিই দিয়েছেন, টাকা চলে গেল, তিনিই নিয়ে নিলেন। যে কোন জিনিসের প্রতি যে মায়া মোহ, এই ভাব অনুশীলন করলে এটা কেটে যায়। কৈকেয়ী এটাই বলছেন, হে রাম! তোমার প্রতি যে আমার জ্ঞান এই জ্ঞান দিয়ে যেন আমার সব রকম মায়া মোহ কেটে যায়। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

দেবকার্য্যার্থসিদ্ধার্থমত্র দোষঃ কুতস্তব।
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্।২/৯/৬৪
সর্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেহচিরাৎ।
অহং সর্বত্র সমদৃগ্দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা।২/৯/৬৫

হে মহাভাগে! তুমি যা বলছ ঠিকই বলছ। দেবতাদের কার্য সিদ্ধির জন্য আমারই প্রেরণাতে তোমার মুখ দিয়ে এই কথা বেরিয়েছে, এতে তোমার কোন দোষ নেই। চৌষট্টি নম্বর শ্লোকের দ্বিতীয় আর পয়ষট্টি নম্বর শ্লোকের প্রথম লাইন, এখান থেকে শ্রীরামচন্দ্র উপদেশ দেওয়া শুরু করলেন। আগে এক আধ জায়গায় দিয়েছেন কিন্তু এই ভাবে অবতার রূপে উপদেশ দেননি। তুমি এখন অযোধ্যায় ফিরে যাচ্ছ যাও, কিন্তু নিরন্তর তুমি আমাকেই চিন্তন করবে। আমাকে মানে শুদ্ধ চৈতন্যের কথাই বলছেন। তাহলে কি হবে? *সর্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষ্যসেহচিরাৎ*, প্রথম হবে সব কিছু থেকে তুমি স্নেহবিবর্জিত হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি হবে, এই দুটো থাকলেই তোমার অচিরে মোক্ষ লাভ হয়ে যাবে। জগতের প্রতি স্নেহের নাশ আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিলাভ এই দুটোতে শ্রীরামচন্দ্র খুব জোর দিচ্ছেন। এর আগেও আমরা আলোচনা করেছিলাম, জগতের প্রতি যাদের স্নেহ থাকে তারা বিষয়ী হয়ে যায় আর যাদের জগতের প্রতি স্নেহ নেই সে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। কিন্তু জগতের প্রতি যাদের স্নেহ চলে গেছে সাথে সাথে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাও জন্মেছে তাঁরাই মহাত্মা হয়ে যান। সন্ন্যাসীরও যদি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা না থাকে তাঁরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

কথামৃতে আছে, ভক্তদের সাথে কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, মৃত্যুর সময় মানুষ যেটা চিন্তা করে সেটাই হয়। বলার পর বলছেন, মৃত্যুর সময় যদি ঈশ্বর চিন্তন কর তাহলে তার মুক্তি হয়ে যায়। ঠাকুরের কথা শোনার পর একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, এমনতো হতে পারে সারা জীবন ঈশ্বর চিন্তা করে গেছে কিন্তু শেষ সময় কোন কারণে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারল না, তখন কি হবে? ঠাকুরের উত্তরটা খুবই মজার, ঈশ্বরের চিন্তা করে ঠিকই কিন্তু বিশ্বাস কোথায়! এটাই সমস্যা, ঈশ্বরের প্রতি যার ভালোবাসা আছে শেষ সময়ে তার ঈশ্বরের কথা মনে থাকবেই থাকবে, না থাকার কোন সম্ভবনাই নেই। আমরা সবাই ঈশ্বর চিন্তন করছি ঠিকই, কিন্তু ঈশ্বরে তীব্র বিশ্বাসটা নেই। তাহলে আমরা ঈশ্বরের চিন্তার নামে কি করছি? টিয়া পাখির মত করে যাচ্ছি, বলে দিয়েছে ঈশ্বরের নাম করতে

হয় তাই করে যাচ্ছি। ঈশ্বরের প্রতি যার ঠিক ঠিক বিশ্বাস জন্মে গেছে শেষ সময় তার কখনই ঈশ্বর ছাড়া অন্য চিন্তা আসবে না। স্বামী প্রমেয়ানন্দজী বলতেন মানুষের শেষটা দেখলে বোঝা যায় সারা জীবন তিনি কিভাবে কাটিয়েছেন। ঠাকুর পরিষ্কার বলছেন, সারা জীবন বিষয় চিন্তা করে গেছে মৃত্যুর সময় হঠাৎ হলুদ, লঙ্কা, পাঁচফোড়ন বলে চেঁচিয়ে উঠল। অনেকে প্রশ্ন করেন কোমাতে যারা মারা যায় তারা তো কোন চিন্তা করতে পারে না, তাদের কি গতি হবে? এগুলো কিছু না, কোমা অবস্থায় ভেতরে কি হয় আমাদের জানা নেই, কিন্তু তাই যদি হয় যে কোমাতে কোন চিন্তা থাকে না, আর কোমাতে যাওয়ার ঠিক আগে কি চিন্তা করছিল সেটাও আমরা জানি না, তখন যেটা চিন্তা করছিলেন সেটাই হবে। ঠাকুর আরও কঠোর কথা বলছেন, এক বৃদ্ধার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে, বৃদ্ধাকে গঙ্গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গার ঢেউ তার গায়ে লাগছে বৃদ্ধার খুব ভালো লাগছে। আগামী জন্মে সে এক বেশ্যা হয়ে জন্মাল।

মূল হল ঈশ্বরের প্রতি সেই বিশ্বাস। ঈশাবাস্যোপনিষদে ব্রাহ্মণ এবার মরতে যাচ্ছেন তখন তিনি বলছেন *তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে*। হে সূর্য তোমার মুখের উপর থেকে তোমার রশ্মির আবরণ সরিয়ে দাও, *ব্যূহ রশ্মিন্ সমূহ তেজো*, আমি তোমার সুশোভন রূপকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। আমি কোন কাঙালী ভিখারীর মত প্রার্থনা করছি না, আমি *সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে*, আমি সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, আমার এটা অধিকার। মৃত্যুর সময় ব্রাহ্মণ পুরো সজাগ। ঠিক তেমনি যাঁরা ঈশ্বর চিন্তন করেন তাঁদের এটাই হয়। ঈশ্বরে এমনই বিশ্বাস যে তাঁর মন অন্য কোন দিকে যাবে না, তিনি জানেন আমার শেষ সময় এসে গেছে। সংসারের প্রতি অভিস্নেহের ত্যাগ আর ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, এই দুটো একসাথে চলে। বেশির ভাগ সন্ন্যাসীর সংসারের প্রতি আসক্তি চলে যায়, সংসারের প্রতি আসক্তি তারই হয় যে সেখান থেকে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা করছে, যার কাছ থেকে আমার কিছু পাওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই তার প্রতি আমার কেন ভালোবাসা হবে। এটাই সংসারের বাস্তব ঘটনা। মানুষ তাকেই ভালোবাসে যার কাছ থেকে সে কিছু আদায় করতে পারবে, তা সে সন্তানই হোক, স্ত্রীই হোক, স্বামীই হোক, বন্ধুই হোক যেই হোক না কেন। সন্ন্যাসীর তো কোনটাই নেই, তার না আছে স্ত্রী, না আছে সন্তান, আর সন্ন্যাসীর বন্ধু কিসের বন্ধু, অভিস্নেহটাই চলে গেল, এবার যদি তার ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা না হয়, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস যদি না থাকে সন্ন্যাসী পাগল হয়ে যাবে। সেইজন্য বৈরাগ্য আর ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ এই দুটোকে একসাথে নিয়ে এগোতে হয়। শুধু বৈরাগ্য থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

এখানে কৈকেয়ীকে শ্রীরামচন্দ্র দুটো নির্দেশিকা দিয়ে দিলেন, প্রথম নির্দেশিকা সদা সর্বদা তুমি আমারই চিন্তন করবে, দ্বিতীয় সংসারের প্রতি স্নেহরহিত হও। এই দুটি করতে থাকলে শেষে আমার প্রতি তোমার যে গাঢ় ভক্তি হবে সেই ভক্তিতেই তুমি অচিরে মুক্ত হয়ে যাবে। গীতাতে সাতশটি শ্লোক, এই সাতশ শ্লোকে ভগবানকে পুরো দর্শনকে উপস্থাপন করতে হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম অধ্যায় এমনিতেই বাদ চলে যায়, প্রথম অধ্যায়ে ভগবানের কথা কিছুই নেই। তার উপর বিভিন্ন দর্শনগুলিকেও ভগবানকে নিয়ে আসতে হয়েছে, সেইজন্য যদিও মূল কথা সবই আছে কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা পুরোদমে করতে পারেননি। অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্লোকের সংখ্যা অনেক বেশি, ফলে এখানে ব্যাখ্যাটা আরও বিস্তারিত ভাবে করা যায়। দ্বিতীয় মানবিক চরিত্রের সন্নিবেশ হওয়াতে জিনিসগুলোকে আরও সহজ ভাবে বোঝা যায়। তৃতীয় সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ দিক তা হল, ভক্তিশাস্ত্র আর বেদান্তের সব কিছুকে সমন্বয় করে সবারই জন্য উপযোগী করে আধ্যাত্মিক বিচার ধারাগুলোকে সঙ্কলন করে দেওয়াতে অধ্যাত্ম রামায়ণ অত্যন্ত উচ্চমানের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ রূপে সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, পণ্ডিত সবারই কাছে সমাদৃত হয়ে গেছে। সেইজন্য সবারই অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করা উচিৎ। ভাগবতও খুব উচ্চমানের গ্রন্থ, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ভাগবত বোঝা যেমন কঠিন, এর সংস্কৃত ভাষাও খুব কঠিন আর আকারেও বৃহৎ, প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোক। সেই তুলনায় অধ্যাত্ম রামায়ণে মাত্র চব্বিশ শ্লোক, আর এর সংস্কৃতও খুব সহজ। ভগবান এখানে কত সুন্দর ভাবে সহজ করে বলছেন, তুমি যদি আমার অহর্নিশি ভক্তি কর, সংসারের প্রতি যদি স্নেহশূন্য হও তাহলে আমার প্রতি ঐ ভক্তি দ্বারা তোমার মুক্তি হবেই।

কেন বলছেন আমার প্রতি ভক্তি দিয়েই তোমার মুক্তি হবে? এই কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *অহং সর্বত্র সমদৃগ্দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা*। আমি সবারই প্রতি সমদর্শি, কারুর প্রতি আমার দ্বেষও নেই কেউই আমার প্রিয়ও নয়। ঠিক এই জায়গাতে এসে অবতারবাদ খুব কঠিন হয়ে যায়। এর আগে আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম, যখন আমরা God as person নিয়ে আসি তখন আমরা ভগবানের উপর যে গুণগুলো আরোপ করতে

থাকব এই গুণগুলো কোথাও গিয়ে সংঘাত হতে শুরু হয়ে যাবে। যদি বলি God the merciful আর God the just, ঈশ্বর দয়াবান, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। এবার একজন কাউকে খুন করে ঠাকুরের কাছে গিয়ে সত্যিকারের ক্ষমাপ্রার্থি হয়ে গেল। আর অন্য দিকে যাকে খুন করেছে তার বাবা মা গিয়ে ঠাকুরের কাছে খুব করে প্রার্থনা করছে আমার ছেলের খুনীর যেন কঠোর সাজা হয়। খুনের বিচারে তাকে হয় ফাঁসিতে যেতে হবে নয়তো যাবজ্জীবন কারাবাস হবে। আবার অন্য দিকে খুনি বলছে ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন, আমাকে কৃপা করবেন কারণ তিনি হলেন merciful। ভগবান এখন কোনটা করবেন? ভগবান তাঁর দুটো গুণকে কি করে রক্ষা করবেন, দয়াবান, ন্যায়পরায়ণ দুটো তো একসাথে হবে না। আমরা তখন মায়ের উপমা নিয়ে আসব, সন্তান যত খারাপ কাজ করুক, মা তাকে সাজাও দেবেন আবার ভালোও বাসবেন। কিন্তু মা আর ছেলের যখন হচ্ছে তখন সেখানে মা আর ছেলেতেই হচ্ছে থার্ড পার্সন যুক্ত নেই, এখানে থার্ড পার্সন যুক্ত আছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা এসে যায়, এরপর আরও বিচার করতে গেলে অনেক ধরণের বিপরীত ভাব চলে আসে, যেগুলো কখনই মেলানো যাবে না। কিন্তু খুব উচ্চমানের ভক্তিগ্রন্থ কখনই ধর্মের সহজ রূপের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করবে না। ধর্ম দুটো স্তরে চলে, একটা স্তরে সহজ পথে নিয়ে যায় আরেকটা উচ্চ আদর্শের স্তর দিয়ে নিয়ে যায়। সহজ ধর্ম বলবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তিনি শুনবেনই শুনবেন। কিন্তু উচ্চ আদর্শের স্তরে যে ধর্ম চলে সেখানে বলবে তিনি নির্বিকার। এখানে শ্রীরামচন্দ্র তাই বলছেন, আমার কারুর প্রতি দ্বেষও নেই আর কেউ আমার প্রিয়ও নয়।

এখানে এটাই খুব মজার ব্যাপার, এই একটি দুটি শ্লোক মিলিয়ে পুরো সাধনশাস্ত্রের কথা সূত্রাকারে বলে দিলেন। প্রথমে দুটো জিনিস অনুশীলন করতে বলে দিলেন, সংসারের প্রতি অভিস্নেহ ত্যাগ আর দ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা। তারপরেই যেটা বলছেন এটাই ভক্তিশাস্ত্রের বা বেদান্তের মূল ভাব(Central Theme)। গীতায় ভগবান এই একই কথা বলছেন, *সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ*, সমস্ত প্রাণীর প্রতি আমার সমান দৃষ্টি, কারুর প্রতি না আছে আমার দ্বেষ আর কারুর প্রতি না আছে আমার প্রিয় ভাব। এই গুণ কখনই ভগবানের হয় না। কোন ভগবান? সাধারণতঃ ভগবান বলতে আমরা বুঝি দক্ষিণেশ্বরে মা কালী আছেন, বেলুড় মঠে ঠাকুর আছেন, এই ধারণাটা এখানে দাঁড়াবে না। কিন্তু এই গুণগুলিই শুদ্ধ আত্মার বৈশিষ্ট্য, শুদ্ধ আত্মাই নির্বিকার থাকেন। নির্বিকার থাকেন কিন্তু তিনি আছেন বলেই বাকি সব কিছু হচ্ছে। একমাত্র সচ্চিদানন্দরই কারুর প্রতি দ্বেষ নেই কারুর উপর ভালোবাসা নেই। এটাকেই ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে বলছেন, প্রদীপের আলোতে কেউ ভাগবত পড়ছে, কেউ নোট জাল করছে, তাতে প্রদীপের আলোর কিছু আসে যায় না, প্রদীপ সেখানে নির্বিকার। কঠোপনিষদে এই জিনিসটাকেই সূর্যের উপমা দিয়ে বলছেন, সূর্যের আলোতে পৃথিবীতে ভালো-মন্দ কত কিছু হচ্ছে তাতে সূর্যের কিছু আসে যায় না।

আমাদের তখন প্রশ্ন জাগে, প্রার্থনা করলে কি তিনি শোনেন? ঠাকুর বলছেন আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। কিন্তু কোন প্রার্থনা শুনবেন তার বর্ণনাটা নেই। প্রার্থনা আর শ্লোকে যে বলছেন *অহং সর্বত্র সমদৃগ্দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা*, এই দুটোকে পাশাপাশি রেখে যদি বিচার করা হয় তখন দেখা যাবে যে আমাদের প্রার্থনা কখনই পূরণ হবে না। তাহলে ঠাকুর যে বলছেন আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেনই শুনবেন, ঠাকুরের কথা তো মিলছে না, কিন্তু ঠাকুরের কথা মিলবে না এই জিনিস তো কখনই হতে পারে না। তিনি শুনবেনই শুনবেন, কোন প্রার্থনা তিনি শুনবেন? এই ব্যাপারে কিছু বলা নেই। আমরা যদি বেদান্তের দৃষ্টিতে বা যোগের দৃষ্টিতে দেখি তখন জিনিসটাকে খুব সহজ ভাবে বোঝা যায়। আমি আর শুদ্ধ আত্মা এক, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা জড়িয়ে আছে এই জগতের সাথে, প্রার্থনা করা যায় একমাত্র ঐ ত্যাগের জন্য, নিজের স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার জন্য। আমি যদি দুঃখে প্রতিষ্ঠিত থাকি, যে কোন জিনিসের জন্যই দুঃখ হতে পারে। আমি ঠাকুরের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করছি হে ঠাকুর! আমার দুঃখ নিবারণ কর। আধ্যাত্মিকতার আলোকে যদি বিচার করা হয় তাহলে দুঃখ নিবারণের অর্থ কি হবে? শুদ্ধ আত্মার মধ্যে জাগতিক কোন ব্যাপার নেই, কিন্তু দুঃখ সব সময় জাগতিক ব্যাপার থেকেই আসে। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, আসলে আমরা নিজেকেই বলছি, বাইরের জিনিসটাকে ত্যাগ কর। করতে করতে হঠাৎ দেখছি জিনিসটা ত্যাগ হয়ে গেল। সেইজন্য প্রার্থনা সব সময় ত্যাগ বৈরাগ্যের জন্যই করা উচিৎ। আর প্রার্থনা যে পূরণ হয় সেই পূরণও ত্যাগের জন্যই হয়। শ্রীরামচন্দ্র নিজের স্ত্রীকে অপহরণ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলেন না, শ্রীকৃষ্ণ নিজের বাবা-মার কারাগারত্ব ঘোচাতে পারলেন না, যীশু নিজেকে ক্রুশিফাই থেকে বাঁচাতে পারলেন না, তিনি আমাদের কি রক্ষা করবেন! কারণ তিনি হলেন *অহং সর্বত্র সমদৃগ্দ্বেষ্যো বা প্রিয়*

এব বা। এখানে অবতারের কাহিনীর মাধ্যমে একটা আধ্যাত্মিক সত্যকে আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সংসার থেকে বৈরাগ্য, যোগশাস্ত্রে যে বৈরাগ্যের কথা বলছেন সেই বৈরাগ্য। কিন্তু বৈরাগ্যের সাথে ঈশ্বরে তীব্র বিশ্বাস ও অনুরাগ না থাকলে বিপদ। ঈশ্বরের প্রতি যদি ভালোবাসা এসে যায়, আত্মজ্ঞানের প্রতি যদি আসক্তি হয় তোমার অবশ্যই বৈরাগ্য হয়ে যাবে। মুক্তি কার হবে? যে যেমন সাধনা করবে তার হবে, ওখানে ঈশ্বরের কোন ব্যাপার নেই। বরানগর মঠে স্বামীজী সাধুদের শাস্ত্র, ব্যাকরণ পড়াতে চাইছিলেন। কিন্তু দেখছেন এসব পড়ার থেকে ঠাকুরের পূজা, ভোগ এসব নিয়েই থাকতে সাধুদের বেশি আগ্রহ। স্বামীজী রেগে গিয়ে বলছেন, তোমরা ভাবছ ছোলার বোটা ছাড়ালেই হবে, শেষে ঠাকুর এসে নিয়ে যাবে! কিছুই হবে না। ভক্তির কথা, জ্ঞানের কথা, যাই বলি না কেন সবেতেই দুটি হেতু থাকে। প্রথম হেতু সংসারের প্রতি বিরক্তি, দ্বিতীয় হেতু ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, এই দ্বিতীয় হেতু থেকে যে শক্তির জন্ম হয়, সেই শক্তিতেই মুক্তি হয় বা ভক্তি প্রাপ্তি হয়। কিন্তু যখন বৈধী ভক্তি করতে গিয়ে অনেক উপাচারের মধ্যে ডুবে থাকে, তখন ওটাই আধ্যাত্মিক বিকাশে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শুধু ঠাকুরের নাম করে গেছে, রাম রাম করে গেছে সেইজন্য যে কিছু হবে তাও না, কখনই হবে না। ঠাকুর একটা গল্প বলছেন, পাহাড়ের উপর একজন বাড়ি বানিয়ে ছিল। একদিন খুব ঝড় উঠেছে। ঝড় দেখে লোকটি দুশ্চিন্তায় প্রার্থনা করে বলছে হে ঠাকুর রক্ষা কর। দেখছে তাও ঝড় কমছে না। ঝড় হল পবন দেবতার আর হনুমান পবন দেবতার সন্তান, তাই বলতে শুরু করল এটা হনুমানের বাড়ি, বাড়িটা এবার ধড়মড় করে নড়তে শুরু হয়েছে, তখন বলছে, এটা রামচন্দ্রের বাড়ি, সীতার বাড়ি, লক্ষ্মণের বাড়ি। বাড়িটা যখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল তখন বলছে শালার বাড়ি। আমাদের ভক্তিও ঠিক তাই।

এই যে বলছেন *অহং সর্বত্র সমদৃগ্*, যিনি সমদর্শি, যাঁর কারুর প্রতি দ্বেষ নেই কারুর প্রতি প্রিয় ভাব নেই, তিনি কি করবেন? তিনি কি অপরের কাছ থেকে কেড়ে আপনার প্রার্থনা পূরণ করবেন? তাহলে তিনি *সমদৃগ্* কি করে হলেন? আমি প্রার্থনা করে বলছি এই চাকরিটা যেন আমারই হয়। তাহলে যার চাকরি পাওয়ার কথা তাকে সরিয়ে ভগবান আমাকে চাকরিটা দিয়ে দেবেন? প্রার্থনা করছি আমার রোগ সারিয়ে দাও। রোগ সারিয়ে দিলে রোগের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া এরা কোথায় যাবে, এদেরও তো একটা জায়গায় থাকতে দিতে হবে। এরাও তো ভগবানেরই জীব, এরা তাহলে কোথায় যাবে? সেইজন্য এই ধরণের প্রার্থনায় কোন লাভ হয় না। প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের দুঃখ প্রকাশ করে দিলেন এই যা, এর থেকে বেশি কিছু হয় না। কিন্তু এই যে কথাটা ভগবান বলছেন, তুমি যদি চেষ্টা কর তোমারও মুক্তি হয়ে যাবে। কেন তোমার চেষ্টাতে হয়ে যাবে? কারণ এখানে আমার কোন দ্বেষ নেই, কোন প্রিয় অপ্রিয় নেই। কৈকেয়ীর জন্য আমি রাজ্য হারালাম এই ভাব আমার মধ্যে বিন্দু মাত্র নেই।

এই জিনিসটাকেই আবার অন্য দিক দিয়ে বলছেন, জাদুকর যখন জাদু দিয়ে কোন জিনিসের সৃষ্টি করে তখন সেই জিনিসের প্রতি তার না কোন ভালোবাসা থাকে, না কোন দ্বেষ থাকে। আমরা যদি কোন দামী জিনিস কিনে আনি তখন সেই জিনিসটার প্রতি আমাদের খুব ভালোবাসা হয়। কিন্তু জাদুকররা খেলা দেখাতে গিয়ে দেখাচ্ছে একটা রুমাল থেকে একটা পায়রা বেরিয়ে এল। এখানে মায়াবী শব্দ বলছেন, জিনিসটা আদপেই নেই কিন্তু সেই জিনিসটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। লেজারের আলো দিয়ে একটা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হল, যে করছে সে জানে, জাদুকর জানে জাদুখেলাতে আমি যা দেখাচ্ছি এগুলো বাস্তবে নেই। তাই বলে কি জাদুকরের এই বস্তুগুলোর প্রতি তার বিশেষ আসক্তি হবে? কখনই হবে না। সে জানে সবটাই খেলা। যাদের কাছে বস্তুকে সত্য বলে বোধ হয় তাদের ঐ বস্তুর প্রতি আসক্তি হবে। যারা জানে এই বস্তু সত্য নয় তাদের আর আসক্তি হবে না। এটাই ভগবান বলছেন, এই সৃষ্টিটা আমার মায়া দিয়ে এসেছে, সেইজন্য সৃষ্টিতে কোন কিছুর প্রতি আমার আসক্তি নেই। আপনি মাটির একটা পেয়ারা বা আপেল তৈরী করেন, আর সত্যিই খুব সুন্দর বানিয়েছেন, একেবারে সত্যিকারের মনে হচ্ছে। ওই আপেল বা পেয়ারা দেখে একটা পাখি দূর থেকে দেখলে হয়ত আকৃষ্ট হতে পারে কিন্তু আপনার কখনই খাওয়ার ইচ্ছা জাগবে না, কারণ আপনি জানেন এটা মাটির, এটাকে আপনি একটা শিল্প রূপে দেখবেন। ভগবান তাঁর সৃষ্টিকে মানুষের দৃষ্টিতে কখনই দেখেন না, তিনি জানেন এটা আমার মায়ার সৃষ্টি, যার ফলে তিনি কোন কিছুতেই আসক্ত হন না। যে জানে না সেই আসক্ত হবে, কিন্তু যে জেনে গেছে সে আর আসক্ত হবে না। ম্যাজিক আর ধর্ম দুটো সব সময় একসাথে চলে। সাধারণ মানুষ চমৎকারি দেখতে ভালোবাসে, ধর্মের মধ্যেও তারা চমৎকারিত্ব খুঁজতে যায়। সেইজন্য বাবাজীরা অনেক রকম ম্যাজিক শিখে রাখে, সেগুলিকে দেখিয়ে লোককে বোকা বানায়, লোকেরা মনে করে কত বড় ধর্মাত্মা। যেখানেই দেখা যাবে কোন লোককে কেন্দ্র

করে চমৎকারিতা হচ্ছে বুঝতে হবে ওখানে নির্ঘাৎ কোন গোলমাল আছে। এরা এত রকমের কায়দা শিখে রেখেছে চট করে কেউ ধরতে পারবে না। যে অজ্ঞানী সে চমৎকৃত হবে, আর যে জানে সে চমৎকৃত হবে না। সেইজন্য জাদু আর জাদুকরের উপমা বেদান্তে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরের জানেন এই সৃষ্টিটাই মায়া, বাস্তব সৃষ্টি নয়। বাস্তব সৃষ্টি হলে সে আর এই সৃষ্টিকে ছাড়তে পারবে না। যেমন সন্তান বাবা-মার বাস্তব সৃষ্টি। সন্তান যতই খারাপ হোক, বদমাইস হোক, সন্তানের উপর থেকে বাবা-মার ভালোবাসা কোন দিন চলে যাবে না।

যে কোন লেখকের সব থেকে বড় শত্রু হল তার লেখা। কোন লেখক কবিতা বা কোন উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু খুবই নিম্ন মানের, লেখকও বুঝতে পারছেন লেখা ঠিক জমেনি, কিন্তু সে তার লেখাটা ফেলে দিতে চাইবে না। কোন বিজ্ঞানী অনেক খেটে গবেষণা করে একটা থিয়োরী দাঁড় করিয়েছেন, পরে যদি জেনে যান থিয়োরীটা ভুল, তাও সেই থিয়োরীকে সে ছাড়তে চাইবেন না। কারণ একটা থিয়োরীকে মনে মনে অনেকদিন ধরে চিন্তা করেছেন, সন্তানের মত ভালোবাসছেন, সেটা যদি ভুলও প্রমাণিত হয়ে যায়, সেটাকে সে ছাড়তে চাইবেন না। সৃষ্টি যদি বাস্তবিক হয় সেই সৃষ্টির প্রতি এমন একটা ভালোবাসার টান হয়ে যায়, যে টানে আর সে এগোতে পারে না। ভগবান বলছেন, আমি জানি এই সৃষ্টিটা মায়া, বাস্তব নয়। সৃষ্টি যদি বাস্তব হত তাহলে ভগবানও ছাড়তে পারতেন না। ভক্তিশাস্ত্রে এটাই একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝেই ভক্তের মনে খেদ হয়, ভগবান তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ তুমি আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন, তুমি আমার মধ্যে আমিত্ব বোধ দিয়েছ, কষ্টতো আমি পাচ্ছি। এই যে ভাব, সৃষ্টিকে যখন বাস্তবিক রূপে দেখা হয় তখন দোষটা ঈশ্বরের উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু যাঁরা খুব উচ্চমানের তাঁরা জানেন তাঁর ইচ্ছায় যা হবার হবে। এখানে কাঁচা মনের ভক্তদের কথা বলা হচ্ছে, তাদের কাছে সৃষ্টি বাস্তবিক বলে মনে হয় তাই এই সমস্যাগুলো থাকবে। আর যাঁরা বেদান্ত মতে চলেন তাঁরাও যে সব সময় সৃষ্টিকে মিথ্যা ভেবে জগতে সেইভাবে আচরণ করবেন, পেরে ওঠেন না। আমরাও কখন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আবার অন্য পরিস্থিতিতে বিপরীত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রের জন্য এটা খুবই মূল্যবান কথা, মায়ার সৃষ্টি বলে এই সৃষ্টির কোন কিছুতে আমি মোহিত হই না। আর বলছেন –

নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোহনুভজ্ঞামহ্যম্।
মন্মায়ামোহিতধিয়ো মামম্ব মনুজাকৃতিম্।২/৯/৬৬
সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ।
দিষ্ট্যা মদ্গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপ্যহম্।২/৯/৬৭

কল্পতরুর বৃক্ষের নীচে যে যেমন প্রার্থনা করে কল্পতরু বৃক্ষ তাকে যেমন সেই প্রার্থনা পূরণ করে তেমনি যে যেমনটি আমাকে ভজনা করে তাকেও আমি সেভাবেই দেখাশোনা করি। সাধারণ মানুষ আমার মায়ায় মোহিত হয়ে আছে তারা আমার বাস্তবিক স্বরূপ জানে না, তাই আমাকেও তারা সুখ-দুঃখের অনুগত বলেই জানে। গীতায় এই ভাব অনেকবার নিয়ে আসা হয়েছে। এই ভাবকে নিলে অন্য দিকে একটা সমস্যা হয়ে যায়। ঠাকুর একদিকে ছিলেন ত্রিগুণাতীত, স্বামীজী আরাত্রিক ভজনে বলছেন নির্গুণগুণময়। একদিকে ঠাকুর নির্গুণ আবার অন্য দিকে গুণময়। ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই যারা ঠাকুরকে অবতার বলে মানছে না আবার আরেকদিকে বলছে ঠাকুর সব কিছুর পারে; ঠাকুর যখন গলায় ক্যান্সারে কষ্ট পাচ্ছেন তখন তারাই বলছে, এগুলো কিছু নয়। কিন্তু স্বামীজী বলছেন, না, ওনার কষ্ট হচ্ছে। কারণ অবতারই হন আর যাই হন, দেহ যতক্ষণ থাকবে দেহের কষ্ট বোধটাও ততক্ষণ থাকবে। আমরা এগুলোকে খুব চরমে নিয়ে গিয়ে বলি, অবতারের এগুলো কিছুই হয় না। আবার নীচের দিকে নেমে গিয়ে বলছি, উনিও আমাদের মতই একজন যিনি সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। শ্রীরামচন্দ্রকে অনেক সময় আমরা মনে করি তিনি আমাদেরই মত একজন, যার জন্য সীতার বনবাস, বালি বধ এই জিনিসগুলোকে ধর্মাধর্ম দিয়ে বিচার করি। আবার ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধিকে মনে করছি সবটাই তাঁর লীলা। কিন্তু তা নয়, এটাও আছে ওটাও আছে। কিন্তু অবতারের যত কর্ম হয় কোন কর্মই প্রেরিত হয় না, অবতারের কর্মে সব সময় স্বতন্ত্রতা আছে। আমাদের এই জীবন চলছে আমার অতীতের প্রভাবে আর বলছি ভবিষ্যত আমাকে পেছনের দিকে টানছে। অবতারকে সেভাবে অতীত ভবিষ্যত প্রেরিত করে না। অবতার এখানে আর এমনটি (Here and now) এই অবস্থায় থাকেন, প্ল্যানিং করা বা পেছনের কথাকে নিয়ে তাঁর জীবনের একটা রূপরেখা তৈরী করবে, এই জিনিস হয় না। এখানে আর এমনটি এই অবস্থায় শুধু দুজনই থাকতে পারেন, অতীতকে নিয়ে বলবেন না আর ভবিষ্যতকে নিয়েও বলবেন না, এই জিনিসটা এক অবতার বা উচ্চমানের ঋষিরা করতে পারেন আর কম্প্যুটার বা যে কোন মেশিন

করতে পারে, তাছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। মেশিন অতীত ভবিষ্যত কোনটাকেই মনে রাখে না। সেইজন্য যারা বলে Forget the past, don't worry about future live here and now তারা কিন্তু জানে না যে মানুষ মাত্রেই পেছনটাকেও রাখতে হয় আর ভবিষ্যতকেও রাখাতে হয়। অতীতকে ভুলে যাও, ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না, তুমি বর্তমানকে দেখ, যারা এই উপদেশ দেয় তারা ভুল উপদেশ দিচ্ছে। মানুষ মাত্রই ভূত, বর্তমান আর ভবিষ্যত তিনটেকে নিয়েই থাকে। এখন আর এমনটি একমাত্র অবতার করতে পারেন আর তা নাহলে মেশিন করতে পারে। এই সিলিং পাখার কবে কি হয়েছিল তাতে পাখার কিছু যায় আসে না, পাখার আর্মেচার, ব্লেডগুলো ঠিক থাকলেই হল। অবতারও অতীত নিয়ে কোন কিছু চিন্তা করেন না আর ভবিষ্যত নিয়েও কোন পরিকল্পনা করবেন না। মানুষ তিনটে কালকে নিয়েই থাকে। পাখিরাও ডিম পাড়ার সময় হলে বাসা তৈরী করে। শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলতে চাইছেন, অতীত আমাকে ঠেলে নিয়ে যায় না, ভবিষ্যত আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। কৈকেয়ীকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, মা! তোমার অনেক ভাগ্যক্রমে আমার স্বরূপের জ্ঞান হয়েছে, তাই এবার শুধু গৃহে অবস্থিত থেকে আমার স্বরূপের চিন্তন করতে থাক তাহলে কর্মের কোন বন্ধন তোমাকে আর বাঁধতে পারবে না।

<u>শ্রীরামের অত্রিমুনির আশ্রমে গমন</u>

এরপর সবাই আবার অযোধ্যার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র ভাবছেন, চিত্রকূট থেকে অযোধ্যাতো বেশি দূরে অবস্থিত নয়, আমরা এখানে যদি থাকি তাহলে অযোধ্যা থেকে লোকজন যখন তখন ক্রমাগত আসতেই থাকবে। সেইজন্য লক্ষ্মণকে বললেন আমরা এখান থেকে আরেকটু দূরে চলে যাই। চিত্রকূট থেকে এনারা এবার জঙ্গলের আরও ভেতরের দিকে যেতে শুরু করলেন। সেখান থেকে এবার সবাই অত্রি মুনির আশ্রমের দিকে এগোতে শুরু করলেন। অত্রিমুনির আশ্রমে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্র অত্রি মুনিকে বলছেন, আমি রাম, আপনাকে প্রণাম জানাই, খুব সুন্দর বলছে –

পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতা।
বনবাসমিষেণাপি ধন্যোহহং দর্শনাত্তব।২/৯/৮১

পিতৃ আজ্ঞা মাথায় নিয়ে আমি দণ্ডকারণ্যে এসেছি, এই বনবাসের ছলে আপনার মত একজন ঋষির দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হলাম, আপনাকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। এই ধরণের পর পর কিছু ঘটনা আসতে থাকবে যেখানে শ্রীরামচন্দ্র প্রণাম জানাবেন। আর ঋষিরাও শ্রীরামচন্দ্রের আগমনকে এক বিশেষ ভাবে গ্রহণ করছেন। বলছেন –

শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরম্।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ।২/৯/৮২

এই শ্লোকের অর্থ করলে এটাই মনে হয় যে অত্রি মুনি এর আগে শ্রীরামচন্দ্রের কথা শোনেননি। ভরদ্বাজ মুনি যেমন আগেই জানতেন কিন্তু অত্রি মুনি বোধ হয় শোনেননি। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বলছেন বনবাসের ছুতোয় আপনার দর্শন পেলাম, এই কথা শোনার পর অত্রি মুনি জেনে গেছেন যে ইনি পরাৎপর নারায়ণ, পরম হরি। এটা কি করে সম্ভব, ঋষিকে সম্ভাষণ করে প্রণাম করতেই ঋষি বুঝে গেলেন ইনি সেই পরম হরি? অত্রি মুনি একজন ঋষি, ঋষি বলেই বুঝতে পেরেছেন। আধ্যাত্মিক জগতে যাঁরাই বিচরণ করেন তাঁরা কিছু একটা বুঝতে পারেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার পুরীর জগন্নাথদেবকে দর্শন করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার সময় দেখছেন দরজার কাছে কাঙালীর মত একজন সাধুবাবা বসে আছেন। সাধুবাবার দিকে রাজা মহারাজের দৃষ্টি পড়তেই তিনি কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ওনার চোখের দিকে খুব গভীর ভাবে তাকালেন, দুজনেই একটু হাসলেন, তারপরেই রাজা মহারাজ চলে এলেন। পরে তিনি অন্যদের বলছেন, উনি একজন ব্রহ্মজ্ঞানী। রাজা মহারাজের শিষ্যরা শুনে সবাই চমকে উঠেছেন। শিষ্যর আবার সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখছেন সেখানে তিনি আর নেই। সাধু সন্ন্যাসীদের পরম্পরাতে একটা প্রচলিত মত যে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রহ্মজ্ঞানীকে জানতে পারেন, অন্যরা কেউ জানতে পারে না। কি করে বুঝতে পারেন কারুরই জানা নেই। ঠাকুর যেভাবে নরেনকে দেখেছিলেন, আর কেউই কিন্তু সেভাবে দেখেননি, ঠাকুর বলছেন সপ্তর্ষি মণ্ডল থেকে এসেছে, আবার বলছেন নর ঋষি। আমরা জানিনা এনারা কিভাবে বুঝতে পারেন, তবে এটা ঠিক যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কখনই ভুল দেখেন না। পরের দিকে গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত ঠাকুরকে যখন অবতার বলতে শুরু করলেন, ঠাকুর বলছেন, আগে কত পণ্ডিতরা এসেছে তারা বললে আর এখন একজন

থিয়েটারি করে আরেকজন ডাক্তারী করে এরা নাকি বলছে অবতার। আমরা যা কিছুর জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিয়েই পাই। যাঁদের বুদ্ধি বিকশিত তাঁরা বুদ্ধি দিয়েই জ্ঞান পান।

জ্ঞান তিন ভাবে আসে, প্রথম জ্ঞান আসে মূলতঃ পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে। পশুদেরও পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান আসে। মানুষের মধ্যে যাদের বুদ্ধি একটু বিকশিত তাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি দিয়েও জ্ঞান আসে। বুদ্ধি আবার দু রকমের কাজ করে, প্রথম হল deductive আর দ্বিতীয় inductive। Deductive কাজ করে বর্তমান পরিস্থিতির উপর আর inductive কাজ করে ভবিষ্যতের উপরে। যেমন, আমরা এখানে জানলা দরজা বন্ধ করে বসে রামকথা শুনছি, এখান থেকে বেরিয়ে দেখছি বাইরে রাস্তাঘাট, গাছপালা সব ভেজা, বুঝতে পারি যে আমরা যখন রামকথায় হারিয়ে গিয়েছিলাম তখন বৃষ্টি হয়েছে, এটা হল deductive। আবার আমি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি তখন দেখছি আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, আমার একটা ধারণা আছে যে এই রকম মেঘ করে অন্ধকার করে এলে বৃষ্টি পড়ে, এটা হয়ে গেল inductive। আগে আগে এই রকম হওয়ার জন্য এই এই হয়েছিল তাহলে এখনও তাই হবে। Inductiveএ যুক্তি অনেক সময় ভুলও হতে পারে, এমনও হতে পারে একটা দমকা ঝড়ে সব মেঘ উড়ে গেল, বৃষ্টি হল না। যত রকম পূর্বাভাস দেওয়া হয় সবই inductive logicএর উপর দেওয়া হয়ে থাকে। এই দু ভাবে বুদ্ধি চলে। আর সেরিব্রাল কর্টেক্স যে প্রাণীর যত বেশি উন্নত সেই প্রাণীর মধ্যে তত জ্ঞানরাশি আহরণের ক্ষমতা থাকে। কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায় deductive power বেশি থাকে আবার কিছু লোকের মধ্যে inductive power বেশি থাকে। কেন এই রকম হয় নিউরো বিজ্ঞানীরা এখনও বার করতে পারেননি। আইনস্টাইনের মধ্যে inductive power সাংঘাতিক ছিল, অনেক এগিয়ে এগিয়ে জিনিসটাকে দেখতে পেতেন। বেদান্তের ভাষায় এই জ্ঞানরাশিকে খুব সহজ করে বলে দেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর অনুমান প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে পাই আর অনুমান প্রমাণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে পাই।

তৃতীয় আরেক ভাবে জ্ঞান হয় যাকে বলে অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞানের সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভাবে আসছে না। তাহলে তো পরোক্ষ বললেই হত, কিন্তু বলছেন অপরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানে আমি ইন্দ্রিয় দিয়ে জেনেছি, আর পরোক্ষ জ্ঞান মানে যেটা আমি অপরের কাছে শুনেছি। কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান অপরের মাধ্যমে আসছে না, তাই পরোক্ষও নয় আবার ইন্দ্রিয় দিয়েও আসছে না। শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জ্ঞান আসছে তাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলছেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় দিয়ে জ্ঞান না এলে সেই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা যাবে না। আর পরোক্ষও বলা যাবে না, কারণ অন্যের মাধ্যমে আসছে না, নিজের মাধ্যমেই আসছে তাই বলছেন অপরোক্ষ। অপরোক্ষ শুনলে মনে হবে পরোক্ষ নয়, কিন্তু এটা একটা পরিভাষা। যে কোন পরিভাষার অর্থ সঠিক ভাবে বুঝতে না পারলে বিষয়টা ধারণা করা যাবে না। অপরোক্ষ জ্ঞানকেই ইংরাজীতে বলে intuitive। Intuitiveটাও ঠিক ঠিক হবে না, কারণ intuitionটা আবার অন্য জিনিস, inductive knowledge থেকে যেন আরেকটু এগিয়ে গেল। বেদান্তে এগুলোকে আলোচনা করার সময় intuitive knowledge মানেই হয় যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিয়ে আসেনি, বুদ্ধি দিয়েও আসেনি, সরাসরি এসেছে। ভারতীয়দের কাছে আত্মা ছাড়া আর কেউ জ্ঞান পায় না, কোন কিছুকে বোধ করার ক্ষমতা আত্মা ছাড়া আর কারুর নেই। আত্মা কখন ইন্দ্রিয়ে দিয়ে বোধ করে, কখন বুদ্ধি দিয়ে বোধ করে আর কখন সরাসরি বোধ করে। প্রধানমন্ত্রী যেমন কোন কাজ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে দিয়ে করাচ্ছেন, কোন কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে দিয়ে করাচ্ছেন বা অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে করাচ্ছেন আবার কোন কাজ চাইলে তিনি নিজেই সরাসরি করে দিতে পারেন। সব মন্ত্রীর যা যা কাজ আছে ইচ্ছে করলে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি করে দিতে পারেন। আত্মাও ঠিক তাই করে, আত্মা সচরাচর জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নেয়, অনেক কিছুর জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা নেয় আবার আত্মার হঠাৎ মনে হয় এই জ্ঞানটা নিতে হবে, তখন আত্মা সরাসরি সেই জ্ঞান নিয়ে নেয়। আত্মা সব সময় নিজেরই জ্ঞান নেয়, নিজের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কিছুর জ্ঞান আত্মা নেয় না। আত্মা যে সরাসরি জ্ঞান নেবে তার জন্য নিজের ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি থেকে তাকে আলাদা থাকতে হবে। এই অবস্থাকেই আমরা বলি শুদ্ধ মন। যখনই এই ধরণের শুদ্ধ মন বা শুদ্ধ আত্মা ঠিক সেই ধরণের শুদ্ধ মনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে তখন বুঝতে পারে জিনিসটা কি।

এর আমরা একটা উপমা নিতে পারি, আমরা যখন পরস্পরের সাথে কথাবার্তা বলি, মেলামেশা করি সেই সময় আমার অন্তর্যামী আর আমরা সামনের লোকটির অন্তর্যামীর মধ্যে সরাসরি কথাবার্তার আদান-প্রদান চলতে থাকে। আপনার অন্তর্যামী আমার অন্তর্যামীকে বলে দেয় তোমার সামনের লোকটি এই ধরণের। আর আমার অন্তর্যামী আপনার অন্তর্যামীকে বলে দেয় এই লোকটি এই ধরণের স্বভাবের। সেইজন্য দুষ্ট লোক যদি এসে

কথাবার্তা বলতে থাকে, ভালো লোকের মনটা তার থেকে ছিটকে যেতে থাকবে। অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, লোকটির সবই ঠিকঠাক আছে কিন্তু তার সাথে কথা বলতে গেলে ভেতর থেকে কেন যেন সায় দিতে চায় না। আমরা শত্রুও নয়, আমার ক্ষতিও করছে না কিন্তু কথাবার্তা বলতে গেলেই কেমন অস্বস্তি অনুভব হতে থাকে। আবার অনেকে ক্ষেত্রে এর ঠিক উল্টোটাই হয়, কাছে থাকলেই ভালো লাগে। সামনের লোকটির অন্তর্যামী আমার অন্তর্যামীকে বলে দিচ্ছে লোকটি এই রকমের। আমাদের মধ্যে দশ রকমের জিনিস আছে। আমার সততার একটা স্তর আছে, ভালোবাসার একটা স্তর আছে, ডিসিপ্লিনের একটা ধারা আছে, যে মানুষদের সাথে আমার মেলামেশা করতে হবে তাদেরও আমার কাছ থাকে অনেক রকম প্রত্যাশা থাকবে। পরে আমি যখন জানতে চাইছি লোকটি কি রকম তখন আমার অন্তর্যামীই বলে দেবেন লোকটি এই রকম। আত্মা হলেন সর্বশক্তিমান, সেইজন্য আমি যদি সত্যি সত্যিই সৎ হই তাহলে জগৎ কোন দিন আমার সামনে অসৎ হতে পারবে না। অসৎ লোকও আমার সামনে এসে থমকে যাবে। আমার অন্তর্যামীই তাকে দাঁড়াতে দেবেন না। এটা বেদান্তের মত, কিন্তু কিভাবে হয় আমাদের জানা নেই। তবে আমরা বলতে পারি যে তার অন্তর্যামীই আমার অন্তর্যামীকে বলে দেন লোকটি কি রকম। এখন অত্রি মুনির অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছেন ইনি কে। পরমাত্মা বলে দিচ্ছেন আমি পরমাত্মা।

অত্রি মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে পরাৎপর নারায়ণ বুঝতে পেরে পুষ্প ও ফলমূলাদির দ্বারা পূজা ও অভ্যর্থনা করে স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন, আমার স্ত্রী হলেন সেই বিখ্যাত অনুসূয়া। অনুসূয়ার অর্থ, যাঁর হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র এবং যাঁর মনে কারুর প্রতি বিন্দু মাত্র বিদ্বেষ ভাব এমনকি নিন্দার ভাবও নেই। অনুসূয়া খুব নামকরা ঋষিকা, অত্রি মুনি যতটা বিখ্যাত ছিলেন তাঁর থেকে অনুসূয়ার খ্যাতি অনেক বেশি হয়েছিল। অত্রি মুনি অনুসূয়ার ব্যাপারে বলছেন, তাঁর এখন বয়স হয়ে গেছে, কুঠিয়ার ভেতরেই থাকেন, ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি। আর বললেন সীতা যদি অনুসূয়ার সাথে দেখা করেন তাহলে খুবই ভালো হয়। এই বলার পর শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কুঠিয়ার ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনুসূয়ার সামনে এসে সীতা দাঁড়িয়েছেন, তিনি প্রণাম করলেন। অনুসূয়া সীতাকে খুব আদর করে বলছেন –

দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে যে নির্মিতে বিশ্বকর্মণা।
দুকূলে দ্বে দদৌ তস্যৈ নির্মলে ভক্তিসংযুতা।।২/৯/৮৮
অঙ্গরাগঞ্চ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা।
ন ত্যক্ষ্যতেঽঙ্গরাগেণ শোভাং ত্বাং কমলাননে।।২/৯/৮৯

বিশ্বকর্মা এক দিব্য কুণ্ডল নির্মাণ করেছিলেন, সেই কুণ্ডল অনুসূয়ার কাছে ছিল। অনুসূয়া সেই কুণ্ডল সীতাকে অর্পণ করলেন। দিব্য কুণ্ডলের কি তাৎপর্য তার বর্ণনা এখানে নেই। কুণ্ডলের সাথে সীতাকে তিনি দুটো শাড়িও দিলেন। শাড়ি দুটোও দিব্য, দিব্য হওয়ার দরুণ শাড়ি কখন মলিন হবে না। শুভাননে অনুসূয়া আরও বলছেন, হে কমলাননে! এই দিব্য অঙ্গরাগ তুমি নিয়ে যাও। দিব্য অঙ্গরাগ লেপন করলে কি হবে? তুমি বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে এই দিব্য অঙ্গরাগ ব্যবহার করলে তোমার কান্তি কখনও ক্ষীণ হয়ে যাবে না। এরপর অনুসূয়া খুব সুন্দর কথা বলছেন –

পাতিব্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি।
কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহম্।।২/৯/৯০

হে জানকি! তুমি পাতিব্রতা ধর্ম পালন করতে থাক আর সর্বদা শ্রীরামের অনুগামিনী থাকবে। আমি প্রার্থনা করি পুনরায় রাঘব তোমাকে নিয়ে কুশলে গৃহে যেন প্রতিগমন করতে পারেন। রামায়ণ মহাভারতে পাতিব্রতা ধর্মের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছে। পাতিব্রতা ধর্মকে আমাদের শাস্ত্র কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে সবারই একটু ভেবে দেখা উচিৎ। প্রথমে সবাইকে ঠিক করতে হবে আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি। আমার জীবন-দর্শনের উদ্দেশ্য কি স্ফুর্তি করে জীবন অতিবাহিত করা নাকি ধর্ম পালন করে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া? কেউ যদি চায় কুকুর-বেড়ালের মত থাকতে, কেউ তাকে বাধা দেবে না। দ্বিতীয় আরেকটি জিনিস হল, জীবন যদি আধ্যাত্মিক উত্থানের জন্য হয় তাহলে কোন কাজেরই বিশেষ মাহাত্ম্য থাকে না, কারণ যে কোন কাজ করেই আধ্যাত্মিক উত্থানকে তরান্বিত করা যায়। জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভোগ হয় তাহলে সে যা খুশি করতে পারে আর জীবনের উদ্দেশ্য যদি ধর্ম লাভ করা হয় তাহলে যে কোন জিনিস দিয়ে ধর্ম লাভ করা যায়। কাজের মাহাত্ম্য কোথাও নেই, যদি ভোগ

করতে চায় তাহলে যত খুশি বিয়ে করুক, যত ইচ্ছা ডিভোর্স করুক। অন্য দিকে ধর্মই যদি লক্ষ্য হয় তখনও কাজের কোন গুরুত্ব থাকে না, কারণ যে কোন কাজ করে একজন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করতে পারে। নারী উৎপীড়ন, নারী নির্যাতন নিয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন, এখানে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। আমরা সবাই একটা জায়গায় ফেঁসে আছি, সন্ন্যাসীও ফেঁসে আছে, গৃহীরাও ফেঁসে আছে। হিন্দু শাস্ত্র এটাই বলছে, তুমি যে পরিস্থিতিতে ফেঁসে আছ মনে করছ, এটাতে তুমি ফেঁসে নেই, এটাই তোমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। মুক্তির সহজ পথ হল, তুমি যে জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছ, কর্মবাদ অনুসারে তুমি ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকবে, তোমার সংস্কার বা কর্ম তোমাকে ঠেলে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওখান থেকে তুমি বেরিয়ে চলে যেতে পার। একটা মেয়ে, যেমন সীতাকে তাঁর পিতা বলে দিলেন এই হল তোমার স্বামী। শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা ভগবান বলে মনে করি, তাই মেনে নিচ্ছি শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে পৌরুষ ছিল, ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যদি না'ও থাকত তাতেও সীতার কোন গতি ছিল না, কারণ তখনকার দিনে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথা ছিল না। এখন তাকে দেখতে হবে জীবনের উদ্দেশ্যটা কি, ভোগ না ধর্ম? যদি ভোগ হয়, তাহলে তুমি যে করেই হোক ওখান থেকে বেরিয়ে এস। কিন্তু মোক্ষ যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে কি রকম স্বামী হয়েছে, কোথাও কোন পরিবারে বিয়ে হয়েছে এগুলো আর তোমার কাছে কোন ব্যাপারই থাকবে না। তুমি শুধু পাতিব্রতা ধর্ম পালন করে যাও তাতেই তুমি মোক্ষের দিকে এগিয়ে যাবে। গীতায় যে ভগবান বলছেন, *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ*, এখানেও এই কথাই বলছেন, তুমি যেখানে যে পরিস্থিতিতে আছ সেখান থেকেই তোমার যা হওয়ার হয়ে যাবে।

অনেক আগেকার কথা। একজন নামকরা মহারাজ আশ্রমের অধ্যক্ষের সাথে কিছু ব্যাপারে অশান্তি হওয়াতে ঠিক করলেন আশ্রম থেকে হেডকোয়ার্টারসে চলে আসবেন। তিনি জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে নিয়েছেন। সেখানে একজন পুরনো ভক্ত ছিলেন। মহারাজ কাউকে কিছু বলেননি, ভক্তটিকে বললেন আমি কাল চলে যাচ্ছি, কাউকে কিছু জানাইনি। ভক্তটি খুব মিষ্টি করে বলছেন, আহা! মহারাজ, আপনাদের কি সৌভাগ্য, একটু রাগারাগি হল আর বোচকাবুচকি বেঁধে চলে যেতে পারছেন। আর আমরা কি অভাগা, আমার স্ত্রীর সাথে রোজই খোটাখুটি হয়, কিন্তু কোথাও আমাদের চলে যাওয়ার জায়গা নেই, ওরই মধ্যে পড়ে আছি। কথাটা শুনে মহারাজের চেতনা এল। সত্যিই তো, একজন সাধারণ মানুষকে কত কিই না সহ্য করে সংসারে থাকতে হয়। আমি তো সন্ন্যাসী আমার তো আরও বেশি সহ্য করার কথা। সন্ন্যাসী মানেই গৃহীদের থেকে সর্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, তাঁর সহ্য শক্তি বেশি, তার খাওয়া-দাওয়া কম, ভোগের বৃত্তি কম। সংসারীরা নিজেদের জন্য যে জিনিসগুলি কামনা করে, সন্ন্যাসীরা সেই জিনিসগুলো থেকে দূরে থাকে। আর সংসারীরা যে যে গুণকে বেশি শ্রদ্ধা করে, সন্ন্যাসীদের মধ্যে সেই গুণগুলো বেশি থাকবে। সমাজে যাদের সহ্য গুণ বেশি তাদের মানুষ শ্রদ্ধা করে, এই সহ্য গুণ সন্ন্যাসীর মধ্যে শতগুণ বেশি থাকবে। গৃহী ভক্তের কথাতে সন্ন্যাসীর চেতনা এসে যেতেই তিনি সব প্রোগ্রাম বাতিল করে ঐ আশ্রমেই থেকে গেলেন। পরে তিনি খুব নামকরা মহারাজ হয়েছিলেন। যদি ঈশ্বর দর্শনই কারুর উদ্দেশ্য হয় তাহলে তিনি বেলুড় মঠেই থাকুন বা কোন গুহাতেই থাকুন তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যাঁর কাছে মান-সম্মান, নাম-যশ বেশি গুরুত্ব তখন সব কিছু অন্য রকম হয়ে যায়। রামায়ণের কালে সীতা বা শ্রীরামের জন্য ধর্ম উপলব্ধিটাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য রামায়ণ পাতিব্রত ধর্মকে প্রচণ্ড গুরুত্ব দিচ্ছে। আবার মোক্ষমার্গের যাঁরা পথিক তাঁদের সন্ন্যাস ছাড়া কোন গতি নেই, সন্ন্যাস মানে গেরুয়া ধারণ করা নয়, সন্ন্যাস মানে পূর্ণ ত্যাগ। নিবৃত্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগ ছাড়া মোক্ষমার্গে চলা যায় না। অথচ বেশির ভাগ লোক বিয়েথা করছে, সংসার করছে, ঘরবাড়ি বানাচ্ছে, নানান রকম ভোগ্যবস্তু আহরণের জন্য দৌড়াচ্ছে। কেন করছে? কারণ সে বলেই দিচ্ছে আমার মধ্যে দুর্বলতা আছে, আমি একা একা থাকতে পারব না। শাস্ত্রও মেনে নিচ্ছে, ঠিক আছে তুমি একটা বিয়ে কর। কিন্তু ঐ পর্যন্তই তোমার ভোগের সীমা বাঁধা থাকবে, ওর বেশি লাফালাফি করা যাবে না। আগেকার দিনে বিধবাদের জন্য যে জীবনধারা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেখানেও এই একই চিন্তাভাবনা কাজ করত। আমরা তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, অন্য মেয়েরাও অপেক্ষা করে আছে, তোমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দিতে পারা যাবে না। প্রথম থেকেই ভারতকে ত্যাগের আদর্শের দিকে উৎসাহিত করে এসেছে, আর ত্যাগই ভারতের সনাতন আদর্শ এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব মানুষ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত নয়। জোর করে কাউকে সন্ন্যাসী বানিয়ে দিলে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। বৌদ্ধদের সময় ঠিক এটাই হয়েছিল। সেই সময় একটা পরিবার থেকে সন্ন্যাসী হওয়া খুব সম্মানের ব্যাপার ছিল। পরিবারের ছেলে সন্ন্যাসী হতে চাইছে না, কিন্তু বাবা-মা জোর

করে তাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু বানিয়ে দিত। এই ধরণের বহু ছেলেকে জোর করে বৌদ্ধ ভিক্ষু করে দেওয়া হত, ছেলেগুলো সন্ন্যাসী হয়ে থাকতে চাইছে না, তাদের ভেতরে পুরো মাত্রায় ভোগের ইচ্ছা থেকে গেছে। ফলে দেখা গেল, কিছু দিন শাস্ত্র অধ্যয়নাদি করে কিছু ভক্ত তৈরী করে লুকিয়ে তাদের বাড়িতে ভাত মাংস খেয়ে আসত, এরপর নারীসঙ্গেও জড়িয়ে যেত। কোন উপায় থাকত না, কারণ পূর্ণ ত্যাগ যে কোন সমাজে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কখনই সম্ভব নয়। সেইজন্য বাকীদের, যারা দ্বিতীয় স্তরের তাদের বলে দিলেন, তোমার মধ্যে দুর্বলতা আছে তাই তোমরা একটা compromise করে নাও। তুমি যদি ভোগ করতে চাও কেউ আটকাতে যাবে না, শূদ্র হয়ে জন্মাবে, সেখানে তুমি সব কিছু করতে পারবে।

হেগেল খুব নামকরা একজন জার্মান দার্শনিক ছিলেন। তিনি একটা উদ্ভট থিয়োরী নিয়ে এলেন, যার নাম দিলেন, Thesis, antithesis and synthesis। তাঁর বক্তব্য হল, একটা জিনিস চলছে, কিছু দিন পর দেখা যায় ওর প্রতিক্রিয়াতে তার ঠিক বিপরীত জিনিস এসে যায়, এটাকে বলছে antithesis, কিন্তু এটাও ঠিক নয়। যেমন পেণ্ডুলাম, পেণ্ডুলামকে টেনে একটা দিকে নিয়ে ছেড়ে দিলে অন্য দিকে চলে যাবে। এরপর দুলতে দুলতে একটা জায়গায় এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। যেখানে স্থায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলছেন synthesis। তাহলে তো সমাজ একটা জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। কম্যুনিস্টরা এই কথায় বলত, কারণ কম্যুনিস্টরা হেগেলের থিয়োরীর উপরই দাঁড়িয়েছিল। সমস্যা হল, কিছু দিন পরে এই synthesisটাই পরে thesis হয়ে যায়। ফলে ওর আবার একটা antithesis হবে। হেগেলের এই থিয়োরিটা পপুলার হয়ে যাওয়ার পর উনি সব কিছু নিজের অনুকূলে টানতে থাকলেন। যেমন হয়ত বলা হল হিন্দু ধর্ম থিসিস, বৌদ্ধ ধর্ম তার এ্যন্টিথিসিস আর খ্রীষ্টান ধর্ম হল সিনথেসিস, তার মানে দাঁড়াল খ্রীষ্টান ধর্ম শ্রেষ্ঠ, এটা বোঝানর জন্য বলা হল। হেগেল পুরোপুরি ভুল বলছেন তা নয়, জিনিসটা এই রকমই হয়। একটা জিনিসকে যদি খুব চেপে রাখা হয়, যখন ওকে ছাড়া হবে তখন বুম্ করে তার উল্টো দিকে যাবে। কিন্তু উল্টোদিকে গিয়েও ওখানে সে থাকতে পারবে না। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। গায়ের জোরে সবাইকে এখানে ধার্মিক বানিয়ে রেখে দিয়েছিল, স্বাধীনতা আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া আসাতে ভারতের সব কিছুই এখন অন্য দিকে যেতে শুরু করেছে। এখন যে এটাকে আটকাতে যাবে সে মরবে, না মরলেও কেউ তাকে পাত্তা দেবে না। তাহলে কি এই অবস্থা ভারতে চিরস্থায়ী হয়ে চলবে? কোন দিন চলবে না। কারণ ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ, ধর্মপ্রাণ দেশ কখনই ভোগবাদ নিয়ে বেশি দিন চলতে পারবে না। কিন্তু এটা জানা কথা যে, ধর্মপ্রাণ দেশে ধর্মকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তখন মানুষ ভোগের দিকে যাবেই, কিছু করার থাকবে না। সেইজন্য যাদের ভোগের বৃত্তি আছে তাদের বলা হয় তাড়াতাড়ি ভোগটা মিটিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে এস।

এখানে যে পাতিব্রতার কথা বলা হচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে ধর্মই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যদি ধর্মই উদ্দেশ্য হয়। যাদের ধর্ম উদ্দেশ্য না হয় তখন দ্বিতীয় স্তরের মানুষদের বলা হয়, সমাজের রক্ষার জন্য তোমাকে এই এই ভাবে চলতে হবে। আর তৃতীয় স্তরের যারা তারা বলছে আমার ভোগ চাই। আমাদের ঋষিরা এদের জন্যও পথ তৈরী করে দিয়েছেন, তুমি শূদ্র শ্রেনীতে চলে যাও, এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ হয়েই থাকব আর ভোগ করব শূদ্রের মত, এ জিনিস কোন ভাবেই চলতে দেওয়া যাবে না। তাহলে তোমাকে কলি যুগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, এখন চারিদিকে তাই হচ্ছে। সবাই সব কিছুই করে যাচ্ছে, যা খুশি করে যাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের একটা মূল সুর থাকে, জীবনের সুর যদি ধর্মের সুরে বাঁধা হয়ে থাকে তাহলে তোমার জন্য পাতিব্রত ধর্মই সঠিক। রামায়ণ আর মহাভারতে যে পাতিব্রতা ধর্মের একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে এটা পুরোপুরি ঠিক। কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি ধর্ম পালন করব কিন্তু আমার স্বামী সব দিকেই অপদার্থ, আমি অন্য একটা পথ নিচ্ছি। এতে দোষের কিছু নেই, এই যে সামান্য একটু ধর্ম পরিবর্তন করছে এটাকে নিয়ে হিন্দু ধর্ম কোন দিনই আপত্তি করত না। আমাদের বলা হয় বাবা-মার সেবা করলেই ধর্ম পালন হবে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো অল্প বয়সেই বাবা-মাকে ত্যাগ করে চলে আসছেন। এটাই বলা হচ্ছে, একটা কি দুটো ধর্মের পরিবর্তনে হিন্দুরা কখনই আপত্তি করত না। হিন্দী সাহিত্যের খুব নামকরা লেখিকা মহাদেবী বার্মা। তিনি বিবাহিতা কিন্তু কোন দিন স্বামীর সঙ্গে থাকলেন না, নিজেকে পুরোপুরি সাহিত্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আরও আশ্চর্যের যে, মহাদেবী বার্মা স্বামীকে বলে দিলেন, আমি তো আপনার সাথে থাকতে পারব না, আপনি আরেকটা বিয়ে করে নিন। ভদ্রলোকও আর বিয়ে করলেন না। একটা দুটো ধর্মের পরিবর্তনে হিন্দু ধর্ম কখনই বাধা দেয় না। তাঁরা বলে দিচ্ছেন, তুমি একটা পথ নিয়ে নাও। একজন গৃহবধুর সব থেকে ভালো ও সহজ পথ

হল পাতিব্রতার পথ। কিন্তু সে যদি বলে দেয় আমি পাতিব্রতা ধর্ম পালন করতে পারব না। ঠিক আছে না করলে, কিন্তু একটা কিছুকে তো তোমায় ধরতে হবে, না ধরলে আর তুমি জীবনে এগোতে পারবে না। সাধনা মানেই একটা জিনিসকে অনেক দিন যাবৎ ধরে রাখা। এরপর অনুসূয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ভেতরে আপ্যায়ন করে নিয়ে এসে ভোজনাদি করালেন। অনুসূয়া হাতজোড় করে বলছেন –

রাম ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত-
স্তত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া।।২/৯/৯২

হে রাম! আপনি সম্পূর্ণ ত্রিলোক এবং ত্রিলোকের সব কিছু রচনা করে এর *সংরক্ষণায়*, রক্ষা করার জন্য আপনি নিজেই দেবতা, মানুষ ও তির্যকাদি শরীর ধারণ করেন। অবতারের কথা বললেই আমরা মনে করি শ্রীরামচন্দ্র অবতার, শ্রীকৃষ্ণ অবতার। আসলে তা নয়, সংসারকে রক্ষা করার জন্য ভগবান নিজেই নানান রূপ ধারণ করেন। রক্ষা করার জন্য যে তিনি শুধু মানব দেহই ধারণ করেন তা নয়, দেবতার শরীরও ধারণ করেন আবার তির্যক অর্থাৎ নিম্ন শ্রেনীর যোনির শরীরও ধারণ করেন, যেমন ভগবান কচ্ছপের শরীর ধারণ করেছিলেন, মৎস্যাবতার হয়েও এসেছিলেন। আমরা মানব ইতিহাসটুকুই জানি, অন্যান্য জীবজন্তু মধ্যেও যে নিরাপত্তার ব্যাপার চলছে সেটা আমরা জানি না। বোধিসত্ত্বের কাহিনীতেই আমরা দেখছি ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন জন্মের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিবর্তিত হয়ে হয়ে ভগবান বুদ্ধ হলেন, কখন তিনি বানর হয়ে জন্মেছেন, কখন হাতি হয়ে জন্ম নিয়েছেন, সেখানেও এই একই ধারণা কাজ করছে। এখানে বলছেন হে রাম! আপনি বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন। কিসের জন্য ধারণ করেন? তিনটে ভুবনকে রক্ষা করার জন্য।

সৃষ্টি করে তিনি সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন। পুরো জিনিসটাই একটা সাম্য অবস্থায় থাকে। কোন প্রজাতি যখন ঐ সাম্য অবস্থাকে বিগড়াতে শুরু করে, একটু পর আর তাকে সামলানো যায় না, তখন তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ঐ সাম্য অবস্থাকে রক্ষা করার জন্য ভগবানকে নিজেই আসতে হয়। যেমন ইদানিং কালে সব থেকে ধুরন্ধর বদমাইশ প্রজাতি হল মানুষ। পপুলেশান বেড়েই যাচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে যাচ্ছে আর এক অপরকে মেরে যাচ্ছে। পৃথিবীর যে একটা ভারসাম্য আছে, এই ভারসাম্যকে মানুষ পুরো বিগড়ে দিচ্ছে। এই মানুষকে এখন কে সামলাবে? পৃথিবীতে এমন কোন যোনি নেই যে মানুষকে সামলাবে। দেবতারা কবেই পালিয়ে গেছে। অসুরও কোথাও পাওয়া যায় না, অসুররাই মানব রূপে এসে গেছে। সাপ, বিছে, কত রকমের ভাইরাস এরা আর টিকতে পারছে না, মানুষ পটাপট সবাইকে মেরে দিচ্ছে। এবার ভগবানকে নিজেই নামতে হবে। কোথাও একটা বিচিত্র রূপ ধারণ করবেন, কি রূপ ধারণ করবেন ভগবানই জানেন। মানব জাতি এখন মৃত্যুর খাদের সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যখন কোন প্রজাতি বেশি ক্ষমতা পেয়ে অন্য প্রজাতিদের অস্তিত্ব নাশের কারণ হয় তখনই ভগবান নিজে নেমে আসেন ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য। ইদানিং এই পরিস্থিতি মানুষ তৈরী করে দিয়েছে। অসুরগুলো যখন দেবতাদের মারে, অসুর রাক্ষসরা যখন মানুষদের মারে তখন ভগবান আসেন। কিভাবে আসেন? বলছেন, তিনি তখন দেবতা, মানুষ, তির্যকাদি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করেন। অথচ মজার হল, ভগবান কখনই ঐ যোনির গুণে লিপ্ত হন না।

আর বলছেন *অখিলমোহকরী চ মায়া*, যে মায়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে রেখেছে সে মায়াও আপনাকে ভয় পায়। এখানে একটা সূক্ষ্ম কাব্যিক ভাব আনছেন। যেমন যদি কবিতায় বলি অন্ধকার আলোকে কেমন ভয় পায়, অন্ধকার বলতে বোঝায় আলোর অনুপস্থিতি, যেখানে আলো নেই সেখানেই অন্ধকার। এটাই যদি কবিতায় বর্ণনা করা হয় তখন বলবে, অন্ধকার আলোকে কেমন ভয় পায়। এখানেও ঠিক এভাবেই বলছেন, মায়া ঈশ্বরকে ভয় পায়। কিন্তু যেখানেই ত্রিগুণাতীত থাকবে না সেখানেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি এসে যায়। যেখানেই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের অভাব সেখানেই জাগতিক জ্ঞান এসে যাবে। এই বলে এখানেই অযোধ্যাকাণ্ড শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় অরণ্যকাণ্ড।

অরণ্যকাণ্ড

সেই রাত্রি অত্রি মুনির আশ্রমে অতিবাহিত করার পর পরের দিন প্রভাতে স্নানাদি করে শ্রীরামচন্দ্র বিদায় নিতে যাচ্ছেন। তিনি অত্রি মুনিকে বললেন, আমরা দণ্ডকারণ্য যেতে চাই, আপনি আমাদের অনুমতি করুন এবং কয়েকজন শিষ্যকে আমাদের পথ প্রদর্শকের জন্য আদেশ করুন। শ্রীরামচন্দ্রের কথা শোনার পর অত্রি মুনি খুব সুন্দর কথা বলছেন –

সর্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ।
তথাপি দর্শায়ষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ।**৩/১/৪**

হে রঘুবীর! আপনি হলেন *সর্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং*, সমস্ত প্রাণীর *মার্গদ্রষ্টা* আপনি, আপনিই সবাইকে মুক্তির পথে নিয়ে যান। *তব কো মার্গদর্শকঃ*, আপনাকে কে পথ দেখাবে? মানুষকে পথ দেখায় বুদ্ধি, বুদ্ধিকে পথ দেখায় শাস্ত্র ও গুরু। আর সচ্চিদানন্দই গুরু রূপে আসেন, সচ্চিদানন্দই শাস্ত্র রূপে আসেন। সুতরাং জগতে ভগবান ছাড়া কেউই পথ দেখান না। রাস্থায় আমি কাউকে জিজ্ঞেস করছি দাদা এই বাস কি শ্যামবাজার যাবে। সে যে আমাকে উত্তর দেবে সেটাও ভগবানেরই দেওয়া। শ্যামবাজার আমাদের পূর্ব দিকে আছে, হাওড়া স্টেশন উত্তর দিকে আছে, এগুলোকে তিনিই ওখানে স্থির করে রেখেছেন। যদি এমন হয়, একদিন সকালে হাওড়া স্টেশনটা চন্দননগরে চলে গেছে। আমি হাওড়ার টিকিট কাটতে যাচ্ছি কাউন্টার থেকে বলে দিল আজকে হাওড়া স্টেশন চন্দননগরে আছে। এরকম হচ্ছে না কেন? ভগবান এগুলোকে স্থির করে রেখেছেন। তিনিই ঠিক করে দিয়েছেন কোন জায়গা কোথায় থাকবে। আর কোন বাস, কোন ট্রেন কোথায় যাবে এগুলো ঠিক করছে বুদ্ধি। বুদ্ধি বিভিন্ন শাস্ত্র দিচ্ছে, ভূগোলও শাস্ত্র, ফিজিক্সও শাস্ত্র, সব ভগবান থেকেই আসে। আপনি হলেন সবার মার্গদর্শক। কিন্তু আমার শিষ্যরা অবশ্যই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। *তব লোকানুসারিণঃ*, কারণ এই লোকব্যবহার আপনিও পালন করেন সেইজন্য আমরাও পালন করব। অবতারের লোকব্যবহার কখনই পাল্টায় না। ঠাকুর অবতার রূপে যখন কামারপুকুর গ্রামে শরীর ধারণ করেছেন তখন তাঁর লোকব্যবহার গ্রামের মতই হবে, ভাষাও গ্রামের লোকেদের মতই হবে। তিনি যে বিবাহ করলেন, সেখানেও স্ত্রীর সাথে তাঁর লোকব্যবহার থাকবে। ঠাকুর বলছেন, গঙ্গা স্নান করলে সব পাপ চলে যায় কিন্তু কানাত্ব ঘুচবে না। কানাত্ব হল লোকব্যবহার আর পাপ চলে যাওয়াটা হল ধর্মের শেষ গতি। শ্রীরামচন্দ্র সব কিছুর মার্গদর্শক, কিন্তু জগতে যখন এসেছেন তখন তাঁকেও লোকব্যবহার অনুসরণ করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে তীর লাগলে তাঁরও ব্যাথা অনুভব হবে। বাইবেলে বর্ণনা আছে, যীশু ক্রুশিফাইড হয়ে আছেন, সেই অবস্থায় উনি বলছে, আমি তৃষ্ণার্ত। খ্রীশ্চানরা এই জিনিসটাকে কখন ব্যাখ্যাই করতে পারে না। কারণ ভগবানের আবার তৃষ্ণা কোথা থেকে আসবে! আমাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়, আমাদের কাছে হবে *লোকানুসারিণঃ*, ভগবান যখন যীশু হয়ে মানব রূপ ধারণ করেছেন তখন তাঁর ব্যবহার মানুষের মতই হতে হবে। তিনি যখন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন তখন ওনারও কষ্ট অনুভব হচ্ছে, ওনারও জলতেষ্টা পাচ্ছে। ঐ কষ্টের অনুভব সম্পূর্ণ বাস্তব, তৃষ্ণার্ত হওয়াটাও পুরোপুরি বাস্তব। কিন্তু এর জন্য তাঁর বাস্তবিক সত্তা কখন প্রভাবিত হবে না। কষ্টের জন্য তিনি যে একে তাকে গালাগাল দেবেন তা কখনই হবে না। যদিও বা দেন সেটাও আসল, কোন অভিনয় করছেন না। অত্রি মুনি এটাই বলছেন, আপনি যেমন লোকব্যবহার করেন আমরাও লোকব্যবহার পালন করব। পুরো রামায়ণ জুড়ে দেখা যাবে যাঁরা জ্ঞানী তাঁদের মুখ দিয়ে লোকব্যবহারের কথা বলাচ্ছেন।

এরপর কয়েকজন শিষ্যকে পথ প্রদর্শনের আদেশ দিয়ে অত্রি মুনি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগমন করলেন। অনন্তর রাম প্রীতভরে অনুগমন করতে নিষেধ করাতে অত্রি মুনি আশ্রমে প্রত্যাগমন করলেন। শ্রীরাম সেখান থেকে একশ ক্রোশ যাওয়ার পর মহতী নদী দেখতে পেলেন। এই নদীর ওপার থেকেই দণ্ডকারণ্যের শুরু। অত্রি মুনির শিষ্যরা সবাইকে নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়েছেন। এবার শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সহ ভয়ঙ্কর গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলেন। ভয়ঙ্কর এই জঙ্গল একদিকে যেমন হিংস্র বন্যপশুদের বাসস্থান তেমনি রাক্ষসরাও আছে আর অন্য দিকে ঋষিরাও আছেন, যাঁরা ঐ জঙ্গলে তপস্যায় রত।

শ্রীরামের কাছে থেকে অত্রি মুনির শিষ্যরা সানন্দে বিদায় নিয়ে আশ্রমে ফিরে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ঝিল্লীর ঝঙ্কারে নিনাদিত, বিচিত্র মৃগকুল দ্বারা আকীর্ণ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তু এবং বিকটাকার রাক্ষসগণের লীলাভূমি ঘোরতর অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হলেন। ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করার পর শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন –

ইতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে।
ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ।
অগ্রে যাস্যাম্যহং পশ্চাতমন্বেহি ধনুর্ধরঃ।৩/১/১২
আবয়োর্নধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ।৩/১/১৩

লক্ষ্মণ! এরপর থেকে আমার সাথে খুব সাবধানে চলতে হবে। ধনুতে দড়িটা লাগিয়ে রাখবে। সাধারণ অবস্থায় লাগিয়ে রাখা হয় না। ধনু আর বাণ একসাথে লাগিয়ে রাখবে, কারণ হঠাৎ কোন পশু আক্রমণ করে বসবে, কোন রাক্ষস এসে যেতে পারে কোন ঠিক নেই। এইভাবে আমি আগে আগে যাচ্ছি আর তুমি শরাসন হাতে আমার অনুগমন কর। এরপরের শ্লোকে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, অধ্যাত্ম রামায়ণে আসার জন্য পরবর্তিকালে যত ভক্তি শাস্ত্র, যত রামকথা এসেছে সব জায়গায় এই সুন্দর জিনিসটা এসে গেছে। বলছেন, আত্মা আর পরমাত্মার মাঝখানে যেমন মায়া থাকে, তোমার আর আমার মাঝখানে ঠিক সেইভাবে সীতা যাবে। রামচরিতমানসে তুলসীদাসও এই জিনিসটাকেই খুব সুন্দর ভাবে বলছেন – *আগেঁ রাম অনুজ পুনি পাছেঁ। মুনি বর বেষ বনে অতি কাছেঁ।।* রাম আর লক্ষ্মণ দুজনের তাপস বেশ, রাম আগে আগে যাচ্ছেন আর তাঁর পেছনে লক্ষ্মণ চলেছেন। তারপর বলছেন, *উভয় বীচ শ্রী সোহই কৈসী*। রাম আর লক্ষ্মণের মাঝে সীতার অবস্থান কেমন শোভা দিচ্ছে? বলছেন, *ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী।।* ব্রহ্ম আর জীবের মাঝখানে মায়া যেমন রাম আর লক্ষ্মণের মাঝখানে সীতাকে ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে। সেটাই এখানে বলছেন, আত্মা আর পরমাত্মার মাঝখানে মায়া যেভাবে থাকে আমার আর তোমার মাঝখানে সীতা ঠিক সেইভাবে যাবে।

এই শ্লোকের উপর বড় বড় পণ্ডিতরা ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাখ্যা করে যেতে পারেন। তবে উপমার সাহায্যে আত্মা আর পরমাত্মার মাঝখানে মায়া এই জিনিসটাকে যদি মানুষ বুঝতে যায় তখন অনেক রকম সংশয় তৈরী করে দেবে। আমরা জানি শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ, লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ আর মাঝখানে সীতাও সাক্ষাৎ। মনে হবে আত্মা একটি সত্তা, পরমাত্মা একটি সত্তা আর মাঝখানে মায়া আরেকটি সত্তা। তুলসীদাসের চৌপাঈয়ের একটা জায়গায় পরে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, যেতে যেতে লক্ষ্মণ মাঝে মাঝে দাদাকে দেখতে চাইছেন, সীতা বুঝতে পেরে থেকে থেকে মাঝখান থেকে সরে যাচ্ছেন, লক্ষ্মণ তখন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে পারছেন। এখানে বলতে চাইছেন আত্মা যদি পরমাত্মার দিকে যেতে চায় তখন মায়া যদি পথ ছেড়ে দেয় তবেই পরমাত্মাকে দেখতে পায়। সীতা মাঝে মাঝে যে পথ ছেড়ে দিচ্ছেন তবেই লক্ষ্মণ দাদাকে দেখতে পারছেন। শ্লোকটি খুব জটিল, কারণ খুব সহজ ভাবে একটা তত্ত্বকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অনেক ধরণের দর্শন এখানে খুলে যাচ্ছে। কারণ বেদান্ত মতে আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে কোন ভেদ নেই এবং বস্তুত মায়া বলতেও কিছু নেই। এমনিতে মায়া আছে, আমাকে যে পরম জ্ঞান থেকে আলাদা করে রেখেছে, এই মায়াই আলাদা করে রেখেছে। কিন্তু আমি একটা সত্তা, পরমাত্মা আরেকটি সত্তা আর মাঝখানে মায়া অন্য আরেকটি সত্তা, জিনিসটা তা নয়। এখানে একটা উপমা নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ, যাদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধি প্রখর হয়নি, শাস্ত্রের বাক্য বোধগম্য করার মত বুদ্ধি যাদের খোলেনি তারা এভাবেই ঈশ্বর আর নিজেকে দেখে। আমি আছি ঈশ্বর আছেন, আমাদের মাঝখানে আছে মায়া। প্রায়ই মায়াকে মোহের সাথে এক করে ফেলা হয়, সেই থেকে এসে গেছে মোহমায়া। ঠাকুর বলছেন কামিনী-কাঞ্চনই মায়া, আমাদের মধ্যে যে নানা রকমের প্রলোভন, লোভ, কামনা-বাসনা এটাই মায়া। বেদান্ত মতে মায়া মানে অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যাও মায়ার মত টেকনিক্যাল শব্দই হয়ে যায়। কিন্তু মায়াকে আমাদের স্তরে অনুবাদ করে বোঝাতে হলে ঠিক ঠিক শব্দ হবে অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে নিজের স্বরূপের জ্ঞানের অভাব।

অদ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে সব জ্ঞান, সব শক্তি আমারই ভেতরে। আমরা যা আছি সেটা না হয়ে অন্য কিছু হয়ে যাওয়াটাই দুর্বলতা। শৈশবকাল থেকে আমরা যে শিক্ষাদীক্ষাতে বড় হয়েছি তাতে আমরা প্রথমেই মেনে নিয়েছি যে আমি অজ্ঞান আর আমি দুর্বল। এই অজ্ঞান আর দুর্বলতাকে সরাবার জন্য এবার জ্ঞান বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, শক্তিও বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে। জ্ঞান আর শক্তি অর্জন করার জন্য বাজারে 'How

to' করে কত রকমের বই ছড়িয়ে আছে – How to get strength, How to think positive, How to win successful, How to do this, How to do that কারণ আমাকে শক্তিটা বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হবে, তখন তো হাও টু করতেই হবে। বেদান্ত মতে এভাবে হয় না, আমার ভেতরেই সব শক্তি, সব জ্ঞান আছে কিন্তু আমি হাজারটা জিনিসের সাথে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছি। এই হাজারটা জিনিসকে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। শক্তি আমার ভেতরেই আছে, কিন্তু আমি গায়ের জোরে নিজেকে দুর্বল করে রেখেছি। শক্তিটাই আমাদের স্বভাব দুর্বলতা কখনই স্বভাব নয়। সেইজন্য strengthএর real meaning হয় to be yourself। তুমি যা তুমি তাই। এই জ্ঞান যদি হয়ে যায় তাহলে সে সর্বশক্তিমান হয়ে যাবে। যিনি শক্তিমান তিনি যা তিনি তাই থাকবেন। কিন্তু সব সময় আমরা যেটা নয় সেটাই হতে থাকি। কেউ আমাকে একটা কটূ কথা বলে দিল সঙ্গে সঙ্গে আমার পুরো ব্যক্তিত্বটা ক্রোধে পরিণত হয়ে গেল। কোন ক্ষমতাশালী লোক আমাকে একটু হম্বিতম্বি দেখাল আমি সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে গেলাম। আমি যেটা নই সেটাই হয়ে যাচ্ছি, ফলে আমার স্বাভাবিক অবস্থাকে জানতেই পারছি না। তার মানে real meaning of strength হয় না, তুমি strong আছই, real meaning of weakness হয়। Real meaning of weakness মানে তুমি যেটা নও সেটা যখন হয়ে যাও। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তা বা দর্শনের বিচারে আমি যেন একটা খালি পাত্র, এর মধ্যে জ্ঞান ঢালতে হবে, শক্তি ভরতে হবে। তখন আবার ভাবতে হবে ঐ শক্তিকে কিভাবে নিয়ে আসা যায়। কিন্তু বেদান্ত মতে তুমি আগে থেকেই পূর্ণ, সর্বশক্তিমান হয়ে আছ, কারণ তুমি শুদ্ধ আত্মা। আগে থেকেই সব জ্ঞান তোমার মধ্যেই আছে। কিন্তু তুমি এমন এমন জিনিসের সাথে নিজেকে জুড়ে রেখেছ যার জন্য ঐ জ্ঞানের মধ্যে আবরণ পড়ে গেছে। আবরণ সরিয়ে দিলেই হয়ে গেল। তখন কি হবে? কিছুই হবে না, তুমি যা তাই হয়ে যাবে। তোমার যে পঞ্চাশটা জিনিসের সাথে identification হয়ে আছে সব identification চলে গেলে তোমার মধ্য থেকে সব শক্তি বেরিয়ে আসবে, সব জ্ঞান ভেসে উঠবে। বেদান্ত মতে আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে কোন বিভেদ নেই। যে কোন রূপে দ্বৈতভাব যখনই এসে যাবে, তা বৈষ্ণব রূপে আসুক, ইসলাম রূপেই আসুক তখন অনেক রকম সমস্যা দাঁড়িয়ে যায়। সেখানে আত্মা অপূর্ণ পরমাত্মা পূর্ণ, পরমাত্মা থেকে শক্তি টেনে এনে আত্মাতে ভরতে হবে, এটাই তখন একটা লম্বা process হয়ে যায়। আত্মা পরমাত্মা আলাদা কিনা, আত্মা পরমাত্মা এক কিনা এই নিয়ে তর্কের শেষ নেই। আত্মা আলাদা পরমাত্মা আলাদা হয়ে গেলে মাঝখানের এই বিভেদটাও সত্য হয়ে যায়। এর সাথে অনেক ধরণের সমস্যাও আসতে শুরু হয়ে যাবে। অন্য দিকে অদ্বৈতকে নিলে আমাদের বাস্তবিক জীবনের সাথে অনেক গরমিল দেখা যায়। সেখানে আরেক ধরণের সমস্যা দেখা যাবে। কোন দর্শন যদি পূর্ণ হত তাহলে অন্য কোন দর্শন থাকতই না। একটা পথই যদি সঠিক হত তাহলে অন্য কোন পথের কথা আসতই না। আমরা জানি, যদি একটাই একমাত্র ঠিক পথ হয়, মানুষ তখন কখনই অন্য পথ দিয়ে যাবে না। ধর্ম ও দর্শনের সব পথেই কিছু না কিছু গোলমাল থাকবে। অদ্বৈত দর্শনের সব থেকে বড় ফাঁক হল দৈনন্দিন জীবনে গিয়ে অনেক রকম সমস্যা আসে। স্বামীজী এই সমস্যাগুলোকে দূর করার জন্য practical vedantaএর কথা বলছেন, সেখানে তিনি পরিষ্কার বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে বেদান্তকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু খুব সাধারণ স্তরে এই ধারণাই প্রথম থেকে চলে আসছে – আমি আলাদা আর ঈশ্বর আলাদা, আমার আর ঈশ্বরের মাঝখানে যেন একটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এখানে শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ মাঝখানে সীতা যেন দেওয়াল। কিন্তু এই দেওয়াল যে খুবই শক্ত আর একেবারেই যে অলঙ্ঘনীয় তা নয়। তিনি কৃপাময়ী, যখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে চাইছেন তখনই তিনি পথ ছেড়ে দিচ্ছেন। এটাকেই বেদান্তে বলছে অজ্ঞান। এই অজ্ঞান কাল্পনিকই হোক আর বাস্তবিকই হোক, দৈনন্দিন জীবনে দেখছি আমি ক্ষুদ্র ঈশ্বর মহৎ, নিজেকে অজ্ঞান দেখিছ আর ঈশ্বর সদা সর্বদা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। কোথাও একটা বিভেদ রয়েছে, অথচ এও ভাবছি যে আমার ভেতরে কোথাও ঈশ্বরের একটা অংশ রয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ এখানে খুব সুন্দর একটা বাস্তব জিনিসকে উপমা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

বিরাধের শাপমুক্তি

শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলছেন, হে লক্ষ্মণ! তুমি চারিদিকে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, কখন কোন রাক্ষস এসে কি করে দেবে আমরা জানি না। খুব সতর্ক ভাবে একটু একটু করে ভেতরের দিকে এগোচ্ছেন। কিছু দূর যেতেই হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর রাক্ষস সামনে এগিয়ে এসেছে। আমরা কাহিনীর মধ্যে বেশি যাচ্ছি না। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাবধাণ করে দিলেন আর সীতাকে বললেন তুমি ভয় পেয়ো না। সীতা এই প্রথম শ্রীরামের পৌরুষের সাথে

পরিচয় হচ্ছেন। ধনুর্ভঙ্গের সময় সীতা সেখানে ছিলেন না, যদিও রামচরিতমানসে সীতাকে হাজির করানো হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ আর অধ্যাত্ম রামায়ণে সীতা ধনুর্ভঙ্গের সময় ছিলেন না। শ্রীরাম তাই সাবধান করে বলছেন, তুমি ভয় পেয়ো না। কারণ এখন যে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এই ধরণের ঘটনার সাথে সীতা অভ্যস্ত নয়।

রাক্ষসটা এগিয়ে এসে একটা বিকট অট্টহাসি দিয়ে বলছে হে বালকরা! শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের তখনও খুব বেশি বয়স হয়নি, তোমরা একদিকে জটাবল্কল ধারণ করে মুনির বেশে আছ অন্য দিকে দেখছি শরতুণীরও সাথে রেখেছ আবার দেখছি সঙ্গে রমণীও আছে, পুরো জিনিসটাই গোলমেলে লাগছে। তোমরা কি সুন্দর, কত কোমল শরীর, আমার মুখের গ্রাস হবার একেবারে উপযুক্ত। এগুলোকে বলে বিভৎস রস, বিভৎস রস দিয়ে পাঠকের মনে একটা ঘৃণার ভাব তৈরী করে দিচ্ছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন খুব মিষ্টি করে বলছেন, আমার নাম রাম, আমার ছোট ভাইয়ের নাম লক্ষ্মণ আর এই হল আমার প্রাণপ্রিয়া সীতা। একদিকে শ্রীরামচন্দ্র মিষ্টি করে নিজের পরিচয় দিলেন, অন্য দিকে রাক্ষসকে সাবধান করে দিয়ে বলছেন, আমার বাবা আমাকে জঙ্গলে পাঠিয়েছেন তোমার মত দুষ্টদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। শ্রীরামের কথা শুনে তখন রাক্ষস হুঙ্কার দিয়ে বলছে, রাম তুমি আমাকে জান না, আমি হলাম লোকপ্রসিদ্ধ বিরাধ। আমার ভয়ে এখানে যত ঋষি-মুনিরা ছিল সবাই পালিয়ে গেছে। কেউ নেই তাই জঙ্গলও গভীর হয়ে গেছে। মানুষজন থাকলে কিছু না হলেও চলাচলের জন্য গাছাপালা কেটে রাস্থা করে নেয়। কিন্তু বিরাধের হিংস্রতার ভয়ে ঋষি-মুনিরা সবাই জঙ্গল থেকে পালিয়ে গেছে। বিরাধ তখন বলছে, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে এক কাজ কর, তোমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে এখানে ছেড়ে দাও আর তোমাদের সব অস্ত্র ত্যাগ করে এখান থেকে পালাও। আর তা যদি না কর আমি তোমাদের দুজনকেই ভক্ষণ করে নেব। এই বলে রাক্ষস সীতাকে গ্রহণ করবার জন্য সীতার দিকে দুটো বাহু বাড়িয়ে এগিয়ে এল। বিরাধকে আসতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র হাসতে হাসতে অবলীলাক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দ্বারা রাক্ষসের দুটো হাত ছেদন করে ফেললেন। তীর অনেক রকমের হয়, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ খুরের মত হয়। দুটো হাত কেটে দিতেই বিরাধ স্বাভাবিক ভাবেই প্রচণ্ড রেগে গেছে। রেগে গিয়ে সীতাকে ছেড়ে বিকট ভাবে মুখটা হাঁ করে শ্রীরামের দিকে ধাবিত হল। আসলে এখানে কেউই বেশি দূরে থাকার কথা নয়। কারণ কথাবার্তা যখন চলছে তখন কেউই বেশি তফাতে নেই। রাক্ষসকে এগিয়ে আসতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র তখন বাণ দ্বারা তার দুটো পাও ছেদন করে দিলেন। বিরাধের এখন হাতও নেই পাও নেই। ঐ অবস্থায় সে সাপের মত মুখ ব্যাদান করে শ্রীরামের দিকে এগিয়ে এল। তখন শ্রীরামচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ দিয়ে রাক্ষসের প্রকাণ্ড মস্তকটা ছেদন করে দিলেন। মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়তেই সীতা দৌড়ে এসে শ্রীরামকে আলিঙ্গন করেছেন। শ্রীরামচন্দ্রের শরীর একটা সাধারণ মানুষের শরীরের আকারের আর রাক্ষসের শরীর সেই তুলনায় বিশাল। জানকী প্রথম দেখছেন শ্রীরামচন্দ্র একা এই বিশালাকার রাক্ষসকে কিভাবে বধ করে দিলেন। এর পরেও অনেক রাক্ষস বধ করবেন সেগুলোও সীতা দেখবেন। কিন্তু এখান থেকে তার শুরু হল।

হঠাৎ সবাই প্রত্যক্ষ করলেন স্বর্গে অনেক রকম বাদ্য ধ্বণি হতে শুরু করেছে, অপ্সরারা আনন্দে নৃত্য করতে লাগল এবং গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ গান করতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় সবাই দেখছেন বিরাধের শরীর থেকে তপ্ত কাঞ্চন অতি সুন্দর আকৃতির এক পুরুষ বেরিয়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে লুটিয়ে পড়ল। ধুলোতে গড়াগড়ি দিয়ে বারংবার প্রণাম করছে। তখন বিরাধ বলছে হে রাম! আমার নাম বিমলপ্রকাশ বিদ্যাধর। বিদ্যাধররা অনেক রকম বিদ্যা জানে, বিদ্যাধরদের কাছে জাদুশক্তি ও অনেক রকম সিদ্ধাই থাকত। বিরাধ বলছে, অকারণ ক্রোধে আমি দুর্বাসা মুনির অভিশাপে পড়ে গিয়েছিলাম। এমনই অভিশাপ ছিল যে আমি এই শরীর থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছিলাম না। আপনি এসে আমাকে আজ শাপমুক্ত করে দিয়েছেন।

ইতঃপরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ স্মৃতি সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
তন্নামসংকীর্তনমেব বাণী করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্।৩/১/৩৮
কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে পাদারবিন্দার্চ্চমেব কুর্য্যাৎ।
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবম্।৩/১/৩৯

রাক্ষস যোনিতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে কিন্তু এবার থেকে সংসারে শান্তি পেতে আপনার শ্রীচরণ-কমল সর্বদা যেন আমার স্মরণে থাকে, আমি যেন সদা সর্বদা আপনার নাম সংকীর্তন করতে পারি আর আমার কর্ণদ্বয় যেন আপনার অমৃতকথা শ্রবণ করে, করযুগল যেন আপনার শ্রীপাদপদ্মের অর্চনাতেই নিযুক্ত থাকে,

মস্তক যেন আপনার পদযুগলে প্রণামে নিরত থাকে। বিরাধ কি কি করতে চাইছেন? স্মৃতি অর্থাৎ বুদ্ধি যেন আপনার পাদপদ্মের স্মরণ করতে পারে, বাণী যেন সব সময় আপনার নাম নিতে থাকে, কর্ণ আপনার কথামৃত পান করবে অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কোন কথা শুনবে না, হাত ভগবানের পূজা ও অর্চনাতেই যেন নিরত থাকে আর শির প্রভুর চরণে নত থাকবে।

নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে।
আত্মারামায় সীতারামায় বেধসে।৩/১/৪০

বিরাধ বলছে, হে রাম আপনাকে প্রণাম করি। কি ভাব নিয়ে প্রণাম করব? *বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে*, আপনি বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তি। ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত তিনটে জ্ঞানেরই কথা বলছেন তার সাথে নিজেরও জ্ঞান আছে আর জগতেরও জ্ঞান আছে। একমাত্র আত্মজ্ঞানীই নিজেকে জানেন আর জগতকেও জানেন। অজ্ঞানী নিজেকে তো জানেই না আর সংসারকে জানার চেষ্টা করে কিন্তু জানতে পারে না। গীতায় ভগবান বলছেন *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।* হে অর্জুন! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন কালের সমস্ত ভূতকেই আমি জানি, কিন্তু আমাকে কেউই জানতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রকে বিরাধ ঠিক এভাবেই বলছেন আপনি হলেন বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তি। আত্মারাম, আপনার যে নিজের স্বরূপ, সেই স্বরূপে রমণ করেই আপনি আনন্দ পান। *সীতারামায় বেধসে*, সীতারাম রূপে আপনিই আছেন, আপনিই এই জগতের বিধাতা, আপনাকে প্রণাম। আত্মারাম শব্দ শাস্ত্রে প্রায়ই আসে। যাঁরা উচ্চমার্গের জ্ঞানী তাঁদেরকে যেমন আত্মারাম বলা হয় আবার যাঁরা উচ্চমার্গের ভক্ত তাঁদেরকেও আত্মারাম বলে। নারদীয় ভক্তিসূত্রেও বলছেন, *আত্মারাম ভবতি*। আত্মারাম মানে যিনি নিজের স্বরূপেই রমণ করেন। আত্মারামের ব্যাপারটা ধারণা করা খুবই কঠিন। ঠাকুর তিন রকম আনন্দের কথা বলছেন, বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ। এটা ঠিকই যে আমরা জপধ্যান করছি, শাস্ত্র শুনছি, অনেক কিছুই করছি কিন্তু আমাদের মন মূলতঃ বিষয়ানন্দেই থাকতে ভালোবাসে। আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু উন্নত তাঁরা বই পড়তে, চিন্তন করতে ভালোবাসেন, গান-বাজনা ভালোবাসেন, সৃজনশীল কাজে স্পৃহা আছে কিন্তু এগুলো সবই বিষয়ানন্দ। এর পরের ধাপ ভজনানন্দ, যখন ঈশ্বরীয় নামগুণকীর্তন করা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না। যাঁরা ভজনানন্দের রস পেয়ে যান তাঁদের মন আর বিষয়ানন্দের দিকে যেতে চায় না। শেষে আসছে ব্রহ্মানন্দ। ঠাকুরের কথা ছাড়া ব্রহ্মানন্দের ব্যাপারে জানা ছাড়া আমাদের কোন পথ নেই। অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি তবুও ব্রহ্মানন্দের ব্যাপারে ধারণা হয় না। ঠাকুরের দুটো সুন্দর কথা দিয়ে আত্মারামের ব্যাপারটা বোঝা যায়। প্রথম বলছেন ঈশ্বরীয় রূপের সৌন্দর্য দর্শন হলে রম্ভা, তিলোত্তমা অপ্সরাদিকে চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। দ্বিতীয় বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হলে প্রত্যেকটি রোমকূপে রমণসুখ অনুভব হয়। মনে হয় ঠাকুর এটা কোন শাস্ত্রেই পেয়েছেন। অন্য দিকে আনন্দের বোধ তাঁর ছিল, তার সাথে জাগতিক কিছু কিছু আনন্দের ভোগ কেমন হয় সেটাও জানতেন। মাছের মুড়িঘন্ট ভালোবাসতেন আর সন্দেশের কথাও বলছেন। ঠাকুরেরও সাধ হয়েছিল সিল্কের বস্ত্র পরিধান করবেন, রূপোর গড়গড়াতে তামাক সেবন করবেন। কিন্তু ঈশ্বর দর্শনের আনন্দকে তিনি প্রত্যেকটি রোমকূপে রমণসুখের সাথে তুলনা করছেন। আমাদের পক্ষে ঈশ্বর দর্শনের আনন্দ ধারণা কর সম্ভব নয়, ঈশ্বর দর্শনে কী আনন্দ হয়। ঠাকুর আবার এক জায়গায় বলছেন, বিষয়ানন্দ থেকে শতগুণ আনন্দ ভজনানন্দে, ভজনানন্দ থেকে শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মানন্দে। এই কথাগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আমরা যদি ধারণা করার চেষ্টা করি তখন ঈশ্বরীয় রূপে রমণ কি রকম হতে পারে তার একটা হাল্কা আভাস আমাদের মনে রূপ ধারণ করে। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি ঐ রমণ করা ছাড়া তো আর কিছু করবেন না। ঠাকুর খুব সহজ উপমা দিয়ে বলছেন, মিছরির পানা খেলে আর চিটে গুড়ের পানা খেতে চাইবে না। একেই গুড়, তার উপর আবার চিটে, সেও আবার পানা, ঘনও নয় শুধু জলে গোলা। এই জিনিস কি কারুর ভালো লাগবে খেতে। যিনি আত্মারাম তাঁর আর জগতের কোন জিনিসকে ভালো লাগবে! এটাই বিরাধ বলতে চাইছে, আপনি আত্মারাম, আপনি সীতারাম এবং আপনি বিশুদ্ধঘনজ্ঞানমুর্তি, আপনাকে প্রণাম।

প্রপন্নং পাহি মাং রাম যাস্যামি ত্বদনুজ্ঞয়া।
দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ মায়া মাং মা বৃণোতু তে।৩/১/৪১

হে রাম! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন। আপনার আজ্ঞা পেয়ে এবার আমি দেবলোকে গমন করি। বিদ্যাধররা দেবলোকেই বাস করেন। আর আপনি আমাকে কৃপা করুন যাতে আপনার ভুবনমোহিনী মায়াতে যেন মোহিত না হই। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তুমি এবার যাও। আমার দর্শন পেয়ে তুমি এই জগতের দোষরূপ মায়ার গুণ সকল জয় করে নিয়েছ। তুমি জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে এখনই মুক্তিলাভ করবে। এই বলে শ্রীরাম খুব সুন্দর বলছেন –

মদ্ভক্তির্দুর্লভা লোকে জাতা চেন্মুক্তিদ্য যত।
অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া।৩/১/৪৪

আমার প্রতি ভক্তি লাভ করা এই জগতে বড়ই দুর্লভ। যদি কোনভাবে ভক্তি জন্মে তাহলে সেই ভক্তিই তাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। আমার প্রতি তুমি ভক্তি সম্পন্ন হয়েছ, তাই আমার অনুমতিক্রমে তুমি পরমধামে গমন কর। এইসব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র শেষে বলছেন, এই concluding শ্লোকটা খুবই মজার।

রামেণ রক্ষোনিধনং সুঘোরং শাপাদ্বিমুক্তির্বরদানমেবম্।
বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লব্ধং রামং গৃণ্নোতি নরোঽখিলার্থান্।৩/৩/৪৫

বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লব্ধং, এই যে বললেন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বিদ্যাধরত্ব পেয়ে গেল, এখানে শেষ তিনটে শ্লোক খুবই মজার। প্রথমে মুক্তি জিনিসটা শুরু করছেন পরমধাম রূপে, ভক্তিশাস্ত্রে যাকে সালোক্য, সামীপ্য ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে, অথচ শ্লোকটা শেষ করা হল যোনি মুক্তি দিয়ে। যখনই মুক্তি শব্দ আসে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না মুক্তি জিনিসটা কি বলতে চাইছেন, যোনি মুক্তি বলতে চাইছেন নাকি পরমমুক্তি বলতে চাইছেন। শ্রীমার সাথে একজন ভূতের মুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে সেখানে শ্রীমা বলছেন, ঠাকুরকে দেখেছে এতেই ভূতেদের মুক্তি হয়ে গেল। একজন কেউ বললেন, তাহলে কত ঘোড়া, বানর, গরু এরাও তো ঠাকুরকে দেখেছে। শ্রীমা যেন একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বলছেন, অবশ্যই তাদেরও মুক্তি হয়ে গেছে। আমাদের মনে হতে পারে শ্রীমার কথার সাথে শাস্ত্রের কথা মিলছে না, শাস্ত্রের সাথে না মিললে ঠাকুর বা শ্রীমার কথা নেওয়া যাবে না। কিন্তু শাস্ত্রেই আবার অনেক ধরণের মুক্তির কথা আছে, যেখানে যোনিমুক্তির কথাও বলা হয়েছে। এরপর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। জ্ঞান ছাড়া পরমমুক্তি কখনই হবে না। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমার প্রতি তোমার যে ভক্তি তাতে পরমধামে অবশ্যই তুমি গমন করবে। কিন্তু শেষ শ্লোকে এসে বলছেন বিদ্যাধরত্ব পেয়ে গেলে। এর অর্থ এটাই হতে পারে, প্রথম যে বাণ শ্রীরামচন্দ্র বিরাধের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন তাতে তার যোনি মুক্তি হয়ে গেল আর এবার বিদ্যাধরত্ব পেল। ঠাকুর বলছেন, ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানবে। কেরানী জেল থেকে ছাড়া পেলে কেরানীগিরিই করবে। ঠিক তেমনি বিদ্যাধর যখন জ্ঞান পেয়ে গেল তখন বিদ্যাধর কি করবে? কি আর করবে বিদ্যাধরত্বই করতে থাকবে। আর ঐ বিদ্যাধরের শরীরটাও পড়ে যাবে তখন কি হবে? তখন পরমধাম পেয়ে যাবে। যিনি ঠাকুরের ভক্ত তাঁর যদি ঠাকুরের জ্ঞান হয়ে যায় তাহলে সে কি করবে? যা করছিল তাই করতে থাকবে, কিন্তু তাঁর ভেতরটা পুরো পাল্টে গেছে।

মুক্তি অনেক রকমেরই হয়। মুক্তির ব্যাপারে খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের সহজ ধারণা মৃত্যুর পর মানুষকে অনেক দিন ধরে কবরে শুয়ে থাকতে হবে। তারপর একদিন আসবে যেদিন সবার বিচার হবে সেই বিচার অনুযায়ী কেউ স্বর্গে বা নরকে যাবে। এটা এক ধরণের মুক্তি। কিন্তু এদের কাছে মানুষেরই এই মুক্তি হবে। তাহলে মশা, মাছি, হাতি, সিংহ মৃত্যুর পর এদের কি হবে? কিছুই হবে না। কারণ খ্রীষ্ট আর ইসলাম ধর্মে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে আত্মাই নেই। যাদের বুদ্ধি আছে আর তার সাথে টাকা ও বন্দুকের জোর থাকে তখন তারা ধর্মের ব্যাপারে কতকগুলি প্যারামিটার ঠিক করে দেয়, এই প্যারামিটার গুলো যদি থাকে তবেই সেটা ধর্ম হবে। এরা ধর্মের প্রথম প্যারামিটার ঠিক করে দিল যে ধর্মের একজন ফাউণ্ডার থাকতে হবে, দ্বিতীয় কোন একটা বিশেষ ভগবান থাকতে হবে। কিন্তু কোন এক ভারতীয় মহাত্মাকে যদি প্যারামিটার ঠিক করতে দেওয়া হয় তাহলে প্রথমেই তিনি বলবেন, ধর্ম হতে হলে কোন ব্যক্তি বিশেষ থাকলে চলবে না। যেমন স্বামীজী বলছেন বেদান্তই একমাত্র ধর্ম, যখন বেদান্তকে কোন ভারতীয় ধারায় বসিয়ে দেওয়া হয় তখন সেটাই হিন্দু ধর্ম হয়ে যায়। বেদান্তের যৌগিক অনুশীলনকে নিয়ে যদি অদ্বৈতকে নেয় তখন সেটা বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে যাবে। এটাকেই আরবিয়ান দেশগুলিতে

দ্বৈতবাদের উপর যদি রেখে দেওয়া হয় তখন সেটাই ইসলাম ধর্ম হয়ে যায়। স্বামীজী অন্য ভাবে প্যারামিটার বলে দিলেন। সাধারণ স্তরে এভাবে যদি ধর্মের বাঁধন ঠিক করতে যায় তাহলে ধর্মের কোন শেষ হবে না।

আগেকার দিনে ইউরোপের দেশগুলিতে পুরুষ আর মহিলাদের ডুয়েল হত, পরের দিকে অবশ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষ মহিলার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কেমন ভাবে হবে? দুজনের উচ্চতা সমান করতে হবে। সেইজন্য প্রথম শর্ত হবে পুরুষকে তিন ফুট নীচে গর্তে দাঁড়াতে হবে, দ্বিতীয় শর্ত তার বাঁ হাত পেছনে বাঁধা থাকবে। তৃতীয় শর্ত হল, মহিলারা পাথর ছুঁড়তে পারবে, পুরুষরা লাঠি নিয়ে লড়বে। এবার ভাবুন লড়াইটা কেমন হবে। কিন্তু এটা সত্যি কাহিনী, এভাবেই আগে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হত। যুক্তিতর্ক এভাবে কখন হয় না, যুক্তিতর্ক সমানে সমানে চলতে হবে। সমস্যা হল মানুষ যেভাবে বড় হয়েছে তার বাইরে অন্য কোন কিছুকে তার আজব জিনিস বলে মনে হবে। বিদেশীরা কিছু দিন আগে পর্যন্ত মানতই না যে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, গাছপালা এদের আত্মা আছে। কিন্তু আমরা প্রথম থেকে মেনে আসছি এদেরও আত্মা আছে। সেইজন্য এদের ধর্মে মুক্তির প্রশ্ন মানুষকে কেন্দ্র করেই হয়, অন্যদের ব্যাপারে কোন আলোচনাই করবে না। কর্মের বিধান অনুসারে যে কোন জীব উপরের দিকেও যেতে পারে আবার নীচের দিকেও যেতে পারে, এসব কথা শুনলে ওদের মাথা ঘুরে যায়। সব মিলিয়ে এদের অনেক রকম সমস্যা তৈরী হয়ে গেছে। ইশিগুরো নামে একজন জাপানী লেখক ক্লোন করা মানুষদের নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে যেসব ক্রিমিনালদের সাজা দেওয়া হয়েছে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেছে বা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, এদের শরীর থেকে ক্লোন তৈরী করা হয়েছে। ক্লোনিং করার একটাই উদ্দেশ্য, সাধরণ মানুষের খারাপ হয়ে যাওয়া অর্গানগুলো পাল্টে ক্লোন করা মানুষের অর্গানগুলো বসিয়ে দেওয়া। সভ্য সমাজে জীবন্ত মানুষের অর্গান তো কেটে নিয়ে আসা যায় না। ওরা একটা উন্নত সমাজের চিন্তা করেছে। একটা ক্লোন ফ্যাক্টরি, সেখানে হাজার হাজার ক্লোন রয়েছে, তারাও মানুষ কিন্তু ক্লোন। তাদের বাবা বা মা কোন ক্রিমিনাল। এদের কাজ হল নিজের অর্গান দান করা। ওদের সবার একটা লিস্ট করা আছে, কে কে যাবে, কার কোন অর্গান নেওয়া হবে, তার আগে স্বাস্থ্যের সব রকম পরীক্ষা করা হয়। যখন সময় হয় তখন ওদের নিয়ে যাবে, ওর অর্গানটা কেটে নেবে। এবারে সে চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেল। কাহিনী হল, একজন মহিলা সমাজে প্রমাণিত করার চেষ্টা করছেন ক্লোন করা মানুষেদেরও সোল আছে। খুব মজার কাহিনী, সোসাইটি মানতেই চায় না যে এদের ভেতর কোন জীবাত্মা আছে। মহিলাটি প্রমাণিত করতে চাইছেন এদের মধ্যেও সোল আছে, এদের মধেও শুভ গুণ আছে। মহিলাটি ওদেরকে দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছেন, হাতের কাজের জিনিস তৈরী করাচ্ছেন, তৈরী করে সোসাইটিতে দেখাচ্ছেন এরা কত সুন্দর সুন্দর কাজ করেছে। সমাজ কিন্তু তাও মানছে না। কাহিনীটা খুবই বিয়োগান্তক। ক্লোন করা একটা ছেলে একটা ক্লোন করা মেয়ে দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলেছে। ওরা প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে ওরা মুক্ত হয়ে বিয়ে করতে পারে। কিভাবে ঘুরতে ঘুরতে ওরা সেই মহিলার কাছে গেছে। মহিলা বলছেন আমি কিছুই করতে পারব না, কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সমাজের ওরা মানতেই চাইছে না যে তোমাদেরও সোল আছে। শেষ দৃশ্য হল, পুলিশ এসে দুজনকে টেনে নিয়ে চলে যায়। ওদের কাছে এটা কোন ব্যাপারই নয়, কারণ ওরা পরিষ্কার যে এদের মধ্যে কোন জীবাত্মা নেই। ওরাও তাই অবাক হয়ে যায় যখন আমরা বলি মানুষ মরে গিয়ে কুকুর বিড়ালও হতে পারে আবার মানুষও হতে পারে।

আমেরিকাতে স্বামীজী একটা বক্তৃতায় transmigration of soulএর কথা বলতে গিয়ে যখন বলছেন জীব উপরের দিকে যায় আবার নীচের দিকেও যায়, যে খ্রীশ্চান নোট নিচ্ছিল সে এত গোঁড়া খ্রীশ্চান যে ওটা লিখলই না। লেখা হল জীব সব সময় উপরের দিকেই যায়। সেই পেপার যখন গুরুভাইদের কাছে এল সেটা পড়ে গুরুভাইরা স্বামীজীকে খুব কড়া চিঠি লিখছেন – স্বামীজী! আপনি এটা কি বলেছেন। বিদেশ থেকে আসার পর স্বামীজীও বলছেন, ওরা হল গোঁড়া খ্রীশ্চান, ওদের হাত দিয়ে কখনই এই লেখা বেরোবে না, তাই নিজের মত পাল্টে দিয়েছে। হিন্দু ধর্ম হল পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। হিন্দু ধর্ম পাথরের কথাও ভাবে, গাছপালার কথাও ভাবে আর বাঘ সিংহের কথাও ভাবে। ধর্মের এই সম্পূর্ণতাকে অন্যরা নেয় না। বিরাধ যদি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মারা না যেত তাহলে কি হত? মরে আবার রাক্ষসই হত। এই যে বৃত্তের মধ্যে, Law of Periodicityর মধ্যে ঘুরছে, এখান থেকে কি করে বেরোবে? এর জন্য দরকার একটা ধাক্কা লাগা। এই ধাক্কাটা সব সময় আসবে একটা উচ্চ কোন শক্তি থেকে। আমরা সবাই আমাদের নিজের নিজের মনের সংস্কারের আবর্তে ঘুরছি। যখনই কোন অবতার আসেন, যখনই কোন শাস্ত্র রচনা হয়, তখন তাঁদের কথাবার্তা একটা evolutionary ধাক্কা মারে বা উপরের

দিকে টানে। জাল টানলে অনেক রকম মাছ যেমন একসাথে উপরে চলে আসে, ঠিক তেমনি এখানেও অনেকেই এভাবে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলে আসে। তখন অনেক ধরণের মুক্তি হতে শুরু হয়।

হিন্দু ধর্ম ছাড়া প্রায় সব ধর্মেই, বিশেষ করে ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে মুক্তি সব সময় হবে মৃত্যুর পর, মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে। তাই এদের কাছে উদ্দেশ্য হল স্বর্গপ্রাপ্তি। মৃত্যুর আগে কোন দিন সে স্বর্গে যেতে পারবে না। হিন্দু ধর্মেও আছে, যেমন বলা হয় কাশীত মরলে মুক্তি। এখানেও না মারা যাওয়া পর্যন্ত মুক্তি হবে না। যেহেতু হিন্দু ধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম সেইহেতু মাছি, মশা থেকে শুরু করে সব জীবের মুক্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু এরা হল অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতির জীব। হিন্দুদের একটা খুব বিচিত্র ধারণা যে, কোন ধার্মিক লোকের হাতে যদি কোন প্রানীর মৃত্যু হয় তাহলে তার যোনি মুক্তি হয়ে যাবে। যার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রে যখন ছাগ বলি হয় তখন সেই ছাগের কানে পশু গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে দেওয়া হয়। ছাগ বলি দেওয়া মানেই তার মাংস খাওয়া হবে, কিন্তু সরাসরি তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, তাই তোমাকেও একটা যোনি মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ব্যাপারটা অনেকের কাছে উদ্ভট মনে হতে পারে। স্বামী ভূতেশানন্দজীর একটা ছোট্ট ঘটনার বর্ণনা আছে। একদিন তিনি হাঁটছেন, রাস্থায় একটা বিছে দেখতে পেয়ে তিনি মজা করেই বলছেন 'কেউ কি এর মুক্তি দিয়ে দিতে পার'? বিছে খুবই বিপজ্জনক। মহারাজের কথা শুনেই একজন ব্রহ্মচারী পা দিয়ে চেপে বিছেটাকে মেরে দিয়েছেন। মহারাজ বলছেন 'সাধুর পদাঘাতে মরল, ওর মুক্তি হয়ে গেল'। এই ঘটনায় হিন্দুদের যোনিমুক্তির ধারণা মান্যতা পেয়ে গেল। মুক্তির মধ্যে সব থেকে নীচে হল যোনিমুক্তি। একেবারে নীচে পড়ে ছিল সেখান থেকে যোনিমুক্ত হয়ে একটা নিম্ন যোনি থেকে আরেকটা উচ্চ যোনিতে চলে গেল।

যোনিমুক্তির পর আসে ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তি মানে, একজন হয়ত প্রচুর ঈশ্বর চিন্তন করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর আগে একটু বাকি থেকে গেল। তখন তিনি উচ্চতম স্বর্গে যাবেন, সেখানে ফল ভোগ করে সৃষ্টি শেষ হয়ে গেলে তিনি মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবেন। তৃতীয় হল বিদেহ মুক্তি। বিদেহ মুক্তি মানে, তাঁর জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে গেছে কিন্তু পুরোপুরি উপলব্ধি হয়নি, কিছু কর্ম থেকে যাওয়াতে তাঁর শরীরটা চলতে থাকবে। এনারা উপমা দেন, একটা রথ যাচ্ছে, যেতে যেতে রথের একটা চাকা খুলে বেরিয়ে গেল। চাকাটা রথ থেকে ছেড়ে যাওয়ার পরও চাকা কিছুক্ষণ চলতে থাকবে। ঠিক সেই রকম কখন সখন দেখা যায় জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়ে গেছে কিন্তু শরীরে কিছু একটা কর্ম থেকে গেছে, তখন ঐ গতিবেগেই শরীরটা চলতে থাকবে, কিন্তু ঐ গতি দিয়ে নতুন কোন কর্মের সৃষ্টি হবে না। এটাই বিদেহ মুক্তি, যেমনি মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত। উচ্চতম মুক্তি হল জীবনমুক্তি, যেখানে যে অবস্থাতে তাঁর উপলব্ধি হয়ে গেল, তখনই সে মুক্ত। এরপর বেঁচে থাকলেও তাঁর কিছু আসে যায় না। চার রকমের মুক্তি – যোনিমুক্তি, ক্রমমুক্তি, বিদেহ মুক্তি আর জীবনমুক্তি। আমরা যখন বলছি, ঠাকুরকে ভক্তি কর শেষ সময় ঠাকুর নিয়ে যাবেন, তখন আমরা বিদেহ মুক্তির কথাই বলছি। কিন্তু এটাকে ঠিক বিদেহ মুক্তি বলা যায় কিনা আমাদের জানা নেই, আর বিদেহ মুক্তি না হয়ে বিদেহ ভক্তি হতে পারে। এই কারণে বিদেহ ভক্তি হতে পারে, বিদেহ মুক্তি হয় জ্ঞানীদের। ঠাকুর এসে নিয়ে যাবেন, এর অর্থ ঠাকুর যে লোকে থাকেন তিনি সেই লোকে যাবে। সেই লোকে গেলে মুক্তি হবে না, সালোক্য, সামীপ্য এই ধরণের হবে। তবে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কাশীতে মরলে মুক্তি হয়। কিভাবে মুক্তি হয়? মৃত্যুর সময় শিব কানে তারক মন্ত্র দিয়ে দেন আর মা তার বন্ধন খুলে দেন। এখানেও ভক্তি আর মুক্তি মিশে থাকছে। এগুলো জানার আমাদের কোন উপায় নেই, গুরু বা আচার্যরা যেমন বলে দিয়েছেন তেমনটাই মেনে নিতে হয়। তবে মোটামুটি এই চার ধরণের মুক্তির ধারণা হিন্দু ধর্মে পাওয়া যায়।

যতক্ষণ উচ্চ শক্তি না কাজ করবে ততক্ষণ যোনিমুক্তি কোন মতেই হবে না। কিন্তু ক্রমমুক্তি, বিদেহ মুক্তি, জীবনমুক্তি এই তিন ধরণের মুক্তি তাত্ত্বিক ভাবে অবশ্যই হতে পারে। কারণ উচ্চ চিন্তনের মানুষ ছাড়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করা, শাস্ত্রের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়, আর শাস্ত্র মানে ঈশ্বর নিজেই। যখন শাস্ত্র অধ্যয়ন করছি, শাস্ত্রের কথা শুনতে ভালো লাগছে, শাস্ত্রকে যে পারণ করতে চাইছি তখন মনে হবে বাইরে থেকে যেন একটা ধাক্কা এসেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে তা হয় না। দেখা যায় কাউকে শাস্ত্র কথা শোনাবার জন্য জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে, দুদিন আসার পর আর আসবে না। সবাই শাস্ত্রের কথা নিতে পারে না। ঠাকুর বলছেন পিঠের কোনটাতে কলাইয়ের পুর থাকে কোনটাতে ক্ষীরের পুর থাকে। ঠাকুরের কথায়, শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, শাস্ত্রের কথা চিন্তন করতে ভালো লাগা এরা হল ক্ষীরের পুর দেওয়া পিঠে। কিছু লোক আছে যারা ঘোর বিষয়ী, আবার কিছু লোকের ধর্মচর্চার দিকেই মন। সাধারণ লোকের মধ্যে যে শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ বা প্রীতি আসবে সেখানে একটা ধাক্কা

অবশ্যই দরকার। কিন্তু একবার এই স্তরে চলে এলে এখান থেকে আর কোন দিন সরে যাবে না। কয়েকটা জন্ম লাগতে পারে কিন্তু ঘোর বিষয়ী আর কোন দিন হবে না। শাস্ত্রজ্ঞানের কিরণ যার মধ্যে একবার ঢুকে গেছে এবার এই কিরণই ধীরে ধীরে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, কারুর একটু তাড়াতাড়ি কাজ করবে, কারুর একটু ধীরে কাজ করবে, কিন্তু যেভাবেই করুক আর এখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে না। মুক্তি যাদের হয় সেই শ্রেনীর মধ্যে এরা এবার ঢুকে গেল। বিরাধ রাক্ষস যোনি থেকে মুক্ত হয়ে বিদ্যাধর হয়ে গেল। বিদ্যাধর হয়ে গেলেও শ্রীরামচন্দ্র বিরাধকে বলছেন, তুমি সব সময় আমার কথা মনে রাখবে তাহলে তুমি পরমপদ পেয়ে যাবে। এর মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র একটা শর্ত রেখে দিলেন, যদি না মনে রাখ তাহলে তুমি পরমপদ পাবে না। যদিও তিনি বলছেন না, কিন্তু অর্থটা তাই দাঁড়ায়।

ক্রমমুক্তির ব্যাপারটা সময় সাপেক্ষ, প্রচুর কর্ম করেছে আর প্রচুর ভক্তি করেছে কিন্তু তার একটু বাসনা থেকে গেছে। ঐ বাসনা পূর্ণের জন্য তাকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। কতদিন অপেক্ষা করতে হয়? যত দিন এই কল্পের নাশ না হয়ে যাচ্ছে। ততদিন সে বিভিন্ন স্বর্গলোকে গিয়ে সুখ ভোগ করতে থাকবে। সেইজন্য বলা হয় তুমি হয় জীবনমুক্তি অথবা বিদেহ মুক্তির জন্য চেষ্টা কর, তা নাহলে তোমার অনেক সময় লেগে যাবে। মনে করুন কারুর জ্ঞানের ইচ্ছা হয়ে গেছে, সবই হল কিন্তু কোনটাই হল না, ক্রমমুক্তিও হল না, জীবনমুক্তিও হল না আর বিদেহ মুক্তিও হল না। এরপর আবার যখন তাকে দেহ ধারণ করতে হবে তখন কোথায় গিয়ে কোন পরিস্থিতির মধ্যে তাকে জন্ম নিতে হবে কেউ জানে না। তার হয়ত ইচ্ছে আছে যে আমি ঈশ্বরের দিকে যাব, কিন্তু সেখানে কোন অনুকূল পরিবেশ পেল না, তখন তার মধ্যে একটা ছটফটানি লেগে থাকবে। সে নিজেও বুঝতে পারবে না কেন তার ছটফটানি হচ্ছে। সেখানে তার একটা জন্ম বৃথা চলে গেল। এসব কারণেই হিন্দুরা বলে, যা করার এখানেই চটপট সেরে নাও। অনেক দূর এগিয়ে কোন কারণে যদি কোথাও ফেঁসে যায় তাহলে পুরো কল্প পর্যন্ত ফেসে গেল। এগুলো কতটা সত্যি, কতটা কিভাবে হয় আমাদের জানার কোন উপায় নেই। আচার্য শঙ্কর তাই বারবার বলছেন বন্ধন, মুক্তি, জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ, নরক এসব কথা আমরা শাস্ত্র থেকে পাই। শাস্ত্রে মিথ্যা কথা বলার কোন কারণ আমরা পাই না। একটা কারণ হতে পারে, ওনারা চান সব মানুষের মঙ্গল হোক, মঙ্গলের জন্য জিনিসগুলিকে যখন যুক্তিতর্কে দাঁড় করান তখন কিছু এদিক সেদিক হতে পারে, যা আমাদের জানা নেই। তাই ধর্ম পথে প্রথমের দিকে অনেক কিছু আমাদের মেনে চলতে হয়।

জগতে কোন একটা জিনিসকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো যায় না। যেমন কেউ যদি বলে আমি সারা দিন আমার ছেলের চাঁদ মুখ দেখেই কাটাব। কিন্তু কি করে সে ছেলের চাঁদ মুখ দেখে সারা দিন কাটাবে! কারণ তার ছেলেকে বড় হতে হবে, কলেজে পড়াশোনা করতে হবে, ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে, কারুর পক্ষে সম্ভবই নয় যে সারা জীবন ছেলেকে নিজের কাছে রাখতে পারবে। বিচার করলে দেখা যাবে জগতে কোন কিছুই নেই যে শুধু ঐ জিনিসটাকে নিয়েই মানুষ সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। একমাত্র একটা জিনিসকে নিয়েই সারা জীবন কাটানো যায় তা হল ঈশ্বর চিন্তন। সেইজন্য ধীরে ধীরে আমাদের একটা প্রস্তুতি নিতে হবে যাতে যতটা সময় ঈশ্বর চিন্তন বা ঈশ্বরকে নিয়ে থাকা যায়। ঈশ্বর চিন্তন বা ঈশ্বরকে নিয়ে থাকাটাই জীবনের ধারা করে নিতে হয়। আমরা যে নানান ধরণের শাস্ত্র পড়ছি, শুনছি, সেখানে যে এই ধরণের সেই ধরণের মুক্তির কথা জানছি এগুলো শেষ পর্যন্ত কোনটাই কাজে লাগে না। সংসারে যেমন শেষে ছেলে, মেয়ে, স্বামী, স্ত্রী কোনটাই কাজে লাগে না, এগুলোও ঠিক সেই রকম, কোনটাই কাজে লাগে না। একটাই জিনিস কাজে লাগে, তা হল ঈশ্বর চিন্তন। এত শাস্ত্র, শাস্ত্রের এত আলোচনা সবটারই উদ্দেশ্য একটা, কিভাবে মনকে ঈশ্বর চিন্তনে লাগিয়ে রাখা যায়। এই যে নানা রকমের মুক্তির কথা বলা হচ্ছে, এরও কোন দাম নেই। ঠিক ঠিক দাম একটা জিনিসরই আছে। কথামৃতের পাতায় পাতায় সেই জিনিসটার কথাই ঠাকুর বারে বারে বলছেন, ঈশ্বরকে কিভাবে ভালোবাসা যায়। যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্রের একটাই উদ্দেশ্য কিভাবে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পার, যাতে তোমাকে যদি চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়ে বলা হয় যে একটা চিন্তনই তোমাকে দেওয়া হল, এই একটা চিন্তনকে নিয়েই তুমি থাকতে পারবে, তখন ঈশ্বর চিন্তন এমন একটা জিনিস যেটা নিয়ে থাকলে বাকি অন্য কোন কিছুর আর দরকার হবে না। ঈশ্বর চিন্তনের বাইরে যে কোন জিনিস, যদি বলে টাকার চিন্তন নিয়ে থাকবে, কতক্ষণ থাকবে, টাকা থাকলে তখন অন্যান্য অনেক কিছুর চিন্তনও এসে যাবে। সব কিছুর চিন্তনেই একটা সময় একঘেঁয়েমি এসে যাবে। এখানে বিরাধের প্রসঙ্গ এসেছে, এরপর আরও অনেক প্রসঙ্গ আসবে, কিন্তু সব প্রসঙ্গের একটাই সার তা হল কি করে

ঈশ্বরে পুরোপুরি মন দেওয়া যায়। মীরাবাঈয়ের ভজনে বলছেন, রামের চিন্তা করলে ওটা কখন খরচ হয় না, কেউ এটাকে লুটে নিতেও পারে না, রামের নাম নিলে রামের প্রতি ভালোবাসা দিনে দিনে সুদে আসলে বাড়তেই থাকে। যখন যে শাস্ত্রই আমরা পড়ি না কেন, নানান ধরণের যে স্বর্গের আলোচনা, মুক্তির আলোচনা হয় এগুলো সবই গৌণ, মুখ্য হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা একবার এসে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

শ্রীরামের শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম গমন

বিরাধের কাহিনীর পর আসে শরভঙ্গ ঋষির প্রসঙ্গ। বিরাধ স্বর্গে চলে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র আরও বনের গভীরে আরও অগ্রসর হতে থাকলেন। কাছে শরভঙ্গ ঋষি থাকতেন। সবাই শরভঙ্গ ঋষির তপোবনে গমন করলেন। শরভঙ্গ ঋষি বলছেন –

বহুকালমিহৈবাসং তপসঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।৩/২/৪
তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রামঃ ত্বং পরমেশ্বরঃ।
অদ্য মত্তপসা সিদ্ধং যৎ পূণ্যং বহু বিদ্যতে।
তৎ সর্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহম্।৩/২/৫

বহুকাল আগে আমি শুনেছি যে আপনি সেই পরমেশ্বর নারায়ণ নররূপ ধারণ করে অবতারত্ব গ্রহণ করেছেন। সেই থেকে এই স্থানে আপনার সন্দর্শন অভিলাষে প্রতীক্ষায় আছি। পাঁচ নম্বর শ্লোকটি খুব মূল্যবান শ্লোক। আপনি হলেন সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, অনেক দিন ধরে আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী আর সারা জীবনব্যাপী আমি যে এত তপস্যা করেছি সেই তপস্যার সব পূণ্য আপনাকে অর্পণ করলাম, এবার আমি মোক্ষ লাভ করব। তিন লাইনের একটি শ্লোকে অনেকগুলো কথা বলা হয়েছে। শরভঙ্গ ঋষি অনেক তপস্যা করেছেন, তপস্যার সব ফল তিনি ঈশ্বরের শ্রীচরণের অর্পণ করে দিচ্ছেন। দীক্ষার সময় গুরু বলে দেন, জপ করার পর জপের ফল ঠাকুরকে অর্পণ করতে। তার থেকেও বড় হল, আমরা যা কিছু করছি সব কর্মের ফল প্রভু তোমাকে অর্পণ করলাম, এটাই নিষ্কাম কর্ম। দ্বিতীয় হল, শরভঙ্গ ঋষি অপেক্ষা করছেন শ্রীরামচন্দ্র কবে আসবেন। এতদিন তপস্যা করছেন, আর শ্রীরামের জন্য অপেক্ষায় দিন গুনছেন। হঠাৎ শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণকে দেখে এই কথা বলেই তিনি চিতা সাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিতায় আরোহণ করলেন। চিতার আগুনে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলছে, সেখানেই তিনি সর্বান্তরযামী দুর্বাদল শ্যাম, চীরবসনযুক্ত জটাবল্কধারী কমলোচন রামকে সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত ধ্যান করতে করতে বলছেন-

কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনুরন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো।
স্মৃতো ময়া নিত্যমনন্যভাজা জ্ঞাত্বা স্মৃতিং মে স্বয়মেব যাতঃ।৩/২/৮

অহো! এই জগতে রুঘুনাথ ভিন্ন আর কে কৃপাবান, যাঁর চিন্তন আমি এতদিন ধর করছিলাম তিনি নরদেহ ধারণ করে চলে এসেছেন। আমার কি পরম সৌভাগ্য, এখন পরম দেবেশ্বর রঘুনাথের দিকে তাকাতে তাকাতে নিষ্পাপ হয়ে ব্রহ্মলোকে গমন করছি। শরভঙ্গ ঋষি যে তপস্যা করেছেন তাতে ওনার বিদেহ মুক্তি অবশ্যই হওয়ার কথা, জীবনমুক্তি হবে না কারণ ওনার মনে কোথাও নরলীলা আস্বাদ করার ইচ্ছা জেগেছিল। এখানে দেহত্যাগ হয়ে গেলেই ওনার মুক্তি বা আমরা যদি ক্ষণিকের জন্য মেনে নিই ওনার বিদেহ মুক্তি হয়নি, ক্রমমুক্তি অবশ্যই হবে। ক্রমমুক্তি আর বিদেহ মুক্তির মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। কারণ ওখান থেকে আর তাঁর পতন হবে না। কিন্তু উনি শ্রীরামচন্দ্রকে নররূপে সাক্ষাৎ দেখতে চাইছেন, নরলীলার আস্বাদ করার ইচ্ছা ছিল। সেইজন্য তিনি বলছেন, তিনি কত কৃপাবান আমি যাঁর এত চিন্তন করতাম তিনি সাক্ষাৎ আমাকে দেখা দিতে চলে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যখন অবস্থান করছিলেন, তখন কত দূর দূর থেকে বিভিন্ন ধরণের সাধক, সিদ্ধ পুরুষরা ঠাকুরকে দেখতে আসতেন। ঠাকুরও বলছেন, যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতেই হবে। ঠাকুরের এই কথাকেই টেনে পরবর্তি কালে বলা শুরু হল যারাই ঠাকুরের কাছে এসেছে এটাই তাদের শেষ জন্ম। আসলে ঠাকুর বলতে চাইছেন, ঠাকুরের এবার নরলীলা, ভগবান দেহ ধারণ করে এসেছেন, যাদের শেষ জন্ম তারা সবাই ঠাকুরের কাছে আসছে। সেই পশ্চিমের সিন্ধু প্রদেশ থেকে ভক্ত আসছে, পূর্ববঙ্গ থেকে আসছে, অনেকের নাম লিপিবদ্ধ হয়ে আছে আবার অনেকের নাম লিপিবদ্ধ নেই। আর শরভঙ্গ ঋষি, শ্রীরামকে দেখতে দেখতে চিতায় চলে গেলেন। বরাহনগর থেকে গোপাল সেন নামে এক যুবক দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসত। ঠাকুরকে একদিন গোপাল সেন বলছে 'তোমার এখনো দেরী আছে, আমি চললাম'। কিছু দিন পরেই খবর এল গোপাল

সেন আত্মহত্যা করেছে, এনাদের ক্ষেত্রে আত্মহত্যা তো বলা হয় না, বলেন যে দেহত্যাগ করে নিয়েছেন। অবতাররা এলে এই ধরণের ঘটনা হয়। অনেকে বলেন আমি ওনার নররূপটা একবার দর্শন করে নিতে চাই। তিনি যে কোন হতাশা বা দুঃখ থেকে দেহ ছাড়ছেন একেবারেই তা নয়। তাঁর সব কিছু হয়ে গেছে একবার শুধু ভগবানের নরলীলাটা দেখে নিলেন। শরভঙ্গ ঋষির ঠিক তাই হয়েছিল। ক্রমমুক্তির যে গতি এনাদেরও ঠিক তাই হয়, এনারা ব্রহ্মলোকে যান এবং ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার সাথে এক হয়ে যান। শরভঙ্গ ঋষি বলছেন –

অযোধ্যাধিপতির্মেঽস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা।
যদ্‌বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা।৩/২/১০

জলধরের ক্রোড়ে বিদ্যুৎ যেমন সব সময় থাকে ঠিক তেমনি শ্রীরামচন্দ্রের বামক্রোড়ে সীতা অবস্থিত, সেই অযোধ্যাপতি রাঘবের এই ছবি যেন আমার হৃদয়ে সর্বদা স্থিত থাকে। এটাই ঠিক ঠিক ক্রমমুক্তির দৃষ্টান্ত। তবে আমাদের মত অধিকারীদের পক্ষে এই আলোচনা করা কখনই বাঞ্ছনীয় নয় যে শরভঙ্গ ঋষির মত ব্যক্তিত্বের ক্রমমুক্তি হল নাকি বিদেহ মুক্তি হল। তবে শাস্ত্রে যে ভাবে বলা হয়েছে সেই অনুসারে বিচার করলে মনে হবে এটা যেন ক্রমমুক্তির দৃষ্টান্ত। তিনি সাকার সাধনা এখনও করছেন, ব্রহ্মলোকে যাচ্ছেন, ওখানে গিয়ে উনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব পেয়ে গেলেন আর সেখানেও শ্রীরাম ও সীতার এই রূপের চিন্তন করতে থাকবেন। এরপর তিনি শ্রীরামকে অনেকক্ষণ ধ্যান করার পর চিতায় অগ্নি প্রজ্বলন করে তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নিতে প্রবেশ করে গেলেন আর সবার সামনেই তাঁর পঞ্চভূতের দেহ ভস্মিভূত হয়ে গেল। খবর পেয়ে দণ্ডকারণ্যবাসী অনেক ঋষি-মুনিরা সেখানে ছুটে এসেছেন শ্রীরামকে দেখার জন্য।

আশীভিরভিনন্দ্যথ রামং সর্বহৃদি স্থিতম্।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে ধনুর্বাণধরং হরিম্।৩/২/১৪

সবাই ভূমিতলে প্রণাম করে সর্বান্তর্যামী ধনুর্বাণধারী শ্রীরামকে আশীর্বাদ দ্বারা অভিনন্দিত করছেন। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক লাগার কথা। একেই এনারা সবাই ঋষি-মুনি, শ্রীরামচন্দ্রের থেকে বয়সেও বড়, সবাই জানেন শ্রীরামচন্দ্র অবতার, কেউ হয়ত তাঁরই সাধনা করছেন, কিন্তু আশীর্বচন দিয়ে অভিনন্দন করছেন। ঠাকুরের কাছে কামারপুকুর থেকে যদি কেউ আসেন, তিনি হয়ত সাধনা করেন, ঠাকুরের থেকে বয়সেও অনেক বড়, তিনি ঠাকুরকে পা ছুঁয়ে আর প্রণাম করতে পারবেন না। তখন তিনি আশীর্বাদ করবেন। এখানে অভিনন্দন করছেন, অভিনন্দনটাই মূল। কিভাবে অভিনন্দন করছেন? কেউ গলা জড়িয়ে অভিনন্দন করেন, কেউ পা ছুঁয়ে অভিনন্দন করেন, কেউ হ্যাণ্ডশ্যাক করে অভিনন্দন করেন, আবার রাজাকে পুরোহিতরা আশীর্বাদ দিয়ে অভিনন্দন করেন। তখন ঋষিরা বলছেন –

ভূমের্ভারাবতারায় জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ।
জানীমস্ত্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা।৩/২/১৫

আমরা জানি, ব্রহ্মার প্রার্থনায় আপনি ভূভার হরণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। আমরা আপনার ব্যাপারে সব অবগত আছি। অরণ্যের গভীরে আরও যে আশ্রম আছে সেই সকল আশ্রমেও আপনি আসুন। এরপর সবাই আরও দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বিভিন্ন মুনিদের আশ্রম দেখতে দেখতে শ্রীরাম চলেছেন। যেতে যেতে শ্রীরামচন্দ্র এক জায়গায় দেখছেন অনেকগুলো অস্থিমাত্র অবশিষ্ট নরমুণ্ড স্তুপ হয়ে পড়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্রের মনে কৌতুহল হয়েছে, তপোভূমিতে এই অস্তি কাদের আর কেনই বা এখানে পড়ে আছে? তখন ঋষিরা বলছেন, হে রাম! সবই ঋষিদের মুণ্ডু। ঋষিরা ধ্যানে নিমগ্ন থাকা অবস্থায় রাক্ষসরা এদের মেরে মাংস খেয়ে নেয়। কাব্যে বীভৎস রস ফুটিয়ে তোলার জন্য এভাবে অনেক কিছুর বর্ণনা করা হয়। সাধুপুরুষদের উপর অত্যাচার চিরদিনই ছিল। এগুলো নতুন কিছু নয়। যিনি দুর্বল তিনিও যেমন কিছু করতে পারেন না, অন্য দিকে সত্ত্ব গুণে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও কিছু করতে পারেন না। দুর্বল মানুষ অনেক সময় সবল মানুষের সাহায্য নেয়, সত্ত্ব গুণী সেটাও করেন না।

শ্রীরামের সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম গমন

মুনিদের মুখে রাক্ষসদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে শ্রীরামচন্দ্র খুব অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি তখন প্রতিজ্ঞা করলেন এই অঞ্চলে যত রাক্ষস আছে সবাইকে আমি বধ করে দেব যাতে ঋষি মুনিরা নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে

তপস্যা, জপ-ধ্যান করতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্র এখানে কয়েক বছর বাস করার পর আরও এগিয়ে চললেন, যেতে যেতে ঋষিদের অনেক আশ্রম পরিদর্শন করতে করতে সুতীক্ষ্ণ ঋষির প্রসিদ্ধ আশ্রমে গমন করলেন। শরভঙ্গ আর সুতীক্ষ্ণ ঋষির নাম প্রায়ই একসাথে উচ্চারিত হয়। সুতীক্ষ্ণ ঋষি ছিলেন অগস্ত্য মুনির শিষ্য, তিনিও রাম মন্ত্রের জপ করতেন। শ্রীরামের আগমন সংবাদ শুনেই সুতীক্ষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়ে যথাবিধি তাঁর পূজা করে বলছেন –

ত্বন্মন্ত্রজাপ্যহমনন্তগূণাপ্রমেয় সীতাপতে শিববিরিঞ্চিসমাশ্রিতাঙ্ঘ্রে।
সংসারসিন্ধুতরণামলপোতপাদরামাভিরাম সততং তব দাসদাসঃ।৩/২/২৭

হে রাম! আমি আপনরাই মন্ত্র জপ করি। অধ্যাত্ম রামায়ণে রাম মন্ত্রই আদি। যেমন ওঁ আদি ঠিক তেমনি রাম এই মন্ত্রও আদি। আদি না বললে সমস্যা হয়ে যাবে, কারণ যে কোন জিনিস যদি কালে শুরু হয় তাহলে তা একদিন শেষ হয়ে যাবে। সুতীক্ষ্ণ ঋষি বলছে, শিব, ব্রহ্মা এনারাও আপনারই চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। আপনার চরণযুগল সংসার সাগরের পারে যাওয়ার জন্য বিশুদ্ধ ও সুদৃঢ় পোত। পোত বলে বলতে চাইছেন শুধু সামান্য নৌকা নয় একেবারে জাহাজ। আমি তাই আপনার মন্ত্র জপে সদা রত আর আপনার যে দাস আমি তার দাস। ভক্তিতে যখন উচ্ছ্বাস আসে ভক্তরা তখন সব কিছুকে এভাবেই দেখেন। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে এই ভাবগুলোর স্থায়িত্ব ক্ষণিক। আর বলছেন, হে রাম! আমি ইন্দ্রিয়ের দাস, আপনারই মায়াবশে আমি সংসারে স্ত্রী-পুত্রাদির মোহে নিমগ্ন হয়ে আছি। আমার পক্ষে সংসারের মায়া কেটে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়, তাই আমার উপর কৃপা করার জন্য আপনি নিজেই আশ্রমে চলে এসেছেন। সুতীক্ষ্ণ বলতে চাইছেন, তিনি শ্রীরামের ভক্ত কিন্তু পড়ে আছেন অন্ধকূপে, উনি এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন না, শ্রীরামের কাছেও যেতে পারছেন না, সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র নিজেই তাঁর ভক্তের কাছে চলে এসেছেন। এগুলোকেই বলে বিনয়। সুতীক্ষ্ণের মত এত উচ্চমানের ঋষি মায়ামোহে সংসারের অন্ধকূপে পড়ে থাকবেন ভাবাই যায় না। ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, দেখো ভাই! সুতীক্ষ্ণের মত ঋষিই যদি এই মনে করে থাকেন তাহলে তুমি কোথায় ভাব। সেইজন্য এখানে যা বলা হচ্ছে সব কিছুকে আক্ষরিক ভাবে নেওয়া যায় না। আগেকার দিনে নবাবদের মধ্যে বা খুব সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারে কোন অতিথির আগমন হলে তাঁরা খুব মিষ্টি ও বিনয় নিয়ে কথা বলতেন। সুতীক্ষ্ণও এখানে ঠিক সেভাবেই শ্রীরামচন্দ্রের সাথে কথা বলছেন, আমি তো আপনার কাছে আসতে পারব না, তাই আপনি কৃপা করে আমার কাছে এসেছেন। সুতীক্ষ্ণ এখানে শ্রীরামচন্দ্রকে যে কথাগুলো বলছেন এর মধ্যে ভক্তিশাস্ত্রের অনেক দর্শন রয়েছে, যেমন বলছেন –

ত্বং সর্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োঽপ ত্বনমন্ত্রজাপ্যবিমুখেষু তনোষি মায়াম্।
ত্বন্মন্ত্রসাধনপরেষ্বপযাতি মায়া সেবানুরূপফলদোহসি যথা মহীপঃ।৩/২/২৯

হে রাম! আপনি সবারই হৃদয়ে বিরাজমান, সবারই অন্তর্যামী, তবে যারা আপনার মন্ত্রজপে বিমুখ তাদের আপনি মায়া বিস্তার করে মোহিত করে দেন আর যারা আপনার মন্ত্র সাধনে তৎপর আপনি তাদের উপর থেকে মায়াকে সরিয়ে দেন। আপনি আর কি করেন? রাজা যেভাবে প্রজাদের সেবানুসারে ফল দেয় ঠিক সেভাবে আপনি ফল দেন। কি রকম ফল দেন? আপনার মন্ত্র যে জপ করে তাকে আপনি মুক্তির দিকে নিয়ে যান, যারা আপনার জপ থেকে বিমুখ তাদের আপনি মোহমায়ার মধ্যে ফেলে দেন। এখানে সুতীক্ষ্ণ সরাসরি ভগবানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, আপনিই সবাইকে ঠেলে মোহমায়াতে ফেলে দেন। শুদ্ধ চৈতন্য অন্তর্যামী রূপে সবারই হৃদয়ে বিরাজমান। শুদ্ধ চৈতন্য ভেতরে না থাকলে মন কাজ করবে না, মন কাজ না করলে ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করবে না। আমি যখন হাত নাড়ছি তখন মস্তিষ্ক থেকে একটা নির্দেশ আসছে তাই হাত নাড়ছি। অন্য দিকে মস্তিষ্কও জড়, মস্তিষ্কের পেছনে চৈতন্য সত্তা আছেন বলেই মস্তিষ্ক কাজ করছে। যে মন্ত্র জপ করছে না, তাহলে সে কি করে? বিষয় চিন্তন নিয়েই থাকে। ঠাকুরও বলছেন হলুদ, লঙ্কা, পাঁচফোড়ন বলে চেঁচিয়ে উঠছে। এদের মনে নানা রকমের চিন্তা উঠছে। ভক্তিগীতিতেও বলছে কারে করো অধোগামী কারে দাও মা ব্রহ্মপদ। আসলে অন্তর্যামী অর্থাৎ চৈতন্য আছেন বলেই সব ক্রিয়া হচ্ছে, ভগবান কাউকেই কোথাও নিয়ে যান না। যে ঈশ্বর চিন্তন করে না সে বিষয় চিন্তন নিয়ে থাকবে, আর মানুষ যেটা চিন্তা করে পরে সেটাই সে করে। বিষয় চিন্তন যদি করে, পরে পরে বিষয় চিন্তনই করতে থাকবে। যদি ঈশ্বর চিন্তন করে, পরে পরেও ঈশ্বর চিন্তন করবে। ঈশ্বর চিন্তন কি করে করতে পারছে? ভেতরে অন্তর্যামী আছেন বলে। অন্তর্যামী কে? ঈশ্বর। জপের দিকে কে নিয়ে যাচ্ছেন? ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন। বিষয় ভোগের দিকে কে নিয়ে যাচ্ছেন? ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন। বিষয় চিন্তনের দিকে গেলে মার বেশি খেতে হবে। ঈশ্বর

চিন্তনের দিকে বেশি গেলে কি হবে? রাক্ষসগুলো যেমন ঋষিদের খেয়ে নিল, দুষ্ট লোকগুলো সেভাবে তাদের শেষ করে দেবে। খারাপ ফল দুদিকেই পাবে। আপনি কোনটা চাইছেন? আপনি যেটা চাইবেন, যেখানে নিয়ে যাবেন সেটা দেখবেন ঈশ্বরই হয়েছেন। ঈশ্বর ভাব যখন আমাদের মনে আসে আমরা ভাবি, বাজিকর যেমন পুতুল নাচায়, ঈশ্বর উপর থেকে তেমনি সবাইকে নাচাচ্ছেন। কখনই তা নয়, তিনি ভেতর থেকেই দেন। তিনি আছেন বলেই জগৎ নড়ছে। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাই চলে, কারণ অন্তর্যামী রূপে তিনিই হৃদয়ে বিরাজমান। রাজা যেভাবে সেবানুসারে ফল দেন তিনিও ঠিক সেইভাবে ফল দেন। কারণ ভগবান হলেন কর্মাধক্ষ্য, যে যা করছে সে যেন তার ফল ঠিক ভাবে পায়। ভগবান কি রূপে ফল দেন? ভগবান সব সময় একটাই ফল দেন, যে কাজটা সে করছিল সেই কাজটাই সে আরও বেশি করে করবে। স্বামীজী এই জিনিসটাকে বারবার তুলে ধরছেন। যখনই কোন কাজ করা হয় তখন সে কাজ মনে একটা ছাপ রেখে দেয়, ঐ ছাপ পড়ার জন্য দ্বিতীয়বার আবার সে ঐ কাজটাই করবে, তৃতীয়বার আবার করবে। জাগতিক যে ফলগুলো আমরা পাচ্ছি, এই ফলগুলো সব সময় অন্যান্য force থেকে আসে, সেগুলো ভগবানের জন্য আসে না। সবাই এসব কথা মানতে চাইবে না, কারণ এ ধরণের কথা কেউ কোথাও শোনেনি আর কোথাও শোনার সুযোগও পাওয়া যাবে না। ভগবান বা অন্তর্যামী শুধু এক ভাবেই ফল দেন, যেটা করছে সেটার প্রতি perfection এনে দেন, তার মানে আরও ওটাই করাবেন। যে চুরি করে, তার চুরি করার প্রবৃত্তি বাড়বে আর যে জপধ্যান করে তার জপধ্যান করার প্রবৃত্তি বাড়বে। এর বাইরে ভগবান আর কিছু দেন না। মা ছেলেকে আদর করছে দেখে কেউ হাসছে। এই হাসিটা ভগবান করাচ্ছেন না। তাহলে এটা কে করাচ্ছে, যে হাসছে সেই করাচ্ছে। সে কেন হাসছে? কারণ আগে আগে যাদের এই ভাবে আদর করতে দেখেছে তখন সে হেসেছে। তার ভেতরের অন্তর্যামী তাকে এই ধরণের প্রবণতা করে দিয়েছেন যেখানে এই রকম দেখবে তখন সে মনে করবে এগুলো এক ধরণের ন্যাকামো, সেইজন্য হাসছে। মা ছেলেকে আদর করছে কারণ তার অন্তর্যামী মাকে দিয়ে এই রকম করাচ্ছেন। সেই একই অন্তর্যামী আবার আরেকজনকে দিয়ে অন্য রকম করাচ্ছেন। তার হাসি দেখে মায়ের মন অসন্তুষ্ট হয়েছে, মায়ের অসন্তষ্টতা দেখে সেও হাসিটা একটা দমে নিয়েছে। মা একটা শিক্ষা পেল এবার থেকে লুকিয়ে ছেলেকে আদর করতে হবে, সেও শিক্ষা পেয়ে গেল এবার থেকে একটু কম হাসতে হবে। এটা কে করালেন? মায়ের অন্তর্যামী মাকে একটা ধাক্কা মেরেছে, তার অন্তর্যামী তাকে ধাক্কা মেরেছে।

ভগবান সব সময়ই ফল দিচ্ছেন। ভগবান যে ফল দেন তা হল আমাদের প্রবৃত্তিকে সেদিকে আরও বাড়িয়ে দেন। ঋষিরা তপস্যা করছেন, তাঁদেরও ঐদিকে প্রবৃত্তিটা বাড়ছে। রাক্ষসরা বদমাইশ, ঋষিদের এসে মেরে দিয়েছে। এতে রাক্ষসদের প্রবৃত্তি আরও বেড়ে গেল, আরও ঋষিদের মারতে হবে। এই করতে করতে আরও বেড়ে গেল। এরপর ভগবান একদিন এসে পুরো রাক্ষস জাতটাকেই নাশ করে দিলেন। এতেই বোঝা যায়, সব কিছু নিজের মতই চলতে থাকে, এগুলোকে নিয়ে বেশি ভাবতে নেই। কিন্তু নিজের জীবনকে নিয়ে যখন ভাবব তখন এটাই ভাবার, যেটা আমি করছি সেটা আমি আরও বেশি করে করব। স্বামীজী কর্মকে ঠিক এভাবেই পরিভাষিত করেছেন, যদিও অন্যান্য শাস্ত্রে এত পরিষ্কার আর যৌক্তিকতা দিয়ে দেখান হয়নি। নিওরোলজিতেও ঠিক তাই বলে, যখন কোন কিছু করা হয় মানে নিউরোন কানেকশান হয়, ঐ কানেকশান বেড়ে গেলে ঐ কাজ করার প্রবণতা আরও বেড়ে যায়। যার জন্য অসৎ লোকের সৎ হওয়া একটু কঠিন। ঠাকুর বলছেন, রসুনের বাটি যতই ধোও গন্ধ থাকবেই। সুতীক্ষ্ণ ঋষি যে বলছেন *সেবানুরূপফলদোহসি*, এর মানে প্রবৃত্তিটা বাড়িয়ে দেন। ভালো কিছু পেলে মনে করি ভগবান দিলেন, কিন্তু ভগবান কেন দিতে যাবেন, স্বভাবেই এসেছে, নিজে থেকেই হয়েছে। মার যখন খায় তখন কখন নিজের দোষে খাচ্ছে, কখন বিনা দোষে খাচ্ছে, এভাবে ভগবান কাউকে কিছুই দেন না, অন্যান্য forces গুলো কাজ করছে। পঞ্চাশটা force এলোপাতাড়ি হয়ে এর ওটাকে কেটে দিচ্ছে, ওর এটাকে ঠেলে দিচ্ছে, মাঝখান থেকে আবার কোথা থেকে একটা উদ্ভট জিনিস হতে শুরু করে দিল, এভাবেই সব চলে। সেইজন্য কখনই এসবের দিকে তাকাতে নেই, তাকাতে হয় ঐ একটা দিকে। ঈশ্বর যদি আমাকে freedom দেন – তোমার অন্ন চিন্তা নেই, তোমার আশ্রয় চিন্তা নেই এবার তুমি কোন একটা চিন্তনকে নিয়ে থাকতে চাও? অবশ্যই বলব, ঈশ্বর চিন্তন। সেইজন্য সবাইকে ধীরে ধীরে ঐদিকে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে আমি ঈশ্বর চিন্তনের দিকে যেতে পারি।

রামায়ণ, মহাভারতকে শাস্ত্র বলা হয়, ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালি ছেড়ে দিতে হয়। আমরা কিভাবে বিচার করব শাস্ত্রের কোনটা বালি আর কোনটা চিনি? চিনি আর বালি

বিচার করতে গেলে আমাদের আর শাস্ত্র পড়া হবে না। এই ধরণের মহাকাব্য, বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণ পড়ার সময় এর আধ্যাত্মিক সারটুকু ছাড়া আর কিছুই নেওয়া যাবে না। আধ্যাত্মিক সার নেওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় দেখতে হবে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাপারে বেদ উপনিষদ কি বলছে। বেদ উপনিষদে কোথাও আমরা পাই না যে মানুষকে রক্ষা করার জন্য ভগবান নেমে আসেন। শাস্ত্রে পাচ্ছি, রাক্ষসরা মুনি ঋষিদের মেরে খেয়ে নিত, ভগবান শ্রীরাম রূপে এসে সব রাক্ষসদের বধ করে দিলেন, এগুলো মূলতঃ কাহিনী, খুব বেশি আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। আর শ্রীরামচন্দ্র যদি এসেও থাকেন কিন্তু গত আড়াই হাজার বছরে আমরা কাউকে কি দেখেছি যিনি অসুরদের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করছেন। ভগবান বুদ্ধের কয়েকজন শিষ্য করেছিলেন বলে তাঁর খাওয়া-পড়া চলছিল। বুদ্ধের পর অবতার বলতে আমরা চৈতন্যদেবকে জানি, যাঁর শরীর একেবারে মাখনের মত তুলতুলে, তারপর এলেন ঠাকুর, তাঁরও শরীর মাখনের মত। শ্রীরামচন্দ্র আর শ্রীকৃষ্ণের পর আমরা কোথাও দৈত্য অসুরদের বধ করার ঘটনা পাই না। আচার্য শঙ্করও অবতারতত্ত্বের আলোচনায় কোথাও দৈত্য নাশ, রাক্ষস বধের কথা বলছেন না। তাহলে এই কাহিনীগুলোকে কেন দেখান হয়েছে? এই কাহিনীগুলোকে বলা হয় অর্থবাদ। অর্থবাদ মানে একটা বিদ্যার স্তুতি করা, যাতে সাধারণ মানুষের মন শাস্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। মনুস্মৃতি ছাড়া আমাদের যত শাস্ত্র আছে, বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মহাভারতে যদিও একটু কম, শুধু অর্থবাদ করে গেছেন। যাঁরা ঈশ্বরের পথে আছেন তাঁদের উপরও অনেক রকম ঝড়ঝাপ্টা আসে, কিন্তু তাঁর প্রিয়জনরা ভাবছে ভগবান তাঁকে রক্ষা করবেন। এই আত্মবলটা কোথা থেকে পাচ্ছে? রামায়ণ থেকেই পাচ্ছে। এগুলোকে কখনই আক্ষরিক নিতে নেই, নিলে কষ্ট পেতে হবে। এতে একটা শৌর্য, একটা শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে, এরপর আক্ষরিক ভাবে নিলে বিপদে পড়ে যাবে। গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে বিরাধের মত রাক্ষস আমরা কি দেখেছি? এগুলো আখ্যায়িকা, এই আখ্যায়িকার মাধ্যমে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে আমাদের মধ্যে ঢোকান হচ্ছে। এখানেই মারা হল রাক্ষস কিন্তু সুতীক্ষ্ণ মুনিতে এসে শুরু হয়ে গেল ঈশ্বর তত্ত্বের বর্ণনা।

ধর্ম সব সময় দুটো স্তরে চলে, একটা উচ্চস্তরে আরেকটা সাধারণ লোকেদের স্তরে। উচ্চস্তরে এসব চলবে না। তাহলে যিনি উচ্চস্তরে তিনি কি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পড়বেন না, মানবেন না? অবশ্যই পড়বেন। এই ধরণের শাস্ত্র না পড়লে বোঝাই যাবে না যে একটা কঠিন তত্ত্বকেও যে সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায়। এগুলোকে নিংড়াতে শুরু করলে বেদের কথাই বেরিয়ে আসবে। পুরো রামায়ণ, মহাভারতে বেদ ছাড়া কিছু নেই। ঠাকুরও শুনতেন, স্বামীজীও এইসব শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। তবে মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য যে বর্ণনাগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, সেই বর্ণনাতেই যদি আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে যায় তাহলে আর কিছুই হবে না। বালি বলতে কাহিনীর বিস্তারকেই বোঝাচ্ছে, চিনি বলতে বোঝাচ্ছে তার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ভাব রয়েছে। একটু কাহিনী যদি না থাকে, শুধু স্তুতিই যদি চলতে থাকে তাহলে সাধারণ মানুষের একঘেঁয়েমি এসে যাবে। এরজন্য তো গীতাই আছে, গীতা ছেড়ে আমরা কেন এগুলো পড়তে যাব! খাওয়ার সময় আমরা তেতোও খাই আবার টকও খাই, ঠিক তেমনি শাস্ত্রের সব ভাবকেই নিতে হয়। সেইজন্য বলছেন ঋষি মুনিদের তিনি রক্ষা করার জন্য রাক্ষদের নাশ করলেন।

আমার রক্ষা আর ঈশ্বর এই দুটোকে মিলে যখন ভাবা হবে তখন ঈশ্বরকে সব সময় নাড়ুগোপাল রূপে দেখলে জিনিসটা বুঝতে পারা যাবে। নাড়ুগোপাল, শিশু কৃষ্ণ তিনি কী আমাকে রক্ষা করবেন! তাঁর রক্ষাই আমাকে করতে হয়। এই ভাব মাথায় রেখে যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে আসবেন, তার জন্যই ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক জীবন হবে। আর আমরা যদি দিনরাত ভাবতে থাকি, আমি ঠাকুরের শরণাপন্ন হলাম তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন তাতে আমার রক্ষা হয়েও যেতে পারে আবার নাও হতে পারে। যদি না হয় আমরা বলব তিনি রক্ষা করলেন না, ঠিক আছে, তাতেও আমার শরণাগতির ভাব থাকবে। কিন্তু তার বদলে ঈশ্বরের প্রতি যদি বৈরাগ্য এসে যায় তাহলে তার পক্ষে বিপদের সম্ভবনা অনেক বেড়ে গেল। যে কথাগুলো মানুষের মনকে আকর্ষিত করার জন্য বলা হচ্ছে, সেই কথাগুলোকে আমরা যদি সত্য বলে গ্রহণ করে নিই সেটা আমাদের দোষ। আমরা যে এখানে শাস্ত্রের আলোচনা করছি, এতে আমাদের মন অত্যন্ত উচ্চস্তরে চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে আমি নিজের মত সাধনা করে এগিয়ে চলে যেতে পারব। স্বামীজী যে বলছেন each soul is potentially divine, goal is to manifest this divinity within, আমাদের একটাই কাজ আমাদের ভেতরে যে দিব্যত্ব আছে সেটাকে প্রকাশ করা। সব ভাবেই এই দিব্যত্বকে প্রকাশ করা যেতে পারে, আমার শৌর্য দিয়েও প্রকাশ করা যায়, আমার মাতৃত্ব ভাব দিয়েও

প্রকাশ করা যেতে পারে। এরপর বাকি কোন কিছুরই দাম নেই। এই কাহিনীগুলো আমাদের একটা উচ্চ ভাবের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা উচ্চ ভাবে চলে যাওয়ার পর সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র কাজ, এরপর আর কোন কিছুই হিসাবের মধ্যে আসবে না। নিজের জীবনকে বুঝুন, নিজের উদ্দেশ্যকে জানুন, বোঝা আর জানার পর বাকি সব কিছুকে ফেলে দিয়ে ঐ উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই একমাত্র সাধনা। সুতীক্ষ্ণ ঋষি আবার বলছেন –

বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিরহেতুরেকস্ত্বং মায়য়া ত্রিগুণয়া বিধিরশবিষ্ণু।
ভাসীশ মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিস্ত্বং যদ্বদ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্যনেকঃ।৩/২/৩০

আপনিই একমাত্র আছেন, আর এই সৃষ্টির আপনিই একমাত্র কারণ, জগতকে আপনিই ধারণ করে আছেন, আপনারই মায়ার দরুণ আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব রূপে দেখাচ্ছেন, তার মানে আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ। কিন্তু মজার ব্যাপার হল *ভাসীশ মোহিতধিয়াং বিবিধাকৃতিস্ত্বং*, মানুষ অবাক হয়ে এক অপরের দিকে তাকাচ্ছে, নিজের দিকে তাকাচ্ছে, সেটাও আপনি নিজেই নিজের দিকে তাকাচ্ছেন। নারী পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, পুরুষ নারীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়, একজনকে আরেকজনকে দেখে বলে তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। মানুষ মুগ্ধ চিত্ত হয়ে আছে। কে মুগ্ধ চিত্ত? সুতীক্ষ্ণ বলছেন, হে রাম আপনি নিজেই মুগ্ধ চিত্ত। যে মুগ্ধ চিত্ত সেও আপনি আর যাকে দেখে মুগ্ধ চিত্ত সেও আপনি। আপনি না হলে এই ভালোবাসাই হত না, আপনার জন্যই এই ভালোবাসা হয়। কি রকম জিনিসটা? *যদ্বদ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্যনেকঃ*, যেমন অনেক জলপূর্ণ পাত্রে সূর্য প্রতিবিম্বিত হয়ে সেই এক সূর্য অনেক সূর্য হয়ে যায়। সবাই এক অপরের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকাচ্ছে, নিজের দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকাচ্ছে। মুগ্ধ চিত্তে যার দিকে তাকাচ্ছে সে একবারও ভাবছে না, যাকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছি তিনিই ঐ রূপে ভাসছেন। কাউকে যখন ভালোবাসছে তখন মানুষ রূপেই তাকে ভালোবাসে। যাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে ভালোবাসছে সেও তিনিই আর যে মুগ্ধ চিত্ত সেও তিনিই। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে বলছেন, মানুষ কোন কিছুকে যে ভালোবাসে সে কখনই ঐ জিনিসটার জন্য ভালোবাসে না, ওর মধ্যে আত্মাকে দেখে বলেই ভালোবাসে। এখানে একটু অন্য ভাবে বলছেন। সব তাঁরই প্রতিবিম্ব, অথচ একটা প্রতিবিম্ব নিজের প্রতিবিম্ব বা অন্যের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটাই আশ্চর্যের। আপনিই সব কিছু হয়েছেন। এই ধরণের শ্লোক শাস্ত্রে অনেক জায়গায় এসেছে যেখানে ভগবানকে বলছেন, আপনিই বিভিন্ন রূপ আশ্রয় করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ রূপে দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের প্রায়ই বলা হয়, বাকি যা কিছু আছে, সাপ, বিছে, ব্যাঙ, বাঘ-সিংহ যা কিছু আছে, সেটাও তিনি। এটাকে অনুশীলন করা অসম্ভব, কিন্তু এটাই বাস্তব। যখন জাগতিক জ্ঞানে থাকে তখন সাপ, বাঘ-সিংহ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু যখন একত্ব বোধ হয় তখন দেখে সব কিছু তিনিই হয়েছেন। ঠাকুর যখন অদ্বৈত সাধনা করছিলেন, তখন একদিন গঙ্গার মাঝখানে নৌকায় দুজন মাঝি বিবাদ করতে করতে একজন আরেকজনকে চড় মেরেছে, চড়ের দাগ এসে ঠাকুরের শরীরে ফুটে উঠেছে। এর অবশ্য নিউরোলজিক্যাল অনেক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক পুরুষরা সৃষ্টিকে কখনই ঈশ্বরের বাইরে দেখেন না, তিনি দেখেন ঈশ্বরই সব কিছু হয়েছেন।

সুতীক্ষ্ণ ঋষি বলছেন, হে রামচন্দ্র! আপনাকে আজ আমি প্রত্যক্ষ দেখছি। আপনি সাক্ষীস্বরূপ, সবারই আপনি অন্তর্যামী, কিন্তু যারা জপধ্যান করে না তাদের আপনি কখনই প্রত্যক্ষ হন না। যাঁদের চিত্ত শুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁদের প্রতি আপনি প্রসন্ন হন, আপনার কৃপায় তাঁরা আপনার স্বরূপ বুঝতে পারেন। আপনার এই সুন্দর মনুষ্যবেশ, ধনুর্বাণধারী, সহাস্যবদন রূপ কোটি কোটি কামদেবের রূপের থেকেও অনুপম। ঠাকুরও বলছেন ঈশ্বরীয় রূপের কাছে রম্ভা, মেনকা, তিলোত্তমার রূপকে চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। ঋষি সব শেষে বলছেন –

জানন্তু রাম তব রূপমশেষদেশকাদ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশম্।
প্রত্যক্ষতোহদ্য মম গোচরমেতদেব পুপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাঙ্ক্ষে।৩/২/৩৪

হে রাম! যোগীরা আপনাকে বাক্যমনাতীত শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং দেশকালাদির পারে এই রূপে জানেন, কিন্তু আমার সামনে আমি আপনার যে রূপ প্রত্যক্ষ দেখছি এই রূপই যেন আমার হৃদয়ে সর্বদা ভাসমান থাকে, এই প্রার্থনাই আপনার কাছে করছি। শ্রীরামচন্দ্রের দুটি রূপ, একটা রূপ দেশকালে আবদ্ধ এবং আরেকটি রূপ দেশকালের বাইরে। ঠাকুরেরও তাই, ঠাকুরের একটা রূপ দেশকালে আবদ্ধ, আরেকটা দেশকালের পারে। দেশকালের পারে যে রূপ, সেটাই নির্গুণ-নিরাকার। সুতীক্ষ্ণ ঋষি বলছেন, আপনার ঐ নির্গুণ-নিরাকার রূপে আমার

প্রীতি নাই, আমার ঐ রূপ লাগবে না। দেশকালে আবদ্ধ যে রামরূপ সেই রূপই সুতীক্ষ্ণের লাগবে। এই যে শ্রীরামচন্দ্র আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন, এই রূপেই আমি যেন সব সময় আপনাকে দেখতে পাই। আসলে মানুষের মন সীমিত রূপকেই বেশি সহজে চিন্তা করতে পারে।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, তোমার মন নির্মল হয়ে গেছে আর আমি জানি আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন আশ্রয় নেই। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যাঁরা আমার মন্ত্রোপসনা করেন তাঁরা আমারই শরণে থাকেন। তোমার অবশ্যই সাযুজ্য মুক্তি লাভ করবে। সাযুজ্য মুক্তি মানে, যখন তোমার শরীর চলে যাবে তখন তুমি আমার সাথে এক হয়ে যাবে। সুতীক্ষ্ণ ঋষিকে আশীর্বাদ করার পর শ্রীরামচন্দ্র আরও দক্ষিণের দিকে, যেদিকে অগস্ত্য মুনির আশ্রম, সেইদিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। অগ্রসর হতে হতে শ্রীরামচন্দ্র প্রায় অগস্ত্য মুনির আশ্রমের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। সুতীক্ষ্ণ ঋষিও সঙ্গে আছেন। অগস্ত্য মুনির কাছে খবর পাঠানো হল শ্রীরামচন্দ্র আপনার সাথে দেখা করতে আসছেন। খবর শুনে অগস্ত্য মুনি বলছেন, আমি তো শ্রীরামচন্দ্রেরই ধ্যান করি, আমি তাঁর অপেক্ষাতেই বসে আছি, ওনাকে সত্বর সসম্মানে নিয়ে এসো।

উত্তর ভারতে হিন্দী ভাষী অঞ্চলে রামকথার উপর একটা নামকরা প্রচলিত মত যে, শ্রীরামচন্দ্র আদৌ লঙ্কায় জাননি, মধ্যপ্রদেশেই তিনি ছিলেন। পরবর্তি কালে অনেক ঐতিহাসিকও এর উপর আলোকপাত করেছেন। এমনকি বিদেশী পণ্ডিতরা হিন্দু ধর্মের ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর আধার করে অনেক তথ্যমূলক বই ও প্রবন্ধাদি লিখছেন। এর মধ্যে একজন নামকরা লেখক উইলিয়ম ডালরিম্পন। ওনার একটা বই ইণ্ডিয়ান ওডিসিতে উনি এর উপর চর্চা করতে গিয়ে বলছেন, ভারতের কয়েকজন বিদ্বদজন বলছেন শ্রীরাম আদৌ লঙ্কায় জাননি, রাবণ বলে কেউ ছিল না, ইত্যাদি। একটা পরম্পরাকে সামনে রেখে চলার সময় পুরো ছবিকে নিয়েই চলতে হয়। রামকথা শুরু করার সময়ই আমরা এই আইডিয়াটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, রামকথাই হোক, ভাগবত কথাই হোক এগুলোকে কখনই ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে নিতে নেই। ঐতিহাসিক সত্য রূপে নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এগুলোকে বলা হয় শাস্ত্র, শাস্ত্রের কাজই হল শাসন করা। শাসন করতে গিয়ে তাঁরা জীবনের চারটি উদ্দেশ্য, ধর্ম, অর্থ, কাম আর মোক্ষের কথা বলেন। এই চারটের বাইরে কোন কথা বলাই শাস্ত্রের কাজ নয়। চারটেকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জীবন চালানোর জন্য আরও যে আনুষাঙ্গিক জিনিসের প্রয়োজন, এটা করবে, এটা করবে না, এগুলোকে নিয়েও আলোচনা করেন। এই কথাগুলো সরাসরিও বলা যায়, যেমন মনুস্মৃতি আদি স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে। উপনিষদেও সরাসরি বলা আছে আবার ছোট ছোট আখ্যায়িকারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ এভাবে সরাসরি কিছু নিতে পারে না। মানুষের মনের গঠন শৈলী বিচিত্র। মানুষের মনে চিত্র অঙ্কন জিনিসটা আগে এসেছে এবং অক্ষর জ্ঞান ও শব্দ বিন্যাস পরে এসেছে। চিত্র অঙ্কন এখনও আমরা ছেড়ে দিইনি, যদিও আমরা ইদানিং শব্দের উপর বেশি ভরসা করি। শব্দের একটা সুবিধা হল শব্দ দিয়ে দশ জন মানুষের সাথে সহজে ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। সেই দশ জন আরও দশ জনকে বলে দিতে পারি। অঙ্কনে এই জিনিসটা হয় না, যিনি আঁকছেন ওটা তাঁরই বিশেষত্ব, ঐ আঁকা দশজনকে দিলে তাঁর মত আঁকতে পারবে না। মানুষের স্মৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে শব্দের দরকার, যদিও তার মধ্যে চিত্রকলা আছে। ঠিক তেমনি সুর আগে এসেছে কথা পরে এসেছে। সুর আগে আসে বলেই পাখিরা গান করতে পারে। মানুষের vocal chord অনেক পরে evolve করেছে, আরোহ অবরোহ জিনিসগুলো আগে এসেছে। ঠিক ঠিক শব্দ গঠন অনেক পরে এসেছে। শব্দ গঠন এসে যাওয়ার পরেও চিত্রকলা যেমন থেকে গেল ঠিক তেমনি সুরের ব্যাপারটাও থেকে গেল আর তার সাথে গল্প করা, কাহিনীর মাধ্যমে যখন একটা জিনিসকে বলা হয় তখন সেটা মানুষের মনে অনেক বেশি রেখাপাত করে। হিন্দুরা সব কিছুকে শ্লোকে ছন্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন, ছন্দের সাথে সুরের একটা সম্পর্ক আছে। মানুষের মন ছন্দকে খুব ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারে। মনুস্মৃতিতে যদিও সরাসরি কথাগুলো বলে দেওয়া হয়েছে, সত্য কথা বলবে, প্রিয় কথা বলবে, অপ্রিয় সত্য কথা কখনই বলবে না। কিন্তু এগুলোকেই যদি কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয় তখন এর প্রভাব অনেক বেশি থাকে। পরবর্তি কালে বাল্মীকির মত ঋষি মনীষীদের মধ্যে গল্প বলার একটা প্রতিভা ছিল, আর লোকেদের শোনারও আগ্রহ ছিল। এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে এনারা শাস্ত্র বাক্য বা শাসন বাক্যকে কাহিনীর মাধ্যমে রাখছেন। আমরা এখানে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য জানতে এসেছি, জানার জন্য আমাদের প্রথমেই সাবধান করে দিতে হচ্ছে যে শাস্ত্র বাক্যকে কখনই ঐতিহাসিক সত্য রূপে নিতে নেই। যারা এগুলোকে ঐতিহাসিক সত্য রূপে নেবে তখন তাদেরই সমস্যা হবে।

<u>অগস্ত্য মুনি</u>

ঐতিহাসিক সত্য রূপে আমাদের কাছে অনেক মিথ্ এসেছে, অগস্ত্য মুনির মিথ্ তার মধ্যে একটি অন্যতম মিথ্। রামায়ণ, মহাভারতের মত হিন্দুদের বিভিন্ন শাস্ত্রে অগস্ত্য মুনির কাহিনী এসেছে। অগস্ত্য মুনির সাংঘাতিক যোগশক্তি ছিল। অগস্ত্য মুনির এমনই যোগশক্তি ছিল যে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভাষ্য লিখতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন, ব্রাহ্মণ বংশে অগস্ত্য মুনির জন্ম হয়েছিল আর তাঁর এমন যোগশক্তি ছিল যার জন্য ব্রাহ্মণদের সম্মান করা হয়, আজকেও যে ব্রাহ্মণ দেবতাদের এত সম্মান করা হয় অগস্ত্য মুনির জন্যই করা হয়। যেমন স্বামীজী, একশ বছর আগে স্বামীজীর এমন উপলব্ধি হয়েছিল যে আজকেও রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সম্মান করা হয়। বংশের কেউ যদি বড় হয়ে যান ঐ বংশের সবাইকেই আমরা সম্মান করি। আমাদের মাথায় বসে আছে যে, আমেরিকায় যেই গেছে সে একজন কোটিপতি হয়ে গেছে আর যারা ওখানে আছে তারাও কোটিপতি। ঠিক তেমনি অগস্ত্য মুনি বিরাট যোগশক্তি সম্পন্ন ছিলেন বলে আজকেও আমরা ব্রাহ্মণদের সম্মান করি।

অগস্ত্য মুনিকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। তার মধ্যে একটা কাহিনী হল, উনি বিবাহ করবেন ঠিক করলেন। বিবাহ করার জন্য টাকার দরকার। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অনেক জায়গায় যাচ্ছেন। সেই সময় ইল্বল আর বাতাপি নামে দুই অসুর ছিল, দুজনেই ছিল ব্রাহ্মণদ্রোহি। কোন ব্রাহ্মণ এলেই বাতাপি ছাগল হয়ে যেত আর ইল্বল সেই ছাগলকে বলি দিয়ে দিত। সেই ছাগলের মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণদের খাইয়ে দিত। খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর ইল্বল চিৎকার করে বাতাপির নাম ধরে ডাকত, বাতাপি তুমি বেরিয়ে এসো। ছাগলটা তখন মানুষ হয়ে ব্রাহ্মণদের পেট চিড়ে বেরিয়ে আসত। এই ভাবে দুজনে মিলে অনেক ব্রাহ্মণ মেরেছিল। অগস্ত্য মুনি ওদের কাছে কিছু অর্থের জন্য গেছেন। ওখানে যেতেই যোগশক্তিতে তিনি বুঝে গেছেন অসুর দুটো এই করতে যাচ্ছে। যথারীতি বাতাপি ছাগল হয়ে গেছে আর ইল্বল তাকে বলি দিয়ে অগস্ত্য মুনিকে তার মাংস আর তার সাথে প্রচুর সুরা পান করিয়েছে। খাওয়ার পর অগস্ত্য মুনি বিরাট এক ঢেকুর তুলেছেন। ইল্বল তখন ডাকছে, বাতাপি তুমি বেরিয়ে এসো। অগস্ত্য মুনি বলছেন, বাতাপি আর কোথা থেকে বের হবে, হজম হয়ে গেছে। সেকেণ্ডের মধ্যে, পেটে যেতে না যেতেই বাতাপির মাংস তিনি হজম করে নিয়েছেন। ইল্বল বুঝে গেছে আমি এক সাংঘাতিক ব্রাহ্মণের পাল্লায় পড়েছি। আরেকটা কাহিনীতে আছে, অসুররা দেবতাদের খুব জ্বালাতন করত। তাড়া করলে অসুরগুলো সমুদ্রের তলায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। অসুরদের ধরার একটাই পথ, সমুদ্রে যেহেতু লুকিয়ে যায় তাই সমুদ্রকেই শুকিয়ে দিতে হবে। অগস্ত্য মুনিকে সব বলা হল। অগস্ত্য মুনি সব শুনে সমুদ্রের কাছে গিয়ে দু হাতে সমুদ্রের জল তুলে পান করতে গিয়ে তিনি পুরো সমুদ্রকেই পান করে নিলেন। সমুদ্র এখন ফাঁকা মাঠ। অসুরদের আর পালানোর পথ থাকল না। পরে ভগীরথ সগর বংশের সন্তানদের উদ্ধার করার জন্য গঙ্গাকে মর্ত্যে অবতরণ করিয়ে সমুদ্রকে আবার ভরে দিলেন।

অগস্ত্য মুনি এতই বিখ্যাত মুনি ছিলেন যে দেবতারা তাদের এক বিরাট সমস্যা হওয়াতে আবার তাঁরা অগস্ত্য মুনির শরণাপন্ন হলেন। সূর্য সুমেরু পর্বতের চারিদিকে পরিক্রমা করে। এক হাজার খ্রীষ্টাব্দে আলবেরুনি যখন ভারতে এলেন তখনও মানুষের এই ধারণাই ছিল। আরব দেশ তখন গণিত শাস্ত্র অনেক উন্নত ছিল। সেই সময় তাদের মধ্যে অনেক ধরণের প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছিল কিন্তু তখনও গ্যালিলিওর সিদ্ধান্ত পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে আসেনি। কিন্তু অন্যান্য অনেক সিদ্ধান্ত আসতে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আলবেরুনি তাঁর লেখাতে সুমেরু পর্বতের চারিদিকে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে এর উপর অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। সুমেরু পর্বত বলে যদি কিছু থাকে আর তার চারিদিকে যদি সূর্য প্রদক্ষিণ করে থাকে তাহলে কি কি ফ্যালাসি হতে পারে তিনি সব দেখিয়ে দিলেন। মানুষ যাকে ভালোবাসে, যাকে শ্রদ্ধা করে তার চারিপাশেই মানুষ পরিক্রমা করে। সূর্য যদি সুমেরু পর্বতের চারিদিকে পরিক্রমা করে তাহলে সুমেরু হল বিরাট প্রতিষ্ঠাবান। কিন্তু দক্ষিণ দেশে আছে বিন্ধ্যাচল পর্বত। বিন্ধ্যাচল পর্বত সেও কম যায় না। সে বলল, সুমেরু পর্বত কী এমন প্রতিষ্ঠাবান যে সূর্যকে তার চারিদিকে পরিক্রমা করতে হবে, সূর্যকে আমার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। বিন্ধ্যাচলকে যদি প্রদক্ষিণ করতে হয় তাহলে তাকে বড় হতে হবে। বিন্ধ্যাচল এখন বড় হতে শুরু করেছে। এমন বড় হতে শুরু করেছে যে সূর্যের পথ আটকে যাবে। সবাই বিন্ধ্যাচলকে নিষেধ করছে, তুমি এই রকম করো না। বিন্ধ্যাচলও কোন কথা শুনতে রাজী নয়। তখন সবাই অগস্ত্য মুনিকে ধরলেন। অগস্ত্য মুনি তখন দক্ষিণের দিকে এগোতে শুরু করে বিন্ধ্যাচলের কাছে পৌঁছে গেছেন। বিন্ধ্যাচলকে বলছেন, বিন্ধ্যাচল আমি এখন দক্ষিণ দেশে যাব, তুমি আমাকে একটু পথ দাও। বিন্ধ্যাচল

তখন মাথা নুইয়ে দিয়েছে। অগস্ত্য মুনি এগিয়ে গেলেন, যাওয়ার সময় বললেন, আমাকে আবার এই পথ দিয়েই আসতে হবে। বিন্ধ্যাচল বলল, প্রভু! আপনি যত দিন না ফেরত আসছেন ততদিন আমি মাথা নুইয়েই রাখব। অগস্ত্য মুনি সেই যে দক্ষিণ দেশে গেলেন তিনি মানবজাতি হিতের জন্য আর ফেরত এলেন না। আধ্যাত্মিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই কাহিনীর একটা অর্থ করা হয়। ভারতের দক্ষিণ দেশে বেদের প্রচলন ছিল না। অগস্ত্য মুনিই প্রথম যিনি ধীরে ধীরে দক্ষিণ দেশে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের সংস্কৃতিকে নিয়ে গেলেন। যার জন্য দেখা যায় শ্রীরামচন্দ্র যত দক্ষিণ দেশের দিকে এগোচ্ছেন তত ব্রাহ্মণের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। দক্ষিণ দেশে অগস্ত্য মুনিকে অবতার রূপেই মানে। কারণ তিনিই দক্ষিণ ভারতে বেদের প্রচলন করলেন। আমরা জানি বেদের রচনা হয়েছে সিন্ধু নদীর ধারে। সেখান থেকে বেদের সংস্কৃতি আস্তে আস্তে সারা ভারতে ছড়িয়ে গেছে। ইতিহাসেই দুটো পথের কথা বলা হয়, উত্তর পথ আর দক্ষিণ পথ। দক্ষিণ পথ ধরে যে বেদের সংস্কৃতি গেছে এটাকে ওনারা পুরো অগস্ত্য মুনির উপর রেখে দিলেন। এই কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অগস্ত্য মুনি প্রথম ব্রাহ্মণ যিনি বেদকে দক্ষিণ দেশে নিয়ে গেছেন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী লোপমুদ্রাও চিরদিনের জন্য দক্ষিণ দেশে চলে গেলেন। এগুলো বিচার করলে বোঝা যায় যে, শ্রীরামচন্দ্র যে লঙ্কায় যাননি এই তত্ত্ব খাপ খায় না।

তবে রামকথার ইতিহাস সঠিক ভাবে আমরা কিছুই জানি না। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ছিলেন, সেখান থেকে তিনি কত দূর গিয়েছিলেন, কোথায় সেই অযোধ্যা আর কোথায় লঙ্কা, আদৌ রাবণ বধ হয়েছিল কিনা, সেতুবন্ধ হয়েছিল কিনা, এগুলো আমরা কিছুই জানি না। বৃটিশ শাসন পদ্ধতির একটা প্রধান কৌশলই ছিল বিভেদ তৈরী করে দেওয়া। জাতিপ্রথা নিয়ে এত সমস্যা, কিন্তু বৈদিক যুগে ভারত জাতিপ্রথার সমস্যার কথা জানতই না, এটাকে প্রথম প্রসিদ্ধ করে দিল বৃটিশরা। বৃটিশদের দ্বিতীয় বিভেদ নীতি হল হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করা। এই দুই সম্প্রদায় এক অপরকে কোন দিনই পছন্দ করত না, এটাকেই বৃটিশরা হাতিয়ার করে একেবারে তুঙ্গে নিয়ে চলে গেল। একই ভাবে সংস্কৃত আর তামিল সংস্কৃতিকেও বৃটিশরা বিভেদের মধ্যে ঠেলে দিল। বৃটিশরা যেখানেই যাবে সেখানেই খুব সুন্দর ভাবে বিভেদ তৈরী করে দেবে। প্রথমে চারটে গ্রুপ দেখবে, তারপর তার মধ্যে একটা গ্রুপকে একবারে উপরে তুলে দেবে, আরেকটা গ্রুপকে অবহেলার দৃষ্টি দিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়ে ওদের মধ্যে বিবাদ তৈরী করে ওদের মধ্যেই রাজা হয়ে বসে গিয়ে সবাইকে শাসন করতে থাকবে। ভারতে যাঁরাই হিন্দুদের দর্শন, ইতিহাস সম্বন্ধে জানেন তাঁরা সবাই রামকথা জানেন। কিন্তু এর মধ্যেও কি করে ও কিভাবে অনেক ভুল তথ্য রামকথার মধ্যে ঢুকে পড়েছে বলা খুব মুশকিল। বৌদ্ধ ধর্মেও রামকথা আছে, সেখানে আবার সীতাকে শ্রীরামের বোন হিসাবে দেখান হয়েছে। নিজের বোনকে বিয়ে করেছে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র পরে ভিক্ষু হয়ে যান। সব ধর্মেই নিজের ধর্মকে বড় করার জন্য অপরকে ছোট করে দেয়। আরেকজন লেখক আবার সীতাকে রাবণের মেয়ে বানিয়ে দিয়েছে। রামকথা এত নামকরা কাহিনী যে, এই কাহিনীকে আধার করে যার যেমন দরকার হয়েছে সে তখন বানিয়ে একটা কিছু লিখে দিয়েছে। দুশ বছর হয়ে যাওয়ার পর ঐ কাহিনীটাই প্রচলিত হয়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়ণে, এমনকি অধ্যাত্ম রামায়ণেও কোথাও উল্লেখ নেই যে সীতার স্বয়ম্বর হয়েছিল। অথচ রামায়ণ সিরিয়ালে আমরা দেখছি সীতার স্বয়ম্বর হচ্ছে। রামানন্দ সাগর সীতার স্বয়ম্বর কোথায় পেলেন? পরের দিকে যারা রামায়ণ কথা লিখেছে সেখানে কাহিনীতে রস আনার জন্য সীতার স্বয়ম্বর করিয়ে দিয়েছেন।

অগস্ত্য মুনির আশ্রমে শ্রীরামের আগমন

শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্য মুনির আশ্রমে যেতেই অগস্ত্য মুনি এগিয়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করে বলছেন, হে রাম! আপনার মঙ্গল হোক। আমার বিরাট সৌভাগ্য যে আপনার দর্শন লাভ করতে পারলাম। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা আর লক্ষ্মণ তিনজনই অগস্ত্য মুনিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। আপ্যায়নাদি সমাপন হয়ে যাওয়ার পর অগস্ত্য মুনি অনেক কথা বলছেন। এখানে পর পর কয়েকটি শ্লোকে একেবারে শুদ্ধ বেদান্তের কথা বলছেন। প্রথমে বেদান্তের দৃষ্টিতে সৃষ্টি কিভাবে হয় বলছেন।

অগস্ত্য মুনি বলছেন, হে রাম! অনেক আগে আপনি যখন ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থান করছিলেন তখন ব্রহ্মা আপনার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন আপনি আসবেন, সেইদিন থেকে আমি আপনার অপেক্ষায় আছি। এই জায়গাতে আমরা যদি খুব সাধারণ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে বলতে হয় একজন মানুষের আয়ু খুব জোর একশ বছর।

একটু rationally দেখলে রাবণের বয়স একশ বছরের উপরে যেতে পারে না। আর রাবণ যেভাবে ভোগে নেমে আছে তাতে তার বয়স পঞ্চাশ ষাটের উপর হওয়ার কথা নয়। রাবণের অত্যাচার হয়েছে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গেছেন, প্রার্থনা করেছেন, তারপর ভগবান এসেছেন। এই পুরো ব্যাপারটাতে কত সময় লাগার কথা? পনের থেকে কুড়ি বছরের বেশি হওয়ার কথা নয়, তা নাহলে তত দিনে রাবণ বৃদ্ধ হয়ে যাবে, বৃদ্ধ হয়ে গেলে তার আর ভোগের ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু এই ধরণের সাহিত্যে হাজার বছর কোন ব্যাপারই নয়। একটা সংখ্যা লিখে তার পাশে কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দেওয়া এনাদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। না করলে এই ধরণের সাহিত্যও সৃজন হবে না। কৃষ্ণকথাতে তাও কিছুটা কম, কিন্তু রামকথাতে হাজারের নীচে কিছুই বলবেন না। এই হাজার বছরের ক্ষেত্রেও তাই আর দূরত্বের ব্যাপারেও তাই। একটা বাণ মারলে কত দূর গেল বলতে গিয়ে কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দেবেন। এইভাবে না বললে কাহিনী তৈরী হবে না। অগস্ত্য মুনি বলছেন, যেদিন থেকে আমি শুনেছি আপনি অবতার হয়ে আসবেন, সেদিন থেকে আপনার দর্শন হবে এই অপেক্ষায় বসে আছি। ঐ ভাব, রাম জন্মের আগে রামকথা লিখে দেওয়া হয়েছে। কারণ ঈশ্বরের কাছে অজানা বলে কিছু নেই, আর যিনি মুনি তিনি ঈশ্বরের সাথে এক। তাই তিনি আগে থেকেই জানেন কি কি ঘটবে। কাশ্মীরে এত বন্যা হয়ে গেলে, কত লোক মারা গেল। যারা বেঁচে গেছে, বলছে আল্লার মর্জিতে তারা বেঁচে গেল। মিলিটারিরা এত উদ্ধার কাজ করছে, তখন বলছে তারা তাদের ডিউটি করছে। এটাই ধর্মের নামে duplicity। যারা রক্ষা পেল আল্লার মর্জিতে রক্ষা পেল আর সৈন্যরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার কার্য করে গেল, সেটাকে বলছে সে তার ডিউটি করছে।

যারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মানে না তাদের অনেক শান্তি। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর দিতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, এত লোক কেন মারা গেল, এত লোকের কেন কষ্ট হচ্ছে। তোমরা বনসৃজন করোনি, তোমাদের বাঁধ ঠিক মত maintain করোনি, বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, এরমধ্যে ঈশ্বরকে জড়ানোর কি দরকার! বৃষ্টি যে কোন সময়ই হতে পারে, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা তোমরা ভালোভাবে করে রাখনি আর নদীর তিনি চারটে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। বন্যা তো হবেই। এর মধ্যে তোমার মৃত্যুতেও আল্লার কোন হাত নেই, তোমাকে বাঁচাতেও আল্লার কোন হাত নেই। কিন্তু আমাদের সবাইকেই বলতে হয় ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের কৃপা। ভক্তরাও বলছেন সাধুরাও বলছেন। আধ্যাত্মিকতায় শরণাগতির ভাব একটা আলাদা জিনিস। শরণাগতি আর অক্রিয়তা বা passivity দুটো পুরো আলাদা জিনিস। ভগবানে পূর্ণ শরণাগত, প্রভু তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, এই ভাব যখন হয় তখনই সব তাঁর ইচ্ছাতে হয়। কথামৃতের পাতায় পাতায় ঠাকুর শরণাগতির কথা বলছেন। শরণাগতি সমস্যা হল, লোকে এটাকে passivityতে নিয়ে চলে যায়, আমি কিছু করব না, যা হবার হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কখনই passivityতে নেওয়া যায় না। একটুও যদি আমি বোধ থাকে তাহলে তাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আমি বোধ চলে গেলে তখন আসে শরণাগতির ভাব। রাম জন্মের আগে রামকথা লেখা হয়ে গেছে, এগুলোই ভাবরাজ্যের দর্শন। ভাবরাজ্যে সব কিছু এভাবেই চলে, এই ভাব পাল্টানো যায় না। কিন্তু সেখানেও যদি সবটাই অজানা অচেনা জিনিসগুলো চলে আসে তাহলে তা কখনই ভাবরাজ্যের কাহিনী হবে না। ভাবরাজ্যের কথা হল, ভগবান আগে থেকেই সব জানেন। গীতাতেও তাই বলছেন, ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবই আমার জানা। তাহলে রামের যা কিছু হবে ভগবানের আগে থেকেই সব জানা। আর যিনি ঋষি, যাঁর মন একেবারে শুদ্ধ, যিনি পরমাত্মার সাথে এক, তিনি তো আগে থেকেই জানবেন। ঠাকুর বলছেন, আমি ভাবে দেখলাম আমি এক দেশে গেছি সেখানে সব সাদা চামড়ার মানুষ। শুনে শ্রীমা ঘাবড়ে গেছেন, তোমার তো পেট খারাপ ওখানে থাকবে কী করে! এই জিনিসটাই অগস্ত্য মুনি বলছেন, আমি আগে থেকেই জানি আপনি এই পথ দিয়েই যাবেন আর তখন থেকেই আমি আপনার প্রতিক্ষায় আছি। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভাব। ভক্তিরও নিজস্ব যুক্তি আছে, জাগতিক যুক্তিতে ভক্তি চলে না। ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করলে দেখবে সেখানে তার নিজস্ব একটা যুক্তি এসে গেছে। যাই হোক, অগস্ত্য মুনি সৃষ্টি তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীনির্বিকল্পেহনুপাধিকঃ।
ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে।৩/৩/২০

কুড়ি, একুশ আর বাইশ এই তিনটে শ্লোকে মায়াকে ব্যাখ্যা করছেন। ধর্মীয় দর্শনে সৃষ্টিকে সাধারণত দুটো দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী হল তাঁর ইচ্ছা। বেদান্ত যা কিনা হিন্দু ধর্মের মূল দর্শন, তাঁরাও কয়েকটা থিয়োরীকে নিয়েছেন। প্রথম থিয়োরী হল মায়া, প্রকৃতি, শক্তি, অব্যাকৃত। বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন

শব্দগুলোকে নিয়ে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করেন। মূল বক্তব্য হল, চৈতন্য সত্তা পেছনে আছেন, চৈতন্য সত্তার সামনে একটা জড় সত্তা এসে যায়। এই জড় সত্তা কি বাস্তবিক, নাকি কাল্পনিক, না অর্ধ বাস্তবিক, এটাকে নিয়ে বিভিন্ন দর্শন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করতে থাকেন। যখন এনারা বলেন জিনিসটা এই রকম তখন সবাইকে দুটো জিনিসকে নিতে হয়, একটা হল বেদে এই রকম কথা আছে কিনা আর দ্বিতীয় যুক্তিতে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে কিনা। অন্য দিকে ব্রহ্মসূত্রে অন্যান্য দর্শনে যে প্রকৃতি, শক্তির কথা বলছে যুক্তি দিয়ে দেখান হয়েছে এগুলো কিভাবে ভুল। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে আচার্য বেদ থেকে এনেই দেখাচ্ছেন, তোমরা বেদ থেকে যে কথা নিয়ে এসেছ তা ঠিকই এনেছ কিন্তু বেদেই অমুক জায়গায় এটাকেই contradict করা হয়েছে আর যুক্তিতে জিনিসটা এই ভাবে হবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ হল সমন্বয় শাস্ত্র, সমন্বয় শাস্ত্র হওয়ার জন্য বলছেন *সৃষ্টেঃ প্রাগেক*, সৃষ্টির আগে একমাত্র আপনিই ছিলেন। *এবাসীনির্বিকল্পেহনুপাধিকঃ*, আপনার কোন বিকল্প নেই অর্থাৎ আপনি ছাড়া অন্য কিছু নেই, আর আপনার কোন উপাধি নেই। ঈশ্বরকে এখানে তিনটে বিশেষণ দিয়ে বলছেন, প্রথম *একঃ*, দ্বিতীয় *নির্বিকল্পঃ* আর তৃতীয় *নিরুপাধিকঃ*।

ঈশ্বরের কথা এলে নিরুপাধিক আর সোপাধিক এই দুটো কথা প্রায়ই বলা হয়। উপাধি মানে যা দিয়ে কাউকে জানা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কবি বা গুরুদেব। গুরুদেব হল তাঁর উপাধি। কবি অনেকেই আছেন কিন্তু সবাই কবিতা লিখতে পারবে না, কবি বললেই আমাদের মনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম মনে পড়ে, কবি হল তাঁর উপাধি। মানুষ এটাও একটা উপাধি, জীবজন্তুদের মধ্যে সবার উপরে যে, সবার থেকে বিলক্ষণ। আবার যখন কবি বলছি তখন শত শত কোটি মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বোঝাচ্ছে। আর তার মধ্যে যখন বলছি কবিগুরু বা গুরুদেব তখন সোজা একজনের দিকে চলে যাবে। উপাধি একজনকে সবার থেকে পৃথক করে দেয়, ঐ উপাধি দিয়ে তাঁকে জানা যায়। নামের সাথে গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য এগুলোও উপাধি। ঠাকুর ছিলেন চট্টোপাধ্যায় বংশের কিন্তু পূজো করছেন তাই তাঁকে ভট্চারজি মশাইও বলছেন। উপাধি বলতে আবার বলছেন, একটা জিনিসের উপর অনেকগুলো আবরণ। আপনি আপনার মেয়েকে বললেন ঐ গ্লাশটা নিয়ে এস তো মা। মেয়ে জানতে চাইল কোন গ্লাশটা? আপনি বলছেন, কাঁচের গ্লাশটা যেটার উপর ঢাকনা দেওয়া আছে। এইভাবে একটা জিনিসকে অন্যান্য জিনিস থেকে আলাদা করা হয়। গ্লাশ অনেকগুলো আছে, কিন্তু তার মধ্যে কাঁচের গ্লাশ, কাঁচটা গ্লাশের উপাধি। কাঁচের গ্লাশও অনেক আছে, কিন্তু যার উপর ঢাকনা দেওয়া আছে, আবার একটা উপাধি এসে গেল। একটা জিনিসকে জানার জন্য উপাধি দরকার, উপাধি ছাড়া জানা যাবে না। ভগবানের কোন উপাধি নেই, তাই কোন কিছু দিয়েই ভগবানকে জানা যাবে না। দ্বৈতবাদী আর অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক বাদবিতণ্ডা চলে। দ্বৈতবাদীরা বলে তিনি হলেন করুণাময়, তিনি কৃপাময়। মাধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদে আবার বলতে চান এগুলো ভগবানের উপাধি নয়, এগুলো উপাধির মধ্যে পড়ে না। বেদেই বলছে সোপাধিক ও নিরুপাধিক, তার মানে ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করা যায়। কিন্তু একটা মানুষকে ইঙ্গিত করার জন্য যত রকমের উপায় হতে পারে, ভগবানের মধ্যে তার কোনটাই নেই। না আছে তাঁর জাতি, না আছে তাঁর লিঙ্গ, না আছে তাঁর কোন বৈশিষ্ট, এগুলো খুব সাধারণ উপাধি কিন্তু এর কোনটাই ভগবানের মধ্যে নেই। তারপরে বলছেন নির্বিকল্প, তাঁর কোন বিকল্প নেই। একটা জিনিসকে জানার জন্য বলা হয় স্বাজাতীয় ভেদ আর বিজাতীয় ভেদ। স্বাজাতীয় ভেদ মানে যেমন এই গ্লাশ থেকে বোতল আলাদা, বোতল আবার টেবিল থেকে আলাদা। এগুলো দিয়ে জিনিসটাকে জানা যায়। ভগবানের কোন বিকল্প যদি থাকত তবেই আমরা জানতে পারতাম, কিন্তু তাঁর বাইরে তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। এই যে এতগুলো কথা বলা হচ্ছে, তাঁর না আছে কোন উপাধি, না আছে কোন বিকল্প তার মানে বলতে চাইছেন ভগবানকে জনার কোন পথ নেই। জানার কোন পথ যদি নাই থাকে তাহলে আদৌ তিনি কি আছেন? এই ভুলটা যাতে কেউ করে না বসে সেইজন্য বলছেন *একঃ*। শাস্ত্রে *একঃ* শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। শিখদের ধর্মগ্রন্থ গুরুগ্রন্থে ঈশ্বরের বর্ণনা শুরু হয় এই বলে– এক ওঙ্কার সৎ, এক ওঙ্কারই সৎ। *একঃ*, ঈশ্বরের এই নাম বেদের থেকেই চলে আসছে। ঈশ্বরের নাম এক কেন বলছেন? এই কারণেই বলছেন ঈশ্বরকে জানা যায় না। তিনি নির্গুণ, তিনি নিরাকার, তিনি নিরুপাধিক, তিনি নির্বিকল্পম্। এভাবে বললে বালসুলভ মনে একটা সংশয় এসে যেতে পারে যে তিনি নেই। যারা ধর্ম মানে তারা নির্গুণ, নিরাকার, নিরুপাধিক এসব শুনেও বলবে না যে ঈশ্বর নেই। কিন্তু বৌদ্ধদের নির্বাণে, শূন্যবাদে ঠিক এই সমস্যাটাই হয়ে গেছে।

ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার দুটো পথ, একটা হল সগুণ সাকার, বেলুড় মঠে ঠাকুরের মুর্তি পূজা করছে, অন্যান্য জায়গায় বিষ্ণুর পূজা করছে, কৃষ্ণের পূজা করছে। এই ভাব নিয়েই যদি চলা হয় তাহলে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রচুর গোলমাল বেরিয়ে আসবে। সত্যিকারের যাঁরা নির্বিকল্প সমাধিতে যান তাঁরা বাস্তবিক দেখেন তিনি নির্গুণ নিরাকার। নির্গুণ নিরাকার দিয়ে গেলে দুটো সমস্যা আসে, প্রথম হল নির্গুণ নিরাকার নিয়ে থাকলেও পরে তাঁর পূজা শুরু হয়ে যায়। ব্রাহ্মদের ঠিক এই সমস্যাই হয়েছিল, একদিকে তাঁরা বলছেন নির্গুণ নিরাকার আবার অন্য দিকে বলছেন আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণতলে। নির্গুণ নিরাকার ঈশ্বরের দুটো পা চলে এল আর তাঁর চরণধুলিও এসে যাচ্ছে। সংস্কৃত গ্রন্থে যেখানে চরণরজ বলা হয় এর অর্থ চরণধুলি নয়, রজ শব্দের অর্থ হল সার। ফুলের সার যেমন মৌমাছি গ্রহণ করে, ঠিক তেমনি ভগবানের চরণরজের আকাঙ্খা করা মানে, ভগবানের প্রতি যেন ভক্তিটুকু পাই। রজ শব্দের আরেকটা অর্থ হয় ধুলো, ব্রাহ্মরা না বুঝে এটাকে চালিয়ে দিল নিরাকারের পায়ের ধুলো বলে। যিনি সর্বব্যাপী তাঁর আবার ধুলো কোথা থেকে আসবে। এদের উদ্দেশ্যেই ঠাকুর বলছেন, আমার মামার গোয়ালে অনেক ঘোড়া আছে। সমস্যা হল, মানুষ নিরাকারের পূজা করতে পারে না, পূজা করতে গেলে সবাইকেই সাকার রাখতে হবে। গীতায় ভগবান বলছেন, নিরাকার সাধনা মানুষ করতে পারে না, খুব উচ্চমানের কয়েকজন সাধকই করতে পারেন। যাদের দেহবোধ, আমি বোধ খুব প্রবল তাদের দিয়ে কখনই নিরাকার সাধনা হয় না। দ্বিতীয় সমস্যা হল, নিরাকারকে রাখতে গিয়ে সবটাই তারা উড়িয়ে দেয়, যে সমস্যা বৌদ্ধ ধর্মে হয়েছে। ধর্ম করতে করতে তাঁরা এমন জায়গায় নিয়ে চলে গেলেন শেষে আধ্যাত্মিক সত্তা শূন্যবাদে চলে গেল। শূন্যবাদের উপমা দিতে গিয়ে প্রদীপের উপমা নিয়ে এলেন, প্রদীপ জ্বলছে, জ্বলতে জ্বলতে তেল ফুরিয়ে গেল, প্রদীপ নিভে গেল। ঠিক তেমনি আমার আপনার যে কর্ম, এই কর্ম যেই শেষ হয়ে গেল তখন নির্বাণ হয়ে গেল। নির্বাণ কি? শূন্যাবস্থা। এই থিয়োরী খুবই জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সমস্যা হল ভগবান বুদ্ধ বলতে চাইছেন নির্বাণ হল জ্ঞানের অবস্থা, যেখানে আমির নাশ। আমির নাশ করতে গিয়ে এরা ঈশ্বরকেই নাশ করে দিল, দাঁড়িয়ে গেল শূন্যবাদ। এভাবে কি ঈশ্বরকে কখন নাশ করা যায়? যাঁকে নির্গুণ, নিরাকার, নির্বিকল্প বলছেন, সবটাতেই 'ন' 'ন' করে যাচ্ছেন, কারণ আমাদের হল নেতি নেতি সাধনা। তাহলে থাকল কি? ঠাকুর বলছেন বোধে বোধ করে। বোধে যা বোধ করে সেটা আবার মুখে বলা যাবে না। তাহলে শূন্য বলে দিলে দোষের কিছু নেই। কিন্তু শূন্য বললে সাধারণ মানুষ ঈশ্বর বলে কিছু নেই ভেবে সব কিছুকে উড়িয়ে দেবে। কেউ তখন শূন্যবাদে চলে গেল আর তা নাহলে বিষ্ণুর জায়গায় ভগবান বুদ্ধের প্রতিমা বসিয়ে পূজা করতে শুরু করে দিল, শেষে সবাই আবার সেই সাকারে নেমে গেল। অন্য দিকে শূন্যবাদের দর্শনে পড়ে রইল। শূন্যতে মানুষ যাতে না নেমে যেতে পারে, এই ভুল যাতে না করে বসে সেইজন্য বেদ বলছে *একঃ*। একম্ বলে দিলে আবার অন্য সমস্যা এসে যায়। একম্ বা একঃ দিয়ে বলতে চাইছেন তিনিই আছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই একঃ বা একম্‌কে নেবে ঐ একমাত্র একজন তিনি আছেন। যে কোন উচ্চ দর্শন মুর্খদের হাতে চলে গেলে সেই দর্শন বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে বিকৃত হয়ে যাবে। যখন একম্ নেওয়া হল তখন এসে যাবে এই বিতর্ক, ঈশ্বর এক না দুই। এই করে এসে গেলেন শিব আর শক্তি, শিব তো একা সৃষ্টি করবেন না, সৃষ্টি করতে গেলে শক্তিকে চাই। এই করে ঈশ্বর দুই হয়ে গেলেন। ধর্মের বিতর্ক, ঝগড়া বিবাদ এই নিয়েই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

নির্বিকল্প, নিরুপাধিক, একঃ, এই শব্দগুলো প্রত্যেকটি ধর্মেই বলা হয়। কিন্তু সাধারণ লোক যদি এই শব্দগুলোকে বুঝতে যায়, সে যত বড় বুদ্ধিমানই হোক, বিরাট পণ্ডিত হোক, তার যদি নির্বিকল্প সমাধি না হয়ে থাকে সে গোলমাল পাকাবেই পাকাবে। হয় নির্গুণের পূজা শুরু করে দেবে, কিংবা নির্গুণকে সাকার বানিয়ে দেবে বা নির্গুণকে পুরোপুরি উড়িয়ে শূন্যবাদে চলে যাবে, এই ধরণের কিছু না কিছু গোলমাল করবেই করবে। হিন্দু ধর্মে অন্যান্য ধর্মের মত একটি শাস্ত্র নেই, হিন্দুদের হাজার হাজার গ্রন্থ রয়েছে। ঋষিরা যেমনি দেখেন ভক্তরা শ্লোক বা মন্ত্রের এই জায়গাতে সংশয় প্রকাশ করছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে অন্য শ্লোক এনে তত্ত্বকে আরেকটু ব্যাখ্যা করে স্পষ্ট করে দেন। অধ্যাত্ম রামায়ণাদির মত গ্রন্থ রচয়িতারা কোন অপ সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। কেন অপ সিদ্ধান্ত নেই? কারণ বেদে যে জিনিসটাকে বলেছেন, যাঁরা এগুলো লিখেছেন তাঁদের বোঝার ক্ষমতা সেই একই মানের। অন্যান্য গ্রন্থে বিশেষ করে বাইবেলে সেটা হয় না, তাঁদেরকে তারা সেই উচ্চ সম্মান দিল না। প্রত্যেক ধর্মেই ঋষিরা আছেন, কিন্তু তাঁদের সেই সম্মানটা দেওয়া হয়নি। ইসলাম ধর্মে অনলহক্, মানে সেই এক সত্তা, আমিই সেই, বলার জন্য তাঁদের গলা কেটে দেওয়া হল। ঋষিদেরই যদি গলা কেটে দেওয়া হয় তাহলে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা

আসবে কোথা থেকে! আইনস্টাইন থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি দিয়ে দিলেন, কিন্তু এর উপর কাজ করার জন্য আরও অনেক উচ্চমানের বিজ্ঞানীর প্রয়োজন। মজার ব্যাপার হল, থিয়োরী অফ রিলেটিভিটি লেখার পর একজন বিজ্ঞানী এসে আইনস্টাইনকে বলছেন, স্যার! আপনার এই ইক্যুয়েশান দিয়ে এ্যাটম বোমা তৈরী করা যাবে। আইনস্টাইন শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, বললেন এ হতেই পারে না। যিনি সিদ্ধান্ত দিলেন তিনিই বলছেন হতে পারে না। এরপর যখন অনেক রকম ক্যালকুলেশান করে বিজ্ঞানীরা দেখাতে শুরু করলেন তখন আইনস্টাইন তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, তিনি নিজেই জানতেন না। তার মানে, আমরা আজকে যাঁকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানী বলছি, তিনি যে সিদ্ধান্ত দিলেন, সেই সিদ্ধান্তের যে ইমপ্লিকেশান হতে পারে সেটা তিনি নিজেও জানতেন না। তার মানে, বুদ্ধির দৌড় একটা জায়গা পর্যন্ত যাবে তারপর আর যেতে পারবেন না। আধ্যাত্মিক সত্যগুলো যখন কোন অবতারের মুখ দিয়ে, তিনি মহম্মদই হন আর যীশুই হন, আসছে তার ব্যাখ্যাগুলো দিচ্ছেন পণ্ডিতরা। এখানে আইনস্টাইনেরই এই অবস্থা আর আমাদের ব্যাখ্যাকারদের যা অবস্থা তাদের আর কতটুকু বুদ্ধি থাকবে, গোলমাল তো পাকাবেই। ঐটাকে ঠিক রাখার জন্য দরকার উপলব্ধিবান ঋষিদের। অন্যান্য ধর্মে যখনই ঋষিদের আবির্ভাব হয়েছে তখনই তাঁদের গলাটাই কেটে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুদের এই সমস্যা ছিল না, উচ্চমানের ঋষির যা দিলেন সেটাকেই হিন্দুরা গ্রন্থ রূপে নিয়ে নিলেন। একজন হিন্দু যে সম্মান ও আগ্রহ নিয়ে বেদ পড়বে সেই একই সম্মান ও নিষ্ঠা নিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়বে। ঋষিদের কথাতে কোথাও কোন অপ সিদ্ধান্ত নেই, অপ সিদ্ধান্ত যদি থাকত তাহলে আস্তে আস্তে কোথায় হারিয়ে যেত কেউ জানতেই পারত না।

অন্যান্য ধর্মে সমস্যা হল, অপ সিদ্ধান্তকে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়ে দূর করার জন্য ঋষির অভাব। কারণ যাঁরা ব্যাখ্যা করবেন তাঁদেরকেই কেটে শেষ করে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মে এই সমস্যা কোন দিন ছিল না, আর কোন দিন হবেও না। এখানে যাতে মানুষ ভুল করে মনে না করে যে ঈশ্বর আদপেই নেই, তাই প্রথমেই ঈশ্বরের বর্ণনা করছেন, তিনি *একম্*। কিন্তু তারপরেই বলছেন *ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে*, মায়া আপনাকেই আশ্রয় করে আছে। শুধু তাই না, আপনাকেই আবার বিষয় করে। মায়া না থাকলে ঈশ্বরকে জানা যাবে না। মায়াকে সরিয়ে দিলে ঈশ্বরকে জানার আর কোন পথ থাকবে না। টিউব লাইটে গ্যাসের কোটিন দেওয়া আছে বলেই টিউব লাইটকে আলো রূপে দেখতে পারছি। যেহেতু মায়া ঈশ্বরকে আশ্রয় করে আছে আর ঈশ্বরকে বিষয় করে সেইহেতু এর আরেকটি নাম শক্তি। ভোরবেলায় সূর্যের আলো যখন ভেন্টিলেটার দিয়ে বা জানলার ফুটো দিয়ে আসে তখন ছোট্ট একটা আলোর টুকরো এসে দেওয়ালে পড়ে। এমনিতে কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু যে জায়গাতে আলো পড়েছে সেই জায়গাতে দেখা যাবে। সেই সময় ঘর ঝাড় দিলে ধুলোর মধ্যে যে পার্টিকেলস গুলো থাকে তখন সেগুলো আলোর রেখার মধ্যে নাচতে থাকে, তাতে বোঝা যায় যে আলো আছে। ওখানে যদি কিছু না থাকে তাহলে আলোকে জানার আর কোন পথ থাকবে না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে ঠিক সেই রকম হয়, মায়া যদি না থাকে তাহলে ঈশ্বরকে জানার কোন পথ নেই। সেইজন্য বলে তটস্থ লক্ষণ। তাঁর ক্রিয়া, তাঁর কর্ম দিয়ে তাঁকে জানা যায়। পাহাড়ের উপরে জঙ্গলে ধুয়ো দেখা যাচ্ছে, ধুয়ো যখন আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে জনবসতি আছে। ঈশ্বরের যে কার্য ওটাই তাঁর মায়া, সেই কার্য দিয়ে ঈশ্বরকে বোঝা যায়, ওটা আশ্রয় করে আছে ঈশ্বরকে। আর বিষয় করছে ঈশ্বরকে। এটাকেই বলছেন শক্তি।

তদ্বিষয়া, একটা জিনিসকে বিষয় করা মানে সেই জিনিসটাকে ধরা। বুদ্ধি কখনই ঈশ্বরকে ধরতে পারবে না, তাই ঈশ্বরকে জানার একটাই পথ মায়া যখন তাঁকে আবৃত করে নেয়। কতটুকু আমরা জানতে পারব? মায়া যতটুকু আবৃত করে আছে ততটুকুই আমরা জানতে পারব, তার বাইরে আমরা জানতে পারব না। তাহলে মায়া কি পুরোটাই ঈশ্বরকে আবৃত করে নেবে। প্রশ্নই হয় না, যে আশ্রয় করে আছে সে কখন তাঁকে পুরো আবৃত করতে পারে না। পরের শ্লোকে বলছেন –

ত্বামেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা।
আব্যাকৃতমিতি প্রাহুবেদান্তপরিনিষ্ঠিতাঃ।৩/৩/২১

এই শ্লোকেও বিভিন্ন দর্শনকে সমন্বয় করছেন। প্রথমে মায়াকে করলেন। তারপরে বলছেন, এই মায়ার শক্তি যখন সৃষ্টিকালে আপনার নির্গুণকে আবৃত করে দেয় তখন কিছু কিছু বেদান্তবাদীরা এই শক্তিকে আপনার অব্যাকৃত শক্তি বলে নির্দেশ করেন। অব্যাকৃত বেদান্তের একটা পরিভাষা, এর অর্থ হল যেটাকে এখন আলাদা

আলাদা করে প্রকাশ করা যায় না। আমরা সবাই পরস্পরেকে দেখার সময় আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি, ঠিক তেমনি এই জগতে যা কিছু আছে সব কিছুকে আলাদা আলাদা করে দেখা যায়। পেছন দিকে নিয়ে যেতে যেতে শেষে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ আর তমোগুণ এই তিনটে জিনিসকে দেখা যায়, তখনও পৃথক দেখাচ্ছে। কিন্তু এরও পেছনে চলে যাওয়ার পর যে জায়গাতে প্রকৃতি, ঐ জায়গাটা এখন অপৃথক হয়ে গেল, পুরো জিনিসটাই এক হয়ে গেল, ওটাকে বলছেন অব্যাকৃত, যার কোন বিকৃতি হয়নি। হিন্দু ধর্মের ঋষিরা ঐ ভাবগুলিকে নিয়ে আর ওনাদের যে সব উপলব্ধি ছিল, ওগুলোকে নিয়ে কেউ একটা জায়গায় চিন্তা-ভাবনা করে শিষ্যদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, কেউ একটু দূরে থেকে করেছেন। ফলে কিছু কিছু জিনিস একই থাকত আবার কিছু কিছু জিনিস আলাদা হয়ে যেত। বাইবেল ও কোরানের মত হিন্দু ধর্মের কোন কিছুই একটা central authorityতে কোন দিনই ছিল না। সেইজন্য দেখা যেত ভাব সেই এক কিন্তু শব্দগুলো আলাদা, তার নাম আলাদা দিচ্ছেন বা একটু আলাদা করে বর্ণনা করছেন। অব্যাকৃত সেই একই ভাব কিন্তু শব্দটা আলাদা।

মূলপ্রকৃতিরিত্যিকে প্রাহুর্স্মায়েতি কেচন।
অবিদ্যা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে।৩/৩/২২

এই অব্যাকৃতকেই আবার কেউ বলেন মূলপ্রকৃতি, কেউ মায়া বলেন, কেউ বলেন অবিদ্যা আবার কেউ বলেন সংসৃতি, কেউ বলেন বন্ধন। মায়া = শক্তি = অব্যাকৃত = মূলপ্রকৃতি = অবিদ্যা = সংসৃতি = বন্ধন। ২০, ২১ আর ২২ এই তিনটি শ্লোককে চিন্তন করলে বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, হিন্দু ধর্ম সবটাই কোথাও গিয়ে যেন মিলে যাচ্ছে। এই সব কিছুর পারে যে জায়গাতে তিনি আছেন সেখানে তাঁর কি নাম হবে আমরা জানি না। তাঁকে অনেক নামে সম্বোধিত করা হয়। কেউ বলছেন আল্লা, কেউ বলছেন ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শব্দ আসে বৃহৎ থেকে, তাঁর থেকে আর কিছু বড় হতে পারে না তাই বলছেন ব্রহ্ম। খ্রীষ্টানরা বলছেন গড্। বৌদ্ধরা কোন নাম না দিয়ে বলছেন এটা একটা অবস্থা, সেই অবস্থাকে বলছেন নির্বাণ। আমরা জানি না এর কি নাম হবে, কারণ জানার কোন উপায় নেই। এটাই নিরুপাধিক, নির্বিকল্প, এই নির্বিকার, নির্গুণ, নিরাকারকে জানার কোন পথ নেই। যেটা জানা যায় তা হল সত্তা মাত্রম্, আছেন। এর বাইরে আর কিছু বলা যাবে না। তাহলে জানার পথ কি? এই জায়গাতে এসে একটা বিভাজন রেখা পড়ে যায়, এই বিভাজন রেখাটা কোথা থেকে আসে কেন আসে, এই ব্যাপারে জানার কোন পথ নেই। কেন পথ নেই? কারণ যে জিনিস দিয়ে জানা হয় তার নিজের সৃষ্টি অনেক পরে। নাসদীয় সূক্তমে বলছেন সৃষ্টি তো অনেক পরে এসেছে, তার আগে কি হয়েছিল কি করে জানবে? যেটা আমাদের সামনে হয়েছে সেটাই আমরা জানতে পারব। এই যে বিভাজন রেখা হয়েছে, এর স্বভাব কি? খ্রীষ্টানরা বলে God's will, মুসলমানরা বলে আল্লার মর্জি। ঘোর বেদান্তীরা বলবেন, এই রেখা কিছুই না, এই রেখাটা আদপেই নেই, তোমার মনের ভুল, তুমি ভেবে যাচ্ছ। বেদান্তের এই দর্শনকে বলা হয় অজাতবাদ। বেদান্তীরা এই রেখাকে বলে মায়া বা অবিদ্যা বা অব্যাকৃত। সাংখ্যবাদীরা এটাকেই বলে প্রকৃতি। প্রকৃতি আর মায়াতে একটাই তফাৎ, এই একটি তফাতের জন্য বাকি সব তফাৎগুলো পর পর এসে যায়। যিনি নির্গুণ নিরাকার, তাঁর উপর যেন একটা ছায়া এসে গেছে। এই ছায়া কোথা থেকে আসে, কেন আসে কারুর কাছে এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু এই শ্লোকে বলছেন অবিদ্যা যা মায়াও তাই, মায়া যা প্রকৃতিও তাই। সাংখ্যে বা যোগে প্রকৃতি হল এক স্বাধীন সত্তা, বেদান্তে মায়া পুরুষের উপর আশ্রিত। মায়া আর প্রকৃতিতে এটাই বড় পার্থক্য।

এত বড় পার্থক্য থাকার পরেও এখানে প্রকৃতি আর মায়াকে এক করে দিচ্ছেন। সাংখ্যে পুরুষ আলাদা প্রকৃতি আলাদা, দুটোর যখন মিলন হয় তখন সৃষ্টি শুরু হয়, দুটো আলাদা হয়ে গেলে সৃষ্টির নাশ হয়ে যায়। পুরুষের গুণ সব একই, তিনিও নির্গুণ, নিরাকার। কিন্তু প্রকৃতির কাছে যখন চলে আসেন পুরুষের সেই একই দুরবস্থা হয় যে দুরবস্থা কোন লোক যখন কোন নারীর পাল্লায় পড়ে। নারী থেকে পুরুষ আলাদা হয়ে গেলে তার উত্থান হতে থাকে, এখানে পুরুষ প্রকৃতির থেকে আলাদা হয়ে গেলে তার কৈবল্য হয়ে যায়, কৈবল্য মানে মোক্ষ, মুক্তি হয়ে গেল। মায়াতেও ঠিক একই জিনিস হয়, শুধু তফাৎ হল মায়া ঈশ্বরের উপর আশ্রিত, প্রকৃতির অস্তিত্বটা স্বাধীন। সেইজন্য সাংখ্য বা যোগই ঠিক ঠিক দ্বৈতবাদ, দুটো সত্তাকে নিয়ে চলে, পুরুষকেও মানছে প্রকৃতিকেও মানছে। বেদান্ত প্রকৃতিকে মানে না, কারণ প্রকৃতি পুরুষে আশ্রিত। সত্যিকারের এই লাইনটা কি কারুর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমরা বলতে পারি, বলা সম্ভব নয় বলছি বটে কিন্তু কপিল মুনি ও পতঞ্জলি এনারা কি করে বলছেন প্রকৃতি স্বাধীন। সমস্যা হল জগতকে ঠেলতে ঠেলতে শেষ পর্যন্ত এই দুটি সত্তাতে গিয়েই শেষ হয়। জগৎ আর

ঈশ্বর, চৈতন্য আর জড়, এই দুটো সত্তা আগাগোড়া থেকেই যায়। সেইজন্য ইসলাম, খ্রীষ্টান ধর্মও দ্বৈতবাদী, কারণ এই দুটো ধর্ম চৈতন্যকেও মানে জড়কেও মানে। বেদান্তের এটাই বৈশিষ্ট্য, বেদান্ত যুক্তি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে যখন নিয়ে যাচ্ছেন আর ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সাথে যখন মেলাচ্ছেন তখন দেখছেন এই দুটি সত্তা কিন্তু থাকতে পারে না, সত্তা একটাই থাকতে হবে। যুক্তি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে গিয়ে দেখছেন যাঁরা উপলব্ধি করেছেন তাঁরাও সেই একই কথা বলছেন, তাঁরা ওখানে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। অবাক হয়ে যাওয়া মানেই দুটি সত্তা নেই। সত্তা যদি দুই থাকে তাহলে বাক্ থাকবে, তখন comparison এসে যাবে।

সমস্যা হল উচ্চমানের যোগী বা সাধুরা যখন চিন্তন মনন করতে করতে ধ্যানের গভীরে চলে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁরা শেষে সেই সত্তা মাত্রম্ দেখছেন। ঠাকুরের জীবনী ভালো জানা থাকলে খুব ভালো বোঝা যায়। মা কালীর দর্শন পাওয়ার পর ঠাকুর মা কালীকে নিয়েই সব রকম সাধনা করছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও আরও অনেকে কত রকম সাধনা করালেন। তোতাপুরী এসে ঠাকুরকে বেদান্ত সাধনা করার কথা বললেন, ঠাকুর বলছেন, মাকে জিজ্ঞেস করে আসি। এরপর ঠাকুরের অদ্বৈত বোধ হয়ে গেল যেখানে দুই নেই শুধু সত্তা মাত্রম্ আছেন। এরপর কি ঠাকুর কেবল অদ্বৈতবাদের কথাই বলতে শুরু করে দিলেন? একেবারেই না। নির্বিকল্প সমাধি থেকে নেমে এসে ঠাকুর সেই মা মা করতেই থাকলেন। যে উচ্চতম অদ্বৈত জ্ঞান আমরা যা মাণ্ডুক্য উপনিষদ আদিতে পাই, যে জ্ঞান গৌড়পাদের ছিল, শঙ্করাচার্যের ছিল, সেই একই জ্ঞান ঠাকুরেরও ছিল। সেই জ্ঞানের অবস্থা থেকে নেমে এসে ঠাকুর আবার মা মা করছেন। তার মানে, সমাধি অবস্থার বাইরে কারুর পক্ষে এই দুটি সত্তাকে বাদ দিয়ে একটি সত্তাকে গ্রহণ করা সম্ভবই নয়। সবাইকে এই দুটি সত্তাকে নিতেই হবে। আচার্য শঙ্কর ঘোর অদ্বৈতবাদী কিন্তু তিনিও কত সুন্দর সুন্দর স্তোত্র রচনা করছেন। শঙ্করাচার্যকে বুঝতে হলে ঠাকুরের জীবন ভালো করে পড়তে হবে। স্বামীজীও একজন সমাধিবান পুরুষ, অদ্বৈতবাদী হয়েও সুন্দর সুন্দর স্তোত্র রচনা করছেন। কারণ এই দুটি সত্তাকে কখনই নাকচ করে দেওয়া যায় না। সাধনার শেষ অবস্থার আগের মুহুর্তেও সত্তা দুই থাকবে। সমাধিবান হয়ে ফেরত আসার পর আবার সত্তা দুই। ঐ দ্বিতীয় সত্তাতে বাস্তবিক সমস্যা হয়, সেখানে আমার আপনার যেমন যেমন প্রশিক্ষণ ও সংস্কার তৈরী হয়েছে সেই অনুসারে আমি ওটাকে জড় দেখতে পারি আর তা নাহলে চৈতন্য দেখব। শাক্ত মতে, তন্ত্র দর্শনে চৈতন্য দেখেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর বিগ্রহকে দেখছেন মা চৈতন্যময়ী, বলছেন মা যা ব্রহ্মও তাই। তাই বলে কি ঠাকুর প্রকৃতিকে মানছেন না? সেটাও মানছেন, ঠাকুর প্রকৃতিকে যত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে সব ভাবেই বলছেন, তিনটে গুণের কথা বলছেন। আবার তিনি মায়া রূপেও বলছেন, ঈশ্বর রূপেও বলছেন। মা কালীর সবটাই তিনি নিচ্ছেন। এই বিভাজন লাইনটাই ঠাকুরের মা কালী। মা কালীকে তিনি মায়া রূপেও নিচ্ছেন, প্রকৃতি রূপেও নিচ্ছেন, শক্তি রূপেও নিচ্ছেন আবার তাঁকে ব্রহ্ম রূপেও নিচ্ছেন।

কারণ ঈশ্বর আর তাঁর শক্তি কখনই আলাদা নয়, অথচ আলাদা রূপে দেখাচ্ছে। আলাদা রূপে দেখাতে গিয়ে তখন দুটি সত্তা এসে যাচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্র, সমন্বয় শাস্ত্রে যখন সচ্চিদানন্দের কথা বলছেন তখন সেটাই শেষ কথা। এরপর যেমনি জগতে নামবে, সৃষ্টির কথা যখনই এসে যাবে, তখন সেখানে আরেকটি সত্তাকে নিয়ে আসেন। এটাকে যদি বলা হয় সচ্চিদানন্দই অনেক রূপে ভাসছেন, অনেক রূপ বলা মানেই comparison এসে গেল। আমরা সবাই সচ্চিদানন্দেরই এক একটি রূপ, কিন্তু আর কিছু না হোক সচ্চিদানন্দের মধ্যে পুরুষ নারীর ভেদ তো চলে এসেছে। কিন্তু তার আগে বলা হয়েছে ঈশ্বর নিরুপাধিক আর তিনি হলেন নির্বিকল্প। তাহলে পুরুষ মহিলা কোথা থেকে এসে গেল। বলবেন, এটা সচ্চিদানন্দই। কিন্তু তিনি দুটো রূপে ভাসছেন। এই যে দুটো রূপে ভাসছেন এর জন্য কিছু শব্দ তো আনতে হবে। হয় এই বিভাজন লাইনকে আপনি সত্য বলুন, নয় কাল্পনিক বলুন। কিছু তো একটা বলতে হবে। তা নাহলে ওটা ঐ রূপেই দেখাত। কিন্তু আমার কাছে ঐ রূপে দেখাচ্ছে না, ঐ রূপ বোধ হচ্ছে না। যেমন চিনির ডেলাকে হাতি, ঘোড়া, বাঁদর করে দেওয়া হল, এর মধ্যে চিনিকে আমরা দেখছি কিন্তু তার মধ্যে অন্য রকমও অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। এই যে চিনি থেকে চিনির হাতি ঘোড়া হল এর জন্য একটা শক্তি লেগেছে, এই শক্তিকে আমরা বাস্তবিক বলতে পারি, apparent বলতে পারি, যা খুশি বলতে পারি। এটাই বলছেন, আমরা জানি না এটা কি করে হয়, এটাকে প্রকৃতিও বলতে পারেন, শক্তিও বলতে পারেন, অব্যাকৃতও বলতে পারেন, মায়াও বলতে পারেন। কারণ শাস্ত্র যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা একটা মাত্র ভাবকে, একটা মাত্র গ্রন্থকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না। বিভিন্ন ঋষিরা বিভিন্ন ভাবে

জিনিসটাকে দেখেছেন, এখানে সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র, বেদান্ত সব কটাকে সমন্বয় করে দিলেন। এই অব্যক্ত যখন এসে গেল, এইবার এক এক করে সব সৃষ্টি হতে শুরু করে দিল।

যুক্তি দিয়ে দেখলে এই সংসারকে দাঁড় করানো যায় না। সমাধির অবস্থায় গিয়েও দেখছেন সৃষ্টি বলে কিছু নেই। এই দুটো জিনিস, আধ্যাত্মিক যুক্তি নিলেও সৃষ্টি থাকে না, আর যখন সমাধির অবস্থায় যাচ্ছেন তখনও সৃষ্টি থাকছে না। অথচ চোখের সামনে সৃষ্টি রয়েছে। এই দুটোকে মেলানো অসম্ভব। কোয়ান্টাম ফিজিক্সে হাইজেনবার্গের খুব নামকরা থিয়োরী হল Uncertainity Principle। এই থিয়োরী অনুসারে যখন খুব সূক্ষ্ম স্তরে চলে যায় তখন কিছু বোঝাই যায় না, জিনিসটা এই রকম নাকি অন্য রকম। ফলে খুব নামকরা তত্ত্ব কার্য কারণ সম্পর্ক এবং পদার্থ বিজ্ঞানে নিউটনের যে মূল সিদ্ধান্ত cause and effectএর উপরেই প্রশ্ন চিহ্ন এসে গেছে। যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখা যায়, তাহলে খুব আশ্চর্যের যে বেদান্তে যে যুক্তি গুলোকে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞানীরাও ঠিক সেই ভাবে বলছেন জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞানীরা ফিজিক্সের থিয়োরী, গাণিতিক ফর্মুলা দিয়ে যাচ্ছেন আর বেদান্তে পুরো একটা অন্য দিক দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দুজনের ক্ষেত্রে জিনিসটা ওটাই থেকে যাচ্ছে, একটা স্তরের পরে বলা যায় না জিনিসটা কি। ঋষিরা ও বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভাবে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন।

প্রশ্ন হল, ঈশ্বর যখন সৃষ্টি করছেন তখন তিনি নিজেই কি ঐ রকম হচ্ছেন, নাকি তাঁর ইচ্ছাতে কিছু জিনিস চলে আসছে? ঠাকুর বলছেন, আম খেতে এসেছ আম খাও, কত পাতা, কত ডাল এই হিসাব করার দরকার নেই। এটাকে বলে technicality of religion, এতে আপনি যদি বেশি বিচার করতে যান, বেশি কিছু জানার চেষ্টা যদি করা হয় তাহলে ওতেই আপনি হারিয়ে যাবেন। ভগবান বুদ্ধের খুব নামকরা গল্প আছে। একজন লোকের তীর লেগেছে। তীরটা যখন একজন বার করতে যাচ্ছে তখন আরেকজন বলছে, ওভাবে হবে না, আগে খবর নাও এই তীরটা কে চালিয়েছিল, যে চালিয়ে ছিল সে কি ব্রাহ্মণ ছিল, নাকি ক্ষত্রিয় ছিল, নাকি বৈশ্য বা শূদ্র ছিল। সে দাঁড়িয়ে তীর চালিয়ে ছিল নাকি বসে চালিয়ে ছিল আর তীরটা সে কোথায় তৈরী করেছিল। তীরের মধ্যে যে পালক লাগানো ছিল সেই পালক কোন পাখির ছিল। এই করে লম্বা একটা পাতা জুড়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। বক্তব্য হল, এই প্রশ্নের উত্তর যদি খুঁজতে যাওয়া হয় ততক্ষণে তীরে যে ব্যক্তি আহত হয়েছে তার হয়ে যাবে। লোকটিকে বাঁচানোটা বেশি গুরুত্ব নাকি এই প্রশ্নের উত্তর বার করার গুরুত্ব বেশি। ভগবান বুদ্ধও বলছেন এত কিছু জানার দরকার কি! তুমি আছ আর তোমার দুঃখ আছে, এই দুঃখ থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি? এর জন্য এত কিছু জানার কি দরকার? আগে তুমি দুঃখ থেকে বেরিয়ে এস। তাহলে বেদান্ত যে এত কথা বলছে, এগুলোর কি দরকার? ঠাকুরের কাছে যখন কেউ আসছে, সে যেমন লোকই হোক, সে হয়ত কথা শুনতে চাইছে না, ঠাকুর তাকে ছুঁয়ে দিচ্ছেন, কারুর দিকে শুধু চোখ তুলে তাকাচ্ছেন, তাতেই তার পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। একজনকে বলছেন, এস তোমার সাথে কুস্তি করি, আরেকজনের জিহ্বাতে কিছু লিখে দিচ্ছেন, তাতেই তাদের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, নিজেকে মারার জন্য নুড়ুন হলেই হয়ে যায়, অপরকে মারার জন্য ঢাল তলোয়ার দরকার। কেউ যদি নিজের উন্নতি চায় তার ওখানেই হয়ে যায় কিন্তু অপরের সাথে কথা বলতে যাওয়ার সময় তাকে পুরো জিনিসটাকে systemized করতে হয়। দুটো স্তরে হয়, একজন আপনার কথা মানতে চাইছে, শ্রদ্ধার সাথে শুনতে চাইছে, দ্বিতীয় স্তরে হল আপনার বিরোধী। স্বামীজীর ক্ষেত্রে তিনটেই ছিল, স্বামীজীর নিজের উত্থান দরকার ছিল, দ্বিতীয় তাঁর গুরুভাইয়েরা, নিজের লোকেরা, দেশের লোকেরা তাঁর কাছ থেকে জিনিসটা কি, এর ব্যাখ্যা শুনতে চাইছে। আর তৃতীয় স্তরে তিনি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডে যেখানে তাঁর বিরোধীরা ছিলেন সেখানে হিন্দু ধর্মের পতাকা বসিয়ে আসছেন। তৃতীয় স্তরে স্বামীজীকে রীতিমত তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় আরেকটা হয়, অবতার পুরুষরা এক কথাতেই আমাদের সংশয় দূর করে পরিবর্তন করিয়ে দেবেন। কিন্তু শাস্ত্র পড়ার সময় এভাবে হয় না। তাঁর কৃপায় যেটা হয়ে যাওয়ার হয়ে যাবে কিন্তু সেখানে অরণি মন্থন অনেক বেশি করতে হবে। আমরা যে মনে করছি কোন সাধুবাবা বা মহাত্মার কাছে গেলে তিনি আমাদের সব সংশয় দূর করে দেবেন, ওভাবে কখনই হবে না। মন্থনের দরকার পড়ে। কিন্তু বেশি যদি মন্থন করতে যায়, অপরের সাথে যদি অনেক তর্কবিতর্ক করতে যায় তাহলে সে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। বৌদ্ধ ধর্ম আর ঘোর বেদান্তীদের এই সমস্যাই হয়েছিল। ঘোর বেদান্তীরা তর্ক করতে করতে জিনিসটাকে যে কোথায় নিয়ে চলে যাবে

ঠিক নেই, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল আচার্য শঙ্কর যে বললেন আত্মাই সব, সেখান থেকে তাঁর শিষ্যরা প্রমাণিত করে দিলেন মায়াই সব। আর সেখান থেকে আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মবাদীকে তাঁর পরম্পরার শিষ্যরা বানিয়ে দিলে মায়াবাদী। একটা উচ্চ আদর্শকে কোথায় মায়াবাদে নামিয়ে দিল। বিদ্যাচর্চা না থাকলে যা হয়, আস্তে আস্তে পুরো আদর্শটাই বিনষ্ট হয়ে যায়। এখানে বলছেন, পরমব্রহ্মের উপর কি একটা এমন হয়ে যায় যার ফলে যিনি অখণ্ড তিনি খণ্ডিত রূপে প্রতিভাসিত হতে শুরু করেন। তার একটা নাম দিতে হবে, নাম দিতে গিয়ে বিভিন্ন দর্শন বিভিন্ন নাম দিলেন।

মায়া, যাকে প্রকৃতি বলছেন, এই মায়া এসে যাওয়ার পর শুদ্ধ চৈতন্যে একটা ক্ষোভণ মানে চাঞ্চল্য এসে যায়। চাঞ্চল্য এসে যাওয়ার পর ঐ বিভাজন রেখা যাকে বলছি, তাকে আমরা যে নামেই বলি না কেন, তার মধ্যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটে গুণ এসে যায়। এই তিনটে গুণ সব সময় সাম্য অবস্থায় থাকে, কিন্তু ঐ অবস্থায় তিনটে গুণ চঞ্চল হয়ে যায়। চঞ্চল হওয়া মানে, এক অপরকে দাবিয়ে দিয়ে চেষ্টা করে আমি বড় হব। সত্ত্ব রজকে, রজ তমকে দাবাতে চাইছে, তম সত্ত্বকে দাবাতে চাইছে। এই যে খেলা শুরু হল, শুদ্ধ গুণের নড়চড়া মানেই শক্তি, শক্তি আর গুণের মধ্যে যখন খেলা হয় তখন পর পর সে সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশ স্থূল থেকে আরও স্থূল হতে শুরু করে, এইভাবে সব কিছু এক এক করে জন্ম নিতে আরম্ভ করে।

প্রথম যার জন্ম তাকে বলছেন মহৎ তত্ত্ব। এগুলো আমরা আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি এবং গীতার একটি শ্লোকে পুরো জিনিসটাকে বলে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি থেকে সবার আগে আসে মহৎ। মহৎ থেকে এক ধাপ নামার পর এসে যায় অহঙ্কার। যিনি প্রকৃতি, একটা ছায়ারূপী হয়ে আছেন, তিনি এই অহঙ্কারে যেন একটা বিশ্বমন, বিশ্বাত্মা রূপে দেখান। শুদ্ধ চৈতন্যের উপর ঐ কালো ছায়াটা যখন এসে গেল তখন শুদ্ধ চৈতন্য বৈশয়িক মনের মত প্রকাশ পান। প্রথমে যে জিনিসটার জন্ম হয় সেটা হল মন। আমাদের সবারই মন ঐ বিশ্বমনেরই একটা ছোট্ট অংশ। ছোট ছোট জলবিন্দু একসাথে হয়ে গেলে আমরা যেমন বলি জলাশয়, ঠিক তেমনি ছোট ছোট যত মন রয়েছে, সমস্ত মনের সমষ্টিকে বলছেন মহৎ। বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার পর যখন হুঁশ আসে তখন মানুষ প্রথম নিজেকে খোঁজ করে, আমি আছি এই বোধ তার প্রথম আসে। বৈশয়িক মনেরও ঠিক তাই হয়। মন সবার আগে নিজেকেই ভাবে, মহতের প্রথম বোধ হয় অহম্ অস্মি, আমি আছি। মহতের তাই প্রথমে আসে অহঙ্কার, তার এই বোধ আসে আমি আছি। এই আমি বোধ আসার পর মন আরও স্থূল হতে শুরু হয়। এরপর ওখান থেকে জন্ম নেয় ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় হল জগতকে জানার ক্ষমতা। সেখান থেকে ইন্দ্রিয়গুলির অভিমানী দেবতাদের জন্ম হয়, সেখান থেকে জন্ম হয় পঞ্চ তন্মাত্রার, এই পঞ্চ তন্মাত্রা দিয়েই জগৎ সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্রা যখন এক অপরের সাথে মিশতে শুরু করে তখন জন্ম হয় পাঁচটি স্থূল প্রাণ।

সব কিছু হয়ে গেল, বস্তুগুলো সব দাঁড়িয়ে গেল। এবার বস্তুগুলিকে যে বুঝবে সেই জিনিসটাও তৈরী হয়ে গেল। এবার শুধু সম্মিলিত করে দিতেই সব রকম শরীরগুলো আসতে শুরু করে দিল। শরীরের জন্ম সবার শেষে হয়। আমরা মনে করি শরীর সবার আগে আসে আর বাকি সব কিছু পরে আসে। কিন্তু সৃষ্টি যখন উপর থেকে নীচের দিকে আসে তখন প্রথমে দাঁড়ায় বৈশয়িক মন, সেখান থেকে দাঁড়ায় ইন্দ্রিয়গুলো, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয় ইন্দ্রিয়ের বস্তুগুলো আর তাদের অভিমানী দেবতারা, তার সঙ্গে তৈরী হয় বিভিন্ন প্রাণ। এবার এই সব কিছুর সম্মিলন হয়ে শরীর তৈরী হবে। শরীর মানে, তির্যক, পশু, মানুষ বিভিন্ন যোনি। এরপর পুরো এই জিনিসগুলো একটা মোশানে চলতে থাকে, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বস্তু, প্রাণ এগুলো ক্রমাগত জড়াতে থাকে। একটা ছোট স্নো বল নীচের দিকে ছেড়ে দিলে ঐ বল সব বরফকে টানতে টানতে নীচের দিকে গড়াতে থাকে আর সাইজেও বড় হত থাকে। সাইজে বড় হওয়া মানে, আমরা যে এত স্থূল শরীরগুলো দেখছি, এই শরীরগুলো সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এই কথা অগস্ত্য মুনি বলে যাচ্ছেন। এবারে বলছেন, আপনার এই মায়ার গুণ থেকেই রুদ্র, ব্রহ্মা আর তার সাথে সব কিছুই হয়। ঊনত্রিশ নম্বর শ্লোক থেকে আবার একটা কঠিন তত্ত্বের আলোচনা শুরু হয়।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজৈর্গুণৈঃ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োহব্যয়ঃ।৩/৩/২৯

এখানে এসে আবার ঘোর বেদান্তে ঢুকে গেলেন। উত্তরাখণ্ডে একজন সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন, ওনাকে বইয়ের কথা বললে উনি বলতেন, আমি তো বাপু জীবনে তিনটে বই শুধু পড়েছি – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। সংসারীদের

পক্ষে এই জিনিসগুলো ধরা খুব কঠিন। একবার যদি জানা হয়ে যায় সৃষ্টিটা কিভাবে হয়, তখন ভাববে আমি যে অন্ন এত ভালোবাসি আমি কি অন্ন? আমি যদি অন্ন না হই তাহলে অন্নকে আমি এত ভালোবাসি কেন? মানুষ সেটাকেই ভালোবাসে যেটা তার স্বরূপ। আমি ভাত ডাল বা বিশেষ যা কিছু খাই, আমি তো এগুলো নই, কিন্তু তাও কেন এত ভালোবাসি? তখন ভাববে, না না তা নয় আমি নিজেকে ভালোবাসি। কিন্তু এই শরীর তো আমি হতে পারি না, শরীর অনবরত পাল্টাচ্ছে, শরীর পঞ্চভূত দিয়ে তৈরী, কারণ আমি এর সৃষ্টিতত্ত্বটা জেনে গেছি। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য জেনে নেওয়ার জন্য আমি আর কি করে দেহ হব! দেহ তো আবার সবার শেষে আসছে। দেহ থেকে সরে এসে এবার ভাবছি আমি তাহলে প্রাণ, প্রাণ থেকে সরে এসে ইন্দ্রিয়, এই করে করে মন, বুদ্ধি ভাবছি। এগুলো এক সেকেণ্ডের চিন্তা ভাবনা নয়, বছরের পর বছর এর উপর ধ্যান করে যাচ্ছি। যোগশাস্ত্রের সাধনায় বলছেন সবিকল্প, সাস্মিতা, সানন্দা এই ধরণের যে সমাধি হয় তখন ঐ চিন্তনটাই করছেন, আমি তো এটা নয় আমি কেন এর সাথে নিজেকে একাত্ম বোধ করছি? যে জিনিসকে আমরা ভালোবাসি সেই জিনিসটাই আমরা পেতে চাই আর যে জিনিসটার সাথে আমার সম্পর্ক আছে সেটাকে নিয়েই আমি থাকতে চাই। যার সাথে সম্পর্ক নেই সেখান থেকে আমরা সরে আসতে চাই। মানুষ যখন বাস্তবিক দেখে আমি শরীর নই, তখন সে কোন কিছুকে ভয়ও পায় না, কোন কিছুকে ভালোও বাসে না। সাংখ্য আমাদের বিচারের এই পদ্ধতির শিক্ষা দিচ্ছে। সাংখ্য তত্ত্ব নিরুপণ করে করে দেখাচ্ছে, এই যে চব্বিশটি তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে তুমি এই তত্ত্বগুলো নও। সব তত্ত্বের পরে যেটা থেকে যায় সেটা তুমি। জ্ঞানযোগের প্রথম বিচার এটাই, গুণত্রয়বিভাগ, সত্ত্ব, রজ ও তমের যা কিছু ক্রিয়া, সব ক্রিয়াকে বিচার করে করে যা কিছু সত্ত্ব, রজ ও তমের মধ্যে পড়বে তাকে ত্যাগ করে দেওয়া। জ্ঞানযোগের একটাই বক্তব্য, আর জ্ঞানযোগে শুধু বিচার, বিচার মানে – এটা হল তত্ত্বের এলাকা, তত্ত্বকে সরিয়ে দেওয়ার পর যা থাকে সেটাই আমি, জ্ঞানযোগে এছাড়া আর কিছু নেই। এই চব্বিশটি তত্ত্বকে সরিয়ে দেওয়ার পর যা আছে সেটাই আমি।

দ্বিতীয় যে বিচার হয় তাকে বলা হয় অবস্থাত্রয় বিচার। আমাদের কাছে জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু হচ্ছে সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ, জাগ্রত অবস্থা দিয়েই আমাদের জগৎ চলে। বেদান্তীরা কিন্তু শুধু জাগ্রত অবস্থাকেই নিচ্ছেন না, তাঁরা স্বপ্নের অবস্থাকেও বিচারের মধ্যে নিয়ে আসেন। স্বপ্নে অর্থাৎ নিদ্রাতে আমরা যে সাত আট ঘন্টা অতিবাহিত করছি সেখানে আমরা জগতকে অন্য রকম দেখছি। সেখান থেকে জাগ্রত অবস্থায় এসে গেলে সেই জগতকেই আরেক রকম দেখছি। এই দুটো অবস্থার পরেও আরেকটি অবস্থা থেকে যায়, যাকে বলছেন সুষুপ্তির অবস্থা, খুব গভীর নিদ্রা। গভীর নিদ্রা থেকে জাগার পর দুটো জিনিস হয়, প্রথম হল আমার কোন কিছুর বোধ ছিল না, দ্বিতীয় হল একটা সুখের অনুভব। আমার কিছু মনে ছিল না, এই বোধটুকু কিন্তু থেকে যায়। কিছু মনে ছিল না, এটা আবার কিসের বোধ? এটাও একটা বোধ, অভাব বোধ। কোন কিছু ছিল না এই বোধটাও একটা বোধ। ওনারা বিচার করতে করতে দেখেন, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি মনেরই তিনটে অবস্থা। জাগ্রত অবস্থায় যা হয় সেটাও মনের, স্বপ্নে যা কিছু হয় সেটাও মনের আর সুষুপ্তিতে যা হয় সেটাও মনেরই হয়। বর্তমান যুগের নিওরোলজি বিজ্ঞানীরাও একই কথা বলছেন। মস্তিষ্কের সেলগুলো যখন একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করে তখন জাগ্রত অবস্থা, যখন আরেকটা পদ্ধতিতে কাজ করছে তখন স্বপ্নাবস্থা, অন্য আরেকটি পদ্ধতিতে কাজ করলে সেটা হয়ে যায় সুষুপ্তি।

মস্তিষ্কের এই তিনটে অবস্থার পারে যে এলাকা সেটাই শ্রীরামচন্দ্রের অবস্থা, এটাই শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান বিষ্ণু এটাই, এটাই ত্রিগুণাতীত। অগস্ত্য মুনি বলছেন, আপনি এই তিনটে অবস্থার পারে। আপনি আবার এই তিনটে অবস্থার সাক্ষী, আপনি আছেন বলেই মনের তিনটে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। আমাদের মনে হতে পারে, জাগ্রতকে যদি আমি স্বপ্নের মত আর স্বপ্নকে জাগ্রতের মত নিই তাহলে আমাদের জীবনের তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। ঠিকই, সত্যিই সর্বনাশ হয়ে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তার কারণ আমাদের সেই প্রস্তুতি নেই। যে এখনও টাকা-পয়সা, মান, ইন্দ্রিয়ের সুখ, মনের আনন্দ এগুলোকে ভালোবাসছে সেতো পাগল হয়ে যাবে। এগুলোকে ভালোবাসা মানে জাগ্রত অবস্থাকে ভালোবাসা। জাগ্রত অবস্থায় মনের চাহিদা যদি পুরো না মেটে তখন স্বপ্নের অবস্থায় গিয়ে সেগুলোকে পূরণ করে। মনের যে স্বপ্ন অবস্থা, তার মানে সেখানে কিছু হচ্ছে। জীবনে আমার সুখ হচ্ছে, দুঃখ হচ্ছে, কান্না হচ্ছে, যাকে ভালোবাসছি তার কাছ থেকে কষ্টও পাচ্ছি, যার কাছ থেকে কিছু আশা করছি না সেও অনেক সময় সুখ দিয়ে দেয়। মনের ঠিক এই রকমই হতে থাকে, ওটাই একটা পুরো জগৎ। কিন্তু

ঐ জগতের একটা বিরাট বড় বিশেষত্ব হল, যে সুখ জাগ্রত অবস্থায় আমি কোন দিন পেতে পারব না, স্বপ্নে সেই সুখও আমি পেয়ে যেতে পারি। কল্পনাতে মানুষ অনেক কিছু করে নেয়, ঠিক তেমনি স্বপ্নেও মানুষ অনেক কিছু করে নেয়। বেদান্তের দৃষ্টিতে কল্পনা কিন্তু মনের কোন বাস্তবিক অবস্থা নয়, ওটা বৃত্তির অবস্থা। বেদান্তের দৃষ্টিতে স্বপ্ন মনের একটি অবস্থা। জাগ্রত অবস্থার দুঃখ কষ্ট, কান্না থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেকে ড্রাগস নেয়, নেশা করে, কারণ ঐ স্বপ্নের অবস্থায় গিয়ে একটা সুখের মধ্যে ডুবে থাকে। কিন্তু তার জন্য জাগ্রত অবস্থা absolutely true। ড্রাগস নেওয়ার জন্য ওকে জাগ্রত অবস্থাতেই যেতে হবে, তার জন্য টাকা দরকার, জাগ্রত অবস্থায় টাকা দিয়ে হবে, স্বপ্ন অবস্থায় টাকা দিয়ে হবে না। কিন্তু উচ্চমানের যোগী, সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে সবটাই খসে পড়ে যায়। স্বপ্নের অবস্থায় তাঁদের নতুন কোন fulfillment হয় না। জাগ্রত অবস্থায় তিনি যা যা করেন স্বপ্ন অবস্থায় ঠিক তাই তাই করেন। সুষুপ্তিতেও তাঁর কোন আগ্রহ নেই, সম্পূর্ণ দৃষ্টিটা রয়েছে এই তিনটে অবস্থার যিনি সাক্ষী, সেই জায়গায় তিনি নিজের মনকে একাগ্র করেন। অগস্ত্য মুনি বলছেন, মানুষ এই তিনটে অবস্থার মধ্যেই ঘুর ঘুর করছে। সাধারণ মানুষ জাগ্রত অবস্থায় বেশি ঘুরে বেড়ায়। যাদের মধ্যে তমোগুণের প্রভাব বেশি, অলস হয়ে বসে থাকে, কোন কাজ করতে চায় না, তারা স্বপ্ন অবস্থায় বেশি থাকে। সুষুপ্তি অবস্থা সবারই জন্য বাঁধা আছে, কারুর একটু বেশি কারুর একটু কম। সুষুপ্তি অবস্থায় সবাইকেই যেতে হয়, তা নাহলে মানুষ বিশ্রাম পাবে না। পুরো জেগে থাকলেও বিশ্রাম হয় না, ঘুমিয়ে যদি শুধু স্বপ্নই দেখে তাও শরীরের পূর্ণ বিশ্রাম হবে না। সুষুপ্তি অবস্থাতেই মানুষের পূর্ণ বিশ্রাম হয়, কারণ তখন মানুষের মন আত্মার সব থেকে কাছে থাকে। যদি আত্মার সব থেকে কাছের অবস্থাকে নিয়ে তুলনা করা হয় তাহলে সুষুপ্তি অবস্থাই আত্মার সব থেকে কাছের অবস্থা। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা বেশিক্ষণ থাকে না, কারণ মন আর ইন্দ্রিয় কাউকে সুষুপ্তিতে থাকতে দেবে না। বড় বড় যোগীরাও পারেন না, তাঁরা সুষুপ্তি অবস্থাকে stimulate করার জন্য সমাধিতে থাকেন। সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞান যেমন তেমনই থাকে, সমাধি অবস্থায় অজ্ঞান থাকে না, পুরোপুরি জ্ঞান এসে যায়।

এরপর অগস্ত্য মুনি বলছেন, হে ভগবান! আপনি যদিও এই তিনটে অবস্থার সাক্ষী, কিন্তু আপনি যখন শরীর ধারণ করতে চান তখন আপনি মায়াকে স্বীকার করে নেন। মায়াকে স্বীকার করার পর কি হয় সেটাই পর পর কয়েকটি শ্লোকে বলছেন। এই কথাগুলো ঠাকুরও খুব বলতেন। এই ভাব বেদান্তের ভাব নয়, অধ্যাত্ম রামায়ণের এটা একটা টিপিক্যাল ভাব।

রাম মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা
প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্তিনঃ।৩/৩/৩১
তদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ।
অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে।৩/৩/৩২
বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি।
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্তন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে।৩/৩/৩৩

হে রাম! মায়ার দুটি রূপ, বিদ্যা আর অবিদ্যা। যারা অবিদ্যার বশবর্তী তারা প্রবৃত্তিমার্গে চলে, আর যারা নিবৃত্তিমার্গে চলে তারা বিদ্যার সাধক। যারা আপনার ভক্তিমার্গে আছে তারাও বিদ্যার সাধক, আর আপনার প্রতি যাদের ভক্তি নেই তারা সবাই অবিদ্যার বশে থাকে, তারাই সংসারের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়ে থাকে। যাঁরা বিদ্যার অভ্যাসি তাঁরা যেন নিত্যমুক্ত। মাস্টারমশাইয়ের দ্বিতীয় দর্শনের দিন ঠাকুর মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন, তোমার বিবাহ হয়েছে? অনেককেই ঠাকুর জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হত হ্যাঁ। তখন আবার জিজ্ঞেস করতেন তোমার স্ত্রী কি বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি। মাস্টারমশাই বলছেন অবিদ্যা শক্তি। অবিদ্যা বলাতে মাস্টারমশাই ভেবেছেন লেখাপড়া না জানা। ঠাকুর তখন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। বিদ্যা আর অবিদ্যাকে এখানে বেদান্তের দৃষ্টিত ও ভক্তির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করছেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রবৃত্তিমার্গের বা প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মকে নিয়ে বলছেন, প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম মানে যেখানে দুই বোধ আছে। প্রবৃত্তি মানে হয় কাজ করা, নিবৃত্তি মানে কাজ থেকে বেরিয়ে আসা। কাজের বোধ হওয়াটাই প্রবৃত্তি, আমি সেবা করব, এটা প্রবৃত্তি, আমি নিষ্কাম কর্মযোগ করব, এটাও প্রবৃত্তি। আমি এসব কিছুই করব না, কিন্তু আমি বিচার করব, বিচার করে সব কিছু বাদ দেব, এটাও প্রবৃত্তি। আমরা যেদিকেই যাই না কেন, সবটাই প্রবৃত্তির মধ্যে পড়বে। প্রবৃত্তি করে করে যখন তার একটা স্থিতি এসে যায়, সব কিছু বুঝে নিল; আমি তো ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরকে ভালোবাসা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু নেই।

আমাদের মনে হবে ভালোবাসছি এটাও তো প্রবৃত্তি। কিন্তু তা নয়, সেখানে সে করছে না, এটা তার ধর্ম, আমি এটাই। মা যখন ছেলেকে ভালোবাসছে সেখানে কিছু করে না, এটা আমিই। এটা আমিই যেখানে সেখানে স্বক্রিয়া অভাব, নিজের উপর ক্রিয়া কখনই হয় না। মা যখন সন্তানকে ভালোবাসছে তখন সেখানে ক্রিয়ার অভাব, মা জানে এই সন্তান আমিই, সেইজন্য ঐ ভালোবাসা ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। ঠিক তেমনি অনেক দিন ধরে আমি ফুল তুলছি, চন্দন ঘষছি, করতে করতে একদিন আত্মবোধ জেগে যাবে। আত্মবোধ জেগে গেলে তখন ঠাকুরের সঙ্গে আমি এক এই বোধটাই থেকে যায়। তখন বলে এই বোধ ছাড়া আমার অন্য কিছু লাগবে না। অন্য কিছু যখন ঢুকছে, তখন আর চেষ্টা করে আর আটকাতে হয় না, আপনা থেকেই আটকে যায়। কম্প্যুটারে ভাইরাসের আক্রমণ হয়, হ্যাকাররা ক্রমাগত কম্প্যুটার প্রোগ্রাম ছেড়ে যাচ্ছে, আর ফায়ার বলগুলো এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে ভাইরাস গুলো আর ঢুকতেই পারে না। যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত, যাদের ভেতরে সত্যিকারের ভক্তি ভাবের উদয় হয়ে গেছে, চলতে ফিরতে, কাজে, খাওয়া-দাওয়ায়, ঘুমনোয় সব সময় জানে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে এক। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান এখনও হয়নি। তখনও তাকে সাংসারিকতা অনবরত আক্রমণ করে যাচ্ছে, কিন্তু ওর ঐ বোধটাই আসে না। গীতায় ভগবান বলছেন নদী সমুদ্রে প্রবেশ করলে সমুদ্র বুঝতেই পারে না যে আমার মধ্যে কিছু প্রবেশ করছে, ওর মধ্যেই হারিয়ে যায়। ভক্তের মনে কোন ধরণের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না, ভেতরেও কোন চাঞ্চল্য নেই বাইরেও কোন চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই। আমাকে এই এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে, তখন এই বোধটাও থাকে না। যোগশাস্ত্রে বলছে, আমার যা পড়ার ছিল তা হয়ে গেছে, এই বোধটা তার এসে যায়।

বর্তমান কালে একজন খুব নামকরা পণ্ডিত আছেন, উনি পণ্ডিত আবার একজন দার্শনিকও। দেশে বিদেশে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি। গোলপার্কে উনি বছরে একবার এসে লেকচার দেন। একদিন এক মহারাজকে খুব দুঃখ করে বলছেন, এখন আস্তে আস্তে মেমরি ফেল করে যাচ্ছে। খুব হতাশ হয়ে দুঃখ করে কথাগুলো বলছেন, বিস্মৃতি এসে যাচ্ছে। পণ্ডিতের যদি বিস্মৃতি এসে যায় তাঁকে আর কে সম্মান দেবে! মঠেরই একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী কথায় কথায় একদিন অন্য একজনকে বলছেন, ভাগবতে এই কথা আছে। যাঁকে বলছেন তিনি আবার জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ ভাগবতে এই শ্লোকটা কি বলবেন। সন্ন্যাসী মহারাজ বলছেন, এখন মনে পড়ছে না, আর আমার দরকারও নেই, ওটার কাজ হয়ে গেছে। মহারাজের বক্তব্য হল, শাস্ত্রের যা কাজ ছিল, তার যে উদ্দেশ্য সেটা হয়ে গেছে। এখানেই একজন সন্ন্যাসী আর একজন পণ্ডিতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। পণ্ডিত হতাশ হয়ে বলছেন আমার বিস্মৃতি হয়ে গেছে আর সন্ন্যাসী বলছেন আমার বিস্মৃতি হয়ে গেছে তার সাথে বলছেন, ওর কাজ হয়ে গেছে। শাস্ত্রের কাজ আধ্যাত্মিকতার প্রত্যয় তৈরী করে দেওয়া, সেটা তাঁর হয়ে গেছে, আর কিসের দরকার শাস্ত্রের। যখন এই প্রত্যয় এসে যায়, তিনিই আছেন, তিনিই আমার সব কিছু, তখন ঐ বোধের জন্য যে ভালোবাসা হয়, মানুষ নিজেকে যেমন ভালোবাসে তখন ঈশ্বরকে তিনি সেভাবেই ভালোবাসেন। সেইজন্য তখন আর তাঁর কোন কিছু প্রবৃত্তিমার্গে থাকে না। ওটাই নিবৃত্তিমার্গ। ঠিক তেমনি আবার ভক্তির দৃষ্টিতে বলছেন, যাঁরা আপনার ভক্তিতে আছেন তাঁরাই নিবৃত্তিমার্গের, যাদের আপনার প্রতি ভক্তি নেই তারা প্রবৃত্তিমার্গের বা অবিদ্যা। যাঁরা আপনাতে আছেন তাঁরা বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত, যাঁরা বিদ্যাতে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা নিত্যমুক্ত। আপনার প্রতি যাদের ভক্তি নেই তাদের জন্ম-মৃত্যু চলতে থাকবে, কোন দিন শেষ হবে না। এখানে ভক্তি মানে মন্দিরে যাওয়া, চরণামৃত খাওয়া এগুলোকে বলছেন না, ভক্তি মানে তিনিই আছেন, তিনি ছাড়া আমার আর অন্য কোন বোধই নেই। শাস্ত্র পড়তে হবে সেই বোধও নেই, পাঁচ রকম পদের খাওয়া-দাওয়া করতে হবে সেদিকেও দৃষ্টি নেই, সাজপোষাকের কোন খোঁজ নেই। যেমন যেমন কাজ আসছে তেমন তেমন কাজকর্ম করে দিচ্ছেন, কোন দায়ীত্ব চেপে গেল সেটাকে মিটিয়ে দিচ্ছেন, কোন কিছুতেই তাঁর আগ্রহ নেই, একটাই বোধ তিনি আছেন, তিনিই আমার সব কিছু।

লোকে তৃদ্ভক্তিনিরতাস্তন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে, যাঁরা আপনাকে ভক্তি করেন আর আপনারই মন্ত্র জপ করতে থাকেন, এনাদের হৃদয়েই সেই বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহলে বিদ্যা কার হৃদয়ে জন্ম নেয়? যিনি শুধু মাত্র ঈশ্বরের ভক্তি নিয়ে আছেন আর সদা সর্বদা ইষ্টমন্ত্র জপ করে যাচ্ছেন। আমরা মনে করছি, আমিও তো জপধ্যান করছি, ঈশ্বরে ভক্তি করছি আরও কত কি করছি। সবাই ঠিকই বলছে, এবং কারুর প্রতি অশ্রদ্ধা না রেখেই বলতে হচ্ছে, যদি ভালো করে বিচার করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে কত রকমের কামনা, বাসনা, লোভ, হিংসা জমে আছে। তাহলে আমরা কার মন্ত্র জপ করছি? যে জিনিসের প্রতি আমাদের মোহ আছে। সব সময় কিসের চিন্তা করছি? লোভের, হিংসার চিন্তাই করছি, আর যাকে ভালোবাসি তার চিন্তা করছি। এখানে বলছেন,

যাঁরা ঈশ্বরকে ভালোবাসেন, ঈশ্বর বই আর কিছু চিন্তা নেই, এই ভালোবাসা এলে তখন বাকি কোন কিছুই কিছু নয়। নরম কাদা মাটিতে যদি একটা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারে, ঐ পাথর কাদার মধ্যে বসে গিয়ে ওর মধ্যেই হারিয়ে যাবে, ওখানেই ওর অস্তিত্ব শেষ। ঠিক তেমনি যিনি উচ্চমানের তাঁর মধ্যে কাম, ক্রোধ ঢুকলে ওখানেই হারিয়ে যাবে। সেইজন্য বলছেন, হে রামচন্দ্র! আপনার প্রতি যাঁর ভক্তি এসে গেছে সেতো মুক্ত। আর যার আপনার প্রতি ভক্তি নেই স্বপ্নেও তার মুক্তি সম্ভব নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রের গ্রন্থ তাই এখানে শ্রীরামচন্দ্রের নাম নিচ্ছেন, এই একই কথা শ্রীকৃষ্ণের নামে, শিবের নামে, ঠাকুরের নামেও আমরা বলতে পারি। তার মানে, সচ্চিদানন্দের প্রতি ভক্তি ভাব যদি না থাকে তাহলে তাকে এই সংসারে বারবার আসা যাওয়া করতে হবে, জীবনে তার কোন দিন মুক্তির সম্ভবনা থাকবে না। মুসলমানরা যে বলে আল্লার শরণে না যাওয়া ছাড়া তোমার কোন গতি নেই, তারা ঠিকই বলছে। কিন্তু আমাদের সাথে তফাৎ হল, আমাদের কাছে আল্লাও যিনি, শ্রীকৃষ্ণও তিনি, শ্রীরামও তিনি।

অগস্ত্য মুনি বলছে, হে রাম! বেশি কথা কি বলব। খুব সংক্ষেপে বলছি, মুক্তি বা মোক্ষের একটাই পথ, তা হল সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ছাড়া মুক্তি বা মোক্ষ কখনই হবে না। সাধু কাকে বলা হবে বলতে গিয়ে কয়েকটি শ্লোকে সাধুর লক্ষণ নিয়ে বলছেন। ঠাকুর খুব সহজ ভাবে বলছেন, যাঁর মন, প্রাণ, আত্মা সব সময় ঈশ্বরে নিবিষ্ট সেই সাধু। অধ্যাত্ম রামায়ণে আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলছেন। গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে যেভাবে বলা হয়েছে এখানেও ঠিক সেই ভাবে বলছেন, আপদে বিপদে, সম্পদে যাঁর চিত্ত সমান, নিস্পৃহ, পুত্রবিত্তে যাঁর কামনা নেই, ইন্দ্রিয়াদি সংযত, শান্তচিত্ত, হর্ষ বা বিষাদে হৃষ্ট ও বিষণ্ন হন না, আপনার ভক্ত, সর্বদা নির্জন স্থানে কামনাদিশূন্য হয়ে ব্রহ্ম চিন্তন করেন, সমস্ত কর্মরহিত আর যা কিছু পান তাতেই তিনি সন্তুষ্ট, ইনিই প্রকৃত সাধু। হয়ত দেখা যেতে পারে কোন সাধুর মধ্যে দুটো জিনিসের অভাব কিন্তু আরও চারটে জিনিস আছে, আমরা সাধারণ ভাবে বলে থাকি কোন জিনিসে যদি একটা দুর্গুণ থাকে তাহলে পুরো জিনিসটাকেই ফেলে দেবে। কিন্তু সাধুদের ক্ষেত্রে যদি উপরের একটা গুণও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে বাকি সব গুণই এসে যাবে। যে মানুষ নীচের দিকে যাচ্ছে, তার মধ্যে একটা যদি দুর্গুণ থাকে বাকি সব দুর্গুণ এসে যাবে। আর যে লোক উপরের দিকে যাচ্ছে তার মধ্যে একটা যদি সৎ গুণ এসে থাকে তাহলে বাকি সব সৎ গুণ তার মধ্যে এসে যাবে।

সাধুর লক্ষণ বলার পর বলছেন সাধুসঙ্গে কি হয়। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস জন্মায়, ভক্তি থেকে ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। ইংরাজীতে একটা খুব সুন্দর প্রবাদ আছে, to love is to know একটা জিনিসকে যখন ভালোবাসতে শুরু করে তখন তাকে জানতে শুরু করে। যে জিনিসটাকে যত জানবে সেই জিনিসের প্রতি তত ভালোবাসা জন্মাবে। যাকেই আমরা ভালোবাসি তার ব্যাপারে আমরা দুটো কথা জানতে চাই। যত তার ব্যাপারে জানি তত তাকে ভালোবাসি। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়। সেটাই এখানে বলছেন, সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মায়। প্রথমে একটু ভক্তি যদি না জন্মায় তাহলে তাঁকে জানার ইচ্ছা হবে না, অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান হবে না। ছোটবেলায় স্কুলে অঙ্ক, বিজ্ঞান এগুলো পড়তে আমাদের ভালো লাগত না, কারণ বিষয় গুলোকে ভালোবাসতাম না। কলেজ লাইফে এসে প্রেমের উপন্যাস পড়তে খুব ভালো লাগত। মানুষ ঐটারই জ্ঞান পেতে চায় যেটাকে সে ভালোবাসে। সাধারণ অবস্থায় মানুষ কখনই ঈশ্বরকে ভালোবাসবে না, সেইজন্য ঈশ্বরের ব্যাপারে জানার আগ্রহও হয় না। সাধুসঙ্গ হলে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করে। যেমন যেমন ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শুরু করে তেমন তেমন তার ঈশ্বরের জ্ঞান প্রাপ্তি হয়।

অগস্ত্য মুনি বলছেন, কি আর বলব! আমি অনেক তপস্যা করেছি, সেই তপস্যার ফলেই আজ আপনার দর্শন পেলাম। হে রাম! আপনার কাছে প্রার্থনা করি সীতার সাথে আপনার ছবি যেন আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরুক থাকে আর চলতে ফিরতে উপবেশনে যেন সব সময় আপনাকে হৃদয়ে স্মরণ করতে পারি। এইসব কথাবার্তা হওয়ার পর অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু দিব্য অস্ত্র দিলেন। এর আগে বিশ্বামিত্রও অনেক দিব্য অস্ত্র দিয়েছিলেন, এখন অগস্ত্য মুনিও কিছু দিব্য অস্ত্র দিলেন। এর মধ্যে একটা নামকরা দিব্য অস্ত্র রত্নখচিত খড়্গ আর অক্ষয় তুণীর দিয়েছেন, যার বাণ কখন শেষ হয়ে যাবে না। তারপর অগস্ত্য মুনি বলে দিলেন এখান থেকে একটু এগিয়ে গেলে পঞ্চবটী নামে একটা জায়গা আছে সেখানে আপনি শান্তিতে থাকতে পারবেন। শ্রীরামচন্দ্র আরও দক্ষিণ দিকে নেমে পঞ্চবটীর দিকে এগোতে শুরু করলেন।

<u>পঞ্চবটীতে লক্ষ্মণকে শ্রীরামের মোক্ষ সাধনের উপদেশ</u>

এগোতে এগোতে শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুকে দেখতে পেলেন। জটায়ু ছিলেন গৃধ্ররাজ। এখানে এসে মিথ্ তৈরী হয়। মিথের বৈশিষ্ট্য হল, একটা জিনিস বাস্তবিক আছে কিন্তু ঐ বাস্তবিক রূপকে এমন একটা আকারে নিয়ে যায় যেখানে জিনিসটা পুরোপুরি সত্য নাকি কাল্পনিক কিছু বোঝা যায় না। যেমন গৃধ্র, সাধারণ ভাবে খুব বড় পাখি, পাখিদের মধ্যে সব থেকে বড় হয়। গৃধ্রের আকারকে এখানে আরও বড় করে দেওয়া হয়েছে। পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর বাহন গড়ুরও গৃধ্র বংশের, গৃধ্র সাধারণত শকুন জাতীয় পাখি, কিন্তু দিব্য রূপে দেখানোর জন্য গড়ুর বলা হয়। বড় পাখি কিন্তু খুব শক্তিশালী। এখানেও একটা অস্বাভাবিক আকারের বর্ণনা করে বলছেন পাহাড়ের মত আকারের জটায়ুকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, এটা একটা রাক্ষস, আমার ধনু নিয়ে এস এই ঋষিভোজী রাক্ষসকে আমি বধ করে দেব। এই কথা শুনে জটায়ু ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পেয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, আমি আপনার বাবার বন্ধু, আগে আগে দেবতা অসুরদের মধ্যে সংগ্রামে আমিও দেবতাদের হয়ে লড়াই করেছি। আমি এখানে নিবাস করি আর আপনার একজন হিতৈষী। আপনি আর লক্ষ্মণ জঙ্গলে যখন ফলমূল সংগ্রহে যাবেন তখন আমি সীতার রক্ষা করব। সেইজন্য আপনি আমাকে বধ করবেন না। শ্রীরামচন্দ্র সব শুনে রাজী হয়ে জটায়ুকে ঐ জঙ্গলে বাস করতে বললেন।

এরপর সবাই গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে গেলেন, সেখান লক্ষ্মণ একটা ছোট্ট কুটির নির্মাণ করলেন। সবাই সেই কুটিরে বাস করতে লাগলেন। দিনের বেলায় লক্ষ্মণ সর্বদা অগ্রজ শ্রীরামের সেবায় রত। রাত্রিবেলা ধনু আর তীর নিয়ে কুটিরের পাশে ঘুরে ঘুরে সারা রাত পাহারা দেন। কারণ জঙ্গলে বন্যপশু ও রাক্ষসদের উপদ্রব আছে। একদিন শ্রীরামচন্দ্র একান্তে বসে আছেন, লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণিপাত সহকারে জিজ্ঞেস করছেন –

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষস্যৈকান্তিকীং গতিম্।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ সঙ্ক্ষেপাদ্বক্তুমর্হসি।৩/৪/১৭

হে ভগবন্! আমি আপনার কাছে মোক্ষ সাধন, মুক্তির সাধন কি রকম হয় শুনতে চাইছি। লক্ষ্মণ বশিষ্ঠ মুনির শিষ্য, বিশ্বামিত্র ঋষিরও সঙ্গ করেছেন, তাঁদের কাছে মোক্ষ, মুক্তির কথা শুনে থাকবেন। কিন্তু মানুষের যেটা প্রিয় বিষয় সেটাকে সে অনেক ভাবেই শুনতে চায়। আবার অনেক সময় মনে হয় আমি জিনিসটা জানি ঠিকই কিন্তু ইনি হলেন এই ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ, তাই একটু এনার মুখেও শুনতে চাই। দ্বিতীয় লক্ষ্মণের এই বোধ আছে যে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, সেইজন্য লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করছেন মুক্তির সাধন ঠিক কেমন হতে পারে। লক্ষ্মণ তাই শ্রীরামচন্দ্রকে তখন বলছেন –

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃংহিতম।
আচক্ষ্ব মে রঘুশ্রেষ্ঠ বক্তা নান্যোচহস্তি ভূতলে।৩/৪/১৮

হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্যের মধ্যে বিজ্ঞানযুক্ত জ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। গীতাতেও ভগবান বলছে, *জ্ঞানবিজ্ঞানসহিতং*। জ্ঞান মানে জিনিসটাকে জানা হয়ে গেল, বুঝে গেলাম আর বিজ্ঞান হল জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা। এই বিজ্ঞানের কথা আমাকে বিশেষ ভাবে বলুন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, ঠিক আছে তোমাকে সেই ব্যাপারে বলছি যেটাকে জেনে গেলে বুঝে নিলে মায়া থেকে যে সংসার ভ্রম তৈরী হয় মানুষ এই ভ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

ঘুরে ঘুরে একই কথা বিভিন্ন শাস্ত্র বলছে, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে বলে। মানুষের মন স্বভাবে অত্যন্ত চঞ্চল, কোন জিনিসে বেশিক্ষণ তাই মন দেওয়া যায় না। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সাধারণ মানুষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনতে চায় না, কিন্তু লোকগীতি সবাই শুনতে চায়। লোকগীতিতে সুর, ছন্দ খুব দ্রুতলয়ে চলে আর মনকে বেশি চেষ্টা করে শুনতে হয় না। সেইজন্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে লোকগীতি মানুষ বেশি পছন্দ করে। চেষ্টা মানে খাটনি, কিন্তু এটাই খুব পরিহাসের ব্যাপার যে মন এমনই সব সময় খেটে যাচ্ছে। সেখানে চেষ্টা লাগছে না, মনের ব্যাপারে চেষ্টা মানে মনকে আটকে দেওয়া। শরীরের ব্যাপারে চেষ্টা মানে শরীরকে চালানো কিন্তু মনের ক্ষেত্রে চেষ্টা করা মানে মনকে দমানো। সবার মন বন্ বন্ করে দৌড়াচ্ছে, চেষ্টা মানে এই মনকে শান্ত করা। অন্য দিকে শরীরটা চলতে চায় না, সেই শরীরটাকে চালানো মানে চেষ্টা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সময় মন শান্ত হতে শুরু করে,

কিন্তু মন শান্ত হওয়া পছন্দ করবে না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতও তাই অনেকেই পছন্দ করে না। কাহিনীর ক্ষেত্রেও তাই হয়। গোয়েন্দা কাহিনী, উপন্যাসে অনেক কিছু ঘটতে থাকে, মানুষ তাই এগুলো পড়তে খুব ভালোবাসে। আর্ট ফিল্ম বাজারে দুদিনের বেশি চলে না, কারণ ঐ ধীর ছবি আর তার ভাব কেউ ধরতেই পারবে না। একই কারণে আমরা শাস্ত্র পড়তে চাই না, ধ্যান করতে পারি না। ধ্যান পারি না, তাই আমাদের বলা হয় খুব করে জপ কর। জপে কিছুটা মন শান্ত হওয়াতে মনের একটা পরিবর্তন আসতে থাকে। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ সাধুদের বলতেন, কি বিধবাদের মত খালি জপ করছে, ধ্যান কর। ধ্যানে মনের বেশি যোগদান লাগে, কারণ মনকে শান্ত করতে হচ্ছে। মনের যোগদান যদি আরও কম করতে হয় তাহলে জপ করুন। আরও সহজ করতে হলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করুন, তার থেকে আরও সহজ করতে হলে অনেক রকম শাস্ত্র পড়তে থাকুন। কারণ মনে নিতে পারবে না। কাউকে যদি শুধু আচার্য শঙ্করের ভাষ্য সহ গীতা অনেক দিন ধরে পড়তে দেওয়া হয়, তাহলে সে নিতে পারবে না। একবার দুবার পড়বে, অনেক দিন পড়বে কিন্তু কিছুই ধরতে পারবে না। সেইজন্য অনেক রকম শাস্ত্রের দরকার, সব শাস্ত্র একই কথা বলছে কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলছে। মনও দৌড়াচ্ছে, দৌড়াতে দৌড়াতে একই কথা বিভিন্ন ভাবে শুনতে শুনতে কোন কথা কিভাবে ভেতরে কখন বসে যাবে টের পাওয়া যাবে না।

এর মধ্যে একটা খুব মজার ব্যাপার আছে। চৌদ্দ বছর বিরাট বড় সময়। হিসেব করলে দেখা যায় মোট বারো বা তের বছর শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটীতে ছিলেন। ভরত কয়েক দিনের মধ্যে জঙ্গলে এসে গিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তাঁরা আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকে আরও গভীরে চলে যাচ্ছেন। সীতার অপহরণ আর যুদ্ধাদি হতে এক বছরের মত লেগেছে। আর এক বছর প্রথমের দিকে সরিয়ে দিলে যে বারোটি বছর থাকছেন তার পুরোটাই এনারা পঞ্চবটীতে কাটিয়েছেন। কিন্তু এই বারো বছরের বর্ণনা খুব কম। একেবারেই যে নেই তাও নয়, কিন্তু সেই রকম উল্লেখযোগ্য বর্ণনা কিছু নেই। বিভিন্ন রামকথাতে এই ফাঁকটা পূরণ করা হয়েছে, রামচরিতমানসেও অনেক কিছু দিয়ে পূরণ করা হয়েছে আর অধ্যাত্ম রামায়ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যাত্ম শাস্ত্র, এখানেও পরস্পরের মধ্যে নানা রকম তত্ত্ব আলোচনা দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এখানে সেটাই মায়ার স্বরূপ, মোক্ষের সাধনা, পরমাত্মার স্বরূপ এগুলো দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে।

লক্ষ্মণ যে মুক্তি, মুক্তির সাধন, মায়া ও পরমাত্মার স্বরূপের কথা বলছেন এগুলো সব শাস্ত্রেই আছে, তবে অন্য ভাবে। কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে আর অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পরম্।
যদ্বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্।৩/৪/১৯
আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্।
জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাজ্ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্।৩/৪/২০
জ্ঞায়ঞ্চ পরমাত্মানং যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।৩/৪/২১
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ।
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্পতে।৩/৪/২২

হে বৎস! তোমাকে আমি অত্যন্ত গুহ্য কথা বলতে যাচ্ছি। সব শাস্ত্রেই বলে অত্যন্ত গুহ্য কথা বলতে যাচ্ছি। গীতাতেও ভগবান বলছেন, হে অর্জুন তোমাকে আমি অত্যন্ত গুহ্য কথা বলছি। গুহ্য এই জন্যই বলছেন, কারণ যাদের শ্রদ্ধা নেই তাদের সব কথা বলতে নেই। তারা বুঝবে না, না বুঝে হাসাহাসি করবে। গুহ্য কথার আরেকটা তাৎপর্য হল, যাদের শ্রদ্ধা আছে তারা এসব অমূল্য কথা শোনার সুযোগই পায় না। অনেকের শ্রদ্ধা আছে, শাস্ত্র কথা শোনারও সুযোগ হয়েছে কিন্তু কোন বোধ হয় না। সেইজন্য প্রথম প্রথম শাস্ত্রের কথা শুনে যেতে হয়, শুনে যাওয়াটাও একটা সাধনা। কঠোপনিষদে বলছেন, *আশ্চর্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা*, যতক্ষণ যিনি বলছেন তিনি যদি উচ্চমানের না হন আর শিষ্যও যদি উচ্চমানের না হয় ততক্ষণ বোধ হবে না। সেইজন্য অধ্যাত্ম বিদ্যাকে গুহ্য বিদ্যা বলা হয়। প্রথম কথা হল যাঁরা জানেন তাঁরা সবার সামনে বলবেন না, দ্বিতীয় যদি বুঝিয়েও দেন তাঁর সামনের শ্রোতা ধরতে পারবে না। তবে গুরু যদি সেই রকম হন আর শিষ্যও যদি সেই রকম হন তখন এই বিদ্যা ফলপ্রসু হয়। সেইজন্য একে গুহ্যবিদ্যা বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *যদ্বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্*, এই গুহ্য বিদ্যাকে জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে কি হয়? *বৈকল্পিকং ভ্রম*, বিকল্প জনিত যে

সংসার, জিনিসটা আছে এক রকম কিন্তু দেখাচ্ছে অন্য রকম এটাই ভ্রম। যোগশাস্ত্রেও প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যয়, নিদ্রা ও স্মৃতির কথা বলছেন। মনে যে বিভিন্ন রকম চিন্তার প্রবাহ চলছে এর পাঁচ রকম বিভিন্ন উৎস আছে, তার মধ্যে একটা হল বিকল্প। বিকল্প মানে পুরোটাই ভ্রমিত হয়ে আছে। সাধারণ যে ভ্রম, আমরা যে জগতে বাস করি, সেখান থেকে একটা বিকল্প হয়ে আছে। কিন্তু বলছেন পুরো জগটাই একটা বিকল্প। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন তোমাকে আমি কয়েকটা জিনিস বলে দিচ্ছি। প্রথমে আমি মায়ার স্বরূপ বলব, তারপর জ্ঞানের সাধন এবং তদনন্তর বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয়ে বর্ণনা করব, যে বিজ্ঞান দিয়ে ঠিক ঠিক পরামার্থ সাধন হয়। বিজ্ঞান বলতে বোঝাচ্ছেন পরমাত্মার ঠিক ঠিক জ্ঞান আর জ্ঞান বলতে বোঝাচ্ছেন বিচারের স্তর। কিন্তু বর্তমান কালে, বিশেষ করে কথামৃতে জ্ঞানের অর্থ হয় যেখানে একটা স্থির বিশ্বাস হয়ে গেছে আর বিজ্ঞান মানে যেখানে বাস্তবিক উপলব্ধি হয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই দুটি শব্দকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। মোটামুটি হল, খুব উচ্চস্তরের জ্ঞান যেখান থেকে তাকে আর কেউ নাড়িয়ে দিতে পারবে না। শ্রীরামচন্দ্র তিনটি জিনিসকে ব্যাখ্যা করছেন, মায়া কি, জ্ঞানের সাধন কি আর জ্ঞানের পরিণতি কি। নিজের তরফ থেকে যোগ করে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তার সাথে আমি তোমাকে পরমাত্মার স্বরূপের ব্যাপারেও বলব, যেটা জানলে মানুষের সংসার ভয় দূরীভূত হয়।

ভয় মনেরই একটা আবেগ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভয় থাকে। ভয়ের বিশ্লেষণ করতে করতে একেবারে শেষে ভয়ের যেটা উৎস, যেটা সবার মা, যতক্ষণ এই শেকড় থাকবে ততক্ষণ ভয় থাকবে। ভয়ের এই শেকড়টা কি? যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, ভয় তখনই হবে যখন এই বোধ হতে থাকবে যে আমার বাইরে কিছু আছে। আমার বাইরে যদি কিছু নাই থাকে তখন আর কিসের থেকে ভয় আসবে! সেইজন্য বলছেন, ব্রহ্মার যখন জন্ম হল তিনি তখন একা, একা দেখে তিনি ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি বিচার করতে শুরু করলেন, আমি তো একাই আছি আমার কার থেকে ভয়! তখন তাঁর সব ভয় চলে গেল। সেইজন্য বলছেন *অদ্বৈতমেব অভয়ম্*, যেখানে অদ্বৈত সেখানেই অভয়। যেখানে একত্ব বোধ সেখানে ভয়ের কিছু থাকে না। যেখানে দুই বোধ, আমি আলাদা তুমি আলাদা, তখনই ভয়। তাহলে ভয় কত দিন থাকবে? যত দিন না ঈশ্বর জ্ঞান হয়। ঈশ্বর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত, আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত ভয় থাকবেই। এরপর আপনি একে যাই বলুন, বাস্তব বলুন, কল্পনা বলুন, অজ্ঞান বলুন তাতে কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয় যদি কিছু না থাকে আপনাকে কে আঘাত করবে! আঘাত করার জন্য একজন লোক দরকার। এই আঘাতটা করবে দ্বিতীয়। যিনি পরমাত্ম দর্শন করে নিলেন তাঁর আর ভয়ের কিছু থাকছে না। কারণ তিনি ছাড়া তো আর কিছু নেই। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র এখানে বলছেন *জ্ঞায়ঞ্চ পরমাত্মানং যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ*, পরমাত্মার জ্ঞান হয়ে গেলে মানুষ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ পরমাত্মার জ্ঞান না হয়, আত্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণ ভয় থাকবেই। ভয় সব সময় দ্বৈত অর্থাৎ দুই বোধ থেকে হয়। এই দুই বোধ কোথা থেকে আসে? তখন বলবেন দুই বোধ অজ্ঞান থেকে আসে। মুক্তি যা ভয় নাশ হয়ে যাওয়াও তাই। মুক্তি মানেই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান মানেই একত্বের জ্ঞান, একত্বের জ্ঞান মানেই ভয় নাশ। একই কথা বিভিন্ন ভাবে বলছেন।

এরপর বলছেন *অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ*, অধ্যাত্ম রামায়াণের একটা সমস্যা হল, শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনে প্রথমটা বলবেন আর বাকি কথা পরের শ্লোকের প্রথম লাইনে বলে শেষ করবেন আর ঐ শ্লোকেরই দ্বিতীয় লাইন থেকে আরেকটা বিষয় শুরু করবেন। এটাও একটা স্টাইল। গীতায় বক্তব্য একটা শ্লোকেই বলে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, শরীরাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি হওয়াটাই মায়া। মায়াকে অনেক ভাবে পরিভাষিত করা হয়। খুব practical levelএ যদি যাওয়া হয় তাহলে মায়ার অর্থ হয় আত্মাতে আত্মবুদ্ধি না হয়ে যে কোন জিনিসে যদি আত্মবুদ্ধি হয় সেটাই মায়া। অনাত্ম বস্তু মানে যার মধ্যে চৈতন্য নেই। যেটা আমি নই সেটাকে আমি মনে করাটাই মায়া। বাকি সব কিছুকে সে পাল্টে দিতে পারে, কিন্তু নিজের শরীর আর মনের বাইরে সে কিছুতেই যেতে পারবে না। সেইজন্য এটাকে বলে ভ্রান্তি, মায়ার আরেকটা নাম ভ্রান্তি, অর্থাৎ জিনিসটা যা নয় সেটাকে সেই রকম দেখানো। আত্মা মানে আমি, এই আমিটা শুদ্ধ আত্মা ছাড়া যেখানে গিয়ে বোধ হচ্ছে এটা আমি, সেটাই অজ্ঞান। এই শরীরকে যখন ভালোবাসছে সে তখন অনাত্ম বস্তুকেই ভালোবাসছে, কারণ শরীরটা অনাত্ম বস্তু। কিন্তু আমরা জানছি এটা আমি। আমার মনকে মনে করছি আমি। মানুষ যাকে ভালোবাসে, স্ত্রী-পুত্র এদেরকে মনে করে আমি, এটাই মায়া। মা নিজের বাইরে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে বলে আমার সব ভালোবাসা এর জন্য। ছেলে যতই কুলাঙ্গার হোক মা তাকে ছাড়তে পারে না, এটাই মায়া। একজন পুরুষ একটা মেয়েকে ভালোবাসে, মেয়েটা বদমাইস, পুরুষ তাকে ছাড়তে পারছে না, এটাই মায়া। আগেকার দিনে বাবা-মা

অনেক দেখাশোনা করে একটা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিত। তারপর দেখা গেল ছেলেটা একটা অপদার্থ। কিন্তু স্ত্রী তাকে ছাড়ত না, পাতিব্রত ধর্ম এমন ভাবে মাথায় বসে আছে যে স্ত্রী ঐ অপদার্থ স্বামীকেই পতিদেবতা বলে আঁকড়ে থাকত, এটাই মায়া। যখন আমরা শরীরকে ভালোবাসছি তখন এটাই মায়া, নিজের মনকে ভালোবাসছি, এটাই মায়া। আত্মা ব্যতিরেকে, আত্মা মানে শুদ্ধ চৈতন্য, যে কোন জিনিসকে যখন ভালোবাসছি, এটাই মায়া। শুদ্ধ চৈতন্যে যখন মনকে বসিয়ে রেখেছে, ঐ শুদ্ধ চৈতন্যকে ভালোবাসছে, এটাই তার স্বরূপ, তার এটাই স্বভাব। এখান পর্যন্ত ঠিকই আছে, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যের বাইরে যে কোন জিনিসকে ভালোবাসা মানেই মায়া। ভালোবাসা মানে আত্মবুদ্ধি, কারণ নিজেকে ছাড়া মানুষ অন্য কোন কিছুকে কখনই ভালোবাসে না। আমরা যেটাকে মনে করি এটা আমি, সেটাকেই ভালোবাসা বলে। মা সন্তানকে ভালোবাসে, কারণ মা জানে এটা আমি। একেবারে কুৎসিৎ দেখতে সন্তানও মায়ের দৃষ্টিতে সব থেকে সুন্দর। কারণ সে মায়েরই বিস্তার, এটাই মায়ের আমি। স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রেও একই জিনিস হয়। মানুষ ভগবানকে ভালোবাসে কেন? কারণ এটাই আমি। ভগবান ভক্তকে ভালোবাসেন কেন? ভগবান জানেন এটাই আমি। যেখানে এই বোধ যে এটা আমি সেখানেই ভালোবাসা আসে, এর বাইরে আর কোথাও ভালোবাসা আসে না। সাধারণ ভাবে মানুষ নিজের শরীরকে সব থেকে বেশি ভালোবাসে, কারণ সে জানে এই শরীরটাই আমি। একটু উন্নত মনের যাঁরা তাঁরা নিজের সৃষ্টিকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন।

ঠাকুর বলছেন সংসারে বাড়ির ঝিয়ের মত থাকবে। ঝি সব কিছুই করে কিন্তু জানে এই বাড়ির কোন কিছুই আমার নয়। মালিকের ছেলেকে দেখিয়ে বলে আমার রাম বড় দুষ্টু, কিন্তু জানে আমার আসল রাম দেশের বাড়িতে আছে। কিন্তু ব্যবহারে এই জিনিস অত্যন্ত কঠিন, সব কিছু করা সত্ত্বেও মনকে আত্মতত্ত্বে নিয়ে গিয়ে বসানো খুব কঠিন। সাধুদের পক্ষেই অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় আর সংসারীদের সংসারের সব কিছু থেকে বেরিয়ে এসে এই ভাব নিয়ে আসা খুবই দুষ্কর। সেইজন্য অধ্যাত্ম কখনই গৃহস্থদের জন্য নয়। ঠাকুরকে গৃহী ভক্তরা জিজ্ঞেস করছেন, সংসারে থেকে কি হবে না? ঠাকুর বলছেন, হবে না কেন। গৃহীদের একটু সাহস দেওয়ার জন্য এই কথা বলছেন। সন্তান মরে গেল আর সংসারীরা বলবে এটা মায়া, এ কি কখন সম্ভব! সেইজন্য গৃহীদের ধর্ম, অর্থ ও কাম এই তিনটেকে অবলম্বন করতে বলা হয়। মুক্তির পথ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তাই বলে কি কিছুই হবে না। হবে, প্রচুর সাধনা করতে হয়। সংসারীরা সংসারকে জোঁকের মত আঁকড়ে আছে। জোঁকের মুখ থেকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে প্রচুর প্রাণপাত খাটনি দরকার। ঘোর বেদান্তীরা বলবে, ঈশ্বরকে ভালোবাসাটাও মায়া। একজন খুব উচ্চ রামভক্ত ছিলেন। আরেকজন ঘোর বেদান্তী সাধুর সাথে দেখা হতে সাধু তাঁকে কিভাবে কিভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, রামকে যে ভালোবাসছ এটাও মায়া। রামভক্ত সাধুটি কেমন হতাশ হয়ে বলছে, এটাও মায়া? হ্যাঁ, এটাও মায়া। সেই দিনই তিনি সব কিছু ছেড়ে হিমালয়ের দিকে বেরিয়ে গেলেন। এখানে যিনি বোঝালেন তিনিও ভুল আর যিনি বুঝলেন তিনিও ভুল। কারণ ঈশ্বর কেন মায়া হবেন? তিনি তো মায়াধীশ। ঘোর বেদান্তের এই এক সমস্যা, যখন খুব বেশি ঠেলে নিয়ে যায়, যেখানে গিয়ে থামে সেখানে তাদের সিদ্ধান্তগুলোতে গোলমাল হয়ে যায়। ঘোর বেদান্তীরা ঈশ্বরের স্বরূপকেও মায়া বলে উড়িয়ে দেয়। এর সব থেকে ভালো দৃষ্টান্ত হলেন তোতাপুরী। ঠাকুর হাততালি দিয়ে মা কালীর গান করছেন, তোতাপুরী বলছেন, ক্যায়া রোটি ঠোকতা হ্যায়। মা কালী ঈশ্বর কিন্তু ঘোর বেদান্তী ঈশ্বরের স্বরূপকেও মানবে না, ঈশ্বরীয় রূপটাও তার কাছে মায়া।

প্রত্যেক সিদ্ধ পুরুষের একটা ডিভাইডিং লাইন থাকে। ডিভাইডিং লাইনের এই দিকটা মানুষ, ডিভাইডিং লাইনের ঐ দিকটায় তিনি ভগবান হয়ে যান। মুর্খ যখন সুষুপ্তিতে যায় তখন সে মুর্খ হয়েই ফেরত আসে, কিন্তু একজন মুর্খ যদি সমাধিতে চলে যায় মুর্খ জ্ঞানী হয়ে ফেরত আসে। একটা দিনে দুই রকম এই তফাৎ, এদিকে এক রকম আর ঐদিকে আরেক রকম বা একদিন আগে এক রকম ছিল পরের দিন অন্য রকম হয়ে গেল। এর সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত আমরা ভগবান বুদ্ধের জীবনে পাই। বোধিবৃক্ষের তলায় বসে ঠিক করে নিলেন আমি আর এখান থেকে উঠছি না। পরের দিন সকালে যখন উঠলেন তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে উঠে এলেন। সুজাতার পায়েস খেয়ে সন্ধ্যে বেলায় যখন তিনি বসেছেন তখন তিনি অজ্ঞানেই ছিলেন। কারণ তিনি নিজেই বলছেন এই যে আমি এখানে বসলাম, হয় আমি জ্ঞান উপলব্ধি করব না হয়তো এখানেই আমার শরীরের পতন হয়ে যাবে। এরপর মাড় এলো, ভগবান বুদ্ধকে অনেক প্রলোভন দেখাচ্ছে, সেখান থেকে তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি হয়ে গেল। একটা রাতেই হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলাতে এক রকম ছিলেন, সকাল হতে হতে অন্য রকম। গুরু নানকেরও এই ধরণের

ঘটনা আছে। ওনারও অনেক দিন ধরে প্রস্তুতি চলছিল, ভগবান বুদ্ধেরও প্রস্তুতি অনেক দিন ধরে চলছিল। কিন্তু যখন জ্ঞান হল একরাতের মধ্যেই তা হয়ে গেল। গুরু নানককে নিয়ে অবশ্য অনেক মিথ তৈরী হয়েছে। তিনি নদীতে প্রবেশ করলেন, তারপর আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কেউ বলে তিন দিন, কেউ বলে তের দিন, হঠাৎ ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেরিয়ে এসে তিনি বলছেন, না কৈ হিন্দু না কৈ মুসলমান। মহম্মদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। সাধনা করার পর তাঁকে এক রাত্রে দিব্য ঘোড়ায় করে আল্লার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মহম্মদেরও জ্ঞান উপলব্ধি এক রাত্রে হয়েছে। এর কোনটাকেই কাহিনী রূপে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ভগবান বুদ্ধ তাঁর এই উপলব্ধির কথা নিশ্চয়ই তাঁর শিষ্যদের বলেছেন। কিন্তু অনেকগুলো জিনিস আছে যা বোঝা যায় না। যেমন যীশু, উনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, কত বছর তাঁর কোন হদিশই পাওয়া যায়নি। কিন্তু যখন ফেরত এলেন ততদিনে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে গেছে। ঠাকুর ঠিক কোন জায়গা থেকে বিশ্বগুরু হলেন বলা খুব মুশকিল। মা কালীর দর্শন হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে অনেক কিছু শিখছেন। সেখানে শিক্ষা সমাপ্তি হয়ে যাওয়ার পর তোতাপুরী এসে ঠাকুরকে দশ-এগারো মাস বেদান্তের শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যেদিন তিনি কুঠিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলছেন তোরা কে কোথায় আছিস, বা কথামৃত ঠিক ঠিক রচনা হতে শুরু হল, ঐটাই হল ওনার ঠিক ঠিক বিশ্বগুরু ভাবের শুরু বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন পয়েন্টে গুরুভাব এসেছে, সারদানন্দজী মহারাজও লিখছেন কবে থেকে গুরুভাব এসেছে বলা মুশকিল। স্বামীজীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আবার খুব কঠিন হয়ে যায়। স্বামীজীকে আমরা নিত্যসিদ্ধ, সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি বলছি ঠিকই কিন্তু যুক্তিতে এভাবে চলবে না। কারণ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই স্বামীজীর মধ্যে অনেক ভাব, চিন্তার পরিবর্তন হচ্ছে। ঠাকুরের কাছে যাওয়ার সময় ব্রাহ্মদের বিচিত্র সব ধারণা নিয়ে গেছেন, ঠাকুরকেই বলছেন উনি এখনও কালীঘরে যান। স্বামীজীর তখন এত উদ্ভট উদ্ভট ধারণা নিয়ে চলতেন যে ঠাকুরও একদিন বিরক্ত হয়ে বলছেন, তুই আর এখানে আসবি না। কোন পয়েন্টে স্বামীজীর ট্রান্সফরমেশান হয়েছে বলা খুব মুশকিল। যীশুর যেমন তিন বছরের কোন হদিশ পাওয়া যায় না, ঠাকুরেরও একট লম্বা সাধনার ইতিহাস আছে। তেমনি স্বামীজীরও একটা বড় সময় ১৮৮৬ থেকে ১৮৯৩ এই লম্বা সাতটা বছর স্বামীজীর জীবনের একটা বিরাট পরিবর্তনের সময়। শিবরাত্রীর দিন স্বামীজীর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল ঠিকই, এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। কন্যাকুমারীতে স্বামীজীর যে সমাধি হয়েছিল যোগশাস্ত্রে এই সমাধিকে বলছেন ধর্মমেঘ সমাধি। যদি একটা পয়েন্টকেই বলতে হয় তাহলে কন্যাকুমারীই বলতে হবে। তার আগে পর্যন্ত স্বামীজী যোগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। পওহারি বাবার কাছে যখন যাচ্ছেন তখনও তাঁর মনে হচ্ছে যেন জ্ঞান প্রাপ্তি হয়নি। অথচ সিন্ধু নদীর ধার গেলেন, সেখানে বেদের ঋষির দর্শন পাচ্ছেন, দ্বারকাতে যখন আছেন সেখানে তিনি ভারতের ভবিষ্যতকে দেখছেন জ্যোতির্ময়। কিন্তু যখন কন্যাকুমারীতে গিয়ে ধ্যানে বসলেন সেখানে তিনি যে সমাধি লাভ করলেন এই সমাধিকে যোগশাস্ত্র বলছে ধর্মমেঘ সমাধি। ধর্মমেঘ সমাধি মানে, ওখানে সব মেঘ যেন একত্রিত হয়ে ঠেসে গেছে, আর কোন মেঘ আসার নেই। ধর্মমেঘ মানে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমস্ত জ্ঞান সেখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, সব মেঘের সমাবেশ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও বৃষ্টি পড়ছে না। এবার ওখান থেকে হতে শুরু করল, হতেই একটা ফোঁটা পড়ল। একটি ফোঁটা পড়লে আর সামলান যাবে না। নানককেও সামলান যাবে না, যীশুকেও সামলান যাবে না, মহম্মদকেও না, ঠাকুরকেও না। যদি একটা সিংগল পয়েন্ট বলতে হয় তাহলে স্বামীজীর জীবনে কন্যাকুমারীর এই ঘটনাই নিতে হবে। আর এর ঠিক ঠিক প্রকাশ ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় সিস্টারস এণ্ড ব্রাদার্স বলার মাধ্যমে। কিন্তু খুব ভালো করে বিচার করে যদি দেখা যায়, ঠাকুরের মহাসমাধি থেকে শুরু করে ১৮৯৩ পর্যন্ত স্বামীজীর জীবনের এই সাতটি বছর যীশুর জীবনের ঐ কটি বছরের মত ছেড়ে দিতে হয়। স্বামীজীর তাই single point বলা খুব মুশকিল।

যাই হোক আমরা মায়ার আলোচনা করছিলাম। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে খুব সুন্দর বলছেন, *সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্পতে*, এটাই সংসার। সংসার মানেই অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি। অনাত্ম বস্তুতে আমির যে কল্পনা, এতেই সংসারের কল্পনা হয়। সংসার সব সময় মনের বস্তু, আমার সংসার আপনার সংসার সব সময় আলাদা হবে। আমার সংসার আমার কল্পনা জনিত, আপনার সংসার আপনার কল্পনা জনিত। সংসারে যে যে অনাত্ম বস্তুতে আত্মবোধ সেই সেই বস্তুকেই আমি ভালোবাসি আর যেগুলোতে আমার আত্মবোধ হয় না, সেগুলোই আমার শত্রু রূপে আসে। আমি যাকে ভালোবাসি সেটা আমি, যাকে ভালোবাসি না সে আমার বাইরে। আমার বাইরে যা কিছু আছে সেখান থেকে আমার যত রকম ভয়। আর যে মুহুর্তে অনাত্ম বস্তু থেকে মন তুলে আত্মাতে আত্মবুদ্ধি

করে নিল সেই মুহুর্তে তার সংসার থেকে মুক্তি হয়ে গেল। এই আত্মবুদ্ধি তত্ত্বগত ভাবে করে নিলে হয় না, আমরা তত্ত্বগত ভাবে করে নিতে পারি কিন্তু তাতে হবে না। আত্মাতে গিয়ে আত্মা যখন বসে যায় তখনই হয়। তখন দেখে আত্মার উপর সব কিছুর নাম রূপের খেলা চলছে বা দেখেন ঈশ্বরই এই সব কিছু হয়েছেন। এটাই তখন হয়ে যায় সংসার নিবৃত্তি। অনাত্ম বস্তুতে তখন আর ভালোবাসা থাকে না। অনাত্ম বস্তুতে যে আমির বিস্তার হয়ে গিয়েছিল ঐ বিস্তারকে গুটিয়ে নিয়ে আসা, গুটিয়ে নিয়ে এসে যখন সাধন-ভজন করল, সাধন-ভজন করার পর তাঁর ভেতরে একাত্ম বোধ আসে। মজার ব্যাপার হল, আত্মজ্ঞানে সবাইকে জড়িয়ে নেয়, ভালোবাসাতেও জড়ায়, জড়ানোটা দুটো ক্ষেত্রেই থাকে।

এর উপর ঠাকুরের অনেক বর্ণনা আছে। ঠাকুরকে একদিন হলধারী বলছেন, তুমি কায়েতের ছেলেদের এত ভালোবাস কেন। হলধারী নরেন রাখালের কথা বলতে চাইছেন। ঠাকুর বলছেন, এদের মধ্যে আমি নারায়ণ দেখি, এই দেখ আমি এদের উপর থেকে মন তুলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন, চুল, দাড়ি, লোম সব শজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নরেন, রাখালের শরীর, মন অনাত্ম বস্তু, জ্ঞানীর কখনই এগুলোর উপর আত্মবোধ হতে পারে না। ভালোবাসতে হলে তাঁকে আত্মবস্তুকেই ভালোবাসতে হবে। কেউ বলতে পারে আত্মাই তো সব কিছু হয়েছেন, ঠিকই আত্মাই সব কিছু কিন্তু প্রকাশের তারতম্য থেকে যায়। নরেন রাখালাদির উপর প্রকাশ অনেক বেশি, সেইজন্য সেখানে ভালোবাসাটাও বেশি। অন্য সব কিছুকে তিনি যে উড়িয়ে দিচ্ছেন তা নয়, সবাইকেই তিনি ভালোবাসছেন, সব কিছুই নিচ্ছেন। গলার অসুখের সময় বলছেন, আমার এখন এমন অবস্থা হয়ে যে হয় সবাইকে মানি আর তা নাহলে কাউকেই মানি না। বাচ্চা ছেলেও যদি ওষুধ দিতে আসে তখন ওকেও মানি, তা যদি না মানি তাহলে বড় ডাক্তারকেও মানি না। কথামৃত আর লীলাপ্রসঙ্গ পড়লে ধর্মভাব গুলো আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

মায়ার দুটি রূপ, আবরণ আর বিক্ষেপ। আবরণ মানে ঢেকে দেওয়া আর বিক্ষেপ মানে জিনিসটা যেমনটি তেমনটি না দেখিয়ে অন্য রকম দেখানো। মায়ার প্রথম কাজ সচ্চিদানন্দকে ঢেকে দিচ্ছে, বাস্তবিক জ্ঞানকে ঢেকে দিচ্ছে। ঢেকে দিলে তো ঝামেলা চুকে গেল। কিন্তু ঢেকে দিয়েই সে থেমে যায় না, ঢেকে দিয়ে সে আরেকটা কাজ করে। সচ্চিদানন্দকে তখন অনেক রকম রূপে দেখিয়ে দিচ্ছে। যেমন মরুভূমিতে মরীচিকা বা গরমের সময় গাড়ি করে যাওয়ার সময় মনে হবে রাস্তায় যেন জল পড়ে আছে। সিনেমার প্রজেক্টরে একটা রীল দিয়ে দেওয়া হল, প্রথমে প্রজেক্টরের শুদ্ধ আলোটাকে আটকে দিল, কিন্তু এরপর পর্দায় একটা অন্য রকম ইমেজ তৈরী করে দিল। একটু চলতে না চলতেই পর্দায় কত কিছু শুরু হয়ে যায়, মারপিট, ভালোবাসা, হাসি, কান্না কত কিছু চলতে থাকে। চলতে চলতে একটা সময় রীলটা শেষ হয়ে গেল। রীলটা খুলে নিলে প্রজেক্টরের শুদ্ধ আলোটা এসে পর্দায় গিয়ে পড়ল, এখন না আছে কোন আবরণ না আছে কোন বিক্ষেপ। যে শুদ্ধ আলো ছিল সেই শুদ্ধ আলোই রইল। মায়া বাস্তবিক তাই করে। এই খেলাকে দেখছে কে? যাঁর বোঝার ক্ষমতা আছে। বোঝার ক্ষমতা একমাত্র সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কারুর নেই। কাকে দেখছেন? নিজেকেই দেখছেন। কিভাবে দেখছেন? অন্য রূপে দেখছেন। অন্য রূপ কি? ঐটাই মায়া। মায়া আবার তাঁরই শক্তি। দৃশ্যগুলো দেখছেন আর ওর মধ্যেই হাসছেন ওর মধ্যেই কাঁদছেন। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দেখছেন সবই সচ্চিদানন্দ। বালিশের খোলগুলো আলাদা আলাদা কিন্তু সবই সেই তুলো। লেটো গালে হাত দিয়ে বসে আছে, দেখছি সেই সচ্চিদানন্দই গালে হাত দিয়ে বসে আছে, লেটো ঘাড় নাড়ছে দেখছি তিনিই ঘাড় নাড়ছেন। ঠাকুরের প্রজেক্টরের রীলটা শেষ হয়ে গেছে। এখানেও তাই বলছেন, সচ্চিদানন্দের উপর বাকি যা কিছু চলছে সবই সেই আবরণ আর বিক্ষেপ।

এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বলছেন, *রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন*, যদি বিচার করে দেখা হয় তখন দেখা যাবে পরমাত্মাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কল্পনা মাত্র। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছি, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ও দেবতারা রয়েছেন সবটাই রজ্জুতে সর্পভ্রম। প্রজেক্টরের আলোর সামনে একটার পর একটা ছবি ভেসে চলেছে। মহাপুরুষরা ধ্যানের গভীরে সমাধি অবস্থায় দেখেন পরমাত্মা ছাড়া কিছু নেই। তখন যাবতীয় যা কিছু আছে সব কিছুকে মুখোশের মত দেখাচ্ছে। কিসের উপরে? ঐ সচ্চিদানন্দের উপরে। মুখোশ বলতে সচরাচর আমরা বুঝি আবরণ, কিন্তু এই আবরণটা তা নয়, এটাও তিনি। যেমন জল, জল বরফ হয়ে গেছে, সেই বরফ জলের উপরে ভাসছে, জলকে বরফ এখন ঢেকে রেখেছে। বরফের আবার অনেক রকম আকৃতি হয়ে গেছে। বরফের উপর সূর্যের আলো পড়ছে, সেই আলোকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে, কিন্তু সবটাই জলের খেলা। খুব

গভীর ভাবে বিচার করলে তখন মনে হবে এনারা ঠিকই বলছেন। বেদান্ত ছাড়া আর কোন ধর্মেই পাওয়া যাবে না যে, জগতটা মিথ্যা বলছেন। বৌদ্ধ ধর্মে কিছুটা আছে, যেখানে শূন্যবাদ নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে আর কোথাও কেউ বলছেন না যে জগতটা কল্পনা মাত্র, জগতটা মিথ্যা। অথচ জগতটা যে মিথ্যা এই ভাবটা আছে, যেমন বৌদ্ধদের শূন্যবাদ। কিছু কিছু গ্রীক দার্শনিক এবং কিছু খ্রীশ্চান দার্শনিক ছিলেন যাঁদের চিন্তার মধ্যে এই ভাবগুলো ছিল। পাশ্চাত্যের অনেক কবি, দার্শনিকরাও বলছেন যে world is like a dream। কিন্তু জগতটা একটা স্বপ্নবৎ এই জিনিসটাকে ধর্মের তত্ত্ব রূপে দেখা, একমাত্র বেদান্ত ছাড়া আর কোথাও নেই। ধর্ম মানেই সে পরমাত্মার কথা বলবে, কোন না কোন রূপে ঈশ্বরের কথাই বলবে, আর তুমি যতটুকু আছ ঠিক ততটুকুই তুমি নও তার থেকেও তুমি অনেক বেশি, এই কথাও সব ধর্মই বলছে, মৃত্যুর পর জীবন কোন না কোন ভাবে চলছে, এই কথাও বেশির ভাগ ধর্ম মেনে নিয়েছে। তার মানে হিন্দু ধর্ম যা বলে অন্যান্য ধর্মও তাই বলে, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে কথাগুলো পাল্টে যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের মূল যেটা, সেই বেদান্ত যেভাবে বলে জগতটা মিথ্যা, স্বপ্নবৎ, কোন ধর্মই বলে না। বিচার ছাড়া জগৎ যে স্বপ্নবৎ বোঝা যাবে না। কবি ও দার্শনিকরা যখন খুব গভীরে চিন্তা করছেন তখন তাঁরাও বুঝতে পারছেন যে সব নাম আর রূপের খেলা, কিন্তু বিভিন্ন ভাবে নিজের মত করে ব্যক্ত করছেন। ধর্মের মাধ্যমে বিচার করা এই জিনিস বেদান্ত ছাড়া আর কোন ধর্মে নেই। বিচার মার্গটাও যে একটা সাধন পথ হতে পারে, বেদান্ত ছাড়া আর কোথাও নেই। সেইজন্য বেদান্ত যত জোরের সাথে বলে জগৎ মিথ্যা এভাবে কেউ বলে না। বিচার ছাড়া এই ভাব কখনই আসবে না। যেমন ঠাকুর সাধনা করে মা কালী দর্শন পেলেন, তাঁর তো সব কিছু হয়েই গেল, যীশুর যে জ্ঞান ঠাকুরেরও সেই জ্ঞান হয়ে গেল। কিন্তু তোতাপুরীর সাথে ঠাকুরের দেখা হওয়ার পর ঠাকুরের বিচার ভাবটা যেন শুরু হল। ঐ বিচার ভাব দিয়ে যখন তিনি অদ্বৈতের অবস্থায় পোঁছেছেন, তারপরই স্বপ্নবৎ, অদ্বৈতম্, এই কথাগুলো আসতে শুরু হয়ে গেল। যতক্ষণ বিচারমার্গ দিয়ে সাধন করা না হবে ততক্ষণ জগৎ স্বপ্নবৎ এই বোধ হবে না। সেইজন্য মাধ্বাচার্য, রামানুজম, এনারা কোন জগতকেই স্বপ্নবৎ বলবেন না, বলার জন্য সবাইকে বিচারমার্গ নিতে হবে। এই বিচারমার্গকেই জ্ঞানযোগ বলা হয়, যার কথা স্বামীজী জ্ঞানযোগে বলছেন। মজার ব্যাপার হল, বিচার সবাই করে। সবাই বলছে টাকা-পয়সা মায়া। কিন্তু টাকা যখন হাতে আসে তখন কেউ বলে না, কিন্তু হাত থেকে যখন বেরিয়ে যায় তখন বলে টাকা মায়া। কিন্তু মিথ্যা বলে বোধ তো হচ্ছে। জগতের প্রধান চালিকা শক্তি টাকা আর নারী, দুটোকেই একটা অবস্থায় মানুষের মিথ্যা বলে মনে হয়। নাম-যশও যখন বেরিয়ে যায় তখনও মায়া বলে বোধ হয়। তার মানে কোথাও বিচার জিনিসটা কাজ করতে শুরু করে, জগতটা ক্ষণভঙ্গুর, অচিরন্তন, অস্থায়ী এই বোধগুলো আসতে শুরু হয়। কিন্তু একমাত্র বেদান্ত ছাড়া বিচারকে কোন ধর্মই আধ্যাত্মিক পথ রূপে নেয়নি। পাশ্চাত্যের কবি বা দার্শনিকদের যেটা understanding রূপে ছিল সেটাই বেদান্তে realization রূপে এসেছে।

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে তাই বলছেন, ভাই তুমি বিচার করে দেখ, রজ্জুতে যেমন সর্প ভ্রম হয়, ঠিক তেমনি পরমাত্মাতে জগৎ ভ্রম হয়, পরমাত্মা ছাড়া কিছু নেই। পরমাত্মা তো সবাই দেখছেন, যীশুও দেখছেন, মহম্মদও তাই দেখছেন, গুরু নানকও তাই দেখছেন কেউই স্বপ্নবৎ বলছেন না। এটাও সবাই বলছেন যে জগতটা অস্থায়ী, কিন্তু জগতটা স্বপ্নবৎ এত দৃঢ় ভাবে বেদান্ত ছাড়া কেউ বলছেন না। এর একটাই কারণ যেটা বলা হল, বিচার করাটা সাধনা রূপে কোন ধর্মেই আসেনি। এটাই এখানে বলছেন ক্ষুদ্র তৃণের একটা ডগা থেকে শুরু করে ব্রহ্মা পর্যন্ত যে নানান কিছু দেখছ, এরই মধ্যে স্থুল জগৎ, সূক্ষ্ম জগতও দেখছ, স্বপ্ন জগৎ দেখছ বা দেবতাদের জগতকেও দেখছ, এগুলো সবটাই বিক্ষেপ। বিক্ষেপের জন্য সব কিছু হচ্ছে। মায়াকে প্রথম ব্যষ্টি স্তরে এবং পরে সমষ্টি স্তরে আলোচনা করছেন। কোন নারীকে দেখে কামী পুরুষ বিশ্ব সুন্দরী মনে করছে তখন এটা বিক্ষেপ, শরীরটা বিক্ষেপ হয়ে সুন্দরী রূপে দেখাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, মানুষ যা কিছু কান দিয়ে শ্রবণ করে, যা কিছু চোখ দিয়ে দেখে, মনে যেমন নানান রকমের কল্পনা হয়, কল্পনা গুলো যেমন অসত্য এগুলোও ঠিক ততটাই অসত্য। এই শরীরটাই সংসার বৃক্ষের দৃঢ় মূল। পরমাত্মা কোন কিছুতেই লিপ্ত নন, এই শরীরের জন্যই সব কিছু হচ্ছে। পঞ্চতন্মাত্রার দেহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন এগুলোকে বলে ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রেই নানান রকমের ক্রিয়াকলাপ চলে, আর সব ক্রিয়াকলাপের ফল এখানেই পাওয়া যায়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের বর্ণনায় এরই কথা ভগবান বলছেন। দেহটাই মূল, শুধু দেহ নয়, মহৎ থেকে এই স্থুল দেহ পর্যন্ত সবটাই প্রকৃতির শরীর, সেইজন্য এটাই ক্ষেত্র। এখানেই ক্রিয়াদি হয়, এখানেই কর্মের ফল পাওয়া যায়। এটাই মায়ার স্বরূপ।

মায়ার স্বরূপ বলার পর পরমাত্মার স্বরূপ বলছেন, পরমাত্মা এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সব ধর্মের মূল কথা এক, সবাই সেই ঈশ্বরের কথাই বলছেন, ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি বেরিয়েছে সবাই বলছেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে সেই সচ্চিদানন্দই আছেন, সেই সচ্চিদানন্দের যে শক্তি সেই শক্তি যেন সচ্চিদানন্দকে আবরণ করে নেয়। আবরণ করে নেওয়ার পর এবার যে সচ্চিদানন্দ সামনে আসছেন তখন ওর মধ্যে দুটো শক্তি একসাথে খেলা করে – সচ্চিদানন্দ রূপী জ্ঞান আর আবরণ রূপী অজ্ঞান। এই জ্ঞান আর অজ্ঞানের খেলা, এই আলোছায়ার খেলাই জগতকে সামনে নিয়ে আসছে। এরপর আমি যখন এসে গেলাম তখন এই আমিটাও জ্ঞান আর অজ্ঞানের সংমিশ্রণ। আমার মধ্যে সেই চৈতন্য শক্তিও আছে আর অজ্ঞানও আছে, এই দুটোর খেলা নিরন্তর চলছে। সচ্চিদানন্দ যিনি অখণ্ড তাঁকে খণ্ডিত রূপে দেখায়, এটাই মায়া। ব্যষ্টিতে যা হয় সমষ্টিতেও তাই হয়, যেটাই আবরণ সেটাই বিক্ষেপ।

ভারতবর্ষে প্রথম থেকে যে সামাজিক প্রথা ছিল তাতে ওনারা আত্মবস্তু আর অনাত্ম বস্তুকে পার্থক্য করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি দাঁড় করিয়ে ছিলেন। ইদানিং কালে যেটা খুব সাধারণ সমস্যা তা হল বিবাহ। কিন্তু তখনকার দিনে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল সন্তানোৎপাদন। বিবাহের আগে মেয়েকে দেখা হবে, তার লক্ষণ ভালো কিনা, বংশ ভালো কিনা দেখার পর বিবাহে রাজী হতেন। প্রধান হল, পরিবারের জন্য আমার একজন বধু দরকার, সেখান থেকে আমার দরকার বংশের ধারা অব্যাহত রাখা। এটা হল জ্ঞান, আর ইদানিং কালে ছেলে মেয়েরা যে নানান রকমের কল্পনা করছে এটাই অজ্ঞান। যেখানে যেখানে অজ্ঞান আমাদের ছোবল মারতে পারে সেই সেই জায়গায় তাঁরা আটকে দিচ্ছেন। কিন্তু ইদানিং আধ্যাত্মিকতার ভাব, ধর্মের ভাব কমে গেছে, সেইজন্য আমাদের সমস্যা আর কষ্টেরও শেষ নেই।

শ্লোকের মাধ্যমে যদিও শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, জগৎ ও জগতের যা কিছু দেখছ সবটাই মিথ্যা, কিন্তু এর জন্য দুটো সমস্যা হয়। আমরা যে অবস্থায় আছি, সেই অবস্থায় এটাকে বুঝতে চাইলে আমরা কখনই ধরতে পারব না যে জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। ধরতে না পারার পরেও যদি এটাকেই জীবনে কেউ প্রয়োগ করতে যায় তাহলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। বেদান্ত আধ্যাত্মিক উচ্চ উচ্চ তত্ত্বের যোগান দিয়ে যেমন অনেক ভালো করেছে তেমনি বেদান্ত অনেক ক্ষতিও করেছে। কারণ কোন উচ্চমানের সাধক ছাড়া বেদান্তের দর্শন যদি কোন ভুল লোকের হাতে পড়ে যায় তাহলে তার জীবন দর্শনটাই এলোমেলো হয়ে যাবে। যা কিছু আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করছি, দেখছি, শুনছি, যা কিছু চিন্তা করছি সবটাই মস্তিষ্কের খেলা, মস্তিষ্কের খেলা ছাড়া আর কিছু নেই। চোখ যে বাইরে সুন্দর দৃশ্য দেখছে, আসলে এই দৃশ্য মস্তিষ্ক দেখছে। রসগোল্লা খেতে ভালো লাগছে, মস্তিষ্কই রসগোল্লার মিষ্টত্বকে আস্বাদ করছে। বাইরে থেকে যা কিছু আসছে এগুলো সঙ্কেত মাত্র, সেইজন্য একটা জিনিসকে একজন এক রকম দেখছে, আরেকজন অন্য রকম দেখছে, এটাই মিথ্যা। নিউরোলজির দিক দিয়ে একটা জিনিসকে স্থির করার দুটো পথ বলা হয়, প্রথম হল ওর মধ্যে যদি প্রচুর ইমোশান জড়িয়ে থাকে, যেমন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় কত শব্দ আসছে, কত দৃশ্য আসছে কিন্তু কোনটাই আমাদের মনে থাকে না, কারণ ওর মধ্যে ইমোশান জড়িয়ে নেই। দ্বিতীয়, যদি ইমোশান জড়িয়ে না থাকে তাহলে একটা জিনিসকে বার বার করা। আমি যদি আপনাকে বলি, আপনি একটা গাধা, আপনি জীবনে ভুলবেন না। শৈশবে আমাদের একটা জিনিসকে মনে রাখার জন্য বার বার করে বলে দেওয়া হত। মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করছেন, ভারতের রাজধানীর কি নাম বল। আমার মনে নেই, তখন কানটা মুলে দিয়ে বলতেন দিল্লী, এরপর আর কোন দিন আমি ভারতের রাজধানীর নাম ভুলে যাব না। কারণ ওর মধ্যে ইমোশান জড়িয়ে গেছে। এটাও যদি না করা হয় তখন আরেকটা পথ হল, যেমন এখানে শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হচ্ছে, যদি এর মধ্যে একটা ইমোশান জড়িয়ে যায়, ঠাকুরের কোন কৃপা হল, কোন অনুভূতি হয়ে গেল তখন শাস্ত্রের এই কথাগুলো ভেতরে বসে যাবে। এর আরেকটা উপায় হল, যদি বার বার শাস্ত্র আবৃত্তি করতে থাকে। নিউরোন কানেকশান দুভাবে হয়, হয় আপনাকে ইমোশান নিয়ে আসতে হবে, তা না হলে ওটাকেই বার বার করতে হবে।

এই যে বলে দিলেন সংসার মিথ্যা, আমরাও শুনে নিলাম, মুখস্ত করে নিলাম। এই কথাটা আমাদের কাছে উদ্ভট জিনিস মনে হয়, ইমোশানকে পুরো নাড়িয়ে দেয়, কিন্তু পুরো জিনিসটাকে বুঝে নেওয়াটা অসম্ভব। একটা কিছু মুখস্ত করে নেওয়া একটা জিনিস কিন্তু ঠিক ঠিক বোঝা খুব কঠিন। আবার এও আছে, একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে সরে যাচ্ছি তখন ইমোশান আরেকটা জিনিস থেকে সরে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে, আগেরটা ধীরে

ধীরে মন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলোকে খুব ভালো করে বিচার করে আমরা দেখছি যে আমাদের ভালো মন্দ যা কিছু হচ্ছে সব মস্তিষ্কের মধ্যেই হচ্ছে। ইমোশান মানেই সংসার, আমাদের যত দুঃখ কষ্ট সব আশা প্রত্যাশা থেকেই আসে। ঠাকুরের কাছে আমরা কোন না কোন সময় প্রার্থনা করেছি, এখনও প্রার্থনা করি হে ঠাকুর আমার যেন ভালো হয়। আমার ভালো মানেটা কি? আমি একটা কল্পনার জগৎ তৈরী করে নিয়েছি, ঐ কল্পনার জগতে আমি ঠিক করে নিয়েছি, আমি যেটা আছি এর একটা extended personality করে রেখেছি। এতে personalityটা এগিয়ে গেল। তাতে কি হচ্ছে? আমার এই এই হওয়া, আমার স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, সন্তান এদের এই এই হওয়া, আমার চাকরি, বাড়ি, গাড়ি এই এই হওয়া, এভাবে আমরা সবাই একটা সংসার দাঁড় করিয়ে নিয়েছি। একটা বিরাট ঢাউস বেলুন, বেলুনের মধ্যে একটা ছোট্ট ছোলার দানা রাখা আছে। বেলুনটা হল আপনার সংসার আর ছোলার দানাটা আপনি। এবার ওখানে একটু পিনের স্পর্শ লাগছে তাতেই আপনি চেঁচাতে শুরু করছেন। কিন্তু এটা তো জগৎ নয়, এটা আপনার কল্পনার জগৎ। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে বলছি, হে ঠাকুর এ রকম যেন না হয় বা বলছি ঠাকুর এত বড় মন্দ আমার করলে, আমার এত বড় ক্ষতি হয়ে গেল। যখনই বলছি ক্ষতি হয়ে গেল বা যখন খুশি হয়েছি তার মানে, যে কল্পনার জগৎ আমি নির্মাণ করেছি, সব কিছু যখন ঐ কল্পনার জগতের মত চলে তখন আমাদের আনন্দ, যখন চলে না তখন মনে করছি আমার ক্ষতি হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা সংসার বানিয়ে রেখেছি, এরপর যে যে জিনিসগুলো ওর মধ্যে ফিট করে তখন মনে হয় সব ভালো চলছে আর যখন ফিট করে না তখন মনে হয় মন্দ। তার মানে ভালো মন্দ যা কিছু মনে হচ্ছে সবটাই কল্পনা, এটাই মায়া। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যা কিছু শুনছ, দেখছ সবটাই *স্বপ্নমনোরথৌ*, সবটাই অবাস্তবিক, সবটাই কল্পনা। এগুলো এত সহজে বোধগম্য হয়ে যাবে না, এরজন্য প্রচুর বিচার করতে হয়। সেইজন্য না বুঝে, না খাটাখাটনি করে সংসারকে মিথ্যা বলে মেনে নিলে, অনেক কিছুর ব্যাপারে আমাদের আর পরিশ্রম করতে ইচ্ছে হবে না। পরিশ্রমের ইচ্ছাই যদি চলে যায় তখন আলস্য এসে তাকে ধরে নেয়, জীবনটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। এর থেকে আরও বাজে হয়, অপরকে আপনি জগতটা মিথ্যা বলে উপদেশ দিতে শুরু করবেন। এটা ঠিক নয়, এভাবে কিছুই হয় না। অনেক গভীরে গিয়ে বিচার করলে তখন দেখা যায় যে সত্যিই তাই, সবটাই মনের কল্পনা, বাস্তবিক জগৎ বলতে যেটা বুঝি সেটাও কল্পনা। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে নেই, কারণ জিনিসটাকে যদি ভুল ভাবে বুঝে নেয় তখন সাধন-ভজনকেও কল্পনা মনে হবে, ঈশ্বরীয় রূপকেই কল্পনা মনে হবে, তাতে সব কিছুতে আরও গোলমাল হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যে জিনিস গুলোকে অযথা বেশি মূল্য দিয়ে থাকি সেগুলোকে নিয়ে এখানে বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

দেহ এব হি সংসার-বৃক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্।
তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ কিং তেহন্যথাত্মনঃ।৩/৪/২৭

বৃক্ষের যেমন একটা মূল শেকড় থাকে, তেমনি সংসারের মূল শেকড় হল এই শরীর। যদিও মস্তিষ্কেই সব কিছু হয় কিন্তু মূল হল শরীর। কারণ শরীরকে দিয়েই সব কার্য হয়, আহার শরীরের দ্বারাই করা হয়, আর যেটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে সেটাও শরীরকে দিয়েই করে। সেইজন্য বলছেন মায়ার মূলে এই শরীর। এই শরীরের জন্যই স্ত্রী-পুত্রাদির সম্পর্ক হয়, না হলে আত্মার আর কিসের দরকার! অনাত্ম বস্তুর সাথে আত্মা যে নিজেকে জুড়ে নেয় তার মূল কারণই হল এই দেহ। বাড়িকে আমরা কেন ভালোবাসি? আমরা চাইছি আমাদের শরীরের যাতে কোন কষ্ট না হয়। টাকা-পয়সাও রাখা হয় যাতে শরীরের কোন কষ্ট না হয়। আমরা যা কিছু করি সব করা হয় শরীরের যাতে কষ্ট না হয়। আমার মনের কোন অসুবিধা হতে পারে, এই নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবি না। কারণ মনের দিক দিয়ে আমরা কিছু ভাবি না, আর কিছু করিও না, যা কিছু ভাবা শরীরকে নিয়েই। যারা মনের জগতে ঢুকে গেছেন তাঁরা আর শরীরের দিকে বেশি তাকান না। সেইজন্য যাঁরা খুব উচ্চমানের লেখক, কৃতী গায়ক বা চিত্রকর তাঁদের স্ত্রী-পুত্রের দিকেও বেশি মন থাকে না। এখানে বলছেন, শুদ্ধ আত্মার সাথে দেহের কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু দেহকে কেন্দ্র করেই আত্মা আছেন বলে দেহটাই মূল হয়ে যায়। বিয়ের পর নববধু শ্বশুড় বাড়ি আসার পর স্বামীর বাড়ির সব আত্মীয়-স্বজন, যাদের সে কোন দিন চিনত না, তারাও তার আত্মীয় হয়ে যায়। আবার অন্য রকমও আছে, love me love my dog, আমাকে ভালোবাসলে আমার কুকুরকেও ভালোবাসতে হবে। ঠিক তেমনি দেহকে যখন আত্মা ভালোবেসে ফেলে তখন দেহের সাথে যার যার সম্পর্ক বেচারীকে তাদেরকেও ভালোবাসতে হবে। আত্মা ওখান থেকে বেরতেই পারে না, সে এখন দেহের সাথে জড়িয়ে গেছে।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছে, হে লক্ষ্মণ! এই জিনিসগুলোকে বুঝে নিয়ে জীব পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য কিভাবে সাধন করবে তোমাকে আমি সেই ব্যাপারে বলছি। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, দশটি ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহৎ, পঞ্চ তন্মাত্রা যা কিছু আছে এগুলোই ক্ষেত্র। যখন বিচার করা হয় আমি কে, আর যোগ সাধনায় যোগের পদ্ধতিতে ধ্যান করা হয় তখন মন সত্যিকারের সরে আসতে শুরু করে। শুরুতে মন প্রথম সরে আসে দেহ থেকে, দেহ থেকে সরে আসার পর ইন্দ্রিয় থেকে নিজেকে টেনে নিতে শুরু করে। মন আরও সূক্ষ্ম হয়ে গেলে সূক্ষ্ম তন্মাত্রার ব্যাপারে জানে, দেখে মন সূক্ষ্ম তন্মাত্রার সাথে জড়িয়ে আছে। আরও সূক্ষ্ম হতে হতে শেষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে নেয়। প্রকৃতিকেও যখন মন ছেড়ে দেয় তখন তার কৈবল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সাধক যে পথেই সাধনা করুক না কেন, ভক্তি পথ, জ্ঞান পথ, কর্ম পথ যে পথেই সাধনা করুক না কেন, সাধন শেষে এই এক পথেই হয়। প্রথমেই তাঁর দেহ থেকে অনাসক্তি এসে যায়, দেহের থেকে অনাসক্তি এসে গেলে কিছুই হবে না, কিন্তু তখন দেখছে আসক্তিটা অন্য অনেক কিছুতে আছে। সেখান থেকেও ধীরে ধীরে অনাসক্তি আসতে থাকে, এইভাবে সাধনা করতে করতে মন যত গভীরে যায় শেষে প্রকৃতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মনের পারে যে প্রকৃতি, তার সাথে নিজেকে একাত্ম মনে করে। প্রকৃতি থেকেও নিজের একাত্ম বোধকে যখন সরিয়ে নিয়ে আসে তখনই ঈশ্বর দর্শন হয়। দীর্ঘ পথ আর অত্যন্ত কঠিন। আর বলছেন, জপধ্যান করতে করতে যখন এগোবে তখন বিচার করবে এর কোন কিছুই তুমি নও। যেটা এর আগে বলা হল, অনাত্ম বস্তুতে আত্মভাব, অনাত্ম বস্তুর সাথে নিজেকে এক মনে করে আছে। গীতায় এটাই বলছেন *অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু*, নিজের শরীর থেকে অনাসক্ত হয়ে যাবে আর দেহের সাথে যা কিছু জড়িয়ে আছে সেগুলোকে থেকেও অনাসক্ত হয়ে যাবে। শুধু দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেলেই হবে না, দেহের পেছনে ইন্দ্রিয় রয়েছে, মন রয়েছে, পঞ্চ তন্মাত্রা রয়েছে, অহঙ্কার রয়েছে, মহৎ রয়েছে, প্রকৃতি রয়েছে, সব কিছু থেকে আলাদা করতে হবে। সব কিছু থেকে আলাদা করে নেওয়ার পর কৈবল্যে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বোঝানর জন্য বলছেন, সাধনার কোন স্তরে কোন ভুল জিনিসের সঙ্গে তুমি যেন নিজেকে একাত্ম না কর। তন্মাত্রার কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।
মানাভাবস্তথা দম্ভ-হিংসাদিপরিবর্জনম্।৩/৪/৩১

জীবাত্মা আর পরমাত্মা এই দুটোর মধ্যে কোন ভেদ নেই। যোগদর্শনে জীব আর পরমাত্মা আলাদা। কিন্তু আমাদের সাধারণ যে চিন্তা-ভাবনা বা বিভিন্ন ধর্ম মতে যেভাবে বলা হয় তাতে মনে হয় আমার মধ্যে একটি আত্মা আছেন সেই আত্মার সাথে ঈশ্বরের মিলন হবে। এখানে বলছেন, জিনিসটা তা নয়, জীবাত্মাও যা পরমাত্মাও তাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ মূলতঃ ঘোর বেদান্ত গ্রন্থ, কিন্তু তার সাথে অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্রও, সব শাস্ত্র ও দর্শনকে এক জায়গায় এনে সমন্বয় করে দিয়েছেন। এখানে বেদান্ত মতে বলছেন – তোমার ভেতরে যে চৈতন্য আছেন তিনিই সেই পরমাত্মা, দুটো আলাদা কিছু নয়। তাহলে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? অনেক বেদান্তীও এখানে ভুল করে থাকেন। ঠাকুর যখন বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ তখন এই অর্থে বলছেন, তুমি যে নিজেকে দেহের সাথে জড়িয়ে রেখেছ সেখান থেকে বেরিয়ে আমি বলতে কি, আমি বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে এক এটাকে বোঝ। আমরা মনে করছি, দেহের মধ্যে যেটা আছে সেখান থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। অধ্যাত্মে আসলে লক্ষ্য বলে কোন কিছু থাকে না। অনেকগুলো আবরণ আছে সেগুলোকে তুলে ফেলে দিতে হবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ বলে দিচ্ছেন, এটা কখন ভেবো না যে তোমার ভেতরে যিনি আছেন তিনি আর ঈশ্বর আলাদা। বেদান্ত মতে এটাই জীব বা আত্মা বা পরমাত্মার ঠিক ঠিক পরিভাষা। জীব আর পরমাত্মায় কখনই ভেদ বুদ্ধি করতে নেয়।

এই ভেদ কিভাবে যায়? তখন কয়েকটা জিনিসের কথা বলছেন, *মানাভাবস্তথা দম্ভ-হিংসাদিপরিবর্জনম্*, অভিমান, দম্ভ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি ত্যাগ করা, অপরের বঞ্চনা বা অপমানকে সহ্য করা, কায়মনোবাক্যে ভক্তিশ্রদ্ধা সহ গুরুর সেবা করা, সরলতার ভাব রাখা, বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধ রাখা, সব কষ্ট সহ্য করা। এগুলোকে ইংরাজীতে বলে values, ethicsও বলা হয়। Ethicsকে নিয়ে পাশ্চাত্য দুনিয়া পুরো আলাদা একটা দর্শন দাঁড় করিয়েছে। বিদেশে অনেকে ঈশ্বর মানে না, কিন্তু ভালো জীবনকে বিশ্বাস করে। যেমন সক্রেটিস ঈশ্বর বলতে কিছু জানতেনও না। তখনকার দিনে তাদের দেবতাদিরা ছিলেন, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে সক্রেটিস পুরোপুরি চলে গেলেন ethical lifeএর দিকে। পরের দিকে ইউরোপ ও অন্যান্য জায়গায় অনেকেই খ্রীশ্চান ধর্মের উপর বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল, ঈশ্বরের নাম শুনলেই খেপে যেত। আবার অন্য রকমও আছে, বড় বড় রাজপুরুষ আছে যারা

চার্চের উপর, পাদরীদের উপর, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখে। Ethics সব সময়ই দুই ভাবে আসে, প্রথম আসে শাস্ত্র থেকে, শাস্ত্র বলে দিয়েছে তুমি এই রকমটি করিবে না বা তুমি এই রকমটি করিবে, এটাকে বলা হয় আদেশ বা commands। ধর্মের বেশির ভাগ ethics চলে এই কমাণ্ডের উপরে। ভারতবর্ষের দুটো নামকরা ধর্ম জৈন আর বৌদ্ধ ধর্ম, এর উপর আধার করে পণ্ডিতরা বৌদ্ধ ধর্মের নাম দিয়ে দিলেন ethical idealism, আর জৈন ধর্মকে বললেন ethical realism। এগুলোর কোন অর্থই হয় না, উদ্ভট ধরণের সব চিন্তা ভাবনা। যে ধর্ম ঈশ্বর চিন্তনের বাইরে কোন কথা বলছে না তাদেরকে বলছে ethical idealism, ethical realism। হিন্দুদেরও ethicsএর উপর বিরাট লম্বা তালিকা আছে। কিন্তু উপনিষদে ethicsএর উপর খুব কম কথা বলা হয়েছে, অন্য দিকে গীতার ষোড়শ অধ্যায় এই জিনিসটাকে নিয়েই বলছেন। মনুস্মৃতির পুরোটাই এই জিনিসকে নিয়ে বলছে, কি কি করণীয় আর কি কি অকরণীয় এই বিশাল লম্বা তালিকা মনে রাখাও খুব কঠিন। এর কিছু জিনিস আমরা মনে রাখি, কিছু জিনিস মনে রাখি না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মেই একটা মূল ভাব থাকে, ঐ মূল ভাবকে কেন্দ্র করে যখন চলা হবে তখন বাকি সব জিনিসই দাঁড়িয়ে যায়। হিন্দুদের ethicsএর একেবারে মূল ভাব হল ত্যাগ। যে জিনিস আমাকে আত্মকেন্দ্র থেকে সরিয়ে ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত করছে সেটাই আমাকে করতে হবে। সত্য কথা আমাকে কেন বলতে হবে? কারণ মিথ্যা কথা বললে আমাকে আত্মকেন্দ্রিক করে দেবে। সত্য কথা বললে আমাকে অনেক সময় অনেক কিছু হারাতে হবে। হারানো মানেই ত্যাগ, সেইজন্য সত্য কথা বলতে হবে। ব্রহ্মচর্য কেন পালন করবে? কারণ ব্রহ্মচর্য পালন না করা মানেই আত্মকেন্দ্রিক হওয়া। হিন্দুদের যে এত লম্বা তালিকা, মনুস্মৃতিতে যত করণীয় ও অকরণীয় নিয়ে বলেছে সবটাই ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও যে কোন ethics ত্যাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনেকের মূলটা আবার অন্য কোথাও থাকে। যেমন জৈনরা বলে তাদের মূল ভাব অহিংসাতে থাকা। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এগুলোকেও জৈন ধর্ম ব্যাখ্যা করছে, যেমন সত্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছে, সত্য যদি না বলা হয় তাহলে শব্দের সাথে হিংসা করা হল, শব্দের সাথে হিংসা করা পাপ। সেইজন্য সত্য কথা বলবে, কিন্তু মূলে হল অহিংসা। বৌদ্ধদের আবার অষ্টাঙ্গমার্গকে আধার করে তাদের values and ethics চলে। হিন্দুদের একটাই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে চলে, তা হল ত্যাগ। যে জিনিসটাই তোমাকে স্বার্থপর বানাচ্ছে, তোমাকে আত্মকেন্দ্রিত করে দিচ্ছে সেটাই ভুল, যেটা আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে তোমাকে সরিয়ে আনছে সেটাই ঠিক।

এসব বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, অহঙ্কার এগুলো থেকে বিলক্ষণ সেই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মাই ঠিক ঠিক আমি, এই আমিকে জানাই জ্ঞান। জ্ঞান মানে কি? আমি শরীর, আমি মন, আমি বুদ্ধি এই রকম যারা ভাবছে এরা অজ্ঞান, কিন্তু আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা এই জ্ঞান যখন হয়ে যায় তখন এটাই জ্ঞান আর বাকি সবটাই অজ্ঞান। এখানে দু রকম জিনিস হয়, একটা হল আমি বিচার করে করে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হয়ে গেল যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, তখন আমি সেই অনুসারে কাজ করতে শুরু করে দিলাম, কোন সন্দেহ নেই যে এটা একটা খুবই উচ্চ অবস্থা। কিন্তু বাস্তবিক যখন অনুভব হয়, বাস্তবিক আমি দেখছি চৈতন্য ছাড়া কিছু নেই, এই বাস্তবিক যখন উপলব্ধি হয়ে যায় তখন সেটাকে বলছেন বিজ্ঞান। এই কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র খুব মূল্যবান একটা কথা বলছেন, যখন আচার্য ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে মানুষ জীবাত্মা আর পরমাত্মাকে অভেদ জেনে যায় তখন তার সব অজ্ঞান মিটে যায়। প্রথমের দিকে মানুষ দেহ থেকে নিজের আত্মাকে আলাদা জানতে পারে, সেখান থেকে শেষে যখন দেখছে সেই পরমাত্মাই আছেন, আমার ভেতরে যে পরমাত্মা সবার ভেতরে তিনিই আছেন, এটাই ঠিক ঠিক জ্ঞান। এই যে লয় অবস্থা এটাকেই বলে মোক্ষ। মোক্ষ মানে জীব আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান। আমাদের কাছে পরমাত্মা আলাদা বস্তু, জীবাত্মা আলাদা বস্তু। জীবাত্মা আলাদা বস্তু মনে করা অনেক পরের কথা, জীবাত্মার এখনও আমাদের দর্শনই হয়নি, জীবাত্মাকে আমরা জানিই না, তাই পরমাত্মার ব্যাপারে কোন কথাই হতে পারে না। দুটো একই এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রথম অবস্থাটাই জানলাম না, আমার ভেতরে যে একটা চৈতন্য সত্তা আছে সেটাকেই জানি না। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র খুব সুন্দর কথা বলছেন –

সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যুপচারোঽহমাত্মনি।
ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন।৩/৪/৪৪

আগে বলা হল মোক্ষ মানে জীব আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান, কিন্তু এখানে বলছেন *হ্যুপচারোঽহমাত্মনি*, উপচার মানে আচার, আমরা যেমন অনেক সময় বলি অত formal হওয়ার দরকার নেই, মোক্ষ হল superficiality বা formality। উপচার কেন বলছেন? জীবাত্মা আর পরমাত্মা সব সময়ই এক, আমরাই ভুলে

দুটোতে ভেদ দেখছি। যে জিনিসটা স্বাভাবিক সেটাকে মানুষ ভুল দেখছে। ফর্মালিটি আমরা কার সাথে করি? যার সাথে আমার ভেদ বুদ্ধি আছে। বাড়িতে যদি আমার অফিসের কোন বড় অফিসার এসে যায় সেখানে আমাকে উপচার করতেই হবে। আর আমার ছেলে যদি বড় অফিসার হয়ে থাকে আর সে বাড়ি এলে আমি কি তার সাথে উপচার করতে যাব? কখনই করব না, কারণ আমি আর আমার ছেলে অভেদ। ঠিক তেমনি জীবাত্মা আর পরমাত্মা দুটোকে আলাদা মনে হয় কিন্তু বাস্তবে দুটোতে কোন ভেদ নেই। অদ্বৈত বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটা কথা প্রায়ই বলা হয়, বলেন বন্ধন হল মায়া কিন্তু মুক্তিটাও মায়া, সবটাই উপচার। যে জিনিসটা নিত্য মুক্ত তার আবার কিসের বন্ধন কিসের মুক্তি। তবে কথার কথা বলার সময় বন্ধন, মুক্তি বলা হয়। কথার কথা এই অর্থেই বলা হয়, একটা হারানো জিনিসকে পেয়ে গেলে সেটাকে পাওয়া বলা যায় না। গলায় নেকলেস ঝুলছে, কোন কারণে নেকলেসটা পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক খোঁজাখুজি চলছে। তারপর একজন হঠাৎ বলল, তোমার গলাতেই আছে। নেকলেসটা কি সে নতুন করে পেল? নতুন করে কিছুই পাওয়া হয় না, নেকলেস সব সময় ওখানেই ছিল। আমার ভেতরে যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই বিশ্ব ব্যাপি চৈতন্য। এই জিনিসটাকে জেনে যাওয়াই জ্ঞান, জ্ঞান মানেই মুক্তি। দ্বিতীয় হল, আমার ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, সেই অন্তর্যামীর ব্যাপারেও আমি খেয়াল করি না। তার বদলে যত অনাত্ম বস্তু আছে সব অনাত্ম বস্তুকে মনে করছি ওটা আমি। উপমা রূপে বলেন স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, এদেরকে যখন মনে করি আমি, এটাই মায়া। এগুলোকে ছেড়ে যখন আসল আমিতে চলে গেল তখন জীবের জ্ঞান হয়ে গেল। আর বলছেন যেমন চোখ থাকতেও অন্ধকারে মানুষ কিছু দেখতে সক্ষম হয় না, ঠিক তেমনি যাদের ভক্তি নেই তারা কখনই এই অবস্থা লাভ করতে পারে না। জীব আর ব্রহ্ম এক, যতক্ষণ ভক্তি না হবে ততক্ষণ জানা যাবে না। জীব আর ব্রহ্ম এক, এটাই মুক্তি এটাই জ্ঞান। বস্তু আছে, চোখও আছে কিন্তু আলো না থাকলে আমরা দেখতে পারব না। ভক্তি হল সেই আলো, যে আলোর দ্বারা মানুষ জীবাত্মা আর পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান পেয়ে যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণ সব সময় জ্ঞান আর ভক্তিকে এক সঙ্গে নিয়ে চলবে। এই যে এখানে বলছেন, আমার প্রতি ভক্তি না হলে জ্ঞান হবে না, আসলে এগুলো হল অর্থবাদ। আচার্যের ভাষ্য ছাড়া এর অর্থ করলে অনেক সংশয় এসে যাবে। সব শাস্ত্রকে একসাথে নিলে গোলমাল হবেই। আচার্য শঙ্কর এক রকম বলছেন, উপনিষদ এক রকম বলছে, এখানে অন্য রকম বলছেন। কিন্তু অন্য রকম বলছেন না, একই কথা বলছেন। অনাত্ম বস্তুতে আত্মবুদ্ধি এটাই মায়া, এটাই অশুদ্ধ মন। অনাত্ম বস্তু থেকে আত্মাতে নিয়ে আসা এটাই শুদ্ধিকরণের পদ্ধতি। শুদ্ধিকরণের পদ্ধতির কোন শেষ নেই। স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলছেন, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ সবটা দিয়েই শুদ্ধিকরণ হয়। যেহেতু অধ্যাত্ম রামায়ণ মূলতঃ ভক্তিশাস্ত্র তাই এখানে ভক্তির উপর জোর দিচ্ছেন। অন্যান্য অধ্যায়ে গিয়ে অন্য রকম কথাও বলবেন। আসলে শুদ্ধিই করছে, আর আমাদের কাছে ভক্তি পথ খুব সহজ পথ। যোগ সাধনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, জ্ঞানযোগ মানে জ্ঞান বিচার, ঠাকুর বলছেন যার দেহবুদ্ধি আছে সে জ্ঞান বিচার করবে কি করে! কর্মযোগ করা যায় কিন্তু কর্মযোগে এত আড়ম্বর ছড়িয়ে আছে যে কোথায় ফেঁসে যাবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য ভক্তি পথই সহজ, তাই বলে একেবারেই যে সহজ তাও নয় কিন্তু অন্যান্য পথের তুলনায় আপাত ভাবে সহজ। আর যেহেতু ভক্তি গ্রন্থ তাই ভক্তিকে জোর দেওয়ার জন্য এইভাবে বলছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান একটা শর্তেই হয়, তা হল অজ্ঞান চলে গেলে। অজ্ঞান চলে যাওয়া মানে, অনাত্ম বস্তু থেকে যখন আত্মবোধ চলে যায়, এ ছাড়া কোন পথ নেই। এখানে যেটা বলছেন সেটা কোন মতেই ভুল বলছেন না, কিন্তু এটাই একমাত্র পথ তাও নয়। অনাত্ম বস্তু থেকে আত্মবোধে যাওয়া মানে স্বার্থশূন্য হয়ে যাওয়া। আমাদের সব কিছুর ব্যাপারেই স্বার্থ জড়িয়ে আছে, সম্পর্কের ব্যাপারে স্বার্থ, সম্পত্তির ব্যাপারে স্বার্থ আর শরীর নিয়ে স্বার্থ। এর উপর কোন একটা গুণ যদি থাকে তার অহঙ্কারকে আর সামলানোই যাবে না। ঠাকুর একদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে কোন্নগরে গেছেন, নৌকা থেকে নেমে দেখেন দক্ষিণেশ্বরের একজন পুরনো কর্মচারী ঘাটে বসে আছে। ঠাকুরকে দেখে বলছে, ভট্টচায্যি মশাই বলি আছো কেমন? ঠাকুর শুনে হৃদয়কে বলছেন, ওরে হৃদু এর এখন টাকা হয়েছে। একটু কিছু হয়ে গেলে তার আর অহঙ্কারের শেষ নেই, এটাও স্বার্থপরতা। অনাত্ম বস্তুতে আত্ম ভাব, এটাই মায়া, মায়াকে এখন কে কিভাবে কাটাবে সেটা তাকেই বার করতে হবে। তবে এখানে শ্রীরামচন্দ্র কয়েকটা উপায় বলে দিলেন। কি কি করলে আমার প্রতি ভক্তি হয় বলছেন –

মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্বানুমোদনম্।৩/৪/৪৮

ভক্তি লাভের জন্য কি কি করতে হবে বলছেন। যারা আমার ভক্ত তাদের নিরন্তর সঙ্গ করা, আমার সেবা করা, আমার ভক্তদের সেবা করা, একাদশীতে উপবাস করা, আমার পর্বদিনে উৎসবাদি করা এবং আমার কথা রামায়ণ পাঠ করে ব্যাখ্যা করা আর নিয়মিত নামকীর্তন করা, এসব করতে করতে আমার প্রতি ভক্তি জন্মায়। ভক্তি লাভের অনেক রকম উপায়ের কথা বলা হল, ভাগবতেও অনেক কথা বলছেন, কিন্তু এর মধ্যে সাধুসঙ্গ বা ভক্তসঙ্গের উপর প্রচুর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর বলছেন, নিরন্তর আমাকে ভক্তি করলে আমার প্রতি তার ভক্তি অবিচল হয়ে যায়, তার মানে তার বুদ্ধিতে আর কোন চঞ্চলতা থাকে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এগুলো করা সহজ। রাজযোগ, জ্ঞানযোগের কথা শুনে রাখা ঠিক আছে কিন্তু অনুশীলন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলো করা যায়, আর এটাই মুক্তির পথ। এখানে লক্ষ্মণের মূল প্রশ্ন ছিল মুক্তি বা মোক্ষ কিভাবে হয়। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান প্রথমে মুক্তির যেটা অন্তরায় অর্থাৎ মায়াকে বিশ্লেষণ করলেন আর তার সাথে মুক্তির অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরমাত্মার ব্যাখ্যা করছেন এবং তার সাথে বিধির কথা বললেন। শেষে বলছেন, আমাকে যারা ভক্তি করে না, যারা অভক্ত তাদের কাছে এই কথা বলবে না, আর যারা আমার ভক্ত তাদেরকে ডেকে ডেকে শোনাবে।

লক্ষ্মণ কর্তৃক সূপর্ণখার নাসাকর্ণ ছেদন এবং শ্রীরাম কর্তৃক খরদূষণাদি রাক্ষস বধ

যদিও পরিষ্কার করে জানা যায় না, তাহলেও মোটামুটি জানা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র বারো বছর পঞ্চবটীতে ছিলেন। এতদিন ছিলেন তাই স্বাভাবিক ভাবে সেখানে অনেক কিছুই ঘটেছে। কিন্তু সেরকম কিছু বর্ণনা আমরা পাই না। একটা দুটো ঘটনা যে পাই তার মধ্যে সূর্পণখার ঘটনা আছে। সূর্পণখা এক রাক্ষসী ছিল, সে নিজের ইচ্ছা মত রূপ পরিগ্রহ করতে পারত। একদিন সূর্পণখা দেখছে –

পদ্মবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতেঃ।৩/৫/২
দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পাদসৌন্দর্য্যমোহিতা।

শ্রীরামচন্দ্রের চরণে কিছু কিছু দিব্য চিহ্ন ছিল, তার মধ্যে পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশের ইত্যাদি চিহ্ন ছিল। শুধু পদচিহ্নের সৌন্দর্য দেখে সূর্পণখা মোহিত হয়ে গেছে। ভারতে জ্যোতিষবিদ্যায় হস্তরেখার বিচার ছিল না, শরীরের বিভিন্ন চিহ্ন দেখে জাতকের বিচার করা হত। তাতে বলা হয় পায়ে যদি শঙ্খ, পদ্ম, অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে তাহলে সে অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। এই ধরণের চিহ্ন একমাত্র ভগবানেরই থাকে। শুধু এই চিহ্নগুলি দেখে সূর্পণখা *কামপরীতাত্মা* হয়ে গেছে, কামাসক্ত হয়ে গেছে। ভগবানের পদযুগলকে আমরা পাদপদ্ম বলে থাকি। ভগবানের চরণ এত সুন্দর যে আমরা সেই চরণযুগলের পূজা করতে চাই। এখানে তাও নয়, শুধু পায়ের ছাপ দেখেই সে কামাসক্ত হয়ে গেছে। পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে করতে সূর্পণখা আশ্রমে পৌঁছে গেছে। এসে দেখছে শ্রীরামচন্দ্র সীতার সঙ্গে বসে আছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কে, বনবেশ ধারণ করে আছ কেন, ইত্যাদি। তারপর নিজের পরিচয় দিতে শুরু করল, আমি রাবণের বোন সূর্পণখা। সূর্পণখা বলছে, আমি মুনিদের ভক্ষণ করে বিচরণ করি। এখানে আসুরিক গুণগুলোকে বেশি করে দেখান হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রও বলছেন, আমি দশরথ পুত্র, পিতার আদেশে চৌদ্দ বছর বনবাসে আছি। সূর্পণখা তখন বলছে, আমার মন তোমার উপরে পড়ে গেছে –

এহি রাম ময়া সার্দ্ধং রমস্ব গিরিকাননে।
কামার্ত্তাহং ন শক্নোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্।৩/৫/১১

হে রাম! আমার সঙ্গে তুমি চলে এসো, গিরিকানন মধ্যে আমার সাথে তুমি রমণ কর, হে কমললোচন! এক্ষণে আমি অতি কামার্ত হয়েছি। এটা খুবই মজার ব্যাপার, কোন পুরুষের কোন নারীর প্রতি যদি আসক্তি এসে যায় সেখানে অনেক রকম ঝামেলা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে আবার ম্যানেজও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু কোন মেয়ের মন যদি কোন পুরুষে চলে আসে সেখানে অন্য রকম পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে যায়। সূর্পণখার এই ঘটনা বাল্মীকি রামায়ণে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। আদিকবি বাল্মীকির রচনা বলেই সম্ভব হয়েছে। কাব্য রচনায় বাল্মীকির সাথে কারুরই তুলনা হয় না। ইলিয়াস ওডিসিতে মানবীয় মনস্তাত্ত্বিক নিয়ে যা কিছু আছে খুবই উচ্চমানের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইলিয়াস ওডিসি অনেকটা মহাভারতের মত, মহাভারত কোন একজনকে কেন্দ্র করে রচিত নয়। ভারতের ইতিহাস এবং মুখে মুখে যে প্রচলিত কাহিনীগুলো চলে আসছিল সেগুলোকে ব্যাসদেব এক জায়গায় সংগ্রহ করে মহাভারত রচনা করলেন। বাল্মীকিও কিছু কিছু প্রচলিত কাহিনী, ঋষিদের গল্প, তীর্থের কাহিনী সংযোজন করেছেন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে মূল কাহিনী সেখানে শ্রীরামচন্দ্র একাই আছেন।

মানুষের যত রকমের চরিত্র ও মানসিকতা থাকতে পারে বাল্মীকি সব কিছুকে রামায়ণে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাল্মীকি রামায়ণ বহু লোকের রচনাও নয়, ইলিয়ড ওডিসিতে যেমন অনেক লোকের অবদান আছে, বাল্মীকি রামায়ণ তা নয়, একা হাতে বাল্মীকি একটা মহাকাব্যকে দাঁড় করিয়েছেন। কোন নারী যদি কামাতুরা হয়ে এগিয়ে আসে আর সেই নারী যদি প্রত্যাখ্যাত হয় এরপর এর পরিণতি এত রকমের হতে পারে ভাবাই যায় না। মহাভারতেও এই ধরণের পরিস্থিতিকে নিয়ে আসা হয়েছে যখন শর্মিষ্ঠা ও দেবাযানীকে নিয়ে যযাতির মধ্যে ঝামেলা লাগছে, সেখানে বাস্তবিক যে পরিণতি হতে পারে সেটাকে যযাতির ক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়নি, কিন্তু বাল্মীকি নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কোন মেয়ে যদি উপপতি করে আর সে যদি তাকে না দেখে মেয়েটি তখন রাস্থায় নেমে লোকটির জামা ধরে টানতে টানতে বলে, তবে রে, তোর জন্য আমি সব কিছু ছাড়লাম আর আমাকে তুই দেখবি না মানে! এই জিনিস যদি উল্টোটা হয়, কোন ছেলে যদি এভাবে কোন মেয়েকে বলে, পাড়ার লোকেরাই ছেলেটাকে মারতে শুরু করবে। কিন্তু মেয়ে বললে তার সমর্থনে অনেকেই এগিয়ে আসবে। সূর্পণখা এই কথাই বলছে, তোমার উপর আমার মন আসক্ত হয়ে গেছে, এবার তুমি আমার সাথে চলে এসো। কোন নারী যদি কোন পুরুষকে শেষ করে দিতে চায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কেউ আর সেই পুরুষকে রক্ষা করতে পারবে না। নিজেকে নষ্ট করেও পুরুষটিকে নাশ করবে। যেখানেই দেখা যাবে একজন খুব ক্ষমতাশালী হয়ে গেছে, বুঝতে হবে তার পেছনে একজন নারী আছে। দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র, সীতার প্রেম তাঁকে কোথায় পোঁছে দিয়েছে। আর মানুষের বিনাশের পেছনেও নারী। সীতার জন্যই রাবণের নাশ হয়ে গেল।

সূর্পণখার কাছে এটা কোন ব্যাপারই নয়, তোমার উপর আমার মন এসেছে, তুমি আমার সাথে চলে এসো। শ্রীরামচন্দ্রের কথা ভাবুন, তিনি নিজের স্ত্রীর কাছে বসে আছেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে দেখিয়ে বলছেন, আমার তো একজন স্ত্রী আছেন, আর আমি যদি তোমাকে গ্রহণ করি তোমাকে সারাটা জীবন একজন সতীনকে সহ্য করতে হবে, ঈর্ষায় তুমি জ্বলেপুড়ে মরবে। আমার এই পরম রূপবান ভাই আছে, এই জঙ্গলে ও একাই আছে, সে তোমার উপযুক্ত পতি হতে পারবে, ওর সাথেই তুমি এই বনমধ্যে বিচরণ কর। সূর্পণখার প্রথমে এসেছিল মোহ, *পাদসৌন্দর্য্যমোহিতা*, শ্রীরামচন্দ্রের চরণ ছাপ দেখেই সে মোহিত হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে এসেছে কাম। কামের পর সূর্পণখার আর বাছবিচার নেই। এই বৈশিষ্ট্য অধ্যাত্ম রামায়ণের নয়, এই বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বাল্মীকির। এই যে মনস্তাত্ত্বিক দিক, প্রথমে আসে মোহ, মোহ মানেই আসক্তি, মোহ থেকেই এসে যাবে কাম। কাম যখন এসে যায়, যাকে নিয়ে মোহ হয়েছিল এবার যে সে তাকে নিয়ে নাচানাচি করবে তা নয়, তখন কাম জিনিসটাই প্রধান হয়ে যায়, মোহটা পেছনের দিকে চলে যায়। সূর্পণখারও তাই হয়েছে, শ্রীরামের থেকে সরে এবার তার মন লক্ষ্মণের দিকে চলে গেছে।

সূর্পণখা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলছে, তুমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমতি অনুসারে আমার পতি হও, আমরা এক্ষুণি দুজনে মিলিত হই। লক্ষ্মণ তখন বলছেন, দেখ সাধ্বি! আমি হলাম শ্রীরামের দাস, আমাকে পতিত্বে বরণ করলে তোমাকেও শ্রীরামের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে, এর থেকে আর দুঃখের কি আছে, তার থেকে বরং তুমি রামের কাছে যাও, তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তাঁকে বরণ করলে তোমার মঙ্গল হবে। লক্ষ্মণের কথা শুনে সূর্পণখা আবার শ্রীরামের কাছে চলে এসেছে। সূর্পণখা এবার খুব রেগে গেছে, রেগে গিয়ে শ্রীরামকে বলছে, তোমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল আর সব কিছুর সমস্যার মূলে এই সীতা, তোমাকে পেতে চাই সেখানে সীতাই গোলমাল আর লক্ষ্মণকে যদি পেতে চাই সেখানেও সীতাই গোলমালের কারণ, তাই তোমার সামনেই সীতাকে ভক্ষণ করে নিচ্ছি। খুব নামকরা দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক কার্ল জং এক জায়গায় উল্লেখ করে বলছেন, কোন স্ত্রী যখন কোন পরপুরুষকে ভালোবাসে তখন সেই মেয়ে আরামসে স্বামীকে মেরে ফেলবে, এতটুকু দ্বিধা করবে না। স্বামীরা এই জিনিস করবে না। আমাদের শুনতে খুব অবাক লাগবে, কিন্তু এটাই সত্য। স্ত্রীর যদি অন্য কারুর দিকে মন চঞ্চল হয়ে যায় এরপর এই পথে যে বাধা তৈরী করবে তাকেই সে শেষ করে দেবে। সূর্পণখার পথের কাঁটা সীতা, আর সে সীতাকে সহ্য করবে না।

সূর্পণখা তখন বিকটাকৃতি রূপ ধারণ করে সীতার দিকে তেড়ে গেছে। ঐ দেখে লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র ইশারা করতেই লক্ষ্মণ তলোয়ার নিয়ে সূর্পণখার নাক আর কান কেটে দিয়েছেন। নারীবধ করতে নেই, আগে একবার অনেক দ্বিধা নিয় তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন, এখানে আর তিনি করতে চাইলেন না। নাক আর কান কেটে দিতেই প্রচুর রক্তপাত হতে শুরু করল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় বিকট শব্দে ক্রন্দন করতে লাগল আর ক্রোধে

কঠোর বাক্য উচ্চারণ করতে করতে নিজের ভাই খরের সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। খর আর দূষণ দুই ভাই ছিল। বলে নাকি ওদের চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য ছিল, তাদের নিয়ে ওরা দুজনে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। এখানে উল্লেখ নেই কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে আছে, বাল্মীকি খুব সুন্দর বলছেন, এই ঘটনায় শ্রীরামচন্দ্র নড়ে গেছেন, সীতাও কাঁপছে। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সূর্পণখা সম্বন্ধে একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন, ভাই! নীচদের সাথে কক্ষণ মজাও করতে নেই। বাল্মীকি এখানে নীচ শব্দটা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এটাকে নীচুর অর্থেও নেওয়া যেতে পারে। তখন এর অর্থ দাঁড়াবে, আমার থেকে সামাজিক মর্যাদায় যারা নীচু তাদের সাথে হাসি মজা করতে নেই। সেইজন্য বাড়ির চাকর-বাকরদের সাথে কখনই মজা করতে নেই। সবারই মর্যাদার একটা লেবেল আছে, আমি যদি আমার থেকে নীচু স্তরের সাথে হাসি মজা করি তাহলে সে মনে করবে উনি আমাদেরই মত। কিন্তু আপনি তো তা নন। আপনি মনে করছে যে কিছুক্ষণের জন্য তাকে আমি উপরে নিয়ে এলাম, কিন্তু এই উপরে নিয়ে আসাটা স্বাভাবিক না, কৃত্রিম নিয়ে আসা। স্কুল, কলেজের শিক্ষকরা ছাত্রদের সাথে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখে। কিছু দিন পরে ছাত্রদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সীমানাটা ভেঙে যায়, তখন তারা মনে করে ইনি আমাদের মতই একজন। এরপর লক্ষ্মণের মত নাক কান কাটা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। আমার থেকে নীচু যারা তাদের সাথে যদি কোন কারণে মেলামেশা করতে হয় সেখানে মজা কখনই করতে নেই। এই ধরণের ঘনিষ্টতা থেকে অন্তরঙ্গতা তৈরী হয়, অন্তরঙ্গতা থেকেই অসম্মান এসে যায়। সূর্পণখা একটা নীচু জাতি, রাক্ষসী, শ্রীরামচন্দ্র তার সাথে মজা করছেন। পরিষ্কার বলে দেওয়া উচিত ছিল, গেট আউট! এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তা না করে, তিনি কি করলেন? তুমি লক্ষ্মণের কাছে যাও। লক্ষ্মণ বলছে, তুমি রামের কাছে যাও। শ্রীরামচন্দ্র গাম্ভীর্য নিয়ে বলছেন না। নীচদের সাথে মজা করতে গিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পেয়ে গেলেন।

সূর্পণখাকে দেখেই খর বলছে, তোমার এই অবস্থা কে করতে পেরেছে, নিশ্চয় তার মৃত্যুকে বরণ করার ইচ্ছে হয়েছে। সূর্পণখা তখন সংক্ষেপে বলছে, গোদাবরীর তীরে দণ্ডকারণ্যে রাম, সীতা আর লক্ষ্মণ এসেছে। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এই অবস্থা করেছে। তখন সঙ্গে সঙ্গে খর তার ভাই দূষণ আর সেনাপতি ত্রিশিরাকে সঙ্গে নিয়ে চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সৈন্য সহ চলল শ্রীরামচন্দ্রকে আক্রমণ করতে। সৈন্যদের কোলাহল শুনে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এত আওয়াজ কিসের? তখন সবাই দেখতে পেলেন রাক্ষসরা এদিকে এগিয়ে আসছে আক্রমণ করার জন্য। লক্ষ্মণকে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র বললেন, সীতা কোন দিন এত সৈন্যদের মারামারি কাটাকাটি দেখেনি, তুমি তাড়াতাড়ি সীতাকে নিয়ে একটা পাহাড়ের গুহায় চলে যাও, আর সীতাকে বলারও কিছু দরকার নেই, তুমি চলে গেলে আমি একাই ঘোর-দর্শন রাক্ষসদের বিনাশ করে দেব। শ্রীরামচন্দ্র তখন অক্ষয় শর তুণীর ধারণ করে নিলেন। অক্ষয় তুণীর থেকে তীর কখনই শেষ হয় না। তীর নিক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্র প্রচণ্ড ক্ষিপ্র ছিলেন। যুদ্ধ মানেই ক্ষিপ্রতা থাকবে, যার ক্ষিপ্রতা বেশি সেই জয় পাবে। শ্রীরামচন্দ্রের যুদ্ধের কৌশলও খুব উচ্চমানের ছিল। রাক্ষসরা এসেই শ্রীরামচন্দ্রের উপর নানা রকম অস্ত্র-শস্ত্র, পাথর, বৃক্ষ নিক্ষেপ করতে শুরু করে দিয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রও তখন অক্ষয় তূণীর থেকে একসাথে হাজার হাজার বাণ মেরে সব রাক্ষসগুলো মেরে দিলেন। খর, দূষণ আর ত্রিশিরা তিন জনই শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মারা গেল। বাকিগুলো সব পালিয়ে গেল। লক্ষ্মণ সব মিটে যাওয়ার পর সীতাকে নিয়ে এসেছেন। লক্ষ্মণ আর সীতা দেখে অবাক হয়ে গেছেন, এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে শ্রীরামচন্দ্র একা শেষ করে দিলেন! সীতা স্বাভাবিক ভাবেই ঘাবড়ে গেছেন। দেখছেন শ্রীরামের শরীরে কিছু কিছু ক্ষত চিহ্ন হয়েছে। সীতা তাঁর কোমল করস্পর্শে সেই ক্ষতস্থানে স্পর্শ করছেন।

<u>রাবণের দরবারে সূর্পণখার খেদ</u>

এবার সূর্পণখা দৌড়ে লঙ্কায় পৌঁছে সোজা রাবণের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। রাবণ বোনকে দেখেই চমকে উঠেছে, কে তোমার এই দুরবস্থা করেছে? সে যেই হোক আমি তাকে শেষ করে দিচ্ছি। সূর্পণখা তখন দাদা রাবণকে বলছে –

পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ ষণ্ড সর্বত্র লক্ষ্যসে।৩/৫/৪১
চারচক্ষুবিহীনস্ত্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি।

রাবণকে তার বোন বলছে, তুমি প্রমত্ত, মূঢ়বুদ্ধি, পানাসক্ত এবং স্ত্রৈণ। আর বলছে *ষণ্ড সর্বত্র লক্ষ্যসে*, সব জায়গায় তুমি ষণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয়েছ। *চারচক্ষু* মানে গুপ্তচরদের কথা বলছে, তোমার চররূপ চক্ষু নেই, এই ভাবে

তুমি রাজ্যরক্ষা করবে কি করে? শাস্ত্রে রাজার দুটো বড় দোষের কথা বলা হয়ে থাকে, মহাভারতে রাজার অনেক রকম দোষের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে দুটো প্রধান দোষ হল পানাসক্ত আর নারীর প্রতি আসক্তি। এই দুটোর সাথে দ্যুত ক্রীড়ার কথাও বলা হয়। কিন্তু রাজার সব থেকে খারাপ অবস্থা হল তার যদি চক্ষু না থাকে, চারিদিকে রাজার চর যদি না ছড়িয়ে থাকে তাহলে রাজার কাছে কোন খবর আসবে না। সূর্পণখা এটাই বলছে, তোমার তো সবই গেছে, তোমার সীমার মধ্যে রাম এসে বসে আছে সেই খবরও তোমার কাছে নেই। আর এখানে এই মেয়েগুলোকে নিয়ে ফুর্তি করছ আর মদ খাচ্ছ। এদিকে কোত্থেকে এক রাম এসে চৌদ্দ হাজার তোমার সৈন্যকে মেরে দিয়েছে, জঙ্গলের সব রাক্ষসদের শেষ করে দিয়েছে যার ফলে মুনিরা বনে জঙ্গলে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত কিছু হয়ে গেছে অথচ তোমার কাছে কোন খবর নেই। রাবণ সব কথা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। সূর্পণখা তখন আরও বিস্তারিত করে বলছে।

আমি একবার জনস্থান থেকে গোদাবরীর তীরে গিয়েছিলাম। মুনিদের আশ্রমের কাছে পঞ্চবটী কাননে পদ্মপলাশনেত্র, ধনুর্বাণধর, জটা-বল্কল পরিহিত পরম রূপবান রামকে অবস্থিত দেখলাম। তার কণিষ্ঠ লক্ষ্মণও তার মত সুন্দর। রামের ভার্যা মূর্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপসী। দেবলোক, গন্ধর্বলোক, নাগলোক বা মনুষ্যলোকে এই রকম সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখিনি, শুনিওনি। এত সুন্দরী নারী একমাত্র তোমারই যোগ্য। ওকে তোমার জন্য আনতে গেলাম তখন লক্ষ্মণ আমার এই দুরবস্থা করে দিয়েছে। এই বর্ণনা বাল্মীকির। বাল্মীকির রচনায় খুব কৌতুকরস আছে। নিজের স্বার্থে গোলমাল করবে কিন্তু নিজের কাজ আদায় করার জন্য মিথ্যে কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেবে। এটাই মানুষের খুব আদিম স্বভাব। এখানেও সূর্পণখা একই কায়দা করছে, তোমার জন্য পরম সুন্দরী এক নারী সীতাকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখ আমার কি দুরবস্থা করে দিয়েছে। সব বলার পর সূর্পণখা বলছে –

অতো যতস্ব রাজেন্দ্র যথা তে বল্লভা ভবেৎ।
সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্বলোকৈকসুন্দরী।৩/৫/৫৫

সীতা পদ্মপত্রলোচনা, সর্বলোকসুন্দরী। আমি তো পারলাম না কিন্তু তুমি চেষ্টা কর যাতে সীতা তোমারই হয়। সূর্পণখার আসল উদ্দেশ্য হল বদলা নেওয়া। কোন মেয়ে যদি বদলা নিতে চায় তখন সেই মেয়ে যে কিভাবে কাকে কোথা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে কেউ ধরতেই পারবে না। কাউকে মারার থাকলে কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে মারবে বুঝতেই দেবে না। এক ভদ্রমহিলার কাহিনী আছে, যে মহিলা সারা জীবন স্বামীর কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে এসেছে। এবার তার যে ছেলে হয়েছে সেই ছেলেকে ছোটবেলা থেকে তার বাপের বিরুদ্ধে খুব কায়দা করে একটু একটু করে বিষিয়ে যাচ্ছে। ছেলে যখন বড় হয়ে গেল তখন সে দেখছে বাবা মায়ের উপর এত অত্যচার করেছে এবার আমি বাবাকে শেষ করে দেব। যদি কেউ একবার প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে যায় তখন অনেক ভালো মানুষও অনেক ডান দিক বাম দিক করতে শুরু করে দেবে। কিন্তু কোন মেয়ে যদি বদলা নিতে নেমে যায় তাহলে ঠাকুর তার রক্ষা করুন। কোন মেয়ে যদি বলে দেয় আমি তোমাকে দেখে নেব, ঐ লোককে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। কিভাবে কিভাবে মারবে আর কত দিনে ছোবল মারবে তার কোন ঠিক নেই। সূর্পণখার এটা কাহিনী হতে পারে কিন্তু মারার সময় এভাবেই মারবে। দাদাকে গিয়ে মিথ্যে বানিয়ে বলছে, তোমার জন্য এক সুন্দরী নারীকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার কি হাল করেছে দেখ, এবার তুমি চেষ্টা করে দেখ। সূর্পণখার কথা শোনার পর থেকে রাবণের ঘুম ছুটে গেছে। খর আর দূষণের মত বীর আর যার কাছে চৌদ্দ হাজার সৈন্য আছে তাদের সবাইকে একা একজন লোক কী করে শেষ করে দিতে পারল! রাবণ বলছে –

যদ্বা ন রামো মনুজঃ পরেশো মাং হন্তুকামঃ সবলং বলৌঘৈঃ।৩/৫/৫৯

এই রাম কখনই মানুষ হতে পারে না। একটা মানুষ কি করে খর ও দূষণ আর তাদের সৈন্যকে একা শেষ করে দিতে পারে? মানুষের পক্ষে এই জিনিস কখনই সম্ভব নয়। এমন হতে পারে যে, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয় বিষ্ণু মনুষ্য রূপ ধারণ করে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিই কি এই রামচন্দ্র? এই রকম হয়ে থাকে, কাউকে যদি মৃত্যু ভয় দেখিয়ে দেওয়া হয় তখন সে ঐটাই দেখে। ফোনে একটা খবর আসার কথা, তখন যে কোন ফোন বাজলে, এমন কি পাশের বাড়ির ফোন বাজলেও তার মনে হবে ঐ খবরটাই আসছে। যদি কেউ বলে দেয় আপনার বাড়িতে আজ রাত বারোটার সময় বোমা মারতে আসবে। আপনার আর সেই রাত্রে ঘুম আসবে না।

একটা কোথাও আওয়াজ হলেই মনে হবে বোমা মারতে আসছে। আর যদি বিশেষ কোন দোষ করে থাকে তাহলে তো আরও অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এখন রাবণের ঘুম উড়ে গেছে, বলছে –

বধ্যো যদি স্যাং পরমাত্মনাহং বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েহহম্।৩/৫/৬০

তিনি পরমাত্মা, সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু, আমি যদি তাঁর হাতে মারা যাই তাহলে আমি অবশ্যই বৈকুণ্ঠে যাব আর যদি পরমাত্মা না হন তাহলে তো সে মানুষ, মানুষকে মারতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। রামকে মেরে দিতে পারলে আমার শান্তি হয়ে যাবে আর যদি পরমাত্মাই হন তাহলে চিরদিনের জন্য বৈকুণ্ঠলোকে বাস করব, আমাকে আর কেউ ছুঁতেও পারবে না। রাবণের বর ছিল দেবতা, গন্ধর্ব এই রকম অনেকে তাকে মারতে পারবে না। কিন্তু ভগবান অর্থাৎ পরমাত্মা যদি মনুষ্য শরীর ধারণ করে আসেন একমাত্র তিনিই রাবণকে মারতে পারবেন। এখন রাম রূপে এসেছেন, রামকে রাবণ যদি মেরে দেয় তাহলে রাবণ নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করবে। সেটাই রাবণ বলছে, রামকে যদি মেরে দিই তাহলে সাম্রাজ্য আমার হয়ে যাবে আর রামের হাতে যদি মারা যাই তাহলে বৈকুণ্ঠ রাজ্য আমার। পচা শামুকের খোলে যদি পা কেটে যায় তাহলে সেখান থেকে পচন হয়ে মানুষ মারাও যেতে পারে। সেইজন্য বলছে যদি মরতে হয় একজন বীরের হাতেই মারা যাব। ছিচকে চোর বদমাইশদের হাতে মারা গিয়ে কোন লাভ নেই। এখান থেকে অধ্যাত্ম রামায়ণ অন্য দিকে চলে যেতে শুরু করে। বলছেন –

বিরোধবুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদয়েৎ।৩/৫/৬১

রাবণ বলছে, আমি হরিকে বিরোধ বুদ্ধি দিয়ে লাভ করব। এটাই বৈর ভাবে সাধন, অর্থাৎ শত্রু ভাবে সাধন। তবে সাধনার জন্য এই পথ অনুমোদিত নয়। শত্রু ভাবে সাধনের পর যদি সে ভক্তি করে, তাহলে তার যখন তখনই হয়ে যাবে। মানুষ শত্রুর চিন্তা সব সময়ই করে, ভগবানকে যদি শত্রু বানিয়ে নেয় তাহলে সব সময় তার মাথায় ভগবানের চিন্তা ঘুরতে থাকবে। রাবণ তাই বলছে, ভগবানকে আমি শত্রু রূপে চিন্তন করব। অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব unusual গ্রন্থ, রাবণ একজন রাক্ষস, ভগবানের হাতে মারা গেছে বলে তাকেও পরমগতি দেওয়ার জন্য বলছে এটাও একটা সাধন বিধি। কিন্তু পরের দিকে রাবণকে নিষেধ করে বলা হবে, এই ভাবে সাধন করা ঠিক নয়। বৈর ভাবে সাধনে একটা ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। অনেক সময় মজা করেই বলা হয়, যার উপর রেগে আছে তার কথাই বারবার মনে পড়বে। রাবণ শেষে বলছে, ভক্তিতে ভগবান সহজে প্রসন্ন হন না, কিন্তু শত্রু ভাবে সহজে প্রসন্ন হন। কিন্তু শত্রু ভাব কখনই ঠিক নয়। রাবণকে পরে পরে সাবধান করে দেওয়া হবে, কখনই শত্রু ভাব আসতে দিতে নেই, শত্রু ভাবে সাধনার পথ ভুল পথ। একজন বলছিল, অন্যরা কত কষ্ট করে ঠাকুরকে পেলেন কিন্তু গিরিশ ঘোষ কত সহজে পেয়ে গেলেন, আমিও গিরিশ ঘোষের মত মাতাল হব, আর অনেক মেয়েদের সাথে জড়াব, তখন ঠাকুর অবশ্যই আমার উপর কৃপা বর্ষণ করবেন। এই বলে সত্যিই সে মাতলামিতে নেমে গেল। এই পথ পুরোপুরি ভুল পথ, শাস্ত্র সম্মত পথ নয়। হিন্দু শাস্ত্রে কাউকেই হেয় করা হয় না। সবারই মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, আর এই শক্তির জাগরণের সম্ভবনা সবারই মধ্যে আছে। এই জিনিসটাকে মাথায় রেখে রাবণকে দিয়ে বৈর ভাবের সাধনার কথা বলে রাবণকেও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা কখনই শাস্ত্র সম্মত পথ নয়। এই সব কথা বলার পর রাবণ মারীচের কাছে এসেছে। এই সেই মারীচ যাকে শ্রীরামচন্দ্র বাণ মেরেছিলেন। রাবণের মাথায় এখন অনেক কিছু ঘুরছে, এই রাম আসলে কে, সীতাকে হরণ করতে হবে কারণ সূর্পণখার কাছে সীতার রূপের বর্ণনা শোনার পর রাবণের মাথাটা গেছে ঘুরে। তার সাথে রামের শক্তিকেও একটু যাচাই করে নিতে হবে।

মারীচের মায়ামৃগ রূপ ধারণ

যাই হোক, রাবণ মারীচের কাছে এসেছে। দেখছে মারীচ শ্রীরামচন্দ্রের মত জটাবল্কল ধারণ করে ভগবানের ধ্যান করছে। এখানে খুব সুন্দর বলছেন –

ধ্যায়ন হৃদি পরাত্মানং নির্গুণং গুণভাসকম্।৩/৬/৩

ভগবান যিনি নির্গুণ তিনি আবার *গুণভাসকম্*, সব গুণের প্রকাশক। অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যাত্ম শাস্ত্র কিনা তাই কথায় কথায় অধ্যাত্ম ভাব, তত্ত্ব কথা ঢুকিয়ে দেবে। তত্ত্বটা কি? ভগবান নিজে নির্গুণ, স্বামীজী আরাত্রিক ভজনে বর্ণনা করছেন নির্গুণ গুণময়, এখানে বলছেন *নির্গুণং গুণভাসকম্*, এই গুণ মানে সত্ত্ব, রজো ও তমো

তিনটে গুণ। ফিজিক্সে কোন স্থূল জিনিসের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বলবে এ্যটম, কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে সূক্ষ্মতম হল পঞ্চ তন্মাত্রা, আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী। পঞ্চ তন্মাত্রারও সূক্ষ্মতম অবস্থায় বোঝা যায় না এটা কি কোন পার্টিকেলস নাকি গুণ, গুণ আর পার্টিকেলসের মধ্যে তখন বাচ খেলা চলতে থাকে। যেমন ফিজিক্সে বলবে এটা এনার্জি নাকি ম্যাটার বোঝা যায় না, তেমনি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা গুলিকেও বোঝা যায় না যে এটা পার্টিকেলস নাকি শুধু গুণ। কিন্তু এরও সূক্ষ্ম অবস্থায় যখন সত্ত্ব, রজো ও তমোতে চলে যায় তখন এটাই হয়ে যায় শুধু শুদ্ধ গুণ, তখন আর পার্টিকেল বলা যায় না। একই সাথে অস্তিত্বহীন বলাও যাবে না, কিছু একটা আছে। কি আছে? শুদ্ধ গুণ। শুদ্ধ গুণ ঠিক কি হয় আমাদের পক্ষে বোঝা একটু কঠিন। এই তিনটে শুদ্ধ গুণ এক অপরের সাথে মিশতে শুরু করে তখন একটু স্থূল হতে শুরু হয়। আগেকার দিনে এগুলো বোঝাই যেত না, এখন ফিজিক্সের দৌলতে বুঝতে সুবিধা হয়েছে। পিওর এনার্জিও ঘনীভূত হয়ে ম্যাটার হয়ে যায়। ফিজিক্স যেটাকে পিওর এনার্জি বলছে, আমাদের কাছে সেটাই পিওর কোয়ালিটি, শুদ্ধ গুণ। একটা হল রজস যার মধ্যে সক্রিয়তা আছে, আর আছে তমস সব কিছু স্থবির করে রাখে আর তার পেছনে রয়েছে সত্ত্ব যে দুটোকে ব্যালেন্সে রাখছে। এই তিনটে গুণ নিজেরা কিছু করতে পারে না। এদের আলাদা ছেড়ে দিলে অসহায় হয়ে পড়ে থাকবে। তিনটে গুণের কার্য ক্ষমতা তখনই আসে ভগবান যখন তাদের পেছনে আসেন। ভাগবতে এর উপর খুব সুন্দর কাহিনী আছে। সৃষ্টির সময় হয়ে গেছে, সত্ত্ব, রজো ও তমো আর তার সাথে পঞ্চ তন্মাত্রা সব তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু দেখা গেল তাও সৃষ্টি হচ্ছে না। তখন সবাই ভগবানকে গিয়ে বলল, প্রভু! আমরা সবাই তৈরী হয়ে আছি কিন্তু তাও সৃষ্টি হচ্ছে না, আপনি পেছনে না এলে সৃষ্টি হবে না। সেইজন্য চিজ্জড়গ্রন্থির কথা বলা হয়, চৈতন্য যখন জড়ের সাথে মেলে তখনই সৃষ্টি হয়। তিনটে গুণ, সত্ত্ব, রজো আর তমো, সেখান থেকে পঞ্চ তন্মাত্রা, সেখান থেকে পঞ্চ মহাভূত, এই জিনিসগুলো যে পর পর আসছে, এগুলোর পেছনে ভগবান আছেন বলে এগুলো ভাসমান হয়, তা নাহলে এদের কার্য বোঝা যাবে না। একটা বস্তুকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কথা বলছি, শুনতে পারছি কারণ এর পেছনে চৈতন্য শক্তি আছে। বলছেন, মারীচ তখন ভগবানের ধ্যান করছে। কোন ভগবানের ধ্যান করছে? যিনি নির্গুণ, নির্গুণ মানে তার মধ্যে তিনটে গুণের কোনটাই নেই। গুণ কেন নেই? কারণ গুণ সব সময় তাকে সীমিত করে দেয়। ভগবান তো সীমিত নন, অথচ তিনি জগতকে ভাসমান করে রেখেছেন।

রাবণের উপস্থিতিতে মারীচের ধ্যান ভেঙে গেছে। রাবণকে দেখেই মারীচ বলছে, তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোমার চিত্ত চঞ্চল, তুমি চিন্তাগ্রস্ত, কি হয়েছে আমাকে বল। রাবণ তখন সংক্ষেপে বলছে, রাম নামে একজন এসেছে, সে আমার বোনের এই দুরবস্থা করে দিয়েছে, এর বদলা নেওয়ার জন্য ওর ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করতে হবে, তুমি আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করবে। তুমি মায়ারূপী মৃগ হয়ে সেখানে যাও। তোমাকে দেখে সীতা প্রলুব্ধ হয়ে বলবে আমার সোনার হরিণ চাই, রাম বেরিয়ে যাবে তোমাকে ধরতে আর সেই সময় আমি গিয়ে সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসব। রাবণের কথা শুনে মারীচ সবিস্ময়ে বলছে –

কেনেদমুপদিষ্টং তে মুলঘাতকরং বচঃ।
স এব শত্রুর্বধ্যশ্চ যস্তুন্নাশং প্রতীক্ষতে।৩/৬/১৫

হে রাবণ! তোমার সর্বনাশ করার জন্য তোমাকে কে এই বুদ্ধি দিয়েছে? তোমার পুরো কুলের সংহারের জন্যই তোমাকে কেউ এই উপদেশ দিয়েছে। ভেতরে ভেতরে তোমার কেউ এমন শত্রু আছে যে তোমার বংশকে নাশ করে দিতে চায়, সেই হয়ত তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছে। কারণ তুমি জেনে রাখ, শ্রীরামের সাথে শত্রুতা হয়ে গেলে তুমি আর বাঁচবে না। তখন তো শ্রীরাম নেহাতই কোমল এক বালক ছিল, ওই বালক বয়সেই বিশ্বামিত্রের আশ্রম রক্ষা করতে এসে আমাকে একটা ভোঁতা তীর মেরেছিল তাতে আমি সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়েছিলাম। তখন তো শ্রীরাম বাচ্চা ছিল তাতেই আমার ঐ অবস্থা হয়েছিল আর এখন তো তিনি পূর্ণ যৌবনে ভরপুর, তেজ আর শক্তিতে টগবগ করছেন, এখন তাহলে কী অবস্থা করবে ভেবে দেখ। মারীচ বলছে, শ্রীরাম ঐ যে আমাকে তীর মেরেছিলেন, সেই কথা স্মরণ করলে এখনও আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যাই। আমার এখনও মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ বুঝি রাম আমাকে মারার জন্য আসছেন। এই পর্যন্ত বাল্মীকি রামায়ণের সাথে মিল আছে, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে আরেকটু যোগ করা হয়েছে। মারীচ আবার বলছে, একবার রাম আর সীতাকে জঙ্গলে দেখে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গের হরিণের রূপ ধারণ করে সীতা ও লক্ষ্মণের সাথে রামকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম। তখন শ্রীরাম

আমাকে একটি শর নিক্ষেপ করলেন, ঐ একটা শরেই বিদ্ধ হয়ে রক্তবমি করতে করতে আবার সমুদ্রে গিয়ে পতিত হই। সেই থেকে –

রামমেব সততং বিভাবয়ে ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্নরমণীরথাদিকং শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ।৩/৬/২২

আমি সব সময় রামের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকি। জগতে 'র' দিয়ে যত ভোগ্য সামগ্রী আছে রাজ্য, রাজা, রাণী, রত্নরাশি, রমণী, রথ প্রভৃতির নাম কানে গেলেই নিতান্ত ভীত হয়ে রামের কথাই মনে পড়তে থাকে, এই বুঝি রাম আমাকে মারতে আসছে। এটাই কাব্য, তুলসীদাসও এই জিনিসটাকে নিয়েছেন। যার থেকে ভয় তাকে ভক্তি করলে ভয় থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রামকে নিয়ে মারীচের ভয়, রামের শত্রুতাকে নিয়ে ভয়, সেইজন্য রামকেই ভক্তি করতে হবে। ভয় কাটানোর এই পথ ছাড়া আমার কাছে আর কোন উপায় নেই। সেইজন্য মারীচ বলছে –

রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া বাহ্যকার্য্যমপি সর্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপ্নে রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্।৩/৬/২৩

রাম যখন তখন এসে যেতে পারে এই ভয়ে আমি সব বাহ্য কর্ম ছেড়ে দিয়েছি। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে রামকে দেখলেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে থাকি, আমার আর ঘুম আসে না। সেইজন্য দেখো বাপু শ্রীরামের সাথে তুমি শত্রুতা করে যেও না, তুমি এখন বাড়ি যাও, যে রাক্ষসকুল চলে আসছে, তোমার চিরাচরিত রাক্ষসকুলকে রক্ষা কর গিয়ে। আর বৈর ভাবে শ্রীরামকে স্মরণ পর্যন্ত করলে তোমার বংশ নাশ হয়ে যাবে।

ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন ত্বং প্রযাহি ভুবি মানুষং বপুঃ।
দশরথাত্মজভাবমঞ্জসা জহি রিপুং দশকন্ধরং হরে।২৭

তুমি যা ভাবছ তা নয়, শ্রীরাম মানুষ নন। আমি নারদের মুখে শুনেছি যে সত্যযুগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলে হরি বলেছিলেন, তোমার অভিষ্ট কি বল, আমি তা সম্পাদন করে দেব। তখন ব্রহ্মা প্রার্থনা করলেন, হে হরে! আপনি মনুষ্য শরীর ধারণ করে দশরথের পুত্র রূপে অবতীর্ণ হয়ে শীঘ্র আমাদের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন। অতএব হে রাবণ, তুমি যা ভাবছ তা নয়। রামের সাথে বিরোধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে সুখে শান্তিতে অবস্থান কর। তখন রাবণ বলছে –

পরমাত্মা যদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল।৩০
মাং হন্তুং মানুষো ভূত্বা যত্নাদিহ সমাগতঃ।

ভগবান যদি আমাকে মারার জন্য মানুষ রূপ ধারণ করে থাকেন তাহলে তিনি আজ হোক কাল হোক আমাকে মারবনই, তাহলে আমি সীতাকে কেনই বা ছেড়ে দিতে যাব। যুদ্ধে যদি রাম আমাকে বধ করে আমার বৈকুণ্ঠ লাভ হবে, আর আমি যদি রামকে মেরে দিতে পারি তাহলে আমি সীতাকে পাব। সেইজন্য ভয়ের কিছু নেই, তোমাকে আমি যেমনটি বলছি তেমনটি কর। আর তা নাহলে আমিই তোমাকে এখানে মেরে শেষ করে দিচ্ছি। দ্রোণচার্য যখন শুনলেন ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মই হয়েছে আমাকে বধ করার জন্য, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই যখন অস্ত্র শিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে পাঠানো হল তখন সবাই নিষেধ করছে, একে আপনি অস্ত্র শিক্ষা দেবেন না, কারণ এর হাতেই আপনার মৃত্যু হবে। দ্রোণাচার্য তখন বলছেন, এর হাতেই মৃত্যু যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে একে অস্ত্র শিক্ষা দিলেও এর হাতেই মরব আর না দিলেও মরব, মাঝখান থেকে আমি আমার ধর্মকে কেন ছেড়ে দেব। রাবণ আর দ্রোণাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরাট পার্থক্য এসে যাচ্ছে, দ্রোণাচার্য বলছেন আমি আমার ধর্মকে কেন ছাড়ব আর রাবণ বলছে আমি অধর্মকে কেন ছাড়ব। এখানে এটাও আছে যে রাবণ বলছে রামের হাতে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমি বৈকুণ্ঠে যাব। মানুষের স্বভাবই হল যেটা সে ঠিক করে নিয়েছে সে সেটাই করবে। যে দর্শন দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, ঐ দর্শনকে দিয়েই সে justify করে নেবে। রাবণের মাথায় এখন ঢুকে গেছে সীতাকে পেতে হবে, সীতাকে নাই দেখে থাকুক কিন্তু সে ওটাই করবে। দ্রোণাচার্যও ওটাই করবেন যেটা উনি ধর্ম মতে গ্রহণ করে রেখেছেন। গীতায় ভগবান বলছেন, *স্বভাবস্তু প্রবর্ততে*, মানুষ স্বভাবে চলে, তার জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালের বাইরে সে যেতে পারে না। দ্রোণাচার্যের জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হল ধর্ম আর রাবণের

জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হল রজোগুণ, রজোগুণে ওতপ্রতো। রজোগুণের লক্ষণ হল *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*, এটাকে আমি অর্জন করেছি, এবার ওটাকে আমায় পেতে হবে। এভাবেই রজোগুণের চিন্তা ভাবনা চলে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য যদি সে তার ঠিক ঠিক স্বভাব থেকে সরে যায়, যেমন অর্জুনের ছিল শৌর্য্য, কিছুক্ষণের জন্য অর্জুনের শৌর্য্য সরে গিয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়ে গেল। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে গীতার উপদেশ দিয়ে বিষাদ সরিয়ে দিলেন, অর্জুন আবার নিজের স্বভাবে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। রাবণ স্বভাবতঃ রজোগুণে প্রতিষ্ঠিত, দ্রোণাচার্য স্বভাবতঃ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের জন্য যা যা হবে দ্রোণাচার্য তাই তাই করবেন। এই কারণে কোন উপদেশই শেষ পর্যন্ত কোন কাজে লাগে না। নিজের লোকদের অনেক কিছু বলা হয় কিন্তু কোন কথাই তারা শেষ পর্যন্ত শুনবে না। আপনি যদি ভালো কথা বলেন, কর্মবাদের কথা বলেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা বলেন, তখন তারা ওটাকেই নিজের কাজে লাগাবে। এরা কখনই আত্ম প্রত্যয়কে কাজে লাগাবে না। জীবনের যদি একটি উদ্দেশ্য থাকে তা হল আত্মোন্নতি, স্বার্থপরতা থেকে কিভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসব। রাবণ যেটা করতে চাইছে এর মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে, অপরের স্ত্রীকে নিজের কাছে টেনে আনতে চাইছে। এই ধরণের কাজ নিষিদ্ধ, শাস্ত্র নিষেধ করছে, কারণ এই কাজ তোমাকে মহৎ হতে দেবে না। দ্রোণাচার্য যে পথ নিয়েছেন এই পথ তাঁকে মহৎ করে দিচ্ছে, আমি আমার ধর্মকে ত্যাগ করব না, তাতে আমার মৃত্যু হলে হবে। এগুলোকে ভালো করে বুঝতে হয়, কোন কাজ, কোন চিন্তা-ভাবনা আমাকে মহৎ তৈরী করবে।

জাতকের কাহিনীতে আছে, বোধিসত্ত্ব একবার শ্রেষ্ঠী হয়ে এক বণিকের বাড়ি জন্ম নিয়েছেন। সেই শ্রেষ্ঠী রোজ কোন ভিক্ষু বা ব্রাহ্মণকে সেবা করার জন্য খাওয়ার নিয়ে যায়। একবার ইন্দ্র পরীক্ষা নিতে এসেছে। স্বামী আর স্ত্রী খাবার নিয়ে এগিয়েছে। ইন্দ্র সেখানে নরকের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। শ্রেষ্ঠীকে বলছে, এরপর তুমি যদি এক পা এগিয়েছ তুমি কিন্তু আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। বোধিসত্ত্ব তখন বলছেন, সাধু সেবা করাটাই আমার ধর্ম, আমি এই ধর্ম কোন লোভে পড়ে করি না, আর কোন ভয়ের কারণে এই ধর্মকে আমি ত্যাগও করব না, এটাই আমার স্বভাব। এই বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। এগোতেই দেখেন ঐ আগুনটা আর নেই। আমাকেই ঠিক করতে হবে আমার জীবনধারা কি হবে। জীবনধারা ঠিক করার সময় গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের কথার সাথে মেলাতে হবে। মিলিয়ে দেখতে হবে এই জীবনধারা আমাকে কি আত্মোন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না। যখন একবারে মিল পাওয়া গেল তখন আর ওখান থেকে পিছিয়ে যাওয়া চলবে না। কোন লাভের আশায় না, কোন কিছুর ভয়ে এই জীবনধারা থেকে আর সরে আসা যাবে না। আমাকে এখন এটাই করতে হবে। স্বামীজী বারবার বলছেন, একটা আদর্শকে ঠিক করে নাও, ঠিক করে নিয়ে এবার এটাকেই চিন্তা কর, এটাকে নিয়েই স্বপ্ন দেখ আর সেই আদর্শের সাথে নিজেকে এক করে দাও। বিচার করলে দেখা যাবে আমাদের জীবনে কোন আদর্শই নেই। যেমনি একটা আদর্শ নিয়ে নেব তখনই অনেক বাধা বিঘ্ন আসতে শুরু হয়ে যাবে, লোকেরা আমাকে আটকাতে চেষ্টা করবে। তারপর আমি বলতে পারব, আমি কোন লোভের জন্য এটা করছি না, আর কোন লোভের জন্য এই আদর্শকে ছাড়ব না। কোন কিছুর ভয়ের জন্য করছি না, আর কোন ভয়ের জন্য ছাড়বও না। এরপর কোন ব্যক্তি, কোন সমাজ আর তাকে আটকাতে পারবে না। এবার সে সুপারম্যান হয়ে গেল।

শিক্ষার ব্যাপারে স্বামীজী একটা খুব সুন্দর কথা বলছেন – Man making and character building education। পৌরুষত্ব মানে তার শক্তি আছে। রাবণের মধ্যে পৌরুষত্ব আছে, রাম ভগবান ঠিক আছে, আমি তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে আসব, এটাই পৌরুষত্ব। কিন্তু characterটা missing। অধ্যাত্ম রামায়ণ একজন ঋষির রচনা, তিনি একটা কাহিনীর মাধ্যমে একটা আদর্শকে তুলে ধরতে চাইছেন। ভগবান নররূপে এসেছেন, রাবণ সেটাকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে। রাবণেরও একটা আদর্শ আছে, আমি রাজা, আমি যা চাইব তাই করব। আমরা অতি সাধারণ কেন? আমাদের নিজস্ব কোন একটা আদর্শ নেই। ভালো কাজ করারও কোন আদর্শ নেই, বদমাইশি করারও আদর্শ নেই। শুধু character building দিয়ে কিছুই হয় না। একজন লোক গরু কিনতে গেছে। একটা গরুর দাম বলল দশ হাজার টাকা। লোকটি তখন জিজ্ঞেস করছে, অন্য গরুগুলোর দাম হাজার টাকা, এর দাম দশ হাজার টাকা কেন? তখন বলছে, এই গরু কোন দিন পাল খায়নি আর কোন দিন খাবেও না, এখনও বাচ্চা দেয়নি আর কোন দিন দেবেও না, দুধ দেয়নি আর কোন দিন দেবেও না। লোকটি তখন বলছে, এই গরু নিয়ে আমি কি করব? লোকটিকে গরুর মালিক বলছে, character বলেও একটা জিনিস হয়। ঐ character ধুয়ে কি জল খাবে! আমরা সবাই ঐ দশ হাজার টাকার গরু। আগে শক্তিটা অর্জন করুক।

স্বামীজী বলছেন man making, মানুষই তৈরী হচ্ছে না তার character দিয়ে কি করবে! রাবণের মধ্যে শক্তি আছে, যার মধ্যে পাওয়ার এসে গেছে দরকার হলে তাকে characterও দিয়ে দেওয়া যাবে। যার শুধু character আছে সে হল ঠাকুরের সেই গরু যে গরুর লেজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে।

এখানে রাবণের লক্ষ্য যদিও অধর্ম, যদিও রজোগুণের কিন্তু রাবণ নিজের দিক থেকে পরিষ্কার – আমি এটাই চাই। খারাপ যাই হোক কিন্তু রজোগুণ তমোগুণের থেকে অনেক ভালো। আমরা মনে করছি আমাদের চরিত্র আছে, অপরের স্ত্রীর দিকে তাকাই না, কিন্তু আসলে আমরা হলাম তমোগুণী, পাথরের মত নিরেট।

<u>সীতা ছায়ারূপে অবস্থান এবং আসল রূপে অগ্নিতে প্রবেশ</u>

রাবণ আর মারীচের যে যৌথ উদ্যোগ এবং তার ফলস্বরূপ যে সীতা হরণ, এই জিনিসগুলো বাল্মীকি রামায়ণে খুব যুক্তিপূর্ণ ভাবে চলে আর বর্ণনাও কাব্যিকতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের উদ্দেশ্য আলাদা, উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর বা অবতারের কথা সামনে রাখা। যেখানে অবতারের কথা সামনে রাখা উদ্দেশ্য সেখানে কাহিনীতে কিছু যায় আসে না। ভক্তদের জন্য একটা কাহিনী দাঁড় করিয়ে দিয়ে তার মধ্যে তত্ত্ব কথাগুলো রেখে দিলেই হল। একদিকে যখন রাবণ মারীচকে নিয়ে জল্পনা, পরিকল্পনা করছে তখন শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পেরে গেছেন। শ্রীরাম কোন গুপ্তচর দিয়ে জানছেন না, তিনি ভগবান কিনা, তাই আগামী দিনে কি হতে যাচ্ছে তিনি তার সবটাই জানেন। ভগবান যদি সব কিছুই জানতেন তাহলে লঙ্কাতেই রাবণকে সোজা মেরে দিতে পারতেন, এত ঝামেলার কোন দরকারই ছিল না। আসলে কি হয় আমাদের পক্ষে বলা খুব মুশকিল। ঠাকুর বলছেন, জটিলা কুটিলা না থাকলে লীলা পোষ্টাই হবে না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হল লীলা। লীলা মানে ঈশ্বর যখনই কোন কিছু করেন তখন সেটাকেই লীলা বলা হয়। লীলা মানে যে পুরোটাই মিথ্যা, নাটক, তা নয়। আবার আমরা যেভাবে লীলাকে সত্য বলে মনে করি সেভাবে লীলা সত্যও না। পুরোটাই সত্যি আর পুরোটাই মিথ্যা এই দুটোর মাঝখানে বাচ খেলা চলে। এই ব্যপারটা বোঝাবার জন্য এর পরিভাষা হল লীলা। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র যা কিছু করেন, শ্রীকৃষ্ণের যা কিছু ঘটনা আছে সবটাকেই আমরা লীলা বলছি। কিন্তু লীলার বর্ণনা শাস্ত্রের মাধ্যমে আসতে হবে। ঈশ্বরের কার্যকলাপের বর্ণনা যখন শাস্ত্রের মাধ্যমে আসে তখনই আমরা তাকে লীলা বলি।

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের যা কিছু সংঘটিতে হয়েছে সেগুলোকে আমরা ইতিহাস বলব নাকি লীলা বলব? শ্রীরামকৃষ্ণ যা কিছু করেছিলেন সবটাই ইতিহাস। কিন্তু এগুলোকে নিয়ে যখন চিন্তা-ভাবনা শুরু হবে, একটা প্যাটার্ন আনার চেষ্টা হবে, তখন ওটাকেই বলবে লীলা। আমরা হলাম সাধারণ মানুষ, সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা বেগতিক কোন জিনিস দেখতে চাই না, দেখতে পারি না। বেগতিক মানে, এলমেলো, এলোপাতাড়ি কিছু হয়ে যাচ্ছে, এগুলো আমরা দেখতে পারি না। ঝড়ের সময় বাতাস এলোপাতাড়ি চলে, বিজ্ঞানীরা সেটাকেও মানতে চায় না, সেটাতেও তারা একটা প্যাটার্ন বার করার চেষ্টা করে। মানুষের মন প্যাটার্ন ছাড়া কোন জিনিস নিতে পারে না। একদিকে বলছেন ঈশ্বরের অবতার, তিনি সর্বজ্ঞ, আবার মানুষের মত অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, এই পুরো জিনিসটাকে যদি একটা জায়গায় আনতে হয়, তখন এছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। আর ঠিক ঠিক ভক্তের দিক থেকে যদি দেখা হয় তখন এগুলো না হলে লীলা পোষ্টাই হবে না। ঠিক ঠিক অধ্যাত্ম হল শুদ্ধ নির্মল জলের মত। শুদ্ধ নির্মল জল দিয়ে কোন কাজ হয় না, জলতেষ্টাও মেটাতে পারবে না। পানীয় জলেও কিছু মিনারেলস দরকার, তা নাহলে আমাদের শরীর খারাপ হয়ে যাবে। বাচ্চাদের শুধু প্লেইন জল দিলে খেতেই চাইবে না, কিন্তু রসনা-টসনা মিশিয়ে কোকাকোলার মত বানিয়ে দিলে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে নেবে। মানুষ কখন শুদ্ধ জিনিস নিতে পারে না, ভেজাল ছাড়া সে নিতেই পারবে না। ঈশ্বর হলেন একেবারে পরিপূর্ণ ভাবে শুদ্ধ, ঐ শুদ্ধ রূপকে কেউ নিতে পারবে না, তাই ভেজাল দরকার। শুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে যাঁরা চলেন তাঁরা কোন দিনই উপন্যাসাদি লিখতে পারবেন না, সাহিত্য রচনা মানেই ভেজাল। ঈশ্বরের যে শুদ্ধ স্বরূপ, এই শুদ্ধ স্বরূপকে মানুষ কোন দিন নিতে পারবে না। সমাধি ছাড়া ঈশ্বরের শুদ্ধ রূপকে অনুভব করা যায় না, আর ঐ অনুভূতি দিয়ে সংসার চলে না। সংসার চালানো মানে এবার একগুচ্ছ ভেজাল মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন যে কাজগুলো হবে সেখানে রীতিমত ভেজাল আনতে হবে। ঐ ভেজাল আনাকেই বলে লীলা। এই জায়গায় এখন লীলা চলছে। আমরা অতি সাধারণ মানুষ, ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, সত্য কথা বলিবে, চুরি করিবে না। কিন্তু একটা কথাও তো আমরা পালন করতে পারছি না। যখন গোলমাল করি তখন একবারাও তো ঐ কথাগুলো মনে

পড়ে না। কিন্তু রামকথাতে যখন দেখাচ্ছেন, তোমার সামনে এখন সোনার হরিণ নাচছে, খুব সাবধান, তখন আমিও সজাগ হয়ে গেলাম। কাহিনীর মাধ্যমে যখন এই জিনিসগুলো বলা হয় তখন ধর্ম আর অধর্ম আরও পরিষ্কার ফুটে আসে। কিন্তু এগুলো শাস্ত্র, শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে, তত্ত্ব আর কথা দুটো মেশানো আছে। মেশানো থাকার জন্য কিছু কিছু জিনিস আজগুবি বলে মনে হয়। এছাড়া, আমরা সব সময় একটা প্যাটার্ন দেখতে চাই, প্যাটার্ন দেখা মানে কর্মের ভাব। সেই লোকটা কি গোলমাল করেছে আমরা জানি না, আর কোথায় কোন দেবতার কোন তীর কেড়ে নিয়েছে তাতে আমাদের কি আসে যায়। ওকে সরাসরি সামনে গিয়ে দেখাতে হবে একটার পর একটা গোলমাল করছে, এই করে করে ওর কর্মাশয় যখন পুরো দাঁড়িয়ে যাবে তখন গিয়ে বোঝা যাবে। এই সব জিনিসগুলোকে জমাতে হয়। এখন এই কাহিনীগুলো যখন পড়ছে তখন তার তত্ত্ব জানা হয়ে গেল, শ্রীরাম রাবণকে বধ করলেন, এবার আপনি আমি যেভাবে এটাকে ভেতরে জমাবার জমাব। দ্বিতীয় হল রাবণ যখন সীতাকে হরণ করছে নিজের বধের জন্য, সেও এখন পাঁচটি জিনিস ওর মধ্যে জমাবে। বিভিন্ন লেখকরা নিজের মত এই জিনিসগুলিকে সাজিয়ে দেন। যাই হোক এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণের কাহিনী অনুযায়ী ভগবান ব্রহ্মা ও দেবতাদিদের বলছেন আমি রাম রূপে আসব এবং রাবণকে বধ করব। এই মুহুর্তটাই এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। রাবণের সব প্রচেষ্টা জানতে পেরে শ্রীরামচন্দ্র একান্তে সীতাকে ডেকে এনে বলছেন –

উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি মে বচঃ।৩/৭/১
রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেহন্তিকম্।
ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ।৩/৭/২
অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া।

রাবণ ভিক্ষুক রূপে তোমার কাছে আসবে। তুমিও তোমার সদৃশাকৃতির ছায়া রূপে অবস্থান কর। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও আছে *যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা*। মানুষের ছায়া মানুষের সাথে একসাথে চলে। ছায়ার আরেকটা অর্থ হয় জীব যেন ব্রহ্মের ছায়া, ব্রহ্মই আসল আর এটা তাঁর ছায়া। শরীরের দিক দিয়ে দেখলে, আত্মাই মূল দেহটা তাঁর ছায়া। কঠোপনিষদে আছে, ধ্যান করতে করতে যখন অনেক গভীরে চলে যান তখন একটা অবস্থায় গিয়ে দেখেন ছায়াতপো রূপে। আত্মাকে একেবারে প্রকাশমান দেখছেন আর জগতকে দেখেন ছায়া রূপে। দেহীর ছায়া যেটা হয়, যেখানে বাস্তবটা আছে আর তার যে ছায়া ওটা আরেকটা অন্য রকম দেখায়। আত্মা আর শরীর, ব্রহ্ম আর জগৎ হল আলো ছায়ার মত। ঠিক তেমনি সীতাকে বলছেন, *ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং*, তোমার যে আকৃতি তার ছায়া রূপ তুমি ধারণ কর। *অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষং তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া*, তোমার আসল রূপ নিয়ে এক বছরের জন্য অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করে যাও আর তোমার ঐ ছায়া রূপ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এখন যা কিছু ঘটবে তোমার ছায়া রূপেই ঘটবে। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটা একটা উদ্ভট চিন্তা। সীতার ছায়া বাইরে থেকে গেল আর আসল সীতা অগ্নিতে চলে গেল। বাল্মীকি রামায়ণে এই ধরণের জিনিস কল্পনাই করা যায় না, বাল্মীকি কোথাও আজগুবি কাহিনী দেবেন না। সীতাকে হঠাৎ ছায়া বানিয়ে দেওয়া হল কেন?

এর মূল নিহিত রয়েছে আমাদের অনেক দিন আগেকার একটা ধারণার মধ্যে। অগ্নি পরীক্ষা ভারতে অনেক দিন থেকে একটা প্রথা রূপে চলে আসছে। কেউ যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে বা চুরি করে থাকে কিন্তু অস্বীকার করছে তখন তাকে বলা হয় আগুনের উপর হাত রাখতে। আচার্য শঙ্করও ভাষ্যে এর উল্লেখ করে বলছেন, অনেক সময় লোহা গরম করে রাখা থাকত আর যে মিথ্যা কথা বলেছে তাকে ঐ গরম লোহাতে হাত দিতে বলা হত, তুমি যদি সত্য কথা বলে থাক তাহলে তোমার হাত পুড়বে না, যদি হাত পুড়ে যায় তাহলে তুমি মিথ্যা কথা বলছ। এমনকি মনুস্মৃতিতেও আছে যেখানে জজ সাহেবের মনে সন্দেহ হচ্ছে লোকটি সত্যিই কি চুরি করেছে কিনা বা টাকা নিয়ে মিথ্যা কথা বলছে কিনা, সেখানে মনুস্মৃতিতে বলছেন, এরপর লক্ষ্য রাখতে হয় যে কিছু দিন পর লোকটির বাড়িতে আগুন লাগছে কিনা, কিংবা বাড়ির কেউ মারা যায় কিনা, তখন বুঝতে হবে লোকটি দোষী ছিল। দোষ করে থাকলে তাকে অন্য স্তরে গিয়ে মারছে। এগুলো আমরা কতটা বিশ্বাস করব, কতটা মানব জানি না। তবে হিন্দী অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে যে, সত্যি কথা যে বলবে আগুনের আঁচ তার লাগে না। তাছাড়া সে সত্যিই পবিত্র কিনা পরীক্ষা করার জন্য আগুনের উপর তার হাত রাখা হত। বাল্মীকি রামায়ণে একেবারে চরমে নিয়ে গেছে, যেখানে পুরো সীতাকেই অগ্নিতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। এটাই কাব্যিক প্রতিভার পরিচয়। কাব্যিক প্রতিভা মানেই কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে বাচ খেলা। এমন ভাবে বাচ খেলাবে জিনিসটাকে

কখনই মিথ্যা বলেও মনে হয় না। সত্য মানেই একেবারে শুদ্ধ জল। রোজই আমরা কর্মস্থল থেকে বাড়ি যাই, বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাসে উঠছি, কণ্ডাক্টরের কাছে টিকিট কাটছি, পাড়ার স্টপেজে নামছি, সেখান থেকে হেটে বাড়ি আসছি। এই বর্ণনা যদি আমি বাড়ির লোকদের শোনাতে যাই কেউ শুনতে চাইবে না। কিন্তু যদি বলতে শুরু করি, আজকে যেই বাসে উঠলাম একটু পরেই হঠাৎ একটা লোক পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করেছে। এতটুকু বলার পর আমি যদি থেমে যাই, শ্রোতারা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে থাকবে, তারপর কি হল বলবে তো। মশলা ছাড়া কখনই সাহিত্য হয় না। সীতাকে যদি আগুনে হাত রেখে পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে বাল্মীকি রামায়ণের আর বিশেষত্ব থাকল কোথায়! বাল্মীকি রামায়ণের এটাই বিশেষত্ব যে সীতাকেই আগুনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এগুলোকে যদি কেউ আক্ষরিক অর্থে নিতে যায় তাহলে বুঝতে হবে তার মাথাটা খারাপ। কিন্তু সীতাকে যদি আগুনে প্রবেশ করিয়ে দেন সেই ক্ষেত্রে আবার শ্রীরামচন্দ্রের দোষ এসে যাবে। তিনি অন্তর্যামী তিনি জানেন সীতা কোন গোলমাল করেননি। বাল্মীকি রামায়ণেও এর বর্ণনা আছে, অনেকের এই অগ্নি পরীক্ষাতে খুব আপত্তি বোধ করতে শুরু করলেন কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস নেই বলে তারা খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। লক্ষ্মণও ঘাবড়ে গেছেন, দাদা এটা কী করছেন! পরে সীতা যখন অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই অগ্নি পরীক্ষার দরকার ছিল, তা নাহলে লোকেরা পরে সন্দেহ করত। কিন্তু এতে শ্রীরামের উপর দোষ চেপে যায়, যিনি পবিত্রতাস্বরূপিণী তাঁকে এভাবে কেন অগ্নি পরীক্ষা করালেন! অধ্যাত্ম রামায়ণ হল ভক্তদের জন্য, ভক্তদের মনে যাতে কোন আক্ষেপ না হয় সেইজন্য প্রথমেই পুরো ঝামেলাটাই মিটিয়ে দেওয়া হল। পবিত্র সীতাকে রেখে দেওয়া হল অন্য জায়গায় আর নকল সীতাকে সামনে নিয়ে এলেন। এর আর কোন তাৎপর্য নেই, ভক্তদের আবেগে, ভক্তিতে যাতে কোন আঘাত না লাগতে পারে। এরপর সীতাকে রাবণের কাছে থাকতে হবে, সেখানে কত রকমের জটিল পরিস্থিতি হতে পারে, তাই এই একটা দিয়ে সব কিছুকে সরিয়ে দেওয়া হল। অগ্নি পরীক্ষা হলে ভগবানের উপরই প্রশ্ন উঠবে, তাঁর অন্তর্যামীর উপরেই সন্দেহ আসবে। শ্রীরাম ভগবান, লীলা রূপে যখন সামনে রাখা হচ্ছে তখন যে কোন জিনিস বলে দেওয়া যায়। ছায়া রূপে সীতাকে নিয়ে আসার এটাই মূল উদ্দেশ্য।

রাম কর্তৃক মায়মৃগরূপী মারীচ বধ এবং রাবণের সীতা হরণ

শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে বলে দিলেন, তুমি ওখানে এক বছর থাক আর রাবণ বধ হয়ে যাওয়ার পর তোমাকে আমি কায়দা করে ওখান থেকে আবার নিয়ে আসব। কিভাবে আনবেন? ছায়াকে অগ্নিতে ঢুকিয়ে দেবেন, ছায়া অগ্নিতে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে, কারণ অগ্নিতে ছায়া থাকতে পারে না। তারপর সেখান থেকে বাস্তব সীতা বেরিয়ে আসবেন। লোকেরা কেউ আসল নকল বুঝতেই পারবে না। শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা লক্ষ্মণকে এই ব্যাপারে কিছুই জানালেন না। ছায়ারূপিনী সীতার সব কিছুই আসল সীতার মত, কিছুটা ক্লোনিং এর মত বলা যেতে পারে। আমরাও সবাই ভগবানের ছায়া, ভগবানের ছায়া বলে ভগবান যা যা করতে পারেন আমরাও সব কিছু করতে পারি। ভগবান সর্বশক্তিমান, আমরাও সব সময় দেখাচ্ছি আমাদের কত শক্তি আছে। ভগবান হলেন সর্বজ্ঞ, আমরা দিনে দিনে আমাদের জ্ঞানরাশি বাড়াচ্ছি। কিন্তু ছায়ারও একটা সীমাবদ্ধতা থাকে, সেই সীমাবদ্ধতা আমাদেরও আছে। ছায়ারূপিণী সীতারও একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এরপরে সীতা যখন মায়ামৃগ দেখলেন, সেখানে লক্ষ্মণও আছেন, সীতা তখন বলছেন –

পশ্য রাম মৃগং চিত্রং কানকং রত্নভূষিতম্।
বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তং চরন্তমকুতোভয়ম্।৩/৭/৬
বদ্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ।৩/৭/৭

হে রাম! দেখুন কেমন বিচিত্র রত্ন-বিভূষিত সোনার হরিণ, আর দেখুন নির্ভয়ে কি সুন্দর খেলা করছে। এই হরিণকে বদ্ধ করে আমাকে এনে দিন, আমি এর সাথে ক্রীড়া করব আর আমারও সময় কেটে যাবে। মানুষের সময় কাটানো সবচেয়ে বড় সমস্যা। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা সারাদিন ঝগড়াই করতে থাকে, ঝগড়া করতে করতে সময় কাটাচ্ছে। ঝগড়া করছে মানে সময়টা ভালো কাটছে। এক গ্রামে দুই বুড়ি ছিল। সকাল হতেই দুজনে ঝগড়া করতে শুরু করে দিত। রান্না হচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া সবই হচ্ছে তার মধ্যে ঝগড়াও চলছে। যেই সন্ধ্যা হয়ে আসত, সূর্য অস্ত যাবে তখন দুজনে বলত এবার ঝগড়াটা এখানে ধামা চাপা দেওয়া থাকল, কাল সকালে এখান থেকে আবার শুরু হবে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের নিজের ধামাটা আবার উল্টে দিত। তার মানে এবার

ঝগড়া শুরু করা হবে। মানুষ সারাদিন কি নিয়ে থাকবে। সীতাকেও কিছু নিয়ে থাকতে হবে, রান্নাবান্না করতে হত না। কারণ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ এনারা হলেন বনচারী, রান্নাবান্না হবে না, ফলমূল খেতে হচ্ছে। রান্না করলে বাসন ধুতে হবে সেই ঝামেলাও নেই, সারাদিন করবে কি! সেইজন্য এখন দরকার সোনার হরিণ। সোনার হরিণকে আদর করবে, তার সাথে খেলা করবে। সময় কাটানো সব মানুষের কাছে খুব সমস্যা। যাই হোক, শ্রীরামচন্দ্র এবার হরিণ ধরতে যাবেন। লক্ষ্মণকে বলছেন, দেখো আমি তো হরিণ ধরার জন্য যাচ্ছি, এদিকে তুমি সীতার রক্ষা করতে থাক, কারণ চারিদিকে সব ভয়ঙ্কর সব রাক্ষস ও জানোয়ার আছে। তুমি সীতাকে নিয়ে খুব সাবধানে থেকো। তখন লক্ষ্মণ বলছেন –

লক্ষ্মণো রামমাহেদং দেবায়াং মৃগরূপদৃক্।
মারীচোহত্র ন সন্দেহ এবম্ভূতো মৃগঃ কুতঃ।৩/৭/৯

লক্ষ্মণ বলছেন, হে রাম! এই ধরণের বিচিত্র হরিণ কখন হয় না। মারীচ অনেক রকম রূপ ধারণ করতে পারে, এটা সেই কিনা কে জানে! এই হরিণ আর কোথা থেকে আসবে, হরিণকে ধরার জন্য আপনার না যাওয়াই ভালো। এগুলোকে বলে খটকা, কোথাও একটা সন্দেহ এসে গেছে। ঠাকুর বলছেন, কলিযুগে দৈববাণী হয় না, ভগবান পাগলের মুখ দিয়ে বা বাচ্চার মুখ দিয়ে যা বলার বলে দেন। আমরাও যখন কোন কাজে যাই, সেই সময় অনেক কিছু থেকে আমরা সাবধান হয়ে যাই, বেড়াল রাস্তা কেটে দিল, কেউ হাঁচি দিল, আমাদের মনে একটা খটকা আসে, তখন সচেতন হয়ে যাই। মুশকিল হল, সারাদিনই কত কিছু হচ্ছে, কোনটাকে মানব আর কোনটাকে মানব না এসব ভাবতে গেলে কাজ করাই মুশকিল হয়ে যায়। অঘটন কিছু হয়ে গেলে আমরা পেছনের দিকে তাকাই আর হিসাব কষতে শুরু করি, ও আমাকে নিষেধ করেছিল, এই এই জিনিস হয়েছিল ইত্যাদি। সারাদিনই কিছু না কিছু হচ্ছে, যখন কিছু হয় না তখন এগুলোকে খেয়াল করি না। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন –

যদি মারীচ এবায়ং তদা হন্মি ন সংশয়ঃ।
মৃগশেচদানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহে তবে।৩/৭/১০

হে লক্ষ্মণ, যদি মারীচ এই হরিণের রূপ ধারণ করে এসে থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই আজ একে নাশ করে দেব। যদি না হয় তাহলে সীতার মনোরঞ্জনের জন্য এই হরিণকে নিয়ে আসা যাবে। আমার বেশি সময় লাগবে না, আমি এক্ষুণি হরিণকে বদ্ধ করে নিয়ে আসছি, তুমি ততক্ষণ সীতাকে লক্ষ্য রাখ আর যতক্ষণ আমি না আসছি ততক্ষণ খুব সাবধানে থাকবে। এরপর বারো নম্বর শ্লোকে খুব উচ্চ দর্শনের কথা বলছেন –

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রামো মায়ামৃগমনুদ্রুতঃ।
মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ।৩/৭/১২

যে মায়া ভগবানকে আশ্রয় করে থাকে সেই মায়ার পেছনেই ভগবান মায়ামৃগকে বদ্ধ করার জন্য ধাওয়া করেছেন। এটাই লীলা, তিনি সব কিছুই জানেন, কখনই এক্ষণের জন্য তাঁর জ্ঞান কমে যাবে তা হয় না, জ্ঞান সব সময়ই তাঁর জাগ্রত। আগেকার দিনে একজন স্ত্রী সব সময়ই পুরুষের উপর আশ্রিত থাকত, অথচ পুরুষ সেই স্ত্রীর পেছনে দৌড়াচ্ছে। আরও আশ্চর্যের যে একজন নারীর কাছে মার খাওয়ার পরেও সে অন্য এক নারীর পেছনে দৌড়ায়। শুধু স্ত্রী নয়, যে কোন জিনিস যে তাকে আশ্রয় করে আছে সে তারই পেছনে দৌড়াতে থাকে। এটাই মায়া। যিনি জগৎ মোহিনী মায়া সৃষ্টি করেছেন, সেই মায়া সব সময়ই তাঁর স্রষ্টা অর্থাৎ ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, অথচ ভগবান সেই মায়ার পেছনে দৌড়াচ্ছেন, এর থেকে আশ্চর্যের আর কি হতে পারে। আরও বলছেন –

নির্বিকারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোহপি মৃগমন্বগাৎ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানিতি পতাং বচো হরিঃ।৩/৭/১৩

ভগবান কে? *ভক্তানুকম্পী*, অনুকম্পা মানে হয় ভালোবাসা, যিনি ভক্তকে ভালোবাসেন, ভক্তের উপর যাঁর অনুকম্পা থাকে, যিনি ভক্তবৎসল তাঁকেই ভগবান বলা হয়। ধর্মের ইতিহাস যদি খুব ভালো করে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে ভগবানের বা অবতারের এটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। আমরা সব সময় বলি অবতারের কাজ ধর্ম রক্ষণ, গীতাতেও তাই আছে। কিন্তু সাধুপুরুষ আর তাঁর যে নিরাকার ভগবান, এনাদের মূল চরিত্রই হল অনুকম্পা। বলা হয় যে, যে কোন সাধুর হৃদয় অত্যন্ত কোমল হয়। একটা নামকরা দোঁহা আছে, মাখন খুব নরম, আগুন দেখাতেই

সে গলে যায় কিন্তু সাধুর হৃদয় মাখনের থেকেও নরম। সাধু যদি কঠোর হয় তাহলে তাঁর কিছু গোলমাল আছে। একজন সাধক সাধনা করার জন্য কোন গ্রামে গেছেন। গ্রামের এক গরীব বুড়ি সাধনা করার জন্য কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তাকে একটা কুঁড়ে ঘর করে দিয়েছে। সেই কুঁড়ে ঘরে তিনি পনের কুড়ি বছর সাধন ভজন করেছেন। গরীব বুড়ির মনে হল, একবার পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাক, আমি যাকে কুড়ি বছর খাওয়া-পড়া দিয়ে রেখেছি এতদিনে সে সাধনায় কিছু উন্নতি করেছে কিনা। গ্রামে এক নর্তকী ছিল, তাকে সেখানে পাঠিয়েছে। মেয়েটি সেই সাধকের কোলে গিয়ে বসে বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি। সাধক খুব রেগে মেয়েটিকে সেখান থেকে একেবারে ভাগিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এসে বলছে, উনি খুব ভালো সাধু, আমি তার মন ভোলানোর অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাকে ওখান থেকে বার করে দিলেন। বুড়ি শুনে বলছে, কী বলছ! তোমাকে ভাগিয়ে দিল, তাহলে এতদিন আমি খাইয়ে পড়িয়ে একজন ভুল লোককে রেখেছি। কুড়ি বছর সাধনা করার পরেও তার ভেতরে একটু অনুকম্পা জাগলো না! তোমাকে একটু মিষ্টি করে বোঝাতে পারল না, তোমার মন থেকে এই জিনিসটাকে সরাতে পারল না! আজকেই আমি ওখান থেকে আমি বার করে দিচ্ছি, তোমার দ্বারা সাধন ভজন হবে না।

দুটো জিনিস একটা passion আরেকটা compassion। Passion মানে হয় যেখানে নানান রকমের emotion জড়িয়ে আছে, নানান রকমের emotionএর মধ্যেই মানুষ ডুবে থাকে। সাধন ভজনের সময় passion থেকে বেরিয়ে আসতে হয়, কিন্তু বেরিয়ে এসে তাকে compassionএ প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। যদি একজনের ভেতরে করুণা বা অনুকম্পা না এসে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ওর সাধন ভজন এখনও হয়নি। Compassion যদি ভেতরে না এসে থাকে তাহলে এখনও সে passionএর এলাকায় পড়ে আছে। হয় সে passionকে ভালোবাসছে আর তা না হলে passion থেকে পালাচ্ছে। Passion থেকে পালানোও একই জিনিস, passionএর প্রতি এখনও দুর্বলতা আছে বলেই পালাচ্ছে। আচার্য শঙ্কর গীতার সম্বন্ধ ভাষ্যে বলছেন *স্বপ্রয়োজনাভাবেহপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া*, তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন নেই, শুধু মানুষকে ভালোবাসেন, সেইজন্যই ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করেন। ভগবান বুদ্ধ সিদ্ধি পাওয়ার পর দেখছেন আমার যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, জ্ঞান হয়ে গেছে, সেই সময় তাঁর মনে সমস্ত জগতের জন্য করুণা জেগে উঠল, এই জ্ঞান সবাইকে দিতে হবে। তখন মাড়, মায়া এসে ভগবান বুদ্ধকে বোঝাচ্ছে, তুমি তো জ্ঞান পেয়ে গেছ অপরের জন্য এই জীবন রাখার আর কি দরকার। ক্ষণিকের জন্য মাড়ের কথা ভগবান বুদ্ধ শুনলেন, কিন্তু জগতের প্রতি অনুকম্পা এত তীব্র ভাবে তাঁকে নাড়া দিল যে তিনি জগতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নেমে পড়লেন। ভগবান যীশুর জীবনটাই ছিল ভালোবাসার জীবন। যাঁদের আমরা অবতার বলে জানি সবারই চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল অনুকম্পা। মায়েদের সন্তানের প্রতি কি প্রচণ্ড করুণা, এই করুণা বাংলা করুণা, এটাকে বলে মায়া। সংস্কৃতের করুণা মানে ভালোবাসা, যাতে সবার মঙ্গল হয়। ভালোবাসা যখন সবার প্রতি হয়ে যায়, যে ভালোবাসায় পর, অপর, আমি, তুমি এই ধরণের কোন বিভেদ নেই তখন তাকে বলে দয়া। দয়া যখন আসে তখন এটাই করুণা হয়ে যায়, নিজের ব্যক্তিত্বের বিস্তার হয়ে যায়।

ভগবান হলেন ভক্তানুকম্পী, ভক্তের প্রতি অনুকম্পা, তা না হলে, *নির্বিকারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোহপি মৃগমন্বগাৎ*, ভগবান নির্বিকার, যাঁর মনে কোন বিকার হয় না, যিনি চিদাত্মা, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, যাঁর এসবের সাথে কোন সম্পর্কই নেই আর যিনি সদা পূর্ণ, পূর্ণ মানে যেখানে কোন অজ্ঞানতা নেই, কোথাও কোন দুর্বলতা নেই তিনি কেন একটা হরিণের পেছনে দৌড়াতে যাবেন! অপূর্ণ যারা তারাই কাজ করে। যখনই অবিদ্যা, অজ্ঞান এসে যায় তখন সে মনে করে আমি অপূর্ণ আমি পূর্ণ হব। যার মনে যত অপূর্ণতার ভাব সে তত বেশি কাজ করে। অপূর্ণতাকে দূর করার জন্য কাজ দরকার। যে মনে করছে আমার টাকার অভাব, তার মানে সে অপূর্ণ, তখন সে টাকা অর্জন করার জন্য কাজ করে। একটা ছেলে মনে করছে স্ত্রী না হলে আমি অপূর্ণ, বাবা মনে করছে আমার মেয়ের বিয়ে না হলে মেয়ে অপূর্ণ, মেয়েও মনে করে যতক্ষণ আমি একটা বর না পাই ততক্ষণ আমি অপূর্ণ। অপূর্ণ ভাব সব সময় আসে অজ্ঞানের জন্য, আমার নিজের যে স্বরূপ সেই স্বরূপ জানা নেই বলে অপূর্ণতা। আমরা জাগতিক জিনিসকে নিয়ে ভেবে যাচ্ছি। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ের পর থেকেই আবার অশান্তি শুরু, এবার তার দরকার দামী দামী গয়না, ভালো ভালো শাড়ি, সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাট। আসল যে অপূর্ণতা তার একমাত্র মূল হল নিজের স্বরূপজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানের অভাব। দু মাসের শিশু যখন কাঁদে তখন আমরা সত্যিই জানি না সে কেন কাঁদছে, কত রকমের সমস্যা তার হতে পারে। মা কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তার বাচ্চা কেন কাঁদছে, এখন খিদে পেয়েছে তাই কাঁদছে, এখন ঘুমোবার জন্য কাঁদছে, এটা ব্যাথা পাওয়ার কান্না। আবার অনেক সময় ভেতরে কোন

কষ্ট থাকার জন্য কাঁদে, তখন মাও বুঝতে পারে না, ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়, ডাক্তাররা তখন হিসেব করে বলে দেন কিসের কান্না। মা হলেন ঠিক ঠিক ব্যক্তি যে বাচ্চার কান্না বুঝতে পারে। ঠিক তেমনি গুরু তিনি বোঝেন আমার শিষ্যের ছটফটানি কেন হচ্ছে। কত কিছুতে আমাদের অপূর্ণতা, একটা অপূর্ণতা মেটাতে মেটাতে আরেকটা অপূর্ণতা এসে যাচ্ছে। এই হিমালয়ে বেড়াতে চলে যাচ্ছে, আবার রামেশ্বরম্ কন্যাকুমারী চলে যাচ্ছে, অপূর্ণতার জন্যই মানুষ কাজ করে। কাজ করতে গিয়ে যে জিনিসগুলো সে জানত না, অন্য অন্য অপূর্ণতাকেও জেনে যায়। মনে করছে দুটো টাকা হয়ে গেলে শান্ত হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয় না। টাকা অর্জন করতে গিয়ে অনেক ধরণের লোকেদের সংস্পর্শে আসছে। তাদের সব কিছুই আলাদা, খাওয়া-দাওয়া, সাজপোশাক সবই আলাদা। এদের সব কিছু দেখে নতুন করে আবার অপূর্ণতা এসে গেল। সেখান থেকে হতে হতে এবার এলিট ক্লাশের লোকেদের, যাদের দু চার হাজার কোটি টাকার সম্পতি আছে তাদের সংস্পর্শে এসে গেল, তখন দেখছে পুরো জীবনটাই আলাদা, সেখান থেকে আরও উপরে যখন চলে গেল তখন বলছে, আমি সাধারণ লোকেদের সাথে এ্যারোপ্লেনে যেতে পারব না, আমার নিজের একটা এ্যারোপ্লেন দরকার। এই ভাবে অপূর্ণতা বাড়তেই থাকে। সেইজন্য বলে, অগ্নিত যদি ঘি দেওয়া হয় অগ্নি তাতে স্তিমিত হয় না, আরও জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি অপূর্ণতাকে যত জাগতিক জিনিস দিয়ে মেটাতে থাকে তত অপূর্ণতা বাড়তে থাকে। পূর্ণতা থাকে একমাত্র ভগবানের, আর ভগবানের সাধক যাঁরা তাঁরা সব সময় এই পূর্ণতাকে নিজের উপর আরোপ করেন। নিজেকে সব সময় তিনি মনে করেন আমি পূর্ণকাম, আমার মনে কোন ধরণের কামনা-বাসনা নেই। আর আমার আশেপাশে অপূর্ণকাম যারা তাদের জীবনে পূর্ণতা আনার জন্য আমি সর্বদা চেষ্টা করব। আমি যা কিছু করব তা সব সময় অপরের অপূর্ণতা দূর করার জন্য। নিজে যদি পূর্ণকাম না হয় তাহলে অন্ধ অন্ধকে পথ দেখার মত অবস্থা হয়ে যাবে। ভগবান হলেন চিদাত্মা, নির্বিকার, পূর্ণোহপি, সব দিক দিয়ে তিনি পূর্ণকাম। যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি সব কিছুই জানেন তাও তিনি কাজ করছেন। কেন করেন? ভক্তের প্রতি অনুকম্পার জন্য, ভক্তের কোন ইচ্ছাকেই তিনি অপূর্ণ রাখতে চান না।

হিরণ ম্যাক্সিন ছিলেন একজন নামকরা বিজ্ঞানী, তিনি মেশিনগান আবিষ্কার করেছিলেন। পরে রাশিয়ান এক বিজ্ঞানী মেশিনগানের মডেল অনুকরণ করে একে৪৭ বার করেছিলেন। কিন্তু মেশিনগান মেশিনগানই, মেশিনগানের কোন দিন রিপ্লাসমেন্ট হবে না, মেশিনগানের টেকনোলজি সাংঘাতিক ব্যাপার। হিরণ ম্যাক্সিনের সাথে স্বামীজীর দেখা হয়েছিল। হিরণ ম্যাক্সিন সত্যিকারের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। পরে তাঁর ছেলে বাবার স্মৃতিকথা লিখেছিলেন। তাঁর জীবনের ছোটখাট এমন এমন ঘটনা ছিল যেগুলো পড়তে খুব মজা লাগে। এই রকম একটা ঘটনা আছে যেটা দিয়ে দেখাচ্ছেন সত্যিকারের পিতৃস্নেহ কাকে বলে। এই ছেলেই স্বামীজীকে বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। হিরণ ম্যাক্সিনের ছেলে যখন খুব ছোট ছিল সেই সময় একদিন পাড়ার এক দোকানে গিয়ে দোকানের মালিকের কোলে একটা ছোট্ট সুন্দর কুকুরের বাচ্চা দেখেছিল। ছেলেটির ইচ্ছে হল আমিও এই রকম একটা কুকুরের বাচ্চা পুষব। ছেলেটি দোকানদারকে গিয়ে বলল আমাকে একটা কুকুরের বাচ্চা দেবে। দোকানদার বলল, হ্যাঁ দেব, যদি তুমি একটা এক ডলারের কয়েন নিয়ে আস যার দু দিকেই হেড আছে। বাচ্চা ছেলে, খুব খুশি, পাপ্পিকে পাওয়ার খুব সহজ পথ পাওয়া গেছে। বাড়িতে এসে মাকে বলছে, মা আমাকে একটা টাকা দাও যার দু দিকে হেড আছে। মা আবার একেবারে অন্য ধরণের মহিলা ছিলেন, প্রচণ্ড প্রাচীনপন্থী, কখন হাসাহাসি করতেন না, অন্য দিকে আবার গোঁড়া খ্রীশ্চান। ছেলের কথা শুনে উনি বাচ্চাকে খুব বকে দিলেন, ও রকম জিনিস কখন হয় না। ছেলের বয়স তখন পাঁচ ছয় বছর হবে। সন্ধ্যেবেলা বাবা বাড়ি আসতেই বাবাকে বলেছে, বাবা তোমার কাছে এক টাকার কয়েন আছে যার দু দিকে হেড? হিরণ ম্যাক্সিন বললেন, দাঁড়াও দেখছি আছে কিনা। পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা বার করে ছেলের সামনেই দেখলেন, দেখছেন একটাও দু দিকে হেড দেওয়া কয়েন নেই। ছেলে বলল, মা বলছে যে এ রকম কয়েন নাকি হয় না। বাবা বুঝিয়ে দিল, মা তো সব জানে না। আজকে নেই, ঠিক আছে কালকে দেখব। আগামী দিনের অপেক্ষায় বাচ্চাটির আর রাত্রে ঘুম আসছে না। আগামী দিন বাবা হিরণ ম্যাক্সিন কাজ থেকে আবার ফিরে এসেছেন। ছেলে দৌড়ে এসে আবার জিজ্ঞেস করেছে, বাবা! বাবা! দেখ তো আজকে আছে কিনা। হিরণ ম্যাক্সিন পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরা পয়সাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলেন, এই তো একটা কয়েন আছে। ভদ্রলোক ছেলেকে খুশি করার জন্য লেদ মেশিনে দুটো কয়েনকে মাঝখান দিয়ে চিড়ে দিয়েছেন, দুটো হেডকে এবার ডেনড্রাইট জাতীয় আঠা দিয়ে সেটে দিয়ে একটা সিঙ্গল কয়েন তৈরী করলেন যার দু দিকেই হেড। ছেলে তো খুব খুশি, বাবাকে নিয়ে দৌড়ে দোকানে গেছে।

দোকানদারকে গিয়ে বলেছেন, আপনি বলেছেন দু দিকে হেড দেওয়া কয়েন দিলে কুকুরের বাচ্চা দেবেন, এই নিন সেই কয়েন। দোকানদার হাতে নিয়ে কয়েনটাকে দেখেই তার মাথা ঘুরে গেছে। তখন দোকানদার বলছে, আমি তো কুকুরের বাচ্চাটা বিক্রি করব না, ওকে ফেরানোর জন্যই এই রকম বলে ছিলাম। হিরণ ম্যাক্সিন খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, এই রকম অন্যায় কাজ আর করবেন না, না দেওয়ার থাকলে সরাসরি বলে দেবেন, এভাবে একটা বাচ্চার মনে আশা তৈরী করবেন না। এই হল পিতৃস্নেহ।

ঈশ্বর, ভগবান, নারায়ণ তাঁরও ঠিক এই স্নেহ, ভক্তের প্রতি অনুকম্পা। তাঁর যে একটা সাময়িক বিস্মৃতি হয়ে গেছে তা নয়। আমাদের সাময়িক বিস্মৃতি হয়, যাকে ভালোবাসি সে যদি আমার ক্ষতি করে দুঃখ পাই, তার ভালোবাসাটা ভুলে যাই, আবার যখন ভালোবেসে সামনে আসে তখন আমরা তার অপমানের কথা ভুলে যাই, এই সাময়িক বিস্মৃতি ভগবানের নেই। কারণ তিনি চিদাত্মা, তিনি শুদ্ধ চৈতন্য কখনই তাঁর বিস্মৃতি হয় না। অথচ তিনি মায়ামৃগের পেছনে দৌড়াচ্ছেন। কেন দৌড়াচ্ছেন। হিরণ ম্যাক্সিন কি জানেন না দু দিকে হেড দেওয়া কয়েন হয় না, কিন্তু ছেলেকে একবারও বলছেন না। এই যে বলা হয় সত্যি কথা বলতে হয়, তাহলে হিরণ ম্যাক্সিন কি মিথ্যাবাদী? প্রশ্নই হয় না। যিনি স্বামীজীর লেকচার শুনেছেন, শুনে স্বামীজীকে বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করেছেন, আর স্বামীজীও সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ওনার সাথে দেখা করলেন, সেই লোক কত উচ্চমানের ভাবা যায়! আমেরিকার মত জায়গায় স্বামীজীকে বাড়িতে চায়ের আমন্ত্রণ করেছিলেন। অথচ সন্তানকে খুশি করার জন্য কত দূর চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার বলছেন –

কর্তুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ।
অন্যথা পূর্ণকামস্য রামস্য বিতিতাত্মনঃ।৩/৭/১৪

অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই সমস্যা। আগে বলে দিলেন সীতার ছায়া, তার মানে এখন সবটাই লীলা। কিন্তু পরে যে ইমোশানগুলো আনছেন সেখানে আর আগের কথার সাথে মিলিয়ে জমাতে পারছেন না। যেখানে সীতাকে ছায়া বলে দিয়েছেন, ছায়াকে ওখানেই ফেলে দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ছায়া কায়া সমান, যারা জন্য বড়দের ছায়া পা দিয়ে মাড়িয়ে আমরা যাই না। শ্রীমাও বলছেন, ছায়া কায়া সমান। এখন আমাদের কায়াকে নিয়েই চলতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র জানেন এই ধরণের হরিণ হয় না, আর যিনি পূর্ণকাম, সবটাই তাঁর জানা কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন তিনি সীতার মন রাখার জন্য, সীতাকে খুশি করার জন্য মায়ামৃগের পেছনে দৌড়াতে যাবেন?

মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাত্মনঃ।
কদাচিদ্দৃশ্যতেঽভ্যাসে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে।৩/৭/১৫

যিনি পরমাত্মা তাঁর মৃগেই বা কি প্রয়োজন আর স্ত্রীতেই বা কি প্রয়োজন। না আছে তাঁর স্বর্ণমৃগের পেছনে দৌড়ানর কারণ, না আছে কোন মেয়ের কথায় ওঠবোস করার কারণ। আচার্য অবতারত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাষ্যে বারবার বলছেন জ্ঞানে যিনি সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। কোন জ্ঞানে? আত্মজ্ঞানে। তিনি পরমাত্মা এই জ্ঞান তাঁর সব সময় আছে। এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য তুলসীদাস একটা কাহিনী নিয়ে আসছেন। শিবের ঘরণী উমা সীতার রূপ ধারণ করে এসেছেন শ্রীরামচন্দ্রের পরীক্ষা নিতে। শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পেরেছেন যে ইনি দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরণী উমা। সীতার বেশে উমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করছেন, বলুন! কৈলাসে শিব ঠিকঠাক আছেন তো? এখানে কাহিনীটা বড় নয়, ঐ আইডিয়াকে নিয়ে আসা হচ্ছে, যিনি ভগবান তাঁর জ্ঞান কখনই চলে যাবে না। আমেরিকাতে স্বামীজীর কয়েকজন শিষ্য স্বামীজীর উপর খুব ভরসা করে চলতেন। একবার জিজ্ঞেস করাতে স্বামীজী বলছেন, আমার যারা শিষ্য এদের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবটাই আমি জানি, তাও আমি এভাবে যাচ্ছি। স্বামীজীর এই উক্তিটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ঠাকুর বলছেন, আমার সামনে কেউ এলে কাঁচের আলমারির মধ্যে সব জিনিস যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনি আমি সব জানতে পারি। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, বলো না বাপু, সত্যি কথা বলা কি আমার ছুঁচিবাঈ হয়ে গেল, যদি বলি খাবো না, খিদে পেয়ে থাকলেও আমি আর খেতে পারবো না। আর সঞ্চয় এমন শৌচের পর হাতে মাটি পর্যন্ত নেওয়ারও জো নেই। এখন না হয় বাথরুমে নানা রকম সোপ থাকে সেখান থেকে শৌচের কাজ চলে যায়। কিন্তু আগেকার দিনে মাঠে ঘাটে প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি করে মাটি নিয়ে সেখান থেকে দূরে জলের কাছে যেতে হত। ঠাকুর বলছেন ঐটুকু সময়ের জন্যও মাটি নেওয়ার পর্যন্ত জো নেই। যিনি শৌচের জন্য হাতে মাটি নিতে পারছেন না, যিনি বলছেন, আমার একি ছুঁচিবাঈ

হল যদি বলে দিই খাবো না, পেটে খিদে থাকলেও খাওয়া হয় না, তিনি আবার বলছেন, ওরে নরেন! তোর জন্য আমি লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে পারি। ঠাকুর কলকাতায় যাবেন, দক্ষিণেশ্বরে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ নরেন এসে হাজির। ঠাকুর বলছেন নরেন এসেছে আর কি কলকাতায় যাওয়া যায়! তার মানে ঠাকুর সত্যকে অতিক্রম করছেন, নরেনের জন্য তিনি আবার ত্যাগকেও অতিক্রম করছেন, কারুর কাছে চাইতে হয়নি ঠিকই, মুখে বলছেন, বলা মানেই তো করা হয়ে গেল। কারণ তিনি হলেন ভক্তানুকম্পী। আমাদের মন এতই জাগতিক সম্পন্ন যে আমরা সব সময় শ্রীরামচন্দ্র আর সীতাকে ভাবছি স্বামী-স্ত্রী। ঠাকুর আর মা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়, গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। নরেন যেমন একজন উচ্চকোটির শিষ্য, শ্রীমাও একজন উচ্চকোটির শিষ্যা। উচ্চকোটির শিষ্য আর গুরুর মধ্যে আমি তুমি আলাদা এই বোধ থাকে না। *মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি*, যিনি পরমাত্মা তাঁর কাছে হরিণই বা কি, হরিণ বলতে এখানে কাঞ্চন বোঝাচ্ছে, আর নারীই বা কি, নারী মানে কামিনী। শুধু কামিনী-কাঞ্চনই নয়, কোন কিছুর সাথে পরমাত্মার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ তিনি স্ত্রীর কথায় সেই হরিণের পেছনেই ধাবিত হচ্ছেন। আর সেই হরিণও এই চোখের সামনে আসছে, একটু দেখা দিয়েই আবার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে, মায়াবীর মত শ্রীরাচন্দ্রকে দৌড় করিয়ে যাচ্ছে। মরীচিকাতেও ঠিক তাই হয়, এই দেখা যাচ্ছে, এগিয়ে গিয়ে দেখছে কিছুই নেই। যিনি পরমাত্মা তিনি নিজের ইচ্ছাতেই হোক বা কাউকে ভালোবাসেন তাঁর ইচ্ছা পুর্তি করার জন্যই হোক, মায়াবী হরিণ তাঁকে দৌড় করিয়ে অনেক দূরে টেনে নিয়ে এসেছে।

মারীচ, যদিও আগে রাবণকে বলেছে আমি শ্রীরামকে ভয় করি, কিন্তু জাতিতে অসুর কিনা তাই তার মনে কোথাও একটা বদলা নেওয়ার ইচ্ছা থেকে গিয়েছিল। কারণ মারীচের পক্ষে ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার খুব সহজ পথ ছিল, সরাসরি এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলে দেওয়া যে রাবণ আমাকে এই এই মতলবে পাঠিয়েছে, আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করুন। কিন্তু কোথাও তার মনে একটা বদলা নেওয়ার সঙ্কল্প থেকে গিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবছেন এ নির্ঘাৎ রাক্ষস। তখন আর ধরাধরির ব্যাপার নেই, শ্রীরামচন্দ্র একটা বাণ বার করে হরিণের দিকে নিক্ষেপ করে দিয়েছেন। বাণ গিয়ে হরিণকে বিদ্ধ করতেই মারীচ তার নকল হরিণ শরীর ছেড়ে আসল রাক্ষসের শরীর ধারণ করে নিয়েছে। বলা হয় যে, রাক্ষসরা নানান রকমের রূপ ধারণ করতে পারত। মারীচ এমন বদমাইস যে তীরবিদ্ধ হয়ে সে মরতে যাচ্ছে তখনও সে ছাড়ছে না, শ্রীরামচন্দ্রের গলা নকল করে জোরে জোরে প্রলাপ করে বলছে –

হা হতোঽস্মি মহাবাহো ত্রাহি লক্ষ্মণ মাং দ্রুতম্।৩/৭/১৮

হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! আমি মারা যাচ্ছি শীঘ্র আমাকে বাঁচাও। আমরা শুনে আসছি যে মানুষ মৃত্যুর সময় নাকি মিথ্যা কথা বলে না, বদমাইসি করে না। ইদানিং কালে সুপ্রিম কোর্টও বলে দিয়েছে, জবানবন্দি মৃত্যুর সময় হলেই যে সত্য হবে তা নয়, ঐ বক্তব্যকেও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মারীচ এমনই বদমাইস যে মৃত্যুর সময়েও সে চালাকি করে যাচ্ছে, শ্রীরামের গলা নকল করে বলছে, হে লক্ষ্মণ! তুমি আমাক বাঁচাও আমি মরে যাচ্ছি। কিন্তু এমনই রামনামের মাহাত্ম্য যে শ্রীরামের নাম যদি কেউ মৃত্যুর সময়ও উচ্চারণ করে তাতেও সে মুক্ত হয়ে যায়। মারীচ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে মারা গেছে। অনন্তর মারীচের দেহ থেকে একটা তেজ বেরিয়ে এসে শ্রীরামের শরীরে প্রবেশ করে গেল। দেবতারা এই দৃশ্য দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যে লোক এত ঋষি মুনিদের বধ করেছে, রাক্ষস যোনির সেই লোকেরও এই পরম গতি হয়ে গেল! তবে এর আগে শ্রীরামচন্দ্রের বাণে বিদ্ধ হয়ে ভয়ে সব রকম সাংসারিক কার্যাদি ভুলে সর্বদা হৃদয়ে শ্রীরামকে ধ্যান করতে করতে নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন সে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে মারা গেল, সে যে মুক্তি পাবে এতে আর আশ্চর্যের কী!

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকেঽপিবা।
ত্যজন কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্।৩/৭/২৪

ব্রাহ্মণ হোক, রাক্ষস হোক, পাপী হোক বা ধার্মিকই হোক রামনাম স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করলে অবশ্যই তার মুক্তি লাভ হবে। গীতাতেও বলছেন, মৃত্যুর সময় যা চিন্তা করবে সে সেই রকম গতিই লাভ করবে। তখন শ্রীরাম বলছেন, এই অধম মৃত্যুকালে আমারা গলা নকল করে হা লক্ষ্মণ হা লক্ষ্মণ বলতে বলতে মারা গেছে, ঐদিকে সীতা আমার কণ্ঠস্বর শুনে কিছু না বুঝেই কতই না উদ্বিগ্ন হয়ে যাবে। ঠিক তাই হল। সীতা মারীচের ঐ আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়ে গেছে, খুব দুঃখিত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, হে লক্ষ্মণ তুমি এক্ষুণি যাও,

দাদাকে দেখ তাঁর কি বিপদ হল। লক্ষ্মণ তখন বলছেন, দেবি! এই বাক্য কখনই শ্রীরামচন্দ্রের নয়, কোন রাক্ষস মৃত্যুকালে এই কথা বলছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে গেলে ক্ষণিকের মধ্যে ত্রিলোকের বিনাশ করে দিতে পারেন, সেই দেবপূজিত শ্রীরামচন্দ্র কেন এই রকম কাতর বাক্য বলতে যাবেন? শ্রীরামচন্দ্র যদি মরেও যেতে থাকেন তখনও তিনি আর্তস্বরে ক্রন্দন করবেন না। আলেকজাণ্ডারের কাছে যখন পুরুকে পরাস্ত করে বেঁধে আনা হয়েছে তখন আলেকজাণ্ডার পুরুকে জিজ্ঞেস করছে তুমি আমার থেকে কি রকম ব্যবহার প্রত্যাশা কর। তখন পুরু বলছে এক রাজা আরেক রাজার কাছে থেকে যেমন প্রত্যাশা করে। এই হচ্ছে শক্তির পরিচয়, ভেতরে যার শক্তি আছে সে কখনই আর্তস্বরে দীন ভাবে কথা বলবে না। আর্ত যে হয়েছে বুঝতে হবে ভেতরে তার শক্তির অভাব। মনে করা যাক শ্রীরাম রাক্ষসের হাতে মারা যাচ্ছেন আর তিনি লক্ষ্মণকে খবর দিতে চাইছেন, সেখানেও তাঁর গলার স্বর অন্য রকম হবে, দীন ভাব, কাতর ভাব থাকবে না, তখনও বলার সময় কণ্ঠস্বরে তেজ থাকবে।

কিন্তু সীতা লক্ষ্মণের কথা বুঝতেই চাইছেন না, তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। ভয় পাওয়ারই কথা, যাঁকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন চলছে, তাঁর এই রকম কাতর কণ্ঠস্বর শুনছেন। সীতা বলছেন, হে লক্ষ্মণ! তোমার নিশ্চয় দুর্বুদ্ধি হয়েছে, তুমি শ্রীরামের নাশ চাইছ, ভরতই কায়দা করে তোমাকে পাঠিয়েছে, আসলে তুমি রামবিনাশ অভিলাষী। এই জিনিসগুলো বাল্মীকি রামায়ণ থেকে নেওয়ার জন্য অধ্যাত্ম রামায়ণের দৃষ্টিতে মেলাতে গেলে অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। সীতার এগুলো প্রলাপ, কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এই ধরণের প্রলাপ কোন ভাবেই খাপ খায় না। সীতা আরও বলছেন, তোমার মনে দুরভসন্ধি রয়েছে, শ্রীরামের নাশ হয়ে গেলে তুমি আমাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু জানবে আমি রাম ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করব না। এইসব বলে সীতা কান্নাকাটি করে বুক চাপড়াচ্ছেন। তখন লক্ষ্মণ খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন –

মামেবং ভাষসে চণ্ডি ধিক্ ত্বাং নাশমুতৈষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা বনদেবীভ্যঃ সমর্প্য জনকাত্মজাম্।৩/৭/৩৬

কুপিত নারীকে চণ্ডী বলে, লক্ষ্মণ তাই বলছেন, হে চণ্ডী! তোমাকে ধিক্ তুমি আমাকে এই রকম কথা বলছ, তোমার মনের মধ্যে এই ধরণের ভাব রেখেছ। তোমার এই বুদ্ধিভ্রংশই কোন অনিষ্টপাতের কারণ হয়ে উঠবে। এই ধরণের কথা বলে তুমি খুব অন্যায় করছ। লক্ষ্মণের আর করারও কিছু নেই, তিনি বনের যে দেবতারা আছেন তাঁদের কাছে সীতাকে সমর্পণ করে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এরপরই রাবণ ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে সীতার কুঠিয়াতে পৌঁছে গেল। ভিক্ষু দেখে সীতা তাকে প্রণাম করলেন, প্রণাম করে বললেন, আপনি এখন এই ফলটুকু আহার করুন, আমার স্বামী বিশেষ কাছে জঙ্গলে গেছেন, তিনি ফিরে এলে আপনার বিশেষ ভাবে সৎকার করবেন। রাবণ সীতাকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা জঙ্গলে কেন বাস করছ? সীতা তখন পুরো ঘটনা সংক্ষেপে বললেন।

সীতার সব কথা শোনার পর ভিক্ষুবেশী রাবণ বলছে, আমি পৌলস্ত্য নন্দন রাক্ষসেশ্বর রাবণ। পুলস্ত্য একজন নামকরা ঋষি ছিলেন, সেইজন্য রাবণকে অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণও বলা হয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক তা নয়। রামকথা অনেক লেখা হয়েছে কিনা, যাঁদের যেমন যেমন প্রতিভা ছিল তাঁরা তেমন তেমন ভাবে কাহিনীকে নিজেদের মত সাজিয়ে দিয়েছেন। পুলস্ত্য একজন বিরাট ঋষি ছিলেন। ঋষি যিনি তাঁর মন সব সময় ঈশ্বরেই আছে ঠিকই কিন্তু তাঁরা যে সব সময় ব্রাহ্মণ বংশ থেকে আসতেন তা নয়। বিভিন্ন বংশ থেকেই ঋষিরা এসেছেন, যেমন বলি, প্রহ্লাদরাও ঋষি ছিলেন, কিন্তু এনারা ছিলেন দৈত্য বংশের। ঠিক তেমনি রাবণ হল রাক্ষস বংশের। পুলস্ত্য ঋষি হওয়ার জন্য তাঁকে রাক্ষস বংশেরও বলা যায় না। তবে বলা হয় যে বিস্যস্রবার স্ত্রীর মনে অনেক রকম কামনা বাসনা ছিল, উনি বলেই দিয়েছিলেন যে তোমার পুত্র একটা রাক্ষস হবে। এগুলো সব কাহিনী, কাহিনী বানাতে গেলে অনেক রকম মালমশলা দিতে হয়, এখানেও সেইভাবে বানিয়েছে।

রাবণ তখন বলছে, তুমি এভাবে জঙ্গলে পড়ে আছ, এখানে তুমি কোন সুখই পাবে না শুধু কষ্ট আর কষ্ট। আমি হলাম রাক্ষসরাজ, আমার সাথে চলে এসো, আমার কাছে অনেক সুখে থাকতে পারবে। ঠিক এই একই ভাব মহাভারতেও আসে, পাণ্ডবদের বনবাসের সময় দ্রৌপদীকে একদিন জঙ্গলে একা পেয়ে দুর্যোধনদের ভগ্নিপতি জয়দ্রথ এসে দ্রৌপদীকে সেই একই কথা বলছে, জঙ্গলে থেকে তুমি কেন কষ্ট করছ, এদের ভবিষ্যত তো নষ্ট হয়ে গেছে, তুমি আমার সাথে চলে এসো। যাই হোক রাবণের কথা শুনে খুব ভীতা হয়ে সীতা বলছেন, তুমি

আমাকে এই যে কুবাক্য বলছ রাম তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করে দেবেন। আর তুমি মনে রেখ সিংহের ভার্য্যা সিংহই হয়, বনের সামান্য পশুরা তার অত্যাচার করতে সক্ষম হয় না। এক্ষুণি রামবাণে তুমি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সীতার কথা শুনে রাবণ ক্রোধে প্রচণ্ড অধীর হয়ে গেছে, অধীর হয়ে ভিক্ষুবেশ সরিয়ে রাবণের যে আসল রূপ, সেই বিরাট চেহারা, দশটা মাথা, কুড়িটা হাত, সীতাকে দেখিয়ে দিল। আর তার হাতের যে বড় বড় নখ, সে নখ দিয়ে মাটি বিদীর্ণ করে মাটি শুদ্ধ সীতাকে তুলে রথের মধ্যে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। রাবণ সীতাকে স্পর্শ না করে রথের মধ্যে বসিয়ে দিলেন। এরও একটা প্রেক্ষাপট আছে, রাবণের প্রথম থেকেই নারীদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। রম্ভার সাথে একবার দুর্ব্যবহার করার জন্য কুবেরের পুত্র নলকুবর রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিল, তুমি যদি কোন মেয়ের সাথে এই রকম করতে যাও তাহলে তোমার মাথা শত খণ্ডে বিদির্ণ হয়ে যাবে। রাবণ দেখল নলকুবরের তপস্যার জোর কিছুই না। ওদের থেকে রাবণের তপস্যার জোর অনেক বেশি ছিল। রাবণ নলকুবরের অভিশাপকে গ্রাহ্যই করল না। আরেকবার অন্য এক অপ্সরা একবার ব্রহ্মার কাছে যাচ্ছিল। তাকে দেখে রাবণ বলপূর্বক তার বস্ত্র হরণ করে নিয়েছিল। ব্রহ্মা সব জানতে পেরেছেন, তিনি সবারই স্রষ্টা। ব্রহ্মা সব শুনে খুব রেগে গেলেন। রেগে গিয়ে রাবণকে বলে দিলেন, ভবিষ্যতে যদি আর তুমি কোন নারীকে বলপূর্বক কিছু করতে যাও তোমার শির শত খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে। সেই থেকে রাবণ মেয়েদের জোর করে কিছু করতে খুব ভয় পেয়ে গেল। ব্রহ্মা সবারই পিতামহ, ওনার কথাকে কখনই অবহেলা করা যাবে না। সীতাকে তাই স্পর্শ না করে তার বড় বড় নখ দিয়ে মাটি সমেত তুলে নিয়ে এসে রথে বসিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া অধ্যাত্ম রামায়ণ হল ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্র হওয়ার জন্য সব কিছুতে পবিত্রতার ভাব বজায় রাখা হয়েছে। সীতা হলেন মা, সীতাকে রাবণের মত লোক স্পর্শ করবে, ভক্ত এই জিনিস কখনই চাইবে না। সীতা তখন খুব ভয় বিহ্বল হয়ে উচ্চস্বরে রোদন করতে শুরু করেছেন 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ রক্ষা কর'। সীতার ক্রন্দন ধ্বণি শুনে পাহাড় থেকে পক্ষীকুলের ইন্দ্র জটায়ু ছুটে এসে রাবণকে বলছেন –

শুনকো মন্ত্রপুতং ত্বং পুরোডাশমিবাধ্বরে।৩/৭/৫৫
ইত্যুক্ত্বা তীক্ষ্ণতুণ্ডেন চুর্ণয়ামাস তদ্রথম্।

যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার জন্য এক ধরণের বিশেষ হবিষ্যি তৈরী করা হয়, তাকে বলা হয় পুরোডাশ। পুরোডাশ দেবতাদের প্রাপ্তির জন্য আহুতি দেওয়া হয়। জটায়ু বলছেন, রাস্তার কুকুর যদি পুরোডাশ ভোজনের আশায় যজ্ঞের কাছে চলে যায় তখন সেই কুকুরের কি অবস্থা হবে একবার ভেবে দেখ। তুমি সীতার উপর দৃষ্টিপাত করেছ তোমার যে কি অবস্থা হতে যাচ্ছে তুমি বুঝতে পারছ না। এই বলে জটায়ু চঞ্চু দ্বারা রাবণের রথ চুর্ণ করে দিলেন আর পায়ের নখ দিয়ে অশ্ব ও ধনুকও চুর্ণ করে দিলেন। জটায়ুর এই কাণ্ডে রাবণ খুব রেগে গিয়ে সীতাকে ছেড়ে তলোয়ার বার করে জটায়ুর দুটো ডানা কেটে দিল। এরপর আরেকটা রথে বসিয়ে সীতাকে নিয়ে আকাশমার্গে চলতে লাগল। বিভিন্ন রামকথায় কাহিনীকে বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। এসব জায়গায় কল্পনার জগতে বিচরণ করার অনেক সুযোগ থাকাতে কবিরা বিভিন্ন ভাবে কাহিনীকে দাঁড় করিয়েছেন। সীতাও তখন 'রাম রাম' বলে রোদন করতে করতে বলছেন –

রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব।
হা লক্ষ্মণ মহাভাগ ত্রাহি মামপরাধিনীম্।৩/৭/৬০

হে রাঘব! এই রাক্ষস আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে এর থেকে আমায় রক্ষা করুন। আমি অপরাধী। লক্ষ্মণকে কটুকথা বলে পাঠিয়ে ছিলেন, তাই বলছেন, হে লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেছিলাম, আমি অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করে দাও। সীতা নানান ভাবে ক্রন্দন করে যাচ্ছেন, আর উচ্চস্বরে অনেক কথা বলে যাচ্ছেন, আশা করছেন যদি তাঁর ক্রন্দন শুনে রাম আর লক্ষ্মণ চলে আসেন। কিন্তু রথে করে রাবণ সত্বর সেখানে থেকে সীতাকে নিয়ে আকাশমার্গ দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে সীতা নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছেন পাহাড়ের চূড়ায় পাথরের উপর পাঁচটি বানর বসে আছে। সীতা তখন নিজের সব আভরণ খুলে উত্তরীয়র মধ্যে রেখে পুটলি করে নীচে বানরদের মাঝখানে ফেলে দিলেন। সীতার আশা যে আমার রামের সাথে তোমাদের যদি কখন দেখা হয় তখন রামকে আমার বৃত্তান্ত বলবে। ওখানে সুগ্রীব, হনুমান ও আরও অনেক বানর বসে ছিল, পরে এই কাহিনী আসবে। এরপর রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে অশোককাননে রেখে দিল, বলছেন –

রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ৎ।৩/৭/৬৫

রাবণ লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষসীদের সীতার পাহারাতে নিযুক্ত করে দিল। বলছেন *মাতৃবুদ্ধ্যা*, মা যেমন নিজের সন্তানকে সামলে রাখে, রাক্ষসীরা ঠিক সেই রকম মাতৃভাবে সীতাকে প্রতিপালন করতে লাগল। পুরাণে একটা কাহিনী আছে, জয় আর বিজয় বৈকুণ্ঠলোকের দ্বারপাল, ভগবান বিষ্ণুর রাজমহল পাহারা দেয়। চার কুমার, সনক, সনন্দন, সনৎকুমার আর সনাতন ব্রহ্মার মানসপুত্র, এনারা বাচ্চাদের মত থাকতেন, বস্ত্র পরিধান করতেন না। চারজন একবার ভগবান বিষ্ণুর সাথে দেখা করতে গেছেন। ভগবান বিষ্ণু তখন বিশ্রামে ছিলেন বা লক্ষ্মীর সাথে ছিলেন। জয় বিজয় চারজন কুমারকে আটকে দিয়েছে। কুমাররা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন, আমরা ভগবানের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তোমরা কি করে আমাদের আটকাচ্ছ, এটা তোমাদের আসুরিক ব্যবহার, এক্ষুণি তোমরা রাক্ষস যোনিতে চলে যাও। জয় বিজয় ছিল বৈকুণ্ঠ লোকের বাসিন্দা, বৈকুণ্ঠবাসীদের শরীরে ভূমি পদার্থ খুবই কম আর তেজ পদার্থ বেশি থাকে বলে তাদের শরীর সব সময় হাল্কা। কিন্তু দেখছে ওদের শরীর ভারী হতে শুরু করেছে আর ক্রমশ নীচের দিকে পড়তে শুরু করেছে। ওরা চিৎকার করতে শুরু করেছে, চেঁচামেচিতে ভগবান বিষ্ণু মহল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ওরা অনেক ক্ষমা চাইছে। কিন্তু কিছু করার নেই। জয় বিজয় তখন বলছে, আমরা তো আমাদের কর্তব্য পালন করছিলাম। যাই হোক ওদের বলা হল তোমাদের সাত জন্ম রাক্ষস যোনিতে থাকতে হবে। বলছে, একটু কম করুন। তখন বলা হল, তোমরা যদি ঈশ্বরের বৈর ভাবে সাধন কর তাহলে তিন জন্মে মুক্তি হয়ে যাবে। এরপর ওরা প্রথম হিরণ্যকশ্যপু আর হিরণ্যাক্ষ হয়ে জন্ম নিয়ে বৈর ভাবে সাধন করল, দ্বিতীয় কংস ও আরেকজন রাক্ষস হয়ে সাধন করল আর শেষে রাবণ আর কুম্ভকর্ণ হয়ে জন্ম নিল। তাও অনেকটা দীর্ঘ সময়। হিন্দু ধর্মে মন্দ বলে কিছু নেই, যদি মন্দ কিছু এসেও যায় তাকেও কোন না কোন ভালো কিছুর সাথে জুড়ে দিতে হয় আর তার সাথে তার একটা সদ্‌গতির ব্যবস্থাও করে দিতে হয়। একেবারে গোল্লায় গিয়ে শেষ হয়ে যাবে এরকম যেন না হয়। রাবণের এই মন্দ কাজকেও একটা শুভ জায়গা থেকে শুরু করা হচ্ছে আর একটা শুভ জায়গাতে গিয়ে শেষ করা হচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য। অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তশাস্ত্র, এখানে কাউকেই একেবারে গোল্লায় নিয়ে যাওয়া হয় না, যাদের মধ্যে ভক্তির অভাব তাদেরকেও ভালো কিছুর সাথে জুড়ে দেয়, সব কিছুতেই ভালোটাকেই সামনে নিয়ে আসা হয়। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র মারীচকে মারার পর বলছেন –

লক্ষ্মণস্তন্ন জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্।
জ্ঞাত্বাপ্যেনং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা।৩/৮/৩
যস্যহং বিরতো ভূত্বা তূষ্ণীং স্থাস্যামি মন্দিরে।
তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ।৩/৮/৪
যদি শোচামি তাং দুঃখসন্তপ্তঃ কামুকো যথা।

লক্ষ্মণ তো জানে না যে আসল সীতাকে আমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছি আর নকল ছায়া সীতা অন্য কিছু করছে। এই কথা লক্ষ্মণকে বলে কোন লাভ নেই কারণ আশা করছি এতক্ষণে সীতার অপহরণ হয়ে গেছে। আমাকেও এখন সাধারণ মানুষের মত শোক করতে হবে। যদি আমি শোক না করি, আর সীতার অন্বেষণ না করি তাহলে এই যে কোটি কোটি রাক্ষসের বধের কথা বলা হয়েছিল, সেই কাজ হবে না। কামুক, যার মধ্যে কামের ইচ্ছা রয়েছে, তার সেই ইচ্ছা যদি অপূর্ণ হয়ে যায় তাকে বলছেন কামুক। কামুকের কাম্য বস্তুকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তখন সে দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে শোক করতে শুরু করে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, আমি যদি এখন কামুক ব্যক্তির মত ব্যবহার না করি, তাহলে আমার কাজ হবে না। এই রকম ব্যবহার করলে ক্রমশঃ আমি সীতার অনুসন্ধানের ছলে রাবণের কাছে পৌঁছে যেতে পারব।

মনুষ্যভাবমাপন্নঃ কিঞ্চিৎকালং বসামি কৌ।
ততো মায়ামনুষ্যস্য চরিতং মেহনুশৃণ্বতাম্।৩/৮/৭
মুক্তিঃ স্যাদপ্রয়াসেন ভক্তিমার্গানুবর্তিনাম্।

যাঁরা ভক্তিপরায়ণ, তাঁরা যদি আমার এই মায়া মানুষ রূপ ধারণ করাকে শ্রদ্ধা সহকারে শুনবেন বুঝবেন, তাঁদের অনায়াসেই মুক্তি হয়ে যাবে। ভগবান এখানে মায়ার দ্বারা মানুষ রূপ ধারণ করছেন, আর এই মানুষ রূপ ধারণ করেই সব কিছু করছেন। গীতাতে ভগবান বলছেন *জন্মকর্ম চ মে দিব্যং*, আমার জন্মটাও দিব্য আর আমার সব কর্মও দিব্য। দিব্য জন্ম মানে, আমাদের যে জন্ম এই জন্ম হয় পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলানুসারে, ভগবানের

সেভাবে জন্ম হয় না, তিনি স্বেচ্ছায় শরীর ধারণ করেন। কর্ম দিব্য মানে, কোন কর্মের পেছনেই তাঁর কোন কামনা থাকে না। ভগবানের জন্ম আর কর্ম দুটোই দিব্য আর মানুষের জন্ম আর কর্ম দুটোই কর্মবশাৎ, কামবশাৎ আর অপূর্ণতা ভাবের কারণে হয়। যিনি ভগবানের জন্ম আর কর্মের এই দিব্যত্বকে শুনবেন, অধ্যয়ন করবেন, এগুলোকে নিয়ে চিন্তন করবেন তাঁদের অনায়াসে মুক্তি হয়ে যায়।

যাই হোক, মনে মনে এই ভেবে নিয়ে লক্ষ্মণকে আসতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র খুব অবাক হয়ে বলছেন, একি! সীতাকে একা ছেড়ে তুমি এখানে কেন চলে এলে। লক্ষ্মণ দাদাকে পুরো ঘটনাটা বললেন। আরও বলছেন যে, স্বাধ্বী জনকনন্দিনী আমাকে যে সব দুর্বাক্য বলেছেন তা আমি আপনার সামনেও বলতে পারব না, আমিও কর্ণ দ্বারা সেই সব বাক্য শ্রবণ করতে পারছিলাম না, হাত দিয়ে কান ঢেকে আপনাকে দেখার জন্য আমি আপনার কাছে চলে এলাম। শ্রীরামচন্দ্র শুনে বলছেন, তুমি কিন্তু ঠিক কাজ করো নি লক্ষ্মণ।

ত্বয়া স্ত্রীভাষিতং সত্যং কৃত্বা ত্যক্তা শুভাননাম্
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈনার্ত্র সংশয়।৩/৮/১৪

একটা মেয়ের কথাকে সত্য মনে করে তুমি এভাবে চলে এসে খুবই অনুচিত কার্য করেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সীতাকে রাক্ষসরা ধরে নিয়ে গেছে বা ভক্ষণ করে নিয়েছে। আশ্রমে ফিরে এসে দেখছেন ঠিকই সীতাকে দেখা যাচ্ছে না। তখন শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করতে শুরু করেছেন। বিলাপ করতে করতে বলছেন –

হা প্রিয়ে ক্ক গতাসি ত্বং নাসি পূর্ববদাশ্রমে।
অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক্কবিলীয়সে।৩/৮/১৬

হা প্রিয়ে তুমি কোথায় চলে গেলে। আগের মত তোমাকে আশ্রমে দেখা যাচ্ছে না। নাকি তুমি আমার সাথে মজা করার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছ। তাতেও সীতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এরপর শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যের মধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করছেন, কোথাও না দেখতে পেয়ে তখন তিনি বনদেবতা, বনের পাখি, বৃক্ষ, তরুলতা, বনবাসীদের কাতর হয়ে জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা বলে দাও আমার প্রাণবল্লভ কোথায় আছে। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে আবার সেই একই কথা বলছেন –

সর্বজ্ঞ সর্বথা ক্কাপি নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ।
আনন্দোহপ্যন্বশোচৎ তামচলোহপানুধাবতি।৩/৮/১৯
নির্মমো নিরহঙ্কারোহপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্।
মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ।৩/৮/২০

শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তিনি সর্বজ্ঞ, সীতা কোথায় আছেন জেনেও জানছেন না। তিনি আনন্দস্বরূপ হয়েও শোক করছেন। শুধু ভগবানের নয়, এই জিনিস আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয়ে আছে। আমরাও হয়ত বিশ্বাস করতাম না, যদি না স্বামীজী বারবার বলে দিতেন, each soul is potentially divine, বা বলছেন, all strength is within you। এই কথাগুলোই প্রকারন্তরে বলে দিচ্ছে মানুষ পরমাত্মার সঙ্গে এক, তা যে রূপেই নেওয়া হোক না কেন। পরমাত্মার যা যা গুণ সব গুণই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, তার ভেতরে যে শক্তি সেই শক্তিও সেই পরমাত্মারই শক্তি, তার ভেতরে যে আনন্দ সেই আনন্দ অসীম আর তার ভেতরে যে জ্ঞানরাশি সেটাও অসীম। সেইজন্য তার আধ্যাত্মিক ভাব, পবিত্রতা অসীম, এই জিনিসটাকেই আমরা যাতে ধারণা করতে পারি সেইজন্য স্বামীজী আমাদের ভাষায় বলছেন each soul is potentially divine। দুটো শ্লোকে ভগবানের গুণের বর্ণনা করছেন, তারপরেই দেখাচ্ছেন ভগবান তাঁর গুণের বিপরীত আচরণ করছেন। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়, মানুষের মধ্যেও এই একই গুণ সমুদয় রয়েছে, কিন্তু মানুষ সেই গুণের ব্যাপারে জানে না এবং তার বিপরীত আচরণ করে। কিন্তু ভগবান উল্টোটা করছেন, ভগবান জানেন তিনি এই গুণে প্রতিষ্ঠিত, জেনেও তিনি অন্য রকম ব্যবহার করছেন। ভগবান যেটা আপাতদৃষ্টিতে ছলপূর্বক করছেন, মানুষ সেটাই অজ্ঞানবশতঃ করে। এখানে কি কি গুণ বলছেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, কিন্তু 'হা সীতা হা সীতা' বলে শোক করছেন। তিনি অচল, বাংলা অচল মানে যে জিনিস চলে না, যেমন পাথর অচল। কিন্তু ভগবান বাংলা অচল নন, তিনি অনন্ত। অনন্ত হওয়ার জন্য এমন কোন জায়গা নেই যে যেখানে তিনি নেই। চল তখনই হয় যখন যাওয়ার জন্য কোন জায়গা থাকে।

কিন্তু ভগবান সর্বত্র ব্যাপ্ত, তাই তিনি কোথায় যাবেন, সেইজন্য বলছেন তিনি অচল। অথচ চোখের সামনে আমরা দেখছি সীতাকে খোঁজার জন্য তিনি এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছেন। ভগবানের আরেকটা গুণ তিনি *নির্মমো নিরহাঙ্করঃ*, অর্থাৎ যাঁর মমত্ব নেই আর যাঁর অহঙ্কার অর্থাৎ আমি ভাব নেই। গীতায় বলছেন *অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ, অসক্তি* মানে আমি ভাব আর *অভিষঙ্গ* মানে মমত্ব ভাব, আমি আর আমার বোধ। ভগবানের আমি ও আমার বোধ নেই। ভগবান হলেন অখণ্ড, অখণ্ড মানে তাঁর মধ্যে কোন বিভাজন নেই, খণ্ডিত কিছু নেই। অথচ তিনি *মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ*, ওগো আমার সীতে! তুমি কোথায় চলে গেলে, এইসব বলে বিলাপ করছেন। ভগবান জানেন এটাই মায়া কিন্তু তাও তিনি বিলাপ করছেন। কারণে অকারণে আমরা কত কিছুর জন্য বিলাপ করছি, কিন্তু আমরা অজ্ঞানে করছি। নাটকে অভিনেতা যে অভিনয় করছেন তিনি জানেন তিনি এটা নন, কিন্তু করছেন অন্য রকম। ভগবানের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, তিনি এক রকম কিন্তু আচরণ করছেনে অন্য রকম। তবে নাটক আর ভগবানের এই জিনিসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, সেইজন্য এর নাম লীলা। তাঁরও শোক আছে, শরীরের বোধ আছে, কিন্তু উচ্চতম দৃষ্টিতে দেখলে তখন বোঝা যায় এগুলো কিছুই নয়। পরের শ্লোকে আবার খুব সুন্দর বলছেন –

এবং মায়ামনুচরন্নভক্তোহপি রঘুত্তমঃ।
আসক্ত ইব মূঢ়ানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং নহি।৩/৮/২১

শ্রীরামচন্দ্র, তিনি ভগবান, কিন্তু মায়ার অনুসরণ করছেন, চোখের জল ফেলছেন, বিলাপ করছেন, সাধারণ মানুষ, অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত মানুষ মনে করে ভগবান আসক্ত, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট এক ক্ষণের জন্যও ভগবান এই রূপ প্রতীত হন না। কাশীপুরে ঠাকুর ক্যানসারে শয্যাশায়ী, শরীর একেবারে কঙ্কালসার, সবাই চোখের জল ফেলছে। সেই সময় একজন ভক্ত ঠাকুরকে দেখে বলছেন, আমি কিন্তু দেখছি তিনি মহা আনন্দে আছেন। ঠাকুর শুনে বলছেন, ধরে ফেলেছে রে। একদিকে স্বামীজী চোখের জল ফেলছেন, আর কয়েকজন ভক্ত বলছেন ঠাকুরের এগুলো কিছুই না, সব লীলা। স্বামীজীর সাথে তাঁদের বিবাদ হচ্ছে, স্বামীজী বলছেন, এই যে দেহের কষ্ট হচ্ছে এগুলো সত্য, আমাদের তাঁকে সেবাশুশ্রুষা করতে হবে। স্বামীজীর এক গুরুভাই বলছেন ঠাকুর মহা আনন্দে আছেন আর ঠাকুরও তাঁর কথাকে সমর্থন করছেন। দুটোর বাস্তবিকতাকে মেলানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। ঠাকুর আধ্যাত্মিকতার উচ্চাবস্থায় আছেন, সত্যিই তিনি সেখানে মহা আনন্দে আছেন, তাতে কোন সন্দেহই নেই। এই শ্লোকগুলোতে যে বলছেন তিনি অখণ্ড, তিনি অচল সবই ঠিক বলছেন। কিন্তু তিনি যখন দেহ ধারণ করে থাকেন তখন দেহের যা যা কষ্ট হবে সেই কষ্টগুলোও সব বাস্তব সত্য। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই জায়গার সংজ্ঞাটা ঠিক নয়। লীলাপ্রসঙ্গ আর কথামৃতের বর্ণনার সাথে একুশ নম্বর শ্লোকের বর্ণনা মেলে না। অধ্যাত্ম রামায়ণ কিন্তু ভগবানের কথা নয়, গীতা উপনিষদ ভগবানের কথা, অধ্যাত্ম রামায়ণ হল পুরাণ। ভক্তির দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করার জন্য অনেকগুলো কথা বলতে হচ্ছে যে, সবটাই তাঁর লীলা বলে তাঁর শরীরের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। ভগবান এখানে দেহ ধারণ করে এসেছেন, দেহ ধারণ করে থাকার জন্য তিনি বাচ খেলতে পারেন। তাঁর দেহের উপর মন কখনই আসে না, কিন্তু একটু থাকে, যতটুকু থাকে ততটুকু তাঁর কষ্ট বোধও থাকবে। নিজের স্বরূপে তাঁর মন যে ডুবে থাকে সেখানে সত্যিই তাঁর ভেতর কোন ধরণের বিক্ষেপ থাকে না। স্বামীজীর গুরুভাই যখন বলছেন তখন তিনি ঠাকুরের ঐ রূপকে নিয়েই বলছেন। স্বামীজী যখন বলছেন, তখন তিনি ঠাকুরের দেহ রূপকে সত্য ধরে নিয়েই বলছেন।

আমাদের কাছে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ ভাবধারায় যাঁরা বড় হয়েছেন, যে কোন অবতার এবং তাঁর যে শরীর ধারণ, তাঁর যে নরলীলা এটা পুরোপুরি সত্য। লীলা, কাহিনী, নাটক এইসব বলে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। ঠিক তেমনি জীবনকেও এভাবে ঘুরিয়ে দেওয়া যায় না। আসলে হিন্দুদের কখনই একটা মাত্র ধর্মগ্রন্থ ছিল না, আর cohesive philosophy না থাকার জন্য বিভিন্ন ঋষিরা নিজের মত ভাবনা চিন্তা করে লিখে গেছেন। গুরুভাইয়ের কথাতে আমরা মনে করব অবতারের এগুলো কিছুই না। আবার স্বামীজী বলছেন, তাঁর কষ্টটা সত্য। ঠাকুর বলে গেছে নরেন শিক্ষা দেবে। ঠাকুরের যে কোন জিনিস যদি বুঝতে হয় তাহলে স্বামীজীর কথা দিয়েই বুঝতে হবে। কিন্তু এই ভাবগুলো কোন একটা সময় হিন্দু ধর্মে অনেক বেশি করে ঢুকে গিয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্রের যেন কোন কষ্টই ছিল না, সীতার কোন কষ্টই ছিল না। কিন্তু তা নয়, তাঁদের অবশ্যই কষ্ট ছিল। তবে হ্যাঁ তিনি যদি চান, সঙ্গে সঙ্গে মনকে অন্য দিকে নিয়ে চলে যেতে পারেন। তিনি যদি অন্য দিকে মন নিয়েই চলে যাবেন তাহলে তাঁর নরলীলা করার আর কিসের দরকার ছিল! নরলীলা যখন তিনি করছেন তখন তাঁকে দেহ, মনের

ধর্মের ভেতর দিয়েই যেতে হচ্ছে। এই শ্লোকে শেষে বলছেন, তবে তত্ত্বজ্ঞানীর এগুলোকে নিয়ে ভ্রম হয় না। এই কারণেই ভ্রম হয় না, এগুলোর জন্য যে তাঁর আলাদা কর্ম সৃষ্টি হবে তা হবে না। স্বামীজীরও এই ভ্রম হচ্ছে না, কিন্তু দেহটাও যে সত্য এবং দেহের সুখ, দুঃখটাও যে সত্য এই বোধটা তাঁর থাকে। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে তিনি জানেন সবটাই মিথ্যা। সেইজন্য স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ভাই! এই জন্মে যা কিছু করার করে নাও। এরপর সবই হবে, মানুষ জন্মও পাব, মুক্তির ইচ্ছাও থাকবে কিন্তু এই ধরণের মহাপুরুষকে আর পাব না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবান তো সর্বত্রই সেখানে তাহলে মহাপুরুষের আসার কি দরকার? দরকার আছে, যখন তিনি দেহ ধারণ করে থাকেন তখন তাঁর একটা আলাদা দাম থাকে। মহাপুরুষকে দেখার দুটো পদ্ধতি – একটা দেহ রূপে আরেকটা ঈশ্বর রূপে। আরেকটা হল সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা, যারা অতি সাধারণ, তাদের কাছে শ্রীরাম নিজের স্ত্রীর জন্য বিলাপ করছেন, এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছেন, এই জিনিসটা তাঁদের কখনই হবে না। কিন্তু দেহ ও মনের যে একটা কষ্ট বোধ আছে সেটা তাঁর একেবারেই হবে না তা নয়, একটু হলেও কষ্ট বোধটা হবে। বাল্মীকি একভাবে রচনার করেছেন আর অধ্যাত্ম রামায়ণ অন্য ভাবে লিখেছেন। কিন্তু অবতারের যখন কষ্ট হয় তখন তিনি কি রকম প্রতিক্রিয়া করেন, এর সঠিক বর্ণনা আমরা কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গে খুব সুন্দর ভাবে পাই।

<u>জটায়ু মোক্ষণ</u>

সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত সীতার অন্বেষণ করে যাচ্ছেন। অন্বেষণ করতে করতে দেখছেন এক জায়গায় মাটিতে একটা ভগ্ন রথ ও ভগ্ন ধনু পতিত হয়ে আছে। শ্রীরামচন্দ্র বিস্মিত হয়ে বলছেন, মনে হচ্ছে এখানে কিছু একটা হয়েছে, কোন দুরাত্মা জানকীকে হরণ করে পালাতে যাচ্ছিল তখন অপর কোন পুরুষ তাকে যুদ্ধে জয় করে সীতাকে গ্রহণ করেছে। কাছে যেতেই সেখানে পক্ষীন্দ্র জটায়ুকে রক্তাক্ত কলেবরে পড়ে থাকতে দেখলেন। রক্ত দেখে তিনি লক্ষ্মণকে বলছে, দেখ ভ্রাতঃ, এই দুরাত্মা জানকীকে ভক্ষণ করে তৃপ্ত হয়ে এখন নির্জনে এখানে শয়ন করে আছে। তুমি আমার ধনুর্বাণ নিয়ে এসে, এক্ষুণি আমি একে শেষ করে দিচ্ছি। জটায়ুর কানে এই কথা যেতে খুব ভীত হয়ে বলছেন –

মাং ন মারয় ভদ্রং তে ম্রিয়মাণং স্বকর্মণা।৩/৮/২৭

হে রামচন্দ্র! আপনি আমাকে বধ করবেন না। আমি আমার নিজের প্রারব্ধ কর্মের দরুণই মারা যাচ্ছি, আমাকে আর আলাদা করে মারার দরকার নেই। জটায়ুর এই কথার মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক তাৎপর্য জড়িয়ে আছে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায়ই ভুল কারণে বা সঠিক কারণে কারুর উপর রেগে গিয়ে অনেক কিছু করে ফেলি বা বলে দিই। কিন্তু একটু বিচার করলে দেখা যাবে, আপদ-বিপদ, দুঃখ যা কিছু আসছে তখন বুঝতে হবে ভগবান তাকে আগেই মেরে রেখে দিয়েছে বা নিজের কর্মের জোরে মরতে বসেছে। যখনই দেখা যায় কেউ খুব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়ে আছে তখন বুঝতে হবে যে সে তার নিজের কর্মের প্রভাবে পড়ে গেছে। তাকে আর কিছু করার দরকার নেই। আমরাও তখন আর তাকে কিছু করতে যাই না। অন্য দিকে আমরা সব সময় ওত পেতে থাকি, যখন দেখছি আমার শত্রুর কিছু গোলমাল হয়েছে তখনই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, ওকে মারার এই হল উপযুক্ত সময়। সাধারণ মানুষ তাই করে, ওত পেতে বসে থাকে। যার সাথে শত্রুতা আছে তার যদি কোন আপদ-বিপদ হতে দেখে তখন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যারা সাধু পুরুষ তাঁদের এই ব্যাপারে বুঝতে হয়, এর এখন দুঃখ এসেছে, ভগবানের মার, নিজের কর্মের মার এর উপর এখন আছড়ে পড়ছে, একে তখন ছেড়ে দিতে হয়, আর কিছু করতে হয় না।

যোগসূত্রে বলছেন *মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপূণ্যাপূণ্যাবিষয়ণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদাম্।।* চার রকম পরিস্থিতিকে নিয়ে বলছেন। একটা হল সুখ, কোন কারণে আনন্দ হচ্ছে, দ্বিতীয় কোন কারণে দুঃখ এসেছে, তৃতীয় কোন পূণ্য কর্ম করছে আর চতুর্থ অপূণ্য কিছু করছে। কর্ম দুই রকমের পূণ্য কর্ম আর অপূণ্য কর্ম, তার ফলও দুই রকম সুখ আর দুঃখ। মানুষ যা কর্ম করে তার পূণ্য আছে আর তা নাহলে অপূণ্য আছে, আর তার ফল হিসাবে তার সুখ হয় অথবা দুঃখ হয়। যখনই কারুর মধ্যে সুখ দেখা যায় তখন তার সাথে মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার করতে হয়। আর যখনই কারুর জীবনে প্রচুর দুঃখ এসেছে তখন তার দিকে করুণার ভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। যেখানে কোন পূণ্য কর্ম হয় সেখান আনন্দের প্রকাশ আনতে হয় আর যেখানে অপূণ্য কর্ম হয়, খারাপ কাজ

হতে দেখা যাচ্ছে সেখান উপেক্ষা। জীবনে যদি কেউ শান্তি পেতে চায়, জীবনে কেউ যদি মহৎ হতে চায় তাকে এই চার রকমের পরিস্থিতিতে চার রকমের ভাব নিয়ে আসতে হবে। পতঞ্জলি যোগসূত্রের এটি খুব বিখ্যাত সূত্র।

নিজের ছেলে বোর্ডের পরীক্ষায় স্টার পেয়েছে, বাবা-মার খুব আনন্দ। কিন্তু পাশের বাড়ির ছেলে যদি স্টার পায় তখন গাত্রদাহ হতে শুরু হয়ে যাবে আর যদি পরীক্ষায় ফেল করে তখন আহ্লাদে ফেটে পড়বে। যাকে আমি পছন্দ করি না, তার যদি ভালো কিছু হয়, আমি সেখানে কি করে মৈত্রীভাব বজায় রাখব? এখানেই যোগসূত্রের বৈশিষ্ট্য। অফিসের দুই সহকর্মি, দুজন একই পোস্টের জন্য দরখাস্ত করেছে, একজন সেই পোস্টে প্রমোশন পেয়ে গেল আরেকজন পেল না। স্বাভাবিক ভাবেই যে পায়নি তার মধ্যে ঈর্ষা, রাগ আসবে। যোগসূত্র এটাই বলছে, তুমি গিয়ে তাকে বল, আরে ভাই! আমিও এই পোস্টে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু আমার হল না, তাতে কিছু না, তোমার তো হয়েছে, বেশ বেশ, খুব ভালো হয়েছে। এখানে অন্যের কি হচ্ছে সেখানে আমার কোন দায়ীত্ব নেই, দায়ীত্ব আপনার নিজের প্রতি। নিজের দিকে তাকান, অপরের দিকে তাকাতে যাবেন না, জগতে কেউ আপনার নয়, সেইজন্য আগে নিজেকে সামলান। দুঃখের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, আপনার একজন শত্রু আছে, আপনি তাকে পছন্দ করেন না। সে কিছু গোলমাল করাতে তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের এটাই স্বভাব, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি কিনে সবাইকে খাওয়াতে শুরু করে দেব। পতঞ্জলি এটাকে আটকে দিচ্ছেন, এ রকমটি কখনই করো না। তুমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও, করুণার ভাব নিয়ে এস, তাকে বল, আপনার দুঃখের দিন এসেছে, কিছু ভাববেন না, আমি আপনার পাশে আছি, কোন সাহায্যের দরকার হলে অবশ্যই বলবেন। যেখানেই দুঃখ দেখবে, বন্ধুরই হোক বা শত্রুরই হোক সব সময় করুণার ভাব নিয়ে পাশে দাঁড়াও। যেখানেই আনন্দ দেখবে, বন্ধুরই হোক বা শত্রুরই হোক সেখানে মৈত্রী ভাব নিয়ে আনো। এতে তোমার হৃদয় আরও বড় হয়ে যাবে। হৃদয়কে বড় করা মানেই হল, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরে আসা। আধ্যাত্মিক জীবন মানেও তাই, আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে সরে আসা, মানে নিজেকে আরও মহৎ করা। ঠিক তেমনি যেখানেই পূণ্য, একটা বদমাইস লোক সে একটা কালীপূজা করছে, আমাদের স্বভাব হল আড়ালে বলতে থাকা, সারাদিন চুরি চামারি করে আর এখন কালীপূজা করছে। কখনই এই রকম বলতে নেই, কালীপূজা একটা পূণ্য কাজ, খিচুড়ি খাওয়ানো একটা পূণ্য কাজ, এই ধরণের কোন পূণ্য কাজ দেখলেই তাকে বাহাবা দিতে হয়, আনন্দ প্রকাশ করতে হয়। আর যেখানে অপূণ্যের কাজ হচ্ছে, রাস্থা দিয়ে যেতে গিয়ে দেখছি একজন লোক মাতলামো করছে, তখন আমাদের উপেক্ষা করে ওখান থেকে সরে আসতে হয়। যদি কেউ যোগী হতে চান তাঁকে এই রকম আচরণই করতে হবে। ভালো করে দেখলে দেখা যাবে আমরা আসলে কিছুই হতে চাই না। কিছুই হতে চাই না বলে আমাদের যখন যে যে ইমোশান গুলো আসবে সেই ইমোশানের বশবর্তি হয়ে সেই রকম কাজে নেমে পড়ি। মাতালকে দেখে জামার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে ধমকাতে শুরু করে দিলাম, এত বড় সাহস! আমার পাড়ায় এসে মাতলামো করা! হয়ত দু-চারটে কিল-চাপড় লাগিয়ে দিল।

জগতে সবারই দুঃখ লেগে আছে। কোন মানুষই চায় না যে তার দুঃখ আসুক। দুঃখ পাওয়ার জন্য কেউ নিজেকে দুঃখ দেয় না, ওর পেছনেও একটা সুখের বোধ থাকে। আত্মহত্যা যখন করতে যায় তখনও সে ভাবে আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাব, সুখের আশাতেই মানুষ আত্মহত্যা করতে যায়। সংসারে দুঃখ সবারই লেগে আছে, কিছু করার নেই। দুঃখ কেন আসে আমাদের জানা নেই, আমাদের হয় বলতে হয় তিনিই মারছেন আর তা না হলে বলতে হয় নিজের কর্মের বিপাকে দুঃখ এসেছে। আমাদের শুভ কর্মের ফল যখন আসতে শুরু করে তখন সব কিছুই শুধু ভালো ভালো, আর যখন খারাপ কর্মের ফল আসা শুরু হয় তখন শুধু দুঃখ আর দুঃখ। সেইজন্য যারই জীবনে কোন দুঃখ আসে তখন তাকে কিছু বলতে নেই, উল্টে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু আমরা এতই স্বার্থপর জীব যে যাকে পছন্দ করি না তার কোন দুঃখ এলে আমরা আনন্দ করি। আমার নিজের কিছু না হোক, আমার সুখভোগ না হোক কিন্তু পাড়াপরশির কারুর খারাপ কিছু হলে এত আনন্দ হয় যে এর থেকে আনন্দের আর কিছুতে নেই।

জটায়ু এটাই বলছেন, আমি তো এখন দুঃখে পড়ে আছি, আমার প্রারব্ধের জন্য আমি নিজেই মারা যাব, তোমাকে আর আমাকে মারতে হবে না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে এটা বলা হচ্ছে না যে, সে এমনিতেই দুখী তাকে আর মারবেন না। এখানে একটা mis-conception আছে, শ্রীরামচন্দ্র ভাবছেন এটা একটা রাক্ষস, সীতাকে ভক্ষণ করে নিয়েছে, চল একে মেরে দেওয়া যাক। শ্রীরামচন্দ্র নিজের দিক দিয়ে ভুল কিছু করছেন না, সীতাকে খুঁজে

পাওয়া যাচ্ছে না, তারপর এই বিশাল এক পাখি দেখে ভাবছেন কোন রাক্ষস পাখির রূপ ধারণ করে বসে আছে, একে মেরে শেষ করে দিতে হবে। মাঝখান থেকে জটায়ু একটা খুব মূল্যবান কথা বলে দিলেন, আমি নিজের কর্মের দ্বারাই বিনষ্ট হয়ে গেছি, তুমি আর নতুন করে আমাকে মারতে যেও না। এই জন্মে আমি যে কোন পাপ কর্ম করেছি তা নয়, নিশ্চয় আগের আগের জন্মে কোন পাপ কর্ম করেছি। আমরা সাধারণত মারতে চাই বর্তমানে কোন দোষ করলে। আগে কিনা কি করেছে তার জন্য আমাদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া আসে না।

তখন জটায়ু সংক্ষেপে বলে দিলেন কিভাবে সীতাকে রাবণ অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দেওয়ার জন্য আমাকে রাবণের সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, রাবণের প্রহারে আমি এই ভূমিতলে পতিত হয়ে আছি। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর আর আমি আমার প্রাণত্যাগ করি। শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর গাত্র স্পর্শ করে বললেন, হে জটায়ু! তুমি বল কে আমার সীতাকে নিয়ে গেছে। জটায়ু বলছেন, রাবণ সীতাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গেছে। আমার আর কিছু বলার ক্ষমতা নেই, তার সাথে বলছেন –

দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি রাম ত্বং ম্রিয়মাণেন মেঽনঘ।
পরমাত্মাসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজরূপধৃক্।৩/৮/৩৪

হে রামচন্দ্র! আমার পরম সৌভাগ্য যে মৃত্যুকালে আমি তোমার দর্শন পেলাম। আমি জানি আপনি সেই পরমাত্মা নিজের মায়া শক্তিতে এই মানুষ রূপ ধারণ করেছেন। আমি যে আপনাকে দেখলাম তাতেই আমার মুক্তি হয়ে গেল কিন্তু আপনি যদি আমাকে একটু স্পর্শ করে দেন তাহলে আমার আপনার পরম পদ প্রাপ্ত হবে, বিষ্ণুলোকে যাবই যাব। শ্রীরামচন্দ্র তখন জটায়ুকে স্পর্শ করলেন আর সেই সময় জটায়ুর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমার যে জগতকে জানছি, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়েই জানছি। যাকে আমরা ভালোবাসি তাকেও আমরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চাই। জটায়ুরও এই ভাব কাজ করছে, আপনার দর্শনেই আমার মুক্তি হয়ে যাবে জানি কিন্তু আপনি যদি আমাকে একটু স্পর্শ করে দেন তাহলে আপনার পরম পদ পেয়ে যাব। বেদান্তে বলে, আমাদের ভেতরে যে চেতনা আছে, চেতনা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বস্তুকে ধরে। স্পর্শের ক্ষেত্রে পুরোপুরি এক হতে হয়। জটায়ুকে উদ্দেশ্য করে তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে জটায়ু! সকল লোক তাকিয়ে দেখুক, তুমি এক্ষুণি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হও। এখানে একটা মজার ঘটনা আছে –

স্নাত্বা দুঃখেন রামোঽপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
হত্বা বনে মৃগং তত্র মাংসখণ্ডান সমন্ততঃ।৩/৮/৩৮

জটায়ু মারা গেল। পরম মিত্রের বিয়োগে মানুষ যেমন অশ্রু বিসর্জন করে, শ্রীরামচন্দ্রও ঠিক সেইভাবে শোকাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এরপর লক্ষ্মণকে দিয়ে কাঠ আনিয়ে জটায়ুর দাহকার্য সম্পন্ন করলেন। জটায়ুকে তিনি স্পর্শ করেছেন, তাঁর একটা শ্রাদ্ধকর্মও করছেন। শ্রাদ্ধকর্ম করার জন্য লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে প্রচুর মৃগ শিকার করলেন তারপর ঐ মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করে বনের জটায়ুর স্বজাতীয় পাখিদের খাইয়ে দিলেন আর বলছেন, এতে পক্ষিরাজ জটায়ু পরিতৃপ্ত হবেন। যার শ্রাদ্ধ হয় সে যেটা খেতে ভালোবাসত তাকে সেই খাবার দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে হয়, এখানেও ঠিক তাই করা হচ্ছে। এই শ্লোকটা খুবই মজার শ্লোক। গীতা প্রেসের বইতে শ্লোকের তলায় ফুটনোটে লিখে দেওয়া হয়েছে, এই শ্লোকের অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না, সেইজন্য এর অনুবাদ করা হল না। কিন্তু এর অর্থ খুবই স্পষ্ট, *হত্বা বনে মৃগং*, বনে হরিণ শিকার করলেন, *তত্র মাংসখণ্ডান সমন্ততঃ*, তাদের মাংস খণ্ড বিছিয়ে দেওয়া হল। শ্লোকের অর্থ না বোঝার কিছু নেই। আসলে এর অন্য একটা কারণ আছে, হিন্দীভাষীদের মধ্যে মাংসের নাম নেওয়া যাবে না, আর তার উপর শ্রীরামচন্দ্রের সাথে মাংসের সম্পর্কের কথা শুনলে এরা ভিরমী খেয়ে পড়ে যাবে। এগুলোই গোঁড়ামি, এই গোঁড়ামি থেকেই শাস্ত্র পাল্টাতে শুরু করে। বাল্মীকি রামায়ণেও ঠিক এই একই বর্ণনা আছে, যিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ লিখেছেন তিনি বাল্মীকি রামায়ণের ভাবটাই বজায় রেখেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রে চার রকম মুক্তির কথা বলা হয়, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য আর সাযুজ্য। সালোক্য মানে ইষ্ট যেই লোকে থাকেন তাঁর ভক্তও সেই লোকে গিয়ে থাকবে, তার মানে বৈকুণ্ঠধামে গিয়ে থাকবে, এটাই ভক্তের কাছে বিরাট আনন্দের। দ্বিতীয় সামীপ্য, ভগবানের কাছে কাছে থাকছে, তৃতীয় সারূপ্য, ভগবানের যে রূপ তারও সেই রূপ হয়ে যায়। শেষে সাযুজ্য, ভগবানের সাথে এক হয়ে যাওয়া। বলা হয়, সাযুজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই হয়, বেশির ভাগ ভক্ত সাযুজ্য চায় না। কারণ ভগবানের সাথে এক হয়ে গেলে ভগবানের ভক্তিরস আস্বাদন, তাঁর

পূজা অর্চনা করা, স্তুতি করা যাবে না, তাঁরা এটা চান না। জটায়ু এখন ভগবান বিষ্ণুর রূপ পেয়ে গেছেন, তাঁর মতই দেখতে, ওনার মতই সব কিছু হয়ে গেছে। ভগবান বিষ্ণুর সাথে যেমন বিষ্ণুদূতেরা থাকে, জটায়ুকে সেবা করার জন্য চার বিষ্ণুদূত এসে গেছে। অনেক যোগী, সিদ্ধগণরা সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে দিব্যরূপধারী জটায়ুর স্তুতি করতে লাগলেন। এবার জটায়ু ওই রূপ নিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করতে শুরু করেছেন তার সাথে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করছেন –

জটায়ু কৃত শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্।৩/৮/৪৪

শ্রীরামচন্দ্রের এটি একটি নামকরা প্রণামমন্ত্র। বলছেন শ্রীরামচন্দ্রের এত গুণ যে গুণের গণনা করা যায় না। সাকার ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্মকে আমরা অনেক কিছু বলি, কিন্তু ঈশ্বরের নামে একটাই শব্দ হয়, *সকলগুণনিধনম্* যেটা এখানে বলছেন *অগণিতগুণমপ্রমেয়ম্*। *সকলগুণনিধনম্*, যে কোন গুণের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করতে পারি তিনি সব গুণের খাজানা। অদ্বৈত মতে ঈশ্বর নির্গুণ নিরাকার, কিন্তু রামানুজের মতে যে ঈশ্বর, তাঁকে যখন সগুণ সাকার রূপে দেখা হয় তখন আমরা যে গুণের চিন্তা করি না কেন সব গুণই ঈশ্বরের মধ্যে আছে। এমনকি যে গুণের চিন্তা করতে পারি না সেই গুণও ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বর হলে গুণের খনি, গুণের সমুদ্র তিনি। তার সাথে তিনি অপ্রমেয়, অপ্রমেয় মানে যাঁকে মাপা যায় না। কিন্তু অপ্রমেয় মানে একটাই হয় যাঁকে ইন্দ্রিয় দিয়ে বা মন দিয়ে জানা যায় না। বস্তুকে মেপে নেওয়া মানে সেই বস্তুর ব্যাপারে জেনে যাওয়া। জগতে যত বস্তু রয়েছে তাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে মাপা হয়, ঈশ্বরই একমাত্র সেই বস্তু যাঁকে ইন্দ্রিয় কোন দিন জানা যায় না, সেইজন্য বলছেন অপ্রমেয়। যখনই আত্মা বা ঈশ্বরের কথা বলা হয় তখনই সেখানে অপ্রমেয় বলা হয়। আমরা যখন কোন জিনিসকে জানছি তখন তার যে ইমেজ বা তার ব্যাপারটা মনে capture করে নিই। ঈশ্বরের ব্যাপারে capture করা যায় না, তাঁকে অনুভব করা যায়। আর বলছেন, *সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্*, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে জন্ম হয়, লয় হয় এর হেতু হলেন তিনি, তিনি আছেন বলেই সব কিছুর জন্ম, স্থিতি ও লয় হচ্ছে।

উপরমপরমং পরাত্মভূতম্, তিনি হলেন পরম শান্ত স্বরূপ, সেখানে গিয়ে সব কিছু শান্ত হয়ে যায়, আমি সেই শ্রীরামচন্দ্রকে সতত প্রণাম করি। আমরা যখন কারুর কথা বলি তখন আমরা বলে দিই তিনি এই রকম, সেখানে একটাই প্রার্থনা হয়ে যায়। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে একটাই প্রার্থনা হবে না। ঈশ্বরের ভক্ত যে ভাবে ঈশ্বরকে দেখে সে সেইভাবে প্রার্থনা করবে। কারণ ভগবান হলেন অনন্ত। কিন্তু তার মধ্যেও কিছু কিছু একই জিনিস এসে যায়, সেখানে এই চারটে গুণ সব সময় থেকে যায়, তার মধ্যে একটা হল সব কিছুর তিনি উপরতি। যত রকমের বুদ্ধির বিলাস, যত রকমের ইন্দ্রিয়ের বিলাস সব সেখানে গিয়ে থেমে যায়। থেমে যাওয়ার জন্য বলছেন *উপরমপরমং*। আর তিনি হলেন পরমাত্মা, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। তার সাথে বলছেন –

নিরবধিসুখমিন্দিরাকটাক্ষং ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্।৩/৮/৪৫

তিনি আনন্দময় আর লক্ষ্মী যিনি কটাক্ষে সবার কৃপা করেন তিনি তাঁর আশ্রয়। ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা বিপৎকালে যাঁর শরণাপন্ন হয়ে সমস্ত দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে থাকেন সেই শ্রেষ্ঠ ধনুর্বাণধারী মায়ামনুষ্যরূপী বরপ্রদ রামকে সতত প্রণাম করি। আমরা মনে করি দেবতারা আমাদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁদেরও অনেক রকম আপদ-বিপদ, দুঃখ আছে, তাঁদের দুঃখও ভগবানই একমাত্র দূর করেন।

ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্।
শরণমনিশং সুরাগমূলে কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে।৩/৮/৪৬

ত্রিভুনে তিনি সব চাইতে রূপবান। এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে খুব মজা লাগবে। কোন জিনিসকে যদি আমরা সুন্দর মনে করি, যেমন একটা ঘোড়া, ঘোড়ার নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে, তার নিজস্ব একটা তেজ আছে। যখন আমরা ঘোড়া ভাবছি তখন আবার ভাবছি সৃষ্টিতে অনেক রকম ঘোড়া আছে। সেই ঘোড়াগুলোকে যখন আঁকতে যাব তখন দেখা যাবে একটা standard ঘোড়া হবে। আর্ট মানে ultimate standard ভাব

কিছু। সেখান থেকে এবার variety নিয়ে আসা হবে। কপি করতে গিয়ে যে imperfection গুলো আসবে, সেটাই হল variety। এখান থেকেই হয়ে যায় imperfection বা যেটাকে আমরা স্টাইল বলছি। Perfection হল একমাত্র সেই perfect রূপ যার বাকি সব রূপ হল তার কপি। যে কোন জিনিসের ব্যাপারে, যেমন ঐ রকম একটা গোলাপ ফুল যদি কেউ আঁকতে পারে, জগতে যত গোলাপ হতে পারে সব গোলাপের ওটা হবে মাস্টার কপি, তখন সে ঐ জায়গা চলে গেল যেখান থেকে বাকি সব জিনিস বেরিয়ে আসবে। স্বামীজী যখন বলছেন divinity is goal of life, তার মানে ফিজিক্স যদি এমন কোন মেশিন বার করে যে মেশিন থেকে সব এনার্জি বেরোচ্ছে বা কেমেস্ট্রি এমন কোন কেমিক্যাল যদি বার করে যেটা থেকে বাকি সব কেমিক্যাল বেরোচ্ছে তখন unityর stageএ চলে যাবে, তখন আর কিছু দরকার থাকবে না। ফিজিক্সে যদি কেউ এনার্জির সোর্স পেয়ে যায় তখন তার জানার আর কিছু বাকি থাকবে না। আইডিয়ার জগতে ঠিক তাই হয়, কিছু আইডিয়া আছে যেটা সব কিছুর মাস্টার। যেমন মাস্টার চাবি থাকে যে চাবি দিয়ে সব তালা খুলে দেওয়া যায়, ঠিক তেমনি জগতে সব কিছুর একটা মাস্টার কপি থাকে। ঐ আইডিয়ার জগতে যাবতীয় যা কিছু সৌন্দর্য আছে, সেগুলোকে যদি একটা জায়গায় আনা হয় তখন সেটাই হয়ে যাবে সৌন্দর্যের শেষ কথা। ভগবান হলেন জগতের সব সৌন্দর্যের খনি। যদি জাগতিক অর্থে আর পারমার্থিক অর্থে বুঝতে হয় তাহলে মা দুর্গাকে দিয়ে বুঝলে বোঝা যায়। মা দুর্গার ক্ষেত্রে দেখা যায়, জগতে যা কিছু শক্তি তার সার অংশ দিয়ে মা দুর্গার সৃষ্টি। ঠিক তেমনি তিলোত্তমা, জগতে যত সৌন্দর্য আছে সব সৌন্দর্যকে তিল তিল করে জমিয়ে তিলোত্তমার সৃষ্টি। কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা হয় না, তিনি আছেন বলে জগতে যত রকমের সৌন্দর্য, যত শক্তি, যা কিছু আছে সব প্রকাশ পাচ্ছে। পারমার্থিক আর জাগতিক ক্ষেত্রে এই জায়গাতে বিরাট পার্থক্য। জাগতিক সৌন্দর্য যদি আনতে হয় তখন তিলোত্তমা হয়ে যাবে। জগতের সব সৌন্দর্যকে তিল তিল করে যার মধ্যে জমান হয়েছে। ভগবান কিন্তু তা নন, সৌন্দর্য জিনিসটা ভগবানের থেকে বেরিয়েছে। তারও বাইরেও কত কি আছে আমাদের জানা নেই। তিলোত্তমার সৌন্দর্যও ভগবান থেকে বেরিয়েছে, তাই ভগবানের সৌন্দর্যের কাছে তিলোত্তমার সৌন্দর্য কিছুই না। ঠাকুর খুব জোর দিয়ে একেবারে নির্দিষ্ট করে বলছেন, ঈশ্বর দর্শন হয়ে গেলে রম্ভা, তিলোত্তমাকে চিতার ভস্ম বলে মনে হয়। চিতার ভস্ম একটা খুব বাজে জিনিস, মরা পুড়িয়ে দেওয়ার পর যে ছাই, খুবই জঘন্য জিনিস।

জগতে যত সৌন্দর্য আছে সব সৌন্দর্যকে তিল তিল করে জমিয়ে এক নারী তৈরী করলে সেই নারী হল তিলোত্তমা, কিন্তু সেটা হল চিতার ছাই। জগতের তুলনায় তিলোত্তমা শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য আর ঈশ্বরের তুলনায় চিতার ছাই। এই জিনিসটাকে মাথায় রাখলে বোঝা যায় *ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং* এই কথার মাধ্যমে কি বলতে চাইছেন। সৌন্দর্য জিনিসটাই তাঁর কাছে থেকে বেরচ্ছে। শাস্ত্রের এই ধরণের শ্লোকে যে বর্ণনা আছে এগুলোকে কাব্য বা কবিতা রূপে কখনই দেখতে নেই। কালীকির্তনে মায়ের যে বর্ণনা আছে সেখানেও এই একই জিনিস হয়। ঋষিরা বা সাধকরা সমাধির গভীরে এই জ্ঞান পেয়েছেন, তারপর তাঁরা বাস্তবিক ঐভাবেই দেখেন। আর বলছেন, যাঁর তেজ শত সূর্যের মত, যিনি শরণাগত ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন আর যিনি তাদের হৃদয়ে বাস করেন তাঁকে আমি প্রণাম করি।

এক এক করে ভগবানের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে জটায়ু স্তুতি করে যাচ্ছেন। বলছেন, এই যে সংসাররূপী অরণ্য, ভগবানের নাম দাবানলের মত এই সংসাররূপী অরণ্যকে ভস্মিভূত করে দেয়। যিনি মহাদেবাদি দেবগণেরও দেবতাস্বরূপ, যিনি সহস্রকোটি দৈত্য নাশ করে পৃথিবীর ভার হরণ করেন, আমি সেই নীলকান্তি শোভিত পরম দয়াময় হরির শরণাপন্ন হই। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম এই তিনটে জিনিস। আমাদের স্বরূপের ব্যাপারে অজ্ঞান থেকে আসে কামনা-বাসনা, কামনা-বাসনা মানেই অপূর্ণতা, অপূর্ণতা দূর করবার জন্য কর্মের সৃষ্টি হয়, কর্ম থেকে অবিদ্যা বিস্তার পায়, অবিদ্যা থেকে আরও কামনা আসে, আরও কর্ম করা শুরু হয়, যত কর্ম হবে তত আরও অজ্ঞানতা বাড়ছে। এর থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। আমরা মনে করছি আমি নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করছি, এই কাজ করে দিলে আমার শান্তি, কখনই শান্তি হয়ে যাবে না। একটা ইচ্ছা মিটে গেলে আরও দু-চারটে ইচ্ছা এসে যাবে। সেই ইচ্ছা থেকে আরও ইচ্ছা এসে হাজির হয়ে যাবে। এখান থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। বাঁচার উপায় হল, এর উৎসকে কাটতে হবে, তার মানে অবিদ্যাকে কাটতে হবে। অবিদ্যাকে কাটা মানে বিদ্যার আশ্রয় নেওয়া, বিদ্যার আশ্রয় নেওয়া মানে, ঈশ্বরের নামগুণগান, জপ-ধ্যান। ঈশ্বরের নাম ধ্যান অবিদ্যাকে উড়িয়ে দেয়। অবিদ্যাকে উড়িয়ে দেওয়া মানেই সংসাররূপী এই গহন অরণ্যে যেন দাবানল লেগে গেল। একটা একটা

করে গাছ কাটতে থাকলে কোন দিন, কোন যুগেও এই অরণ্যের নাশ হবে না। যতক্ষণ একটা গাছ কাটবে ততক্ষণে আরেকটা গাছ দাঁড়িয়ে যাবে। এই অরণ্যেকে নাশ করার একটাই পথ, আগুন লাগিয়ে দেওয়া। আগুন লাগানো মানেই হয় ভগবানের নাম নেওয়া। ঈশ্বরের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে এই অরণ্যের নাশ হবে না। একটাই পথ, তা হল ঈশ্বরের পথ, ঈশ্বরের ধ্যানের পথই হোক, ঈশ্বরের নামগুণগান করার পথই হোক, বিচারের পথই হোক, যে পথই হোক, ঈশ্বরের পথ না ধরলে নাশ হবে না। তার সাথে বলছেন *অবিরতভবভাবনাতিদূরম্*, সংসারের প্রতি ভালোবাসা যাদের প্রবল তাদের থেকে ভগবান অনেক দূরে আর ভগবানকে যাঁরা ভালোবাসেন ভগবান তাঁদের খুব কাছে কাছে থাকেন আর তিনি সব সময় তাঁদের দৃষ্টি রাখেন। এই ভাবটা উপনিষদাদিতে বারবার আসে, আত্মাকে দেখা যায় না, আত্মাকে দেখা যায়, আত্মা সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম, আত্মা বৃহৎ থেকেও বৃহৎ, এই ধরণের বিপরীত ভাব নিয়ে আসা হয়। এখানে দেখাতে চাইছেন বাসনা যাদের আছে তারা কখনই ভগবানের কাছে যেতে পারবে না। যাদের মন থেকে সব বাসনা চলে গেছে, শুধু ভগবানকে চাইছে তারা নিত্য ভগবানকে দেখতে পায়। এইভাবে অনেক কিছু বলার পর জটায়ু বলছেন –

পরধনপরদারবর্জিতানাং পরগুণভূষিতং তুষ্টমানসানাম্।
পরহিত নিরতাত্মানাং সুসেব্যং রঘুবরম্বুজলোচনং প্রপদ্যে।৩/৮/৫০

অপরের সম্পত্তি যারা লোভ করে না আর পরস্ত্রী থেকে যারা দূরে থাকে, অপরের কোন গুণ ও বিভূতি দেখে যারা প্রসন্ন হয়, আমাদের উল্টোটা হয়, অপরের নামযশ, গুণ, বিভূতি দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে, এই ধরণের মহাত্মা যাঁরা আছেন, যাঁদের মন সব সময় উচ্চ অবস্থায় থাকে তাঁরা সব সময় যাঁর পাদপদ্মের সব সময় সেবা করেন সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। যখন এখানে বলছেন *পরধনপরদারবর্জিতানাং*, অপরের টাকা, অপরের সম্পত্তি, পরস্ত্রী এগুলোর দিকে দৃষ্টি থাকা মানে, এটাই সংসারী লোকেদের লক্ষণ। অপরের ঐশ্বর্য, গুণ দেখে আনন্দিত হওয়া, তার মানে তিনি তার থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চাইছেন না।

হরিকমলজশম্ভূরূপ ভেদাৎ ত্বমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ।
রবিরিব জলপূরতোদপাত্রেষ্বমরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীড়ে।৩/৮/৫২

বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে যেমন একই সূর্য বিভিন্ন ভাবে প্রতীত হয়, পাত্রের যেমনটি আকার সূর্যও তেমনটি প্রতীত হয়। ঠিক তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এই তিনজনের যে রূপ দেখা যায় সেটা আপনারই ভাসমান রূপ। জগতে যা কিছু আছে সেই এ্যাটম, ঐ এ্যাটমের মধ্যে যে ইলেক্ট্রন, তারও সূক্ষ্ম প্রোটন বা কোয়ার্কে চলে যাওয়া হয়, আর সেখান থেকে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবেতে ভগবানরই রূপ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। জগতে এমন কোন জিনিস নেই যেখানে ভগবানের রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। উপনিষদে বলছেন *ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি*, তুমিই স্ত্রী, তুমিই সেই পুরুষ, সব কিছুতে তিনিই ভাসমান। সৃষ্টি তত্ত্ব দিয়ে দেখলে প্রথমে দেখা যায় প্রকৃতিকে, প্রকৃতি হল সত্ত্ব, রজো আর তমো, তাই প্রকৃতিকে বলা হয় ত্রিগুণাত্মিকা। সেখান থেকে আরেকটু নীচে এসে যেখানে সূক্ষ্ম থেকে আরও একটু স্থূল রূপে এসে গেল তাকে বলছেন মহৎ। মহৎ থেকে আরেকটু স্থূল হওয়ার পর আসে অহঙ্কার, অহঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসে পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে আসে পঞ্চ মহাভূত, সেখান থেকে তৈরী হয় এই ইন্দ্রিয়গুলি, এরপর ধীরে ধীরে সব বস্তুগুলো তৈরী হয়ে যায়। সেই প্রকৃতি থেকে শুরু করে নীচে স্থূল বস্তু পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছুতে ভগবান ভাসমান। সকালবেলা ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু দেখা যায়, ঐ শিশির বিন্দুতেও সমস্ত আকাশ সূর্য সহ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। পাশে বিশাল জলাশয় সেখানেও সূর্য প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। যে সূর্যের ব্যাপারে কিছু জানে না সে বলবে, ঘাসের ডগায় সূর্যটা কত ছোট, জলাশয় সূর্যকে কত বড় দেখাচ্ছে।

প্রকৃতি তিনটে গুণের সমাহার, সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণ একসাথে থাকে কিন্তু এদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন আর কখনই এক হয়ে যাবে না। সগুণ সাকারের যদি কল্পনা করি, যিনি সেই সচ্চিদানন্দ তিনি যখন প্রতিবিম্বিত হন, প্রথম প্রতিবিম্বিত হন এ্যাটমিক স্তরে, সেখান থেকে উঠে উঠে প্রকৃতির স্তরে। প্রকৃতির স্তরে গিয়ে যে পার্টিকেলস গুলিতে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন সেখানে এক রকম প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন, রজোতে এক রকম, তমোতে আরেক রকম। তিনি সেই এক, সত্ত্বতে যখন তিনি প্রতিবিম্বিত হন তখন তাঁকে বলছি ব্রহ্মা, রজোতে বিষ্ণু আর তমোতে শিব। সবই সেই সচ্চিদানন্দের প্রতিবিম্ব। যিনি শিবের ভক্ত তিনি বলবেন সচ্চিদানন্দ মানে শিব, সেখানে কোন দোষ হবে না, শুধু নামের খেলা, সিদ্ধান্ত কখনই পাল্টাবে না। যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন,

তিনি সত্ত্বতে প্রতিবিম্বিত হলে এক রকম, রজোতে প্রতিবিম্বিত হলে আরেক রকম আর তমোতে যখন প্রতিবিম্বিত হন তখন অন্য রকম দেখান। তেমনি মহৎ তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হলে তাঁকে এক রকম দেখাবে, অহঙ্কার তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হলে আরে রকম দেখাবেন। সেখান থেকে নামতে নামতে পঞ্চ মহাভূতে প্রতিবিম্বিত হলে আরেক রকম, সেখান থেকে আমাদের সবার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে বিভিন্ন রকম দেখাচ্ছেন। তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। তাহলে কোনটা সত্য সচ্চিদানন্দ সত্য নাকি তাঁর এই প্রতিবিম্ব গুলো সত্য? ঠাকুর কিন্তু বলছেন প্রতিবিম্বিত সূর্যও সত্য। কি করে সত্য? যতক্ষণ আমি বোধ আছে ততক্ষণ প্রতিবিম্বিত সূর্য সত্য। ঠাকুর আরও বলছেন, এই প্রতিবিম্বিত সূর্যকে ধরেই আসল সূর্যে পৌঁছান যায়। প্রতিবিম্বিত সূর্য যদি না দেখে থাকে তাহলে কি করে বিশ্বাস হবে যে বাস্তব সূর্য আছে! সেইজন্য ঈশ্বরকে দেখতে হলে প্রথমে তাঁকে জীবের মধ্যে দেখতে হবে, যোগ যেমন একটা একটা ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রথমে জীবের মধ্যে দেখছেন, তারপর মনকে আরও সূক্ষ্ম করে, সূক্ষ্মতম থেকে সূক্ষ্মতর করে করে শেষে গিয়ে দাঁড়াবে সগুণ সাকার রূপে, যেখানে সত্ত্ব, রজো ও তমো তিনটে আলাদা আলাদা গুণকে দেখিয়ে দিচ্ছে বা তিনটে একই রূপে যখন দেখেন তখন বিষ্ণু রূপে দেখছেন, এরপর ঐ প্রতিবিম্বটাও শেষ হয়ে গেল, যেখানে প্রতিবিম্ব বলে কিছু থাকছে না তখন কেউ কাউকেই দেখছেন না। ঈশ্বর দর্শন এই পদ্ধতিতেই হয়। প্রতিবিম্বকে ধরে ধরে শেষ ঐ অবস্থায় যায়। এটাই একমাত্র পথ, অন্য কোন পথ নেই।

শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করতে গিয়ে জটায়ু বলছেন, জগতে যা কিছু আছে প্রতিবিম্বিত সূর্যের স্বরূপের মত সব আপনারই স্বরূপ। পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সচ্চিদানন্দেরই প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্ব এখানে বাইরে থেকে হচ্ছে না, ভেতর থেকে হচ্ছে, ভেতরেই আলো জ্বলছে, সেই আলোই প্রতিবিম্বিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ সব থেকে স্বচ্ছ ও বৃহৎ আধার যেখানে সব থেকে ভালো প্রতিবিম্ব হয়, এর থেকে ভালো আর কোন কিছুতে সচ্চিদানন্দ প্রতিবিম্বিত হন না। যাঁরা ঐ বিষ্ণু বা শিবের কাছে পৌঁছে গেলেন তাঁরা অনেকে মনে করেন আমি এতেই সন্তুষ্ট আমার আর কিছু লাগবে না। আবার অনেকে মনে করেন আমার আর কোন প্রতিবিম্ব লাগবে না তখন তাঁরা ভগবান বিষ্ণুকেই সচ্চিদানন্দ রূপে গ্রহণ করেন। বিষ্ণু বললে দুটো অর্থ আসে, একটা হল সচ্চিদানন্দ যিনি তাঁরও নাম বিষ্ণু আবার যিনি জগতপালয়িকা তাঁকেও বিষ্ণু বলে আবার বিষ্ণু নামে দেবতাও আছেন। কখন কোন বিষ্ণুর কথা বলতে চাইছেন বোঝা যায় না। জটায়ু বলছেন এটাই আপনার সচ্চিদানন্দ রূপ, যে রূপ ঋষি-মুনিদের হৃদয়ে সর্বদা ভাসমান, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি। শেষে গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন, যে ব্যক্তি জটায়ুর এই স্তুতিকে শ্রবণ করে বা লিপিবদ্ধ করে, কিংবা সংযত হয়ে প্রতিদিন পাঠ করবে মৃত্যুর সময় সেই ব্যক্তির অবশ্যই শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ হবে এবং অন্তে সারূপ্য লাভ করবে।

কবন্ধ উদ্ধার

এরপর আসছে কবন্ধ উদ্ধার। শ্রীরামচন্দ্র ক্রমশ দক্ষিণের দিকে এগিয়ে আরও গভীরে চলে গেছেন। এগিয়ে যাওয়ার পর দেখছেন এক বিশাল কিম্ভূত বিচিত্র রাক্ষস, তার বিরাট মুখ কিন্তু সেই মুখে কোন চোখ, কান নেই অথচ তার হাত দুটো বিরাট লম্বা। বলছেন হাতগুলো এক যোজন লম্বা। যোজনের হিসাব আবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম, তবে বিরাট লম্বা, পাঁচ-ছয় মাইল হবে। শ্রীরামচন্দ্র আর লক্ষ্মণ বুঝতেও পারলেন না কখন তাঁরা কবন্ধের বাহুর মধ্যে জড়িয়ে গেছেন। লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্র বলছে, দেখো কী আশ্চর্য এর হাত দুটোই আছে, পা বা অন্য কিছু নেই, কবন্ধের বুকটাই ওর মুখ। ওর হাতের নাগালে যা কিছু জীবজন্তু পায় সেটাই ধরে মুখে পুরে দেয়। এর থেকে আমরা আর বাঁচতে পারব না। লক্ষ্মণ তখন বলছেন, আপনি চিন্তা করছেন কেন, বিলম্ব না করে এর দুটো হাতকেই আমরা কেটে দিচ্ছি। লক্ষ্মণের কথায় সম্মত হয়ে শ্রীরামচন্দ্র খড়্গ দিয়ে তার ডান হাত কেটে দিয়েছেন, আর লক্ষ্মণ বাম হাত কেটে দিলেন। কবন্ধের হাত দুটো কাটা হয়ে যাওয়ার পর সে খুব অবাক হয়ে বলছে, আপনারা কারা, কারণ এই তিনটে লোকে কারুরই সামর্থ নেই যে আমার হাত কেটে দেবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র নিজের পরিচয় দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, আমরা দুই ভাই, আমার নাম শ্রীরামচন্দ্র আর আমার ভাই লক্ষ্মণ। আমার ভার্যা সীতাকে রাবণ অপহরণ করে নিয়ে চলে গেছে, আমরা সীতারই অন্বেষণ করতে করতে এখানে এসে পড়েছি। আর এখন আমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য তোমার হাত কাটলাম। কিন্তু তুমি আমাদের বল তুমি কে, এই রকম এক বিকট বিচিত্র শরীরে তোমার আসল পরিচয়টা কি? তখন কবন্ধ বলছে,

আপনার দর্শন পেয়ে আমি ধন্য হয়ে গেলাম। কবন্ধ বলছে, পুরা কালে আমি অনেক তপস্যাদি করেছিলাম, সেই তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে আমি এই বর পেয়েছিলাম আমাকে যেন কেউ বধ না করতে পারে। কবন্ধ বলছে –

বিচরন্ লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ।
তপসা ব্রহ্মণো লব্ধমবধ্যত্বং রঘুত্তম।**৩/৯/১৬**

ব্রহ্মার কাছে আমি বর পাওয়াতে আমি অবধ্য হয়ে গেলাম, এবার আমার আর কোন ভয় নেই। আমি হলাম গন্ধর্বের রাজা, গন্ধর্ব হওয়াতে আমি একেই রূপবান আর তার সাথে ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত। এরপর যত সুন্দরী নারী দেখতাম আমি তাদের মন কেড়ে নিতাম, সুন্দরী রমণীদের নিয়ে আমি সমস্ত লোকে বিচরণ করতাম, তাতেই আমি ভোগে পুরোপুরি লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। যদি কেউ ভোগে লিপ্ত হয় আর কোন কিছু থেকে ভয়ও যদি না থাকে তখন সে কোথায় গিয়ে পড়বে তার কোন ঠিক থাকে না। ভোগের এটাই সমস্যা, গড়াতে গড়াতে কোথায় কোন অবস্থায় চলে যাবে কোন হুঁশ থাকবে না। ঠিক তেমনি যখন কেউ পাপকর্ম করতে শুরু করে, করতে করতে একটা সময় পাপকর্মের প্রতি ঘেন্নাটা চলে যায়। ভোগ করতে করতে ভয় চলে যায়। পাপকর্মের প্রতি ঘেন্না চলে গেলে তখন বলবে বেশ আছি, তারপর কোথায় তলিয়ে যাবে টেরই পাবে না। পাপকর্ম করতে করতে মনে হয় আমাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। এবার তার ভয়ও চলে গেল। ভোগ অনেক রকমের হয়, ঘর সংসারে আছে, সব কিছুতে পরিপূর্ণ, টাকা-পয়সা আছে, সন্তান আছে, নাতি আছে বন্ধু-বান্ধব আছে, সবাইকে নিয়ে খুব আনন্দে আছে, এটাও ভোগ। তখন মনে হবে কত সুখ। তারপর হঠাৎ এমন কিছু হয়ে গেল তাতে সংসারটা তছনছ হয়ে গেল। কবন্ধেরও এখন সব কিছু ভালো চলছে, তার ভয় চলে গেছে। একদিন কি হল –

অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদ্‌হসং পুরা।
ক্রুদ্ধোহসাবাহ দুষ্ট ত্বং রাক্ষসো ভব দুর্মতে।**৩/৯/১৭**

মহাভারতে অষ্টাবক্র ঋষির নাম পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষি শ্বেতকেতুর তিনি ভাগ্নে ছিলেন। মায়ের গর্ভেই অষ্টাবক্রের জ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অষ্টাবক্রের পিতা একদিন সকালে বেদমন্ত্র পাঠ করছিলেন, কিন্তু পাঠ করার সময় ভুলভাল উচ্চারণ করছিলেন। মায়ের গর্ভ থেকেই অষ্টাবক্র বলছেন বাবা! আপনি মন্ত্রের ভুলভাল উচ্চারণ করছেন, আমার কষ্ট হচ্ছে, আপনি উচ্চারণটা ঠিক করুন। তাতে বাবা খুব রেগে গেছেন, মায়ের গর্ভেই এই রকম ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলছে, পরে তুমি কি করবে! এই যে তুমি ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলছ তোমার অঙ্গগুলোও এই রকম এ্যাঁকা ব্যাঁকা হবে। পরে যখন জন্ম নিলেন তখন তাঁর শরীরের আট জায়গা ব্যাঁকা হয়ে জন্ম নিলেন, সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেলে অষ্টাবক্র। পরে অষ্টাবক্র বিরাট ঋষি হয়েছিলেন, অষ্টাবক্র গীতা খুব নামকরা অদ্বৈত গ্রন্থ। অষ্টাবক্র যেখানেই যেতেন সেখানে তাঁকে দেখে সবাই হাসাহাসি করত, হাত, পা সব ব্যাঁকা কিনা, অথচ তিনি পূর্ণজ্ঞানী ছিলেন। অষ্টবক্রকে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে। একটা কাহিনী আছে, একবার অষ্টাবক্র জনকের রাজদরবারে গেছেন, লোকেরা তাঁকে দেখেই হেসে ফেলেছে। অষ্টাবক্র তখন রাজা জনককে বলছেন, আপনি নিজে জ্ঞানী কিন্তু দরবারে আপনি সব চামারদের আশ্রয় দিয়েছেন। অষ্টাবক্রের কথাতে সবাই খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের চামার বলছেন, এর ব্যাখ্যা করুন। তখন রাজা জনককে তিনি বলছেন, এরা সবাই শুধু চামড়া দিয়ে বিচার করে একটা জিনিসকে সম্মান করে। চর্মকাররাই চামড়ার কদর করে, এটাই তাদের কাজ। যাই হোক, অষ্টাবক্র ঋষিকে দেখে গন্ধর্ব হেসে ফেলেছে। যার রূপ আছে, যৌবন আছে সে নিজের অহঙ্কার বশতঃ রূপহীন, যৌবনহীন মানুষকে অবজ্ঞা করে। বুড়ো মানুষ, যাদের রূপ নেই, যৌবন নেই তাদের দেখে বাচ্চারাও হাসে। অষ্টাবক্র তখন প্রচণ্ড রেগে গেছেন। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে মুনিরা খুব শান্ত শিষ্ট হন, কিন্তু তা না, তাঁরাও প্রচণ্ড রেগে যান। মুনিদের আবার তপস্যার শক্তি থাকে, রেগে গিয়ে কি করে দেবেন কোন ঠিক নেই।

অষ্টাবক্র রেগে গন্ধর্বকে বললেন, তোমার এত দুষ্ট স্বভাব! ঠিক আছে তুমি রাক্ষস হয়ে দিন কাটাতে থাক। কবন্ধ ছিল গন্ধর্বরাজ, তার ভোগের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, সেখান থেকে হয়ে গেল একটা রাক্ষস। রাক্ষস হয়ে যাওয়া মানে, জন্তু জানোয়ার মেরে, মানুষদের মেরে তাদের মাংস খাবে। নিমেষের মধ্যে এত ঐশ্বর্যবান একজন গন্ধর্ব হয়ে গেল রাক্ষস, কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়ল। গন্ধর্ব ভয় পেয়ে অষ্টাবক্রের স্তুতি করতে শুরু করে দিল। আমার ভুল হয়ে গেছে, অজান্তায় এই পাপ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন। মানুষ যদি বুঝে যায় তার সামনের লোকটির তেজ আছে তখন সে ভীত হয়ে যায়। অষ্টাবক্র মুনি বললেন, ঠিক আছে

এই রাক্ষস যোনি থেকে তুমি সেইদিন মুক্ত হবে, ত্রেতা যুগে যেদিন ভগবান নারায়ণ দাশরথি রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে এখানে আগমন করে তোমার যোজন পরিমিত বাহুদ্বয় ছেদন করে দেবেন। এখন কবন্ধ রাক্ষস হয়ে গেছে, অন্য দিকে সে ব্রহ্মার বরে অবধ্য। একদিন কোন কারণে ইন্দ্রের উপর রেগে গিয়ে ইন্দ্রকে ধরতে গেছে। ইন্দ্রকে ধরতে যেতেই ইন্দ্র কবন্ধের মাথার উপর প্রচণ্ড জোরে নিজের বজ্র চালিয়ে দিয়েছেন। বজ্র তো চালিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এই রাক্ষস তো অবধ্য, তার মাথাটা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে আর ঐ চাপে পা দুটো পেটে ঢুকে গেছে। কিন্তু কবন্ধের মৃত্যু হবে না, সেও খুব বলশালী। মাথা, বুক আর পা সব এক হয়ে পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। মুখবর্জিত হয়ে এর খাওয়া-দাওয়া এখন কিভাবে হবে? সবাই তখন দয়াপরবশ হয়ে ইন্দ্রকে বলল, আপনি যা করলেন এতে এই রাক্ষস এখন কিভাবে জীবনধারণ করবে? সবার অনুরোধে ইন্দ্র এসে বলল, এই পেটটাই তোমার মুখ, তোমার হাত দুটো এক যোজন লম্বা হয়ে যাবে আরে তোমার বাহুর মধ্যে যে আসবে তাকেই তুমি খেতে পারবে। সেখান থেকে তার নাম হয়ে গেলে কবন্ধ। ঋষিরা অজগর সাপ দেখেছিলেন, অজগর সাপের এলাকার মধ্যে যে আসবে তাকেই সে গিলে নেয়। কবন্ধের দুই বাহু দুটো অজগর সাপ। অজগর সাপ পনের ষোল ফুট লম্বা হয়, এটাকে আরেকটু লম্বা করে দিয়েছেন। কাব্য মানেই তাই, জিনিসটাকে একটু টেনে নিয়ে যায়, এটাকেই অতিশয়োক্তি বলে। কিন্তু কাহিনীর উদ্দেশ্য হল ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের শিক্ষা দেওয়া।

কবন্ধের এখন জীবনের উদ্দেশ্যই হল শুধু খাওয়া। এই নিয়ে মজার ঘটনা আছে, দিল্লীতে তখনও মোঘল সাম্রাজ্য চলছে, এদিকে ইতিমধ্যে বৃটিশরা কলকাতায় ঢুকে গেছে। ইংরজদের প্রভাব বাড়তে শুরু হয়ে গেছে। তারও আগে আফগানিস্থানে ইংরেজরা ওখানে সবাইকে পিটিয়ে দিয়ে এসেছে। ঐতিহাসিকরা বর্ণনা দিচ্ছেন যে মোঘল আর বৃটিশদের জীবনধারা পুরো বিপরীত ছিল। ওখানে বৃটিশ রেজিমেন্ট ছিল, ভোর সাড়ে তিনটের সময় ওদের বিউগিল বাজত। ঘুম চোখে সৈন্যরা গিয়ে সব হাজির হয়ে যেত এরপর দু ঘন্টা ধরে তাদের ড্রিল চলত। মোঘলদের হারেমে তখন মুশায়ারা, নাচগান তখন তুঙ্গে। দিল্লীর গলি গলিতে তখন বাঈজীদের নাচ গান চলছে। বাহাদুর শা তখন দিল্লীর বাদশা, যার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সাড়ে পাঁচটায় যতক্ষণে বৃটিশ সৈন্যদের ড্রিল শেষ হয় তখন মোঘলরা ঘুমোতে যেত। মোঘলদের যখন তন্দ্রাটা খুব গভীর হয় তখন সাহেবদের ছোটা হাজির হত, ছোটা হাজির মানে early breakfast। বর্ণনা আছে যে ইংরেজরা দিনে ছয়বার খেত, ছয়বার খাওয়া মানে হাল্কা খাবার নয় একেবারে পেট ভর্তি খাওয়া। সাড়ে পাঁচটায় early breakfast, আর আটটার সময় হত breakfast, তাতে চার পাঁচ রকমের মাংস থাকত। এরপর দুপুরে লাঞ্চ, বিকেলে আবার বড় খাওয়া, রাত্রে আবার ডিনার। একজন নামকরা দার্শনিক বলছেন, ভারতে এসে ইংরজদের দেখলে মনে হয় পুরো বৃটিশ সাম্রাজ্য শুধু ইংরেজদের খাওয়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজরা যদি দিনে ছবার না খায় তাহলে মনে হবে যেন এক্ষুণি বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়ে যাবে। বলছেন, যে দেশের লোকেরা দু বেলা খায় আর যে দেশের বেশির ভাগ লোকেরা একবেলা খেয়ে থাকে, সেখানে সাহেবদের যখন ছবার খেতে দেখে তাতেই ওরা নার্ভাস হয়ে ভাবে, নিশ্চয়ই এরা আমাদের থেকে অনেক সুপিরিয়র। ছবার খেয়ে হজম করে নিচ্ছে তাতেই মনে হয় এরা বিরাট কিছু। এগুলো সব আসুরিক বৃত্তি, আসুরিক বৃত্তি মানে অনেক খেতে পারবে, খেয়েই যাবে। কবন্ধও ঠিক এই রকম, কবন্ধের জীবনটা দাঁড়িয়েই আছে বৃটিশদের খাওয়ার মত। বৃটিশরা ছবার খাচ্ছে আর লড়াই করে যাচ্ছে। কবন্ধও তাই করে যাচ্ছে, হাতের সীমানায় যে এসে যাচ্ছে তাকেই খপ্ করে ধরে সোজা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মুখ তো নেই, পেটটাই মুখ।

কবন্ধ নিজের জীবনের কাহিনী শ্রীরামচন্দ্রকে শোনাবার পর বলছে, হে রামচন্দ্র! আপনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন, আমিও আপনাকে সাহায্য করব, সীতার ব্যাপারে আমি বুঝতে পারব। কিন্তু আমার এই শরীরটা সীমিত, ইন্দ্রিয়ের অভাব হওয়ার জন্য আমি সীমিত জিনিসকেই গ্রহণ করতে পারি। যতক্ষণ আমি আগের শরীর না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব না। এর একটাই পথ, একটা গর্ত করে ওর মধ্যে আমাকে ফেলে আমাকে আগুন লাগিয়ে দিন, এই শরীরটা পুড়ে যাক। আমি অবধ্য, কিন্তু এই শরীরটা পুড়ে গেলে আমার আরেকটা শরীর বেরিয়ে আসবে, তখন আপনাকে আমি সীতার ব্যাপারে বলতে পারব। লক্ষ্মণ তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট গর্ত করে কবন্ধকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করে দিল। শরীরের তো কিছুই, না আছে মাথা, না আছে পা, দুটো হাত যাও বা ছিল সেটাও কাটা পড়ে গেছে। লক্ষ্মণ কাঠ দিয়ে কবন্ধের দাহ করতে শুরু করে দিলেন। তখন

কবন্ধের রাক্ষস দেহ থেকে আসল গন্ধর্ব বেরিয়ে এসেছে। সেই গন্ধর্ব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, রাবণ সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ দেশের দিকে গেছে, আপনি ঐদিকেই যান।

অষ্টাবক্রের অভিশাপে যে শরীর হয়েছিল সেই শরীর থেকে কবন্ধ মুক্তি পেয়ে গেল। যারা ভোগে লিপ্ত তাদের কাছি আমি মানে এই শরীর আর যে শরীরে এত রকম সীমাবদ্ধতা, সেই শরীর থেকে সবাইকেই বেরিয়ে যেতে হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও শরীরের প্রতি কি তীব্র আসক্তি। বৃদ্ধদের এত রোগশোক কিন্তু তাও শরীরের প্রতি আসক্তি যায় না। অনেক দিন শরীরের সাথে জড়িয়ে আছে কিনা, অনেক দিন জড়িয়ে থাকার জন্য শরীরের প্রতি একটা ভালোবাসা জন্মে যায়। বাড়িতে একটা পুরনো কাপ অনেক দিন ধরে ব্যবহার হচ্ছে, ভেঙে গেলে মন খারাপ হয়। অনেক দিন ধরে কোন কিছুর সাথে সঙ্গ হতে হতে সেটার প্রতি একটা আসক্তি জন্মায়। মানুষের সবচেয়ে বেশি আসক্তি হয় নিজের শরীরের প্রতি, কারণ তার মধ্যে যেদিন চেতানা এসেছে সেদিন থেকে সে নিজেকে শরীরের সাথে যুক্ত দেখছে। রোগগ্রস্থ, জীর্ণ শরীর ছেড়ে দিলে আমরা একটা ভালো শরীর পেয়ে যাব, কিন্তু চোখে দেখতে পাই না বলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না বলে জীর্ণ শরীরটা ছাড়তেও চাই না। কিন্তু সন্ন্যাসীরা একটা বয়সের পর থেকে বিরক্ত হয়ে বলতে শুরু করেন, এই শরীর দিয়ে যা করার ছিল, যা যা হওয়ার ছিল সব হয়ে গেছে এবার শরীরটা ছাড়তে পারলে বাঁচি। ভগবান বুদ্ধকে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল সেটা কোন কারণে বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাতে ভগবান বুদ্ধের শরীর চলে গেল। যে লোকটি খাবার নিয়ে এসেছিল সে খুব কাঁদছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। ভগবান বুদ্ধ হেসে বলছেন, তুমি কাঁদছ কেন, কত আনন্দের কথা এই শরীর থেকে আমাকে তুমি মুক্তি দিয়ে দিলে। ভগবান বুদ্ধের জীবনমুক্তি আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু দেহের মাধ্যমে যে চেতনা চলছে, দেহের পতন না হওয়া পর্যন্ত এই চেতনার মুক্তি হবে না, তাই জীবনমুক্ত পুরুষকেও শরীরের পতনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। একটা সচেতনতা না হলে হয় না। কবন্ধের যে এখানে সচেতনতা আছে তা নয়, তবে গন্ধর্ব ছিল এই বোধটা আছে, আর অষ্টাবক্র মুনিও বলে দিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র তোমার হাত দুটো কেটে দিলে তুমি আবার গন্ধর্ব শরীর পেয়ে যাবে। গন্ধর্বরাজের এখন খুব আনন্দ, আগের শরীর পেয়ে গেছে, সেই সৌন্দর্য আবার পেয়ে গেছে আর ব্রহ্মার বরে অবধ্য তো আছেই। এরপর সে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করে বলছে –

ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্।৩/৯/৩০

হে রাম! আপনি সর্বব্যাপী অনাদি, আপনার না আছে আদি না আছে অন্ত, তার সাথে আমি জানি আপনি মন ও বাণীর অবিষয়, কিন্তু তাও আমার মন চাইছে আপনার স্তুতি করি। অনন্ত মানে যাবতীয় যা কিছু আছে সেখানেই তিনি আছেন। আদি, অন্তহীন বলতে প্রায়ই লোকেরা বলে who created God, আমাদের সাধারণ জীবনে যা যা দেখি, শুনি সেগুলো ভগবানের উপর কল্পনা করি। ঠাকুরকে একজন বলছেন, মশাই! তিনি কাউকে ভালো করছেন, কাউকে মন্দ করছেন, তাহলে তো তাঁর বৈষম্য দোষ হয়ে যাবে। শুনে ঠাকুর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, তোমার তো দেখছি ভারী বেনে বুদ্ধি। যে রকম আমরা সংসারকে দেখছি, জগৎ যেমনটি আছে ঈশ্বরকেও আমরা তেমনটি দেখতে চাই। আমরা জানি মানুষের জন্ম হয়, মানুষের মৃত্যু হয়, আমরা তাই মনে করি ভগবানেরও আদি অন্ত আছে। বাণী দিয়ে সেটাকেই প্রকাশ করা যায় যেটাকে মন গ্রহণ করে। যোগসূত্রে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে *যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ*, চিত্তবৃত্তি যখন নিরোধ হয় তখনই যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। *তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্*, তখনই ঠিক ঠিক জ্ঞান হয়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান হবে না। চিত্তবৃত্তি যদি নিরোধই হয়ে গেল তাহলে জিনিসটাকে আমরা জানব কি করে? সেইজন্য বলা হয় জ্ঞান দুই প্রকার, বস্তু জ্ঞান আর ঈশ্বর জ্ঞান বা তত্ত্ব জ্ঞান। ইন্দ্রিয় ও মন ঈশ্বর জ্ঞানকে ধরতে পারে না, ভগবানকে তাই বলা হয় *অবাঙমনসগোচরম্*, তিনি মন আর বাণীর পারে। মন যাকে ধরতেই পারে না বাণী তার ব্যাপারে কি করে বলবে! আর বলছেন –

সূক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দেবদ্বয়বিলক্ষণম্।
দৃগ্রূপমিতরৎ সর্বং দৃশ্যং জড়মনাত্মকম্।৩/৯/৩১

আমরা মানছি যে আমাদের একটা স্থূল শরীর আছে, যেটাকে আমরা সব সময় দেখছি আর এই স্থূল শরীরের পেছনে একটা সূক্ষ্ম শরীর আছে। সূক্ষ্ম শরীরই মৃত্যুর সময় স্থূল শরীরকে ছেড়ে আরেকটা নতুন শরীর গ্রহণ করে। বেদান্তে বলছে মানুষের যেমন স্থূল শরীর আছে, স্থূল শরীরের পেছনে সূক্ষ্ম শরীর আছে, সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে কারণ শরীর আছে, গন্ধর্ব বলছে, তেমনি হে ভগবান! আপনার স্থূল শরীর হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটাকে

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি, তার পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর তাকে বলছে হিরণ্যগর্ভ বা বিরাটমূর্তি, তারও পেছনে যে কারণ শরীর তাকে যোগীরাও জানতে পারেন না। বলছেন, হে ভগবান্! আপনার বাইরে যা কিছু দৃশ্য বস্তু আছে সবই জড়, চৈতন্য শুধু আপনার। তাই এই জড় মন, বুদ্ধি আপনাকে কি করে জানবে! আর বলছে –

ভাবনাবিষয়ো বাম সূক্ষ্মং তে ধ্যাতৃমঙ্গলম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যত্রেদং দৃশ্যতে জগৎ।৩/৯/৩৪

যাবতীয় যা কিছু হয় আত্মাই তার সব কিছুর সাক্ষী। আমাদের স্তরে যা কিছু হচ্ছে, আমাদের হৃদয়ে যিনি চৈতন্য তিনি হলেন তার সাক্ষী। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হয় তার সাক্ষী সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। সেইজন্য তিনি কোন কিছুর বিষয় হন না, মনের বিষয় হন না, বাণীরও বিষয় হন না। এই যে নির্বিকার আত্মা, এই আত্মার জন্যই জগৎ আলোকিত হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে এটাই হল জ্ঞান মিশ্রিত ভক্তি বা ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞান। শুদ্ধ চৈতন্য যে কোন পরিকল্পিত হয়ে কোন রকমে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হয়ে গেছেন তা নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত করা হয়, কল্পনা করা হয়। আমরা যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি এটা নাম আর রূপের খেলা। গন্ধর্ব বলছে, আপনার যে ভাবনাময় শরীর, যেটা সূক্ষ্ম রূপ, তাতে জগতের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যত তিনটেই ভাসমান থাকে। ঈশ্বরই একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্যস্বরূপ হওয়ার জন্য জগতে কোন কিছু নেই যেটা তাঁর অজানা। কোন কিছু অজানা না থাকার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবটাই তিনি জানেন। প্রত্যেকটি প্রাণীর ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতও তিনি জানেন। আমরা প্রায়ই বলি বা শুনে থাকি যে, তিনি সব কিছু আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। ঠাকুরও অনেক জায়গায় এই কথা বলছেন। Predestine যে অর্থে বলা হয় আর আমরা যে অর্থে বলছি তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন, এখানে জিনিসটা ঠিক তা নয়। তাঁর এটা জানা আছে। আমি যদি সব কিছু আমার মতই করতে পারি, তাহলে তো তাঁর অজানা জিনিস এসে গেল, তাহলে তো predestine তিনি হলেন না। আমরা কি করব, কি করব না সবটাই ঈশ্বরের জানা আছে। যদি আমরা ঐ অর্থে predestine করি, কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই শরীর মনকে নিয়ে আসব ততক্ষণ তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন এসব কথা বলা যাবে না। তবে যাদের বোধ হয়ে গেছে তারা বলতে পারে যে তিনি সব কিছু জানেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান দেখাচ্ছেন কিভাবে সব বড় বড় যোদ্ধারা তার মুখের গহ্বরে ঢুকে যাচ্ছে। তার মানে, ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে তারই preview অর্জুনকে দেখিয়ে দিলেন। সেইজন্য বলছেন, যিনি চৈতন্য তাঁর সবটাই জানা আছে। যদি সবটাই জানা থাকে তাহলে তো খেলা হয়ে গেল, সবটাই মায়া হয়ে গেল।

পুরুষসূক্তমে বা অন্যান্য অনেক জায়গায় যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঠিক সেই রকম এখানেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভৌতিক পুরুষ রূপে ঈশ্বরের বর্ণনা করে দেখাচ্ছেন। তারই বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, যত লোক আছে সব লোক হল আপনার অঙ্গ, পাতাল আপনার পায়ের তলা। এইভাবে উপরের দিকে যেতে যেতে বলছেন, সূর্য চন্দ্র আপনার নেত্র, রুদ্র আপনার অহঙ্কার, বেদ আপনার বাণী, জনলোক আপনার মুখ, নক্ষত্রগণ আপনার দন্ত। কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু দেখছেন সবই ভগবানের রূপে দেখছেন। আর বলছেন, সবাইকে যে মায়া মোহিত করে রেখেছে সেই মায়াই আপনার হাসি। আপনার কটাক্ষ হল সৃষ্টি, আপনার সামনেরটা ধর্ম, আপনার পেছনটা অধর্ম। এখানে পুরুষ রূপে সামনে আর পেছনে কল্পনা করা হচ্ছে। মানুষের সামনে আর পেছনে কোন তফাৎ নেই, ঠিক তেমনি তাঁরও কোন তফাৎ নেই। কিন্তু এখানে ঈশ্বরকে একজন পুরুষ বা মানুষ রূপে কল্পনা করা হচ্ছে তাই বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করছেন। কেউ যদি এভাবে কল্পনা করতে পারে তাহলে ভাগবতাদিতে যে বর্ণনাগুলো আছে সেই বর্ণনাগুলো নিয়েও সে অনেক রকম কল্পনা করতে পারবে। তাছাড়া আমি নিজে যা কিছু দেখছি সেগুলোকে নিয়ে আমার যিনি ইষ্ট, তাঁর উপর আরোপ করে অনেক কিছু কল্পনা করতে পারি। আমরা সূর্য আর চন্দ্র রোজ দেখছি, দিনে সূর্য আকাশে রাজ করে আর রাতের আকাশে চন্দ্রমা রাজ করে, সেখানে আমি কল্পনা করছি সূর্য আর চন্দ্র আমার ইষ্টের চোখ।

আরও বলছেন, যত রকম বৃক্ষ, যত রকমের ছোট ছোট গাছপালা এগুলো সব যেন আপনার শরীরের লোম। আপনার এই স্থূল ভূতের বাইরে কোন পদার্থ নেই, কারণ যা কিছু স্থূল ভূত আছে সব আপনার শরীরের অঙ্গ। আমি আপনার এই বিরাট রূপের সব সময় চিন্তন করি তাতে আমার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হয়। যাঁরা জপধ্যান করেন তাঁরা জানেন জপ করতে করতে যখন মন একাগ্র হতে শুরু হয় তখন ধ্যান করতে ভালো লাগে।

ধ্যান আবার অনেক রকমের হয়, ধ্যানের একটা হয় রূপ চিন্তন। ইষ্টের যে রূপ, ছবিতে বা মূর্তিতে যেটা দেখা হয়েছে, সেই রূপের ধ্যান করতে করতে সেই ছবিকে সজীব বলে মনে হয়। কিন্তু এর আরেক রকম ধ্যান হয় যখন তাঁর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঈশ্বরের ভৌতিক শরীর রূপে বিরাটের ধ্যান করা হয়, চোখ চেয়েও যখন দেখবে তখনও এই বিরাট বিশ্বকে ঈশ্বরের ভৌতিক শরীর বলে মনে হবে। যদিও এখানে কল্পনার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু এগুলোই ধ্যানের বিষয়, প্রথম অবস্থায় কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। যাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ ইষ্ট, তিনি যখন ঠাকুরের ধ্যান করবেন সেখানেও তখন দু রকমের ধ্যান হবে, গুরু দীক্ষার সময় ঠাকুরের যে রূপ দেখিয়ে বলে দিয়েছেন এই রূপে ধ্যান করবে, তখন ঐ রূপেই তাঁকে ধ্যান করে যেতে হবে। দ্বিতীয় ধ্যান হল, শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট রূপের, যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছি এটাই শ্রীরামকৃষ্ণের বিরাট রূপ। ঈশ্বরের বিরাট রূপের যখন চিন্তন করা হয় তখন এই চিন্তনই জ্ঞানে পরিণত হয় যার ফলস্বরূপ জীবন ধন্য হয়ে যায়। এসব বলার পর গন্ধর্ব বলছেন, হে রামচন্দ্র! যদিও আমি এই রকম ধ্যান করি তবে আপনার ধনুর্বাণধারী জটাবল্কলভূষিত নবদুর্বাদলশ্যাম এই রামরূপ লক্ষ্মণের সাথে সীতার অন্বেষনে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে, এই রূপ যেন আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক থাকে। হে রঘুনন্দন! আপনার এই যে দুটো রূপ, এই রূপই ভগবান শিব ধ্যান করেন এবং সদা রাম রাম জপ করতে থাকেন, আর কাশীক্ষেত্রে যাদের মৃত্যু হয় সেই মুমুর্ষুদের কর্ণরন্ধ্রে তারক মন্ত্র দিয়ে তিনি নিজেও আনন্দ লাভ করেন আর অপরকে মুক্তি দিয়ে দেন। ঠাকুরও সাক্ষাৎ এই ঘটনা দেখেছিলেন তিনি বর্ণনা করছেন কাশীতে যারা মারা যাচ্ছে তাদের সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে আসছে আর শিব তাদের কানে তারক মন্ত্র অর্থাৎ রাম নাম দিয়ে দিচ্ছেন আর মা তার পাশ খুলে দিচ্ছেন। হে অযোধ্যাপতি! আপনিই সে পরমাত্মা, আপনারই মায়াতে সবাই মোহিত, সেইজন্য আপনার বাস্তবিক স্বরূপকে কেউ জানতে পারে না, আমি আপনার সৌমিত্রি সেবিত রামরূপকে প্রণাম করি। হে প্রভু! আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্বলোক মোহিনী মায়া যেন আমাকে বশীভূত না করতে পারে। শ্রীরামচন্দ্র তখন খুব খুশী হয়ে বলছেন, তোমার এই স্তুতি যে পাঠ করবে তার অজ্ঞান চলে যাবে, আর অন্তকালে আমাকে লাভ করবে। এরপর গন্ধর্ব শ্রীরামচন্দ্রকে শবরীর কথা বললেন। এখান থেকে বেরিয়ে শ্রীরামচন্দ্র এবার শবরীর আশ্রমের দিকে এগোতে থাকলেন।

শবরীর কাহিনী

অনেক আগে থেকেই আমাদের একটা ধারণা চলে আসছে যে একটা শরীরের মধ্যে আরেকটা শরীর। কবন্ধকে দাহ করার সময় শ্রীরামচন্দ্র দেখলেন কবন্ধের যে রাক্ষসের শরীর সেই শরীর থেকে আরেকটা দিব্য শরীর বেরিয়ে এল। শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণেই নেই, এই ধারণা অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর এই দুটো শরীরের কথা আমরা সব সময়ই শুনতে পাই। আমরা এও মনে করি যে সূক্ষ্ম শরীর অনেক দিন ধরে চলতে থাকে, স্থূল শরীরের পরিবর্তন পুরোপুরি নির্ভর করে খাওয়া-দাওয়া আর পরিবেশের উপর। সূক্ষ্ম শরীর যেটা ভেতরে আছে, সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে চরিত্র গঠন হয়, যার যেমন ভাবনা চিন্তা সেই অনুসারে সূক্ষ্ম শরীরটাও পাল্টায়। মৃত্যুর সময় এই সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীরকে ছেড়ে দিয়ে আরেকটা জায়গায় ঢুকে যায়, সেখান থেকে আবার একটা স্থূল শরীর পায়, সেটার সাহায্যে নিজেকে পরিবর্তন করতে থাকে। সেইজন্য স্থূল শরীরের বেশি মূল্য নেই। একটা মূল্য আছে, ঐ স্থূল শরীর দিয়ে সব কাজ করা হয় বলে, মনের যে পরিবর্তন হয়, চরিত্রের যে পরিবর্তন হয় তখন ঐ স্থূল শরীরের সাহায্যেই হয়। স্থূল শরীরের এই সাহায্যের জন্য তারও একটা গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু স্থূল শরীর যদি খসে যায় বা মারা গেল এতে কিছু আসে যায় না। কারণ আসল হল সূক্ষ্ম শরীর, আমি বলতে ঠিক ঠিক যেটা বোঝায় সেটাই সূক্ষ্ম শরীর। সেই সূক্ষ্ম শরীরের পেছনেও আবার আরেকটা জিনিস আছে। কিন্তু কবন্ধের ক্ষেত্রে এখানে দেখাচ্ছেন কবন্ধের শরীর থেকে একজন গন্ধর্ব বেরিয়ে এলেন। এই গন্ধর্ব অভিশপ্ত, অভিশাপের ফলে সে ঢুকে গেছে একটা স্থূল শরীরে। এখন তার আচার, ব্যবহার সব কিছু ঐ স্থূল শরীর অনুযায়ীই চলতে থাকবে। সেখানেও তার গন্ধর্ব শরীরের একটু চেতনা থেকে গেছে। গন্ধর্ব শরীরের পুরো চেতনা যদি থাকে তাহলে কবন্ধ যেভাবে সবাইকে মেরে খেয়ে যাচ্ছিল সেটা আর করতে পারবে না। এই ধরণের ঘটনা অন্যান্য ধর্মেও কাহিনী রূপে এসেছে।

মুসলমান ধর্মে নামকরা অনেক কাহিনীর মধ্যে আরব্যরজনীতে একটা কাহিনী আছে যেখানে একটা ডাইনী কোন পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। লোকটি সারাটা দিন এখন ভেড়া হয়ে থাকে আর রাত্রিবেলা কানে মন্ত্র দিয়ে দিলে আবার মানুষ হয়ে যায়। কবন্ধের মত কাহিনী আরব্যরজনীতেও আছে আর একটা দুটো নয় প্রচুর

কাহিনী আছে। মানুষকে ছাগল বা ভেড়া করে দেওয়াতে একটা জায়গায় বড় পরিবর্তন হয়, যাকে পাল্টানো হয়েছে তার হুঁশটা থেকে যায় যে আমি হলাম অমুক। সে জানে আমার বাইরের আবরণটা অন্য রকম হয়ে আছে, সেইজন্য তাদের দুঃখটাও বেশি সহ্য করতে হয়। এখানে অভিশাপে গন্ধর্ব থেকে কবন্ধ রাক্ষস হয়ে গেল, জিনিসটা একই। কিন্তু তফাৎ হল, যার শরীরটা পাল্টে দেওয়া হয়েছে তার তখন ঐ শরীরের বোধটাই চলতে থাকে, চেতনা একটু থেকে যায় কিন্তু খুব বেশি থাকে না। যদি একজনের চেতনা বেশি থেকেও যায় তাও তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। তখন যেমনটি পাবে তেমনটিই খাবে। যতই চেতনা থাকুক, ঐ শরীরের বোধ নিয়েই তাকে থাকতে হয়। অভিশাপ যেমনি কেটে গেল তখন সে আগের শরীরেই ফেরত চলে যায়। অভিশপ্ত শরীরে অবস্থান কালে যে পাপকর্ম গুলো করেছে সেই পাপকর্ম গুলো তাকে আর তখন স্পর্শ করবে না। কিন্তু স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীরে তা হয় না, স্থূল শরীর দিয়ে যা কিছু করবে সেটা সূক্ষ্ম শরীরকেও স্পর্শ করবে।

বাল্মীকি রামায়ণে আছে, কবন্ধ বলছে, আমি এই শরীরে আছি বলে আমি এখন বলতে পারব না। কবন্ধের শরীর চলে যেতেই যেমনি গন্ধর্ব বেরিয়ে এসেছে তখন তার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। শক্তি বেড়ে যেতেই গন্ধর্ব শ্রীরামচন্দ্রকে বলে দিল, রাবণ সীতাকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে গেছে, আপনি আরও দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যান সেখানে আপনি সাহায্য পাবেন। গন্ধর্বের কথা মত শ্রীরামচন্দ্র এবার দক্ষিণ দিকে এগোতে শুরু করেছেন। এগোতে এগোতে দেখছেন সামনে একটা খুব সুন্দর আশ্রম। এটাই শবরীর আশ্রম। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই জঙ্গলে এত হিংস্র জন্তু জানোয়ার বিচরণ করে, তার মধ্যে আশ্রম! আশ্রমে এক বয়স্কা মহিলা শবরী তপস্যা করেন। শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সাথে আসতে দেখেই –

পতিত্বা পাদয়োরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনা।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ।৩/১০/৬

তৎক্ষণাৎ শ্রীরামের পদযুগলে লুটিয়ে পড়লেন আর আনন্দে তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরতে লাগল। পরস্পর কুশল সম্ভাষণাদি করার পর শবরী শ্রীরামকে একটা উত্তম আসনে উপবেশন করালেন। এখানে কিছু কথা বলার আছে। এগুলোকে বলা হয় শাস্ত্র, কিন্তু মূল শাস্ত্র নয়। আমাদের মূল শাস্ত্র বেদ উপনিষদ। বাল্মীকি রামায়ণ আর মহাভারত হল ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্রকে পুরাণ বলা হয়, দুটোকে যোগ করে বলা হয় ইতিহাস পুরাণ। ইতিহাস পুরাণের কাহিনীগুলিতে মূল তত্ত্বগুলিকে একই রাখা হয়। কিন্তু আমাদের কাছে যখন পরিবেশন করা হয় তখন পাল্টে দেওয়া হয়। রামায়ণ রচনা করার সময় বাল্মীকি নিজে অনেক কিছু মাথায় রেখে রচনা করেছেন। বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে পরের দিকে যাঁরা রামকথা রচনা করেছেন তাঁরা অনেক কিছু পরিবর্তন করেছেন। বাল্মীকি ছিলেন একজন বড় ঋষি, তিনি এমন কিছু জিনিস দেখতে পারতেন সাধারণ লোক যেগুলো দেখতে পারবে না। বেদের সময় থেকে একটা ধারণা তৈরী হয়ে আছে, বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা ছিল, যারা দ্বিজ বা আর্য ছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এদেরই বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল। বেদের অধিকারী ছিলেন বলেই ধর্মেও এদের অধিকার ছিল। ধর্মের আচরণ মানে বেদে যে আচরণের কথা বলে দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে আচরণ করা। বাল্মীকি দেখলেন এটা ঠিক নয়, কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। তখন তিনি ভিল জাতি অর্থাৎ নিচু জাতি থেকে শবরীকে কেন্দ্র করে একটা চরিত্র নিয়ে এলেন। এই চরিত্রকে কেন্দ্র করে তিনি দেখাচ্ছেন একজন নীচু জাতির ধর্মে অধিকার না থাকতে পারে কিন্তু তার বিজ্ঞানের অধিকার থাকবে, বিজ্ঞান মানে বেদান্তের জ্ঞান। অধ্যাত্মের যে শেষ কথা, ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য সেই অধিকার কিন্তু এদের থাকবে।

শবরীর কাহিনী হল, মাতঙ্গ মুনি একজন বড় মুনি ছিলেন, শবরী তাঁর সেবিকা ছিলেন। মাতঙ্গ মুনির যা বয়স ছিল শবরীও সেই বয়সেরই ছিলেন, খুব একটা ছোট ছিলেন না। সেবা করতে করতে শবরীর আরও বয়স হয়ে গেছে। সেবা করতে করতে মাঝখানে শবরীর মধ্যে একটা ভক্তির ভাব এসে গেছে, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এসে গেছে। এই ভাবে হতে হতে শবরী একজন সাধিকা হয়ে গেছেন। সাধিকা হয়ে গেছেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মে তাঁর অধিকার থাকল না। ধর্মে অধিকার না থাকা মানে বেদে যে যজ্ঞাদির কথা আছে সেই সব যজ্ঞ করার অধিকার থাকল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকার থাকবে। আমরা যে বলি ধর্মীয় চিন্তা ভাবনায় অনেক পরিবর্তন এসেছে, ঠাকুরও বারবার বলছেন, যার ঈশ্বরের পথে যেতে চায় তাদের আর কিছু দরকার পড়ে না। এই ভাব যে ইদানিং এসেছে তা নয়, বাল্মীকির সময় থেকেই আছে। মূল কথা হল ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, কিন্তু বাল্মীকির রাম ঈশ্বর

নন। ঈশ্বর না হলেও তিনি কিন্তু সাধারণ লোক নন। বাল্মীকি দেখাচ্ছেন কিভাবে বিষ্ণুর অংশ থেকে শ্রীরামের জন্ম হয়েছে, অহল্যার উদ্ধার শ্রীরামের দ্বারা হয়েছে, আরও যে ঋষি মুনিরা ছিলেন তাঁরা শ্রীরামচন্দ্রকে দেখতে দেখতে নিজের শরীরকে অগ্নিতে বিসর্জন দিচ্ছেন। অগ্নিতে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে দেওয়াটা বাল্মীকির একটা খুব প্রিয় রীতি ছিল। কারণ তখন যজ্ঞই ছিল প্রধান আর যজ্ঞের অগ্নিতে সব কিছু আহুতি দেওয়া হত, সেই রকম নিজের দেহকেও শেষ যজ্ঞ রূপে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে দিচ্ছেন। নিজের দেহ ছেড়ে দেওয়ার আগে মাতঙ্গ মুনি একটা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে শবরীকে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র এখন চিত্রকূটে আছেন, তুমি এখন এখানেই অবস্থান কর এবং সাধনা যেমন করছ করতে থাক, এরপর তাঁর দর্শন তোমার যখন হবে তখন তুমি তোমার শরীর ত্যাগ করবে। বাল্মীকির দৃষ্টিতে শ্রীরামচন্দ্র যদি অন্তর্যামী নাও হয়ে থাকেন, তাহলেও তিনি দেখছেন জঙ্গলের মধ্যে একজন বৃদ্ধা এক মনে তপস্যা করে যাচ্ছেন। তার উপর তিনি কিছু ব্রত দীক্ষা নিয়েছেন। যাই হোক, এখন দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে কিছু প্রশ্নাদি করছেন, তুমি যে সাধনা করছ তা ঠিক ভাবে করছ কিনা, সব কিছু ছেড়ে এখানে এভাবে পড়ে আছ এতে তুমি পারমার্থিক দিক দিয়ে কতটা লাভবান হচ্ছ, সাধনাকে এগিয়ে যাচ্ছ কিনা ইত্যাদি এই ধরণের কিছু কুশল সংবাদ আদান-প্রদান করছেন। কুশল সংবাদের পর বলছেন –

রামলক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ।
তজ্জলেনাভিবিচ্যাঙ্গমথার্ঘ্যাদিভিরাবৃতা।৩/১০/৭
সম্পূজ্য বিধিবদ্রামং সসৌমিত্রিং সপর্য্যয়া।
সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা।৩/১০/৮

শবরী ভক্তি সহকারে রাম-লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন করলেন তারপর সেই পবিত্র পাদোদক দ্বারা নিজ অঙ্গ অভিষিক্ত করলেন। শবরী নিজের তপঃ প্রভাবে আগে থেকেই জানতেন যে শ্রীরাম এখানে আসবেন, সেইজন্য অমৃততুল্য ফল সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, সেই ফলগুলো এবার শ্রীরামকে ভক্তি পূর্বক নিবেদন করলেন আর নানা রকমের সুগন্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রীরামের চরণ বন্দনা করে শবরী নিজের কথা বলছেন –

অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ গুরবো মে মহর্ষয়ঃ।
স্থিতা শুশ্রুষণং তেষাং কুর্বতী সমুপস্থিতা।৩/১০/১১

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মাতঙ্গ মুনি মহর্ষিগণ সহ থাকতেন, আমি তাঁদের সেবা শুশ্রুষা করার জন্য বহু বৎসর এখানে বাস করি। মাতঙ্গ মুনি সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন, তাঁর দেহ পতনের আগে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তুমি এখানেই বাস কর, তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। সনাতন পরমাত্মা, বিষ্ণুর অংশে যাঁর জন্ম তিনি কিছু দিনের মধ্যে এখানে আসবেন। তিনি এখন চিত্রকূট পর্বতের আশ্রমে আছেন। তাঁর আগমনের সময় হয়ে গেছে। যত দিন তিনি না আসছেন তত দিন তুমি একাগ্র চিত্তে তাঁর ধ্যান কর। তিনি এখানে আগমন করলে তুমি তাঁর দর্শন করবে, এরপর তোমার এই শরীরের আর কোন প্রয়োজন থাকবে না এবং তারপর অগ্নি মধ্যে নিজ দেহকে আহুতি দিয়ে বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করবে। এই স্থূল শরীরের পেছনে যে সূক্ষ্ম শরীর তার এমনই আকর্ষণ থাকে যে স্থূল শরীর যতক্ষণ কাজ করতে থাকে ততক্ষণ সে শরীর ছাড়তে চায় না। এমনকি দুর্ঘটনায় কেউ যদি মারা যায়, সূক্ষ্ম শরীর ঐ স্থূল শরীরের পাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। সেইজন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় শ্মশানে মৃত শরীরের দাহ সংস্কার করিয়ে দেওয়া হয়। দাহ করার পর আর কিছু পরে থাকে না, কিন্তু কবর দিলে সূক্ষ্ম শরীর ওখানেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। শবরী বলছেন সেই থেকে আমি আপনার অপেক্ষায় আছি আর আপনার ধ্যান করি। আমার গুরুর কথা আজ সত্য হয়ে গেল। শবরী আরও বলছেন, হে রাম! আমি কি আর বলব, আমি তো এক নীচ জাতির মেয়ে। আমি আপনাকে ভক্তি করি ঠিকই কিন্তু আমি কি করে বলি যে আমি আপনার দাসী।

তব দাসস্য দাসানাং শতসংখ্যোত্তরস্য বা।
দাসীত্বে নাধিকারোঽস্তি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি।৩/১০/১৮

হে রাম! আপনার দাসগণের যারা দাস, তাঁদেরও যাঁরা দাস, এইভাবে ক্রমে এক শত সোপানের পরবর্তি অনুদাসের দাসী হওয়ারও অধিকার আমার নেই। আমরাও বলি আমি ঠাকুরের ভক্ত, কিন্তু ঠাকুরের ভক্ত হওয়ার অধিকার সেই বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্রের মত মুনি ঋষদেরই আছে। আমরা হলাম ওনাদেরই শিষ্যের শিষ্য,

তাঁদেরও যাঁরা শিষ্য তাঁদেরই কোন একজনের শিষ্য। শবরী এটাই বলতে চাইছেন, আমি এই আশ্রমে থাকি ঠিকই, আপনার অপেক্ষায় আছি এটাও ঠিক কিন্তু আমি আপনার দাসী এই কথা বলার দুঃসাহস আমার কোথায়! অথচ কী সৌভাগ্য আমার যে আপনার দর্শন হল। তখন বলছেন –

কথং রামাদ্য মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং না জানে দেবেশ কিং করোমি প্রসীদ মে।৩/১০/১৯

হে রামচন্দ্র! আপনি তো মন আর বাণীর বিষয় নন। মন যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না বাণী তাঁকে কী করে ব্যক্ত করতে পারবে! মন হল সীমিত আর পরমাত্মা অসীম, সীমিতকে দিয়ে অসীমকে কখন মাপা যায় না। সেইজন্য মন দিয়ে কখনই পরমাত্মাকে জানা যাবে না, যেটাকে জানা যাবে না তার ব্যাপারে বলবে কী করে! শবরীর যদি এই বক্তব্য হয়, ভগবান মন আর বাণীর পারে, অথচ আমরা ঠাকুরের ব্যাপারে এত কথা বলছি, রামায়ণের মাধ্যমে শ্রীরামচন্দ্রের এত কথা বলে যাচ্ছি কি করে? আসলে শাস্ত্র ঈশ্বরকে বর্ণনা করছে না, শাস্ত্র যে কথাগুলো বলছে সেটা পরমাত্মার দিকে নির্দেশ করে আকার ইঙ্গিতে বলে দিচ্ছে। যে কোন শাস্ত্রই হোক না কেন, বাইবেল হোক, কোরান হোক বা আমাদের যত শাস্ত্র আছে এরা কেউই ঈশ্বরকে পরিভাষিত করছে না, ঈশ্বরের দিকে যেন আঙ্গুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করছে। বিজ্ঞান যেমন সব কিছুকে একেবারে পরিভাষিত করে ঠিক ভাবে বলে দিচ্ছে, অধ্যাত্ম শাস্ত্রে সেভাবে বলা হয় না। অধ্যাত্ম শাস্ত্র মানেই আকার ইঙ্গিতে, ইশারা করে বলা। জিনিসটা তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া হল এবারে বাকিটা তোমাকে নিজেই জানতে হবে। শবরী এখন তারই পুনরোল্লেখ করছেন, তিনি মন ও বাণীর পারে, তাঁকে বোধে বোধ করা হয়। এগুলো এখন আমাদের কাছে শব্দ মাত্র।

শবরী বলছেন, শাস্ত্রে যাঁকে বলছেন মন বাণীর পারে, তিনি সাক্ষাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা কি করে সম্ভব? এখন যিনি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এটা একটা ভৌতিক রূপ। এই জিনিসটা খুব জটিল ব্যাপার। ঠাকুর বারবার বলছেন, ঈশ্বর মানুষ রূপে আসতে পারেন এটা ধারণা করা যায় না। কেউই ধারণা করতে পারে না। শুধু এই ব্যাপারটাই নয়, আমাদের শাস্ত্রে অনেক রকম বিচিত্র জিনিস আছে যেগুলো ধারণা করা খুব কঠিন। উপনিষদে পরমাত্মার তত্ত্বের যে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অত কঠিন নয়, যোগশাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে সেগুলোও বুঝতে কঠিন মনে হয় না, কিন্তু যখন ভক্তিশাস্ত্রে বা দ্বৈতবাদে বর্ণনা করা হয় তখন সেটাকে বুঝতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। যিনি অসীম, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি একটা শরীর ধারণ করছেন আর কোন ম্যাজিকালি নয়, পুরো একটা দর্শনের মাধ্যমে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটাই আশ্চর্যের। সচ্চিদানন্দ অনেক রকমের লীলা করেন, তার মধ্যে দেবলীলা আছে, ঈশ্বরলীলা আছে আবার মানবলীলাও আছে। তিনি এই মানব শরীরে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেন। যার জন্য একবার অবতার অপ্রকট হয়ে যাওয়ার পর আর অনেকদিন যাবৎ মানবলীলা দেখা যায় না। শবরী বলছেন, আমার তো জ্ঞান নেই, সাক্ষাৎ ভগবান আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর স্তুতি কিভাবে করতে হয় আমার জানা নেই। এখন আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে যা বলার বলুন। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভক্তজনে ভক্তিরেব হি কারণম্।৩/১০/২০

জাতিভেদ, যেমন পুরুষত্ব, স্ত্রীত্ব বা নাম, জাতি, আকার এই যে নানান রকমের বিভেদ এগুলো কখনই আমার ভজনার কারণ হয় না। তার মানে, তার উপর যে আমি কৃপা করব না তা নয়। ভগবান কি ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীদের উপরই কৃপা করেন? কখনই না। যারা চণ্ডাল, নীচ জাতি বা যাদের ধর্মের অধিকার নেই তাদের কি ভগবান কৃপা করবেন না? তা কেন হবে। বাবা যেমন তাঁর দু মাসের সন্তানকেও ভালোবাসেন আবার দশ বছরের সন্তানকেও ভালোবাসেন, ভগবানও সবাইকেই ভালোবাসেন। এই জগতে এমন কোন গুণ নেই যেটার জন্য আমি কারুর উপর প্রসন্ন হব। আমি তার প্রতিই প্রসন্ন হই, অর্থাৎ আমার প্রসন্ন হওয়ার একটাই কারণ, যার আমার প্রতি ভক্তি আছে তাকে আমিও ভালোবাসি। গীতাতেও এই ভাবটা ঘুরে ঘুরে আসে। যারাই ঈশ্বরকে ভালোবাসে ঈশ্বরের প্রসন্নতা, কৃপা তার উপরই হয়, এই ক্ষেত্রে কখনই দুই রকম হবে না। আমাদের অনেক রকম বিচিত্র বিচিত্র ধারণা আছে, ঈশ্বরের পূজো করলে বাড়ির সব কিছু ভালো চলবে, ঈশ্বরের ভজনা করলে টাকা-পয়সা হবে, মান-সম্মান বাড়বে। হাজরা ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, হাজরা বলতেন, তিনি চাইলে ঐশ্বর্যও দেন। ঠাকুর তখন বলছেন, গত জন্মে হাজরা কাঙাল ছিল তাই টাকা টাকা করে। প্রার্থনা করলেই কি সব কিছু পূরণ হয়ে যায়?

কখনই হয় না। কত লোক দিবারাত্র প্রার্থনা করে যাচ্ছে, তার মধ্যে একজন দুজনের কিছু ভালো হয়ে গেলে আমরা বলি ভগবানের জন্যই হয়েছে। এগুলো কিছুই নয়। ভগবানকে যে ভক্তি করে, ভগবান তাকে ভালোবাসেন। ভগবান যখন ভালোবাসেন তখন তাঁর ভালোবাসা থেকে কি হয় আর কি হয় না আমরা জানি না। ঠাকুর বলছেন, যাঁর উপর তাঁর কৃপা হয় তাঁকে বড়লোকেরাও মানে। যদি নাও মানে তাতে ভক্তের কিছু আসে যায় না। কারণ তখন তাঁর হুঁশটাই থাকবে না, কে তাকে মান দিল আর কে মান দিল না।

এক মঠের মহন্ত খুব দুঃখ করে একজন বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে বলছেন, আমরা এত সদ্ভাবে মঠ চালাচ্ছি কিন্তু তাও মঠে কোন টাকা-পয়সাই আসছে না। তখন সেই বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী তাঁকে বলছেন, সৎ ভাবে থাকার সাথে টাকা-পয়সার কি সম্পর্ক! সৎ ভাবে থাকা মানে আপনার এটা ভালো লাগছে। টাকা-পয়সারই যদি গুরুত্ব হয় তাহলে অসৎ ভাবে যদি টাকা সংগ্রহ করার সুযোগ থাকে তাহলে সেই ভাবেই নেবেন। এখানে উদ্দেশ্য হল ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি যার ভক্তি সে ঈশ্বর ছাড়া জগতের আর কোন কিছুই চায় না। তবে ঠাকুর বলছেন, যে ঠিক ঠিক ভক্ত তাকে ঈশ্বর কখনই ছোট হয়ে যেতে দেবেন না। কিন্তু তাও যে হয় না তা নয়, এমনও দেখা যায় ভক্ত কত কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কৃপা মানেই ভক্তি, এই জায়গাতে কখনই কোন ব্যাতিক্রম হয় না। একজন প্রচুর খাটছে, প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য করে যাচ্ছে তাতে তার টাকা-পয়সা নাও হতে পারে, কিন্তু ভক্তিতে এই জিনিস কখনই হবে না। যদি কেউ ভক্তি নিয়ে এগোয় সে ঈশ্বরের কৃপা পাবেই, কৃপা মানে ভক্তি সে পাবেই। এই জিনিসটাই শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে বলছেন, আমি যাকে কৃপা করি, যাকে আমি ভালোবাসি এর কোন হেতু থাকে না। এর একটাই কারণ, যখন দেখবে কারুর হৃদয়ে ঠিক ঠিক ভক্তির ভাব উদয় হয়ে গেছে, তাহলে বুঝবে তার উপর ঈশ্বরের কৃপা আছে। ঈশ্বরের কৃপা কেন তার উপর আসবে? কারণ সেও ঈশ্বরকে ভক্তি করে। তখন বলছেন –

যজ্ঞদানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা।৩/১০/২১

জগতে দেখা যায় মানুষ যজ্ঞ করছে, দান করছে আর বেদাদি অধ্যয়ন করছে। আমরা সাধারণ ভাবে মনে করি এগুলোই ভক্তির লক্ষণ। সন্ন্যাসীরা যখন মঠে নতুন যোগ দিতে আসেন তাঁদেরও বলা হয়, সকাল সন্ধ্যায় আরতিতে যাবে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে, নিয়মিত পাঠ করবে, বড়দের সম্মান করবে। এভাবেই সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলো আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। কিন্তু এগুলো কখনই ভক্তির কারণ হয় না। *মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ*, যদি ভেতরে আমার প্রতি ভক্তি না থাকে তাহলে সে কিন্তু কোন দিনই আমার কৃপা পাবে না। আমার প্রতি ভক্তি না থাকলে, আমার যে কৃপা পাবে, আমার যে দর্শন হবে এ কোন দিনই সম্ভব হবে না। অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু বেশি কথা বলছেন না, কিন্তু শবরীকে অনেক কথা বলছেন। শবরীর ভালোবাসা অন্য ধরণের ভালোবাসা। শবরীকে বলছেন, তুমি কিভাবে জন্ম নিয়েছ, কি হয়ে জন্ম নিয়েছে সেটার কোন দাম নেই, তুমি কি কর্ম করছ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক একটাই, তোমার হৃদয়ে আমার প্রতি ভক্তি আছে কিনা। ভক্তি আছে কিনা কি করে বোঝা যাবে? একবার এক বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীকে তাঁরই ছোটবেলার এক বন্ধু, পরে সে ডাক্তার হয়েছে, জিজ্ঞেস করছে, মহারাজ আপনি এত বছর সন্ন্যাস জীবন কাটালেন, এই দীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনে কি পেলেন? মহারাজ বলছেন, কিছুই পাইনি, তবে তুমি তোমার সন্তানকে যেভাবে ভালোবাসো আমিও ঠাকুরকে সেভাবেই ভালোবাসি। এত দিনে এই ভালোবাসাটা হয়ে গেছে। ঠাকুর ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে আমি আর থাকতে পারব না। সব কিছুর উপর ঠাকুরই সত্য, এই ভাবটা খুব দৃঢ় হয়ে যায়। অনেক দিন ধরে শাস্ত্র কথা শুনলে, বাড়িতে যদি সংস্কার থাকে, সেই সংস্কারগুলো শুনে আসছে, দেখে আসছে তখন মনে হয় ঠাকুরই সত্য। কিন্তু ঐ ভক্তির যখন উদয় হয় তখন বুঝতে পারে, ভক্তি এসেছে কিনা তার লক্ষণ আছে, কোন ধাক্কা যদি জীবনে আসে তখন ভক্তিটা নড়ে যায় না, ভালো কিছু হলেও ভক্তিটা হারিয়ে যায় না। আমরা বেশির ভাগই হলাম সুখের পায়রা, বাড়িতে ভালো কিছু হল, মেয়ের ভালো জায়গায় বিয়ে হয়ে গেল, ছেলের একটা চাকরি হল তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে বিশেষ পূজা দিয়ে এলাম। খারাপ কিছু হলে আমরা ভেঙে পড়ি। ভক্তদের মধ্যে এমন অনেক ঘটনা আছে যার জন্য তারা ঠাকুর থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। এগুলো কোন ভক্তিই নয়। ভক্তি মানে, তিনিই আছেন, তাঁর বাইরে যা কিছু আছে তার কোন মূল্যই নেই। তাই বলে যে তার ঈশ্বর দর্শন হয়ে যাবে, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করতে পারবে তা নয়। তখন এই ভক্তিই তার একটা জীবনধারা হয়ে যাবে। জীবনধারা যখন হয়ে গেল তখন সে কোন পরিস্থিতিতেই, এমনকি জগতে কোন কিছুই থাকবে না যেটাকে পাওয়ার জন্য সে ঠাকুরকে ছেড়ে

দেবে। আমরা এখন ঠাকুরের জন্য সব কিছু ছাড়তে পারছি না, অনেক কিছুতেই আমাদের আকর্ষণ আছে। তাই বলে কোন কিছুর লোভের জন্য আমরা ঠাকুরকে ছেড়ে দেব না। যেমন চোর ছ্যাঁচড়, চুরি চামারি করছে কিন্তু তাকে যদি খুন করতে বলা হয় সে খুন করবে না। খুন করে কিন্তু তাকে যদি বলা হয় বোমা মেরে সব উড়িয়ে দিতে, সে করবে না। আবার যারা স্মাগ্লিং করে তাদের যদি ড্রাগ স্মাগ্লিং করতে বলা হয় করবে না, একটা জায়গায় তারা লাইন টেনে দেয়। ঠিক তেমনি যারা ভক্ত তাদের নিজস্ব দুর্বলতার জন্য তারা কিছু কিছু কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করে, কিন্তু তাই বলে যে তাদের যদি বলা হয় তুমি ঠাকুরকে ছেড়ে দাও তাহলে এটা তুমি পাবে, তারা এই জিনিস করবে না। একজন লোক একটি মেয়েকে ভালোবাসে, তাকে ভালোবাসবে বলে, তাকে বিয়ে করবে বলে সে নিজের ধর্মকেই ছেড়ে দিল, তার মানে তার ভক্তি বলে কিছু নেই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীশ্চান হয়ে গেলেন। ঠাকুরের সাথে দেখা হতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে? বললেন, পেটের জন্য। মুসলমানরা ভারতে এসে এখানকার ব্রাহ্মণদের যখন বলতে শুরু করল, হয় কোরান গ্রহণ কর তা নাহলে তলোয়ার। ব্রাহ্মণরা বলে দিলেন, তুমি আমার গলা কেটে দাও, আমি আমার ধর্ম ছাড়তে পারব না। তাদের কাছে ছিল ধর্ম। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে ধরে নিয়েছেন তিনি আর কোন কিছুর সাথে আপোষ করবেন না। এটাই শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যদি ভক্তি না থাকে তাহলে তুমি যতই বেদ অধ্যায়ন কর, জপধ্যান কর, আমাকে পাবে না। ভক্তি ছাড়া হবে না বুঝলাম, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি হবে কি করে? যদি আমাদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের ভক্তি আছে? আমরা কেউই না বলব না, সবাই বলবে আমার ভক্তি আছে, যদি বলে নেই তাহলে বুঝতে হবে লুকনোর জন্য বলছে। আপনার ভক্তি নেই কাউকে বললে সে রেগে যাবে। সবাই মনে করে আমার ভক্তি আছে। এটা একটা খুব সাধারণ সমস্যা। আসলে কারুরই ভক্তি থাকে না। যারা বলছে আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, আসলে তারা মনে করে আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, এর বাইরে কিছু না। আমার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে এটাই একটা বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এর কোন দাম নেই, একটা শব্দ মাত্র। এখন বলছেন ভক্তি কিভাবে হবে, এটাকেই বলে নবধা ভক্তি, নয় রকমের ভক্তি। ভক্তশাস্ত্রে নবধা ভক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণে যেমন আছে ঠিক তেমনি নবধা ভক্তির কথা ভাগবতেও আছে। আমরা মনে করি ভক্তি এমনিই এসে যায়, কিন্তু জ্ঞানের ব্যাপারে মনে করি সেখানে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। রাজযোগেও মনে করি সেখানেও অনেক খাটতে হয়। কর্মযোগেও অনেক রকম কাজ করতে হয়, কাজ করা মানেই প্রচুর খাটনি। ভক্তিও এমনি এমনি হয়ে যায় না।

অমরনাথ যাওয়ার পথে এক জায়গায় এক নামকরা সুফি সাধক থাকতেন। এলাকায় ওনার খুব নামডাক ছিল। কয়েকজন সন্ন্যাসী অমরনাথ যাওয়ার পথে সুফি সাধকের সাথে দেখা করেছেন। দেখা হলে কিছু কথার কথা জিজ্ঞেস করতে হয়, একজন সন্ন্যাসী কিছু জিজ্ঞেস করেছেন, কিন্তু উনি সন্ন্যাসীক কোন গ্রাহ্যই করছেন না। কথায় কথায় আরেকজন সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন, ভক্তি কিভাবে হয়? সুফি সাধক তখন খুব সুন্দর একটা কথা বললেন, যেভাবে জমিদারী অর্জন করতে হয় ভক্তিও সেভাবেই অর্জন করতে হয়। একজন মুসলমান সুফি সাধকের মুখে এই কথা শুনে সন্ন্যাসীরা খুব অবাক হয়ে গেলেন। মানুষ যেভাবে খেটেখুটে জমি-জায়গা, অর্থ অর্জন করে ভক্তিও সেভাবেই অর্জন করতে হয়, এমনি এমনি ভক্তি হয়ে যায় না। ঠাকুর বলছেন ভক্তি সহজ পথ, ঠিকই বলছেন কিন্তু ভক্তিতেও প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। জ্ঞান পথে, যোগ পথে বা কর্মের পথে যেমন অনেক কিছু করতে হয় ঠিক তেমনি ভক্তিতেও অনেক কিছু করতে হয়। এমনি এমনি ভক্তি হয় না। ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে খুব সংক্ষেপে ভক্তি সাধনের কথা বলে দিয়েছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে একটু বিস্তৃত করে প্রথমেই বলছেন –

সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্।৩/১০/২২

নবধা ভক্তি হল ভক্তির নয়টি ধাপ। নবধা ভক্তির প্রথমটাই বলছেন সাধুসঙ্গ। কার সঙ্গ করতে আমার ভালো লাগে নিজেকে বিচার করে দেখতে হয়? একজন লোক শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে, শাস্ত্রের কথা শুনছে কিন্তু বিষয়ী লোকেদের যখন সঙ্গ হয় তখন খুব মজা পায়, রাজনীতির কথা বলছে, অন্যান্য অনেক ধরণের কথা বলছে, বুঝতে হবে ভেতরে কোন ভক্তির ভাব নেই। কোন সাধুর সাথে কথা বললাম, কোন সাধুর সঙ্গ করলাম, সাধুসঙ্গ মানে একেবারেই তা নয়। সাধুসঙ্গ মানে, ঐটাই আমার সব সময় ভালো লাগবে। সৎসঙ্গই তখন একমাত্র পছন্দের তালিকায় থাকবে, বিষয়ীদের সঙ্গ, বিষয়ের কথা বলতে তার আর একেবারেই ভালো লাগবে না। সাধুসঙ্গ হল নবধা ভক্তির প্রথম।

দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্গুণৈরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ।৩/১০/২৩

দ্বিতীয় হল সৎ প্রসঙ্গ। সৎ প্রসঙ্গ মানে ঈশ্বরের জন্ম ও কর্মের কথা, তাঁর লীলাকথা এগুলোই ভালো লাগে, এর বাইরে কোন কিছু শুনতে বা বলতে বা পড়তে ভালো লাগে না। তৃতীয় গুণচিন্তম্, *মদ্গুণৈরণম্*। প্রথমে সাধুসঙ্গ হল, সাধুসঙ্গ করার পর একটু স্থূল ভাবে ভক্তির উদয় হয়। স্থূল ভাবে মানে ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলাপ আলোচনা করা, সেগুলোকে নিয়ে চিন্তন করা। সেখান থেকে আরেকটু সূক্ষ্ম হয়ে যায়, ঈশ্বরের গুণ চিন্তন মানেই আরও সূক্ষ্ম হয়ে গেল। চার নম্বর *ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং*, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা, মানে গীতা উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করা। চতুর্থ ধাপে না আসা পর্যন্ত নবধা ভক্তির ছবিটা পরিষ্কার হয় না। গীতা ও উপনিষদের যিনি ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন সেখানে তাঁরা ধরে নিচ্ছেন যে ইনি সাধুসঙ্গ করেছেন, এখন তাঁর ঠাকুরের জন্মকথা, লীলাকথার মনন করতে ভালো লাগবে আর তাঁর গুণের কথা বলতে ভালো লাগবে। কিন্তু এক, দুই আর তিন হল সম্পূর্ণ নিজের ব্যাপার, বাইরের লোকেরা তাঁকে বুঝতে পারবে না। চতুর্থতে এসে তিনি এগোচ্ছেন কি এগোচ্ছেন না ধরা পড়ে যাবেন। গীতা উপনিষদের ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করছেন কি করছেন না, যদি বলেন ব্যাখ্যা করতে আমার লজ্জা করছে বা বলছেন আমি পারবো না, তার মানে তিনি এগোননি। যদি বলেন আমি এত উচ্চ তত্ত্বের ব্যাপারে কি করে মুখ খুলি, তার মানে তিনি এখনও এগোননি। কিন্তু যিনি বলছেন ঠাকুরের কথা বলতে আমার ভালো লাগে, এটা দিয়েই তাঁর পরীক্ষা হয়ে যাবে তাঁর ভেতরে কোন গোলমাল আছে কিনা। যেখান থেকেই অনুরোধ আসবে, চলুন আমাদের ঠাকুরের দুটো কথা শোনাবেন, অবশ্যই তিনি আনন্দে সেখানে চলে যাবেন। যেদিন থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করে দিলেন, এরপর দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ব্যাখ্যাই করে যাচ্ছেন। এরপর হঠাৎ একদিন তিনি দেখবেন ঈশ্বরের ব্যাপারে অনেক কিছু তাঁর পরিষ্কার হয়ে গেছে। যাঁরা ভক্ত সাধক তাঁরা এটা করেন, হয় তাঁরা কোন গ্রন্থ থেকে ব্যাখ্যা করেন আর তা নাহলে নিজেরই কিছু অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির কথা লিখে সেটাকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথাকে তাঁরা ব্যখ্যা করবেনই করবেন। কারণ ঈশ্বরের জন্ম, কর্ম, লীলা এগুলোকে নিয়ে চিন্তা করাতে তাঁর সাধুসঙ্গ হয়ে গেল আর ঠাকুরের জন্ম, কর্ম, গুণ, ঠাকুরের কথাগুলোকে তিনি বোধ করেই বলছেন, বোধ মানে এগুলো তাঁর অন্তর্জগতকে আলোড়িত করছে। যতক্ষণ ভক্ত সাধক গীতা উপনিষদের কথা না বলতে শুরু করে ততক্ষণ বুঝতে হবে কোন রকম সুযোগ হয়নি। এখানে তাঁদের কথাই বলা হচ্ছে যাঁরা ভক্তি অর্জন করতে চাইছেন। স্বামীজী, রাখাল মহারাজ এনাদের এখানে ধরা যাবে না, ঠাকুর বলছেন ফল আগে ফুল পরে। সাধারণতঃ ফুল আগে হয় ফল পরে আসে। কিন্তু লাউ কুমড়োর ফল আগে আসে ফুল পরে ফোটে। আমাদের ভক্তি নেই আমরা কিভাবে ভক্তি অর্জন করব? তখন এভাবেই এগোতে হবে। ঠাকুর বাচ্চা বয়স থেকেই যেখানে শাস্ত্র কথা হছে সেখানে দৌড়ে যাচ্ছেন, নিজেও অনেক কথা বলছেন। ঠাকুরের ক্ষেত্রে ঠিক এই ধাপ বজায় থাকছে না, কারণ তাঁরা অন্য থাকের পুরুষ। সাধারণ মানুষদের জন্য এই *ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচস্য* খুব জরুরী, কারণ তখন নিজের বিচারগুলো পরিষ্কার হয়। বিচার পরিষ্কার হতে শুরু হলে তখন ঈশ্বরের ধারণাটা হয়। ঈশ্বরের ভক্ত দুই প্রকার, একজন হল শ্রীরাধার মত, ঠাকুরের মত, ভক্তি নিয়েই এনাদের জন্ম, এনারা হলেন অবতার পুরুষ। দ্বিতীয় থাক হল আমাদের মত, যাদের জো সো করে চেষ্টা করে এগোতে হয়। ঐ স্তরে পৌঁছানর জন্য প্রথমে ঈশ্বরের একটা ধারণা দরকার। ঈশ্বরের ধারণা শুরু হয় সাধুসঙ্গ দিয়ে, তারপর তাঁর কথা কাহিনী দিয়ে, তাঁর লীলাচিন্তন করে, তাঁর কথার মধ্যে যে তত্ত্ব রয়েছে ঐ তত্ত্বগুলিকে বাইরে আনতে হয়। যখন তত্ত্বগুলিকে বাইরে আনা হয় তখন বুঝতে হয়ে তাঁর বুদ্ধি এবার সূক্ষ্ম হচ্ছে। সূক্ষ্ম বুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত ভক্তি, জ্ঞান, যোগ বা কর্ম কোন পথেই এগোতে পারবে না। এরপর বলছেন –

আচার্যোপাসনং ভদ্রে মদ্বুদ্ধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পূণ্যশীলত্বং যমাদি নিয়মাদি চ।৩/১০/২৪

আচার্য বা গুরুকে সব সময় ভগবদ্বুদ্ধি দিয়ে সেবা পূজন করা। আসলে ভাব আরোপ করার কথা বলছেন। ভাব আরোপ সাধারণ লোকেদের জন্য, কারণ সাধারণ লোক একবারে ভক্তিতে পৌঁছাতে পারবে না। সেইজন্য বলা হয়, যার প্রতি তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা আছে সেইখানে ঈশ্বর বুদ্ধি নিয়ে আসতে হয়। যাঁর কাছে থেকে মন্ত্রদীক্ষা হয়েছে বা যাঁর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে বা যাঁকে গুরু মনে করছে, তাঁকে ঈশ্বর বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা করা। ব্যাপারটা খুব স্থূল ঠিকই, কিন্তু যখন একটা পথে কেউ এগোতে চাইছে তখন তাকে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরের

দিকে এভাবেই যেতে হয়। বাচ্চাদের অঙ্ক শেখানোর সময় প্রথমে তাকে কমলালেবু, বল দিয়ে শেখানো হয়, প্রথম স্থূল জিনিস দিয়ে শুরু করা হচ্ছে, সেখান থেকে একটু একটু করে সংখ্যায় নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে আরও বড় বড় যোগ, বিয়োগ, সেখান থেকে আরও কত রকম ইক্যুয়েশানে চলে যাচ্ছে। এখানেও প্রথমে একেবারে স্থূল থেকে শুরু হল। আগে সাধুসঙ্গ কর, সেখান থেকে তাকে ধাপে ধাপে তুলে আনছেন। এবার তাকে ভক্তি ভাব দিচ্ছেন। কিভাবে দিচ্ছেন? যাকে তুমি শ্রদ্ধা কর তাকে তুমি ঈশ্বর ভাবে শ্রদ্ধা কর, ঈশ্বর ভাবে তাঁকে বোধ কর। এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির মধ্যে কোন চাহিদা থাকবে না, সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে শ্রদ্ধা করতে হবে।

এবার এখান থেকে নিজের জীবনকে সুসংগঠিক কিভাবে করতে হবে বলছেন। আচার্য বা গুরুর প্রতি যখন ঈশ্বরীয় ভাব এসে গেল, সেখান থেকে এবার যমনিয়মাদি পালন করতে হয়। তার মানে নিজেকে পবিত্র করা আর পবিত্র ভাবে গুরুর সেবা করা শুরু হয়। গুরুর সেবা করা আর পবিত্র হওয়া দুটো একই সাথে চলে। যেমন যেমন গুরুর প্রতি ঈশ্বরীয় ভাব আসবে তেমন তেমন পবিত্রতা আসবে, যেমন যেমন পবিত্রতা আসবে তেমন তেমন গুরুর প্রতি ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে।

নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে।৩/১০/২৫
সদ্ভক্তিষ্বধিকা পূজা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা।৩/১০/২৬
অষ্টমং নবমং তত্ত্ব-বিচারো মম ভামিনি।
এবং নববিধা ভক্তি-সাধনং যস্য কস্য বা।৩/১০/২৭

ঈশ্বরের পূজোয় ভালোবাসা, এটাকে স্পষ্ট করছেন। আমরা পূজা করি ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগ পূজাই আমরা যন্ত্রের মত করে যাই, কিন্তু বলছেন ঈশ্বরের যে কোন পূজা ভালোবেসে করা। সপ্তম, মন্ত্রের সাঙ্গোপাঙ্গ মানে নানা রকমের ন্যাসাদি করার কথা বলছেন, এগুলো করলে মন একাগ্র করতে সুবিধা হয়, মন একাগ্র হলে জপে মন বসে যায়। নবধা ভক্তির ধাপগুলো বিভিন্ন শাস্ত্রে একটু তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। অষ্টম বলছেন, নিজের প্রতি বৈরাগ্য আর ভক্তদের প্রতি ভালোবাসা। ঈশ্বরের যাঁরা ভক্ত তাঁদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা হবে, তাঁদের যে পূজাদি করা, শ্রদ্ধা করা এগুলো বেশি করবে, জগতে যত প্রাণী আছে সবারই প্রতি একটা স্নেহ ভালোবাসার ভাব নিয়ে চলা, কারুর প্রতি তার কোন বৈরী ভাব, দ্বেষ ভাব থাকবে না। অথচ নিজের যে জীবন সেখানে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য। জগতের থেকে তার কোন চাহিদা নেই। নিজের প্রতি পূর্ণ্য বৈরাগ্য আর অপরের প্রতি ভক্তি, এটাই অষ্টম ধাপ। জগৎ ঈশ্বরেরই প্রকাশ আর তাঁর যাঁরা ভক্ত তাঁরা ঈশ্বরেরই বিশেষ রূপ, এই বোধ যখন এসে যায় তখন তাঁর প্রতি একটা ভালোবাসার ভাব, শ্রদ্ধার ভাব আসে। আর ঐ কারণেই তার মধ্যে বৈরাগ্য এসে যায়। ঈশোনিষদে বলছে, *মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্*, কোন রকম লোভ করবে না। কেন লোভ করবে না? কারণ সবই ঈশ্বর, সবটাই ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। ঈশ্বরেরই যদি সব অভিব্যক্তি হয় তাহলে তুমি কোন জিনিসটা নিয়ে লোভ করবে। যেটা পদার্থ সেটাকে নিয়েই মানুষ লোভ করবে, কিন্তু এখানে তো কোন পদার্থ নেই সবটাই তো ঈশ্বর।

শেষে নবম হল তত্ত্ব বিচার। এইভাবে একটা একটা করে ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর যখন তত্ত্ব বিচার করতে যায় তখনই ঠিক ঠিক বোধ হয় যে ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু। আমরা উপাচারের দিকে বেশি যাই, যেগুলোতে নামযশ আছে সেগুলো করি, এখানেই ভক্তি জিনিসটা বাতিল হয়ে গেল। সেইজন্য আমাদের কিছু হয় না। ভাগবতেও নবধা ভক্তির কথা বলতে গিয়ে শ্রবণকীর্তনম্ এসবের কথা বলছেন কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অন্য ভাবে নবধা ভক্তির কথা বললেন। এইভাবে বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

স্ত্রীয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্যাগ্যোনিগতস্য বা।
ভক্তি সঞ্জায়তে প্রেম-লক্ষ্মণা শুভলক্ষণে।৩/১০/২৮

স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক বা তির্যগযোনির হোক যেই হোক যদি দেখা যায় এই নটি জিনিস এসে গেছে তখন তার মধ্যে আমার প্রতি প্রেম লক্ষণা ভক্তি আবির্ভূত হবেই হবে। ভক্তি দুই প্রকার, বৈধি ভক্তি আর প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তিকে অনেক সময় রাগাত্মিকা ভক্তিও বলে। বৈধি ভক্তি মানে যেখানে বিধি চলে, বিধি মানে আমাকে এত জপ করতে হবে, এত রকম পূজা করতে হবে, অর্চনা করতে হবে, এত বার স্নান করতে হবে, শাস্ত্রে যে নানান

রকমের বিধি দেওয়া আছে সেই ভাবে যা কিছু করা হয় সেটাকে বলে বৈধি ভক্তি। কিন্তু নবধা ভক্তিতে যে নয় রকমের জিনিসের কথা বলা হল, এগুলোকে যদি খুব গভীর নিষ্ঠার সাথে করা হয় তাহলে তার মধ্যে প্রেমাভক্তির উদয় হবেই হবে। আমরা অনেককে বলতে শুনি, আমার ভেতরে শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি ভেতরে আছে, না এভাবে কখনই হয় না। যে বলছে, আমার ভেতরে ভক্তি আছে, তার কিছু গোলমাল আছে। কারণ যদি ভেতরে ভক্তি থাকে, যদি ভক্তির কথাই বলতে চায় তখন সব সময় ভক্তি মানেই হবে প্রেমাভক্তি। বৈধি ভক্তি ভক্তি নয়, বৈধি ভক্তি মানেই হল উপাচার। ভেতরে ভক্তি আছে বলার সময় আসলে বলতে চাইছে আমি উপাচার পালন করি না, আমি ভক্তি করি। যার উপাচারাদির অনুষ্ঠান না করেই ভক্তির উদয় হয়ে গেছে, তাহলে হয় সে ঠাকুর, স্বামীজীর মত উচ্চ আধার, তা নাহলে সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। যে কোন লোক যদি বলে আমার অন্তরে ভক্তি আছে, বুঝতে হবে অন্তরে তার গরল ছাড়া কিছু নেই। এখানে যে নয়টি ধাপের কথা বলা হল, এই নটিকে যদি সে পালন না করে থাকে এবং তাও যদি বলে, আমার ভক্তি আছে, মাঝেসাজে মন্দিরে যাই আর যেখানেই মন্দির দেখি সেখানে মাথা ঠুকে দিই, বুঝতে হবে যে এখনও একেবারে গোল্লায় যায়নি, কিন্তু যদি বলে ঐসব ভণ্ডামি আমি করি না, অন্তরে ভক্তি আছে, তাহলে বুঝতে হবে পুরোপুরি গোল্লায় গেছে। কারণ তোমার ভেতরে যদি ভক্তি থাকে তাহলে সেই ভক্তি প্রেমাভক্তি, ভক্তি মানেই প্রেমাভক্তি সেখানে উপাচার বলে কিছু নেই। উপাচারকে তাঁরাই অতিক্রম করতে পারেন যাঁরা এই নটি ধাপকে অতিক্রম করে এসেছেন। এই নবধা ভক্তির মধ্যে দিয়ে না আসা পর্যন্ত কারুর ভেতরে প্রেমাভক্তির উদয় হবে না। তুমি সাধুসঙ্গ করলে না, শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে না, শাস্ত্রের বাক্যকে মন্থন করলে না, বিচার করলে না, ঈশ্বরীয় তত্ত্বের আলাপ আলোচনা করলে না, ঈশ্বরের ভক্ত ও গুরুজনদের সেবা করলে না আর তুমি বলছ তোমার ভেতরে ভক্তি আছে? তোমার থেকে মিথ্যাবাদী আর কেউ নেই। ভক্তি দুজনেরই কেবল হয়, এক হলেন যাঁরা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী, আর ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গী শুধু এই জন্ম থেকেই না। আর যাদের ঈশ্বরকে জানার ইচ্ছে আছে, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে চাইছে, তারা তখন এই নবধা ভক্তির নটিকে অনুসরণ করে এগোতে থাকেন, তখনই তার মধ্যে ঠিক ঠিক ভক্তির উদয় হয়। এই কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি।৩/১০/২৯

অধ্যাত্ম রামায়ণের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক। এই শ্লোকে মুক্তি জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করছেন। মুক্তি সম্বন্ধে আমাদের সবারই একটা তাত্ত্বিক ধারণা আছে। খুব ব্যবহারিক স্তরে মুক্তি বলতে আমরা বুঝি সব রকম সমস্যা, ঝামেলা থেকে মুক্তি। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমাদের যে ধারণা তাতে মনে হয় যেন আমার একটি আত্মা আছেন, আত্মা শরীরের মধ্যে নানান রকমের কর্মপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে, মুক্তি মানে সব রকম বন্ধন খুলে গেল আর ঐ জ্বলজ্বল আত্মা যেন মুক্ত হয়ে গেল। আসলে মুক্তি মানেই হয় তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তির এই একটাই অর্থ, তত্ত্বজ্ঞান। প্রশ্ন হল কিসের তত্ত্বজ্ঞান, কোন তত্ত্বকে জানা? যদি আত্মতত্ত্বকে জানা হয় সেটাও মুক্তি, ব্রহ্মতত্ত্বকে যদি জানে সেটাও মুক্তি আর ঈশ্বর তত্ত্বকে যদি জানা হয় তখন সেটাও মুক্তি। কারণ আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর সবই এক। বিভিন্ন শাস্ত্রে জিনিসটাকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ে যায়। বিভিন্ন ভাবে নিয়ে যাওয়ার সময় শব্দগুলো পাল্টে যায়। শব্দগুলো পাল্টে যাওয়ার জন্য জিনিসটাকে পুরো অন্য রকম মনে হয়। কিন্তু মূল সেই এক, তত্ত্বজ্ঞান। অধ্যাত্ম রামায়ণ সমন্বয় শাস্ত্র, সমন্বয় শাস্ত্র হওয়ার জন্য ভক্তিকে সামনে রেখে সব কিছুকে সমন্বয় করে একটা জায়গায়া নিয়ে এসে মুক্তিকে ব্যাখ্যা করছেন, *মত্তত্ত্বনুভবস্তথা*, আমার তত্ত্বটা সে জানতে পারে, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বকে সে জানতে পারে। আমাকে যিনি অনুভব করেছেন। কি অনুভব করেছেন? আমার তত্ত্বকে যে অনুভব করেছে। আমার তত্ত্ব মানে, আমার যে সার, আমি কি এটাকে যে অনুভব করেছে। অনুভব করা কোন তাত্ত্বিক ভাবে জানা নয়, বোধে বোধ করা, বাস্তবিক তিনি ঐ ভাবেই দেখেন। কিভাবে দেখেন? *ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং*, হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়। যখনই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমাভক্তি হয় তখনই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়। ইংরাজীতে একটা খুব সুন্দর কথা আছে, যে কথা আমরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি, তা হল, To love is to know, to know is to love। একটা জিনিসকে ভালোবাসা মানে সেই জিনিসটাকে জানা, কোন জিনিসকে জানা মানে সেই জিনিসের প্রতি ভালোবাসা হয়ে যাওয়া। যখন চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দ বলা হয়, তখন একই জিনিস বলছেন। চিদানন্দের চিৎ মানে চৈতন্য, বোধ আর আনন্দ মানে ভালোবাসা। আমরা ওটাকেই ভালোবাসি যেটাকে আমরা জানি, যেটার ব্যাপারে জানি না কখনই সেটাকে ভালোবাসি না। আমরা

সবচেয়ে ভালো জানি নিজেকে, সেইজন্য আমরা নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। মানুষ একমাত্র নিজেকেই সবচেয়ে ভালো জানে। অন্য কাউকে যখন ভালোবাসে তখন সে মনে করে ও আমিই, সেইজন্য ওকে ভালোবাসি। আমি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে শরীর মন, মানুষ নিজের শরীর মন ছাড়া অন্য কিছুকে ভালোবাসে না। নিজের শরীরকে ভালোবাসছি সেইজন্য মনে করছি সবাই আমার শরীরকে ভালোবাসবে। ভিড়ের মধ্যে আমি ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেলাম, যাকে ধাক্কা দিলাম সে আমার উপর রেগে গেল। আমি তাকে বলছি, আপনি রাগ করছেন কেন, একটু ধাক্কাই না হয় লেগে গেল। কারণ আমি নিজেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি কিনা, আমি নিজেকে ছাড়া আর কাউকে জানি না। কিন্তু ঐ অবস্থা থেকে অনেক প্রশিক্ষণ দিয়ে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে যখন ঐ অবস্থায় যাওয়া হয় তখন প্রেমাভক্তির উদয় হয়। তত্ত্ব বিচার করছে, তখন প্রেমাভক্তির উদয় হয়। ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেমাভক্তির যখন উদয় হল তখন সঙ্গে সঙ্গে *মত্তত্ত্বনুভবঃ*, আমার তত্ত্বের অনুভব হয়। ঈশ্বর কি জানলেই ভক্তি, ব্রহ্ম কি জানলেই ভক্তি, একই জিনিস। যেটাকে আমরা মুক্তিসাধন বলি, সেটাকেই উপনিষদের বাক্যের দ্বারা দেখা হলে সেখানে নানা রকমের বিচারাদি চলে। এখানে বলছেন, ঈশ্বরকে জেনে গেলেও মুক্তি হয়। গীতাতে এই ভাবটাই নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরকে জানা মানেই মুক্তি, দুটো আলাদা কিছু নয়। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র বলছেন ভক্তিই মুক্তির প্রথম কারণ। এই যে নবধা ভক্তির কথা বলা হয় এতে কি হয় –

প্রথমং সাধনং যস্য ভবেৎ তস্য ক্রমেন তু।৩/১০/৩০

এই শ্লোকের দ্বিতীয় লাইনটাই মজার। বলছেন নবধা ভক্তির প্রথমটা যার মধ্যে এসে গেল এরপর তার মধ্যে বাকি সব কটাই এসে যায়। প্রথমটা মানে সাধুসঙ্গ। ঠাকুরও তাই বারবার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন। নবধা ভক্তির প্রথম ধাপ সাধুসঙ্গকে যে ধরে নিয়েছে, সাধুদের ভালো লাগছে, সাধুদের ভালোবাসছে, বুঝে নিন ওকে আর আটকানো যাবে না, এবার সে উপরের দিকে চলে যাবে। এবার যে যেমন যেমন চেষ্টা করবে তার অগ্রগতি তেমন তেমন ত্বরান্বিত হবে, ঢিমে তেতালা হলে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু সাধুসঙ্গকে যে ধরে রাখবে তার কোন কিছুই আর বাধা হয়ে আসবে না। সাধু কে বলতে গিয়ে ঠাকুর বলছেন যাঁর মন প্রাণ ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পিত। এবার যদি কেউ উল্টো দিক থেকে শুরু করে, সেখানে শেষে বলছেন জ্ঞানটাই দরকার, জ্ঞানের জন্য প্রথম হল তত্ত্ববিচার। যদি কেউ সরাসরি তত্ত্ববিচার করে তাহলেও তো হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যদি তত্ত্ববিচারে না হয় তখন তাকে আরেক ধাপ পেছনে যেতে হবে, সেখানে না হলে আরও এক ধাপ পেছনে যেতে হবে। এখন কেউ যদি মনে করে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই আমার হয়ে যাবে, তাহলে তাকে নীচের ধাপে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরেও দেখছে যে হচ্ছে না, তখন তাকে আরও নীচের ধাপে নামতে হবে। কিন্তু সাধুসঙ্গের নীচে আর কিছু হয় না, সাধুসঙ্গ হল ভিত। যে কোন ধাপ থেকেই শুরু করা যেতে পারে। যদি কারুর তত্ত্ববিচারেই হয়ে যায় তখন তার আর কিছু লাগবে না। যদি কেউ বলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই হয়ে যাবে, তাকে এই কথা কে বলেছে? নিশ্চয়ই সাধু মহাত্মার কাছে সে এই কথা শুনেছে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই হয়ে যাবে, তাহলে তো তার ওখানেই সাধুসঙ্গ হয়ে গেল। সাধুসঙ্গ না হলে সে তো এই কথা জানতে পারত না। কোন না কোন ভাবে সাধুর প্রভাব জড়িয়ে আছে। তবে কি, ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে, চিনিটুকু নিয়ে বালিটা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু চিনি আর বালির বিচার করতে আমাদের দম বেরিয়ে যায়। সাধুসঙ্গ হল একেবারে ক্রীম। কবীর দাসের দোহাতে বলছেন, কুলোতে যখন কিছু ঝাড়া হয় তখন সারটা কুলোতে পড়ে থাকে আর ওর ভুশিগুলোকে উড়িয়ে দেয়ে, ঠিক তেমনি শাস্ত্র যখন সাধুর কুলোতে গিয়ে পড়ে তখন ওর বালিগুলো সব উড়ে যায় আর শাস্ত্রের সারটুকু পরে থাকে। সার আর ভুশি এই দুটো মিশে আছে, সাধুর সাথে ঘুর ঘুর করলে সাধু সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন এটা হল সার আর এগুলো কিছু না। সাধুসঙ্গে এটা একটা বড় লাভ।

তার আগে বলছেন, ভক্তিই মুক্তির প্রথম কারণ, এটা তুমি নিশ্চিত ভাবে জানবে। অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিশাস্ত্র, সেইজন্য ভক্তিকে এত প্রাধান্য দিচ্ছেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গী বা কট্টর বেদান্তী সন্ন্যাসীরা মানবেন না। এখানে আবার বলতে হচ্ছে অধ্যাত্ম রামায়ণ হল সমন্বয় শাস্ত্র, আর সমন্বয় শাস্ত্রের দৃষ্টিতে দেখলে এটাই ঠিক। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন গীতা উপনিষদের থেকেও শ্রেষ্ঠ, কারণ উপনিষদে ভক্তি জিনিসটা নেই, গীতায় ভক্তি জিনিসটা আছে। ভক্তি একটা খুব প্রধান অঙ্গ, তাই বলে যে সবাই ভক্তিকে নেবেন তা নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণের মতে যাঁর ভক্তি আছে তাঁর জ্ঞান হবে। ঠাকুরেরও এই মত আর গীতারও একই মত। ঈশ্বরে ভক্তি আর মুক্তি একই জিনিস। গোঁড়া ভক্তরা বলেন ভক্তি হলে দুদিকে সুবিধে হয়ে যায়, ঈশ্বরে ভক্তিও পায় আর মুক্তিও পায়,

যাঁরা জ্ঞানমার্গী তাঁরা শুধু মুক্তি পায়। এগুলোই আবার বোকা বোকা কথা। কারণ ভক্তি আর মুক্তি দুটো আলাদা কিছু নয়। যিনি আত্মাকে গ্রহণ করছেন, ভক্তি আছে বলেই গ্রহণ করছেন, তাঁর একই আনন্দ হয়, যে আনন্দ ঈশ্বর চিন্তন করে পান। তবে ভক্তিটা ভালো কেন, সহজ কেন? কারণ আমাদের যে চিন্তা-ভাবনা, যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধি স্থূল জিনিস ছাড়া নিতে পারে না। জ্ঞানমার্গের পথ অত্যন্ত সূক্ষ্ম পথ, সেখানে শুধু বিচার চলছে, এই বিচার করা সবার দ্বারা সম্ভব নয়। ভক্তিতে স্থূল দিয়ে শুরু করে একটু একটু করে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরের দিকে নিয়ে যায়, এই কারণে ভক্তির অনুশীলন করা সহজ। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। জ্ঞানমার্গ সূক্ষ্ম দিয়েই শুরু, সেইজন্য বুদ্ধিও খুব সূক্ষ্ম না হলে জ্ঞানমার্গের যে বিচার ধারা ঐ বিচার করা যায় না। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

যস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তা ত্বং ততোহহং ত্বামুপস্থিতঃ।৩/১০/৩১

শবরী! আমার প্রতি তোমার ঐকান্তিক ভক্তি আছে, সেইজন্য আমি স্বয়ং তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি। ঠাকুর বলছেন যাদের শেষ জন্ম তাদের এখানে আসতেই হবে। যদি না আসে ঠাকুর তাদের কাছে যাবেন। শ্রীরামচন্দ্রও যাঁদের শেষ জন্মে যে কোন ভাবেই হোক তাঁদের কাছে নিজেই পৌঁছে যাচ্ছেন। গভীর জংগলের মধ্যে অনেক দিন ধরে যাঁরা তপস্যা ও ধ্যানে রত তাঁদের কাছে গিয়ে দর্শন দিচ্ছেন। জ্ঞানমার্গের সাধকরা বলছেন হে রাম! তোমাকে আমরা দশরথের ব্যাটা বলেই জানি। তাতে শ্রীরামচন্দ্রও কিছু মনে করছেন না, অন্য দিকে তাঁরা আবার শ্রীরামচন্দ্রকে পরমাত্মা রূপে দেখছেন। আবার কবন্ধ বলছে, আমি জানি আপনি পরমাত্মা কিন্তু আমি লক্ষ্মণ ও সীতা সহ ধনুর্বাণধারী আপনার এই রূপকেই হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে চাই। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

ইতো মদ্দর্শনান্মুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।৩/১০/৩২

হে শবরী! তুমি যে আমার এই রূপ দর্শন করলে তোমার মুক্তি হবেই হবে, এতে কোন সংশয় নেই। শ্রীশ্রীমাও ঠাকুরের নামে বলছেন, যারা ঠাকুরের দর্শন করেছে তাদের মুক্তি হবেই হবে। পূর্ণজ্ঞান না হোক যোনিমুক্তি তো হবেই। কিন্তু শবরীর কাছে যোনিমুক্তি হওয়ার কিছু নেই, সে তো ভক্তির পরাকাষ্ঠায় চলে গেছে। ঠাকুরকে ভালোবাসা মানে ঠাকুরের যে ভাব সেই ভাবকে ভালোবাসা। ঐ ভাবকে ভাবতে ভাবতে যখন মহাভাবে পরিণত হয়ে গেল, সে সাক্ষাৎ ঈশ্বরে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু ঠাকুরকে যদি মানুষ রূপে দেখে ভালোবাসছে তাতেও তার একটা শুভ পরিণতি হবে। এই জন্মে তার হয়ত যোনিমুক্তি হয়ে পরের জন্মে ভালো কিছু হবে। এইসব কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র এবার ব্যবহারিক জগতে নেমে এসে বলছেন –

যদি জানাসি মে ব্রুহি সীতা কমললোচনা।
কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা।৩/১০/৩২

তুমি যদি জেনে থাক তাহলে বলে দাও আমার কমললোচনা সীতা কোথায় আছে, কোন দুরাত্মা আমার প্রিয়দর্শনা সীতাতে হরণ করে নিয়ে গেছে? ভক্তিশাস্ত্রে এই সমস্যা হয়। শ্রীরামচন্দ্র একদিকে শবরীকে মুক্তি দিয়ে দিলেন আবার জিজ্ঞেস করছেন আমার সীতাকে কে নিয়ে গেছে। তিনি তো ভগবান, ইচ্ছে করলেই জেনে যেতে পারেন। যদি সরাসরি ভক্তিশাস্ত্র রূপে লেখা হত তাহলে এই সমস্যা হত না, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণকে আধার করে লেখা হয়েছে তাই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। অবতার তত্ত্ব যদি বুঝতে হয়, অবতার কিভাবে কাজ করেন, অবতারের জীবন কেমন হয়, একমাত্র বাল্মীকি রামায়ণেই এর ঠিক ঠিক বর্ণনা আছে। যতই আমরা ভাগবত বা অধ্যাত্ম রামায়ণের কথা বলি না কেন, এই জিনিস আর কোথাও নেই। বাল্মীকি রামায়ণ হল ঠিক ঠিক শাস্ত্র যে শাস্ত্র অবতারকে বর্ণনা করে। ঠাকুরকেও আমরা জানি তিনি ভগবান, কিন্তু তাঁর যখন হাত ভাঙছে তিনি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন, ঘোড়াওয়ালা সময় মত আসেনি বলে তিনি রেগে যাচ্ছেন। অবতার যখন আসেন তিনি এভাবেই থাকেন। বাল্মীকি ঠিক সেভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু তুলসীদাসের রামচরিতকথা, অধ্যাত্ম রামায়ণ, স্কন্দ রামায়ণ কোথাও অবতারকে ঠিক ভাবে রাখা হয়নি। এগুলো তাও সাধকদের রচিত কিন্তু তাতেই এই অবস্থা আর বাকি যত রামায়ণ আছে তাদের হিসাবের মধ্যেই আনা উচিত নয়। একদিকে দেখাচ্ছেন যে তিনি পারমার্থিক সত্তায় অবস্থিত, একে ভক্তি দিচ্ছেন, তাকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন অন্য দিকে নিজেকে অনেক ব্যাপারে অসহায় মনে করছেন। এই জিনিস ভক্তিশাস্ত্রে মেলে না। আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়, কারণ ঠাকুর পাঁচ জনের কাছে যাচ্ছেন, স্বামীজীও পাঁচ জনের কাছে যাচ্ছেন। স্বামীজী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করতে গেছেন, পাণিনির প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যাটাই বুঝতে পারছেন না। ঠাকুর শুভঙ্করী অঙ্ক শিখতে গিয়ে যোগটা কোন রকমে শিখলেন, বিয়োগটা শিখতেই পারলেন না।

অবতারদেরও অনেক মানবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। অথচ একদিকে তাঁরা কত লোককে কৃপা করছেন, অন্য দিকে প্রত্যেক পদে দেখা যাচ্ছে অনেক কিছুতে তাঁদের অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে। কট্টর ভক্তিশাস্ত্রে অবতারকে মহান শক্তিমান দেখাচ্ছে, তিনি সব কিছুই জানেন কিন্তু মাঝখান থেকে দেখাচ্ছে অনেক কিছুই তিনি জানেন না। সীতা কোথায় আছে, কে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, এগুলো শবরীকে জিজ্ঞেস করার কি দরকার! বাল্মীকি রামায়ণে পরিষ্কার এই দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে বলছেন শবরী একজন সিদ্ধ যোগীনি। কবন্ধ বলে দিয়েছে আপনি ওখানে যান সুগ্রীব আপনাকে সাহায্য করবে। শবরী তাঁর যোগশক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রকে এগিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু অবতার পুরুষের এভাবে যোগসিদ্ধি হয় না, অনন্ত জ্ঞান সবই থাকবে কিন্তু জগতে নিজেকে চালানোর জন্য টাকা-পয়সা, ধার দেনা যেমনটি থাকার তাঁরও তেমনটিই থাকতে হবে। সেইজন্য বাল্মীকি রামায়ণ অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। যাই হোক তখন শবরী বলছেন –

দেব মানাসি সর্বজ্ঞ সর্বং ত্বং বিশ্বভাবন।
তথাপি পৃচ্ছসে যন্মাং লোকাননুসৃতঃ প্রভো।৩/১০/৩৩

যিনি ভগবান তিনি শবরীকে মুক্তি দিয়ে দিলেন, তিনিই আবার হঠাৎ শবরীকে এভাবে জিজ্ঞেস করাতে শবরী বলছেন, হে বিশ্বভাবন! আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি সব কিছুই জানেন কিন্তু লোকব্যবহার অনুসারে আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তখন আমিও বলছি, আপনার সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃত হয়েছেন আর এখন তিনি লঙ্কায় আছেন। এখানে আবার গোলমাল হয়ে যায়, লঙ্কায় আছেন একেবারে নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছেন তাহলে বানরগুলো চারিদিকে সীতাকে খুঁজে বেরিয়েছে এই ব্যাপারটা ঠিক খাপ খায় না, সবাই লঙ্কায় চলে গেলেই পারত। এই কথা বলার পর শবরী বলে দিচ্ছেন, এখান থেকে একটু দূরেই পম্পা সরোবর আছে, পম্পা সরোবরের কাছে ঋষ্যমুক পর্বত আছে, ঐ পর্বতে মহাবল-পরাক্রম বানররাজ সুগ্রীব নিজের দাদা বালির ভয়ে তাঁর চারজন মন্ত্রীর সাথে বাস করছেন। আপনি সুগ্রীবের কাছে যান, সে আপনাকে সাহায্য করবে। বলছেন –

অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি তবাগ্রে রঘুনন্দন।৩/১০/৩৯

হে রঘুনন্দন! আমি আপনার সামনে এই অগ্নিতে প্রবেশ করব আর যতক্ষণ আমার নশ্বর দেহকে দগ্ধ করে বৈকুণ্ঠধামে গমন না করছি ততক্ষণ আপনি এখানে অবস্থান করুন। বাল্মীকির সময়েও ছিল, যাঁদের মনে হত আমার এই শরীর দিয়ে আর কিছু হবে না, তাঁরা অগ্নিতে নিজেদের শরীরকে আহুতি দিয়ে দিতেন। শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা বলে শবরী অগ্নিতে প্রবেশ করে গেলেন আর ক্ষণকালের মধ্যে শ্রীরামের সামনেই তিনি দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত করে নিলেন। স্তুতি করে বলছেন, শ্রীরাম যাঁর উপর প্রসন্ন হয়ে যান জগতে তাঁর আর কোন কিছুই দুর্লভ থাকে না। একজন নীচ আদিবাসী নারী শবরীও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় অতি দুর্লভ মুক্তি পেয়ে গেলেন। স্বামীজী বলছেন, আমরা এত শাস্ত্র খাটাখাটনি করে অধ্যয়ন করে যে জ্ঞান পেয়েছি কিন্তু লেখাপড়া না জানা লাটু ঠাকুরের কৃপা মাত্রেই ঐ জ্ঞানের অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বলছেন যার অপবিত্র যোনিতে জন্ম, সেও যদি শ্রীরামের প্রসাদে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে তাহলে যারা উচ্চ বংশের, তাদের কথা আর বলার আর কোন অপেক্ষা থাকে না। সেইজন্য হে সাধুগণ! সব কিছু ছেড়ে শ্রীরামের চরণে ভক্তি কর, এতেই মুক্তি হবে, এতেই শান্তি হবে। এই কথা বলার পর অরণ্যকাণ্ড শেষ হয়ে যায়। অরণ্যকাণ্ডের পর শুরু হয় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

বাল্মীকি রামায়ণের এক একটা কাণ্ডে গিয়ে একজন করে নতুন অথচ খুব প্রভাবশালী চরিত্রের সংযোজন হয়। যেমন আগের কাণ্ডে রাবণ প্রবেশ করেছে, কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে হনুমান আসছেন। পরের কাণ্ডে গিয়ে একটা অভূতপূর্ব জিনিস হয়েছে, মুখ্য চরিত্র না হয়েও বাল্মীকি পুরো একটা কাণ্ড হনুমানের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মহাবীর হনুমান চরিত্র রূপে প্রবেশ করছেন। বাল্মীকি যে কটি চরিত্র দাঁড় করিয়েছেন তার মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র তো আছেনই কোন সন্দেহ নেই, সীতা ও লক্ষ্মণেরর চরিত্রও খুবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু বাল্মীকি হনুমানের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন সেখানে হনুমানকে প্রচণ্ড শক্তিমান ব্যক্তিত্ব রূপে উপস্থাপনা করেছেন। সাহিত্য রচনায় বলা হয় মূল চরিত্রকে কখনই পার্শ্বচরিত্র যেন ছাপিয়ে না চলে যায়। এখানে তিনটে কাণ্ডের পর বাল্মীকি হনুমানকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু পরের কাণ্ড পুরোটাই হনুমানের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সেখানে হনুমানকে এতটাই শক্তিশালী

আর গুরুত্ব দিয়েছেন যে রামের কোন ভূমিকাই নেই, সাহিত্যে এই ধরণের ঘটনা সাধারণত দেখা যায় না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের এটাই বৈশিষ্ট্য যে এবার হনুমানের প্রবেশ হতে যাচ্ছে।

শবরী দেহত্যাগ করেছেন, তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছিল আর তিনি শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন। দেহত্যাগের আগে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন, এখান থেকে আরেকটু এগিয়ে গেলে আপনার সাথে সুগ্রীবের দেখা হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে নিষ্কাশিত করে দিয়েছে এবং তাঁর স্ত্রীকেও হরণ করে নিয়েছে। সুগ্রীব এখন তাঁর চারজন মন্ত্রীকে নিয়ে ঋষ্যমুক পর্বতে আশ্রয় নিয়েছে। সুগ্রীব সীতার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে। শ্রীরামচন্দ্র এখন এগিয়ে চলেছেন, এখান থেকেই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের শুরু। ওখান থেকে এগিয়ে প্রথমে আসে পম্পা সরোবর। পম্পা সরোবর এক বিশাল জলাশয়, বলছেন এক ক্রোশ বিস্তীর্ণ সরোবর। তার জল অতি নির্মল ও গভীর এবং পদ্মকহ্লার ফুল ও হংস ও নানা রকম পাখির কলরব সরোবরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। পম্পা সরোবরের পাশেই ঋষ্যমুক পর্বত। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের পরিধানে বল্কল, মাথায় জটা অর্থাৎ সাধুর বেশ কিন্তু তীর ধনুক নিয়ে চলেছেন। ঋষ্যমুক পর্বত থেকে সুগ্রীব দুজনকে লক্ষ্য করেছেন।

সুগ্রীব, হনুমান এরা সবাই বানর, এই বানর আদিবাসী জাতি। একটা জাতির নাম বানর, সেখান থেকে পরে বানরের শরীর, বানরের লেজ দিয়ে সত্যিকারের বানর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগুলো হল শাস্ত্র, শাস্ত্রের সব বর্ণনাকে কখনই আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। যেমনি আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হবে, এরপরেই লাঠালাঠি শুরু হয়ে যাবে। সাহিত্য রচনা এভাবেই হয়। বাল্মীকি একজন গভীর কল্পনাপ্রবণ কবি। বাল্মীকি কবি কালিদাসের মত রম্য রচনা লিখছেন না, বাল্মীকির একমাত্র উদ্দেশ্য বেদের ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সেইজন্য বেদে যে কাহিনী, যে তত্ত্ব, যে আচার-সংহিতা রয়েছে সেই জিনিসগুলিকে মহাকাব্যের মাধ্যমে মানুষের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। একদিকে বাল্মীকি রামায়ণ শাস্ত্র অন্য দিকে ইতিহাস পুরাণের অন্তর্গত। ইতিহাস পুরাণ মানেই, চিনিতে বালিতে মেশানো আছে। ঋষিদের উদ্দেশ্যই ছিল কোন প্রকারে মানুষের কানে দুটি ধর্মের কথা ঢুকিয়ে দেওয়া। ঠাকুর বলছেন, ছোকাড়দের আমি একটু আঁশ ধোওয়া জল দিই, তা নাহলে এখানে আসবে না। সরাসরি তত্ত্ব কথা বললে সাধারণ মানুষ নিতে পারবে না, তাদের মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতাই নেই, কিছু দিন শোনার পর আর শুনতে চাইবে না। যাই হোক, সাধু বেশে দুজন বীরপুরুষকে দেখতে পেয়ে সুগ্রীব ভয় পেয়ে গেছে –

ভয়াদাহ হনুমন্তং কৌ তৌ বীরবরৌ সখে।
গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুর্ভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ।৪/১/৮

ভয় পেয়ে হনুমানকে সুগ্রীব বলছেন, হে হনুমান! এই দুজন বীর এরা কারা, এখানে কি করতে এসেছে, তুমি গিয়ে দুজনের ব্যাপারে খোঁজ নাও তো। দাদা বালিই হয়ত এদের পাঠিয়েছে আমাকে বধ করার জন্য। দুজন একদিকে জটাবল্কলধারী, অন্য দিকে ধনুর্বাণধারী। ভয় হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আর বালির থেকে সুগ্রীবের মৃত্যুভয় আছে। যাদের মৃত্যুভয় থাকে তারা সব কিছুতে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখে, অচেনা, অজানা কাউকে দেখলে ভাববে এ বুঝি আমাকে মারতে আসছে, পুলিশে যার ভয় তারও পুলিশ শব্দ শুনলেই ভয় হয়। মন ততটুকুই নেবে যেটা সে হয়ে আছে। মনের একটা অবস্থা থাকে, ঐ অবস্থার বাইরে মন কখনই কিছু শিখতে পারে না। এনারা তাই এর নাম দিয়েছেন উপমান। উপমান মানে, কোন জানা জিনিসের সাথে অজানা জিনিসের তুলনা করে করে অজানা জিনিসকে জানা। একজন চিড়িয়াখানা যাবে, তাকে বলা হল ওখানে সিংহ অবশ্যই দেখবে। সে জীবনে সিংহ কোনদিন দেখেনি, ছবিও দেখেনি, ওকে এখন বোঝাতে হবে সিংহ কি রকম দেখতে। হলুদ রঙ, হাড়ির মত বিরাট মুখ, বিশাল গর্জন করে। হলুদ রঙ জানে, বেড়াল দেখেছে, বেড়ালের বড় রূপ, আর খুব জোর আওয়াজ করে। চিড়িয়াখানা গিয়ে যখন সিংহ দেখল তখন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল এটাই সিংহ। এরপর অন্য কোন জন্তুর কথা তাকে যদি বোঝাতে হয় তখন সিংহকে আধারে করে বোঝাতে হবে। এইভাবে ধাপে ধাপে মানুষের জ্ঞান হয়। যেটাতে মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে তার বাইরে সেই কিছুতেই যেতে পারে না। ঠাকুর বলছেন, কাকেই বা বলি কেই বা বুঝবে! ঠাকুরের যে জ্ঞানরাশি, প্রথমেই স্বামীজীর পক্ষেও বোঝা সম্ভব ছিল না। বেদান্তে বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাই ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। কামী পুরুষের মন একেবারে কামের মধ্যে পড়ে আছে। মহাভারতে কীচকের কাহিনীতে কীচক দ্রৌপদীর জন্য অপেক্ষা করছে আর সেখানে ভীম শুয়ে আছে আর মনে করছে দ্রৌপদী শুয়ে আছে। কারণ কাম ছাড়া সে আর অন্য কিছু দেখতেই পারবে না। ঠিক তেমনি যার মনে মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে

সে এবার সব কিছুতে মৃত্যুর রূপকেই দেখবে। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব ভাবছে বালি এদেরকে পাঠিয়েছে আমাকে বধ করার জন্য। সেইজন্য হনুমানকে বলছেন, তুমি গিয়ে এরা কারা, কেন এসেছে খোঁজ নিয়ে আস। কিভাবে হনুমান যাবে? *দ্বিজাকৃতিঃ*, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে যাবে। আর বলছেন –

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকার

যদি তৌ দুষ্টহৃদয়ৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্।৪/১/১০

যদি দেখ ওদের হৃদয়ে দুষ্ট বুদ্ধি আছে, আমার ক্ষতি করতে চাইছে তখন তুমি আঙুল দিয়ে আমাকে একবার ইশারা করে দেবে। তুমি খুব বিনয়ের ভাব নিয়ে এদের কাছে যাও। কারণ কারুর ব্যাপারে কিছু জানতে হলে তার কাছে খুব বিনয়ের সাথে যেতে হয়, এটাই আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য। হনুমান ব্রহ্মচারীর বেশে সেখানে গিয়ে অত্যন্ত বিনীত ও নম্র হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন –

কৌ যুবাং পুরুষব্যাঘ্রৌ যুবানৌ বীরসম্মতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব।৪/১/১২
যুবাং ত্রৈলোক্যকার্তারাবিতি ভাতি মনো মম।
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ।৪/১/১৩

হনুমান যে আজ্ঞা বলে ব্রহ্মচারীর বেশে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বিনয় ও নম্র ভাবে বললেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনারা দুজন কারা। আপনারা এখন যুবাবস্থায়। হনুমান বলতে চাইছেন, বনবাসী হয়ে যাঁরা আসেন সধারণ ভাবে তাঁরা বয়স্ক হন, কারণ একটা বয়সের পর তাঁরা সংসার ছেড়ে অরণ্যে ঈশ্বর চিন্তা করতে আসেন। হনুমান বলতে চাইছেন আপনাদের দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনারা যুবক তার সাথে প্রচণ্ড বীরপুরুষ। আর বলছেন, আপনাদের শরীরের যে দিব্যকান্তি তাতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়ে আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ যেহেতু ভক্তিশাস্ত্র সেইজন্য আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে বলছেন, আমার মন বলছে আপনারা দুজন ত্রিলোকের কর্তা। মুখ দেখে সত্যিই এভাবে বলা যায় কিনা যে ইনি বা এনারা ত্রিলোকের কর্তা আমরা জানি না। শ্রীশ্রীমা তখন বারাণসীতে আছেন। শ্রীমার কথা শুনে একজন এসেছে মায়ের সাথে দেখা করতে। গোলাপ মাও সেখানে বসে আছেন, ভদ্রমহিলা গোলাপ মাকেই শ্রীমা ভেবে প্রণাম করেছেন। গোলাপ মা শ্রীমার দিকে দেখিয়ে দিতে ভদ্রমহিলা শ্রীমাকে প্রণাম করতে গেছে, মাও মজা করে বলছেন ঐ মা। ভদ্রমহিলা আবার গোলাপ মাকেই প্রণাম করতে গেছেন। এইভাবে এক দুবার হতেই গোলাপ মা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বলছেন, মুখ দেখে বুঝতে পারছ না কে জগজ্জননী। আবার অন্য দিকে আমাদের পরম্পরাতেই কোথাও কোথাও বলা হয় যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা মুখ দেখে বুঝতে পারেন কে ব্রহ্মজ্ঞানী। কিন্তু এটা ভক্তিশাস্ত্র, ভক্তিশাস্ত্রে হনুমান একজন আদর্শ ভক্ত। ঠাকুরও বলছেন ভক্ত মানেই হনুমান। এখানেও তাই ঐ ভাবেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে, হনুমান দেখেই বলছেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা। আর বলছেন, *যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ*, আপনাদের দেখে আমার মনে হচ্ছে আপনারা দুজনেই জগতের হেতু, জগন্ময়, প্রধান পুরুষ, প্রকৃতি আর পুরুষ দুটোই আপনি। তারপর হনুমান বলছেন –

মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া।
ভূভারহরণার্থায় ভক্তানাং পালনায় চ।৪/১/১৪

শ্লোকে অবতারের বর্ণনা করছেন। হনুমান এখনও জানেন না যে শ্রীরামচন্দ্র অবতার, কিন্তু অবতারের বর্ণনা করে বলছেন *মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া*, ভগবান নিজের মায়ার শক্তিতে মানুষের আকৃতি ধারণ করেছেন। মায়া technical শব্দ, মায়াকে সাধারণ ভাবে আমরা মনে করি, মায়া-মোহ, মিথ্যা, জাদু ইত্যাদি, মায়া তা নয়। মায়া শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ হল, জিনিসটা আছে, দেখাচ্ছে কিন্তু বাস্তবে নেই। আমাদের জন্মকর্ম সব কিছু পূর্ব পূর্ব কর্মের প্রেরণাতে হয়, কিন্তু ভগবানের জন্ম কর্ম দিব্য, স্বেচ্ছায় তিনি করেন, সেখানে কোন বন্ধন নেই, সেইজন্য এটাকে বলে মায়া। আমাদের জন্ম কর্ম সবই বন্ধনে। ভগবান যে শুধু মানুষের রূপই ধারণ করেন তা নয়, পশু, পাখি, দেবতা যে কোন রূপ তিনি ধারণ করতে পারেন। এখানে শ্রীরামচন্দ্র মানুষের আকার ধারণ করেছেন। *চরন্তাবিব লীলয়া*, শ্রীরামচন্দ্রের যত রকম ক্রিয়া এটাই তাঁর লীলা। বাস্তবে তাঁর কোন ক্রিয়া হয় না,

কারণ যেখানে ক্রিয়া থাকবে সেখানে সেই ক্রিয়ার পেছনে আরেকটা কর্ম থাকতে হবে, সেই কর্মের পেছনে আরেকটি কর্ম থাকবে। যে কোন কার্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক চিরন্তন। একটা কারণে কার্য হবে, এই কার্যটাই আরেকটা কার্যের কারণ হবে, সেই কারণ আরেকটি ক্রিয়াকে জন্ম দেবে। ভগবানের ক্ষেত্রে তা হয় না, ভগবানের যে কোন ক্রিয়ার পেছনে কোন কারণ থাকে না, সেইজন্য এটাকে লীলা বলা হয়। তাহলে তিনি মানুষের আকার ধারণ করে কেন কার্য করেন? বলছেন, *ভূভারহরণার্থায়*, জগতের ভার হরণ করার জন্য। শুধু ভূভার হরণ করার জন্যই ভগবান অবতার হয়ে আসেন তা নয়, বিভিন্ন কারণে তিনি আসেন। যেমন ভগবান বুদ্ধ, তিনি কাউকেই বধ করেননি, কপিল মুনিও অবতার তিনিও কাউকে মারেননি। অবতারের একটাই কাজ, প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ, এই দুটোর শিক্ষা দেওয়া। এটাই ধর্ম স্থাপন। মানুষের মধ্যে ধর্ম স্থাপন করতে গিয়ে যদি চারটে লোককে বধ করতে হয়, ভগবান তখন রজোগুণ অবলম্বন করে তাই করান। মারার যখন দরকার হয় তখন দশটা বদমাইশ লোকের সাথে চারটে ভালো লোকও মারা যায়। ভূভার হরণ আর ভক্তদের পালনের জন্য ভগবান মানুষ রূপ ধারণ করেন, এটাই প্রচলিত মত। ভালো লোকরা নিজেদের রক্ষা করতে পারেন না, ভগবানই তাদের দেখছেন। যখন দেখেন ভালো লোকেদের উপর অত্যাচার খুব বেশি বেড়ে গেছে, তখন তিনি কোন একটা বিহিত করেন। হিন্দুদের যে বিচার ধারা তাতে ভগবান যখন তখন হস্তক্ষেপ করেন না। আমরা মনে করছি, আমি ঠাকুরকে ডাকছি তিনি আমাকে রক্ষা করবেন, কিন্তু তিনি কখনই তা করেন না। সংসারে সব সময়ই গোলমাল লেগে আছে। গোলমাল একটা অবস্থাকে অতিক্রম করে গেলে তিনি নিজেই আসেন নয়তো কাউকে পাঠিয়ে দেন। যারা সংসারের স্থিতিকে বিগড়ে দিচ্ছে তিনি তাদের পথে নিয়ে আসেন বা নাশ করে দেন। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সাথে তীরধনুকও আছে। তাঁরা বিদ্যা দিয়ে ধর্ম সংরক্ষণ করতে আসেননি, তার মানে অস্ত্রের সাহায্যে এবার কিছু জিনিসের সংহার করবেন। ভগবান কি রূপে এসেছেন তার উপর নির্ভর করে তিনি এবার কিভাবে কাজ করবেন। ঠাকুর এক ভাবে এসেছেন, শ্রীরাচন্দ্র আরেক ভাবে এসেছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে এবার ভক্তদের পালন করতে গিয়ে কিছু ভার হরণ করতে হবে। আবার বলছেন –

অবতীর্ণবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী।
জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্গং লীলয়া কর্তুমুদ্যতৌ।৪/১/১৫
স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ।
নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ।৪/১/১৬

সংসারের স্থিতি, সংসারের উৎপত্তি আর দুষ্টের সংহার এটাই আপনার লীলা, অথচ আপনি ক্ষত্রিয়ের রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভগবানের দুটো জিনিস একসাথেই চলছে, তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করছেন, ঐ লয়ের মধ্যে যারা দুষ্ট তাদের বিনাশ সাধন করাটাও আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই তিনি নিজের মায়ার শক্তিতে এক স্বর্গীয় রূপ ধারণ করে ঘুরছেন। তখনও হনুমান জানেন না এনারা কারা। দুজনেই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র মানে সত্তা বা ক্ষমতা যার নিজের হাতের মুঠোয় রেখেছেন। পৃথিবীতে একমাত্র রাজার হাতেই ক্ষমতা থাকে, কিন্তু আসল রাজা ভগবান। সেইজন্য তাঁর একটা নাম ঈশ, ঈশ মানে সবারই যিনি নিয়ন্তা। তার মানে আমরা যতই বলি, যতই ভাবি না কেন কখনই কোন মানুষ কোন পরিস্থিতিতে, কোন অবস্থাতে কখনই স্বাধীন হতে পারে না, স্বতন্ত্র হতে পারে না। স্বতন্ত্র মানে পুরো ক্ষমতা যার নিজের হাতে আছে। সত্তা একমাত্র ভগবানের হাতে, বাকি সবাই পরাধীন, বাকি সব পরতন্ত্র। হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে বলছেন, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি স্বতন্ত্র। হনুমানের কি করে মনে হল শ্রীরাম স্বতন্ত্র? শরীরের ভাষা, তাঁর হাটাচলা, কথা বলা দেখেই বোঝা যাবে যে তিনি স্বতন্ত্র কিনা।

যাঁরা স্বতন্ত্র তাঁদের যে বোঝা যায় না তা নয়, বোঝা যায়। আমেরিকার এক নামকরা বন্দর থেকে নতুন একটি জাহাজের প্রথম যাত্রা সূচনা হচ্ছিল। নবনির্মিত জাহাজ প্রথম ছাড়ছে, দেখার জন্য অনেক লোক জড়ো হয়েছে। স্বামীজীও দেখতে গেছেন। সাধারণ লোকেদের জন্য একটা জায়গাতে ব্যারিকেড করা ছিল, সাধারণ লোক ওর বাইরে যেতে পারবে না। ব্যারিকেডের বাইরে থেকেই দেখতে হবে। স্বামীজীর ইচ্ছা হল কাছে গিয়ে দেখবেন। স্বামীজী ব্যারিকেড ছাড়িয়ে আরামসে সামনে গিয়ে জাহাজ ছাড়া দেখলেন। কোন রক্ষীই স্বামীজীকে আটকালো না। স্মৃতিকথায় একজন লিখছেন, স্বামীজীর হাটাচলার মধ্যে এমন একটা রাজকীয়তা ছিল যে, সিকিউরিটির লোকেরা তাঁকে আর আটকাতে পারল না। ভগবান যীশুকে যেদিন ক্রুশিফাই করা হবে সেদিন তিনি একজনকে বলছেন,

অমুক লোকের কাছ থেকে গাধা নিয়ে এস। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে গাধার পিঠেই সবাই যাতায়াত করত। সাধারণত বড়লোকরাই গাধাতে যেত। যীশুকে তাঁর লোক জিজ্ঞেস করছে, আমি গিয়ে কি বলব? যীশু বলছেন, আমি চেয়েছি বললেই সে দিয়ে দেবে। ঠিক তাই হল, লোকটি গিয়ে চেয়েছে আর সেও গাধা দিয়ে দিল। যাঁরা শক্তিমান পুরুষ, কিছু একটা হয় যেখানে বোঝা যায় এর উপর কোন শক্তিই কাজ করবে না। কামিনী-কাঞ্চন তো নয়ই, এমনকি সমাধিতে যে যোগশক্তি হয় সেই শক্তিও তাঁর উপর কাজ করে না। যে রাজবংশের তাঁর কোন কিছুতেই তাড়া নেই। রাজার ঘড়ির সাথেই সবাই সবার ঘড়িকে মিলিয়ে নিতে হয়। বড় বড় লেখক, সাধুদের মধ্যে এই জিনিসটা থাকে।

মীর্জা গালীব নামকরা উর্দু কবি ছিলেন। বেচারীর কোন সময় পয়সা-কড়ি ছিল না, সব সময় নানান রকম ঝামেলা হয়ে যেত। দিল্লীর তখন বাদশা ছিলেন বাহাদুর শা জাফর। গালিব আশা করতেন বাহাদুর শা তাঁকে কিছু টাকা-পয়সা দেবেন, বাহাদুর শা দিতেনও। দিনকাল তখন খুব খারাপ যাচ্ছিল। সেই সময় দিল্লীতে নতুন কলেজ হয়েছে, দিল্লী কলেজ। গালিবকে বলা হল পার্সি ভাষার শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক হতে। তখনকার লোকেরা জানতই না কলেজ জিনিসটা কি। ইংরেজরা এসে সবে কিছু কিছু জিনিস স্থাপন করতে শুরু করেছে। গালিব দরখাস্ত করেছেন। ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হয়েছে। উনি পাল্কিতে চেপে ইন্টারভিউ দিতে গেছেন। কলেজের গেটের কাছে এসে উনি পাল্কি থেকে নামবেন না। যতক্ষণ না কলেজের সেক্রেটারি এসে গালিবকে অভ্যর্থনা করছে ততক্ষণ তিনি নামবেন না। কিছুতেই নামলেন না। সেক্রেটারি একজন ইংরেজ সাহেব, তিনি এলেন। সেক্রেটারি বলছেন, শ্রীমান! এভাবে হয় না, চাকরির জন্য এসেছেন, পাল্কী থেকে নামুন, আমরা আপনার ইন্টারভিউ নেব, তারপর ঠিক করব আপনাকে চাকরি দেওয়া হবে কি হবে না। গালিব খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, আমি রাজার একজন কর্মচারী হতে এসেছি আর রাজা যদি আমাকে সম্মান না দেয়, আমি এ রকম চাকরি নিতে পারি না। আসল রাজা তো ইংরেজ, ইংরেজ সাহেব যদি আমাকে সম্মান না দেয় এই চাকরির আমার দরকার নেই। মীর্জা গালিবের মাথায় ঘুরছে, আমি বাহাদুর শার রাজসভার কবি, সেই কবি যদি যান সেখানে রাজার লোক তাঁকে আপ্যায়ন করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। মীর্জা গালিব, সাহেবকে বলছেন, কলেজের চাকরি নেব কিনা আমি ভাবছি। গালিব পাল্কি থেকে নামলেনই না, আমার চাকরি লাগবে না। ওখান থেকেই তিনি ফেরত চলে এলেন। এগুলোই রাজকীয় ব্যাপার। কিন্তু এটা সেই প্রকৃত স্বতন্ত্রতারই প্রতিচ্ছবি। প্রতিচ্ছবি দিয়েই বোঝা যায় আসল স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বতন্ত্রতা কাকে বলে। হনুমান তাই বলছেন, আপনার শরীরের ভাষা দিয়ে বোঝা যাচ্ছে আপনি স্বতন্ত্র।

তাই না, আপনার প্রেরণাতেই জগৎ চলছে। কারণ ভগবান নিজে কোন কিছুতে জড়ান না, প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি সব কিছু করেন। তিনি আছেন বলেই প্রকৃতি সব চালাচ্ছে। *সর্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ*, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যিনি অন্তর্যামী, চৈতন্য সত্তা, সেটা আপনি। *নরনারায়ণৌ লোকে*, আপনারা দুজন হলেন নরনারায়ণ। আগেকার দিন অবতারের ধারণায় ভগবান বিষ্ণু ঐভাবে ছিলেন না, তখন ছিলেন নরনারায়ণ ঋষি। বদ্রিকাশ্রমে নর ও নারায়ণ দুই ঋষি সব সময় তপস্যায় লীন হয়ে থাকেন। নারায়ণ ঋষি ভগবান আর নর দিব্য লীলাসহচর। তপস্যা করে করে দুজনেরই শরীর অস্তিচর্মসার হয়ে গেছে, হাড় আর চামড়া ছাড়া শরীরে কিছু নেই। আমাদের পরম্পরাতে নর আর নারায়ণ ঋষিকে নিয়ে প্রচুর কাহিনী আছে। মহাভারতে একটা কাহিনীতে আছে, এক রাজার প্রচুর অহঙ্কার হয়ে গেছে। সেই রাজা সমস্ত রাজাদের জয় করার পর ভাবছে আর কাকে জয় করা যায়। খুঁজে খুঁজে একজনকে জয় করতে গেছে, সে বলছে আমাকে জয় করে তোমার কি হবে, বদ্রিকাশ্রমে নর আর নারায়ণ ঋষি আছেন, জয় যদি করতে হয় তুমি ওদের দুজনকে জয় কর। রাজা বদ্রিকাশ্রমে গিয়ে দেখছে হাড় আর চামড়া শরীর নিয়ে দুটো ঘাটের মড়া সাধু গাছের তলায় বসে ধ্যান করছে। রাজা নরনারায়ণ ঋষিদের গিয়ে বলছে, ধ্যান থেকে উঠুন, চলুন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। নরনারায়ণ ঋষিরা বলছেন, আমরা কী যুদ্ধ করব! আমরা ধ্যানে বসে আছি, এছাড়া আমরা তো আর কিছু পারিনা। সেও দুজনকে ছাড়বে না। অনেক তর্কাতর্কি করার পর রাজা এবার তীর চালাতে যাচ্ছে দেখে, নর ঋষি একটা ঘাসের টুকরো নিয়ে মন্ত্রপূত করে রাজার সৈন্যদের দিকে ছেড়ে দিয়েছেন। এবার ঐ একটা ঘাসের টুকরো থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা, এই করে হাজার হাজার ঘাসের টুকরো গিয়ে রাজার যত সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ছিল আর তাদের শরীরে যত রকমের ছিদ্র ছিল সব ছিদ্রে ঢুকে গেছে। প্রত্যেক লোমকূপে, কানে, নাকে, চোখে মুখে শরীরে যত ছিদ্র থাকতে পারে সব ছিদ্রের মধ্যে ঘাসের টুকরো ঢুকে গেছে। পুরো সৈন্যবাহিনী ওখানেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। তখন রাজা গিয়ে অনেক করে

ক্ষমা চাইলেন। ঋষিরা ক্ষমা করে দিলেন, তোমার যা করার ওদিকে গিয়ে কর, আমাদের বিরক্ত করতে এসো না। নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসেছেন। ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে নরেনের সামনে হাঁটুগেড়ে বলছেন, আমি জানি তুমি সেই নর ঋষি। রামলক্ষ্মণকে দেখে হনুমানও বলছেন আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে আপনারাই নর নারায়ণ ঋষি। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকার পুরো অন্য ধরণের। হনুমানের সব কথা শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন –

শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পশ্যৈনাং বটুরূপিণম্।
শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নূনমনেকধা।৪/১/১৭

বটু মানে ব্রহ্মচারী। হে লক্ষ্মণ এই বটুরূপীকে তুমি লক্ষ্য কর। এর কথা শুনে মনে হচ্ছে এ অনেকবার খুব ভালো করে শব্দশাস্ত্র, শব্দশাস্ত্র মানে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেছে, শ্রবণ করেছে। আর দেখ, এ এতগুলো কথা বলল কিন্তু কথার মধ্যে একটিও অশুদ্ধ শব্দ নেই, তার মানে এ একজন পণ্ডিত ব্রহ্মচারী। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে হনুমানের ব্যাপারে আরও বিস্তারিত এবং কাব্যিক ভাবে বলছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন – *ন অন্ ঋগবেদ বিনীতস্য ন অযজুর্বেদ ধারিণঃ। ন অসামবেদ বিদুষঃ শক্যম্ এবম্ বিভাষিতুম্।।৪/৩/২৮।* যে ব্যক্তি ঋগ্বেদ, সামবেদ আর যজুর্বেদ, এই তিনটে বেদ সম্যক ভাবে অধ্যয়ন করেনি সে এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করতে পারবে না। আর বলছেন *নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নম্ অনেন বহুধাশ্রুতম্,* অধ্যাত্ম রামায়ণেও ঠিক এই ভাষাই নিয়ে এসেছেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রকে যে অনেকবার অধ্যয়ন করেনি, শ্রবণ করেনি সে কখনই এই রকম কথা বলতে পারবে না। আর *বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।।৪/৩/১৮।* সামনের লোকটি এতগুলো কথা বলল কিন্তু তার মধ্যে একটিও অপশব্দ নেই। অপশব্দের বাংলা অর্থ হয় নোংরা শব্দ, অপশব্দের সঠিক অর্থ শব্দের ভুল ব্যবহার। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, লোকটি ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ খুব ভালো ভাবে অধ্যয়ন করেছে, ব্যাকরণ শাস্ত্রও অনেকবার অধ্যয়ন করেছে।

আমরা জানি দ্বিজ ছাড়া কেউ বেদ অধ্যয়ন করতে পারত না, বাল্মীকি বলছেন, মহাবীর হনুমানের ঋক, সাম ও যজুর্বেদ জানা আছে, তার সাথে বেদান্ত ও বেদাঙ্গও জানা আছে। অনেকগুলো কথা বলছে কিন্তু কোথাও ভাষার কোন ত্রুটি নেই। তার মানে হনুমান সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান পুরো আয়ত্ত করে নিয়েছিল। পরে আসবে, মহাবীর হনুমান লঙ্কায় গিয়ে সীতাকে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলার আগে ভাবছেন, আমি যদি সংস্কৃতে সীতার সাথে সম্ভাষণ করি তাহলে সীতা ভাববেন, কোন রাক্ষস হয়ত ছল করছে। তখুন তিনি ভাবলেন, অযোধ্যায় যে ভাষায় কথা বলা হয় ঐ ভাষায় আমি যদি কথা বলি তাহলে সীতা হয়ত ভাববে আমি শ্রীরামচন্দ্রেরই লোক। তখন তিনি অবধী ভাষায় মিষ্টি মিষ্টি করে রামকথা বলতে শুরু করলেন। তার মানে হনুমান একজন ভাষাবিদ ছিলেন। আমাদের ধর্মীয় পরম্পরার দৃষ্টিতে যদি দেখা হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে ঋক, সাম, যজুর্বেদ কে পড়বেন? বাল্মীকি ছিলেন এক অসাধারণ সৃজনশীল কবি, তিনি অনেক কিছুকে মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই না, বাল্মীকি কি সুন্দর বলছেন, *অন্যেষ্বপি চ সর্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ*। মানুষের মনকে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা, এমন নিখুঁত বর্ণনা বাল্মীকির মত আর কোথাও পাওয়া যাবে না। কথা বলার সময় হনুমানের চোখ, মুখ, ললাট, ভ্রু যুগল বা শরীর কোথাও কোন রকম কোঁচকানো নেই। কথা বলতে গিয়ে আমরা চোখে, মুখে, হাতে কত রকমের ভঙ্গিমা করি। বলতে চাইছেন, হনুমানের মনের মধ্যে কোন রকমের ইমোশান জড়িয়ে নেই। ইমোশানে কখন জড়িয়ে যায় না? যখন সরাসরি শুধু fact দেওয়া হয়। আমি লোকাল ট্রেনে যাচ্ছি, আমার পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা অমুক স্টেশন কখন আসবে? এখানে চোখেমুখে কোন অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে না, সরাসরি একটা কথা বলে দেওয়া হল। যখনই কথা বলার সময় চোখেমুখে নানা রকমের আকৃতি বিকৃত হতে থাকে, হাতে কোমরে অনেক রকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে, বুঝতে হবে কিছু গোলমাল আছে। পরের দিকে এগুলোকে নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরিক্ষা করা হয়েছে। কথা বলার সময় চোখ যদি এই রকম করে, ভ্রু যদি এভাবে নাচায় তাই দিয়ে লোকটিকে সহজেই মেপে নেওয়া যায়। আর বাল্মীকি কত হাজার হাজার বছর আগে এগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে সাহিত্যের মধ্যে কাব্যিক রস দিয়ে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। হনুমানের ললাট, ভ্রু, চোখ, মুখ, অঙ্গ কোথাও কোন ধরণের নড়াচড়া নেই।

বাল্মীকি শ্রীরামের সংলাপে আরও বলছেন, *অবিস্তরম্ অসন্দিগ্ধম্ অবিলম্বিতম্ অদ্রুতম্,* হনুমান যে কথাগুলো বলছে, বিরাট লম্বা করে বলছে না। *অসন্দিগ্ধম্,* কথার মধ্যে কোন সংশয় নেই, *অবিলম্বিতম্* একই

কথাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে লম্বা করেও বলছে না আর *অদ্রুতম্*, কথা বলার মধ্যে কোন রকম তাড়াহুড়ো নেই। হড়্ হড়্ করে যে বলছেন তা নয়, খুব ধীরে ধীরে যে বলছেন তাও নয়, মেপে মেপে যে বলছেন তাও নয়, খুব বিস্তারে বলছে তাও না, খুব যে সংক্ষেপে বলছে যার ফলে যে সংশয় এসে যাবে তাও না, কথার পুনরুক্তিও করছে না। আর তার সাথে কথাগুলো যে বলছেন মনে হচ্ছে বুক থেকে যেন বের হচ্ছে আর গলা দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছে তখন কণ্ঠস্বর একেবারে হাল্কা ও মৃদু হয়ে মধ্যম সুরে সমান ভাবে বেরিয়ে আসছে। কারুর সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় তারই বর্ণনা করছেন। বাল্মীকি বলছেন, হনুমান খুব মার্জিত ভাষায় কথা বলছেন, কথাগুলো খুব শুভদায়িনী আর হৃদয়কে স্পর্শ করছে। কথাগুলো বক্তার হৃদয়স্থিত। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে লক্ষ্মণ! এত পরিষ্কার ভাবে এত সুন্দর যে কথা বলে, শত্রুও যদি তলোয়ার বার করে দাঁড়িয়ে থাকে সেও কিন্তু এর ভাষায় মুগ্ধ হয়ে যাবে।

এই ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃতিকে ক্লাসিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে আকবর থেকে শুরু করে পর পর রাজারা যারা এসেছিলেন। দিল্লীর দরবারে ভাষা এত মার্জিত ছিল যে কল্পনাই করা যায় না। লক্ষ্ণৌর নবাবরাও একই কালচার পেয়েছিল। কিন্তু ভারত পাকিস্থান ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে এই কালচারটা নষ্ট হয়ে যায়। নবাবদের দুর্দিন এসে গেল, তারাও থাকল না। বাড়িতে মেয়েরা জীবনে কোন কাজই শেখেনি। যেমন মীর্জা গালিব, বেচারির পরে কিছুই থাকল না। একটা রান্না করতে জানে না, নিজের কাপড় ধুতেও জানে না, সব কিছুর জন্য অপরের উপর নির্ভর থাকত। মাঝখান থেকে নবাবরা চলে গেল, রাতারাতি সব ফকির হয়ে গেল। মেয়েগুলো সব রূপসী ছিল, মায়েদেরও কিছু করার ছিল না, নিজের মেয়ের গলা তো আর কেটে দিতে পারবে না। বড় বড় বাড়িতে, হোটেলে মেয়েগুলোকে রাত্রিতে পাঠাতে শুরু করল।

পাঞ্জাব থেকে যারা এদিকে এসেছিল তারা প্রচুর টাকা-পয়সা নিয়ে এসেছিল, চরিত্র বলে এদের কিছুই ছিল না, সংযম বলে কিছু নেই, সংস্কৃতি বলে কিছু নেই। একবার এক হোটেলে নবাব বংশের একটি মেয়েকে রাত্রে পাঠানো হয়েছে। পাঞ্জাবী লোকটি মদ পান করেছিল। কিন্তু শুধু মেয়েটির এমন সুসংস্কৃত, এমন মার্জিত ভাষা ও স্বভাব যে, সেখানে বর্ণনা আছে যে লোকটি কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। ঐ উচ্চমানের সংস্কৃতির সামনে লোকটি মেয়েটিকে স্পর্শ করার সাহস পেল না। লোকটি কাঁপতে কাঁপতে দরজা খুলে মেয়েটিকে টাকা-পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিল। সংস্কৃতি এমনই জিনিস, যিনি খুব সুসংস্কৃত, খুব উচ্চ কালচারের হন, কেউ যদি তার ক্ষতি করতে চায়, সে কিন্তু ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা বলি ঠিকই যে, সতী নারীর প্রতি লম্পট লোক যদি কুদৃষ্টি দেয় সে অন্ধ হয়ে যায়, সতী হয়ে থাকলে তাকে কেউ আর স্পর্শই করতে পারবে না। কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা নয়, সতী মানেই তার একটা কালচার আছে, ঐ কালচারের এমন একটা শক্তি থাকে, যে শক্তির সামনে দুষ্ট লোক দাঁড়াতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যার এই ভাষা, এই ভাষার সামনে কোন শত্রুও যদি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেও তাকে ছুঁতে পারবে না। আর লক্ষ্ণৌয়ের যে ঘটনা বলা হল, এটা ঐতিহাসিক ঘটনা, কোন গল্প নয়।

এইসব কথা বলার পর শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, দেখো লক্ষ্মণ, এই রকম সুসংস্কৃতবান, শান্ত স্বভাবের দূত যার আছে, সেই রাজার সব কাজ সিদ্ধ হবেই। রাজদূতের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গুণ হল শান্ত থাকা। ইংরাজীতে দুটো শব্দ আছে, diplomacy আর politics, গালাগাল দেওয়ার সময় আমরা বলি ব্যাটা politics করছে, আর ভদ্র ভাবে বলার সময় বলি diplomacy করছে। যারা diplomat তার কাউকে যখন বোকা বানাবে তখন মিষ্টি করে, ভদ্র ভাবে বোকা বানাবে। আর নোংরা ভাবে বোকা বানালে তাকে politics বলে। হনুমানের এমন ভাষা জ্ঞান, এমন জ্ঞানী, আর এমন সংস্কৃতবান, এই ধরণের লোক যে রাজার দূত হবে সেই রাজার কার্য সিদ্ধি হবেই হবে। আমরা এতক্ষণ বাল্মীকি হনুমানের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটাকে তুলে ধরলাম। অধ্যাত্ম রামায়ণে একই কথাকে খুব সহজ ভাবে সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের ব্যাপারে বলছেন। বাল্মীকি হনুমানকে মানুষ রূপেই উপস্থাপিত করছেন। হনুমানের লেজ, শরীরের কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু কাহিনী যেমন যেমন এগোবে তাঁর চরিত্রটা আরও এগিয়ে যাবে। তখনকার দিনের রচনায় কোন ধরণের সম্পাদনা হত না, লেখক যেমন যেমন লিখে যাচ্ছেন তার চরিত্রটাও তেমন তেমন এগিয়ে যাচ্ছে। ওরহান্ পামুর খুব নামকরা লেখক, তিনি বলছেন, লেখন যেন একটা জাহাজ, তাকে সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হল। এরপর লেখনী কোথায় যাবে, কোন দ্বীপে, কোন শহরে, কোন বন্দরে গিয়ে পোঁছাবে জানা নেই। যেমন যেমন এগোবে তেমন তেমন অজানা জিনিসগুলো লেখকের সামনে ফুটে উঠতে পারে। আমরা মনে করি লেখকরা একটা জিনিস জানে বা একটা জিনিসকে ঠিক করে রেখেছে, সেটাকেই লিখে

দিলেন। যদি একটা জানা জিনিসকে নিয়ে লেখা হয় তাহলে সেটা রিপোর্টিং হয়ে যাবে, সাহিত্য হবে না। Creative writing মানেই হয় লেখক নিজেও জানে না আমি কি লিখতে যাচ্ছি। লেখকের কাছে হয়ত ছোট্ট দুটো জিনিস আছে, ওই দুটোকে নিয়েই এগোতে শুরু করলেন, যেন একটা নৌকা নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। এবার সে বিচারের যে সমুদ্র সেটার উপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাল্মীকিও সেই রকম এগিয়ে যাচ্ছেন, যেতে যেতে একটা খুব সুন্দর চরিত্র মানসচক্ষে ভেসে উঠল, তার শক্তি আছে, বিদ্যা আছে, সংস্কৃতি আছে, তার বুদ্ধি আছে, পরে পরে সেভাবেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু তাঁকে প্রথম উপস্থাপনা করছেন তাঁর বাকপটুতাকে সামনে রেখে আর তাঁর বেদ জানা আছে, ব্যাকরণ জানা আছে, কথাগুলো যখন বলছেন মধ্যম স্বরে, খুব গভীর নয়, কথা বলার সময় শরীরের কোন রকম অঙ্গভঙ্গি নেই, শান্ত ভাবে অল্প কথায় অনেক কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এইসব হয়ে যাওয়ার পর এবার শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের কাছে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।

অহং দাশরথী রামস্ত্বয়ং মে লক্ষ্মণোহনুজঃ।
সীতয়া ভার্যায়া সার্দ্ধং পিতুর্বচনগৌরবাৎ।৪/১/১৯

আমি দশরথ পুত্র রাম, এ আমার ছোট ভাই লক্ষ্মণ। পিতৃবাক্যের গৌরব রক্ষার্থে আমি ভার্য্যা সীতা সহ দণ্ডকারণ্যে এসেছি। দণ্ডকারণ্যে কোন রাক্ষস আমার সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রকে অনেকে বলেছে যে রাবণ অপহরণ করেছে কিন্তু এখনও সব কিছু পরিষ্কার নয়, সত্যি সত্যি কে সীতাকে অপহরণ করেছে। সেইজন্য বলছেন কোন রাক্ষস অপহরণ করেছে। তখন ব্রহ্মচারীর বেশে হনুমান বলছেন –

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ।
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গিরিমুর্দ্ধনি তিষ্ঠতি।৪/১/২১

সুগ্রীব নামে মহামতি বানররাজ চারজন মন্ত্রি সহ এই গিরিশিখরে অবস্থান করছেন। এখানে বানর মানে একটা ট্রাইব। কিন্তু পরের দিকে যত এগোবে তত বানরের যত গুণ সব এদের উপর আরোপ করে দেওয়া হবে, ভাল্লুকের যত গুণ সেগুলোও নিয়ে আসবে। কিন্তু হনুমানের প্রথম যে ভূমিকা সেটাকে মানুষের মতই বাল্মীকি রেখেছেন। সুগ্রীবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হনুমান বলছেন –

সুগ্রীবের সাথে শ্রীরামের বন্ধুত্ব

ভ্রাতা কনীয়ান সুগ্রীবো বালিনা পাপচেতসা।
তেন নিষ্কাশিতো ভার্য্যা হৃতা তস্যেহবালিনা।৪/১/২২
অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুত্রো মহামতে।
হনুমান নাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসম্ভবঃ
তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেণ রঘুত্তম।৪/১/২৪

সুগ্রীব হল পাপ বুদ্ধি সম্পন্ন বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেই বালি সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে তাঁর ভার্য্যাকে অপহরণ করে নিয়েছে। বালির ভয়ে সুগ্রীব এই ঋষ্যমুক পর্বতে থাকেন। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে হনুমান বলছেন, আমি সেই সুগ্রীবের মন্ত্রী। আমি হলাম বায়ুপুত্র, অঞ্জনার গর্ভে উৎপন্ন, আমার নাম হনুমান। বাল্মীকির রামায়ণে অঞ্জনা একজন অপ্সরা ছিল। কিভাবে কোন অভিশাপে সে বানর যোনিতে এসে পড়ে। অঞ্জনা একদিন বাগানে বিচরণ করছিলেন, সেই সময় বায়ু দেবতা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। অঞ্জনা তখন বানরদের রাজা কেশরীর বিবাহিতা স্ত্রী। বায়ু দেবতার খুব ইচ্ছে হল এই নারীর সাথে সমাগম করবে। পুরাণের কাহিনীগুলিতে দেবতাদের এটা একটা চিরদিনের সমস্যা ছিল, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই গোলমাল পাকিয়ে ফেলত। বায়ু দেবতা অদৃশ্য দেবতা, কিন্তু যখন সমাগম করেছে তখন অঞ্জনা বুঝতে পেরে চেঁচামেচি করতে শুরু করে দিয়েছে। তখন বায়ু দেবতা বললেন, আমি বায়ু দেবতা, তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তোমার কাছে এসে গেছি। এখান থেকে তোমার এক পুত্র জন্ম নেবে, আমিই তার বাবা আর আমিই তার রক্ষা করব। সেইজন্য বলা হয় যত দিন বায়ু দেবতা আছেন তত দিন হনুমানের মৃত্যু নেই। বায়ু মানে যত রকম প্রাণ সঞ্চার হয় তিনি সমস্ত প্রাণের দেবতা, তাই যত দিন বায়ু থাকবে তত দিন হনুমানের শরীরও থাকবে। মূল কথা হনুমান মহা শক্তিমান। হনুমানের শক্তিকে আধার করে যদিও অনেক কাহিনী আছে, পুরো পাহাড় তুলে নিয়ে চলে গেছেন, হনুমানকে

কেউ পরাস্ত করতে পারবে না, মারা যাবে না ইত্যাদি, কিন্তু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রাবণ এক ঘুষি মারতেই হনুমান মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল, রামায়ণেই বর্ণনা আছে। যিনি সমস্ত দেবতাদের তুলে ফেলে দিতে পারেন, কিন্তু রাবণের কাছে পারলেন না কেন? এখানে কোন অসঙ্গতিপূর্ণ কথা নেই। কবিরা যখন কোন চরিত্রকে তোলেন তখন তাঁরা অনেক সময় হারিয়ে যান। যেমন বাল্মীকি রামায়ণে চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে। আমরা কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিলাম যে পুরো চব্বিশ হাজার শ্লোক বাল্মীকিই লিখেছেন। তালপত্রে বা ভুজ্যপত্রে বছরের পর বছর লিখে যাচ্ছেন। দু বছর আগে কি লিখেছেন কবিদের মনে থাকার কথা নয়, পাতা উল্টে উল্টে কত দেখতে যাবেন। আজকালের মত অত indexing ছিল না যে ফটাফট দেখে নেবেন। রাবণের বর্ণনার সময় রাবণের চরিত্রকে উপরে নিয়ে আসতে হবে, রাবণের শক্তির বর্ণনা করার সময় মাথা থেকে আগের অনেক কিছু হারিয়ে গেছে, সেই কারণে একটা ফাঁক এসে যাচ্ছে। তাছাড়া রাবণের শক্তির প্রকাশ যদি না থাকে তাহলে রামের মহিমা হবে না। সেইজন্য রাম তার থেকেও শক্তিশালী। কিন্তু প্রথমে হনুমানকে একটু বেশি বড় করে দেখান হয়েছে, পরে ফাঁক এসে যাচ্ছে। সেইজন্য এগুলোকে নিয়ে বেশি বিচার করতে নেই, যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে দিতে হয়। বেশি বিচার করতে গেলে হিসাব মেলানো যাবে না। তখন হনুমান বলছেন, আপনি যে সীতার সমস্যার কথা বললেন, এতে আপনার খুব ভালো হবে যদি আপনি সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করে নেন। তুলসীদাসের রামায়ণে আছে, যেখানে হনুমান বলছেন, সুগ্রীবও নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছে, আপনিও আপনার স্ত্রীকে হারিয়েছেন, আপনাদের দুজনের বন্ধুত্ব খুব ভালো হবে। নরেন আর হাজরার খুব বন্ধুত্ব ছিল, ঠাকুর দুজনকে নিয়ে বলতেন, একজন বিদেশীনি আরেকজন বিরহীনি। একজনের স্বামী বাইরে চলে গেছে, সে বিরহীনি, আরেকজন স্বামীকে ছেড়ে অন্য দেশে পড়ে আছে, সে বিদেশিনী। দুজনেরই একটাতে মিল, দুজনের মনে খুব দুঃখ, তাই বিদেশীনি আর বিরহীনি দুজনে খুব জমবে। নরেনরও টাকার দরকার, হাজরারও টাকার দরকার, দুজনেই দুঃখে আছে। দুজনের সমান সুখ হলে কম জুড়বে, সমান দুঃখ হলে খুব ভালো ভাবে জুড়বে। হনুমান তাই বলছেন, আপনার স্ত্রীও হারিয়ে গেছে সুগ্রীবের স্ত্রীকেও নিয়ে গেছে, আপনাদের দুজনে জমবে ভালো।

এটা ঠিকই যে, মনের মিল না হলে বন্ধুত্ব হয় না। ঠাকুরও অনেককে বলছেন তুমি ওর সাথে আলাপ করবে তোমাদের ভালো বন্ধুত্ব হবে, ঠাকুর দেখছেন এদের মনের মিল আছে। হনুমান সেই কথাই বলছেন, আপনাদের দুজনের মিল আছে, দুজনের ভালো বন্ধুত্ব হবে। শ্রীরামচন্দ্রও বলছেন, হ্যাঁ আমিও সুগ্রীবের সাথে সখ্যতা স্থাপনের জন্যই এখানে এসেছি। কারণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলে দেওয়া হয়েছিল সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, সুগ্রীবের যা প্রয়োজন আমি নিশ্চয় তা সম্পাদন করব। হনুমান বলছেন, সুগ্রীব পর্বত শিখরে বালির ভয়ে লুকিয়ে আছেন, আপনারা ওখানে যেতে পারবেন না। আপনারা আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আমি এক লাফে আপনাদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। হনুমান তখন শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধে বসিয়ে এক লাফে পর্বত শিখরে পৌঁছে গেলেন।

সুগ্রীবের কাছে পৌঁছে হনুমান বলছেন, রাজা! আপনি এবার দুশ্চিন্তা দূর করুন, ইনি শ্রীরাম আর ইনি ওনারই অনুজ লক্ষ্মণ। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে আপনি শ্রীরামচন্দ্রের সাথে শীঘ্রই বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করুন। অগ্নি হলেন দেবতা, আমাদের অনেক কিছু কার্য অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করা হয়। উপনয়ন অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করা হয়, ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা অগ্নিকে সাক্ষী রেখেই করা হয়, হিন্দুদের বিবাহ কার্য অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করা হয়। বন্ধুত্বও অগ্নিকে সাক্ষী রেখে করা হয়। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে বন্ধুত্ব করার পর মিত্র ধর্ম পালন না করলে পাপ হবে। অগ্নিকে সাক্ষী রেখে সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এখানে আবার তুলসীদাসের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে, বলছেন যে বন্ধুর দুঃখে দুখী হয় না তার অত্যন্ত অধম গতি হয়। বন্ধুত্বের সম্পর্ককে স্বীকার করার পর তারা দুজনেই দুজনের ব্যাথাতে ব্যাথী আর সুখেতে সুখী হবে। আমাদের সবারই চিত্ত প্রমাদগ্রস্ত, মন এতই চঞ্চল যে কোন কিছুতেই স্থির থাকে না। বন্ধুত্বের মত এক পবিত্র সম্পর্কেও আমরা দেনা-পাওনার হিসাব করতে নেমে পড়ি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে এক অপরের উপর নির্ভরতা আছে। কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের কঠোর চাপ যদি না থাকে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সামলানই যাবে না। আমেরিকাতে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে এত আইনি জটিলতা আর টাকা-পয়সার এত রকম ঝামেলা জড়িয়ে দিয়েছে যে যাতে কেউ ডিভোর্সের দিকে না যায়। কোন সমাজই চায় না যে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ হোক। যে সমাজে চাপ আছে সেখানে সম্পর্কটা চলতে থাকে। আর মায়ের সাথে সন্তানের একটা আবেগ জড়িত সম্পর্ক থাকে। বন্ধুত্বে তো কোন bondingই নেই। আমরা মনে করি অনেকের সাথেই

আমার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যার ঠিক ঠিক চারজন বন্ধু থাকে সে কিন্তু জগৎ জয় করে নেবে। কিন্তু আজকের দিনে কোথায় সেই বন্ধুত্ব পাবে। আগেকার দিনে মানুষ অপেক্ষাকৃত একটু শান্ত চিত্ত ছিল বলে তাদের এক আধটা বন্ধুত্ব হয়ে যেত। ইদানিং কালে কোন প্রশ্নই নেই। কাউকে নিজের দুঃখের কথা বলার পর সে আর তার ফোনই ধরবে না। সবাই এখন যে যার নিজের জীবন নিয়েই ব্যস্ত, আর জীবনটাই হয়ে গেছে চঞ্চল চিত্ত। সুগ্রীব সেইজন্য বলছেন, বন্ধুর দুঃখে দুখী হয় না সেতো মহা পাতক, নরকে তার গতি হয়। এরপর সবাই বসে গল্প করছেন, দুজন দুজনের কথা বলছেন। তখন সুগ্রীব বলছেন, আমি আপনার ভার্য্যা সীতার খোঁজ করব, আর আমি যা দেখেছিলাম সেই ব্যাপারে আপনাকে বলছি।

একদিন আমি এখানে বসে ছিলাম, হঠাৎ দেখছি এক রাক্ষস একজন নারীকে আকাশমার্গ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ঐ নারী কেবল 'রাম রাম' বলে আর্তনাদ করছিলেন, আমাদের পর্বতের উপরে দেখে সেই নারী তাড়াতাড়ি করে অঙ্গের অলঙ্কার খুলে নিজের উত্তরীয়র মধ্যে বেঁধে পুটলি করে আমাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সুগ্রীব রাবণকে বুঝতে পারেনি, আর রাবণকে জানতেনও না। সুগ্রীব বলছেন, সব অলঙ্কার আমি গুহায় লুকিয়ে রেখেছি, আপনি দেখে বলুন এই আভূষণ সীতারই কিনা। শ্রীরামচন্দ্র আভূষণ দেখে 'হা সীতা' বলে ক্রন্দন করতে শুরু করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র বুঝে গেলেন সীতাকে রাবণ অপহরণ করে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গেছে। সুগ্রীব তখন বলছেন, হে রাম! আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আমি অবশ্যই সংগ্রামে রাবণকে বধ করে আপনার জানকীকে উদ্ধার করে দেব। এইসব বলার পর সুগ্রীব নিজের জীবনের কাহিনী বলতে শুরু করেছেন।

দেবতাদের যেমন বিশ্বকর্মা তেমন দানবদের মধ্যে ময় দানব সব কাজ করে। ময় দানবের সন্তানের নাম মায়াবী। একবার মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যাতে এসে যুদ্ধের জন্য বালীকে আহ্বান করে। বালী শক্তিশালী পুরুষ, সে সহ্য না করে রেগেমেগে বেরিয়ে মায়াবীকে সজোরে এক মুষ্টাঘাত করেছে। একটা ঘুষি খেয়েই মায়াবী দৌড়ে পালিয়ে একটা গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে। বালী মায়াবীকে গুহায় ঢুকতে দেখেছে। বালী তখন সুগ্রীবকে নিয়ে গুহার কাছে এসে সুগ্রীবকে গুহার বাইরে দাঁড় করিয়ে নিজেই গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে। সুগ্রীবকে বলে দিল, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি এক্ষুণি ব্যাটাকে মেরে আসছি। এরপর এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে, বালী আর ফেরত আসছে না। তারপর একদিন দেখে গুহার ভেতরে থেকে প্রচুর রক্ত গড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। সেই রক্ত দেখে সুগ্রীবের মনে হল আমার দাদা মারা গেছে। তখন সে গুহার মুখে একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে দিল, যাতে ভেতর থেকে মায়াবী আর বেরোতে না পারে। সন্তাপ করতে করতে কিষ্কিন্ধ্যাতে ফিরে এসেছে। এরপর সুগ্রীব রাজা হয়ে গেল। রাজা হওয়ার কিছু দিন পরে দেখে বালী এসে হাজির হয়ে গেছে। বালী খুব করে সুগ্রীবকে গালাগাল দিয়েছে, গালাগাল দেওয়ার পর প্রচণ্ড মারতে শুরু করেছে। সুগ্রীব কিছু বলতে চাইছে কিন্তু বালী কিছুই শুনবে না। তখন সুগ্রীব নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে! যেখানেই যাবে বালী থেকে বাঁচার কোন পথ নেই। তখন সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে এসে আশ্রয় নিল। সুগ্রীব খুব দুঃখ করে বলছেন, বালী তো রাজ্য থেকে আমাকে বহিষ্কার করেই দিয়েছে সাথে সাথে আমার স্ত্রীকেও হরণ করে নিয়েছে। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে নিষেধ আছে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে নেওয়া যায় না, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী কন্যার মত। শাস্ত্রে এই কজনের ব্যাপারে নিষেধ করছে, কন্যা, মা, ভগিনী আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। শ্রীরামচন্দ্র পরে এই বিধানটাকে কাজে লাগাবেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর সাথে নিজের স্ত্রীর মত ব্যবহার করেছে তাই বালী পাপী। সুগ্রীব খুব দুঃখ করেই বলছেন, আমি এখানে মনের দুঃখে পড়ে আছি, আমার স্ত্রীও চলে গেল, রাজ্যও চলে গেল। নিজের জন্মভিটাতেও আর ঢুকতে পারছি না।

তখন শ্রীরামচন্দ্র বললেন, ঠিক আছে! আমি তোমার শত্রু নাশ করব। শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সুগ্রীব বলছেন, আপনি কী করে বালীর নাশ করবেন, সে সাধারণ কেউ নয়, প্রচণ্ড শক্তিশালী, দেবতারাও তাকে হারাতে পারবে না। সুগ্রীব তখন একটা উপমা দিচ্ছেন, দুন্দুভি নামে এক বিরাট বড় রাক্ষস ছিল। সেও একবার মহিষের শরীর ধারণ করে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে এসে খুব হম্বিতম্বি করতে লাগল, তার সাথে অনেক রকম উৎপাত করতে শুরু করে দিয়েছে। চেঁচামেচি শুনে বালী বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে বালী দুন্দুভির শিং ধরে ঘুরিয়ে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলেছে। আর তার মুণ্ডুটা মোচড় দিয়ে ধড় থেকে আলাদা করে দিয়েছ। তারপর মুণ্ডুটাকে নিয়ে এমন জোরে ছুড়েছে যে এই ঋষ্যমুক পাহাড়ে এসে পড়েছে। মড়া মোষের রক্ত গিয়ে মাতঙ্গ মুনি, শবরী অধ্যায়ে যাঁর আলোচনা করা হয়েছিল, তাঁর আশ্রমে গিয়ে পড়েছে। মাতঙ্গ মুনি খুব বিরক্ত হয়ে গেছেন, আশ্রমের

মধ্যে মোষের রক্ত। তিনি তখন রেগেমেগে বালীকে অভিশাপ দিয়ে বলছেন, তোমার এত অহঙ্কার! ঠিক আছে, এই পর্বতে যদি তুমি একবার পা দিয়েছ তোমার মাথাও ফেটে চৌচিড় হয়ে যাবে। বালীর যত শক্তিই থাকুক আর যাই থাকুক, ঋষির অভিশাপকে সবাই ভয় করে। সেই থেকে বালী আর এদিকে মাড়ায় না।

দুন্দুভির মাথাটা এখনও এখানে পড়ে আছে। সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, ওর মুণ্ডুকে যদি আপনি ছুড়ে ফেলতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস হবে যে বালীর সাথে লড়াই করার মত আপনার শক্তি। কিন্তু মুণ্ডুটা যতই বড় মোষের হয়ে থাকুক, মুণ্ডুর ওজন বেশি হওয়ার কথা নয়, ওর শরীরটাই ভারী হবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র এগিয়ে গিয়ে পায়ের আঙটা দিয়ে একটু চাপ দিতেই মুণ্ডুটা দশ যোজন দূরে গিয়ে পড়ল। এটা দেখে সুগ্রীব চমকে উঠেছেন। সুগ্রীব আবার শ্রীরামকে বলছেন, আমি আরেকটা পরীক্ষা নিতে চাই। এই যে সামনে সাতটি তাল গাছ দেখছেন। বালী যখন এখানে আসত তখন মজা করে গাছগুলোকে এত জোরে নাড়াত, তাতে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ত। আপনি যদি এক বাণ মেরে সাতটা তাল গাছকে ছিদ্র করে দিতে পারেন, তাহলে আমি ধরে নেব যে আপনি বালী বধ করে দিয়েছেন। কারণ তাল গাছকে কাটা খুব কঠিন। শ্রীরামচন্দ্র হাসতে হাসতে একটা বাণ বার করে মারলেন। এমন মেরেছেন ঐ একটা বাণ সাতটা তালগাছকে ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে সেই বাণ পৃথিবী, আকাশ পথে ঘুরে আবার শ্রীরামচন্দ্রের তূণীরে ঢুকে গেছে। সুগ্রীব তখন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে বলছেন –

দেব ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ।
মৎপূর্বকৃতপূণ্যৌঘৈঃ সঙ্গতোহদ্য ময়া সহ।৪/১/৭৬

হে দেব! আপনি নিশ্চয় সমস্ত জগতের স্বামী, এতে কোন সন্দেহ নেই, আমার আগের আগের জন্মের অনেক পূণ্যফল সঞ্চিত হয়েছে বলেই আমি আপনার আজ দর্শন পেলাম। এই কাজ মানুষ কখনই করতে পারে না। ভাগবতে বলছে, ঈশ্বর যখন অবতার হয়ে আসেন তখন তিনি এমন কিছু কাজ করেন যে কাজ মানুষ চেষ্টা করলেও পারবে না। যে খুব শক্তিশালী সে হয়ত দুটো কি তিনটে তালগাছ ভেদ করে দেবে কিন্তু একসাথে সাতটা তালগাছ ভেদ করে আবার নিজের কাছে ফিরে আসবে, এই শক্তি মানুষের কখনই হতে পারে না।

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে।
ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েহহং কথং ভবম্।৪/১/৭৭

মহাত্মাগণ সংসারনিবৃত্তির জন্য আপনার ভজনা করেন, আর আমি সেই মোক্ষপদ কামনা না করে সাংসারিক বস্তু কি করে আপনার কাছে চাই! স্বামীজী তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাড়িতে কত রকম কষ্ট, ঝামেলা চলছে। ঠাকুর একদিন মায়ের কাছে পাঠালেন, যা মায়ের কাছে প্রার্থনা কর। স্বামীজী তিন বার গিয়ে ফেরত চলে এলেন, স্বামীজীর লজ্জা করছে, যে মা ভক্তি দেন, মুক্তি দেন তাঁর কাছে কি করে ডাল ভাতের প্রার্থনা করি! অন্য জায়গায় ঠাকুর বলছেন, কল্পতরু বৃক্ষের নীচে গিয়ে কি কেউ লাউ কুমড়ো চায়! সুগ্রীবও একই কথা বলছেন, এই দেখার পর আমার আর সাংসারিক কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি নেই, আমি কিছু চাই না।

আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোহহং ভাগ্যগৌরাবাৎ।
মৃদর্থং যতমানেন নিধানমিব সৎপতে।৪/১/৭৯

একজন লোক চাষের জন্য বা কোন কারণে মাটি খনন করছে, মাটি খুড়তে খুড়তে হঠাৎ দেখল সেখানে বিরাট ধনরাশির ভাণ্ডার। আমি এখানে বসে আছি আমার স্ত্রী ও রাজ্য ফেরত পাওয়ার আশায়, সেখানে আমি পেয়ে গেলাম আপনাকে। ঠাকুর বলছেন, কেউ যদি কাঁচ কুড়োতে গিয়ে হীরে পেয়ে যায় সে কি ঐ হীরেকে ছেড়ে দেবে? কখনই ছাড়বে না। কোন কামনা নিয়েই যদি কেউ ঈশ্বরের কাছে যায়, আর কোন কারণে যদি মুক্তি বা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির দিকে তার মন চলে যায়, সেটাকে কি সে ছেড়ে দেবে? কখনই ছাড়বে না। সুগ্রীব বলছেন, এই যে আপনাকে দর্শন করলাম, এই দর্শনেই যে অবিদ্যা জনিত জন্ম-মৃত্যু হয় সেই অবিদ্যা জনিত সব বন্ধন আমার কেটে গেল। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ইষ্টাপূর্ত যত যা কিছু আছে, এসব কর্ম দিয়ে কখনই মুক্তি হয় না, উপরন্তু আরও বন্ধন বেড়ে যায়। কিন্তু হে রাম! আপনার প্রতি যদি কারুর ভক্তির উদয় হয়, আপনার চরণ দর্শন যদি কারুর হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ তার মুক্তি হয়ে যায়।

ক্ষণার্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্।

তস্যাজ্ঞনমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।৪/১/৮২

কারুর চিত্ত যদি ক্ষণার্দ্ধের জন্যও আপনার শ্রীচরণে স্থির ভাবে অবস্থান করে, এই যে অনর্থের মূল অজ্ঞান, তৎক্ষণাৎ এই অজ্ঞান নাশ হয়ে যায়। এটা সত্যিকারেরই হয়, একবার যদি ঈশ্বরই সত্য এই বোধটা ঠিক ঠিক হয়ে যায়, সেখানেই তখন অজ্ঞানরাশির নাশ হয়ে যায়। এই কথা বলার পর সুগ্রীব বলছেন, হে রাম! আমার মন যেন আপনাতেই লেগে থাকে অন্য কোথাও যেন না যায়।

রাম রামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্।
স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।৪/১/৮৪

যে ক্ষণকালও রাম রাম করে মধুর গান করে সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী বা সুরাপায়ী বা যত বড় পাপীই হোক সে সব পাপরাশি থেকে অবশ্যই মুক্ত হয়ে যাবে। হে রাম! বালীর উপর বিজয়, সাম্রাজ্য, আমার এসব কিছুই লাগবে না। আমার শুধু এই প্রার্থনা আপনার চরণে যেন আমি সেই ভক্তি লাভ করতে পারি, যে ভক্তিতে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে যেতে পারি। এই সংসার আপনারই মায়া, আপনারই বিস্তার। আমিও এই মায়ারই অংশ, সেইজন্য আপনার চরণে আমি একমাত্র ভক্তিই কামনা করি। সুগ্রীব জ্ঞানীর লক্ষণ বলছেন –

পূর্বং মিত্রার্য্যুদাসীনাস্ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ।
আসন্ মেহদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাঘব।৪/১/৮৭

আগে আগে আমার মন যখন অজ্ঞানে আবৃত ছিল তখন সংসারে অনেক কিছুতে দ্বন্দ্ব দেখতাম, শত্রু দেখতাম মিত্র দেখতাম, উদাসীন দেখতাম। কিন্তু হে রাঘব! আজ আপনার শ্রীচরণ দর্শনেই সব কিছু ব্রহ্ম রূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে। মানুষের মন যতক্ষণ সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের মধ্যে থাকে ততক্ষণ ভালো মন্দ সবই দেখে, কিন্তু যখন সব কিছুকে আত্মা রূপে, ব্রহ্ম রূপে বা ঈশ্বর রূপে দেখে তখন আর এই বিভেদ থাকে না। ত্রিগুণাতীত মানেই তাই, সব কিছুতে ঈশ্বরকেই দেখে। সব কিছুকে যদি ঈশ্বর রূপে দেখে তখন কিসের ভালো আর কিসের মন্দ। যে গলা কাটছে সেও ঈশ্বর, যার গলা কাটছে সেও ঈশ্বর, যেটা দিয়ে কাটছে সেটাও ঈশ্বর। আর বলছেন –

সর্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক্ব মিত্রং ক্ব চ মে রিপুঃ।
যাবত্ত্বন্মায়য়া বদ্ধস্তাবদ্গুণবিশেষতা।৪/১/৮৮

সবই যদি ব্রহ্ম রূপে দেখি তখন কে আমার শত্রু কেই বা আমার বন্ধু। ঈশোপনিষদে বলছেন *তত্র কো মোহ কঃ শোকঃ*, একবার যদি দেখে নিই সবই তিনি তখন কিসের আর মোহ আর কিসের জন্য শোক! মায়া যতক্ষণ ঢেকে রেখেছে ততক্ষণই মানুষ সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণের প্রভাবে থাকে। মায়া মানেই বহু দেখা, দ্বন্দ্ব দেখা। এই বহুর পারে যখন একত্ব দেখে এটাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা, এটাই জ্ঞান। সব কিছুর আধার ঐ এক, ঐ একের উপরে বহুর খেলা। যতক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান না হয় ততক্ষণই নানা দর্শন, ততক্ষণই মৃত্যু ভয়। যেখানেই ভেদ ভাব সেখানেই মৃত্যু ভয় থাকবে। ভেদ ভাব চলে গেলে তখন আর কিসের মৃত্যু ভয় হবে! চেঙ্গিস খাঁ নির্বিচারে এত নিরীহ লোকদের হত্যা করল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলছেন, তখন ঈশ্বর কি করছিলেন। সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের ব্যাপারে একটা খুব সাধারণ ধারণা হল, আমার ইচ্ছা গুলো যদি ঠিক ঠিক চলতে থাকে তখন সেটা ভগবানের জন্য। কিন্তু যাঁদের ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ধারণা হয়ে গেছে তাঁদের কাছে জীবন যা মৃত্যুও তাই। জীবনটা ভগবানের, তাহলে মৃত্যুটা কার? মৃত্যুটাও ভগবানের, জীবনটাও ভগবানের। সেটাই বলছেন, যাঁর অখণ্ড জ্ঞান হয়ে গেছে তাঁর ভেদ ভাব চলে গেছে, ভেদ চলে গেছে তাই মৃত্যু বলেও কিছু থাকছে না। সেইজন্য বলছেন যে পুরুষ অবিদ্যার কামনা করে, অবিদ্যা মানে কামিনী-কাঞ্চন, সে তো প্রচণ্ড অজ্ঞানে পড়ে আছে। হে রাম! আমার যেন ভক্তি হয়। ভক্তিকে এখানে ব্যাখ্যা করছেন, মন যেন আপনারই ধ্যান করে, বাণী যেন আপনারই নাম উচ্চারণ করে, হাত যেন আপনারই কাজ করতে থাকে আর এই শরীর যেন সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। শরীর আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকে মানে, আমি যেখানেই যাই ঈশ্বরের পাশে পাশেই আমি হাটছি। যে কোন কাজ করার সময় এই ভাবনাই থাকবে আমি তাঁরই সেবা করছি। বাণীতে ঈশ্বরের নাম ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না। মনে তাঁর চিন্তন ছাড়া কিছু থাকবে না। এটাই ভক্তিশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যদিও এখানে সুগ্রীবের মুখ দিয়ে বলছেন, সুগ্রীবের আগেও অনেক রকম সমস্যা হয়েছে, পরেও অন্য রকম সমস্যা হবে কিন্তু কাহিনী অবলম্বন করে একটা উচ্চ

আদর্শকে স্থাপন করছেন। তার সাথে বলছেন, আমার চোখ যেন আপনার রূপের মাধুর্যেরই চিন্তন করে আর আপনার যাঁরা ভক্ত তাঁদেরকেই যেন দর্শন করতে থাকি, আর আমার কর্ণ যেন আপনারই লীলাকথা শ্রবণ করে।

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্রতীর্থানি বিভ্রত্বহিশক্রুকেতো।৪/১/৯৩

আমার এই শরীর যেন আপনার চরণধূলা ধারণ করে, মস্তক যেন নিরন্তর আপনার শ্রীচরণ প্রণামে তৎপর থাকে। একজন ভক্ত যাঁর এখনও জ্ঞান হয়নি, তাঁর জীবন কিভাবে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে চলবে, তাঁর সাধনা কেমন হবে, সুগ্রীবের মাধ্যমে কয়েকটি শ্লোকে তারই বর্ণনা করলেন। এই হল কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের প্রথম অধ্যায়, হনুমানের সাথে শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় আর সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন। এরপর আসছে বালীবধের কাহিনী।

বালীবধ

সমালোচকরা শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে অনেক কিছু বলেন, শ্রীকৃষ্ণকে নিয়েও বলেন। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে যে কটি ঘটনা সমালোচকরা আলোচ্য বিষয় করতে উৎসাহিত বোধ করে তার মধ্যে দুটো তিনটে ঘটনা বেশি গুরুত্ব পায়। একটি সীতার অগ্নিপরীক্ষা, সীতাকে বনবাসে পাঠানো আর তৃতীয় বালী বধ। শ্রীরামচন্দ্র বালীকে লুকিয়ে কেন বধ করলেন? বালীর বর ছিল যে, তার মুখোমুখি যে যুদ্ধ করতে যাবে তার অর্দ্ধেক শক্তি বালীর মধ্যে চলে আসবে, সেইজন্য বালীকে কেউ হারাতে পারত না। শ্রীরামচন্দ্রকে তাই তালগাছের আড়ালে লুকিয়ে বালীকে বধ করতে হয়েছিল। এটাও একটা কাহিনী, নৈতিকতা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো উঠতে পারে তার থেকে অনেক রকম সমস্যা তৈরী হতে পারে, তাই একটা কাহিনী দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে যত বিতর্কমূলক আলোচনা আছে তার মধ্যে বালীকে লুকিয়ে মারার প্রসঙ্গ সব থেকে বেশি প্রাধ্যান্য পেয়েছে। লুকিয়ে বালীকে বধ, এর পক্ষে বিপক্ষে অনেক রকম যুক্তি আনা হয়। পক্ষে যারা তারা বলবেন, রামায়ণ হল ঠিক ঠিক ধর্মশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র মতে যেটা আপনি ঠিক করে নিয়েছেন সেটা আপনাকে করতে হবে, সেখানে ডান দিক বাম দিকের কোন হিসাব চলবে না। এর বিপক্ষে বলবে, বড় বড় কোম্পানীরা বলছে আমাদের উদ্দেশ্য মুনাফা করা, এখানে নৈতিকতা, মূল্যবোধ বলে কিছু নেই। কোম্পানি ঠিক করে নিয়েছে আমাদের মুনাফা করতে হবে, তা যে করেই হোক, তারাও তো ধর্মশাস্ত্র অনুসারে ঠিকই করছে। আবার পক্ষে যারা তারা বলবে, শ্রীরাম যেটা কথা দিয়েছেন সেটা তিনি করবেন। এর বিরুদ্ধেও সেই একই যুক্তি আসছে, কোম্পানির ডিরেক্টর কথা দিয়েছে আমি আপনার কোম্পানিতে মুনাফা করিয়ে দেব। এখন সে যদি ডান দিক বাম দিক করে মুনাফা করে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে কি? আবার বলা হয় যে শ্রীরামের কোন কাজেই আমিত্ব ভাব থাকত না। সমস্যা হল, যখন তিনি সুগ্রীবকে কথা দিয়েছেন যে আমি বালীকে বধ করব, তার বদলে সুগ্রীবও কথা দিল আমি সীতার উদ্ধারের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। দু তরফেই অহং ভাবটা কোন না কোন ভাবে জড়িয়ে আছে। আবার বলা হয়, ভগবান বা অবতার পুরুষের কোন দোষ থাকে না। ভাগবতে শুকদেবকে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কিন্তু তিনি এভাবে মর্যাদা লঙ্ঘন করে অপরের স্ত্রী অর্থাৎ গোপীদের নিয়ে এত কিছু করেছেন এটা কেমন দৃষ্টিকটু লাগে। শুকদেব তখন পরীক্ষিৎকে সাবধান করে দিচ্ছেন, বড়দেরকে নিয়ে কখনই প্রশ্ন করবে না। সামর্থবান বা ক্ষমতাবানরা অনেক সময় মর্যাদাকে অতিক্রম করে থাকেন। সেইজন্য এনাদের কখন নকল করতে নেই। শুকদেব দৃষ্টান্ত এনে বলছেন শিব হলাহল পান করেছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোক সামান্য একটু বিষ পান করলে মরে যাবে। কিন্তু পক্ষে এই যুক্তিটাই might is right হয়ে যায়, যার ক্ষমতা আছে সে যা করবে সেটাই ঠিক বলে মেনে নিতে হবে। এখানে বিষয় হল লুকিয়ে পেছন থেকে মারা নিয়ে। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে হরণ করেছে, মারাত্মক অন্যায় এবং শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে মারতে হলে সামনে নিয়ে এসে মারুন, লুকিয়ে কেন মারতে যাবেন?

সমাজে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে, তাদের কিছু একটা যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে হবে। এখানে যা যা বলা হয়েছে সবাই ঠিক বলছেন, কোনটাই ভুল নয়। কিন্তু উত্তরগুলো সম্পূর্ণ উত্তর নয়। প্রত্যেকটি উত্তরকেই অন্য রকম যুক্তি এনে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। সাহিত্য সব সময় দুই প্রকারের হয়, একটা সাহিত্যকে বলা হয় বাল সাহিত্য বা child literature, আরেকটাকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বা matured literature। বাল সাহিত্যে পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেবে এটা ভালো এটা মন্দ, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যে ভালোতে মন্দ মিশে থাকে, মন্দতে ভালো মিশে থাকে। আমাদের সবারই জীবন, তা জ্যোতিষিরা যতই ভালো বলে দিক, ভালোর মধ্যে খারাপও চলে আবার খারাপের মধ্যে ভালোও চলে। পুরোটাই ভালো চলবে বা সবটাই খারাপ চলবে এই

জিনিস কিছুতেই হবে না। মানুষের জীবন কখনই একশ ভাগ সৎ চলে না, শ্রীরামই হোন, শ্রীকৃষ্ণই হোন আর শ্রীরামকৃষ্ণই হোন, একটু ডান দিক বাম দিক থাকবেই। কারুর একটু বেশি থাকবে, কারুর একটু কম থাকবে। আবার কারুর জীবনটাই এই রকম। জীবনে সবারই ডান দিক বাম দিক হবে, যীশুরও আছে, মহম্মদের আছে, শ্রীকৃষ্ণেরও আছে। আমরা যখন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখব তখন আমরা দেখতে চাইব ওনার জীবনে স্বার্থের পরিমাণ কি রকম ছিল আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান কি রকম ছিল। এরপর বাকি জিনিসগুলো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হবে না। কোন সাধারণ মানুষের জীবনের সবটাই যদি সাদা হয়, সাধারণ মানুষ তখন পাগল হয়ে যাবে। খ্রীশ্চানিটি যে মার খেল তার কারণ এই একটাই। যীশুর জীবনে যত কটা গোলমাল আছে সেগুলো ওরা কখনই সামনে নিয়ে আসতে চায় না, পুরোটাই সাদা আনার চেষ্টা করে। ফলে সাধারণ মানুষ অপরাধ বোধ আর পাপ বোধে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যেতে থাকে। আমাদের যে কজন অবতার আছেন, তাঁদের শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত জীবন যদি নেওয়া হয় দেখা যাবে আমি আপনি যত রকম গোলমাল করি তাঁরাও করে আছেন। গোলমাল করাকে যে অনুমোদন করছেন তা নয়, জীবন এভাবেই চলে। হিন্দু ধর্মের এখানেই সততা যে এনারা এখানে সেগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রথম হল, মানুষের জীবন এভাবেই চলে।

দ্বিতীয় হল, ভালো মন্দকে আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি। ভালো মন্দ আধ্যাত্মিক স্তরে হয় না, কিন্তু সামাজিক স্তরে সমাজ পরিষ্কার করে বলে দেয় এটা ভালো এটা মন্দ। পেছন থেকে মারা যাবে না, এই নিষেধ কোন শাস্ত্রে বলছে? কে বলেছে? তখন বলবে নীতি শাস্ত্রে আছে। যে নীতি শাস্ত্রই বলছে পেছন থেকে মারা যাবে না, সেই নীতি শাস্ত্রই আবার বলছে, তুমি আগে তোমার বন্ধুকে দেখ, যেভাবেই হোক বন্ধুকে আগে রক্ষা কর। এই কারণেই এটাকে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বলা হয়, জীবন কখনই শুধু সাদা বা শুধু কালোতে চলে না। জীবন সব সময় শুভ অশুভ, ভালো মন্দের সংমিশ্রণে চলে। আর প্রত্যেক মুহুর্তে জীবন আমাদের সামনে সুযোগ দিচ্ছে। এই সময় আমি এক রকম পথ নিতে পারি, অন্য সময় অন্য রকম পথ নিতে পারি। আমি যেটাই নিই না কেন তার ফলটা আমাকে নিতে হবে। যিনি অবতার পুরুষ তাঁর ভালো মন্দ কোনটাতেই কিছু আসে যায় না। মহাভারতে এত বড় নরসংহার হল, গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে বলে দিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার জন্যই এই নরসংহার সংঘটিত হয়েছে। মরছে গান্ধারীর ছেলেরা, গান্ধারীর ভাইরা আর দোষ হল শ্রীকৃষ্ণের! গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ দিলেন তো কৃষ্ণের তাতে হলটা কি! আমরা মনে মনে নিজেরাই ভালোর সংজ্ঞা আর মন্দের সংজ্ঞা তৈরী করে রেখেছি। সন্ন্যাসীদের প্রায়ই একটা কথা সমাজ থেকে শুনতে হয়, আপনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, বাপ-মায়ের সেবা করলেন না! বাবা-মার সেবা করতে হবে কোথায় লেখা আছে? শাস্ত্রে আছে। সেই শাস্ত্রই বলছে বৈরাগ্য এসে গেলে সংসার ত্যাগ করে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে থাকবে, আত্মজ্ঞানের জন্য পুরো জগতকে ত্যাগ করে দেবে। শাস্ত্র অনেক রকম কথা বলে। বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত এগুলো হল পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য, জীবন যে রকম ঠিক সেই ভাবে তাকে সামনে রেখে দিয়েছেন, কোন সাজগোজ করতে যাবেন না। জীবন এভাবেই চলে, অনেক সময় এমন পরিস্থিতি আসবে যখন তোমাকে লুকিয়ে মারতে হবে, অনেক সময় সামনে থেকেই মারবে, দরকার হলে অপরের স্ত্রীর সাথে খেলা করতে হবে, অনেক সময় নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে হবে। এর প্রত্যেকটাই শাস্ত্রে আছে, আর প্রত্যেকটারই ফল আছে। তুমি যদি ফলটা নিতে রাজী থাক তাহলে এগিয়ে যাও। জীবন কখনই শুধু সাদা বা শুধু কালোতে চলে না।

যীশুর জীবনে একটা মজার ঘটনা আছে। ফিড ফ্রুট এক ধরণের ছোট্ট মিষ্টি ফল। একজন এসে বলছে এখন ফ্রিডের সিজন নয়। যীশু বললেন, এই গাছে একটাও ফল নেই, এই গাছ রেখে কি লাভ। কুড়ুল এনে তিনি গাছটা কেটে দিলেন। কোন খ্রীশ্চানই যীশুর এই কাজকে justify করতে পারবে না। এখন মরশুম নয়, গাছে কোথা থেকে ফল আসবে! শীতকালে আমগাছে আম হয় না, বলে দিলেন আম গাছে একটিও ফল নেই, কেটে দাও গাছটা। এখন তো আমের মরশুম নয়, আপনি কিভাবে justify করবেন? ইদানিং পাশ্চাত্যের স্কলাররা সব কিছুকে খুব যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেন, ওনারা বলছেন ফ্রিড গাছের কি দোষ! এই জিনিসটা আসলে সূচিত করছে যে, মানুষের জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, তুমি যদি সেই উদ্দেশ্যে না প্রতিষ্ঠিত হও তাহলে তোমার জীবনটাই বৃথা। এটাকেই যীশু ফ্রিড গাছ দিয়ে দেখাচ্ছেন। কিন্তু ফ্রিড ফলের এখন মরশুম নয়, যার জন্য যীশুকে অনেক সমালোচনা করা হয়। মহম্মদের জীবনেও এই ধরণের প্রচুর বিতর্কিত ঘটনা আছে। কিন্তু তাও এনারা কেউ প্রফেট, কেউ অবতারের সঙ্গী। কারণ জীবন এভাবেই ভালো আর মন্দ মিশিয়ে চলে, তা সে সাধারণ মানুষের

জীবনই হোক আর অবতারের জীবনই হোক। যে পুরোপুরি ভালো, বুঝে নিন সে একটা ধর্মের ষাঁড়, এর দ্বারা কিছুই হবে না। চব্বিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে গয়না হয় না, গয়না বানাতে গেলে তার মধ্যে একটু খাদ মেশাতে হয়। যেমনি একটা আদর্শকে নিয়ে জীবনে চলতে শুরু করবে সঙ্গে সঙ্গে তার দশ খানা গোলমাল শুরু হয়ে যাবে। বিভিন্ন কারণে গোলমাল হয়। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনেও অনেক গোলমাল নজরে আসবে। সীতাকে যেভাবে ত্যাগ করলেন, বালীকে যেভাবে মারলেন। কোথাও একটা মনে হয় বালীর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ হওয়ার সম্ভবনা ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বালী যুদ্ধ করার কোন দরকারই ছিল না। কিন্তু বন্ধুর জন্য বালীকে বধ করতে হবে, তা নাহলে বন্ধু তার স্ত্রীকে ফেরত পাবে না, রাজ্য পাবে না। শিকারীরা ছাগলকে গাছের মধ্যে বেঁধে রেখে যেভাবে বাঘ শিকার করে, এখানে সেই রকমই ব্যাপার। শ্রীরামচন্দ্র ঠিক করেছিলেন, নাকি ভুল করেছিলেন, আমরা এই বিচার করতেই পারব না। কারণ যাঁরা মহাপুরুষ, সামর্থবান পুরুষ ওনাদের বিচার করা যায় না। ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিৎকে খুব সুন্দর কথা বলছেন, *ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাং সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভূজো যথা।।১০/৩৩/৩০।।* 'যাঁরা খুব তেজস্বী হন যেমন সূর্য, অগ্নি, যাঁদের মধ্যে ঈশ্বরীয় সামর্থ আছে, কখন কখন দেখা যায় এনারা প্রকৃতির নিয়মকে উল্লঙ্ঘন করে যান। কিন্তু তাতে তাঁদের কোন দোষ দেখা হয় না। যাঁদের মধ্যে ঐশ্বরীয় শক্তি আছে তাঁরা অনেক সময় তাঁরা নিজের ধর্মকেও উল্লঙ্ঘন করে বসেন। এতে তাঁদের কোন দোষ হয় না। বলা হয় যে, সামর্থবান পুরুষের কোন দোষ হয় না'। আমাদের সেই ক্ষমতাই নেই যে এনাদের দোষ বিচার করব। এখানে ধর্ম সঙ্কট হয়ে গেছে। ধর্ম সঙ্কট মানে, দুটো ধর্ম এসে গেছে, আমাকে দুটো ধর্মের একটা ধর্মকে বেছে নিতে হবে। আমি যেটাই বাছব সেটাতেই আমার নিন্দা হবে। শ্রীরামচন্দ্র যদি সীতাকে বনবাসে না পাঠাতেন তখন লোকেরা এই নিন্দাই করত, দেখ শ্রীরাম কি রকম স্ত্রৈন, স্ত্রীকে ছাড়া থাকতে পারবে না বলে এত লোককে কষ্টে ফেলে রাখল। বালীকে যদি আড়াল থেকে বধ না করতেন তখন লোকেরাই বলত, কেমন বন্ধু! কথা দিয়ে কথা রাখল না। নিন্দা দুদিকেই হবে। সেইজন্য সব সময় নিজের ধর্মের উপর চলতে হয়। সবারই দুঃখ, অশান্তির মূলে একটাই কারণ, স্বধর্ম বলে কিছু নেই। আমার এটাই স্বধর্ম, এই ধর্মকেই আমি ঠিক করে নিয়েছি, এই ধর্মের উপরই আমি চলব, স্বধর্মে চলতে গিয়ে আমি নতুন নতুন জিনিস নিচ্ছি, কিন্তু আমার আদর্শেই আমি দৃঢ় থাকব। স্বধর্ম ও আদর্শ আর এতে দৃঢ়তা, এই দুটো থাকে না বলেই সমস্যার শেষ নেই। আগে ঠিক করে নিতে হবে, আমার এটাই জীবনধারা, এই ধারাতেই আমি এগিয়ে যাব, এরপর যদি সুখ আসে তাতেও উল্লসিত হব না, দুঃখ এলেও ভেঙে পড়ব না। সব অবস্থাতেই আমার সন্তুষ্টি থাকবে কারণ আমি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত।

গাড়ি চালানোর জন্য দুটো জিনিসের দরকার, ইঞ্জিনের শক্তি আর দ্বিতীয় স্টিয়ারিং ও ব্রেক। জীবন চালানোর জন্যও দরকার শক্তি আর স্টিয়ারিং। কাজ করে করে ইঞ্জিনের শক্তিটা বাড়াতে হয় আর স্বধর্মের কাজ হল যেটা স্টিয়ারিং করে। আমরা সবাই হলাম খুব দামী দামী গাড়ি। এই গাড়িতে কি কি আছে? একটা বসার জায়গা আছে আর একটা সুন্দর স্টিয়ারিং আছে। কিন্তু গাড়িটা চলছে না। খুব হলে গাড়িতে একটা জোরাল হর্ণ আছে, শুদ্ধু ভোঁ ভোঁ করে আওয়াজ করে যাচ্ছে। গাড়ির ইঞ্জিনটাই নেই। আর কদাচিৎ আজকাল যাদের ইঞ্জিন হয়েছে তাদের আবার স্টিয়ারিংটাই নেই, ফাঁকা মাঠে এলোপাতাড়ি গাড়ি চলছে। কাকে গিয়ে ধাক্কা মারবে কোন ঠিক নেই। লোকজন আওয়াজ শুনেই দশ হাত দূরে ছিটকে যাচ্ছে। রামায়ণ দেখাচ্ছে শ্রীরামচন্দ্রের মত পুরুষদের শক্তি আছে, তার সাথে ওনাদের একটা স্টিয়ারিংও আছে। শ্রীরামচন্দ্রের স্বধর্ম হল, *রামো দ্বির্নাভিভাষতে*, তিনি সুগ্রীবকে কথা দিয়েছেন, বালীকে তিনি যেভাবেই হোক বধ করবেন। যদি তিনি না মারেন, তাহলে ধর্মের হানি এতেও হবে, যদি মারেন তাতেও হবে। সুগ্রীবকে কথা দিয়ে যদি বালীকে বধ না করেন তাহলে মিত্রধর্মের হানি হবে, বালীকে যদি মারেন তখন ধর্মে অন্য দোষ হবে। আমাকে নিজেই ঠিক করে নিতে হবে আমি কোন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হব। আমাদের সমস্যা হল, সকালে আমরা একটা আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, দুপুরে আরেকটা আদর্শে আর বিকেলে আরেকটা আদর্শে প্রতিষ্ঠিতে থাকি। সব মিলিয়ে রাত্রে গিয়ে ওটা জিরোতে দাঁড়িয়ে যায়। তার থেকেও আর জঘন্য অবস্থা হল, আমাদের ভেতরে শক্তি নেই। আমাদের না আছে শক্তি, না আছি কোন আদর্শে দৃঢ়তা। যে কোন একটা আদর্শকে যদি কেউ ধরে নেয়, তা সে যত ছোট আদর্শই হোক না কেন, সেই আদর্শে যদি দৃঢ় হয়ে যায়, তাকে আর কেউ রুখতে পারবে না।

বাল্মীকি রামায়ণকে এই কারণেই পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য বলা হয়। জিনিসটা যেমনটি আছে তেমনটি সামনে রাখছেন। অবতার পুরুষেরও দুঃখ, কষ্ট হয়, এনাদেরও উভয় সঙ্কট আছে। কিন্তু ঐ সঙ্কটের মধ্যে তিনি যেটা

অনুসরণ করবেন সেটাই দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে। রামায়ণ এখানে দেখাচ্ছেন সবারই জীবনে এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, এরপর দেখিয়ে দিচ্ছেন, বন্ধুকে আমি কথা দিয়েছি, আমি বন্ধুর জন্য সব কিছু করব। আপাতভাবে প্রতীয়মান হয়ে যে শ্রীরামচন্দ্র ঠিক কাজ করেননি, ঠিকই মনে হচ্ছে, লুকিয়ে বালীকে অসতর্ক অবস্থায় বধ করেছেন। কিন্তু জীবন কখনই এক ভাবে চলে না, নানা টানাপোড়েন, সজ্ঘাতের মধ্য দিয়েই জীবন চলে।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানই জীবনের জন্য সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এতক্ষণ জিনিসটাকে খুব জাগতিক স্তর থেকে আলোচনা করলাম। উচ্চস্তরের দিক দিয়ে আলোচনা করলে অন্য ভাবে জিনিসটা দাঁড়িয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তিনি অবতার পুরুষ, তিনি জ্ঞানী পুরুষ, তাঁর কাছে জীবনেরও কোন দাম নেই, মৃত্যুরও কোন দাম নেই। যিনি সর্বত্র ব্রহ্ম দেখছেন, সবেতেই আত্মা দেখছেন, সবার মধ্যে ঈশ্বর দেখছেন, তাঁর কাছে জীবন-মৃত্যু কিছুই না। সেইজন্য দরকার একটা মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। বাস্তবিক জীবনেও তাই হয়, কোন একটা মূল্যবোধকে নিয়ে চলতে থাকা। ঐ একটা মূল্যবোধকে নিয়েও যদি চলতে থাকে তাতেও দুটো ভালো, দুটো মন্দ হয়ে যাবে। ভালো-মন্দের কোনটার দিকেই তাকাতে নেই। যিনি মহৎ হয়ে যান তাঁরও অনেক দোষ-ত্রুটি থাকে, যে সাধারণ থেকে যায় তারও দোষ-ত্রুটি থাকে। যে গরু দুধ দেয় সেও লাথি মারে আর যে গরু দুধ দেয় না সেও লাথি মারে। যে গরু দুধ দেয় না শুধু লাথি মারে, সেই গরু কে নেবে! দুধ যদি নাই দেয় তার লাথি খেয়ে লাভ কি! শক্তিমান পুরুষ মানে তাঁরা দুধ দিচ্ছেন, তাঁদের জীবনই আমাদের প্রেরণা দেয়। তাঁদের দোষ-ত্রুটি আমাদের মেনে নিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের, সে তিনি অবতারই হন আর যাই হন না কেন, তাঁদের একটা core group থাকে, ঐ core groupএ তাঁদের ঐ values গুলো চলে না। যেমন শ্রীকৃষ্ণের অর্জুন, পাণ্ডবরা ছিলেন core group। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী, রাজা মহারাজরা ছিলেন core group। এনাদের মূল্যবোধ অন্য ভাবে চলে।

ঠাকুর বলছেন, সাধুর সঞ্চয় করতে নেই। তারপর বলছেন, আমার এমন অবস্থা শৌচের জন্য মাটি পর্যন্ত নিতে পারি না। সেখান থেকে আবার ভক্তদের বলছেন, হৃদয় আমাকে এত জ্বালাতন করছিল যে, এক সময় ঠিক করলাম কাশী চলে যাব। সঙ্গে জামা-কাপড় নিয়ে যাব কিন্তু পয়সা তো সঙ্গে নিয়ে যাবার জো নেই, সেইজন্য আর কাশী যাওয়া হল না। ঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসছে। হৃদয়রামের যন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে ঠিক করলেন দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কাশী চলে যাবেন। এই ধরণের বৈরাগ্যকে ঠাকুর নিজেই বলছেন মর্কট বৈরাগ্য, যন্ত্রণায় বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু নিজের একটা ধর্ম ঠিক করে নিয়েছেন, আমি টাকা ছোঁব না। টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না, বাইরে ঘোরাঘুরিতে টাকা ছাড়া কি করে চলবে! সেইজন্য ঠাকুরের আর কাশী যাওয়া হল না। তিনিই আবার নরেনকে বলছেন, ওরে তোর জন্য আমি ঘরে ঘরে ভিক্ষে করতে পারি। যদিও করেননি কিন্তু ঠাকুর মুখে বলেছেন। ঠাকুরের আবার সত্যের আঁট, অন্যকে বলছেন উনি কথা দিয়ে কথা রাখেননি। আবার একদিন ঠাকুর ঠিক করে রেখেছেন কলকাতায় যাবেন, হঠাৎ নরেন এসে গেছে, ঠাকুর বলছেন, নরেন এসেছে এখন কি আর কলকাতায় যাওয়া যায়! মহাপুরুষদের সবারই একটা core group থাকে ঐ core groupএ গিয়ে জিনিসগুলো অন্য রকম হয়ে যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে মায়েরা অনেক কিছুই করবে না, কিন্তু সন্তানের জন্য অনেক কিছুই করে থাকে। নিজে না খেয়ে থাকতে পারে না, কিন্তু সন্তানের মঙ্গলের জন্য উপোস করে। মহাপুরুষরা যেখানে নিজেকে মনে করেন আমি এর সাথে এক, তখন সেখানে তাঁর ভালোমন্দের কোন বিচার থাকে না। তার জন্য ফল তাঁকেও পেতে হয়। যেমন গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সেটা মেনে নিলেন। বালীকে এভাবে বধ করে শ্রীরামচন্দ্রের নিন্দা হচ্ছে কিন্তু পূজা শ্রীরামচন্দ্ররেই হয়, বালীর হয় না। মূল কথা, জীবন যখন চলে তখন সবারই জীবনে দুটো চারটে মন্দ জিনিস থাকবে, কারুর একটু বেশি কারুর একটু কম। স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে যদি কীর্তি হয় তখন সব মন্দ চাপা পড়ে যায়। নিন্দুকরা ওগুলোকেই তুলবে। স্বামীজীকে নিয়ে এখনও নিন্দা শুরু হয়নি, আরও একশ দুশো বছর পর শুরু হবে, আর নিন্দুকরা কি কি বার করবে ভগবানই জানেন। তাতে হলটা কী! স্বামীজীর শক্তিতে সারা দেশে একটা নতুন আলোড়ন তৈরী হয়েছে, একটা নতুন জীবন এসেছে। এরপর কেউ যদি স্বামীজীর নামে পাঁচটা দোষ নিয়ে আসে তাতে কি আছে!

এই অধ্যায় শুরু হয় মহাদেবকে নিয়ে। আধ্যাত্ম রামায়ণ শুরুই হয় শিব আর পার্বতীর সংবাদ দিয়ে। শ্রীরামচন্দ্র একবার সুগ্রীবের দিকে তাকালেন আর শ্রীরামচন্দ্রের সংসর্গ করার জন্য সুগ্রীবের সব পাপ চলে গেছে। তখন শ্রীরামচন্দ্র নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য সুগ্রীবের মোহ মায়াজাল বিস্তার করে ঈষৎ হেসে বললেন –

মায়া মোহকরীং তস্মিন্ বিতন্বন্ কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সখে ত্বদুক্তং যৎ তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ।৪/২/২

শ্রীরামচন্দ্র তখন মায়া শক্তির বিস্তার করলেন আর সুগ্রীবকে সেই মায়া মোহের মধ্যে জড়িয়ে নিলেন। তার মানে সুগ্রীবের বুদ্ধিকে একটু মোহিত করে দিয়েছেন, কিছু কিছু ভুল জিনিস যে হতে যাচ্ছে সেগুলো সুগ্রীব যেন বুঝতে না পারে। এই ধরণের জিনিস ব্যবহারিক জীবনে প্রায়ই করতে হয়। কিছু কাজ করার জন্য ব্রেনকে ব্লান্ট করে দিতে হয়। অপারেশন করার সময় রোগীকে এ্যনাস্থেসিয়া করা হয়, ব্রেনের ফাংশান বন্ধ হয়ে গেল, এরপর একটা অপারেশন করে দেবে। ঠিক তেমনি অনেক সময় কোন বড় কাজ করার সময় মানুষের মনকে একটু আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। মানুষ খুন করার সময়ও কেউ খুব সহজে খুন করতে পারে না। যারা খুব পেশাদার খুনী তারাও অনেক দিন চিন্তা করে, প্ল্যান করে খুন করে, জাজ সাহেব তাকে ফাঁসী দেবেন। কিন্তু হঠাৎ একটা উত্তেজনার বশে heat of the momentএ খুন করে দিল, তাকে জাজ সাহেব একটু নরম ভাবে বিচার করবেন। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা খুব কঠিন। পেশাদারী খুনীরাও খুন করতে যাওয়ার আগে মদ খেয়ে নেশা করে মস্তিষ্ককে অবশ করে নেয়। কিন্তু এখানে খুব মিষ্টি করে, সুন্দর ভাবে বলছেন – ভগবান সুগ্রীবের মধ্যে মোহ বিস্তার করে দিলেন। মহৎ স্বার্থের জন্য একটা অপ্রীতিকর কিছু করতে হচ্ছে তখন বিভিন্ন ভাবে মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে দেওয়া হয়। শ্রীরামচন্দ্র এখানে মায়া বিস্তার করে এই কাজ করছেন। ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন, গিন্নীকে স্বামীর কাছ থেকে একটা জিনিস আদায় করতে হবে, তার আগে খুব ভালো ভালো রান্না করে স্বামীকে আদর করে খেতে দেবে। খেতে খেতে স্বামী যখন প্রশংসা করবে তখন গিন্নী খুব মিষ্টি করে বলবে, ওগো পাশের বাড়ির গিন্নীকে একটা গয়না করে দিয়েছে, আমাকেও একটা করে দাও না। এখানেও ভালো রান্না করে খাইয়ে তার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রও সুগ্রীবের মনকে মোহাচ্ছন্ন করে দিয়েছেন।

সুগ্রীব বলে যাচ্ছেন, আমার কিছু লাগবে না, বিজয়ও চাই না, সাম্রাজ্যও চাই না, আশীর্বাদ করুন আপনার মায়াতে যেন মুগ্ধ না হয়ে যাই, আপনার পাদপদ্মে শুধু ভক্তি চাই। সুগ্রীবের এই যদি অবস্থা হয় তাহলে তো লীলা পোষ্টাই হবে না, তখন তিনি সুগ্রীবকে মায়া দিয়ে ঢেকে দিলেন। একই জিনিস আমরা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনেও পাই। ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্রীমা এমন অন্তর্মুখী হয়ে গেলেন যে, তিনিও আর এই জগতে থাকতে চাইছেন না। ঠাকুর বারবার বলছেন, তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে। ঠাকুর তখন মায়ের সামনে রাধুর মাধ্যমে মায়ার আবরণ সৃষ্টি করে দিলেন। শুদ্ধ সত্ত্বকে দিয়ে যদি কাজ করাতে হয় তখন বাস্তবিক তাঁর উপর মায়ার আবরণ নিয়ে আসতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র তখন হেসে বলছেন – *সখে ত্বদুক্তং যৎ তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ*, তুমি যে কথাগুলো বলছ সব ঠিকই বলছ, তোমার রাজ্য লাগবে না, স্ত্রী লাগবে না, শুধু ভক্তি চাই, কিন্তু –

কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ।
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সত্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্।৪/২/৩

লোকেরা সবাই আমার নিন্দা করবে, শ্রীরামচন্দ্র অগ্নিসাক্ষী রেখে সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল কিন্তু তাতে সুগ্রীব কে পেল! যাঁরা নিয়মিত শাস্ত্র কথা শুনতে আসেন, তাঁদের বাড়ির লোকেরা বলবে, এতদিন শাস্ত্র কথা শুনে তুমি কি পেলে! সংসারী মানুষ মাত্রই লাভ-লোকসান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। এই জিনিসটাই ঠাকুর আবার বিভীষণের নামে বলছেন, কোন রামায়ণে তিনি শুনেছেন, শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণকে রাজা করতে চাইছেন তখন বিভীষণ বলছেন আমার রাজ্য লাগবে না। তখন শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, লোকেরা বলবে যে বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের এত সেবা করল বদলে সে কী পেল! তাহলে কি লোকেদের কথাতেই আমাদের চলতে হবে? চলতে হয়। আমরা এমনি খুব সহজে বলে দিচ্ছি লোক না পোক, শ্রেষ্ঠ পুরুষদেরও জীবনে সাধারণ লোকেদের মাঝখানেই থাকতে হয় বলে তাদের কথাও শুনতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র এই জিনিসটাকেই সামনে নিয়ে আসছেন, লোকেরা জানতে চাইবে সুগ্রীব বন্ধুত্ব করে কী পেল! তাহলে কি হবে?

ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদাহ্বয়ে ভদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্।৪/২/৪

এই লোকে আমার অপবাদ হবে, সবাই আমার নিন্দা করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য বলছি, তোমার মঙ্গল হোক, তুমি গিয়ে যুদ্ধার্থে বালীকে আহ্বান কর। আর সেই যুদ্ধে এক বাণেই আমি বালীকে শেষ করে

দেব। সুগ্রীব একটা ত্রিগুণাতীত অবস্থায় চলে গেছেন, কিন্তু সুগ্রীবের এটা স্বাভাবিক অবস্থা নয়, সাময়িক একটা অবস্থা। মানুষ শেষমেশ যেটাতে স্বাভাবিক সেটাতেই অবস্থান করে। ক্ষণিক বৈরাগ্যের অবস্থা যদি হয়ে যায়, ওটাকেই সত্য বলে নিতে নেই। ঠাকুর বলছেন, জ্বরের বিকার রোগী অনেক সময় বলে এক জালা জল খাবো। তখন সে জ্বরের ঘোরে ভুলভাল বকছে। স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর সময় একজন খুব বড় ভক্ত ছিলেন। সেই ভক্তের স্ত্রী মারা গেছে। ভক্তটির খুব মন খারাপ। ভক্তটি একজন মহারাজকে বলছেন, আমার যা সম্পত্তি আছে সব আপনাদের মঠে দান করে দিচ্ছি। সেই মহারাজ খুব খুশি হয়ে খবরটা রাজা মহারাজকে বললেন, মহারাজ! ভক্তটির কী বৈরাগ্য, উনি সব সম্পত্তি মঠকে দিয়ে দিচ্ছেন। রাজা মহারাজ সব শুনে বলছেন, দাদা! ও সংসারী লোক, সাধুসঙ্গ করে তার ভেতর সাধু ভাব এসে গেল আর তুমি গৃহস্থের সঙ্গ করে তোমার মধ্যে সংসারী ভাব এসে গেল। রাজা মহারাজের কথা শুনে উনি চমকে উঠে থেমে গেলেন। আর কদিন পরে ভদ্রলোকের বৈরাগ্যটাও চলে গেল! এই যে রাজা মহারাজ বলছেন, সে সংসারী কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গ করে তার মধ্যে বৈরাগ্য এসে গেল আর সন্ন্যাসী গৃহস্থের সঙ্গ করে তাঁর মধ্যে সংসারের ভাব এসে গেল, খুব দামী কথা। শ্রীরামচন্দ্র পূর্ণজ্ঞানী, পূর্ণজ্ঞানীর সামান্য একটু সঙ্গ করেই সুগ্রীবের ক্ষণিক একটা বৈরাগ্য এসেছে। সন্ন্যাসীও যদি সংসারীদের সঙ্গ করে তাঁর মধ্যে ক্ষণিক একটা ভোগের ইচ্ছা জাগে। দুটোর কোনটাকেই খুব গুরুত্ব দিতে নেই।

যাই হোক, শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে বললেন, তুমি যাও, বালীকে গিয়ে যুদ্ধে আহ্বান কর। সুগ্রীব এতদিন ঋষ্যমুক পর্বতে লুকিয়ে ছিল, কারণ বালী দেখলেই সুগ্রীবকে শেষ করে দেবে। মূল কাহিনী হল, সুগ্রীব গিয়ে বালীক যুদ্ধে আহ্বান করাতে বালী বাইরে বেরিয়ে এসে সুগ্রীবকে বেদম মার মেরেছে। শ্রীরামচন্দ্র অবাক হয়ে দেখছেন দুজনকে দেখতে একই রকম, দুজনকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না, শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সমস্যা হয়ে গেছে বালীকে মারতে গিয়ে সুগ্রীবকেই না মেরে বসেন। সেইজন্য উনি চুপচাপ দুজনের লড়াই দেখতেই থাকলেন। সুগ্রীব কোন রকমে পালিয়ে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলছেন –

কিং মাং ঘাতয়সে রাম শত্রুণা ভ্রাতৃরূপিণা।
যদি মন্ধননে বাঞ্ছা ত্বমেব জহি মাং বিভো।৪/২/১১

হে রাম! আমার এই ভাই শত্রুরূপী, এর হাতে আপনি আমাকে বধ করাতে চান? আপনি যদি আমার বধ করাতে চান তাহলে আপনি নিজেই আমাকে বধ করে দিন, আমি বন্ধুর হাতেই মারা যাব, শত্রুর হাতে কেন মারা যাব! মহাভারতে একটা কাহিনী আছে, সেখানে চারটে পাখির শাবক আগুনে মরতে যাচ্ছে, ওদের মা বলছে তোমরা ঐ ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যাও। পাখির শাবকরা বলছে, ইঁদুরের গর্তে ঢুকলে ইঁদুর আমাদের খেয়ে নেব, ইঁদুরের হাতে মরা অত্যন্ত ঘৃণ্য মৃত্যু, তার চাইতে আগুনে পুড়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। সুগ্রীব একই কথা বলছেন, যদি মরতে হয় তাহলে আপনার হাতেই মরব, ওর হাতে কেন মরতে যাব। তখন শ্রীরাম বললেন, তোমরা যখন যুদ্ধ করছিলে আমি দূর থেকে বুঝতে পারছিলাম না, কোনটা বালী আর কোনটা সুগ্রীব। এবার তুমি গলায় এই মালাটা পড়ে যাও এবার আমি ঠিক বালীকে মেরে দেব। গলায় মালা দিয়ে আবার সুগ্রীব বালীর ডেরায় গিয়ে আহ্বান করেছে। সুগ্রীব দ্বিতীয়বার ফিরে আসতেই বালী অবাক হয়ে গেছে, সুগ্রীবের এত সাহস কী করে হল? বালীর স্ত্রী বালীকে আটকেছে, আটকে দিয়ে বলছে, আমার খুব শঙ্কা হচ্ছে, আপনি যাবেন না, যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে চলে যাওয়ার পর আবার যখন ফিরে এসেছে, নিশ্চয়ই সুগ্রীবের পেছনে কোন বলশালী ও শক্তিমানের সহায়তা আছে। ঠাকুর বলছেন, একজন সাধারণ প্রজা জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। জমিদার বলছে, এর এতো সাহস নেই যে আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে, নিশ্চয় এর পেছনে অন্য বড় কোন জমিদার আছে। তারা খুব বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্না, সে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন শক্তিমান আছে, আপনি এখন আর বাইরে বেরোবেন না। বালী তখন তারাকে খুব সুন্দর কথা বলছে, সুগ্রীবের কোথাও কিছু অবলম্বন নেই, ওর মত লোককে কে সাহায্য করতে আসবে? এবার আর ও পালাতে পারবে না, তুমি চিন্তা করো না, আমি এবার ওকে শেষ করে দিচ্ছি, আর দ্বিতীয় কথা হল –

আয়াস্যে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্‌গৃহে রিপুম্।
জ্ঞাত্যাপ্যাহূয়মানং হি হত্বায়াস্যামি সুন্দরি।৪/২/২৪

বাড়ির দরজায় এসে শত্রু যদি যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে, কোন শূরবীর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। যত ভয়ই থাকুক, যাই থাকুক, আহ্বান যখন করেছে শূরবীরকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না, তা নাহলে তার সম্মান থাকবে না। তখন তারা খুব সংক্ষেপে বলছে, আমাদের ছেলে অঙ্গদ জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একটা ঘটনার কথা শুনেছিল। অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ আর নিজের ভার্য্যা সীতার সাথে দণ্ডকারণ্যে এসেছিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। এখন শ্রীরামচন্দ্র সীতার অন্বেষণ করতে করতে ঋষ্যমূক পর্বতে এসে সুগ্রীবের সাথে অগ্নিসাক্ষী রেখে বন্ধুত্ব করেছে। রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেছেন যে বালীকে বধ করবেন। সেইজন্য বলছি আপনি আমার কথা মানুন, আপনি ঘর থেকে বেরোবেন না। আপনি এই রাজ্যকে রক্ষা করুন, পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করুন। তারা এই কথা বলতে বলতে কাঁদছে। সব শুনে বালী বলছে –

রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ।৪/২/৩৪
তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।

তারা! তুমি চিন্তা করো না। শ্রীরামচন্দ্র যদি এসেই থাকেন আর আমি যদি যুদ্ধে ওনার সম্মুখীন হই, তাতে আমারই মঙ্গল হবে। কারণ প্রভুর প্রতি আমার ভক্তির উদয় হবে। ভূভার হরণের জন্য ভগবানের আগমনের কথা আমিও শুনেছি। যদি দেখি শ্রীরামচন্দ্র আছেন, আমি তাঁর কাছে যাব, তাঁর পায়ে পড়ব, ওনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসব, আমি ধন্য হয়ে যাব। একটা শ্লোকে বালী খুব সুন্দর কথা বলছে –

আনেষ্যামি গৃহং সাধ্বি ন ত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ভজতোহনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ।৪/২/৩৭

হে সাধ্বি! আমি শ্রীরামের চরণকমলে প্রণাম করে তাঁকে গৃহে নিয়ে আসব। আর তুমি জেনে রাখ, শ্রীরামের যে ভজনা করে সে শ্রীরামের মতই হয়ে যায়। ঠাকুরও বলছেন, যে যার সঙ্গ করে সে তার সত্তা পায়। যদি কেউ শ্রীরামের সঙ্গ করে, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গ করে সে তাঁর ভাব পেয়ে যাবে। বালীও বলছে, যে অনুরাগের সাথে শ্রীরামের ভজনা করে সে শ্রীরামচন্দ্রের মতই হয়ে যায়, আমি যদি তাঁকে সামনে পেয়ে তাঁর পূজা করতে পারি তাহলে তো আমি ধন্য হয়ে যাব। তুমি এটা জেনে রেখ, যদি সুগ্রীব একা থাকে তাহলে আমি তাকে এক্ষুণি মেরে চলে আসছি আর শ্রীরামচন্দ্র যদি সাথে থাকেন তাহলে আমি তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে আমার গৃহে নিয়ে আসব। কিন্তু তারার আশঙ্কা যাচ্ছে না, ভয়ে সে কাঁদছে। বালী বেরিয়ে গেল, সুগ্রীবের সাথে লড়াই শুরু হল। আর তখন শ্রীরামচন্দ্র একটা গাছের আড়াল থেকে একটা তীর ধনুকে লাগিয়ে কান পর্যন্ত ধনুর ছিলা টেনে আনলেন। রামায়ণ মহাভারতে কান পর্যন্ত টেনে আনার ব্যাপারটা অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। এখানেও বলছেন, *আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তম্*, কর্ণ পর্যন্ত টেনে আনা মানে তীরের elasticity প্রচণ্ড বেড়ে গেছে, ছাড়লেই তীরের শক্তি ও গতি অনেক বেড়ে যাবে। যত শক্তিমানই হোক ওই তীর তাকে ভেদ করে দেবে। তীর লাগতেই বালী সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেছে আর তখনই তার সঙ্গা চলে গেল, শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে।

তখন বালী শ্রীরামচন্দ্রকে তিরস্কারের সুরে করে কয়েকটা কথা বলছেন। বাল্মীকি রামায়ণ আর অধ্যাত্ম রামায়ণে অনেক পার্থক্য। বাল্মীকি রামায়ণে যেখানে বলা হচ্ছে তিরস্কার করা হচ্ছে তখন বোঝা যায় সত্যিই সে তিরস্কার করছে। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে একটু আগেই বালী শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বলছিলেন। ভগবানের হাতে মারা যাওয়াতে তো তার খুশি হওয়ার কথা। এগুলো কিছুই না, একটা ফর্মেটে ছিল, ঐ ফর্মেট থেকে আরেকটা ফর্মেটে যখন নিয়ে আসছে তখন অনেক ফাঁক সৃষ্টি হয়ে যায়। বালী তিরস্কার করেছিল বাল্মীকি রামায়ণে আমরা স্পষ্ট ভাবেই পাই। অধ্যাত্ম রামায়ণে যেন তিরস্কারের সুরে বলছেন –

কিং ময়াকৃতং রাম তব যেন হতোহস্মাহম্।৪/২/৫১
রাজধর্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম তে কৃতম্।
বৃক্ষষণ্ডে তিরোভূত্বা ত্যজতা ময়ি সায়কম্।৪/২/৫২
যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ।
যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশসমুদ্ভবঃ।৪/২/৫৩

হে রাম! আপনার প্রতি আমি কি দোষ করেছি যার জন্য আমাকে এভাবে বাণ মারলেন? আপনি রাজধর্মের ব্যাপারে অভিজ্ঞ কারণ ক্ষত্রিয় বংশে আপনার জন্ম। গাছের পেছনে লুকিয়ে কারুর প্রতি বাণ নিক্ষেপ করা তো রাজধর্মে পড়ে না, আপনি এই রাজধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম কেন করলেন? চোরের মত লুকিয়ে এই যে আমাকে মারলেন এতে আপনি কী যশ পাবেন? আপনি ক্ষত্রিয় সন্তান, বিশেষতঃ মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। বালীর বক্তব্য হল, ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধ করার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল যশপ্রাপ্তি। ক্ষত্রিয় কখনই ধর্মযুদ্ধ ছাড়া করবে না, কোন লোভে পড়ে যুদ্ধ করবে না। বালী বলছে, সুগ্রীব আপনার কী এমন উপকার করেছে আর আমি আপনার প্রতি কী অন্যায়ই বা করেছি যার জন্য আপনি এই কাজ করলেন? হ্যাঁ আমি শুনেছি যে জঙ্গল থেকে রাবণ আপনার ভার্য্যা সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। সীতাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি নাকি সুগ্রীবের সাহায্য নিয়েছেন। এই কথা আমি তারার মুখে শুনেছি। তবে কি জানেন?

বত রাম ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্।
রাবণং সকুলং বদ্ধা সসীতং লঙ্কয়া সহ।৪/২/৫৬
আনয়ামি মুহুর্ত্তার্দ্ধদৃষদি চেচ্ছামি রাঘব।
অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বামাং কি করিষ্যসি।৪/২/৫৭

হে রাম! আপনি আমার শক্তির পরিচয় পাননি, আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে অর্দ্ধ মুহুর্তের মধ্যে রাবণ আর তার কুলের সবাইকে বেঁধে সীতা সহ এখানে নামিয়ে আনতে পারি, এই অপদার্থ সুগ্রীবের পাল্লায় আপনি কেন পড়লেন! বক্তব্য হল, যদি আপনার বন্ধুত্বই করতে হত তাহলে আপনি আমার সাথেই করতে পারতেন। আপনি আমার শক্তি জানেন না, আমি চাইলে রাবণকে তার বংশ সহ সবাইকে টেনে এখানে নামিয়ে আনতে পারি। সংসারে সবাই আপনাকে নাকি ধর্মাত্মা বলে, ধর্মাত্মা হয়ে আপনি এই রকম একটা ভুল কাজ কি করে করতে পারলেন! বানরের মাংস অভক্ষ্য, আপনি যে আমাকে মেরে আমার মাংস ভক্ষণ করবেন সেটাও তো করতে পারবেন না, কারণ আমি বানর আমার মাংস অভক্ষ্য। পর পর সুগ্রীব অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। সুগ্রীব বলতে চাইছেন, হে রাম! আপনার এই কাজ একেবারেই ভুল কাজ। প্রথমতঃ আপনি ক্ষত্রিয় বংশের, আপনার কাজ হল যশপ্রাপ্তি করা, আমাকে এভাবে চোরের মত লুকিয়ে মেরে আপনি কি যশ পাবেন বলুন? দ্বিতীয়তঃ আপনি রাজা, রাজধর্মে এভাবে লুকিয়ে কাউকে বধ করা কখনই অনুমতি দেয় না। তৃতীয়তঃ শক্তি, শক্তির দিক থেকে যদি দেখা হয় সুগ্রীবের থেকে আমার শক্তি অনেক বেশি, আমি আপনাকে আরও ভালো সাহায্য করতে পারতাম। আর যদি শিকার করার জন্য মেরে থাকেন, তাহলেও সেটা ভুল কাজ, কারণ আমার মাংস অভক্ষ্য। আমাদের এখানে মনে রাখতে হবে বানর এখানে পশু বানর নয়, বানর মানে একটা আদিবাসী জাতির কথাই বলছেন। তৃতীয় পয়েন্টে যে বলা হচ্ছে, বন্ধুত্ব যদি করতেই হত তাহলে সুগ্রীবের সাথে কেন করলেন, আমার সাথেই বন্ধুত্ব করতে পারতেন। পরের দিকের রামায়ণেত কাহিনীতে যোগ হয়েছে যে, রাবণ একবার নাকি বালীকে আক্রমণ করেছিল। বালী জাতিতে বানর, রাবণের উপর ব্রহ্মার যে বর আছে সেই বর এখানে কাজ করবে না। বালী তখন রাবণকে বেঁধে কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে নিয়ে এসেছিল, যাতে ওর বাচ্চারা রাবণের সাথে খেলতে পারে। রাবণ তখন বালীর হাতে পায়ে ধরে ছাড়া পেয়েছিল। এগুলো কাহিনী, খুব সিরিয়াসলি নিতে নেই। বিচার করে দেখলে বালীর প্রত্যেকটি যুক্তিই ঠিক। আমাদের মাথায় এটা রাখতে হবে, পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য মানেই তাই। মন্দের মধ্যে ভালো আছে, ভালোর মধ্যে মন্দ আছে, জীবন এভাবেই চলে। আমি একটা পথ নির্ণয় করে নিয়েছি, পথের ভালো মন্দ সবটা নিয়েই আমাকে চলতে হবে। যিনি সন্ন্যাসের পথ নিয়ে নিলেন তাঁর যে সব সময় ভালো চলবে, সবটাই আধ্যাত্মিকতা অনুযায়ী চলবে, তা নয়। গৃহস্থ হয়ে গেছে বলে যে সে ঈশ্বর চিন্তন করবে না, সুখ-সমৃদ্ধির সাথে তার যে ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাব থাকবে না, তা নয়। সবটাই সবার জীবনে মিলে মিশে চলে। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব না করে বালীর সাথে বন্ধুত্ব করলে তাঁর আরও ভালো হত কিনা বলা খুব মুশকিল। এর আগে শবরীর সাথে দেখা হয়েছে, শবরী শ্রীরামচন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন সুগ্রীবের কাছে যেতে, সুগ্রীব আপনাকে সাহায্য করবে। বালীর সঙ্গে শ্রীরামের কোন দিন বন্ধুত্ব হতে পারত না, তার কারণ বন্ধুত্ব আর শত্রুতা সব সময় সমানে সমানে হয়। কবন্ধের শরীরকে দাহ করার পর কবন্ধ দিব্য শরীর ধারণ করে ঠিক এই কথাই শ্রীরামচন্দ্রকে বলছে, আপনারা দুজনেই সমান দুঃখে দুখী, আপনি যেমন নিজের স্ত্রীকে হারিয়েছেন সুগ্রীবও নিজের স্ত্রীকে হারিয়ে আছে। এখানে বালীর কোন কিছুই হারায়নি, সেইজন্য বালীর সাথে বন্ধুত্ব হবে না। কারণ বালী তখন শ্রীরামকে oblige করবে,

শ্রীরামচন্দ্র একজন ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় কখনই যেখানে obligation সেদিকে যাবেন না। বন্ধুত্ব সব সময় হয় সমানে সমানে। বালীর সাথে তাই শ্রীরামের কখনই বন্ধুত্ব হত না, হলে সেই বন্ধুত্ব one sided হত। One sided হওয়ার জন্য, বালী যদি কখন oblige না করে তখন আর ঐ বন্ধুত্ব থাকবে না। স্বামী স্ত্রীর যে সম্পর্ক, সেখানে উভয় উভয়কেই ভালোবাসা দেয়, স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসায় অবদান থাকে, স্ত্রীরও অবদান থাকে, উভয়ের দিক থেকে যখন হয় তখনই সেটা ধর্ম হয়। এক তরফা চললে সেই ভালোবাসা বেশি দিন টিকবে না। বালীর সাথেও শ্রীরামের বন্ধুত্ব বেশি দিন স্থায়ী হত না। কারণ বালীর কোন কিছু প্রাপ্তির ব্যাপার ছিল না। শ্রীরামচন্দ্রকে সব সময় হাতজোড় করে বলতে হবে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ক্ষত্রিয়ে স্বভাবেই এই জিনিস দাঁড়াবে না। শ্লোকটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ, যারা খুব শক্তিমান তারা বালীর মত বলে আমার উপর সব ছেড়ে দিন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাকে দেওয়া যাবে কারণ সে তার সমব্যাথী নয়। বালীর কথার উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

ধর্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি সশরাসণঃ।৪/২/৫৯
দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা।৪/২/৬০
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ।
পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ স বধ্যো রাজভিঃ সদা।৪/২/৬১
ত্বং কপিত্বান্ন জানীষে মহান্তো বিচরতি যৎ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্ নাতিভাবয়েৎ।৪/২/৬৩

হে বানররাজ! ধর্ম কি আমি ভালো জানি। ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই আমি শরাসণ ধারণ করে জগতে বিচরণ করছি। যারা অধর্ম করে তাদেরকে আমি সাজা দিই। কারা সেই অধর্মকারী? শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যারা এই চারজন নারীর সঙ্গে নারীসঙ্গ করে, কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া ও পুত্রবধু। বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রেও এই নিয়ে লেখা হয়েছে। এখানে সম্পর্কে ছোটদের নিয়ে বলছেন, অন্য জায়গায় সম্পর্কে বড়দের সাথেও নিষেধ করা হয়েছে, তার মধ্যে একজন হল গুরুপত্নী। এই চারজনের মধ্যে যে কোন একজনে যে উপগত হয় সে মহাপাতকী, এদের বধ করতেই হয়। তুমি তোমার ছোটভাই সুগ্রীবের স্ত্রীকে নিজের সঙ্গে রেখেছ, সেইজন্য একজন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি রূপে আমি তোমাকে বধ করেছি। তুমি বানর জাতি, তুমি বুঝবে না, ধর্মকে কিভাবে রক্ষা করার জন্য মহাপুরুষরা জগতে বিচরণ করে বেড়ান। এখানে মূল সমস্যাটা থেকেই গেল, আপনি মারবার থাকলে মারুন কিন্তু লুকিয়ে কেন মারলেন? আগে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এর উত্তর দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জীবন এভাবেই ভালো মন্দ মিশিয়ে চলে। যেটা নিষেধ করা হয় সেটা হল casual approach to life। আমাদের সমস্যা হল ভালো যখন করছি সেখানেও আমাদের casual approach, খারাপ যা করছি তাতেও casual approach নিয়েই করছি।

ভালোবাসা নিয়ে একজন মজা করেই লিখছেন। একটি ছেলেকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, মেয়েটির মধ্যে যদি গুণ থাকে তাহলে তুমি তাকে সহজে পাবে না। সহজে যদি পেয়ে যাও তাহলে বুঝবে তার মধ্যে গুণ নেই। মেয়েটির যদি অনেক ক্ষমতা থাকে তাহলে তোমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। যদি হতাশ হয়ে তুমি আগেই ওকে ছেড়ে দাও তাহলে বুঝবে তোমার মধ্যে ক্ষমতা নেই। এই ভাবে অনেক কিছু বলার পর শেষে বলছে, যেটাই করতে যাও শুধু ঝামেলা আর ঝামেলা, ঝামেলা ছাড়া কিছুই জুটবে না। সেইজন্য এমন কাউকে ভালোবাসবে যার জন্য এই ঝামেলা পোয়ানোটা সার্থক হয়। যদি তোমাকে খাটতেই হয়, কাঠখড় পোড়াতেই হয় তাহলে এমন একজনের জন্য খাট, যেখানে ভালোবাসাটা সার্থক মনে হবে। শুধু ভালোবাসাতেই না, জীবনে যে কোন কাজই করি না কেন, মন্দ কাজেও কোন দোষ নেই কিন্তু দেখতে হবে আমি ওই কাজ প্রাণ দিয়ে করছি নাকি উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে করছি। সমস্যা casualকে নিয়ে হয়। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র যখন করছেন তখন পুরো ঐকান্তিকতার সাথে করছেন। ভুল কাজও যদি গভীর আন্তরিকতা নিয়ে করা হয় এই ভুল কাজও তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ঠিক ঠিক বন্ধুত্ব দিয়ে মানুষ ভগবানকেও পেয়ে যেতে পারে। সুফি ট্রাডিশানে ভগবানের ভালোবাসাকে যুবক-যুবতীর ভালোবাসাতে নামিয়ে দিয়েছে, লায়লা-মজনুর কাহিনীতে ঠিক তাই হয়েছে। ছেলে আর মেয়ে, এদের যে ভালোবাসা আর ভগবানকে যে ভালোবাসে দুটোর মধ্যে বিরাট মিল। তার মানে এই ভালোবাসা দিয়ে মানুষ ভগবানকে পেতে পারে। কোন অবস্থায় পেতে পারে? যদি সেই ভালোবাসায় তীব্র অনুরাগ থাকে। সমস্যা হল আমাদের ভেতরে শক্তি নেই, সব ব্যাপারে আমরা ক্যাজুয়াল। আধ্যাত্মিক পুরুষরা কোন ব্যাপারেই ক্যাজুয়াল হন না। সব্জী কাটাতেও তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে।

সন্ন্যাসীরা সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, কথা বলতে গেলে বলবেন, এখন কথা বলা যাবে না, ব্যস্ত আছি। একজন সিনিয়র মহারাজ সন্ন্যাসীদের বলতেন, কখন ব্যস্ত থাকবে না, সব সময় সমস্ত থাকবে। ব্যস্ত মানে 'বি' পূর্বক, অর্থাৎ অনেক কিছুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পাঁচটা জিনিসকে নিয়ে থাকা, সমস্ত মানে একটা জিনিসকে নিয়ে থাকা। গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় আচার্য শঙ্কর কুশলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন, অনেক কাজ এসে গেছে, কুশল মানে সে জানে কোনটা আগে কোনটা পরে করতে হবে। অবতার পুরুষের বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত, যেটাকে নিয়ে আছেন পুরোটাই সেটাতে লেগে আছে। অনেকে বলতে পারেন, ছেলে মেয়েরা যখন ভালোবাসে, দেখা যায় একজন আরেকজনকে না পেলে আত্মহত্যা করে নেয়। ঠিকই, কিন্তু ঐ একটা কাজেই সমস্ত থাকে কিন্তু অন্য কাজে সমস্ত থাকে না। যখন খাচ্ছে তখন মেয়েটার কথা চিন্তা করছে, পড়ছে তখনও মেয়েটার কথা ভাবছে, আর সমস্ত থাকল না, ব্যস্ত হয়ে গেল। জীবনের উদ্দেশ্য হল সমস্ত হওয়া। মহাপুরুষ ও অবতারের এটাই বৈশিষ্ট্য, ওনারা সমস্ত, integreted personality। দশটা কাজ করবেন কিন্তু সবটাতেই পুরোটা লাগিয়ে দেন। এরপর একটা দুটো যদি ভুল কাজও হয়ে যায়, তাতে কোন ম্যাটার করে না। স্বামীজী বলছেন, যে আদর্শকে নিয়ে এগোয় সে যদি দশটা ভুল করে, বিনা আদর্শে যারা চলে তারা একশ খানা ভুল করে।

সাধারণদের জন্য যখন কিছু রচনা করা হয় তখন সেখানে যুক্তিগুলোও সাধারণ দিতে হয়। বালীকে শ্রীরামচন্দ্র লুকিয়ে কেন মারলেন, আমরা এর যে যুক্তি দিলাম এই যুক্তি সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারবে না, তাদের বলেও কোন লাভ হবে না। সেইজন্য এখানে সহজ যুক্তি এনে বলছেন, তুমি এ রকম করেছিলে তাই তোমাকে এভাবে মারা হল। সেখানেও কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে লুকিয়ে কেন মারলেন? সাধারণ ভাবে এর উত্তর হয় না। এর উত্তর আসবে higher level থেকে। যাই হোক, শ্রীরামচন্দ্রের কাছে এই কথা শোনার পর বালী ভয় পেয়ে গেছে, আমি তো গেলাম কিন্তু পেছনে আমার ছেলে অঙ্গদ থেকে গেছে। বাল্মীকি রামায়ণে এই জিনিসটাকে আরও বাস্তবিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। অবতারের গুণ যদি বুঝতে হয়, অবতার কিভাবে থাকেন, অবতারের আচরণ কেমন হয়, এর জন্য ঠিক ঠিক মাত্র দু খানা গ্রন্থ, একটা বাল্মীকি রামায়ণ আরেকটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই। ভাগবতাদি গ্রন্থ ঘটনা গুলোকে খুব সুন্দর প্যাকেজিং করে আমাদের সামনে রেখে দিয়েছেন। ফলে আমরা যখন শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত দেখছি তখন আমাদের মনে হবে, কাহিনীগুলো খুবই ভালো, কিন্তু আমি তো এগুলো পারব না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অবতার পুরুষ সব সময় মানুষের মতই ব্যবহার করেন, তাঁরও শোক হয়, দুঃখ হয়। ঠাকুর বলছেন, ভেতরে ডুব দাও, জপ-ধ্যানে মনকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে বলছেন। তখন একজন ভক্ত বলছেন, বেশি গভীরে চলে গেলে সংসার আর থাকবে না। ঠাকুর বলছেন, সেকি! সংসার থেকে যাবে কোথায়, সংসার কি তাঁর থেকে আলাদা নাকি! আমাদের এটা একটা বিরাট সংশয়, আমরা ভাবছি ঈশ্বর একটা সংসার আরেকটা। ঠাকুর বলছেন, আমি দেখি আমি সেই অযোধ্যাতেই আছি। যখন আমি কলকাতা দেখছি, কলকাতাতেই আছি, এটাই সেই অযোধ্যা নগরী, যেখানকার অধিপতি শ্রীরামচন্দ্র। যাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, তাঁরাও দেখছেন এই বেলুড় মঠ একটা নগরী, এর অধিপতি ঠাকুর। এই সংসার ঠাকুরেরই সংসার। আমার আপনার জন্যও সেই সংসার, শ্রীরামচন্দ্রের জন্যও সেই সংসার আর ঠাকুরের জন্যও সেই সংসার। সংসার মানেই এখানে শোক থাকবে, দুঃখ থাকবে, মোহ থাকবে, আকর্ষণ থাকবে, বিকর্ষণ থাকবে, ভালোবাসা থাকবে। কথামৃতে এক ভক্ত ঠাকুরকে বলছেন, আপনি খালি নরেন আয় রে, নরেন খারে, আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি? সবারই একজন বিশেষ লোক থাকে, ঠাকুরেরও একজন দুজন বিশেষ লোক ছিল। যে সবাইকে ভালোবাসে সে কাউকেই ভালোবাসে না। যে শিক্ষক ছাত্রদের বলে, আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি। হয় সে মিথ্যা কথা বলছে, নয়তো কাউকেই ভালোবাসে না। একজনকে একটু বেশি ভালোবাসতেই হবে। জীবনে আমরাও একজনকে একটু আলাদা করে ভালোবাসি, এই জিনিস সব জায়গাতেই প্রযোজ্য। বিয়ে করেছে একজনকে কিন্তু ভালোবাসে আরেকজনকে, এই জিনিস হবেই, কিছু করার নেই। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিয়ে করেছেন কিন্তু তিনি বলছেন, তোমার তো শিশুপালের সাথে বিয়ে ঠিক ছিল, ভেবে দেখো তুমি যদি এখনও চাও চলে যেতে পার। কিন্তু শ্রীরাধাকে তিনি কোন দিন এই ধরণের কথা বলেননি। এই ভাবগুলো থাকবেই। ভাগবত, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিস্তির্ণ ভাবে ছড়িয়ে গেছে, সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের ঠিক ঠিক চিত্রটা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে সময় লাগে। কিন্তু বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের যে চিত্রন করেছেন এটাই ঠিক ঠিক চিত্রন। আর পরে মাস্টারমশাই কথামৃতে ঠাকুরের যে চিত্রন করেছেন, অবতারের জীবন এভাবেই চলে। আমরা যদি এখন ঠাকুরের

নামে পাঁচটা প্রশ্ন করি, ঠাকুর এটা কেন করলেন, সেটা কেন করলেন, তাতে দোষের কিছু নেই, কারণ মানুষের জীবন এভাবেই চলে, অবতার যখন মানুষ দেহ ধারণ করছেন তখন তিনিও এভাবেই চলেন।

কাশ্মীরে থাকার সময় সেখানকার এক ফকিরের চেলা স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজীর কাছে আনোগোনা করতে শুরু করেছে। ফকির দেখছে চেলা হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি কি একটা বাণ মারলেন যাতে রক্ত আমাশা হয়ে স্বামীজীকে ওখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে হয়। কদিন পর তাই হল, স্বামীজীকে প্রাণ ছেড়ে পালাতে হল। স্বামীজী পরে শ্রীশ্রীমাকে দুঃখ করে বলছেন, মা! তোমার ঠাকুর রক্ষা করতে পারলেন না। শ্রীশ্রীমা বলছেন, বাবা! শক্তি মানতে হয়, ঠাকুর তো ভাঙতে আসেননি গড়তে এসেছেন। আসলে এনারা হলেন জগতের সব রকম সুখ-দুঃখের পারে। যতই বাণ মারুক এতে স্বামীজীর আত্মজ্ঞানের কিসের খামতি হল! এগুলো একদিনে ধারণা হয় না, যেমন যেমন জ্ঞানের পরিপক্কতা হতে থাকে তেমন তেমন ধারণাটা স্বচ্ছ হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানে একত্বের জ্ঞান, তিনিই একমাত্র আছেন। সেটাকে কেউ আত্মা রূপে নিতে পারেন, ব্রহ্ম রূপে নিতে পারেন, ঈশ্বর রূপে নিতে পারেন। এরপর বাকি যা কিছু চলে এগুলোই সংসারের এক একটি ভাব, ওনারা ঐ দিকে তাকাতে যান না। আর দ্বিতীয় হল, সংসারের এই ভাবগুলো তাঁদের স্পর্শ করে না। স্পর্শ করে না মানে, এই গেল এই বেরিয়ে এল। ঠাকুর বলছেন, ফোঁস করতে হয় বিষ ঢালতে নেই। এগুলো হল শ্রীরামচন্দ্রের ফোঁস করা। আপনি বলবেন, ফোঁস করলেন ঠিক আছে কিন্তু লোকটি তো মরেই গেল। ঠিকই, সে মরে গেল, কিন্তু অন্য কোন সাধারণ লোক যদি হত তাহলেও তার পুরো বংশকেই নাশ করে দেবেন না, যতটুকু দরকার ততটুকু করলেন, সুগ্রীবের জন্য ঐ কাঁটাটুকু বার করে সরিয়ে দিলেন, আর কাউকে কিছু করতে দিলেন না। এই কয়েকটা জিনিস, intensity, জ্ঞানের কখনই হানি হয় না, এই কটি মাথায় রাখলে তখন বোঝা যায় অবতার পুরুষরা কিভাবে ব্যবহার করেন। যেহেতু অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিশাস্ত্র সেইজন্য কোথাও কোথাও ফাঁক থেকে যায়। পুরোপুরি নিজেদের মত রচনা করলে ফাঁক থাকত না, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের অনেক ভাব নিয়ে আসার জন্য কোথাও কোথাও একটু ফাঁক থেকে যায়।

মৃত্যুর সময়েও বালী কিন্তু বিলাপ করছে, রাজা বলে কথা! বালী পুরো সচেতন যে আমার পেছনে আমার স্ত্রী পুত্র থেকে গেছে। এই শক্তিশালী পুরুষকে আমি যদি চটিয়ে দিই তাহলে তাদের জীবন সংশয়ে চলে যাবে। স্ত্রী পুত্রের প্রতি মায়ার প্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে বালী পিছিয়ে আসছে। বালী দেখছে আমাকে এভাবে লুকিয়ে বাণ মারা হল, আমি এবার মরতে যাচ্ছি, প্রথমেই একটা ফোঁস করল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে বালী বলছে –

রাম রাম মহাভাগ জানে ত্বাং পরমেশ্বরম্।
অজানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি।৪/২/৬৫
সাক্ষাত্ত্বচ্ছরঘাতেন বিশেষেণ তবাগ্রতঃ।
ত্যজাম্যসূন মহাযোগিদর্লভং তব দর্শনম্।৪/২/৬৬
যন্নাম বিবশো গৃহ্নন ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্মে পুরং স্থিতঃ।৪/২/৬৭
দেব জানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয়াং জানকীং শুভাম্।
রাবণস্য বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্।৪/২/৬৮

বালী শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জেনে অতি ভীত হয়ে গেল, আনন্দে প্রণাম করে বলছে, হে রাম! আমি বুঝতে পেরেছি আপনি সেই পরমেশ্বর, আমি অজ্ঞানবশতঃ রেগে গিয়ে আপনাকে কিছু অপ্রিয় কথা বলে ফেলেছি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। বড় বড় তপঃশীল যোগীরাও আপনার দর্শন পান না, কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য যে আপনারই বাণে আহত হয়ে আপনারই সামনে আমার শরীর চলে যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, বিবশ হয়ে, অসহায় হয়ে শেষ সময়ে কেউ যদি ঈশ্বরের নাম করে তাতেও আপনি তাকে দর্শন দেন এবং তার মুক্তি হয়। আমার তো এখন শেষ সময়, আপনি সাক্ষাৎ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেইজন্য আমার আর দুঃখের কিছু নেই। গীতাতেও ভগবান বলছেন, মৃত্যুর সময় যেমন ভাব থাকে তেমনই গতি হয়। এইভাবে স্তুতি করে শেষে বলছেন, হে রাম! আপনার কৃপায় আমি বুঝতে পারছি আপনি সেই সাক্ষাৎ পুরুষ। পুরুষ মানে, যিনি পুর অর্থাৎ দেহ রূপ নগরীতে শয়ন করেন। শরীরটা একটা নগরীর মত, এই নগরীতে যিনি বাস করেন, যিনি শয়ন করেন

তাঁকেই বলা হয় পুরুষ। পুরুষ মানে ভগবান বা আত্মা বা অন্তর্যামী। আমি জানি আপনি সেই পুরুষ আর জানকী হলেন লক্ষ্মী, যিনি নারায়ণের চির সঙ্গিনী। ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে রাবণবধের জন্য আপনি এই ভূতলে অবতরণ করেছেন। হে রাম! আপনি এখন অনুজ্ঞা করুন আমি আপনার উত্তম ধামে গমন করি আর আমার ছেলে অঙ্গদ আপনার কাছে রইল, এর উপর আপনি কৃপাদৃষ্টি রাখবেন। বাল্মীকি রামায়ণের সাথে এই বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যায়। বালী ভাবছে আমি কিছু কটু কথা বলে ফেলেছি, তিনি যেন রেগে না যান। বাল্মীকি রামায়ণেও বলছে, অঙ্গদ আমার ছেলে, এর উপর কৃপাদৃষ্টি রাখবেন। কারণ সুগ্রীবের থেকেও বালীর ভয় আছে। যতই হোক বংশ পরম্পরায় অঙ্গদই রাজা, মাঝখান থেকে সুগ্রীব ঢুকে যাচ্ছে। রাজসিংহাসনের প্রতি সবারই লোভ, সেটাকে নিষ্কণ্টক করার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করে দিতে পারে। অঙ্গদেরও চিরদিনই ভয় ছিল, সুগ্রীব কোন না কোন বাহানা করে তাকে মেরে ফেলবে। বালী জানত শ্রীরামচন্দ্রের যদি কৃপা না থাকে অঙ্গদ বাঁচতে পারবে না। কারণ অঙ্গদ তখনও ছোট, এখনও তার সেই শক্তি হয়নি যে শক্তিতে নিজেকে সে রক্ষা করতে পারবে। আর শক্তি যাই থাকুক, সুগ্রীব এখন রাজা হবে, রাজার একটা বিশেষ ক্ষমতা সব সময়ই থাকে। বালী শেষে বলছেন, হে রাম! আপনি আমাকে স্পর্শ করে আমার শরীর থেকে এই তীরটা বার করে দিন। শরীরে তীর বিধে থাকলে খুব যন্ত্রণা হতে থাকে। তীরটা টেনে বার করে নেওয়ার পর হুর হুর করে রক্তক্ষরণ হয়ে তাড়াতাড়ি সে মরে যাবে। তীর লেগে থাকলে একটু একটু করে মরবে। সেইজন্য বালী শ্রীরামচন্দ্রকে বললেন, আপনি হাত দিয়ে এই তীরটা বার করে দিন, আর আপনার স্পর্শে আমি পরম শান্তি পাব। শ্রীরামচন্দ্র তখন তাই করলেন। বালীর প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের যে রাগ ক্রোধ ছিল তা তো নয়। মিত্রধর্ম পালন করতে গিয়ে তাঁকে একটা কাজ করতে হল, এমনিতে বালীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত কোন আক্রোশ বা বিদ্বেষ কখনই ছিল না। রাবণের প্রতিও শ্রীরামচন্দ্রের কোন কিছু ছিল না।

এখানে বর্ণনা করছেন, শ্রীরামচন্দ্র বালীর শরীর থেকে তীরটা বার করে নিতেই বালীর বানর রূপটা চলে গেল আর ক্ষণকালের মধ্যে তার সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রস্বরূপ রূপ ধারণ করে পরমহংসদের প্রাপ্য দুর্লভ পরমপদ প্রাপ্ত হয়ে গেল। ভক্তিশাস্ত্রে এভাবেই দেখানো হয়, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, তাঁর হাতেই যদি মৃত্যু হয় অবশ্যই তার শুভ কিছু হবে। মহাদেব পার্বতীকে এই কাহিনী বলছেন, মহাদেব বলছেন বালী যে শ্রেষ্ঠ পদ পেল এই পদ পরমহংসরাও পান না, সাধারণ মানুষের দ্বারা তো কখনই সম্ভব না। বালী শ্রীরামচন্দ্রের বাণ দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে আর শ্রীরামচন্দ্রের মৃদু স্পর্শ পেয়েছে, এই কারণে বালী ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারল যেখানে পরমহংসরাও পৌঁছাতে পারেন না।

বালী মারা যেতেই বানরগুলো সব কিষ্কিন্ধ্যা নগরের দিকে দৌড়ে গেছে খবর দেওয়ার জন্য। বালী মারা যাওয়াটা একটা সাংঘাতিক ঘটনা, যে বালী এত বলশালী ও পরাক্রমী, যাকে কেউ কোন দিন পরাজিত করতে পারত না, সে কিনা মারা গেছে! বানররা বালীর স্ত্রী তারাকে বলছে, আপনি এই বাচ্চাটিকে রক্ষা করুন, বালী মারা গেছে এখন আপনার এই বাচ্চা ছেলে অঙ্গদকে কে রক্ষা করবে! কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর সব ঘরবাড়ির দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে এই নগরীকে রক্ষা করব। বালী মারা গেছে শুনে তারা মুর্ছিত হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে তারা বলছে –

কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা।
ইদানীমেব নিধনং বাস্যামি পতিনা সহ।৪/৩/৫

আমার আর অঙ্গদকে নিয়ে কি হবে, রাজ্য নিয়েই বা কি হবে, নগরী, টাকা-পয়সা নিয়েই বা কি হবে! আমি আমার স্বামীর সাথেই চলে যাব। তারা বালীকে খুবই ভালোবাসত। হিন্দুদের পঞ্চসতীর মধ্যে তারা একজন সতী নারী, এই পাঁচজন হলেন – অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, কুন্তি আর মন্দোদরী। বালী যেখানে পড়ে আছে তারা সেখানে দৌড়ে গেছে। বালীর সমস্ত শরীর রক্তে লিপ্ত হয়ে আছে। তারা কান্নাকাটি করছে তার সাথে প্রচুর বিলাপ করে যাচ্ছে। সামনে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে তারা বলছে –

করুণং বিলপন্তী সা দর্শ রঘুনন্দনম্।
রাম মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্ত্বয়া।৪/৩/৮
গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্নামভিকাঙ্ক্ষতে।
স্বর্গেহপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন।৪/৩/৯

পত্নীবিয়োগজং দুখমনুভূতং ত্বয়ানঘ।
বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ।৪/৩/১০

হে রাম! যে বাণ দিয়ে আপনি বালীর প্রাণ হরণ করলেন সেই বাণ দ্বারা আমাকেও শেষ করে দিন। এখানেও বাল্মীকি রামায়ণের ভাব এনে বলছেন, হে রঘুনন্দন! আমার স্বামী স্বর্গে গিয়েও আমাকে ছাড়া সুখ পাবেন না। আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন, আমাকে ছাড়া তিনি স্বর্গে যেতে চাইবেন না। সেইজন্য আপনি ঐ বাণেই আমাকে শেষ করে দিন যাতে আমি বালীর সাথে গিয়ে স্বর্গে থাকতে পারি। এটাও হিন্দুদের একটা ধারণা যে, মৃত্যুর পর সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে বিভিন্ন লোকে গিয়ে সুখে বাস করে। তারা বলছে, হে অনঘ! পত্নীবিয়োগের কী ব্যাথা সেটা আপনি নিজেই এখন অনুভব করছেন, শীঘ্রই আমাকে বালীর নিকট প্রেরণ করুন তাহলে আপনি পত্নীদানজনিত ফল লাভ করবেন। এখানে শব্দটা হল পত্নীদানফল, কিন্তু ইদানিং যে শব্দটা ব্যবহার করা হয় তা হল কন্যাদান। বলা হয় কন্যাদান হল মহাদান। এখানে পত্নীদান অর্থটা কন্যাদান অর্থেই করছেন। বলে, কন্যাদান যে করে তার নাকি মহা পূণ্য হয়। তারা এটাই বলতে চাইছেন, আপনি যদি এটা করে দেন তাহলে আপনি কন্যাদানের ফল পাবেন, কারণ আমি মরে যাওয়ার পর বালী আমাকে স্বর্গে পাবে, আর এতে আপনি বিরাট পূণ্যফল পাবেন। তারা এইসব বলার পর সুগ্রীবকে বলছে, যাও সুগ্রীব তুমি এবার রুমার সাথে সুখভোগ কর। এরপর একটা বিরাট আলোচনা চলবে। অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র উপদেশের দ্বারা তারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে হনুমান সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

তারাকে সান্ত্বনার ছলে শ্রীরামের তত্ত্বোপদেশ

একজন শোক সন্তপ্ত ব্যক্তি, তার স্ত্রী কিংবা স্বামী মারা গেছে, কিংবা তার পুত্র বা নিকট কোন লোক মারা গেছে, তাকে আমরা কিভাবে সান্ত্বনা দিতে পারি? আমরা ঐ অবস্থায় নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে যাই, কিন্তু ঐ সান্ত্বনা কোন কাজ করে না। ইংলিশে একটা শব্দ আছে empathy, শোকের সময় এই empathyই সবচেয়ে বেশি কাজ করে। Empathy মানে তার দুঃখে দুখী হওয়া। Sympathyতে আমি একটু উঁচুতে আছি আর শোক সন্তপ্ত ব্যক্তি একটু নীচুতে আছে। কিন্তু empathyতে আমি তার সাথে এক হয়ে গেছি। যদি কারুর দুঃখে এক হয়ে যায়, যদি empathy এসে যায় তাতে তার শোক অনেক লঘু হয়ে যায়। প্রধান সমস্যা হল, কারুর শোকে মানুষ empathy নিয়ে যায় না, সব সময় sympathy নিয়ে যায়। এর খুব বাস্তব উদাহরণ হল, বাড়িতে যদি সন্তান মারা যায় সেখান স্বামী আর স্ত্রী এক অপরকে ধরে থাকে, কারণ সেখানে empathy রয়েছে। ঠিক তেমনি বাবা কিংবা মা মারা গেলে ভাইয়েরা সবাই একত্র হয়। শ্রাদ্ধাদি করার যে বিধি তাতে এটাই উদ্দেশ্য, সব আত্মীয়-স্বজনরা যেন একত্রিত হয়ে তাদের সমব্যাথী হতে পারে। শোক সন্তপ্ত ব্যক্তিকে ঠিক ঠিক সান্ত্বনা তখনই দেওয়া হয়, তার সাথে একত্ব ভাব নিয়ে আসা, তার দুঃখে আমি এক। এরপর যে সান্ত্বনা বাক্যই বলা হোক সেটাই কাজে দেবে, কিছু যদি নাও বলে সেটাও কাজ দেয়। শুধু তার পাশে আছে এটাই তাকে শক্তি দেবে।

যখনই আমাদের জীবনে কোন সমস্যা আসে তখন দেখতে হবে এটা সমস্যা নাকি বাস্তবিক পরিস্থিতি। একজন যুবতী স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে, এটা সমস্যা নয় এটা হল একটা পরিস্থিতি এসে গেছে। পরিস্থিতিতে কোন সমাধান থাকে না। মানুষের সমস্যা হল পরিস্থিতিকে মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রহণ না করে তারা পরিস্থিতিকে পাল্টাতে চেষ্টা করে। সমস্যা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ তার প্রতি আমাদের empathy থাকা দরকার, কিন্তু যেমনি ওটা পরিস্থিতিতে পাল্টে গেল, তখন আর কিছু করার নেই, এটাই থাকবে। যাঁরা সমস্যা আর পরিস্থিতিকে সামলাতে পারেন তাঁরাই হয়ে যান গুরু স্থানীয়, যেমন আমরা শ্রীরামচন্দ্রকে, মহাবীর হনুমানকে, অর্জুনের ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পাই। পরে ঠাকুর আর শ্রীশ্রীমায়ের ক্ষেত্রে পাই। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি এসে দুঃখ প্রকাশ করত মা হাঁক ছেড়ে কান্না শুরু করে দিতেন, দেখা যেত যার শোক হয়েছে তার থেকে মা বেশি কাঁদছেন। মায়ের কান্নাটা বাস্তবিক ছিল, তিনি সত্যিই তার দুঃখে দুখী হয়ে যেতেন। ঐ দুঃখে দুখী হওয়াতেই শোকাতুরা ব্যক্তির দুঃখটা চলে যেত। কথামৃতে ঠাকুরের জীবনের একটা খুব নামকরা ঘটনার উল্লেখ পাই। পুত্রশোকে কাতর হয়ে একজন এসেছে। ঠাকুর প্রথমে তাঁর শোকের কথা চুপচাপ শুনলেন। তারপরেই হঠাৎ তিনি গান গাইতে শুরু করে দিলেন জীব সাজ সমরে। আপনি তার ব্যথায় সমব্যাথী হন, তার দুঃখে আপনি চোখের জল ফেলুন যাই করুন, কিন্তু যিনি গুরু তাঁর কাজ হল তাকে একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। শাস্ত্র

চোখের জল ফেলানোর জন্য নয়, শাস্ত্র হল আমাদের একটা উচ্চ অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেইজন্য অধ্যাত্ম রামায়ণে, বাল্মীকি রামায়ণে বা গীতাতে খুব জোর একটা দুটো বাক্যে একটু empathy দিয়ে দিলেন কিন্তু তারপরেই তাকে উচ্চ আদর্শের দিকে তুলে দিচ্ছেন। বাল্মীকি রামায়ণে মহাবীর হনুমান ঠিক এই উচ্চ ভাব দিয়েই শুরু করছেন। তারা! কার জন্য তুমি শোক করছ! তুমি নিজেই তো আকাশের ভগ্ন তারার মত ভূমিতে পতিত হয়ে আছ। তার নাম তারা, তারার স্থান আকাশে, আকাশের তারা এখন মাটিতে লুটোপুটি করছে। হনুমান তাই বলছেন, তুমিই এখন শোচনীয়া, তোমাকে নিয়েই এখন শোক করতে হবে। তুমি আবার কার জন্য শোক করবে? আমরা যেমন সান্ত্বনা দেওয়ার সময় বলি, যে যাওয়ার সে চলে গেছে, যারা আছে তাদের দিকে তাকাও। এখানেও হনুমান একই জিনিস করছেন। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণ কথায় কথায় মোক্ষের উপদেশ দেয় না, তাই অন্য ভাবে জিনিসটাকে রাখছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অন্য ভাবে রাখছেন। মূল কথা ওর দুঃখের সাথে এক হয়ে শোক থেকে তাকে টেনে তুলে নিয়ে আসা। যতক্ষণ সমব্যাথী না হওয়া যায় ততক্ষণ তার দুঃখকে লাঘব করে তাকে শোক থেকে তুলে আনতে পারবে না। ভাইপো অক্ষয় মারা যাওয়ার সময় ঠাকুর অনুভব করছেন, একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা, বুকে যেন বিল্লি আঁচড়াচ্ছে। তখন ঠাকুর বলছেন, মা দেখিয়ে দিলেন সংসারীদের শোক দুঃখের যন্ত্রণাটা কেমন হয়। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা হয় ঐ দুঃখটাকে বোধ করতে পারছি না আর তা নাহলে যে মারা গেছে বা যার মারা গেছে তার সাথে আমাদের সেই রকম ঘনিষ্ঠতা নেই। এই দুটো না হওয়ার জন্যই সমস্যা হয়। বাল্মীকি রামায়ণ শাস্ত্র আর অধ্যাত্ম রামায়ণও শাস্ত্র, কিন্তু বাল্মীকি এই পরিস্থিতির যেভাবে বাস্তবিক চিত্রন করছেন এখানে সেভাবে করছেন না, শ্রীরামচন্দ্র এখানে সরাসরি দর্শনে চলে যাচ্ছেন –

কিং ভীরু শোচসি ব্যর্থং শোকস্যাবিষয়ং পতিম্।
পতিস্তব্যয়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ।৪/৩/১৩

স্বামী শোকে বিলাপরতা তারাকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তোমার স্বামী হলেন শোকের অবিষয়, তিনি শোক করার জন্য নন। তুমি ঠিক ঠিক বিচার করে দেখ তো রণভূমিতে শায়িত এই দেহ বা এই দেহের মধ্যে যে জীব বাস করে এর মধ্যে তোমার স্বামী কে? দেহটাই যদি তোমার স্বামী হয় তাহলে দেহ তো সামনে পড়ে আছে, একেই তুমি ভালোবাস। আর জীব যদি তোমার স্বামী হয় তাহলে সেই জীব তো মরেনি, তাহলে তুমি শোক করছ কেন। এখানে ব্যবহারি দৃষ্টিতে যুক্তিতে একটু গোলমাল আছে। জড় জড়কেই ভালোবাসে, জড় জড়ের সাথেই মিলে যায়। জীবন জীবনের সাথে মেলে আর চৈতন্য চৈতন্যের সাথে মেলে। চেতনার বোধ জড়ের জড়ের সাথে থাকে, জীবনের জীবনের সঙ্গে থাকে আর চৈতন্যের চৈতন্যের সাথে থাকে। আমি তোমাকে যে ভালোবাসি আত্মা রূপে তো ভালবাসছি না, ভালবাসছি জীবন রূপে। সেই জীবনটাই চলে গেল। এখানে যুক্তিতে দোষ আছে, তারা ঐ উচ্চ অবস্থায় নেই, তারা জীবনকে ভালোবাসে, সেই জীবনটাই এখন নেই। যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে অধ্যাত্ম রামায়ণের অনেক গোলমাল নজরে আসবে, কিন্তু শাস্ত্রের দিক দিয়ে কোন তুলনাই নেই। গীতায় ভগবান সেই একই কথা বলছেন *অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদংশ্চ ভাষসে*। এখানে তারাকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন আর অর্জুনকে ভগবান গীতায় বলছেন। কিন্তু গীতা আর অধ্যাত্ম রামায়ণে একটা বড় পার্থক্য আছে। অর্জুন কিন্তু একজন জ্ঞানী পুরুষ, যা তা কোন লোক নন। এই পয়েন্টটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, এই পয়েন্টটা যদি মাথা থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে শাস্ত্রের অনেক কিছু বুঝতে গোলমাল হয়ে যাবে। আমাদের ধারণা যে অর্জুন যেন শুধু একজন বড় যোদ্ধা, বীরপুরুষ। কিন্তু তা নয়, তখনকার দিনে ছোটবেলা থেকে বেদান্ত বা অধ্যাত্মের পুরো শিক্ষা দেওয়া হত, অর্জুন গুরুর কাছে বেদান্তের পুরো শিক্ষা পেয়েছেন, তাছাড়া একা একা বনে বনে ঘুরে বেড়াবার সময় অর্জুন অনেক সাধুসঙ্গ করেছিলেন। সেইজন্য আমরা সহজেই বলতে পারি অর্জুনের অধ্যাত্ম বা বেদান্ত জ্ঞানের সম্যক ধারণা ছিল। শ্রীকৃষ্ণও জানতেন যে, চৈতন্য দিয়ে বোধ করার ক্ষমতা অর্জুনের ছিল, অর্জুন চৈতন্য রূপে জিনিসটাকে দেখতে পারবেন। সেইজন্য ভগবান প্রথমেই এই উচ্চ তত্ত্ব *অশোচ্যানন্ব* দিয়ে শুরু করলেন। কিন্তু অনেকটা বলার পর দেখছেন এত উচ্চ তত্ত্ব অর্জুন নিতে পারছে না, তখন আরেকটু নীচে থেকে শুরু করলেন। সেখান থেকে আবার তিনি অর্জুনকে টেনে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। যে কোন সমস্যার সমাধান পেতে হলে ঐ সমাধানটা একটা হায়ার লাইফ থেকে নিয়ে আসতে হবে। যে কোন সমস্যায় কখনই সমান সমান perspective থেকে সমাধান হয় না। কিন্তু জিনিসটাকে কার্যকর করার জন্য অনেক সময় সমানে সমানে শুরু করে, কিন্তু ধীরে ধীরে আরও বড় হয়ে যায়। যেমন একজন একটা বাড়ির ছাদে উঠবে। তার জন্য একটা বড়

মোটা দড়ি দরকার। কিন্তু প্রথমে সরাসরি বড় মোটা দড়ি ছাদে ছুড়তে গেলে পৌঁছাবে না। প্রথমে তাই একটা হাল্কা দড়িতে একটা পাথর বেঁধে ছুঁড়ে দিল। ঘুরে এদিকে চলে আসার পর পাতলা দড়িটা সহজেই মোটা দড়িকে টেনে নেবে, ঐ মোটা দড়ির সাহায্যে আরও ভারী দড়ি যাবে। তখন ঐ দড়িকে অবলম্বন করে নিজে ছাদে উঠবে।

শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনের ক্ষেত্রে তাই করেছেন। প্রথমের দিকে ভারী ছুড়েছেন, দেখছেন হচ্ছে না। এরপর নিজেকে অর্জুনের স্তরে নিয়ে গেছেন তারপর সেখান থেকে টেনে তুলে নিয়ে এসেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশ তিনি অন্যদের দিতে যাবেন না। কারণ জড় জড়ের সাথে মিলে যায় আর জীবন জীবনকেই চায়, চৈতন্য চৈতন্যের সাথে মিলে যায়। গীতার ব্যাপারে একটা জিনিস অনেকবার বলা হয়, অর্জুন ছিলেন বীর, কিন্তু তাঁর মধ্যে একটা যেন ছায়া এসে গেছে, ভেতরটা মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভগবান যেন জোর বাতাস দিয়ে মেঘটাকে উড়িয়ে দিলেন। সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রে এই জিনিস হবে না। সাধারণ লোকেরা মৃত্যুধর্মা, জন্ম নেওয়াটাই এদের স্বভাব আর মরাটাও স্বভাব, জন্ম আর মৃত্যুর বাইরে এরা কিছু জানেই না। এই ধরণের লোকেদের যদি বলা হয় আত্মার জন্ম নেই আত্মার মৃত্যু নেই, এরা নিতেই পারবে না, এতটুকু বুঝবে যে আপনি তাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু empathy জিনিসটা যদি এসে যায় তখন তাকে বলা যেতে পারে, যে চলে গেছে সে চলে গেছে, যারা আছে তাদের কথা ভাব। তখন সে তার এই ভাষাটা বুঝতে পারে। অধ্যাত্ম রামায়ণ শাস্ত্র, এই পরিস্থিতিতে শাস্ত্র সব সময় উচ্চ আদর্শ দিয়ে দেবে। বাল্মীকি রামায়ণও শাস্ত্র কিন্তু অনেক বাস্তবানুগ। গীতাতেও অধ্যাত্ম রামায়ণের মতই বলা হচ্ছে, কিন্তু গীতাতে যাঁকে বলা হচ্ছে তিনি একজন জ্ঞানী পুরুষ। যাঁদের চৈতন্যের বোধ আছে তাঁদেরকে বলা যেতে পারে। যদি দেখা যায় বীরপুরুষ কাপুরুষের মত আচরণ করছে তখন তাকে বলা যেতে পারে, তুমি বীরপুরুষ হয়ে এই ধরণের কাপুরুষের মত আচরণ কেন করছ! কিন্তু যে কাপুরুষ তাকে বলে কী হবে! তার শক্তি, ক্ষমতার স্তরটা দেখতে হবে। স্তর অনুযায়ীই উপদেশ দিতে হয়। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ শাস্ত্র, তাই এখানে শেষ কথা দিয়েই শ্রীরামচন্দ্র তারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু সব জায়গায় এভাবে উপদেশ দিলে কোন কাজ হবে না, উল্টে অনেক গোলমাল লেগে যেতে পারে। সাধারণ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত লৌকিক ব্যবহার নিয়ে চলা।

তারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন শ্রীরামচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্ব, এই ধরণের ব্যক্তিত্ব যদি শোকের সময় হাজির হয়ে যান তাতেই সে অনেকটা শক্তি ফিরে পাবে। মৃত্যু মানে আমার একটা ক্ষতি হয়ে গেল, যে কোন ক্ষতি মানুষকে দুর্বল করে দেয়। দুর্বলকে সবল করতে হবে, শ্রীরামচন্দ্র, হনুমান, শ্রীকৃষ্ণের মত লোক যদি তার কাছে পৌঁছে যায় আর যদি বলেন আমি তোমার পাশে আছি, তখন তার মধ্যে যে শক্তির চেতনা আসবে সেটাই তাকে ঐ শোক থেকে তুলে আনবে। একটা বাচ্চা ছেলের কিছু হয়ে গেল তার মা যদি পাশে এসে যায় তখনও তার ভেতরে শক্তি এসে যায়। তার সাথে আধার অনুযায়ী যে তত্ত্ব কথা বলা হচ্ছে সেখানেও শক্তির বোধ আসছে। উপযুক্ত আধার না বুঝে তত্ত্ব কথা বললে আরও সমস্যা বেড়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্র শুরু করছেন এই বলে, তারা তুমি বল তোমার স্বামী বলতে তুমি কাকে মনে করছ? যদি শরীরকে মনে কর তাহলে এই তো শরীর পড়ে আছে, আর জীবকে যদি তোমার স্বামী মনে কর তাহলে জীব তো সর্বব্যাপী। এখানে ব্যাখ্যা করছেন না যে, জীব বলতে জীবাত্মাকে বলতে চাইছেন বা আত্মাকে বলতে চাইছেন। শ্রীরামচন্দ্র আত্মার স্বরূপের কথা বলতে গিয়ে বলছেন –

ন স্ত্রী পুমান্ বা ষণ্ডো বা জীবঃ সর্বগতোঽব্যয়ঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽয়মাকাশবদলেপকঃ
নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমর্হতি।৪/৩/১৬

শ্রীরামচন্দ্র এই শ্লোকে আত্মার ব্যাখ্যা করে বলছেন, আত্মা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন আর নপুংসকও নন, তিনটের মধ্যে কোনটাই নন, তিনি সর্বব্যাপী আর অব্যয়। আত্মার চরিত্র বোঝার জন্য শ্রেষ্ঠ উপমা আকাশ। আকাশের কোন বিভাজন হয় না, একটা বাড়ি করে দেওয়া হল, একটা কৃত্রিম বিভাজন হয়ে গেল, আকাশ আকাশের মতই আছে, আত্মাও সেই ভাবে একই রকম আছেন, আত্মাই এক অদ্বিতীয়। আত্মার সাথে কোন কিছুরই মিল হবে না। হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে আকাশেরও একটা সীমা আছে, বর্তমান বিজ্ঞান যেভাবে উন্নত হচ্ছে সেই বিজ্ঞানও এখন বলছে আকাশের সীমা আছে, কিন্তু আত্মা অসীম। যেটা আমরা ভাবতে পারছি সেটাতেও আত্মা আছেন আর যা আমরা ভাবতে পারছি না সেটাতেও আত্মা আছেন। আত্মা নিত্য এবং জ্ঞানময়। আত্মার

ব্যাপারে কোন কিছুই বলা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো বলা যায়। কারুর ব্যাপারে কিছু বলার সময় আমরা বিশেষণ ব্যবহার করি। যেটা বিশেষ্য রূপে চলে সেটাও আসলে বিশেষণ রূপে চলে যায়। বিশেষণ মানেই যেটা আছে তার বিপরীতও হতে পারে। ব্যাকারণে পুরুষ জাতিবাচক সংজ্ঞা, কিন্তু আসলে বিশেষণ। আর যদি জাতির দিক থেকে বলা হয় তাহলে দুটো জাতি হয়ে যায়, স্ত্রী বা নপুংসক। যে জিনিসটাকে বলছি আছে, তার বিপরীতও থাকতে হবে। আত্মার ব্যাপারে যদি কিছু বলা হয় তাহলে তার বিপরীতটাও সত্য হবে। কারণ যে কোন জিনিস যখন বিশেষণ রূপে আসে তখন তার বিপরীতটাও হয়। যদি বলা হয় আত্মা নিত্য তাহলে আত্মা অনিত্যও হতে পারে, আত্মা তাহলে কখন নিত্য আবার কখন অনিত্য হয়ে যাবে। তাহলে তো নিত্যের সংজ্ঞাই পাল্টে যাবে। আবার বলছেন আত্মা সর্বগতঃ, আত্মা সব জায়গায় আছেন, সর্বব্যাপী। ধুয়ো যেমন সমস্ত ঘরে ভরে যায় আবার ধুয়োকে বারও করে দেওয়া হয়। আত্মা কখন সর্বগতঃ হবেন আবার কখন অসর্বগতঃ হয়ে যাবেন। এটা একটা বিরাট বড় সমস্যা আছে। ভগবানকে আমরা বলছি তিনি দয়াময়। যিনি দয়াময় হতে পারেন তিনি আবার অদয়াময়ও হতে পারেন। ভগবান ন্যায় প্রিয়, ভগবান তাহলে মাঝে মাঝে অন্যায়ও করতে পারেন।

যে কোন দ্বৈত ধর্মে এই সমস্যা হয়। ঈশ্বরের নামে, আত্মার নামে যখনই কোন বিশেষণ নিয়ে আসা হবে তখন স্বাভাবিক ভাবে তার বিপরীতেরও সম্ভবনা এসে যাবে। কারণ গুণ মানেই গুণের অভাব। যেমন যদি বলি লাল গোলাপ, তাহলে এমন গোলাপও হতে পারে যেটা লাল নয়। গোলাপ লালও হতে পারে সাদাও হতে পারে। একজনের ভগবান ন্যায়প্রিয় হতে পারেন আরেকজনের ভগবান ন্যায়প্রিয় নাও হতে পারেন। এই জায়গাতেই আচার্য শঙ্কর আক্রমণ করলেন। রামানুজাদি আচার্যরা পরে পরে ঈশ্বরের ব্যাপারে অনেক গুণ নিয়ে এসেছেন, তিনি সত্যময়, তিনি জ্ঞানময়। তিনি যদি জ্ঞানময় হতে পারেন কিছুক্ষণ পরে তিনি জ্ঞানময় নাও থাকতে পারেন। সেইজন্য আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করে বললেন, ওনার একটাই আছে, সেটা হল তিনি আছেন, অস্তি মাত্রম্। অস্তি মাত্রমও এটাকে বোধে বোধ করা হয়, এই অস্তি বা আছে মানে এই গ্লাশ আছে, টেবিল আছে ঐ অর্থে নয়।

মানুষ সেটাকেই ভালোবাসে যেটার বোধ তার আছে। আর মানুষ ঐ জিনিসটাকেই বোধ করে যেটা আছে। সত্তামাত্রমকেই মানুষ বোধ করে আর যেটাকে বোধ করে সেটাকেই মানুষ ভালোবাসে। যে কোন বস্তুর দুটি সত্তা, একটা বস্তু আর আছে। যেমন এই গ্লাশ, গ্লাশ আর গ্লাশ আছে। গ্লাশের নাশ হয়ে গেলেও অস্তি বোধটা কখনই যায় না। এই যে অস্তি বোধ, সত্তা বোধ এটাই সেই শুদ্ধ সত্তা। সত্তামাত্রম্ শব্দ এটা বোঝানর জন্যই আনা হয়, যেভাবে এই গ্লাশ আছে সেইভাবে ভগবান আছেন তা নয়, তিনিই আছেন। তিনি আছেন বলেই তিনি বোধ হন, আর যেটাই বোধ হয় সেটাকেই আমরা ভালোবাসি। যেটাই সৎ সেটাই চিৎ, যেটাই চিৎ সেটাই আনন্দ, যেটাই আনন্দ সেটাই সৎ। সেইজন্য যখন সচ্চিদানন্দ বলা হয় তখন সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাঁর বিশেষণ নয়, এটাই তাঁর স্বরূপ। সংসারে যেমন দয়া আছে আবার দয়ার অভাবও আছে, কিন্তু ঈশ্বরে সেই রকম হয় না, কারণ তিনি এই গুণের পারে। শেষ কথা ঐ একটাই, সত্তামাত্রম্। যিনি আছেন তাঁকে বোধ করা হয়, যাঁকে বোধ করা হয় তিনি আনন্দস্বরূপ, যেটাকে আমরা জানি সেটাকেই আমরা ভালোবাসি, যেটাকে ভালোবাসি সেটাকেই আমরা জানি আর যেটাকে আমরা জানি সেটাই আছে, যেটা আছে সেটাকেই জানি। যেটা আমরা কল্পনা করি সেখানেও সত্তামাত্রম্ আছে, সেখানেও এই বোধ আছে যে ওটা আছে আর এই জিনিসটা থাকে। এরপর বাকি যা কিছু গীতাতে বা অধ্যাত্ম রামায়ণে বা অন্যান্য শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে, ওই কঠিন জিনিসটাকেই খুব সহজ ভাষায় বলছেন। সত্তামাত্রম্ বললে তিনিই আছেন, তিনি আনন্দস্বরূপ, তাঁর সাথে কারুর তুলনা হবে না, তাঁকে মাপা যাবে না, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যাবে না, এই ধরণের নানান রকম ভাষায় বলছেন। শ্রীরামচন্দ্রও সেই রকম বলছেন, তুমি মনে করো না যে, বালীর যে জীব এটা পুরুষ আর তোমার ভেতরে যে জীব সেটা নারী, *ন স্ত্রী পুমান্ বা ষণ্ডো*। জীব পুরুষও নন নারীও নন। তাহলে তিনি কি ক্লীব লিঙ্গ বাচক কিছু? মুর্তি গড়ার সময় যে কাঠামো তৈরী করা হয় তখন সেটা স্ত্রী না পুরুষ কিছুই বোঝা যায় না। জীব কি ঐ রকম নপুংসক কিছু? জীব পুরুষও নয়, নারীও নয় আবার নপুংসকও নয়। জীব *সর্বগতঃ, অব্যয়ঃ, একঃ,* অদ্বিতীয়, আকাশবৎ নির্লেপ। আর জীব নিত্য, শুদ্ধ ও জ্ঞানময়, জীবের মধ্যে কখন কোন অশুদ্ধি আসে না। যত মেঘ হোক, যত ধুয়ো হোক, ধুলো হোক আকাশ আকাশই থাকে। আকাশ আছে বলেই ধুয়ো হয়, ধুলো হয়। এর জন্য আকাশ কখনই মলিন হয় না। আকাশকে ধোঁয়াশে দেখাতে পারে কিন্তু তাতে আকাশের গুণের কোন পরিবর্তন হবে না। যদি তুমি জীবাত্মাকেই মানো তাহলে তুমি কিসের জন্য শোক করবে। আর যদি তুমি মনে কর আমার স্বামী বালী হল এই শরীর, সেই শরীর

তো তোমার সামনেই পড়ে আছে। সেটার জন্য শোক করা কেন? শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে আশেপাশে যারা আছে এমনিই তাঁর প্রভাবে তাদের সবার মানসিক স্তর একটা উচ্চ ভাবে উঠে যাবে। অধ্যক্ষ মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের সবারই ভেতরে একটা ভক্তি ভাব এমনিই জেগে উঠবে। যেখানেই একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব উপস্থিত থাকেন, তা তিনি যে কোন ক্ষেত্রেরই হন না কেন, আশেপাশের লোকেদের ভেতরে তাঁর ভাবগুলো জেগে উঠবে। শ্রীরামচন্দ্র অবতার, তাঁর সামনে যারা আছে তাদের ভেতরও চৈতন্য যেন কিছুক্ষণের জন্য জেগে উঠেছে। জেগে ওঠার পর শ্রীরামচন্দ্র তারাকে এবার তোলার চেষ্টা করছেন। তারা এখনও সেইভাবে প্রস্তুত নয়, শ্রীরামচন্দ্রের কথা শুনে সে প্রশ্ন করছে –

দেহোচিৎকাষ্ঠবদ্রাম জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ।
সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্যাদ্রাম মে বদ।৪/৩/১৭

হে রাম! দেহ তো কাষ্ঠের মত কিন্তু আপনি বলছেন জীব চৈতন্য স্বরূপ, তাহলে এই সুখ-দুঃখ কার হয়, কিসের নিমিত্তে হয়? তারার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামচন্দ্র তখন সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। শুদ্ধ আত্মা যখন এই শরীরকে আশ্রয় করেন তখন অবিদ্যাজনিত তাঁর মধ্যে আমি ও আমার এই বোধ এসে যায়। আমি ও আমার বোধ এসে যাওয়ার জন্যই তাঁর সুখ-দুঃখের সম্পর্ক হয়ে যায়, আর সেখান থেকে তাঁর সংসারের সাথে সম্পর্ক হয়ে যায়। দেহ হল জড়, যা কিছু হচ্ছে সব দেহের উপরই হয়। কিন্তু দেহের ভেতরে যিনি চৈতন্য আছেন, যিনি বোধ করতে পারেন, তিনি কোন কারণে ভুলবশতঃ দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম বোধ করেন। সেইজন্য দেহের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ মনে করেন। উপমাতে আমরা বলি, সিনেমায় হিরো হিরোইনের খারাপ কিছু হচ্ছে তার জন্য আমারও চোখের জল বেরোচ্ছে, হাসির কিছু হচ্ছে তখন আমার মুখেও হাসি ফুটে উঠছে। এই দেহ ও মনের সাথে বাস্তবিক কোন সম্পর্কই হয় না। বাস্তবিক সম্পর্ক হওয়ার জন্য অনেকগুলো শর্ত আছে, সমান ধর্মী যদি হয়, সমান জাতি যদি হয়। কিন্তু আত্মার সাথে শরীর ও মনের কোথাও কোন মিল নেই। কিন্তু মায়া এমনই জিনিস, যদিও এদের সাথে আত্মার কোন মিল নেই, তবুও শরীর ও মনের সাথে আত্মা একেবারে একাত্ম হয়ে আছে। কেন আত্মা শরীর মনের সাথে জুড়ে যায় এর ব্যাখ্যা করা যায় না। এটা একটা statement of fact, যেটা আমরা দেখছি ঐটাকে শুধু বলা যায়, এই রকম হয়েছে। কেন হয়েছে তার উত্তর কোন দিন পাওয়া যাবে না। কিন্তু শরীর মনের সম্পর্ক থেকে আত্মার বেরিয়ে আসার উপায় আছে, যখন জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায় তখন আত্মা এগুলো থেকে বেরিয়ে আসে। যতক্ষণ না জ্ঞান হয় ততক্ষণ মায়ার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, এই এক বোধ আর এক বোধের যা ফল দুটোই মিথ্যা। এক বোধটাও মিথ্যা আর ওর ফলাফলটাও মিথ্যা। জল আর মাটি দুটোই পদার্থ, দুটোকে মিশিয়ে দিলে কাদা হয়ে যায়। সেই কাদা থেকে অনেক রকম পাত্র তৈরী করা যাবে। সেই পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে রঙচঙ লাগিয়ে দেওয়ার পর মাটিকে চেনাই যাবে না। কিন্তু শেষে সেই মাটি আর জলই আছে, কিন্তু কোথাও পঞ্চভূতের স্তরে গিয়ে দুটো এক। আত্মা আর জীব কোন মতেই মাটি ও জলের মত নয়। এসব কথা আমরা মুখে বলছি ঠিকই, কানেও শুনছি ঠিকই কিন্তু এগুলো ধারণা করা অত্যন্ত কঠিন, ধারণা হতেই চায় না। জপ, ধ্যান, তপস্যা যদি না থাকে ঠিক ঠিক ধারণা কখনই হবে না। আরও বাজে হল নিজের সমস্যা হলে আমরা কখনই নিজের উপর লাগাই না, কিন্তু অপরের সমস্যা হলে দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা, তুমি আত্মা তোমার কিসের কষ্ট, অপরকে আমরা এসব উপদেশ দিই। যত শাস্ত্র আছে সব অপরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য, নিজের উপর কখনই লাগাতে নেই। তবে যাঁদের খুব তপস্যা আছে, প্রচুর স্বাধ্যায় করেন ওনারা নিজেদের উপরও লাগান। উত্তরকাশীতে একজন খুব নামকরা ঘোর বেদান্তী সাধু ছিলেন। বয়স হয়ে গিয়েছিল, চলাফেরা করতে পারতেন না। কিন্তু দু-চারজন শিষ্যের কাঁধে ভর দিয়ে হ্যাঁচড়ে হ্যাঁচড়ে রোজ গঙ্গা দর্শন করতে আসতেন। একজন সাধু রোজ দেখতেন কত কষ্ট করে মহারাজ গঙ্গা দর্শন করতে আসছেন। একদিন তিনি সাধুজীকে বলেই ফেললেন, আপনার বয়স হয়ে গেছে, হাঁটতে পারেন না, কেন আর কষ্ট করে রোজ গঙ্গা দর্শন করতে আসেন। সাধুজী শুনে খুব রেগে গেলেন। আমি একদিকে বলছি এই সংসার মিথ্যা, এই দেহ মিথ্যা আর এই দু পয়সা দেহের জন্য আমি আমার মাকে দর্শন করা ছেড়ে দেব! সেই সাধুটি পরে তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলতেন, এই ঘটনা আমার চোখ খুলে দিয়েছে। একদিকে বলছেন দেহ মিথ্যা, আর যে জিনিসটাকে আপনি ভালোবাসেন সেটাকে আপনি দেখতে যাবেন না! মঠের অনেক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীরাও হাটাচলা করতে পারেন না, কিন্তু সেবকের সাহায্যে দু বেলা মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম করছেন, আরতিতে যাচ্ছেন। একদিকে বলছেন দেহ

মিথ্যা, সেই দেহ এখন কাজ করতে পারছে না, তার জন্য আপনি সেবা আদি সবই ঠিক রাখছেন আর ঠাকুর মন্দিরে যাওয়ার সময় আপনি ভাববেন আমার শরীর চলছে না, এনারা এই জিনিসটাকে একেবারেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন না। সামান্যতম যে শক্তিটুকু অবশিষ্ট আছে, যে সময়টুকু হাতে আছে, সেটাকে কোথায় কাজে লাগাবেন? যেটা মানুষের প্রিয়তম। এটাই সব মানুষ করে। সারাদিন অফিসে কাজ করে বাড়ি এসেছে, রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া করে নিল, ক্লান্ত শরীর দিয়ে সে আর কিছু করতে পারছে না, পুরো বিধ্বস্ত, এবার বিছানা যাবে। তখন মানুষ কি করে? যেটা তার সবচেয়ে প্রিয় সেটাই সে করে। বিছানায় এসে টেলিভিশনটা একটু চালিয়ে দেবে, পাঁচ মিনিট টিভি দেখবে, সন্তান থাকলে গিয়ে তার মুখটা একটু দেখে নেবে, যাকে ভালোবাসে তার সাথে ফোনে দুটো কথা বলবে। তার মানে, যেখানে এত ক্লান্তি সেখানেও সে এগুলো করছে। ঠিক তেমনি বয়সের ভারে শরীর যখন ভেঙে পড়ার অবস্থায় চলে আসে, তখনও তার কাছে যেটা সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, যে জিনিসটাকে অবলম্বন করে সে তার শরীর মনকে ধরে আছে, শত কষ্ট হলেও সে সেটার দিকে যাবে। ঐটা দেখেই বোঝা যায় তার বাস্তবিক যে সত্তা সেটা কোথায়?

পরনিন্দা-পরচর্চা এত প্রিয় যে মুমূর্ষও অপরের নিন্দা শুনলে সোজা হয়ে বসে পড়ে, শুধু বসেই পড়ে না, তখন বলে এই ব্যাপারে আমারও দুটো কথা বলার আছে। পরনিন্দা করার সুযোগ পেলে মানুষের এনার্জি লেভেলটা বেড়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, কাক এত সেয়ান কিন্তু সকালে উঠেই অপরের নোংরা খেয়ে বেড়ায়। আমরাও তাই, গত জন্মে কাক ছিলাম, অপরের নোংরা খেতাম, এই জন্মে অপরের নোংরা কাণ্ডগুলো চর্চা করে বেড়াচ্ছি। আত্মার ব্যাপারে আমরা যা কিছু শুনছি এগুলো শোনা ভালো, প্রথমবার শুনছি, দ্বিতীয়বার শুনছি, শুনতে শুনতে একটা ধারণা হচ্ছে। আমাদের মন পাথরের মত নিরেট, স্টিমও কোন দাগ কাটতে পারবে না, ডায়মণ্ডের কাটার যদি চালানো হয় তাহলে একটু দাগ হবে। শাস্ত্রের কথাগুলো হল ডায়মণ্ড কাটার, এগুলো আমাদের মনকে কাটছে। বড় বড় পাথরকে প্রথমে ডায়মণ্ড কাটার দিয়ে কাটতে হয়, একটা দাগ, দুটো দাগ, তিনটে দাগ দেওয়া হল, এরপর ডিনামাইট দিয়ে পাথরটাকে ফাটাতে হয়। জ্ঞান হল ডিনামাইট। পাহাড়ে বড় বড় পাথরকে কাটতে হলে প্রথমে ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ড্রিল করে তার মধ্যে বড় বড় ডিনামাইট স্টিক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মন হল পাহাড়ের বড় বড় পাথরের মত, মনকে যদি কাজে লাগাতে হয় তাহলে এতে ডিনামাইট লাগিয়ে ফাটাতে হবে। না ফাটলে এই জিনিসগুলো কোন দিন পরিষ্কার হবে না, সত্যের রাজপথ তৈরী হবে না। প্রথমেই ডিনামাইট লাগানো যাবে না, তার আগে দরকার ড্রিলিং মেশিন দিয়ে ড্রিল করা। ডায়মণ্ড ছাড়া ড্রিলিং হবে না। খুব উচ্চমানের শাস্ত্র না হলে ড্রিলিং হবে না। ড্রিলিং হয়ে যাওয়ার পর এবার ডিনামাইট লাগাতে হবে, ডিনামাইট লাগানো মানে ধ্যানে ডুব দেওয়া। দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা গভীর ধ্যান যদি হয়, ধ্যান করতে করতে একটা সময় বুম্ করে সব ফেটে বেরিয়ে আসবে। শাস্ত্রের কথা শুধু শুনে গেলে কিছুই হবে না, শুনতে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু কাজে না লাগালে আর পাঁচটা এন্টারটেইনমেন্টের মত এগুলোও এক রকম এন্টারটেইনমেন্ট, এ ছাড়া কিছু না।

শ্রীরামচন্দ্র তারাকে বলছেন, এই যে অনাদি অবিদ্যা, অহঙ্কার যে জিনিসগুলো দিয়ে সংসার নির্মিত সেই সংসারটা পুরো নিরর্থক। অথচ রাগ আর দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত হয়ে মানুষ এই সংসারে আবদ্ধ। রাগ মানে অনুরাগ বা ভালোবাসা আর দ্বেষ মানে বিরক্ত হয়ে সরে আসা। সংসার মানেই রাগ আর দ্বেষ, কিছু জিনিসের প্রতি ছুটে যাচ্ছে আর কিছু জিনিসের থেকে পালিয়ে আসতে চাইছে, এটাই সংসার। অথচ এই সংসার পুরোপুরি নিরর্থক। অহঙ্কার মানে আমি বোধ, আমি বোধ জুড়ে যায় বলেই কাউকে আমরা ভালোবাসি আর কারুর থেকে আমরা দূরে থাকতে চাই। এরপর একুশ নম্বর শ্লোকে খুব সুন্দর কথা বলছেন –

মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে।
আত্মা মনঃসমানত্বমেত্য তদ্গতবন্ধভাক্।৪/৩/২১

এই ভাবটা আমাদের শাস্ত্রের অনেক জায়গাতেই পাওয়া যাবে। এই মনটাই সংসার, মনটাই বন্ধন, এর বাইরে আর কিছু নেই। আমরা যেটাকে সংসার বলছি, যেটাকে বন্ধন বলছি সবটাই আমাদের মনের ভেতরে। তারাকে শ্রীরামচন্দ্র বোঝাচ্ছেন, তুমি যে কথাগুলো বলছ, সবটাই মনের ভেতরে আছে, মনের বাইরে কিছু নেই। তোমার যে স্বামী, যাকে তুমি ভালোবাসতে, তোমার মনের জন্যই ভালোবাসতে আর স্বামীর জন্য যে শোক করছ সেটাও তোমার মনের জন্যই করছ। আমরা যাকে ভালোবাসি সেটাও মনের জন্য, যাকে অপছন্দ করি সেটাও

মনের জন্য, কাজ করছি সেটাও মনের জন্য। আমরা যে বন্ধনে পরে আছি মনে করছি সেটাও মনের জন্য আর এই বন্ধন থেকে যে মুক্তি হবে সেটাও মনের জন্য। অষ্টাবক্র গীতায় বলছেন, মনেতেই বদ্ধ আর মনেতেই মুক্ত, যা আছে সব মনের ভেতরেই আছে। এখানে বলছেন মনেতেই বন্ধন, মনেতেই সংসার। সংসার বলতে আমরা বাইরে যেটা দেখছি সেটাকে মনে করছি, কিন্তু তা নয়। যা কিছু আছে সব মনের মধ্যে আছে, মনের বাইরে কিছু নেই। আত্মা যখন মনের সঙ্গে জুড়ে যায় তখনই এই যত সুখ-দুঃখের সংসার শুরু হয়।

যেখানেই প্রাণ আছে অর্থাৎ যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া হয় সেখানেই জ্ঞান, এ্যমিবা থেকে শুরু করে পরমহংস পর্যন্ত সবাই প্রাণী, প্রাণন ক্রিয়া মানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া সেইখানেই জ্ঞান, কারণ জ্ঞান না হলে সে খেতে পারবে না, এটা আমার খাদ্য আর এটা আমার খাদ্য নয় সে বুঝতে পারবে না। যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া সেখানেই প্রাণী, প্রাণী মাত্রেরই জ্ঞান থাকবে, জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথমটাকে বলা হয় বৃত্তিজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টাকে বলে আত্মজ্ঞান। আত্মা যখন নিজেকে নিজের জ্ঞান করেন তখন সেটাকে আত্মজ্ঞান বলে। আত্মা যখন নিজেকেই মন দিয়ে দেখেন তখন সেটাকে বৃত্তিজ্ঞান বলে। কিন্তু আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে জগতকে যখন দেখছি তখন মন দিয়েই দেখি, এটাকেই বৃত্তিজ্ঞান বলা হয়। বৃত্তিজ্ঞান মানে, যখন পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের ভেতরে যা কিছু যাচ্ছে তখন তা মনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্য আমাদের জ্ঞান হচ্ছে, এই জ্ঞানকেই বলে বৃত্তিজ্ঞান। যখন মন দিয়ে না দেখে সরাসরি দেখছে তখন সেটাকে বলে আত্মজ্ঞান। মন দিয়ে দেখা মানেই বৃত্তিজ্ঞান, এটাকেই বলছেন সংসার, এটাকেই বন্ধন বলছেন, এখানেই রাগ-দ্বেষ, এখানেই সুখ-দুঃখ। আপনি আমি বললেই এটাকে ছাড়তে পারব না, এতদিনের অভ্যাস, আত্মা এতদিন মন দিয়ে যেটাকে দেখছেন সেটাকে আত্মা ছাড়তে চায় না। ছাড়তে চায় না বলেই যত দুঃখ-কষ্ট। স্ফটিকের কোন রঙ নেই, কিন্তু স্ফটিকের পাশে একটা লাল জবা রেখে দিলে স্ফটিককে লাল রঙের দেখাবে, নীল অপরাজিতা ফুল রেখে দিলে নীল রঙের দেখাবে। ঠিক তেমনি আগুনেরও কোন রঙ হয় না, কিন্তু এক এক ধরণের বড়ি ফেলে দিলে আগুনের এক একটা রঙ আসতে শুরু করবে। ইন্দ্রিয় আর মনের সাথে আত্মার যখন সঙ্গ হয় তখন তার সংসার রূপ হয়। তারার প্রশ্ন এটাই, কি করে সব কিছু হয়? বাস্তবিক যে কোন সম্পর্ক হচ্ছে তা নয়, পুরোটাই আরোপিত। আরোপ করার অর্থ হল, ওটা ওর স্বাভাবিক অবস্থা নয়। ওর কাছাকাছি এলেই জিনিসটা এমনিতেই ঐ রকম হয়ে যায়, সেইজন্য একমাত্র পথ হল এগুলো থেকে দূরে থাকা। কিন্তু ঠিক ঠিক বিচার করলে দেখবে, যা কিছু হচ্ছে সব মনেতেই হয়, মনের বাইরে কিছুই হয় না। সেইজন্য মন থেকে সরে গেলেই এগুলোও খসে পড়ে যায়।

সংসার কিভাবে চলে বলতে গিয়ে ব্যাখ্যা করে বলছেন, আত্মাই সব কিছু সৃষ্টি করছেন, মনের সৃষ্টিও আত্মাই করছেন। আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, যোগ সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মনকে ঠেলতে ঠেলতে যখন পেছনের দিকে যেতে থাকে, তখন দেখে যে কোন জিনিসের পেছনে রয়েছে তন্মাত্রা, ঐ তন্মাত্রার পেছনে রয়েছে অহঙ্কার, অহঙ্কারের পেছনে রয়েছে মহৎ, মহতেরও পেছনে প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতি আবার আত্মার সাথে অভিন্ন। বলছেন, আত্মাই প্রথমে মনের সৃষ্টি করছেন, মনের সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তাঁর রাগ আর দ্বেষের প্রতীতি হয়। রাগ আর দ্বেষের প্রতীতি হতেই সে নিজেই নানান রকমের জিনিস সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয়। এটাকে বলে জ্ঞানযোগ, মানুষ স্বপ্নে যেমন নানান রকমের জিনিসের সৃষ্টি করে, আমরা যখন কোন কিছুর কল্পনা করি তখন ঐ কাল্পনিক বস্তুর সাথে বাস্তবিক জগতের অনেক কিছুর মিল থাকবে, কিন্তু স্বপ্নের জগতে অনেক কিছু অমিল হয়ে যায়। স্বপ্নে মন যেমন অনেক কিছুকে সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি জাগ্রত অবস্থাতে এই স্থূল মনও অনেক কিছুকে সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যদি দেখা হয়, যেমন এই পেন দেখছি, কিন্তু পেনের সাথে আমার মমত্ব এক রকম আপনার মমত্ব অন্য রকম। এই যে সংসার এর সৃষ্টি কে করছে? জাগ্রত অবস্থার মন এই সৃষ্টি করে। জাগ্রত অবস্থায় এক রকম সংসারের সৃষ্টি হয়, স্বপ্নাবস্থায় আরেক রকম সংসারের সৃষ্টি হয় আর সুষুপ্তি অবস্থায় অন্য এক সংসারের সৃষ্টি হয়। এই তিনটের পারে, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তির পারে কোন সংসার নেই। বেদান্ত ঠিক এই জিনিসটাকে নিয়েই চলে। জগতে আমাদের সামনে যত বস্তু রয়েছে বস্তুকে নিয়ে, জগতকে নিয়ে বেদান্ত কখন আলোচনা করে না, বেদান্ত আলোচনা করে সংসারকে নিয়ে। সংসার বলতে বেদান্ত বলছে, আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া গুলো হচ্ছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। একজন সন্ন্যাসী রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথে একটা পাঁচশ টাকার নোটের বাণ্ডেল পড়ে আছে দেখলেন। এখন যত বড় নোটের বাণ্ডেলই থাকুক না কেন, হীরা, মুক্তা যাই পড়ে থাকুক সন্ন্যাসী দ্বিতীয়বার ঐ দিকে ঘুরে তাকাবেন না। সন্ন্যাসী ছাড়া আর যারই চোখ পড়বে সে কয়েকবার

তাকাবে, চিন্তা করবে তুলে নেব কিনা, হয়ত তুলেও নেবে, সংসার ধর্ম এভাবেই চলে। সন্ন্যাসীর একটা জায়গায় অনপেক্ষতার ভাব এসে গেছে, জিনিসটা দেখে সন্ন্যাসীর মনে এক রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, সাধারণ মানুষের মনে অন্য রকম প্রতিক্রিয়া হবে। এই প্রতিক্রিয়াটাই সংসার। এনারা বলছেন জাগ্রত অবস্থায় সংসারটা এক রকম, স্বপ্নাবস্থার সংসার আরেক রকম আর সুষুপ্তি অবস্থার সংসার আরেক রকমের। এই তিনটের বাইরে যে অবস্থা সেটাই আত্মার শুদ্ধ অবস্থা। মনের এক একটা অবস্থা দিয়ে এক এক রকমের সংসার সৃষ্টি করছেন। বাইরের বস্তুকে কখনই অস্বীকার করা হচ্ছে না, রাস্তায় টাকার পড়ে আছে, হ্যাঁ পড়ে আছে। কিন্তু ওখান দিয়ে একজন সন্ন্যাসী উপেক্ষার ভাব নিয়ে চলে যাচ্ছে, একজন সংসারী যেতে পারছে না। রাগ আর দ্বেষ এবং এই দুটোতেই উদাসীনতার ভাব এটাই হল সংসার। মনই এই সংসার রচনা করে। জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায়, তপস্যা করে মনকে যদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তখন এই মনই অন্য ভাবে চলবে। রাগ আর দ্বেষে প্রেরিত হয়ে মানুষ নানা রকমের কর্ম করেন। পঁচিশ নম্বর শ্লোকে তখন বলছেন –

শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গতয়সন্তৎসমানতঃ।
এবং কর্মবশাজ্জীবো প্রমত্যাভূতসংপ্লবম্।৪/৩/২৫
জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশঃ।৪/৩/২৭

মানুষ যত রকম কর্ম করে, সব কর্মই তিন প্রকার, শুক্ল, লোহিত আর কৃষ্ণ। শুক্ল মানে সাত্ত্বিক কর্ম, লোহিত মানে রাজসিক কর্ম আর কৃষ্ণ মানে তামসিক কর্ম। যে কর্ম মানুষকে জ্ঞান দেয়, সুখ দেয় সেই কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম, রজোগুণে মানুষ নিজের প্রভাব দেখাতে চায় আর তমোগুণে নিজের স্থিতি বজায় রাখে। এই তিন ধরণের কর্মানুসারে জীবের গতিও তিন প্রকার হয়। সাত্ত্বিক গুণের আধিক্য অনুযায়ী সাত্ত্বিক কর্ম করলে মানুষ স্বর্গলোকে যায়, অত্যন্ত অধম কর্ম করলে নিম্ন যোনিতে যায় আর মিশ্র কর্ম করলে বার বার তাকে জন্ম নিতে হয়। যখন প্রলয় হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মার যখন রাত হয় তখন সব জীব অনাদি অবিদ্যায় লীন হয়ে থাকে। মাকড়সা জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল, এবার সেই জালকে গুটিয়ে নিজের ভেতরে গিলে ফেলল। সৃষ্টির যখন সময় হয় তখন সব কিছু সেখান থেকে আবার বেরিয়ে চলে আসে। সৃষ্টির বীজের কথা বললে আমরা সব সময়ই ভাবি লাউ, কুমড়োর যেমন বীজ হয় সৃষ্টিরও সেই রকম বীজ হয়। কিন্তু জীবের বীজ ঐভাবে হয় না, জীবের যা সংস্কার সেটাই তার বীজ, সংস্কার বশতঃ জীবের আবার যোনি প্রাপ্তি হয়। প্রলয়ের সময় ঐ সংস্কারগুলোই ব্রহ্মার সাথে লীন হয়ে থাকে। সৃষ্টির সময় হয়ে গেলে সব বেরিয়ে আসবে, না বেরোতে চাইলেও তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, আবার সেই একই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। *ঘটীযন্ত্রমিবাবশঃ*, ঘড়ির কাঁটা যেমন ঘুরতেই থাকে তেমনি সব জীব অবশ ভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্যে চলতেই থাকে। কেউ বেরিয়ে আসতে চাইলেও ওর থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। পরের চারটি শ্লোকে সৃষ্টি জিনিসটা কি এবং সৃষ্টি থেকে মুক্তির কি পথ বলছেন –

যদা পূণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্।
মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ।৪/৩/২৮

ঠাকুর কতবার সাধুসঙ্গের কথা বলছেন, শ্রীরামচন্দ্রও আবার সেই সাধুসঙ্গের কথাই বলছেন। মানুষ যা কিছু কর্ম করে কোন কর্মই নষ্ট হয়ে যায় না। আমাদের বেশির ভাগ কর্মই হয় মিশ্রিত কর্ম, মিশ্রিত মানে ভালো-মন্দ মিশিয়ে। আমরা জীবনে যে ফলগুলো পাই বেশির ভাগই মন্দ জিনিসেরই ফল পাই। মানুষ এত চেষ্টা করে যাতে দুঃখ না আসে, মন্দিরে যায়, জ্যোতিষিদের কাছে যায়, বাবাজীদের কাছে যায় কিন্তু দুঃখ শেষ হতেই চায় না। জীবনে একটার পর একটা ধাক্কা আসতেই থাকে। ধাক্কা আসছে, দুঃখ পাচ্ছে কারণ তার বাজে কর্মগুলো ফল দিচ্ছে। তাই বলে কি কারুর কোন পূণ্য কর্ম করা নেই? জগতে এমন কোন মানুষ নেই যার কোন পূণ্য কর্ম করা নেই। শ্রীরামচন্দ্র এটাই বলছেন, *যদা পূণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্*, যদি কেউ কোন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গ লাভের সুযোগ পায়, সাধুসঙ্গের যদি সুযোগ পায়, তখন বুঝতে হবে এবার তার পূণ্যফলের উদয় হয়েছে। পূণ্য উদয় হলে তখন পূণ্য অনেক রকমের ফলই দেয়, কিন্তু সবচেয়ে ভালো যে ফল দেয় সেটা হল সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ। খুব সাধারণ পূণ্যের উদয় হলে টাকা-পয়সা, সাম্রাজ্য, নাম-যশ এগুলো হয়। যখনই বুঝতে পারবেন আপনার পূণ্যের উদয় হয়েছে, যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে তখন আরও পূণ্য অর্জন করার চেষ্টা করতে হয়। এটাই শাস্ত্রের মত, এগুলোকে নিয়ে তর্ক করা যায় না, মানতে হলে মানবেন, না মানতে হলে মানবেন না।

এটাকে এই অর্থে না নিয়ে অন্য ভাবেও নেওয়া যেতে পারে, যদি দেখা যায় মনের মত কিছু ভালো হচ্ছে, যেমন প্রমোশন হয়েছে। প্রমোশন হওয়াটা মনের মত, তাহলে কোথাও তার পূণ্যের উদয় হয়েছে। তখন একটা জিনিসই করতে হয়, তা হল সাধনা আরও বেশি করে করতে হয়। কিছু দিন আগেও কিছু নেতাদের কিছুই ছিল না, কিন্তু দুম্ করে তারা রাজা হয়ে গেছে। কি করে হল? এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। হয় বলতে হবে সবই এলেমেলো ব্যাপার। তা নাহলে বলতে হবে ভগবানের মাথায় পাগলামো আছে, একে তাকে তিনি পক্ষপাত করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কর্মবাদ দিয়ে গেলে সব কিছুর সহজ সমাধান হয়ে যায়, আগে আগে ভালো কর্ম করা ছিল। যেমন একজন প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। তিনি অনেক খেটখুটে আজকে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। এবার দেখতে হবে তিনি এখনও ঐ পথে কাজ করছেন কি করছেন না। যদি তাঁর মত কাজ করেন, যেটা একজন প্রধানমন্ত্রীর করা উচিত, তাহলে তিনি চিরদিন প্রধানমন্ত্রী থেকে যাবেন, কারণ ঐ পূণ্য তাঁকে ওখান পর্যন্ত নিয়ে চলে এসেছে। আর যদি না করেন, কদিন পরে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেবে। অনেক নেতা আছে যারা দশ পনের বছর আগে এমন ছিল যেন rising star, সব কিছু যেন অধিকার করে নেবে। কিন্তু আজকে তাঁদের আর খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না। পূণ্য উদয় হয়েছিল শীর্ষে উঠেছিল, পূণ্য শেষ আবার পতন হয়ে গেছে, *ক্ষীণে পূণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*। এখানে বুঝতে হবে, মনের মত ভালো যা কিছু হয় সেটা হয় পূণ্যের জন্য। আগে তাকে ঠিক করতে হবে মনের মত ভালো যা কিছু আসছে সেটা সে চাইছে কি চাইছে না। কারুর হাতে টাকা-পয়সা আসতে শুরু হয়েছে, বুঝতে হবে সে কোন পূণ্য করেছে। বলে, দান করলে টাকা-পয়সা আসে। যদি কেউ চায় টাকা-পয়সা আসুক তাহলে এখন সে দান করতে থাকুক, আরও টাকা-পয়সা আসবে। কিন্তু যদি মনে করে আমি এত কষ্ট করে আয় করেছি অপরকে কেন দিতে যাব! কিছু দিন পর দেখা যাবে ঐ টাকা-পয়সাটাও চলে গেছে। ঠাকুরও বলছেন, পূর্ব জন্মে কিছু দানটান করা থাকলে এই জন্মে ঐশ্বর্য হয়।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বলছেন, *যদা পূণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্*, খুব বিশেষ পূণ্য যখন হয় তখন সৎ পুরুষের সঙ্গ হয়, তা নাহলে হয় না। অনেক জন্ম ধরে ভালো ভালো কিছু পূণ্য কর্ম করা হয়েছে, সব পূণ্য ফল একত্র হলে তবেই সৎ পুরুষের সঙ্গ লাভ হয়। একজন সংসার ধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, তাঁর একটা কোন পূণ্য ছিল যেটার জন্য তিনি সাধু হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসীর পূণ্যের কোটা তো ওখানেই শেষ হয়ে গেল। এবার তাঁকে সন্ন্যাস ধর্মে জোর লাগাতে হবে, নইলে সন্ন্যাস জীবনকে ধরে রাখতে পারবেন না। ছোটবেলা থেকেই যাদের ত্যাগের ভাব, অন্য কোন কিছুর দিকে তাকায় না, শুধু জপ ধ্যানই করে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা অতি সাধারণ, তাদের কিছু পূণ্য ছিল, সেই পূণ্যে কিছু সাধুসঙ্গ হয়ে গেল, ঠাকুরের কাছে এসে পড়েছে, এবার তুমি দু হাত দিয়ে ঠাকুরকে ধর। না ধরলে সাধারণ কর্মগুলো ফল দিতে শুরু করে দেবে। কদিন পরেই নারীর দিকে মন যাবে, টাকা-পয়সা, নামযশের দিকে মন যাবে, ভোগের দিকে মন যাবে। তারপরে আস্তে আস্তে সাধু জীবন থেকে তুমি সরে যাবে। কিছু পূণ্য ছিল সেই পূণ্যের জোরে সাধু হয়েছিলে, পূণ্য শেষ হয়ে গেল সাধুত্ব থেকে বেরিয়ে গেলে। সেইজন্য যেমনি কোন পূণ্য ফল দিতে শুরু করে তখন সেটাকে আঁকড়ে ধরতে হয়, আমি এটাই চাই। ঠাকুরও বলছেন সময় হয়ে গেলে গুরুও এসে যান। কারণ তাঁর পূণ্যই তাঁকে ওখানে নিয়ে চলে যাবে। এরপর তাঁকেই ঠিক করতে হবে আমি এটা চাই কি চাই না। যদি চান জোর কদমে আরও চেষ্টা করে যেতে হবে। যদি না চান তাহলে পূণ্য শেষ হয়ে গেলে যে কে সেই।

আর বলছেন, *মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাং তদা মদ্বিষয়া মতিঃ*, যাঁরা শান্তচিত্ত মহাত্মা আর আমার একান্ত ভক্ত তাঁদের সঙ্গ লাভ হবে, যাঁর কাছে গেলেই তোমার মন একেবারে শান্ত হয়ে যাবে। আর তখনই আমার দিকে তোমার মন যাবে। প্রথম ধাপ হল বিশেষ পূণ্যফলের উদয়, দ্বিতীয় ধাপ সাধুসঙ্গ, তৃতীয় ঈশ্বরে মতি। ঠাকুর অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব ভালোবাসতেন। ঠাকুরও এই ধরণের কথা অনেক জায়গায় বলছেন, তবে ঠাকুর এখান থেকে উল্লেখ না করে নিজের মত করে বলছেন। যখন আমার দিকে মন যায় তখন কি হয়?

মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ।
ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে।৪/৩/২৯
তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্ষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্স্থিতম্।৪/৩/৩০

চতুর্থ ধাপে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণে আগ্রহ জাগে, তখন সে কথামৃত পড়বে, গীতা পড়বে, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শ্রবণ মননে রুচি জাগে। ঈশরীয় কথা শুনে যাচ্ছে, শুনতে শুনতে তার স্বরূপ জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়ে যায়। পঞ্চম ধাপে স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তি। তখন বিশ্বাস হয় যে জিনিসটা এই রকমই। ষষ্ঠ ধাপে বলছেন তখন গুরুর কৃপায় মহাবাক্যের অর্থ স্পষ্ট হয়। পঞ্চম ধাপে স্বরূপ জ্ঞান আর শেষে হয় জ্ঞান। কিসের জ্ঞান হয়? গুরু হয়ত একটা মন্ত্র দিয়ে বলে দিলেন এই মন্ত্রে সাধনা করে যাও, মনে করা যাক শিষ্য অহং ব্রহ্মাস্মি এই মন্ত্র নিয়ে সাধনা করছে, শেষ ধাপে এই মন্ত্রের অর্থ স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেউ হয়ত ওঁ নমঃ শিবায় এই মন্ত্রে সাধনা করছিল, তখন শিবের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান তার স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন স্পষ্ট দেখে আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, অহঙ্কার এগুলো থেকে আলাদা। এখানে শ্রীরামচন্দ্র শোকসন্তপ্ত তারাকে বোঝাচ্ছেন। প্রথমে বললেন সৃষ্টি কিভাবে হয়, তারপরে বলছেন সৃষ্টিতে চলতে চলতে মানুষ কিভাবে কষ্ট পায়, ঐ কষ্ট পেতে পেতে কিভাবে কিভাবে তার যে পূণ্য সঞ্চিত হয়েছে সেই পূণ্য উদয়ের ফলে সে আস্তে করে উপরের দিকে উঠে আসে। উঠে আসার পর তার স্বরূপ জ্ঞান হয় আর স্বরূপ জ্ঞান থেকে তার জ্ঞান প্রাপ্তি হয়ে যায়। এতক্ষণ তার বৃত্তি জ্ঞান চলছিল, বৃত্তিজ্ঞান দিয়ে সে দেহান্দ্রির দ্বারা সংসারকে জানছিল, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্তি হতেই সে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

শ্রীরামচন্দ্র তারাকে বলছেন, আমি তোমাকে যেটা বাস্তবিক সত্য সেটা বললাম। যে এটাকে সব সময় মনন করবে তাকে কখনই সাংসারিক দুঃখ স্পর্শ করবে না। কোন জিনিসটাকে শ্রীরামচন্দ্র মনন করতে বলছেন? পূণ্য উদয়ের হেতু সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গের জন্য ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থেকে ঈশ্বরীয় কথায় শ্রদ্ধার উদয় হওয়া। ঈশ্বরীয় কথার প্রতি ভালোবাসা মানে, অনেকেই দীক্ষা নিয়েছেন, ঠাকুরের প্রতি অনেকেরই ভক্তি আছে কিন্তু তাই বলে তাঁর ঈশ্বরীয় কথাতেও যে শ্রদ্ধা এসে গেছে তা নয়। এদের দীক্ষা হয়েছে, সাধুসঙ্গও হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরের কথার প্রতি ভক্তি আসেনি। ঈশ্বরীয় কথাতেও যাঁর শ্রদ্ধা এসে গেছে আর অনেক দিন ধরে ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করে যাচ্ছে এর পরের ধাপ হল স্বরূপ জ্ঞান। তত্ত্বগত যে জ্ঞান সেটাতে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে। ঠাকুর বলছেন, স্ত্রী-পুত্রের জন্য মানুষ ঘটি ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কজন কাঁদে? এগুলো খুব উঁচু কথা, আমরা এখানে অনেক সাধারণ স্তরে আছি। ঈশ্বরীয় কথা যে শুনবে সেটাই ইচ্ছে হয় না। সেখান থেকে পরের ধাপ হল চিন্তন। তারপরের ধাপে বলছেন, *আচার্য্যপ্রসাদেন*, গুরুর কৃপাতে তখন ঐ তত্ত্বজ্ঞানের উপলব্ধি হয়ে যায়। ক্রীস্টাল তৈরী করার সময় ফুটন্ত জলে অনেক ক্রীস্টাল দিয়ে যাচ্ছে, দিতে দিতে যে সুপার স্যাচুরেটেড অবস্থায় চলে গেল তখন একটা ক্রীস্টাল দিতেই পুরো স্ফটিক তৈরী হয়ে যায়। এই উপলব্ধি সব সময় তাঁর কৃপাতেই হয়, ঘোর বেদান্তীরাও এটাকে মেনে চলেন। আমাদের চেষ্টা সব সময় চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু আসল যে উপলব্ধি হবে সেটা তাঁর কৃপা ছাড়া হবে না। বেশির ভাগ লোকের এসব কথা শোনারই সুযোগ হয় না, কারণ তাদের সাধুসঙ্গ হয়নি। সাধুসঙ্গ হয়েছে কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি নেই, ঈশ্বরে ভক্তি আছে কিন্তু শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নেই, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা আছে কিন্তু জপ-ধ্যান নেই যেখানে স্বরূপ জ্ঞানটা আসবে। স্বরূপ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর আর আমাদের কিছু করার নেই, এরপর যা করার তিনিই করবেন।

হে তারা! তোমাকে বলছি, তুমি আগের আগের জন্মে আমাকে ভক্তি করেছিলে, সেইজন্য এই জন্মে প্রারব্ধবশাৎ আমার সঙ্গ হয়ে গেল, তুমি এবার যাও, গিয়ে রাতদিন এই কথাগুলো চিন্তন করবে আর তখন তুমি যে কর্মই করো না কেন কোন কর্মতেই তোমাকে আর লিপ্ত হতে হবে না, লিপ্ত না হওয়াতে বন্ধনেও পড়বে না। এইসব কথা বলে শ্রীরামচন্দ্র তারাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। এদিকে তারার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের এইসব অমূল্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা শুনে সুগ্রীবেরও অজ্ঞান চলে গেছে। শ্রীরামচন্দ্র তাড়াতাড়ি সুগ্রীবকে বলছেন, অঙ্গদকে সাথে নিয়ে তুমি বালীর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মাদি করিয়ে দাও। সুগ্রীব তখন শ্রীরামচন্দ্রকেও সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন বললেন, পিতার আদেশে আমি কোন নগরীতে প্রবেশ করতে পারি না, তুমি যাও, এবার কিষ্কিন্ধ্যাতে গিয়ে তুমি রাজ্য কর। সুগ্রীব নিজের রাজ্য ফেরত পেয়ে গেল। সুগ্রীব এখন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। বন্ধু বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞ। এবার শ্রীরামচন্দ্রের কাজ করে দিতে হবে, সীতার অনুসন্ধান করতে হবে। সুগ্রীব বলছেন, এখন বর্ষাকাল, চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ, এক্ষুণি তাই কিছু করা যাবে না। কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। কিষ্কিন্ধ্যায় সুগ্রীব ফিরে গেছেন আর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সাথে আছেন। কয়েকটি মাস শ্রীরামচন্দ্রকে অপেক্ষায় থাকতে হবে। যে কোন লোকের পক্ষে অপেক্ষার সময়টা খুবই কষ্টকর, বিশেষ করে সময় কাটানো।

<u>লক্ষ্মণকে শ্রীরামচন্দ্রের ক্রিয়াযোগের উপদেশ</u>

লক্ষ্মণ এখন মাঝে মাঝে শ্রীরামচন্দ্রকে কিছু প্রশ্ন করছেন আর শ্রীরাম সেই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই অংশের এনারা নাম দিয়েছেন ক্রিয়াযোগ। ক্রিয়াযোগ মানে বাহ্যিক পূজা কিভাবে করা হয়। বেদে পূজা করার ব্যাপারে অনেক রকম বিধির কথা বলা হয়েছে। বেদে পূজা মানে যজ্ঞ, বৈদিক যুগে মানুষ কিভাবে হোম আদি করতেন তারই বর্ণনা বেদে করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তি কালে পূজা আদি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়ার পর সবাই পূজাতে মোটামুটি দুটো পদ্ধতি অনুসরণ করত, একটা তন্ত্র পদ্ধতি এবং আরেকটি পুরাণ পদ্ধতি। বর্তমান কালে গৃহস্থ বাড়িতে যে পূজাদি হয় তাতে কিছুটা তন্ত্র আর কিছুটা পুরাণ পদ্ধতি অনুসারেই করা হয়। পরের দিকে তন্ত্রেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান কালে পূজা বলতে আমরা যেটা বুঝি তাতে সব কিছু মিশে আছে। হোম নেওয়া হয়েছে বেদ থেকে, মুর্তি পূজার প্রথা এসেছে পুরাণ থেকে আর পূজার যে বিধি সমূহ তার বেশির ভাগ এসেছে তন্ত্র থেকে। বিশেষ করে পূজাতে যেসব মন্ত্রের ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই এসেছে তন্ত্র থেকে। আগেকার দিনে আমরা অগ্নির উপাসক ছিলাম, যাঁরই পূজা করবে সেখানে হোমকুণ্ড করে শুধু অগ্নির নামে আহুতি দেওয়া হত। বর্তমান কালে অগ্নিকে সেই দেবতার নামটাই দিয়ে দেওয়া হয়, যেমন দূর্গা নামে অগ্নি, রামকৃষ্ণ নামে অগ্নি নাম করে তাঁর নামে আহুতি দেওয়া হয়। প্রতিমা পূজা পুরোপুরি পৌরাণিক বিধি। আর মন্ত্র আদি যা কিছু নিয়ে আসা হয় তার পুরোটাই তন্ত্র বিধি। পরের দিকে তাই পূজা বিধির কোন central system হয়নি। একটা Central Authority যদি থাকে তাহলে সেখান থেকে একটা বিচার দিয়ে দেওয়া হয়। যেমন খ্রীশ্চানদের রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে পোপ যা বলবেন সেটাই সবাই মেনে নেয়। মুসলমানদের ঠিক সেই রকম উলেমা আছে, কোন দ্বন্দ্ব দেখা দিলে মৌলবীরা বিচার করে করে ফতোয়া দিয়ে বলে দেন জিনিসটা এভাবে হবে। হিন্দুদেরও ছিল, কাশীর পণ্ডিতরা যা বলতেন পুরো দেশ মোটামুটি সেটাই মানত। কিন্তু যখন একটা পরম্পরা বড় হয়ে গেল তখন তারা অতটা সব কিছু মানতেন না। অন্যান্য যে কোন ধর্মের তুলনায় হিন্দুদের যেটা বড় বৈশিষ্ট্য সেটা হল গ্রহণ করে নেওয়া। বিশেষ করে ব্যাসদেব, শঙ্করাচার্য আর স্বামীজী আসার পর হিন্দুদের সব কিছুকে যেভাবে একটা সূত্রে গ্রথিত করে দিলেন, সেখান থেকে হিন্দুদের কাছে সব কিছুই গ্রহণ করার অঙ্গীকার করে দিলেন। এটাই হিন্দুদের বড় বৈশিষ্ট্য। সেইজন্য পুরাণে যা কিছু বলছে, করছে সেগুলো যারা তন্ত্র মতে চলে তারাও নিয়ে নিলেন, তন্ত্র মতে যারা যা কিছু করছে সেটাও আবার পুরাণ মতের লোকেরা নিয়ে নিলেন। হিন্দুদের কোন কিছুতেই না করা হয় না। কোন আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় এক আদিবাসী দেবী আছেন তাঁকেও মায়ের রূপ দিয়ে দিচ্ছে। মাদুরাইতে মীনাক্ষী দেবীর মন্দির। বলা হয় যে ওখানকার যে মূল আদিবাসীরা ছিল তাদের দেবী হলেন মীনাক্ষী, মীনাক্ষী দেবী নাকি অত্যন্ত আসুরিক শক্তির দেবী ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের প্রভাব বিস্তার হওয়ার পর সেখানে তারা মীনাক্ষী দেবীকে মায়ের রূপ দিয়ে দিল। হিন্দুরা এটাই করে, যেখানে যা কিছু আছে সব নিয়ে নেওয়ার পর নিজেদের মত করে নেয়। হিন্দুদের কাছে যিনি পরম সত্তা তাঁকে যে কোন রূপে দেখা যেতে পারে। সেইজন্য হিন্দুরা কোন কিছুকেই অগ্রাহ্য করবে না। হিন্দু ছাড়া বাকি সব ধর্ম তাদের ধর্মের বাইরে অন্য কোন কিছু নেবে না। পুরাণে অনেক রকম পূজা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে একটা আলাদা রূপে পূজার ক্রিয়াদির ব্যাপারে বলা হচ্ছে। লক্ষ্মণ বলছেন –

ইদানিং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব।
ভবদারা ধর্মং লোকে যথা কুর্বন্তি যোগিনঃ।৪/৪/৮

যোগিরা কিভাবে ক্রিয়ামার্গের দ্বারা আপনার সাধনা করেন আপনার কাছে আমার শোনার খুব আগ্রহ হয়েছে। এখানে ক্রিয়ামার্গ মানে পূজা পদ্ধতি, বিধি। এগুলো আমাদের আলোচনার কিছু নেই, যাঁরা পূজাদি করেন তাঁরা জানেন কিভাবে পূজা পদ্ধতি চলে। বারো নম্বর শ্লোকে বলছেন –

স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
সকাশাৎসদ্‌গুরোর্মন্ত্রং লব্ধা মদ্ভক্তিসংযুতঃ।৪/৪/১২
তেন সন্দর্শিতবিধির্নামেবাধ্যয়েৎ সুধীঃ।
হৃদয়ে বানলে বার্চ্চেৎ প্রতিমাদৌ বিভাবসৌ।৪/৪/১৩

নিজের বাড়ির পরম্পরা গৃহ্যসূত্রানুসারে উপনয়নাদি সংস্কারাদির দ্বারা দ্বিজত্ব অর্জন করার পরই পূজার অধিকার পায়। গৃহ্যসূত্র বেদের, বেদের ঋষিরা, ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকেরা যাঁরা বেদকে সামলে রাখতেন, তাঁরা সামবেদ, যজুর্বেদ এগুলো নিলেন, তার সাথে সেই বেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এগুলোও নিলেন। এরপর তাঁদের যে বিভিন্ন শাখা ছিল যেখানে বেদাঙ্গ গুলো রীতিমত আলাদা হত, যেমন যাঁরা যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের কিছু কিছু বিধি থাকত, সেই বিধি কাশ্মীরের যজুর্বেদের ব্রাহ্মণদের এক রকম হত, কন্যাকুমারীর ব্রাহ্মণদের অন্য রকম হত। ঠিক তেমনি উচ্চারণেও কিছু কিছু পরিবর্তন হত। যার জন্য বেদ যদিও এক কিন্তু বেদাঙ্গ অনেক হয়ে গিয়েছিল। আর যে বিধিগুলো তাঁরা শিখতেন সেগুলোও আলাদা। ফলে দেখা গেল যাঁরাই দ্বিজ, যাঁরাই পূজা আদি করেন তাঁদের অনেক শাখা উপশাখা হয়ে গিয়েছিল। এনাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ম্যানুয়াল ছিল, যেখানে তাঁরা যে বিধিগুলো পালন করতেন সেটাকে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন, এটাকেই বলে গৃহ্যসূত্র, গৃহ থেকে গৃহ্যসূত্র এসেছে। এখনও বিভিন্ন পরিবারের পরম্পরাতে যে বিধিগুলো পালন করা হয় সেগুলো সব গৃহ্যসূত্র থেকে আসে। সেইজন্য বিবাহে বাংলার ব্রাহ্মণরা এক রকম বিধি অনুসরণ করে, গুজরাতে ব্রাহ্মণরা অন্য রকম করে। মূল জিনিসটা একই থাকবে কিন্তু গৃহ্যসূত্রে গিয়ে তফাৎ হয়ে যায়। বাঙ্গালীদের সবাই আবার এক রকম বিধি অনুসরণ করছে না, ভট্টচার্যীরা এক রকম করছে, চ্যাটার্জীরা আরেক রকম করছে, এর কারণ গৃহ্যসূত্রে তফাৎ। শুধু তফাতই হয় না, অন্য দিকে গৃহ্যসূত্রকে পাল্টানো যাবে না তা নয়, বেদের যেমন কোন কিছুতেই হাত দেওয়া যাবে না, গৃহ্যসূত্র সে রকম কিছু বিধি নেই। গৃহ্যসূত্রের তফাতের জন্যই পরে গৃহস্থদের বাড়িতে পূজা পদ্ধতিতে অনেক তফাৎ এসে গেছে। ইদানিং কালে ছাপা বই এসে যাওয়ার পর একটা জায়গাতে এসে সব বিধিগুলো স্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু একশ দেড়শ বছর আগে বিধিতে অনেক তফাৎ থাকত। আচার্য শঙ্কর এসে কিছু কিছু বিধি উপাচার ঠিক করে দিলেন, যেমন সবার আগে গুরুপূজা, তারপর গণেশের পূজা, তারপর পঞ্চ দেবতার পূজা ইত্যাদি বিধি করে দিলেন। এখন এই বিধিগুলোই মোটামুটি পালিত হয় কিন্তু গৃহস্থের বাড়িতে এসে সেই পরিবারের অনেক বিধি যোগ হয়ে যায়।

এখানে সংক্ষেপে বলছেন, গুরু যেমন বলে দেন সেইভাবে পূজা করবে, ধ্যান করবে। কোথায় করবে? হৃদয়ে করা যায় বা অগ্নিকে সামনে রেখেও করা যায়, প্রতিমাতে করা যায় আর কিছু না হলে শুধু সূর্যেও করা যায়। হৃদয়ে যে পূজা হয় তাকে মানস পূজা বলে। মানস পূজা পুরোপুরি প্রতিমাতে যেভাবে হয় ঠিক সেই ভাবেই করা হয়। তের নম্বর শ্লোকে হাল্কা একটা আভাস পাওয়া যায়, কিভাবে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি পাল্টে যাচ্ছে। আবার বলছেন, এর কোনটাই না করে শুধু শালগ্রাম শিলাতেও পূজা করা যেতে পারে। পুরাণ এই পুজো গুলোকে অনুমোদন করে দিচ্ছেন, পুরাণ যেটা অনুমোদন করে দিয়েছে সেটাই এখনও চলছে, ইদানিং পূজা আদি এভাবেই হয়। আবার বলছেন, পূজা করার আগে অঙ্গন্যাস করে দেহ শুদ্ধি করে নেবে, ন্যাস করার আগে মৃত্তিকাদি দিয়ে শরীরকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবে। আর তার সাথে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম করবে। এখানে পূজার কতগুলি বিধি বলে দিচ্ছেন, যদি শিলা হয় তাহলে তাকে স্নান করাতে হবে, প্রতিমা হলে একটু জল ছিটিয় বা মার্জন করে দেবে। পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ইত্যাদি দিয়ে পূজা করবে, প্রতিমার শৃঙ্গার করতে হবে। পর পর কি করতে হবে বলছেন প্রথমে জল, তারপর ধূপদীপ, তারপর নৈবেদ্য, তারপর আরতি। বিভিন্ন বাড়িতে গৃহ্যসূত্র অনুসারে তাদের পরম্পরা আলাদা। সব কিছু করার পর আমার পার্ষদবর্গকে বলি প্রদান করে হোম করবে। বলি মানে অর্পণ করা। এই বলি প্রথাই তন্ত্রের প্রভাবে এসে হয়ে গেল ছাগবলি। আর বলছেন, পূজা সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মৌন হয়ে আমার ধ্যান করবে আর আমাকে স্মরণ করবে এবং জপ করবে। যাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন, যাঁরা জপ করেন গুরু তাঁদের দীক্ষার সময় বলেই দেন বাড়িতে যদি ঠাকুরের পূজোর ব্যবস্থা থাকে তাহলে আগে বাহ্যিক পূজা করে পরে মানসিক পূজা করতে হবে। মানসিক পূজার পর জপ এবং জপের পর ধ্যান করতে হবে। উদ্দেশ্য হল ভক্তি লাভ করা, ভক্তি তো সবার ভেতর থাকে না, তখন এই উপাচার বিধি গুলোকে নিষ্ঠা নিয়ে করে যেতে হয়। উপাচারকে যদি না ধরে রাখা হয় তাহলে আস্তে আস্তে সবটাই হারিয়ে যাবে। পূজা উপাচার এগুলো করার একটাই উদ্দেশ্য নিজেকে ঈশ্বরীয় ভাবের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা। শুধু জপ-ধ্যান করার জন্য আমরা এখনও প্রস্তুত হইনি, এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, নিত্যপূজা, ফুল তোলা, ঠাকুরকে সাজানো, নৈবেদ্য দেওয়া, আরতি করা এগুলো দীর্ঘদিন করতে হয়, এটাই জপ-ধ্যানের প্রস্তুতি করিয়ে দেয়। আমাদের মন স্বাভাবিক ভাবেই বহির্মুখী, বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী না করা পর্যন্ত জপধ্যান করতেই পারবে না, মনকে অন্তর্মুখী করার একটাই প্রাথমিক পথ

তা হল এই ক্রিয়াযোগ। যাঁরা জপ-ধ্যান করেন তাঁদের এক ধরণের শক্তি হয় কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের ভক্তি নিষ্ঠা সহ পূজা অর্চনা করেন তাঁদের জীবনে আলাদা ধরণের একটা শক্তি আসে, যে শক্তিতে জীবনে যে দুঃখ-কষ্ট আসছে সেগুলোকে হজম করে নেওয়ার ক্ষমতাটা এসে যায়। ক্রিয়াযোগের কথা বলে আবার বলছেন, পূজা অর্চনাদি হয়ে যাওয়ার পর নৃত্য, গান, স্তুতি, পাঠাদির আয়োজন করতে হয়। এগুলোর বন্দোবস্থ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু অনেকের থাকে। শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরুগ্রন্থ সাহি, সাহি মানে সাহেব। সব ধর্মেই তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়। একমাত্র শিখ ধর্মে তাদের ধর্মগ্রন্থকে সাহেব বলে, ধর্মগ্রন্থকে শিখরা একজন ভদ্রলোকের মত দেখে। কেমন ভদ্রলোক? গুরু বা গুরুর উপরে। আমরা যেমন বলি গুরুতে ইষ্ট দেখবে, কিন্তু শিখদের কাছে তা নয়, ওদের কাছে ধর্মগ্রন্থটাই বাস্তবিক একজন জীবন্ত বিগ্রহ। শিখদের যাদের ক্ষমতা আছে তাদের বাড়িতে একটা আলদা ঘর থাকে, সেখানে গুরুগ্রন্থ সাহি রাখা হয়, তার জন্য আলাদা বিছানা, রাত্রে মশারি খাটানো থেকে শুরু করে সব ব্যবস্থা থাকে। ঘরে ঐ গ্রন্থই আছে আর কিছু নেই। যখন তখন যে কেউ ঐ ঘরে ঢুকতে পারবে না। গ্রন্থ পুরনো হয়ে গেলে রীতিমত সংস্কারাদি করে সম্মানের সাথে দাহ করা হয়। খ্রীশ্চান, মুসলমানদের কাছেও বাইবেল কোরান অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ, ঈশ্বরের কথা কোন সন্দেহ নেই কিন্তু শিখদের কাছে গুরুগ্রন্থ সাহি রীতিমত একজন সম্মানীয় ব্যক্তি রূপে পূজিত হন। গুরুগ্রন্থের সামনে ওরা কীর্তন করে। আমাদের কাছে প্রতিমা বা মূর্তি জীবন্ত রূপে পূজিত হন, নিছক মূর্তি বা প্রতিমা নন। শ্রীমা বলছেন তোমাদের ঠাকুর হাতপাওয়ালা ঠাকুর। এগুলোই ভাব, যখন মানুষ কোন একটা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার জীবনধারা অন্য রকম হতে শুরু হয়। ক্রিয়াযোগে সেটাই শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, প্রতিমার শৃঙ্গার করবে, নৈবেদ্য দেবে, তাঁর ধ্যান এভাবে হবে আর পারলে নিয়মিত গান, বাজনা, নৃত্য, পাঠের ব্যবস্থা করবে।

এত কিছু করতে বলার মধ্যে এনাদের বক্তব্য একটাই, জীবনে তুমি কি চাইছ? যীশুর একটা খুব সুন্দর কথা আছে, তিনি বলছেন এই জীবনটা একটা সেতু। উপনিষদ বলছেন, *অমৃতস্যৈষা সেতুঃ*, অমৃতত্ত্বে যাওয়ার জন্য এই জীবনটা একটা সেতু। এরপর বলছেন, সেতুর উপর কেউ বাড়ি নির্মাণ করে না। মানুষ সেতুর ওপারে নয়তো এপারে বাড়ি নির্মাণ করে। আমাদের জীবনের পেছনের দিকে এক অনন্ত সামনেও এক অনন্ত কিন্তু মাঝখানে সেতুটা খুব ছোট। হাওড়া শহর বিরাট কলকাতা শহরও বিরাট কিন্তু মাঝখানে হাওড়া ব্রীজটা খুব ছোট। হাওড়া ব্রীজে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না, এখান দিয়ে তুমি শুধু পেরিয়ে চলে যেতে পারবে। জীবনটাও এই রকম একটা হাওড়া ব্রীজ, হাওড়া ব্রীজে কেউ বাড়ি বানিয়ে বসবাস করতে পারবে না। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য আর আমরা এমনই মুর্খ যে ব্রীজের উপরেই আমরা বাড়ি বানিয়ে থাকছি। কিন্তু ব্রীজের উপর কাউকেই থাকতে দেওয়া হবে না। হাওড়া ব্রীজে তো গাড়ি পার্কিং করতেও দেবে না, গাড়ি চালিয়ে ব্রীজকে ক্রস করে যেতে পারবে। কিন্তু আমরা সবাই মুর্খের মত ব্রীজেই বাড়ি নির্মাণ করে থাকতে চাইছি। পুনর্জন্মের মাধ্যমে আমরা শুধু এই ব্রীজের উপর দিয়ে পারাপার করে যাচ্ছি। হাওড়া থেকে শিয়ালদহ যাচ্ছি আবার শিয়ালদহ থেকে হাওড়া আসছি। যে ব্রীজকে ধরে আমরা অমৃতত্ত্বের দিকে চলে যেতে পারি, যেখানে চলে গেলে আর আসা যাওয়া করতে হবে না, সেই ব্রীজের উপর দিয়ে আমরা শুধু এপার ওপার করে যাচ্ছি। যদি আমরা অমৃতত্ত্বের কথা নাও বুঝতে পারি কিন্তু এটা তো বুঝতে হবে যে ব্রীজের উপর মানুষ বাড়ি বানায় না। ব্রীজের উপর থেমে যেতে নেই, ব্রীজটা থামার জায়গা নয়। তাহলে কি করতে হবে? যখন এই ভাবগুলো ভেতরে আনা হবে, তখন জীবনের ব্যাপারে সচেতনতা আসবে, সচেতনতা আসা মানেই জীবনটা স্থিতিশীল হয়ে গেল। তা নাহলে পুলিশ টেনে তাকে ব্রীজ থেকে সরিয়ে দেবে, যমরাজও ধাক্কা মেরে আমাদের সরিয়ে দেবেন। যখন গভীর ভাবে এই পূজা অর্চনা করা শুরু হয় তখন ধীরে ধীরে এই চেতনাটা জাগতে শুরু করে, আমার ভেতরে এক চৈতন্য সত্তা আছেন এই বোধটা জাগতে শুরু করে। আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের পরা ভক্তি এল না, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের উদয় হল না, জ্ঞানের আকাঙ্খা জাগল না, তাতে কোন অসুবিধা নেই, এতে জীবনে ব্যক্তিত্বের একটা ওজন এসে যায়। আমাদের ব্যক্তিত্ব এখন বেলুনের মত, এই প্রশংসায় ফুলে গেল, সামান্য একটু নিন্দাতে চুপসে গেল। ক্রিয়াযোগ করলে বেলুনের মত জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা থেকে সে রেহাই পেয়ে যায়। রাস্থায় যেতে যেতে একটা মন্দির পড়ল, সেখানে গিয়ে একটা টাকা দিয়ে প্রণাম করল, খুব ভালো। কিন্তু পূজা উপাচারাদি যদি প্রাত্যহিক রুটিনে পর্যবসিত হয়ে যায় তখন দেখা যাবে ঐ রুটিনের সময় এলেই সব ইন্দ্রিয়গুলো গুটিয়ে আসবে। পূজা উপাচারের কথা ছেড়ে দিন, দৈনন্দিন যে নিত্য কাজগুলো আমাদের করতেই হয় সেখানেও কোন সময়ের ঠিক নেই, স্নানের কোন নির্দিষ্ট

সময় নেই, খাওয়ার কোন ঠিক সময় নেই, একদিন রাত এগারোটায় শুতে যাচ্ছে আরেকদিন রাত একটায় ঘুমোতে যাচ্ছে, এতে আমাদের মনের শক্তিটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়ে দুর্বল করে দেয়, নিষ্ঠাটাও থাকে না। বাহ্যিক পূজা, মানসিক পূজা যদি না থাকে জীবনের প্রতি নিষ্ঠা অনেক কমে যায়। আমরা যে বলি ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে এগুলো সব মুখের কথা, এসব কথার কোন দাম নেই। জীবনে একটা ধাক্কা এলে ছিটকে ফেলে দেবে। যদি খুব নিষ্ঠা নিয়ে আসতে হয় তাহলে খুব গভীর ভাবে প্রচুর ধ্যান করতে হয়। যাদের দ্বারা ধ্যান হয় না তারা জপ করবে, যারা নিষ্ঠার সাথে জপ করতে পারে না তাদের ক্রিয়াযোগ করতে হবে। এখানে যে ক্রিয়াযোগের কথা বলা হল এর বাইরে যাদের পরিবারের পরম্পরায় যেভাবে ক্রিয়াযোগ করতে বলা হয়েছে তারা সেই ভাবে করবে। আর যারা দীক্ষা নিয়েছে গুরু যেভাবে বলে দেন সেভাবেই করবে। এতক্ষণ এত ক্রিয়াযোগের কথা বললেন, কিন্তু ৪২ নম্বর শ্লোকে বলছেন –

পুনঃ প্রাকৃতবদ্রামো মায়ামালম্ব্য দুঃখিতঃ।
হা সীতেতি বদন্নেব নিদ্রাং লেভে কথঞ্চন।৪/৪/৪২

শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ লক্ষ্মণকে সর্বোত্তম ক্রিয়াযোগের কথা বললেন, বলার পরেই তিনি আবার নিজের মায়াকে অবলম্বন করে এক দুঃখী পুরুষের মত চোখে জল এনে 'হা সীতা' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। রাতের পর রাত শ্রীরামচন্দ্রের ঘুম হচ্ছে না। সাধারণ ভাবে ভক্তরা মানতে চায় না যে শ্রীরামচন্দ্রের সত্যিকারের দুঃখ হয়েছিল। মঠ মিশনের অধ্যক্ষের শরীর চলে গেলে ভক্তরাও মানতে চায় না, কাঁদতে কাঁদতে বলে, মহারাজের কিছুই হয়নি উনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন। ঠাকুর গলায় ক্যান্সার রোগ নিয়ে কত কষ্ট ভোগ করছেন, আর সব ভক্তরা বলছেন, ওসব কিছু না, সব তাঁর লীলা। একমাত্র স্বামীজী বারবার বলছেন, উনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। সাধারণ ভক্তরা মানতে চায় না। তখন যুক্তি দেবে, যদি ওনার দুঃখ বা কষ্ট হয় তার মানে মন মেঘাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন মন নিয়ে তিনি উপদেশ কি করে দিচ্ছেন আর এই ক্রিয়াযোগের কথা কি করে বলছেন? কিন্তু তা নয়, যিনি পরমহংস, যিনি অবতার তিনি দুটো ভুমিতেই বিচরণ করতে পারেন। সংসার ভূমিতে যখন থাকেন তখন সংসারের যা যা আছে সবটাই তার মধ্যেও থাকে আর আধ্যাত্মিক ভূমিতে যখন থাকেন তখন পুরোপুরি ঐ ভাব নিয়েই তিনি থাকেন। আধ্যাত্মিক ভাবের কথা বলছেন বলে যে তাঁর এই শরীরটা নেই তা নয়, সংসার পুরোপুরি তাঁকে গ্রাস করে নিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্রও এখন মায়াকে অবলম্বন করে চোখের জল ফেলছেন। যখন মানুষ বুঝে যায় আমি শেষ হয়ে গেছি, আমার আর কোন আশা নেই, তখন দুঃখটা অনেক কমে যায়। কিন্তু যতক্ষণ আশা থাকে ততক্ষণ দুঃখও থাকবে। দুঃখ যতক্ষণ আসেনি ততক্ষণ দুঃখটা অনেক বেশি হয়, দুঃখ এসে গেলে দুঃখ অনেক কমে যায়। যদি জানতেন সীতাকে মেরে ফেলা হয়েছে, তখনও শ্রীরামচন্দ্রের কষ্ট হবে কিন্তু এতটা কষ্ট হবে না। যাই হোক শ্রীরামচন্দ্র এখন নাটক করতে শুরু করে দিয়েছেন। লক্ষ্মণও দেখছেন অগ্রজের চোখে ঘুম নেই, সারাক্ষণ 'হা সীতা' করছেন।

<u>সুগ্রীবকে প্রথমে হনুমানের এবং পরে লক্ষ্মণের তিরস্কার</u>

অন্য দিকে এতদিন সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতে ভোগের অনাহারে পড়েছিল, এখন সে রাজা, সব ভোগ্য সামগ্রী এসে গেছে, অভুক্ত সুগ্রীব এখন ভোগের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হনুমান গিয়ে সুগ্রীবকে বোঝাচ্ছেন, আপনার হিতের জন্য বলছি, আপনি কিন্তু খুব অন্যায় করছেন, যে রাম এক বাণে বালীকে মেরে দিতে পারলেন সেই শ্রীরাম রেগে গেলে আপনার কি করবেন ভেবে দেখেছেন? যে শ্রীরামচন্দ্রের জন্য আপনি রাজ্য পেলেন, স্ত্রী পেলেন, সব সুখ পেলেন আর তাঁকে ভুলে আপনি ভোগের মধ্যে ডুবে রয়েছেন?

ত্বন্তু বানরভাবেন স্ত্রীসক্তো ন্যববুধ্যসে।৪/৪/৪৭
করোমিতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
ন করোষি কৃতঘ্নস্ত্বং হন্য বালিবদ্ দ্রুতম্।৪/৪/৪৮

বানর স্বভাবের জন্য আপনি স্ত্রীতে আসক্ত। রামায়ণে বলছেন, যারা স্ত্রীর প্রতি আসক্ত তাদের বানর স্বভাব। বানর স্বভাব মানে চঞ্চল মন, বানর স্বভাবের আরেকটা অর্থ পশুভাব। যেমন গরু, গরুর পশু ভাব থাকতে পারে কিন্তু চাঞ্চল্য নেই। বানরের মধ্যে পশু ভাবটাও আছে চাঞ্চল্যটাও আছে। বানরদের মধ্যে আরেকটা দেখা যায়, বানরের দলে একটাই পুরুষ বানর থাকে আর বাকি সব মেয়ে বানর। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন সীতার খোঁজ

পাওয়ার জন্য আমি সব রকম ভাবে কাজ করব। আপনি পণ করেছেন। কবে প্রতিজ্ঞা করেছেন? যখন আপনাদের দুজনের মধ্যে প্রথম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। আর তারপরে শ্রীরামচন্দ্র আপনার জন্য এত কিছু করে দিলেন, কিন্তু আপনার মধ্যে কোন চেষ্টাই নেই, আপনি একজন অত্যন্ত কৃতঘ্ন, আপনি যদি কৃতঘ্ন হন শ্রীরাম কিন্তু আপনাকেও বধ করে দেবেন, তখন আর বন্ধুত্বের কোন ব্যাপার আসবে না। প্রথম হল আপনি কথা দিয়ে কথা রাখছেন না, দ্বিতীয় শুধু কথাই না শ্রীরামচন্দ্র আপনার উপকার করেছেন, যে উপকারের জন্য প্রথমে আপনার প্রাণরক্ষা হল, দ্বিতীয় আপনি রাজ্য পেলেন, তৃতীয় স্ত্রীকে পেলেন, শুধু নিজের স্ত্রীকেই পাননি, দাদার স্ত্রীর উপরও অধিকার কায়েম করেছেন। হনুমানের কথা শোনার পর সুগ্রীব ভয়ে একটু আতঙ্কিত হয়ে গেছেন। সুগ্রীব হনুমানকে বললেন সব বানরদের খবর দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় জড়ো করা হোক।

বর্ষা বিদায় নিয়েছে, শরৎ ঋতুও এসে গেছে। কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর বাইরে শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা করে আছেন কবে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে সব শক্তি লাগাবে। তিনি দুঃখ করে লক্ষ্মণকে বলছেন, সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়ে গিয়েছে, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, সীতার একটা খবরও যদি পেতাম বড় ভালো লাগত। শ্রীরামচন্দ্র নানা ভাবে বিলাপ করতে করতে অনেক কথাই বলছেন। বিলাপ করে শেষে লক্ষ্মণকে বলছেন, তুমি সুগ্রীবের কাছে যাও, গিয়ে বল তোমার প্রতিজ্ঞার কি হল। লক্ষ্মণ তখন বলছেন, আপনি একবার বলুন এক্ষুণি গিয়ে সুগ্রীবকে আমি ঠাণ্ডা করে আসছি। শ্রীরামচন্দ্র শুনে বললেন, তুমি ঠাণ্ডা করতে যেও না, যতই হোক আমার বন্ধু, তবে ভয়টা একটু দেখিয়ে দিও। ঠাকুর যেমন বলছেন, ফোঁস করবি বিষ ঢালবি না। ফোঁস করতে থাকলে জীবনে অনেক কাজই হয়ে যায়। লক্ষ্মণকেও শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তুমি ওকে একটু ভয়টা দেখিয়ে দিও, ওর ক্ষতি কিছু করতে যেও না। লক্ষ্মণ যে আজ্ঞা বলে বীরবিক্রমে বেরিয়ে গেলেন। সতের নম্বর শ্লোক থেকে বলছেন –

সীতামনুশুশোচার্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণস্তস্য মায়াকার্য্যার্তিবর্তিনঃ।৪/৫/১৭

নানান রকমের যে অজ্ঞান, মায়া এরা শ্রীরামচন্দ্রের অনুবর্তিনী। তিনি সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ, এমনকি বুদ্ধি আদিরও তিনি সাক্ষী। বুদ্ধির সাক্ষী এই ভাব বেদান্তে বার বার আসে। হিন্দু দর্শনে মন বুদ্ধির সাক্ষী আত্মা, ঠিক ঠিক জ্ঞান একমাত্র আত্মাই পান। বুদ্ধিকেও যিনি দেখছেন তিনিই আত্মা, সেই আত্মাই পরমাত্মা, সেই পরমাত্মাই শ্রীরামচন্দ্র। যিনি বুদ্ধিরও সাক্ষী, মায়া যাঁর অনুবর্তিনী, তিনি সীতার জন্য শোক করবেন একি কখন সম্ভব! যে কোটিপতি তার এক টাকার একটা কয়েন হারিয়ে গেলে সে কি কখন ঐ একটি টাকার জন্য হা হুতাশ করতে যাবে। নিজে যদি অর্জন করে থাকে তখন একটা কষ্ট হয়। হেনরি ফোর্ড খুব খেটে খুটে অর্থ সম্পদ দাঁড় করিয়েছিলেন। হেনরি ফোর্ড একটা হোটেলে গেছেন, গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন আপনাদের সবচেয়ে সস্তার ঘর কত? বলা হল দশ ডলার। হোটেলের ম্যানেজার জানত ইনি হেনরি ফোর্ড। হেনরি ফোর্ড জিজ্ঞেস করছেন, এর চাইতে সস্তার কোন ঘর নেই আপনাদের হোটেলে? বলছে, হ্যাঁ আছে, ছাদে একটা কুড়ে ঘরের মত আছে, ওটার জন্য আমরা এক ডলার নিই। হেনরি ফোর্ড বললেন, ওটাই আমাকে দাও। হোটেলের ম্যানেজার বলছে, স্যার! আপনার ছেলেরা এলে হোটেলের সবচেয়ে দামী ঘর নেয়, আপনি এ রকম কেন করছেন? হেনরি ফোর্ড বলছেন, ওদের বাবা কোটিপতি আমার বাবা কোটিপতি ছিলেন না। বংশ পরম্পরায় যারা বড়লোক, যারা খুব আভিজত্য পরিবারের তারা যতই খিদেয় কষ্ট পাক, রাস্তায় ফুটপাতে করা রুটি কখনই খাবে না। ভগবান হলেন পরম্পরায় আভিজাত্যপূর্ণ, তিনি মায়ার মালিক।

আমেরিকায় এক নাটকের প্রডিউসারের বন্ধু একটা মজার গল্প লিখেছিলেন। উনি একবার নাটকের রিহার্সালে গেছেন, নাটকের কমেডির রিহার্সাল দেখে এমন হাসতে লাগলেন যে হাসির চোটে লুটোপুটি করতে শুরু করে দিয়েছেন। হাসি আর থামছেই না, বাদ বাকি যারা প্রডিউসাররা ছিল সবাই গম্ভীর মুখে দেখে যাচ্ছে। যখন চলে আসছে তখন তার বন্ধুকে সে বলছে, জিনিসটা এত হাসির ছিল যে না হেসে থাকতে পারলাম না, তোমার হাসি পাচ্ছিল না? প্রডিউসার তখন বলছে, আমি যদি একটু মুচকি হাসিও দিই সঙ্গে সঙ্গে সবাই নাটক বন্ধ করে আমার কাছে স্যালারি বাড়ার জন্য পৌঁছে যাবে। নাটকের হাসির দৃশ্য তার মনে কোন প্রভাব ফেলছে না, কারণ তার সবটাই জানা। ভগবানও ঐ রকম, তিনি সবটাই জানেন, সব কলকাঠি নাড়ছেন। সেইজন্য ভগবানের ক্ষেত্রে মায়ার কোন কিছুই খাটে না।

রাগাদিরহিতস্যাস্য তৎ কার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি।৪/৫/১৮
তপসঃ ফলদানায় জাতো মানুষবেষধুক্।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্বে জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ।৪/৫/১৯
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ইতি বিষ্ণুবিচিন্তয়ন্।
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্বলোকমলাপহাম্।৪/৫/২০
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে।৪/৫/২১

তিনি রাগ-দ্বেষ সব কিছুর পারে। শুধু ব্রহ্মার কথা সত্য করার জন্য আর রাজা দশরথের তপস্যার ফলদান করার জন্য শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যদেহ ধারণ করে এত কিছু করছেন। পিতার আদেশ তাই তিনি জঙ্গলে এসেছেন, ব্রহ্মাকে কথা দিয়েছেন রাবণকে বধ করবেন, তাই তিনি একটা হেতু তৈরী করে রাবণ বধ করার রাস্তা তৈরী করে নিলেন। জগতে মানুষ মায়ামোহিত এবং অজ্ঞানে পড়ে বিচরণ করছে, এদের কিভাবে মুক্তি হবে? তখন বলছেন, রামায়ণ নামের যে রামকথা তার প্রচার করার জন্য তিনি এই রামরূপ ধারণ করেছেন। অধ্যাত্ম রামায়ণের শুরুতেই বলা হয়েছিল যে রাম জন্মের আগে রামকথা প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র কেন মনুষ্যদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন? রামকথাকে সত্য করা এবং লোকেদের মধ্যে প্রচলিত করার জন্য শ্রীরামের আগমন। আমাদের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এর অনুবাদ করতে হয় তখন বলা হবে – ঠাকুর কেন দক্ষিণেশ্বরে এলেন? কথামৃত প্রচার করার জন্য। তাহলে আগে কে? ঠাকুর আগে না কথামৃত আগে? কথামৃতই আগে হতে হবে, ঠাকুর পরে। তেমনি রামকথাই আগে, রাম পরে। সৃষ্টি সব সময় বেদ দিয়ে হয়, আর অবতার যখন আসেন তখন বেদের মাধ্যমে আসেন। আসার পর তাঁর মুখ দিয়েই ঐ বেদই অন্য রূপে আসে। সেদিক দিয়ে কথামৃতও যা রামকথাও তাই। রামচন্দ্র ভগবান। কিন্তু তিনি যে ভগবানই হন না কেন, তাঁকে মায়ার মাধ্যমে আসতে হবে, মায়া দিয়ে আসা মানেই শব্দব্রহ্ম দিয়ে আসতে হবে, শব্দব্রহ্ম দিয়ে আসা মানে সেই তত্ত্বের মাধ্যমেই আসতে হচ্ছে। ঐ অর্থেই বলছেন রামের আগে রামকথা। কিন্তু রামায়ণের কাহিনীকে নিয়ে দেখলে তখন বলা যাবে না। কথামৃতকেও যদি একটা পুস্তক রূপে দেখা হয় তখন ঠাকুর আগে কথামৃত পরে। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে, কথামৃতে যে তত্ত্ব আছে, কথামৃতে অনেক তত্ত্ব আছে, যেমন ঈশ্বরই সত্য, ত্যাগের কথা, সত্ত্ব, রজো ও তমোর কথা, সাধুসঙ্গের কথা এগুলো চিরন্তন, তাই কথামৃত আগে। গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও বলছেন, ধর্ম জিনিসটা ঐ রকমই থাকবে, যখন ধর্মের ভাব কমে যায় তখন ভগবান আবার এসে নতুন করে তাতে শক্তি প্রদান করে উপরে তুলে আনেন। রামায়ণে বা কথামৃতে বা বাইবেলে যে তত্ত্ব কথাগুলো আছে সেগুলো চিরন্তন সত্য, যিনি বলেছেন তাঁর আগে থেকেই এই তত্ত্বগুলো আছে। এই অর্থে শ্রীরামচন্দ্রের আগে রামকথা বলছেন। কিন্তু যদি কেউ বলেন ভগবান তো সেই সচ্চিদানন্দ। কিন্তু সেভাবে হবে না, কারণ যিনি সচ্চিদানন্দ তিনি কখন ঐ অর্থে অবতরণ করেন না। যিনি সাকার রূপে আছেন তিনিই অবতরণ করেন, আর সাকার রূপ যখনই শক্তির এলাকায় আসেন তখন তাঁকে শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে আসতে হয়। শব্দব্রহ্ম সব সময় আগে, সৃষ্টি মানেই শব্দব্রহ্ম, এবার অবতার যিনিই আসবেন তাঁকে শব্দব্রহ্মের মাধ্যম দিয়েই আসতে হবে। সেই শব্দব্রহ্মের ব্যাখ্যা তিনি বিভিন্ন ভাবে করেন। সেটাই এখানে বলছেন, ভগবান কেন মনুষ্যদেহ ধারণ করে এসেছেন? জগতে রামকথা বিস্তার করার জন্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানুষের মনের নানান রকমের দুর্বলতা, দুর্গুণকে নিজে গ্রহণ করে সেই অনুসারে আচরণ করছেন, এর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষিত করার জন্য। যদি ঠিক ঠিক দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে তিনি এর সব কিছু থেকে আলাদা। তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ, বিজ্ঞানই তাঁর শক্তি আর সব কিছু থেকে তিনি সব সময় নির্লিপ্ত। সেইজন্য তাঁর চোখের জল ফেলা, সীতাকে নিয়ে বিলাপ করা সবটাই মিথ্যা।

ভক্তচিত্তানুসারণ জায়তে ভগবানজঃ।
লক্ষ্মণোহপি তদা গত্বা কিষ্কিন্ধ্যানগরান্তিকম্।৪/৫/২৫

ভগবান যা কিছু করেন সবটাই দিব্যলীলা। শ্লোকে একটা অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, বলছেন ভক্তের ভক্তি ও ভাবনুযায়ী ভগবান অবতারত্ব গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা ভক্তি করেন, তাঁর এক রকম প্রার্থনা। দশরথ আগে আগে তপস্যা করেছিলেন, সেই তপস্যায় তাঁর আরেক রকম প্রার্থনা ছিল। সব প্রার্থনা পূরণ করার জন্য ভগবান অবতরণ

করেছেন। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে জিনিসটা দাঁড় করান যাবে না। যুক্তি দিয়ে আচার্য শঙ্কর যেটা বলছেন ওটাই ঠিক। ধর্ম হল সনাতন, সনাতন ধর্ম যাঁরা পালন করছেন, পালন করতে করতে তাঁদের মনে যেমন যেমন কামনা-বাসনার উদয় হয় তেমন তেমন ধর্মের অধঃপতন হয়। ধর্মের যখন খুব বেশি অধঃপতন হয়ে যায় তখন ভগবান এসে আবার সনাতন ধর্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে দেন। কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণকে সব সময় এভাবেই রাখা হয়। এর আরেকটা কারণ হল, ঈশ্বরের ঠিক ঠিক ভক্ত যখন ভগবানের গভীর চিন্তন করেন তখন তাঁর সামনে ভগবানের যে রূপ ভেসে ওঠে সেটা পুরোপুরি তাঁর ভক্তি ও ভাবের মত। যেমন কেউ শ্রীকৃষ্ণকে নাড়ুগোপালের মত চিন্তন করছেন, যখন ভগবানের দর্শন হবে তখন ঐ রূপেই তাঁর দর্শন হবে। কেউ তাঁকে শক্তি রূপে চিন্তন করে যাচ্ছেন তখন ঐ ভাব নিয়েই তিনি ভক্তের সামনে প্রকট হন। এই জিনিসটা ঋষিরা জানতেন, তাই সেটাকেই একটা স্থূল রূপ দিয়ে সেইভাবে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে বলছেন, ভগবান ভক্তের ভক্তি ও ভাব অনুযায়ী আসেন। ভগবানের যা কিছু হয় সবটাই তাঁর লীলা, কোন শাস্ত্রই এর অন্যথা বলবেন না।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানেই নিজেকে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক জানা। হয় তিনি অহং ব্রহ্মাস্মি রূপে দেখবেন, তা না হলে son of God, বা ভগবানের সেবক রূপে দেখবেন। কোন না কোন একটা সম্পর্ক দিয়ে জুড়ে নিজেকে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে এক দেখেন। এই ব্যাপারে শাস্ত্রে দ্বিমত নেই, সব শাস্ত্রে এই একই কথা বলা হয়। যিনি চৈতন্যের সাথে এক হয়ে যান তাঁর যা কিছু ক্রিয়াকর্ম হয় তখন তিনি জানেন ইন্দ্রিয় আর মন নিজের নিজের বস্তুর উপর কাজ করছে। তাঁর কখনই আমি করছি এই বোধটা থাকে না। এই কথা যাঁরা সাধারণ সাধক তাঁদের কথা বলা হচ্ছে, এখানে অবতার পুরুষের কথাও বলা হচ্ছে না। অতি সাধারণ সাধকও যখন ঐ অবস্থায় চলে যান তিনি বুঝতে পারেন আমি ইন্দ্রিয় মন থেকে আলাদা। কিন্তু যাঁরা অবতার পুরুষ বা যদি অন্য ভাবে বলা হয় যাঁরা সিদ্ধের সিদ্ধ তাঁরা যে কাজই করুন না কেন তিনি জানেন সবটাই মিথ্যা, তাঁর হাসিটাও মিথ্যা, তাঁর চোখের জলটাও মিথ্যা। কারণ তিনি চৈতন্যের সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এর কোথাও কোন অন্যথা হবে না। শ্রীরামচন্দ্রকে এখানে অবতার রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে, তাঁর কাছে কোন কিছুর দাম নেই। কথামৃতে আমরা যে বর্ণনা গুলো পাই তাতে ঠাকুর এই মুহূর্তে ফষ্টিনষ্টি করছেন পর মুহূর্তেই সমাধিতে লীন হয়ে যাচ্ছেন। সমাধিই ঠাকুরের বাস্তবিক, ফষ্টিনষ্টি কিছুই না। কিছুই না যদি হয় তাহলে পুরোটাই কি অভিনয়? অভিনয়ও নয়। লীলা শব্দটা একটা টেকনিক্যাল শব্দ, লীলাকে এনারা বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন, এগুলো তাঁর অভিনয় নয় আবার পুরোটা সত্যি তাও নয়, আমি করছি এই বোধটাও থাকে না আর সিনেমা নাটকের অভিনয়ও নয়। করছেন কিন্তু সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে করছেন, এটাই লীলা। লীলা মানে, আমিত্বটা নেই, আমি বোধটা নেই। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমি আমার আমি খুঁজে পাই না। ফলে সাংসারিক ব্যাপারে তাঁর যে চোখের জল, তাঁর হাসি, আমি মিষ্টি খাব এই ধরণের যে কথা বলছেন এগুলোর কোন দাম নেই। শ্রীরামচন্দ্র যে সীতার জন্য চোখের জল ফেলছেন, বিলাপ করছেন, এগুলোরও কোন দাম নেই। কিন্তু আবার আমিত্ব বলতে আমরা যে অর্থে মনে করি সেই অর্থে আমিত্বটাও নেই। একজন সংসারী মানুষ যেভাবে কাঁদবে, চোখের জল ফেলবে, সেইভাবেও নয়। নাটকে সিনেমায় যখন অভিনয় করে তখন সে জানে এগুলো কিছুই না, কিন্তু সে যতই তাতে মজে যাক ওটা অভিনয়। এটা ঠিক তাও না, মাঝামাঝি। অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরোপুরি ভক্তিগ্রন্থ, ভগবানের সব কিছুকে এখানে অভিনয় দেখাচ্ছেন, যদিও শব্দটা লীলা ব্যবহার করেন, কিন্তু পদে পদে বলা হচ্ছে নিজের স্বরূপের ব্যাপারে তিনি সর্বদা সচেতন। শ্রীমাকে একজন জিজ্ঞেস করছেন, মা! আপনার কি সব সময় আপনার দিব্য স্বরূপের কথা মনে থাকে। শ্রীমা তখন বলছেন, তাহলে কি আর ঘরসংসার করা যায়! এই নিয়ে আমাদের অনেক ভুলভাল ধারণা আছে। প্রায়ই বলা হয় জাদুকর আর জাদু, জগতটা হল জাদু খেলা। ফলে আমাদের একটা ধারণা যে জগতটা মিথ্যা। এই ধারণাই আমাদের দেশটাকে শেষ করে দিয়েছে। এর ঠিক ঠিক উপমা হল সোনা আর সোনার তৈরী গয়না। গয়নাটাও সোনা, কিন্তু তার নাম আর রূপটা মিথ্যা, সোনাটাই আসল। যিনি অবতার তিনি সব সময় সচেতন যে নাম আর রূপটা মিথ্যা, যিনি সিদ্ধের সিদ্ধ তিনিও সচেতন যে নাম ও রূপ মিথ্যা। তাহলে অবতার আর সিদ্ধের সিদ্ধে তফাৎ কোথায়? শক্তিতে তফাৎ হয়ে যায়। সাধকের ক্ষেত্রে জ্ঞান একটু কম থাকে, কারণ তাঁর বাস্তবিক উপলব্ধি হয়নি, সেইজন্য সাধকের ওঠানামা চলতে থাকে। মায়ামোহের কথা শুনে শুনে মায়ার ব্যাপারে একটা ধারণা হয়ে গেছে যে, জাদুকর যেমন খেলা দেখায়, ভগবানও সেই রকম কোন ম্যজিক দেখান। কিন্তু জিনিসটা একেবারেই তা নয়। এই মিথ্যা হল সোনা আর সোনার গয়না এই অর্থে। তখন বলছেন, শ্রীরামচন্দ্রের

এই যে বাস্তবিক স্বরূপ এই স্বরূপকে সনকাদির মত কোন কোন মুনিরাই ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। বাকি যারা ভক্তরা আছেন তাদের জন্য ভগবান অবতার রূপ ধারণ করেন। সাধারণ মানুষ ভগবানকে সেই শুদ্ধ চৈতন্য রূপে, কোন রূপ নেই শুধু স্বরূপ রূপে চিন্তা করতে পারে না।

যাই হোক, লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দিকে এগিয়ে গেছেন। বানররা লক্ষ্মণকে জানে না তারা লক্ষ্মণের দিকে পাথর, গাছের ডালপালা ছুড়তে শুরু করেছে। লক্ষ্মণ প্রচণ্ড রেগে গেছেন, রেগে গিয়ে বলছেন, এক্ষুণি সব কটাকে শেষ করে দিচ্ছি। এই বলে ধনুকে তীর লাগাতেই অঙ্গদ ঝাঁপ মেরে এসে বানরগুলোকে আটকেছেন, তোমরা এ কী করছ, তোমাদের সবারই প্রাণ চলে যাবে। লক্ষ্মণ তখন অঙ্গদকে বলছেন, তুমি গিয়ে সুগ্রীবে এক্ষুণি আমার আগমনের খবর দাও। লক্ষ্মণকে অঙ্গদ ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, অন্য দিকে সুগ্রীবের কাছে খবর পাঠিয়েছে। বাল্মীকি রামায়ণে সুগ্রীবের তখনকার অবস্থার অনেক বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা আছে, কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে বলছেন। বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণনা করছেন, সুগ্রীব তখন নেশা করে পুরো বেসামাল, কোন হুঁশ নেই। তারাকে বলছেন, এই অবস্থায় আমি তো লক্ষ্মণের সাথে কথাই বলতে পারব না, তুমি গিয়ে লক্ষ্মণকে কিছুক্ষণ আটকাও। তারাও নেশা করে আছে কিন্তু সুগ্রীবের তুলনায় একটু কম, হুঁশটুকু আছে। মেয়েরা সহজে হুঁশ হারায় না। ঠাকুর বলছেন, একজনের স্বামী মারা গেছে, স্ত্রী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে, কিন্তু তার আগে নাকের নথ খুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। এখানে সুগ্রীব কাউকে না এগিয়ে তারাকে এগিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে কোন ধরনের সঙ্কট হলে হয় বাচ্চাকে নয়তো কোন মহিলাকে এগিয়ে দেয়। কারণে ওদের দেখে বাইরের লোকটির মন একটু নরম হয়ে যাবে। লক্ষ্মণের সামনে যদি অঙ্গদকে এগিয়ে দেওয়া হত আর অঙ্গদ গিয়ে যদি বলত, কি ব্যাপার! ওখানেই লক্ষ্মণ পুরো কিষ্কিন্ধ্যাকে পুড়িয়ে শেষ করে দিতেন। মদ সবাই মিলেই পান করছিল, কিন্তু তারা খুব হিসাব করে নেশা করছিল, ওর হুঁশটাই তাই ঠিক আছে। সুগ্রীবও জানে তাই তারাকে লক্ষ্মণের দিকে এগিয়ে দিলেন। অধ্যাত্ম রামায়ণেও বলছেন –

ত্বং গচ্ছ সান্ত্বয়ন্তী তং লক্ষ্মণং মৃদুভাষিতৈঃ।
শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেহনঘে।৪/৫/৩৫

হে তারা! তুমি যাও, তোমার মৃদু ও মধুর ভাষণ দিয়ে লক্ষ্মণকে কোপশূন্য করে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও। এটাই নিয়ম, সুগ্রীব ঠিকই করছেন। জঙ্গলে বুনো হাতিগুলোর কী প্রচণ্ড শক্তি, বুনো হাতি মানেই মারাত্মক বিপজ্জনক। ঐ বুনো হাতিকে শান্ত করার জন্য সব সময় হস্তিনীকে এগিয়ে দেওয়া হয়। কোন কামভাবের জন্য শান্ত হয়ে যাচ্ছে তা না, স্বভাবেই শান্ত হয়ে যায়। সুগ্রীব বলছেন, লক্ষ্মণ শান্ত হয়ে গেলেই তাঁকে অন্তঃপুরের দিকে নিয়ে যাবে, তার আগে আনবে না। কারণ একেই তো সুগ্রীব নেশাগ্রস্ত হয়ে আছে, তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করছে না। কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে জোর করে উঠিয়ে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনে বিভীষণ এসে গেছে। কুম্ভকর্ণ বলছে, ভাই তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও, শত্রু-মিত্র আমি বিভেদ করতে পারছি না। কুম্ভকর্ণের মস্তিষ্ক এখন এলোপাতাড়ি কাজ করবে। মস্তিষ্ক যখন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন স্মৃতি গোলমাল হয়ে যায়। গীতাতেও বলছেন *সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি*। ঘুমন্ত অবস্থায় স্মৃতি কাজ করে না, কোন ওষুধের ঘোরে স্মৃতি বিভ্রম হয়ে যায়, মদ খেয়ে নেশা করে আছে আর নানা রকম মনের আবেগের জন্য স্মৃতি গোলমাল হয়ে যায়। কারুর প্রতি খুব মোহ হয়ে গেছে, কারুর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধ এসে গেছে তখন আর মস্তিষ্ক কাজ করবে না। একটা লোক এখন রেগেমেগে এগিয়ে আসছে, সুগ্রীবের দুটো সমস্যা, একেই মদ খেয়ে আছে আর তার উপর ভয়। সেইজন্য তারাকে এগিয়ে দিচ্ছেন। নিজের স্ত্রী রুমা সে তো আরও বাজে অবস্থায়, এখানে অবশ্য সেটা বলছেন না। তারা একদিকে বিধবা, তার স্বামী বালীকে লক্ষ্মণের দাদা বধ করেছেন, একটা sympathy কাজ করবে, তারাই একমাত্র উপযুক্ত যে কিনা লক্ষ্মণের ক্রোধকে শান্ত করতে পারবে।

ইতিমধ্যে হনুমান আর অঙ্গদ লক্ষ্মণকে খুব শান্ত মনে অভ্যর্থনা করছেন। হনুমান ও অঙ্গদও বুঝে গেছেন কিছু একটা গোলমাল বাঁধবে। লক্ষ্মণ একটু ভেতরের দিকে এগিয়ে গেছেন তখন সামনেই তারা ভেতর থেকে এগিয়ে এসে খুব সুন্দর করে বলছেন –

মধ্যকক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা।
সর্বাভরণসম্পন্না মদরক্তান্তলোচনা।৪/৫/৪১

উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্বাভিভাষিণী।
যাহি দেবর ভদ্রং তে সাধুস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ।৪/৫/৪২
কিমর্থং কোপমাকার্ষীর্ভক্তে ভৃত্যে কপীশ্বরে।
বহুকালমনাশ্বসং দুঃখমেবানুভূতবান্।৪/৫/৪৩
ইদানিং বহুদুঃখৌঘাদ্ ভবদ্ভিরভিরক্ষিতঃ।
ভবৎপ্রসাদাৎ সুগ্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ।৪/৫/৪৪

তারা এক সুন্দরী নারী, তারাকে বলছেন চন্দ্রমুখী, সর্বলঙ্করাভূষিতা হয়ে মধ্য প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মণের দিকে এগিয়ে গেছে। মিষ্টি সুন্দর মুখ দেখলে মানুষ নরম হয়ে যায়। মদিরা পান করার জন্য তারার চোখদুটো আরক্তিম হয়ে আছে। তারা লক্ষ্মণকে নমস্কার করে খুব মিষ্টি করে ওষ্ঠদ্বয়ে একটা মধুর হাসি দিয়ে দেবর বলে সম্বোধন করছে। শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সুগ্রীবের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। শ্রীরাম, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ সবাই এখন দাদা ভাইয়ের সম্পর্কের। লক্ষ্মণ ছোট তাই দেবর বলে সম্বোধন করছে। আর বলছে, *ভক্তবৎসলঃ*, আপনি সাধুপুরুষ আর ভক্তবৎসল। এই যে সুগ্রীব সে আপনারই একজন ভৃত্য, আপনি কেন তাঁর উপরে কুপিত হয়ে গেছেন? এই সুগ্রীব কতকাল শুধু দুঃখই ভোগ করে এসেছে। তারা কার বিরুদ্ধে বলছে? নিজের স্বামী বালীর বিরুদ্ধে। মানুষ এক বিচিত্র জীব। কিছু দিন আগে বালী বধ হয়ে যেতে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছিল, আপনি আমাকে ঐ বাণ দিয়ে বধ করে দিন, আমাকে ছাড়া বালী স্বর্গে থাকতে পারবে না, আমার জন্য বালী অপেক্ষা করে আছে, আমাকেও বধ করে দিন যাতে আমি আমার স্বামীর কাছে থাকতে পারি। কত কান্নাকাটি, এখন সুগ্রীবের সাথে থাকছে, মানুষ এই রকমই হয়। তারা বলছে, সুগ্রীব অনেক দিন বহু দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে। দুঃখের এই মহাসাগর থেকে আপনারাই সুগ্রীবকে বার করে এনেছেন, সুগ্রীবের উপর যদি আপনারা কৃপা না করতেন তাহলে সুগ্রীব বাঁচতে পারত না। সুগ্রীব যে এখন একটু সুখ পেয়েছে আপনাদের জন্যই পেয়েছে। কেন মিছিমিছি আপনি এর উপর রাগ করছেন!

আমাদের ভারতবর্ষের ঠিক সুগ্রীবের মত দুরবস্থা। সাধারণ মানুষের কাছে সুখভোগ ছিল না, অভাবগ্রস্থ, ক্ষমতা ছিল না, জানেই না ক্ষমতা কাকে বলে, তার উপর শিক্ষা কিছুই ছিল না। সেইজন্য ভারতে কে রাজা হচ্ছে কে হচ্ছে না তাতে তাদের কিছু মাথাব্যাথা ছিল না। পঞ্চাশ বছর লাগল ভারতবর্ষকে বুঝতে খাওয়া কাকে বলে। পঞ্চাশ বছর লাগল বুঝতে ক্ষমতা কাকে বলে। রাস্তার একটা সাধারণ লোকও আজকে জানে আমার সাংঘাতিক ক্ষমতা, সেও এখন ইনকিলাব জিন্দাবাদ করে দেয়। যার ফলে এখন কেউ নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না। ভোগ জিনিসটাও সামলাতে পারছে না আর ক্ষমতার যে অপব্যবহার হতে পারে সেটাও সামলাতে পারছে না। ভাবতেই পারছে না যে তার হাতে এত ক্ষমতা আসতে পারে। ক্ষমতা আর ভোগের আস্বাদ করতে করতে এটাই যখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় তখন আর কোন অপব্যবহার করবে না। কিন্তু তখন একটা অন্য ধরণের ভাব এসে যায়। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করার সময় আমরা কোন কিছু অপচয় করতে চাই না, ভারতবর্ষে সাধারণ ভাবে কেউ নিজের বাড়িতে কোন কিছুর অপচয় হতে দেয় না, কারণ এটাই অভাবের লক্ষণ। আমেরিকাতে যতটা নেবে তার থেকে বেশিটাই ফেলে দেয়। খাওয়াটা যে শেষ করতে হয় ওরা জানেই না। আমেরিকাতে একটা জায়গায় একটা বড় পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে একজন মহারাজও ছিলেন। উনি নেওয়ার সময় যেটুকু খেতে পারবেন সেই হিসাব করে নিয়েছেন, অল্প একটা আইটেম প্লেটে ছেড়ে দিয়েছেন। ওয়েটার মহারাজকে শ্লেষ করে বলছে, ঐটুকু কেন ছেড়ে দিলেন? বক্তব্য হল, সব কিছু তুমি কি করে খেয়ে নিতে পার! আমেরিকাতে এত প্রাচুর্য যে ওরা জানেই না যে কোন জিনিস নষ্ট করতে নেই। আর ভারতবর্ষের লোকেরা অভাবের মধ্যেই বড় হয়েছে। আমাদের দেশে জলের অপচয় বন্ধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দিতে হয়, কিন্তু আরব দেশের লোকেরা জলের ব্যবহারে খুব সজাগ। মানুষের কাছে যেটার প্রাচুর্য থাকে সেটারই অপচয় হয়, যেটা অপ্রাচুর্য সেটার অপচয় হতে দিতে চায় না। যেটা দুম করে চলে আসে তখন আবার আরেক ভাবে চলে। সুগ্রীবের সব কিছুতে অভাব আর দুঃখ লেগে ছিল, হঠাৎ করে রাজৈশ্বর্য চলে আসাতে ভোগ সামগ্রীর প্রাচুর্য এসে গেছে, সুগ্রীবকে আর সামলানো যাচ্ছে না। যারা সমাজের খুব নীচু স্তর থেকে লড়াই করতে করতে একটা ক্ষমতার শীর্ষে এসে যায়, কোন মন্ত্রী হয়ে গেল, এরপর আর তাকে সামলানো যাবে না। একজন দুজন হয়তো ভালো থাকছে কিন্তু সাধারণ ভাবে বেশির ভাগ মানুষকে সামলানো যায় না। লুটেপুটে খাওয়ার ভাবটা তাদের মধ্যে এসে যায়। সুগ্রীবের তাই অবস্থা

হয়েছে, লক্ষ্মণকে তারা এটাই বোঝাতে চাইছে, এতদিন সে অভুক্ত ছিল, প্রাণের ভয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ করে তার কপাল খুলে গেছে। তারা এটাই বলছে –

কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ।
আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতা প্রভো।৪/৫/৪৫

দেখুন আপনাদের কৃপাতেই সুগ্রীব এই সম্পত্তি লাভ করেছে, সে এখন কামাসক্ত হয়েছে বটে কিন্তু আপনি এই নিয়ে কিছু ভাববেন না, চারিদিকে খবর পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে বানর সৈন্যরা এসে একত্রিত হচ্ছে, সবাই আপনাদের সেবায় লেগে যাবে। আপনি এবারে ভেতরে চলুন যেখানে সুগ্রীব নিজের স্ত্রী সন্তান নিয়ে আপনারই অপেক্ষায় আছেন। তারার এইসব কথা শোনার পর লক্ষ্মণ এখন একটু শান্ত হয়েছেন। ভেতরে গিয়ে দেখে সেখানে রুমার গলা জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তখনও সুগ্রীবের নেশা কাটছে না। হঠাৎ লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীবের রুমা-টুমা সব উড়ে গেছে, এক লাফ দিয়ে লক্ষ্মণের সামনে এসে কাঁপতে শুরু করেছে। লক্ষ্মণ এখানে সুগ্রীবকে দেখে আবার তাঁর মাথাটা একটু গরম হয়ে গেছে, রেগে গিয়ে বলছে, তুমি কি শ্রীরামচন্দ্রের সেই বাণের কথা, যে বাণ দিয়ে বালীকে বধ করেছিলেন ভুলে গেলে। তুমিও কি বালীর পথ অনুসরণ করতে চাও? সুগ্রীবের তখনও কোন হুঁশ নেই, লক্ষ্মণকে হনুমান ঠাণ্ডা করছেন, আপনি শ্রীরামচন্দ্রকে যত ভক্তি করেন সুগ্রীব তার থেকেও অধিক ভক্তি করেন। আপনি এভাবে রেগে যাবেন না, সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাই হোক লক্ষ্মণ সব কথা শুনে শান্ত হয়ে গেলেন, সব কিছু মেনে নিলেন। সুগ্রীবকে বলছেন, আমি একটু রেগে গিয়েছিলাম, শ্রীরামচন্দ্র সীতার বিরহে খুবই কষ্টের মধ্যে আছেন। সুগ্রীব তখন সোজা হয়ে বললেন, আমি নিজেই শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হনুমানকে শ্রীরামের অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান

শ্রীরামচন্দ্রকে গিয়ে সুগ্রীব জানালেন, আমরা সব বানরকুলকে একত্র করছি, এবার সবাই মিলে সীতার অন্বেষণে চারিদিকে বেরিয়ে পড়বে। বানর দলের প্রত্যেক নেতাকে ডেকে সুগ্রীব বলে দিলেন, তোমাদের এক মাসের সময় দেওয়া হল, এক মাসের মধ্যে আমার সীতার খবর চাই। বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিশায় যাবে। একটা দল দক্ষিণ দিশায় যাবে, যে দিকে সীতাকে পাওয়ার সম্ভবনা সব থেকে বেশি, সেই দলে হনুমান আছেন। হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র একটা আংটি দিলেন, দিয়ে বলছেন, আমার বিশ্বাস যে তুমিই সীতার দেখা পাবে, সীতার সাথে দেখা হলে তাকে তুমি এই আংটিটা দেখিও। এরপর একটা নতুন প্রসঙ্গ শুরু হয়।

যদিও অধ্যাত্ম রামায়ণের মতে সব কিছু আগে থেকেই জানা আছে, কিন্তু এখানে সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্র বসে মন্ত্রণা করছেন কিভাবে সীতার খোঁজ নেওয়া যায়। সব দিক দিয়ে বিচার করলে বাল্মীকি রামায়ণ অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। পরের দিকের সব রামকথাতে ভাব ভক্তি নিয়ে আসার জন্য অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে মেলানো যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে ওনাদের একটা স্থির ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে সীতাকে নিশ্চয়ই দক্ষিণ দিকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যখন সব কিছুই সংশয়ের মধ্যে থাকে, অজানা অচেনা ব্যাপার হয়ে যায় তখন দলের যিনি সব থেকে উপযুক্ত দক্ষ ও বুদ্ধিমান হন তাঁকে ঐ দিকেই পাঠানো হয় যেদিকে সীতাকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। হনুমান এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যার জন্য পরের দিকে সুন্দরকাণ্ডে বাল্মীকি শুধু হনুমানের জন্যই একটা কাণ্ডকে উৎসর্গ করেছেন। সাহিত্য রচনায় এই জিনিস কখনই দেখা যায় না, যেখানে পুরো একটা অধ্যায় প্রধান চরিত্রকে সরিয়ে আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুন্দরকাণ্ড পুরোটাই মহাবীর হনুমানকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে আছে। ভক্তিমার্গে দাস্য ভক্তি যে একটা পুরো আলাদা ধরণের ভক্তি, এই দাস্য ভক্তি শুরুই হয় মহাবীর হনুমানকে কেন্দ্র করে। প্রথমের দিকে হনুমানের বিদ্যার পরিচয় পেলাম, আর তাঁর বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় পরে পরে পেয়ে যাব। হনুমান ঐ দলে আছেন যে দলটা দক্ষিণ দিশায় যাবে। শ্রীরামচন্দ্রেরও মনে হচ্ছে এই দলটাই সক্ষম হবে। তখন শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে ডেকে কিছু কথা বলছেন –

গচ্ছন্তং মারুতিং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানার্থমেতন্মে হ্যঙ্গুলীয়কমুত্তমম্।৪/৬/২৮
মন্নামক্ষরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ।
অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম্।

জানামি সত্ত্বং তে সর্বং গচ্ছ পন্থাঃ শুভস্তব।৪/৬/২৯

খুব সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের হনুমানের সাথে সরাসরি সংলাপ চলছে, শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে পবননন্দন! এই আংটি তুমি নিয়ে যাও, এতে আমার নামাক্ষর মুদ্রিত আছে। আমি তোমার বলবুদ্ধি সমস্ত অবগত আছি, এই কার্য্যে জন্য তুমিই সমর্থ, তুমিই সফল হবে। সীতাকে তুমি এই আংটিটা দেখাবে, সীতা বুঝে যাবে তুমি আমার দূত, তার থেকেও বেশি সীতা বুঝে যাবে যে শ্রীরামচন্দ্র চেষ্টা করছেন। যাদের কিডন্যাপ করে বন্দী করে রাখে তারা যদি একবার বুঝে যায় আমার লোকেরা আমার জন্য চেষ্টা করছে তখন তার ভেতরে শক্তিটা বেড়ে যায়। এটা খুব মজার ব্যাপার, যখন কাউকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয় তখন যে বাঁচাতে যাচ্ছে শুধু তার উপর নির্ভর করে না, যাকে বাঁচাতে চাইছে তারও মানসিক শক্তি দরকার। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতেই হোক আর জাগতিক দৃষ্টিতেই হোক, যখনই কাউকে রক্ষা করা হয় তখন দেখতে হয় যাকে রক্ষা করা হবে তার ভেতরে ক্ষমতা আছে কিনা। এর উপর প্রচুর কাহিনীর তৈরী হয়েছে। বাইবেলে ভগবান যীশুও বলছেন, একজন মালিক তার দুই সেবককে twenty talents দিয়েছে। প্রথম সেবক খুব যত্ন করে সেটা রেখে দিয়েছে, দ্বিতীয় সেবক সেটাকে কাজে লাগিয়ে আরও টাকা বাড়িয়ে নিয়েছে। প্রথম সেবককে বলছে, তুমি একটা অলস অপদার্থ তোমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা ফেরত দিয়ে দাও। যে বাড়িয়ে দিয়েছে তাকে বলছে, সবটাই তুমি রেখে দাও। ভগবান যীশু তখন বলছেন ভগবান যাকে যা দিয়েছেন সেটাকে সে যদি কাজে লাগিয়ে আরও বাড়িয়ে নেয়, ভগবান তাকে সবটাই দিয়ে দেন। যদি না বাড়ায় তিনি বলেন তোমাকে যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা তুমি কাজে লাগাওনি, যেটা দিয়েছিলেন সবটাই আবার ফেরত নিয়ে নেন। আমাদের সবারই ভেতরে কিছু না কিছু ক্ষেত্রে ট্যালেন্ট আছে, যার গান-বাজনায় দখল আছে সে যদি চর্চা করে করে সঙ্গীতের পারদর্শিতাকে বাড়িয়ে নিয়ে যায় তখন পুরো কৃতিত্ব, নামযশ তারই থেকে যায়। যদি চর্চা না করে তাহলে বিদ্যাটা আস্তে আস্তে হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। সঙ্গীত বিদ্যার দেবী তখনই তাকে উজাড় করে দেবেন যখন দেখবেন তার মধ্যে পাত্রতা আছে। তার নিজের চেষ্টা কতটা আছে সেটা দিয়ে বোঝা যায় তার পাত্রতা আছে কিনা। যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেতো এখন উদ্বেগের মধ্যে মনমরা হয়ে পড়ে আছে। তাকে যখন ওখান থেকে বার করে নিয়ে আসা হবে তখন তারও একটা শক্তির দরকার। তার ভেতরে শক্তি যদি না থাকে তাহলে যে অপারেশান করা হবে সেটা পুরো কাজে লাগবে না। শক্তি বাড়ানোর সব থেকে ভালো উপায় কোন রকমে তার কাছে একটা খবর পাঠিয়ে দেওয়া, চিন্তার কিছু নেই আমরা তোমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। স্বামীজীর বাড়ি অধিগ্রহণের সময় ভাড়াটিয়াদের সাথে প্রচুর গোলমাল চলছিল। অধিগ্রহণের কাজ যে মহারাজ দেখাশোনা করছিলেন, ভাড়াটিয়াদের দেড়শ দুশো লোক একবার তাঁকে ঘেরাও করে রেখে নোংরা গালিগালাজ দিয়ে যাচ্ছে। মহারাজ হঠাৎ দেখেন তাদের মধ্য থেকে দুজন লোক মহারাজের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিয়েছেন। তখন উনি বুঝে নিলেন এরা পুলিশের স্পেশার ব্রাঞ্চ সিআইডির লোক। এই দুজনও ওখানে ওদের সাথে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করে যাচ্ছে। দুজনকে দেখে মহারাজের শক্তি বেড়ে গেল। দুশো লোকের মধ্যে মাত্র দুজন পুলিশ কী রক্ষা করবে! কিন্তু একজনও যদি ইশারা করে দেয় আমি আপনার সাথে আছি চিন্তা নেই, তখন তার একটা শক্তি এসে যাবে। সীতার ক্ষেত্রে সবটাই ঠিক। একবার যদি যোগাযোগের সংযোগটা ঠিক হয়ে যায় ওর শক্তি বেড়ে যাবে। বাল্মীকি রামায়াণে এর খুব সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। যেমনি সীতার সাথে হনুমানের পরিচয় হয়ে গেল সীতার সব কিছুই পাল্টে গেল। শ্রীরামচন্দ্র আমার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এই ভেবেই তিনি প্রচণ্ড খুশি হয়ে গেলেন, খুশিতেই সীতার ইচ্ছাশক্তি হাজার গুণ বেড়ে গেল। আমরা প্রায়ই বলি, জগৎ যদি তোমাকে ছেড়ে দেয় ঈশ্বর তোমাকে দেখবেন। মানুষ যদি দেখে জগতে আমার আর কেউ নেই সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্রের কাছে বিশেষ কিছু নেই ঐ আংটি ছাড়া, সেটাই তিনি তাঁর হাতে তুলে দিলেন যাঁর ভেতরে সবচেয়ে সম্ভবনা বেশি সীতা পর্যন্ত পৌঁছানোর।

আংটি দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, *অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম*, হে হনুমান! এই কাজের জন্য তুমিই প্রমাণ। মাপ যে ধাতু থেকে এসেছে প্রমাণ ঐ একই ধাতু থেকে এসেছে। এখানে বলছেন, তোমার মধ্যে সেই সামর্থ আছে। *জানামি সত্ত্বং তে*, সত্ত্ব মানে বুদ্ধি, তোমার বুদ্ধিকে আমার ভালোভাবে জানা আছে। প্রথম সাক্ষাৎকারে হনুমান যেভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সাথে কথা বলেছেন, তারপর যেভাবে হনুমান সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করিয়েছেন, সেখানেই শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের আসল পরিচয়টা পেয়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি বলতে পারছেন, তোমার বিদ্যাবুদ্ধির উপর আমার কোন সংশয় নেই, এই কাজ করতে একমাত্র তুমিই সক্ষম, সেইজন্য এই আংটি

তোমাকেই দিলাম। হনুমানের দলে কয়েকজন খুব নামকরা বানর সেনাপতিরা ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বালীপুত্র অঙ্গদ। এই দলটাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। যাই হোক, সব বানররা চারটে দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, যত জঙ্গল, পর্বত, গুহা, দেশ আছে সব জায়গায় সীতার অনুসন্ধানে লেগে গেল। এরপর কাহিনী দক্ষিণ দিকের দলকে নিয়েই এগিয়ে গেছে, বাকীদের কাহিনীর বর্ণনা নেই।

স্বয়ংপ্রভা যোগিনীর সাথে বানরদের সাক্ষাৎ

জঙ্গলে কোন এক রাক্ষসকে দেখে রাবণ মনে করে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। কিন্তু সেখানে সীতার কোন অনুসন্ধান না পেয়ে সবাই আবার এগিয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে এমন এক জায়গায় পোঁছে গেছে যেখানে কোন জলের দেখা নেই। পিপাসায় সবার গলা শুকিয়ে গেছে। কিছু দূর এগিয়ে তারা একটা গুহা দেখতে পেল। কিছু পাখি, যারা জলের ধারে থাকে, গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই ঠিক করল এই গুহার ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যাক। গুহার ভেতর প্রবেশ করে দেখছে একটা জায়গায় অনেকগুলো জলাশয়, যার জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। চারিদিকে একটা মনোরম পরিবেশ, সবাই অনুভব করছে যে স্থানটায় একটা সাত্ত্বিক ভাব বিরাজ করছে। অনেক রকমের দিব্য বৃক্ষ আর প্রত্যেকটি বৃক্ষই ফলে পরিপূর্ণ। কিন্তু কোথাও কোন প্রাণী দেখা যাচ্ছে না। কিছু গৃহ তাদের নজরে এল। গৃহে প্রবেশ করে দেখছে গৃহে প্রচুর জিনিসপত্র রয়েছে কিন্তু কোন মানুষের নামগন্ধ নেই। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখছে খুব সুন্দর একটি সিংহাসনে এক নারী বসে আছেন –

প্রভয়া দিপ্যমানাস্তু দদৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্।
ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্।৪/৬/৪০

বলছেন তিনি এক যোগিনী। তন্ত্রের দিক থেকে পরে যোগিনী শব্দ আসার পর যোগিনী শব্দকে খুব একটা ভালো অর্থে নেওয়া হত না। এখানে অবশ্য যোগী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়েছে। তিনি চীরবসন পরিহিতা আর ধ্যানরতা। ধ্যান মানুষ অনেক রকমের করে, বিষয়ের চিন্তন করাও এক ধরণের ধ্যান, কিন্তু এখানে বলছেন ধ্যান করছেন আর *যোগমাস্থিতাম্*, তিনি যোগে অবস্থিত। মনের সমস্ত রকম সঙ্কল্প-বিকল্পকে নিরোধ করে ধ্যান করছেন। *প্রভয়া দিপ্যমানাস্তু*, তিনি এত বড় যোগিনী যে তাঁর শরীরের প্রভা পরিবেশকে দিপ্যমান করে রেখেছে। এই ধর্মীয় বিশ্বাস সব ধর্মেই আছে, যাঁরা ঈশ্বরের সাথে এক তাঁরা যখন ধ্যান করেন তখন তাঁদের শরীর থেকে যেন আভা বেরোয়, ইংলিশে Halo বলে। আসলে এই ধরণের কোন আভা শরীর থেকে বেরোয় কিনা আমরা জানি না, কিন্তু যাঁরা জপ-ধ্যান করেন তাঁদের চোখে-মুখের একটা পরিবর্তন হয়। তবে শরীর থেকে আলো বের হওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি উড়িয়েও দেওয়া যায় না। আমেরিকার এক সেন্টারে একজন ভক্তিমতি মহিলা মহারাজদের ক্লাশে যেতেন। তিনি অনেক স্মৃতিকথা লিখেছেন, তাঁর লেখা অনেক পত্রপত্রিকাতেও প্রকাশিত হত। একটি স্মৃতিকথায় এক মহারাজের কথা লিখতে গিয়ে বলছেন, মহারাজ যখন ক্লাশ নিতেন তখন তাঁর আঙুল থেকে যেন সব সময় আলো বের হত। আর বলছেন, এমন কোন দিনই হয়নি যে ক্লাশের সময় তাঁর শরীরটা দেড় দুই গুণ বড় দেখিনি। উনি দেখছেন ওনার শরীরটা বড় হয়ে গেছে আর হাত থেকে আলো বের হচ্ছে। আমরা যা কিছু দেখি সব মস্তিষ্কের মাধ্যমেই দেখি, তাই বলা মুশকিল তিনি ঠিক কি দেখেছিলেন। তবে সাধারণ ভাবে দেখা যায় যাঁরা জপ-ধ্যান করেন তাঁদের চেহারাতে একটা স্নিগ্ধ ভাব থাকে, এতে কোন সন্দেহ নেই। জপ-ধ্যান করার জন্য সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়, সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির জন্য আলোময় মনে হয়। আর সূক্ষ্ম জগতের যে আলোর ব্যাপার সেটা থাকতেই পারে। এখানে বলছেন *প্রভয়া দিপ্যমানাস্তু*, এক আসনে বসে ধ্যানের মধ্যে ডুবে আছেন, মনে হচ্ছে তাঁর শরীর থেকে যেন আলো বেরিয়ে আসছে। যাঁরা প্রচুর ধ্যান-জপ করেন তাঁদের সামনে মানুষ যেন একটু সম্ভ্রম চিত্ত হয়ে যায়। অন্য রকম যে হয় না তা নয়, যারা অত্যন্ত নিম্ন প্রকৃতি, ক্রূঢ় প্রকৃতির, তারা এদেরকেও আক্রমণ করে দিতে পারে। আলোময়, জ্যোতির্মন দেখাটা যিনি দেখছেন তাঁর মনের উপরও নির্ভর করে। বানররা যোগিনীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভয় পেয়ে গেছে। প্রণামাদি করার পর উনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তখন তারা খুব সংক্ষেপে বলল, আমরা শ্রীরামের দূত, সীতার খোঁজে তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন। বানরদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর দেখে তিনি বললেন, তোমরা যাও আগে নিজেদের ইচ্ছেমত ফলমূলাদি ভক্ষণ কর আর সুস্বাদু জলপানাদি করে এসো তারপর আমি আমার সব কথা বলছি। সব বানররা আনন্দে ভোজন করতে চলে গেল।

সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ওখানে ফিরে এসেছে। তিনি বলছেন, আমার নাম স্বয়ংপ্রভা। স্বয়ংপ্রভা নামের অর্থেই বোঝা যায় যে তিনি একজন উচ্চমানের যোগিনী। আমাদের একটা ভুল ধারণা যে মেয়েদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ছিল না। আমাদের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন, বেদে আমরা অনেক ঋষিকাদের কথা পাই, আর রামায়ণেই শবরীর মত একজন উচ্চমানের সাধিকাকে পেলাম আর এখানে স্বয়ংপ্রভার কথা পাচ্ছি। অনেক নারী ছিলেন যাঁরা মন প্রাণ দিয়ে যোগ সাধনা করতেন। পরের দিকে বেশির ভাগ মেয়েরা ভক্তিভাবকে আশ্রয় করেছেন, কারণ তাঁদের ঘরসংসার সামলাতে হয়। কিন্তু তাই বলে ভক্তি সাধনার বাইরে অন্য কোন সাধনা যে করতেন না তা নয়। স্বয়ংপ্রভা তখন তাঁর নিজের ইতিহাস বলতে শুরু করলেন –

তস্যা অহং সখী বিষ্ণুতৎপরা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণী।
নাম্না স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্বতনয়া পুরা।৪/৬/৫৩

অনেক অনেক কাল আগে বিশ্বকর্মার হেমা নামে এক পুত্রী ছিল। হেমা নৃত্যের মাধ্যমে শিবের আরাধনা করতেন। শিব খুশি হয়ে এই দিব্য জায়গাটা তাঁকে দিয়েছিলেন। আমি হলাম তাঁর সখী, আমার নাম স্বয়ংপ্রভা, আমি মোক্ষকাঙ্ক্ষিণী। ধর্মের নামে মানুষ অনেক ইচ্ছার পুর্তি করতে চায়, কেউ কষ্ট নিবারণ চায়, সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছা, শুধু সুখপ্রাপ্তিই নয় কোন একটা বিশেষ ইচ্ছার পুর্তি করতে চায়। স্বয়ংপ্রভা বলছেন, আমার ইচ্ছা মোক্ষ লাভ করা। তার জন্য তিনি নারায়ণের ধ্যান করেন। শাস্ত্রে বার বার আসে যদি কেউ জ্ঞান পেতে চায়, মোক্ষ লাভ করতে চায় তখন আর শুদ্ধ পরমাত্মা ছাড়া হয় না। মোক্ষ মানেই হয় নেতি নেতি, নেতি নেতি সাধনা ছাড়া মোক্ষ হয় না, জগৎ যতক্ষণ খসে না যায় ততক্ষণ মোক্ষ হয় না। ভক্তি সাধনা যখন করছে তখনও নেতি নেতি দিয়েই হয়, তখনও জগৎ খসে পড়ে যায়। সাংসারিকতার লেশ মাত্র থাকবে না। সাংরিকতার লেশ মাত্র যে থাকবে না, এটা আত্মার শুদ্ধ স্বভাব ছাড়া হয় না। অন্য সব কিছুতেই অজ্ঞান, অবিদ্যা লেগে থাকবে। যাই হোক স্বয়ংপ্রভা বলছেন, আমার বান্ধবী হেমার যখন ব্রহ্মালোকে চলে যাওয়ার সময় হল, তখন তিনি আমাকে বললেন –

তত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্বপ্রাণিবিবর্জিতে।৪/৬/৫৪
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
ভূতভারহরণার্থায় বিচরিষ্যতি কাননে।৪/৬/৫৫

তুমি এই প্রাণি বিবর্জিত স্থানে অবস্থান করে তপস্যা কর, এখানে তোমার খাওয়া, থাকা, পানীয় সবই সহজ লভ্য। আগে থাকতেই হেমা বলে দিচ্ছেন, এখানে থেকে তুমি তপস্যা কর আর ত্রেতাযুগে ভূভার হরণের জন্য দাশরথি রূপে অবতীর্ণ হয়ে বনে বিচরণ করবেন, বানররা তাঁর ভার্য্যার অন্বেষণ করতে করতে তোমার এই গুহার মধ্যে আসবে। তুমি তাদের আদর অভ্যর্থানাদি করে সেবাদি করবে আর তাতেই তুমি বিষ্ণুধামে গমন করবে। তত্ত্বের দৃষ্টিতে এর আগে আমরা আলোচনা করলাম রামকথা আগে আর রাম পরে এসেছেন। কিন্তু তত্ত্বের দৃষ্টিতে কোন মানুষ বুঝতে পারবে না, কিন্তু তাকে তো বোঝাতে হবে। কিভাবে বোঝাবে? হাজার হাজার বছর আগে তাঁকে বলেই দেওয়া হয়েছে, আজ থেকে হাজার বছর পর শ্রীরামের কাজে বানররা এখানে আসবে, তাদের তুমি সেবা করার পর তোমার মুক্তি হয়ে যাবে। এর আগে অহল্যাকেও গৌতম মুনি বলে দিয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র আসবেন। এর একটা বিশেষ অর্থ আছে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে। গীতায় ভগবান বলছেন, *বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন।।৭/২৬।* যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর অজানা কখনই কিছু থাকবে না। আমরা সব সময় রাম রূপে ভাবছি, রামকৃষ্ণ রূপে ভাবছি তিনি সবটাই জানেন। ঐ অর্থে নেওয়ার জন্যই সব গোলমাল হয়ে যায়। তাঁর নির্বিকল্প রূপ রূপে চিন্তা করলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়, শুদ্ধ চৈতন্যের কাছে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন কিছুই অজানা থাকতে পারে না। যদি কিছু অজানা থাকে তাহলে তাঁর জ্ঞান সীমিত হয়ে গেল, তখন তিনি আর ভগবান থাকবেন না। এই কথাই শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সবটাই জানি কিন্তু আমাকে কেউ জানতে পারে না, এখনে শ্রীকৃষ্ণকে না রেখে যদি সচ্চিদানন্দ রূপে দেখলে জিনিসটা সহজে বোঝা যায়। সমুদ্র আছে, সমুদ্রে অসংখ্য ঢেউ উঠছে, সমুদ্র বলছে ঢেউগুলো কোন দিন আমাকে জানতে পারবে না কিন্তু আমি সবটাই জানি। এই আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণকে যদি না নেওয়া হয় তাহলে সচ্চিদানন্দ বা ঈশ্বরের যে জ্ঞানের রূপ, যেটাকে চিৎ রূপ বলছেন, এই রূপটা খসে পড়ে যাবে। যদি নেওয়া হয় তখন মনে হবে তাহলে ঈশ্বরের সবটাই আগে থেকে জানা আছে। আগে থেকে জানা

থাকলে স্বাভাবিক ভাবে এটাই দাঁড়াবে আগে থেকে সব কিছু ঠিক করা আছে। সব কিছু যদি পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে তাহলে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছুই থাকল না। তাহলে তো বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে। আমরা সবাই তাহলে সারাটা জীবন ধরে করছিটা কি? শাস্ত্রে বেশি ঢুকলে এমন এমন জটিলতা চলে আসে যে মাথা ঘুরে যায়। একটাই মূল কথা, তিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই চিন্ময়। চিন্ময় মানেই তিনি সবটাই জানেন। সবটাই জানেন মানে পরে পরে যা হবে সেটাও তাঁর জানা আছে। পরে যা কিছু হবে সব যদি জানা থাকে তাহলে যা কিছু চলছে সবটাই ফালতু, ফক্কা। ঐটাই হবে যেটা হওয়ার আছে। তাহলে এই সংসার, সংসারে আমি, আপনি, তিনি এসব কি? তখন বোঝা যায় যে এটা হতে পারে না। সত্তা কখনই দুটো হতে পারে না। আমিও করছি তিনিও করছেন, দুটো সত্তা হয় না। যখনই বলা হয় সব তাঁর ইচ্ছা, তখন এটাই বলা হচ্ছে যে আমার ইচ্ছা বলে কিছু নেই। দুটোর মধ্যে একটা নিতে হবে, হয় আপনি আপনার ইচ্ছা মত চলুন তখন ঈশ্বরকে মানা হবে না, তা নাহলে ঈশ্বরের ইচ্ছা বললে তখন আমার আপনার ইচ্ছা বলা যাবে না।

যিনি সবটাই জানেন, আগে থেকেই জানেন কি হবে, তাই যদি হয় তাহলে জগতে আর কিছু করার কি কোন অর্থ আছে? এ্যস্ট্রিক্সের কমিকসে একটা কাহিনীতে দেখাচ্ছে, এ্যস্ট্রিক্সকে বলা হয়েছে সিজারের সময়কার একজনের সঙ্গে দৌড়াতে হবে। ওখানে স্থানীয় বৈদ্য এক ধরণের ওষুধ তৈরী করে খাইয়ে দিলে হাতির মত শক্তি এসে যায়, ও একাই সবাইকে পিটিয় দেবে। ওরা আগেই বলে দিয়েছে আমরা এটা সেবন না করলে এই কাজ করতে পারব না। এতে ওদের আপত্তি আছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় দৌড়বীরের সাথে এ্যস্ট্রিক্স দৌড়াতে শুরু করেছে। এ্যস্ট্রিক্স সেই দৌড়বীরের সাথে গল্প করতে শুরু করে দিয়েছে, দৌড়াচ্ছ দৌড়াও কিন্তু তাতে গল্প করতে কি দোষ। লোকটি তো এ্যস্ট্রিক্সের উপর খুব খেপে গেছে। হঠাৎ দেখে রাস্থার ধারে গাছে ভালো ফল ফলে রয়েছে। এ্যস্ট্রিক্স গিয়ে সেই ফল পাড়তে শুরু করেছে। ততক্ষণে লোকটি অনেকটা দৌড়ে এগিয়ে গেছে। এ্যস্ট্রিক্সও কিছু ফল নিয়ে লোকটির পেছনে দৌড়ে ধরে ফেলে বলছে, তোমার জন্য কিছু ফল পাড়তে গিয়েছিলাম, দ্যাখো আমি এসে গেছি। লোকটি দেখছে এর সাথে কে দৌড়ে পারবে! তখন সে খুব সুন্দর একটা কথা বলছে, আমাদের গ্রামেও এই রকম প্রতিযোগিতা হয়, সেখানে আমরা সবাই ম্যজিক ওষুধ খেয়ে নিই। সেইজন্য আমরা সবাই একসঙ্গে ফাস্ট আসি। যার জন্য প্রাইজ দেওয়ার সময় আমরা লটারি করি। গ্রামের একশজন দৌড়াচ্ছে সবাই সোমরস পান করে আছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই একসাথে যাচ্ছে। একজনকে প্রাইজ দিতে হবে, সেইজন্য লটারির মাধ্যমে ঠিক করে নেওয়া হয়।

গল্পটা হাসির, কিন্তু কাহিনীটা এর মধ্যে লাগিয়ে দিলে একটা মজার জিনিস বেরিয়ে আসে। প্রথম হল এটাকে কি দৌড় প্রতিযোগিতা বলা যাবে? সবাই একসাথে দৌড় শুরু করছে, একসাথে দৌড় শেষ করছে। এতো আর প্রতিযোগিতা থাকল না। এরপর একটা লটারি হয়ে ঠিক করা হল কে প্রথম হয়েছে। এটাই গ্রামের একটা মজা। আমাদের জীবনটা ঠিক তাই। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখলে এই জগত সংসারের সবটাই তাঁর জানা। কার জানা? যিনি এগুলো করছেন। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সবটাই একটা মজা। এটাকেই এনারা বলছেন লীলা। সবটাই সত্য বলে মনে হয়, সবাই দৌড়াচ্ছে দেখছি সবই সত্য কিন্তু সবটাই ফাক্কা। এখানে বাংলায় একজন মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লীতে একজন প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকায় একজন রাষ্ট্রপতি, সবাই বিরাট বিরাট ক্ষমতাবান। ক্ষমতা দেখাচ্ছে কোথায়? যে একজন জেলে পড়ে আছে, সে আবার আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। কেউ যদি জানতে পারে মুখ্যমন্ত্রীর ভেতরে যে নারায়ণ আর জেলে যে আছে তার মধ্যেও সেই নারায়ণ। আর দুজন যা কিছু করছে সবটাই তাদের আগে থেকেই জানা আছে, আগে থেকেই জানা আছে মানে আগে থেকেই ঠিক করা আছে, পুরোটাই got up case। গোটা সংসারটাই যদি got up case হয় তাহলে পুরো জিনিসটাই ফাক্কা ছাড়া কিছুই না। আমার চোখের জলেরও কোন দাম নেই, এটা ঠিক যে আমি এখন এই জিনিস পছন্দ করছি না, সেইজন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমি ঐ অবস্থায় চলে যেতে পারি। ঘোর অদ্বৈতী না হলে এই ভাব হবে না। যখনই দ্বৈত ভাব এসে যাবে তখন জিনিসটা অন্য রকম হয়ে যায়। দ্বৈত ভাবে ভগবান আলাদা আমি আলাদা, সত্তা দুটো হয়ে গেল। তিনি যেমন নাড়াচ্ছেন আমিও তেমন নড়ছি, তখন আমি হয়ে গেলাম সেবক। সেবক কখনই মালিকের সমান হতে পারবে না। তখন আমার ইচ্ছা এক রকম মালিকের ইচ্ছা আরেক রকম হবে। মালিকের ইচ্ছার মত না করতে পারলে অনেক আপদ-বিপদ এসে যেতে পারে। এই ভাবটাই ইসলাম, খ্রীশ্চান ধর্ম এবং কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদের ভাব। ভগবান মালিক আমরা তাঁর সেবক, আমাদের ক্ষমতা খুবই সীমিত। কিন্তু সব কিছুকে যখন বেদান্তের দৃষ্টিতে দেখা হয় তখন এক

কথাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন একটাই কথা, সব কিছু মায়া, সব কিছু তাঁর লীলা। মানুষ যে দুঃখ-কষ্ট পায় তার একটিই কারণ, তার মধ্যে এই বোধটা আসছে না বলেই দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে। বোধ আনাটাই সাধনা। যখন এটাকেই কাহিনীর মাধ্যমে নিয়ে আসা হবে তখন বলবেন, গৌতম মুনি আগেই বলে দিলেন, তুমি এখন এভাবে থেকে তপস্যা করে যাও, এত বছর পর শ্রীরামচন্দ্র আসার পর তুমি তাঁর সেবা করবে তখন তোমার মুক্তি হবে। তিনি এত বছর পর আসবেন। এই আইডিয়াটা তাঁরা কোথায় পেলেন? বাড়িতে মা যেমন ছেলেকে বলে, তুমি দুষ্টুমি করছ তো, ঠিক আছে তোমাকে এখন ঘরে আটকে রাখছি বাবা এসে তোমাকে মজা দেখাবে। এই জিনিসটাকেই বেদান্তের যে শেষ কথা সেটার সাথে জুড়ে দিচ্ছেন। কাহিনীটাও সুন্দর হয়ে গেল আর তত্ত্বটাও ভালোমত দিয়ে দেওয়া হল। সচ্চিদানন্দই শুধু আছেন আর তিনি সবটাই জানেন, সৃষ্টি যখন করছেন তখনও তিনি সব জানছেন আর সৃষ্টিতে কি কি হবে সেটাও জানেন, আরও মজার ব্যাপার সৃষ্টিতে যা কিছু হয়েছে সব কিছু তিনিই হয়েছেন। পুরো জিনিসটাই খুব মজার। এটা কোন তত্ত্ব বলে মনে করার কিছু নেই, এটাই সত্য। এই সত্যের মধ্যে আমার আপনার মধ্যে যে একটা বিস্মৃতি হচ্ছে সেটাও কিন্তু সত্য। বিস্মৃতিটাই একমাত্র সত্য, কারণ বিস্মৃতি যদি না থাকে তাহলে কোন কিছুই জমবে না। বৌদ্ধ ধর্মে একটা সিদ্ধান্ত আছে, সবারই যত দিন মুক্তি না হয় ততদিন ভগবান বুদ্ধ থাকবেন। স্বামীজীর এই ভাবট খুব পছন্দের ছিল। ঠিক ঠিক বেদান্তও সবারই মুক্তির কথা বলে। কারণ তিনিই তো সব কিছু হয়েছেন, তিনিই লীলা খেলা করছেন। বলা হয় যে, যোগীরা শেষ অবস্থায় যাবার আগে জাতিস্মর হয়ে যান। জাতিস্মর হয়ে যাওয়া মানে তিনি দেখছেন আমি কখন এভাবে খেলা করেছি কখন ওভাবে খেলা করেছি, তারপর শেষে ঐ জায়গাতে পৌঁছে যাচ্ছেন। শুধু যে যোগীরাই পৌঁছে যাচ্ছেন তা নয়, সবাই ঐ জায়গাতে পৌঁছাবে। কেউ আজ পৌঁছাবে কেউ কাল পৌঁছাবে, যার যত মরিয়া ভাব সে তত তাড়াতাড়ি যাবে। স্বয়ংপ্রভার গল্পে ঐ ঘটনাকেই সামনে নিয়ে আসছেন। যোগীরা কখন সখন অনন্তের যে মন সেখানে পৌঁছে যান আর ওখান থেকে একটা কোন আইডিয়া রূপ নিতে শুরু করে। স্বামীজী মাঝে মাঝে যে বলছেন, এই রকম হবে, এই হতে যাচ্ছে, এর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস তিনি নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বলছেন আবার অনেক কথা, যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর মনে যেমনটা আছে সেটাকে তিনি অনুভব করে তারপর বলছেন। যীশুও যখন নিজের শিষ্যদের বাছাই করছেন তখন তিনি জানেন এরাই পারবে, অথচ তাঁরা অতি সাধারণ লোক।

এই জিনিসটা বুঝতে হবে যে, দ্বৈতে থেকে অদ্বৈতকে ভাবা যায় না, অদ্বৈতে থেকে দ্বৈতকে ভাবা যায় না। যখন যেটা চলে তখন সেটাই চলে। রেসে যখন ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করে তখন কেউ চাইলে তার ঘোড়া পাল্টাতে পারবে না। যখনই কেউ দ্বৈতের ভাবে থাকে, ব্যবহারে দ্বৈতের ভাব আছে সে কখনই অদ্বৈতের কথা বলতে পারে না। ঠাকুরও বলছেন, যতক্ষণ আমি ভাব আছে ততক্ষণ সংসার মিথ্যা বলা যাবে না। আমি ভাব থাকলেই তার গুরু-শিষ্যের ভেদ থাকবে, নারী-পুরুষের ভেদ থাকবে আর ভগবান ও ভক্তের ভেদ সব সময়ই থাকবে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন কাশীতে ছিলেন, কয়েকজন শিষ্য তাঁকে বলছেন, মহারাজ! আপনি তো আমাদের কোন উপদেশ দেন না। মহারাজ বলছেন, আমিও চাই তোমাদের উপদেশ দিতে কিন্তু যখনই উপদেশ দিতে যাই তখন দেখি তোমরা সবাই সেই নারায়ণ, নারায়ণকে কি উপদেশ দেব! যখনই কেউ উপদেশ দিতে যাবে তখনই তার কিন্তু দ্বৈত ভাব এসে যাবে। দ্বৈত ভাব এসে গেলে অদ্বৈতের কোন কথা বলা যাবে না। শাস্ত্রও যখন যেটাকে নিয়ে চলেন তখন সেটাকে নিয়েই চলেন, দুটো জিনিসকে মিশিয়ে দেন না। জগতকে সত্য মনে করলে সবাইকে দ্বৈত ভাবেই সব চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যখন মনে হবে অদ্বৈত ভাবটাই ঠিক ঠিক, অদ্বৈতই ঠিক ঠিক যুক্তিযুক্ত, তখন তার জীবনচর্চা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটাই পাল্টে দিতে হবে, আর চিন্তা-ভাবনা, কথাবার্তা সবটাই পাল্টে যাবে। দ্বৈত ভাবে দেখলে তখন সমস্যা হয়ে যাবে, ভগবান আছেন আমরা আলাদা, তিনি আমাদের কলকাঠি নাড়ছেন, এই ভাব নিয়ে থাকলে যত রকম দুর্বলতা আছে সবটাই তখন সত্য হয়ে যায়, ভীতি জিনিসটা খুব শক্তিশালী হয়ে যায়। বলাই হয়, যেখানেই দ্বৈত সেখানেই ভয়। মনের মধ্যে সব সময় দুশ্চিন্তা লেগে থাকে, এই বুঝি ভগবানের কাছে দোষ করে ফেললাম, এই বুঝি কোন ত্রুটি হয়ে গেল, এই কাজটা বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করে ফেললাম। আর তখন কিছু সুযোগ সন্ধানী বাবাজী জুটে গেলে তো আর কথাই নেই, সব সময় ভয় দেখাতে থাকবে। অদ্বৈতে কোন ভয় থাকে না। সাধারণ মানুষের জন্য অদ্বৈত অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অদ্বৈতের ভাব মাথায় নিয়ে চললে জীবনে শান্তি ও শক্তি অনেক বেশি আসবে উপরন্তু শাস্ত্রের জিনিসগুলো বুঝতেও সুবিধা হয়।

কৃষ্ণ ভগবান, রামও ভগবান, কিন্তু ভগবান দুটো কি করে হবেন? বেদে যে ইন্দ্রাদি দেবতার নাম এসেছে, পরের দিকে হিন্দুরা তাঁদের ভগবান পর্যায়ে নিয়ে গেলেন, যেমন বিষ্ণু ভগবান হয়ে গেলেন। দেবতাদের শত্রুদের বলা হত অসুর। পার্সিরা অসুরকেই ভগবান বলে মনে করে, আহুর মাজদা। পার্সিরা ইন্দ্রকে একজন বদমাইশ রূপে দেখে। বেদেও অসুরদের চরিত্র অনেক বেশি দৃঢ় ও সঙ্গতিপূর্ণ, তুলনায় দেবতাদের চরিত্র অনেক গোলমেলে। তেমনি মহাভারতে পাণ্ডবদের চরিত্রে অনেক গোলমাল, দুর্যোধনের চরিত্রে অনেক consistency আছে। জরাথ্রুষ্ট্র ইন্দ্রাদি দেবতাদের পূজা বন্ধ করে দিলেন। পার্সিরা পূজো করে আহুর মাজদার, তিনি ভগবান। তা সত্ত্বেও পার্সিরা আজও ভারতবর্ষে সম্মানের সাথে বাস করে যাচ্ছে। পার্সিরাও অগ্নিতে আহুতি দেয়, ওরাও সোমরস পান করে কিন্তু অন্য দিকে দেবতাদের যারা শত্রু তাদের ভগবান বলে পূজা করে। আর পার্সিদের যে শত্রু তাকে হিন্দুরা ভগবান বলে পূজা করে। পার্সিদের স্বভাব হিন্দুদের তুলনায় অনেক নরম, কথা বলতে গেলে কত মিষ্টি করে কথা বলে। আমাদের কাছে দেবতা মানে ভগবান আর পার্সিদের কাছে অসুর ভগবান, এটা কি করে হয়? এগুলো কিছুই না, মন দিয়ে যখন দেখা হয় তখন সেটাকে দ্বৈত বলা হয় আর মন ছাড়া যখন দেখা হয় তখন সেটাই অদ্বৈত। আমরা সবাই জগতের সাথে এত বেশি জড়িয়ে আছি যে আমরা মনে করি ভগবান আমাদেরই মত একজন কোন ভদ্রলোক। আমরা সব সময় যা কিছু ভাবছি সব নাম আর রূপ দিয়েই ভাবছি, নাম-রূপ ছাড়া আমরা কোন কিছু কল্পনাই করতে পারি না। যখন ঈশ্বরকে ভাবছি তখন তিনিও আমাদের একজন জামা-কাপড় পড়া কোন ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর জ্ঞান, শক্তি, করুণা আমাদের তুলনায় বেশি। যতই বেশি হোক তিনি আমাদের মতই একজন। কিন্তু তিনি তো তা নন, তিনি নাম-রূপের বাইরে। যিনি নাম-রূপের বাইরে, তাঁকে কেউ দেখবে বিষ্ণু রূপে, কেউ তাঁকে দেখবে বিষ্ণুর শত্রু আহুর মাজদা রূপে। যদি না দেখে তাহলে ভগবানের যে পরিভাষা সেটাই ভুল হয়ে যাবে। যদি তাঁকে কেউ আল্লা রূপে, কেউ কালী রূপে, কেউ জেহোবা রূপে না দেখে তাহলে ভগবানকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। কালী কে? ঠাকুর বলছেন কালীই ব্রহ্ম। কালী আবার সাঁওতালীদের অত্যন্ত সাধারণ একজন দেবী, সেই দেবীকে হিন্দুরা কালী রূপে পূজা করতে শুরু করে দিল। ঠাকুর আবার সেই কালীকেই বলছেন কালীই ব্রহ্ম। এইভাবে দেখাটাই ঠিক, এটা যদি ঠিক না হয় পুরো হিন্দু ধর্মের মৌলিক যে ভীত সেটাতেই গোলমাল লেগে যাবে।

আমরা সামনে যা কিছু দেখছি প্রত্যেকটি বস্তুই একটা well defined বস্তু, এই পাখা একটা well defined জিনিস। ঠিক তেমনি ভগবানও একটা well defined জিনিস। ভগবান যখনই well defined জিনিস হয়ে যান তখন আমরা ভাবি, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান ঠিকই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের একটা বেশ ধারণ করে এসেছেন। তাহলে শিব কি? শিব হলেন একজন অত্যন্ত সাধারণ দেবতা, যে দেবতাকে আদিবাসী উপজাতিরা পূজা করত। তাহলে সেই শিব আজ যোগীশ্বর শিব কিভাবে হয়ে গেলেন? কারণ এটাই ঠিক যিনি বিষ্ণু তিনিই শিব, এটা যদি না হয় তাহলে নাম-রূপের পারে তিনি যাবেন না। নাম-রূপের পারে যিনি তাঁকে মন দিয়ে দেখলে তখন দ্বৈত রূপে দেখাচ্ছে। যখন দ্বৈত রূপে দেখাবে তখনই কিন্তু একজন স্রষ্টা, একজন ঈশ্বরের আবির্ভাব হবে। সেই স্রষ্টা বা ঈশ্বর কে হবেন? আপনার আমার মন যেমনটি তেমনটি সেই ঈশ্বরকে হতে হবে। দশজন বড় ঋষি দশটা ফুটো দিয়ে বায়স্কোপ দেখছেন, দশটা ফুটো দিয়ে তাঁরা জিনিসটাকে দশ রকম ভাবে দেখছেন। ফুটো কত বড়, ফুটোতে কি কাঁচ লাগানো, কি রঙের কাঁচ সেই অনুসারে দেখবেন। সত্য সেই একটাই কিন্তু দেখাবে দুটো। তাহলে সত্য কটা হবে? অসংখ্য। যেটা বাস্তবিক সত্য সেটা এক রকম, কিন্তু সেটাকে মন দিয়ে কখনই জানা যাবে না, মন দিয়ে জানতে গেলে সব সময় তাকে ঐ ফুটো দিয়েই জানতে হবে। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, একটা বিরাট প্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরের ওপাশে খুব আমোদ-আহ্লাদ চলছে। তিনজন বন্ধু প্রাচীরের এপার থেকে ভাবছে ওদিকে কি হচ্ছে দেখলে হয়। একটা মই এনে প্রথমজন প্রাচীরের উপর উঠে ওপারের আমোদ-আহ্লাদের দৃশ্য দেখে আনন্দে হো হো করে সেদিকে লাফিয়ে পড়ল, এই করে দ্বিতীয় জনও লাফিয়ে পড়ল। যে ওদিকে চলে গেল সে আর কোন খবর দিতে পারল না। অদ্বৈত মানেই হল, ওর খবর পাওয়া যায় না। কখন কখন কদাচিৎ কোন অবতার বা ঈশ্বরকোটি পুরুষ ফেরত এসে আকার ইঙ্গিতে ওখানকার কথা বলেন। কিন্তু তিনিও আসার পর একটা ফুটো হয়ে যাচ্ছেন যেটা দিয়ে আমরা অনন্তকে দেখছি। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই বিরাট প্রাচীরের একট বড় ফুটো, যখন কেউ অনন্তকে দেখছে তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছে, কেউ শ্রীরামচন্দ্র রূপে দেখছে, কেউ শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখছে। আবার কেউ আহুর মাজদা রূপে দেখছে কেউ আবার বিষ্ণু রূপে দেখছে। আমরা এর যতই আলোচনা করি না

কেন, আমাদের মস্তিষ্কের প্রোগ্রামিং এমন ভাবে সেট করা আছে যার জন্য সব সময় মনে করছি ঈশ্বর মানে আমাদের মতই তিনি একজন কোন বিশেষ ভদ্রলোক। পোশাক পাল্টে কখন শ্রীকৃষ্ণ রূপে, কখন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিষ্ণু বা আহুর মাজদা রূপে আসছেন। কিন্তু তা তো নয়, পুরো ব্যাপারটাই অন্য রকম। ঠিক তেমনি অদ্বৈত আর দ্বৈতের ক্ষেত্রেও তাই হয়, ঐ সত্তাকে হয় মন দিয়ে দেখা হয়, তা নয়তো মন ছাড়া দেখা হয়। মন ছাড়া দেখাটাই অদ্বৈত। কিন্তু একমাত্র নির্বিকল্প অবস্থাতেই ঐ বোধ করা যায়। তাঁকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করা যায় না, বস্তুকে আমরা যেভাবে জানি সেভাবে তাঁকে জানা যায় না। যদি এগুলো করতে হয় তাহলে সব সময় মনের মাধ্যমে করতে হয়। যেমনি মনের মাধ্যমে নেমে গেল তেমনি দ্বৈত সত্য। সেইজন্য দ্বৈতও সত্য অদ্বৈতও সত্য। সব কিছু নির্ভর করছে সে স্বাভাবিক ভাবে 'আমি'র এলাকায় থাকছে নাকি 'আমি'র এলাকার বাইরে বিচরণ করছে। যদি 'আমি'র এলাকার বাইরে বিচরণ করে তাহলে তার জন্য অদ্বৈত। আর যার কাছে মনের এলাকা, জগৎ, সংসার খুব প্রিয়, আমি ও আমার ভাব প্রবল তাহলে স্বাভাবিক ভাবে তার জন্য দ্বৈত।

স্বয়ংপ্রভা নিজের কাহিনী বলার পর বলছেন, আপনাদের সেবা করার সুযোগ পেলাম, এই সেবা করার জন্য আমার এখন যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। সাধনার ব্যাপারে ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, সবটাই তিনিই করেন। একটা মতে বলা হয়, মানুষের কি ক্ষমতা আছে যে সংসারকে মন থেকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের ধ্যান করবে! পুত্রৈষণা আর বিত্তৈষণা এই দুটোর উপরই সংসার চলছে। এরা করবে ঈশ্বর চিন্তন! কখন কি সম্ভব! মাতৃসঙ্গীতে বলছেন, কারে দাও মা ব্রহ্মপদ কারে করো অধোগামী। অধোগামী যে অর্থে বলছেন সেই অর্থে ভগবান কাউকে অধোগামী করতে পারেন না। ক্ষেতে জল আনার জন্য খাল কাটা হচ্ছে, মূল ধারার কাছে এসে খাল কাটাটা ছেড়ে দেয়। জলের তোড়েই ঐটুকু ভেঙে যায়। কিন্তু বলছেন সাধনার সময় সবটা তিনিই করে দেন, শেষের দিকে তিনি সরে যান। প্রথমের দিকে তাঁকে দিয়ে ভগবান একটু করিয়ে নেন, তাতে সাধক মনে করে আমি সাধনা করছি, এই করছি, সেই করছি। যোগশাস্ত্রে যোগ পথের যে বর্ণনা করা হয় তাতে একটা ধারণা করা যায় সাধনার পথ কত কঠিন, ঈশ্বরীয় শক্তি না থাকলে ওই সাধনা সম্ভব না। এখানে স্বয়ংপ্রভার কাহিনীটা খুব সুন্দর। স্বয়ংপ্রভা কি সাধনা করেছিলেন আমরা জানি না, কিন্তু শেষে জলের তোড় এসে অল্প একটু যেটা আটকে আছে সেটাকে ভেঙে উড়িয়ে দেবে, এটাই এখানে দেখাচ্ছেন। স্বয়ংপ্রভাকে দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সেবাটুকু করলেই তোমার সব খুলে যাবে। গুরুই সব কিছু করেন কিন্তু তিনি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ান, মনে হয় সব আমার চেষ্টায় হচ্ছে। তখন স্বয়ংপ্রভা বলছেন, তোমরা চোখ বন্ধ কর, চোখ বন্ধ করলেই সবাই গুহার বাইরে পৌঁছে যাবে, তা নাহলে তোমরা বের হতে পারবে না। এমনি বেরিয়ে যেতেও তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে।

স্বয়ংপ্রভা কৃত শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি

অন্য দিকে বলছেন, যেমনি বানরগুলো সব বেরিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংপ্রভাও সেখান থেকে বেরিয়ে হাটতে হাটতে সেইখানে চলে গেলেন যেখান সুগ্রীব আর শ্রীরামচন্দ্র বসে আছেন। শ্রীরামচন্দ্রকে সাক্ষাৎ দর্শন করে স্বয়ংপ্রভা বলছেন, আমি যে হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করছিলাম, আজ সেই তপস্যা আমার পূর্ণ হল। আপনি সেই শুদ্ধ পরমাত্মা, নিজের মায়ার শক্তিতে এই শরীর ধারণ করেছেন। স্বয়ংপ্রভা আরও বলছেন, কোন জাদুকর যখন মায়ার রূপ ধারণ করে নেয় তখন তাকে কেউ চিনতে পারে না, যাঁরা চেনার তাঁরাই চিনতে পারেন। ঠিক তেমনি শুদ্ধ পরমাত্মা যখন অবতার রূপ ধারণ করে আসেন তখন সাধারণ মানুষ তাঁকে চিনতে পারে না। আপনার যাঁরা ঠিক ঠিক ভক্ত শুধু তাঁদের উপর কৃপা করার জন্য এবং তাঁদের ভালোবাসাকে মুর্ত রূপ দেওয়ার জন্য আপনার এই অবতারত্ব গ্রহণ।

লোকে জানাতু যঃ কশ্চিৎ তব তত্ত্বং রঘুত্তম।৪/৬/৬৫
মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদালয়ে।
রাম তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্।৪/৬/৬৬

হে রঘুবর! এই লোকে যাঁরা আপনার পরমতত্ত্ব নিয়ে চিন্তন করেন, জ্ঞান রূপে আপনার যাঁরা চিন্তন করছেন তাঁরা তাই করুক, আমার তা লাগবে না। আমরা এটাই প্রার্থনা যে, আপনার এই রূপই যেন আমার হৃদয় মন্দিরে বিরাজমান থাকে। জ্ঞানপথ আর ভক্তিপথের কথা ঘুরে ফিরে আলোচনায় উঠে আসে। ঠাকুরও অনেকবার বলছেন ভক্তিপথ আর জ্ঞানপথ দুটো একই। কিন্তু যাঁরা এগুলোকে নিয়ে ভাষ্যাদি লিখেছেন তাঁরা একটা মজার

কথা প্রায়ই বলেন, যাঁরা ভক্তিপথের পথিক তাঁদের জীবন অনেক প্রেমময় হয়, সবারই প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছড়িয়ে যায় আর তাঁদের আনন্দের বোধ অনেক বেশি হয়। তার সাথে তিনি যদি মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন, জ্ঞান পেতে চান তিনি তাঁর কৃপাতে তাও পেয়ে যান। আর যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জ্ঞানটুকু পান, ভক্তিরসের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। ভক্তিপথে গেলে ভক্তি মুক্তি দুটোই পাওয়া যায়, জ্ঞানপথে গেলে শুধু মুক্তিই পাওয়া যায়, সেইজন্য ভক্তিপথই ভালো। এখানে স্বয়ংপ্রভা বলছেন, যাঁরা মুক্তি কামনা করে করুক আমার লাগবে না, আপনার এই রূপই আমি হৃদয়ে ধারণ করে রাখতে চাই, কারণ এতে আনন্দ আছে। পরে পরে যাঁরা ভাষ্যকাররা এসেছেন তাঁরা এগুলোকে আরও জনপ্রিয় করে দিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে ছোট্ট একটা ফাঁক থেকে যায়। জ্ঞান আর প্রেম দুটো একই জিনিস, দুটো আলাদা কিছু নয়। মুক্তির মূল ভাবই হল আমার আর সংসারের আনন্দ লাগবে না। তাহলে সে কি আনন্দ চাইছে? সে পরমানন্দ চাইছে, ভক্তিপথে যারা যাচ্ছে তারাও তো ঐ কথাই বলে, আমার সংসারের আনন্দ লাগবে না, আমার পরমানন্দ চাই। এগুলো সব একই কথা, কিন্তু পরের দিকের লেখকরা এগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক রকম গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছেন। গোলমাল পাকানোর পেছনে কারণও আছে। ঠাকুরও বলছেন, আমি শুষ্ক জ্ঞানী হব না। ঠাকুর শুষ্কও বলছেন না, বলছেন শুটকো জ্ঞানী। আবার ঠাকুরও বলছেন জ্ঞানী আর ভক্ত এক। শঙ্করাচার্য তাঁর কী জ্ঞান আবার একাধারে কী গভীর ভালোবাসা! আসলে জ্ঞানমার্গের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাধনা হল বিচার, বিচার করে করে সব কিছুকে ত্যাগ করা। কিন্তু বিচার করতে গিয়ে তাঁরা এত বেশি বিচার করেন যে তাঁরা ঐ বিচারের জালেই ফেঁসে যান। ঠাকুর বলছেন তীর্থ করতে গিয়ে কাঙালী খাওয়াতেই সব সময় চলে গেল ঠাকুর দর্শন আর হল না। কর্মযোগে কাজ করতে করতে শেষে কাজটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, কর্মের মাধ্যমে একটা উচ্চাবস্থায় যে পৌঁছাতে পারত সেটা আর পারে না। ঠিক তেমনি জ্ঞানপথের সাধকদের এই সমস্যা হয়, খালি নিত্য আর অনিত্যের বিচার করতে করতে ওর মধ্যেই থেকে যায় মাঝখান থেকে জগতে যে আনন্দের একটা দিক আছে সেটাকে হারিয়ে ফেলে। সাধনার জগতে যাঁরাই আসছেন একটু এগোয় ঠিকই কিন্তু তারপরে সবাই ওখানেই আটকে থাকে। ভক্তিপথেও কিছু দিন জপ করে সেখানে শেষ। এখন তিনি যেটা করেছেন ঐটাকে নিয়েই তাঁকে তাঁর জীবন চালাতে হবে। ভক্ত যদি ঘরেই ইষ্টমুর্তিতে ইষ্টের দর্শন পায় তাহলে তার সাধনায় কিছু গোলমাল আছে। কিন্তু এমন কোন ভক্ত হন শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসতে গিয়ে তার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল, এখন উনি কোন অবস্থায় থাকবেন? শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসাটা আছে কিন্তু ওখানেই তিনি আটকে থাকবেন। জ্ঞানীর সমস্যা হল, বিচার করতে করতে যদি বিচারের মধ্যেই আটকে যায় তাহলে তো সে গেল, এরপর সবাইকে সে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে থাকবে। তার নিজেরও কোন ভালো হবে না অপরেরও কোন ভালো হবে না। যারাই ঈশ্বরের পথে আসেন তাদের শতকরা নব্বুই থেকে বিরানব্বুই ভাগ blocked হয়ে যায়, হতে বাধ্য। এত ব্রহ্মজ্ঞানী হয়ে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে, জগতকে সামলানো যাবে না। এক স্বামীজী ব্রহ্মজ্ঞানী আসার পর এখনও তাঁর Complete Works পড়ে কেউ শেষ করতে পারছে না। বছরে যদি এই রকম পাঁচশ ব্রহ্মজ্ঞানী হতে শুরু হয়ে যায়, মারাত্মক সমস্যা হয়ে যাবে। আটকাবে সবাই, কি সাধনা করছে সেটাতে গিয়ে আটকাবে। কিন্তু যে কোন পথেই যদি ঐ বাধাকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যায় তখন সেখানে সত্যিকারের কোন তফাৎ থাকবে না।

স্বয়ংপ্রভা যে কথাগুলো বলছেন এখানেও আবার ঠিক ঠিক ভক্ত জানেও না জ্ঞানী হলে কি হয়, শুধু জানে বিচার করতে করতে শুষ্ক জ্ঞানী হয়ে ওতেই আটকে থাকে। কিন্তু স্বয়ংপ্রভা বলছেন, যে পথই থাকুক আমার কোন কিছুই লাগবে না আমার এটাই চাই। হনুমানও বলছেন, আমি জানি শ্রীরাম আর অন্য অবতাররা অভিন্ন কিন্তু আমার এই রাম রূপই লাগবে। একজন শিবভক্ত যদি সত্যিকারের ভক্ত হয়, সে জানবে যে শিব যা শ্রীকৃষ্ণও তাই। এখন যে শিবভক্ত অনেক বছর ধরে কাশীতে আছে, কোন কারণে তাকে যদি কাশী থেকে তাড়িয়ে বলে দেওয়া হয় যাও তুমি এখন থেকে মথুরায় গিয়ে থাক। তাহলে কী অবস্থা হবে তার? মরেই যাবে। সে জানে শিবও যা শ্রীকৃষ্ণও তাই, সে জানে অযোধ্যা যা মথুরাও তাই, কাশীও তাই, বৃন্দাবনও তাই। কিন্তু যে অযোধ্যাবাসী ঠিক ঠিক শ্রীরামচন্দ্রকে ভালোবাসে সে তো অযোধ্যা ছাড়া অন্য কোথাও থাকতেই পারবে না। কারণ ভাবে তার ব্যাঘাত পড়ছে। এটা কিন্তু পুরোপুরি আলাদা একটা দিক। আমরা সাধারণ ভাবে যে ভাবছি জ্ঞানমার্গীর অন্য ধরণের অনুভূতি আর ভক্তের অন্য ধরণের অনুভূতি, তা কিন্তু নয়, একই জিনিস হয়। যাই হোক স্বয়ংপ্রভা এইসব বলে শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি করছেন আর ঐ একই ভাব আরোপ করছেন –

নমঃ স্বাত্মাভিরামায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
কালরূপিণমীশানমাদিমধ্যান্তবর্জিতম্।৪/৬/৬৯
সমং চরন্তং সর্বত্র মন্যে ত্বাং পরুষং পরম্।
দেব তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্।৪/৬/৭০

আপনি সত্ত্ব, রজো ও তমো এই তিনটে গুণের পারে, স্বভাবেই আপনি নির্গুণ আপনিই আবার আরোপে সগুণ। আপনার স্বভাব সব সময় নির্গুণ। নির্গুণকেই যখন আমরা মন দিয়ে দেখি, তার মানে তখন ভাবটা আরোপ হয়ে যায়, সেইজন্য তিনি সগুণ। দুটো কিন্তু একই, নির্গুণও যা সগুণও তাই। বাড়িতে যিনি বাবা অফিসে তিনি সাহেব। আর বলছেন, সব কিছুর আপনি নিয়ন্তা, আপনিই কালরূপে সব কিছুর সংহার করেন আবার ঈশান রূপে সব কিছুর সৃষ্টি ও পালন করেন, সব কিছুতেই আপনি সমান ভাবে অবস্থিত, আপনার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই। আপনি মানুষের মত যখন ব্যবহার করেন তখন আপনাকে সাধারণ লোকেরা কোন দিন বুঝতে পারবে না। আমাদের একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, যখনই আমরা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের বা যে কোন অবতারের বিচার করতে যাব তখন গীতার এই শ্লোকটাকে খুব ভালো করে অনুধাবন করতে হবে – *জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ*। জাগতিক যে কোন বিষয়, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, বায়োলজি বুঝতে বেশি কঠিন লাগবে না, অদ্বৈত বেদান্ত পড়তেও কঠিন লাগবে না। অধ্যাত্ম শাস্ত্র পুরো আলাদা জিনিস, কিন্তু এর মধ্য থেকেই কয়েকটা cardinal principle বানিয়ে নিতে হয়। যে কোন একটা অধ্যাত্ম শাস্ত্র তা কথামৃতই হোক বা গীতা হোক, ওর মধ্য থেকে কিছু কিছু কথাকে আমাদের মর্মে গেঁথে নিতে হয়। যদি কোন কিছুকে বিচার করতে হয় তখন ঐ কথা দিয়েই বিচার করতে হবে। এর মধ্যে গীতার এই শ্লোকটি একটা মাপকাঠি। অবতারের কোন কথায় বা কাজে কেউ যদি বিচারে ভুল মনে হয় তখন গীতার এই শ্লোক দিয়ে বিচার করতে হবে, ভগবান বলছেন আমার জন্ম আমার কর্ম সব দিব্য। দিব্য হওয়ার জন্য এটাই সিদ্ধ হয়ে যায় যে তিনি দোষ করতে পারেন না, আমাদের বুঝতে দোষ হচ্ছে। যদি কেউ বলে আমি তাকে অবতার মানছি না, তারও উত্তর আছে। কারণ যখন সে শাস্ত্রে নামবে, সব কিছু দেখবে তখন বুঝবে যে তিনি অবতার। অবতার পুরুষের কখনই দোষ হতে পারে না। যেমন এর আগে বালীবধ নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের যে কোন কাজের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের যদি দোষ হয়, তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণরা, ঋষিরা অবতারদের উপর এত শাস্ত্র রচনা করতেন না। তাহলে দোষটা কোথায়? দোষ আমাদের বোঝার মধ্যে আর তা নাহলে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরামচন্দ্রকে আমরা মানুষ রূপে দেখছি। ঠাকুর বলছেন আমার একটা কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমার সব কথা মিথ্যা হয়ে যাবে। অবতারের একটা জিনিস যদি গোলমেলে হয় তাহলে সব কিছু গোলমেলে হয়ে যাবে। এটাই standard rule। সেইজন্য সবটাই তাঁর দিব্য। স্বয়ংপ্রভা বলছেন, সংসারীরা কোন দিন আপনার মর্ম বুঝতে পারবে না। ভগবানের বাস্তবিক দিক হল, আপনার না আছে কেউ প্রিয়, না আছে কেউ অপ্রিয়। আর তাই না, আপনি কারুর প্রতি উদাসীও নন। প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণ, মানুষের বুদ্ধি মায়ার দ্বারা আবৃত। সেইজন্য মানুষ কাউকে দেখে প্রিয় বলছে, কাউকে অপ্রিয় বলছে, কারুর দিকে তাকাচ্ছে, কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। কিন্তু আপনি তা নন, সব জায়গাতেই আপনার উপস্থিতি আছে, আপনার শক্তিতেই সব কিছু চলছে। সেইজন্য আপনি কখনই উদাসী হতে পারেন না। প্রিয়-অপ্রিয়ের কোন প্রশ্নই উঠছে না, যার যেমন যেমন অজ্ঞান সরে যায় সে তেমন তেমন দেখতে থাকে। আর বলছেন –

অজস্যাকর্তুরীশস্য দেবতির্য্যঙ্ঙ্নরাদিষু।
জন্মকর্মাদিকং যদুযৎ তদত্যন্তবিড়ম্মনম্।৪/৬/৭২
ত্বামাহুরক্ষরং জাতং কথাশ্রবণসিদ্ধয়ে।
কেচিৎ কোশলরাজস্য তপসঃ ফলসিদ্ধয়ে।৪/৬/৭৩

দেবযোনি, তির্যকযোনি আর মানুষযোনি, এই বিভিন্ন দেহে আপনার যে কর্মগুলো হয় সবটাতেই আপনি নির্বিকার। ভগবানের এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক, ভগবান যে দেহে যেখানেই অবতার রূপে আসুন না কেন, কূর্মাবতার রূপেই আসুন, মীন অবতারই ধারণ করুন বা নৃসিংহ অবতার হয়েই আসুন, তিনি কিন্তু সব জায়গাতে নির্বিকার। তিনি অনেক কিছু করছেন ঠিকই, কিন্তু ঐ করার পেছনে না আছে পূর্ব পূর্ব কর্মের শক্তি, যে শক্তি তাঁকে জন্মান্তরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার সাথে কোন কর্মেরও সৃষ্টি করেন না। কেউ কেউ বলেন, নির্বিকার

হলেও আপনার চরিতামৃত কথা, রামকথাকে সিদ্ধ করার জন্যই এসেছেন। আবার সেই একই বিষয় অবতারণা করছেন। বর্তমান কালে সাহিত্যে একটা নতুন চিন্তা-ভাবনা এসেছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে Post Modernism, এর কি অর্থ হয় জানা নেই, modern মানেই তো আজকের কথা। এটা একটা technical শব্দ, কিছু লেখাকে modernism বলা হত, এর পরের সাহিত্য রচনাকে বলছেন Post Modernism। Post Modernismএর একটা বৈশিষ্ট্য হল, এর মাথামুণ্ডু কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। ওর মধ্যে ওরহান্ পামুরের একটা বই আছে যার নাম Black Book, আরেকটা বইয়ের নাম Snow। ওনাকে Post Modernistic সাহিত্যিক বলা হয়। তাতে একটা চরিত্র আছে, ভদ্রলোক একটা শহরে পৌঁছেছে। পৌঁছে দেখে ওখানে আগে থেকেই লিখে রেখেছে যে, উনি আজ তিনটের সভায় সম্বোধন করলেন আর সেই সভায় তিনি এই বক্তব্য রাখলেন। ভদ্রলোক খুব আপত্তি করে বলছে, আমার তো engagement রয়েছে আমি যাব না। তখন সেই Editor বলছে, আমি যখন লিখে দিয়েছি তখন এটাই হবে, আমাদের এখানে খবরটা আগে ছাপা হয় ঘটনাটা পরে হয়। তারপর দেখা গেল এমন এক পরিস্থিতি হয়ে গেল যে ভদ্রলোককে সেখানেই যেতে হচ্ছে। এটা কোন mystical সাহিত্য নয় এটাই post modernistic সাহিত্য। ঠিক তেমনি এখানেও বলা যেতে পারে রামকথা হল post modernistic সাহিত্য। এই জিনিস ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে, আগে থেকেই ঋষি লিখে দিয়েছেন, ভগবান এবার সেটাকে কার্যকর করবেন।

এইসব কথা বলার পর বলছেন, তবে কি আপনার এই কথা, এই কাহিনী যে শুনবে সেই ধন্য হয়ে যাবে, সে মায়ার পারে চলে যাবে। অথচ আপনি মন ও বাণীর পারে সেখানে আমি আপনার কী স্তুতি করতে পারি! আমার পক্ষে আপনার স্তুতি করা সম্ভব নয়, সেইজন্য আমি শুধু আপনাকে প্রণাম জানাই। সব কিছু বলার পর শ্রীরামচন্দ্র তখন স্বয়ংপ্রভাকে বলছেন, বল তুমি কি চাও? স্বয়ংপ্রভা তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন –

সা প্রাহ রাঘবং ভক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্ত বৎসল।
যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো।৪/৬/৭৯
তদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রাম রামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্বদা।৪/৬/৮০

যেখানেই আমি জন্মগ্রহণ করি না কে, আপনার প্রতি আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। আমার যেখানেই জন্ম হোক না কেন, আপনার ভক্তের সঙ্গ যেন হয়, সংসারী ও প্রাকৃত লোকের সঙ্গ যেন না করতে হয়, তাদের সাথে আমার যেন কোন যোগাযোগ না থাকে আর সব সময় আমার জিহ্বা রাম রাম এই নাম জপ করতে থাকে। ভক্তির এটাই শেষ কথা, আমার আর কিছু লাগবে না, আমার ঐ একটা জিনিসই চাই। আমার যত জন্ম হোক, যেখানেই জন্ম হোক আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু সংসারী লোকের মধ্যে আমার জন্ম যেন না হয়, আপনার ভক্তদের মধ্যেই যেন জন্ম হয়। যখন জন্ম হবে তখন সেখানেও আমি যেন আপনার রাম রাম নাম উচ্চারণ করতে থাকি। শ্রীরাম তখন তথাস্তু বলে বলছেন, তুমি এখন বদ্রিকাশ্রমে চলে যাও, সেখানেই তুমি আমার ধ্যান করতে করতে এই পঞ্চভূতের দেহত্যাগ করার পর সঙ্গে সঙ্গে পরমাত্মারূপী আমাকে প্রাপ্ত করবে। এদিকে বানরগুলো ঐ গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। বিরাট সমুদ্র দেখে বানররা সবাই দিশাহারা হয়ে গেছে, কোন কুলকিনারা পাচ্ছে না।

শঙ্কাগ্রস্ত অঙ্গদের প্রতি হনুমানের উপদেশ

অঙ্গদের দলকে সুগ্রীব এক মাস সময় দিয়েছিলেন। এক মাসের মধ্যে যা করার করতে হবে। অত বড় গুহার মধ্যে বানররা হারিয়ে গিয়েছিল। গুহা থেকে বেরিয়ে আসার পর তাদের কারুর সময়ের হুঁশ নেই, মনে করছে এক মাস সময় পেরিয়ে গেছে। অঙ্গদ ভাবছে সুগ্রীব আমাদের এক মাসের সময় দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা এই সময়ের মধ্যে সীতার কোন খবর নিতে পারলাম না। এই অবস্থায় কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে গিলে সুগ্রীব আমাদের কাউকেই আর বাঁচতে দেবেন না। অঙ্গদ খুব দুঃখ করে বলছে, দুরাত্মা সুগ্রীব আমাকে বধ করার একটা খুব সুন্দর বাহানা পেয়ে গেল।

মাতৃকল্পাং ভ্রাতৃভার্য্যাং পাপাত্মানুভবত্যসৌ।
ন গচ্ছেয়মতঃ পার্শ্বং তস্য বানরপুঙ্গবঃ।৪/৭/৬

সুগ্রীব আমার কাকা হতে পারেন, কিন্তু যে বৌদিকে মায়ের মত মনে করা হয় সেই বৌদিকে সুগ্রীব সঙ্গে রেখেছেন, এতই নীচ। আমার পিতা বালীর সব সম্পদ এখন সে নিষ্কন্টক ভোগ করতে চাইছে। অঙ্গদ বালীর সন্তান কিনা তাই সুগ্রীবের মনে কোথাও একটা ভয় থেকে গেছে। সাধারণ মানুষের চরিত্রে এটাই দেখা যায়। এই নিয়ে অনেক কাহিনীও আছে। নিউইয়র্কের এক পুলিশ তার আত্মকথায় বলছে, ওদের পাড়ায় ইতালী থেকে এক পরিবার এসে বসবাস করতে শুরু করে। খুব ভদ্র ভাবে সবার সাথে মিলেমিশে থাকত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা গুজব ছিল যে ভদ্রলোকের আগে কোথাও কোন একটা গোলমাল আছে। তারপর দেখা গেল, কোথা থেকে হঠাৎ এক ইতালীর লোক ঐ পাড়াতে ঘোরাফেরা করছে। আর কিছু দিন পরেই সবাই দেখল পরিবারের সবাইকে মার্ডার করে দিয়েছে। কোথা থেকে কিভাবে মানুষ খবরও পেয়ে যায় আর খুঁজে খুঁজে বেরও করে নেয়। কোনও মানুষের জীবনে যদি কোন একটা লুকনো পাপ থাকে ঐ পাপ তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নিলে সব মিটে গেল, এরপরও যদি কিছু হয়ে যায় সেখানে কারও কিছু করার থাকে না। প্রত্যেক ধর্মে দুটো জিনিসের কথা বলা হয়, যদি জান্তায় বা অজান্তায় কোন দোষ করে থাকে তাহলে তার জন্য একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে হয়। তারপরে বলতে হয় এই রকমটি আর করব না। তখন দেখা যায় কর্মের গতি তাকে হাল্কা একটা ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে। এগুলো খুবই রহস্যময়, কেন হয়, কি হয় আমরা জানি না। আমেরিকাতে একজন ভদ্রলোক খুনের জন্য চল্লিশ বছর জেল খাটল। ঐ খুনের মামলায় একজন মাত্র সাক্ষী ছিল। চল্লিশ বছর পর সেই সাক্ষী বলছে, আমি তখন মিথ্যা কথা বলেছিলাম। এরপর জেল থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জেল মানেই জঘন্য, আমেরিকার জেল মানে আরও নরক। একবার যে জেলে ঢুকে গেল তার ইহকাল পরকাল দুটোই গেল। লোকটির চল্লিশটা বছর ইতিমধ্যে জেলেই কেটে গেছে, চল্লিশ বছর পর সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে এখন জেল থেকে বেরিয়ে তার কি আর কিছু করার ক্ষমতা থাকবে! কিসের কর্ম, কিসের ঠাকুরের ইচ্ছা, কোন ঠাকুর এই রকম করতে পারে? একটা লোক অপরাধ করেনি কিন্তু বিনা অপরাধে তাকে চল্লিশ বছর জেলের মধ্যে আটকে রাখল। এগুলো দেখে সাধারণ মানুষের ঈশ্বরের উপর আস্থা, বিশ্বাস চলে যায়। তাহলে বলতে হয় জীবনটা নিজের মত এলোপাতাড়ি চলে যাচ্ছে। অন্য ভাবে যদি বলা হয়, তোমারই পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন পাপকর্ম ছিল। দুটোর মধ্যে এটাই তফাৎ, এলোপাতাড়ি নিলে সামনে এগোনর জন্য জীবনের কোন উদ্দেশ্য থাকে না আর আমারই কোন কর্ম করা ছিল তাই এই রকম হয়েছে, তখন উদ্দেশ্যও ঠিক থাকে আর জীবনকেও সংঘটিত করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু এনাদের যে উপলব্ধি তাতো ভুল নয়। ওনাদের পথে যে মানুষ এগোবে, সেই পথটা আবার খুব কঠিন। এগুলোকে নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে গেলে আমাদের মাথা গুলিয়ে যেতে শুরু হয়, মানুষ চিন্তা ভাবনা করাটাই ছেড়ে দেয়। কিন্তু মোটামুটি দেখা যায়, যদি কিছু সেরকম দোষ করেও থাকে, তার থেকেও বেশি দোষ যদি করতেই থাকে, তার সব সময় আতঙ্ক লেগে থাকবে। দোষী মানুষ আতঙ্কে শান্তিতে ঘুমোতে পারে না। অঙ্গদ সেই কথাই বলছে, সুগ্রীব অনেক পাপ করেছে আর এখন সে নিষ্কন্টক রাজ্য চাইছে। টলস্টয়ের খুব সুন্দর একটা কাহিনী আছে, অতি সাধারণ জিনিস, মুরগী পাশের বাড়িতে ডিম পেড়েছে, সেই নিয়ে ঝগড়া। এরা বলছে ডিম এখানে দিয়েছে ডিম আমার, ওরা বলছে মুরগী আমার ডিমটাও আমার। সেই নিয়ে ঝগড়া। ঝগড়া বাড়তে বাড়তে কোর্টে কেস হয়ে গেল। শেষ দৃশ্য হল এক অপরের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। বিবাদের সূত্রপাতেই আটকে দিতে হয়, তা নাহলে কোথায় নিয়ে চলে যাবে, পরে আর তাকে সামলানো যাবে না। গীতায় বলছেন কর্মের গতি গহন, এটাই বলতে চাইছেন যে কোনটা ঠিক আর কোনটা বেঠিক সহজে বোঝা যায় না। নিষ্কাম কর্মের গতি বোঝা যায়, কিন্তু তার বাইরে কোন কর্ম কোথায় নিয়ে যাবে বোঝার কোন উপায় নেই। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? উপায় একটাই, শাস্ত্র যেটাকে স্বধর্ম অর্থাৎ শুভকর্ম বলে দিয়েছে, যে কর্ম সব জায়গায় সমান ভাবে করা যায় ওটাই একমাত্র শুভ কর্ম। এছাড়া শুভ কর্মের অন্য কোন সংজ্ঞা হয় না। ঠিক কাজ সেটাই যে কাজ আমি সব জায়গায় সব সময় করতে পারব। একটা কাজ ঠিক না ভুল এর বিচার কিভাবে করব? যদি ঐ কাজ আমি সব জায়গায় করতে পারি। চুরি সব জায়গায় সব সময় করতে পারবে না, মিথ্যা কথা সব জায়গায় বলতে পারবে না। একটা জায়গায় আমি ভুল কথা বলছি, অন্য জায়গায় সেই ভুল কথা বলতে পারব না। যে কাজ সর্বস্থানে সর্বকালে করা যায় ওটাই একমাত্র ঠিক কাজ। জপ-ধ্যান যে কোন সময় যে কোন জায়গায় করতে পারে।

একবার যখন জীবনকে পরিভাষিত করে দেওয়া হল, আমার জীবনের উদ্দেশ্য এই আর আমার পথ এই, এবার উদ্দেশ্যকে মাথা থেকে সরিয়ে শুধু ঐ পথকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। এরপর যাই হয়ে যাক, খারাপ ফল

আসুক, ভালো ফল আসুক ওই পথ ও আদর্শের সাথে আর কোন আপোষ করা যাবে না। প্রশিক্ষণ ও লেগে থাকতে থাকতে পথ দৃঢ় হয়ে যায়। আদর্শে যদি অবিচল না থাকে, মন যদি দৃঢ় না হয় তাহলে তার একটা ভয় থাকে, কোন দোষ করলে, পাপ করলে একটা ভয় লেগে থাকে। সুগ্রীব এখানে বেশ কিছু ভুল কাজ করছে, যার জন্য অঙ্গদের ব্যাপারে একটা ভয়, অঙ্গদ একদিন আমাকে না উল্টে দেয়, এই ভয়টা তার চিরদিনই থাকবে। আমাদের নীতিশাস্ত্রেও বলে, শত্রুপক্ষ সে যেই হোক ওকে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। একবার যাকে শত্রু বানিয়ে নেওয়া হল, আর তাকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যাবে না। অঙ্গদকে এখন সুগ্রীব শত্রু বানিয়ে নিয়েছে, সুগ্রীব সুযোগ পেলেই অঙ্গদের অনেক কিছু করে দিতে পারে। তাহলে অঙ্গদের এখন উপায় কি? অঙ্গদের একমাত্র উপায় শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হওয়া। অঙ্গদ যদি শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হয়ে যায় তাহলে সুগ্রীব আর তার কিছু করতে পারবে না। আর শ্রীরামচন্দ্র ঐদিকে আছেন বলে অঙ্গদও কোন দিন সুগ্রীবের কিছু করবে না।

অঙ্গদের দুঃখ হচ্ছে না, মনের ভেতরে ভয় ঢুকে গেছে। সুগ্রীবের মত দুরাত্মা, যে কিনা নিজের বৌদিকে সঙ্গে রেখে দিয়েছে, সে যে কোন দিন আমার অনেক কিছু করে দিতে পারে। এদিকে এক মাস সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, সুগ্রীবের কাছেও ফেরত যাওয়া যাবে না, গেলেই আমাকে শেষ করে দেব। তার চাইতে বরং এখানেই কোন না কোন ভাবে নিজের জীবনকে শেষ করে দিতে হবে। মানুষের এটাই খুব মর্মান্তিক পরিণতি, ভয়ের বোঝা, পাপের বোঝা, অপরাধের বোঝা মানুষ আর বহন করতে পারে না। যে কোন মানসিক আবেগ মানুষকে শেষ করে দেয়। সেইজন্য মনের আবেগকে কখনই মাথা চাড়া দিতে নেই। আবেগ যদিও বা থাকে তাহলে সব সময় তার একটা আশ্রয় রাখতে হয়। কারুর মৃত্যুতে বা কোন মারাত্মক ধরণের ক্ষতি হয়ে গেলে যদি কেউ অস্বাভাবিক ভাবে ভেঙে পড়ে, আর তারপর যদি একা হয়ে যায় বুঝতে হবে ওর পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের সম্পর্কটা খুব নড়বড়ে। সম্পর্ক যদি মজবুত হয় তাহলে ওরাই তাকে ওখান থেকে টেনে তুলে আনবে। ইমোশান ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। অন্য দিকে ইমোশান হল আগুনের মত, যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে ততক্ষণ ইমোশান তার সব কাজ করে দেবে, কিন্তু একটু আলগা থাকলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। ইমোশানকে তাই বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। বেড়া হল ছোটবেলা থেকে আমাদের যে নানা রকমের ট্রেনিং দেওয়া হয়, লোভ বেশি করবে না, রেগে যাবে না, বড়দের সম্মান করবে। কিন্তু সঙ্কট এসে গেলে মন থেকে ওসব উড়ে বেরিয়ে যাবে, তখন কি হবে? তখনই আর দশটা মনের দরকার, দশটা মন ওকে ঘিরে নেবে, তুমি এটি করবে না। যদি করেও ফেলে তখন এই দশটা মনই তাকে বাঁচাবে, ঠিক হয়েছে যা হওয়ার হয়ে গেছে এটা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, এখন আমরাই তোমাকে বাঁচাব। ইমোশন মানুষ যখনই নিতে পারে না তখন এটাই বলবে –

ত্যক্ষামি জীবিতাঞ্চাত্র যেন কেনাপি মৃত্যুনা।
ইত্যশ্রুনয়নং কেচিদ্দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবঃ।৪/৭/৭

হে বানরপুঙ্গব! আমরা আর সুগ্রীবের কাছে ফিরে যাচ্ছি না, এখানেই কোন উপায়ে আমরা আমাদের জীবন ত্যাগ করে দেব। মানুষ সব সময় সব কিছুতে বাঁচার পথ খোঁজে, সন্ন্যাস জীবনও একটা বাঁচার পথ। কিন্তু এটাই আবার মানুষকে অনেক উঁচুতে নিয়ে চলে যায়। অনেক উঁচুতে নিয়ে চলে যাচ্ছে যদি এই ভাব নিয়ে চলা যায় তাহলে সেটাই তাকে উঁচুতে নিয়ে চলে যাবে। আর যদি পলায়ন বৃত্তি নিয়ে নেয় তাহলে একটা অবস্থায় গিয়ে ফেঁসে যাবে, তারপর তার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। এরপরে যে এত উঁচুতে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে ওঠার তার আর দম নেই। মৃত্যু ঠিক তাই, এরপর তার যে নতুন জীবন সেখানে সব কিছুই নতুন, নতুন দেহ, নতুন কর্ম। সেটাকেই যদি কেউ পলায়ন বৃত্তি নিয়ে আত্মহত্যা করে নেয় তাতে সে আরও ফেঁসে গেল, প্রেতযোনীতে কত যুগ পড়ে থাকবে কোন ঠিক নেই। সেইজন্য সব সময় একটা ভালো আশ্রয় দরকার। সন্ন্যাসীরাও প্রথম জীবনে কোন প্রাচীন সন্ন্যাসীকে আশ্রয় করে তাঁর সাথে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক করে নেয়। এরপর সন্ন্যাস জীবনে যত ঝড়ঝাপ্টা আসবে তখন সব ক্ষেত্রে তিনিই বাঁচাবেন। এমনিতে সন্ন্যাসীদের বলা হয় যদি কোন ঝামেলা এসে যায় সব সময় ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। কিন্তু ঝামেলা তো ঠাকুর আগেই এনে দিয়েছেন। একটা আশ্রয় যদি না থাকে, তার চারিদিক যদি সুরক্ষিত না থাকে, অন্য কোন পথ যখন থাকে না তখন সে বলে আমার জীবনকেই আমি ত্যাগ করে দেব। অঙ্গদ এখন ঠিক এই মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। অঙ্গদ যেন ধরেই নিয়েছে ফিরে গেলে সুগ্রীব তাকে মারবেই। মরতে যদি হয় তাহলে আত্মহত্যার করার কি দরকার, সুগ্রীবের কাছেই ফিরে যেতে পারে, তাতে বেঁচে যাওয়ারও একটা সম্ভবনা থেকে যাচ্ছে। অঙ্গদ তাও

মরতে চাইছে কেন? মানুষের একটা স্বভাব হল, যাকে সে পছন্দ করে না কখনই সে তার হাতে মরতে চাইবে না। এটাকে বলে নিন্দনীয় মৃত্যু। বাংলায় প্রবাদ আছে, পায়ে পচা শামুক ফুটে সেপ্টিক হয়ে মরা। নিন্দনীয় মৃত্যুর বিপরীত হল বীরের মৃত্যু। মরতে যদি হয় তাহলে ছিঁচকে চোরের হাতে মরার থেকে কোন ক্ষমতাবান লোকের হাতে মরা অনেক সম্মানীয় মৃত্যু। মহাভারতে খাণ্ডববন দহনের সময়ে একটা কাহিনী আছে। খাণ্ডব বনে আগুন লেগেছে, সেখানে চারটে পাখির শাবক ছিল। তাদের মা বলছে ওখানে একটা গর্ত আছে, ওর মধ্যে ঢুকে গেলে তোমরা বেঁচে যাবে। পাখির শাবকরা ছিল জ্ঞানী। তারা মাকে বলছে ঐ গর্তের মধ্যে একটা ইঁদুর আছে, ইঁদুর আমাদের খেয়ে ফেলবে। ইঁদুরের হাতে মরাটা নিন্দার, তার থেকে আগুনে পুড়ে মরা অনেক সম্মানীয়। মৃত্যু যেন সব সময় সম্মানের মৃত্যু হয়। মানুষ এই নিন্দা থেকে বাঁচতে চায়। অঙ্গদ মনে করছে সুগ্রীব আমার শত্রু, ওর কাছে কেন আমি মরতে যাব, তার থেকে আমি নিজেই মরে যাব। অথচ সুগ্রীবের কাছে ফিরে গেলে সে বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু অঙ্গদ ঠিক করে নিয়েছে, তার থেকে মরে যাওয়া ভালো।

অঙ্গদের কাণ্ড দেখে সব বানররা বলছে, আপনি কেন এমন করছেন, এটা ঠিক নয়। এক কাজ করা যায় আমরা স্বয়ংপ্রভার এই গুহাতেই থেকে যাব, এখানে কেউ আমাদের খুঁজেও পাবে না, মিছিমিছি আমরা মরতে যাব কেন! হনুমান তখন এগিয়ে এসে অঙ্গদকে বলছেন, সুগ্রীবের ব্যাপারে তুমি কখনই এই রকম দুর্ভাবনা করতে যেও না। তুমি হলে তারার অত্যন্ত আদরের সন্তান, তারা কখনই তোমার কোন ক্ষতি হতে দেবে না। সুগ্রীবও তারাকে ভালোবাসে, সেইজন্য তারা সুগ্রীবের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এই ধরণের কোন কাজ সে করবে না। আর শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে আগে জানতেন না, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দিনে দিনে তিনি তোমাকে ভালোবাসছেন। লক্ষ্মণকে যেমন ভালোবাসেন তেমনই তোমাকেও তিনি ভালোবাসতে শুরু করেছেন। এই যে বানররা তোমাকে বলছে এখানে ভয়ের কিছু নেই, এদের কথা তুমি কর্ণপাত করো না, শ্রীরামচন্দ্রের বাণ যে কোন জায়গাতেই তোমাকে খুঁজে বার করে শেষ করে দেবে। এই কাজে শুধু সুগ্রীব নয় শ্রীরামচন্দ্রও জড়িয়ে আছেন। তার থেকেও বড় কথা হল, যারা এখানেই থেকে যাওয়ার কথা তোমাকে বলছে এরা কি নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে এখানে থাকতে পারবে? হনুমান খুব বড় নীতিজ্ঞ ছিলেন, নীতিটা খুব ভালো জানতেন। যখনই কেউ কোন সমস্যা নিয়ে আসে তাকে বেশি কথা বলতে নেই, বেশি কথা বললে একটা অবস্থার পর সে আর শুনতে চাইবে না। কিন্তু সব দিক থেকে যুক্তি আনতে হয়, তার কারণ হল, কোন যুক্তি যে তার হৃদয়ে গিয়ে লাগবে আমাদের জানা নেই। খুব উচ্চমানের কথা বলে দিলেই যে তার হৃদয়ে লেগে যাবে তা নয়, সাধারণ জাগতিক বা মনোবৈজ্ঞানিক যে কোন কথা তার মানসিকতাকে পাল্টে দিতে পারে।

হনুমান এখানে অনেকগুলো যুক্তি দিচ্ছেন। প্রথম যুক্তি হল, সুগ্রীবের দিক থেকে তোমার ভয়ের কিছু নেই কারণ তারা যত দিন আছে ততদিন তোমার কিছু হবে না, তার থেকেও বড় হল শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে স্নেহ করেন। শ্রীরামচন্দ্র কখনই তোমার ক্ষতি হতে দেবেন না। আর তুমি যদি মনে করে এখানে থেকে গেলে তুমি বেঁচে যাবে, এই প্রত্যাশা তুমি ত্যাগ কর, তুমি যেখানেই থাক শ্রীরামচন্দ্রের বাণ ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করে নেবে। শ্রীরাম সাক্ষাৎ নারায়ণ, যা তা লোক নন। শেষ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল, তোমাকে যারা এখানে থেকে যাওয়ার কথা বলছে, এরা নিজেরাই কি তাদের স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চিরদিনের মত এখানে থেকে যেতে পারবে? মানুষ হল সামাজিক জীব, খুব বিরাট সমস্যা হয়ে গেলে নিজের পরিবারের, স্ত্রী-পুত্রের একটা দুটো ক্ষতি সে মেনে নেবে কিন্তু নিজেকে বাঁচাবার জন্য নিজের স্ত্রী-পুত্র সবাইকে কখনই ত্যাগ করে দেবে না। মনুস্মৃতিতে খুব নামকরা কথা আছে, যেখানে বলছেন নিজের পরিবারকে বাঁচাবার জন্য একজনকে ত্যাগ করে দেওয়া যায়, একটা গ্রাম বাঁচাবার জন্য একটা পরিবারকে ত্যাগ করতে হয়, জনপদকে বাঁচাবার জন্য একটা গ্রামকে বাদ দিয়ে দিতে হয়, কিন্তু কখনই বলছেন না নিজের জন্য পরিবারকে ছাড়তে। শেষে বলছেন, নিজের মঙ্গলের জন্য সব কিছুকে ছেড়ে দিতে হয়। এই কথা বলছেন সন্ন্যাসের অর্থে বা জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য, জাগতিক অর্থে নয়। গীতায় অর্জুন এই কথাই বলছেন, যাদের জন্য জীবনধারণ তাদেরকেই এই যুদ্ধে বধ করতে হবে! এই যুদ্ধ করে কী লাভ!

আচার্য শঙ্কর, ভগবান বুদ্ধ এনারা সব কিছুকে ত্যাগ করে দিলেন। তাঁরাও একটা সঙ্ঘ দাঁড় করালেন, ভগবান বুদ্ধ নিজের সঙ্ঘ তৈরী করলেন, আচার্য শঙ্করও একটা সঙ্ঘ দাঁড় করিয়েছেন, সঙ্ঘের লোকেদের প্রতি তাঁদেরও একটা বিশেষ করুণার ভাব থেকে গিয়েছিল। মানুষের পরিচয় সব সময়ই তার ঘনিষ্ঠ পরিবার আর সম্প্রসারিত পরিবারকে নিয়েই হয়। সবার নামের সাথে উপাধি ব্যবহার করার পেছনেও এটাই বলতে চাইছে যে

আমি এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তার পরিবার আর সে এক। তার সম্মানে তাদের সবার সম্মান, তার কলঙ্কে তাদের সবারই কলঙ্ক। বংশে যদি কোন দুর্নাম আসে সেই দুর্নাম বংশের সবারই উপর আরোপিত হয়ে যায়। হঠাৎ কোন বিপর্যয় থেকে মানুষের মধ্যে একটা সাময়িক বৈরাগ্যের ভাব এসে যায়। ঠাকুর মর্কট বৈরাগ্যের ব্যাপারে বলছেন, চাকরী নেই, খাওয়া-পড়া জুটছে না, আমি কাশী চললাম। ওখানে গিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখছে, এখানে আমার একটা চাকরী হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এটাই হয়, মানুষ নিজের পরিবারকে ছেড়ে থাকতে পারে না। স্বামী স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে, স্ত্রীও স্বামীর উপর কত অত্যাচার করছে, কিন্তু কেউই কাউকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে না। ছেড়ে যাবেটা কোথায়। যেটার জন্য জীবন ধারণ করে আছে, ওটাকে ছেড়ে সে কি করে বেরিয়ে যাবে! মরুক বাঁচুক, লড়াই করুক, যাই করুক ঐটাই তার অঙ্গ। আমার হাতের আঙুল সুন্দর হতে পারে নাও হতে পারে, আমার হাতে শক্তি থাকতে পারে নাও থাকতে পারে কিন্তু আমারই হাত, এটাই আমি, আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ঠিক তেমন স্ত্রী-পুত্র-স্বামী এটাই তার পূর্ণ ব্যক্তিত্ব। যেভাবে মানুষ নিজের হাত-পা ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারে না, ঠিক তেমনি কোন মানুষ তার স্ত্রী-পুত্র-স্বামী-বাবা-মাকে ছাড়া নিজেকে কল্পনা করতে পারে না। মহাবীর হনুমান এটাই অঙ্গদকে বোঝাতে চাইছেন, এই বোকা বানরগুলোর কথায় তুমি কান দিও না, ওদের কথা মত চলতে গেলে মারা পড়বে। তুমি যা করতে যাচ্ছ সব দিক দিয়েই এই কাজ ভুল। জীবনে আমাদের অজানা, অচেনা পরিস্থিতিতে অনেক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সব সময় বিচার করে দেখতে হয় এই সিদ্ধান্ত যদি আমি নিই এর জন্য সব থেকে ভালো কি হতে পারে আর সব থেকে খারাপ কি হতে পারে। দেখতে হবে এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনটা বেশি জরুরী, সব থেকে নীচে হল নিজের সুরক্ষা আর সব থেকে উঁচুতে হল নিজের কার্যের সাফল্য তাকে কত দূর নিয়ে যেতে পারবে। অঙ্গদ ও হনুমানের এটি খুব মূল্যবান সংলাপ, তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও এখানেই থেকে যাবে আর তাতে যদি মনে কর তুমি বেঁচে যাবে তাহলে তুমি জেনে নাও এখানেই শ্রীরামচন্দ্রের বাণ এসে তোমাকে মারবে। তুমি ভয় পাচ্ছ সুগ্রীব তোমাকে মেরে ফেলবে, কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না যে শ্রীরামচন্দ্রই তোমাকে রক্ষা করবেন। তৃতীয়, তুমি যে মনে করছ বানরগুলো সব তোমার সাথে থাকবে, এটাও তোমার ভুল ধারণা, কদিন পরে ওদের স্ত্রী-পুত্রের জন্য মন খারাপ হতেই সব এখান থেকে পালিয়ে যাবে। সব থেকে ভালো আর সব থেকে খারাপ কি হতে পারে অঙ্গদের সামনে দুটোই রেখে দিলেন, এবার তুমি কি করবে ঠিক কর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সামনে গীতার দর্শন রাখার আগে সব থেকে খারাপ কি হতে পারে আর সব থেকে ভালো কি হতে পারে বলে দিলেন, তুমি যদি যুদ্ধ থেকে সরে যাও তাহলে তোমার দুশমনরা তোমার নামে অকথনীয় নিন্দা করবে, তোমার সামর্থকে নিয়ে সবাই নিন্দা করবে এর থেকে বাজে আর কী হতে পারে! প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। আর শ্রেষ্ঠ ভালো কি হতে পারে? তুমি যদি মরেই যাও তাহলে তোমার স্বর্গের দ্বার খুলে যাবে আর তুমি যদি জয়ী হও তাহলে রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য ভোগ করবে।

এসব বলার পর হনুমান অঙ্গদকে বোঝাচ্ছেন, দেখ বাবা! শ্রীরামচন্দ্র হলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ, রাক্ষসদের নাশ করে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি দেহ ধারণ করেছেন। আর মনে রেখ এই লক্ষ্মণও যদি চান তিনিও একা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাশ করে দিতে পারেন। আমরাও ভগবানের মায়াশক্তি থেকে বানর হয়ে জন্ম নিয়েছি, আমরা হলাম তাঁর সঙ্গী। কথায় বলে, ঈশ্বরের কাজ এমনিতেই হয়ে যাবে কিন্তু যে সেই কাজে হাত লাগাবে সেই মহৎ হয়ে যাবে। স্বামীজী একবার মাত্র একটা চিঠিতে বলছেন, রামকৃষ্ণ রূপী জগৎরথ চলছে, যদি এই রথের দড়িতে হাত লাগাও ধন্য হয়ে যাবে, না হলে সরে দাঁড়াও, বিরোধীতা করলে পিশে যাবে। স্বামীজী আমেরিকা থেকে এমন সময় এই চিঠি লিখছেন যখন কিছুই নেই, রামকৃষ্ণ মিশনই গঠন হয়নি। অবাক হয়ে শুধু দেখতে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে, ঠাকুরের কাজে যাঁরাই সাহায্য করছেন কিভাবে তাঁরা মহৎ হয়ে যাচ্ছেন। নিমপীঠ আশ্রমের অধ্যক্ষ এক সময় বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ছিলেন। একটা সময় তিনি কর্তৃপক্ষকে বললেন, স্বামীজীর সেবা ভাব নিয়েই আমি সন্ন্যাস হয়েছিলাম, আমার প্রচুর সেবাকার্য করার ইচ্ছা, কিন্তু এখানে আমি সেই সুযোগ পাচ্ছি না। বেলুড় মঠের সাথে আমার কোন বিরোধীতা নেই, আমি আপনাদেরই লোক কিন্তু আলাদা ভাবে কাজ করতে চাই। অনুমতি নিয়েই তিনি বেরিয়ে গিয়ে নিমপীঠ আশ্রম তৈরী করলেন। সেই মঠ আজ কোথায় দাঁড়িয়ে গেল। ওনারা কাউকে দীক্ষা দেন না, সন্ন্যাস দেন না, কিন্তু কত কাজ করে যাচ্ছেন। এটা যেন বেলুড় মঠেরই কেন্দ্র। উনি বলছেন আমি ঠাকুরেরই কাজ করছি, মানুষের মধ্যে কাজ করছি। জগন্নাথ দেবের রথের চাকা নিজে থেকেই ঘুরবে, আমি দড়ি টানলেও চলবে, না টানলেও চলবে। এক সময় মাস্টারমশাইয়ের ডাইরী লেখার ইচ্ছে করছিল

না, ঠাকুর তখন একটা কথা বললেন, তিনি একবারই এই কথা বলেছেন, কারিগরের কাছে অনেক কল আছে, একটা কল কাজ না করলে অন্য কল লাগিয়ে নেবেন। রাজা মহারাজও একটা সময় ঠাকুরের কথার নোট লিখতে শুরু করেছিলেন, ঠাকুর তাঁকে নিষেধ করছেন, এটা তোমার জন্য নয়, সব কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা কারিগর ঠিক করা আছে। ঠাকুরের কাজে যে হাত লাগাবে সে ধন্য হয়ে যাবে। যে বিরোধীতা করবে সে পিষে যাবে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে কত লোকের কত রকম নিন্দা কিন্তু আজ সেই নিন্দুকদের কেউ নামই জানে না, মাইকেলকে সবাই এখনও মনে রেখেছে। স্বামীজীর সময়ে স্বামীজীকে কত লোক কত বিদ্রুপ করেছে, নিন্দা করেছে, ঠাকুরকে বলত পরমহংসের দল চলে প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক। আজ তাদের নামও কেউ জানে না। এখানে ভাবটা ঠিক তাই। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান, রাক্ষসদের তিনি মারবেনই, আমরা তাঁর কাজে হাত না লাগালেও রাক্ষসরা মরবে, কিন্তু হাত লাগালে আমরাই মহৎ হয়ে যাব। আর আমরা হলাম তাঁর মায়ার অংশ। মায়ার অংশ মানে তো পুরো সৃষ্টি, কিন্তু শক্তির তফাৎ হয়ে যায়। কারুর কম শক্তি কারুর বিশেষ শক্তি। যাদের বিশেষ শক্তি আছে সেই শক্তি ঈশ্বরীয় কাজে লাগালে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এটাই হনুমান বলছেন –

বয়ন্তু তপসা পূর্বমারাধ্য জগতাং পতিম্।৪/৭/২০
তেনৈবানুগৃহীতাঃ স্মঃ পার্ষদত্বমুপাগতাঃ।
ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কৃত্বৈব মায়য়া।৪/৭/২১

আমরাও আগের আগের জন্মে ভগবান বিষ্ণুর অনেক তপস্যা করেছি, অনেক সাধনা করেছি, সেই সাধনার ফলস্বরূপ তাঁর কাজের জন্য এই যোনিতে জন্ম নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াবার সৌভাগ্য লাভ করে জীবনকে ধন্য করার সুযোগ পেয়েছি। ভগবান যীশুর খুব বিখ্যাত একটা উক্তি আছে, Many are call but few are chosen, তিনি অনেককেই ডাকেন কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই বেছে নেন তাঁর কাজের জন্য। কাদের ডাকা হয়? যাঁরা তপস্যা করেছেন। কাদের বাছাই করা হয়? যাঁরা আরও কঠোর সাধনা করেছেন, ঈশ্বরের মতের সাথে যাঁরা এক। আমরাও তাদেরকেই দায়ীত্ব দিই যারা আমাদের মনের মত কাজ করবে। একজন লোক কাজে খুব ওস্তাদ হতে পারে কিন্তু আমার মতের লোক নয়, তাকে নিয়ে আমার কী হবে! ঠিক তেমনি যিনি ঈশ্বরের চিন্তন করেন, ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা করেন ভগবান তাঁদেরই ডাকেন, আর তাঁদের মধ্যে যাঁদের খুব গভীর চিন্তন তাঁদেরকেই ভগবান নিজের কাজের জন্য বেছে নেন। হনুমান অঙ্গদকে একটা শ্রেষ্ঠ দর্শন দিলেন। এর আগে অন্য ভাবে অঙ্গদকে বোঝালেন, অর্জুনকে যেমন ভগবান বলছেন, তুমি যদি যুদ্ধে জয়লাভ কর তাহলে তুমি রাজ্যভোগ করতে পারবে, যদি মারা যাও তাহলে স্বর্গদ্বার তোমার জন্য খুলে যাবে। তারপরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, কিন্তু তুমি যদি স্বধর্ম পালন কর তাহলে তোমার আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে। হনুমানও প্রথমে অঙ্গদকে বলছেন, এখানে থাকলে তুমি মরবে, তোমাকে ছেড়ে সবাই চলে যাবে, ফেরত যদি যাও শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে রক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁর কাজে যদি হাত লাগাও তাহলে তুমি মহৎ হয়ে যাবে। তিনি রাক্ষসদের মারতে এসেছেন, আর মারবেনই তিনি, তাঁর সুনাম হবে আর তাঁর সাথে তোমারও সুনাম হয়ে যাবে। Jan Paderewski পোল্যাণ্ডের রাজা হয়েছিলেন, তিনি আবার বিশ্ব বিখ্যাত পিয়ানো বাদক ছিলেন। উনি অনেক জায়গায় public performance করতেন। এক শহরে পিয়ানো বাজাবেন। সেখানকার একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলেকে তার মা পিয়ানো বাজানো শেখায়। ছেলেটিকে নিয়ে ওর মা বিখ্যাত পিয়ানো বাদকের বাজনা শোনাতে নিয়ে গেছে। বাচ্চাটি সবে পিয়ানোর রীডে আঙুল ঠেকিয়ে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার বাজানো শিখেছে, এর বাইরে আর কিছু বাজাতে পারে না। কখন মায়ের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সবার নজর এড়িয়ে পালিয়ে স্টেজে উঠে গেছে। মা প্রথমের দিকে খেয়াল করেনি। ইতিমধ্যে স্টেজের পর্দা সরে যাচ্ছে, আর সবাই দেখছে ছেলেটি হাত পাচ্ছে না তাও কোন রকমে হাত লাগিয়ে টুইঙ্কল টুইঙ্কল বাজাচ্ছে। মা তো দেখে হতবম্ব হয়ে গেছে। তারপর Jan Paderewski এলেন, এসে বাচ্চাটিকে তিনি ঘিরে নিয়ে পিয়ানো বাজাতে শুরু করেছেন। বাচ্চাটিও আর বেরিয়ে আসতে পারছে না। হাজার হাজার শ্রোতা অবাক হয়ে দেখছে। ঐ বিশাল হল ভর্তি লোক দেখে বাচ্চাটিও খুব উদ্দীপ্ত হয়ে গেছে, আর একটাই সুর পিং পাং করে যাচ্ছে, ও ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। আর ওরই মধ্যে Paderewski নিজের রাগ বাজিয়ে যাচ্ছেন। শুধু যে রাগ বাজাচ্ছেন তাই না, বাচ্চার ঐ টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার বাজনাকেও ওর মধ্যে মিলিয়ে দিচ্ছেন। এইভাবে পুরো blending করে এক ঘন্টা বাজিয়ে গেলেন। যেমনি বাজনা শেষ হল তুমুল হর্ষধ্বনিতে পুরো হল একেবারে ফেটে পড়ল। বাজাতে অনেকেই পারেন কিন্তু একটা বাচ্চার বেসুরো বাজানকেও ওর মধ্যে belnding

করে দিচ্ছেন। প্রোগ্রাম শেষে বাচ্চাটিকে স্টেজের মাঝখানে এনে হলের সবাইকে বলছেন, দেখলেন এটুকু বাচ্চা কী সুন্দর পিয়ানো বাজালো। আরও জোর হাততালি পড়তে শুরু হয়ে গেল। জগতেও সব ভগবানই করেন আমরা শুধু বাচ্চাটির মত পিং পাং করে যাচ্ছি, আর মনে করছি অনেক কিছু করে দিচ্ছি। আমরা যে বড় কাজই করি না কেন, আমাদের কোন শক্তি নেই ঐ বড় কাজ করার, ঈশ্বরের শক্তি পেছনে আছে বলেই জগতের সব মহৎ কাজ হচ্ছে। আগেকার দিনে বড় বড় ওস্তাদ গায়ক-বাদকরা ঘন্টার পর ঘন্টার পর যেমন রেওয়াজ করতেন তেমনি গভীর ভাবে ঈশ্বরের আরাধনাও করতেন। হনুমান এই কথাই বলছেন, আগে আগে আমরা অনেক তপস্যা করেছি তারই ফলস্বরূপ আজ এই সুযোগ সামনে এসেছে, ঈশ্বরীয় কাজ করার সুযোগ পাওয়া খুব দুষ্কর, মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেই তিনি তাঁর কাজের জন্য বেছে নেন।

বানরদের মুখে সম্পাতির জটায়ুর নাম শ্রবণ

সবাই এখন এগোতে এগোতে ভারতের দক্ষিণ ভূমিখণ্ডের একেবারে শেষ অংশে মহেন্দ্রগিরির পাদদেশে এসে পৌঁছেছেন। অনন্ত উত্তাল অলঙ্ঘ্য সমুদ্র দেখে সবাই একেবারে ভেঙে পড়েছে, এরপর আর কোথায় আমরা যাব! সাধ্যের মধ্যে আর কিছু করার নেই, এবার এখানে বসে আমাদের প্রায়োপবেশন করা ছাড়া আর কোন রাস্থা নেই। প্রায়োপবেশন মানে না খেয়ে একটা জায়গায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকা, এভাবেই শরীরটা একটা সময় পড়ে যাবে। এর আগে যেটা আলোচনা করা হয়েছিল সেটাই এখন এখানে বলছেন –

সুগ্রীববধোতোহস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্।৪/৭/২৭

বলছেন সুগ্রীবের হাতে মরা অপেক্ষা প্রায়োপবেশন করাই শ্রেয়। ভগবানের নাম করতে করতে মারা যাব, এ অনেক ভালো। পাশেই মহেন্দ্র পর্বত, পর্বতের গুহা থেকে এক বিরাটা গৃধ্র বেরিয়ে এসেছে। গৃধ্র বানরদের দেখে বেশ খুশি হয়ে বলছে, আজ আমার প্রচুর খাবার পাওয়া গেছে, একটা একটা করে মরবে আর আমিও প্রতিদিন সব কটাকে ভোজন করতে পারব। গৃধ্র মরা জীবজন্তুই ভক্ষণ করে, শিকার করে না। গৃধ্র দেখে বানরগুলো ভয় পেয়ে গেছে, গৃধ্র এসে যাওয়া মানেই মৃত্যু এসে গেছে, মৃত্যুর প্রতীক এসে গেছে দেখে সবাই ভীত। আসলে গৃধ্র একটা জাতি। বানরগুলো তখন বলছে –

ভক্ষ্যয়িষ্যাতি নঃ সর্বানসৌ গৃধ্রো ন সংশয়ঃ।
রামকার্য্যঞ্চ নাস্মাভিঃ কৃতং কিষ্কিন্ধরীশ্বরাঃ।৪/৭/৩২
সুগ্রীবস্যাপি চ হিতং ন কৃতং স্বাত্মনামপি।
বৃথানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্।৪/৭/৩৩

আমাদের জীবনটা বৃথাই গেল, আমাদের দিয়ে শ্রীরামেরও কোন কাজ হল না, সুগ্রীবেরও কোন কাজ হল না, নিরর্থক এই গৃধ্রের হাতেই আমাদের যমালয়ে যেতে হবে। কেউ যদি নিজে থেকে হতাশাকে ডেকে নিয়ে আসতে চায় তাহলে তাকে ভাবতে বলুন তুমি পাঁচ বছরে কি কি বড় কাজ করেছ। পাঁচ বছর কিছু কম সময় নয়, পাঁচ বছরে একজন কলেজে ঢুকে মাস্টার ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। একটা মজার কাহিনী আছে, তাতে এক রাজার ইচ্ছা হল আমার পূর্বপুরুষদের ইতিহাস লেখাব। পণ্ডিতরা অনেক দিন লেখালেখি করে মোটা মোটা কয়েকটা পুঁথি নিয়ে এসেছে। রাজা বলছে আমার এত পড়ার ফুসরৎ নেই, সংক্ষেপে করে নিয়ে এস। পণ্ডিতরা আবার সংক্ষেপ করে তিন চারটি খণ্ডে লিখে নিয়ে এসেছে। রাজার তাও পড়ার সময় নেই। তারপর একটা খণ্ডে লিখে নিয়ে এল। এটাও পড়ার সময় নেই। তারপর একটা ছোট্ট কাগজে লিখে নিয়ে এল, আপনার পূর্বপুরুষরা জন্মেছিলেন, খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন, মরে গেলেন। আমাদের জীবনের ইতিহাসও যদি লেখা হয় সেখানে কটা বাক্যের ব্যবহার হবে? এখানে বানররা ঠিক এই সমস্যার কথাই বলতে চাইছে। বলছে, আমার জীবন যেন একটা শুকনো গাছের ছায়া, কোন কাজেই লাগল না। দুজন সন্ন্যাসী অমরনাথ যাওয়ার পথে টেলিফোন ডিপার্টমেন্টের দুজন মুসলিম টেকনিশিয়ানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথায় কথায় একজন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল আপনার সন্ন্যাস জীবন কত দিন হল? মহারাজ একটু থেমে বললেন, কুড়ি বছর হবে। একজন টেকনিশিয়ান বলছে, আমি কুড়ি বছরের কম টেলিফোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছি, আজ কিন্তু আমি জানি টেলিফোন লাইনে কোথাও যদি কিছু গোলমাল হয়, একটু দেখেই আমি বলে দিতে পারব কোথায় কি গোলমাল হয়েছে। তা কুড়ি বছরে আপনার কি achievement হয়েছে? আপনি কি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে আমাদের জন্য ভালো কিছু করতে পারেন? এই

কুড়ি বছরের সাধনায় আপনার কি মনে হয় যে, আপনি ঈশ্বরকে সেই রকম ভালোবেসেছেন যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনবেন? এই ধরণের প্রশ্ন যে কোন সন্ন্যাসীর কাছে খুবই অস্বস্থিকর। সন্ন্যাসী তাঁর ভাইদের প্রায়ই বলেন, লোকটির প্রশ্ন আমাকে মাঝে মাঝে ভেতরে একটা খোঁচা দেয়। ঈশাবাস্যোপনিষদে বলছেন *ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর*, মন তুমি এখন স্মরণ কর সারা জীবন ধরে যা যা ভালো কাজ করেছ, কত যজ্ঞাদি করেছ, কত শুভ কর্ম করেছ সব সামনে নিয়ে এসো, তোমার তাহলে স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। মানুষ সারা জীবন কিছু না কিছু তো কাজ করেছে, কিন্তু একটা মজবুত সারবত্তা কর্ম আছে কিনা দেখতে হবে। বানররা তাই বলছে, এই যে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম, কোন কাজেই লাগল না। না শ্রীরামের কাজে লাগলাম, না সুগ্রীবের কাজে লাগলাম, আর নিরর্থক শকুনের খাদ্যে পরিণত হতে যাচ্ছি। আমাদের থেকে জটায়ু অনেক ধন্য, শ্রীরামচন্দ্রের কাজের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিল।

বানরদের মুখে জটায়ুর নাম শুনে গৃধ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছে, তোমরা কারা, অনেক দিন পর আমি জটায়ুর নাম শুনলাম। জটায়ুর ব্যাপারে তোমরা কি জান আমাকে বল। তখন বানররা খুব সংক্ষেপ শ্রীরামচন্দ্রের কথা, সীতার কথা আর সীতাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ুর সাথে রাবণের যুদ্ধের কথা বললেন। গৃধ্র তখন বলছে, অনেকদিন পর আমি ভাইয়ের খবর পেলাম, আমার ভাই মারা গেছে, আমি ওকে একটু জলাঞ্জলী দিতে চাই। তোমরা আমাকে ধরে সমুদ্রের কাছে নিয়ে চল। যাঁরা ইহলোক থেকে চলে গেছেন তাঁদের স্মরণ করে জলাঞ্জলী দেওয়ার প্রথা আজও চলে আসছে। এই নিয়ে গুরু নানকের খুব মজার এক কাহিনী আছে। পিতৃপক্ষের সময় হরিদ্বারে সবাই গঙ্গায় পিতৃদের উদ্দেশ্যে জল দিচ্ছিল। গুরু নানক তখন গঙ্গার পশ্চিম দিকে গিয়ে জল ছুড়তে শুরু করেছেন। লোকেরা বলছে তুমি এটা কি করছ? গুরু নানক বলছেন, স্বর্গ অত দূর কিন্তু আপনাদের দেওয়া জল সেখানে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমার চাষের ক্ষেতগুলো কাছেই পাঞ্জাবে তাই আমি জল দিচ্ছি যদি আমার ক্ষেত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আসলে জল দেওয়াটা বড় কথা নয়, এটা হল পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো। স্বর্গ আছে কি নেই, থাকলে কোথায় আছে, কিভাবে আছে এগুলো শাস্ত্রের দ্বারাই পরিভাষিত হয়। ঠাকুর আবার জলাঞ্জলী দিতে পারলেন না, তাঁর হাতের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে গেল। সাধারণ মানুষ গুরু নানক বা ঠাকুরের মত নয়, তাদের কাছে এই ধরণের প্রথার অনেক গুরুত্ব আছে। এই যে বৃহৎ পরিবার, যেটাকে নিয়ে আমরা এর আগে আলোচনা করলাম, সেই বৃহতের মধ্যে পিতৃরাও যুক্ত হয়ে আছেন, বিশেষ দিনে তাঁদেরকেও স্মরণ করতে হয়, শ্রদ্ধা জানাতে হয়। যে কোন লোক যে কোন জিনিসকে নিয়ে হাসিমজা ঠাট্টা করতে পারে। কিন্তু এই যে দৃষ্টিভঙ্গী, একজন গৃধ্র বংশের লোক, জটায়ুর দাদা সম্পাতি সেও নিজের ভাইকে স্মরণ করছে। কিভাবে স্মরণ করছে? জলাঞ্জলী প্রথার মাধ্যেম।

জলাঞ্জলী দেওয়ার পর সমুদ্রে স্নানাদি করে সম্পাতি বলছে, আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে একশ যোজন দূরে দক্ষিণ দিকে ত্রিকুট পাহাড় আছে, সেখানে লঙ্কা নগরী, সেই নগরীতে অশোক কাননে সীতাকে বন্দী করে রাখা আছে। আমার যা দৃষ্টি শক্তি সেই শক্তিতে আমি সবটাই দেখতে পাচ্ছি। আমি একাই রাবণকে মেরে দিতে পারি, কিন্তু আমার সমস্যা হল আমার দুটো ডানাই নেই। আমি এখন আর এই সমুদ্র লঙ্ঘন করে সেখানে পৌঁছাতে পারব না, ডানা থাকলে আমি রাবণকে মেরে দিয়ে আসতাম। যাই হোক, সমুদ্র লঙ্ঘন করে ওখানে চলে যান, তবে যা কিছু হবে তা শ্রীরামচন্দ্রই করবেন। আপনাদের মধ্যে যাঁর ক্ষমতা আছে এই একশ যোজনকে অতিক্রম করার, তিনি কিন্তু সীতার সাথে সম্ভাষণ করে ফেরত চলে আসতে পারবেন। এবার কাহিনী আবার মহাদেবের কাছে চলে গেছে।

সম্পাতিকে চন্দ্রমা মুনির উপদেশ

মহাদেব পার্বতীকে এই কাহিনী বলতে শুরু করেছেন। বলতে বলতে সেখানে সম্পাতির নিজের কাহিনীতে চলে এসেছে। সম্পাতি তার জীবনের ইতিহাস বলছে। আমরা হলাম গৃধ্র বংশের, পাখিকুলের মধ্যে আমাদের মত শক্তিমান কেউ নেই। আমার একবার সূর্যলোক পর্যন্ত চলে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। সম্পাতি আর জটায়ু, দাদা আর ভাই উড়তে শুরু করেছে। উড়তে উড়তে যত উপরের দিকে উঠছে ততই তাপের মাত্র বাড়তে শুরু করেছে। তখন সম্পাতি ভ্রাতৃ স্নেহে নিজের ডানাটা জটায়ুর উপর মেলে দিয়েছে। ডানাটা ছড়িয়ে দিতে সূর্যের সব তাপ ঐ ডানার উপর লাগাতে দুটো ডানাই পুড়ে গেল। ডানা পুড়ে যাওয়াতে আমার ওড়ার ক্ষমতা চলে গেল, মুর্ছিত হয়ে ঐ উঁচু

থেকে আমি নীচে এসে পড়লাম। সেখানে একজন মুনি থাকতেন তাঁর নাম ছিল চন্দ্রমা। চন্দ্রমা মুনি আমাকে দেখে বলছেন, তুমি তো সম্পাতি, তুমি অন্য রকম ছিলে কিন্তু এখন তোমাকে কেমন কুরূপ দেখাচ্ছে। তোমার ডানা কী করে পুড়ল? সম্পাতি সব বলার পর বলছে, আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেল, আগুন জ্বালিয়ে তাতে এবার আমি পুড়ে মরব। তখন চন্দ্রমা সম্পাতিকে খুব উচ্চমানের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপদেশ দিতে শুরু করলেন।

তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তুমি ভালো করে আমার কথাগুলো শুনে নাও। আমার কথা শোনার পর তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই করবে। তোমার যে দুঃখ হচ্ছে, দেহই এই দুঃখের আশ্রয়। একটু বিচার করলে যে কেউই বুঝতে পারে যে দেহ সব সময় কর্ম থেকে জন্ম। আমার যে আমি বোধ, আমি দুঃখ পেলাম, এই দুঃখের মূলে রয়েছে দেহ, দেহের সৃষ্টি কর্ম থেকে। একদিকে দেহ দিয়েই সব কর্ম হয় আর অন্য দিকে সব কর্মের যে ফল তার থেকে এই দেহের জন্ম হয়। মানুষ দেহেই অহং বোধ করে, এ দেহটাই আমি, এই অহং বোধ থেকেই কর্মের দিকে প্রবৃত্তি আসে। আমি বুদ্ধি যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ সে দেহকে কাজে লাগাবে না। এই অহং বুদ্ধি অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। কখনই প্রশ্ন করা যাবে না কবে থেকে অহং বুদ্ধি এসেছে আর কিভাবে এসেছে। যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নিতত্ত্ব সূক্ষ্ম ভাবে লোহার মধ্যে ব্যপ্ত, ঠিক তেমনি আমি বোধ, অহংকার পুরো শরীরের মধ্যে ব্যপ্ত। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই আমি বোধটা কোথায় থাকে, আমাদেরও আজগুবি মনে হবে। আমিটা কে, কোথায় থাকে? পুরো শরীরে ব্যপ্ত, কোন একটা জায়গাতে নেই। আসলে আমি বোধটা পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই রয়েছে। জগতে যত বস্তু আছে এদের মধ্যে ঐ বোধটা নেই, বোধ করার শক্তিটাই নেই। কিন্তু জীবন যখনই চলে আসে তখনই তার আমিত্ব চলে আসে। আমিত্ব এসে গেলে প্রথমে সে বলে আমি নাশ হয়ে যেতে চাই না। যত নিম্ন যোনির জীব হোক প্রথমে তার এই বোধটাই আসে আমি নাশ হতে চাই না। দেহের সাথে যখনই এই আমি যুক্ত হয় তখনই দেহটা যেন চেতনাময় হয়ে যায়। আমিত্ব যদি না থাকে তাহলে দেহটা শব হয়ে পড়ে থাকবে, ওর মধ্যে কোন চেতনা থাকবে না। চেতন একমাত্র আত্মাই, আত্মা যখন মন দিয়ে প্রকাশ হন তখনই আমিত্বের প্রকাশ পায়। ঐ আমিত্ব যখন দেহের সাথে জুড়ে যায় তখন দেহটা চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। তখন এই বুদ্ধি এসে যায়, আমি দেহ। শুদ্ধ আত্মা যে নিজেকে দেহ বোধ করছেন, এই বোধ এক ধাপে আসে না। আত্মা প্রথমে অহঙ্কারের সাথে এক হয়ে যায়, প্রথমে তাঁর আসে আমি বোধ, ঐ আমি বোধটা গিয়ে আছড়ে পরে দেহের উপর। ওখান থেকে তার সব কিছুর সাথে নিজেকে একাত্ম অনুভব হতে থাকে। তারপর যত শুভকর্ম, অশুভ কর্ম সব এই দেহের জন্যই হতে থাকে। এইভাবে কর্ম করতে করতে সে নানান কর্মে জড়িয়ে যায়। কোন একটা পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য আমি একটা মিথ্যা কথা বললাম, ঐ মিথ্যাকে বাঁচাবার জন্য আরও চারটে মিথ্যা কথা বলতে হয়, সেখান থেকে এক একটা মিথ্যার জন্য আরও চারটে মিথ্যা কথা বলতে হয়। অপরাধ জগতে প্রায়ই দেখা যায়, অসহায় হয়ে কেই কোন একটা অপরাধ করেছে, এরপর আর সে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওর মধ্যেই আরও অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তখন তাকে বুলেটের সাহায্যেই বাঁচতে হয়, বুলেটের সাহায্যে বাঁচে বলে মরেও বুলেটে। বন্দুকের শক্তিতে যারা বেঁচে থাকে তারা বন্দুকের গুলিতে মারাও যায়, এছাড়া তাদের বাঁচার আর কোন পথ থাকে না। অপরাধ জগতে একবার যে ঢুকে গেল সে আর কোন দিন ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, অন্য অপরাধীরাই তাকে বেরিয়ে যেতে দেবে না, বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কি শেষ, আর মৃত্যুও তার হবে গুলিতে। ঠিক তেমনি মানুষ মানুষের সাথে যখন কোন সম্পর্ক তৈরী করে নেয়, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাবা-সন্তানের সম্পর্ক, মা-পুত্রের সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক তখন এক অপরের ভালো মন্দের সাথে জড়িয়ে যায়। যাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এল, তার বাপের বাড়ি, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার সাথেই সে জড়িয়ে গেল, এখানে কিছু করার নেই। তার পরিবার যদি ক্রিমিনাল পরিবার হয় ক্রিমিনালদের সাথে এক হয়ে গেল, তার পরিবার যদি মুর্খ অশিক্ষিত হয় তাদের সাথে এক হয়ে গেল, তারা যদি সাধু পরিবার হয় তার সাথে এক হয়ে গেল। সমস্যা হল সব কিছুর সাথে আমাদের বোধ কাজ করে যাচ্ছে। স্ত্রী দোকান থেকে শাড়ি, গয়না কিনে যাচ্ছে স্বামীকে যে করেই হোক তার খরচ মেটাতে হয়। আবার স্বামী একটা ঝগড়ুটে, সবার সাথে ঝগড়া করে গোলমাল পাকিয়ে বেড়ায়, স্ত্রী গিয়ে সেই ঝামেলা মিটিয়ে বেড়াচ্ছে। এগুলো মানুষ বুঝতে পারে। কিন্তু দেহের সাথে একাত্ম বোধ হয়ে গেছে, এই একাত্ম বোধের জন্য এত কিছুর সাথে যে জড়িয়ে যাচ্ছে এই বোধটা তার কিছুতেই আসতে চায় না। গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপা হলে তখন চেতনা আসে। চেতনা এলেও মানুষ এমন ভাবে জড়িয়ে থাকে সেখান থেকে আর বেরোতে পারে না। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ আর তার সাথে নিজের সচেতন

একটা প্রচেষ্টা না থাকলে এর থেকে মুক্তি নেই। সেইজন্য সব সময় দেহের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। মনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, একবার যদি এই দেহের বিচার করি, দেহ মানেই ইন্দ্রিয় আর দেহ দিয়ে আমরা সারাদিন কি করছি; তখনই আমরা ধরা পরে যাব। জপ-ধ্যানের কথা সরিয়ে রাখুন, জপ-ধ্যান গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব হল এই দেহ। এই দেহ দিয়ে আমরা নতুন নতুন কর্মের জন্ম দিয়ে যাচ্ছি, যত কর্মের জন্ম হচ্ছে তত আমরা ওর মধ্যে আরও ফেঁসে যাচ্ছি। এর ফলে মানুষ পাপ-পূণ্যের হিসাবে নানা রকমের যোনিতে আসা যাওয়া করতে থাকে। এদের মধ্যে যারা একটু ভালো তারা সব সময় ভাবতে থাকে আমি সারা জীবন ভালো কাজ করেছি, যজ্ঞ করেছি, দান করেছি, আমি স্বর্গে যাব। মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যায় ঠিকই, কিন্তু স্বর্গে গিয়ে যেমনটি পূণ্য কর্ম করেছে সেই অনুসারে ভোগ করে আবার নীচে চলে আসে।

এরপর চন্দ্রমা মুনি একটা লম্বা পদ্ধতি বলছেন, কিভাবে জীবাত্মা ওখান থেকে বিভিন্ন যোনিতে গিয়ে শরীর ধারণ করে। বিভিন্ন পুরাণে এই জিনিসটাকেই বিভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে। এখানে যেমন বলছেন, জীবাত্মা প্রথমে চন্দ্রমণ্ডলে অবতরণ করে, সেখান থেকে চন্দ্রমার রশ্মিকে অবলম্বন করে আরও নীচে চলে আসে, তারপর অন্নকে আশ্রয় করে, সেই অন্নের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের শরীরে প্রবেশ করে, সেখান থেকে জীবাত্মা আবার জন্ম নেয়। বিরাট বর্ণনা করে যাচ্ছেন, এগুলো আমাদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। শেষে বলছেন শুধু 'আমি দেহ' এই অধ্যাস সম্ভূত অভিনিবেশ থেকে স্বর্গ, নরকাদি ভোগ এবং গর্ভবাস, জন্ম, দুঃখ ভোগ এত কিছু হয়ে যাচ্ছে। এই এতটুকু বোধ থাকার জন্য কত যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। যদি এই তত্ত্ব ঠিক হয়, আমরা মেনে চলছি এটাই সত্য তাহলে জীবাত্মা এখন যে গর্ভাবস্থায় আছে, যে জায়গাতে জীব শরীরে ঢুকে গেল; এখন কোন কারণে তার যদি চেতনা থাকে, আমিত্ব যদি এসে যায়, ছ মাস, সাত মাস মায়ের গর্ভে ছিল তখন ও ঢুকেছে এখন তিন-চার মাস ওর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে, এবার ভাবুন তার কি দুরবস্থা হবে। আমরা জানি না চেতনা থাকে কি থাকে না, আশা করছি চেতনা থাকে না। এই নিয়ে অনেক মতবাদ আছে, অনেকের মতে তার পূর্ব পূর্ব কর্মের চেতনা থাকে, কিন্তু জন্ম নেওয়ার সময় দৈহিক সংঘাতের জন্য যে আচ্ছন্নতা হয় তাতে তার আগেকার সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যায়।

সম্পাতিকে মুনি বোঝাচ্ছেন, সব সময় বিচার করবে তোমার জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তির অবস্থা এই তিন অবস্থা থেকে তুমি আলাদা, এগুলো অবাস্তবিক আর এই দেহটাও অবাস্তবিক এবং অচিরস্থায়ী, তোমার বাস্তবিক স্বরূপ হল তুমি সেই শুদ্ধ চৈতন্য আত্মা। আত্মাই একমাত্র শুদ্ধ; সত্য, জ্ঞান ও আনন্দই আত্মার স্বরূপ, আত্মার মধ্যে কোন ধরণের চাঞ্চল্য নেই। ধ্যান ধারণা করে যখন এই বোধ করবে তখন তোমার আত্মজ্ঞান হয়ে যাবে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হয়ে গেলে অবিদ্যা জনিত মোহ নাশ হয়ে যাবে। মোহ নাশ হয়ে গেলে এই দেহের সাথে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তখন এই দেহ থাকল কি নাশ হয়ে গেল তাতে কিছু যায় আসে না।

এই দেহেরও গুরুত্ব আছে, দেহ দিয়ে জগতের সুখভোগ হয়, কর্মের ভোগ হয়, প্রারব্ধ কাটে। ঈশ্বর দর্শনের জন্য আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই দেহেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। এক মাঝ বয়সী মহিলা ভক্ত, শরীরটাও তাঁর এখন সুস্থ নয়, তিনি একজনকে বলছিলেন, শাস্ত্রে বলে পুরুষ শরীর ছাড়া ঈশ্বর দর্শন হয় না, পুরুষকেই সন্ন্যাসের কথা বলা হত, সারা জীবন আমি এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছি। এই বয়সে এসে আমি বুঝতে পারছি শাস্ত্র ঠিকই বলছে। এখন পুরো মন শরীরের উপর দিতে হচ্ছে। মেয়েদের শারীরিক মানসিক এত বেশি সমস্যা যে সেই তুলনায় পুরুষদের কিছুই হয় না। সুস্থ, বলিষ্ঠ শরীর যদি না থাকে সেই শরীর দিয়ে কোন সাধনাই হবে না। কথায় বলে, বল বুদ্ধি ভরসা তিরিশ পেরলেই ফর্সা। তিরিশ পেরলেই বেশির ভাগের কোমরে ব্যাথা, পেটের রোগ, ব্লাড সুগার, রক্তচাপ, ঘুম না হওয়া লেগেই থাকে। মহাপুরুষ মহারাজ সবাইকে বলতেন, গণিকারা যেমন দেহের যত্ন নিয়ে দেহকে খুব সামলে রাখে তোমরাও সেইভাবে দেহকে সামলে রাখবে। কারণ সাধন পথে একমাত্র দেহই কাণ্ডারী। সংসারের পাঁচ রকমের সমস্যা আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের লোকদের সাথে নিয়ে মিটিয়ে দেওয়া যাবে, বেশি অর্থ থাকলে দু চারজন ভৃত্য রেখে সংসারের সব কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। জগতে সব কিছুর বিকল্প পাওয়া যাবে কিন্তু শরীরের কোন বিকল্প পাওয়া যাবে না, শরীর দিয়ে একটাই কাজ হয় সেটা হল সাধন-ভজন। আমার হয়ে কেউ সাধন-ভজন করে দিতে পারবে না। ঠাকুর বার বার বলছেন, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এই শরীর দিয়ে অনেক কিছু হয়, ভোগ হয়, কর্ম হয়, কর্মের প্রারব্ধ ভোগ হয়। নানান রকমের যে সুখ-সুবিধা আছে, এগুলোর বিকল্প ব্যবস্থা করা যেতে পারে, নীচু হয়ে কিছু করতে পারছে না,

একটা মেশিন নিয়ে আসা যায়। কিন্তু সাধন-ভজনের কোন বিকল্প নেই, একমাত্র নিজের শরীর দিয়েই তা করতে হবে, এখানে কোন আপোস নেই। শরীরের প্রতি যাদের নজর নেই তাদের দ্বারা আর যাই হয়ে যাক সাধন-ভজন কোন ভাবেই হবে না। চন্দ্রমা মুনি বলছেন, যোগীরা তাই শরীরকে খুব সামলে রাখেন। কিন্তু একবার আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে তখন আর শরীরের ব্যাপারে কোন হুঁশ থাকে না, থাকলে থাকল, না থাকলে চলে গেল, শরীরের দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সাধনার সময় ঠাকুরের কি বলিষ্ঠ সুস্থ শরীর ছিল, যার জন্য ঐ অকল্পনীয় সাধনার ধকল তিনি সামলাতে পারলেন। যারা ঘাটের মড়া, পেটের রোগী এদের দ্বারা কখনই ধর্ম সাধন হয় না। সেইজন্য বলাই হয়, যা কিছু করার তিরিশ বছরের আগেই করে নিতে হয়। তার কারণ একটাই, সেই সময় আপেক্ষিক ভাবে শরীরটা অনেক মজবুত থাকে। সম্পাতিকে বলছেন, তোমার তো এখনও আত্মজ্ঞান হয়নি আবার তুমি বলছে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করবে, এসব করতে যেও না। তোমার প্রারব্ধ যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণ দেহটাকে ধারণ করে রাখ, প্রারব্ধ শেষ হলে দেহ আপনা থেকেই চলে যাবে। জ্ঞানী আর অজ্ঞানীর মধ্যে এটাই তফাৎ, জ্ঞানী মনে করেন দেহ থাকলেও যা না থাকলেও তাই, অজ্ঞানী যখন সুখে থাকে তখন মৃত্যুকে ভয় পায় আর যখন খুব দুঃখ-যন্ত্রণা পায় তখন বলে মরলে বাঁচি। কিন্তু সবাইকেই প্রারব্ধের খণ্ডন করতে হবে।

সব বলার পর সম্পাতিকে চন্দ্রমা মুনি বলছেন, পরে এখানে শ্রীরামচন্দ্র আসবেন, তাঁর কাজে তুমি সাহায্য করার সুযোগ পাবে। যেমনি তুমি সীতার খবর শ্রীরামচন্দ্রের লোকেদের বলে দেবে, এই শুভ কাজের জন্য তোমার আবার নতুন করে ডানা গজাবে। এর আরেকটা অর্থ হতে পারে, সম্পাতির এই শরীর চলে যাবে, শরীর চলে যাওয়ার পর একটা নতুন দিব্য শরীর পেয়ে গেল। সম্পাতি এই কাহিনী বলার পর বানরদের বলছেন, এই দেখুন যেমনি আমি সীতার খোঁজ দিয়ে দিলাম আমার নতুন ডানা গজাতে শুরু হয়েছে। আপনাদের যা বলার বলে দিয়ে আমার মুক্তি হয়ে গেল, আমি এবার এখান থেকে চললাম, আপনারও এখন সমুদ্র লঙ্ঘনের চেষ্টা করুন। তবে একটা শেষ কথা আপনাদের বলে দিচ্ছি, আপনারা আশা ছাড়বেন না, যিনি সেই পরমেশ্বর তাঁর কাজে আপনারা নেমেছেন। আপনার শ্রীরামচন্দ্রের নিজের লোক, তাঁর বিশেষ কাজে নেমেছেন, আপনাদের আর কিসের চিন্তা! এরপর সম্পাতি সেখান থেকে চলে গেল। ঠাকুরের কাজ করলে কিসের চিন্তা। যেখানে নিজের কাজ করতে হয় সেখানে সুখ-দুঃখের ব্যাপার থাকে, সেখানে মান অপমানের ব্যাপার থাকে। ঠাকুরের কাজ করতে গিয়ে যদি কাজ হয়ে যায় ভালো যদি নাও হয় তাতেও কিছু যায় আসে না। সবাই এখন নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করতে শুরু করেছে – সবই তো বুঝলাম কিন্তু এই বিশাল সমুদ্রকে উল্লঙ্ঘন করা হবে কি করে!

<u>জাম্বোবান কর্তৃক হনুমানকে তাঁর শক্তির স্মরণ করিয়ে দেওয়া</u>

একদিকে সবাই খুশি, এতদিন সীতার ব্যাপারে কোন কিছুই জানা যাচ্ছিল না, কিন্তু সীতা এখন কোথায় আছে জানা গেছে। জানা গেলেই যে সব সমাধান হয়ে গেল তা নয়, অনেক ধরণের বাস্তবিক সমস্যাও এসে উপস্থিত হয়। প্রথম সমস্যা বিশাল সমুদ্র, সম্পাতি বলে গেছে এর দূরত্ব একশ যোজন। পুরাণে সময় আর দূরত্বের হিসাব এলেই সব তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তবে বড় সমুদ্র, এই সমুদ্রকে অতিক্রম করতে হবে। সমুদ্রে আবার বিশাল বিশাল ঢেউ। বলছেন, এই রাজকার্য যে করতে পারবে সে আমাদের সবারই প্রাণদান করবে। আমরা যদি সীতার কোন খবর না নিয়ে ফিরে যাই আমাদের মরতে হবে, সুগ্রীব আমাদের যে কি করবে কোন ঠিক নেই। একজন কেউ এই কাজ করে দিলে আমরা সবাই প্রাণে বেঁচে যাব। এসব কথা বলার এক অপরের দিকে তাকাচ্ছে, বল! কে পারবে, কার কেমন ক্ষমতা? তখন কেউ বলছে আমি দশ যোজন লাফিয়ে চলে যেতে পারি, কেউ পঞ্চাশ যোজন পারবে। জাম্বোবান বলছে, একটা জোর লাগিয়ে এক লাফে আমিও চলে যেতে পারব কিন্তু ফেরত আসতে পারব না, ওতেই আমার সব শক্তি বেরিয়ে যাবে। বাঘ, সিংহ এরাও শিকার করতে গিয়ে একটা দুটো যদি জাম্প মেরে দেয় তারপর তাকে বেশ কিছুক্ষণ থামতে হয়। কোথায় আছে জানা হয়ে গেছে, কি করতে হবে সেটাও জানা হয়ে গেছে কিন্তু উপায়টা আর পাওয়া যাচ্ছে না। জাম্বোবান একবার হনুমানের দিকে তাকালেন।

ঋষ্যমুক পর্বতের সানুদেশে শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সাথে আমরা প্রথম হনুমানের দেখা পাই, যেখানে তিনি সুন্দর ভাষা ব্যবহার করছেন। এরপর থেকে যে কবার আমরা হনুমানের দেখা পেয়েছি তাতে যেটুকু পরিচয় পাই তার মূল হল হনুমানের বুদ্ধি। একেবারে কুশাগ্র বুদ্ধি আর তার সাথে পরিস্থিতিকে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা। শ্রীরামচন্দ্র তাই মুদ্রিকাটা হনুমানকেই দিলেন। কারণ শ্রীরামচন্দ্রও বুঝতে পেরেছেন এরই ক্ষমতা আছে। হনুমানের

ব্যক্তিত্বের আরেকটা দিক ঠিক এই জায়গা থেকে খুলতে শুরু করে। জাম্বোবান হনুমানের দিকে তাকিয়ে সব বানরদের বলছেন, মহাবীর হনুমান হলেন সাক্ষাৎ বায়ু দেবতার পুত্র। শ্রীরামচন্দ্রের কাজে লাগবেন সেইজন্যই বায়ু দেবতা হনুমানের জন্ম দিয়েছেন। এক অপ্সরা কিভাবে শাপগ্রস্ত হয়ে বানর জাতিতে জন্ম নেয়। বানর জাতির রাজা অঞ্জনী, তাঁর স্ত্রী সেই অপ্সরা, তার নাম অঞ্জনা। বায়ু দেবতা বানর জাতির সুন্দরী মেয়ে অঞ্জনাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে অঞ্জনাকে আলিঙ্গন করেন। অঞ্জনা বুঝতে পেরেছে কিছু একটা গোলমাল হচ্ছে, চেঁচাতে শুরু করেছে। তখন বায়ু দেবতা বলছেন, আমি হলাম বায়ু দেবতা, এখান থেকে তোমার যে পুত্র হবে সে সর্বশক্তিমান হবে, জ্ঞানী হবে। বেদে বায়ুর আরেকটি অর্থ প্রাণ, প্রাণ আর বায়ু দুটো একই সাথে চলে। যার জন্য প্রাণকে অনেক সময় মুখ্যপ্রাণও বলে। বায়ু বলতে আমরা বাতাসই বুঝি, কিন্তু বায়ু ঠিক বাতাস নয়। বেদ উপনিষদে তিনটে জিনিসকে এক জায়গায় মিলিয়ে দিচ্ছেন, বাতাস, তার সঙ্গে প্রাণ যে প্রাণ সব প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে আর তৃতীয় এনার্জি। যেখানেই এনার্জি সেখানেই প্রাণনক্রিয়া চলে। প্রাণনক্রিয়া মানেই ওখানে মোশান আছে। ব্যাটারিতে ইলেক্ট্রিক্যাল পাওয়ার আছে, কিন্তু সেখানে প্রাণনক্রিয়া নেই, এনার্জি ওখানে পোটেনশিয়াল ফর্মে আছে। কিন্তু যখন তারের সাথে জুড়ে দেওয়া হবে, ইলেক্ট্রিসিটি যখন চলতে শুরু হয়ে গেল, তখন প্রাণনক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। প্রাণ এখন সচল হয়ে গেল, যতক্ষণ প্রাণ সচল না হয় ততক্ষণ ওটা প্রাণ নয়। বায়ু হলেন তার দেবতা। যেখানেই যে কোন ধরণের সচল বা গতি থাকবে, গতি মানেই এনার্জি, এনার্জি মানেই প্রাণ, প্রাণ মানেই তার দেবতা বায়ু দেবতা। বায়ু দেবতা আর বায়ু দুটোর মধ্যে ছোট একটা তফাৎ আছে, সাধারণ অর্থে আমরা যে বাতাস মনে করি সেখানেও ক্রিয়া হচ্ছে, তারও দেবতা বায়ু দেবতা। যেখানে যে কোন ধরণের গতি আছে সেই মোশান হল বায়ু দেবতার জন্য। যে মহাজাগতিক শক্তি, যে শক্তিতে নক্ষত্র ঘুরছে, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্যকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সব ক্রিয়া প্রাণন ক্রিয়ার জন্যই হয়।

হনুমান হলেন সাক্ষাৎ সেই বায়ু দেবতার পুত্র, যাঁর শক্তিতে মহাজাগতিক নক্ষত্রমণ্ডল চলছে তাঁর পুত্র হলেন হনুমান, পুত্র মানে তাঁর ভালোবাসার জিনিস। তার মানে নিজের যা কিছু আছে সেটাও দিচ্ছেন আর উপর থেকে দরকার হলে ধার করেও দেবেন। তাই হনুমানকে সামলানো খুব মুশকিল, পুরো এনার্জি টগবগ করে ফুটছে। ছোটবেলায় একবার ঘুম ভাঙার পর ভোরের লাল সূর্যের দিকে চোখ যেতেই হনুমানের মনে হল এটা বুঝি কোন ফল। সে তখন হাত বাড়িয়ে সূর্যকে খাওয়ার জন্য দৌড়ে গেছে। পৌরাণিক চিন্তা ভাবনা কোন স্তরে চলে যেতে পারে এগুলো হল তার নিদর্শন। তবে এটা কোন আশ্চর্যের কিছু নয়, সূর্য হনুমানের কাছে কিছুই না। কারণ হনুমান বায়ু পুত্র, বায়ু পুত্র মানে পুরো যে কসমিক এনার্জি তার দেবতার পুত্র, এনার্জি না থাকলে সূর্যই থাকবে না। বাল্মীকি যাই লিখে থাকুন পুরো ব্যাপারটা একেবারেই অযৌক্তিক নয়। সূর্য প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে, ইন্দ্রকে ডেকেছে, ইন্দ্র এসে রেগেমেগে হনুমানের উপর বজ্র চালিয়ে দিয়েছেন। বজ্র চালাতেই হনুমান বেহুঁশ হয়ে নীচে পড়ে গেল, আর তার মুখটা একটু বেঁকে গেল, সেইজন্য তাঁর নাম হয়ে গেল হনুমান। ছেলেকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, হনু বেঁকে গেছে বায়ু দেবতা প্রচণ্ড রেগে গেলেন, আমার ছেলের উপর বজ্র চালানো! ঠিক আছে! তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব প্রাণনক্রিয়া বন্ধ করে দিলেন। কোন কম্পন নেই, কম্পনই যদি না হয় তাহলে বাতাস প্রবাহিত হবে কী করে! পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, প্রাণীকুল কতক্ষণ বেঁচে থাকবে, কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। এভাবে জগতের সমস্ত প্রাণিকুলের বিনাশ হতে দেওয়া যায় না। দেবতারা সন্ত্রস্থ হয়ে ব্রহ্মার কাছে দৌঁড়ে গেছেন, ব্রহ্মা আবার বায়ু দেবতাকে বোঝাতে লাগলেন, এ রকম করো না। তাহলে একটা সমঝোতা করতে হবে। কি সমঝোতা হবে? হনুমানকে দেবতারা আর কখন কিছু করতে পারবে না। ব্রহ্মাও বায়ুকে শান্ত হয়ে যেতে বললেন তার সাথে বললেন, আমিও আমার তরফ থেকে হনুমানকে বর দিচ্ছি, আমার যত অস্ত্র আছে, ব্রহ্মপাশ, ব্রহ্মাস্ত্র ইত্যাদি এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এত ক্ষমতা যদি হনুমান পেয়ে যায় তাহলে সে তো সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অশান্তি মাচিয়ে দেবে। তখন ঠিক করা হল, হনুমানের ভেতরে যে এই শক্তি আছে এটা এখন তাঁর স্মরণে থাকবে না। তবে কেউ যদি তাঁকে মনে করিয়ে দেয় তখন হনুমান তাঁর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। এটা একটা আখ্যায়িকা, এই কাহিনী যদি না থাকে তাহলে রামকথা হবে না। রামকথা রাখতে হলে হনুমানকে শক্তিমান হতেই হবে আর তার সাথে বিস্মৃতিটাও থাকতে হবে। বিস্মৃতি যদি না হয় তাহলে এই কাহিনী চলবে না, কারণ তখন এক ভগবান ছাড়া হনুমানকে আর কেউ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে না। কারণ ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি প্রকৃতিরও

মালিক। যেখানেই কম্পন, যেখানেই প্রাণ সেটাই প্রকৃতির এলাকা। প্রকৃতির আবার দুটো দিক, একটা হল মহৎ বা বুদ্ধি আর অন্যটা ক্রিয়াশক্তি। হনুমানের মধ্যে দুটোই আছে, বুদ্ধিও আছে শক্তিও আছে।

এর মধ্যে বেদান্তের খুব উচ্চ একটা ধারণা লুকিয়ে আছে। বাল্মীকি এত কিছু ভেবে লিখেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। তিনি একটা চরিত্র নির্মাণ করছেন, চরিত্রের একটা মাধুর্য আছে, চরিত্রের শক্তি আছে। হিন্দুদের মধ্যে স্বপ্নকে কেন্দ্র করে, শক্তিকে নিয়ে খুব সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে। বিদেশে স্যামসনের খুব নামকরা কাহিনী আছে, সেখানে স্যামসনের যত শক্তি সব ওর চুলে ছিল। স্যামসনকে ফাঁসানোর জন্য ডেলায়লা নামে একটা মেয়েকে লাগিয়ে দিল। মেয়েটি কায়দা করে তার লম্বা লম্বা চুলগুলো কেটে দিয়েছে। তাতে তার শক্তি চলে গেল। এরপর তাকে বেঁধে রেখেছে। বাঁধা থাকতে থাকতে চুল আবার বড় হয়ে গেছে। আমাদের জীবন-দর্শন পুরোপুরি চলে হনুমানের লাইনে, মানুষের ভেতরেই অসীম শক্তি কিন্তু মানুষ ভুলে আছে। মানুষের তিনটে অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি আর তার যে জীবন এর সাথে স্বপ্নের বিরাট মিল। এই ভাবকে মানুষের মনের মধ্যে বসিয়ে দেবার জন্য কাহিনীর পর কাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একটা কাহিনী হল, ভগবান যখন মানুষের সৃষ্টি করলেন তখন তাকে আত্মজ্ঞান দিয়েই সৃষ্টি করলেন, এতে দেবতারা ভয় পেয়ে গেল। মানুষ যদি জেনে যায় সে কে, এই আত্মজ্ঞান যদি সে পেয়ে যায় তাহলে তাকে আর সামলানো যাবে না, স্বর্গ, পাতাল সব লোক জয় করে নেবে, দেবতাদেরই মানতে চাইবে না। দেবতারা সবাই মিলে তখন ব্রহ্মার কাছে গেলেন। ব্রহ্মা তখন বললেন, এক কাজ করা যাক ওদের আত্মজ্ঞানকেই লুকিয়ে দাও। দেবতারা এবার ওদের আত্মজ্ঞানকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায়, কখন পর্বতের গুহায় লুকিয়ে রাখছে, কখন সমুদ্রের তলায়, কখন স্বর্গে। দেবতারা দেখছেন জগতে এমন কোন জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে মানুষ পৌঁছে যেতে পারবে না। সব জায়গা থেকেই মানুষ ঠিক আত্মজ্ঞানকে খুঁজে বার করে নেবে। তাহলে কি করা যায়? ব্রহ্মা বলছেন, ওদের মনের ভেতরেই আত্মজ্ঞানকে লুকিয়ে দাও। বাইরে সব জায়গাতে মানুষ অনুসন্ধান করে বার করে নিতে পারবে কিন্তু নিজের ভেতরে ওরা কোন দিন ঘুরে দেখবে না। কঠোপনিষদে এটাই যমরাজ বলছেন, *আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন*, যদি অমৃতত্বের ইচ্ছে থাকে তাহলে ভেতরের দিকে তাকাও, বাইরের দিকে তাকিও না। *পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণাৎ স্বয়ম্ভূ*, কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো সব বহির্মুখী, তাই সব মানুষ বাইরের দিকেই তাকিয়ে যাচ্ছে। ভেতরের দিকে কেউ তাকাতে চায় না, ভেতরের দিকে তাকালে তার অমৃতত্ব লাভ হয়ে যাবে। অমৃতত্ব লাভ হয়ে গেলে তাকে আর সামলে রাখা যাবে না। দেবতারা এমন এমন সব ব্যবস্থা করে রেখেছে যার ফলে মানুষের মন বাইরের দিকেই যাবে, ভেতরের দিকে যাবে না। মানুষ নিজেকে প্রলুব্ধ করার জন্য আরও পাঁচটা কাজ জুটিয়ে নেবে।

এই যে কাহিনী বলা হল বা হনুমানের ব্যাপারে দেবতারা যে বললেন, ভেতরের এই শক্তির খবর যদি ও জেনে যায় তাহলে ওকে আর সামলে রাখা যাবে না, এই শক্তির জ্ঞান যেন হনুমানের বিস্মৃতি হয়ে যায়। এই যে ভাব, যে ভাব এতদিন বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল, এই ভাবটাই সারা বিশ্বে প্রথম খোলাখুলি প্রচার করলেন স্বামীজী, বলে দিলেন, তোমার ভেতরে অসীম শক্তি। এই একটি বাক্য, 'তোমার ভেতরে অসীম শক্তি', অন্যান্য সব ধর্ম থেকে বেদান্তকে আলাদা করে দেয়। একমাত্র বৌদ্ধ ধর্মই হিন্দু ধর্মের খুব কাছাকাছি আসে, জৈন বা শিখ ধর্মও এত কাছে আসে না। বৌদ্ধ ধর্ম বলছে, তুমি চেষ্টা করে যাও, চেষ্টা করতে করতে একটা সময় তুমি বুদ্ধের অবস্থা বা তার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছে যাবে। এক জন্মই হোক আর দশ জন্মই লাগুক চেষ্টা করতে করতে তুমি কোন এক জন্মে পৌঁছে যাবে। যত ধর্ম সব এশিয়াতেই জন্ম নিয়েছে, একটা হল ইণ্ডিক রিলিজিয়ান, ভারতের যে চারটে ধর্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন আর শিখ, আরেকটা হল মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্ম, পার্সি, জহুদি, ইসলাম ও খ্রীশ্চান। ইউরোপ আমেরিকা কোথাও কোন ধর্মের জন্ম হয়নি। মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার ধর্মগুলিতে সমস্যা হল ওদের কাছে সৃষ্টি একবারই হয়েছে, এরপর আর কোন সৃষ্টি হবে না। এই সৃষ্টি একদিন শেষ হয়ে যাবে। তোমার জন্মও একবার হয়েছে। তোমার একটা সীমিত ক্ষমতা আছে, সীমিত ক্ষমতা দিয়ে সীমিত উপলব্ধি হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই আল্লা বা গডের কাছাকাছি যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। ভগবান তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, স্রষ্টা আর সৃষ্টি এই দুটোর কখন মিলন হয় না। হিন্দুদের দর্শন এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা সবাই সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা, সেইজন্য আমার আপনার ভেতরে অনন্ত জ্ঞানরাশি, অনন্ত ক্রিয়াশক্তি। কিন্তু এই জ্ঞানরাশি ও ক্রিয়াশক্তির উপর আবরণ পড়ে গেছে, তুমি ভুলে গেছ, এছাড়া আর কিছু না। যদিও মহাবীর হনুমানের কাহিনী বাল্মীকি অন্য ভাবে চিন্তা করে লিখেছিলেন, কিন্তু পুরো বেদান্তের যে সারতত্ত্ব, যে মূল সত্য যদি কোথাও ঠিক ঠিক

প্রতিফলিত হয়ে থাকে তা হল এই মহাবীর হনুমানের কাহিনী। তোমার ভেতরে অসীম শক্তি, তোমার ভেতরে অনন্ত জ্ঞান, যে কথা স্বামীজী বার বার বলছেন, এটাই সত্য। কিন্তু তোমার জ্ঞানের উপর, শক্তির উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ চাপা পড়ে গেছে। একবার যেই অজ্ঞানের আবরণ চাপা পড়ে গেল, এরপর একটার পর একটা চলতেই থাকে, সেখান থেকে স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, আত্মীয়, টাকা-পয়সা, ধর্ম-অধর্মের এমন জাল ছড়িয়ে গেছে, দশটাকে যদি নাশও করে দেওয়া হয় আরও দশটাকে জুটিয়ে নিয়ে তার মধ্যে একেবারে মজে থাকে। কিন্তু একবার যদি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে সরে আসে তাহলে দেখবে তার মধ্যে সেই অসীম শক্তি এসে যাবে। তখন দেখবে এটাও আছে ওটাও আছে। কিন্তু ক্ষণিক অনিত্য জিনিসগুলোকে যে ছাড়তে হবে, সেটাই আর হয় না। আর সবাই গুরুদের কাছে ঘুরে বেড়াবে, মনে করছে যে গুরুই সব করে দেবেন। কোন গুরুই কারুর জন্য কিছু করে দেননি। ঠাকুরের কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা এক একজন কী উচ্চ আধার। তাও ঠাকুর দুঃখ করে বলছেন, এরা কিছুই করবে না, সবটাই তাদের করে দিতে হবে। রান্না করে থালায় সাজিয়ে আবার ধরে মুখে পুরে দিতে হবে। আমাদের মধ্যে সব বিচিত্র রকমের ধারণা এসে গেছে, গুরু কৃপা করবেন। কিছুই করবেন না, একমাত্র আত্মকৃপাতেই হবে। একবার অন্তত বোঝার চেষ্টা করতে হবে, আমার ভেতরে অসীম শক্তি। যেটা লাগবে সেটা হল বিশ্বাস, হ্যাঁ, আমার ভেতরে অসীম শক্তি আছে। স্বামীজী বলছেন, আমার যখন শক্তির দরকার হয় তখন আমি সিংহের হৃদয়ের উপর ধ্যান করি। একটা সিংহের হৃদয়ের উপর যদি কেউ ধ্যান করে বুঝতে পারবে যে তার শক্তি বাড়ছে। আমার ভেতরে অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান, বেদান্ত এটার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। এই জগতে এমন কিছু নেই যেটা তুমি করে নিতে পার না। বিশ্বে যে কজন বিখ্যাত মহাপুরুষরা ছিলেন, যীশুই বলুন আর স্বামীজীই বলুন, সবারই ভেতরে এটাই। যখন একবার নিজের অজ্ঞানকে সরিয়ে দিলেন, তারপর তাঁর যে শক্তি বিচ্ছুরণ হয়েছে, সেই শক্তির প্রভাব হাজার, দু হাজার বছর ধরে চলছে, সেই প্রভাবকে আর থামানো যাচ্ছে না। কিন্তু তার আগে তিনি কি ছিলেন, খুবই সাধারণ একজন মানুষ। আমরা অনেক রকম কথা বলছি ঠিকই, তিনি অবতার, তিনি ঈশ্বরের পুত্র কিন্তু আমরা দেখছি তাঁর জীবনটা এক রকম ছিল সেখান থেকে অন্য রকম হয়ে গেল। সেমেটিক ধর্মের সাথে আমাদের ধর্মের এটাই প্রধান পার্থক্য। সেমেটিক ধর্মের যে চিন্তা-ভাবনা আমাদের এখানে এসেছে আর আমাদের যে নিজস্ব বেদান্তের দর্শন যেখানে ঐ অসীম শক্তি অসীম জ্ঞানের কথা বলছে, যেখানে কারুর প্রতি কোন কটুতা, নিন্দা নেই, আর এমনই ক্ষমতা যে সবাইকে গ্রহণ করে নিচ্ছে। যে নিন্দা করছে তাকেও গ্রহণ করে নিচ্ছে, কত শক্তি হলে তবে গিয়ে এই জিনিস সম্ভব! হনুমানের ঠিক এই শক্তি ছিল, অসীম শক্তি কিন্তু চাপা পড়ে আছে। এই একই শক্তি সব মানুষের মধ্যেই আছে।

একজন শিল্পী একটা ঘোড়ার ছবি এঁকেছে, কিন্তু দেখে মনে হবে কোন কাঠের ঘোড়ার মুর্তি এঁকেছে, নিষ্প্রাণ মনে হচ্ছে। ঘোড়ার ছবি যখন আঁকবে তখন সেই ছবি দেখেই মনে হবে জীবন্ত, ছবির মধ্যে ঘোড়ার তেজ ফুটে উঠবে। শিল্পী কি এই পর্যায়ে ছবিকে নিয়ে যেতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। তার মধ্যেও সেই অসীম ক্ষমতা আছে। জগতে এমন কোন কিছু নেই যেটা মানুষ পারবে না। এর যদি অন্যথা কিছু হয় তাহলে বেদান্ত মিথ্যা হয়ে যাবে। আমাদের প্রথম সমস্যা হল ঘর, সংসার, বন্ধু-বান্ধব সব কিছুকে জড়িয়ে রেখেছি। এটা তো গেল বহির্জগতের প্রকাশ। অন্তর্জগতে আরও বাজে সমস্যা, সেখানে কত হাজার রকম সংস্কার, ধারণা, দুর্বলতাকে আমরা আঁকড়ে ধরে রেখেছি। আঁকড়ে ধরে রাখলে সেই শক্তি খুলবে কী করে! খোলার জন্য ছাড়তে হবে। মন, মনের পেছনে আত্মার শক্তি, মনের শেকলগুলোকে খুলতে হবে, না খুললে আত্মার শক্তি বেরোতে পারবে না। পাখির দাঁড় যদি খুলে না দেওয়া হয় তাহলে কি করে সে মুক্ত আকাশে উড়বে। এটাই বেদান্ত। স্বামীজী বেদান্তের একটা মূল সত্যকেই বলছেন, আর এটাই সত্য। স্বামীজী বলছেন বলে নয়, এটাই সত্য। বেদান্ত আর অন্যান্য ধর্মের এটাই তফাৎ। অন্যান ধর্মে একজন কেউ বলেছেন তাই সেটা সত্য। বেদান্তে তা হয় না। বেদান্তের এটাই সত্য, এটাই পরে একজন বলে দিয়েছেন। তোমার ভেতরে অসীম শক্তি, তোমার ভেতরে অসীম জ্ঞান এটা যদি সত্য না হয় তখন শুধু বেদান্তই মিথ্যা হয়ে যাবে না, এর সাথে বিশ্বের সব ধর্মই ইসলাম, খ্রীশ্চান সব মিথ্যা হয়ে যাবে। এই বাক্যের সাথে বেদান্তের কোন সম্পর্ক নেই। যীশুর দিকে যখন তাকাচ্ছে তখন ভাববে একটা কাঠ মিস্ত্রির ছেলে এতটা হল কি করে? তখন খ্রীশ্চানরা বলবে, উনি ছিলেন son of God। মহম্মদ বাচ্চা বয়সে ছাগল, ভেড়া চড়াতেন, তাঁর মধ্যে এত ক্ষমতা এল কোথা থেকে? মুসলমানরা বলবেন, উনি প্রফেট। প্রফেট মানে আল্লা যাঁকে বেছে নিয়েছেন। একেবারে ঠিক কথা, আল্লা বেছে নিয়েছেন। তাহলে আল্লা একজনকেই বেছেছেন

নাকি আরও দুজনকে বাছতে পারেন? ওরা বলবে বাছা যাবে না। এখানেই এরা ভুল করছে। যদি একজনকে বেছে নিতে পারেন তাহলে আরও একজনকে তিনি বাছতে পারেন। যদি বাছতে পারেন তাহলে আমি কেন সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি হতে পারব না। এইসব জায়গায় সমস্যা হল rationality আর অন্ধ বিশ্বাসে তফাৎ এসে যায়। Rationality বলছে, মহম্মদ যেটা করেছিলেন, আমিও যদি সেভাবে ত্যাগ তপস্যা করি, আমি যদি সেভাবে ধ্যান-ধারণা করি ঈশ্বর তাঁর জ্ঞান আমাকেও দেবেন। অন্ধ বিশ্বাস বলছে, না এটা আর দ্বিতীয়বার হতে পারে না। ইসলাম ধর্মের পরের দিকে মনীষী, ঋষি যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও ঐ অবস্থায় চলে যাচ্ছেন। শুধু তফাৎ হল, তুমি বলছ মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ, আমরা বলছি এই জীবনেই সে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করতে পারবে। যে শক্তি দিয়ে মানুষ অনন্ত স্বর্গ পেতে পারে, সেই শক্তি দিয়ে মানুষ অনন্ত পৃথিবী কেন ভোগ করতে পারবে না! খ্রীশ্চান ধর্ম বলছে, তোমরা হলে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী। তাহলে এখানেও বলতে হয় স্বর্গরাজ্য আমি পেতে পারি তাহলে পৃথিবীর সাম্রাজ্য আমি পেতে পারব না? যুক্তিতেই এই জিনিস দাঁড়ায় না। কাকে বলছেন তুমি স্বর্গরাজ্য পাবে? যারা পবিত্র হৃদয়ের, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে। পবিত্র হৃদয় মানে সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরকে ভালোবাসা মানে যারা ভক্তিযোগ অনুশীলন করছে। পবিত্র হৃদয় আর ঈশ্বরকে ভালোবাসা, এই দুটো তোমাকে ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দিচ্ছে। আমরাও তো এই কথাই বলছি। আমরা তো তাও দশটা জন্মের কথা বলছি, আর তোমাদের একটা জন্মেই দিয়ে দিচ্ছে। অসীম শক্তি না হলে কি করে একটা জন্মেই ঈশ্বরের সাম্রাজ্যের অধিকারী হচ্ছে! Kingdom of Heaven মানেই তো অনন্ত শক্তি। এখানে তুমি একটা রুটি খেয়ে হজম করতে পারছ না, এই তো তোমার শক্তির দৌড়, সেখানে বলছেন, Kingdom of Heaven, কী অসীম শক্তি! অসীম শক্তি পাওয়া মানেই অসীম জ্ঞান, ঈশ্বরকেই তুমি জেনে যাচ্ছ। এই কথা তো আমাদের প্রত্যেকটি শাস্ত্রও বলছে। সেইজন্য বেদান্তের একটি কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে প্রত্যেকটি ধর্মই মিথ্যা হয়ে যাবে। শুধু তফাৎ হল ওরা এক একটা দিককে নিয়ে বলে আর বেদান্ত সবটাকে নিয়েই বলে। বেদান্তের যে শেষ কথা, তোমার ভেতরে অসীম শক্তি, তোমার ভেতরে অসীম জ্ঞান, এই জিনিসটা চাপা পড়ে গেছে। কিসে চাপা পড়ে গেছে? অজ্ঞানে। খ্রীশ্চান, ইসলাম মত বা বৈষ্ণব মতে সমস্যা হল একটা মূর্তি গড়া। মূর্তি গড়া মানে, প্রত্যেকটি মানুষ একটা পাথর, সেই পাথরে ছেনি দিয়ে কেটে কেটে একটা মূর্তি গড়া হচ্ছে। কাজটা যেন বাইরে থেকে আসছে। খ্রীশ্চানরা বলছে তুমি জন্ম থেকেই পাপী। কবে তোমার পূর্বজ আদম আর ঈভ কি একটা পাপ করেছিলেন, সেই পাপে তাঁদের স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গিয়েছিল। কবে সেই পাঁচ হাজার বছর আগে একটা পুরুষ একটা মেয়েকে ভালোবেসে ছিল, সেই পাপ নাকি জন্ম থেকে আমাকে বহন করে যেতে হচ্ছে। এর অর্থ হল, তুমি একটা অপদার্থ হয়ে জন্ম নিয়েছ। এবার তুমি একটা মূর্তি গড়, তোমার জীবনকে দাঁড় করাও। সেখান থেকে তুমি একটা সুন্দর প্রতিমা হয়ে গেলে। সুন্দর প্রতিমা হওয়া মানে, তোমার মধ্যে পবিত্রতা এসে গেছে আর ঈশ্বরের প্রতি তোমার ভালোবাসা এসে গেছে। এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গী। বৈষ্ণবদেরও তাই দৃষ্টিভঙ্গী, তুমি কৃষ্ণকে ভালোবাস, কৃষ্ণকে ভালোবাসতে গেলে তোমাকে এটা সেটা করতে হবে। দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হল বেদান্তের। বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাইরে থেকে কিছু আসে না। আচার্য শঙ্করের খুব প্রিয় উপমা হল চন্দন কাঠ, জলের সংসর্গে থাকতে থাকতে চন্দনের মধ্যে দুর্গন্ধ এসে যায়। চন্দনের সুগন্ধ যদি পেতে হয় চন্দনকে জলের সংসর্গ থেকে সরিয়ে এনে ভালো করে ঘষে মেজে নিলে ওর নোংরা গুলো বেরিয়ে গিয়ে ওর স্বাভাবিক জিনিসটাই অর্থাৎ সুগন্ধ চলে আসবে। এই দুটো দৃষ্টিভঙ্গী, একটা মূর্তি গড়া, আরেকটা চন্দনকে ঘষে মেজে নেওয়া। একটাতে perfection ভেতরে আছে আরেকটা perfection বাইরে থেকে আসে। Perfection বলতে ঈশ্বরের সাম্রাজ্য পাওয়া। এখন perfection বাইরে থেকেই আসুক আর perfection ভেতর থেকেই আসুক, মূল কথা হল perfection আসবে। কার আসবে? যে কোন লোকের আসবে। এই কথাই বেদান্ত বলছে, তোমার মধ্যে অসীম ক্ষমতা আর অসীম জ্ঞান, কিন্তু ঢাকা পড়ে আছে। ঢাকা পড়ে আছে মানে আমাদের ভাষায় বলছি অজ্ঞান, অজ্ঞান কিভাবে এসেছে আমাদের জানা নেই, কিন্তু এসেছে, এটাই সত্য। খ্রীশ্চানদের ভাষায় সবাই অজ্ঞান নিয়েই জন্মেছে। যিনি বড় মূর্তিকার তিনি প্রত্যেকটি পাথরের মধ্যে মূর্তি দেখেন।

প্যারিসে একটা খুব সুন্দর বিচিত্র আকারের বিরাট গ্রানাইট পাথর ছিল। প্যারিসের তখনকার সময়ের যত বড় বড় ভাস্কর ছিলেন তাঁদের স্বপ্ন ছিল ঐ গ্রানাইট পাথরের একটা মূর্তি বানানো। কিন্তু এমন বিচিত্র আকারের পাথর ছিল যে কেউ ঐ পাথর দিয়ে মূর্তি বানাতে পারছিলেন না। রোঁদার তখনও অত নামডাক ছিল না। একটু একটু করে তিনি বিখ্যাত হতে শুরু করেছেন। একদিন তিনি বললেন ঐ গ্রানাইট পাথরটা আমাকে দিয়ে দেওয়া

হোক। কিন্তু পাথরটা খুব মূল্যবান হওয়ার জন্য রোঁদাকে সহজে দিতে চাইছিল না। কিন্তু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পাথরটা তাঁকেই দেওয়া হল। উনি একটা বিচিত্র মূর্তি তৈরী করলেন, তার নাম দিলেন, 'Thinking Man of Paris', বিশ্বের আজকে একটি সেরা ভাস্কর্য। ভালো ভাস্কর যত পাথর দেখেন সব পাথরেই একটা ভালো মূর্তিকে দেখেন। মূর্তিটা কোথায় আছে? ভাস্করের ভেতরেই আছে, তোমার যা জ্ঞান, যা শক্তি সব ভেতর থেকেই আসে। এখন সেটাকে কেউ একটা আকার দেওয়া বলতে পারে, কেউ বলতে পারে পাথরের অবাঞ্ছিত অংশ গুলিকে সরিয়ে দেওয়া, ব্যাপারটা একই দাঁড়ায়।

মহাবীর হনুমানের কাহিনী কোন একজন ব্যক্তির কাহিনী নয়, কাহিনীর সার প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহাবীর হনুমানের এই কাহিনী সবার জীবনের কাহিনী। ব্রুস লীর কাহিনীতে ব্রুস লী যা করতে পারে সেটা একমাত্র ব্রুস লীই পারে, ওটা আমাদের সবার জন্য নয়। মহাবীর হনুমানের কাহিনী তা নয়, তাই যদি হত তাহলে বাচ্চারাই শুধু এই কাহিনী কমিক্স স্টোরি হিসাবে পড়ত, বড়রা পড়তেন না। বাচ্চারা একই কাহিনী দু বার, তিন বার পড়বে কিন্তু বড়রা একটা কাহিনী দ্বিতীয়বার তখনই পড়বেন যখনই কোন কাহিনীতে আধ্যাত্মিক ব্যাপার থাকে। মহাবীর হনুমানের কথা ঘরে ঘরে সবাই পড়ছে, শুনছে, হনুমান এক লাফে সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কায় পোঁছে গেলেন, এই কাহিনী বাচ্চা বয়স থেকে শুনে এসেছে, এখনও শুনে যাচ্ছে। রামলীলা বছরের পর বছর হয়ে যাচ্ছে, সেই এক অভিনেতা, এক কাহিনী শুধু একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য একটা দুটো অতিরিক্ত গান ঢুকিয়ে দেয়, শ্রোতারাও সেই এক কিন্তু দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মানুষ শুনে যাচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে কোটি কোটি মানুষ যারা শুনে আসছে তারা কি সবাই মুর্খ? কখনই তারা মুর্খ নয়, ওর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উপাদান রয়েছে, ঐ আধ্যাত্মিকতা মানুষের আত্মাকে জাগিয়ে দেয়। যে সাহিত্য, শিল্প মানুষের আত্মাকে জাগায় ওটাকেই মানুষ দ্বিতীয়বার পড়তে চাইবে, শুনতে চাইবে, দেখতে চাইবে। মহাবীর হনুমানের এই কাহিনী কোথাও মানুষের অন্তরাত্মাকে গিয়ে অজান্তায় নাড়া দিয়ে দেয়। স্বামীজীর জন্ম হয় ১২ই জানুয়ারী, সেই দিনটা ছিল মকর সংক্রান্তি। সাধারণত মকর সংক্রানিত ১৪ই জানুয়ারী হয় কিন্তু সেবারে কি করে বারো তারিখ ছিল। এই ব্যাপারে নিবেদিতা খুব সুন্দর লিখছেন, কলকাতার ঘরে ঘরে সেদিন পূজো হচ্ছে, মানুষ অজান্তায় একজন প্রফেট এসেছেন তাঁকে নমস্কার জানাচ্ছে। মকর সংক্রান্তি বারো তারিখে হয় না, চৌদ্দ তারিখেই হয়, কিন্তু অজান্তায় হয়ে গেছে। এই অজান্তায় হওয়াটাও সেই অনন্ত শক্তির জন্যই হয়। সেই অনন্ত শক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু চাপা পড়ে আছে। দেবতাদের পীড়াপীড়িতে ব্রহ্মা এটাকে মানুষের মনের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিলেন, সব মানুষ যদি এই অনন্ত শক্তির খবর পেয়ে যায় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। দেবতাদের এই কাহিনীটাই পরিবর্তিত হয়ে মানুষের ক্ষেত্রেও বানানো হয়েছে। মহাবীর হনুমানের এই কাহিনী মূল এটাই, তোমার ভেতর অনন্ত শক্তি, এটাকে জাগাও। বাল্মীকি হয়ত সত্যিই এত কথা ভাবেননি, আবার ভাবতেও পারেন। কারণ বাল্মীকির মত ঋষিরা যখন কোন চরিত্র চিত্রণ করেন তখন তাঁরা দুমদাম করে কোন চরিত্র বানিয়ে দেবেন না।

যাই হোক, তখন জাম্বোবান হনুমানকে বলছেন, তোমার উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ দেওয়া, না দিলে তুমি ঐ বাচ্চা বয়সেই যা দৌরাত্ম দেখাতে শুরু করেছিলে তাতে ত্রিলোকের সবাই অতিষ্ট হয়ে যেত, আর এখন যে কি করবে তার কোন ধারণা নেই। হনুমান! তুমি উঠে দাঁড়াও, তুমিই এই কাজ পারবে। এই কথা বলতেই –

শ্রুত্বা জাম্ববতো বাক্যং হনুমানতিহর্ষিতঃ।
চকার নাদং সিংহস্য ব্রহ্মাণ্ডং স্ফোটয়ন্নিব।৪/৯/২১
বভুব পর্বতাকারস্ত্রিবিক্রম ইবাপরঃ।
লঙ্ঘয়িত্বা জলনিধিং কৃত্বা লঙ্কাঞ্চ ভস্মসাৎ।৪/৯/২২
রাবণং সকুলং হত্বনেষ্যে জনকনন্দিনীম্।
যদ্বা বদ্ধ গলে বজ্জ্বা রাবণং বামপাণিনা।৪/৯/২৩

জাম্বোবানের কথা শুনতেই হনুমানের ভেতরের শক্তিটা যেন চেতনা পেয়ে জাগতে শুরু করেছে। এবার হনুমান সিংহের মত গর্জন করতে শুরু করেছেন। পাহাড়ে যদি সিংহ ডাক ছাড়ে, বলে যে দশ থেকে বারো কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত ঐ ডাক শোনা যায়। আর কয়েক মিটার পর্যন্ত সিংহের ডাকের সাথে যে বাতাস বের হয় তাতে সব ঘাস ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ে। বলছেন, হনুমানের ঐ গর্জনের যে শব্দ মনে হচ্ছে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে যেন

কাঁপিয়ে দিচ্ছে। আর তার সাথে হনুমানের আকৃতিটা বড় হতে শুরু হয়ে গেল, যেন দ্বিতীয় ত্রিবক্রম পর্বত এসে দাঁড়িয়েছে। বাল্মীকির কাব্যিক বর্ণনার এটাই বৈশিষ্ট্য, এটাকেই পরের দিকের কবিরা নানান ভাবে নিয়েছেন। বাল্মীকি নিজেও এই দৃশ্যটাকে বেশি করে ফাঁপিয়েছেন। আসলে যেটা হয়, যখন কেউ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, যদি তেজ বেড়ে যায় তখন সে নিজেকে মনে করে আমি সাইজে যেন বড় হয়ে যাচ্ছি। আর যখন কুণ্ঠিত হয়ে যায় তখন নিজেকে একটু ছোট মনে হয়। মানুষের এভাবে বাড়া বা কমা বাস্তবিক হয়। আর এখানে হনুমান এবার নিজেকে খুলে দিচ্ছেন।

একটা মানুষ পর্বতের মত বিশাল হয়ে যাচ্ছে, ভক্ত ছাড়া এই ব্যাপারটা কেউ যুক্তিতেই মানতে চাইবে না। কিন্তু যোগের দিক দিয়ে দেখলে কোন সমস্যা হয় না। হনুমান জ্ঞানী ছিলেন, জ্ঞানী হওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে যোগশক্তি বা বিভূতি ছিল, অণিমা, লঘিমা এই ক্ষমতাগুলো তাঁর ছিল। সেইজন্য তিনি কখনও বিরাট হয়ে যেতে পারেন, কখন আবার লঘু হয়ে যেতে পারেন। আশ্চর্যের কিছু নয়। ব্যক্তিত্বের দিক থেকে এর খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবে মহাকাব্যে কখন নিজের বুদ্ধি লাগাতে নেই, যেমনটি আছে তেমনটি ছেড়ে দিতে হয়। হনুমানের মধ্যে এখন অকল্পনীয় শক্তির উন্মেষ হয়ে গেছে। বলছেন, আমি চললাম, এক্ষুণি এই সমুদ্র লঙ্ঘন করব, লঙ্ঘন করে লঙ্কাকে আমি ভস্ম করে দেব, রাবণকে সবংশে ধ্বংস করে সীতাকে আমি নিয়ে আসছি আর তা নাহলে গলায় দড়ি বেঁধে রাবণকে এবং ত্রিকুট পাহাড় সহ লঙ্কানগরীকে বাম তালুতে ধারণ করে শ্রীরামচন্দ্রের সামনে এনে হাজির করিয়ে দিচ্ছি। অথবা শুধু জনকনন্দিনীকে দর্শন করে ওনার খবর নিয়েই আমি ফেরত চলে আসব।

তখন জাম্ববান হনুমানকে বলছেন, হনুমান! তুমি এক কাজ কর, ওখানে গিয়ে সীতাকে জীবিত দেখেই ফিরে এসো, পরে শ্রীরামের সাথে এক হয়ে তোমার পৌরুষ দেখিও। জাম্ববান জানেন, বেশি পাঁয়তারা দেখাতে গিয়ে কোথায় ফেঁসে যাবে তার কোন ঠিক নেই। ফেঁসে তো গিয়েই ছিল, হনুমানকে তো বেঁধেই নিয়েছিল। সেইজন্য জাম্ববান বলে দিলেন সীতার খবরটুকু নিয়েই তুমি ফেরত চলে এস। তুমি এবার আকাশমার্গে গমন কর, তোমার শুভ হোক। হনুমানের সঙ্গীরা সবাই তাঁকে শুভেচ্ছা দিচ্ছেন, বড়রা আশীর্বাদ দিচ্ছেন –

মহেন্দ্রাদ্রিশিরো গত্বা বভূবাদ্ভুতদর্শণঃ।৪/৯/২৮

সবার আশীর্বাদ নিয়ে হনুমান বিদায় নিয়ে মহেন্দ্র পর্বতের শিখরে আরোহণ করলেন। পাহাড়ের উপর ঐ বিশালাকৃতির হনুমানকে দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। পাহাড়ের মতই সুবিশাল শরীর, লোমগুলো সোনার মত জ্বলজ্বল করছে, মুখটা সূর্যের মত উদ্ভাসিত, হাত দুটোকে মনে হচ্ছে মহানাগ। তাঁর পায়ের চাপে গোটা পাহাড়টাই কাঁপছে, পাহাড়ের প্রানীদের মনে হচ্ছে যেন বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে। সিদ্ধ, মুনিরা যাঁরা ধ্যানাদি করছিলেন, সবাই আসন ছেড়ে বেরিয়ে এলেন দেখার জন্য, কী হচ্ছে। পাহাড়ের গর্তে যত বড় বড় সাপ ছিল, সব ভয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে আর পাথরের চাপে ঝুলছে, তারা আবার বিচিত্র বর্ণে শোভিত। দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ে যেন নানান রঙের পতাকা ঝুলছে। এরপর পায়ের উপর চাপ দিয়ে মহাবীর হনুমান ঝাঁপ মেরেছেন। ট্রেন যখন চলে যায় তখন তার সাথে কাগজ, পাতা, আবর্জনাও উড়তে উড়তে পেছনের দিকে যেতে থাকে। এখানেও ঠিক তাই হচ্ছে, ঝাঁপ মারার পর যে প্রচণ্ড বেগ নিলেন তাতে আশেপাশে যত আলগা গাছপালা, শুকনো বৃক্ষাদি ছিল সব হনুমানের সাথে পেছনে উড়ে চলেছে। কিন্তু এগুলো বেশিক্ষণ চলতে পারে না, একটু পরে খসে পড়ে যায়। এখানে খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়ে বলছেন, যেমন শুভকর্ম শেষ হয়ে গেলে জীব স্বর্গ থেকে নেমে আসে, ঠিক তেমনি সব গাছপালা কিছু দূর যাচ্ছে, তারপর সব আবার রাস্তার উপর নেমে আসছে, আর হনুমান এগিয়ে গেলেন।

সুন্দরকাণ্ড

এখান থেকে সুন্দরকাণ্ড শুরু হয়। সুন্দরকাণ্ডের বৈশিষ্ট্য হল এই কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের কোন ভূমিকা নেই, একমাত্র হনুমানকেই সুন্দরকাণ্ড উৎসর্গ করা হয়েছে। অনেকে বলেন, মহাবীর হনুমান শ্রীরামের দাস ছিলেন, প্রভুকে ছেড়ে দাসের কেন পূজা? বাল্মীকির রামায়ণের দৃষ্টিতে দেখলে এই ধরণের কথা খুব একটা বলা যাবে না। বাল্মীকি রামায়ণের একটা বড় অংশ হনুমানকে নিয়েই এগিয়ে গেছে, আর সেখানে তাঁর বীরত্ব কোথাও কখন ঘাটতি হচ্ছে না। শ্রীরামচন্দ্রও হনুমানকে সম্মান করছেন। শ্রীরামচন্দ্র যদি বিষ্ণুর অংশে অবতার হয়ে থাকেন আর সেদিক দিয়ে মহাবীর হনুমান বায়ু দেবতার পুত্র, তাঁদের কাছে দেবতাদের গুরুত্ব বেশি ছিল।

সুন্দরকাণ্ড নামকরণের কারণ বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে, এর সব কিছুই সুন্দর, লঙ্কার বর্ণনা যেমন সুন্দর, হনুমানের বর্ণনাও তেমন সুন্দর। অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রামচরিতমানসে এই বর্ণনাগুলো অনুপস্থিত। বাল্মীকি রামায়ণে পুষ্পকযানের বর্ণনাও খুব সুন্দর, রাবণের মহলে হনুমান সীতার অনুসন্ধান করতে গিয়েছিলেন, মহলে যত নারী নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন বাল্মীকি সেখানে সব নারীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন এক কথায় তা অনবদ্য। সীতাকে দেখার পর হনুমানের মাধ্যমে বাল্মীকি যে বর্ণনা দিচ্ছেন সেটাও খুব সুন্দর। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল, সুন্দরকাণ্ডে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনা করছেন। পুরো রামায়ণে শ্রীরামের বর্ণনা কোথাও নেই। আমরা প্রায়ই সুপুরুষ এই শব্দটা ব্যবহার করি, কিন্তু সুপুরুষ কাকে বলা হবে, বাল্মীকি ওখানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন কি কি লক্ষণ থাকলে একজন পুরুষকে সুপুরুষ বলা যেতে পারে। ঠিক তেমনি সীতার বর্ণনা যেখানে দিচ্ছেন সেখানেও অবাক হয়ে যেতে হয় সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী নারীর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের উপর বাল্মীকির কি সাংঘাতিক জ্ঞান ছিল। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের আলাদা আলাদা করে বর্ণনা দিচ্ছেন। সৌন্দর্য কাকে বলে, শ্রীরামের মাধ্যমে পুরুষের সৌন্দর্য আর সীতার মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্যের বর্ণনা করছেন। সুন্দরকাণ্ডে সব কিছুতেই শুধু সৌন্দর্য, সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য। তার সাথে শক্তির যে সৌন্দর্য আর চরিত্রের যে সৌন্দর্য একমাত্র সুন্দরকাণ্ডেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু পরের দিকে যত রামকথা রচিত হয়েছে সেখানে শ্রীরামের যে সৌন্দর্য, সীতার যে সৌন্দর্য এগুলোকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভক্তিশাস্ত্রে সব কিছু এভাবে লেখা যায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিগ্রন্থ তাই সব কিছুকে ভক্তির দিক দিয়েই দেখা হচ্ছে। এখানে বলছেন –

ধ্যাত্বা রামং পরাত্মনমিদং বচনমব্রবীৎ।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্বে গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা।৫/১/২
অমোঘং রামনির্মুক্তং মহাবাণমিবাখিলাঃ।
পশ্যাম্যদ্যৈ রামস্য পত্নীং জনকনন্দিনীম্।৫/১/৩

সমুদ্র লঙ্ঘনার্থে হনুমানের লম্ফ প্রদান

হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করলেন। একটা বিশাল বড় কাজের জন্য এগোচ্ছেন তাই ঈশ্বরের ধ্যান করে শুরু করা খুব ভালো। ঈশ্বরের ধ্যান করলে মনে কোন সংশয় থাকলে সেটাও কেটে যায়। অনেকের মনে হতে পারে ধ্যান না করেও তো অনেক কাজ হয়ে যায়। নিজের যত শক্তি আছে সবটাই কাজে লাগাতে হয়। ঈশ্বরের নাম করা বা ধ্যান করাটাও এক ধরণের শক্তি তৈরী করে। হনুমান তখন বলছেন, এই দেখো! আমি এখন আকশমার্গ দিয়ে যাচ্ছি? কিভাবে যাব? শ্রীরামচন্দ্র যখন যাকে বাণ মারেন তখন যেভাবে সেই বাণ প্রচণ্ড শক্তি আর বেগে গিয়ে তাকে মারবেই মারবে, সেই শক্তি আর অমোঘ নিশানায় আমি আকাশমার্গ দিয়ে যাচ্ছি। শ্রীরামচন্দ্রের বাণের মত আমার শক্তি আর লক্ষ্য ভেদের ক্ষমতা। আর তোমার জেনে নাও, কৃতকার্য না হয়ে আমি ফিরছি না। কৃতকার্য মানে যে সঙ্কল্প নিয়ে কাজ করা হয় সেই সঙ্কল্প সিদ্ধি হওয়া। হনুমান খুব সুন্দর বলছেন –

কৃতার্থোহহং কৃতার্থোহহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎ স্মরন্।
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিমপারং যাতি তৎপদম্.৫/১/৪
কিং পুনস্তস্য দূতোহহং তদাঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ।৫/১/৫
ত্বমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম্।

মৃত্যুকালে যারা ভাল লোক, যারা সৎলোক একবার শ্রীরাম এই নাম স্মরন্ করলে ভবসাগরের পারে, জন্মমৃত্যুর সমুদ্রের পারে চলে যায়। আর যেখানে শ্রীরামচন্দ্রেরই কাজে, তাঁরই নাম নিয়ে যাচ্ছি সেখানে এই সমুদ্র কোন ব্যাপারই না। আর আমার সাথে শ্রীরামচন্দ্রের মুদ্রিকা আছে, এই অঙ্গুলি মুদ্রিকার ধ্যান করতে করতে আমি ঠিক চলে যাব। এটাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা। অনেক সময় বলা হয় শ্রীরামের থেকে তাঁর নাম বড়। এই ভাবটা আমাদের সব পবিত্র গ্রন্থেই আছে। দুর্গা দুর্গা নাম স্মরণ করে যাত্রা করলে সব কিছু শুভ হয়। ছোটবেলা থেকে আমরা শুনে আসছি রাম নাম নিলে ভূত পালিয়ে যায়। আসলে রাম রাম নাম করলে ভেতরের শক্তিটা বেড়ে যায়। কারণ যেখানেই রাম নাম হয় সেখানে হনুমান নিজেই এসে হাজির হন আর হনুমানকে দেখে ভূতগুলো পালিয়ে যায়। হনুমানের শরীরের কোন সীমা পরিসীমা নেই, যদি পঁচিশ জন রাম নাম করে হনুমান পঁচিশটা শরীর নিয়ে প্রত্যেকের কাছে চলে যাবেন। আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস, যেখানেই রামনাম সঙ্কীর্তন হয় সেখানেই হনুমানজী এসে হাজির হন। সেইজন্য রামনাম সঙ্কীর্তনের জায়গায় একটা আসন বা চেয়ার আলাদা করে রাখা থাকে। তবে বলে যে হনুমান সবার পেছনে গিয়ে বসেন। কেউ বলবেন শক্তি বেড়ে যায়, কেউ বলবেন শক্তিটক্তি কিছু না, তিনি স্বয়ং আসেন বলেই ভূত পালিয়ে যায়। এগুলো এক একজনের এক এক রকম ভাব। কথামৃতেও কিছু কিছু কাহিনী বলার পর ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, তোমার কি এগুলো বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস হোক আর যাই হোক, মূল কথা থেকে সরে যাওয়া যায় না। এটা সব সময় দেখা যায় যারা এগুলো করে তাদের অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি থাকে। আল্লার নাম করে জেহাদীরা নিজেরাও মরতে রাজী। মিলিটারিতে প্রত্যেকটা রেজিমেন্টের পৃথক পৃথক রণধ্বণি আছে, উৎসাহ দেওয়ার জন্য জয় মা কালী, হর হর মহাদেব, এই ধরণের রণধ্বণি আছে। এই নিয়ে আবার মুসলমান সৈনকদের সাথে অনেক অশান্তি তৈরী হয়। তাদেরও বলা হয়, এটাই আমাদের রেজিমেন্টের রেওয়াজ, এর সাথে ধর্মের কোন ব্যাপার নেই। এখানে হনুমান খুব সহজ আর শান্ত ভাবে বলছেন মৃত্যুর সময় যার নাম স্মরণ করলে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায় সেখানে আমি তাঁরই কাজে তাঁরই ধ্যান করে যাচ্ছি আর তার মুদ্রিকা আমার সাথে আছে, ভবসাগরের তুলনায় এই সমুদ্র তো তুচ্ছ।

ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীর সময় স্বামী প্রেমেশানন্দজী ঠাকুরের কাজে কোন এক জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। অন্যরা মহারাজকে বলছেন, এখন মঠে ঠাকুরের উৎসবে কত কিছু হতে যাচ্ছি তা সত্ত্বেও আপনি যাচ্ছেন? মহারাজ তখন বলছেন, কর্তারাও তো জানেন এখন মঠে উৎসব আছে, তা সত্ত্বেও আমাকে পাঠাচ্ছেন এখানে প্রশ্ন করার কি আছে! তখন সবাই মহারাজকে বললেন, তিথি নক্ষত্রটা ভালো করে দেখে যাত্রা করবেন। মহারাজ তখন তাদের বলছেন, আমি ঠাকুরের কাজ করতে যাচ্ছি, ঠাকুরেরই আশ্রমে যাচ্ছি আর ঠাকুরের নাম করতে করতে যাচ্ছি সেখানে তিথি নক্ষত্র দেখার কি প্রয়োজন! পঞ্জিকা দেখা, বার তিথি দেখা এগুলো হল গৃহস্থ ধর্ম, আমার সন্তানের যেন মঙ্গল হয়, মেয়েটার যেন একটা ভালো জায়গায় বিয়ে হয়, ছেলেটার যেন একটা ভালো চাকরি হয়, স্বামীর অসুখটা যেন সেরে যায়, গৃহস্থরা সব কাজের পেছনে এই ভাবটা থাকে। কিন্তু মহাবীর হনুমান তিনি রামকাজের জন্যই যাচ্ছেন, রামের নাম করতে করতে যাচ্ছেন সেখানে তিথি বার এসব দেখার কি দরকার। এটাই হনুমান বলছেন, তাঁর নামে ভবসাগর পার হয়ে যায় সেখানে এই ছোট্ট সমুদ্র কোন ব্যাপারই নয়। এরপর হনুমান, বিশাল ঐ শরীরকে একটু স্বাভাবিক করে, একটা পজিশান নিয়ে এক ঝাঁপ মারলেন।

দেবতারা দেখছেন হনুমান ভগবান শ্রীরামের কাজের জন্য এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ওর একটা পরীক্ষা নিয়ে দেখা যাক সত্যিই সে এই কাজে সফল হতে পারবে কিনা। কোন বড় কাজ করার সময় on the spot decision নিতে হয়। সেইজন্য সবাই নেতা হতে পারে না। আমাকে যদি প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় দু চারদিন আমিও চালিয়ে নিতে পারব। কিন্তু পরে এমন এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত নিতে আমি পারব না। এই কারণেই সবাই নেতা হতে পারে না, একেই তো পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হয়, তার সাথে on the spot decision নিতে হচ্ছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ আর বাল্মীকি রামায়ণে এখানেই বিরাট তফাৎ এসে যায়। বাল্মীকি রামায়ণে দেবতারাই সব কিছু, সেখানে পরমপিতা পরমেশ্বরের ভূমিকা তেমন কিছু নেই। ফলে কাহিনীগুলো অনেক বেশি consistent হয়ে যায়। এখানে ভগবান নিজেই উপস্থিত তখন দেবতাদের কোন দরকারই নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি নাগমাতা সুরসার একটা খুব সুন্দর চরিত্র দাঁড় করিয়েছেন। দেবতারা প্রথমে নাগমাতা সুরসার মাধ্যমে হনুমানের পরীক্ষা নিচ্ছেন। হনুমান এখন বেরিয়ে পড়েছেন, পারার হলে হনুমানই

পারবেন, না পারলে কেউই পারবে না, সেখানে আর পরীক্ষা নেওয়ার কি দরকার। সুরসাকে দেবতারা বললেন, হনুমানের কাজে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে দেখ এর বলবুদ্ধি কেমন। সুরসা তখন এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে হনুমানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক বিশালাকৃতির মুখ নিয়ে হনুমানের সামনে এসে বলছে, দেবতারা তোমাকে আমার ভক্ষ করে পাঠিয়েছেন, তোমাকে এখন আমার মুখগহ্বরে প্রবেশ করতে হবে। তুমি আমাকে অতিক্রম করে যেতে পারবে না। হনুমান দেখছেন ইনি হলেন নাগমাতা, এনার সাথে আমার এমনিতে কোন শত্রুতা নেই আর তার উপর দেবতারা বলে দিয়েছেন আমাকে এর মুখের মধ্যে ঢুকতে হবে। তখন হনুমান বলছেন, হে নাগমাতা! শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞাতে আমি সীতার খোঁজে যাচ্ছি, একবার যদি খোঁজ পেয়ে যাই তখন আমি নিজেই এসে আপনার মুখে ঢুকে যাব, আমার কাজটা আগে সমাধান করে নিতে দিন। এই ধরণের ভাব প্রত্যেক পৌরাণিক কাহিনীতে পাওয়া যাবে, এমনকি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতেও পাওয়া যাবে, যেখানে বলছে আমি একটা কাজে যাচ্ছি, কাজটা হয়ে যাওয়ার পর আপনি যা করার করে নেবেন। অনেক জায়গায় কথা দিয়ে দিচ্ছে আবার অনেক জায়গায় নিজেকে সমর্পণ করে দিচ্ছে। তখন সামনের লোকটির মধ্যে করুণা এসে যায়, তুমি সত্যিকারের একজন সৎ ব্যক্তি, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলাম। এই ধরণের অনেক কাহিনী আছে।

সুরসা কিন্তু ছাড়ছে না, আমি ওসব কথা শুনবো না, আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আর তুমি আমার খাদ্য, আমার মুখে তোমাকে ঢুকতেই হবে। হনুমান আর কিই বা করবেন, সুরসা তো কোন পথই দিচ্ছে না, বিশাল মুখ দিয়ে আটকে রেখেছে। হনুমান তখন বললেন, ঠিক আছে তাই হোক। বলার পর হনুমান এবার নিজের শরীরকে বিস্তার করতে শুরু করলেন। হনুমান যত বড় আকার নিচ্ছে সুরসাও তত বড় হচ্ছে। এই ভাবে করতে করতে সুরসার যখন একটা বিশাল মুখ হয়ে গেল আর তক্ষুণি হনুমান শরীরটাকে চট করে মাছির মত ছোট করে সুরসার মুখের মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসে হনুমান বলছেন, হে নাগমাতা! আমি আপনার কথা রক্ষা করলাম, আপনি বলেছিলেন আপনার মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে, আমি প্রবেশ করে বেরিয়ে এসেছি। সাধু সন্ন্যাসী আর ঠাকুরের যাঁরা পরম ভক্ত তাঁদের মধ্যে সত্য রক্ষা করার ব্যাপারটা ঠাকুরের ভাব থেকেই এসেছে। ঠাকুর যদি একবার বলে দিতেন আমি ঝাউতলায় যাব, প্রয়োজন না থাকলেও তিনি একবার ঘুরে আসতেন। এই জিনিসটাই পরবর্তি কালে সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যেও প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল। নাগ মহাশয় একজন খুব উচ্চস্তরের গৃহী ভক্ত ছিলেন। তিনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী করতেন কিন্তু সারাক্ষণ শুধু ভগবদ ভজনাদি নিয়ে থাকতেন বলে তাঁর পিতৃদেব একদিন রেগেমেগে বললেন, ডাক্তারী না করে এসব কী করে বেড়াচ্ছিস, তোকে তো সাপ ব্যাঙ খেয়েই বেঁচে থাকতে হবে দেখছি! নাগ মহাশয় সত্যি সত্যিই একটা মরা ব্যাঙ এনে মুখে দিলেন যাতে বাবার সত্য রক্ষা হয়। নিজের কথার না, বাবার কথার সত্য যেন রক্ষা হয়। হনুমানও তাই করছেন, দেবতারা আমাকে তোমার ভক্ষ বানিয়েছেন, আমাকে তোমার মুখে যেতে হবে, ঠিক আছে দেবতাদের কথাকে আমি মিথ্যা হতে দেব না। কিন্তু আমি এর থেকেও একটা বড় কাজে বেরিয়ে এসেছি, সেই কাজের সত্যও আমাকে রক্ষা করতে হবে। হনুমান সুরসার মুখে ঢুকে বেরিয়ে এলেন। এই ধরণের প্রচুর কাহিনী আমাদের সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সুরসার উদ্দেশ্য হল হনুমানকে মুখের মধ্যে প্রবেশ করানো, এরপর খাওয়া হজম করা সম্ভব নয়, আর দেবতারাও এতটা করবেন না। দেবতাদের কাজ হল হনুমানের বল বুদ্ধির পরীক্ষা নেওয়া। প্রচণ্ড বিষম পরিস্থিতিতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সপ্রতিভ আর on the spot decision নেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে ওই সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারত না। মুর্খ হলে ওর মুখেই ঢুকে মারা যাবে আর তা নাহলে মারামারি করে শক্তি ক্ষয় করে দেবে।

হনুমানকে বেরিয়ে আসতে দেখে সুরসা বলছে, দেবতারা আমাকে পাঠিয়েছিলেন তোমার বল বুদ্ধি দেখার জন্য, আমি দেখলাম তোমার বল, বুদ্ধি, তেজ সবই আছে, তোমার কার্য সিদ্ধি হবেই হবে। ওখান থেকে হনুমান আবার চলেছেন। সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে দেখছেন মাঝখানে মৈনাক পর্বত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো সব পৌরাণিক কাহিনী, বাল্মীকির সময় এই কাহিনীগুলো হয়ত আগে থেকেই প্রচলিত ছিল বাল্মীকি সেগুলোকে সংগ্রহ করে তাঁর রচনার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছেন, হয়ত বা বাল্মীকি নিজে থেকেই দাঁড় করিয়েছেন। মৈনাক কাহিনীও খুব মজার কাহিনী। আগেকার দিনে পাহাড়দের নাকি ডানা থাকত। পুরুলিয়ায় বেড়াতে গিয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের কাছে একটা গেস্ট হাউসে আছি। সকালবেলা উঠে দেখছি অযোধ্যা পাহাড় নেই। কোথায় গেল? অযোধ্যা পাহাড় উড়ে কলকাতায় এসে বসে গেছে। আমাদের কাছে মনে হবে আজগুবি, কিন্তু পাহাড়ের যদি

ডানা থাকত তাহলে এই রকমই হত। এগুলো হল মিথস্‌। মিথসের কাহিনী পড়ে আমাদের সব উদ্ভট, আজগুবি মনে হতে পারে, কিন্তু গল্প বা কাহিনী রচনা করা খুব কঠিন কাজ।

এক মহিলা সাহিত্যিক একবার কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পর সেখানকার বাচ্চারা মহিলাকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কি করেন? মহিলা বললেন, আমি গল্প লিখি। ওরা জানেই না গল্প জিনিসটা কি, বুঝতেই পারছে না। মহিলা তখন তাদের বোঝালেন। বাচ্চারা শোনার পর বলছে, আপনি তাহলে মিথ্যা জিনিস লেখেন? মহিলা পরে বলছেন, মিথ্যা আর গল্পকে আলাদা করে ওদের বোঝান আমার পক্ষে বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। যাঁরা গল্প লেখেন তাঁরা মিথ্যাই লিখছেন। আমি মনে করতে পারি পাহাড়ের ডানা ছিল এটা একটা কল্পনা। কল্পনা তো আরও বাজে ব্যাপার, যে জিনিসটা নেই সেই জিনিসটাকে নিয়ে চিন্তা করছি, কল্পানও তাহলে মিথ্যা। অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়, বাল্মীকি রামায়ণে বা ধর্ম গ্রন্থে যা কিছু আছে সবটাই কি সত্য? অবশ্যই সত্য নয়, তা নাহলে মহাকাব্য হবে কি করে! তাহলে কি আমরা ধর্মের নামে মিথ্যা পড়ছি? এগুলোকে নিয়ে খ্রীশ্চানরা হিন্দুদের প্রচুর আক্রমণ করে, কিন্তু এভাবে সব কিছু হয় না। মিথ্‌ মানেই তাই, মিথ্‌ মানেই হল, একটা আইডিয়াকে তুলে ধরার জন্য কাহিনীকার কিছু জিনিসকে অবলম্বন করেন। ওর পেছনে যে সত্য গুলো থাকে সেই সত্য গুলো অত্যন্ত শক্তিশালী। আর ঐ সত্য গুলোকে চালানোর জন্য আরও কিছু কাহিনীর অবলম্বন করতে হয়। সেইজন্য কাহিনী কল্পনাও হয় না, কাহিনী মিথ্যাও হয় না, কাহিনী একটা পুরো আলাদা শ্রেণী। যাঁদের কাল্পনিক শক্তি আর সাহিত্যিক প্রতিভা আছে তাঁরা দুটোর মেলবন্ধন করে বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী তৈরী করতে থাকেন। দেখছেন ডানার সাহায্যে ছোট পাখি বড় পাখি উড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে। সেটাই কবি কল্পনাতে দেখলেন পাহাড়ের যদি পাখির মত ডানা থাকত তাহলে জিনিসটা কিরকম দাঁড়াত।

যাই হোক সেই সময় পাহাড় গুলো উড়ে বেড়াত। দেবতাদের রাজা দেখলেন এতো ভারী উৎপাত, এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাহাড় বসে গেলে সেখানকার ঘরবাড়ি, মানুষ, প্রাণী সব পাহাড়ের চাপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র তখন সব কটা পাহাড়ের ডানা ছেটে ফেলতে শুরু করলেন। ইন্দ্র পাহাড়ের উপর বজ্র চালাচ্ছেন আর ডানাগুলো সব খসে খসে পড়ে যাচ্ছে আর সেখানেই যে যে পাহাড় বসে যাচ্ছে আর উঠতে পারছে না। একমাত্র মৈনাক পর্বত প্রাণ ছেড়ে ওখান থেকে পালিয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রের নজর এড়িয়ে কোথাও তো লুকোবার জায়গা নেই। সমুদ্র তখন এগিয়ে এসে মৈনাককে আশ্রয় দিয়েছে। বাতাসও তখন তাকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। সমুদ্র দেবতা মৈনাককে বলছেন, পূর্বকালে আমার কলেবর অনেক কমে গিয়েছিল, শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ গঙ্গাকে অবতরণ করিয়ে আমার কলেবরকে আবার বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। সমুদ্র কি কখন কমে যায়? রীতিমত কমে যায়। ইজ্রায়েলের কাছে যে ডেথ সী আছে এর সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত। জোয়ার ভাঁটা ছাড়াও সমুদ্র কমে যেতে পারে। মৈনাক সমুদ্রে গিয়ে লুকিয়েছিল, এখনও ওখানেই আছে। হনুমান সমুদ্রের উপর দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাজের জন্য যাচ্ছেন দেখে সমুদ্র দেবতা সেই কথাই মৈনাককে বলছেন, এক সময় আমার জল কমে গিয়েছিল তখন শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভগীরথ গঙ্গাকে এনে আমাকে আবার জলে পরিপূর্ণ করে দিলেন। সেইজন্য আমি শ্রীরামের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ। হনুমান সেই শ্রীরামের কাজ করতে যাচ্ছে, তুমি আমার তরফ থেকে হনুমানকে সাহায্য কর, হনুমানকে তুমি একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও। আমি শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ, তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ, তোমার মাধ্যমে আমি আমার এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তোমার উপর হনুমান যেন একটু বিশ্রাম নেয়। সমুদ্রের উপর ঐ রকম বিচিত্র পাহাড় দেখে হনুমান খুব আনন্দ পাচ্ছেন, অত সুন্দর পাহাড় তার উপর আবার তার ডানা নিয়ে উড়ছে। মৈনাক হনুমানকে নিজের পরিচয় দিলেন আর বলছেন সমুদ্র আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, আমার এখানে প্রচুর সুস্বাদু ফল ও শুদ্ধ জল আছে, এসো, ফলাদি ভক্ষণ করে বিশ্রাম নিয়ে আবার তুমি তোমার কাজে চলে যাও। তখন হনুমান বলছেন –

গচ্ছতো রামকার্য্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ।
বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া।৫/১/৩৩

হে মৈনাক! আমি শ্রীরামের কার্যে যাচ্ছি এখন আমার কিসের খাবার কিসের বিশ্রাম! বলা হয়, রাজার দূত যখন চলতে শুরু করে তখন সে আর থামে না, রাজার কাজের দেরী হয়ে কোন ক্ষতি হয়ে গেলে রাজা ছেড়ে দেবে না। হনুমান ঠিক তাই বলছেন, আমি ঈশ্বরের দূত, খাওয়া বিশ্রাম করে একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না।

হনুমান তখন মৈনাকের মান-রক্ষার্থে হাত দিয়ে মৈনাকের গাত্রে আলতো স্পর্শ করে এগিয়ে গেলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর আবার এক মহা বিঘ্ন, সিংহিকা রাক্ষসীর আগমন।

আকাশ দিয়ে পাখি বা কোন কিছু যাওয়ার সময় জলে যে তার ছায়া পড়ে, সেই ছায়াকে সিংহিকা রাক্ষসী আকর্ষণ করে তার ভোজন বানিয়ে নিত। আমরা সাধারণ ভাবে জানি বস্তুকে ধরলে তার ছায়াকেও ধরা হয় কিন্তু এখানে ছায়া ধরে বস্তুকে টেনে নিয়ে আসা। হনুমান এখন ধরা পড়ে গেলেন। হনুমানের ছায়া টানতেই হনুমানের বেগ আটকে গেল। হনুমান ভাবছেন, কে এমন বিঘ্ন সৃষ্টি করে আমার বেগ রোধ করেছে, এখানে তো কাউকে দেখছি না। তিনি তখন নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখছেন বিরাট আকারের সিংহিকা, উনি সঙ্গে সঙ্গে জলে নেমে পদাঘাতেই তাকে বধ করে দিলেন। ইদানিং কালে একজন রামায়ণকে পুনর্লিখন করেছেন। ওনার মনে হল রামকথাতে এই ধরণের যে কাহিনীগুলো আছে তাতে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। উনি নিজেই ঠিক করলেন এগুলোকে ঠিক ভাবে লেখা উচিত। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন হনুমান ঝাঁপ দিয়ে না গিয়ে সাঁতরে সমুদ্র পার হয়েছেন। সাঁতার দিয়ে যাওয়ার সময় সমুদ্রের মধ্যে যে সব হিংস্র জলজন্তু রয়েছে সেগুলোকে তিনি এর সাথে তুলনা করে মিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের মত কোন কিছু পুনর্পরিভাষিত করতে গেলে এই জিনিসগুলো হয়। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ হল শাস্ত্র, শাস্ত্রে যেমনটি আছে তেমনটি রেখে দিতে হয়। যদি কোথাও মনে হয় জিনিসটা যুক্তিতে দাঁড়াচ্ছে না, তখন সেটাকে ওভাবেই ছেড়ে দিতে হয়। অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে জিনিসগুলিকে শাস্ত্র থেকে বাদ দেওয়া যায় না। কিছু তত্ত্বকে তাঁরা বোঝাতে চাইছেন, তাছাড়া জীবনের অনেক কিছুকে এর মাধ্যমে বোঝান হয়, সেইজন্য এগুলোকে বাদ দেওয়া যায় না। সংসারে কিছু মানুষ আছে যাদের কখনই চাহিদা মেটে না, এদেরকে বলছে সুরসা। সব সময় যে কাহিনী রূপেই আসে তা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই আমরা এরকম অনেক কিছু দেখে থাকি। আবার বলে বেড়াল একটু গন্ধ পেতেই পৌঁছে যায়। আমাদের দেখে মনে হতে পারে ছায়া দেখে কি করে টেনে আনছে। অন্য ভাবেও হয়, মাছের গন্ধ পেলেই বেড়াল পৌঁছে যাচ্ছে। আবার কাউকে যদি ধরতে হয় তখন তার ছায়া দেখে দেখে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। শাস্ত্রের পুনর্লিখন কখনই করতে নেই। যাই হোক হনুমান আবার ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। এখানে আর বর্ণনা করছেন না কিসের উপর দাঁড়িয়ে ঝাঁপ দিলেন, তবে বৃহতাকারের কোন মাছ ছিল সিংহিকা, তার উপর দাঁড়িয়েই হয়ত তিনি ঝাঁপ দিলেন। এরপর তিনি সরাসরি লঙ্কার সমুদ্রের দক্ষিণ তটে পৌঁছে গেলেন।

হনুমান ও লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাক্ষাৎকার

হনুমান দেখছেন চারিদিকে গাছপালা, আর ত্রিকুট পর্বত, সেই পর্বতের উপর লঙ্কানগরী। লঙ্কানগরীকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাবণ সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে। উঁচু উঁচু প্রাচীর, তার উপর আবার সব প্রহরীরা রয়েছে। একটা বানর যদি সেখানে যায় তাহলে প্রহরীরা তাঁকে দেখতে পেয়ে যাবে। হনুমান ধরা পড়ে যাবে, যে কাজের জন্য আসা সেই কাজটাই বিফল হয়ে যাবে। হনুমান ঠিক করলেন, আমাকে এখন একটু অপেক্ষা করতে হবে, দিনের অবসান হয়ে রাত আসুক তারপর একটা সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে এই নগরীতে প্রবেশ করতে হবে। রাত্রির অন্ধকার নামার পর হনুমান একটা সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করে নগরীর ভেতরে প্রবেশ করেছেন। সূক্ষ্ম রূপ মানে, আমাদের তরফ থেকে যদি কল্পনা করি তাহলে তিনি নিজেকে একটু ছোট করে নিলেন। কিন্তু এখন কাহিনী এত বড় হয়ে গেছে যে, হনুমানজী বিভিন্ন রকমের সাইজ নিতে পারেন এটাকে মেনে চলতে হয়। ছোটবেলায় আমরা শুনতাম হনুমান লঙ্কায় মাছি হয়ে প্রবেশ করলেন। কিন্তু লঙ্কা নগরী এমন সুরক্ষিত যে সেখানে একটা মাছিও নাকি গলতে পারে না। কিন্তু হনুমান তার মধ্য দিয়েও ঢুকে গেলেন। লঙ্কা নগরীকে শুধু প্রহরীই পাহারা দিচ্ছে না, *তত্র লঙ্কাপুরী সাক্ষাৎ*, রাক্ষসীবেশধারিণী স্বয়ং লঙ্কার যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি পুরো লঙ্কা নগরী জুড়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিয়ে যাচ্ছেন। এই ধারণাটা বাল্মীকি রামায়ণেও এসেছে আর এখানেও আছে, লঙ্কার ঐশ্বর্যকে রক্ষা করছে তার এক দেবী। অধ্যাত্ম রামায়ণে রাক্ষসী বলছেন, সবাই রাক্ষস বলে নগরীর দেবীকেও রাক্ষসী বলছেন। লঙ্কা দেবী হনুমানকে দেখতে পেয়েই তাঁকে ধরেছেন, তুমি কে? আমি লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমাকে অবজ্ঞা করে রাত্রিবেলা বানরের রূপ ধারণ করে চোরের মত এই নগরে প্রবেশ করছ? লঙ্কা দেবী হনুমানের পথ আটকাচ্ছে দেখে তিনি দেবীকে তাঁর বাম হস্তে এক চড় মেরেছেন। চড় মারতেই রাক্ষসীর মুখ থেকে রক্ত বের হতে শুরু হল, তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর উঠে হনুমানকে বলছে, যাও, তুমি এই লঙ্কাকে জয় করে নিলে। ব্রহ্মা যখন লঙ্কাদেবীকে বর দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেই ছিলেন, ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্র রূপে আসবেন তখন

তাঁর দূত হনুমান এই নগরীতে প্রবেশ করবে। আর হনুমান এসে তোমাকে মারবে, আর ঐ মার খেয়ে তুমি যদি ব্যাকুল হয়ে যাও, তখন বুঝবে যে লঙ্কা শেষ।

ভারতবর্ষে এই ধারণাটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতে একজন গৃহদেবতা বা গৃহদেবী আছেন, গৃহে তাঁর নিত্য পূজা করতে হয়। তেমনি প্রত্যকে শহর বা নগরে একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, সাধারণ ভাবে দেবীই হন। দেবীর যতদিন নিত্য পূজাদি চলে ঐ শহরে ততদিন কোন গোলমাল হবে না। এই ধারণা যে শুধু শাস্ত্রেই আছে তা নয়, জনগণের মনের ভেতরেও ঢুকে গেছে। শ্রী জিনিসটা প্রত্যকে মানুষের থাকে, প্রত্যেক বাড়ির থাকে, প্রত্যেক নগরের থাকে আর প্রত্যেক দেশের থাকে। ঐ শক্তিকে যতক্ষণ জাগিয়ে রাখা হবে ততক্ষণ তার ব্যক্তিত্বে কোন গোলমাল হবে না। একটা কাহিনীতে কোন এক রাজা একজনকে আশ্রয় দেওয়াতে সেই রাজ্যের দেবী রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। রাজা দেখছেন একটা পর একটা নারী খুব সুন্দর বেশে চলে যাচ্ছেন। রাজা জিজ্ঞেস করছেন, তুমি কে? আমি নগরীর দেবী। আরেকজন চলে যাচ্ছে তাঁকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কে? আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তিনিই চলে যাচ্ছেন তাই চলে যাচ্ছি। ঐশ্বর্য দেবী চলে যাচ্ছেন, তিনি বলছেন অমুক চলে যাচ্ছে বলে আমি চলে যাচ্ছি। একেবারে শেষে দেখে ধর্মের দেবী চলে যাচ্ছেন, তখন রাজা তাঁকে বলছেন, সবাই চলে যাচ্ছে আপনি কেন চলে যাচ্ছেন আপনাকে তো আমি ছাড়িনি। ধর্মের দেবী বলছেন, ঠিক আছে আমি থাকব। তারপর দেখা গেল ঐ দেবীরা আবার সবাই ফিরে আসছেন। যেখানে সত্য ধর্ম আছে সেখানেই আমাদের সবাইকে থাকতে হবে, সেইজন্য সবাই এক এক করে আবার চলে এলেন। শেষমেশ সব শক্তি মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি থেকেই পায়। মনের শক্তি, মনের আবেগের যে শক্তি, এই শক্তি চলে পুরো আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়েই। দৈহিক শক্তি হ্রাসবৃদ্ধি হতে পারে কারণ দৈহিক শক্তি পুরোপুরি শরীরের উপর দিয়ে চলে। মানসকি শক্তির আবার দুটো রূপ হয়, একটা আবেগপ্রবণতার শক্তি আরেকটা নৈতিক শক্তি, আর শেষে আসে আধ্যাত্মিক শক্তি। একজন মা, তার একটাই ছেলে, ছেলে মারা গেল মা তো ভেঙে পড়বেই, এটাই স্বাভাবিক। অল্প বয়সে বিয়ের পর বিধবা হয়ে গেলে সে তো ভেঙে পড়বে। জীবনের আর কোন অবলম্বনই রইল না, সমস্ত বাহুবল তার চলে গেল, জীবনটা তার ফাঁকা হয়ে গেল। ওর মধ্যে যদি একটু চেতনা থাকে তাহলে তাকে তখন ভাবতে হবে আমার যদিও মানসিক অবলম্বনটাই চলে গেছে কিন্তু জীবনে কখন অনৈতিক কাজ করিনি। তখন এই নৈতিক শক্তিই তাকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলে নিয়ে আসবে। বেশির ভাগের লোকেরই চেতনা থাকে না, সেইজন্য আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে তার অনেক সময় লেগে যায়। নৈতিক জীবনে গোলমাল হয়ে যদি তার পতন হয় তখন তার আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগাতে হয়। আমি গর্হিত অপরাধ করে ফেলেছি ঠিকই কিন্তু আমি তো ঈশ্বরের প্রতি কোন অপরাধ করিনি। এই ভাবনাই তাকে হঠাৎ জাগিয়ে দেবে, তখন সে বলবে, আর না, আমি এবার থেকে এক নতুন জীবন শুরু করছি। খ্রীশ্চান ধর্মে, এমনকি পার্সি ধর্মেও পাপ স্বীকার করা, কারুর কাছে নিজের পাপকর্মের কথা বলে দেওয়ার নিয়ম আছে। নৈতিক কোন অপরাধ করলে তার মানসিক স্তরে গিয়ে একটা ধাক্কা দেবে। রাস্থা দিয়ে যেতে যেতে একটা একশ টাকার নোট পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হোটেলে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করলাম, বা কোন মিথ্যা কথা বলে দিলাম, বা অজান্তায় কারুর প্রতি কটু বাক্যবাণ ছুড়ে দিলাম, এই ধরণের যে কোন দোষ করার পর মন খুঁত খুঁত করতে থাকে, তখন সে আর কোন ভালো কাজ করতে পারবে না, কারণ মনের মধ্যে তার চাঞ্চল্য এসে গেছে। সেইজন্য কোন দোষ করার পর ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়, একটা ভুল হয়ে গেছে, আর হবে না। মন্দিরে গিয়ে পূজা দেওয়া, এগুলো এইজন্যই করা হয়, পাপের মার্জনা করা হয়ে গেল। এগুলো করলে মানুষ আবার নিজেকে নির্মল মনে করে। আমাদের মধ্যে যিনি অন্তর্যামী আছেন, তাঁর কাছে একটা অপরাধ স্বীকার করে নিলে পাপজনিত কাজের হেতু মনের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়ে যায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। গীতাতে বলছেন *দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্*। দৈবকে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তার মধ্যে একটা হল কর্ম কিন্তু আরেকটা বলছেন অধিষ্ঠান দেবতা। চোখ ঠিক থাকতে পারে, কান ঠিক থাকতে পারে সবই ঠিক থাকতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাও একটা ইন্দ্রিয় কোন কাজ করতে পারছে না। কারণ ওই ইন্দ্রের যে অধিষ্ঠান দেবতা, চোখের যিনি অভিমানী দেবতা তিনি কোন কারণে কুপিত হয়ে আছেন। দেবতারা ভগবান নন, ভগবান কখন কুপিত হন না কিন্তু দেবতারা তুষ্ট হন আবার কুপিতও হন। তখন ঐ দেবতার আরাধনা করলে আবার ঠিক হয়ে যায়।

এখানে যে লঙ্কা দেবীর কথা বলছে এও ঠিক তাই। রাবণ যে বিশাল সাম্রাজ্য চালাচ্ছে, এত বিপুল ঐশ্বর্য, তার কারণ লঙ্কার যে অধিষ্ঠাত্রি দেবী, তাঁকে ওরা তুষ্ট করে রেখেছে। সেই দেবী সারা রাত নগরী ঘুরে ঘুরে পাহাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের যিনি ভাগ্যদেবতা উনি কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের কাজেকর্মে রুষ্ট হয়ে যান। যদি দেখা যায় ছোট খাটো কাজে অনেক সমস্যা এসে যাচ্ছে, একটা দুটো কাজে নানান রকম বিঘ্ন এসে যাচ্ছে তখন বুঝতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে গেছে। তখন সব কিছু ছেড়ে ঠাকুরের নাম ধ্যান করতে হয়। করতে করতে গোলমালটা ঠিক হয়ে যায়। বিবাহের পর মিথিলা থেকে ফেরার সময় রাজা দশরথ নানা রকম লক্ষণ দেখছেন, যার মধ্যে অনেকগুলো লক্ষণ ঠিক নয়। তখন বশিষ্ঠ দেব স্বস্তিবচন করছেন। ওখানেও বশিষ্ঠ দেব একই জিনিস করছেন। অজান্তায় বা জান্তায় আমরা অনেক রকম অপরাধ করে ফেলি, অপরাধের মার্জনা করতে হয়। অপরাধ মার্জনা করার অনেক রকম বিধি আছে, সব থেকে ভালো বিধি হল ঠাকুরের নাম করা। তাতে যদি না হয়, তাহলে দান করতে হয়। আমাদের শাস্ত্র এই কারণেই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধি দিয়েছেন। যদি আমি মনে করি আমি তো কোন গোলমাল করিনি কিন্তু তা সত্ত্বেও এত কেন আমাকে ঝামেলার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তাহলে বুঝতে হবে অনেক আগে আমি কিছু গোলমাল করেছি। তা নাহলে অকারণে কোন ঝামেলা আসবে না। সিপাহী বিদ্রোহের আগে দিল্লীতে সৈন্যরা মেয়েদের, বাচ্চাদের কেটে মেরে ফেলছে, আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তখনই হিন্দু বাসিন্দারা খোলাখুলি বলতে শুরু করেছিল, এরা এত অপরাধ করেছে এই সৈন্যরা আর বাঁচবে না। ১৮৫৭ সালে কানপুরে সাহেবদের অনেক মহিলা ও শিশুকে বন্দী করে রেখেছিল। যখন খবর পেল ইংরেজ সৈন্যরা এদিকে আসছে তখন যারা মাংস বিক্রী করে তাদেরকে দিয়ে সবাইকে খুন করিয়ে দিল, যাতে কোন প্রমাণ না থাকে। কিন্তু পরে সব খবরই বেরিয়ে এল। কানপুরকে একটা সময় বলা হত প্রাচ্যের ম্যাঞ্চেস্টার, কানপুর ছিল বিশাল শিল্পনগরী, উত্তরপ্রদেশের অর্থনীতির রাজধানী। কিন্তু একটা সময় সব বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর মানসিক রোগের তালিকায় দেশের সবার উপরে, রোজই তিন চারজন করে আত্মহত্যা করছে। কোথাও এই শহরের আধ্যাত্মিক শক্তিতে গোলমাল হয়ে গেছে। এটাকে ঠিক করার একটাই উপায়, কোন বড় নেতা যদি ওখানে খুব করে পূজা, যজ্ঞ, তপস্যাদি করে। যে কোন সংস্থাতেও তাই, যেমন বেলুড় মঠ একটা সংস্থা, ঠাকুর, মা, স্বামীজী এখানকার দেবতা। যতদিন এনাদের পূজা অর্চনা চলতে থাকবে এখানে কোন দিন কোন গোলমাল হবে না। প্রত্যেক গৃহেও তাই, মনুস্মৃতিতে বলছেন *যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ*, গৃহে দেবতা থাকবেন, স্বস্তি থাকবে। কোথায় থাকবেন? গৃহে যদি নারীকে সম্মান দেওয়া হয়। নারীকে যদি সম্মান না দেওয়া হয়, নারীর প্রতি অপরাধ হয়ে গেল, এবার কিন্তু ঐ গৃহে দেবতা থাকবেন না, গৃহের সমৃদ্ধি আর থাকবে না।

ভালো করে বিচার করে, অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যাবে সারা দেশে একই কাহিনী চলছে, এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে, পরে আসবে যে রাবণের উপর অভিশাপ আছে। এরপর লঙ্কাদেবীর শক্তিটা এবার নড়ে গেল। লঙ্কিনী বলছে, ব্রহ্মা আমাকে বলেছিলেন, যেদিন তোমাকে কেউ চড় মেরে দেওয়ার পর তুমি যদি বেহুঁশ হয়ে যাও তাহলে বুঝবে লঙ্কার দিন এবার শেষ হয়ে এসেছে। এগুলো কাহিনী কিন্তু কাহিনীর মাধ্যমে একটা চেতনা দেওয়া হচ্ছে। কিসের চেতনা? প্রত্যকে মানুষ, প্রত্যেক বাড়ি, প্রত্যেক জনপদ, প্রত্যেক দেশের পেছনে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। ঐ শক্তিতে যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায় তাহলে সেই মানুষ, সেই বাড়ির, সেই নগরের বা সেই দেশের নানান রকম সমস্যা, ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে, তার অস্তিত্বই হয়ত বিপন্ন হয়ে যাবে। ঐ গোলমালটা কেন হয় আমরা জানি না, এর অনেক কারণ থাকতে পারে। এনাদের কাছে একটা জিনিসের নিষ্কর্শটা আগে এসে গেছে, সেটাকেই এনারা পরে একটা কাহিনীর মাধ্যমে সাজিয়ে দিচ্ছেন। মানুষের এটাই স্বভাব, তার কাছে সিদ্ধান্তটা আগে থেকেই এসে গেছে, দেখছে জিনিসটা এই রকমটি হবে, এবার তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। রোজ সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হয় আর পশ্চিম দিকে অস্তমিত হয়ে যায়। এর একটা ব্যাখ্যা চাই। খুব সহজ ব্যাখ্যা, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু অন্য কোন কারণও থাকতে পারে কিন্তু আমরা জানি না। কিভাবে প্রদক্ষিণ করে? এমনিতে দেখছি কোন জিনিস যখন চলে তখন রথে করে চলে, সূর্যেরও একটা রথ আছে। এভাবেই পৌরাণিক কাহিনী তৈরী হয়। এগুলোকে খুব আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। যেটা বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা হয়ে যেতে পারে সেখানে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা হয়ে যাবে। কিন্তু যে জায়গাতে অনেক রকম কাহিনী আছে সেখানে বুঝতে হবে বিভিন্ন কবি ওখানে কলম চালিয়েছেন। কিন্তু যদি সেখানে অবৈজ্ঞানিক কিছু থাকে বা ঐতিহাসিক সত্য নয় সেই জায়গাতে সব কিছুকে খুব আন্তরিক ভাবে নিতে নেই। নিলে পুরো জিনিসটাই

বুঝতে গোলমাল লেগে যাবে। কারণ লেখক সব সময় একটা তত্ত্বকে নিচ্ছেন, সেই তত্ত্বের উপর নিজের কল্পনা শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভা দিয়ে একটা কাব্য রচনা করেন, ওর ভেতরের সারটুকু নিতে হয়। ঠাকুর বলছেন শাস্ত্রে চিনিতে বালিতে মিশে আছে। এখানে চিনি হল সব কিছুর পেছনে এক দৈবী শক্তি আছে, সেই দৈবী শক্তি তুষ্ট থাকলে সব কিছু ঠিক ঠিক চলতে থাকে, যদি কোন কারণে রুষ্ট হয়ে যান তখনই গোলমাল হতে শুরু হয়। রুষ্ট কেন হল? সহজ ভাবে দেখলে, রাবণ যেভাবে সীতাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে আর সীতার যে ক্রন্দন, তাঁর যে চোখের জল, রাবণের যে কর্মের জোর ছিল, ভাগ্য ছিল সেটাকে নাড়াতে শুরু করে দিয়েছে। আধ্যাত্মিক শক্তিকে যদি ধরে রাখা হয় তখন সবটাই ঠিক থাকে। ভারতবর্ষের ব্যাপারে স্বামীজী বলছেন, ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রাখার জন্য আধ্যাত্মিক শক্তিকে এমনিতেই ধরে রাখতে হবে কিন্তু তার সাথে আরেকটা জিনিস হল ভারতবর্ষের মূল তত্ত্বটাই হল অধ্যাত্ম। যেমন একজন সন্ন্যাসীর কাছে প্রচুর টাকা থাকলে তা কখনই সেই সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্মানের নয়। সন্ন্যাসী যদি বড় লেখক হন, কর্মবীর হন তাতেও সন্ন্যাসীর কোন সম্মান হয় না। সন্ন্যাসীর সম্মান সব সময় হয় ঐ একটা জিনিসেই, তা হল আধ্যাত্মিক চিন্তন। আর সন্ন্যাসীর শক্তির বিকাশও হয় আধ্যাত্মিক চিন্তন দিয়ে। যেমন ভারতবর্ষের জন্য সব কিছু হল অধ্যাত্ম, ঠিক তেমনি সন্ন্যাসীর সব কিছু অধ্যাত্ম। বাড়িতে যিনি মা, তাঁর শক্তি চলে সেবা দিয়ে, মায়ের সেবা যদি ঠিক থাকে বাড়িটাও ঠিক থাকবে। কিন্তু সেখানেও আধ্যাত্মিক শক্তি থাকে। মাকে দুটো জিনিসের রক্ষণা-বেক্ষণ করতে হয়, একদিকে আধ্যাত্মিক শক্তির রক্ষণা-বেক্ষণ করতে হবে তেমনি সেবা ভাবটাও বজায় রাখতে হবে। ভারতবর্ষ আর সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে দুটোই হল অধ্যাত্ম। এখানে একটা লক্ষণের কথা বলছেন, লঙ্কিনী মার খেয়ে গেছে এবার লঙ্কার বিনাশ হতে যাচ্ছে।

লঙ্কিনী বুঝে গেছেন লঙ্কার এবার বিনাশ অবশ্যম্ভাবি। লঙ্কিনী তাই হনুমানকে বলছেন, তুমি যখন আমাকে জিতে নিলে বুঝে নাও তুমি পুরো লঙ্কাকেই জিতে নিয়েছ, লঙ্কাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। এবার তুমি যাও, যে কাজের জন্য তুমি এসেছ সেই কাজের জন্য এগিয়ে যাও। আর বলছেন রাবণের রাজমহলের ভেতর এক মনোরম উদ্যান আছে তার নাম অশোকবাটিকা, সেই অশোকবাটিকাতে এক বিশাল শিশু বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষের নীচেই সীতাকে রাখা হয়েছে আর অনেক রাক্ষসীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। সেখানে গিয়ে তুমি সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের খবর দাও। লঙ্কিনী যদিও রাক্ষসী বলছেন কিন্তু একজন দেবী, দেবী হনুমানকে বলছেন –

ধন্যাহমপাদ্য চিরায় রাঘবস্মৃতির্নমাসীদ্ভবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোহপ্যতিদুর্লভো মম প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি।৪/১/৫৭

আমার মন থেকে এতদিন শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতি, ভগবানের স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিল। কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল? এই যে আমি লঙ্কা নগরীরতে এত দিন রাবণের ঐশ্বর্যের ভোগের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আজ তোমাকে দেখার পর আবার আমার মনে সেই স্মৃতি জেগে উঠেছে। এটা খুবই সত্য যে, ঈশ্বরীয় চেতনার বোধ সব সময় থাকে না, হারিয়ে যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভোর ছটায় ট্রেন ধরে কর্মস্থলে যাবে, তার জন্য ভোর চারটে থেকে উঠে স্নান করা, রান্না করে খাবার তৈরী করে দেওয়া, নাকে মুখে দুটো গুজে ট্রেন ধরার জন্য দৌড়ান, এরপর বাচ্চাকাচ্চা সামলানো, আবার রাত্রিতে বাড়ি ফিরে কত রকমের ফাইফরমাস। একই জিনিস দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলছে। ঠাকুর, মা, স্বামীজী বলছেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন, এদেরকে ধর্মের কথা কে বলতে যাবে! কিছু দিন আগে পর্যন্ত এতটা খারাপ অবস্থা ছিল না, যত দিন যাচ্ছে মানুষের মধ্য থেকে ধর্মের ভাবটাই হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারপর একটা ধাক্কা যদি খায়, লঙ্কিনীর মত একটা চড় খেলে ঈশ্বর বোধ, ধর্মের ভাবটা চট করে জেগে ওঠে, তাও সবার ওঠে না। যার জাগে সে তখন ভাবে আমি এসব কি করছি।

প্রত্যেক জীবনের আদর্শ হল সন্ন্যাস, সন্ন্যাস মানে সব কিছু ত্যাগ, পূর্ণ ত্যাগই জীবনের আদর্শ। কিন্তু মানুষ ত্যাগের পথে যেতে চায় না। যেতে চায় না বলে জীবন আমাদের প্রতি পদে পদে বলে যাচ্ছে সন্ন্যাসই জীবনের আদর্শ। কিভাবে বলছে? আজকে আমার এটা চলে গেল, কাল ওটা চলে যাবে, পরশু আরেকটা কেড়ে নেবে। জীবন সব সময় কেড়ে নিচ্ছে, মা-বাবাকে কেড়ে নিল, কত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতদের কেড়ে নিচ্ছে, কিন্তু তাও চেতনা জাগছে না। জীবন তখন বলে, তোর চেতনা যখন জাগছে না তাহলে আমি খুব ভালো করে তোর চেতনা জাগিয়ে দিচ্ছি। দেখা গেল আমাকেই জীবন টেনে নিয়ে চলে গেল। পুনর্জন্মে যদি বিশ্বাস থাকে

তাহলে যতবার আমার জন্ম হয়েছে প্রত্যেক বার মৃত্যু এসে আমার পায়ে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে চলে গেছে, আমার সব কিছু এখানেই পড়ে থেকে গেছে। প্রত্যেক জন্মে মৃত্যু এসে টেনে তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, বাকি সব এখানেই পড়ে রইল, এটাই তো সংসার। সংসারীদের প্রত্যেক জন্মে জন্মে সন্ন্যাসের আদর্শ কি রকম দেখিয়ে দিয়েছে আর একজন সন্ন্যাসীকেও দেখিয়েছে। এরপর একজন নিজে থেকেই সন্ন্যাস নিয়ে নিলেন, জীবনকে বলে দিলেন, ওহে ভাই! তোমাকে আর আমাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে হবে না, জীবনের জন্যও আমার কোন মোহ নেই আর আমি মরে যেতে চাই এই ইচ্ছাও হবে না। ক্ষুদিরাম বোস ও অন্য সত্যগ্রহীদের যখন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাওয়া হত তখন তাঁরা বলতেন, আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি আমার সেখানে একটা আত্মসম্মান আছে, নিন্দনীয় মৃত্যু আমি নেব না। জীবন আমাদের প্রত্যেক পদে শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, ত্যাগই শেষ কথা। মানুষ সংসার থেকে এত চড় থাপ্পর খেয়ে যাচ্ছে তাও সে শিক্ষা নিতে চায় না। লঙ্কিনী হনুমানের কাছ থেকে এমন একটা চড় খেলেন তাতে তাঁর ঐ চেতনাটা জেগে গেল। লঙ্কিনী বলছেন, আমি ধন্য, কারণ আমার ভগবানের স্মৃতি ফিরে এসেছে।

আর বলছেন ভগবানের ভক্তের সঙ্গ অতি দুর্লভ, তোমাকে পেয়ে আমার সেটাও হয়ে গেল। মঠ মিশনের সন্ন্যাসীরা সবাই ঠাকুরেরই ভক্ত, এখানকার সাধুদের মত চরিত্র, ব্যক্তিত্ব জগতে পাওয়া অসম্ভব। সেইজন্য এখানে হাজার রকমের অসুবিধা থাকুক সন্ন্যাসীকে এখানেই পড়ে থাকতে হবে। একজন সন্ন্যাসী একবার তাঁর অন্যান্য সন্ন্যাসী ভাইদের বলছিলেন, দেখো ভাই! যদি মনে কর তোমার বৈরাগ্য কমে যাচ্ছে তাহলে জগতটা কেমন চলছে দেখার জন্য মাঝেসাজে কোন লোকাল ট্রেনে আপ-ডাউন করে নেবে, আর ট্রেনের লোকেদের কথাবার্তা যা শুনবে আর তাতেই দেখবে আবার তোমার বৈরাগ্য চাঙ্গা হয়ে গেছে। দু মিনিট বাইরের লোকেদের কথাবার্তা একটু কান পেতে শুনবে তখন মনে হবে কী জগৎ, আমরা কোন জগতে আছি আর এরা কোন জগতে আছে। দেখবে জগতকে কি রকম আতঙ্ক মনে হবে। অথচ আমরা ওখান থেকেই বেরিয়ে এসেছি। সন্ন্যাসীরা দুটোই বুঝতে পারেন, জগতটাও বুঝতে পারেন আর ত্যাগের জীবনটাও বুঝতে পারেন। এই যে চেতনা, এই চেতনাকে জাগানোর সুযোগ ভগবান প্রত্যেক পদেই সবাইকে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আমাদের চোখ কান বন্ধ।

বলছেন, হনুমান সমুদ্র লঙ্ঘন করে লঙ্কায় পৌঁছে যাওয়ার পর সীতা এবং রাবণের বাম নেত্র আর বাম বাহু আর শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ বাহু ঘন ঘন কাঁপতে শুরু হয়ে গেল। নারীর বাম অঙ্গ কাঁপা মানে শুভ আর ডান অঙ্গ কাঁপা অশুভের লক্ষণ, পুরুষের ক্ষেত্রে উল্টো। সীতার বাম অঙ্গ কাঁপছে তার মানে তাঁর শুভ কিছু হতে যাচ্ছে আর রাবণের বাম অঙ্গ কাঁপছে তার মানে রাবণের খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্রের ডান অঙ্গ কাঁপছে মানে তাঁর শুভ হতে যাচ্ছে। লক্ষণ দেখা ব্যাপারটা একটা পৃথক শাস্ত্র। যাঁরা মানার তাঁরা মানেন। স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ লক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র খুব মানতেন, আর তাঁর হতও সেই রকম। একবার তিনি মায়াবতী থেকে ঘোড়ায় করে ফিরছেন। বৃষ্টি পড়তে শুরু হয়েছে, ছাতাটা মেলে সামনে ধরে রেখেছেন। ঘোড়াটা দেখলে কালো কি একটা জিনিস, সে তো ভয়ে দৌড়াতে শুরু করে দিল। ঘোড়া অজানা অচেনা জিনিসকে সহ্য করতে পারে না। তারপর উনি যত ঘোড়াকে সামলানোর চেষ্টা করছেন তত সে বেগে দৌড়ে যাচ্ছে। শেষে মহারাজ কোন রকমে গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়লেন, আর ঘোড়াটা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। পরে মহারাজ বলছেন, যখন বেরিয়েছিলাম তখন যে তিথি ও নক্ষত্রের সংযোগ ছিল তাতে আমার মৃত্যু যোগ ছিল। এর একটা আলাদা শাস্ত্র, কিভাবে এগুলো কাজ করে আমাদের জানা নেই। যাই হোক এখানে যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে একটা নতুন শুভ অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছে, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের দক্ষিণ অঙ্গ আর সীতার বাম অঙ্গ কাঁপতে শুরু হয়েছে।

রাবণের রাজপ্রাসাদে হনুমানের সীতার অন্বেষণ

ক্ষুদ্র বানর রূপে হনুমান যখন লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন তখন রাত্রি হয়ে গেছে। হনুমান ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন। তাঁর লঙ্কিনীর কথা মনে পড়ল, তিনি অশোকবাটিকার কথা বলেছিলেন। হনুমান এখন অশোকবাটিকার দিকে এগোতে শুরু করলেন। এই জায়গাতে বাল্মীকি রামায়ণে খুব সুন্দর একটা বর্ণনা আছে। মহাবীর হনুমান যখন ঘুরছেন তখন লঙ্কার রাজপ্রাসাদ, নগরীর ঐশ্বর্য, বৈভব দেখে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। রাবণের অনেক স্ত্রী ছিল। স্ত্রী বলতে আমরা যে বুঝি ধর্মসঙ্গিনী, এরা ঠিক তা নয়। রাজাদের স্ত্রী একজনই থাকত, যে প্রথম বিবাহিতা, সেই স্ত্রীই তার ধর্মপত্নী। যজ্ঞযাগ যা কিছু হবে ধর্মপত্নীই সঙ্গে থাকবে, বাকিদের এখানে কোন ভূমিকা নেই। রাজা বলে

কথা, যে নারীর দিকে দৃষ্টি চলে যাবে সেই নারীর আর কিছুই করার থাকে না। এই জিনিস সব জায়গাতেই হয়। বাহাদুর শা জাফরের কাহিনী পড়লে শিউড়ে উঠতে হয়। নিজেকে সে ভারতের নবাব বলত কিন্তু লালকেল্লা থেকে মেহেরোলি পর্যন্তই তার কথা চলত, এর বাইরে তার কথা চলত না। কিন্তু সত্তর বছর বয়সেও বিয়ে করেছে। এদিকে নবাবেরই কোন ঐশ্বর্য নেই তাই বেগমদের অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। কিন্তু রাবণের ঐশ্বর্য সাংঘাতিক, রাবণ ছিল একা আর তার অত সংখ্যায় স্ত্রী। বাল্মীকি রাবণের স্ত্রীদের বর্ণনা করছেন, ভাবতে অবাক লাগে কি করে তিনি মানুষের মনের গভীরের সুক্ষ্ম জিনিসকে ধরতে পেরেছিলেন। তারা এমনিই সব রকমের ভোগ পেয়ে যাচ্ছে, খাওয়া-দাওয়া, মদিরা সেবন সব কিছুই আছে, কিন্তু স্বামী সোহাগ কি জিনিস তারা জানতেই পারল না। কারণ রাবণের কোন দৃষ্টিই ছিল না তাদের দিকে। একবার দেখে ভালো লেগে যাওয়ার পর তুলে নিয়ে এসেছে তারপর আর কোন খোঁজ নেই। রাবণের স্ত্রীরা একটা বড় মহলের মধ্যেই পড়ে আছে। প্রথম নিশা বা মধ্য নিশা হবে, সবাই মদিরা পান করে বেহুঁশ, কেউ অর্দ্ধাবৃত কেউ পুরোপুরি অনাবৃত হয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। হনুমান তাদের মধ্যে সীতাকে খুঁজছেন। এটা বাল্মীকির বর্ণনা। বাল্মীকির হনুমান আর অধ্যাত্ম রামায়ণের হনুমানে অনেক পার্থক্য আছে। বাল্মীকির হনুমানের মানুষের স্বভাব আর সাধনার জীবন যেভাবে এগোয় সেটা ভালো বোঝা যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণে ঠিক বোঝা যায় না। এই পার্থক্যটা খুব ভালো বোঝা যেতে পারে যদি কেউ কথামৃত আর স্বামীজীর রচনাবলীকে নিজের মত বোঝার চেষ্টা করে। কথামৃত পড়ার সময় মনে হয় সবটাই স্পষ্ট, খুব বেশি কথা কথামৃতে নেই, কয়েকটি মাত্র কথা আছে। তার সাথে মনে হয়ে একটু চেষ্টা করলে হয়ে যাবে, কিন্তু বাস্তবে যত নামাতে যাবে তত যেন দূরে চলে যেতে থাকে। স্বামীজীর রচনাবলী পড়ার সময় মনে হয় আধ্যাত্মিক জীবনের বিস্তার কত বড়। আধ্যাত্মিক জীবনে যাঁরা সফল তাঁদের মন কোন স্তরে কাজ করে, স্বামীজীর রচনাবলীতে সেটা ঠিক ঠিক বোঝা যায়। কারণ স্বামীজীর রচনাবলী একটু একটু আমরা বুঝতে পারি, কথামৃত কিছুই বুঝি না। কথামৃতের কথা যখন বলতে যাচ্ছে তখন সবাই বলছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। কালকের ছেলেও তাই বলছে, শোভাযাত্রায় প্ল্যাকার্ডে সেটাই বলছে আর অধ্যক্ষ মহারাজ দীক্ষা দেওয়ার সময়ও ঐ একই কথা বলছেন। কিন্তু সবার কথার মধ্যে একটা তফাৎ তো নিশ্চয়ই আছে। একটা বাচ্চা ছেলে যে কথা বলছে, অধ্যক্ষ মহারাজ দীক্ষা দিয়ে আমাকে ঐ কথাই বলছেন, নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল আছে। কিসের গোলমাল? যত ধারণা করতে যাচ্ছি তত কঠিন মনে হয়। স্বামীজী যে কথা বলছেন তার কিছু কিছু আমরা বুঝি। দুটো পুরো আলাদা টাইপ। ঠিক তেমনি অধ্যাত্ম রামায়ণ আর বাল্মীকি রামায়ণ দুটো আলাদা টাইপ। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণের সমস্যা হল অন্তর্জগতে সমস্যাগুলো সামনে নিয়ে আসেনি। একজন সাধককে কি পরিমাণ লড়াই করতে হয়ে সেটাকে পরিষ্কার করে বলা নেই। যদিও অধ্যাত্ম রামায়ণ সাধকদেরই জন্য। যাঁদেরকে আদর্শ রূপে নিয়ে আসা হয়েছে, যেমন হনুমান, হনুমানের যা ভক্তি, শক্তি, জ্ঞান ওর ধারে কাছেই আমরা কোন দিন যেতে পারব না। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে ঐ পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, ঐ লড়াইটাকে আমাদের খুব কাছে এনে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে মূলতঃ সিদ্ধান্ত বাক্যগুলিকে রেখে দেওয়া হয়েছে, সিদ্ধান্ত বাক্যকে ধারণা করা সবার দ্বারা সম্ভব না। যেমন আমাদের যদি বলা হয়, তোমরা স্বর্গসুখ চাও নাকি ঈশ্বরকে চাও? আমরা কেউই স্বর্গসুখ চাইব না। কিন্তু যদি বলা হয় তোমাদের মাইনের সাথে টেন পারসেন্ট ইংক্রিমেন্ট দেওয়া হবে, তোমরা রাজী আছ তো? আমরা অবশ্যই রাজী হয়ে যাব। কারণ আমরা অতটুকুই বুঝি, স্বর্গের ব্যাপারে আমাদের কোন ধারণাই নেই। আমাদের বুদ্ধির দৌড় কটি টাকা, দু কামরার বদলে তিন কামরার ফ্ল্যাট পর্যন্ত। রাজমহল চাই? না, আমার লাগবে না। কারণ আমাদের বুদ্ধির দৌড় তিন কামরা ফ্ল্যাট পর্যন্তই। কথামৃতের কথা আমাদের কাছে ঐ রকম, কিছু বুঝতে পারছিন না কিনা, আমাদের কোন ধারণাই হয় না। স্বামীজীর রচনাবলী পড়তে শুরু করলে তখন কিছু কিছু জিনিসের ধারণা হতে শুরু হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে মহবীর হনুমান হলেন একজন সিদ্ধ পুরুষ, বলছেন সে অমুক দেবতার অংশ থেকে এসেছে, অমুক অমুকের কৃপাপাত্র, তাহলে আমাদের আর কি হবে, আমার তো সেরকম কিছু নেই। বাল্মীকি রামায়ণে সেরকম কিছু নেই, বাল্মীকি রামায়ণে পদে পদে লড়াই চলছে। মহাবীর হনুমানের উপর একটা গুরু দায়ীত্ব সীতাকে খুঁজে বার করতে হবে। খুঁজতে গিয়ে নানা রকম জিনিস দেখছেন। মানব জীবনে মানুষ যদি কাজের মধ্যে নামে তখন তাকে অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়। হনুমান তখন রাবণের সুন্দরী স্ত্রীদের দেখছেন, এদের মধ্যে রাবণ কাউকে তুলে নিয়ে এসেছে, কেউ নিজের ইচ্ছাতেই এসেছে, কারুর বাবা এসে রাবণের হাতে তুলে দিয়ে গেছে যাতে সুখে থাকতে পারে।

রাজমহলের মধ্যে নিদ্রাভূত নারীদের মধ্যে সীতার অন্বেষণ করতে করতে হঠাত হনুমানের মনে হল, আমি তো জন্ম থেকেই ব্রহ্মচারী। বাল্মীকিই হনুমানকে ব্রহ্মচারী রূপে দেখিয়ে গেছেন, পরে অন্যান্য রামায়ণেও হনুমানকে ব্রহ্মচারী রূপে দেখান হয়েছে। তুলসীদাস আবার ব্রহ্মচারী মানবেন না, তাই হনুমানের একটা সন্তানও দিয়ে দিয়েছেন, যার নাম মকরধ্বজ। সমুদ্র পার হওয়ার সময় হনুমান ঘেমে গিয়েছিলেন, সেই ঘাম সমুদ্রে ঝরে পড়তেই একটা মাছ খেয়ে নিয়েছে, সেখান থেকে মাছের একটা সন্তান হয়ে গেল, তার নাম হল মকরধ্বজ। লেখা দেখেই লেখকের মানসিক গঠন বোঝা যায়, শিবের বিবাহ পাতার পর পাতা বর্ণনা করে যাচ্ছেন, শেষ আর হতেই চায় না। কিন্তু অন্য দিকে তিনি যেমন একজন বড় সিদ্ধ পুরুষ আবার একাধারে বিরাট কবি। তুলসিদাসের রামচরিতমানস সবারই জীবনে একবার অন্তত উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পড়া উচিত। বিবাহের বর্ণনা যখন করছেন সেখানেও আধ্যাত্মিকতার সাথে কোন আপোষ করছেন না।

হনুমান জন্ম থেকেই ব্রহ্মচারী। রাবণের রাজমহলে অর্দ্ধনিশায় রাবণের স্ত্রীদের ঘুমন্ত অবস্থায় দেখার পর ভাবতে শুরু করেছেন, আমি এ কি করলাম! রাবণের অন্তঃপুরের স্ত্রীদের আমি অচেতন অবস্থায় দেখলাম, এদের বসন-ভূষণও ঠিক নেই। ব্রহ্মচারী হয়ে আমি নিশ্চয় খুব গর্হিত কর্ম করলাম। হনুমানের ভেতরে খুব অনুশোচনা হতে শুরু করেছে। হঠাৎ তাঁর মনে হল, আমি পরস্ত্রীদের দেখেছি ঠিকই কিন্তু আমার মনে কোন বিকার উৎপন্ন হয়নি, সেইজন্য আমার কোন দোষ হয়নি। হনুমানের এখানে যা কিছু হয়েছে কার্যবশাৎ হয়েছে। সন্ন্যাসীদেরও কার্যবশাৎ অনেক মহিলার সাথে পরিচিতি হয়ে যায়। তখন দেখতে হয় মেয়েদের নিয়ে যে বিকারগুলো মনের মধ্যে চাড়া দেয় সেগুলো চাড়া দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, যদি না এসে থাকে তখন আর কোন ব্যাপার থাকে না। কিন্তু যে জিনিসটা প্রায়ই হওয়ার সম্ভবনা থাকে, যদি বেশি দিন মাখামাখি করা হয় তখন বিকার কিন্তু আসবে। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের নিষেধ করা হয়। নৈতিকতার শেষ পরীক্ষা দিতে হয় নিজের মনের কাছে। মনে যদি কোন বিকার না এসে থাকে তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এখানে কার্যবশাৎ এটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এক খ্রীশ্চান ফাদার এক মহিলাকে কাঁধে করে নদী পার করিয়ে দিয়েছেন। আশ্রমে ফেরার পর তার সঙ্গী বলছেন, তুমি একজন সন্ন্যাসী হয়ে একটা মেয়েকে কাঁধে তুলে নিলে? সেই ফাদার তখন বলছেন, আমি তো মেয়েটিকে ঘাটেই নামিয়ে দিয়ে এসেছি আর তুমি সেই মেয়েটিকে এখানেও কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছ। কার্যবশাতে একটা সাহায্য করে দিলেন, দেওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এলেন। সন্ন্যাসীই হন, পুরুষই হন, মহিলাই হন যেই হন না কেন ঠাকুর কোন কারণে তাঁকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছেন, সেখানে যতটুকুর জন্য নিয়ে এসেছেন ততটুকু করে দেওয়ার পর ওখানেই তার সাথে সম্পর্ক শেষ। এর পরেও তার সাথে যোগাযোগ রাখা, আলাপচারিতা চালিয়ে যাওয়া, এগুলোই পরে বিপদ ডেকে আনবে। সব সময় মনে রাখতে হবে যিনি এসেছেন তিনিই তাঁকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মহাবীর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের কাজের জন্য নেমেছেন, সেখানে ভগবান তাঁর সামনে কিছু দৃশ্য এনে দিয়েছেন। কিন্তু হনুমান কোন দৃশ্যের সাথেই জড়িয়ে যাচ্ছেন না, কোন ধরণের বিকার হচ্ছে না, কাকে দেখতে সুন্দর, কে মোটা, কে রোগা এসব কোন কিছুই তাঁর মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছে না।

এর থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, মহাবীর হনুমান বলছেন, সীতা কিন্তু এই সব নারীদের মধ্যে থাকতে পারেন না। আমি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছি, তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বের পুরুষ যিনি এমন কোন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করবেন না যে নারী পরে এই রকম পানাসক্ত, অপর পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যেতে পারে। একজন সন্ন্যাসী স্বামী সারদানন্দজীকে জিজ্ঞেস করছেন, মহারাজ! ঠাকুর যে অবতার সেটা না হয় বুঝি কিন্তু শ্রীমা লক্ষ্মী এটা মাথায় ঠিক আসে না। শরৎ মহারাজ তাঁকে বলছেন, ঠাকুর যে অবতার এটা মানছ তো? হ্যাঁ মানছি। তাহলে এটাও বুঝে নাও ঠাকুর কখন কোন ঘুঁটে কুড়ুনি মেয়েকে বিয়ে করবেন না। স্বামীজীও এক জায়গায় বলছেন, যে কোন লোক সেই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, যেটার জন্য সে নয়। আমি যদি এক রকম হই আর আপনি যদি আরেক রকম হন, আপনার আমার সাথে সম্পর্ক হবে না, যদিও সম্পর্ক হয়ে যায় তাহলে সেই সম্পর্ক বেশি দিন টিকবে না। সেইজন্য বলে বন্ধুত্ব, শত্রুতা আর বিবাহ সমানে সমানে হয়। সমানে সমানেও হয় না, হয় যেখানে sense of oneness আছে। আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষকে আক্রমণ করল, এটা শত্রুতা নয়, আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে, তাই আক্রমণ করে দিল, এটা আলাদা জিনিস। শত্রুতা সেখানেই হয় যেখানে sense of oneness থাকে, ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা হয়, বন্ধু বন্ধুতে শত্রুতা হয়, সমানে সমানে যদি না থাকে সেখানে শত্রুতাও হয় না। সেইজন্য টাকা-পয়সা দিয়ে বা অন্য ভাবে সন্ধি করে নেয়। সমানে সমানে আমরা

বলছি বটে কিন্তু আসলে হল sense of oneness, আমিও যা তুমিও তাই। আমাদের জীবনে কত লোক এসেছে কিন্তু কয়েকজন মুষ্টিমাত্র থেকে গেছে বাকি সব ছিটকে হারিয়ে গেছে। যদি আমিও যা সেও তাই হয় তাহলে সেখানে কোন দিন ছাড়াছাড়ি হবে না। বয়স হয়ে যাওয়ার মারা গেল সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু কম বয়সে যদি চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেই ঐ জায়গার জন্য অনুপযুক্ত ছিল। কোন বন্ধু হঠাৎ চলে গেল, বুঝতে হবে সেখানে ওর একত্ব বোধটা ফিট করছিল না, ভুল বশাৎ সে ওখানে নিজেকে জুড়ে দিয়েছিল। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে তাকে ওখান থেকে ছিটকে বার করে দেবে, কোন রিলেশান দেখবে না। যেমন মাধ্যাকর্ষণ টেনে নেয়, বোয়েনসিতে উপরে ঠেলে দেয়। কিন্তু কাদের ক্ষেত্রে হয়? আমার আপনার ক্ষেত্রে। মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে হয় না। কারণ মহাপুরুষরা এক দৃষ্টিতেই বুঝে নেন কে আমার আর কে আমার নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ এক নজর দেখেই বুঝে নিচ্ছেন এ আমার লোক। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ইমোশানালি বা অন্য কোন কারণে অপরের সাথে জড়িয়ে পড়ি, তখন তাকেই আমরা ধরে রাখতে চাই। কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন ধরে রাখতে পারা যাবে না। চলে যাওয়ার পর অনেকদিন পর যখন বিচার করবে তখন দেখবে ওর সাথে আমার একত্ব কখন ছিলই না। আবার দেখা যায় অনেকে অনেক দিন পর ঐ পুরনো জায়গাতেই ফিরে চলে আসে। কারণ তারা মনের দিক থেকে একত্ব বোধে ছিল। মহাপুরুষদের অত বিচার করতে হয় না, আর ধাক্কাও খেতে হয় না, এক নজরেই জেনে যান এ আমার থাকের আর এ আমার থাকের নয়। ঠাকুর কেশব সেনকে বলছেন, তুমি লক্ষণ দেখে শিষ্য কর না, সেইজন্যই তোমার দল ভেঙে যায়।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার যে ঠাকুরের জীবনী খুব ভালো করে পড়া থাকলে দেখা যাবে ঠাকুর জীবনে কারুর কাছ থেকে আঘাত পাননি, হৃদয়রামের কাছ থেকে যেটা এসেছে সেটা আত্মীয়তার সূত্র থেকে পেয়েছেন। কিন্তু স্বামীজী সবারই কাছ থেকে আঘাত পেয়ে গেছেন, দেশে বিদেশে যেখানেই গেছেন সেখানেই আঘাত পেয়েছেন। এমন এমন সব ঘটনা আছে পড়লে বুকের ভেতরটা মোচড় দেয়, স্বামীজীর জীবনী তাই পড়া যায় না। স্বামী শিবানন্দজীও প্রচুর আঘাত পেয়েছেন। তাহলে স্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ এনাদের লোক চেনার ক্ষমতা ছিল না? মজার ব্যাপার হল ঠাকুরকে আমরা জানি প্রচণ্ড কোমল, রাজা মহারাজও ছিলেন অতি কোমল প্রকৃতির। রাজা মহারাজকে বলছেন রাখালদের দলে কৃষ্ণের খেলার সাথী, আর তাঁর কত উচ্চ উচ্চ ভাব, কি নরম মানুষ। কিন্তু এনারা দুজন ভেতর থেকে প্রচণ্ড কড়া, যে কেউ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারত না। স্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ দুজনকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় কি কড়া ধাঁচের। কিন্তু ভেতর থেকে একেবারেই নরম, এনারা বুঝতে পারছেন গোলমাল করবে কিন্তু তাও সবাইকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন, যে আসছে তাকেই আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন। আশ্রয় দেওয়া মানেই ভেতরটা খুলে দেওয়া। কাঙালীকে দুটো টাকা দিয়ে বিদায় দেওয়ার মত নয়, আশ্রয় দেওয়া মানে তাকে গ্রহণ করা। গ্রহণ করা মানে হৃদয়ের কপাটটা খুলে দিলেন। যাকে খুলে দিলেন সে তো তাঁর জন্য নয়, এবার সে ঘা দেবে। তাহলে স্বামীজী ঠিক করেছিলেন নাকি ভুল করেছিলেন? একদিকে স্বামীজী যেমন বলছেন, আমি সবারই ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জানি, কিন্তু অন্য দিকে যে স্বামীজীর আশ্রয় পেয়ে গেল তার অনেক জন্মের অনেক কিছুই কেটে গেল, এবার সে অনেকটাই এগিয়ে যাবে। যারা যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যদি ভালো করে খতিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে পরের দিকে এদের সবারই একটা অন্য ধরণের বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। এদেরও যে ভালো হয়নি তা নয়, ভালোটাও হয় কিন্তু মাঝখান থেকে এনারা একটা কষ্ট পান। কিন্তু মানুষ বাছাই করা নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে এই ব্যাপারে ঠাকুরের ধারে কাছে কেউ নেই। এমনকি ভাবের অবস্থায় বলে দিচ্ছেন, জয়রামবাটীতে অমুকের বাড়িতে মেয়ে আছে, ওর সাথে বিয়ের ব্যবস্থা কর। জয়রামবাটীতে কোথায় কার পরিবারে কোন মেয়ে আছে ঠাকুরের জানার কথা নয়, কিন্তু ভাবে তিনি বলে দিচ্ছেন, এটাই right choice। মহাবীর হনুমান এখানে ঠিক এই কথাই বলছেন, মেয়েগুলো এখানে যেভাবে পড়ে আছে এদের কারুকেই শ্রীরামচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্ব কখনই নিজের সঙ্গিনী নির্বাচন করবেন না, অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কথায় কথায় বলি, আপনার আচরণই আপনার পরিচয়। এখানেও এটাই বক্তব্য, উচ্চ বংশের ছেলে যদি হয় কখনই সে এই রকম করবে না, একটা মর্যাদাকে মেনে চলবে। হনুমানজী বুঝতে পেরেছেন যে এখানে সীতা থাকতে পারেন না। লঙ্কিনী হনুমানকে বলে দিয়েছিলেন, অশোকবাটিকাতে সীতাকে রাখা হয়েছে।

অশোক বাটিকায়া হনুমানের জানকী দর্শন

হনুমানজী এবার খুঁজতে খুঁজতে অশোকবাটিকায় গেছেন। সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, লতা, ফুলগাছে সজ্জিত বাগান, নানান জাতের পশুপাখিতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেকটি বৃক্ষতলে হনুমান সীতাকে অন্বেষণ করতে লাগলেন। ওখানে গগনস্পর্শী এক চৈত্যপ্রাসাদ দেখে হনুমান অবাক হয়ে গেছেন। আগেকার দিনে মন্দির হত না, তখনকার দিনে একটা জায়গাতে সবাই সমবেত হয়ে প্রবচনাদি দিতেন, যজ্ঞাদি করতেন, ঐ জায়গাকে বলা হত চৈত্য বা বিমান। বিমান মানে উঁচু বাড়ি। চৈত্য জিনিসটাই বিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে মন্দিরের রূপ নিয়েছে। বৈদিক যুগে কোন মন্দির ছিল না, মূর্তি পূজাও ছিল না, বলা হয় ভগবান বুদ্ধের আগমনের পর থেকে নাকি মন্দির, মূর্তি পূজা প্রসার লাভ করেছে। বেদের কিছু যজ্ঞ বাড়িতে হত আর কিছু যজ্ঞ সর্বসাধারণের মধ্যে হত। সমাজের সবাই মিলে যখন যজ্ঞ করবে তখন প্যাণ্ডেল খাটিয়ে করবে, অনেক জায়গায় একটা বাড়ি করাই থাকত যেখানে সবাই সমেবত হয়ে যজ্ঞাদি, প্রবচনাদি করতেন, সেই বাড়িকেই বলা হত চৈত্য। অশোকবাটিকাতেও একটা সেই রকম চৈত্য আছে। আজকের দিনে আমরা রাবণকে যেভাবে জানছি, রাবণ কিন্তু তা নয়। নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে রাবণ একজন শক্তিমান রাজা। রাজার নীতি পরিষ্কার, রাজার যা পছন্দ সেটা রাজার জিনিস। আর কোথাকার জিনিস পছন্দ? রাজার এলাকার জিনিস, জঙ্গল রাজার এলাকা। জঙ্গলে সীতা এসেছে আমার পছন্দ হয়েছে আমি তুলে এনেছি। কিন্তু এরপরে যা কিছু রাবণের আছে তার সব কিছু রাজার মতই। রাবণের যে ভক্তি, যে জ্ঞান সেখানে সবই সমান, ওখানে কোন তফাৎ নেই। আমাদের একটা স্বভাবই হল যখনই কোন চরিত্রকে খারাপ দেখাতে হবে তখন তাকে আসুরিক বানিয়ে দেওয়া, এটাকে বলে demonise করা। কোন নেতাকে যদি বরবাদ করতে হয় আগে তাকে অসুর বানিয়ে দিতে হয়। Demonise করার দুটো পদ্ধতি, একটা ইতিহাসকেই নতুন করে রচনা করে আর আরেকটা প্রথম থেকে ধীরে ধীরে চেষ্টা করে। জর্জ অরওয়েলের বই Animal Farmএ একটা ঘটনা আছে, একজন মুক্তির জন্য লড়াই করেছে, পরে বিভিন্ন কারণে আলাদা হয়ে গেছে। সেখানে ওরা ইতিহাসকেই পাল্টে দিচ্ছে, ঐ লোকটি তো বদমাইশ ছিল। তবে যে কোন জায়গায় কেউ যখনই সচেতন ভাবে কাউকে মারার জন্য demonise করার চেষ্টা করছে তখন বুঝতে হবে সে দুর্বল হয়ে গেছে, এর বিনাশের আর দেরী নেই। দুর্বল না হলে কেউ কাউকে demonise করবে না। রাবণাদির যা কিছু বলছেন এটা হল শাস্ত্র, মিথ্, এখানেও রাবণকে demonise করছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়, শ্রীরামচন্দ্রের আর রাবণের মধ্যে বিরাট কোন তফাৎ নেই। বাল্মীকি রামায়ণে এই জঙ্গলটা কাশ্মীরের মত disputed area। শ্রীরামচন্দ্রই বলছেন, আমরা ভরতের রাজ্য রক্ষা করছি। অন্য দিকে রাবণ মনে করছে এই জঙ্গল আমার রাজ্যের মধ্যে, জঙ্গলের যা কিছু সব আমার। এই জিনিসগুলো আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে। তবে আধ্যাত্মিক শক্তি যেখানে থাকবে সেখানেই জয় হবে। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দিকে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হলেন আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতিভূ, পাণ্ডবদের তাই জয় হল। শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই, বানর সেনার দিক থেকে যদি দেখা হয় তাহলে আধ্যাত্মিক শক্তি তাদের সাথে আছে তাই তারা জয়ী হয়ে গেল। ধর্মেরও একটা শক্তি আছে, ধর্ম মানে জপ-ধ্যান করছে, পূজাদি করছে, এতেও শক্তি হবে কিন্তু অধ্যাত্ম আলাদা জিনিস। মানুষ সাধারণত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু যে অধ্যাত্মে চলে গেল সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু জানে না, পাণ্ডবরা তাই বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আমরা আর কাউকে জানি না। অর্জুন বলছেন, কৃষ্ণের নারায়ণী সেনা আমার চাই না, আমার কৃষ্ণকেই চাই। পাণ্ডবদের কি তাই বলে কোন ঝামেলা হয়নি, প্রচুর ঝামেলা হয়েছে। ঠাকুর বলছেন, ভীষ্ম এই ভেবে মৃত্যুর সময় চোখের জল ফেলছেন, ভগবান সব সময় যাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকছেন তাদেরই এই দুরবস্থা। ঠাকুর এর উল্লেখ করে বলছেন, ভগবান নিজে সব সময় পাণ্ডবদের সাথে সাথে কিন্তু তা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের কত দুঃখ কষ্ট। কিন্তু তারপরেই ঠাকুর বলছেন, কিন্তু পাণ্ডবদের মত ভক্ত কোথায় আর জ্ঞানীই বা কোথায়! ভগবানের যে ঠিক ঠিক কৃপা তা হল জ্ঞান ভক্তির ঐশ্বর্য। যে যাঁর পূজা করে সে তাঁরই সত্তা পায়। যারা দেবতাদের পূজা করে তারা দেবতাদের সত্তা পায়, ভগবানকে যারা ভালোবাসে তারা ভগবানের সত্তাই পায়, ভগবানের সত্তা হল জ্ঞান ভক্তির। যাই হোক ঐ চৈত্যের কাছে হনুমানজী একটা শিংশপা বৃক্ষ অর্থাৎ শিশু গাছ দেখতে পেলেন। শিশু গাছের পাতা খুব নিবিড় ভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকে সেইজন্য শিশু বৃক্ষের তলায় সূর্যের আলো পৌঁছাতে পারে না বলে বৃক্ষের নীচটা অন্ধকার থাকে, বলছেন –

তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্।৫/২/৮
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভূতলে।

একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্।৫/২/৯
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতিভাষিণীম্
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকৃশাং শুভাম্।
শাখান্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।৫/২/১০

হনুমান দেখছেন বৃক্ষমূলে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাদের মত সীতা বসে আছেন আর তাঁকে চারিদিকে রাক্ষসীরা ঘিরে রেখেছে। সীতাকে দেখে হনুমানের মনে হচ্ছে যেন এক দেবী বসে আছেন। তাঁর কেশে একটা বেণী, বোঝা যাচ্ছে যে চুলের অনেক দিন কোন সংস্কার হয়নি। এক বেণীর আরেকটা অর্থ হয়ে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন। আর বলছেন *কৃশাং*, মনের দুঃখে দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে, *দীনাং*, মনে হচ্ছে কত অসহায় ভাবে ভূতলে পরে আছেন, কেউ নেই আর *মলিনাম্বরদারিণীম্*, পরিধাণের বস্ত্র অতি মলিন। *ভূমৌ শয়ানাং*, মাটিতে শয়ন করে আছেন। শায়িত অবস্থায় কি করে যাচ্ছেন? *রাম রামেতিভাষিণীম্*, শুধু ‘রাম’ ‘রাম’ এই শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। দেখছেন এই বিপদ থেকে ত্রাণ করার আমার কেউ নেই, সেইজন্য শুধু রাম রাম এই নাম জপ করে যাচ্ছেন। গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে কপিশ্রেষ্ঠ এই দৃশ্য অনিমেষ নয়নে দেখে যাচ্ছেন। ঠাকুর অনেকবার এই উপমাটা নিয়েছেন, সীতাকে হনুমান কিভাবে দেখছেন।

বাল্মীকি খুব বড় কবি ছিলেন তিনি এই দৃশ্যের বর্ণনা আরও বিশদ ও সুন্দর ভাবে দিয়েছেন। কিন্তু জিনিসটাকে যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখা হয় তাহলে অধ্যাত্ম রামায়ণের নয় আর দশ নম্বর দুটি শ্লোককে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোক বলা যেতে পারে। এই ধরণের গ্রন্থের কাহিনীর যেমন একটা গুরুত্ব আছে তার সাথে এই ধরণের জিনিসগুলো একটা আধ্যাত্মিক ব্যপ্তি নিয়ে আসে। যদিও বলা হয় শিব আর শক্তি এক কিন্তু শিব সব সময় নিজের অবস্থাতেই অবস্থিত থাকেন, তাঁকে পাওয়ার জন্য শক্তিকে সব সময় সাধনা করতে হয়। যদি সহজে পেয়েও যায় তখনও কোন না কোন ভাবে শক্তিকে খাটিয়ে নেবে। যখন সময় হবে তখন ঠাকুর কৃপা করবেন কিন্তু তার আগে তিনি তাকে দিয়ে একটু করিয়ে নেন। অবাক হয়ে তাই ভাবতে হয় মানুষ করবে ঈশ্বর চিন্তন? তা কি কখন সম্ভব! ঈশ্বর দর্শন করতে পারবে, তা কি কখন সম্ভব! একেবারেই সম্ভব নয়। মুখে আমরা যতই প্রবচন দিই, যত যাই করি না কেন, এ কখনই সম্ভব না। যোগদর্শন পড়লে সব থেকে ভালো বোঝা যায় জিনিসটা কত কঠিন। আমরা মনে করছি বটে ভক্তিপথ সব থেকে সহজ পথ, একেবারেই তা নয়। বদ্রীনাথ, কেদারনাথে যেতে গেলে যে পথ দিয়েই আমরা যাই না কেন পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। হেলিকপ্টারেও গেলে ঐ উচ্চতায় তাকেও যেতে হবে। যে পরিমাণ হাড়ভাঙা পরিশ্রম দরকার, সেই পরিশ্রম প্রত্যেকটি পথেই দরকার। যখনই আমরা বলছি শিব আর শক্তি এক তার মানে যখন শিব আর শক্তির মিলন হয়ে গেল। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত যতক্ষণ শিব আর শক্তি আলাদা ছিল ততক্ষণ এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম সবাইকেই করতে হয়। কথামৃতে এই ভাব অনেক জায়গায় এসেছে। ঠাকুর বলছেন, শিবকে পাওয়ার জন্য পার্বতীকে কত তপস্যা করতে হয়েছিল। যদিও, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, কিন্তু আখ্যায়িকার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক উপাদান থাকে তাকে কখনই পাল্টানো যাবে না। কাহিনীর ইতিহাস নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে কিন্তু ভেতরের আধ্যাত্মিক সত্যকে নিয়ে কখনই কোন প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ সাধু, সন্ন্যাসী, ঋষিরাই এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁদের ইতিহাস ভূগোলের জ্ঞানে গোলমাল থাকতে পারে কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানে কোন গোলমাল থাকবে না।

অবতার হয়েই আসুন, অবতারের সঙ্গী হয়েই আসুন, যাই হয়ে আসুন তপস্যা সবাইকেই করতে হবে। ঠাকুরও বলছেন, কিছু ফল আছে যার ফল আগে ফুল পরে, যেমন লাউ, কুমড়ো, কিন্তু তাঁদেরও তপস্যা করতে হবে। কিন্তু হাড়ভাঙা তপস্যা, মুণ্ডুকাটা তপস্যার যে কথা বলা হয়, এই তপস্যা সব থেকে বেশি দেখা যায় যাঁরা শক্তি, পার্বতীর রূপ যাঁরা। সতী যে শিবকে পেয়েছিলেন সেখানেও তপস্যা ছিল কিন্তু মুণ্ডুকাটা তপস্যা যেটা বলে সেটা ছিল না। পার্বতীর তপস্যা হল মুণ্ডুকাটা তপস্যা। আবার শ্রীরাধাও পঞ্চতপা করেছিলেন, এক জায়গায় ঠাকুরও এই কথা বলছেন। যাঁরাই অবতারের সঙ্গিনী হয়ে এসেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। শ্রীমা, যদিও ঠাকুরের সাথে বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরকে যেমনটি অবস্থা দিয়ে যেতে হয়েছিল তিনিও সেই অবস্থা দিয়ে গেছেন, ভালোটাও দেখেছেন মন্দটাও দেখেছেন। কিন্তু ঠাকুরের মহাসমাধির পর, মহাসমাধি হওয়া মানে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া নয়, কারণ ঠাকুরই বলছেন এই ঘর আর সেই ঘর, কিন্তু তারপরে যে শ্রীমার তপস্যা আর এখানে যে বলছেন *একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বধারিণীম্*, একই বর্ণনা।

ঠাকুরের মহাসমাধির পর কামারপুকুরে ওই কটা দিন, খাওয়ার কিছু নেই, ভাতে নুনটুকুও জুটছে না, কাপড় ছিঁড়ে গেছে সেটাকেই গিট দিয়ে কোন রকমে চালাচ্ছেন। মায়ের ঐ কষ্ট আমরা কল্পনাও করতে পারব না। একজন মহারাজ খুব দুঃখ করে বলছিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছাতেই সব হয়, কিন্তু মায়ের যে ঐ কষ্ট, তরকারী তো দূরের কথা নুনই জুটছে না, পড়ার কাপড় নেই। কিন্তু ঠাকুর ভগবান, ভগবান সর্বশক্তিমান, ঠাকুর যদি অতটুকুর ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে কি ঠাকুরের অবতারত্ব কিছু কমে যেত? কোন বড়লোক ভক্তকেও স্বপ্নে বলে দিতে পারতেন, কামারপুকুরে ও খুব কষ্টে আছে। যে পরিস্থিতিতে মা ছিলেন এখানে সীতারও একই পরিস্থিতি। তফাৎ শুধু সীতাকে রাক্ষসীরা ঘিরে রেখেছে, সব সময় একটা আতঙ্ক লেগে আছে, কিন্তু তার সাথে এই আশাও আছে যে শ্রীরামচন্দ্র এসে তাঁকে উদ্ধার করবেন। কিন্তু শ্রীমায়ের আর সেই সুযোগ নেই যে এই পার্থিব শরীরে ঠাকুরকে দেখবেন। অবতারের সঙ্গিনী রূপে যাঁদেরকে আমরা জানি, তাঁদের সবারই এই লাঞ্ছনা যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। আমরা মনে করছি শক্তি আর শিবের মিলন যেন খুব অনায়াসে হয়ে গেল, লাউ কুমড়ো ফল আগেই হয়ে গেল। কিন্তু এর উল্টোটাও হতে হবে, সাধনাটাও হতে হবে। সীতা স্বয়ম্বরে শ্রীরামচন্দ্রকে খুব সহজেই পেয়ে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্রই সীতাকে বেছে নিলেন। কিন্তু তারপরের যে তপস্যা সীতাকে করতে হয়েছে শ্রীরামচন্দ্রকে পাওয়ার জন্য, এটাই মুণ্ডুকাটা তপস্যা, যদিও খুব বিষম পরিস্থিতিতে করতে হয়েছে।

ঠাকুর যদিও এক জায়গায় বলছেন, আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর, ঐ এক টাং করলেই হবে। কিন্তু তারপরেও কামারপুকুরে শ্রীমায়ের ঐ বর্ণনা পড়লে আমরা শিউড়ে উঠি। এগুলোকে তো শুধু কাহিনী রূপে দেখা যায় না, কাহিনী হলে হাজার হাজার বছর ধরে কেউ রামায়ণ মহাভারত পড়ত না। কাহিনীগুলোর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক দিক আছে, ঐ আধ্যাত্মিক দিকটাকে সবাই দেখছে বলেই এত বছর ধরে মানুষ পড়ে যাচ্ছে। তার মানে, আমরা যদি আধ্যাত্মিক পথে যেতে চাই তাহলে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হবে ভাবাই যায় না। *একবেণীং কৃশাং দীনাং*, এই অবস্থা বাস্তবিক সবারই হয়। আমি মনে করছি আমি বেঁচে যাব, তা নয়, আমারও এই অবস্থা হবে, এই জন্মে হয়ত নাও হতে পারে কিন্তু দুই কি চার জন্ম পরে হবে। যা কিছু খাচ্ছে হজম হচ্ছে না, অথচ খাওয়ার অভাব নেই, ভক্তরা আছে কিন্তু তাও তাকে কাঙালীর মত থাকতে হচ্ছে।

কিন্তু এই শ্লোকের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল *ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রাম রামেতিভাষিণীম্*, সীতা শোকে কাতর হয়ে ভূমি-শয্যায় পড়ে আছেন কিন্তু তখনও মুখে তিনি 'রাম' 'রাম' বলে যাচ্ছেন, তার মানে তাঁর শরীর বোধটা চলে গেছে আর পুরো মন তাঁর একমাত্র শ্রীরামের প্রতি পড়ে আছে, শ্রীরাম ছাড়া আর কোন চিন্তাই তাঁর মনে আসছে না। সাহিত্যে যদি বিভিন্ন স্তরের বিন্যাস না থাকে তাহলে কাহিনী দাঁড়াতে পারে না, সোজাসাপ্টা বলে দিলে কাহিনী হবে না। আধ্যাত্মিক রচনা সমূহে মূলটা আধ্যাত্মিক থাকতে হয় আর তার উপর একটার পর একটা স্তর থাকে। এগুলো হল বিভিন্ন স্তর, যেমন একজন সাধক বেড়ালের ছায়ের মত মিউ মিউ করে মাকে ডেকে যাচ্ছে, মাকে ছাড়া আর সে কিছু জানে না। সীতার এখন কি করার আছে? কিছুই করার নেই, নিজের প্রাণটুকু দিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কিছু নেই। শ্রীমায়েরও ঐ একই অভাব, একই কষ্ট সেখানেও মায়ের কিছু করার নেই। তার মধ্যে হরিশ, যাকে ঠাকুর স্নেহ করতেন, সেই হরিশ আবার উৎপাত করতে এল। কামারপুকুরে ঐ অবস্থার মধ্যে মা দিন কাটাচ্ছেন অথচ কিছু দিন আগে দক্ষিণেশ্বরে কত বড় বড় ভক্তদের আনাগোনা, ঠাকুরকে সবাই কত মানছেন, নিত্য উৎসব লেগে আছে। সেখান থেকে হঠাৎ এই অবস্থার মধ্যে এসে পড়লেন। সীতারও একই অবস্থা। এই কাহিনীগুলো দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য, ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য একজন সাধককে কি কঠোর তপস্যা করতে হয়। যত জাগতিক দুর্যোগ বিপর্যয় আসুক 'রাম' 'রাম' করাটা কোন অবস্থাতেই ছাড়া যাবে না, সাধকের যিনি ইষ্ট তাঁকে এক মুহূর্তের জন্য ছাড়া যাবে না, চিত্তটা সব সময় ইষ্টতেই লেগে থাকবে।

অনেক কিছু আছে যা প্রকৃতি নিজের মতই করে যায়, এর পেছনে কোন নিয়ম আছে কিনা বা এলোপাতাড়ি কিনা আমরা জানি না, তাঁর ইচ্ছাতেই হয় নাকি এমনিতেই হয় আমরা কিছুই জানি না। কিন্তু একটা জিনিস জানি, যা কিছুই হয়ে যাক আমাকে 'রাম' 'রাম' করে যেতে হবে। কমাণ্ডার তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন দুর্গটাকে দখল করে নাও। সৈন্যরা প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সাবধানে এগোতে থাকে, কিন্তু যেমনি শত্রুরা দেখে নিল সঙ্গে সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গেল, ফায়ারিং হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই কখন পাঁকের ভেতর দিয়ে, জলের উপর দিয়ে, দড়ির সিঁড়ি বেয়ে, তার মধ্যে গুলি চলছে, পাশের বন্ধুরা কেউ ওখানেই মরে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে, ওর একটাই জিনিস মাথায় আমাকে এই দুর্গের দখল নিতে হবে। এই জিনিস একদিনে হঠাৎ

করে হয়ে যাবে না, এর জন্য অনেক প্রস্তুতি দরকার, অল্প বয়স থেকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়। বিপদে পড়লে মানুষ 'রাম' 'রাম' করতে পারবে না, 'রাম' 'রাম' করার জন্যও বাচ্চা বয়স থেকে ট্রেনিং দরকার। প্রথমে বাচ্চা বয়সে ট্রেনিং, পরে যুবা অবস্থায় ট্রেনিং, যখন চাকরি জীবন শুরু হল তখন অফিসের কাজ, সংসারের কাজ, যে কোন কাজের মাধ্যমে তাঁকে ধরার চেষ্টার ট্রেনিং নিতে হবে আর যখন কাজ থাকবে না তখন দু-হাত দিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করতে হবে। সামর্থ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কাজের মাধ্যমে তাঁকে ধরার চেষ্টা না থাকলে অবসর জীবনে গিয়ে তারাই খুব বিপদে পড়ে। কারণ সারা জীবন মানুষ যে কাজ করে আসছে কাজ করার এই স্বভাবটা তার যাবে না। একটা বয়সে এসে শরীরের সামর্থ থাকবে না কিন্তু কাজের স্বভাবটা থেকে গেছে, এখন সে কি করবে? টিভি দেখবে, খবরের কাগজ পড়বে, কিন্তু কত আর টিভি দেখবে, কত কাগজ পড়বে, এরপর কি করবে ভেবেই অস্থির হয়ে যায়, তখন শুরু হবে একেতাকে গালাগালি দেওয়া আর নয়তো পরনিন্দা পরচর্চা। সেইজন্য প্রথম থেকে নিজেকে ট্রেনিং দিতে হয়, আমি যে কাজ করছি এই কাজের উদ্দেশ্য হল কাজের মাধ্যমে ঠাকুরকে ধরার চেষ্টা আর কাজ যখন থাকবে না তখন দু-হাতেই তাঁকে ধরব। এই ভাব যদি না থাকে বয়সের সাথে সাথে একটা সময় গিয়ে সে বিপদে পড়বে। আর এইভাবে চেষ্টা করতে করতে একটা জন্মে গিয়ে তার ভেতরে ত্যাগ বৈরাগ্যের আধিক্য হবে, আর তখন কম বয়সেই হয়ত সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। সীতা যত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে কাছে ছিলেন ততদিন তিনি তাঁকে ভালোবেসে গেছেন আর সেবা করে গেছেন, কিন্তু আজ যখন দুর্দিন এসে গেছে তখন সীতা এটা বলছেন না যে শ্রীরামচন্দ্রকে ভালোবেসে আমার এই পরিণতি হয়ে গেল!

ঠাকুর বলছেন, অনেক সময় দেখা যায় একটু কিছু হয়ে যাওয়াতে স্ত্রী কুপিত হয়ে গেল, এবার সেই স্ত্রী সারাটা দিন গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে, তোমাকে বিয়ে করে আমি কি সুখ পেলাম, না নিজে ভালো খেতে পেলুম না বাচ্চাদের খাওয়াতে পারলুম, তুমি ছাড়ো তো ঐসব ঠাকুর-টুকুর। এই যে ভাব, একটু বিষম পরিস্থিতি হয়ে গেলেই ঠাকুরকেও গালাগাল দিচ্ছে স্বামীকেও গালাগাল দিচ্ছে, সীতার মধ্যে তা নেই। পরিস্থিতি অনুকূল হোক আর প্রতিকূলই হোক, সেই 'রাম' 'রাম'ই উচ্চারিত হয়ে যাবে, 'রাম' ছাড়া আর কিছু জানি না। জীবন যদি এভাবে না চলে কষ্টের শেষ নেই। সীতাকে দেখে হনুমান এই রকম ভাবছেন। এটাই এই কাহিনীর আধ্যাত্মিক দিক। ঠাকুর সীতার এই ভাবটা কথামৃতে নিয়ে এসেছেন। সেখানে ঠাকুর ঠিক এই শ্লোকের বর্ণনা দিচ্ছেন, ঠাকুরের এই শ্লোকটা হয়ত খুব ভালো লেগেছিল, হনুমান দেখছেন সীতা দীনহীন মলিন বেশে বসে আছেন কিন্তু মন তাঁর সেই রামেই পড়ে আছে। যাই হোক, মহাবীর হনুমান দেখেই বুঝতে পেরেছেন ইনিই সীতা, কারণ লঙ্কা নগরী হল ভোগ নগরী, সেখানে এভাবে একজন পড়ে থাকবেন এ জিনিস হতেই পারে না, ইনিই নিশ্চয় সীতা হবেন। হনুমান আগে থেকে সীতার একটা ছবি মনের মধ্যে এঁকে নিয়েছিলেন। হনুমানের মনে যে সীতার ছবি সেই ছবি কখনই ভোগের দিকে যাবে না। রাবণের অন্তঃপুরে ভোগের প্রাচুর্যের মধ্যে মেয়েগুলোকে দেখে হনুমান বুঝতে পারছেন এখানে সীতা থাকতে পারেন না, তাঁর মনের ছবির সাথে মিলছে না। কিন্তু এই জায়গায় এসে মিলে যাচ্ছে। যদিও তিনি শোকে কাতর, অন্তরটা তাঁর ভারাক্রান্ত কিন্তু বুঝেছেন ইনিই সীতা।

হনুমান হঠাৎ দেখছেন সেখানে রাবণ আসছে। এখানে রাবণকে পুরো কালো বর্ণনা করছেন। হতে পারে, আশ্চর্যের কিছু নয় কারণ সিংহল দেশের লোকেদের গায়ের রঙ কালোই হয়। রাবণের বর্ণনা করে বলছেন, তার দশটি মুখ আর কুড়িটি বাহু, বর্তমানে আমরা রাবণের যে রূপ জানি সেই রূপে সেখানে হাজির হয়েছেন। এই জায়গাতে এসে বৈর ভাবে সাধনের কথা পুরোভাবে বলা শুরু হয়, বলছেন –

রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ।
সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ।৫/২/১৫

রাবণ মনে মনে চিন্তা করছেন, কিভাবে শ্রীরামের হাতে আমার মৃত্যু হবে জানিনা, শ্রীরামের হাতে মৃত্যু হলে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। এমন কি কারণ হয়েছে যে শ্রীরাম সীতার জন্য এখনও আসছেন না? এই জায়গাতে এসে বাল্মীকি রামায়ণ থেকে অধ্যাত্ম রামায়ণ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। বাল্মীকির কাছে এসব কিছু নেই, তাঁর কাছে হল রাবণের পৌরুষত্ব। পরে হনুমান তাকে নিষেধ করবেন বৈর ভাবে সাধনা না করার জন্য। বৈর ভাবে সাধনার জন্য রাবণের মাথায় সব সময় শ্রীরামই ঘুরছেন। এই সমস্যা কংসেরও ছিল। অধ্যাত্ম রামায়ণ খুব positive গ্রন্থ, negative বলে কিছু নেই। মানুষ যাকে অপছন্দ করে, যার উপর রেগে থাকে সে সব সময়

তার কথা ভাবতে থাকে। রাবণ এখন দিনরাত শ্রীরামের কথাই ভেবে যাচ্ছে, সব সময় একটাই চিন্তা মাথায়, সেইজন্য রাবণের ঘুম আসছে না। ঘুম না আসাতে রাবণ একটা স্বপ্ন দেখল, শ্রীরামচন্দ্রের সন্দেশ নিয়ে কোন এক বানর, যে নিজের মত রূপ ধারণ করতে পারে, লঙ্কায় এসেছে, আর সে বৃক্ষে অবস্থান করে আছে। যদি স্বপ্ন ঠিক হয় তাহলে আমি এখন সীতার কাছে যাচ্ছি, গিয়ে সীতাকে অনেক কটূ কথা বলব, বানর তখন সব শুনে শ্রীরামচন্দ্রকে গিয়ে বলবে তাহলে তিনি তাড়াতাড়ি লঙ্কায় আসবেন। এই জিনিসটাকে বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিতে না দেখে যদি ভক্তির দিক দিয়ে দেখা হয় তাহলে এটাই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হয়ে যাবে। যাঁরা খুব উচ্চমানের ভক্ত তাঁদের কাছে সব কিছু তাঁর ইচ্ছাতেই হয়। আর সেই ইচ্ছাতে যখন মিলনের ইচ্ছা থাকে তখন তাঁকে যেটাতে তাঁর মিলন তাড়াতাড়ি হবে বলে দেওয়া হবে তিনি সেটাই করবেন। বাচ্চা ছেলে মায়ের কাছে যাবে বলে কাঁদছে, এমনি সময় বাচ্চাটি কারুর কাছেই যায় না, কিন্তু তখন কেউ এসে যদি বলে, চল আমি তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব, বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে চলে যাবে। ভক্তিতে তাঁর এটাই মনে হয়, যা কিছু হচ্ছে সব শ্রীরামচন্দ্রের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। শ্রীরামের ইচ্ছাতে যদি সব কিছু হয়ে থাকে তাহলে এই যে গোলমাল এত যা কিছু হয়েছে, এর জন্য সে এখন শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে চাইছে। রাবণ এখন চাইছে কিভাবে শ্রীরামকে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসা যায়। এটাই অধ্যাত্ম রামায়ণের দর্শন।

বলা হয় যে রাবণ যখনই সীতার কাছে যেত তখন একা কখনই যেত না, সঙ্গে মন্দোদরীকে নিয়ে যেত। বাল্মীকি রামায়ণেও এই বর্ণনা আছে, এমনকি যখন রাবণ সীতাকে কটু কথা বলছে তখন মন্দোদরী রাবণকে বলছে, হে রাজা! কোন মেয়ের দিকে আপনার যদি দৃষ্টি পরে আর সেই মেয়ে যদি আপনাকে প্রতিপ্রেম না দেয় তখন এতে শুধু শরীরের তাপ বৃদ্ধি হয়, এটা কখনই সুখ দেয় না। আপনি সীতাকে ভালোবাসছেন, কিন্তু সীতা আপনাকে ভালোবাসতে চাইছে না, সীতা সেই প্রেমের প্রতিদান দিতে চাইছে না, এটা আপনার জন্য একেবারেই ভালো নয়, আপনি এই জিনিস করবেন না। এরকম হলে শরীরের কষ্ট ছাড়া আর কিছু হবে না। মূল কথা হল রাবণ একা কখন সীতার কাছে যেত না। যাই হোক সস্ত্রীক রাবণ আসছে, দূর থেকে নুপুরধ্বণি, কিঙ্কিণীধ্বণি শুনেই সীতা বুঝতে পারছেন রাবণ আসছে। সীতা ভয়ে নিজেকে গুটিয়ে আরও জড়সড় হয়ে গেলেন। বাল্মীকি রামায়ণে যে স্টাইলে বর্ণনা আছে এখানেও ঠিক সেইভাবেই বর্ণনা দিচ্ছেন। ভাষ্যকাররা এটাকেই খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। এখানে double meaning দেওয়া আছে, কারণ প্রথমে রাবণ ভাবছেন কবে শ্রীরামচন্দ্র এসে আমাকে বধ করবেন, কবে আমি মুক্তি পাব। তারপরেই রাবণ সীতাকে গিয়ে কটু কথা বলছেন। এই দুটোকে মেলাবার জন্য ভাষ্যকাররা প্রত্যেকটি কথার দুটি করে অর্থ বার করেছেন। সীতাকে রাবণ বলছে –

রামো বনচারাণ্যং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ।
কদাচিদ্দৃশ্যতে কৈশ্চিৎ কদাচিন্নৈব দৃশ্যতে।৫/২/২৩

রাবণ বলছে, রাম জঙ্গলে ভাইকে নিয়ে বনচরদের সাথে থাকে। ভাষ্যকাররা এটাকে ব্যাখ্যা করে বলছেন, ঋষিরাও জঙ্গলে থাকেন, তাই এখানে বলতে চাইছে শ্রীরাম ঋষিদের মধ্যে আছেন। শ্রীরাম ঋষিদের সাথে জঙ্গলে আছেন এই কথাটাই ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা খুব নমনীয় ভাষা, সেইজন্য একই বাক্যের অনেকগুলো অর্থ করা যায়। রাবণ বলছে, শ্রীরামকে কখন দেখা যায় আবার কখন তাঁকে দেখা যায় না। এর ব্যাখ্যা করছেন, ঋষিরা কখন কখন তাঁকে ধ্যানের গভীরে দেখতে পান, অনেক সময় আবার দেখতে পান না। রাবণ বলতে চাইছে, রাম কখন সখন সামনে এসে যান আবার কখন সখন ভয়ে জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে থাকেন। যেসব গুপ্তচরদের নিয়োগ করা হয়েছে তারাও কখন দেখতে পায় কখন আবার দেখতে পায় না। কিন্তু ভাষ্যকাররা এর অর্থ করছেন, তিনি ঋষিদের মধ্যে আছেন, ঋষিরা সাধনার গভীরে তাঁকে দেখতে পান, অনেক সময় পান না। সাধন-ভজনের ব্যাপারে বলা হয় নিয়মিত ধ্যানে বসতে হয়, যেমন ছিপ নিয়ে বসলে কোন দিন মাছ ধরা পরে আবার কোন কোন দিন একটা মাছও ধরা পরে না। সেই রকম ধ্যানে বসলে কখন তিনি কৃপা করবেন আবার কখন তিনি কৃপা নাও করতে পারেন। সেই রকম শ্রীরামচন্দ্র যে সব সময়ই ঋষিদের গোচর ছিলেন তা নয়। বলছেন *কদাচিৎ দৃশ্যতে*, কোন কোন সময় দেখা যায় কিন্তু বেশির ভাগ সময় দেখা যায় না।

ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে।
ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষ্যমানাঃ সমন্ততঃ।৫/২/২৪

কিং করিষ্যসি রামেণ নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি।
ত্বয়া সদালিঙ্গিতোঽপি সমীপস্থোঽপি সর্বদা।৫/২/২৫।
হৃদয়েঽস্য ন চ স্নেহস্ত্বয়ি রামস্য জায়তে।
ত্বৎকৃতান্ সর্বভোগাংশ্চ ত্বদ্‌গুণানপি রাঘবঃ।৫/২/২৬

রাবণ আবার বলছে, আমিও রামকে খুঁজে বার করার জন্য অনেক বার আমার চরদের পাঠিয়েছি, কিন্তু তারাও চারিদিকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করেও তাঁকে কেউ দেখতে পায়নি। এর ব্যাখ্যাতে বলছেন, আমিও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত, আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি যদি তাঁর দর্শন পেতে পারি, কিন্তু আমার এই চেষ্টা সর্বথা নিষ্ফলই হয়েছে, আমিও তাঁর দর্শন পাচ্ছি না। রাবণ আবার বলছে, হে সীতা তুমি শোন! শ্রীরামচন্দ্র তো সব সময় তোমার পাশে থাকত আবার সব সময় তোমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে থাকত, সেই রাম এখন তোমার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে গেছেন। নিস্পৃহ যদি না হতেন তাহলে কি এতদিনে তোমার কাছে না এসে থাকতে পারতেন? এখানে ভাষ্যকাররা না বললেও দু-রকমের অর্থ হতে বাধ্য। তার কারণ, আগে যে রাবণ বলছে শ্রীরামন্দ্রের হাতে বধ হতে চাইছে তাহলে আমি মুক্তি পেয়ে যাব, সেই রাবণ জানে সীতা কে, সীতা কে জানলে রাবণ কখনই তাঁকে অপমানজনক কথা বলতে চাইবে না, বিশেষ করে এই ধরণের শাস্ত্রের মতে। সেইজন্য কিছু কথা অন্য লোকেদের জন্য আছে আবার কিছু কথা হল রাবণের নিজের মনের ভাব। দ্বিতীয় অর্থে বলছেন, তুমি হলে তাঁর প্রিয়, সদা তুমি তাঁর আলিঙ্গনে থাক। কিন্তু তিনি নিস্পৃহ। যেমন ব্রহ্ম আর মায়া, মায়া সব সময় ব্রহ্মের সঙ্গে আছে কিন্তু ব্রহ্ম নির্বিকার, পরমাত্মা সব সময় নির্বিকার। শ্রীরাম সব সময় তোমার থেকে উদাসীন অথচ সব সময়ই তুমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছ। রাবণ আবার বলছে, এখনও শ্রীরামের হৃদয়ে তোমার জন্য কোন স্নেহ জন্মায়নি। এই শ্রীরাম তোমার প্রসাদে সমস্ত ভোগ্য বস্তু ভোগ করেছেন অথচ দেখ সে একটুও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, তোমার দিকে একটুও তার মন নেই। সে অকৃতজ্ঞ, গুণহীন, অধম, একবারও তোমার কথা ভাবছে না।

ভাষ্যকাররা বলেন এই শ্লোকটি সাংখ্যবাদীদের আত্মাকে নিয়ে যে মত সেই মতকে কেন্দ্র করে। সাংখ্যে প্রকৃতি আর পুরুষ আলাদা। কিন্তু পুরুষ যখন প্রকৃতির কাছে আসে তখন সে প্রকৃতিকে ভোগ করতে শুরু করে। ভোগ করলেও পুরুষ প্রকৃতিতে লিপ্ত হয় না, কেননা যদি লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে কোন দিন মুক্তি হবে না। আমি ভোগ করছি এই ভাব পুরুষের কখন আসে না। প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার পর সেখানে তৃতীয় একটা জিনিস দাঁড়িয়ে যায়, সেটা হল জীব। জীবেরই যত রকমের গতি হতে থাকে। পুরুষ সব সময় নির্বিকার, ভোগ কিন্তু করছে পুরুষ। পুরুষ আছে বলেই এত কিছু হচ্ছে কিন্তু পুরুষ সব কিছুতে নির্বিকার। এই শ্লোকগুলোর মধ্যে ঈশ্বর, আত্মা, পুরুষের বর্ণনা চলছে। ব্রহ্মের মায়ার সাথে কি সম্পর্ক, ঈশ্বরের শক্তির সাথে কি সম্পর্ক, আত্মার সাথে প্রকৃতির কি সম্পর্ক, এগুলো বলে যাচ্ছেন। রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের অনেক দোষের কথা বলছে –

ভুঞ্জানোঽপি ন জানাতি কৃতঘ্নো নির্গুণোঽধমঃ।
ত্বমানীতা ময়া সাধ্বী দুঃখশোকসমাকূলা।৫/২/২৭

শ্রীরামচন্দ্র হলেন কৃতঘ্ন, নির্গুণ আর অধম। রাবণ তিনটি শব্দ ব্যবহার করছে, কৃতঘ্ন, নির্গুণ আর অধম। শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে ভোগ করে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, তোমার দিকে তিনি আর তাকান না। সেইজন্য তিনি হলেন কৃতঘ্ন, নির্গুণ আর অধম। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনটেরই আলাদা অর্থ। কৃতঘ্ন মানে যার দ্বারা সে উপকৃত হয়েছে তার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা বোধ নেই, কিন্তু এর অর্থ হল কর্মের যিনি নাশ করেন, কর্মের নাশ একমাত্র ভগবানই করেন। রাবণ ভাবছে আমার বধ যদি তিনি করে দেন তাহলে এতদিনের আমার যে কর্ম সঞ্চিত হয়েছে তার নাশ হয়ে যাবে। সংস্কৃত বিচিত্র ভাষা, একই শব্দকে একটু ডানদিক বামদিক করে দিলে অন্য অর্থ বেরিয়ে আসবে। সেই রকম কৃতঘ্নের অর্থ হয়ে যায়, কৃত অর্থাৎ যে কর্ম করা হয়েছে সেটাকে যিনি নাশ করেন, যা কিনা একমাত্র ভগবানই পারেন। ঠাকুর বলছেন সচ্চিদানন্দই গুরু, সেখান থেকে আমরা মনে করি গুরু আমাদের কর্মকে নাশ করে দিতে পারেন। চারিদিকে যত গুরু আছেন বেশির ভাগই জাগতিক গুরু, জাগতিক গুরু কর্মের নাশ করতে পারবেন না। দ্বিতীয় হল নির্গুণ, নির্গুণ মানে গুণহীন। কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যিনি ত্রিগুণাতীত, গানেও বলছেন, নির্গুণগুণময়। নির্গুণ মানে এখানে গুণের অভাব নয়, নির্গুণ মানে সত্ত্ব, রজো আর তমো এই তিনটে গুণের পারে যিনি। সংস্কৃতে অধম শব্দের ব্যাখ্যা আরও মজার। অধম মানে *ন ধমতি শব্দ বিষয়ো ভবতি*, যেটাকে

মাপা যায় না, যে জিনিস শব্দের বিষয় হয় না। তার মানে যাঁকে মুখ দিয়ে বলা যায় না, ঠাকুর যেমন বলছেন, ব্রহ্ম কি বস্তু মুখ দিয়ে বলা যায় না, শ্রুতিও বলছেন, *অবাঙমনসোগোচরম্*, তাঁকে মন বিষয় করতে পারে না, মন যাকে বিষয় করতে পারে না, বাক্য তাঁর ব্যাপারে কী বলবে! ধম মানে যে জিনিসকে শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তার বিপরীতে অধম মানে যেটার ব্যাপারে শব্দের ব্যবহার করা যায় না, সেইজন্য ঈশ্বর হলেন অধম। রাবণ বলছে, আমি যে তোমাকে এভাবে তুলে নিয়ে এসেছি কিন্তু এখনও তিনি তোমাকে নিতে এলেন না। কারণ মায়াতে তাঁর মন থাকে না। আর বলছে –

ইদানীমপি নায়াতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ।
নিঃসত্ত্বো নির্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্।৫/২/২৮
নরাধমং তদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ভামিনি।
ত্বয্যতীব সমাসক্তং মাং ভজস্বাসুরোত্তমম্।৫/২/২৯

শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভক্তিহীন, কারণ তোমার প্রতি তাঁর প্রেম নেই, প্রেম নেই তাই তোমাকে নিতে আসবে কি করতে! তাঁর আবার কি কি বৈশিষ্ট্য? *নিঃসত্ত্বো নির্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্*, *নিঃসত্ত্বঃ* মানে বুদ্ধি নেই, *নির্মমঃ*, মমতা নেই অর্থাৎ নিষ্ঠুর, *মানী* মানে সে অহঙ্কারী, *মূঢ়ঃ*, শ্রীরামচন্দ্র মুর্খ কিন্তু *পণ্ডিতমানবান্*, নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন। এগুলোকেই আবার অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করলে তখন *নিঃসত্ত্বঃ* এর অর্থ হবে তিনি বুদ্ধির পারে। বাংলায় নির্মম মানে কঠোর কিন্তু সন্ন্যাসে নির্মম খুব উচ্চ ভাবার্থক, নির্মম মানে যাঁর মধ্যে মমতার অভাব অর্থাৎ আমি ও আমার এই ভাব যার মধ্যে নেই। মানীর অর্থ করছেন অমানীর অর্থে, যাঁর মধ্যে নিজের কোন ভাব নেই, অহংতা আর মমতা দুটো শূন্য। *মূঢ়ঃ* মানে মুর্খ, কিন্তু সংস্কৃতে সন্ধি ও ব্যাকরণের অন্যান্য নিয়ম লাগিয়ে এর অর্থ দাঁড়ায় ম+উঃ+উঢ়ঃ, ম বলা হয় ব্রহ্মাকে, উ বলে শিবকে আর *উঢ়ঃ* মানে ধ্যানের বিষয়, *মূঢ়ঃ* শব্দের অর্থ তখন দাঁড়ায় ব্রহ্মা ও শিবের যিনি ধ্যানের বিষয়, মানে নারায়ণ। নারায়ণের একটা নাম *মূঢ়ঃ*। আর *পণ্ডিতমানবান্*, নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। এর অন্য অর্থ হল, পণ্ডিতরা যাঁকে মানেন। রাবণ সীতাকে এরপর বলছে, হে ভামিনি! এ হল নরাধম আর *তদ্বিমুখং* তোমার থেকে বিমুখ। নরাধমকে বলছেন নর অর্থাৎ মানুষ যাঁর থেকে অধম তিনিই নরাধম। সন্ধি আর সমাসের নিয়মে অর্থটা পাল্টে যাচ্ছে। সমাসের নিয়ম দিয়ে বলছেন *নরা অধমা যস্মাদ্*। মানুষ একমাত্র ভগবানের থেকে অধম। বিমুখীকে বলছেন, ভগবান সব সময় মায়া থেকে বিমুখ থাকেন। শ্রীরামচন্দ্রের এত সব বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করার পরে রাবণ বলছে, আমি তো তোমাকে ভালোবাসি। বাল্মীকি রামায়ণে এই জিনিসটাকে অনেক সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেখানে রাবণ যা যা বলছে সীতা রাবণকে ঠিক একই কথা দিয়ে জবাব দিচ্ছেন, কিন্তু সীতার কাছে গিয়ে শব্দগুলোর আলাদা আলাদা অর্থ হয়ে যাচ্ছে। রাবণ যেটা নিন্দার ছলে বলছে সেই একই কথা সীতা বলছেন প্রশংসার ছলে। বাল্মীকির পাণ্ডিত্য, কবিত্ব অত্যন্ত উচ্চমানের। রাবণ শেষে বলছে, তুমি যদি আমাকে স্বীকার করে নাও তাহলে যত গন্ধর্ব, কিন্নর, দেবতারা আছেন সবাই তোমার আদেশ পালন করবে। এই কথা শোনার পর সীতা মনে খুব কষ্ট পেয়ে চুপচাপ অধোমুখে বসে দাঁতের মধ্যে একটা ঘাসের টুকরো নিয়ে কাটতে লাগলেন। কারণ পর পুরুষের সামনে কখন মেয়েদের মুখ খুলতে নেই।

ঐ ঘাসের টুকরো দাঁতের মধ্যে রেখেই সীতা তখন সক্রোধে বলতে লাগলেন, তোমার পরাক্রম আমার জানা আছে, তুমি নিজেই শ্রীরামকে ভয় পাও, তোমার দম নেই যে শ্রীরামের সামনে দাঁড়াবে যার জন্য আমাকে অপহরণ করার সময় তুমি ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করে শ্রীরামের অবর্তমানে কুটিরে এসেছিলে। যেভাবে কুকুর কোন যজ্ঞশালা থেকে হবি চুরি করে নিয়ে যায়, কারণ কুকুর কখন যজ্ঞের হবি নিয়ে যেতে পারে না, কারণ কুকুর অতি অস্পৃশ্য জিনিস আর হবি অত্যন্ত পবিত্র জিনিস, কিন্তু যজ্ঞশালায় কেউ নেই পবিত্র জিনিসকে নিয়ে পালিয়ে গেল, তুমিও ঠিক সেই রকম করে আমাকে অপহরণ করেছ। রাম যখন তোমাকে বাণ মেরে বিদীর্ণ করে শমনসদনে পাঠাবেন তখন বুঝতে পারবে রাম কেমন মানুষ। তুমি এটা জেনে রেখো, তোমাকে বধ করার জন্য রাম লক্ষ্মণ সহ বাণ দিয়ে সমুদ্র শোষণ করে দেবে, দরকার হলে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করে এখানে এসে তোমাকে নিশ্চয় বধ করবেন। সীতার বাক্যবাণে রাবণ আরও রেগে গেছে, রেগে গিয়ে খড়্গ বার করেছে, এক্ষুণি সে সীতাকে কেটে দেবে। খড়্গ বার করতেই মন্দোদরী রাবণকে বলছেন –

মন্দোদরী নিবার্য্যহি পতিং পতিহিতে রতা।

ত্যজৈনাং মানুষীং দীনাং দুঃখিতাং কৃপাণাং কৃশাম্।৫/২/৩৮
দেবগন্ধর্বনাগানাং বধ্বঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ।
ত্বামেব বরয়ন্ত্যচ্চৈনর্দমত্তবিলোচনাঃ।৫/২/৩৯

মন্দোদরী সব সময় তার পতির হিতে রতা। মন্দোদরী তখন বলছে, হে স্বামী! আপনি দীনা দুঃখিতা কাতরা এবং কৃশা এই মানুষীকে ত্যাগ করুন। আপনার কিসের অভাব আছে বলুন, দেব, গন্ধর্ব, নাগকুলের রমণীরা মদমত্তনয়না, রূপসী বরাঙ্গনারা আপনাকেই বিশেষ রূপে প্রার্থনা করে, এত রূপসীদের ছেড়ে কেন একটা সামান্যা মানুষীর জন্য আপনি এত কাতর হচ্ছেন! এর আগে আমরা যেমন বললাম এইসব কাহিনীর যেমন আধ্যাত্মিক দিক আছে, তার সাথে এর আবার একটা মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে দেখা যায় যখন পুরুষের পৌরুষে ঘা পড়ে তখন তার থেকেও অনেক নিকৃষ্ট মেয়ের দিকেও যদি তার মন চলে যায়, ওখান থেকে তার মনকে আর সরানো যায় না। বাল্মীকি রামায়ণে মনস্তাত্ত্বিক এই ব্যাপারগুলো খুব সুন্দর দেখানো হয়েছে। কোন কারণে মন একটা জায়গায় গিয়ে যদি আসক্ত হয়ে যায়, যদি তার শক্তিশালী মন হয় তাহলে ওখান থেকে আর মন সরবে না। আর রাবণের নিজস্ব একটা যুক্তি আছে, এই জঙ্গল আমার রাজ্যের এলাকার মধ্যে, এর যা কিছু আমার। এরপর যত বিঘ্ন আসছে রাবণের ফোঁসফোসানি তত বাড়ছে। রাবণ আর সেখান থেকে পিছিয়ে আসতেও পারবে না, সম্ভবই না। এতটা এগিয়ে গেছে আর সে পিছোতে পারবে না। যদি পিছিয়ে যায় ওর পৌরুষত্ব চুরমার হয়ে যাবে। সেইজন্য বলা হয়, যে কাজ করতে যাওয়া হচ্ছে শুরুতেই সাবধান থাকতে হয়। কিছু কিছু পরিস্থিতি আছে যেখানে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে সেটাকে ছাড়তে পারবে না। রাবণের ভুল প্রথমেই হয়ে গিয়েছিল, এরপর সীতাকে নিয়ে আসার পর রাবণের কাছে আর কোন বিকল্প নেই। বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিতে দেখলে, খুব সাধারণ মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে এরপর একটাই উপায় ছিল, সীতাকে ফেরত দিয়ে দাও আর নিজের গলায় দড়ি দিয়ে দাও বা সমুদ্রে গিয়ে ডুবে মরে যাও। এ ছাড়া রাবণের আর কোন বিকল্প রাস্তা নেই, আর সে রাজ্য করতে পারবে না। শক্তিমান যদি একবার পিছিয়ে যায় তার কাছে মৃত্যু ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, গীতাতেও বলছেন *সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে*, সম্মানিত পুরুষ যদি একবার পিছিয়ে যায় এর থেকে তার মরে যাওয়া অনেক ভালো। রাবণের কাছে একটাই পথ খোলা, যদি লঙ্কাকে বাঁচাতে হয় তাহলে সীতাকে ফেরত দিয়ে দাও আর তুমি সমুদ্রে ডুবে মরে যাও।

রাবণ তখন যত রাক্ষসীরা সীতাকে পাহারা দিচ্ছিল তাদের সবাইকে বলে দিল, আমি দু মাস সময় দিলাম তোমরা সীতাকে ভয় দেখিয়েই হোক, ভালোবাসা দিয়েই হোক ওর মনকে তৈরী করে দাও যাতে সীতা আমার প্রতি অভিলাষিণী হয়ে আমার বশীভূতা হয় আর তা নাহলে দু মাস পরে ওকে কেটে পাঠিয়ে দেবে ওর মাংস রান্না করে আমি প্রাতঃভোজ সমাধান করব। এইসব বলে রাবণ তার স্ত্রীদের নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেল। আর এদিকে রাক্ষসীগুলো সীতাকে বোঝাতে শুরু করেছে, তুমি কী করছ! তোমার এত সৌভাগ্য যে রাবণের মত শক্তিমান, ঐশ্বর্যবান পুরুষ তোমাকে চাইছেন, তুমি সব সুখ, ঐশ্বর্য ভোগ করতে পারবে, তুমি শ্রীরামের কথা ভুলে যাও।

রাক্ষসীরা সবাই যখন সীতাকে বিভিন্ন রকম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে ভয় দেখাচ্ছে তখন ত্রিজটা নামে এক বৃদ্ধা রাক্ষসী এগিয়ে এসে রাক্ষসীদের নিষেধ করছে, এই রকম তোমরা করতে যেও না। আমি এক্ষুণি স্বপ্ন দেখেছি, রাম আর লক্ষ্মণ সাদা হাতির পিঠে চেপে আসছেন। আর লঙ্কা নগরীকে ভস্মীভূত করে দিয়েছেন। তার সাথে দেখছি, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে মেরে সীতাকে নিজের কোলে বসিয়ে রেখেছেন। রাবণকে দেখলাম তিনি গলায় মুণ্ডমালা পরে, গায়ে তেল লাগিয়ে উলঙ্গ হয়ে নিজের পুত্রপৌত্রদের নিয়ে গোবরের কুণ্ডে ডুবে যাচ্ছেন। আর বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের পাশে বসে আছেন। ত্রিজটা এই স্বপ্নের অর্থ বলছে, রাবণ মারা যাবে, শ্রীরামচন্দ্র জয়ী হবেন আর বিভীষণকে রাজত্ব দান করবেন। এই রকম হতে যাচ্ছে সেইজন্য তোমরা এসব করতে যেও না, তোমরা খুব সাবধানে থাক। ত্রিজটার স্বপ্নের বিবরণ শুনে রাক্ষসীরাই এবার ভয় পেতে শুরু করল। অন্য দিকে সীতা ভয়ে বিহ্বল হয়ে আছে, অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলছেন, রাক্ষসরা প্রাতঃকালে তো আমাকে নিশ্চয়ই ভোজন করে নেবে, এখন কিভাবে মরতে হবে কে জানে! এইসব ভাবতে ভাবতে সীতা বলছেন –

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোহষিমধ্যতঃ।৫/৩/১

আমার তো বাঁচার আর কোন পথ নেই। তাহলে আমি নিজেই এই দেহকে নাশ করে দিই। কিন্তু কিভাবে নাশ করা যেতে পারে? *উদ্বন্ধনেন*, গলায় ফাঁসি দিয়ে মরে যাব, এটাই আমার কাছে একমাত্র পথ। রাম বিনা এই রাক্ষসদের মধ্যে আমার জীবন রেখে কি লাভ? কিভাবে ফাঁসি দেব? দড়ি কোথায় পাবে? তখন বলছেন আমার যে লম্বা বেণী এটাকেই আমার দড়ি বানিয়ে নেব। সীতা যখন বলছেন আমার লম্বা বেণীকে দড়ি বানিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাব তখন হনুমান, যিনি শিশুবৃক্ষের ডালে পাতার আড়লে বসে বসে সব কিছু দেখছিলেন, সংক্ষেপে খুব সুন্দর ভাবে রামকথা বলতে শুরু করেছেন। হনুমান এতদিন শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে থেকেছেন, শ্রীরাম আর লক্ষ্মণের কাছে তিনি তাঁদের সব কথা শুনেছেন। সেটাই হনুমান সংক্ষেপে বলছেন।

বাল্মীকি রামায়ণে এই জায়গাতে যে বর্ণনা করা হয়েছে, এক কথায় দুর্ধর্ষ। বাল্মীকি রামায়ণে হনুমান ভাবছেন, আমি যদি সংস্কৃত ভাষায় বলি সীতা ঘাবড়ে যেতে পারেন, বানর সংস্কৃত ভাষায় কেন বলছে, আমাকে রাক্ষসদেরই কেউ মনে করতে পারেন। অযোধ্যা নগরী আর তার পার্শ্ববতী অঞ্চলে যে স্থানীয় ভাষা প্রচলন ছিল তার নাম ছিল অবধী ভাষা। হনুমান অবধী ভাষার উল্লেখ করছেন না, না করে বলছেন অযোধ্যার যে স্থানীয় ভাষা আমি সেই ভাষাতেই বলতে শুরু করব। মহাবীর হনুমান কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁকে আবার বানর জাতির বলা! হনুমান ছিলেন ভাষাবিদ, নিজের স্বজাতিদের ভাষা জানতেন, সংস্কৃত তো জানতেনই কারণ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, এ বেদ অধ্যয়ণ করেছে, বেদ অধ্যয়ণ না করলে এত শুদ্ধ সংস্কৃত সে বলতেই পারবে না। আরও বড় ব্যাপার হল, অবধী ভাষা কত দূরের এক স্থানীয় ভাষা সেই স্থানীয় লোকেদের ভাষাও হনুমান জানতেন। বাল্মীকি রামায়ণে আছে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের বর্ণনা করছেন। একজন পুরুষের আদর্শ দেহ কেমন হতে পারে, কোন কোন অঙ্গ উন্নত হবে, কোন কোন অঙ্গ নীচু থাকবে বাল্মীকি একেবারে নিখুঁত ভাবে হনুমানের মুখ দিয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন। সীতা দিনে রাতে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখেছেন, তিনি এতটুকু বুঝতে পারছেন যে, যে শ্রীরামের ব্যাপারে এত নিখুঁত বর্ণনা দিচ্ছে সে নিশ্চয়ই শ্রীরামের ব্যাপারে জানে, শ্রীরামচন্দ্রকে না জানা থাকলে কারুর পক্ষে এমন নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা কখনই সম্ভব নয়। রামচরিতের মাধ্যমে হনুমান খুব সংক্ষেপে অবধী ভাষায় শ্রীরামের কীর্তি আর শ্রীরামচন্দ্রে গুণের কথা গান করে করে বলে যাচ্ছেন। সীতা হনুমানের গান শুনে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত, তিনি প্রচণ্ড বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, ভাবছেন আকাশে এমনিই কোন শব্দ ধ্বণিত হচ্ছে, নাকি বায়ু এই শব্দ উচ্চারিত করছে। সীতার মনে হচ্ছে, এখানে এই রকম বর্ণনা আমি কি করে শুনছি, এটা কি আমি সত্যিই শুনছি, নাকি নিদ্রায় স্বপ্নে শুনছি, নাকি ভুলবশতঃ কিছু শুনছি?

কোন জিনিসকে জানার জন্য পাঁচটি পদ্ধতি আছে, যোগশাস্ত্রে এই পাঁচটিকে বলছেন, প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। সীতার এখানে স্মৃতির কোন প্রশ্ন নেই কারণ তিনি শ্রবণ করছেন, বস্তুশূন্য যেমন আকাশকুসুম, এখানে সেটাও হবে না, বাকি তিনটেকে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে, এই তিনটেরই সম্ভাবনা থাকছে। প্রমাণ মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যাচ্ছে, তা নাহলে বিপর্যয় অর্থাৎ ভ্রম হতে পারে আর তা নাহলে নিদ্রা বা স্বপ্ন দেখছি নাতো। এই তিনটের মধ্যে কোন একটা হবে। সীতা তখন ভাবছেন, নিদ্রা তো আমার হয়ই না। সর্বদা এমনই আতঙ্ক লেগে আছে যে সীতার চোখে ঘুম নেই, সেইজন্য স্বপ্ন হওয়ারও প্রশ্নই নেই। সীতা তখন বলছেন, আমি তো সাক্ষাৎ দেখেছি, স্বপ্ন কি করে হবে! তাহলে জ্ঞান তিন রকমের হয়। আমরা যদি কোন জিনিসকে দেখে থাকি তাহলে হয় আমি সেটা স্বপ্নে দেখছি, নয়তো ভ্রম দেখছি আর তা নাহলে সত্য। সীতা একটা দুটো কথা শোনেননি, পর পর অনেকগুলো কথাই শুনেছেন। তখন সীতা স্বর একটু উঁচু করে বলছেন –

যে মে কর্ণপীযুষং বচনং সমুদীরিতম্।
স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাণী মমাগ্রতঃ।৫/৩/১৮

যিনি এই শ্রবণের জন্য অমৃতময়ী কথাগুলো বলেছেন, আমি প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমার সামনে এসে উপস্থিত হন। সব দিক দিয়েই কথাগুলো খুব প্রামাণ্য, একদিকে অযোধ্যার ভাষায় কথা বলছেন, তারপর শ্রীরামের জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত পুরো কাহিনী সংক্ষেপ বলে গেলেন, সুগ্রীবের সাথে মিলন, বালী বধ সব কিছুর বর্ণনা করে দিলেন। আর শ্রীরামচন্দ্রের শরীরের নিখুঁত বর্ণনা, যেটা শ্রীরামচন্দ্রের খুব কাছ থেকে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা না করলে কখনই জানা যাবে না। সীতার এই কথা শোনার পর হনুমান ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে এসেছেন।

কলবিঙ্কপ্রামানাঙ্গো রক্তাসাঃ পীতবানরঃ।

ননাম শনকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ।২০

কলবিঙ্ক চাতক জাতীয় ছোট পাখি। চাতক পাখির মত একটা ছোট্ট বানর ধীরে ধীরে সীতার সামনে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন, তার বদন রক্তবর্ণ আর গায়ের রঙ হলুদ। সীতা বানর দেখে ঘাবড়ে গেছেন, আবার তাঁর মনে শঙ্কা জেগেছে, আমাকে মোহিত করবার জন্য মায়াবলে বানর রূপ ধারণ করে রাবণ এসেছে কিনা। এইসব ভেবে সীতা মুখ হেঁট করে চুপ করে বসে রইলেন। ইংরাজীতে একটা খুব নামকরা কথা আছে A man on the run takes help but does not depend on anyone, ভীত মানুষ কারুর সাহায্য নিতে পারে কিন্তু ভরসা করতে পারে না। একজন লোক হয়ত প্রচুর কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, প্রচুর আঘাতে জীবনটা জর্জরিত হয়ে আছে, আমি যদি এগিয়ে গিয়ে তাকে বলি, আপনাকে আমার ভালো লাগে আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই, লোকটি মনে মনে ভাববে নিশ্চয়ই কোন ধান্দা আছে। কারণ এখন পর্যন্ত তার কাছ থেকে সবাই লুট করে গেছে, সবাই কাজ আদায় করে গেছে, সে কাউকেই এখন আর ভরসা করতে পারবে না। মানুষ যখন ভীত থাকে, দুঃখে থাকে, মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে থাকে তখন সে কাউকেই বিশ্বাস করবে না, ভরসা করবে না, কথায় কথায় চটে যাবে। তার কাছে জগতটা এই রকমই। এমনকি পশুপাখিদের মধ্যেও, পোষা যদি হয়ে যায় তখন ওকে যা দেওয়া হবে সব নিয়ে নেবে, কিন্তু নতুন নিয়ে আসার পর নিতে চাইবে না, কারণ নতুন জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে, ভয়ে এখন ছটফট করছে। সীতাও এখন ভয়ে আছেন, মনের মধ্যে সন্তাপ আছে, বেদনা আছে, কাউকেই ভরসা করতে পারছেন না, সম্পূর্ণ ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে আছেন। সব দিক দিয়ে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলেও সীতার মনে হবে কিছু গোলমাল আছে। কারণ ঐ অবস্থায় অভিনিবেশ থেকে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা প্রচণ্ড বলীয়ান হয়ে যায়। ছোট্ট একটা বানর, কোথা থেকে কিভাবে লঙ্কা নগরীতে এসেছে কে জানে, এর কী উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে না পেরে সীতা মুখ হেঁট করে বসে আছেন। হনুমান তখন বলছেন –

নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্।
দসোহহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ।৫/৩/২৩

খুব মিষ্টি করে হনুমান বলছেন, মা! আপনি আমার থেকে যে ভয় পাচ্ছেন সে রকম কিছু না, আপনি শঙ্কা ত্যাগ করুন। যিনি কোশলরাজ, যিনি পরমাত্মা আমি সেই শ্রীরামের দাস আর আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী। খুব সংক্ষেপে হনুমান নিজের পরিচয় দিয়ে বলছেন, আমি হলাম বায়ুপুত্র হনুমান। হনুমান এখানে সীতার কাছে তিনটে পরিচয় দিচ্ছেন, নিজের পরিচয় – আমি বায়ুপুত্র হনুমান, status – আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী আর হনুমান যেন on deputation শ্রীরামের কাজে নিযুক্ত, হনুমানকে ধার দেওয়া হয়েছে। রামচন্দ্র দত্ত লাটু মহারাজকে ঠাকুরের কাছে ধার দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষে ঠাকুরের কাছেই থেকে গেলেন। ঠিক তেমন সুগ্রীব হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ধার দিলেন তাঁর কাজ করার জন্য, পরে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রেরই থেকে গেলেন। এই তিনটে পরিচয় দেওয়ার পর এবার সীতা বলছেন, তুমি যে বলছ তুমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস কিন্তু তা কি করে হবে?

বানরাণাং মনুষ্যাণাং সঙ্গতির্ঘটতে কথম্।৫/৩/২৫

তুমি বলছ আমি শ্রীরামের দাস, কিন্তু বানর আর মানুষের সঙ্গ কি করে সম্ভব? এখানে আবার বানর জাতি থেকে বানরে নেমে গেলেন। তখন হনুমান আবার সীতাকে বলতে লাগলেন কিভাবে কিভাবে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে ব্রহ্মচারীর বেশে গিয়েছিলেন, হনুমানের শুদ্ধ ভাব জেনে তিনি কিভাবে সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়েছিলেন, পুরো কাহিনীটাই আবার সংক্ষেপে বলে বলছেন, আমি যখন আপনার খোঁজে আসছিলাম তখন শ্রীরামচন্দ্র আমায় বললেন, তুমি সীতাকে গিয়ে বলবে আমি আর লক্ষ্মণ ভালো আছি। আর তখন –

অঙ্গুরীয়কমেতন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্।
সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মন্নামাক্ষরমুদ্রিতম্।৫/৩/৩৪
ইত্যুক্তা প্রদদৌ মহ্যং করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্।
প্রযত্নেন ময়ানীতং দেবি পশ্যাঙ্গুলীয়কম্।৫/৩/৩৫

তিনি বললেন, সীতা তোমাকে বিশ্বাস করবেন না, সেইজন্য তুমি আমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরীয় নিয়ে যাও, তাহলে জানকী বিশ্বাস করবেন। এই বলে হনুমান আংটিটা বার করে সীতাকে দিলেন। অঙ্গুরীয় দেখে

নেওয়ার পর সীতার আর কোন সন্দেহ থাকল না। সীতা তখন সেই রামনামাঙ্কিত মুদ্রিকা অবলোকন করে আনন্দে মস্তকে ধারণ করলেন আর তাঁর দু চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নিপতিত হতে লাগল। সীতা তখন বলছেন –

কপে মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে।
ভক্তোহসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোহস্তি তবৈব হি।৫/৩/৩৮

এই জায়গায় আবেগ আর উচ্ছ্বাসে ভক্তির এক উচ্চ ভাবের বর্ণনা করা হচ্ছে। শ্রীমায়ের আশেপাশে যে কজন ছিলেন তাঁদেরও ঠিক এই ভাব ছিল। স্বামীজীর ঐ ভাব, যেন মহাবীর হনুমান মায়ের আশীর্বাদে রামকার্যের জন্য এবারে সমুদ্র লাফিয়ে না গিয়ে ওদের তৈরী জাহাজে করে লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। শরৎ মহারাজেরও ঐ ভাব। যাঁরাই মাকে ভালোবাসতেন তাঁদের সবারই এই ভাব ছিল যেটা এখানে বর্ণনা করছেন। *কপে মে প্রাণদাতা*, হে কপি! তুমি আমার প্রাণ দাতা। *ত্বং বুদ্ধিমানসি*, তুমি খুব বুদ্ধিমান আর *রাঘবে ভক্তোহসি প্রিয়কারী ত্বং*, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত আর সত্যিই তাঁর প্রিয়কারীও বটে। *বিশ্বাসোহস্তি তবৈব হি*, নিশ্চয় তিনিও তোমাকে খুব বিশ্বাস করেন। বেলুড় মঠের নিয়মাবলীতে স্বামীজী বলছেন, শিষ্যের যখন গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা থাকে আর গুরুর যখন শিষের প্রতি একান্ত বিশ্বাস থাকে তখন উভয়েরই মঙ্গল হয়। কিন্তু বেশির ভাগ গুরুই শিষ্যকে বিশ্বাস করে না আর বেশির ভাগ শিষ্য গুরুকে শ্রদ্ধা করে না। আর দ্বিতীয় শিষ্য গুরুকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করে কিন্তু গুরু শিষ্যকে বিশ্বাস করে না অথবা গুরু শিষ্যকে বিশ্বাস করে কিন্তু গুরুর প্রতি শিষ্যের সেই শ্রদ্ধা নেই। একটা হল পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা বিশ্বাসটা নেই কিন্তু সম্পর্ক চলছে আরেকটা হল একজনের আছে অপরের নেই। কিন্তু উভয়েরই মঙ্গল তখনই হয় যখন উভয় উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে। শিষ্যের প্রতি গুরুর বিশ্বাস, এ আমার উপদেশ অনুসারে ঠিক ঠিক কার্য করবে এই বিশ্বাস যদি গুরুর থাকে আর গুরুর প্রতি শিষ্যের একান্ত শ্রদ্ধা থাকে তখন দুজনেরই মঙ্গল হয়। স্বামীজী বারবার positive approach আনতে বলছেন, তোমার সন্তানদের কখনই negative কথা বলবে না। রোমা রোঁলা যখন স্বামীজী ও ঠাকুরের ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলেন, everything is positive in Swami Vivekananda। স্বামীজী রেগে যাচ্ছেন, গালাগাল দিচ্ছেন কিন্তু তখনও একটাও negative কথা বলছেন না। স্বামীজী সব লেকচার যদি পড়ার ধৈর্য না থাকে তাহলেও মাঝে মাঝে সবারই ভারতে বিবেকানন্দ, ইংরাজীতে নাম Lectures from Colombo to Alomorah, পড়া উচিত। তখন ভারতের কি শোচনীয় অবস্থা, দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, রোগ-শোক আর তার মধ্যে সারা ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য পুরোদমে চলছে। ১৮৫৭ সালের রিপোর্ট রয়েছে, তারপর চল্লিশ বছরও হয়নি কিন্তু ইংরেজরা এমন জাঁকিয়ে বসে আছে মনে হচ্ছে যেন আর কোন দিন ইংরেজ এই দেশ ছেড়ে যাবে না। পরাধীনতার গ্লানি সমগ্র দেশকে গ্রাস করে রেখেছে। একটা দেশের যা যা negative হতে পারে তার সবটাই তখন ভারতে ছিল। প্রত্যেক স্তরে শুধু শোষণ চলছে, গরীবলোকদের মধ্যবিত্তরা শোষণ করছে, মধ্যবিত্তদের জমিদার শোষণ করছে, জমিদারদের রাজারা, রাজাদের ইংরেজরা। আর ইংরেজরা গরীবদের পোকামাকড়ের মত দেখছে। দেশে তখন কিছু নেই, কোথাও বন্যাতে লোক মরছে, কোথাও অনাবৃষ্টিতে মরছে, পোকামাকড়ের মত জন্মাচ্ছে পোকামাকড়ের মত মরছে। তার সাথে চিরসঙ্গী হল দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কার, রোগ-শোক আর শোষণ। অথচ স্বামীজী বলছেন, এই ভারতবাসী হল রক্তবীজের সন্তান, এক মুঠো ছোলা খেয়ে জগৎ জয় করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্বামীজী ভারতবাসীর মধ্যে দেখছেন, সাপ মরা ব্যাঙ খেয়ে মরছে অথচ সাপের মাথায় মণি, সাপের কাছে কোন খবর নেই।

ভারতে বিবেকানন্দ লেকচারে এটাই দেখাচ্ছেন ভারতবাসী মরা ব্যাঙ খেয়ে মরছে অথচ তার মাথায় আধ্যাত্মিকতার অমূল্য রত্ন। স্বামীজী বলছেন, তোমার পাশ দিয়ে স্বচ্ছ সলিলা পবিত্র গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে আর তোমরা লোকেদের ডোবার নোংরা জল খেতে দিচ্ছ। তোমার ধমনীতে শুদ্ধ বেদান্তের, ধর্মের এত উচ্চমানের জিনিস থাকতে তোমরা এসব কী করে বেড়াচ্ছ! এখনও আমরা স্বামীজীর এই ভাব গ্রহণ করতে পারছি না, যখন গান-বাজনা বেশি হয় তখন প্রথম ধাপ নামল, তারপর এত কথা কাহিনী হতে শুরু হল, ঠাকুরের কৃপার বর্ণনা, মায়ের কৃপার বর্ণনা তারপর আরেক ধাপ নামল, তারপর কদিন পরে ধর্মের আচার বিচারে নেমে যাবে, খিচুরি খাও খিচুরি খিলাও, ওখানেই সব শেষ। যে স্বামীজী শুদ্ধ বেদান্তকে আমাদের জন্য নিয়ে এলেন, be and make নিজে তুমি অনন্তের সাথে এক হও আর অপরকেও টেনে নিয়ে এসো। ভারতের দুর্ভাগ্য, হাজার হাজার বছর অতিক্রম করে সে ঐ দূরবস্থায় পড়েছিল। ঠাকুর স্বামীজী আসার পর এখন অনেক কিছু খুলে গেছে, জিনিসটা অন্য

রকম হয়ে যাচ্ছে। যেখানে ধর্ম আছে সেখানে আবার আচার প্রথা সব ঢুকতে শুরু হয়েছে। মূল কথা ছিল, স্বামীজীর positive outlook আর এমনই positive outlook যে সন্ন্যাসীদের জন্য তিনি যে নিয়মাবলী তৈরী করছেন, সেখানে তিনি বলছেন এর মধ্যে একটাও নেতিবাচক কথা থাকবে না। জহুদি খ্রীশ্চান ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে টেন কমাণ্ডমেন্টসের উপর যেখানে বলে দিচ্ছেন তুমি এটা করবে না, এটা করবে না। কিন্তু স্বামীজী যে নিয়মাবলী তৈরী করলেন সেখানে কোথাও নেতিবাচক কিছু নেই সবটাই ইতিবাচক, তুমি এমনটি করবে, তুমি এমনটি বলবে। একটা নিয়ম করার ছিল এখানে কেউ মদ খাবে না, ভাঙ খাবে না। এটাকে তো লিখতে হবে, কিভাবে লেখা যাবে? তখন অনেক ভেবে চিন্তে লিখলেন এখানে শুধু তামাক সেবন করা চলিবে। তার মানে বাকি সব নেশা করা বন্ধ। এমনই ছিল স্বামীজীর positive outlook যে তিনি লিখতে চাইছেন না যে সন্ন্যাসীরা এমনটি করবে না, এই করবে না। এই যে স্বামীজীর positive outlook, সেখানে স্বামীজী লিখছেন, যেখানে শিষ্যের প্রতি গুরুর একান্ত বিশ্বাস আর গুরুর প্রতি শিষের একান্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সেখানে উভয়েরই মঙ্গল হয়। কারণ গুরুতো সচ্চিদানন্দ নন, ভগবান নন কিন্তু সচ্চিদানন্দ যিনি শ্রীরামচন্দ্র তিনিও হনুমানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখছেন, শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস করছেন অর্জুনকে, শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ বিশ্বাস নরেনের প্রতি, তাঁর আরও লোক আছে। শ্রীরামচন্দ্রের কাছেও আরও অনেকে ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছেও অনেক লোক ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করছেন একজনকে, তুমিই এই কাজ করতে পারবে। সীতা হনুমানকে এটাই এখানে বলছেন –

নো চেন্মৎসন্নিদিশ্চান্যং পুরুষ্য প্রেষয়ৎ কথম্।
হনুমন দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বয়া।৫/৩/৩৯
সর্বং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া।
মাসদ্বয়াবধি প্রাণাঃ স্থাস্যন্তি মম সত্তম্।৫/৩/৪০

তোমার উপর শ্রীরামচন্দ্রের যদি বিশ্বাস না থাকত তাহলে তিনি কখনই পরপুরুষকে আমার কাছে পাঠাতেন না। হে হনুমান! তুমি তো আমার দুরবস্থা নিজের চোখে দেখলে, তুমি গিয়ে শ্রীরামকে বলবে আমার আর দু মাস জীবন, দু মাস পর রাবণ এসে আমাকে বধ করে দেবে। এর মধ্যে যদি কিছু না করা হয় আমি আর বাঁচব না। তিনি যেন সত্বর সুগ্রীব এবং অন্যান্য বানর সেনাপতিদের সাথে এসে যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে বধ করে আমাকে বাঁচান। আর হনুমান তুমি যদি এই রকম কথা গিয়ে বল তাহলে তোমারাও একটা বাচিক পূণ্য হবে। বাচিক পূণ্য মানে, মুখ দিয়ে হরিনাম করলে, শাস্ত্র পাঠ করলে, ভগবানের লীলাকীর্তন করলে তাতে বাচিক পূণ্য হয়। হনুমান তখন বলছেন, আমি যেমন দেখেছি তেমনটিই বলব, আপনার কোন চিন্তা করার কিছু নেই আমরা সবাই এসে রাবণকে বধ করে আপনাকে অযোধ্যায় নিয়ে যাব।

সীতা তখন বলছেন, যদিও তিনি ভগবান, তাঁর সীমা করা যায় না, কিন্তু এত বানর সহ তিনি কিভাবে সমুদ্র লঙ্ঘন করে এখানে আসতে সক্ষম হবেন। হনুমান এখন উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন, সীতাকে দেখে নিয়েছেন এই উদ্দিপনাকে সামলাতে পারছেন না। সাত-আট বয়সের বাচ্চাদের জীবন সব সময় excitement to excitement চলে। বয়স হয়ে যাওয়ার পরেও মানুষের একটু excitement লাগে। হনুমান হলেন পুরো রজোগুণে পরিপূর্ণ। যাদের মধ্যে রজোগুণ বেশি থাকে তাদের excitement একটু লাগে। শ্রীরামচন্দ্র হলেন হনুমানের ইষ্ট, তিনি তাঁকে একটা কাজ দিয়েছেন, সেই কাজটা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সীতার সাথে দেখা হয়ে গেছে, সীতাকে মুদ্রিকাও দিয়ে দিয়েছেন এখন হনুমানের সঙ্কল্প সিদ্ধি হয়ে গেছে। হনুমানের এখন এমন উদ্দিপনা এসে গেছে যে তাঁকে আর থামানো যাচ্ছে না। সীতার কথা শুনে হনুমান বলছেন, কোন অসুবিধা নেই, আমি শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ কাঁধে বসিয়ে নেব, নিয়ে এক ঝাঁপে এখানে চলে আসব। সুগ্রীবরাও সবাই এক ঝাঁপ দিয়ে পেরিয়ে আসবে। আমার যা ক্ষমতা আমি দুজনকে এক সঙ্গে নিয়ে চলে আসতে পারব। হনুমান বলছেন, মা! কিছু একটা চিহ্ন আপনি দিন যাতে শ্রীরামচন্দ্র বুঝতে পারেন আমি আপনার সাথে দেখা করে এসেছি। তখন সীতা একটু ভেবে চিন্তে নিজের চুল থেকে চূড়ামণি খুলে হনুমানের হাতে দিলেন। দেওয়ার পর সীতা বলছেন, শ্রীরামকে আরও বিশ্বাস দেওয়ার জন্য তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি, চিত্রকুট পাহাড়ে যখন আমরা ছিলাম তখন একদিন শ্রীরামচন্দ্র আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত কাকের রূপ ধারণ করে পরীক্ষা নিতে এসেছে শ্রীরামচন্দ্র সত্যিই ভগবান কিনা। কাক এসে আমার পায়ের আংঠাতে বারবার চঞ্চু দিয়ে ঠোকরাচ্ছিল, আমি তখন একটুও বিরক্ত না হয়ে নড়াচড়া করিনি। আংঠা বিদীর্ণ হয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। শ্রীরামচন্দ্র

নিদ্রাভঙ্গের পর আমার অবস্থা দেখে খুব রেগে গেছেন, কে এই দুষ্কর্ম করেছে? দেখলেন একটা কাক এই কাজ করেছেন। তখন তিনি একটা ঘাসের টুকরো নিলেন, নিয়ে সেটাকে মন্ত্র দ্বারা আহ্বাণ করে একটা দিব্যাস্ত্রে রূপান্তরিত করে ঐ কাকের উপর নিক্ষেপ করে দিলেন। কাক এখন ভয়ে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ঐ দিব্যাস্ত্র তাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। এখনকার দিনে যুদ্ধে যুদ্ধবিমানকে ধ্বংস করার নানা রকম মিসাইল থাকে, মিসাইলগুল যুদ্ধবিমানকে ট্র্যাকিং করতে থাকে। তার মধ্যে একটা হয় হীট সিকিং মিসাইল, তাতে মিসাইলের মধ্যে একটা ছোট্ট চিপ লাগানো থাকে। মিসাইলটা যখন যুদ্ধবিমানের দিকে এগিয়ে ওকে সার্চ করতে থাকে তখন দেখে সব থেকে বেশি হীট কোথা থেকে আসছে। সব থেকে বেশি হীট ইঞ্জিন থেকেই আসবে, যেখান থেকে বেশি হীট আসবে সেখানে গিয়ে মিসাইলটা এ্যটাক করবে, ঐ প্লেনকে ও আর বাঁচতে দেবে না। এখানেও দিব্যাস্ত্রে কিছু প্রোগ্রামিং করা ছিল হয়ত। কেউ যখন ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে রক্ষা করতে পারলেন না তখন সে শ্রীরামচন্দ্রের পায়ে এসে পড়েছে। শ্রীরামচন্দ্র তাকে বলছেন, এই দিব্যাস্ত্র অমোঘ এর শক্তি কখনই বিফলে যাবে না। তবে এক কাজ করা যেতে পারে, তোমার একটা চোখকে যদি ছেড়ে দাও তাহলে দিব্যাস্ত্র ঐ চোখটুকু নিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেবে। তখন জয়ন্তের বাম নেত্রের দৃষ্টি চলে গেল। সীতা এটাই বলছেন, যিনি এমন বীর্য্যসম্পন্ন আর আমার প্রতি এমন ভালোবাসা যে একটা কাক তার উপর তিনি দিব্যাস্ত্র চালিয়ে দিলেন আর তিনি আজ আমাকে কেন এভাবে ছেড়ে থাকতে পারছেন? হনুমান শুনে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, মা! আপনার কোন চিন্তা নেই, শ্রীরামচন্দ্র আপনার খবর জানেন না তাই, এবার জানার পর এক্ষুণি এসে সব ভস্মসাৎ করে দেবেন। হনুমানের কথা শুনে সীতা তখন বলছেন, ‘বৎস! দেখছি তোমার দেহ অতি ক্ষুদ্র, বোধ হয় বাকি সব বানর তোমারই মত ক্ষুদ্র হবে, এই ক্ষুদ্র শরীর নিয়ে তোমরা যুদ্ধ করবে কি করে? তখন হনুমান বলছেন, তাহলে এবার আপনি আমার রূপ দেখুন। এই কথা বলার পর হনুমান ধীরে ধীরে বিরাট রূপ ধারণ করলেন। হনুমান চালিশাতেই আছে, সূক্ষ্ম রূপ ধরি সিয়ঁহি দিখাবা বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জরাবা, সীতাকে তিনি সূক্ষ্ম রূপ দেখালেন আর লঙ্কাকে তাঁর বিরাট রূপ দেখিয়ে দিলেন। তখন সীতা বলছেন –

সমর্থোঽসি মহাসত্ত্ব দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্।
রাক্ষস্যস্তে শুভঃ পন্থা গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্।৫/৩/৬৬

তোমার এই বিরাট রূপ দেখে এবার আমার বিশ্বাস হচ্ছে যে তোমরা রাবণকে যুদ্ধে বধ করতে পারবে। যাই হোক, তুমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে যাও তা নাহলে এই রাক্ষসীরা তোমাকে দেখে ফেলবে। তুমি শীঘ্র শ্রীরামের কাছে গমন কর, পথে যেন তোমার কোন বিঘ্ন না হয়। তখন হনুমান বলছেন, মা! আমার এখন খুব খিদে পেয়েছে, সারা রাস্থায় আমি কিছু খাওয়া-দাওয়া করিনি, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে আমার এই উপবাস ভঙ্গ করি। সীতা হনুমানকে তথাস্তু বলে অনুমতি দিলে হনুমান বৃক্ষের সব ফল ভোজন করলেন। অনন্তর জানকীকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন। কিছু দূর আসার হনুমানের মনে একটা ইচ্ছা জেগেছে। এই শ্লোকটাও বাল্মীকি থেকেই এসেছে। বাল্মীকি মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থাকে মাথায় রেখেই লিখেছেন, সেখানে তিনি বলছেন –

হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড

কার্যার্থামাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ।
অন্যৎকিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সঃ।৫/৩/৬৯

এই শ্লোকে সেবক আর সেব্য এই দুজনের মধ্যে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ককে নিয়ে বাল্মীকি বলছেন, বাল্মীকির এই বক্তব্য অধ্যাত্ম রামায়ণও নিচ্ছেন। উত্তম সেবক আগেই বুঝে নেয় তার মালিকের কি দরকার আর সে সেই রকমটি করে রাখে। মধ্যম সেবক হল তাকে আদেশ করার পর সে করে দেয় আর অধম সেবককে আদেশে দিলে সে ভুলভাল করবে অথবা আদৌ করতে চাইবে না। স্বামী তার সেবককে কোন কাজে পাঠিয়েছে, সেই কাজ করে দেওয়ার পর সে এমন কিছু কাজ করে দেয় যেটা মূল কাজের অবিরোধী হবে না তখন সেই কাজ করে দেওয়াটাই মঙ্গল, যারা এ রকমটি করে না তারা অধম।

আকবর আর বীরবলের কাহিনীতে আকবরের স্ত্রী বলছে আমার ভাইকে মন্ত্রী বানাতে হবে। আকবর বলছেন, আমার শালাকে আমি ভালো করেই জানি, বীরবলের সামনে ও দাঁড়াবে না। স্ত্রী বলছে তাহলে একটা পরীক্ষা নেওয়া হোক। আকবরা তাঁর শালাকে ডেকে বললেন, যমুনাতে নৌকা করে মাল এসেছে, তুমি একটু খোঁজ

নিয়ে দেখ তো কি এসেছে। শালা তক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে খবরটা নিয়ে এল, এক বণিক সুতো নিয়ে এসেছে। স্ত্রী বলছে, দেখলেন কিভাবে চটপট সব খবর নিয়ে এল। আকবর তাকে জিজ্ঞেস করল, সুতো কি বিক্রি করার জন্য এনেছে? শালা বলল তাতো জানি না। এরপর আকবর বীরবলকে ডাকালেন, বললেন বীরবল একটু খবর নাও তো যমুনায় নৌকা করে কি মাল এসেছে। বীরবল গেল, গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে নৌকাতে কি এসেছে। বলল সুতো এসেছে। এই সুতো কার? মালিক ওখানেই ছিল, সে বলল আমার। আপনি কিসের জন্য সুতো নিয়ে এসেছেন? বিক্রি করব বলে। আপনার সুতোর দাম কত? এই দাম। আচ্ছা পুরোটা আমিই কিনে নিলাম, টাকাটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফেরার সময় দেখে একজন শেঠ আসছে। কোথায় যাচ্ছেন? মাল কিনতে যাচ্ছি। মাল তো আমার কেনা হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি চাইলে আমি আপনাকে বিক্রি করে দিতে পারি। আমি একশ টাকা রেটে কিনেছি, আপনাকে একশ এক টাকা রেটে বিক্রি করে দিচ্ছি। শেঠ রাজী হয়ে গেল। এক টাকার মার্জিনে বীরবল দশ বারো হাজার টাকা কামিয়ে নিল। শেঠ তাকে পুরো টাকা দিয়ে দিল, বীরবল শেঠকে লাভের টাকাটা রেখে বাকিটা দিয়ে বলে দিল, এই টাকাটা নিয়ে আপনি ওকে দিয়ে পুরো মালটা নিয়ে নিন। বীরবল হাতে করে টাকা নিয়ে এসে বাদশার সামনে দাঁড়িয়েছে। আকবর জিজ্ঞেস করলেন বীরবল ওরা কি নিয়ে এসেছে? সুতো নিয়ে এসেছে। সুতো কি বিক্রি করবে? হ্যাঁ করবে। কাকে করবে? যে কাউকেই বিক্রি করতে পারে। আকবর বললেন, সুতোগুলো কিনে নিলে কেমন হয়? হ্যাঁ জাঁহাপনা আমি কিনে নিয়েছি। কিনে নিয়ে আমি কি করব, ওটাকে তো বিক্রি করতে হবে? জাঁহাপনা আমি বিক্রিও করে দিয়েছি। তা কত লাভ হয়েছে? বারো হাজার টাকা লাভ হয়েছ, এই নিন সেই টাকা। তখন স্ত্রীকে বলছেন দেখলে তোমার ভাই আর বীরবলের মধ্যে কোথায় তফাৎ। তোমার ভাইকে যতটুকু কাজ দিলাম ততটুকুই করেছে। আর বীরবল শুধু কাজই করেনি, এখানে খুব দামী কথা বলছেন *স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ*, স্বামীর অবিরোধী কাজ করে দেয়। সেবককে কাজে পাঠিয়েছে কিন্তু এমন একটা কাজ করে দিল যেটা স্বামীর বিরোধী হয়ে গেল। এগুলোকে নিয়ে নামকরা অনেক ঘটনা আছে।

১৯৩০ বা ১৯৪০এর সময় আমরা বলি বটে যে ইংরেজ সারা ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছিল, কিন্তু পুরো ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা তখনকার দিনে অত সহজ ছিল না। ভারতের তখন যারা সামন্ততান্ত্রিক রাজারা ছিল তাদেরও একটা সম্মান ছিল আর তার এলাকায় তাদেরও একটা বিশেষ ক্ষমতা চলত। ঐ সময় একজন ইংরেজ অফিসার District Collector হয়েছিল, সে নিজেকে খুব upright মনে করত। একবার ওখানকার জমিদার বা রাজা তাকে একটা উপহার পাঠিয়েছিল। সেই সময় উপহার পাঠাবার একটা প্রথা ছিল। সাহেব সবে লণ্ডন থেকে এসেছে, ভাবল আমাকে ঘুষ দিতে চাইছে। সাহেব বাড়ির সুইপারের হাত দিয়ে উপহারটা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে রাজাকে অপমান করার জন্য। পাঠিয়ে দেওয়ার পর তার উপরে যিনি কমিশনার তাঁকে এই খবরটা পাঠিয়েছে। কমিশনার তো খবর পেয়ে রেগে আগুন হয়ে গেছে। তুমি এটা কি করলে! তোমাকে আনা হয়েছে আমার কাজের সুবিধার জন্য আর তুমি একদিনেই আমার এতদিনের সব কাজ পণ্ড করে দিলে! এই রাজা এখন চিরদিনের মত ইংরেজদের শত্রু হয়ে গেল। ইংরেজদের শত্রু মানে সে তো তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে নেমে যাবে না, কিন্তু অনায়াসে নির্বিঘ্নে যে কাজগুলো করে দিচ্ছিলাম সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল। হনুমান বলছেন, যদি অতিরিক্ত কিছু কাজ করে না দেওয়া হয় তাহলে তুমি অধম, কিন্তু অতিরিক্ত কাজ করতে গিয়ে সেটা যেন মূল কাজের অবিরোধী হয়, মূল কাজের বিরোধী না হয়ে যায়। Management related কথা বাল্মীকি রামায়ণে অনেক বেশি এসেছে। বসের সাথে এ্যাসিস্ট্যান্টের কি রিলেশান থাকবে? *কার্যার্থমাগতো দূতঃ*, তোমাকে কাজে পাঠানো হয়েছে, পার তো তার সাথে অতিরিক্ত কিছু করে দাও। কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, স্বামী যেটা বলেছেন সেটার অবিরোধী কাজ যেন হয়। তখন হনুমান চিন্তা করতে লাগলেন তাহলে কি করা যেতে পারে?

অতোহহং কিঞ্চিদন্যচ্চ কৃত্বা দৃষ্ট্বাথ রাবণম্।
সম্ভাষ্য চ ততো রাম-দশনার্থং ব্রজামহ্যম্।৫/৩/৭০

সব থেকে ভালো হয় এত দূর যখন এসেই গেছি তাহলে রাবণের সাথে একবার দেখা করে নিলে কেমন হয়! শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা দুজনের সংযোগের হেতু হল রাবণ, সীতার সাথে দেখা হয়ে গেল, এবার তাহলে রাবণের সাথে একটু কথা বলে নিই। কিন্তু রাবণের কাছে তো এমনি সরাসরি চলে যাওয়া যাবে না। দেখা করার জন্য কি করা যেতে পারে? তখন হনুমান বুদ্ধি খাটিয়ে পরিকল্পনা করলেন, এই যে অশোকবাটিকা আছে, এটা হল রাবণের প্রমোদ কানন, এই বাটিকাকে আমি ধ্বংস করে দিচ্ছি। হনুমান এখন সীতা যে বৃক্ষের মূলে অবস্থান

করছেন সেই বৃক্ষকে বাদ দিয়ে বাটিকার সব বৃক্ষকে উৎপাটিত করতে শুরু করে দিলেন। পুরো দেশে হিন্দুরা যখন মহাবলী বলে তখন সব সময় মহাবলী বলতে হনুমানকেই বোঝায়, ভীমও সেখানে আসবে না। ভীম বলতে অনেক সময় পেটুক অর্থেও বলা হয়। শক্তি বলতে সব সময় হনুমান, মহাবলী। অথচ ভারতবর্ষে অনেক শক্তিধর পুরুষ রয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্রের শক্তি আছে, শ্রীকৃষ্ণের শক্তি আছে, অর্জুনের শক্তি রয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, অরণ্যদেব এইসব আছে কিন্তু আমাদের ধর্মের মধ্যেই ঢুকে আছে মহাবলী হনুমান। আর তাঁকে বায়ুপুত্রের চরিত্র দিচ্ছে, বায়ু মানে প্রাণ, যেখানেই প্রাণন ক্রিয়া চলে সেখানেই হনুমানের শক্তি। সেইজন্য ঐ শক্তির সাথে কেউ কোন দিন তুলনা করতে পারবে না। সেই মহাবলী এখন রাবণের প্রমোদ কাননের সব বৃক্ষকে উপড়ে ফেলে দিয়েছেন। অশোকবাটিকাকে একেবারে বৃক্ষহীন করে দিয়েছেন, এখান শব্দটা বলছেন *নির্বৃক্ষাম্*। তার সাথে ওখানে যে চৈত্য ছিল সেটাকেও ভেঙেচুড়ে রেখে দিলেন। ওখানকার রাক্ষসীরা এই সব দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। তারাও রাক্ষসদের দেখেছে, রাক্ষস একটা জাতি, বর্তমান কালে আমরা একটা বিকটাকার কিম্ভূতাকৃতির ছবি তৈরী করে দিয়েছি, তা কিন্তু নয়। রাক্ষসরাও মানুষের মতই একটা জাতি, মানুষের থেকে শক্তিতে একটু বেশি। রাক্ষসীরা এসে সীতাকে জিজ্ঞেস করছে, এই বানর কে? কারণ ওরা দেখেছে সীতার সাথে বানরের কথা হচ্ছিল। সীতা উত্তর দিচ্ছেন –

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্মিতাম্।
নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোক সমাকুলা।৫/৩/৭৩

সীতা এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন আমি জানি না এ কে। বাল্মীকি রামায়ণে বাল্মীকি খুব সুন্দর ঘুরিয়ে বলাচ্ছেন, সীতা বলছেন, সাপ সাপের গতি জানে, তোমাদের রাক্ষসীদের এটা কী ধরণের মায়া সেটা তোমরাই ভালো বুঝবে। এখানে সরাসরি বলে দিচ্ছেন এটা রাক্ষসদের মায়া কিনা আমার জানা নেই, আমি জানি না এ কে। সত্যিই তিনি তার আগে কিছুই জানতেন না। কেন জানি না? আমি শোক আর দুঃখের মধ্যে ডুবে আছি, ও কে আমি কি করে জানব? রাক্ষসীরা দৌড়ে গিয়ে রাবণকে খবর দিয়েছে। এর পরের কাহিনী সবারই জানা। রাবণকে খবর দেওয়া হয়েছে, একটা বানর, বানর সরাসরি না বলে বলছে *বানরাকৃতিদেহভৃৎ*, বানরের মত আকৃতির শরীর নিয়ে একজন কেউ এখানে প্রবেশ করেছে। তার বিরাট শরীর, এসে প্রথমে সে সীতার সাথে কথাবার্তা বলেছে। কথাবার্তার পর এত বড় অশোকবাটিকাকে তছনছ করে দিয়েছে তার সাথে চৈত্য প্রাসাদকেও ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। বানরটা এখনও ওখানেই আছে। হনুমানের উদ্দেশ্য হল রাবণের মুখোমুখি হওয়া। তার প্রিয় প্রমোদ কাননকে ধ্বংস করে দিয়েছে শুনে রাবণ রাক্ষসদের পাঠালো বানরকে ধরে নিয়ে আসার জন্য। হনুমানজীও সঙ্গে সঙ্গে সব রাক্ষসগুলোকে মেরে শেষ করে দিলেন। এখানে বলছেন –

ততঃ উত্থায় হনুমান মুদ্গরেণ সমন্ততঃ।
নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যূথপঃ।৫/৩/৮১

হাতি যেমন মশাকে পিষে দেয় মহাবীর হনুমান ঠিক সেইভাবে মুদ্গর প্রহারে সমস্ত রাক্ষসকে চূর্ণ করে দিলেন। যেমন যেমন খবর আসছে রাক্ষস মারা যাচ্ছে, তেমন তেমন পর পর রাবণ রাক্ষস, রাক্ষস সেনা পাঠাতে থাকলেন। সবাই হনুমানের হাতে মারা যাচ্ছে। তখন রাবণ তার এক সন্তান অক্ষকে পাঠালেন। অক্ষ আসছে দেখতে পেয়ে হনুমান তখন গদা নিয়ে আকাশে উঠে এক লাফ দিয়ে অক্ষের মাথায় গদা দিয়ে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। রাবণের কাছে খবর গেছে, পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণ খুব রেগে গেছে। তখন মেঘনাদকে পাঠালো। ইন্দ্রজিৎ ছিল বিরাট বড় যোদ্ধা তার সাথে তার সব রকমের গুণ ছিল। রামায়ণাদিতে মেঘনাদকে নিয়ে খুব কম বর্ণনা আছে, কিন্তু খুব ট্র্যাজিক চরিত্র। তার কারণ, মেঘনাদের প্রচুর ক্ষমতা ছিল, যখন নিজের ক্ষমতা দেখাচ্ছে তখন সে স্বর্গলোক আক্রমণ করে ইন্দ্রকেই বেঁধে নিয়েছিল, সেইজন্য তার একটা নামই হল ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু আসল যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণের সাথে ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে পারল না। আর নিজেও যখন বুঝতে পারছে বাবা ভুল করছে তখনও একবারের জন্য সে মুখ খোলেনি, তিনি আমার বাবা, এর বাইরে আমি আর কিছু জানি না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত শুধু মেঘনাদকে নিয়েই মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করলেন। মেঘনাদ সব দিক দিয়েই খুব উচ্চমানের ব্যাক্তিত্ব, যেমন সে বড় যোদ্ধা, বীর, তেমনি তার চরিত্র, তেমনই তার ব্যক্তিত্ব। অভিমন্যু যেমন কম বয়সে মারা গেল, ঠিক তেমনি মেঘনাদও খুব কম বয়সে মারা গেল, তাও নিজের

দোষে নয় বাবার দোষে। যার জন্য রাবণের রাক্ষস বংশ থেকে নাম একমাত্র মেঘনাদেরই আসে, বিভীষণের নাম খুব কম আসে। বিভীষণ এত বড় ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভীষণ বলতে বোঝায় ঘরশত্রু। হিন্দীতে একটা প্রবাদই আছে ঘরে যদি দুশমন হয়ে যায় সেই ঘর লঙ্কা হয়ে যাবে। রাবণের বংশ থেকে মেঘনাদের নামটাই সব থেকে প্রসিদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পরের দিকে মেঘনাদকে নিয়ে অনেক মিথস্ তৈরী হয়েছে, মেঘনাদকে মারা যাবে না, মেঘনাদের আবার এই ক্ষমতা যে, চৌদ্দ বছর যে কোন স্ত্রীর মুখ দেখেনি একমাত্র সেই মেঘনাদকে মারতে পারবে ইত্যাদি। মেঘনাদ তো সবাইকেই মেরে শুয়েই দিয়েছিল, বিশেষ করে লক্ষ্মণকে তো দাঁড়াতেই দেয়নি, হনুমানকে এমন কাবু করে ফেলেছিল যে তাঁকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। চৌদ্দ বছর কোন স্ত্রীর মুখ দেখেনি সেই একমাত্র মেঘনাদকে মারতে পারবে, লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর কোন নারীর মুখ দেখিনি। সীতা চৌদ্দ বছর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন কিন্তু লক্ষ্মণ বলছে আজ পর্যন্ত আমি সীতার মুখ দেখিনি। তখন বলা হল লক্ষ্মণই একমাত্র বধ করতে পারবে, শ্রীরামচন্দ্রও পারবেন না। এগুলো মিথ্, এগুলোকে খুব আক্ষরিক অর্থে নিতে নেই। এখানেই বুঝতে হয়, শাস্ত্রের কোন জায়গাটা বাদ দিতে হয় আর কোন জায়গাটা নিতে হয়। আমাদের যত শাস্ত্র আছে এমনকি বেদেও অর্থবাদ রাখা হয়েছে। অর্থবাদ হল গ্রন্থের স্তুতি। শাস্ত্র কোন জায়গাতে মূল কথা বলছেন আর কোন জায়গাতে অর্থবাদ করছেন বোঝা যায় না। বেদ মানেই পুরো অর্থবাদ, উপনিষদেও অর্থবাদ রয়েছে। যোগশাস্ত্রে এসে সমস্যা হয়ে যায়, কোনটা যে এর অর্থবাদ আর কোনটা যে আসল আলাদা করা খুব মুশকিল হয়ে যায়। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি লাগাতে গেলে গোলমাল লেগে যাবে। হিন্দুদের দুটি শাস্ত্রে অর্থবাদ নেই, প্রথমটা হল গীতা, গীতাতে কোন অর্থবাদ নেই, গীতা পাঠ করলে তোমার এই হবে সেই হবে কিছু নেই। আধ্যাত্মিকতা কি দেয়? একমাত্র আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের বাইরে আর কোন কিছু হয় না। আর দ্বিতীয় হল ঠাকুরের কথামৃত, কোন অর্থবাদ নেই, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে কি হয়? মানুষ সুখী হয়। কেন সুখী হয়? অন্য কোন কিছুই তাকে ছুঁতে পারে না। গীতায় যেমন বলছেন *যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ*, যখন আত্মজ্ঞান হয়ে যায় তখন এত আনন্দ হয় যে বাকি সব কিছু তার কাছে তুচ্ছ বলে মনে হয়। ঠাকুর এটাই বলছেন, যে মিছরির শরবৎ খেয়েছে তার আর চিটে গুড়ের পানা ভালো লাগে না। এ্যাপলো-১১কে চাঁদে নিয়ে গিয়েছিলেন অলভিন্ অল্ড্রিন্। পরে উনি একটা বই লিখেছিলেন, সেই বইতে তিনি লিখছেন, চাঁদের মাটি থেকে আকাশে যখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছি, সে যা দৃশ্য আর পুরো দৃশ্যটা এত উচ্চমানের যে, ঐ দেখার পর এখানে আর কিছু ভালো লাগে না। তাঁর জীবনটাও পরে সত্যিই গোলমেলে হয়ে গেল, কারণ তাঁর তো আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল না। দু তিন বার ডিভোর্স হয়ে গেল, মদের মধ্যে ডুবে থাকতেন, উনি শুধু বলতেন আমার কিছুই ভালো লাগে না। এই জিনিসের অভিজ্ঞতা আমাদেরও অনেকেরই হয়, কোন জিনিসের একটা উচ্চমানের আস্বাদ পেয়ে গেলে অন্য কিছু আর ভালো লাগে না। নিজেকে অনেক কিছুর সাথে মানিয়ে থাকতে পারে কিন্তু তার ভালো আর কিছুতেই লাগবে না। অর্থবাদ জিনিসটা এই জায়গাতে বাড়ানো হয়েছে বা অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে জিনিসটাকে বাড়িয়ে বলছে। এই জিনিসগুলিকে যদি বুঝে নেওয়া যায় তাহলে তার নিজের আত্মোন্নতির পক্ষে বিরাটা সুবিধা হয়। পড়ার সময় সবটাই পড়তে হবে, লোকেদের বলার সময় সবটাই বলবে, কিন্তু তাকে জানতে হবে, মূল হল এটা আর এটা তার বাহ্যিক আবরণ। এটা জানা থাকলে নিজের জীবনে আর কোন গোলমাল হবে না।

ইন্দ্রজিৎ মহা শক্তিমান, সে এসে হনুমানকে প্রচুর বাণ চালাতে শুরু করেছে। হনুমান উল্টে তার রথ ভেঙে দিচ্ছে। মেঘনাদ সঙ্গে সঙ্গে অন্য রথে উঠে বাণ চালিয়ে হনুমানকে অস্থির করে তুলছে। কিন্তু কিছুতেই হনুমানকে বাগে না আনতে পেরে শেষে মেঘনাদ ঠিক করল –

শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বদ্ধা বানরপুঙ্গবম্।
নিনায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ।৫/৩/৯৭

এই বানরকে ব্রহ্মপাশ দিয়ে আবদ্ধ করে নিতে হবে। মেঘনাদ তখন হনুমানের প্রতি ব্রহ্মপাশ চালিয়ে দিয়েছে। পাশ মানে মন্ত্রসিদ্ধ দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়িতে যেমন অনেক রকমের গিট্ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন কিছু গিট্ আছে একটা টান মারলে খুলে যায়। বিশেষ করে পর্বতারোহীদের দড়ির অনেক রকম গিট শিখতে হয়। ফায়ার ব্রিগেডেও অনেক রকম দড়ির গিট্ ব্যবহার করা হয়। সেটাকেই দেখে এনারা হয়ত পাশ জিনিসটা নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও অনেক রকম পাশের কথা আছে। পাশ মানেই হল, শত্রুকে দড়ির ফাঁস দিয়ে বেঁধে ফেলা। অধ্যাত্ম রামায়ণে বলবেন, ব্রহ্মা হনুমানকে বর দিয়েছিলেন যে আমার কোন অস্ত্র তা ব্রহ্মাস্ত্রই হোক আর

ব্রহ্মপাশই হোক হনুমানের উপর কাজ করবে না। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে খুব মজার ব্যাপার, সেখানে বলছেন দিব্য জিনিসের সাথে যদি জাগতিক কোন কিছু লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন ঐ জিনিসের দিব্য শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে। বাল্মীকি এই জিনিসটা কোন অর্থে, কেন বলেছেন আমাদের জানা নেই। যেমন একটা কথা আমরা শুনি, গুরুকে মানুষ জ্ঞান করতে নেই, এখানেও তাই দিব্য যেটা তার মধ্যে জাগতিক জিনিস লাগিয়ে দিলে দিব্যত্বের ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন বলা হয় প্রসাদে লোভ করতে নেই, প্রসাদ জিনিসটা একটা দিব্য জিনিস, এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে, সেই জিনিসে যখন লোভ করছে তখন জাগতিক বুদ্ধি লাগিয়ে দিল, তখন প্রসাদের মাহাত্ম্য আর থাকবে না, প্রসাদ খেলে বলে ঈশ্বরে ভক্তি হয়, কিন্তু এত লোক প্রসাদ খেয়ে যাচ্ছে তাও ভক্তি হচ্ছে না, তার মানে কোথাও তাদের প্রসাদে লোভ এসে যাচ্ছে। এই জিনিসটাকেই বাল্মীকি সামনে নিয়ে এসেছেন, যেখানেই আধ্যাত্মিক ব্যাপার থাকবে, কখনই সেখানে জাগতিক কিছু লাগাতে নেই। জাগতিক জিনিস লাগালে ওর আধ্যাত্মিক শক্তিটা চলে যায়।

বাইরে বড় বড় আশ্রমে দেখা যায় প্রসাদ বেরিয়ে আসার পর ভালো ভালো মিষ্টি, ফল যা আছে সেগুলোকে বেছে বেছে বিশেষ লোকেদের জন্য রেখে দেয়। বেলুড় মঠে এসবের কোন ঝামেলাই নেই, এখানে একটা ভাণ্ডারের ঘর আছে, সেখানে সব প্রসাদ আসে, ওখানে একজন সন্ন্যাসী দায়ীত্বে থাকেন। তিনি সেখানে বসে বসে চাঙাড়ি গুলোতে কয়েকটা ফল, একটা কি দুটো মিষ্টি random ভরে চলে যাবেন। সেগুলো আবার ঠিক করা আছে কার কার কাছে যাবে। এখানে কোন বাছবিচার নেই। অন্যান্য জায়গায় প্রিয়জন যারা তাদেরকে এক রকম প্রসাদ দেবে, আর সাধারণ ভক্তদের জন্য ঢালাও। বারোয়ারী পূজাতেও একই দৃশ্য। নিজে আগে ঠিক করুক, সে প্রসাদ পেতে গেছে নাকি খাবার খেতে গেছে। বেলুড় মঠে এমন দৃশ্যও দেখা গেছে, এ এন রায় ছিলেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। উনি নিয়মিত মঠে আসতেন তিনি আবার জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর ক্লাশমেট ছিলেন। দুদিক থেকে তিনি ভিভিআইপি, একদিকে তিনি রিটায়ার্ড চীফ জাস্টিস আবার অন্য দিকে মঠের জেনারেল সেক্রেটারীর ক্লাশমেট। উনি কিন্তু চিরদিন বেলুড় মঠে লাইনে দাঁড়িয়ে হাতে করে খিচুরি প্রসাদ নিতেন। ওনাকে দেখে সাধুরা দৌড়ে আসতেন, আপনি সুপ্রীম কোর্টের চীফ জাস্টিস, আপনি এখানে দাঁড়াবেন না, ভেতরে চলুন। উনি নির্বিকার, না না, কোন দরকার নেই আমি প্রসাদ পেতে এসেছি। উনি লাইনে দাঁড়িয়েই সবার সাথে প্রসাদ নেবেন। সাধুদের কোন special treatment নিতেন না, আমি মন্দিরে এসেছি, ঠাকুরের কাছে এসেছি, কিসের special treatment। আমার এখন একটাই পরিচয়, আমি ঠাকুরের ভক্ত, ভক্ত মানে সব সমান। আধ্যাত্মিক জিনিসে জাগতিক বুদ্ধি লাগিয়ে দিলে কোন ফল দেবে না।

এই ভাবকে বাল্মীকি তাঁর লেখনীতে ফুটিয়েছেন, ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে ব্রহ্মপাশ দিয়ে বেঁধে ফেলেছে দেখে সব রাক্ষস আনন্দে লাফাতে শুরু করেছে। রাক্ষসদের ভেতর এখন জোশ এসে গেছে, অতিরিক্ত উৎসাহে তখন ওখানে যত লতা ছিল সেগুলোকে দিয়েও হনুমানকে বেঁধে দিয়েছে। যখন লতা দিয়ে বেঁধে ফেলল তখন ইন্দ্রজিৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, সব নিষ্ফল হয়ে গেল। কারণ ব্রহ্মপাশ দিয়ে বাঁধার পর সেটার উপর যদি আলাদা দড়ি বা লতা দিয়ে দেওয়া হয়, ব্রহ্মপাশের শক্তি ওখানেই শেষ। অনেকে মনে করতে পারে, এটা একটা সুন্দর কাহিনী, আইনের ফাঁক, কিন্তু একেবারেই তা নয়। এখানে দেখানো হচ্ছে আধ্যাত্মিক জিনিসে যেমনি জাগতিক জিনিস নিয়ে আসা হল তখন কিভাবে তার আধ্যাত্মিক ভাবটাই নাশ হয়ে যায়। ঠাকুর খুব মজা করে বলছেন, একজন জমিদার খুব বিরাট করে দুর্গাপূজা করত, পরে আর করে না। কি ব্যাপার? সব দাঁত পড়ে গেছে পাঠার মাংস খেতে পারি না তাই বন্ধ করে দিয়েছি। দুর্গাপূজা জাগতিক হয়ে গেছে, এই পূজার আর কোন দাম থাকল না। যাই হোক, হনুমানকে বেঁধে এবার রাবণের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তখন খুব সুন্দর বলছেন –

রাবণের রাজদরবারে হনুমান

যস্য নাম সততং জপন্তি যেহজ্ঞানকর্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।
সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং যান্তি কোটিরবিভাসুরং শিবম্।৯৮
তস্যৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা হৃৎপদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।
সদৈব নির্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ কিং তস্য পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ।৯৯

অজ্ঞানকর্মকৃতবন্ধনং, এর আগেও এই জিনিসটাকে অনেকবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা কোথা থেকে এসেছি, কিভাবে এসেছি, কেন এসেছি এই প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর নেই। বেদান্ত বলছে, যিনি শুদ্ধ চৈতন্য, একটা খুব রহস্যজনক ভাবে তাঁর উপর একটা অজ্ঞানের আবরণ এসে যায়, ঐ আবরণের জন্য তিনি নিজের স্বরূপকে ভুলে যান। স্বরূপকে ভুলে যেতে তাঁর মনে হতে থাকে আমি যেন অপূর্ণ। তিনি তখন পূর্ণ হতে চান। এই পূর্ণ হতে চাওয়াকে বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে। সব ধর্মই কোন না কোন ভাবে অদ্বৈত ভাবের কথা বলে ফেলে। যখন বলছে ঈশ্বরের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে, যদিও ওনারা এই শব্দটা আনছেন না, ব্যাখ্যা করছেন না, কারণ সেই ট্র্যাডিশানটা নেই। কিন্তু অদ্বৈত ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। তাদের খুব সহজ যুক্তি হল, ভগবান যখন সৃষ্টি করছেন তখন তার আগে কি আছে? এখানেই বারবার সমস্যা হয়, আমরা বলছি ভগবান তিনিই আছেন, কিন্তু মন যেটাই বলবে সেটাই নেই। এটাই তো অদ্বৈত হয়ে গেল। কিন্তু যেমনি সৃষ্টি এসে গেল তখনই দ্বৈত এসে গেল। এই জিনিসগুলোকে আচার্য শঙ্কর খুব স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বিভিন্ন ধর্ম এটাকেই বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করে। পার্সিদের ধর্মে এটাকে উপস্থাপিত করা হয় পাপ আর পূণ্য দিয়ে, একটা বিভাজন হয়ে যাচ্ছে। একটা পাপ পথ যাচ্ছে আরেকটা পূণ্য পথ যাচ্ছে। শাক্ত মতেও একই জিনিস পুরুষ আর নারী বা শিব আর শক্তি রূপে বিভাজিত হয়ে যান। যিনি অনন্ত, অখণ্ড তিনি যখন বিভাজিত হয়ে যান তখন শিব আর শক্তি রূপেই বিভাজিত হন। শিব আর শক্তি নারী আর পুরুষ নন, শিব আর শক্তি হল চৈতন্য আর ক্রিয়াশক্তি। চিতি শক্তি আর ক্রিয়াশক্তি এই দুটোতে বিভাজন হয়। এর কাছাকাছি আসে চীনের ধর্মে সেখানে Yang আর Yin এই দুটোতে বিভাজন হয়ে যায়। এই বিভাজন থেকে সেই আদি অবস্থায় অর্থাৎ একত্বে ফিরে যাওয়াটাই সমস্ত সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। ঘড়ির পেণ্ডুলামের স্থিতি হয় যখন থেমে যায়, ওকে যদি একটু তুলে নেওয়া হয় সেই জায়গাটা তার স্থিতি, অথচ সেখানে তার potential energy maximum থাকে, ছেড়ে দিলে বুম্ করে যে জায়াগাতে তার স্থিতি সেই জায়গাটাকে পার করে অন্য দিকে চলে যায়। যে জায়গাতে সে rest পায় সেই জায়গাতে তার maximum motion রয়েছে। যে জায়গাতে maximum motion রয়েছে সেই জায়গাটা তার restএর জায়গা। আমাদের জীবনেও ঠিক তাই হয়, যে জায়গাতে আমরা rest পাই, মানে সংসার জীবন, ওটাই অশান্তির মূল। আর যে জায়গাটা শান্তির মূল সেখান থেকে প্রাণপনে পালায়। পেণ্ডুলামও শেষ পর্যন্ত থেমে যায়। কোথায় থেমে যায়? যেটা তার বাস্তবিক অবস্থা। আমরা যখন প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, চিতি শক্তি ক্রিয়াশক্তির কথা বলছি, শিব আর শক্তির কথা বলছি, Yang আর Yin এর কথা বলছে, সবটাই হল সেই সংগ্রাম নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা। সেইজন্য ওনারা বলেন, যে এক সেই একেকে দুইয়ে খণ্ড করে দিল, তাতেই পুরুষ আর নারীর সৃষ্টি। সেখান থেকে মজা করে বলে সেইজন্য পুরুষ আর নারী সব সময় এক হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মূল হল ওটাই, নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে কার্যকর করার জন্য যতক্ষণ সচেতন প্রচেষ্টা না হবে ততক্ষণ সংসার চলতে থাকবে। যখন সচেতন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল তখন তার সাধনা শুরু হয়ে গেল। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছে গেল তখনই সিদ্ধি হয়ে গেল।

এই বিভাজনটা কেন হচ্ছে? বলছেন *অজ্ঞানকর্মকৃতবন্ধনং*। কিন্তু অজ্ঞানের কি কারণ তার কোন উত্তর নেই। আমরা বলি তাঁর ইচ্ছাতে হয়, তাঁর লীলা, যাই বলা হোক উত্তর কারুর কাছেই নেই। আমাদের কাছেও নেই সেইজন্য আমরা বলছি অজ্ঞান। আমরাও জানি না এটা কি আর যিনি করেছেন সেই জায়গাটায় অজ্ঞানের এমন একটা পর্দা আছে আমরা জানি না। কিন্তু তার পরিণামটা আমরা জানি। কি পরিণাম? এই সংসার, এই বন্ধন, পাপ-পূণ্য, শোক-মোহ, দুঃখ, কান্না, আনন্দ, হাসি সব হয়ে চলেছে। অনাদিকাল থেকে এই বন্ধন চলে আসছে। তার যদি মিলন হয়ে যায়, পরম অবস্থায় চলে যায় তখন আর কিসের কান্না, কিসের দুঃখ! প্রশ্নই উঠছে না। যিনি তাঁর নাম সতত করে যাচ্ছেন, সদা সর্বদা রাম রাম জপ করে যাঁর সব বন্ধন কেটে যাচ্ছে, সেখানে ব্রহ্মপাশ তাঁকে কি বাঁধবে! এটাই গ্রন্থস্তুতি। ঠাকুর বলছেন গঙ্গাস্নান করলে সব পাপ পালিয়ে যায় কিন্তু চোখের কানাটা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মপাশ এমনি সাধারণ কোন দড়ি নয়, আধ্যাত্মিক ব্যাপার, দৈবীশক্তির ব্যাপার। কিন্তু যিনি ভগবানের নামের মধ্যে সদা মগ্ন তাঁর কাছে আর কিসের ব্রহ্মপাশ। এই জিনিস সত্যিকারের হয়, এই জিনিসটাকেই খুব সুন্দর চিত্রন করা হয়েছে প্রহ্লাদের জীবনীতে। প্রহ্লাদকে মারার জন্য তার বাবা সাপের বন্ধনে ফেলে দিয়েছেন কিন্তু যাঁর নাম নিলে ভববন্ধন ছুটে যায় সেখানে নাগপাশ কি করবে! প্রহ্লাদকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিল, যে বিরাটের সাথে এক হয়ে গেছে, পাথরে তার কি হবে! পাথরটাই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সমুদ্রের মধ্যে প্রহ্লাদকে

ডুবিয়ে দেওয়া হল, ভগবান হলেন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, প্রহ্লাদ সেখানে ভেসে ফেরত চলে এল। এগুলো অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি। দেখাচ্ছেন তাঁর নাম করতে থাকলে এই জিনিসগুলো হয়ে যায়। হনুমান সদা রাম নাম জপ করছেন, হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্মের ধ্যান করে যাচ্ছেন, তিনি তো সমস্ত বন্ধন থেকে এমনিতেই মুক্ত, সেখানে ব্রহ্মপাশ বা অন্য কোন নতুন বন্ধন তাঁকে কি করে আর কিসের বন্ধনে ফেলবে!

পুরো রামায়ণে হনুমানের যা বর্ণনা আমরা পাই তাতে তাঁর অন্য যা কিছু থাকুক sense of humour একেবারেই ছিল না, শুধু হুঙ্কার আছে কিন্তু কোন humour নেই। অল্প একটু humour শুধু এই জায়গাতেই আছে। হনুমানকে রাবণের কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু তিনি হাবভাবে দেখাচ্ছেন যেন কত ভয় পেয়ে আছেন। হনুমান এতক্ষণ প্রমোদ কাননে উৎপাত মাচিয়ে দিয়েছিলেন, এখনও চাইলে তিনি সব বন্ধন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তিনি ভয় পাওয়ার অভিনয় করছেন। রাক্ষসরা অন্য দিকে ভাবছে মেঘনাদ এমন মার মেরেছে ব্যাটা এখন জব্দ হয়ে গেছে। হনুমান এখন বন্ধনে পড়ে আছেন আর সব রাক্ষসরা মিলে কেউ ঘুষি মারছে, কেউ লেজ ধরে টানছে, কেউ চড় মারছে। তখন বলছেন –

ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমত্রিসঙ্গমং কৃত্বা গতং ব্রহ্মবরেণ সত্বরম্।
জ্ঞাত্বা হনুমানপি ফল্গুরজ্জুভির্ধৃতো যযৌ কার্য্যাবিশেষগৌরবাৎ।৫/৪/২

হনুমান ভালো করেই জানেন ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মপাশ তাঁকে স্পর্শও করতে পারবে না, হনুমান ইচ্ছে করলেই ব্রহ্মপাশ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাঁকে একটা কার্য সম্পাদন করতে হবে, সেইজন্য ভাণ করে আছেন যেন তিনি বন্ধনে পড়ে আছেন। ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বেঁধে রাবণের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে বলছে, এই দেখুন একে ধরে নিয়ে এসেছি। রাবণ রাজসভায় বসে আছে, মন্ত্রী প্রহস্তও বসে আছে। রাবণ প্রহস্তকে বলছে, প্রহস্ত! ওকে জিজ্ঞেস কর তো ও কোথা থেকে এসেছে, এখানে কি প্রয়োজনে এসেছে? আমার সমস্ত বন কেন উন্মূলিত করে দিয়েছে? রাজা কিংবা কোন উচ্চ ক্ষমতার বা খুব সংস্কৃতবান লোক কখন সরাসরি অজানা অচেনা লোকের সাথে কথা বলবে না। কারণ লোকটি অপমান সূচক কথা বলে দিতে পারে, অনেক রকম ব্যাপার হয়ে যেতে পারে। সরাসরি কখনই কথা বলা উচিত নয়। সরাসরি কথা বলার অধিকার দুজনেরই আছে, শিশু আর পরমহংস। শিশু সরাসরি ছাড়া কিছু জানে না। এর মাঝারি যারা তাদের কারুরই সাথে সরাসরি কথা বলতে নেই। একজন বাড়িতে চা খেতে এসেছে, তারপর খোস গল্প শুরু করে দিয়েছে, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, চাইছেন লোকটি বিদায় হোক। আমরা কখনই বলি না আপনি এবার চলে যান, বলি, আপনি আবার আসবেন। আবার আসবেন বলা মানে এবার আপনি দয়া করে আসুন। যদি সরাসরি বলে দেয় চা খাওয়া হয়ে গেছে এবার চলুন, এটাই অভদ্রতার পরিচয় হয়ে যাবে। সংস্কৃতি মনোভাবা মানুষ কখনই এভাবে বলবে না, সবটাই মিষ্টি করে ঘুরিয়ে বলবে। পিঠ পেছনে কারুর সম্বন্ধে বলাটা নিন্দনীয়। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি যা বলার তার মুখের উপরই বলে দিই, এটাই তখন ঔদ্ধত প্রকাশ হয়ে যায়। মুখের উপর যে বলে সে হল ঔদ্ধত। আমরা প্রায়শই বলি, আড়ালে কেন বলছেন যা বলার সামনে বলতে পারছেন না! কি করে সামনে বলবে কারণ পিছুনি বৃত্তি থেকে আরও বাজে হল ঔদ্ধত। যারা পিছুনি বৃত্তি করে তারা তাও সামনে এসে যাবে কিন্তু যারা ঔদ্ধত তাদেরকে তো সামনে আসতে দেওয়া যায় না। মজা করে, ইয়ার্কির ছলেও কাউকে কটু কথা বলতে নেই। মজা করে কথা বলা যায় একমাত্র নিজের ঘনিষ্ঠদের সাথে, সবার সাথে নয়। ইংরেজদের সময় একজন অফিসার একটা ম্যানুয়াল তৈরী করেছিলেন, তাতে ইয়ং যারা আইসিএস অফিসার হবে তারা কি রকম ব্যবহার করবে বলা হয়েছে। তার মধ্যে একটা ছিল, Reserve your humour for your closed friends, do not express it in your files। তোমার sense of humourকে কখন ফাইলের উপর চালাবে না। আমি দেশকে ভালোবাসি এটাকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা যাবে না। যে ভাষায় এত প্রেমের গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেখানে একটা simple expression নেই, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি দেশকে ভালোবাসি এই বাক্যকে সংস্কৃতে অনুবাদ করা যাবে না। সংস্কৃত হল indirect language, সংস্কৃতে directness নেই। সংস্কৃতে সব সময় indirectly বলা হয়। সংস্কৃতে active voiceএর কোন দাম নেই passive voiceএর গুরুত্ব রয়েছে। কারণ active voiceএর sign হল crudeness। আগেকার দিনে হিন্দী সিনেমায় সেনসর বোর্ড অনেক কিছু সেনসর করত, যা বোঝাবার সরাসরি না দেখিয়ে আকার ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দাও। এখন জমানা পাল্টে যাচ্ছে, সব খুলে দিচ্ছে, সব direct হয়ে যাচ্ছে, সব কিছুও তাই গোল্লায় যাচ্ছে।

রাবণ এখানে প্রশ্নটা করছেন indirectly, প্রহস্তকে বলছেন, তুমি একে জিজ্ঞেস কর। তাই বলে সব সময় থার্ড পারসনকে নিয়ে এসে কথা বলতে হবে? কেন তা হবে। আপনিই বলছেন, কিন্তু তা কখন সরাসরি যেন না হয় আর রূঢ় যেন না হয়। প্রহস্ত তখন জিজ্ঞেস করছে। এরপর মহাবীর হনুমান বলতে শুরু করলেন। হনুমান পরিষ্কার রাবণকেই উদ্দেশ্য করে বলছেন। হে রাবণ তুমি সুস্পষ্ট ভাবে শোন আমি কি বলছি, কুকুর যেমন যজ্ঞের জন্য রাখা পবিত্র হবিকে নিয়ে পালিয়ে যায়, ঠিক তেমনি তুমি সীতাকে অপহরণ করেছ। হনুমান খুব সংক্ষেপে বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন, তাঁকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বানিয়েছেন আর তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি দূত রূপে সীতাকে অন্বেষণ করতে এখানে এসেছি, আর এখানে এসে আমি সীতার খবর পেয়ে গেছি। আমার কাজ হয়ে গেছে আর আমার বানর স্বভাবের জন্য তোমার বনকে তছনছ করে দিয়েছি। আর আপনি তো জানেন দেহধারী মাত্রেই তাদের কাছে এই শরীর অত্যন্ত প্রিয় সেইজন্য আপনার রাক্ষসরা যখন মারতে এসেছে তখন দেখছি আমার শরীর এখন বিপদে পড়ে গেছে তাই আমি এদের মেরে উড়িয়ে দিয়েছি। আরেকটা কথা আপনাকে বলছি, মেঘনাদ আমাকে যে ব্রহ্মপাশ দিয়ে বেঁধে নিয়ে এসেছে সেই ব্রহ্মপাশ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলাম তাই এই ব্রহ্মপাশকে আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে এখানে এসেছি। এরপর হনুমান অনেক কথা বলছেন যেখানে তিনি রাবণকে বোঝাতে চাইছেন তুমি যা করছ ভুল করছ।

কেউ যখন দেখে একজন এমন কিছু ভুল কাজ করছে যাতে তার জীবন সংশয় হয়ে যাচ্ছে, শুধু তার নিজের জীবনই নয় আরও অনেকের জীবন সংশয়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে, সে তখন গিয়ে তাকে সাবধান করার চেষ্টা করে, যাতে তার ক্ষতি না হয়ে যায়। মহাবীর হনুমান এখন রাবণের জন্য ঠিক এই জিনিসটাই করছেন।

বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ।৫/৪/১৫

হে রাবণ তুমি এই সংসারের গতিকে একবার বিচার করে দেখ। অনেক সন্ন্যাসীদের দেখা যায়, শরীরে কোন রোগ হওয়াতে ডাক্তারের কাছে যেতে পরীক্ষাদি করে ধরা পড়ল তাঁর পেটে ক্যানসার। উনি এমনিতেই হাসিখুশি এরপর আরও হাসিখুশি হয়ে যান। সবাই জানে যে উনি আর বেশি দিন নেই। আর চলেও গেলেন, কিন্তু তিনি জানছেন আমার তো আর বেশি দিন নেই তাতেও তিনি হাসছেন, মজা করছেন, আনন্দ করছেন। আমরাও সবাই জানি জীবন মানে কটা দিনের খেলা। কিন্তু আমাদের এমনই মায়ার আবরণ যে এই জিনিসটা ভাবি না যে আমি তো আর বেশি দিন নেই। ছ মাস আর পঞ্চাশ বছরে কি এমন আর তফাৎ, বিরাট কিছু তফাৎ নেই। এটাই মায়া। দু মিনিটের জন্যও যদি নিজের কথা ভাবি, আমি তো আর কটা দিনই আছি, মনটা একটু অন্য রকম অবশ্যই হয়। কিন্তু এই অন্য রকম হওয়াটা স্থির থাকে না। যারা অনেক দিন ধরে শাস্ত্রের কথা শুনে যাচ্ছে তাদের নিশ্চয়ই চেতনার স্তর উন্নত হয়েছে, প্রথম প্রথম শাস্ত্রের কথা শুনলেও চেতনার স্তরটা আসতে শুরু হয়। তাদেরকে যদি বিচার করতে বলা হয়, তারাও বিচার করতে গিয়ে দেখে সত্যিই তো সংসারে কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু শাস্ত্রের কথা শোনার দু মিনিট পরেই বাইরে বেরিয়ে যেতেই আবার সেই আগের ভাব তাকে ঘিরে নেবে। এটাই আশ্চর্যের, এর থেকে বেশি আশ্চর্যের কিছু জগতে নেই। যুধিষ্ঠিরকে যক্ষ প্রশ্ন করছেন *কিমাশ্চর্যম্*, জগতে আশ্চর্য কি? উত্তরে বলছেন, মানুষ রোজ দেখছে লোক মরছে কিন্তু তাও সে ভেবে যাচ্ছে আমি মরব না। ওরা না হয় সাধারণ লোক, ওদের কথা ছেড়ে দিন, যাদের চেতনার স্তরের বিন্যাস হয়ে গেছে তাদের কথা নিয়ে আসুন, সাধু-সন্ন্যাসীদের কথাই নিয়ে আসুন, তাঁদেরও এই বিচার স্থির থাকে না। যাদের এখনও বয়স কম তাদের বলা যায় এগুলো বিচার কর কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বয়স হয়ে যাওয়ার পর বিচারেরও কিছু থাকে না। কিন্তু এটাই আশ্চর্য, এটাই মায়া, কাউকেই স্থির হতে দেবে না।

হনুমান এটাই রাবণকে বলছেন *বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং*। কি বিচার করতে বলছেন? *ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ*, রাবণ! তুমি যে আসুরিক বুদ্ধি, রাক্ষসী বুদ্ধি নিয়েছ এই বুদ্ধিকে তুমি ছাড়। গীতাতে ভগবান আসুরিক বুদ্ধির বিরাট আলোচনা করেছেন। সেখানে ভগবান দুটি বুদ্ধির কথা বলছেন, দৈবী বুদ্ধি আর আসুরিক বুদ্ধি, যাকে পাপ ও পূণ্য বলা হয়। আসুরিক বুদ্ধিতে ধর্মও যদি ঠিক থাকে তাতেও এই ভাব সব সময় থাকবে *ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্*, আমি এটাকে পেয়েছি এবার এটাকেও পেতে হবে। আচার্য শঙ্কর এর ভাষ্য দিতে গিয়ে খুব সুন্দর বলছেন, আরে আমি কত বড় বড়কে শেষ করে দিলাম আর এরা যারা আছে এরা

পৃথিবীতে ভার স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে, এদেরকে তো তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেব। দৈবী আর আসুরিক এই দুটো শক্তির মধ্যে মানুষের মধ্যে সাধারণ ভাবে আসুরিক শক্তিটাই থাকে। ভগবান সেইজন্য অর্জুনকে বলছেন, *মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডবঃ*, যাই হোক তুমি কিন্তু চিন্তা করো না অর্জুন, তোমার মধ্যে দৈবী গুণই আছে। অর্জুনের মধ্যে এত শক্তি, এত দিব্যাস্ত্রের তিনি অধিকারী কিন্তু তাঁর মধ্যে এই ভাবটা নেই যে, আমি জগৎ জয় করে নেব, অপরের সম্পত্তি নিয়ে নেব। কিন্তু অপরের সম্পত্তি ঐশ্বর্য দেখে, অপরের উৎকর্ষ, অপরের ভালো আমাদের সবারই মনের মধ্যে এই ভাব আসে আহা আমারও যদি এই রকম হত। এগুলোই আসুরিক ভাব। এই ভাবটাই প্রবল হয়ে আরও নীচের দিকে যখন চলে যায় তখন সেটাই রাক্ষসী ভাব হয়ে যায়। রাক্ষসী ভাব কিন্তু হয় না, গীতাতে আসুরিক ভাবকে নিয়ে বলছেন। রাক্ষসী ভাবে হিংস্রতা, বলপ্রয়োগের মাত্রাটা আরও বেড়ে যায়। মহাবীর হনুমান এটাই বলতে চাইছেন, তুমি যেটা করছ এটা রাক্ষসী বৃত্তি, অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করা সেটাকে আবার নিজের শক্তি ক্ষমতা দিয়ে ধরে রাখা, এটাই রাক্ষসী বৃত্তির লক্ষণ, এই জিনিস করতে যেও না।

হনুমান রাবণকে বোঝাতে চাইছেন, যে বুদ্ধি মানুষকে শুভের দিকে, মুক্তির দিকে নিয়ে যায় সেই বুদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর। মূল্যবোধ সব সময়ই দু রকমের হয়, সামাজিক মূল্যবোধ আর ব্যষ্টি মূল্যবোধ। এই দুটো মূল্যবোধকে একসাথে চালানো যায় না, চালাতে গেলে সমস্যা হয়ে যায়। যেমন আমাদের ভারতবর্ষ, এখানে ব্যষ্টি মূল্যবোধ খুব উচ্চস্তরের। ভারতের মানুষ সাধারণ ভাবেই চেষ্টা করে সত্যপরায়ণ হওয়ার, অহিংস হওয়ার। ভারতবর্ষের এটাই বিশেষত্ব যে, ভারত কোন দিন কোন প্রতিবেশী দেশকে, পাশে এত ছোট্ট একটা দেশ শ্রীলঙ্কা, তাকেও কোন দিন জয় করতে যায়নি। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, সন্ন্যাসীদের ধর্ম যখন সমাজে এসে যায় তখন সমাজের দুরবস্থা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের এটাই দুর্ভাগ্য, ভারতের কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো সন্ন্যাসীদের ধর্ম। চীন, পাকিস্থান ভারতে এত সমস্যা করছে, কেন করতে পারছে? একমাত্র সন্ন্যাসীরাই বলেন, আমি ভালো আমাকে কেন কেউ ক্ষতি করতে আসবে! আমি কোন দিন পাপ করিনি আমার কেন কষ্ট হবে! সন্ন্যাসীরাই এই রকম কথা বলেন, গৃহস্থদের এই ধরণের কথা বলা তো দূরে চিন্তাতেও আসতে দেওয়া উচিৎ নয়। আর দেশ কখনই এভাবে চলবে না। যদি বলে আমরা তো কাউকে আক্রমণ করিনি, আমাকে কেন অন্য দেশ আক্রমণ করবে! তখন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলতেই পারে, তাহলে আমি আক্রমণ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যষ্টি স্তরে এই রকম ভাবতে পারে, একটা সুরক্ষিত সমাজ ভাবতে পারে। সেইজন্য প্রথম দিনেই ভারতবর্ষ একটা উৎসর্গীকৃত বর্ণই তৈরী করে দিয়েছিল, যারা শুধু ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য, দেশ ও সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য লড়াই করবে, এরাই হল ক্ষত্রিয় যাদের কাজই হল যুদ্ধ করা। বাকি যারা, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এরা যেন অহিংসায় থাকে। ক্ষত্রিয়রাও হিংসা করবে না, প্রতিরক্ষা করবে। এটাই ভারতবর্ষের মূল ভাব। যখন কেউ সত্য অহিংসা এগুলোকে জীবনে গ্রহণ করে নিল তখন তারা দৈবী পথ নিয়ে নিল। এই দৈবী পথ মানুষকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়। আর যে ক্ষমতায় স্ফীত হয়ে বলে এবার এর সব কিছু কেড়ে নিতে হবে, তখন সে আসুরিক পথ নিয়ে নিল। এই আসুরিক পথ যখন চরম মাত্রায় চলে যায় তখন সেটাই হয়ে যায় রাক্ষসী বৃত্তি। রাবণকে হনুমান বলছেন, তুমি রাক্ষসী বৃত্তি ত্যাগ কর। ঠাকুরও যে কথাগুলো বলছেন, গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সব জায়গায় ঐ একই কথা বলা হয়, তোমার মধ্যে যে আসুরিক বৃত্তি আছে সেই বৃত্তি থেকে বেরিয়ে এসো। আর রাক্ষসী বৃত্তি যদি থাকে এই বৃত্তিকে তো অবশ্যই সমূলে নাশ করে দিতে হবে। রাক্ষসী বৃত্তি এখানে আমাদের কারুরই মধ্যে নেই, রাক্ষসী বৃত্তি থাকলে এখানে শাস্ত্রের কথা শুনতেই আসত না, কিন্তু আসুরিক বৃত্তি অল্প বিস্তর সবারই মধ্যে আছে। কিন্তু যে জিনিস মানুষকে ঠিক ঠিক মানুষ করে তোলে, বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে নিয়ে যায়, সেটা হল দৈবী পথ। সব জায়গায় এই দৈবী পথকেই আশ্রয় করতে বলা হয়।

সপ্তর্ষি মণ্ডলে সাত জন্য ঋষির মধ্যে পুলস্ত্য ঋষি ছিলেন। পুলস্ত্য ঋষি ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র আর পুলস্ত্য ঋষির পুত্র ছিলেন বিস্যস্রবা। বিস্যস্রবার স্ত্রীকে নিয়ে পরে পরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে তাঁর তিনটি সন্তান, রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণের জন্ম হয়। বাল্মীকিও খুব স্পষ্ট করে বলেননি আর যা হয়ে থাকে, পরে পরে অনেকেই অনেক রকম কাহিনী বানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সৃষ্টিতে ব্রহ্মা ছাড়া কোন সৃষ্টি নেই। পরের ধাপে যা সৃষ্টি আসছে, সাপ, বিছে যত রকম যোনি সেটাও ঋষি থেকে এসেছে। কারণ সৃষ্টি মানেই দৈবী শক্তি। রাবণকে এটাই হনুমান স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তুমি যদি দেহবুদ্ধি নাও, দেহবুদ্ধি নিলেও তো তুমি সেই উচ্চবংশের, তোমার পিতা বিস্রবা ঋষি, তাঁর পিতা পুলস্ত্য সপ্তর্ষি মণ্ডলের একজন ঋষি, পুলস্ত্যের পিতা

হলেন ব্রহ্মা। যদি কাউকে ভালো কিছু মনে করিয়ে ভুল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হয় তখন তাকে সব সময় এটাই বলতে হয়, একবার তুমি ভেবে দেখ তুমি নিজে কোন বংশের, উচ্চবংশের শোণিত ধারা তোমার ধমণীতে প্রবাহিত হচ্ছে, তুমি উচ্চবর্ণের লোক হয়ে কি করে এই ভুল কাজ করতে যাচ্ছ! আমাদের দুটো বুদ্ধি চলে, একটা আত্মবুদ্ধি আরেকটা দেহবুদ্ধি। হনুমান সেটাই বলছেন, যদি তুমি দেহবুদ্ধিও নাও তাহলে তুমি তো ঋষি বংশের, রাক্ষসী বৃত্তি তুমি কেন নিচ্ছ? আর যদি আত্মবুদ্ধি নাও তাহলে তো প্রশ্নই উঠছে না। যদি কেউ নিজেকে নির্বিকার আত্মা রূপে দেখে তখন সেখানে কোন কার্যই হবে না। অহঙ্কারের সঙ্গে নিজেকে যখন জুড়ে দেয় তখনই মানুষ কাজ করে, শুদ্ধাত্মা কখনই কোন কাজ করেন না। ঠিক একই জিনিস গীতাতে আসে যখন ভগবান অর্জুনকে জীবন-দর্শন দিচ্ছেন। তুমি যদি নিজেকে পঞ্চভূতের সৃষ্টি বলে মনে কর তাহলে তোমার জন্ম হয়েছে, একদিন মরে যাবে, সব খেলা শেষ। কোন কোন দর্শনে বলছে মানুষ জন্মাচ্ছে মরছে, আবার জন্মাচ্ছে আবার মরছে, তাহলে তুমিও একদিন মরে যাবে আবার জন্মাবে, তাতে তোমার শোক করার কি আছে! আর তুমি যদি বেদান্তের শুদ্ধ আত্মার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চল তাহলে তোমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, তোমার আর কিসের এত ভাবনা! একটা কিছু তুমি ঠিক কর। কিন্তু যেটাই তুমি ঠিক কর না কেন, স্বধর্মকে কখনই ত্যাগ করবে না। হনুমান এখানে দুটো দৃষ্টিকোণ নিচ্ছেন, দেহাত্মবুদ্ধি আর শুদ্ধাত্মবুদ্ধি। দেহাত্মবুদ্ধি যদি তুমি নাও, তুমি হলে ঋষিপুত্র, ঋষিপুত্র হয়ে কেন রাক্ষসী বৃত্তিকে অবলম্বন করছ? আর আত্মবুদ্ধি যদি নাও তাহলে তো তোমার এগুলো কখনই করা উচিত নয়।

একজন সন্ন্যাসী, তাঁর এখন বয়স হয়ে গেছে, তিনি এখন কি করবেন? সন্ন্যাসের পরম্পরাতে দেখলে তাঁকে তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত আর যদি তিনি দেহের দিক দিয়ে দেখেন তাহলেও তাঁর বয়স হয়ে গেছে এখন তাঁকে তপস্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। দুটোর কোনটাতেই জাগতিক কোন সুখের স্থান নেই। ঠিক সেইভাবে হনুমান রাবণকে বোঝাচ্ছেন, দেহাত্ম বুদ্ধি যদি নাও তাতেও তোমার এই ধরণের ভুল কাজ করার সুযোগ নেই, আর শুদ্ধাত্মবুদ্ধি নাও তাতেও কোন সুযোগ নেই। হনুমান শুদ্ধাত্মার বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, শুদ্ধাত্মা কখনই কোন কিছুতে লিপ্ত হন না। কিন্তু বুদ্ধি, অহঙ্কারের সাথে জড়িয়ে মনে একটা ভাব সৃষ্টি হয়, যেই ভাব তাকে 'আমি' বোধ তৈরী করে দিচ্ছে। যিনি জ্ঞানী তিনি দেখেন আত্মা কোন কার্য করেন না, সেইজন্য আমি কোন কাজ করছি না। এইভাবে অনেক কিছু বলার পর হনুমান বলছেন –

নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা জ্ঞাত্বৈবমাত্মনমিতো বিমুচ্যতে।
অতোহহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং বক্ষ্যে শৃনুষ্বাবহিতো মহামতে।৫/৪/২১

আত্মা দেহাদি প্রকৃতিসমষ্টি থেকে অতিরিক্ত, তিনি কোন কিছুর বিকার সম্ভূত নন, তিনি নিরঞ্জন এবং নিরুপাধি, আত্মাকে এভাবে ধারণা করতে পারলে সংসার থেকে মুক্তি লাভ হয়ে যায়। যাতে তোমার আত্মার ব্যাপারে এই রকম ধারণা হতে পারে সেইজন্য তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলছি। তুমি মনোযোগ দিয়ে শুনলে তোমার বিশেষ মঙ্গল হবে। কি সেই secret of realisation –

বিষ্ণোহি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়স্ততো ভবেজ্ জ্ঞানমতীব নির্মলম্।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেৎ ততঃ সম্যগ্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ।৫/৪/২২

ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি মনকে শুদ্ধ করে দেয়, ঐ শুদ্ধ মন দিয়েই আত্মজ্ঞান হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই কথা আমাদের সব শাস্ত্রই বলছেন। কিন্তু যেভাবেই হোক, এই জিনিসটা খুব বেশি popularize করা হয়নি। গীতাতে *একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ* বলছেন ঠিকই, আচার্য শঙ্করও ভাষ্যে বারবার একই জিনিসকে নিয়ে বলছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। সাধক যে পথ দিয়েই যাক, কর্ম দিয়েই যাক, ভক্তি দিয়েই যাক আর বিচার পথ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ দিয়েই যাক বা যোগপথের সাধনাই করুক, সব পথ ঐ একটাই জিনিস করে দেয়। কি করে? মনকে শুদ্ধ পবিত্র করে দেয়। মনকে শুদ্ধ পবিত্র করা মানেই অহং নাশ, আমিত্বের বিলোপ সাধন। যখনই কেউ জিজ্ঞেস করে আমরা পাপ কেন করি? তখন তার একটাই উত্তর আমিত্ব আছে বলেই করি। পাপকর্ম করছে অহং বুদ্ধি আছে বলে। তাহলে পূণ্য কর্ম কেন করে? অহং বুদ্ধি আছে বলেই পূণ্য কর্ম করছে। এই অহং নাশের কোন একটা পথ নেই, অসংখ্য পথ আছে। স্বামীজী চারটে পথ জনপ্রিয় করে দিলেন। ঠাকুর একজন বয়স্কা মহিলাকে বলছেন, তোমার ভাইপোর মধ্যেই তোমার ইষ্টকে দেখ। সেখানেও একই জিনিস

করছেন, অহং নাশ। অহং নাশের অনেক পথ আছে, যে কোন একটা পথেই অহং নাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুকে যে ভক্তি করা হয় তখন যে অহং নাশ হয়, ঐ অহং নাশে আত্মজ্ঞান নিজেই উদ্ভাসিত হয়। এই কথা আচার্য শঙ্করও অনেকবার বলছেন। বিচার করে করে মন শুদ্ধ হয়ে গেলে আত্মজ্ঞান এসে যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য হল আমাদের পরম্পরায় যাঁরা যাঁরা বেদান্ত পথে সাধনা করেছেন, বা ভক্তি পথে সাধনা করেছেন তাঁরা এই জিনিসটাকে খুব বেশি নজরে নিয়ে আসেননি। ঠাকুর যেমন এক জায়গায় বলছেন, জ্ঞানীরা আত্মাকে সাক্ষী রূপে দেখেন, আর দেখেন জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি এই তিনটেই একটা অবস্থা, এই তিনটে অবস্থার সাক্ষী আত্মা। জ্ঞানীরা তাই তিনটে অবস্থাকেই উড়িয়ে দেয়। বলার পর ঠাকুর বলছেন, আমি বাপু সবটাই নিই, তা নাহলে ওজনে কম পড়ে যাবে, উদ্দেশ্য হল যো সো করে ঠাকুর দর্শন করা, তার মানে এটাই উদ্দেশ্য হল যো সো করে মন শুদ্ধ করা। অধ্যাত্ম রামায়ণেরও একই বক্তব্য, এই জায়গাতে মহাবীর হনুমান বলছেন, ভগবান বিষ্ণুকে যদি ভক্তি কর তাহলে তোমার মন শুদ্ধ হয়ে যাবে, আর ঐ শুদ্ধ মনে আত্মজ্ঞান ভেসে উঠবে। যেটা আছে সেটাকে দেখা যায়। এই আত্মজ্ঞান যখন হয় তখন কি হয়?

কারুর আত্মজ্ঞান হয়ে গেলে সে তখন আত্মতত্ত্ব লাভ করে। নিজের জ্ঞান হয়ে যাওয়া যা উপলব্ধিও তাই, পেয়ে যাওয়াটাও তাই। 'বস্তু লাভ' এই কথা বলা হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু দেখতে গেলে সেভাবে হয় না, বস্তু লাভ মানে আমি আলাদা ঈশ্বর আলাদা আমি গিয়ে তাঁকে পেলাম, এরকম কিছু নয়। জ্ঞানটাই লাভ। কি জ্ঞান? আত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব লাভ। ঐ আত্মতত্ত্ব যখন লাভ হয় তখন *পরমং পদং ব্রজেৎ*, পরম পদপ্রাপ্তি, এর থেকে আর কোন উচ্চাবস্থা হতে পারে না। পরমপদ পাওয়াটাই মুক্তি, শোক, মোহের পারে চলে যাওয়া। আমাদের অস্তিত্বের অনেকগুলো অবস্থা আছে, পোকামাকড় হয়ে জন্মাতে পারে, কেঁচো ব্যাঙ সাপ হয়ে জন্মাতে পারে এগুলো এক একটা অস্তিত্ব, মানব দেহটাও একটা অস্তিত্ব আর তার সাথে হিরণ্যগর্ভও অস্তিত্ব, তাঁর সাথে এক হয়ে যাওয়াও আছে, এই সংসারে হিরণ্যগর্ভের সাথে এক হয়ে যাওয়া উচ্চতম অবস্থা। কিন্তু সবার উপরে রয়েছে বিষ্ণুপদ, বিষ্ণুপদ মানে যে অবস্থায় পৌঁছে গেলে আর যাওয়া-আসা নেই, যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাথে নিজেকে এক দেখছেন। এটা কিভাবে হয়? বলছেন, আত্মতত্ত্ব লাভে হয়। আত্মতত্ত্ব লাভ মানে আত্মজ্ঞান হয়ে যাওয়া। আত্মজ্ঞান হওয়া মানেই দেহবুদ্ধির নাশ, অহং বুদ্ধির নাশ। দেহবুদ্ধি, অহংবুদ্ধির নাশ একমাত্র হয় ভগবান বিষ্ণুকে যদি কেউ ভক্তি করে। অধ্যাত্ম রামায়ণে একটা প্রসঙ্গে এসে হনুমান রাবণকে এই জিনিসটাকে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু আমরা যদি পুরো চিত্র নিই, এই জিনিসটাকে যদি যে কোন ভাবে করা হয় তখনও একই জিনিস হবে। মা যখন সন্তানকে ভালোবাসে তখন সে নিজেকে ভুলে যায়, মাতৃত্ব যখন হয় তখনই তার মধ্যে পূর্ণতা আসে। বিবাহের দ্বারা একটা নারী কখনই পূর্ণতা আসে না। আমাদের শাস্ত্রে নারী সঙ্গকে নিয়ে কখনই সমস্যা হয় না, সমস্যা হয় পুত্রৈষণাকে নিয়ে, সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা। কারণ পুত্র পাওয়ার পর তার যে আনন্দ আর তার সাথে আনুষাঙ্গিক যা কিছু হয় সবটাই খুব প্রবল আকার ধারণ করে, এটাই মানুষকে বিরাট বন্ধনে রেখে দেয়। নারীত্বের যে পূর্ণতা তা হয় সন্তান লাভে। সেইজন্য পুরুষের জন্য নারীসঙ্গ আর নারীর জন্য পুরুষ সঙ্গ কোন বড় সমস্যা নয়।

কিন্তু উপনিষদে এসে এর একটা বড় পরিবর্তন দেখা যায়, সেখানে বলছেন মনটা ওদিকে ছিটকে যায়। নিজের স্ত্রী ব্যাতিরেকে অন্য দিকে যে তাকাতে যাবে এই জিনিসটা আগেকার দিনে ছিল না, আমরা শাস্ত্রে বাস্তবিকই কোথাও পাই না। কিন্তু ঠাকুর এটাকে অনেক ভাবে অনেক জায়গায় উল্লেখ করছেন। যেমন এক জায়গায় বলছেন, আমি ভাসুরের সঙ্গে থাকি তাতেই লজ্জায় মরি, অন্যরা পরপুরুষের সঙ্গে কিভাবে থাকে! আবার বলছেন, কেউ যদি উপপতি করে আর পরে সে যদি তাকে না দেখে, ইত্যাদি বলছেন। ঠাকুর জানতেন সমাজে এই এই গোলমাল আছে। এখানে পুত্রৈষণার সমস্যাটা থাকল না, সমস্যাটা আরও খারাপ হয়ে গভীরে চলে গেছে, সেটাই হয়ে গেল কামিনী। সেইজন্য প্রথম থেকেই ঠাকুর কামিনী জিনিসটা থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন। কিন্তু নারীর ঠিক ঠিক পূর্ণতা হয় সন্তান প্রাপ্তিতে। কেন পূর্ণতা বলা হয়, কারণ সে নিজেকে ভুলে যায়। নিজের সন্তানকে কোলে নিয়ে একজন মায়ের যে সুখ, ঐ যে নৈসর্গিক আনন্দ, এই আনন্দই খুব কাছাকাছি যায় ঈশ্বরকে নিয়ে গভীর চিন্তনের যে আনন্দ সেই আনন্দে। আনন্দটা হয় অহং নাশে, মা যখন সন্তানের লালন পালন করছে, স্নেহ করছে তখন অহং নাশ হয়ে যায়। একটা ছেলে একটা মেয়েকে যখন ভালোবাসছে তখনও অহং নাশ হয় কিন্তু সমস্যা হল ওখানে অহংটা আবার তাড়াতাড়ি ফেরত চলে আসে। মা ও সন্তানের ভালোবাসায় মায়ের কচিৎ কখন সখন অহং নাশ না হতেও দেখা যায়। নামকরা মনস্তাত্ত্বিক ফ্রয়েডের আবার বিচিত্র রকম ধারণা ছিল, কিন্তু পরের

দিকে বড় বড় মনস্তাত্ত্বিকরা ফ্রয়েডের ধারণার বিরুদ্ধে বললেন, তাঁরাও বললেন, একটা পুরুষ আর নারীর যে ভালোবাসা আর একজন মা ও সন্তানের ভালোবাসা সেই ভালোবাসা নয়। কারণ পুরুষ আর নারী যদি আলাদা হয়ে যায় কিছু দিন পরে এক অপরকে ভুলে যায়। কিন্তু মা ও ছেলে সারা জীবন আলাদা থাকলেও এক অপরকে ভুলে যাবে না, ভালোবাসা ঠিক একই রকম থেকে যায়, মা ও সন্তানের ভালোবাসায় কোথাও একটা তফাৎ আছে। আমরা জানি কোথায় তফাৎ, তফাৎ হল সেই নিঃস্বার্থপরতায়।

স্বামীজী বারবার বলছে, নিঃস্বার্থপরতাই ঈশ্বর। যদি কেউ যে কোন ভালোবাসায় নিঃস্বার্থ হয়ে যেতে পারে বুঝে নিন সে ঈশ্বরের কাছে চলে গেছে। অনেকে বলে উনি একজন ভালো সাধু। কিন্তু ভালো সাধু এর মানে কি? সাধু মানেই তো ভালো। কিন্তু সাধু ও ভালো সাধুর মধ্যেও তফাৎ আছে। তফাৎ হল স্বার্থ আর নিঃস্বার্থপরতায়। ভালো সাধু মানে যিনি নিঃস্বার্থ, স্বার্থহীনতায় যিনি প্রতিষ্ঠিত। ভালো গৃহস্থ মানেও সেই একই, যিনি নিঃস্বার্থপর হয়ে গেছেন। যে কোন মানুষ যখন নিঃস্বার্থপর হতে শুরু করে সে তখন ঈশ্বরের দিকে এগোতে শুরু করেছে। এটা একেবারে golden rule এখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। একটা লোক ভালো না মন্দ দেখার জন্য পাঁচটা জিনিস বিচার করার দরকার হয় না, শুধু দেখতে হয় নিঃস্বার্থপর কিনা। নিঃস্বার্থপরতার সব থেকে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল মা যখন শিশুকে ভালোবাসে। কিন্তু যখন নিজের সন্তানকেই ভালোবাসে তখন এটাই মায়া, সবাইকে যখন ভালোবাসে তখন এটাই দয়া। এই দয়া বাংলা দয়া নয়, এটা একটা পরিভাষা, যার মধ্যে এই ভাব এসে গেছে সে তো পুরোপুরি নিঃস্বার্থপর হয়ে গেল, ঈশ্বরের সঙ্গে এক, তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পাড়ায় অনেক বিধবা বয়স্কাদের দেখা যায়, কুকুরদের খাওয়াচ্ছে, বেড়ালদের খাওয়াচ্ছে, সেখানে তার একটা বাধ্যবাধকতা আছে, পরিস্থিতি তাকে এই রকম তৈরী করে দিয়েছে, খারাপ কিছু নয়, অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। কারণ যারা একা থাকে তারা আরও স্বার্থপর হয়ে যায়। এই যে নিঃস্বার্থপরতা, মা আর শিশুর যে সম্পর্ক এই একই সম্পর্ক আমরা দেখি ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্কে, একেবারে নিঃস্বার্থপর। এই নিঃস্বার্থপরতাই মুক্তি, কারণ তখন একটা জ্ঞান আসে। স্বামীজী যখন বলছেন unselfishness is God, এটাকে তখন আক্ষরিক নেওয়া যাবে না, নিঃস্বার্থপর হয়ে গেলাম মানে তা নয়। নিঃস্বার্থপর হয়ে গেলে মন শুদ্ধ হয়ে যায়, মন শুদ্ধ হয়ে গেলে ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বরের যে জ্ঞান সেটা উদ্ভাসিত হয়ে যায়। তখন সে আত্মতত্ত্বের সঙ্গে এক হয়ে যায়। এইসব কথা বলার পর হনুমানজী রাবণকে আবার এই বলে সাবধান করে দিচ্ছেন –

বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবানাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্।৫/৪/২৩

হে রাবণ! তোমার ভেতরে মুর্খতা বশতঃ শ্রীরামের প্রতি যে শত্রুভাব রয়েছে এটাকে তুমি পরিত্যাগ কর। হিন্দু ধর্মে সব কিছুতে ঈশ্বর দর্শন আর সব ভাবে ঈশ্বর প্রাপ্তি করা যায়, তাতে বৈর বা শত্রু ভাবে সাধনাটাও একটা পথ। কিন্তু ঠাকুর বলছেন, বাড়িতে প্রবেশ করার অনেক পথ থাকে, পায়খানার রাস্থা দিয়েও প্রবেশ করা যায়, কিন্তু এটা ভালো রাস্থা নয়। পৌরাণিক কাহিনীতে দেখানো হয় যারা লড়াই করতে গিয়ে ভগবানের হাতে মারা যাচ্ছে সেখানে বলছেন, ভগবানের হাতে মারা গেছে তার তো মুক্তি হবেই। সেটাকেও এনারা একটা উচ্চমানের অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে এনারা একটা নতুন পথ নিয়ে এলেন, শত্রু ভাবে সাধন বা বৈর ভাবে সাধন। কিন্তু এই পথটা ঠিক নয়। শিশুদের মন খুব কাঁচা মন হয়, তারা যেটা শোনে সেটাই তারা বলে, যেটা দেখে সেটাই বলতে শুরু করে। একদিকে টিয়া পাখির স্বভাব অন্য দিকে বানরের স্বভাব। বাড়ির বড়রা যেমনটি ব্যবহার করবে বাচ্চারা তেমনটি ব্যবহার শিখে নেয়। সেইজন্য বাচ্চাদের সামনে খারাপ কথা, নোংরা ভাষা ব্যবহার করতে নেই। সাধারণ মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চার পাঁচ বছর বাচ্চাদের বুদ্ধির মত। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর স্বামীজী চেন্নাইতে একটা ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে অনেক বড় বড় অধ্যাপকরাও বসে আছেন। সেখানে স্বামীজী বলছেন তোমরা সবাই হলে মোচওয়ালা শিশু, তোমাদের দাড়ি-গোঁফ হয়ে যেতে পারে কিন্তু তোমরা এখনও শিশু। আমাদের পক্ষে এই জিনিসগুলো বোঝা সম্ভব নয়। সাংসারিক বুদ্ধি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বোঝার জন্য যে বুদ্ধির দরকার সেই বুদ্ধিকে বাড়তে দেয় না। আধ্যাত্মিকতায় একটা পরিপক্কতা না এলে এই বুদ্ধি আসে না। আমাদের তিন ধরণের পরিপক্কতা আছে, আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা, বৌদ্ধিক পরিপক্কতা আর জাগতিক পরিপক্কতা। পাঁচ-ছ বছরের বাচ্চাদের কোন পরিপক্কতাই থাকে না। সাধারণ মানুষের জাগতিক পরিপক্কতাটা এসে যায়, অপরের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, কার সামনে কি কথা বলতে হবে এগুলো শিখে

যায়। কিন্তু এদেরও বৌদ্ধিক বিকাশ আসে না, পড়াশোনার মধ্যে থাকলে, পণ্ডিতদের সাথে মেলামেশা করলে বৌদ্ধিক পরিপক্কতা এসে যায়। এদেরও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা নাও আসতে পারে। আবার যাঁরা আধ্যাত্মিক সম্পন্ন মানসিকতার হয়ে যান তাঁদের জাগতিক পরিপক্কতা ক্রমশ নীচের দিকে চলে আসে, সাংসারিকতা তাঁদের দ্বারা হয় না। যাদের বৌদ্ধিক পরিপক্কতা নেই তাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা থাকবেই না। এদের সব থেকে বড় সমস্যা হল ধর্মের অনেক তত্ত্ব বা কথার ভুলভাল ধারণা করে গোঁড়ামিতে নেমে যায়।

ঠাকুরের যে বিভিন্ন রকম দর্শন, কখন মা কালীর দর্শন হচ্ছে, কখন রামলালার দর্শন হচ্ছে। ঠাকুরের এই দর্শনকে নিয়ে একজন শিক্ষক কোন আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লাশে ছাত্রদের সামনে বললেন, সব মনেরই ব্যাপার, মন যেমন কল্পনা করে, চিন্তা করে মন তেমনই দেখে। ক্লাশের একটি ছেলে ঠাকুরকে খুব শ্রদ্ধা করে, শিক্ষকের কথা শুনে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। ছেলেটি একজন মহারাজকে গিয়ে কথাটা বলার পর উনি তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন। কিন্তু শিক্ষক যা বলছেন তিনি কিন্তু ভুল বলছেন না, শিক্ষকের বোধবুদ্ধি এটাই। সেইজন্য ঠাকুরের মা কালী দর্শনকে মনের ব্যাপার বলছেন। অনেকে বলতে পারেন যার যেমন বিশ্বাস সে সেই রকমই ভাববে। কিন্তু এই ভুলটাও আমাদের কখনই করা উচিত হবে না। আসলে বলতে চাইছে, ঠাকুরের বিশ্বাস যে মা কালী আছেন সেইজন্য তিনি ঐ রকম দেখছেন, তার মানে ঠাকুরের মনের কল্পনা এত তীব্র যে তিনি সেইভাবে দেখছেন। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই তা নয়, সচ্চিদানন্দ আমাদের কাছে জগৎ রূপে আসেন, সেই সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের কাছে মা কালী রূপে আসছেন। আর যখন নির্বিকল্পে সমাধিতে চলে যান তখন সচ্চিদানন্দ বোধে বোধ হয়, সেখানে মন বুদ্ধির কোন ক্রিয়া নেই, সরাসরি বোধ করা। জাগতিক রূপ মানে হাসি-কান্না এই রূপে তিনি আসেন। আমাদের মনের বাকি যা কিছু হয় সব মনের চিন্তা, কিন্তু ঠাকুর যে মা কালী দেখছেন সেটা মনের চিন্তার জগৎ নয়। আমাদের সবটাই মনের ব্যাপার, আমরা যখন ধ্যান করছি সেটাও মনেরই ব্যাপার, শিক্ষক ভুল বলছেন না। কিন্তু একটা জায়গায় খুব মারাত্মক ভুল করে বসেছেন, জিনিসটা মনের ব্যাপার ঠিকই, কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু তার পেছনে যে সাধনা লেগে আছে সেটাকে ধরছেন না, তার থেকেও আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, তার যে ফল, সেই ফলের সাথে মনের কল্পনা বা জগতের যে বাস্তব এর সাথে কোন মিল নেই, সম্পূর্ণ আলাদা। এটাই আধ্যাত্মিকতার পরিপক্কতার অভাব, আধ্যাত্মিকতার অপরিপক্কতা থাকলে সাধন জীবন পুরো গোলমেলে হয়ে যায়। দীক্ষা নেওয়ার সময় গুরু বলে দেন, এই মন্ত্র আর এই তোমার ইষ্ট। সবাই তো দেখছে মন্ত্র জপ মানে মনে মনে একটা জিনিস করতে হচ্ছে। তখন মনে হতে পারে সব তো মনেরই ব্যাপার, মনের মধ্যে সিনেমার গানও ভাসে, দূর্গাপূজার সময় মায়ের গানও মনে ভাসে আর ধ্যান করা মানে চিন্তন করা, সব তো মনেরই ব্যাপার। শাস্ত্রও বলছেন মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। এই ভাবে সব কিছু থেকে মানুষ নিজের মত একটা কল্পনা করে নিজের জন্য একটা পথ বার করে নেয়। এবার কিন্তু তার সর্বনাশ হয়ে যাবে, কারণ তার এখনও আধ্যাত্মিক অপরিপক্কতা রয়েছে। আধ্যাত্মিক অপরিপক্কতা থাকলে আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বনাশ হতে বেশি সময় নেবে না।

এক ভক্ত পরিবারের সবাই ঠাকুরের খুব ভক্ত। তাদেরই একজন সদস্য বিদেশে থাকে, জীবনে সে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, টাকা-পয়সা প্রচুর, তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেলেটা অবাধ্য হয়ে গেছে। নিজে কিন্তু খুব বড়লোক। এখন ঐ ভদ্রলোক মদ খাওয়া ধরেছে, তার মাথায় ঢুকেছে যে, ঠাকুর তখনই কাউকে কৃপা করেন যখন সে পূর্ণ বিনাশের দিকে চলে যায়, যেমন গিরিশ ঘোষ। গিরিশ ঘোষ এখন তার আদর্শ। গিরিশ ঘোষের মত আমিও মদ খাবো, মাতলামি করব, কিন্তু ঠাকুরকে আমি ভক্তি করে যাব, সেখান থেকে তিনি আমাকে কৃপা করবেন। ঠাকুর কারুকে অপরের মত করাকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। ঠাকুর স্বামীজীকে এক বিশেষ ভাবে দেখতেন। নরেনের আচার ব্যাবহারে এমন কিছু কিছু ছিল যেগুলো আবার অন্যদের জন্য ঠিক নয়। কেউ যখন নরেনের মত করতে যাচ্ছে ঠাকুর তাকে আটকে দিচ্ছেন। শত্রু ভাবে সাধনে, বৈর ভাবে সাধনে রাবণকেই উপমা রূপে নিয়ে আসা হয়। যেখানেই শত্রু ভাব নিয়ে সাধনার কথা বলা হয় সেখানেই রাবণের প্রসঙ্গ অবশ্যই আসবে, রাবণ বৈর ভাবে সাধন করে শ্রীরামচন্দ্রকে পেলেন। কিন্তু এখানে মহাবীর হনুমান রাবণকে নিষেধ করছেন। আসলে হনুমান রাবণকে নিষেধ করছেন না, রাবণকে উপলক্ষ্য করে আমাদের মত লোকেদের বারণ করছেন, আমরা যেন এই ভুল পথে না চলে যাই। শুধু শত্রু ভাবে সাধনেই নয়, গুরু যেটা বলে দিয়েছেন তার বাইরে যে কোন ভাব, গুরু যেটা বলে দিয়েছেন তার বাইরে যে কোন সিদ্ধান্ত ভুল। সেইজন্য বলছেন *বিসৃজ্য*, মুর্খের মত যেটা করছ, এই বৈর ভাবের সাধনকে, হৃদয়ে শত্রু ভাব রেখে যে সাধন করছে এই পথ তুমি পরিত্যাগ কর।

দেখা যায় বোষ্টম বোষ্টমীরা বাবাজীদের আখড়াতে জড়ো হয়ে জনসাধারণের মধ্যে হরিনাম করে যাচ্ছে, গান-বাজনা, প্রবচন এই নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। খুব আনন্দ পাচ্ছে, কিছু না করার থেকে তাও ভালো। দ্বিতীয় ধাপে সেখান থেকে নিজের মত কিছু ধারণা করে নিচ্ছে আর মনে করছে নিষ্ঠা থাকলে ঠিকই হয়ে যাবে। কিন্তু জীবনধারাও যদি ঐ রকম করে দেয় তখন মুশকিলে পড়ে যাবে। কেউ যদি বলে আমি শ্রীকৃষ্ণের মত হব, আমিও এবার রাসলীলা করব, এবার তার পতন তাকে কোথায় নিয়ে যাবে টেরও পাবে না। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, আমাকে এসে বলছে আমরা রাজা জনকের মত। কিন্তু তার আগে রাজা জনকের তপস্যা দেখ, কত হেঁটমুণ্ড হয়ে তপস্যা করেছেন, এমনিই কি রাজা জনক হওয়া যায়! সেইজন্য এখানে ছোট্ট দুটি শব্দে নিষেধ করা হচ্ছে। সব রকম পথই আছে, কিন্তু তার মধ্যে অশাস্ত্র সম্মত পথ আর শাস্ত্র সম্মত পথ আছে। সাধন ভজনে অশাস্ত্র সম্মত পথে যেতে নেই। সংসার চালাতে গেলে টাকা উপার্জন করতে হয়, খেটে খুটে পরিশ্রম করেও অর্থোপার্জন হয় আবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি, লোক ঠকিয়ে, জালিয়াতি করেও অর্থোপার্জন হয়। এতেও অনেকে ধনী হয়। কিন্তু এগুলো শাস্ত্র সম্মত নয়, শাস্ত্র সম্মত হল পরিশ্রম করে সৎ ভাবে আয় করা।

এইসব বলে হনুমান বলছেন, *ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্,* শ্রীরামচন্দ্র হলেন শরণাগতপ্রিয়, সেইজন্য তুমি তোমার পরিজনদের নিয়ে সীতার সামনে গিয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে যাও, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এখানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, হিন্দুরা সব পথকেই পথ বলে মনে করে, যদি কেউ শত্রু ভাবেও ঈশ্বর চিন্তন করে তাতেও হয়, কিন্তু ঠিক পথ নয়। ভক্তরা যাঁরা শাস্ত্রের কথা শুনছেন তাঁদেরকেও বলা হচ্ছে, শুধু শত্রু ভাবেই সাধনা নয়, যে কোন জিনিসে এটা করতে যেও না, যে কোন পথ নিতে যেও না, নিলে তোমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। হনুমান বলছেন, যারা শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করে না, কোন শ্রীরামচন্দ্রের? যিনি বাইরে আছেন তিনি নয়, হৃদয়ে যিনি অবস্থিত, তারা কি করে *কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াৎ,* এই শোক-মোহ রূপী সংসারের পারে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে! হে রাবণ! যদি তুমি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা না কর তাহলে অজ্ঞানের যে অগ্নি তোমাকে নিরন্তর দগ্ধ করে যাচ্ছে, এর থেকে তুমি কোন দিন বাঁচতে পারবে না, আর তোমার পাপ তোমাকে ক্রমাগত নীচের দিয়ে নিয়ে চলে যাবে। এ এক বিচিত্র জিনিস! পাহাড়ের চূড়ায় যারা ওঠে তারা এক ধাপ এক ধাপ করে ওঠে কিন্তু যখন পড়ে তখন ধপাস করে পড়ে। মানুষ যখন পাপকর্ম করতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই কত নীচে চলে যায় বুঝতেই পারে না। অথচ উপরে ওঠার সময় কত কষ্ট করে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠতে হয়। সেইজন্য নিয়মিত ধ্যান-জপ, তপস্যাদি যদি না করে কিছু দিনের মধ্যে পাপকর্মে পড়ে কোথায় তলিয়ে যাবে, কিছু দিন পরে দেখবে সব ফক্কা হয়ে গেছে। তবে হিন্দু ধর্মে কখনই বলা হয় না যে ওখানেই সব শেষ হয়ে গেল, ওখান থেকে আবার শুরু হয়। সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের তাই নিয়মিত জপ-ধ্যানে বসার জন্য বলা হয়। নিয়মিত বসার অভ্যাসটা যদি থাকে তাহলে অন্তত পতন হতে দেয় না, একটা স্তরের নীচে আসা থেকে আটকে রাখে।

হনুমানের মুখে এসব কথা শুনে রাবণের মেজাজ গরম হয়ে গেছে। এতক্ষণ প্রহস্তের মাধ্যমে কথা বলছিল, কিন্তু এখন রেগে গিয়ে সরাসরি বলছে, তোমার এত সাহস কি করে হল? আমার রাজদরবারে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ! রাম, সুগ্রীব আমার কী করবে? এদেরকে আমি চাইলেই বধ করে দিতে পারি। তবে শুনে রাখ, আমি আগে তোকে বধ করব, তারপর রাম আর লক্ষ্মণ এই দুটোকে বধ করব, এদের বধ করার পর সুগ্রীব আর তার বানর সেনাদের শেষ করে দিচ্ছি। রাবণের কথা শুনে হনুমানও এমন রেগে গেছে যে ক্রোধাগ্নিতে সব রাক্ষসদেরই দগ্ধ করে দিচ্ছে, রাবণকে বলছেন, আমি হলাম শ্রীরামের দাস, আমার বিক্রম অসীম, তোমার ক্ষমতাই নেই যে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে। আর তুমি কে! তোমার মত কোটি কোটি রাবণও আমার সমকক্ষ নয়। দূতের কাজ হল সংবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসা। কিন্তু হনুমানের অন্য একটা উদ্দেশ্য, যদি আগেই রাবণের এখানে কিছু গোলমাল পাকিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায়। তিনি রাবণকে খুব করে তাতিয়ে যাচ্ছেন। রাবণের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। রেগে গিয়ে আদেশ দিলেন এই দুষ্ট বানরকে এক্ষুণি শেষ করে দাও। তখন বিভীষণ রাবণকে থামালেন, এই বানর এখানে দূত হয়ে এসেছে, দূত অবধ্য। আর একে যদি আমরা মেরেই ফেলি তাহলে রাম জানবে কি করে যে এখানে সে এসেছিল। সেইজন্য এমন কিছু একটা শাস্তি একে দিয়ে দেওয়া হোক যাতে তার মালিক বুঝে নিতে পারবে। যাঁরা খুব বাকপটু তাঁরা অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতিতেও বাকপটুতা দিয়ে একটা পথ বার করে নেন। বিভীষণ তখন বললেন, বানরদের লেজ খুব প্রিয়, ওর প্রিয় লেজটাকেই পুড়িয়ে দেওয়া হোক। পরের কাহিনী আমাদের সবারই জানা। সব রাক্ষসরা লেজে কাপড় জড়াতে লেগে গেল, আর এদিকে হনুমান তাঁর

লেজকে লম্বা করে চলেছেন। বিরাট লম্বা লেজে প্রচুর কাপড় জড়ানো হল, তাতে প্রচুর পরিমাণে তেল ঘি মাখানো হল। আগুন লাগানো হলে লঙ্কাবাসীরা সবাই এসে মজা দেখছে। তখন হঠাৎ নিজেকে ছোট করে নিয়ে এক লাফে বাইরে এসে চারিদিকে লেজ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনা লাগিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন রামকথাতে এই ঘটনাকে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক জায়গায় গিয়ে দেখছেন বিভীষণের ঘর সেখানে আগুন লাগালেন না। সবাই আতঙ্কে আর্তনাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাড়িতে আগুন লাগলে যা হয়ে থাকে। সমস্ত লঙ্কাকে পুড়িয়ে তছনছ করে এক ঝাঁপে সমুদ্র এসে নিজের লেজের আগুনটা বুজিয়ে দিলেন।

বায়োঃ প্রিয়সখিত্বাচ্চ সীতয়া প্রাথিতোহনলঃ।
ন দদাহ হরেঃ পৃচ্ছং বভুবাত্যন্তশীতলঃ।৫/৪/৪৭
যন্নামসংস্মরণধুতসমস্তপাপাস্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সদাঃ।৫/৪/৪৮

অগ্নি দেবতা আর বায়ু দেবতা দুজন বন্ধু। হনুমান বায়ুপুত্র, সেইজন্য বায়ু দেবতা অগ্নি দেবতাকে বলার পর অগ্নি শীতল হয়ে গেছেন। অন্য দিকে সীতাও প্রার্থনা করছিলেন, হে অগ্নি দেব! আপনি শীতল হয়ে যান। ফলে হনুমানের লেজে যে আগুন লাগিয়েছে অগ্নির তাপ হনুমানের অনুভব হচ্ছে না। দু দিক থেকে প্রার্থনা, সীতা এদিকে প্রার্থনা করছেন আর অন্য দিকে বায়ু দেবতা তাঁর বন্ধু অগ্নি দেবতাকে বলছেন। এখানে খুব সুন্দর বলছেন, যত রকমের পাপ আছে আর ঐ পাপের জন্য যে তিন ধরণের তাপ আসে, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক। মানুষের শরীর মনে যে কষ্ট আসে, পারিপার্শ্বিক যে কষ্ট আসে আমরা মনে করি এগুলো সব পাপের ফল। শরীরে কষ্ট হচ্ছে, বাড়িতে প্রচুর ঝামেলা চলছে, আমরা তখন বলি, হে ভগবান আমি কোন পাপের ফলে এই সাজা পাচ্ছি। আমাদের মনে ঢুকে আছে যে, আমি এমন কিছু পাপ করেছি যার ফল এখন এইভাবে আমার কাছে আসছে। আমরা বলি পাপ তাপ, পাপের পরিণতি তাপে হয়। যদি পূণ্য কর্ম করতে থাকে তখন এই পাপ কর্মগুলিকে ক্ষয় করে দেয়। কিন্তু ভগবানের নাম করে এই ত্রিতাপ থেকে মুক্তি হয়ে যায়। ভগবানের নাম এই তিন রকম অগ্নিকে শান্ত করে দেয় সেখানে এই জাগতিক অগ্নি হনুমানের কি করতে পারবে! ঘুরে ঘুরে সেই মূল একটি কথাতেই নিয়ে যাচ্ছেন, যদি ভগবানের নাম করা হয় তাহলে শোক, তাপ আর পাপের জন্য যে তাপ হয় সব নাশ হয়ে যায়। শ্রীমাও অনেকবার বলছেন, জপ করতে করতে পাপকর্ম নাশ হয়ে যায়। নতুন করে আর যদি পাপকর্মের জন্ম না দেয় তাহলে আস্তে আস্তে সঞ্চিত পাপকর্ম সব নাশ হয়ে যায়।

সীতার কাছ থেকে হনুমানের বিদায় গ্রহণ

লঙ্কা দহনের পর হনুমান আবার সীতার কাছে গেছেন তাঁর খবর নেওয়ার জন্য। আমি লঙ্কার অনেক সর্বনাশ করে দিয়েছি, এবার আমি ফিরে যাচ্ছি। সব শুনে সীতা বলছেন, তোমাকে দেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম, আমি যে রাবণের হাতে বন্দী মনেই ছিল না। অন্য দিকে তোমার ফিরে যাওয়ারও দরকার আছে, তোমাকে আমার নিজের লোক মনে হচ্ছে, তুমি চলে যাচ্ছ বলে আমার মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক তুমি ফিরে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে সব কথা বলবে। তখন হনুমান সীতাকে বলছেন –

যদ্যেবং দেবি মে স্কন্ধমারোহ ক্ষণমাত্রতঃ।
রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যসে যদি জানকি।৫/৫/৬

মা সীতা! আপনি যদি চান তাহলে একটা পথ আছে, আপনি আমার কাঁধে আরোহণ করুন আমি আপনাকে এক ঝাঁপে শ্রীরামের কাছে নিয়ে চলে যাচ্ছি। ঠাকুর এটাকে অন্য ভাবে বলছেন, সীতা বলছেন আমি পরপুরুষকে কখন স্পর্শ করব না। হনুমানের এই পরিকল্পনাকে চিন্তা করেই মকবুল ফিদা হোসেন একটা ছবি তৈরী করেছিলেন, পরে যে ছবিকে নিয়ে প্রচুর অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। সীতা এখানে না করে দিয়েছেন, বলছেন শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে শোষণ করে বা সেতুবন্ধন করে বানরদের সাথে এখানে এসে রাবণকে যুদ্ধে বধ করে আমাকে যদি নিয়ে যান তখন তাঁর অমরকীর্তি হবে। অতএব তুমি যাও; আমি কোন ভাবে জীবন ধারণ করে থাকব। ইদনিং হাইজ্যাক করে সন্ত্রাসবাদীরা কত লোককে পণবন্দী করে রাখছে, সেখানে লোক পাঠিয়ে কায়দা করে বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়, উদ্দেশ্য হল যো সো করে তাকে ছাড়িয়ে আনা। কিন্তু সীতা এখানে চাইছেন না যে তাঁকে কেউ কায়দা করে এখান থেকে নিয়ে যাক। সীতার উদ্দেশ্য হল শ্রীরামের অমরকীর্তি হোক, কিন্তু এখন আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ কীর্তি চাইছে না, আমাদের লোককে যেন তেন ভাবে বাঁচাতে হবে। কিন্তু

শ্রীরামচন্দ্রের কাছে কাজ করাটা যেমন দরকার ঠিক তেমনি কীর্তিও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে সম্মানীয় মৃত্যুর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, অঙ্গদ বলছে এই মৃত্যু আমার বাঞ্ছনীয় নয়, যদি মরতে হয় বড় জায়গায় মরতে হবে। ঠিক তেমনি যে কাজ আমরা করব সেই কাজের যেন কীর্তি হয়, কাজে যেন নিজের শৌর্য প্রকাশিত হয়। যশ লাভ যে কোন কাজেই করা যায়, ঘর ঝাঁটা দেওয়া, বিছানা করার মত ছোটখাটো কাজেও যশ লাভ হতে পারে। তেমনি যে কোন কাজেই কীর্তি লাভ হয়, কীর্তিটা বড় শব্দ। যেমন অনেকে বলে, আমার মা যা ডাল রান্না করত এখনও আমার মুখে লেগে আছে। মা শুধু ডাল রান্না করে কীর্তি লাভ করেছে। আমরা সারাদিনে যত রকম কাজ করছি সব কাজই আমাদের কীর্তি লাভের একটা সুযোগ এনে দিচ্ছে। যদি আমরা কীর্তি লাভের দিকে দৃষ্টি দিই তখন কাজটাও হয়ে যাবে আর তার সাথে নামও হবে।

শ্রীরামচন্দ্র তিনি হলে চক্রবর্তী, তিনি এত বড় সুযোগ কেন ছাড়তে যাবেন! বেশির ভাগ মানুষ চাইছে কোন রকমে কাজটা করে দিতে পারলে হয়, কীর্তি সেখানে হয় না। সাধারণ লোকেদের জন্য এই জিনিস চলবে কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বের কাছে চলবে না। এনারা যে কোন কাজ যখন করবেন তখন একটা কীর্তি অবশ্যই হবে। রাজাদের জন্য কীর্তি হল এক বিরাট ব্যাপার, সেইজন্য তাঁদের সেই সুযোগটা ছাড়তে নেই। এই জিনিসটাকে বিভিন্ন রামকথায় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কোথাও বলছে রাবণের এখনও পাপ পূর্ণ হয়নি, কোথাও আছে সীতা পরপুরুষকে স্পর্শ করবেন না, কিন্তু এখানে বলছেন অক্ষয় কীর্তি স্থাপন। আমি যদি এভাবে তোমার কাঁধে চেপে চলে যাই তাতে শ্রীরামচন্দ্র যে রাজা, তিনি যে ক্ষত্রিয় সেই ক্ষত্রিয় বা রাজার কীর্তি বৃদ্ধি হবে না। রাবণ লুকিয়ে সীতাকে নিয়ে এল আর হনুমানকে দিয়ে শ্রীরাম সীতাকে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এতে শ্রীরামচন্দ্রের কোন কীর্তি বৃদ্ধি হবে না। যদি এভাবে সীতাকে হনুমান নিয়ে যায় তখন লোকেরাই বলবে, শ্রীরামচন্দ্র লুকিয়ে নিজের অপহৃত স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনেছে, রাবণের সাথে লড়াই করার ক্ষমতা ছিল না। অর্জুনকেও শ্রীকৃষ্ণ একই কথা বলছেন, *অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন*, তোমার নামে যে কথাগুলো বলা উচিৎ নয় লোকেরা সেই কথাগুলোই তোমার নামে বলতে থাকবে। যদিও পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মবিদ্যা দিচ্ছেন কিন্তু তার আগে অর্জুনকে কীর্তি অর্জন করার কথা বলছেন। কীর্তিই যদি না অর্জন করতে পারে তাহলে সে ত্যাগ কী করবে আর নিষ্কাম কর্মই বা করবে কি করে! তোমার কোন কর্মই নেই, তুমি নিষ্কাম কর্ম কী করবে! সীতার সব সময় এক ভাবনা, কিভাবে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তি বৃদ্ধি হয়, কিভাবে তাঁর পূণ্য বাড়ে, সীতার দৃষ্টি ঐদিকে।

সীতার কথা শুনে হনুমান প্রণাম করে বিদায় নিয়ে সমুদ্রের পারে যাওয়ার জন্য ওখানে একটা উঁচু পাহাড় ছিল সেই পাহাড়ের শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে এক ঝাঁপ দিয়েছেন। মহাবীর হনুমানের এমন শক্তি যে তাঁর পদভারে তিরিশ যোজন বিস্তৃত পাহাড় ধসে গিয়ে সমতল হয়ে গেল। আকাশ পথে সমুদ্র পার হওয়ার সময় হনুমান মহাশব্দ করতে লাগলেন। এই পারে বানররা ঐ শব্দ শুনেই বুঝে গেছে যে হনুমান আসছেন, এরাও তখন মহা আনন্দে শব্দ করতে শুরু করে দিল, সব শব্দ প্রতিধ্বণি হয়ে এক বিচিত্র পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। হনুমান পৌঁছেই সবাইকে বলছেন, ভাইগণ! আমি সীতার খবর পেয়ে গেছি। এবার সবাই কিষ্কিন্ধ্যা নগরীর দিকে ফিরে আসছে, সবাই আনন্দে লম্ফঝম্ফ করতে করতে চলেছে। কিষ্কিন্ধ্যার কাছে মধুবন নামে একটা বিশাল ফলের বাগান ছিল। মধুবন বিশেষ ভাবে সুরক্ষিত বাগান ছিল, ওখানকার ফল, মধু সব ছিল শুধু সুগ্রীবের জন্য। মধুবনে ফল বা মধুতে হাত দেওয়া তো দূরে ওখানে কেউ প্রবেশ করতেই পারত না। যাওয়ার পথে এখন হনুমান, অঙ্গদ সহ সব বানররা মধুবনে ঝাঁপিয়ে ঢুকে গিয়ে ওখানকার দারোয়ানদের পিটিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে সব লুটপাট করে, মৌচাক ভেঙে মধু, গাছের সব ফল খেতে শুরু করে দিয়েছে। মধুবনের রক্ষীরা দৌড়ে গিয়ে সুগ্রীবকে এই খবরটা দিয়েছে। খবর পেয়ে সুগ্রীব তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, অন্য সময় হলে সব কটার গলা কেটে রাখত। সুগ্রীব বলছে, মধুবনে ঢুকে লুটপাট করে খাওয়ার মত এত বড় দুঃসাহস কাজ করতে পেরেছে, তার মানে এরা সীতার খবর পেয়ে গেছে। সীতার খবর যদি না পেয়ে থাকত তাহলে এই দুঃসাহস কখনই করত না। এরপর সবাই কিষ্কিন্ধ্যা নগরী পৌঁছে গেছে, তখন শ্লোকে বলছেন –

হনুমান রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাগ্রে রামং পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্।৫/৫/৩৬
কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র জানকী ত্বাং শুচান্বিতা।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপামূলমাশ্রিত্য।৫/৫/৩৭

<u>হনুমানকে শ্রীরামের আলিঙ্গন</u>

হনুমান প্রথমে শ্রীরাম এবং পরে বানররাজ সুগ্রীবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে খুব সংক্ষেপে সব বিবরণ দিলেন, সীতাদেবীকে কুশলিনী দেখে এসেছেন। হে রাজেন্দ্র! শোকান্বিতা জানকী আপনার জন্য কুশলবার্তা নিবেদন করেছেন। আমি দেখলাম তিনি অশোকবনে শিশু বৃক্ষের মূলে আশ্রয় করে আছেন আর শুধু আপনার কথাই চিন্তন করে যাচ্ছেন, আপনার ছাড়া তাঁর মনে আর কোন চিন্তন নেই। এরপর হনুমানজী পুরো কাহিনীটাই বললেন। কাহিনী বলার পর বলছেন, সীতা আপনার জন্য সন্দেশ পাঠিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্র যেন যে করেই হোক আমাকে উদ্ধার করেন। বলার পর হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সীতার মাথার চূড়ামণিটা দিলেন। চূড়ামণি হাতে নিয়ে সীতার কথা মনে পড়ে শ্রীরামচন্দ্রের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছে, হনুমানকে বলছেন –

হনুমংস্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ।৫/৫/৬০
ইদানিং তে প্রযচ্ছামি সর্বস্বং মম মারুতে।
ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃষ্য গাঢ়ং বানরপুঙ্গবম্।৫/৫/৬১

হে হনুমান তুমি যে কাজ করলে কোন দেবতার পক্ষেও এই কাজ করা সম্ভব ছিল না, তুমি আমার যে উপকার করলে এর প্রতিদান আমি কোন দিন তোমাকে দিতে পারব না। এই জিনিসগুলোকে বাল্মীকি খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। ওনার বক্তব্য হল, তুমি যা করলে তাতে আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে, আমি যদি তোমাকে এর প্রতিদান দিতে যাই তাহলে তোমার প্রাণকে সংশয়ের মধ্যে যেতে হবে, তোমার প্রাণ সংশয়ে যাক এটা কখনই আমার কাম্য নয়। সেইজন্য এই উপকারের প্রতিদান কোন দিন দেওয়া যাবে না। আর আমার তো দেওয়ার মতও কিছুই নেই, দ্বিতীয়ত এর প্রতিদান হয় না। হে হনুমান! সেইজন্য একটাই পথ, আমার যা কিছু আমি সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। কি দেব? আলিঙ্গন। এই যে তোমাকে আলিঙ্গন করছি, আমি নিজেকেই তোমাকে দিয়ে দিলাম। যখনই কাউকে আলিঙ্গন করা হয় সেখানে এটাই একমাত্র ভাব, আমি তোমাকে পুরোপুরি দিয়ে দিলাম, আমার সর্বস্ব তোমাকে দিলাম। এটাই শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তোমাকে আমার কিছু দেওয়ার নেই, আর তুমি যা কাজ করেছ এর থেকে বেশি কিছু দেওয়াও যায় না। সেইজন্য আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে দিলাম। এরপর অধ্যাত্ম রামায়ণ আবার নিজের ভাবে জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছে –

পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মনঃ।
অতস্ত্বং মম ভক্তোহসি প্রিয়োহসি হরিপুঙ্গব।৫/৫/৬৫

এই জগতে পরমাত্মার আলিঙ্গন পাওয়া দুর্লভ। শ্রীরামচন্দ্র এখানে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন তিনি পরমাত্মা। এই সংসারে ঈশ্বরের আলিঙ্গন কেউই পেতে পারে না। ঠাকুর কথায় কথায় বলছেন অবতারকে কেউ চিনতে পারে না। অবতারকে কেউ চিনতে পারে না আর সেখানে অবতার নিজে আলিঙ্গন করছেন, এই জিনিস কল্পনাই করা যায় না। হে হনুমান! তুমি আমার প্রিয় এবং ভক্ত; সুতরাং তুমিই এই দুর্লভ জিনিস প্রাপ্ত হলে। শিব তখন পার্বতীকে বলছেন, ভক্তরা যাঁর পাদপদ্মে তুলসী পাতা প্রভৃতির দ্বারা পূজা করে বিষ্ণুর পরমপদ পায়, সেখানে তিনি নিজে একজনকে আলিঙ্গন করছেন, সেই ব্যক্তির কথা আমরা কী বর্ণনা করব। সেবক ভাবে কেউ যখন সাধনা করে তখন সেব্য যিনি তিনি যখন খুশি হন তিনি তখন তার জন্য তাঁর সর্বস্ব খুলে দেন। ঠাকুর এর খুব সুন্দর উপমা দিচ্ছেন, বাবুর বাগানের মালী বাবুর সেবা করে, একদিন বাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, তুইও যা আমিও তাই, আয় আমার পাশে বোস। মালী তখন একটু ইতস্ততঃ করছে, বাবু বলছেন, আয় আয় কিছু হবে না, এখান বোস। কিন্তু কেউ যদি নিজে থেকে বসতে যায় বাবু তখন অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বার করে দেবেন। দাস্য ভাবেও ভগবানের সাথে একাত্ম বোধ হয়, কিন্তু তিনি নিজে হাতে ধরে কৃপা না করলে হবে না। এখানে এসে সুন্দরকাণ্ড শেষ হয়ে যায়। এরপর শুরু হয় লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড।

লঙ্কাকাণ্ড

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা যাত্রা এবং সমুদ্রতীরে অবস্থান

লঙ্কাকাণ্ডের শুরুতে শ্রীরামচন্দ্র আবার সেই হনুমানের কথাই বলছেন, হনুমান যে কার্য্য করেছে তা দেবতাদের পক্ষেও দুষ্কর আর পৃথিবীলোকে যারা আছে তাদের পক্ষে মনে মনে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। হনুমান সুগ্রীবের সেবক রূপে যে কাজ করেছে জগতে কোন সেবকই এই রকম করতে পারবে না। সুগ্রীবের এই সেবকের মত সেবক কারও হয়নি আর হবেও না। নিজের জীবনকে বাজি লাগিয়ে এভাবে কেউ বিস্তির্ণ সমুদ্রকে লঙ্ঘন করতে পারে? আর তাই না, শত্রুদের মধ্যে প্রবেশ করে একা শত্রু নগরীকে সবার সামনে এভাবে কেউ দুর্দশাগ্রস্ত করতে পারবে? হনুমান একাধারে সীতা, আমার, লক্ষ্মণের আর পুরো রঘুবংশের প্রাণ রক্ষা করেছে। এইসব বলার পর বলছেন, খবর তো পাওয়া গেল কিন্তু আমরা যাব কি করে? এত বিশাল সমুদ্রকে আমরা পার করব কিভাবে? তখন সুগ্রীব বলছেন, এই নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, আপনি আমাদের উপর সব দায়ীত্ব ছেড়ে দিন। আমাদের সব বানররা মিলে একটা না একটা উপায় বার করে নেবে। সুগ্রীব সব বানর সেনাপতিদের আদেশ দিলেন, সব সেনাপতিরা যেন তাদের নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হনুমানের স্কন্ধে আমি বসব আর লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে বসবে। এইভাবে সব ঠিকঠাক করার পর পুরো দলটা এবার চলতে শুরু করেছে। এই জায়গাতে এসে আমরা জাতি আদি ব্যাপারটা মাথা থেকে নামিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে এবার বানর, ভল্লুক রূপ নিয়েই চলছি। সবাই লম্ফঝম্প করতে করতে চলেছে আর নিজেদের লেজের আওয়াজ করছে। সবাই অবাক হয়ে দেখছে এ এক বিচিত্র সৈন্যদল যুদ্ধ করতে চলেছে।

চলতে চলতে সবাই যে জায়গায় হনুমানরা ছিলেন সেই জায়গাতে পৌঁছে গেছেন। দেখানো হচ্ছে এই হল সেই সমুদ্র যার মধ্যে অনেক মকরাদি আছে। এবার আমাদের বিশেষ উপায় বার করতে হবে। এই বিশাল সমুদ্র দেখে আবার শ্রীরামচন্দ্রের মনে দুশ্চিন্তা দানা বাঁধতে শুরু হয়ে গেছে। দুশ্চিন্তা সবারই মনে আসা স্বাভাবিক। রাবণকে বধ করতেই হবে, ওপারে না গেলে বধ করা যাবে না। কিন্তু ওপারে যাব কি করে? শ্রীরামচন্দ্র ভেবে ভেবে খুব দুঃখ করতে শুরু করলেন —

রামঃ সীতামনুস্মৃতা দুঃখেন মহতাবৃতঃ।
বিলপ্য জানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমানুষ।৬/১/৪৯
যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ।৬/১/৫০
তং ন স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্।
দুঃখহর্ষভয়ক্রোধ লোভমোহমদাদয়ঃ।৬/১/৫১

শ্রীরামচন্দ্র সনাতন পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা, ভগবান। অথচ তিনি এই কার্যসিদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের মত বিলাপ করছেন। বলছেন যাঁরা ঈশ্বরের চিন্তন করেন তাঁদেরকেই শোক আর মোহ স্পর্শ করে না, আর যিনি অদ্বয় আনন্দ তাঁর কোথা থেকে শোক হবে! কথামৃতে খুব নামকরা একটা সংলাপ আছে যেখানে সামাধ্যায়ী বলছেন, ঈশ্বর হলেন নিরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাঁকে রসপূর্ণ করতে হবে। ঠাকুর শুনে বলছেন, দেখো দিকি কি কথা বলছে! বেদ যাকে কিনা বলছেন রসস্বরূপ সামাধ্যায়ী তাঁকে বলছেন নীরস। শাস্ত্র হল যাঁরা জিনিসগুলিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অনুভূতি করেছিলেন, তাঁদের অনুভূতির কথা। সেইসব ঋষিরাই ব্যাখ্যা করে বলছেন, যাঁরা ঈশ্বরে ভক্তি করেন, ঈশ্বরের প্রতি যাঁদের প্রেম উদয় হয়েছে তাঁদের জীবন থেকে শোক আর মোহ চিরদিনের মত চলে যায়। ঠাকুরেরও নরেনের জন্য মন খারাপ হচ্ছে, শ্রীশ্রীমায়ের জন্যও ঠাকুরের চিন্তা হচ্ছে; কিন্তু সেটা শোক আর মোহ নয়। ঠিক যে দায়ীত্ব বলব জিনিসটা তাও নয়। কারণ অবতারের কোন দায়ীত্ব থাকে না। একজন জ্ঞানী পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের যে এতদিনের অভিজ্ঞতায় ধারণা হয়েছে, সেটাকেই অনেক গুণ বাড়িয়ে দিলে অবতারেরও ঠিক তাই হয়। অষ্টাবক্রসংহিতায় বলছেন, যার এখনও কর্তব্যবোধ আছে সে কী করে সাধন ভজন করবে? কর্তব্যবোধ থাকা মানে সে সংসারের সাথে জুড়ে আছে। এই কথা ভগবান গীতায় বলছেন *ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন*, হে পার্থ! এই তিনটে লোকে আমার কোন কর্তব্য নেই। ঈশ্বরের আবার কিসের কর্তব্য? ঈশ্বরের যেহেতু কোন কর্তব্য নেই, সেইহেতু অবতারেরও কোন কর্তব্য থাকে না আর যাঁরা জ্ঞানী পুরুষ তাঁদেরও কোন কর্তব্য থাকে না। ঠাকুর বলছেন, যারাই সাধন ভজনের পথে আসে তাদের যাতে এই কর্তব্য

বোধ চলে যায় সেইজন্য তিনিই ব্যবস্থা করে দেন, কেউ হয়ত এসে তার সংসারের দায়ীত্ব নিয়ে নেয়। এই তিনটে স্তর, শাস্ত্রে ঈশ্বরের গুণের যে কথা বলা হয়েছে সেটাই অবতারের মধ্যে দেখা যায় আর যাঁরা সিদ্ধ পুরুষ তাঁদের জীবনেও ঐটাই দেখা যায়। সাধক যারা তারা সেটাই চেষ্টা করেন, একই জিনিস। ভগবান হলেন *রসো বৈ সঃ,* তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ, অবতারও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকেন, সিদ্ধ পুরুষরাও তাই, সেইজন্য সাধককেও আনন্দে পরিপূর্ণ থাকার সাধনা করতে হয়। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা আলাদা জিনিস। ঠাকুর মায়ের জন্য কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন, ওটা ব্যাকুলতা, ঐ কান্না শোক মোহের কান্না নয়।

এখানেও একই বিষয়ে বলছেন, *যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ,* যাঁরা ঈশ্বরের স্বরূপকে তত্ত্বতঃ জেনেছেন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপকে যিনি তত্ত্বতঃ জানেন। তত্ত্বতঃ শব্দটা একটু জটিল, এর দুভাবে ব্যাখ্যা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের তত্ত্বকে যিনি বৌদ্ধিক দিয়ে জানেন এই অর্থেও যেমন হয় তেমনি যিনি ঐ তত্ত্বকে অনুভব করেছেন সেই অর্থেও হয়। আচার্য গীতার ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, যারা জ্ঞানের পথে এসেছে তারাও জ্ঞানী। কিছু কিছু ধারণাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট করতে হয়, স্পষ্ট থাকলে এই সংশয়গুলো আসে না। সাধকরা যেটা চেষ্টা করে করেন সিদ্ধরা সেটাতে স্বাভাবিক হয়ে যান আর অবতারের ঐটাই স্বভাব। আর সেটাই যখন দেশ, কাল সব কিছু থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে সেটাই ঈশ্বরের স্বরূপ। এটাকে জানাও যা ওটাকে জানাও তাই। যদি কেউ ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে যায় তখন এটাও জেনে যাবে একজন সাধককে কিভাবে আচরণ করতে হবে। এখানে বলছেন যিনি ঈশ্বরের স্বরূপ জেনে যান তাঁকে আর শোক মোহ স্পর্শ করতে পারে না। একটা শিশু যখন তার মায়ের কোলে থাকে তখন তার আর কোন শোক-মোহ থাকে না। আর যিনি সাক্ষাৎ অবতার তাঁর আর শোক মোহ কোথা থেকে আসবে! প্রশ্নই নেই। এটাই বলছেন, শ্রীরামচন্দ্র বিলাপ করছেন, এ কি করে সম্ভব! শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে ঠাকুরের খুব সুন্দর সুন্দর কথা আছে, রামলালের খুড়ির কথা ভাবলুম, কী হবে তার? কি আর হবে! আমি যেমন আছি তেমনিই থাকবে, হরিনাম করবে। তার মানে আমি যদি অভাবেও থাকি সেও অভাবে থাকবে, আমার যদি খাওয়া-দাওয়া জোটে তারও জুটবে। কিন্তু সংসারীদের যেভাবে দুশ্চিন্তা হয় এখানে ঐ দুশ্চিন্তা নেই, এটা আলাদা জিনিস। সংসারে থাকার জন্য একটা অবলম্বন করে নেওয়া, এর বেশি কিছু না। সাধককে এটাই একটু চেষ্টা করে করে নিজেকে নিয়ে যেতে হয়, অত ভাবাভাবির কি আছে! সন্তানদের একটা প্রতিপালনের ব্যবস্থা করবে, অসুখ-বিসুখের জন্য একটা মেডিক্লেম করে রাখল। এর বেশি ভাবতে নেই। *যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ,* তাঁর তত্ত্বটা জানতে হবে। বিষয়ী লোকেরা তত্ত্বটা জানে না, রামকথা শুনেই বলবে তিনি বালীকে লুকিয়ে কেন মারলেন, সীতাকে কেন বনবাসে পাঠালেন? রামের তত্ত্বটা যারা জানে না তাদের সাথে কী কথা বলতে যাবে! যিনি শ্রীরামের তত্ত্বকে জেনেছেন তাঁকেই শোক আর মোহ স্পর্শ করতে পারে না। তাহলে অবতারকে কে স্পর্শ করবে!

দুঃখহর্ষভয়ক্রোধ লোভমোহমদাদয়ঃ, দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি এগুলো অজ্ঞানের লক্ষণ, যেগুলো অজ্ঞানের লক্ষণ সেগুলো চিদাত্মাতে কি করে থাকবে? যিনি অবতার তিনি ভগবান ঠিকই কিন্তু জগতে এসে তিনি মানুষ হয়ে আছেন। ঠিক মানুষের মতই তিনি আচরণ করেন, মানুষের মতই সব কিছু করেন, কিন্তু তাঁর যে বাস্তবিক সত্তা সেখানে তাঁকে কোন কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। শ্রীরাম সীতার জন্য বিলাপ করছেন, শ্রীরামচন্দ্র এর উপর ক্রোধ করছেন, তার উপর রেগে যাচ্ছেন, এগুলোকে সেভাবে নিতে নেই। বাল্মীকি রামায়ণে তাঁকে মর্যাদাপুরুষ, যুগপুরুষ রূপে দেখানো হয়েছে সেইজন্য এগুলোর বর্ণনা করেছেন, তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যখন অবতার রূপে দেখা হবে তখন এই জিনিসগুলো থাকবে না।

দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদাত্মনঃ।৬/১/৫২
সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে।

যে দেহী, যার দেহের বোধ আছে দুঃখ তারই হয়। কিন্তু যিনি চিদাত্মা, আত্মাতে যিনি অবস্থিত তাঁর কখনই দুঃখ হয় না। প্রচুর দুঃখ কষ্টে আমরাও যদি চিন্তা করি আমি তো সেই শুদ্ধ আত্মা, আমার আবার কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, তাও আমাদের দুঃখ কষ্ট চলে যাবে না, কারণ আমাদের সেই রকম ট্রেনিং নেই। কিন্তু কিছুটা লাঘব হবে, বিষদংশনের জ্বালাটা কমে যাবে। কিছুক্ষণের জন্য চলে গিয়ে অন্য একটা ভাব আসবে। আর বলছেন, *সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে।* সাধনা করতে করতে যখন সমাধিতে চলে যায় তখন তার শুধু সুখের অনুভূতি হয়। এই জায়গাতে ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক অনুভূতির বর্ণনা করছেন। তিনটে অবস্থার কথা বলা হয়,

জাগ্রত, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। সুষুপ্তিতে মানুষের চেতনাটুকু থাকে কিন্তু আর কোন বোধ থাকে না। কিসের চেতনা থাকে? আমি এমন গভীর ঘুমিয়েছি যে আমার কিছু মনে নেই আর তখন খুব সুখে ছিলাম। এই যে বলছে, আমার কিছু মনে নেই আর আমি সুখে ছিলাম, এই দুটো মনে করিয়ে দিচ্ছে যে সুষুপ্তিতে কিছু একটা থেকে যায়। সমাধি অবস্থাটা জাগ্রত অবস্থারই অন্য একটা স্তর, তুরীয় অবস্থা, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পৌঁছানর চেষ্টা। সমাধিতে যেখানে মন লয় হয়ে যায়, তখন বোধ হয় আমি খুব সুখে আছি, আমি খুব আনন্দে আছি। তার সাথে তার দেহ বোধ আর বুদ্ধি বোধ চলে যায়। যেমন সুষুপ্তিতে চলে যায় তেমনি সমাধিতেও চলে যায়। সুষুপ্তি আর সমাধিতে একটাই পার্থক্য। সুষুপ্তিতে মানুষ যেমনটি যায় তেমনটি ফিরে আসে, অজ্ঞানী অজ্ঞানী হয়েই ফেরত আসে। সমাধিতে যদি অজ্ঞানীও চলে যায় যখন ফেরত আসে তখন জ্ঞানী হয়ে ফেরত আসে। এই একটাই তফাৎ, বাকি সব কিছুই এক, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে যা যা হয় সমাধিতে ঠিক তাই তাই হয়। বলছেন, আমরা যা কিছু দেখছি, অনুভব করছি, সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ এগুলো সব বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধি দেহকে সঞ্চালন করে, দেহের যা কিছু হয় বুদ্ধি মনে করে আমারই সব কিছু হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবিক কিছুই হয় না। শ্রীরামচন্দ্র সেই আদিপুরুষ, তিনি সেই শুদ্ধ আত্মা, তাঁর মধ্যে সুখ-দুঃখ কোথা থেকে আসবে! যারা সাধারণ লোক, অজ্ঞানী তারা যখন মায়ার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখে তখন মনে করে তিনি দুখী ছিলেন, তিনি সুখী ছিলেন, তিনি ভুল করেছিলেন, তিনি ঠিক করেছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু যাঁরা আধ্যাত্মিক মার্গে আছেন তাঁরা কখনই এভাবে দেখবেন না। শ্রীরামচন্দ্রের দুটো ব্যক্তিত্ব, একটা ব্যক্তিত্ব যারা জাগতিক লোক তারা একভাবে দেখছে, আরেকটা ব্যক্তিত্ব যেটাকে আধ্যাত্মিক সাধকরা দেখছেন। জাগতিক লোকেরা কাউকেই ছাড়বে না, যীশুকেও ছাড়ে না, বুদ্ধকেও ছাড়ে না। তাদের কথাকে গ্রাহ্য করতেও নেই।

অন্য দিকে রাবণ নিজের মন্ত্রীদের সভা ডেকে শলাপরামর্শ করে বলছে, এটা কি করে সম্ভব হল? যে নগরীতে কেউ প্রবেশ করতে পারে না, পাহাড়ের উপর এই লঙ্কা নগরী সেখানে একটা হনুমান কোথা থেকে এসে এত কাণ্ড করে দিল। এখন আমাদের কী করা উচিত আমাদের বিচার করতে হবে। এখানে একটু অন্য রকম ব্যাপার নিয়ে আসা হয়েছে, কুম্ভকর্ণকে এই সময় নিয়ে আসা হয়েছে, অন্যান্য রামকথায় রাবণ যখন আর পারছে না তখন কুম্ভকর্ণকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। যাই হোক অন্য রাক্ষসরা তখন বলছে, একটা অঘটন হয়ে গেছে কি আর করা যাবে, চিন্তার কি আছে, বারবার কি অঘটন হবে নাকি! আপনি একবার আদেশ দিয়ে দিন আমরা সবাই এক্ষুণি রাম সহ সবাইকে পিটিয়ে দিয়ে আসছি। কুম্ভকর্ণের বর্ণনা সব রামকথাতে একই রকমের। এখানে কুম্ভকর্ণকে নিয়ে কিছু আলোচনা করছেন না, হয়তো আলোচনা সেরে আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে। কুম্ভকর্ণ কিন্তু এখানে রাবণকে অন্য রকম কথা বলছে –

আরব্ধং যৎ ত্বয়া কর্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্।
ন দৃষ্টোহসি তদা ভাগ্যাৎ ত্বং রামেণ মহাত্মনা।৬/২/১৪

হে রাবণ! তুমি সীতাকে এভাবে নিয়ে এসে ঠিক কাজ করোনি, তোমার নাশের জন্যই এই কর্ম করেছ। তোমার ভাগ্য খুব ভালো যে রাম তোমাকে দেখতে পাইনি তুমি যে সীতাকে অপহরণ করছ, তা নাহলে সেখানেই তোমার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়ে যেত। আর শ্রীরামচন্দ্র কোন সাধারণ লোক নন, তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ আর সীতা হলেন লক্ষ্মী। একটা বিরাট বড় তিমি মাছও যদি একটা বিষপিণ্ড খেয়ে নেয় সেও শেষ হয়ে যাবে। তুমিও ঠিক সেইভাবে সীতাকে তোমার গলায় ফাঁসিয়েছ, তুমি যতই শক্তিমান হও তুমি যখন এই বিষকে নিয়ে নিয়েছ, তোমার বিপদ এসে গেছে। তবে যাই হোক, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমরা তোমার ভাই, সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করব, তুমি এখন সুস্থ চিত্ত হও। বিভীষণ তখন বলছেন, এটা কিন্তু ঠিক হবে না, আমাদের যত বড় বড় বীররা আছে এরা কেউই শ্রীরামচন্দ্রের সাথে পারবে না।

বিভীষণকে রাবণের অপমান এবং বিভীষণের রামের আশ্রয় গ্রহণ

সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ গ্রস্তোহসি রাজন ন চ তে বিমোক্ষঃ।৬/২/২৩

সীতা এক মহাগ্রহ, সীতা নামক এই মহাগ্রহ তোমাকে গ্রাস করে নিয়েছে, তুমি আর এর থেকে বেরোতে পারবে না। আমরা বলি সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। আমরা সুখের আশায় অনেক কিছু করে বসি, তারপর দেখা যায় সেটা থেকে প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয়, তখন আর সেটাকে ছাড়াও যায় না। বন্ধু বান্ধবরাও বলছে ছেড়ে দাও, কিন্তু তাও ছাড়তে পারি না। বিভীষণ বলছেন, এতে তুমিই যে শেষ হয়ে যাবে তা না, আমাদের পুরো বংশের নাশ

হয়ে যাবে। সেইজন্য বলছি, শ্রীরামচন্দ্রের বাণ এসে নাশ করে দেওয়ার আগে চলো সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রত্যার্পণ করে দিই। তা নাহলে তুমি যেখানেই চলে যাও, শ্রীরামচন্দ্রের হাত থেকে তুমি বাঁচবে না। এইসব কথা শুনে রাবণ স্বাভাবিক ভাবেই খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। অসন্তুষ্ট হয়ে রাবণ বিভীষণকে বলছে, তুমি আমারই দেওয়া জিনিস খাচ্ছ আর আমারই নিন্দা করছ, আমারই বিনাশ চাইছ –

অনার্য্যেণ কৃতঘ্নেন সঙ্গতির্নে ন যুজ্যতে।
বিনাশমভিকাঙ্ক্ষন্তি জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা।৬/২/৩০

তোমার মত কৃতঘ্নের সংসর্গ করা আমার পক্ষে অনুচিত। জগতে দেখা যায় নিজের যারা পরিজন, যারা জ্ঞাতি তারাই নিজের লোকের বিনাশ আকাঙ্খা করে। রাবণ এখানে একটা খুব সত্যি কথা বলছে, নিজের জাতি, নিজের জ্ঞাতি, নিজের পরিজন এরা নিজের লোককে উঠতে দিতে চায় না। বাঙালী বাঙালীকে উঠতে দিতে চায় না, বিহারীরা বিহারীদের উঠতে দিতে চায় না। এর অন্য রকমও আছে, কিন্তু অন্য রকম থাকলেও নিজের কমিউনিটিতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে গজরাতে থাকে। যারা উপরে উঠে গেছে তাদেরও চিন্তা, এই বুঝি আমার লোকেরা ক্ষতি করে দেবে, আর যারা উপরে উঠতে পারছে না তাদেরও ভেতরে জ্বালা, আমার লোক আমার থেকে উপরে উঠে গেছে! ঠিক তেমনি জ্ঞাতি জ্ঞাতিকে সহ্য করতে পারে না। রাবণ এই কথাই বিভীষণকে বলছে, তুমি আমার জ্ঞাতি কিনা তাই তুমিও আমার বিনাশ চাও। সব বলার পর রাবণ বিভীষণকে বলেই দিলেন অন্য কোন রাক্ষস যদি আমাকে এই কথা বলত তাহলে আমি তাকে এক্ষুণি বধ করে দিতাম কিন্তু তুমি আমার ভাই, তোমাকে আর আমি কি করব, তুমি রাক্ষসকুলের অধম, তোমাকে ধিক্।

রাবণের কঠোর বাক্যে মর্মাহত হয়ে বিভীষণ তাঁর গদাটা নিয়ে নিজের চারজন মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন। আকাশে অবস্থিত হয়ে রাবণকে বলছেন, আমি তোমাকে ভালো কথাই বলতে চাইছিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে ধিক্কার দিলে, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, তাই বলছি এই যে সীতা রূপে তোমার কাল উপস্থিত হয়েছে, তোমার এবার বধ হবেই। তারই প্রেরণায় সেই শ্রীরামচন্দ্র তোমার বিনাশ চাইছেন, সেইজন্য তোমার জন্য যে হিতকথা আমি বলছি, তুমি শুনতে চাইছ না। তিনি সবারই অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, সেই ভগবান যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই সংহার করেন। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি বরদান দিয়ে তোমাকে এত ক্ষমতাবান করেছেন তিনিই এখন কালরূপী হয়ে তোমার সংহার করতে নেমেছেন। গীতাতেও ভগবান এই কথাই বলছেন *কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ*, বিনাশ করার জন্য আমি এই রূপ ধারণ করেছি। সেইজন্য সীতাকে নিমিত্ত করে তোমাকে মারবেন। কারণ তিনিই সৃষ্টি করেন তিনি সংহার করেন, সবেতেই তিনি একটা অবলম্বন করে নেন। আমি চোখের সামনে এই সংহার দেখতে পারব না, সেইজন্য আমি এখান থেকে চললাম, তুমি ভোগ কর, কিন্তু তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবি। আর তোমার সাথে এই রাক্ষসকুলেরও বিনাশ হয়ে যাবে। এই সব কথা বলার পর বিভীষণ শরণাগতি নেওয়ার জন্য উড়ে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে পৌঁছে গেলেন।

এদিকে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে শ্রীরামচন্দ্র অপেক্ষা করে আছেন। সমুদ্রের পথ দেওয়ার তো কোন প্রশ্নই নেই, সে তার নিজের মতই চলছে। শ্রীরামচন্দ্র এখন অনেক রকম চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছেন। পরের দিকের রামকথাতে লেখকরা বানিয়ে দিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের কাছে তিন দিন ধরে প্রার্থনা করে যাচ্ছেন আমাকে পথ দাও বলে। প্রার্থনা করে যখন কিছুই হচ্ছে না, তখন তিনি অগ্নি বাণ সন্ধান করলেন। অগ্নি বাণ সন্ধান করে লক্ষ্মণকে বলছেন, সমুদ্রের কাছে আমি পথ চাইছি, সে আমাদের পথ দিচ্ছে না, এবার দেখ! এই বাণ দিয়ে আমি এক্ষুণি সমুদ্রকে শুষ্ক করে দিচ্ছি। অগ্নি বাণ সন্ধান করতেই সমস্ত জগৎ স্তব্দ হয়ে গেছে। তখন সমুদ্র তাঁর দেবতার রূপ ধারণ করে এসে বলছেন, ত্রাহি! ত্রাহি! আমাকে রক্ষা করুন। হে রাম! যখন আপনি সংসারের রচনা করেছিলেন তখন আপনি আমাকে জড় রূপেই সৃষ্টি করেছিলেন। এই যে পঞ্চ স্থূল ভূত, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এরা সবাই জড়। এই জড়ের জন্য আপনি যেমনটি আদেশ করে দিয়েছেন সেটাকে কেউ উল্লঙ্ঘন করতে পারে না। হে রাম! আপনি রাজা, আপনি হুকুম করলে আমি পথ দিয়ে দেব। শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, তুমি এখন বলছ পথ দিয়ে দেব কিন্তু যে বাণ আমি সন্ধান করে ফেলেছি এই বাণ অমোঘ, এই অমোঘ বাণকে আমি কোথায় নিক্ষেপ করি? এর লক্ষ্যস্থান তুমি দেখিয়ে দাও। তখন সমুদ্র বলছেন, উত্তরের দিকে এক প্রদেশ আছে যেখানে অনেক পাপাত্মা বাস করে সেইখানে শরক্ষেপ করে ওদের শেষ করে দিন। সব কিছু মিটে যাওয়ার পর সমুদ্র

তখন বলছেন, আপনার সাথে যে বানর সেনা আছে এদের অনেকেই খুব ভালো কাজ জানে, আপনি এদের বলুন আমার উপর সেতু নির্মাণ করতে।

এই জায়গাতে একটু আলোচনা করার আছে। সমুদ্র বলছে আমি জল আর আমি জড়। আপনি আমার স্বভাব যেমনটি বানিয়েছেন সেই স্বভাবের আমি উল্লঙ্ঘন কি করে করতে পারি! তবে আমি পথ দিয়ে দিচ্ছি। এই জিনিসগুলোকে আধ্যাত্মিক রূপে দেখতে গেলে অনেক রকম গোলমাল হয়ে যায়। বাল্মীকি তাই এই ব্যাপারটা পুরো অন্য ভাবে নিয়ে গেছেন। বাল্মীকি রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্র বাণ সন্ধান করছেন, সমুদ্রও দৌড়ে এসেছেন। এসে বলছেন, দেখুন আমার এটাই স্বভাব, আমি এভাবে কাউকে পথ দিতে পারি না। আপনি আমার উপর বাণ চালাতে পারেন কিন্তু তাই বলে আমি আমার ধর্মকে কখনই ত্যাগ করতে পারব না। লক্ষ্মণও তখন এসে শ্রীরামচন্দ্রকে আটকালেন। সমুদ্র বলে দিলেন, পথ আপনাকে আমি দিতে পারব না কিন্তু আপনাকে উপায় বলে দিচ্ছি। আপনি এখানে সেতু নির্মাণ করুন। বাল্মীকির কাছে ধর্ম ছিল প্রধান, সেইজন্য সমুদ্র বলছেন আমি আমার ধর্মকে ছাড়ব না। মোজেসের কাহিনীতেও আছে, এক জায়গায় গেলেন সেখানে যেতেই সমুদ্র চৌচির হয়ে মাঝখান দিয়ে রাস্থা হয়ে গেল। বিভিন্ন জায়গায় এই ধরণের কাহিনী তৈরী করা হয়। কিন্তু যখনই প্রকৃতির নিয়মকে কোন কিছু উল্লঙ্ঘন করে তখন আমরা সেটাকে মানতে চাই না। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনে কোথাও প্রকৃতির নিয়মের কোন উল্লঙ্ঘন নেই। স্বামীজী বলছেন যোগশক্তিতে যে ক্রিয়াগুলো হয় সেখানেও প্রকৃতির স্বাভাবিক যে নিয়ম রয়েছে তার কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন হয় না। ফিজিক্স, কেমেস্ট্রির অনেক নিয়ম আছে যা আমাদের জানা নেই, এখন আপাতত ভাবে যদি দেখা যায় যে কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন হচ্ছে তখন বিজ্ঞানীরা সঙ্গে সঙ্গে ওটাকেই একটা নিয়ম বানিয়ে দেবে। যোগকেও একটা বিদ্যা রূপে গণ্য করা হয়, সুতরাং এই বিদ্যাতে এই এই নিয়ম চলে। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে তখন যোগের কোন কিছুকেই অস্বাভাবিক মনে হবে না। কিন্তু বেলুড় মঠের সামনে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম ভেঙে দেখছি গঙ্গার মাঝখান দিয়ে একটা পথ হয়ে গেছে। তাহলে উত্তর দিক থেকে জল আসছিল সেই জল এখন কোথায় যাবে। এটা প্রকৃতির একটা নিয়ম, এই নিয়মের এখানে উল্লঙ্ঘন হচ্ছে, এর অনুমতি দেওয়া হয় না। ভগবান কখনই কোন senseless কাজ করেন না। অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন ভগবান কিন্তু কখন কখন আবার রাজার যে ব্যক্তিত্ব সেটাকেও শ্রীরামচন্দ্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এটাতেই অনেক গোলমাল হয়ে যায়। দিব্য জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জিনিসকে ঐভাবে নিতে নেই। যেমন ঠাকুর নরেনকে শেষ সময় বলছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ সেই রামকৃষ্ণ। নরেন পড়াশোনা না করে সারাদিন ঠাকুরের কাছে থাকছে বলে নরেনের মাতৃদেবী ঠাকুরের কাছে এসে ঝগড়া করছেন। ঠাকুর যদি এখন নরেনের মাতৃদেবীকে বলতেন, জানো আমি কে! আমি ভগবান, সাবধান, নরেনকে নিয়ে কোন কথা বললে আমি শেষ করে দেব তোমাকে। এরপর কি হত? তখনকার দিনে লোকেরা ঠাকুরকে পাগলা গারদে ঢুকিয়ে দিত। এভাবে কোন কিছুই হয় না। বাল্মীকি সেইজন্য যেটা বলছেন সেটাই সঠিক পথ। সেইজন্য যে কোন ভক্ত যখন কোন কিছু রচনা করেন সেই রচনাগুলোকে বিশ্বাস করা যায় না। যে জিনিসগুলি নিজস্ব একটা নিয়মে চলছে, যুক্তিতে চলছে, সামঞ্জস্য ভাবে চলছে, সেই জিনিসগুলোতে গিয়ে তাঁরা গোলমাল পাকিয়ে দেন। ফলে এই লেখাগুলো পরের প্রজন্ম যখন পড়ছে তাতে না তারা না পায় কোন দিব্য মনোমুগ্ধকারী কিছু আর না পায় বিজ্ঞানসম্মত কোন সামঞ্জস্য। ফলে প্রচুর সমস্যা নিয়ে পুরো জিনিসটাই তালগোল পাকিয়ে যায়। পাড়ার মস্তানরা যেমন মস্তানি দেখিয়ে বলে, জানো আমি কে! শ্রীরামচন্দ্রকেও যদি পদে পদে জাহির করে দেখাতে হয় জানো আমি কে! আমি ভগবান! আমার কি ক্ষমতা জানা আছে? জানার কি আছে, আপনি এমনিই করে দিন না, অতো তামাসা করার কিছু নেই। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে দেখিয়ে দিন আর তা নাহলে মানুষের মত ব্যবহার করুন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মানুষের মতই ব্যবহার করেন। কিন্তু আমরাই ভক্তি দেখাতে গিয়ে তাঁকে ঐ রকম বানিয়ে দিই। তাহলে কি তুলসীদাসের রামকথা, অধ্যাত্ম রামায়ণ এগুলো পড়া বন্ধ করে দেব? কখনই না, অবশ্যই আমাদের পড়তে হবে। ভক্ত জিনিসটাকে কিভাবে দেখে জানার জন্য আর অধ্যাত্ম রামায়ণে যে উচ্চমানের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রয়েছে এই মানের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাল্মীকি রামায়ণে নেই। বাল্মীকির সময় মোক্ষ তত্ত্বের গুরুত্ব ছিল না।

বাল্মীকি রামায়ণে সমুদ্র বলছে লোভে পড়ে বা ভয়ে পড়ে বা মোহে পড়ে আমি আমার ধর্ম কখনই ত্যাগ করব না। বাল্মীকির এই কথার কত দূর প্রভাব এটাকে বোঝার জন্যই অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। আমাদের সমস্ত শোকের মূল হল, আমরা যখন আমাদের ধর্ম ত্যাগ করি। ধর্ম ত্যাগ না করলে দুঃখ আসবে কিন্তু শোক

কখনই আসবে না। বাল্মীকি কাউকে কোন জায়গায় নিজের ধর্ম ছাড়তে দেননি। যখনই লক্ষ্মণের মনে হত সীতার প্রতি ভালোবাসায় বা নিজের ক্ষোভে দুঃখে শ্রীরামচন্দ্র ধর্মকে ত্যাগ করতে যাচ্ছেন লক্ষ্মণ তাঁকে আটকে দিতেন। লক্ষ্মণ বলছেন, দাদা আপনি এটা করবেন না। আর কথায় কথায় বলছেন, দাদা! এই কথাগুলো আপনার কাছেই শিখেছি। সমুদ্রও তাই বলছেন, আমার এটাই ধর্ম, আমি তো আমার ধর্মকে ত্যাগ করতে পারব না। কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ ভক্তিগ্রন্থ তাই এটা সেটা করে সমুদ্রের সাথে একটা সমঝোতা করা হয়েছে। এরপর সেই বিরাট সেতু, যার নাম রামসেতু, তৈরী করা হল, যে সেতু নিয়ে এখনও অনেক রকম বিতর্ক চলছে।

সবাই সেই সেতুর সাহায্যে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাবণের গুপ্তচররাও আনোগোনা করতে শুরু করে দিল। এইসব নানা রকম হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয়ে গেল লড়াই। যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা বেশি ঢুকব না। কখন রাম এগিয়ে যাচ্ছেন আবার কখন রাবণ এগিয়ে যাচ্ছে, হনুমানের লড়াই, মেঘনাদের লড়াই, সুগ্রীবের লড়াই সব লড়াইয়ের বর্ণনা চলছে। এর মধ্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে এমন বাণের আঘাত পেলেন যে তাতে তাঁর মুর্ছা হয়ে গেছে। হনুমানকে পাঠানো হল সঞ্জিবনী বুটি নিয়ে আসার জন্য। হনুমান আবার পুরো পাহাড়টাই নিয়ে চলে এসেছেন, কারণ সঞ্জিবনী গাছ কি রকম জানেন না। তারপর একটা সময় কুম্ভকর্ণকেও ঘুম থেকে তুলে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুম্ভকর্ণকে শ্রীরামচন্দ্রই বধ করে দিলেন। আবার নারদও পৌঁছে গেলেন যুদ্ধ দেখার জন। কুম্ভকর্ণের বধ হয়ে যাওয়ার পর নারদ স্তুতি করছেন –

নারদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রের স্তুতি

দেবদেব জগন্নাথ পরমাত্মন্ সনাতন।
নারায়ণাখিলাধার বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে।৬/৮/৩৪
বিশুদ্ধজ্ঞানরূপোঽপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন্।
মায়য়া মনুজাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব।৬/৮/৩৫

হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনি সেই নারায়ণ, সমস্ত জগতের আপনি হলেন আধার, আপনাকে আমার প্রণাম জানাই। হিন্দুদের এটাই মত, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধার ভগবান নিজে। এই মতকে কিছু কিছু বৌদ্ধবাদীরা এমনকি সাংখ্যবাদীরাও মানেন না আর বৈশাষিকরাও পুরোপুরি মানতে চান না। কিন্তু যুক্তিতর্ক দিয়ে এদের সবারই মতকে খণ্ডন করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ওরা যেটা বলছে তা কখনই সম্ভব নয়। অবতারতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, আপনি নিজের মায়াশক্তিতে মানুষের রূপ ধারণ করেন আর মায়ার দরুণ মানুষের মতই আপনি সুখ-দুঃখ পান, কিন্তু এটাও আপনার মায়া। মায়াকে নিয়ে আমরা এর আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি, সেখানে বলা হয়েছিল মায়া একটা technical term। আমরা যা কিছু করছি সবই আমরা কর্মের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েই করছি। আগে আগে যে কর্ম আমরা করেছি সেই কর্মগুলোই ঠেলে ঠেলে আরেকটা কর্মের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সব কিছুকে মিলিয়ে আরেকটাতে ঠেলে দিচ্ছে। ভগবানের ক্ষেত্রে এই জিনিস কখনই হয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপেই ভগবান স্বাধীন। তিনি যে কোন জায়গায় একটা কাজ নতুন করে করে দিতে পারেন বা মাঝখানেই ছেড়ে দিতে পারেন, তার জন্য তাঁর কোন কিছুই বন্ধনের কারণ হয় না। ঠিক তেমনি তিনি যদি চান আমি জন্ম গ্রহণ করব, তখন তিনি নিজের মত বেছে নেন আমি কোথায় গিয়ে জন্ম নেব। আমার আপনার ক্ষেত্রে তা হবে না, আমাদের কর্ম ঠেলে সেই রকম যোনিতে নিয়ে ফেলবে যে যোনিত আমার আগের কর্মের প্রবাহ সমান ভাবে চলতে পারে। আমি চাইলেও অন্য যোনিতে যেতে পারব না, ঐ যোনিতেই গিয়ে আমাকে জন্ম নিতে হবে। তাই না, উপরে হাজার রকম যোনি নীচে হাজার রকম যোনি, উপর নীচ যোনিতে আসা যাওয়াতে আমাদের কোন হাত নেই। মানুষ যোনিতেও কার বাড়িতে জন্ম নিতে হবে আমাদের কোন হাত নেই। কে ঠিক করে? আমাদের পেছনে যে কর্মগুলো আছে এরাই ঠিক করে। ভগবানের ক্ষেত্রে তা হয় না, তিনি নিজে ঠিক করে নেন, আমি এই যোনিতে যাব। একদিকে তিনি জন্ম নিচ্ছেন অন্য দিকে তিনি নিজেই ঠিক করছেন কোথায় জন্ম নেবেন। তাহলে এটা কি? এটাই মায়া। সেইজন্য এর technical নাম মায়া। আমাদের ক্ষেত্রে সবটাই কর্ম প্রেরিত। আমাদের সব কিছুই বন্ধনে হয় অথচ আমরা সবাই মনে করি আমি স্বাধীন। ভগবানের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো, ওনার সব কিছুই স্বাধীন কিন্তু মনে হয় যেন তিনি বন্ধনে আছেন, সেইজন্য এটাকে বলছেন মায়া। এরপর নারদ যা যা বলছেন এগুলো এর

আগেও অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে। আপনি স্বয়ংপ্রকাশ, সবারই হৃদয়ে আপনিই বিরাজ করে আছেন, আপনি চোখ খুললেই সৃষ্টি, চোখ বন্ধ করলেই সৃষ্টি শেষ, বলছেন –

যস্মিন্ সর্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
যস্মান্ন কিঞ্চিল্লোকেঽস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ।৬/৮/৩৮

এটাই অধ্যাত্ম তত্ত্বের শেষ কথা। যাঁর মধ্যে সমস্ত জগৎ ভাসমান, যেটা দিয়ে এর উৎপত্তি, যিনি ছাড়া আর কিছু নেই, সেই ব্রহ্মকে আমার নমস্কার। এর একটাই উপমা হতে পারে, মনে করা যাক মহাসমুদ্র জলে পরিপূর্ণ। এবার কোন কারণে জলের একটা অংশ হিম হয়ে গেল। ঐ হিমের প্রত্যেকটি কণার মধ্যে যেন চেতনা এসে গেছে, আমি আছি এই বোধ এসে গেছে। এরপর ওরা নিজেদের মধ্যেই সব কিছু করছে। এই হিমশৈল কোথায় ভাসছে? সমুদ্রের উপরে। কোথা থেকে তার উৎপত্তি? সমুদ্র থেকেই। মূলতঃ এটা কি? সমুদ্র। অথচ বরফের এখন চেতনা এসে গেছে, সে জানেও না আশেপাশে কোথাও সমুদ্র আছে কিন্তু সে সমুদ্রের মধ্যেই ভাসছে। বোঝানর জন্য এটাই একমাত্র উপমা। হে রামচন্দ্র! আপনাকে আমি প্রণাম করি, আপনি সেই পরমব্রহ্ম যাতে এই জগৎ ভাসমান, যেখানে এর উৎপত্তি যেখানে এর লয়। জগতে যা কিছু আছে সব তাঁতেই, সেই ঈশ্বরে অবস্থিত, ঈশ্বর থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, আর তাঁর বাইরে অন্য কিছু নেই। যেমন জল আর বরফ, জলই বরফ বরফই জল, জল ছাড়া আর কিছু নেই।

দেবর্ষি নারদ বলছেন, মুনিশ্রেষ্ঠরা আপনাকে বিভিন্ন রূপে জানেন, কেউ পুরুষ রূপে জানেন, কেউ প্রকৃতি রূপে জানেন, ব্যক্ত রূপে জানেন, অব্যক্ত রূপে জানেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমার প্রণাম। অধ্যাত্ম রামায়ণের এটাই বৈশিষ্ট্য, সাংখ্য থেকে সরে এসে প্রকৃতি যিনি তাঁকে বলছেন শ্রীরামচন্দ্র। বলছেন, যাঁরা প্রকৃতিকে প্রাধান্য দেন, যেমন সাংখ্যবাদীরা, সেই প্রকৃতিও শ্রীরামচন্দ্র। আজকের দিনের ভাষায়, যিনি মা কালীকে মানেন, সেই মা কালী কে? শ্রীরামচন্দ্র, সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমার প্রণাম। আবার অনেকে আছেন যাঁরা পুরুষকে মানেন, তিনি সাংখ্যের পুরুষ হতে পারেন বা বেদের আদিপুরুষ হতে পারেন, তিনিও সেই শ্রীরামচন্দ্র, তাঁকে আমার প্রণাম। ব্যক্ত জগৎ যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, এই জগতকেও অনেকে ঈশ্বর দেখেন, তাঁকে প্রণাম আর অব্যক্ত মানে প্রকৃতি, তাঁকেও প্রণাম। যেটা আছে সেটাও শ্রীরাম, যেটা দেখা যাচ্ছে না সেটাও শ্রীরাম। শ্রীরামচন্দ্রের বাইরে যা কিছু আছে, সবটাই অলীক, মানে এর শব্দ মাত্রই আছে বাস্তবিক কিছু হয় না। বলছেন, এমনিতে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা যায় নানা রকম তত্ত্ব নিয়ে খিচমিচ লেগে আছে। কারণ আপনার কৃপা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ নিশ্চিত কেউ ধারণা করতে পারবে না যে জিনিসটা ঠিক ঠিক কি। মরুভূমিতে মরীচিকায় জল দেখা যায়, শুধু সূর্য কিরণের খেলাতে ঐ জল দেখা যায়। ঠিক তেমনি আপনি বিশুদ্ধ চৈতন্য, আপনার যে লীলাখেলা তাতেই এই জগৎ দেখাচ্ছে। যদি এই জগৎ নাই দেখা যায় তাহলে লোকেরা আপনার ভজনা করবে কী করে? সেইজন্য যাঁরা বুদ্ধিমান পুরুষ তাঁরা আপনাকে অবতার রূপেই পূজা করেন। গীতাতেও বলছেন, নিরাকারের সাধনা করা খুব কঠিন। কিন্তু এই জগৎ আমার চোখের সামনে আছে, জগতের সব ভালো মন্দ আমার সামনে আছে, জগৎ দেখলে জগতের একজন স্রষ্টার কথা মনে আসে, সেইজন্য অবতারের মধ্যে যিনি আছেন, অবতারের মাধ্যমে তাঁর পূজা করা সহজ হয়, সেইজন্য অবতার তত্ত্বের পূজো। মানুষের পক্ষে একজন অবতারকে অবলম্বন করে সাধনা করা অনেক সহজ। মানুষ নিরাকারের কথা ভাবতে পারে না, অবয়ব ছাড়া সে থাকতে পারবে না। অদ্বৈত সাধনা খুব উচ্চমানের সাধক ছাড়া সম্ভব নয়, সেইজন্য সাধনায় অবতারের দরকার।

নারদ স্তুতি করে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, কাম, ক্রোধাদি এই যে নানান রকমের বিঘ্ন সব সময় আমাদের ভয় দেখাচ্ছে, এই ভয়েই আমরা মরছি। কিন্তু যাঁরা নিত্য হৃদয়ে আপনার ধ্যান করেন তাঁদের মন থেকে এই ভয় সমূহ দূরীভূত হয়ে যায়। সেইজন্য হে ভগবান! আমি সর্বদা আমার হৃদয়ে আপনার রূপ চিন্তন করি আর এই জগতে জীবনমুক্তের মত বিচরণ করতে থাকি। যে কোন মানুষ যদি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তন নিয়ে থাকে তার আর ভয় বলে কিছু থাকে না। আমাদের কাছে ঈশ্বর চিন্তন মুখের কথা, তার সাথে সেই ভাবও নেই আর অনন্ত চাহিদা। অনন্ত চাহিদার জন্য ভগবানের কথা চিন্তা করলেও মাথার মধ্যে ঐ চাহিদা গুলো ঘুরঘুর করে। হে ভগবান! এই যে যুদ্ধ চলছে, এই যুদ্ধের সব কিছুই ঠিক হয়ে আছে। এরপর মেঘনাদ মারা যাবে, তারপর রাবণ মারা যাবে। এই

যে কুম্ভকর্ণ, যে এত শক্তিশালী, তার বধ করলেন, সেইজন্য আপনাকে আমি প্রণাম করতে এলাম। নারদ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে মেঘনাদ যেন খুব অবাক হয়ে গেছে, কাকা এত বলশালী, শক্তিশালী বীর তিনি কী করে মারা যেতে পারেন। মেঘনাদ খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। তখন মেঘনাদ বলছে, ঠিক আছে এবার আমি শক্তির উপাসনা করতে যাচ্ছি, শক্তির উপাসনা করার পর আমি অজেয় হয়ে যাব। মেঘনাদের সঙ্কল্পের কথা শোনার পর শ্রীরামচন্দ্র ঠিক করে নিলেন আমি মেঘনাদকে বধ করতে যাব। তখন সবাই শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝাচ্ছে যে আপনি মেঘনাদকে বধ করতে পারবেন না। কারণ ব্রহ্মা মেঘনাদকে বলে দিয়েছেন, যে মানুষ বারোটি বছর ঘুমোয়নি, খায়নি একমাত্র সেই ব্যক্তিই তোমাকে বধ করতে পারবে। একমাত্র লক্ষ্মণই রামসেবার জন্য ঘুমোননি, খাওয়া-দাওয়া করেননি। প্রথমের দিকে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে বলা ও অতিবলা বিদ্যা দিয়েছিলেন, সেই বিদ্যার শক্তিতে লক্ষ্মণ নিদ্রা আর ক্ষুধাকে জয় করে নিয়েছিলেন। তাই লক্ষ্মণই মেঘনাদকে বধ করতে পারবে। এরপর মেঘনাদের শক্তি উপাসনার যজ্ঞাদিকে কায়দা করে পণ্ড করে দেওয়া হল। পণ্ড করে দিলেও মেঘনাদ তো সাধারণ কোন যোদ্ধা না। যাই হোক মেঘনাদেরও পতন হয়ে গেছে। মেঘনাদ মারা যেতে মন্দোদরীর মন এবার একেবারেই ভেঙে গেছে, অন্য দিকে রাবণও প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেছে। দৈত্যদের গুরু শুক্রাচার্যের কাছে রাবণ চলে গেল। শুক্রাচার্যও রাবণকে যজ্ঞ করতে বলে দিলেন। আমাদের সব কিছুতেই যজ্ঞের প্রাধান্য ছিল, হবন যদি করা হয় তাহলে মানুষ সব শক্তি পেয়ে যায়। যজ্ঞের ধুয়ো দেখে বিভীষণ বুঝতে পেরে গেছেন, রাবণ এমন কিছু একটা করছে যেটাতে তার ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে। হনুমান গিয়ে সেই যজ্ঞকেও পণ্ড করে দিলেন। এগুলোকে নিয়েও পরের দিকে অনেক কাহিনী তৈরী হয়েছে। একটা বর্ণনায় এখানে বলা হচ্ছে যে, বানরসেনারাও সেখানে ঢুকে মন্দোদরীকে অপমান করতে শুরু করেছে। সেটা দেখে মন্দোদরী খুব শোক করছে, রাবণের সামনেই খুব কান্নাকাটি করছে।

রাবণ বধ

তখন রাবণ মন্দোদরীকে বোঝাচ্ছে, তুমি চিন্তা করো না, আমি আত্মার স্বরূপ জানি, জীবন মৃত্যু নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। কিন্তু আমাকে যদি মরতেই হয় আমি শ্রীরামচন্দ্রের হাতেই মারা যাব, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মারা গেলে আমি সেই পরমপদ পেয়ে যাব। মন্দোদরী তখন রাবণকে বোঝাচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্র ভগবান, আগের আগের জন্মে তিনি এই এই অবতার হয়ে এসেছিলেন, তিনি এখন রঘুবংশে জন্ম নিয়েছেন। এখনও সময় আছে আপনি সীতাকে অগ্রবর্তী করে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে প্রত্যার্পণ করে দিয়ে আসুন। রাবণ তখন বলছে, তা কী করে সম্ভব, আমার জন্য আজ আমার সব সন্তানরা মারা গেছে, এত রাক্ষস সৈন্য মারা গেছে আমি এখন কি করে বনবাসী হয়ে যাব, আমি এটা মেনে নিতে পারি না। যুদ্ধ এমন জায়গায় চলে গেছে যে এখন আর কিছু করা যাবে না। এখন একটাই পথ, শ্রীরামচন্দ্রের বাণে আমার মৃত্যু হবে, এর বাইরে আর কিছু নেই। মন্দোদরী! যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমি চললাম। এবার আমার বীরগতিই হোক আর যাই হোক এই জায়গাতে এসে আমি আর কোন সমঝোতা করে নিতে পারি না। এইসব বলার পর রাবণ বেরিয়ে রণভূমির দিকে এগিয়ে গেলেন। রণভূমিতে এসে শ্রীরামচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র যত বার রাবণের মাথা কেটে দিচ্ছেন, হাত কেটে দিচ্ছেন আবার সব গজিয়ে যাচ্ছে। তখন বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে বলে দিলেন, রাবণের নাভিদেশে অমৃত রয়েছে, ঐ অমৃত শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রাবণ জীবিত থাকবে। এগুলো আখ্যায়িকা। শেষ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে যখন বধ করলেন তখন তিনি দেখছেন রাবণের শরীর থেকে একটা জ্যোতি বেরিয়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করে মিলিয়ে গেল। তখন বলছেন, যে এত লোককে এত কষ্ট দিয়েছে, কত রকম অন্যায় করেছে, কিন্তু যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের হাতে মারা গেল সেইজন্য রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সেইজন্য কোন মানুষ সারা জীবন যত যাই করে থাকুক মৃত্যুর সময় যদি শ্রীরামচন্দ্রের চিন্তন করে সে অবশ্যই তাঁকে লাভ করবে। গীতায় ভগবান ঠিক এই কথাই বলছেন, মৃত্যুর সময় মানুষ যেমন চিন্তন করবে সে সেই রকমই গতি পায়।

বিভীষণকে সান্ত্বনার ছলে লক্ষ্মণের উপদেশ

রাবণ বধ হয়ে যাওয়ার পর বলছেন, যত দিন আকাশে চন্দ্র থাকবে সূর্য থাকবে, যত দিন সৃষ্টি থাকবে তত দিন শ্রীরামচন্দ্র যে এইভাবে রাবণকে বধ করলেন এই কীর্তি অক্ষয় হয়ে থাকবে। যারা এই পবিত্র রামকথা

শ্রবণ করবেন, অধ্যয়ন করবেন তাঁরাও ভক্তি মুক্তি পাবেন। রাবণের মৃত্যুতে মন্দোদরী সহ রাবণের সব স্ত্রী, আত্মীয়রা শোক করতে শুরু করেছে। এতদিন যাই করে থাকুক, যত গালাগাল দিয়েই থাকুক শত কিছু হলেও রাবণ বিভীষণের দাদা, তাই বিভীষণের শোক আর থামছে না। লক্ষ্মণ বিভীষণকে অনেক কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছেন। একবার আপনি ভেবে দেখুন, আপনি আগে কি ছিলেন আর এর পরে কি থাকবেন। জলের প্রবাহে বালি আদি সব কিছু এসে জমা হয় আবার প্রবাহে কোথায় ভেসে যায়, জীবনও ঠিক সেই রকম। যেমন বীজ থেকে গাছ হয় আবার ঐ গাছ থেকে বীজ হয়, প্রাণী জগতের সব প্রাণীই ঠিক এভাবেই জন্মায় আবার মারা যায়। লঙ্কাকাণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ের একটা শ্লোকে বলছেন –

জন্মমৃত্যু যদা যস্মাত্তদা তসমাদ্ভবিষ্যতঃ।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ।৬/১২/১৪

জন্ম আর মৃত্যু এই দুটো যখন হওয়ার তখনই হয়, বিধাতাই সব ঠিক করে রাখেন। ঈশ্বর সব ভূতের জন্য ঠিক করে রেখেছেন কখন কার জন্ম হবে কখন কার মৃত্যু হবে। এই ধারণাটা আমাদের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। বলা হয় যে, কর্ম কেউ চেষ্টা করে করতে পারে, সেই কর্মের ফল সে পেতেও পারে আবার নাও পেতে পারে, কিন্তু মৃত্যু জিনিসটা খুব উদ্ভট। এমনই উদ্ভট যে, ঈশ্বর মৃত্যুকে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, মৃত্যুর চেষ্টা করলেও সময় না হলে হবে না। আমার যেগুলোকে সাধারণ কর্ম বলে মনে করি, সেই কর্মেও ব্যাঘাত হয়, কিন্তু কেউ দিনের পর দিন ভাত রান্না করছে, তার মধ্যে একদিন খারাপ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে মোটামুটি জানে যে আমি ভাত রান্না করতে যাচ্ছি আর ভাত রান্না হয়ে যাবে। মৃত্যুটাও একটা কর্ম, কেউ জলে ঝাপ দিয়ে দিতে পারে, গলায় দড়ি দিতে পারে, বিষপান করে নিতে পারে কিন্তু সময় না হলে তাতেও তার মৃত্যু হবে না, মৃত্যু জিনিসটা খুব উদ্ভট, অন্যান্য কর্মের নিয়মানুসারে চলে না। ঠিক তেমনি জন্মটাও অন্যান্য কর্মের নিয়মের মত চলে না। ক্ষেতে বীজ দিয়ে দিলে ফসল হয়ে যাবে আমরা জানি, মানব জন্ম ওভাবে হয় না। রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক দস্তোভস্কি, কিভাবে তাঁর নামে রটে গেল যে তিনি রাশিয়ান সম্রাটের বিরুদ্ধে। তখন তাঁর বয়স খুব কম, আঠারো কি উনিশ, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। পিস্তল লাগিয়ে মারা হবে, ওনার সাথে আরও অনেকেই ছিল। সবাইর হাত বেঁধে মাথাটা নুইয়ে দেওয়া হয়েছে, আর জল্লাদরা পেছনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউন্টিং চলছে, ওরাও গুনে যাচ্ছে এবার গুলি চলবে। সেই সময় একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সেখানে হাজির হয়েছে। সে ছিল রাজার দূত, দূত এসে ঘোষণা করছে, রাজা আদেশ দিয়েছেন এদের মারা হবে না। দস্তোভস্কি তখন বমি করতে শুরু করে দিয়েছেন। পরে সেখান থেকে তিনি এক বিরাট লেখক হয়ে গেলেন। মানুষ মরার চেষ্টা করেও মরতে পারে না, এসব নিয়ে কত কাহিনী কত কিছু আছে। আবার যাদের মৃত্যুর কথা ভাবাও যায় না, তাদেরও মৃত্যু এসে হঠাৎ করে নিয়ে যায়। সব ধর্মই বলে ঈশ্বরই সব কিছু করেন, কিন্তু এই যে বলছেন *ঈশ্বরঃ সর্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ*, জন্ম আর মৃত্যু যেন বিশেষ ভাবে ওনার হাতে রাখা আছে। সরকারের যাবতীয় যত কাজ সব প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই হয়, কিন্তু কিছু কিছু কাজ আছে যে কাজগুলো প্রধানমন্ত্রী নিজেই করেন। এখানেও যেন ঠিক ঐ ভাব, বিশেষ করে যখন যুদ্ধ বিগ্রহ চলে তখন দেখা যায় যাদের মারা যাওয়ার কথা তারা বেঁচে ফিরে আসে, যাদের বাঁচার কথা তারা মারা যায়। বোঝা যায় না এই রকম কেন হয়। সেটাই বিভীষণকে লক্ষ্মণ বলছেন, আপনি এগুলো নিয়ে মিছিমিছি ভেবে যাচ্ছেন, যখন ঠিক করা আছে তখনই সেটা হবে, ওখানে কিছু করা যাবে না। লক্ষ্মণ আরও বলছেন, এই যে এত প্রিয় দেহ, এই দেহ মা-বাবার সংযোগ থেকে এসেছে কিন্তু এই দেহের পেছনে যিনি আত্মা তাঁর কিছুই হয় না। বিভিন্ন জিনিস দিয়ে আগুন জ্বালানোর জন্য আগুনের রঙও বিভিন্ন রকমের হয়, ঠিক তেমনি শরীরের যে নানান রকমের ধর্ম তার জন্য মনে হয় আমার তোমার কর্ম আর কারও কর্ম নয়। কিন্তু আসলে জিনিসটা তা তো নয়, এগুলো সব ভ্রান্তি। লক্ষ্মণ যে উপদেশ দিচ্ছেন এগুলো খুব উচ্চমানের উপদেশ, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই ধরণের উপদেশ নেওয়া অসাধ্য। কিন্তু তাও এগুলো শুনতে হয়, শুনতে শুনতে ভেতরে কিছু ভাব ঢুকতে শুরু করে, কিছু কিছু ধারণা হতে শুরু হয়। লক্ষ্মণ বলছেন, হে বিভীষণ! সেইজন্য আপনি যত রকমের মমতা হতে পারে সব ত্যাগ করুন। এই সংসারে সবাইর কারুর না কারুর প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা আছে, কেউ নিজের স্ত্রীকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, মা নিজের সন্তানকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। এই ভালোবাসার জন্য তাদের ভেতরে একটা ভয়ও থাকে। কোন কারণে কিছু যদি হয়ে যায়, একজন যদি ছেড়ে চলে যায় তখন তার যে শোক হবে, সেই শোককে কেউ ঠাণ্ডা করতে পারবে না। আমি আপনি

কেউ তাকে কোন ভাবে বোঝাতেও পারব না। সেইজন্য যারা সত্যিকারের শান্তি চায়, সুখ চায়, প্রথম থেকেই নিজেকে একটু দূরত্ব না রাখলে খুব কষ্ট পেতে হবে। কিন্তু মানুষ এটা কখনই পারে না, জীবন এভাবেই চলে, কিছু করার থাকে না। লক্ষ্মণ যে কথাগুলো বলছেন একেবারে সত্যি কথা বলছেন, একটু ধ্যানের গভীরে গেলে, জপ-ধ্যান করতে করতে তখন মনে হবে এটাই সত্য। যেভাবেই আমরা বিচার করি না কেন, এভাবে সেভাবে বিচার করার পর মনে হবে এই কথাগুলোই ঠিক। কিন্তু বাস্তবিক জীবন চালাতে গিয়ে এগুলোর প্রয়োগ একেবারেই করা যায় না। এমনই মায়া, মমতায় আমরা ডুবে আছি, যাকে ভালোবাসি তাকে ছাড়া আমার জীবন কল্পনাই করতে পারি না। লক্ষ্মণের কথা শোনার পর বিভীষণ ভেতর থেকে একটু শক্তি পেয়ে আবার সোজা হয়ে গেলেন। কিন্তু বিভীষণ তখন আবার বলছেন –

নাহোহস্মি দেব সংস্কর্তুং পরদারাভিমর্শিনম্।
শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রীত্যে রামো বচনমব্রবীৎ।৬/১২/৩২

শ্রীরাম কর্তৃক বিভীষণকে রাবণের দাহাদি সংস্কারের আদেশ

লক্ষ্মণের কথা শোনার পর বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়ে বলছেন, আমার এই অগ্রজ ছিল নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ক্রূর, ধর্মভ্রষ্ট, ব্রতহীন এবং পরদারাগামী তাই আমি এর দাহ সৎকার করতে পারব না। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখলেও বলা খুব মুশকিল যে বিভীষণ কতটা রাবণের অনুগামী ছিলেন, কারণ এতক্ষণে তিনি শ্রীরামের প্রতাপ ও ক্ষমতা বুঝে নিয়েছেন, বিভীষণের এখন আর করার কিছু নেই, ভয়ও আছে। মালিকের ভয়ে আমরা অনেক কিছু করে বসি। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে তখন খুব সুন্দর কথা বলছেন –

মরণান্তানি বৈরাণি নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।৩৩

শ্রীরামচন্দ্র এখানে যেভাবে কথাগুলো বলছেন বাল্মীকিও ঠিক এভাবেই রেখেছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, শত্রুতা তত দিনই যত দিন মানুষ বেঁচে আছে, মরে গেলে তখন আর কিসের শত্রুতা, এখন রাবণ যেমন তোমার তেমনি আমারও। রাবণের এই দেহের সাথে তোমারও যেমন সম্পর্ক আমারও তেমন সম্পর্ক, আলাদা কিছু নেই। আমাদের সবারই বিভিন্ন ব্যাপারে ছেলেমানুষী সারাটা জীবন চলতে থাকে। অনেক কিছু ব্যাপার থাকে যেখানে একটা সময় পর্দা টেনে দেওয়া উচিৎ, আমরা সেখানে পর্দাটা টানতে পারি না। যাদের বুদ্ধি পরিপক্ক তাঁরা জানেন কোন জায়গায় পর্দা টানা দরকার। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ পর্দাটা টানতে পারে না। সন্ন্যাসীদেরও এটাই বলা হয়, এই যে তুমি ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এলে এবার তোমার আগের যে জীবন ছিল সেটাতে পর্দা টেনে দাও। সন্ন্যাসীর পূর্বাশ্রমের ভালো মন্দ যা ছিল সেখানে পর্দা টানা হয়ে গেল। মৃত্যু হয়ে গেল, ভালো মন্দ যা ছিল সেটাতে পর্দা টেনে দেওয়া হল। পর্দা দেওয়া মানে ভালোবাসাটাও শেষ, তাহলে মরা শরীরকে জড়িয়ে কি হবে! সে আমার কাছের লোক ছিল, এই দেহকে আশ্রয় করে ছিল, তার জন্য দুঃখ একটা থাকবে, শত্রুতা কখনই থাকতে পারে না। তবে শত্রুতায় ইমোশনটা আরও প্রবল হয়। মস্তিষ্কের তথ্য সংগ্রহ করে ধরে রাখার ক্ষমতা কম, কিন্তু মস্তিষ্ক ইমোশানকে খুব ভালো বুঝতে পারে। সেইজন্য চড় মেরে বাচ্চাদের পড়ালে তারা খুব ভালো মনে রাখতে পারে। মোল্লা নাসিরুদ্দিনের ছেলেকে জল আনতে পাঠাচ্ছে। ছেলেটি ঘটি নিয়ে যাচ্ছে, ওকে ডেকে আগে এক চড় মারল, ঘটিটা যেন কুয়োতে ডুবে না যায়। ছেলের বন্ধু নাসিরুদ্দিনকে বলছে, আপনি আগেই চড় মারলেন কেন? উত্তর দিচ্ছে, যদি ডুবেই যায় তখন ওকে মেরে আমার লাভটা কি! আগে থেকে মেরে দেওয়াতে ওর মনে থাকবে। ইমোশান যদি জড়িয়ে থাকে মানুষ ওটাকে ভালো মনে রাখে। খুব শক্তিশালী ইমোশান চললে স্মৃতিটা খুব ভালো থাকে, ঐ স্মৃতিকে যতই সরাতে চাই স্মৃতি থেকে যেতে চাইবে যাবে না। ইমোশানের মধ্যে বৈর ভাব, শত্রুতা প্রচণ্ড শক্তিশালী। শত্রু মারা যাওয়ার খবর পেলে ভেতরে আনন্দে ফেটে পড়বে, বাইরে নাও প্রকাশ করতে পারে কিন্তু তখনও বলবে ওর দাহ ক্রিয়াতে আমি যাব না, শ্রাদ্ধেও যাব না।

সীতাকে শ্রীরামের কাছে আনয়ন

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র মর্যাদা পুরুষোত্তম, অতুলনীয় সাম্য ভাবের ব্যক্তিত্ব। তিনি বলছেন, রাবণ মারা গেছে, মৃত্যুতে সব শত্রুতা শেষ, ওর সংস্কারাদি যা করার সবই করতে হবে। এটা খুব নামকরা কথা, *মরণান্তানি বৈরাণি*

নিবৃত্তং নঃ প্রয়োজনম্, মৃত্যুর আগে পর্যন্তই শত্রুতা, মৃত্যুর পর আর শত্রুতা থাকে না। শুধু শত্রুতাই নয়, জীবনে একটা কিছু নিয়ে সমস্যা হয়ে গেল, সমস্যাটা একটা সময় মিটেও গেল কিন্তু সমস্যার সাথে যে ইমোশান গুলো জড়িয়ে ছিল সেগুলো যেতে চায় না। মহাপুরুষ যাঁরা তাঁরা ওটাই করেন, ইমোশানকে তাঁর উপড়ে ফেলে দেন। শ্রীরামচন্দ্রের অনুমতি নিয়ে রাবণের দাহাদি কার্য সম্পন্ন করা হল। এরপর বিভীষণকে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কার রাজা ঘোষণা করে অভিশিক্ত করে দিলেন। হনুমানকে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হনুমান! তুমি বিভীষণের অনুমতি নিয়ে রাবণের মহলে যাও, আর জানকীকে খবর দাও, খবর শোনার পর জানকী যা বলবে সব আমাকে জানাও। এবার হনুমান আবার সীতার কাছে হাজির হয়েছেন। সীতাকে সব খবর দিলেন। সব খবর শোনার পর সীতা খুশি হয়ে হনুমানকে বলছেন, আমার কাছে কিছুই নেই যে তোমাকে দিই, কোন জিনিসই দেখছি না যেটা আমি তোমাকে দিতে পারি। সব বলার পর বলছেন, আমি শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন যেন পাই, এই অনুমতি যেন তিনি দেন।

ফিরে এসে হনুমানজী বলছেন, যাঁর জন্য এত কার্যের সূত্রপাত এবং যিনি এই সমস্ত কর্মের ফলস্বরূপা, হে রামচন্দ্র! এবার আপনি সেই শোকসন্তপ্তা দেবীকে দর্শন দিন। তখন আদেশ হয়ে গেল, বিভীষণকে বলা হল স্নান করিয়ে নির্মল বসন পরিধাণ করিয়ে জানকীকে নিয়ে আসা হোক। সীতাকে উত্তম পাল্কিতে আরোহণ করিয়ে যখন নিয়ে আসছেন তখন সব রক্ষীরা সীতাকে রক্ষা করে নিয়ে আসছে। বানরগুলো উঁকি মেরে সীতাকে দেখতে চাইছে। চারিদিকে খুব কোলাহল, রঘুবীর দূর থেকেই দেখছেন জানকীকে শিবিকাতে নিয়ে আসা হচ্ছে, বানররা সীতাকে দেখতে চাইছে, রক্ষীরা বানরদের ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। তখন তিনি বিভীষণকে বললেন, তোমার রক্ষীরা এভাবে বানরদের কেন ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে? সব বানররা জননীর মত যেন সীতাকে দেখতে পায় সেইজন্য সীতাকে পায়ে হেঁটে আমার কাছে আসতে বল। অধ্যাত্ম রামায়ণে এই জিনিসটা ঠিক খাপ খায় না, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণের দৃষ্টিতে পুরো খাপ খেয়ে যায়। সীতা এক বছর রাবণের হেফাজতে আছেন, শ্রীরামচন্দ্র সীতার এই এক বছরের কিছুই জানেন না, সীতার উপর কি হয়েছে, কি হয়নি, কি পরিস্থিতি কিছুই জানেন না। বাল্মীকি রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্যে কয়েকটা কটু কথা বলছেন। কিন্তু এখানে সীতা হলেন মায়া রচিত, সেইজন্য এই সীতাকে কিছু বললেও কোন দোষ নেই। এই কটু কথা শোনার পর সীতা লক্ষ্মণকে বলছেন, এই কথা শোনার পর আমার আর কিছু ভালো লাগছে না, তুমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, অগ্নিশিখাকে দেখতে দেখতে সীতা বলছেন –

যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্বতঃ পাতু পাবকঃ।৬/১২/৮২

হে অগ্নি দেবতা! আমার হৃদয় যদি কখনই শ্রীরামচন্দ্রের কাছ থেকে সরে না গিয়ে থাকে, তাহলে হে সর্বলোকের সাক্ষী অগ্নি আমাকে রক্ষা করুন। এরপর সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করে গেলন। সব বানররা হায় হায় একি হল বলে হা হুতাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এইসব দেখে দেবতারা সবাই এসে শ্রীরামচন্দ্রের বিরাট স্তুতি করলেন। তখন অগ্নি দেবতা সীতাকে নিয়ে এসে শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, তপোবনে যে সীতাকে আপনি আমার কাছে ছেড়ে গিয়েছিলেন, এই নিন সেই সীতাকে আবার আপনার কাছে ফেরত দিলাম।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করতে এসে এত যে বানর ভল্লুক মারা গেল, তাদের জন্যও খুব অনুতাপ হচ্ছে। শ্রীরামচন্দ্র তখন দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন তুমি অমৃতকলস থেকে এদের উপর অমৃত সিঞ্চন করে দাও, যারা যারা মারা গেছে তারা যেন বেঁচে ওঠে আর তারা যেন মনে করে আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমরা যেন ঘুম থেকে উঠলাম। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রেরও চৌদ্দ বছরের সময় শেষ হয়ে এসেছে, তাড়াতাড়ি করে ফেরত যেতে হবে। হনুমানকে এগিয়ে দিয়েছেন, তারপর পুষ্পক রথে আরোহণ করে এবার সবাই ফিরে যাবেন। অযোধ্যায় ভরত অপেক্ষাতেই ছিলেন। এরপর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার রাজা হয়ে গেলেন আর সেখান থেকেই শুরু হয়ে গেল রামরাজ্য। রামরাজ্য শুরু হওয়ার পর সেখানে সব দেবতারাও এসেছেন, দেবতারা সবাই আশীর্বাদ ও শুভ কামনা করেছেন। সব বানর সৈন্য যারা যুদ্ধে অংশ নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে সাহায্য করেছিল তাদের সবাইকে শ্রীরামচন্দ্র নানা রকম উপহারাদি দিয়ে বিদায় জানালেন। যুদ্ধকাণ্ডের পরে বাল্মীকি রামায়ণ শেষ হয়ে যায়। পরের দিকে অনেক প্রক্ষিপ্ত হয়ে আরেকটা কাণ্ড সংযোগ করা হয় যার নাম উত্তরকাণ্ড। এখন যত রামায়ণ লেখা হয় তাতে উত্তরকাণ্ড আবশ্যিক ভাবেই থাকবে।

উত্তরকাণ্ড

সীতার বনবাস

অযোধ্যায় ফিরে আসার পর অনেক কথা ও কাহিনী তৈরী হয়েছে। কিন্তু বাল্মীকি যুদ্ধকাণ্ডের পর আর কিছুর উপর জোর দেননি। পরের দিকে যাঁরা রামকথা রচনা করেছেন সেখানে আরেকটি কাণ্ড যোগ করে তাতে রামরাজ্যের অনেক কিছুর বর্ণনা করেন এবং আগে আগে যে চরিত্র এসেছে সেই চরিত্রের পূর্বকথা নিয়ে একটা বর্ণনা দিয়েছেন। উত্তরকাণ্ডের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী হল, একদিন শ্রীরামচন্দ্র বললেন, অযোধ্যার প্রজাদের রামরাজ্যের ব্যাপারে কি মত সেই ব্যাপারে খোঁজ নিত হবে। খোঁজ নিতে গিয়ে প্রজাদের মধ্যে সীতার শুদ্ধতা নিয়ে আড়ালে একটা গুঞ্জন শোনা গেল, সীতা এতদিন রাবণের ওখানে ছিল। শ্রীরামচন্দ্র এই আলোচনার কথা শোনার পর দেখলেন রাজার কখনই জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজের স্বার্থ বজায় রাখা উচিৎ নয়। এরপরের ইতিহাস সবার জানা, সীতাকে তিনি বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। লৌকিক লোকেরা এই নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নামে পাঁচ রকম কথা বলেন। সীতাকে যদি রেখে দিতেন তখন এরাই বলত, একটা স্ত্রৈণ লোক, স্ত্রীকে কাছে রাখাটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে গেল; প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভাবলেন না। আপনি যেটাই করুন লোকেরা আপনার নিন্দা করবেই, যে কাজই করুন না কেন একটা খুঁত বার করে দেবে। গীতার শেষে ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন! যারা আমাকে দ্বেষ করে তাদের কাছে কখনই আমার কথা বলবে না। তার মানে ভগবানকে দ্বেষ করে, নিন্দা করে এই ধরণের মানুষ চিরদিনই আছে। ভগবানেরই যখন নিন্দা হয় সেখানে আমার আপনার তো নিন্দা হবেই, আমাদের দুটো দুশমন থাকবেই, গালাগাল দেওয়ার জন্য দুটো লোক থাকবেই। শ্রীরামচন্দ্রের বেলাতেও অন্যথা হবে না। মূল কাহিনী হল, লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে জঙ্গলে বাল্মীকির আশ্রমে রেখে এলেন। সেই থেকে সীতা বাল্মীকির আশ্রমে থাকতে লাগলেন, যেখানে পরে লব আর কুশের জন্ম।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তিনি ছিলেন কট্টর গান্ধীবাদী। সেই সময় ওনার এক বন্ধু সকালে দেখা করতে এসেছেন, এসে দেখেন তিনি বাথরুমে আছেন। আধ ঘন্টা হয়ে গেল তখনও বাথরুমে, এক ঘন্টা থেকে দু ঘন্টা হয়ে গেল তখনও বাথরুমে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর বন্ধু জিজ্ঞস করছেন, এতক্ষণ বাথরুমে কি করছিলে? তিনি বলছেন, জামা-কাপড় কাচকাচি করছিলাম। বন্ধু খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। তোমার সময়ের দাম আছে, এত লোক অপেক্ষা করছে আর তুমি তোমার একটা ব্যক্তিগত আদর্শকে পালন করে যাচ্ছ? তুমি কি এটার জন্যই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে? যখন তুমি রাজা হয়ে গেছ, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছ তখন তোমার আর ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না। যে সবাইকে নিয়ে চলতে পারবে সেই রাজা হবে, রাজা মানেই তাই, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। যখন দুটো আদর্শে সংঘাত হয়, যেমন জনগণের প্রতি রাজার দায়ীত্ব আছে আবার নিজের স্ত্রীর প্রতিও স্বার্থ রয়েছে, দুটোতে সংঘাত হলে সে কোনটাকে পালন করবে? এগুলো খুব জটিল পরিস্থিতি। সেইজন্য আমাদের স্মৃতিকাররা স্মৃতিশাস্ত্রে এগুলোকে ঠিক করে দেন। স্মৃতিশাস্ত্র দু রকমের বিধান দিয়ে থাকে, একটা হল কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল, আরেকটাতে বলা হয় যখন দুটোই ঠিক। যদি দুটোতে সংঘাত লাগে তখন কোনটাকে বেছে নেবে? যেমন সত্য আর অসত্যের মধ্যে সত্যটাই ঠিক। হিংসা আর অহিংসার মধ্যে অহিংসাটাই ঠিক। এখন যদি সত্য কথা বললে হিংসা হয়ে যায়, তখন সত্যটাও ঠিক অহিংসাটাও ঠিক, এবার কোনটাকে নেওয়া হবে? স্মৃতিকাররা এগুলোকে ঠিক করে দেন। ঠিক করে তাঁরা বলে দেন এটাকেই কেন নেওয়া হবে। দুম করে আমার খেয়াল হল বলেই যে বলে দেবেন তা নয়। বাচ্চারা যেমন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে, এটা আমি কেন করব? মা তখন বলে, আমি বলছি তাই করবে। স্মৃতিকাররা এভাবে বলতে পারেন না, তাঁদের জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। উচ্চতম যে সিদ্ধান্ত আছে সেখান থেকে এনে ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দেন যে এই পরিস্থিতিতে এই কাজ এভাবেই করতে হবে। ব্যাখ্যা করে দেওয়ার পর দৃষ্টান্ত নিয়ে আসেন, আগে আগে এর এর ক্ষেত্রে এই এই রকম হয়েছে। মনু তাই বলছেন, পরিবারের কল্যাণে একজনকে ত্যাগ করতে হয়, করতে করতে শেষে বলছেন রাষ্ট্রের হিতে যদি একটা রাজ্যকে ছাড়তে হয় তাহলে সেই রাজ্যকে ছেড়ে দিতে হয়, দেশকে আগে বাঁচাতে হবে। সেখানে একটা পরিবার তো অনেক আগে, প্রথমেই বলে দিচ্ছেন একটা পরিবারের স্বার্থের জন্য একজন সদস্যকে যদি ত্যাগ করতে হয়ে ত্যাগ করে দাও। এখানে তো আর পরিবার নেই, পুরো অযোধ্যা রাজ্যের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। যেখানে সীতার জন্য এত অশান্তি হচ্ছে সেখানে কি করে সীতাকে রাখা যাবে?

লোকেরা সব বোকা বোকা কথা বলে। ঠাকুর বলছেন, মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর ওঠে, নিজেরা সংসারী, নিজেরা বিষয়ী তাদের মুখ দিয়ে এর বাইরে কি কথা আর বেরোবে। এরাই রামকথা পড়ছে আর ঐ বুদ্ধি নিয়ে বিচার করছে রাম আর সীতার চরিত্র।

উচ্চ আদর্শকে ধরে রাখা সত্যিই খুব কঠিন। অল্প বয়সী সন্ন্যাসীদের বড়দের সঙ্গ করে উচ্চ আদর্শের নিদর্শন চোখের সামনেই দেখা হয়ে যায়। কিন্তু সন্ন্যাসীদের পক্ষেও এই উচ্চ আদর্শ পালন করা যে কত কঠিন কল্পনা করা যায় না। উচ্চ আদর্শের কথা যদি শোনে, একটু বোঝারও যদি চেষ্টা করে তাতেই আমাদের মাথা ফেটে যায়। বেলুড় মঠে ছিলেন স্বামী শান্তানন্দ মহারাজ, উনি অত্যন্ত উচ্চমানের এবং সম্মানীয় সাধু। ধ্যানের গভীরে যে অনাহত ধ্বণি যোগীরা শুনতে পান, উনি সেই অনাহত ধ্বণি সব সময় শুনতেন, মানে ওঁ ধ্বণি সব সময় শুনছেন। ফলে তিনি ভালো করে ঘুমোতেও পারতেন না। সেইজন্য সারা রাত ধ্যানে বসে জপ করে যেতেন। তিনি ঘুমোতেই পারতেন না, কানের কাছে যদি সব সময় কেউ ঘন্টা বাজায় সে কি করে ঘুমোবে! কিন্তু অনাহত ধ্বণি কোন বিরক্তিকারক শব্দ নয়, একটা soothing শব্দ। ঠাকুরেরও যার জন্য ঘুমটুম হত না। যাঁরা উচ্চমানের সাধক, ধ্যান-জপ করে খুব উচ্চ অবস্থায় চলে যান বিভিন্ন কারণে তাঁদের ঘুম অনেক কমে যায়। তার মধ্যে এটাও একটা কারণ। এক যুবক সন্ন্যাসী ওনার ঘরে থাকতেন। তখনকার দিনে ঘরের সংখ্যাও কম ছিল, যুবক সন্ন্যাসীকে স্বামী শান্তানন্দজীর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনি রাত্রিরে খাওয়া-দাওয়া করে এসে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমিয়ে পড়ার পর দেখেন মহারাজ ঐ ভাবে ধ্যান করে যাচ্ছেন। সকালে ওনার ঘুম ভাঙতে চায় না। কিছু দিন পরে এনার মনে হল, উনি একজন বৃদ্ধ সাধু কিন্তু সারা রাত বসে ধ্যান করে যান আর আমি একজন যুবক সন্ন্যাসী হয়ে পরে পরে ঘুমোচ্ছি, নাঃ আমাকেও ধ্যান করতে হবে। উনি তখন পরের দিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়া করে হাঁটাচলা করে ঘরে এসে দেখছেন মহারাজ ধ্যান করছেন, উনিও তখন ধ্যানে বসে গেলেন। দশ-পনের মিনিট পর থেকেই এই সন্ন্যাসী উশখুশ করতে শুরু করেছেন। রাত্রিবেলা ধ্যান করা খুব কঠিন, বিরাট ইন্দ্রিয় সংযম যদি না হয়ে থাকে আর মনের সাংঘাতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলে হবে না। উনি বসে নড়াচড়া করছেন, একটু তো আওয়াজ হবেই। শান্তানন্দজী দেখলেন, তখন কিছু বললেন না। আবার উনি একবার শুয়ে পড়ছেন, আবার উঠে বসছেন, হাই তুলছেন। এই করে করে কোন রকমে রাতটা কাটল। সকালে শান্তানন্দজী ওনাকে বলছেন, দেখো! আমার অন্য রকম অবস্থা, আমাকে নকল করতে যেও না। বেলুড় মঠে তোমাদের জন্য যেমন রুটিন করা আছে সেই রুটিনটাই তুমি এখন পালন করতে থাক। আর যখন তোমার ঐ অবস্থা হবে তখন তুমি চেষ্টা করবে। এগুলো হল অত্যন্ত উচ্চ আদর্শ, উচ্চ আদর্শ পালন করা কত কঠিন বোঝানর জন্যই স্বামী শান্তানন্দজীর এই ঘটনাটা বলা হল। দীর্ঘকাল উনি উত্তরকাশীতে ছিলেন। রাত্রিতে কিছু খেতেন না, দুপুরবেলা ভিক্ষায় যেতেন, রুটি-ডাল যা পেতেন গঙ্গার ধারে ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করে, বাসন মেজে এপারে চলে আসতেন। আর সারাদিন নিজের জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায় এসবের মধ্যে ডুবে থাকতেন। উচ্চ আদর্শ পালন করার আগে চাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, যার মধ্যে ব্রহ্মচর্য হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন না করা থাকে আর তারপর যদি উচ্চ আদর্শের দিকে যায় তাহলে মাথা বিগড়ে যাবে। উপনিষদের কথা, যোগের কথা, রামগীতার কথা যেটা শুরু করতে যাওয়া হচ্ছে এগুলো যতক্ষণ শোনা হচ্ছে ততক্ষণ ভালো, একটা জিনিস জানা হয়ে থাকল। আলতু-ফালতু জিনিস শোনার থেকে, খোশ গল্প করার থেকে এগুলো শোনা অনেক ভালো। ঠাকুর বলছেন শুনে রাখা ভালো। বোঝার চেষ্টা করলে মাথাটা ফেটে যাবে। এগুলোকে ধারণা করা এখন সম্ভব নয়। কারণ সত্য, হিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এগুলোতে যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকে মস্তিষ্ক উচ্চ জিনিসকে নিতে পারবে না, নেওয়ার চেষ্টা করলে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে। সেইজন্য ধর্ম পথে যারাই আসে তাদের বেশির ভাগই হয়ে যায় ফ্রড, কয়েকজনকে বাদ দিয়ে বাকি সবার মাথার গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাহলে ভাবুন, বিষয়ী লোকেরা যখন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তখন সেই বিশ্লেষণ কি রকম হবে বোঝাই যায়। চুপচাপ শুনে যেতে হয়, কিছু বলার উপায় নেই। কারণ মুর্খদের সাথে তর্ক করে কোন লাভ নেই।

রামগীতা

সীতা বনবাসে চলে গেলেন। শ্রীরামচন্দ্র রাজকার্য চালাচ্ছেন। সাথে লক্ষ্মণ আছেন, মাঝে মাঝে লক্ষ্মণ এটা ওটা প্রশ্ন করেন, শ্রীরামচন্দ্র সব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন, তার সাথে কিছু কিছু পুরনো কথাকাহিনীও বলেন। এইভাবে প্রশ্নোত্তর পর্ব ও কাহিনী চলতে চলতে পঞ্চম অধ্যায়ে লক্ষ্মণ কিছু প্রশ্ন করেছেন, শ্রীরামচন্দ্র তার যে

উত্তর দিচ্ছেন এটাই প্রসিদ্ধ রামগীতা রূপে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দু ধর্মে গীতা শাস্ত্র এমনই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, পরের দিকে যাঁরাই ভালো কোন অধ্যাত্ম শাস্ত্রের রচনা করতেন তার নাম গীতা দিয়ে দিতেন। কিন্তু গীতা নামে যত গ্রন্থ আছে তার কোনটাই মূল গীতার সমতুল্য নয়। হিন্দু ধর্মের যা কিছু বক্তব্য সব ঐ একটা ছোট্ট বইয়ের মধ্যে দেওয়া আছে। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই অংশকে বলা হয় রামগীতা। লক্ষ্মণ বলছেন –

অহং প্রপন্নোহস্মি পদাম্বুজং প্রভো ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্।৭/৫/৫

হে শ্রীরাম! যোগীরা আপনার চরণকমলের ধ্যান করেন, আপনার চরণকমলের ধ্যানই ভবমুক্তির উপায়। আমি সেই যোগীগণের চিন্তনীয় সংসার বন্ধনের মুক্তিকারক আপনার পাদপদ্মের শরণাগত, আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন যার দ্বারা আমি এই অজ্ঞানরূপ সংসার সাগরের অপার জলরাশিকে অনায়াসে পার করতে পারি। এতক্ষণ আমরা যে অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করলাম, এবার অধ্যাত্ম রামায়ণের সার উপস্থাপন করার জন্য এই প্রশ্নের অবতারণা করা হল। গীতাতেও ঠিক এই শৈলী নেওয়া হয়েছে, যখন কোন একটা তত্ত্বের আলোচনা করতে চাইছেন, তার আগে অর্জুনের মুখে একটা প্রশ্ন তুলে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে ভগবান উত্তর রূপে ঐ তত্ত্বকে সামনে রাখছেন। এখানেও লক্ষ্মণের মূল প্রশ্ন হল সংসার থেকে মুক্তি কিভাবে হয়। এই প্রশ্নের আলোচনা পুরো অধ্যাত্ম রামায়ণ জুড়েই করা হয়েছে কিন্তু সেটাই আবার সংক্ষেপে এখানে বলছেন, তা সত্ত্বেও অনেক কিছুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন –

আদৌ স্বর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানঃ।
সমাপ্য তৎপূর্বমূপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে।৭//৫/৭

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে বলছেন, হে লক্ষ্মণ! নিজের বর্ণাশ্রমে তোমার যে কর্মের বিধান করা হয়েছে, সেই কর্ম করে আগে নিজের মনকে শুদ্ধ পবিত্র কর। বর্ণাশ্রমের কথা বলছেন, বর্ণাশ্রম মানে জাতিপ্রথা, জাতিপ্রথাতে তোমার যা যা কাজ আছে সেই কাজ কর। ভারতবর্ষের এটাই দুর্ভাগ্য, বিদ্যাচর্চা যদি না থাকে, আর মহাপুরুষরা এসে আমাদের চিন্তা ভাবনা না করতে শেখান, যেমন ঠাকুর স্বামীজীর আগমনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে কোন চিন্তা ভাবনা ছিলই না। তার আগে মহাপ্রভু এসে প্রেম দিয়ে বাকি সব কিছু উড়িয়ে দিলেন বা হিন্দীভাষী অঞ্চলে তুলসীদাস, কবীরদাস এনারা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ভাব দিয়ে অনেক কিছুই উড়িয়ে দিলেন। তার আগে আচার্য শঙ্কর কি বলছেন দেশের লোকেরা জানতই না, তারও আগের কথা ছেড়েই দিতে হয়। মুষ্টিমাত্র কয়েকজন ব্রাহ্মণ জানতেন তাঁদের বাইরে আর কেউ কিছু জানত না। স্বামীজী প্রথম এসে সব কিছুকে যুক্তিপূর্ণ ভাবে সামনে রাখতে শুরু করলেন। বর্ণাশ্রমের সাথে হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকেরা এখানেই ভুল বুঝতে শুরু করে। অধ্যাত্ম রামায়ণ শেষ পর্যায়ে এসে মুক্তির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তি কোথা থেকে শুরু হয়? বলছেন বর্ণাশ্রমের কর্ম দিয়ে। সেইজন্য বর্ণাশ্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একেবারেই তা নয়। আমি কি কাজ করব, আমার পক্ষে কোন কাজটা ঠিক, এটাকে যদি কেউ বিচার করতে নেমে যায় তার অনেক সময় লেগে যায়। ওনারা তাই একটা সহজ উপায় করে দিলেন, বেশি ভাবাভাবির কিছু নেই, যেখানে তুমি জন্মেছ, যে বংশে জন্মেছ সেই বাড়ির সেই বংশের যা কাজ তাই কর তাতেই তোমার সব হয়ে যাবে, যদি মুক্তি তোমার উদ্দেশ্য থাকে। মুক্তি যদি তোমার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে তুমি যে কাজই কর না কেন তখন আর এই নিয়মগুলো খাটবে না। এটা সমাজের একটা ব্যবস্থা, সমাজের অস্তিত্ব যেন ঠিকঠাক থাকে, সমাজে সব ধরণের কাজের লোক যেন পাওয়া যায়, সেইজন্য তারা বর্ণাশ্রম প্রথা নিয়ে এলেন। আর ধর্মগুরুরা বলে দিলেন, যে বাড়িতে তুমি জন্মেছ, সেখানে তুমি যে কাজ করছ সেই কাজই কর, এরপর আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না। কিন্তু পুরো দেশটাকে অজগর সাপের মত বর্ণাশ্রম প্রথা জড়িয়ে নিল। বর্ণাশ্রম প্রথাকে নিয়ে আসার জন্য কি বলতে চাইছেন, সেটাকে না বুঝে সবাই লাইন দিয়ে ভুল ভাবে ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। স্বামীজী এসে জিনিসটাকে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলেন, তিনি দেখাচ্ছেন এর এমন কোন গুরুত্ব নেই। এখানে বলতে চাইছেন, তুমি যে কাজই করছ সেই কাজ অনাসক্ত ভাবে কর। স্বামীজী কর্মযোগে অনাসক্ত, নিঃস্বার্থপরতার উপরেই বারবার জোর দিয়ে গেছেন। তুমি কি কাজ করছ সেটা বড় কথা নয়, সব কাজ অনাসক্ত ভাবে কর।

মানুষ যে কাজই করুক না কে, কাজ করে সে কিছু থেকে টাকা পেতে চায় বা বিবাহ করতে চায় বা একটু নাম-যশ পেতে চায়। এছাড়া অন্য কিছুর জন্য মানুষ কাজ করে না। সংসার এই কটি জিনিসের উপরই চলে। আমেরিকা, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান সবাই এটাই চাইছে, আমার টাকা চাই, আমার সুখভোগ চাই, নামযশ চাই, এর বাইরে আর কিছু না। কিন্তু যারা ধর্মের পথে যেতে চাইছে অথচ এখনও ঠিক প্রস্তুত নয়, তাদেরকে বলা হল, তুমি যে কাজটা করছ সেই কাজটাই করতে থাক কিন্তু তোমার চাহিদাকে একটু কমাবার চেষ্টা কর। এত বেশি চাহিদা থাকলে ধর্ম পথে যেতে পারবে না, দুটো একসাথে চলে না। এরপর চাহিদা যখন কমতে শুরু হয় তখন তাকে বলা হয়, এবার তুমি বুঝে নাও তুমি যে কাজ করছ, তোমার কাজের যতটুকু এক্তিয়ার তার বাইরে যেও না। আর সেটাও এই মনোভাব নিয়ে করবে, আমি এই কাজ করছি, এই কাজ থেকে দুটো টাকা হচ্ছে, এই দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ চলে গেলেই হল, এর বেশি আর নয়। এই করতে করতে নিষ্কাম কর্ম করা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে আসে সকাম কর্ম, যে কোন মানুষ যে কাজই করুক সবটাই সকাম কর্ম। সেখান থেকে আসে, বেশি কাজে না জড়িয়ে যতটুকু কাজ করা দরকার ততটুকুই করে দিলাম। ঠাকুরও বলছেন, যে কাজ সামনে এসে গেল সেই কাজটা করে দাও। সেখান থেকেই নিষ্কাম কর্ম হয়। ছেলের অসুখ হয়েছে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এটা নিষ্কাম কর্ম। এরপর ডাক্তারের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল, ডাক্তারবাবু আমার ছেলে যেন অবশ্যই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়, এটাই সকাম কর্ম। মনের ইমোশানগুলো যখন খেলা করতে শুরু করে দেয় তখন সেই কাজটাই হয়ে যায় সকাম কর্ম। ইমোশান ছাড়া যখন কাজ হয় তখন সেটাই হয়ে যায় নিষ্কাম কর্ম। কাজের মধ্যে যদি প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা জড়িয়ে থাকে তখন সেটা সকাম কর্ম। কাজের যে উৎকর্ষ সাধিত হবে, গীতায় ভগবান বলছেন *যোগঃ কর্মসুকৌশলম্*, এই উৎকর্ষতা সব সময় আসে নিষ্কাম কর্ম থেকে। নিষ্কাম কর্ম করার সময় মস্তিষ্কে কোন ধরণের কোন colouring থাকে না। আবেগ, উত্তেজনা যেখানে থাকে সেখানে মনটা রঙে যায়, সিদ্ধান্তগুলি সেখানে ভুল হয়, পরে অনেক কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়।

ধর্ম শুরু করার জন্য প্রথমে তাকে বলতে হবে আমি ধর্ম চাই। এরপর আসছে কাজ, তোমার যে কাজ ঠিক করা আছে তার বাইরে এগিয়ে গিয়ে কখনই কাজের মধ্যে জড়াবে না। এগিয়ে গিয়ে কাজ করে সাধারণত রজোগুণের প্রভাবে আর গৃহস্থরা করে যাতে দুটো অতিরিক্ত টাকা আসে। কিন্তু ধর্ম পথে যেতে হলে একটা ধাপে গিয়ে কাজে জড়ানোটা কমাতে হবে, এটা আমার কাজ, এই কাজের বাইরে আমি কোন কাজে জড়াব না। শ্রীরামচন্দ্র এই কথাই লক্ষ্মণকে বলছে, তোমার বর্ণাশ্রমজনিত যে কর্ম সেই কর্ম করে আগে তোমার চিত্তকে শুদ্ধ কর। চিত্ত শুদ্ধ হওয়ার পর যখন তোমার মনে হবে এই সংসার থেকে ভোগের জন্য আমার কিছু লাগবে না, তখন তোমাকে ইন্দ্রিয়, হাত, পা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শম দমাদি করার জন্য নিজেকে স্থির সঙ্কল্প নিতে হবে, আমি এটাই করব। শমদমাদি সাধন লাভ হওয়ার পর কি করবে, *সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে*, সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করবে। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শাস্ত্র জানবেন, শাস্ত্রে বর্ণিত সত্যগুলিকে উপলব্ধি করেছেন, ফলস্বরূপ তাঁর মধ্যে সাংসারিকতার কিছু থাকবে না। সদ্‌গুরুর এই তিনটেই বৈশিষ্ট্য, চতুর্থ কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না – শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা চাই, উপলব্ধিবান হবেন আর কোন ধরণের কোন ভোগের প্রতি স্পৃহা থাকবে না।

ঠাকুর বলছেন, এখানে প্যালা দিতে হয় না। আচার্যের সাথে দেখা করতে গিয়ে যদি ফিজ্ দিতে হয়, এদের কথা শুনে কী হবে! এরা টাকা দিয়ে নিজেদের ঘিরে রেখেছে। আমরা কি করে জানব যে তাঁর উপলব্ধি আছে কি নেই, কি করে জানব যে তিনি শাস্ত্র জানেন কি জানেন না? প্রথমে তাই দেখতে হবে, তাঁর ভোগসামগ্রীর ব্যবহারটা কি রকম। সাধু সন্ন্যাসীদেরও একটা শরীর আছে, সেই শরীরকে রক্ষা করার জন্য নুন্যতম জিনিসের প্রয়োজন, সেটার জন্য তাঁদের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু এমন এক গুরুর কাছে গেছেন, যাঁর ঘরে এত দামী কার্পেট বেছানো যে ভক্তদেরই ইতস্তত করবে পা রাখতে। সাধারণ ভাবে গুরুদের অবস্থা ভারতবর্ষে চিরদিনই ভক্তদের অবস্থা থেকে নীচেই থাকত। যার জন্য গুরুরা ভক্তদের কাছে ঘুরঘুর করতেন, আজ এটা চাই, কাল ওটা চাই, যজ্ঞের জন্য এটা চাই, স্বস্ত্যয়নের জন্য এই চাই ইত্যাদি। অন্য দিকে গুরুর অবস্থা যদি ভালো হয়ে যায় তখন আবার ভক্তরা তাঁর কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে চায়।

স্বামী প্রেমেশানন্দজী মহারাজ সারগাছিতে থাকতেন। কোন ভক্ত তাঁকে সিল্কের খুব সুন্দর একটা আসন দিয়েছিল। মহারাজ আসনটাকে সব সময় উল্টে ব্যবহার করতেন। গ্রামের লোকেরা যখন আসবে তখন ওদের গুরুর দিকে দৃষ্টি যাবে না, দৃষ্টিটা সিল্কের দামী আসনের দিকেই যাবে। রামকথাতে আছে, সীতা একদিন বলছেন,

বানরগুলো আমাদের জন্য এত কিছু করল কিন্তু আমরা ওদের জন্য কিছুই করলাম না, ভালো করে খাতির-টাতির করা হয়নি, ওদের জন্য কিছু একটা করা হোক। সীতার ইচ্ছানুসারে একটা বিরাট ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হনুমান সব বানরদের ডেকে বলছেন, দেখো আমরা হলাম বানর, বানরের স্বভাব বলে আমরা লোকব্যবহার জিনিসটা জানি না। সেইজন্য তোমরা সবাই আমার দিকে লক্ষ্য রাখবে, আমি যেমনটি করব তেমনটিই করবে, তার বাইরে কিছু করতে যেও না, তাহলে আমাদের অনেক দুর্নাম হয়ে যাবে। শ্রীরামচন্দ্রের দরবারে বিরাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছে, বানরদের জন্য শুধু ফল আর ফল, যত রকমের ফল হতে পারে সব রকম ফলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বানররা সবাই আড়ষ্ট হয়ে শুধু হনুমানের দিকে তাকিয়ে আছে। হনুমান কলা নিয়ে কলা ছাড়ালেন, ওরাও কলা ছাড়াল। হনুমান একটা আপেল নিলেন, ওরাও আপেল খেতে শুরু করেছে। এরপর হনুমান একটা সবেদা নিয়ে চাপ দিতেই ফসকে ওর বীজটা বেরিয়ে গেছে। বানররা ভাবলো এভাবে বীজ বার করতে হবে, ওরাও জোর টিপিছে। একজনের বীজটা একটু উপরে গেছে, আরেকজন আরেকটু জোর চাপ দিতে বীজটা আরও উপরে গেছে। হনুমান ওখান থেকে ইশারা করে যাচ্ছেন, কিন্তু এরা বুঝতে পারছে না, ওরা ভাবছে কৃতিত্ব নিতে হবে কার বীজ কত উপরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সব বানরগুলো নেমে গেল প্রতিযোগিতায় কার বীজ কত উপরে যাচ্ছে। এ বলছে আমার বীজ বেশি উপরে গেছে, অন্য বানর বলছে না আমারটা বেশি উপরে গেছে, এরপর ধ্বস্তাধ্বস্তি, সেখান থেকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। হনুমান মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ঠাকুর বলছেন, আমি যদি দাঁড়িয়ে প্রস্বাব করি তোরা ঘুরে ঘুরে করবি। তার মানে, আধ্যাত্মিক গুরুর যদি একটু ভোগের চিহ্ন থাকে তখন সেই গুরুর শিষ্যরা শতগুণ ভোগ করবে। সদ্গুরুকে দেখার সময় এটাই প্রথম দেখতে হয়, তাঁর ভোগ সামগ্রি কেমন আছে। লুকিয়ে গুড় খান কিনা। আর সদ্গুরু যদি বলেন আমি তো এসব থেকে অনাসক্ত, আপনি যদি অনাসক্তই হন তাহলে এত বৈভব রাখার দরকার কি, যদি এর সাথে আপনার কোন সম্পর্কই নেই তাহলে সব ফেলে দিন। ধর্মীয় গুরুর ভোগ সামগ্রি, কামিনী-কাঞ্চনের ব্যবস্থা কেমন দেখতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে বাকিগুলো বুঝতে হয়। পরম্পরায় বিদ্যা গ্রহণ করেছেন কিনা, শাস্ত্র জানেন কিনা আর তীব্র বৈরাগ্য ও সাধন-ভজন আছে কিনা, কাউকে প্যালা দিতে হয় কিনা। যিনি পয়সার বিনিময়ে বিদ্যা দান করেন তাঁকে বিশ্বাস করা যায় না। এই ধরণের গুরুর কাছে কিসের জন্য যাবে? আত্মোপলব্ধির জন্য, অন্য কোন কিছুর জন্য, কোন স্বার্থের জন্য গুরুর কাছে যাবে না। হে লক্ষ্মণ তুমি এটা ভালো করে বোঝ –

ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং পুনঃ ক্রিয়া চক্রবদীর্য্যতে ভবঃ।৮
অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী ন কর্ম তজ্জৎ সবিরোধমীরিতম্।৯

শরীর আর ক্রিয়া এই দুটোর একটা অনন্য সম্পর্ক আছে। শরীর দিয়েই ক্রিয়া হয়, ক্রিয়া করলেই তার ফল হয়, সেই ফল ভোগের জন্য এই শরীর। ভালো খাওয়া-দাওয়া করলে শরীর সেই রকম হবে, খাওয়া-দাওয়া সেরকম না হলে শরীর অন্য রকম হয়ে যাবে। শুভকর্ম করলে চেহারা এক রকম হবে, অশুভ কর্ম করলে চেহারা অন্য রকম হবে। শুভ চিন্তা করলে শরীর এক রকম হবে, অশুভ চিন্তা করলে শরীর অন্য রকম হবে। দেহ আর ক্রিয়া এটা একটা চক্র, যে কর্মগুলো হয়েছে সেখান থেকে আসে পুনর্জন্ম। কর্মের ইচ্ছা থেকে গেছে, কর্মের ফল বাকি থেকে গেছে, তার মানে পুনর্জন্ম হবেই। মন আছে বলেই সংসার আছে, আর এই সংসারে যে কাজ করছি দেহ দিয়েই কাজ করছি। সংসারের মূল দেহ আর মন, এর কারণ হল অজ্ঞান, এটাই বলছেন *অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণম্*। মানুষ যখন নিজের স্বরূপ ভুলে যায়, স্বরূপ ভুলে যাওয়াই মানে অজ্ঞান এসে গেল। অজ্ঞান এসে গেলে এবার সে পঞ্চাশ রকম কর্মের মধ্যে জড়িয়ে যাবে। বেদের সময় ব্রাহ্মণদের জন্য বলা ছিল, তোমাকে বৈদিক কর্ম, যজ্ঞাদি করতে হবে। গীতাতেও শেষের দিকে ভগবান এই আলোচনাকে নিয়ে আসছেন, কর্ম করা দরকার কিনা। আজ থেকে বারশ তেরশ বছর আগে আচার্য শঙ্কর গীতার ভাষ্য লেখার পর জিনিসগুলো অনেক থিতিয়ে গেছে। কিন্তু তার আগে এই নিয়ে অনেক অশান্তি ছিল, তাঁদের বক্তব্য ছিল কাজ তোমাকে করতে হবে, শাস্ত্রে যে কাজগুলো করতে বলা হয়েছে সেই কাজগুলো সবাইকেই করতে হয়। যাঁর জ্ঞান পেতে চান তাঁদেরও নিত্যকর্ম করা দরকার। আচার্য শঙ্কর নিজের ভাষ্যে এই প্রশ্নগুলো তুলে দেখাচ্ছেন জ্ঞান আর কর্ম দুটো কিভাবে বিরোধী। জ্ঞান ও কর্মের এই বিরোধ রামকৃষ্ণ ভাবধারাতে এসেও অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। স্বামীজী

কর্মযোগে কর্ম করতে বলছেন। অনেক বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদেরও জ্ঞান আর কর্ম নিয়ে আচার্য শঙ্কর ও স্বামীজীর চিন্তাধারাকে তুলনা করতে দেখা যায়। কিন্তু কোথাও জ্ঞান ও কর্মকে নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যাচ্ছে। স্বামীজী যখন কর্মের কথা বলছেন তখন তিনি অন্য অর্থে বলছেন। আচার্য শঙ্করও যখন জ্ঞান ও কর্মের বিরোধের কথা বলছেন সেটাও তিনি অন্য অর্থে বলছেন। গীতাতেও ভগবান বলছেন, যাঁরা এই পথে আসছেন তাঁদেরকেও আগে কর্ম করে শুদ্ধি করতে হয়। কিন্তু অনেকেই শুদ্ধির পরে লোকসংগ্রহার্থে, লোকের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, যেমন জনকাদি করেছিলেন। স্বামীজীও যে শিব জ্ঞানে জীব সেবা বলছেন, সেটা প্রথমে সাধনা রূপে হয় পরে সিদ্ধি রূপে হয়। কিন্তু তাই বলে যে সবাইকেই কর্ম করতে হবে তা নয়। মানুষের ভেতরে রজোগুণ প্রসুত কর্মের প্রবৃত্তি থেকে যায়, এই প্রবৃত্তির প্রভাবে মানুষ কর্মকেই সঙ্গত মনে করে। কিন্তু খুব গভীরে বিচার করলে কর্মের প্রাধান্য দাঁড়ায় না। অধ্যাত্ম রামায়ণের এই জায়গাতে পূর্বপক্ষের তর্ক, সিদ্ধান্ত এগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছেন। বেদ ঈশ্বরের কথা, বেদের কথা কাটা যায় না, বেদে আছে যত দিন তুমি বেঁচে আছ তত দিন তুমি যজ্ঞ করবে। এখন এটা ঠিক না ভুল এই নিয়েই এনারা বিচার করবেন, জ্ঞানের সাথে কর্মের কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখাবেন। আগেকার দিনে ছিল বেদ, ইদানিং রামকৃষ্ণ ভাবধারায় সেটাই কর্মকে নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু উত্তরাখণ্ডের সাধুরা, আচার্য শঙ্করের পরম্পরাতে যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা কর্মকে কোন মতেই মানেন না।

এখানে বলছেন, যাঁরা বলেন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে কর্ম করতে হয় তাঁদের বক্তব্যে কোথাও একটা ভুল এই কারণেই হচ্ছে যে কর্ম সব সময় দেহ অভিমান থেকে হয় আর জ্ঞান অহঙ্কার নাশ থেকে হয়। দেহের মধ্যে অহঙ্কার, অহঙ্কার মানে আমিত্বের ভাব আর জ্ঞান হল আমিত্ব ভাবের নাশ। তাই দুটো একসাথে কী করে হবে! যিনি জ্ঞানী তিনি কি করে কর্ম করবেন! কখনই তা সম্ভব নয়। তখন প্রশ্ন উঠবে, তাহলে স্বামীজী এত কর্মের কথা কি করে বলছেন, নিজেই বা এত কর্ম করছেন কি করে, আর মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কি করলেন? আমিত্বে এসেই তফাৎ হয়ে যায়, তাঁদের মধ্যে আমিত্বের ভাব, আমি করছি এই ভাব থাকে না। শুধু যে আমি ভাব থাকছে না তা নয়, তাঁদের আশেপাশের কেউ যদি বলে আপনি করছেন, তাদের আটকে দেন। ঠাকুর বলছেন, আমাকে কেউ গুরু, কর্তা, বাবা বললে গায়ে কাঁটা বেঁধে। স্বামীজীর গর্ভধারিণী বেলুড় মঠে গোশালা, ক্ষেতের বেগুন, ফুলকপি দেখে বলছেন আমার নরু সব করেছে, শুনে স্বামীজী খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। কারণ তাঁর এই বোধটা আছে আমি করছি না। গীতায় ভগবান বলছেন *যস্য নাহংকৃতো ভাবঃ*, অহঙ্কার, আমি ভাব নাশ হওয়াটাই মূল। কারণ জ্ঞান সব সময় অহঙ্কারের নাশ থেকে হয়। কর্ম সব সময় অহঙ্কার থেকে হয়। এই অহঙ্কার বাংলা অহঙ্কার নয়, সংস্কৃতে অহঙ্কার মানে আমিত্বের ভাব। আমাদের সবারই দেহবোধ আছে, আমি দেহ এটাই অহঙ্কার। কাজ সব সময় দেহ থেকে অর্থাৎ আমি বোধ থেকে হয়। এটাই বলছেন, যেখান দুটো বিপরীত সেখানে জ্ঞান আর কর্ম কি করে একসাথে চলবে। যাঁরা জ্ঞানমার্গী সাধু, জ্ঞানমার্গী সাধক তাঁরা কি করে কর্ম করবে! সম্ভব নয়।

যে কোন কাজে ক্রিয়া থাকে, কারকের সাতটি বিভক্তি থাকে আর ফল থাকে। এই নয়টি জিনিস প্রত্যেকটি কাজে জড়িয়ে থাকে। বিচার করে করে চরম আত্মজ্ঞান যখন হয়, আত্মাই আছেন এই বোধ যখন আসে তখন দেখেন এই নটি লয় হয়ে গেছে। খাওয়ার আগে যে ব্রহ্মার্পণং মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাতে এটাই বলা হচ্ছে যে সবটাই ব্রহ্ম। কে করছেন? সেই রাম। কার উপর করছেন? রাম। কাকে দিয়ে করাচ্ছেন? রাম। কোথা থেকে আনছেন? রাম। ক্রিয়া, সেটাও রাম। ফল, সেটাও রাম। এই যদি হয় তাঁর তাহলে কর্ম হবে কোথা থেকে! ধারণা করা সত্যিই খুব কঠিন। কিন্তু যাঁদের আত্মবৃত্তি জেগেছে তাঁরা দেখেন, এ ছাড়া আর কিছু নেই। সেইজন্য কর্ম নিবৃত্তি এমনিতেই হয়ে যায়। এখানে প্রশ্ন করছেন লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ কোন সাধারণ লোক নন, তিনি খুব উচ্চমানের সাধক। শ্রীরামচন্দ্রকে এই প্রশ্ন করছেন, শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, তুমি যদি এই সংসারের সর্বথা নাশ চাও, নিবৃত্তি চাও। আমরা তো তা চাই না। ঠাকুর বলছেন, একজনের ভগবতীর দর্শন হয়েছে, তিনি প্রার্থনা করছেন, আমি যেন সোনার বাটিতে নাতিকে দুধভাত খাওয়াই। এক বরে সবই হয়ে গেল, ঐশ্বর্য হল, দীর্ঘায়ু হল আর নাতিও হল। আমরা সবাই এটাই চাই, সোনার থালাতে নাতির সঙ্গে খাব, ভাষাটা শুধু একটু পাল্টে যায় কিন্তু ভাবটা এক। তারা যদি বলে আমি মুক্তি চাই, সেখানে আর কি বলার আছে! শুধু সে নিজের ঝামেলা থেকে মুক্তি চায়। ঝামেলা থেকে মুক্তির জন্য অন্য পথ, সেই পথ দেখানো তো শাস্ত্রের কাজ নয়।

এখানে এটাই বলছেন, যখন এই বোধ আসে তখন ধীরে ধীরে কাজ কমিয়ে দেয়, কর্ম ত্যাগ করে। যে বিদ্যা চাইছে তার জন্য কর্ম অত্যন্ত বিরোধী। এখানে মনে রাখতে হবে, অধ্যাত্ম রামায়ণ দেড় হাজার বছর আগে

রচিত হয়েছিল, তখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বেদের কর্ম করা উচিত কিনা এই নিয়ে আলোচনাদি হত। এই আলোচনাও সেই অনুসারে চলছে। অন্য দিকে চিত্তশুদ্ধি না করে সন্ন্যাসের পথে বা ধ্যানের পথে নেমে গেলে মাথায় বিকৃতি এসে যাবে। সেইজন্য এখানে কয়েকটা ধাপ দিয়ে দেওয়া হল, প্রথমে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধির পর গুরুপ্রাপ্তি, গুরুপ্রাপ্তির পর শমদমের অনুশীলন, এরপর ধীরে ধীরে কর্ম ত্যাগ। কর্মের বড় সমস্যা হল, যখনই কোন কর্ম করা হবে তখন দুটো ভালো কাজও হবে তার সাথে দুটো মন্দ কাজও হয়ে যাবে। ঐ মন্দ কাজগুলো মেটানোর জন্য আবার তাকে কর্ম করতে হবে। ঠাকুর কৌপন কী ওয়াস্তের গল্প বলছেন, শুধু ইঁদুর থেকে কৌপিন বাঁচাতে সাধু কোথা থেকে কোথায় জড়িয়ে গেল। পরমাত্মার যে সত্য, ওটাই পরমাত্ম বস্তু, ঐ পরমাত্ম বস্তুর বার বার বিচার করে করে কর্মের ভাবনা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বিচার করতে পারে না। তবে মনে রাখতে হবে অধ্যাত্ম রামায়ণ অত্যন্ত উচ্চমানের গ্রন্থ, সাধারণ লোকেদের জন্য এই গ্রন্থ নয়। এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণের শেষ কথা চলছে, শেষ কথায় সব সময় উচ্চমানের কথাই থাকে।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, এই আমিত্বের বোধ, আর আমিত্ব বোধের মধ্যে যে চৈতন্যের বোধ, এই চৈতন্যের বোধ যখন বৃহতের সাথে এক হয়ে যায় তখন কর্মের বিভক্তি আর তার ক্রিয়া এবং ফল এই নটি জিনিস লীন হয়ে যায়। তখন তিনি বাস্তবিক দেখেন যিনি মারছেন তিনিও সেই আর যিনি মরছেন তিনিও সেই, যেটা দিয়ে মারছেন সেটাও সেই অর্থাৎ কর্মের প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া সবটাই তিনি। তখন আর তার মধ্যে দ্বৈত ভাব আসে না। এই বোধ আসার পর যখন এগুলোর নাশ হয়ে যায় তখন কি হয় –

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা কথং ভবিষ্যত্যপি কার্যাকারিণী।৭/৫/১৯

শ্রুতি প্রমাণ দিয়ে এই জিনিসটা মনের মধ্যে বসে যায়। প্রমাণ মানে যার দ্বারা একটা জিনিসকে জানা হয় আর প্রমাণ অনেক রকমের হয়। ঘোর ভৌতিকবাদীরা একটাই প্রমাণ মানেন, তা হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যা কিছু জানা যাচ্ছে তারা এটাকেই শুধু মানে। বেদান্ত ছয় রকম প্রমাণকে মানে, একসাথে বলা ষট্‌প্রমাণ। প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ইন্দ্রিয়াদি দিয়ে জানা। দ্বিতীয় অনুমান প্রমাণ, যুক্তি দিয়ে জানা, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ আর অনুমানকে নিয়েই চলে। একটা জিনিসকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া হল, কিন্তু কেউই সেটাকে দেখেনি। এমন জিনিস কি কখন হতে পারে? বিজ্ঞানাদি জানা থাকলে এগুলো বুঝতে সুবিধে হয়। পদার্থ বিজ্ঞানে একটা পার্টিকেল আছে যার নাম পজিট্রন। মজার ব্যাপার হল বিজ্ঞানীরা যুক্তি দিয়ে বার করলেন এই পজিট্রনকে থাকতে হবে। অনেক পরে বিজ্ঞানীরা পজিট্রনের হদিশ পেলেন। বিজ্ঞান কখন চলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর আবার কখন অনুমান প্রমাণের উপর। রাদারফোর্ডরা খুব দুঃখ করে বলছেন থিয়োরিটিশায়নরা আগে পজিট্রনের কথা বলে দিল, আমরা আগে বললে ভালো হত। এই রকমই হয়, যুক্তি দিয়ে বলে দিচ্ছেন জিনিসটা এই রকমই হতে হবে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণে ধরা পড়ছে না। এর সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত হল এ্যটম বোমা। আইনস্টাইন নিজের যুক্তি দিয়ে একটা ইক্যুয়েশান দিয়ে দিলেন, তিনি নিজেও জানেন না এ ইক্যুয়েশান দিয়ে এ্যটম বোমা হতে পারে। পরে যখন বিজ্ঞানীরা বলছেন এটা দিয়ে তো এ্যটম বোমা তৈরী করা যাবে। আইনস্টাইন বিজ্ঞানীদের কথা মানতেই চাইলেন না, তাদের থিয়োরীকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ওরাও ছাড়তে চাইল না। তারপর দেখা গেল সত্যিই এ্যটম বোমা হয়ে যাচ্ছে। জিনিসটা এখন নেই কিন্তু যুক্তি দিয়ে সেই জিনিসটার কথা বলে দিচ্ছেন। বেদান্ত এই অনুমান প্রমাণকে অত্যন্ত সম্মান করেন। তৃতীয় শ্রুতি প্রমাণ, ঋষিরা ধ্যানের গভীরে যা কিছু অনুভূতি করেছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে করতে ঋষিদের সেই অনুভূত সত্যগুলির অর্থটা স্পষ্ট হয়ে যায়। তার মানে শ্রুতি দিয়ে জিনিসটাকে জানা হল। অনেকে মনে করেন, তিনি যেটা দেখেছেন সেটাকে শ্রুতি সঠিক বলে দিচ্ছেন, অর্থাৎ শ্রুতির সাথে জিনিসটাকে মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু জিনিসটা তা নয়, এর অর্থটা ঠিক উল্টো। এর অর্থ হল, শ্রুতিকে আধার করে জিনিসটাকে জানা। যেমন যুক্তি দিয়ে জানা হয়। কাজ করার সময় আমাদের মস্তিষ্ক বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। আমরা দেখছি গাছ থেকে আম পড়ে নীচের দিকে যাচ্ছে আর ধুয়ো উপরের দিকে যাচ্ছে, এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এর আমরা লজিক লাগাতে শুরু করলাম, এটা কেন হয়, ভারী জিনিস নীচের দিকে আসে, হাল্কা জিনিস উপরের দিকে যায়? তখন অর্কিমিডিস বললেন ল অফ বোয়েনসি আবার নিউটন বললেন ল অফ গ্র্যাভিটেশান, দুটোকে লাগিয়ে দিলে উত্তরটা পেয়ে যাব। আবার অন্যটাও হয়, লজিক দিয়ে আগে এগিয়ে চলে গেছে, প্র্যাক্টিক্যালটা পরে এসেছে। আধ্যাত্মিক জীবনে জিনিসটা ঠিক এই রকম হয়। কিছু জিনিসের উপলব্ধি আগে হয় আর তার রেকর্ডিং পরে হয়। কিছু ক্ষেত্রে রেকর্ডিং আগে আর উপলব্ধি পরে। শ্রুতি প্রমাণের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়। ঠাকুরের প্রথমেই

সব উপলব্ধি হয়ে গেল, তিনি কোন বই পড়েননি, কোন শাস্ত্র পড়েননি। পরে পরে যখন বিভিন সম্প্রদায়ের সাধকরা আসছেন, পণ্ডিতরা আসছেন তাঁদের সাথে ঠাকুর সব কিছু মিলিয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু মুশকিল হল ঠাকুরের সব উপলব্ধির কথা লিপিবদ্ধ হয়নি। বেদে যা কিছু আছে, এর সব উপলব্ধি আগে আর রেকর্ডিং পরে হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে রেকর্ডিং আগে উপলব্ধি পরে, অর্থাৎ আগে শাস্ত্র অধ্যয়ন পরে তার ফল। ঠাকুর বলছেন নরেন, রাখাল এরা লাউ, কুমড়ো, ফল আগে ফুল পরে। আগে আগেই এনাদের নিজস্ব উপলব্ধি হয়ে যাচ্ছে, আগেই দেখে নিচ্ছেন তত্ত্বটা কি। তারপরে জানছেন, ও! শাস্ত্রে এই রকম আছে। তাই ওনাদের ক্ষেত্রে শ্রুতি প্রমাণ হবে না, আমাদের ক্ষেত্রে হবে। শ্রুতি প্রমাণ মানে, শাস্ত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন শাস্ত্রের অর্থটা স্পষ্ট হয়ে গেল। চেন্নাইতে স্বামীজীর লেকচার শুনে শ্রীলঙ্কার একজন পরে বড় সাধু হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ভাষণে তিনি স্বামীজীর মুখে শুনলেন, এই জীবনের আর কটি দিন, এই কথা শুনে তিন চমকে উঠে ভাবছেন, তাই তো আমি কি করছি! অতটুকু শুনেই তাঁর জীবন পাল্টে গেল। একই কথা অনেকবার শুনছে, কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। হঠাৎ একদিন ঐ কথাটাই ভেতরে জেগে উঠল, এই যে জেগে উঠল, এটাকেই বলা হয় শ্রুতি প্রমাণ। এই জ্ঞানটা তার শ্রুতি দিয়ে এসেছে। শ্রুতি দিয়ে যখন জিনিসটাকে জেনে নিল তখন আর অবিদ্যা তাকে কিছু করতে পারবে না, আসলে জ্ঞানটা জেগে যায়।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, যারা বেদের কর্ম স্বীকার করে, তাদের কত কিছু সংগ্রহ করতে হয়, পুরোহিত লাগবে, এটা লাগছে, সেটা লাগছে। তার মধ্যে ভালো কর্ম করতে গিয়ে বাজে কর্ম হয়ে যেতে পার। এই যে এত ধরণের কর্ম আর তার যে আনুষাঙ্গিক, এটাকে বলছেন বহুশাখা। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানের পথে যান তাঁরা দেখেন একত্ব। একত্ব আর বহুত্ব দুটো এক সঙ্গে কখনই চলে না। সেইজন্য শ্রুতি প্রমাণে বিচার করে করে নিজেকে একত্বের দিকে নিয়ে যেতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, শাস্ত্র অধ্যয়ন করে করে এবং বিচার করে করে যখন তোমার দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেল তখন গুরুর কাছে গিয়ে মহাবাক্য শুনতে হয়। তখনকার দিনে ইষ্টমন্ত্রের প্রচলন ছিল না যদিও ভাগবতে এসে মন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু মন্ত্রবিদ্যাটা ঠিক ঠিক এসেছে তন্ত্র থেকে, তন্ত্রই মন্ত্রবিদ্যা। তবে ভারতে যা কিছু প্রথা আছে সব প্রথাকে মিশিয়ে সমন্বয় করে দাঁড় করিয়ে দেন। গরু সব কিছু আগে খেয়ে যায় তারপর শেষে ওটাই দুধ হয়ে বেরিয়ে আসে। বেদে জপ জিনিসটা ছিল না, বেদের সময় ছিল শুধু যজ্ঞাদি কর্ম। আর বেদান্তীদের কাছে বিচারের ব্যাপারটা প্রচলিত ছিল। ওঁ এর উপর ওনারা বিচার করতেন, ধ্যান করতেন। কিন্তু এখন ওটাই জপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এখানে এনারা বিচারের কথাই বলছেন, গুরুর কাছে গিয়ে মহাবাক্য শুনবে। খুব নামকরা মহাবাক্য হল *তত্ত্বমসি*, গুরু বলে দিলেন *তত্ত্বমসি*, তুমিই সেই। বলেছেন, গুরুর কাছে এই মহাবাক্য শোনার পর এটাকে বিচার করতে হয়। এর মধ্যে তিনটি শব্দ মিশে আছে, *তৎ*, *ত্বম্* আর *অসি*। *তৎ* শব্দে যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁর দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। *ত্বম্* শব্দ জীব, মানে আমি আপনি যত জীব আছে তার দিকে ইঙ্গিত করে। *অসি* শব্দ দিয়ে *তৎ* আর *ত্বম্* এই দুটোকে সংযুক্ত করা হচ্ছে। বেদান্তে এই ধরণের মহাবাক্য নিয়ে বিরাট লম্বা লম্বা আলোচনা রয়েছে, আমরা ঐ বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। মূল বক্তব্য হল, তোমার উপর যে আবরণ পড়ে আছি যেটাকে তুমি নিজেকে মনে করছ, এই আবরণকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় আর ঈশ্বরের ব্যাপারে তুমি যে উপাধির কথা ভাবছ, এগুলোকে যদি ছেড়ে দাও তখন দেখবে জিনিসটা সেই এক। আমার আর আপনার মধ্যে তফাৎ কোথায়? আমার উপর উপাধির কিছু আবরণ রয়েছে, আপনার উপরেও কিছু উপাধির আবরণ রয়েছে। সেইজন্য আমরা আলাদা। এজন পুরুষ, একজন মহিল, একজন সন্ন্যাসী একজন গৃহস্ত, এই ধরণের নানান রকমের পার্থক্য লেগে আছে। কিন্তু আমরা যদি শুধু প্রাণী রূপে দেখি তাহলে সব এক, তার মানে উপাধি গুলো কমিয়ে দেওয়া হল। আমাদের উপর যে উপাধি গুলো আছে সেগুলোকে যদি সরিয়ে দেওয়া হয় আর ঈশ্বরের উপর যে উপাধি গুলো আছে সেগুলোকেও যদি সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে দুটো সেই এক। কিন্তু যতক্ষণ উপাধি আছে ততক্ষণ এক হবে না। মাটির হাতি আর মাটির ইঁদুর, দুটোই মাটির কিন্তু ইঁদুর আলাদা হাতি আলাদা। হাতিরও উপাধি আছে, বিশাল শরীর, কুলোর মত কান, শুঁড়, ইঁদুরেরও কতকগুলি উপাধি আছে, তাই ইঁদুর কোন দিন হাতি হতে পারবে না। আমি আর শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দিন এক হতে পারব না, সম্ভবই না। দুজনেরই উপাধি এসে গেছে। কিন্তু ইঁদুর ও হাতিকে যদি নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখন সবটাই মাটি। সচ্চিদানন্দ সাগরে গিয়ে সব এক হয়ে যাবে। একত্ব সব সময় হয় ব্রহ্মে, ঈশ্বরে কখনই একত্ব হয় না। যদিও তিনি ঈশ্বর, তিনি ব্রহ্ম কিন্তু সেই ব্রহ্মকে যখন বুদ্ধি দিয়ে দেখছি তিনিই তখন ঈশ্বর রূপে দেখান। কিন্তু আমি

ঈশ্বর এই কথা কখনই বলা যায় না, কারণ তখন উপাধির ভেদ রয়েছে। উপাধি যেমনি এসে গেল দুটো পুরো আলাদা হয়ে গেল। বলছেন যতক্ষণ তোমার উপাধি আছে ততক্ষণ তোমার অশান্তি। এই আলোচনা পর পর চলতে থাকবে। উদ্দেশ্য হল বিচার করে করে ঈশ্বরের যে উপাধি আছে ঐ উপাধি সরিয়ে তাঁকে জানা, তার সাথে নিজেকেও উপাধি ছাড়া জানা। প্রথমে বললেন কর্ম দিয়ে চিত্তশুদ্ধি, বিচার করে করে মনকে সূক্ষ্ম করা। অত্যন্ত শুদ্ধ মন আর আর অত্যন্ত সূক্ষ্ম মনই উপাধিগুলিকে কেটে সরিয়ে দেয়। তার সাথে ঈশ্বরের উপর যে উপাধি আছে সেগুলোকেও কেটে সরিয়ে দিচ্ছে। যদি কেউ বলে আমাকে আঙুরের খোসা ছাড়িয়ে দাও। আঙুরের খোসা কি ছাড়ানো যাবে? ছাড়ানো যাবে যদি লেজার শার্প কিছু থাকে। মন একেবারে শুদ্ধ আর সূক্ষ্ম হওয়া মানে লেজারের শার্পের মত। তখন তা আঙুরের খোসা ছাড়ানোর মত যে উপাধি গুলো চেপে আছে সেগুলোকে চেঁছে তুলে দেয়। তার সাথে ঈশ্বরের উপাধি গুলোকেও একেবারে চেঁছে তুলে দেয়, তখন দেখে সেই এক। যতই ক্ষীণ আবরণ থাকুক তুলে ফেলে দেয়। কিন্তু আমাদের মন হল কুড়োলের মত, গাছ কাটা ছাড়া আর কোন কাজে লাগবে না। আমরা উপাধিকে নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করছি, এর আগেও উপাধি শব্দ এসেছে, পরেও আসবে। উপাধিকে ব্যাখ্যা করে বলছেন –

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্মণাম্।৭/৫/২৮

সৃষ্টি তত্ত্বে প্রথমে আসে প্রকৃতি, প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহঙ্কার আর অহঙ্কার থেকে আসে পঞ্চ তন্মাত্রা। এই পঞ্চ তন্মাত্রা, যেটাকে আকাশ বায়ু আদি বলা হয়, একেবারে শুদ্ধ। পঞ্চ তন্মাত্রা আবার পঞ্চীকৃত হয়, পঞ্চীকৃত মানে পাঁচটি তন্মাত্রার এক একটা নিজের অর্দ্ধেক নিয়ে নেয় আর বাকি অর্দ্ধেক অবশিষ্ট চারটে থেকে আট ভাগের এক ভাগ করে নেয়। সেখান থেকে তৈরী হয় স্থূলভূত। আমরা যে জগতকে দেখছি জগৎ এই স্থূলভূত দিয়ে তৈরী। পঞ্চীকরণ একটা থেকেই পাঁচটা হয়ে যায়। আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি ও পৃথিবী এই পাঁচটির দুটো রূপ একটা পঞ্চীকৃত আরেকটি অপঞ্চীকৃত। আমাদের দেহ, পৃথিবী সবই পঞ্চীকৃত। যেমন পিওর ইলেক্ট্রন প্রোটন দিয়ে সৃষ্টি হয় না, এগুলো যখন এ্যটমে গিয়ে মেলে তখনই সৃষ্টি হয়। যেটাই পিওর ফর্মে আছে সেটা দিয়ে কখনই সৃষ্টি হয় না। যেমন খাঁটি সোনা দিয়ে গয়না হবে না, গয়না বানাতে গেলে সোনাতে একটু খাদ মেশাতে হবে। সৃষ্টিতে তাই সব কিছুতেই সব কিছু মিশে আছে। এখানে বলছেন, ভেতরে যে সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে, এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে যে দশটি ইন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ও মন রয়েছে, সূক্ষ্ম শরীরই ঠিক ঠিক ভোক্তা, সূক্ষ্ম শরীরই ঠিক ঠিক সুখ দুঃখের অনুভব করে।

শুদ্ধ আত্মাই আছেন, কোন কারণে অজ্ঞানের জন্য ঐ শুদ্ধ আত্মার উপর যেন একটা আবরণ পড়ে গেল। আবরণটাও খুব শুদ্ধ আবরণ। সেটা দিয়ে সৃষ্টির কাজ চলে না। ঐ শুদ্ধ আবরণও এবার এক অপরের সাথে মিশতে মিশতে আরও একটু গাঢ় আবরণ এসে গেল। আমাদের স্থূল শরীরটা সম্পূর্ণ ভাবে গাঢ় হয়ে আছে, এটা দিয়ে বোঝা যায় না এর ভেতরে কি আছে। একটা লণ্ঠন জ্বলছে, তার আলোটা একটা কাঁচ দিয়ে আবৃত, কাঁচকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল, এরপর সেই কাপড়ের উপর একটা লোহার চাদর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল, লণ্ঠনের উপর একটা মোটা গাঢ় আবরণ এসে গেল। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্র স্থূল শরীরকে একেবারেই গুরুত্ব দেয় না। স্থূল শরীরের ঠিক পেছনেই রয়েছে সূক্ষ্ম শরীর। মানুষের যা কিছু হওয়ার ঐ সূক্ষ্ম শরীর দিয়েই হয়। সুখ-দুঃখের বোধ সূক্ষ্ম শরীর দিয়েই হয়। আমাদের যে হাত, পা চলছে, এই হাত পা কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গ নয়। আসল ইন্দ্রিয়গুলো রয়েছে সূক্ষ্ম শরীরে। স্থূল শরীরের হাত, পা, চোখ সব আসল ইন্দ্রিয়েরই সম্প্রাসারিত রূপ, এগুলোকে বলা হয় গোলক। আসল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম শরীরে, মস্তিষ্কের কেন্দ্রে রয়েছে। মনও সূক্ষ্ম শরীরের ব্যাপার। মস্তিষ্ক আবার স্থূল শরীরের অঙ্গ। স্থূল শরীর আসলে কিছু করে না, করে সূক্ষ্ম শরীর। সুখ-দুঃখের অনুভব সূক্ষ্ম শরীর দিয়েই হয়, ধর্ম-অধর্মের ছাপ সূক্ষ্ম শরীরেই পড়ে। মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম শরীরটাই বেরিয়ে চলে যায়। সূক্ষ্ম শরীর কখনই নারী পুরুষ হয় না। ওর প্রজনন ক্রিয়ার যে ইন্দ্রিয় সেটা সব সময় চালু থাকে, এবার ও যখন দেহ নেবে তখন পুরুষের শরীর পেলে পুরুষের মত হয়ে যাবে, নারীর শরীর পেলে নারীর মত হয়ে যাবে আর তার বাকি শরীরটাও তার মত হয়ে যাবে। আমাদের শাস্ত্রে তাই নারী ও পুরুষের বিভেদকে একেবারেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে বিরাট বিভেদ নিয়ে আসা হয়েছে। ইসলাম, খ্রীশ্চানিটি আর জিউস এই তিনটে ধর্মেই নারী পুরুষের বিভেদের ধারণা এক। ভগবান প্রথমে সুন্দর স্বর্গের সৃষ্টি করলেন, ইডেন তৈরী করলেন। তারপর সেখানে আদমকে সৃষ্টি করলেন। আদম থেকেই আদমী শব্দ এসেছে। আদমকে সৃষ্টি করার পর ভগবানের মনে হল আদম একা থাকবে

কি করে। তখন তিনি আদমকে একটু বেহুঁশ করে দিয়ে তার বুকের হাড় থেকে একটা ছোট্ট টুকরো কেটে বার করে আনলেন। সেই হাড়ের টুকরো থেকে তিনি নারীর সৃষ্টি করলেন। সেইজন্য এই তিনটে ধর্মের নারীর স্থান সব সময় নীচে। নারী নীচে হতেই হবে কারণ তার সৃষ্টি ঐভাবে হয়েছে কিনা। হিন্দুদের এভাবে হয় না, হিন্দুদের সৃষ্টিটাও এভাবে আলাদা হয়নি আর হিন্দুদের বর্তমান যে মত তাতেও হয় না। হিন্দু ধর্মে নারীকে কখনই ধর্মের দিক দিয়ে নীচু বলা হয় না, কর্মের দিক থেকে নিকৃষ্ট বলা হয়। মেয়েদের কিছু কিছু ইমোশানস্ আছে যেগুলো পুরুষের সাথে চলে না। মহাভারতে লিঙ্গের পরিবর্তন নিয়ে রীতিমত কাহিনী আছে। পরের জন্মে গিয়ে যে পুরুষ থেকে নারী হবে তা নয়, এই জন্মেই পুরুষ থেকে নারী হয়ে যাচ্ছে। ইদানিং আমরা যে লিঙ্গ পরিবর্তনের ঘটনা দেখছি, ঐ অর্থে সেখানে হচ্ছে না। ওনারা জানতেন বাইরের এই ইন্দ্রিয়গুলো, গোলকগুলোর কোন গুরুত্ব নেই, এর পেছনে যেটা রয়েছে সেটারই আসল গুরুত্ব। প্রজনের ক্রিয়ার যে ইন্দ্রিয়, সেটা যদি তার মনের পুরো নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, ওর কিন্তু সংসার আর ভালো লাগবে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণে যদি না থাকে তখন পুরুষ নারী যাই হোক তার কাছে প্রজনন ক্রিয়াটা ভালো লাগবে। অর্জুনের বৃহন্নলা হওয়া বা শিখণ্ডী এনাদের এক জন্মেই পরিবর্তন হয়েছিল। সেইজন্য আমাদের কাছে এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। ধর্ম অধর্মের ব্যাপার যখন আসে সেখানে নারী পুরুষের কোন তফাৎ নেই। আমাদের দেশে নারীদের উপর অসম্মান বেশি হতে শুরু হয় মুসলমানরা এদেশে আসার পর থেকে, আগেকার ভারতে নারীদের উপর অসম্মান ব্যাপারটা অত ছিল না। কারণ নারীকে আমাদের শাস্ত্রে কোথাও নীচু বলা হয় না। মনু আদি স্মৃতিশাস্ত্রে নারীকে খুব উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রভাব আসতে শুরু হওয়ার পর থেকে এই ধরণের গোলমাল হতে শুরু হয়েছে।

মূল কথা হল সূক্ষ্ম শরীরটাই আসল আর সূক্ষ্ম শরীরের লিঙ্গ ভেদ নেই। আত্মাতেও কোন লিঙ্গ ভেদ থাকতেই পারে না, কোন প্রশ্নই উঠছে না, সূক্ষ্ম শরীরেও কোন ভেদ নেই। সেইজন্য কেউ মারা যাওয়ার পর যে সূক্ষ্ম শরীর বেরিয়ে গেল সে পরে পুরুষ না নারীর শরীর নেবে বলা অসম্ভব। কোন কোন ছেলেদের মধ্যে মেয়েলি ভাব বেশি থাকে, ঠিক তেমনি কোন কোন মেয়ের মধ্যে পুরুষালী ভাব বেশি দেখা যায়। এর কারণ আগের জন্মে সে হয়তো পুরুষ ছিল, কোন কারণে এবার তার মধ্যে আগের জন্মের সংস্কারগুলো থেকে গেছে। সূক্ষ্ম শরীরটাই শুদ্ধ আত্মার ঠিক ঠিক আবরণ, এটাই ঠিক ঠিক উপাধি। স্থূল দেহের নাশ হয়ে গেলে সূক্ষ্ম শরীরের কোন পরিবর্তন হয় না। সূক্ষ্ম শরীরকেই ভাঙতে হয়, মূল উদ্দেশ্যও তাই। সূক্ষ্ম শরীরকে ভাঙা অত সহজ নয়। সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে তৃতীয় আরেকটা দেহ থাকে, যেটাকে বলা হয় কারণ শরীর, এটাই মায়াময় শরীর, যেখানে শুদ্ধ প্রকাশ থাকে কিন্তু বিদেহ হয় না। প্রথমে স্থূল দেহ, অন্ন দিলে এই দেহ থাকবে অন্ন না দিলে নাশ হয়ে যাবে। স্থূল শরীরের পেছনে আছে সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীর সব সময় জন্ম-মৃত্যুর চক্রের মধ্যে চলছে। সূক্ষ্ম শরীরকে ভেঙে দিলে এবার ও ঈশ্বরের ধ্যান বা চিন্তন করবে কিন্তু বৃহৎ রূপে। এবার সেই অর্থে তার জন্ম-মৃত্যু হবে না, জগতের যেটা সর্বোচ্চ অবস্থা, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার সাথে সে এক হয়ে যায়। কিন্তু পুরোপুরি ভাঙে না। ওটাকেও যদি ভাঙা যায় তবেই শুদ্ধ জ্ঞান হয়। উপাধি তাই তিন রকমের, প্রথমে মায়াময় শরীর যেখানে অজ্ঞান ক্ষীণ আবরণ রূপে আছে, তার উপরে সূক্ষ্ম শরীর, যেটা অজ্ঞানের আরও গাঢ় আবরণ আর তারপর এই স্থূল দেহ। স্থূল দেহকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, বেদান্তে তো কোন দামই দেয় না, কারণ যখন খুশি এর পরিবর্তন করে দেওয়া যায়।

এখানে বলছেন, যখন তুমি ধ্যান করবে প্রথমেই তোমাকে সব উপাধিকে বাদ দিয়ে উপাধি শূন্য হতে হবে। আচার্য শঙ্করের বিখ্যাত নির্বাণষট্কম স্তোত্রে বলছেন *মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহম্*, আমি মন নই, বুদ্ধি নই, অহঙ্কার নই, চিত্তও নই। এই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত হল সূক্ষ্ম শরীরের লক্ষণ। সত্যি কথা বলতে গেলে এই অবস্থায় আমাদের পক্ষে ধ্যান করা অসম্ভব। গুরু বলে দিয়েছেন তুই জপ করে যা, জপ করতে করতে মন গভীরে গেলে ইষ্টের প্রতি একটা প্রীতি জাগে। ঐ ভালোবাসা জাগলে তখন আরেকটু এগোতে ইচ্ছে হয়। আমরা মনে করছি ঘন্টার পর ঘন্টা জপ করে যাব আর তার মধ্যে একটা সময় ঠাকুর এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যাবেন। শ্রীমাকে একজন ভক্ত বলছেন, এত জপ করি, ধ্যান করি কই ঠাকুরের তো দেখা পেলাম না। শ্রীমা শুনে বলছেন, ঠাকুর কি আলু পটল যে এত ধ্যান আর এত জপ করলে তিনি এসে দেখা দেবেন! এখানে যে ধ্যানের পদ্ধতির কথা বলছেন, এই পদ্ধতি শুধু জ্ঞান পথের জন্যই নই, ভক্তিতেও ঠিক একই পদ্ধতি। জ্ঞানের অনুভূতি একই পদ্ধতিতে হয়, স্থূল শরীরের কোন বোধ থাকে না, সেখান থেকে সূক্ষ্ম শরীরের যে উপাধি আমি বোধ কেটে যায়। এরপর কারণ শরীরটা ভেঙে গেলে তখনই জ্ঞান হয়। তখন সে বুঝতে পারে এগুলো সব উপাধি এগুলো আমি

নই, ভক্তিতেও একই জিনিস হয়, যোগের সমাধি অবস্থাতেও তাই হয়। খ্রীশ্চানদেরও তাই হয়, মুসলমানদেরও তাই হয়, তবে যেহেতু এরা এগুলোর উপর পদ্ধতি অনুসারে কাজ করেনি বলে ওরা অতটা বোঝে না। কিন্তু যাঁদের হয়েছে তাঁদের জীবনের ছোটখাটো জিনিসগুলোকে খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় যে সবারই পদ্ধতি এক।

এরপর এখানে একটা উপমা নেওয়া হয়েছে, এই উপমা বেদান্তে প্রায়ই নেওয়া হয়। স্ফটিকের সামনে লাল রঙের ফুল রাখলে স্ফটিককে লাল দেখায়, নীল রঙের ফুল রাখলে স্ফটিককে নীল দেখায়। শাস্ত্রে পঞ্চকোষের কথা বলা হয়, অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ আর আনন্দময়কোষ। কোষ মানে আবরণ, আবরণ মানেই উপাধি। পঞ্চময় কোষের ভেতর আত্মার জ্যোতি আছে বলেই সব কটা কোষ চৈতন্যের আলোতে আলোকিত। আত্মা হলেন চৈতন্য স্বরূপ, এখানে তো আলো নয়, চৈতন্য। আর আত্মা হলেন সর্বব্যাপী। কিন্তু কোন একটা জায়গায় যেন একটা আবরণ এসে গেল, আবরণ এসে গেল মানে, ওখানে আমিত্বের ভাব এসে গেল। তিনি চৈতন্য কিনা, তিনি আমিত্বের ভাব নিলেন। আসলে এই জিনিস গুলোকে ধারণা করা খুব কঠিন আর কাউকে বোঝানার কাজটা আরও কঠিন। যুক্তি দিয়ে বুঝতে গেলে এগুলো কোন দিনই স্পষ্ট হবে না। সেইজন্য বলা হয়, একটা অবস্থার পর শাস্ত্র আর চলে না। এরপর তিনি যদি নিজে দেখিয়ে দেন তবেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়, তা নাহলে যতই শাস্ত্র পড়ুক, যতই ধ্যান করুক কখনই স্পষ্ট হবে না। ঠাকুর বলছেন, বই পড়ে এক রকম, তিনি নিজে যখন দেখিয়ে দেন তখন আরেক রকম।

এর খুব কাছাকাছি উপমা এভাবে দেওয়া যেতে পারে। সমুদ্রের কথা ভাবা যাক। বিশাল সমুদ্র, সমুদ্রের সেই অনন্ত জলরাশিতে অনন্ত জলকণা আর প্রত্যেকটি জলকণার মধ্যে অনেক পার্টিকেলস রয়েছে। এবার ওই পার্টিকেলস অনন্ত চিন্তা করতে পারে। যেমনি ও চিন্তা করল, *একোহম্ বহুস্যাম্ প্রজায়ামি*, আমি এক আমি বহু হব, ঐ পার্টিকেলস সঙ্গে সঙ্গে বহু হয়ে গেল। ঐ বহুর মধ্যেও তিনি নিজেও কিন্তু থেকে যাচ্ছেন। বুঝতে গিয়ে যে জায়গাতে মুশকিল হয়, সমুদ্রের জলের জলবিন্দুর কথা আমরা ভাবতে পারি, সচ্চিদানন্দে কিন্তু তা হয় না। তিনি চৈতন্য কিনা, কোন ভৌতিক জিনিস নন, তিনি আলাদা আলাদা কোন পার্টিকেল নন। তবে বোঝার জন্য এভাবে আমরা কল্পনা করতে পারি যেন একটা অংশ নিজেকে ঐ ভাবে চিন্তা করল। ওটাই তখন একটা ব্রহ্মাণ্ড রচিত হয়ে গেল। বলছেন, সৃষ্টি আদি যা আছে, তাঁরই একটা খুব ক্ষুদ্র অংশ, বাকিটা সেই সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দেরই কোন একটা অংশ যেন ঘনীভূত হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে কোথাও কোন ঘনীভূত হয় না। বেদান্তে যখন এনারা বিচার করতে করতে এগিয়ে যান তখন দেখেন সচ্চিদানন্দে বাস্তবিক পরিবর্তন কখনই হতে পারে না। যদি বাস্তবিক হয় তাহলে তা যুক্তিতেই দাঁড়াবে না। এবার যখন এদিক থেকে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়, যখন *তত্ত্বমসি* বলতে বলছেন, তখন *ত্বম্* কে বিচার করতে বলছেন তার সাথে *তৎ* কেও বিচার কর। বিচার করতে করতে একটা জায়গায় এসে দুটোর সাথে সংযোগ কর। অঙ্ক করার সময় বলা হল একটা গরুর দাম হাজার টাকা, তাহলে পঁচিশটা গরুর দাম কত? আমরা তখন এভাবে হিসাব করি, একটা গরুর দাম হাজার, পঁচিশটা গরুর দাম পঁচিশ গুণ হাজার, উত্তর পঁচিশ হাজার। তার মানে উপর থেকে ধাপে ধাপে নীচের দিকে যাচ্ছি। কিন্তু কিছু কিছু অঙ্কের সমস্যা সমাধান করার সময় ধাপে ধাপে নীচের দিকে এগোয় না। ত্রিগণোমেট্রিকে কিছু কিছু অঙ্ক আছে যেখানে দুদিক থেকেই চালাতে হয়। প্রমাণ করতে হয় এটা সমান এটা। তখন এখান থেকে গিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়াল, আবার ডান দিক নিয়ে এসে দুটোকে মিলিয়ে দেওয়া হল, তারা মানে দেখাচ্ছে, এটাও ওটা, ওটাও এটা, দুটোই সমান। এই ধরণের সমস্যা খুব কম আসে, কিন্তু আছে। কিছু সমস্যাকে যদি সরাসরি নিয়ে চলে যাওয়া হয় তাহলে ওর সমাধান আর করা যাবে না, ওটাকে মেলানো খুব মুশকিল। বাম দিক থেকে চলতে চলতে উত্তর হয়তো হয়ে গেল এক, এবার ডান দিক থেকেও এনে এনে আনতে হবে একে, এক = এক, সেইজন্য দুটো সমান। বেদান্তের বিচার ঠিক ঐভাবেই চলে। ত্বম্ কে বিচার করে করে নিয়ে যাও, তার সাথে তৎ কেও বিচার করে করে নিয়ে যাও, একটা জায়গায় এসে দুটো মিলে যায়। কিন্তু সরাসরি যদি নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা জায়গায় গিয়ে আর যাবে না, আটকে যাবে। যে জায়গাতে গিয়ে আটকাচ্ছে দেখা যাবে ঐ দুটো জিনিস একটা জায়গাতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। তার মানে ঐ জায়গাটা হল দুটো সংযোগ ক্ষেত্র। বিভিন্ন মনের গঠন যেমন যেমন তাদের সংযোগ ক্ষেত্র তেমন তেমন পাল্টে যাবে। সেইজন্য দুটোকে এক রকমই চিন্তা করতে হয়। এদিক থেকেও চিন্তা করতে হয় ঐদিক থেকেও চিন্তা করতে হয়।

শ্রীরাধার যে প্রেম, সেই প্রেমে তিনি দেখছেন সব কৃষ্ণময়। ভাবের দিকেও তাই হয়। কিন্তু যেমনি বিচার করতে যাবে শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণ এক তখন তাকে সেই *তৎ* আর *ত্বম্* এর সাহায্য নিতে হবে। রাধাকে *ত্বম্* রূপে বিচার করে করে ওখানে নিয়ে যেতে হবে আর শ্রীকৃষ্ণকে *তৎ* রূপে বিচার করে করে নিয়ে গেলে ঐ জায়গাতে এসে দুটো মিলে যাবে। বিচার পথে যেতে হলে দুটো দিক থেকেই চলতে হয়, তা নাহলে দুটো মিলবে না। *অহং ব্রহ্মাস্মি* যখন আসে তখনও একই জিনিস হয়। *অহম্* এর যত উপাধি সরাতে হবে, ব্রহ্ম – ব্রহ্ম জিনিসটা কি, ভাবনাতে ব্রহ্মের যত রকম উপাধি আছে সেগুলোকে সরাতে হবে। সব উপাধি সরে যাওয়ার পর দেখে দুটো জিনিসই এক। আত্মা হলেন চৈতন্য, আলো নয়। আত্মার উপর প্রথম আমির আবরণ আসে, এই বোধ আমি আছি। এটাই মহৎ। মহৎ থেকে আসে অহঙ্কার, আমি একা আমি বহু হব, আমিত্বের সাথে তাঁর একত্ব হয়ে গেল। সেখান থেকে আনন্দময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষে নেমে গেল। তার থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে সৃষ্টির দিকে চলে গেল, মনোময়কোষ, এবার বহু হতে শুরু করে দিল। কিন্তু ঐ বহুকে ধরে রাখবে, তা নাহলে বহু তো স্বপ্নের মত হয়ে যাবে, তখন দরকার প্রাণ, এসে গেল প্রাণময়কোষ। প্রাণ বা এনার্জিকে ধারণ করার জন্য চাই অন্ন, অন্নকে গ্রহণ করার জন্য চাই দেহ, এসে গেল অন্নময়কোষ। এই পদ্ধতিতে সেই শুদ্ধ আত্মা থেকে সৃষ্টির সব কিছু চলছে।

আমাদের কাছে দেহকেই মনে হয় চৈতন্য, আমি কথা বলছি, আমি হাত নাড়ছি, পা নাড়ছি। চোখ দিয়ে সুন্দর দৃশ্য বা সুন্দর রূপ দেখার সময় আমাদের কি একবারও মনে হয় চোখ জড়? কখনই তা মনে হয় না। ঠাকুরের সামনে যখন নরেনাদি ছোকড়ারা কথা বলছে তখন কি ঠাকুরের মনে হচ্ছে আমার চোখটা জড়? ঠাকুর আবার বলছেন, নরেন সেদিন একজনকে সাথে করে নিয়ে এল তার একটা চোখ কানা। চোখকে তিনিও গুরুত্ব দিচ্ছেন। কেন? কারণ আমরা দেহকে জড় বলছি, ফালতু বলছি ঠিকই বলছি, কিন্তু চৈতন্যের প্রথম আভাস আমাদের দেহেতেই আসে। সেইজন্য দেহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচারের দিক থেকে গেলেও দেহের খুব গুরুত্ব আছে। কারণ চৈতন্যের প্রথম আভাস দেহ থেকেই আসে। কেন এই আভাস আসে? শুদ্ধ আত্মা, যিনি চৈতন্য, তাঁর চৈতন্যের ভাব ওখান পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। তিনিই একমাত্র চৈতন্য, মেলামেশা হয়ে এই দেহের মধ্যে চৈতন্যের ভাব আর যিনি শুদ্ধ চৈতন্য তাঁর মধ্যে জড়ের ভাব এক অপরের মধ্যে এসে যায়। যখন বিচার করা হয় তখন দেখা যায় সত্যিই শুদ্ধ আত্মার কখনই দেহের ভাব হতে পারে না। আর এর মধ্যে যে বুদ্ধি, এই বুদ্ধিরই তিনটে অবস্থা হয় – জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় জাগ্রতের সাথে স্বপ্ন মেলে না, সুষুপ্তির সাথে স্বপ্ন মেলে না, তিনটের মধ্যে কোন মিল নেই। তিনটের মধ্যে যদি মিল না থাকে কোথাও না কোথাও গিয়ে মিলবে। আমাদের মন এমন যে কোথাও গিয়ে তাকে মিলতে হবে। কিন্তু স্বপ্নে যা দেখছি তার সাথে জাগ্রত অবস্থার কোন মিল থাকে না। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর দেখছি, জিনিসটা অন্য রকম ছিল।

আমেরিকাতে একজন মহিলার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে শিশুকে জন্ম দিতে গিয়ে শিশুটি মারা যায়, ডাক্তাররা বলে দিল যে মহিলা কোন দিন আর মা হতে পারবে না। সেই থেকে মহিলা পুরো অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। একজন মনস্তাত্ত্বিক স্টাডি করার পর এর উপর একটা প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লিখছেন, আমি সকালে সেই হাসপাতালে গেলাম। মহিলাটি দেখতে খুব রূপসী। সকালেই মহিলাটি ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে বলছে, ডাক্তারবাবু জানেন কী হয়েছে? কাল রাত্রে আমি যমজ বাচ্চার জন্ম দিয়েছি, দুজনকেই দেখতে কী সুন্দর আর কী স্বাস্থ্য! ডাক্তারবাবু বলছেন, খুব ভালো খবর, তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার যিনি এই বইটি লিখেছেন, তিনি বলছেন, আমি ভাবছি চিকিৎসা করে ওর এই স্বপ্নের জগতকে ভেঙে ওকে ওর বাস্তবিক জগতে নিয়ে আসা কিছুই না, কিন্তু তাতে বাস্তবিক জীবনে ওর জন্য শুধু কান্নাই থাকবে। তার থেকে স্বপ্নের জগতে ও আনন্দে আছে, খুশিতে আছে। রোজ সকালে আসে, কোন দিন দুটো বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে, কোন দিন তিনটে বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে, সে একটা জগৎ তৈরী করে নিয়েছে। জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্নের জগতকে সত্য রূপে ধরে রেখেছে। আমি আপনি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের জগতকে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি, কারণ ব্যাভিচার, দুটোর সাথে মিলছে না। ঠিক তেমন যদি বিচার করা হয় তখন স্বপ্নের সাথে সুষুপ্তি মেলে না। সুষুপ্তিতে কিছুই নেই, জগতের কোন কিছুই থাকে না আর স্বপ্ন জগতের যে সৃষ্টি সেটাও থাকে না। কি থেকে যায়? বোধটুকু, মৃত্যুর বোধটাও থাকে না। তাহলে সাধারণ পয়েন্ট একটা কোথাও থাকতে হবে, যেখানে এই খেলা হচ্ছে।

বিচার করলে দেখা যাবে সব হল বুদ্ধির খেলা। আমরা মস্তিষ্কের কার্যকেই বুদ্ধি বলছি, এই তিনটে অবস্থাই বুদ্ধির কার্য। বুদ্ধি যেমন সুষুপ্তির অবস্থাকে অনুভব করে, বুদ্ধি যেমন স্বপ্নাবস্থাকে অনুভব করে ঠিক সেই

ভাবে বুদ্ধি জাগ্রত অবস্থাকেও অনুভব করে। মজার কথা যেটা বলছেন, তা হল ব্যাভিচার, এক অপরকে অস্বীকার করে দেয়। স্বপ্নে যা থাকে সুষুপ্তিতে সেটা থাকে না, জাগ্রতেও থাকে না। সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রত দুটোর কোনটাই থাকে না, জাগ্রতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তিও থাকে না। এই তিন অবস্থার বৃত্তিগুলো যতক্ষণ থাকছে আর এই অজ্ঞান যতক্ষণ আছে, যার জন্য এই বৃত্তিগুলো হয় ততক্ষণ এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলতেই থাকে। অজ্ঞান বৃত্তি থাকার জন্য বুদ্ধি আছে, বুদ্ধি থাকলে এই তিন অবস্থা থাকবে। মূল হল অজ্ঞান বৃত্তি, যতক্ষণ এই অজ্ঞান বৃত্তির নাশ না হয়, যতক্ষণ না সরাসরি দেখছে আমি সেই আত্মা, নেতি নেতি বিচার করে যখন সব বৃত্তির নাশ করে দেওয়া হয়, আর হৃদয়ে পরমাত্মার চিন্তন করে করে পরমাত্মার ভাব দৃঢ় হয়ে যায় ততক্ষণ ঐ সারটুকু বোঝা যায় না। যেমন নারকেলের জল, শাঁস আলাদা, শাঁস নিয়ে নেওয়ার পর নারকেলের খোলটা ফেলে দেওয়া হয়। ঠিক তেমনি ধ্যান করে, বিচার করে তাঁরা দেখেন সার হল সেই আত্মতত্ত্ব। আর এই দেহ, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর এগুলো সব সেই নারকেলের খোল যার কোন দাম নেই, ওটাকে তখন ফেলে দেওয়া হয়।

যিনি চৈতন্য তিনি এতক্ষণ ভাবছিলেন আমি তুমি এক। এবার এভাবে নিজেকে ভাবা যেতে পারে, আমি একা, আমি কারুর হাত ধরে বলছি, তুমি আমার। এবার সে যেমন যেমন বলবে আমাকে তেমন তেমন করে যেতে হবে, কারণ আমি তার হাত ধরেছি, সে কিন্তু আমার হাত ধরেনি। মাঝে মাঝে সে আমাকে বলছে, তুমি আমাকে ছাড়ো, আমাকে ধরে আছ কেন? আমাদের দেহ মনও তাই করে, থেকে থেকে বলে আমাকে ছাড়ো, আমার থেকে তুমি বেরোও, আমি তোমাকে চেয়েছি নাকি? মেয়েদের পেছনে ছেলেরা যখন দৌড়ায় তখন মেয়েগুলোও তাই বলে, আমার পেছনে দৌড়াচ্ছ কেন, আমাকে ছাড়তে পারছ না? ওখানে ছেলেটা মনের হাত দিয়ে তার হাতটা ধরে রেখেছে। এটাই তার উপাধি, এবার সে যেমন যেমন নাচাবে এও তেমন তেমন নাচবে। মেয়েটা তাকে কিন্তু ধরেনি, ধরেছে ওই, আঁকড়ে ধরে আছে। মেয়েটি যখন কাঁদবে তখন এও কাঁদবে, যখন হাসবে তখন এও হাসবে, মেয়ের বাবা যখন গালাগাল দেবে তখন মন খারাপ হবে। থেকে থেকে তাকে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটে শুনবে না। কোন কারণে তার বাবা মা বা কোন শুভাকাঙ্খী এসে বলল, তুমি এসব কি করছ, ওকে ছাড়। যদি ছেড়ে দেয় তখন কি হবে? কিছুই হবে না, মুক্ত তো ও চিরদিনই ছিল। বোকার মত হাতটা ধরেছিল, ছেড়ে দিল, খেলা শেষ। এই দেহটা তখন নাচতে থাকবে। কোথায় নাচবে? যে স্থূল ভূত দিয়ে এই দেহ নির্মিত হয়েছিল সেই স্থূল ভূতগুলো পঞ্চভূতে মিলে গেল। ঐ স্থূল ভূত আবার অন্য কোথাও গিয়ে জোট বাঁধবে। সূক্ষ্ম শরীরের পেছনে যে প্রাণাদি রয়েছে সেগুলোও কোথাও যাবে না, ওটা দিয়ে আবার অন্য জিনিস তৈরী হবে। কিন্তু আসল যিনি ছিলেন, এটাকে যদি স্থূল রূপে চিন্তা করা হয় তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এবার ভেবে নেওয়া যাক, আমি, আপনি সবারই ভেতরে একজন আসল রয়েছেন যাঁর মধ্যে চেতনা রয়েছে, আলো রয়েছে। তাঁরও ঐ রকম প্রথমে একটা কারণ শরীর হল যাকে বলছেন আনন্দময়, তিনি তাঁর হাতটা ধরে নিয়েছেন। আর কারণ শরীর আরেকজনের হাত ধরে রেখেছে, সে আবার শেষে এই শরীরের হাতটা ধরে রেখেছে। স্থূল শরীরটা যেমন নাচছে, এরা তিনজনে একই ভাবে নাচছে। যেমন একটা মেয়ের হাত ধরল, এবার সেই মেয়ের একটা ভাই আছে, তার বাবা আছে, মা আছে, সবার হাত ধরে আছে। এবার ওরা যেমন নাচছে, এই বেচারীও সেই রকম নাচছে। কিন্তু ধরে আছে আত্মা, আত্মা এবার হাতটা ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিলে কি হবে? আরেকটা বোকা ছেলে এসে হাত ধরে নেবে। সাংখ্যে নর্তকীর উপমা দেন, নর্তকী তাঁকে ছেড়ে অন্য আরেকজনকে নাচ দেখাতে চলে গেল। কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা নয়, বেদান্তে একমাত্র সচ্চিদানন্দই আছেন, যুক্তি দিয়ে শ্রুতি দিয়ে অনুভূতি দিয়ে ঐটাই দাঁড়ায়। কিন্তু বোঝার জন্য নর্তকীর উপমাটা ভালো। এটাই যখন বিচার করে করে দাঁড়ায় তখন সবটাই খসে পড়ে যায়।

সব বলার পর বলছেন, যিনি সচ্চিদানন্দ তিনিই আছেন, সচ্চিদানন্দ মানে যিনি সৎ চিৎ আর আনন্দ। চিৎ মানে জ্ঞান আর আনন্দ মানে যেটা সুখস্বরূপ। এটাই আশ্চর্যের যে, শাস্ত্রে বলছে সচ্চিদানন্দ ভগবানই আছেন অথচ জগতে শুধু অজ্ঞান আর দুঃখ, শুধু নিরানন্দ। এই বিরোধ কী করে হতে পারে? যিনি সুখস্বরূপ আর যিনি চৈতন্য স্বরূপ, যিনি শুদ্ধ জ্ঞান, সেখানে আমাদের মধ্যে অজ্ঞান, আমরা পুরো মায়াতে আবৃত হয়ে আছি আর সারাটা জীবন শুধু চোখের জলই বেরিয়ে যাচ্ছে। বলছেন, এটাই ভ্রম। আমাদের কান্নাটা সত্য মনে হয় ঠিকই, কিন্তু একবারও ভেবে দেখি না যে এটাই মায়া, এটাই ভ্রম, এটাই অজ্ঞান। যখনই কোন দুঃখ-কষ্ট হয় তখন চুপচাপ বসে একবার ভাবুন আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি সেই সচ্চিদানন্দ, আমার আবার কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট।

তাতে দেখা যাবে তখন এগুলো অনেকটা কেটে যায়, কিছু না হলেও একেবারে ভেঙে পড়া থেকে আটকে দেবে। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের তোড়ে ভাবনা-টাবনা সব উড়ে যায়, তখন এই ভাব ধরে রাখা যায় না ঠিকই। কিন্তু এই অনুশীলনই সবাইকে করতে হয়। ঠাকুর সাধনা করলেন, সাধনা করে সিদ্ধির অবস্থায় গেলেন, সিদ্ধির অবস্থা থেকে তিনি বারবার বলছেন ঈশ্বরই বস্তু বাকি সব অবস্তু আর ঈশ্বরকে তিনি পরিভাষিত করছেন সচ্চিদানন্দ রূপে। তার মানে তাঁর সত্তা আছে। যখন বলছেন ঈশ্বরই আছেন তখন ঐ সত্তাটুকুকেই বলছেন তিনি আছেন। সমাধিতে গিয়ে তিনি দেখছেন তিনিই আছেন, তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। কিন্তু ব্যক্তি স্তরে আমার, আপনার অবস্থায় যখন আসছেন তখনও তিনি সেই একই জিনিস দেখছেন।

আমরা বারবার স্বপ্ন আর সুষুপ্তির উপমা নিচ্ছি। জাগ্রত অবস্থায় যে নানান রকম জিনিস দেখছে সেই জিনিস স্বপ্নেও দেখছে। যদি সুষুপ্তিতে চলে যাওয়ার পর তার ঘুম ভেঙে যায় তখন ভাববে আমি কোথায় আছি, কত সুখে ছিলাম। গভীর ঘুমের পর আনন্দের রেশ থেকে যায় তার সাথে আমার কিছু মনে নেই। যদি মনে থাকে তাহলে স্বপ্ন দেখছিল। আমার কিছু মনে নেই এই বোধ আর গভীর নিদ্রার আনন্দ, সুষুপ্তিতে এই দুটোই হয়। যদি স্বপ্নকে জাগ্রত অবস্থার সাথে তুলনা করা হয় আর সুষুপ্তিকে যদি সমাধি অবস্থার সাথে তুলনা করা হয় তখন পুরো জিনিসটা পরিষ্কার হয়। যেমন স্বপ্নে নির্মিত সব কিছুই মিথ্যা, মিথ্যা মানে জাগ্রত অবস্থায় বলছি মিথ্যা কিন্তু স্বপ্নে কখনই মনে হবে না। আর সুষুপ্তিতে আনন্দের বোধ থেকে যায়। সমাধিতে ঠিক তাই হয়, কিন্তু সমাধি থেকে তিনি জ্ঞানবান হয়ে ফেরত আসেন। মুর্খ সুষুপ্তির পর মুর্খ হয়েই ফেরত আসে, কিন্তু সমাধিত মুর্খ যদি চলে যায় তখন সে বিদ্বান হয়ে ফেরত আসে, এটাই তফাৎ। জাগ্রত আর স্বপ্নও ঠিক ঐ রকম। এখানে বলছেন, যা কিছু বলা হল এগুলো যে কল্পনা করে বলা হচ্ছে তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির পর এরই বর্ণনা করছেন, কিন্তু বাকিদের এই জিনিস নিত্য হচ্ছে, যাদের সুষুপ্তি হয় না তাদের ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। মস্তিষ্কে অনেক রকম ঝামেলা থাকলে ঘুম হতে চায় না, প্রচুর স্বপ্ন দেখে, ঘুম ভাঙার পরেও শরীর ক্লান্তি মেটে না। সুষুপ্তি হলেই মন আবার সতেজ হয়ে যায়, প্রচুর এনার্জি পেয়ে যায়। সেইজন্য শোওয়ার আগে টিভি, সিনেমা দেখতে নিষেধ করা হয়, কারণ মন তাতে আরও চঞ্চল হয়ে যায়। শোওয়ার আগে একটু জপ করলে, ধর্মীয় গ্রন্থাদি পড়লে মনের চাঞ্চল্য কম থাকে।

বলছেন, এই অবস্থা প্রত্যেক মানুষেরই হয়। যেমন মানুষ সুষুপ্তি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে আবার সেই স্বপ্ন আবার সেই সৃষ্টি, তেমনি সমাধিবান পুরুষ সমাধি থেকে ফিরে এসে সৃষ্টিকেই দেখেন। কিন্তু তখন ঐ সুখটাও যেমন নষ্ট হয়ে যায় আর ঐ বোধটাও হারিয়ে যায়। যারা সমাধিবান নয় তাদেরও একই সমস্যা হয়। কিন্তু সমাধিবানদের কথা যদি নেওয়া হয় আর তার সাথে সুষুপ্তিকে যদি বিচার করা হয় তখন দেখা যাবে শেষ কথা ঐটাই, বোধস্বরূপ আর সুখস্বরূপ। সুখস্বরূপে আর বোধস্বরূপে আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারছি না বলেই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট। এইসব বলার পর বলছেন, যিনি আনন্দস্বরূপ তিনি আমি ভাবটা আরোপ করে নেন তার মানে তিনি চৈতন্যের ভাব থেকে সরে জড়ের ভাব নিয়ে নিলেন। জড়ের ভাব নেওয়ার পর মন, বুদ্ধি আদি এগুলো এসে গেল এবং বুদ্ধিতে যখন ঐ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তখনই আমরা তাকে বলছি জীব। মূলতঃ আত্মা আর জীবের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, দুটো একই। কিন্তু শাস্ত্রে দুটোকে বোঝানর জন্য আলাদা করে বলা হয়, আত্মা বিশুদ্ধ, সেই শুদ্ধ আত্মার উপর আমিত্বের ভাব এসে গেলে তখন সেই শুদ্ধ আত্মাকেই অন্য রকম দেখায়। এনারা স্ফটিক আর লাল ফুলের উপমা নেন। আমিত্ব এসে গেলে শুদ্ধ আত্মা জীব হয়ে গেলেন। যখন আত্মার আমি বোধ থাকে তখন জীবাত্মা যখন আমি বোধ নেই তখন পরমাত্মা। এছাড়া আর কিছু না, দুটো একই জিনিস, কোন তফাৎ নেই। পরমাত্মা যখন বুদ্ধি অবিচ্ছিন্ন হয়ে যান তখন বলছেন জীব। আমরা প্রায়ই এই উপমা নিয়ে থাকি, যে যার সঙ্গে করে সে তার সত্তা পায়। এই যে আমিত্ব, যেটা নেই, যেটা জড়, সেই জড়কে এবার চৈতন্যের মত দেখায় আর যিনি চৈতন্য তাঁকে জড়ের মত দেখা। বুদ্ধি, মন, অহঙ্কারাদি সব জড় কিন্তু সে ভাবছে আমি এটা করতে পারি, আমি সেটা করতে পারি অথচ এদের কোন ক্ষমতাই নেই। লোহাকে আগুনে রেখে দিলে লোহার রঙ লাল হয়ে গরম হয়ে যাবে। লোহার যে রঙ, যে তাপ এগুলো লোহার নিজস্ব নয়, এই উপাধি গুলো অগ্নি থেকে লোহার উপর এসেছে। ঠাকুর বলছেন হাড়িতে আলু, পটল লাফায়, অজ্ঞানীরা মনে করে আলু, পটল নিজেই লাফাচ্ছে, জানে না যে নীচে আগুন আছে বলে আলু, পটল লাফাচ্ছে। পেছনে আত্মা আছেন বলে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় এদের চৈতন্যবান বলে বোধ হয়। আমরা কাউকে বলছি সে কত বুদ্ধিমান, সে দেখতে কত সুন্দর আমরা তখন ভুলে যাচ্ছি সেই আত্মা তার চেহারা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। সবটাই আত্মার

প্রকাশ, ওগুলো কিছু না। ঠাকুর অধর সেনকে বলছেন, তোমার যে এই ক্ষমতা সেটা তিনিই দিয়েছেন। কারুর বিদ্যা বুদ্ধি বেশি আছে মানে, তিনিই দিয়েছেন। কারণ আত্মার প্রকাশ যেখানে সেখানেই এই জিনিসগুলো এভাবে হয়। যার মধ্যে আত্মার প্রকাশ তার মধ্যে সব কিছুই আসে। যখন ঐ প্রকাশকে তিনি আরও বাড়াতে থাকেন, তখন ওগুলোও বাড়তে থাকে। কিন্তু যেমনি অধিকার বোধ এসে যায়, আমি করছি এই ভাব এসে গেল, তার মানে মায়া ধরে নিল, তখন আস্তে আস্তে এগুলোও স্তিমিত হয়ে যায়।

ভগবান সব সহ্য করেন কিন্তু অহঙ্কার সহ্য করেন না। ভগবান যদি সব কিছুই সহ্য করেন তাহলে অহঙ্কার সহ্য করাতে আপত্তির কি আছে? আপত্তি এই কারণে, আত্মার প্রকাশ যেখানে সেখানে পরিষ্কার বোঝা যায় এখানে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ, অহঙ্কার মানে মায়ার আবরণটা এসে গেল, এবার আর শক্তির প্রকাশ দেখা যাবে না। প্রদীপের আলো একটার পর একটা জিনিস দিয়ে ঢাকা, প্রদীপের আলোর প্রকাশ কি করে আসবে, অন্ধকারও দূর হবে না, অহঙ্কার মানে আত্মার প্রকাশকে ঢেকে দেওয়া হল। যেখানে বিদ্যা, জ্ঞান, সুখ এই জিনিসগুলো রয়েছে সেখানেও এর বাধক শুধু আমিত্ব। যার মধ্যে যত আমিত্বের ভাব বেশি আত্মার প্রকাশের উপর তার তত মোটা আবরণ পড়ে আছে। শাস্ত্রে বলছেন, *বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্* যাঁদের বিদ্যা আছে তাঁরা বিনয়ী হন। কারণ বিনয় ঈশ্বরেরই রূপ, অহঙ্কার ঈশ্বরের রূপ নয়, অহঙ্কার মায়ার রূপ। প্রথম থেকেই বলা হচ্ছে, যখন তাঁর মধ্যে আমি বোধ এসে যায় সেখান থেকেই মায়ার জগৎ শুরু হয়ে যায়। ঠাকুর বলছেন, পণ্ডিতের মধ্যে যদি দেখি ত্যাগ বৈরাগ্য আছে তখন ভালো লাগে, কিন্তু যদি দেখি নেই তখন পণ্ডিতকে খড়কুটো বলে বোধ হয়। কারণ তখন পণ্ডিতের সব কিছুতে বুদ্ধির খেলা চলে, ওখানে আর আত্মার প্রকাশ নেই, তাই ঐ বুদ্ধিরও কোন দাম নেই। সেইজন্য যেখানেই দেখা যাবে বিশেষ গুণ আছে, যে কোন গুণ, দেখতে সুন্দর, জ্ঞান, বুদ্ধি, টাকা-পয়সা যদি থাকে, বুঝতে হবে এখানে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ আছে। এরপর যদি দেখা যায় ঐ জিনিসগুলোর প্রতি তার কোন আসক্তি নেই, অহঙ্কার নেই, তখন বুঝতে হবে একে আর আটকানো যাবে না। রূপ আছে, গুণ আছে, কীর্তি আছে, ঐশ্বর্য আছে, শ্রী আছে, শক্তি আছে, এর যে কোন জিনিস যদি থাকে আর তার মধ্যে কোন আসক্তি নেই, অহংতা মমতা নেই, এই ব্যক্তিকে মহামায়া আর এই জগতে আটকে রাখতে পারবে না। এত কিছু বলার পর বলছেন, তাহলে উপায় কি? তখন এই শ্লোকে বলছেন –

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।৭/৫/৪২

এতক্ষণ যা কিছু আলোচনা হল এগুলোকে বোঝার জন্য গুরুর কাছে গিয়ে উপবেশন করতে হবে, গুরুর মুখে এসব কথা শ্রবণ করতে হবে। আগেকার দিনে শিক্ষা গুরু, দীক্ষা গুরু একজনই হতেন। ইদানিং সব জায়গায় অনেক কিছুর পদ্ধতি পাল্টে গেছে। এখন শিক্ষা গুরু একজন হন, দীক্ষা গুরু আরেকজন হন। মনুস্মৃতিতে অবশ্য আচার্য, দীক্ষাগুরুর কথা আলাদা বলছেন। কিন্তু বৈদিক যুগে যিনি উপনয়ন দিতেন, তিনিই বেদ পড়াতেন, তিনিই আবার আধ্যাত্মিক গুরু হতেন। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের জ্ঞান আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান একই লোকের কাছ থেকে আসত। এখন যাঁর কাছেই দীক্ষা হয়ে থাকুক, কিন্তু এই যে বোধের কথা বলছেন, গুরুর সঙ্গ করতে করতে, গুরুর কথা শুনতে শুনতে এই বোধ শিষ্যের মধ্যে সঞ্জাত হয়। গুরুর কাছে কি কথা শুনবে? শাস্ত্রের কথা গুরুর মুখ দিয়ে শুনতে হবে। গুরু বেদান্তের যে কথাগুলো বলছেন তার বাইরে আর কিছু শোনার দরকার হয় না। গুরু যদি বিজ্ঞানের কথা বলেন, ইতিহাস, ভূগোলের কথা বলেন, এগুলো শুনে কী হবে! তিনি এগুলোর উপর কতটুকুই বা জানবেন। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে সাধু সন্ন্যাসীরা ইদানিং ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞানের উপর সব জায়গায় লেকচার দিয়ে যাচ্ছেন। সাধু সন্ন্যাসীদের এটা লাইন নয়, তাঁদের লাইন হল বেদান্ত। সাধু সন্ন্যাসীকে শুধু বেদান্তকেই ধরে রাখতে হয়, যারা শুনতে আসবে তারাও তাঁর কাছে বেদান্তের কথাই শুনবে। শুনে শুনে এই একটা বোধ জাগ্রত হয়ে যাবে, আমার হৃদয়ে সেই অন্তর্যামী, সেই পরমেশ্বরের নিবাস। আর যখন ঠিক ঠিক তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে যায় তখন অনাত্ম বস্তু সমূহ আপনা থেকে ত্যাগ হয়ে যায়। অধ্যাত্ম রামায়ণে একটু অন্য রকম বলছেন, যদিও পরিষ্কার ভাবে বলা নেই, কিন্তু এর implication হল, আধ্যাত্মিক জীবনে একটু যদি এগিয়ে যায়, একটু যদি বোধ হয়ে যায় তখন বাকি সব কিছু চেষ্টা করে ছেড়ে দিতে হয়। এখানে শব্দটা ব্যবহার করছেন, ত্যাগ করা। জ্ঞান হয়ে গেলে আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে এখানে জ্ঞানেরও কথা বলছেন তার সাথে ত্যাগ করার কথাও বলছেন। তার মানে বলতে চাইছেন একটু যদি নিষ্ঠা বা জ্ঞান ভক্তি এসে যায়। তার সাথে বলছেন, যাঁরা বেদান্তী তাঁরা বারবার চিন্তা করবে আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আমি হলা অজঃ, আমার জন্ম নেই,

আমার মৃত্যু নেই, আমি নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত-শুদ্ধ। এই ভাবে চিন্তা করতে করতে অখণ্ড বৃত্তি হয়ে যায়। এখানে শব্দটা হল অখণ্ড বৃত্তি, আমাদের বৃত্তি সব সময় খণ্ডিত, আমি এখন একজনকে দেখছি, আবার ওদিকে আরেকজনকে দেখছি, এভাবে আমাদের বৃত্তিগুলো খণ্ডিত। তার সাথে একটা বৃত্তি আরেকটা বৃত্তির উপর লাফাচ্ছে, একটা বৃত্তিকে সরিয়ে আরেকটা বৃত্তি ঢুকে যাচ্ছে, এইভাবে অসংখ্য বৃত্তি আমাদের মনের মধ্যে ওঠানামা করে যাচ্ছে। এটাকে আটকায় অখণ্ড বৃত্তি, অখণ্ড বৃত্তি মানে একটা মাত্র বৃত্তিই চলছে। যোগশাস্ত্রে এগুলোকে আরও সুসম্বদ্ধ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, মনে যে হাজার রকম চিন্তা চলছে এটাকে একটি মাত্র চিন্তা দিয়ে আটকে দিতে হয়। আর ঐ একটা বৃত্তিই যখন অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে তখন সেটাকে বলছেন অখণ্ড বৃত্তি। ঐ অখণ্ড বৃত্তিতে গিয়ে মন যখন প্রতিষ্ঠিতে হয়ে যায় তখন অবিদ্যা আর তার যে কারকাদি বিভক্তি হয় এগুলোর নাশ হয়ে যায়। অখণ্ড বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে এই জগতের কোন দিন নাশ হবে না।

এই আলোচনা শুরু হয়েছিল লক্ষ্মণের প্রশ্ন নিয়ে। লক্ষ্মণের প্রশ্ন ছিল, যে জগৎ সংসারের মধ্যে এত দুঃখ কষ্ট, এই সংসারের লয় কি করে হবে? সেটাকেই এখানে ব্যাখ্যা করেছেন, জগৎ মানেই কার্য চলছে, কার্য মানেই তার ফলও চলছে, ফল সব সময় সুখ আর দুঃখ রূপে আসে। সুখ রূপে আসলে তাকে ধরে রাখতে চায়, দুঃখ রূপ আসলে তাকে সরিয়ে দিতে চায়। ফলে আরও কার্য হতে থাকে, সেখান থেকে আবার সুখ দুঃখ, তার থেকে আবার কার্য এইভাবে চলছে তো চলছেই। কার্য হওয়া মানেই কারক থাকতে হবে, যাতে সাতটি বিভক্তি লেগে আছে। এটাকে নাশ না করা পর্যন্ত সংসারের কোন দিন নাশ হবে না। বলছেন নাশ করার একটাই পথ – অখণ্ড বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মানুষকে নিয়ে কখনই অখণ্ড বৃত্তি হয় না, হবে যদি কাউকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, যেমন মা নিজের শিশুকে প্রচণ্ড ভালোবাসে। মা যতক্ষণ শিশুকে নিয়ে থাকে তখন তার মনে অন্য কিছু আর আসে না। কিন্তু এই অখণ্ড বৃত্তিতে তার শোক মোহ যায় না, যার ফলে জ্ঞানও হয় না। সাময়িক ভাবে যায়, শ্বশুড় বাড়িতে যত অত্যাচারই হোক কিন্তু সে যখন নিজের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে থাকে তখন সব অত্যাচারই ভুলে যায়, কারণ মা অখণ্ড বৃত্তিতে আছে। কষ্ট সব সময় হয় খণ্ডিত বৃত্তিতে।

এখনও জ্ঞানের কথা বলছেন না, এখনও চিন্তনকে নিয়েই বলছেন। এটাই অদ্বৈত সাধন, যদি এটাকে কেউ নিয়মিত চিন্তন করতে থাকে, আমি সেই শুদ্ধ আত্মা, আর শুদ্ধ আত্মার যে ভাবগুলো রয়েছে সেই ভাবের উপর যদি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়, তখন কার্যের যে এই কারকাদির বিস্তার, এর নাশ হয়ে যায়। কার্যের নাশ হওয়া মানে সংসারের নাশ, আর এই জায়গাতেই দুঃখের নাশ হয়। এর আগে আগে ঈশ্বর চিন্তন কিভাবে করতে হয় আলোচনা করেছেন, এখানে এবার আত্মচিন্তন নিয়ে আলোচনা চলছে। যারা আত্মচিন্তন বিচার করতে চায়, তাদের জন্য একটাই পথ, কোন একটা আশ্রয়কে অবলম্বন করে এই চিন্তন করা। স্বামীজী বিদেশে গেলেন, বিদেশ থেকে ভারতে এলেন, কোথাও তিনি ঠাকুরের প্রচার করলেন না। স্বামীজীর গুরুভাইরা এই নিয়ে খুব আপত্তি করেছিলেন। স্বামীজী যদি ঠাকুরের প্রচার করতে যেতেন, সভার সবাইকে যদি বলতে শুরু করতেন ঠাকুর হলেন ভগবান, যীশুর বদলে তোমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভজনা কর, ওখানেই সব লোক ফাঁকা হয়ে যেত। আত্মচিন্তন করা, শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন করা একই। কিন্তু আত্মচিন্তন universal হয়, আত্মচিন্তন ভারতের লোকেরাও করতে পারে, ইউরোপের লোকেরাও করতে পারে আর আমেরিকার লোকেরাও করতে পারে। স্বামীজী তাই ঐ approachটা নিলেন, অদ্বৈত। তোমার যে বাস্তবিক স্বরূপ সেটাকে নিয়ে চিন্তন কর। যারা এটা পারবে না তারা যীশুকে নিয়ে চিন্তা করবে, রামকৃষ্ণকে নিয়ে চিন্তন করবে। যারা আত্মচিন্তন করবে, যারা জ্ঞানমার্গের তারা এই জগতকে পরমাত্মার রূপ ভেবে চিন্তন করবে। কিন্তু জগতের বাকি যা কিছু জাগতিক আছে তার সব কিছুকে আত্মাতে লীন করে দিতে হয়। এটাকে বলে ওঁ এর ধ্যান, ইদানিং কালে এই জিনিসটাকে অনেক গুরুরা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। কিন্তু এই সাধনা খুব কঠিন। ওঁ 'অ' 'উ' আর 'ম' এই তিনটে বর্ণ দিয়ে তৈরী। ওঁ ধ্যানে জাগ্রত অবস্থায় যে জগতকে আমরা দেখছি সেটাকে 'অ'তে লয় করে দিতে হয়, স্বপ্নকে 'উ'তে, এর পর যে কারণ জগৎ সেটা 'ম'তে লয় হয়ে যাবে। এটাও এক ধরণের সাধনার পদ্ধতি। এর বিস্তারিতে গিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ভাববে তখন কি হবে? একই কথা, গীতার দশম অধ্যায় আর একাদশ অধ্যায়ে ভগবান এটাই দেখচ্ছেন। দশম অধ্যায়ে দেখাচ্ছেন, বিশ্বে যা কিছু ভালো আছে সেটা আমারই রূপ, যেমন বলছেন *বেদানাং সামবেদোঽস্মি*, যখন সামবেদ দেখছি তখন দেখছি এটা কৃষ্ণেরই রূপ। আবার একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাঁর বাস্তবিক স্বরূপকে দেখিয়ে দিলেন, সেই বিরাটের স্বরূপ। বিরাটের স্বরূপে দেখাচ্ছেন, কিভাবে বড় বড়

যোদ্ধারাও সব তাঁর ভেতরে প্রবেশ করে যাচ্ছে। ঐ বিরাট করাল রূপের সামনে বড় বড় ঋষি, মুনি, সিদ্ধরা হাতজোড় করে প্রণাম করছেন, এটাই তাঁর রূপ।

যখন সাধনা আরও গভীরে যায় তখন এই বহুকে একের মধ্যে ঢোকাতে হয়। এই বহু যখন একের মধ্যে ঢোকে তখন কিভাবে ঢোকে বলতে গিয়ে প্রথমে বলছেন, যাঁরা জ্ঞান পথে সাধনা করেন তাঁরা এই 'অ', 'উ' আর 'ম'তে ঢোকান। আর যাঁরা কৃষ্ণের সাধনা করেন তাঁদের গীতার দশম ও একাদশ অধ্যায়ে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেইভাবে ঢোকে। সাধনা যদি করতে হয় তাহলে সবাইকে এভাবেই করতে হবে। জাগ্রত অবস্থায় যেটা দেখছি এটাকে ঢুকিয়ে দিতে হয়। কোথায় ঢোকাবে? যদি ওঁ সাধক হন তাহলে তিনি 'অ'তে ঢোকাবেন, আর যিনি ঠাকুরের ভক্ত ঠাকুরের মধ্যে, কৃষ্ণের ভক্ত হলে কৃষ্ণের মধ্যে ঢোকাতে হবে। যাঁরা রামমার্গের তাঁরাও বলবেন, শ্রীরামের এই রূপের মধ্যে জাগ্রত রূপকে ঢুকিয়ে দেবে, রামের এই রূপের মধ্যে স্বপ্নের জগতকে ঢুকিয়ে দেবে বা সূক্ষ্ম জগতকে ঢুকিয়ে দেবে। এটাই ঠিক ঠিক শাস্ত্র, এটাই ঠিক ঠিক সাধনা। আরেকটি শ্লোকে বলছেন –

এবং সদা জাতপরাত্মভাবনঃ স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্‌গুণাত্মনঃ।৭/৫/৫২

মুক্তি কে পায় বলছেন। *এবং সদা জাতপরাত্মভাবনঃ*, এই যে পরমাত্মার যে ভাবনা সব সময় সেই ভাবে করে যাচ্ছে, জাগ্রত যা কিছু আছে অকারের মধ্যে, স্বপ্ন যা কিছু উকারের মধ্যে, সুষুপ্তির যা কিছু মকারের মধ্যে আর তারপরে আছে শুধু আনন্দস্বরূপ। ঠিক সেইভাবে স্থূল জগৎ, সূক্ষ্ম জগৎ, কারণ জগতকেও এভাবে লয় করছে, ধ্যানের গভীরে বাস্তবিক সব লয় হয়ে যাচ্ছে। আর যাঁরা সাধক যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখছেন, বলছেন এটা সেই ঈশ্বরেরই রূপ, ওকে মানুষ রূপে কখনই দেখবে না। স্বামীজীর জীবনের একটা ঘটনা আছে, কলেজে পড়ার সময় একদিন স্বামীজীর মনে কোন কুচিন্তা এসেছিল। শীতের সময় ঘরে কাঠের আগুন জ্বলছিল, তিনি ঐ জ্বলন্ত কাঠের আগুনে বসে পড়লেন। পেছনটা পুড়ে গেল, তারপর মনকে বলছেন, এরপরেও যদি কুচিন্তা আসে তখন আরও কঠিন শাস্তি পাবে। প্যারিসে তিনি একটি মেয়েকে দেখেছিলেন, যার মুখটা খুব সুন্দর লেগেছিল তাঁর কাছে, ভাবছেন এত সুন্দর চেহারা হতে পারে! ভাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছেন মেয়েটির চেহারাটা একটা বানরের চেহারা হয়ে গেছে। যেমনি সংসার চিন্তা এসেছে মুখটা বানরের হয়ে গেল। মুখটা বানরের হয়নি, স্বামীজীর মাথায় মেয়েটির মুখ বানরের হয়ে গেছে। যাঁরা সর্বদা এই চিন্তন করছেন, কিভাবে চিন্তন করছেন, এই যে পরমাত্মা, আমি যে ভাবটা রয়েছে এর পর যেটা রয়েছে। তখন কি হয়? *পরিবিস্মৃতাখিলঃ*, এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, দৃশ্যজগতই হোক কিংবা সূক্ষ্ম জগতই হোক এর সব কিছুকে সেই পরমাত্মাতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তখন *স্বানন্দতুষ্টঃ*, নিজেতেই আনন্দে মশগুল, নিজের যে আত্মা, যে আত্মার চিন্তন করছেন, সেটাতেই আনন্দ। বাইরের কোন কিছুর দরকার লাগে না। একমাত্র এই ধরণের যোগী যাঁরা তাঁরাই মুক্তি পান, তাছাড়া আর কেউ মুক্তি পায় না। তখন আর কোন ধরণের বন্ধন থাকে না, সব কিছুর বন্ধন থেকে তিনি মুক্তি পেয়ে যান।

মজার ব্যাপার হল, আমরা সেই সব বস্তুকেই ধরে রাখতে চাই যেগুলো আমার জিনিস নয়। যে বস্তুগুলো ঠিক ঠিক আমার নিজের সেই জিনিসের আমরা কখনই কোন দাবী করি না, যেগুলো আমাদের নয় ঠিক সেগুলোই আমরা পেতে চাই। যে মেয়ে খুব সুন্দরী তার কত অহঙ্কার, হাঁটাচলাই অন্য রকম। ঐ চেহারাটা কি তোমার? চেহারা সুন্দর হলে তাতে তোমার কি আছে! বাবা-মায়ের জেনেটিক কম্বিনেশানে এই চেহারা পেয়েছ তাতে তোমার কি! কিন্তু কত অহঙ্কার। বাচ্চা বয়স থেকে প্রখর বুদ্ধি, কত অহঙ্কার, আমার কত বুদ্ধি। বাপ-ঠাকুর্দার বিরাট সম্পত্তি, তার কত অহঙ্কার। কিসের অহঙ্কার? তুমি নিজে কিছু করোনি, তোমার বংশ থেকে এসেছে। কিন্তু যে জিনিস দিয়ে কীর্তি হয়, যেমন বিজ্ঞানীরা যত তাঁর জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, যত তিনি উপরের দিকে যান তত তিনি নিরহঙ্কারী হয়ে যান। কীর্তি যত বাড়বে সে ততো নিরহঙ্কারী হয়ে যায়, বাস্তবিকই তাই হয়। ছেলে যখন ছোট থাকে তখন ছেলেকে নিয়ে মায়ের কত অহঙ্কার, আর যখন বড় হয়ে যায় তখন সেই মা বলে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই রকম করতে পারল! কিন্তু সত্যিকারের মায়ের কি নিয়ে অহঙ্কার করার আছে! একটা হতে পারে, মা ছেলেকে বড় করেছে আর তার একটা side effect থাকে, মায়ের মধ্যে ভালোবাসা জাগে। কিন্তু কোন দিন কাউকে কি দেখা গেছে যে নিজের ভালোবাসাকে নিয়ে গর্ব করে? কারণ এটাই তার কীর্তি। বিচার করে করে যত গভীরে যাবে তখন দেখবে ওটাকেই মানুষ ধরে রাখতে চায় যেটা তার নয়, কিন্তু যেটা তার নিজস্ব, যেটা তাকে

এমন মহৎ করে দেয় সেটার দিকে তার দৃষ্টিই পড়ে না। মানুষের জীবনে যত সাফল্য আসে, কীর্তি আসতে শুরু হয় তত সে বিনয়ী হতে শুরু করে।

আইনস্টাইন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন। ওখানে তাঁরা একজনের সাথে আইনস্টাইনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলছেন, ইনি আমাদের একজন সেরা যুবক পদার্থবিজ্ঞানী আর খুব বিনয়ী। শুনে আইনস্টাইন বলছেন, ওর জীবনে এখনও কোন সাফল্য আসেনি, কোন কীর্তি স্থাপন করতে পারেনি, কি করে ও এখন বিনয়ী হবে! যে মানুষের কীর্তি যত বাড়ে সে তত বিনয়ী হয়ে যায়। যে লেখক, যে বিজ্ঞানী যত বড় সে তত বিনয়ী। তেমনি যারা খুব পরিশ্রম করে, খেটেখুটে টাকা রোজগার করেছে তারাও খুব বিনয়ী হয়ে যায়। কিন্তু সব থেকে বড় কীর্তি হল ঈশ্বরকে জানা। ঠাকুর বলছেন, মাইরি বলছি আমার একটুও অহঙ্কার নেই। শ্রেষ্ঠ কীর্তি, ঈশ্বরের উপলব্ধি হয়ে গেলে অহঙ্কার একেবারে জিরো হয়ে যায়। অহঙ্কার যদি জিরো হয়ে যায় তখন স্বাভাবিক ভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য সব জিরো হয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে অহঙ্কার যখনই আসে তখনই ক্রোধ লোভাদি সব কিছু জুটে যায়। শাস্ত্রে বারবার এই কথাই বলছেন, যে ঠিক ঠিক ভক্ত, ঠিক ঠিক জ্ঞানী তাঁদের এগুলো নাশ হয়ে যায়। কেন নাশ হয়ে যায়? কারণ মানুষের উপলব্ধি যত বাড়তে থাকে অহঙ্কার তত নাশ হতে থাকে। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, আমার ভেতরে অন্য যাই দোষ ত্রুটি থাকুক, ঈর্ষার ভাব একেবারেই নেই। স্বামীজীর কোথা থেকে ঈর্ষার ভাব আসবে! তিনি এত মহৎ, তাঁর এত কীর্তি, এত সাফল্য সেখানে ঈর্ষা কী করে আসবে! ঈর্ষা কেন নেই? তাঁর মধ্যে আমি ভাবটা নেই। আমি ভাব কেন নেই? কারণ তিনি সাফল্যের শীর্ষে চলে গেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র তখন বলছেন, যখন এই জিনিসগুলো বিচার কর হয় তখন ভালো করে বুঝে নিতে হয়, জীবনের যত রকমের শোক, মোহ, দুঃখ, কষ্ট আছে, যত রকমের ভয় এর সব কিছুর কারণ এই সংসার। যখন দুঃখ আসে তখন ভাবি আমি কত অভাগা। আমি অভাগা হব যদি এটা সত্য হয়। আমাদের কাছে শরীরটা সত্য বলে বোধ হয়। হাতে যদি চোট লাগে তখন শরীরটা সত্য চোট লাগাটাও সত্য। কিন্তু যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের সাধনা করছেন, বিচার করতে করতে আরও গভীরে যাচ্ছেন তখন দেখেন এই শোক মোহ, যেটাকে সংসারীরা সত্য বলে নিচ্ছে, নিজেকে অভাগা মনে করছে, সেটাকে তিনি মনে করছেন এটা আমার উপর এসেছে। সংসারের নিবৃত্তি যদি করে দেওয়া হয়, সংসার থেকে মনকে যদি সরিয়ে নেওয়া হয়। সংসার তো বাইরের জগৎ নয়, সংসার হল মনের জগৎ। ছোট্ট শিশুর সামনে চোর এসে চুরি করে কিছু নিয়ে গেলে সে বোঝে না যে লোকটা চোর চুরি করছে। কারণ শিশুর মনে চুরির ভাবটাই নেই। ভেতরে যার যে ভাব আছে সে বাইরেও ওই রকমই দেখে। বাইরের দৃশ্য জগতের কোন দাম নেই, দাম রয়েছে মনের। বাইরের বস্তুগুলো যখন আমাদের ভেতরে টোকা মারে তার থেকে ভেতরে যে একটা প্রতিক্রিয়া তৈরী হচ্ছে, এটাকেই বলা হয় সংসার। আমাদের যে নিজের সংসার সেখানে এক গুচ্ছ ইমোশান জড়িয়ে আছে, আর সেই ইমোশানের জন্য আমরা দুঃখ পাচ্ছি, কষ্ট পাচ্ছি। জ্ঞানীরা বা যাঁরা এই স্তরে যেতে চান তাঁরা এই জিনিসগুলোকে বিচার করে করে বুঝে যান, আমার যত দুঃখ, যত শোকের কারণ এই সংসার। তাঁরা তাই সংসার থেকে নিবৃত্তি নিয়ে নেন। সংসার থেকে নিবৃত্তি মানে কর্ম থেকে নিবৃত্তি। কর্ম থেকে নিবৃত্তি মানে আমাকে এটা করতে হবে এই কর্তব্য বোধ থাকে না।

কর্ম না করলে, কর্তব্য না থাকলে তো মানুষ পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু এনারা অন্তরাত্মাতে ভজন কীর্তন নিয়েই থাকেন। বাইরে যে ভজন কীর্তন করবেন তা নয়, ভেতরেই ধ্যান করছেন, ভেতরেই চিন্তন করছেন, মনন করছেন। বাইরে তাঁর কিছু হয় না, যা কিছু হয় সব ভেতরেই হতে থাকে। মূল হলেন ঈশ্বর, যখন সংসারকে ত্যাগ করে মনকে এই মূলে, ঈশ্বর চিন্তনে স্থির করে দেওয়া। ঈশ্বর বলতে আমরা সাধারণ ভাবে যেটা মনে করি ভগবান আকাশে কোথাও সিংহাসনে বসে সংসারকে চালচ্ছেন, সেভাবে কোন ঈশ্বরের কথা এখানে বলছেন না। আমাদের সবার যে শুদ্ধ স্বরূপ, শুদ্ধ আত্মা, সেই স্বরূপের চিন্তন করা, এর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাঁর কোন বিকার নেই, যাঁর মধ্যে কোন শোক নেই, মোহ নেই। নিজের ঐ স্বরূপকে চিন্তন করে করে দৃঢ় করা। আর এটাই স্বাভাবিক, একটাকে নিয়ে চিন্তন করলে অন্য চিন্তা খসে পড়ে যায়। যে মানুষ দিনে চার পাঁচ ঘন্টা এই ধরণের ধ্যান করেন তিনি তখন কত আর জগতের দিকে মন দেবেন, তাঁর সময় কোথায় আলতু-ফালতু জিনিসে মন দেওয়ার। যদি জোর করে বলে আমি সংসার থেকে সরে যাব? সংসার থেকে সরে যেখানেই যাক না, মনকে তো সেখানেও সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন কোন চিন্তা ঢুকবে না, কিন্তু পুরনো যেগুলো রয়েছে সেগুলো আরও শক্তিমান হয়ে নাচিয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর চিন্তন দিয়ে এগুলোকে কাটিয়ে দিলে আস্তে আস্তে সব আবর্জনা খসে পড়ে যায়।

অভিন্ন ভাবে চিন্তন করলে কি হয়, যেমন দুধে দুধ মেশালে দুধ হয়ে যায়, জল জলে মেশালে জল হয়ে যায়, তখন আর দুটোকে আলাদা করা যায় না। ঠিক তেমনি নিজের ভেতরে যিনি অন্তর্যামী আছেন, সেই অন্তর্যামীতে মন স্থির করার পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি পরমাত্মা, তাঁর সাথে মিলিয়ে দেয়। এটাকেই সাধারণ ভাবে যোগ পথ বলা হয়, ঠাকুরও একে যোগ পথ বলছেন। ঠাকুর বলছেন, যোগীদের কাছে জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন। আসলে জীবাত্মা আর পরমাত্মা তো আলাদা কিছু নয়। যখন অহং ভাব আসে তখন ওটাকে আলাদা করে বোঝানর জন্য বলেন জীব, বাস্তবিক কোন তফাৎ নেই। বলছেন, যেমন দুধে দুধ মেলালে দুধ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি তখন দেখেন সেই একই পরমাত্মা অন্তর্যামী হয়ে সবার ভেতরে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মা রূপে আছেন। মহাসমুদ্রে এক ঘটি জল ঢেলে দিলে সমুদ্রের কী আর হবে! জানাও যাবে না সমুদ্রের জল বাড়ল না কমল। কঠোপনিষদেও ঠিক এই কথাই বলছেন, *যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি*, শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল দিয়ে দিলে আর দুটো জলকে আলাদা করে বোঝা যাবে না।

জীবাত্মা ধ্যান করে করে নিজের স্বরূপের বোধ হয়ে গেল। এখানে চিন্তন করার কথা বলছেন, এই রকম হয়ে যাওয়ার পর কি হয় বলতে গিয়ে বলছেন, শ্রুতি এই কথাই বলছে, উপনিষদও একই রকম কথা বলছে, যুক্তি দিয়েও একই জিনিস হয়, আর অনুভূতি, বিচার করে ধ্যান করে করে সংসারের প্রতি আকর্ষণ যখন একটু কমতে শুরু করল, আর যখন দেখছে, আরে তাই তো আমার যে শুদ্ধ স্বরূপ এটাই বৃহৎ তখন তাঁর লোকব্যবহার পাল্টে যায়। সমাধিবান পুরুষের জগতের প্রতি ব্যবহারটা পাল্টে যায়। কিন্তু কেউ যদি চিন্তন করে করে সেই জায়গায় পৌঁছে যায়, আর সেই রকমই ব্যবহার করেন, সমাধিবান পুরুষের সাথে তাঁর তফাৎ কিছু থাকে না। আর যারা সাধক তারা এটারই অনুশীলন করে।

তিন জনকে জ্ঞানী বলা হয়, ঠাকুর যে অবস্থায় আছেন সেটাও জ্ঞানীর অবস্থা, যিনি এর অনুশীলন করছেন তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়। আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এক জায়গায় বলছেন, যাঁরা এই ধরণের অনুশীলন করেন তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়। আর তৃতীয় জনকে জ্ঞানী বলা হয়, যিনি অনুশীলন করে করে ওই শেষ অবস্থায় পৌঁছে গেছেন কিন্তু এখনও তাঁর উপলব্ধি হয়নি। পরমাত্মাই আছেন এই উপলব্ধি না হলেও ধ্যান করে করে চিন্তন করে করে তিনি এমন অবস্থায় চলে গেছেন যেখানে তিনি যখন লোকের সাথে ব্যবহার করেন তখন ঐ রকম ব্যবহারই করেন। সেখানে তাঁর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এসব কিছু নেই, নিজের আনন্দেই ভাসছেন, কোন কিছুতেই জড়ান না। কেউ এসে তাঁকে নিজের দুঃখের কথা বললে তিনি বলবেন আহা! তোমার কত দুঃখ, আরেকজন আনন্দের কথা বললে বাঃ বাঃ বেশ বেশ করে তাকে উৎসাহ দিচ্ছেন, কোন কিছুতেই জড়াচ্ছেন না, এনাকেও জ্ঞানী বলা হয়। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রথম জ্ঞানী হলেন, যিনি সাধনা শুরু করেছেন, মাঝের যিনি এনার বৌদ্ধিক স্তরে একটা দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও উপলব্ধি হয়নি। বৌদ্ধিক স্তরে জিনিসটাকে ধারণা করা আর আসল উপলব্ধিতে কোন তফাৎ থাকে না। কারণ এই স্তরে যিনি পৌঁছে যান, ওখানে ওনার আর কিছু করার থাকে না। ওখানে নিজের চেষ্টায় আর কিছু হয় না, এরপর যেটা হওয়ার সেটা তাঁর কৃপাতে হয়। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাকে বলছেন ধর্মমেঘ সমাধি। আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে, মেঘে জল আছে, বৃষ্টিটা কিন্তু নামছে না। কিন্তু একটা ফোটা যেই নামল তখন হুড়মুড় করে সব জল নেমে আসে, প্রথম ফোটাটা কিছুতেই নামতে চায় না। ঠিক তেমনি, ধ্যান করে করে বিচার করে করে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে তাঁর জ্ঞানরাশি বুঁদ হয়ে জমে আছে, কিন্তু আসল জ্ঞানটাই হতে চায় না। ঐ যে জ্ঞানটা আসবে সেটা ভগবানের কৃপা ছাড়া হবে না। প্রথম জ্ঞানরাশি যেই বেরিয়ে এল এরপর আর থামতে চায় না, হুড়মুড় করে সব বেরিয়ে আসে। ঠাকুর এটাকে খুব সহজ ভাষায় বলছেন, মা রাশ ঠেলে দেন। ঐ যে জ্ঞানরাশি জমাট বেঁধে মেঘের মত জমে আছে, ঐটাকেও জ্ঞান বলে। যাঁর এখনও বৃষ্টি নামতে শুরু হয়নি, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যাঁর হয়নি, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের দর্শন করেননি, কিন্তু লোকব্যবহার সেই রকমই হয়ে গেছে, তাঁকেও জ্ঞানী বলা হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণেও তাই বলছেন। ফলে তাঁর কথাগুলোও জ্ঞানেরই কথা। তফাৎ হল তিনি শাস্ত্রের জ্ঞান থেকে বলছেন নিজের অনুভূতি হয়নি, উপলব্ধিবান আর এনার মধ্যে এই এতটুকু তফাৎ শুধু থেকে যায়। সেটা তিনিও বুঝতে পারেন, আর যিনি শুনছেন তিনিও বুঝতে পারেন। কিন্তু উপলব্ধি হয়ে যাওয়ার পর যে কথা বলছেন সেটাও শাস্ত্রের কথাই বলছেন। এখানে বলছেন –

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।৭/৫/৫৮

যতক্ষণ তুমি সাক্ষাৎ না দেখছ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমারই রূপ তত দিন তুমি আমারই আরাধনা করতে থাকবে। এরপর আরাধনার আর দরকার নেই। কারণ যেটার জন্য আরাধনা করা সেটাই তো হয়ে গেছে, আমি তো বাস্তবিক দেখে নিয়েছি পুরো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শ্রীরামচন্দ্রেরই রূপ, এরপর শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনার আর কি দরকার, তিনিই সব কিছু হয়ে আছেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে যাঁর কথা বলা হল, যিনি ধ্যান করে করে বিচার করতে করতে সেই স্তরে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু এখনও এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়নি যে শ্রীরামচন্দ্রই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছেন, তিনিও ধ্যান করা ছাড়েন না, ঈশ্বর চিন্তন ছাড়েন না। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, হে লক্ষ্মণ! আমি সমস্ত শাস্ত্র আর সাধনার সার তোমাকে বললাম। এটাকে কেউ যদি মনন করে, চিন্তন করে জানবে সেও মুক্ত হয়ে যাবে। বলছেন –

ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ মায়ৈব সর্বং পরিহৃত্য চেতস্য।৭/৫/৬০

হে লক্ষ্মণ জগতে যা কিছু তুমি দেখছ সবটাই মায়া। মায়া মানে মিথ্যা না, মায়া মানে সবটা আমারই রূপ, কিন্তু দেখার সময় তুমি আমাকে দেখছ না, দেখছ আমার নাম আর রূপকে। এই বোতল রামেরই রূপ কিন্তু আমরা দেখছি বোতল। বোতল আর গ্লাশ দুটোর আকার আলাদা, সেইজন্য একটাকে বোতল বলছি আরেকটাকে গ্লাশ বলছি। এদের একটা করে রূপ হয়ে গেছে আর তাই একটা করে আলাদা নাম হয়ে গেছে। সবাই শুধু নাম আর রূপকেই দেখছি, নাম আর রূপের পেছনে যে আসল সত্তা আছে সেটাকে কেউই দেখছে না, এই নাম আর রূপ দেখাটাই মায়া। ঠাকুরের দেখা আর আমার দেখার মধ্যে কোন তফাৎ নেই, ঠাকুরও এই জগৎ দেখছেন, আমিও এই জগৎ দেখছি। ঠাকুর দেখছনে সেই সচ্চিদানন্দকে, আর সচ্চিদানন্দের বাইরের যে নাম আর রূপ আমি সেটাই দেখছি, এছাড়া আর কোন তফাৎ নেই। হাওড়া স্টেশনে কুলি মাথায় করে ঢাউস একটা সুটকেশ নিয়ে যাচ্ছে। সুটকেশে শাড়ি আছে না বই আছে, সোনা আছে না বাসন আছে তাতে কুলির কিছুই আসে যায় না, তার কাছে ওটা বোঝা। সুটকেশের মালিকের কাছে সুটকেশের বিরাট দাম, কিন্তু কুলির কাছে কোন দাম নেই। স্বর্ণকার সোনার অলঙ্কার দেখে না, দেখছে এর মধ্যে কতটা সোনা আছে, শুধু মেপেই যাচ্ছে আর মেয়েরা সোনার গয়না কিনতে গিয়ে দেখবে নাম আর রূপ, এটা নেকলেস, এটা কানের দুল। আমরা নাম আর রূপকেই দেখি, নাম আর রূপ দেখা মানেই দুঃখ আর কষ্ট। নাম আর রূপ এটাই মায়া। নাম আর রূপটা মিথ্যা, এই কারণেই মিথ্যা, যদি ওটাই তার বাস্তবিক রূপ হয় তাহলে ঐ রূপ আর কোন দিন যাবে না। সত্য সেটাই যেটা সব সময় থাকে, কিন্তু নাম আর রূপ পাল্টাতে থাকে। আজ যেটা নেকলেস, সেটা দিয়ে আগামীকাল কানের দুল বানিয়ে দিল। তখন একটার জায়গায় চারটে কানের দুল হয়ে যাবে। নাম আর রূপটা পাল্টে গেল, কিন্তু সোনা সোনাই থাকছে। যে জিনিসটা পাল্টে যায় ঐ জিনিসটাকেই মায়া বলে। মায়া মানে যার রূপ পালটায় আর সত্য মানে যার রূপ পাল্টায় না। সোনার দৃষ্টিতে সোনা কখনই পাল্টাবে না, কিন্তু তার নাম আর রূপ পাল্টাবে। ঠিক তেমনি সচ্চিদানন্দই সত্য আর এই জগৎ, প্রাণী, এগুলো সব নাম রূপ, এটাই মায়া। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলছেন, নাম আর রূপ হল মায়া, মন থেকে এগুলোকে বার করে দাও, তখন তুমি সুখে থাকবে।

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।
সোঽহংস্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশনপুনাতি লোকত্রিতয়ংযথা রবিঃ।৭/৫/৬১

অধ্যাত্ম রামায়ণের রামগীতা নির্গুণ নিরাকারের সাধন। শ্রীরামচন্দ্র নির্গুণ নিরাকার চিন্তনের কথাই বলছেন। কিন্তু তার আগে দেখালেন কিভাবে সগুণ আর নির্গুণ চিন্তনকে এক জায়গায় মিলিয়ে দিতে হয়। বলছেন এভাবে মানুষ যদি নির্গুণ নিরাকারের চিন্তন করে বা সগুণ চিন্তনও যদি করে তখন দেখে *সোঽহম্*, আমিই সেই। যিনি ভগবানের রূপের চিন্তন করেন তিনি ভগবানেরই রূপ। সেইজন্য সাধু সন্ন্যাসীদের এত সম্মান, কারণ তিনি সব সময় ঈশ্বরের চিন্তন করছেন। ঠাকুরও সাধুর সংজ্ঞা দিচ্ছেন, যাঁর মন সব সময় ঈশ্বরে আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও বলছেন, যিনি এই রূপের চিন্তন করেন তিনি আমি নিজে। একজন সাধু ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন, ঠাকুর বলছেন, নিত্যানন্দের বংশের তাই আমি তাঁকে প্রণাম করলাম, তাঁকে আবার এই রকম কথা বলা! কেউ তাঁর নিন্দা করাতে ঠাকুর রেগে গিয়েছিলেন। কারণ যিনি ঈশ্বরের চিন্তন করেন, সগুণ হোক নির্গুণই হোক, সে আমি নিজে, আমার স্বরূপ সে। সকালে সূর্যোদয় হলে সমস্ত জগৎ আলোকিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই ধরণের ব্যক্তি যিনি ঈশ্বর চিন্তন করেন, তাঁরা যে লোকেই যান তাঁদের চরণধূলো তিনটে লোককেই পবিত্র করে। সেইজন্য মানুষ চায় কোন সাধু সন্ন্যাসী আমার বাড়িতে এসে তাঁর পদধূলি দিয়ে যেন পবিত্র করে যান। শাস্ত্রে এই কথা বলেছে,

কারণ সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের দর্শন কোথায় পাবে! বলছেন যিনি সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তন করেন তিনি ঈশ্বরেরই রূপ, যেমন আচার্য শঙ্কর বলছেন যিনি জ্ঞান চিন্তন করেন তিনিও জ্ঞানী। ঠাকুর আরও সহজ করে বলছেন, কোন বাড়িতে জমিদারের নিমন্ত্রণ থাকলে সেই নিমন্ত্রণে যদি জমিদারের বাড়ি বাচ্চা ছেলেও চলে যায়, তাকে সেই সম্মানই দেওয়া হয় যে সম্মান জমিদারকে দেওয়া হয়। সাধক হলেন জমিদারের বাড়ির বাচ্চা। কেউটে সাপের বাচ্চা সেও কেউটে, এই জিনিসটাই এখানে বলছেন। কিন্তু এখানে শর্ত লাগিয়ে দিচ্ছেন, সন্ন্যাসীদেরকে বলছেন না, যে সাধক সদা সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তন করে। এই কথা বলে রামগীতা শেষ করছেন।

কৌশল্যার প্রতি শ্রীরামের উপদেশ

এরপর এক এক করে অনেক ঘটনা হয়ে গেছে। সীতা লব কুশের জন্ম দিয়েছেন। বাল্মীকি রামকথা রচনা করে লব কুশকে শিখিয়ে দিলেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন তখন লব কুশ এসে রামকথা গান করলেন। এই কাহিনীগুলো আমাদের সবারই জানা। সীতাকে আবার গ্রহণ করার কথা হয়েছে। অযোধ্যাবাসীরা অগ্নি পরীক্ষার কথা বলতে শুরু করল। এই অগ্নি পরীক্ষাকে সীতা আর মেনে নিতে পারলেন না। সীতা করজোড়ে প্রার্থনা করলেন, হে ধরিত্রী মা! তুমি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাও। সীতা তখন পাতালে প্রবেশ করে গেলেন। এই কাহিনীগুলো অন্যান্য রামায়ণেও আসে, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ একটু সুযোগ পেলেই ওর মধ্যেই আধ্যাত্মিক আলোচনা ঢুকিয়ে দেয়। এখনও কৌশল্যা বেঁচে আছেন। কৌশল্যা এখন বৃদ্ধা, তাঁকে নিয়ে কিছু কথা উঠেছে, শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে গিয়ে বলছেন –

নির্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ।
দয়ালুঃ প্রাহ ধর্মাত্মা জরাজর্জরিতাং শুভাম্।৭/৭৫৮
মার্গস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ।৭/৭৫৯

হিন্দুরা কখনই কোন কিছু মানবে না যতক্ষণ না তা ভগবানের কাছ থেকে এসে থাকে। গীতাতেও ভগবান বলছেন এই কথা আমি বলছি। এখানে অধ্যাত্ম রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বলছেন *মার্গস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ*, এই তিনটে পথ আমিই শিখিয়েছি। শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, মোক্ষের জন্য আমি, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ এই তিনটে যোগের কথা বলেছি। স্বামীজী চারটে যোগের কথা বলছেন। শাস্ত্রে কোথাও কোথাও চারটে যোগেরই কথা বলেন, কোথাও তিনটে যোগ আবার কোথাও দুটো যোগের কথাও বলেন। চারটে, দুটোতে কোন তফাৎ নেই। শুধু চারটে যোগই নয়, আরও অনেক যোগের কথা বলা হয়। যেমন স্বামী গম্ভীরানন্দজী সেবাযোগ নামে একটা যোগের কথা বলতেন। এগুলো কিছু না, যে কোন পথ দিয়েই যাওয়া যায়। কিন্তু যখন বিচার করা হয় তখন দুটো শ্রেণী হয়। আত্মাকে কেন্দ্র করে যখন ধ্যান হয়, সেটা জ্ঞানমার্গে চলে যায়, ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে সাধনা হয়, সেটা ভক্তিযোগে চলে যায়। ঠিক তেমনি দ্বৈত আর অদ্বৈতকে নিয়ে যদি দেখা হয়, তখন অদ্বৈতে আত্মাই আছেন সেখানে বিচারের পথ হয়ে যায়, এটাও জ্ঞানমার্গ। দ্বৈতে আমি আছি জগৎ আছে তখন এটাই কর্মযোগ হয়ে যায়। কিন্তু স্বামীজী যে রাজযোগের কথা বলছেন, ওটা সবাইকেই করতে হয়। রাজযোগ আবার কর্মযোগেরই রূপ। কর্মযোগ হল বহিরঙ্গ সাধনা আর ধ্যানযোগ হল অন্তরঙ্গ সাধনা। ধ্যানযোগ আবার হয় জ্ঞানমার্গ নেয় নয়তো ভক্তিমার্গ নেয়, ধ্যানে হয় আত্মার চিন্তন করে, না হলে ঈশ্বরের চিন্তন করে। যত যোগই নিয়ে আসা হোক না কেন, সব যোগই কর্ম, ভক্তি আর জ্ঞান এই তিনটের মধ্যে ঘুরপাক করতে থাকে। শ্রীরামচন্দ্র এখানে বলছেন, আমি এই তিনটে যোগের কথা বলেছি। আর যার যেমন স্বভাব মানুষ সেই স্বভাব অনুসারেই পথ নেয়।

শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, মা! আমি তোমাকে ভক্তির কথা বলছি। ভাগবতে এক জায়গায় বলছেন, যাদের মন থেকে সব কামনা বাসনা চলে গেছে তারাই জ্ঞানযোগের উপযুক্ত। কিন্তু যাদের মধ্যে এখনও ভোগ বাসনা কিলবিল করছে তাদের জন্য কর্মযোগ। ঈশাবাস্যোপনিষদে প্রথম শ্লোকেই দুটো পথের কথা বলে দিচ্ছেন, কর্মযোগ আর জ্ঞানযোগ। যাঁরা চিন্তন করবেন ঈশ্বরই আছেন আর কিছু নেই, এটা একটা পথ। যারা এটা পারবে না তারা অন্য পথ নেবে, *কুর্বন্নেবহ কর্মাণি*, তারা কাজ করবে। কিভাবে করবে? অনাসক্ত ভাবে করবে। ভাগবতে বলছেন, কিছু মানুষ আছে যাদের জগতের প্রতি আর সেই রকম আকর্ষণ নেই, অন্য দিকে তার পূর্ণ বৈরাগ্য আসেনি, পূর্ণ ভোগের ইচ্ছাও নেই, তাদের জন্য ভক্তি যোগ। এগুলো সব রুচিভেদে হয়।

বলছেন, যাদের মধ্যে ভেদ দৃষ্টি প্রবল, যার জন্য হিংসা, ক্রোধ, লোভ এগুলো তাদের মধ্যে বেশি থাকে, এদের তামস ভক্ত বলে। ঠাকুরও ব্যাখ্যা করার জন্য কথামৃতে সত্ত্ব, রজো আর তমোকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে অনেকবার বলেছেন। কিন্তু যাদের এই রিপুগুলো কম কিন্তু একটু ফলের ইচ্ছা আছে তাদেরকে রাজস ভক্ত বলে। আমি যা করছি ঈশ্বরের জন্যই করছি, ঈশ্বরের কাজ করাটাই আমার কর্তব্য এই ভাব নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাত্ত্বিক ভক্ত বলে। কিন্তু যখন মানুষ এর সব কিছু থেকে বেরিয়ে আসে, কর্মের প্রতি কোন আসক্তি আর নেই, আর বুঝে নেয় যত রকম বৃত্তি আছে, যত রকম ভাব আছে সব আমার থেকেই বেরিয়েছে আর আমার উপরই খেলা করছে, গঙ্গা যেমন এক ভাবে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ঠিক সেই ভাবে কারুর মন যদি আমার দিকে চলে আসে, তখন বুঝবে এটা নির্গুণ ভক্তির লক্ষণ। এটাই নিষ্কাম আর অখণ্ড ভক্তি, যেখানে কোন ধরণের চাহিদা নেই। গীতায় ভগবান বলছেন, *চতুর্বিধা ভজন্তে মাং*, চার রকম ভক্ত আমাকে চায় – আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থি আর জ্ঞানী। এইভাবে এখানে ভাগ করা হয়নি, কিন্তু মূল এটাই। প্রার্থনা যখন করছে তখন তার মধ্যে প্রচুর অহঙ্কার জড়িয়ে আছে, আমি অন্যের থেকে বেশি ভালো ইত্যাদি, এদের তামস বলছেন। নিজের ভালো যখন চাইছে তখন রজোগুণী ভক্ত বলছেন। ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে আবার আরও মজার মজার বর্ণনা দিচ্ছেন। কিন্তু অন্য কোন ভাবনা নেই, শুধু ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসে, একে বলছেন নির্গুণ ভক্ত। আর এরাই ঠিক ঠিক ভক্ত। গীতাতেও ভগবান তাই বলছেন, জ্ঞানী যে আমার স্বরূপকে ভালোবাসে সে আমার প্রিয়। অন্যরা যে প্রিয় না তা নয়, জ্ঞানী হল আমার স্বরূপ।

তখন বলছেন, যাদের কোন কামনা-বাসনা নেই, এই ধরণের নির্গুণ ভক্তের কি স্বভাব? স্মরণ, মনন, পূজন নিয়ে আছে, বেদান্তে বাক্যে সর্বদা রমণ করছে, যারা কষ্টে আছে তাদের প্রতি করুণা করা, এই ভাবগুলো তার ভেতর প্রবল ভাবে লক্ষিত হয়। আর সব সময় ভাগবত ধর্মের অনুষ্ঠান করে। মানুষ যখন এই জিনিসগুলোকে আশ্রয় করে তখন সে আমাকে খুব সহজেই পেয়ে যায়। কৌশল্যাকে এই শেষ একটা উপদেশ দিলেন, এর আগে লক্ষ্মণকে যেমন বললেন, কৌশল্যাকে এখানে আরেকটা পথের কথা বললেন।

উপসংহার

শ্রীরামচন্দ্রেরও যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কাল এসে খবর দিয়েছে। এবার শ্রীরামচন্দ্র চলে যাবেন। কিন্তু তাঁর যে এত সব লীলা সহচর তাঁদের কি হবে? তখন ভগবান বললেন, এরা সবাই দেবলোক থেকে এসেছে, আর সবাই আমারই কাজ করেছে, তাই এক কাজ করা যাক। সরযু নদীতে যদি এরা ডুব দেয় তখন এই পার্থিব শরীরটা চলে গিয়ে তারা যে শরীর থেকে এসেছিল সেই বাস্তবিক শরীর পেয়ে যাবে। এই কথা শোনার পর যত বানর আর ভাল্লুকরা দৌড়ে এসেছে, আর সরযু নদীর জল স্পর্শ করতেই তাদের শরীর ওখানেই চলে যেতেই যোনিমুক্তি হয়ে গেল আর যে যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল। সুগ্রীব যেমন সূর্যের পুত্র তিনি সূর্যে লীন হয়ে গেলেন, যারা যারা যে যে লোক থেকে এসেছিলেন সবাই সেই সেই লোকে চলে গেল। এখানে অবশ্য হনুমানের কোন কথা বলছেন না। কারণ বলা হয় যে হনুমান এখনও বেঁচে আছেন।

গ্রন্থস্তুতি করে বলছেন, অধ্যাত্ম রামায়ণ যে নিয়মিত অধ্যয়ন করবে শ্রীরাম ও সীতার প্রতি তাদের ভক্তি হবে আর শ্রী বৃদ্ধি হবে। আর বলছেন, এই অধ্যাত্ম রামায়ণ মহাদেবের রচনা। অধ্যাত্ম রামায়ণের শুরুই হয় পার্বতীর প্রশ্ন দিয়ে। তিনি মহাদেবকে শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে প্রশ্ন করছেন আর মহাদেব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। এই শৈলীই তুলসীদাস তাঁর রামচরিতমানসেও ব্যবহার করেছেন। স্বয়ং মহাদেব শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের বর্ণনা করছেন তাই এর মাহাত্ম্য স্বাভাবিক ভাবেই অনেক বেশি। এখানেই অধ্যাত্ম রামায়ণ শেষ হয়ে যায়। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ আর হনুমানের চরণে প্রণাম জানিয়ে আমাদের এই আলোচনা এখানে শেষ করছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।
ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু ।।

<u>সূচীপত্র</u>